ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী

(তিন খণ্ড একত্রে সমগ্র রচনা

অখণ্ড সংস্করণ

সম্পাদনা ঃ-

প্রফুল্ল কুমার পাত্র

পাত্র'জ পাবলিকেশন

২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট

কলিকাতা - ৭৩

TRAILOKYA RACHANABALI

প্রথম পাত্র'জ ঃ এপ্রিল ১৯৫৭

প্রকাশক ঃ
মানস কুমার পাত্র
পাত্র'জ পাবলিকেশন
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা - ৭৩

অক্ষরবিন্যাস ঃ
গ্রাফিক্স ও লেজার, কলকাতা - ৯

প্রচ্ছদ ঃ
প্রদোষ কান্তি বর্মন

মুদ্রক ঃ
ইমপ্রিন্টা, কলকাতা - ৬

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড

মাঝলের

তৃতীয় খণ্ড

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় : জীবনী ও সাহিত্য

সুপ্রসিদ্ধ হাসির লেখক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় বাংলা ১২৫৪ সালের ৬ই শ্রাবণ ইংরাজী ১৮৪৭ খ্রীঃ ২২শে জুলাই উত্তর ২৪ পরগণার অন্তর্গত শ্যামনগরের নিকট রাহুতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায়। বালক ত্রৈলোক্যনাথ গ্রামের চুঁচুড়ায় ডাফ সাহেবের স্কুলে ও ভদ্রেশ্বরের নিকটবর্তী তেলিনীপাড়া স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। সংসারের অসচ্ছল অবস্থার জন্য ১৮৬৫ খ্রীঃ বাড়ী থেকে রোজগারের উদ্দেশ্যে বাহির হয়ে যান এবং নানা দেশ ভ্রমণ করেন। প্রথমে দ্বারকা (বীরভূম) উখড়া (রাণীগঞ্জ) এবং শাহজাদপুর (সিরাজগঞ্জ) প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে শিক্ষকতার কাজ করেন। কিন্তু কোথাও মনঃপুত না হওয়ায় কটকে চলে যান। কটক জেলার ১৮৬৮ সালে পুলিশ সাব ইন্সপেক্টার হন। সেখানে ওড়িয়া ভাষা শিক্ষা করে, ওড়িয়া 'উৎকল শুভকরী' নামে মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা করেন। পুলিশের চাকরী করা কালীন সুপ্রসিদ্ধ স্যার উইলিয়ম হাণ্টার সাহেবের সঙ্গে পরিচিত হন। হাণ্টার সাহেব ইঁহার কথাবার্তা এবং অগাধ পাণ্ডিত্যে সন্তুষ্ট হয়ে কলিকাতায় ১৮৭০ খ্রীঃ নিজের অফিসে 'বেঙ্গল গেজেটিয়ার' সংকলন অফিসে কেরানীর পদে নিযুক্ত করেন। অতঃপর ইনি উত্তর পশ্চিম প্রদেশের কৃষি ও বাণিজ্য বিভাগের অফিসে প্রধান কেরানীর পদে নিযুক্ত হন। পরে বিভাগীয় ডাইরেক্টরের একান্ত সহকারী হন। ১৮৮১ খ্রীঃ ভারত সরকারের রাজস্ব বিভাগে বদলী হন। ১৮৮৬ খ্রীঃ এই বিভাগ ত্যাগ করে কলিকাতা মিউজিয়ামে সহকারী কিউরেটর হন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে দেশীয় শিক্ষা বাণিজ্যে যাতে উন্নতি হয় তার যথেষ্ট চেষ্টা করেন। এই সময়ে ইনি এই বিষয়ে মনোনিবেশ করেন। কালকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি বড় বড় শহরে এবং বড় বড় রেলস্টেশনে ভারতীয় কারুকার্যের যে সকল দোকান দেখতে পাওয়া যায় ইঁহার উদ্যোগেই সেগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে যে সব শিল্প দ্রব্য নির্মিত হত সেই সব শিল্প দ্রব্যের একটি তালিকা ইংরাজীতে প্রকাশ করেন। লোকে যাতে অনায়াসে বুঝতে পারে সেইজন্যেই এই গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। বর্ধমানে বসবাসকালে ফার্সী ভাষা শিক্ষা করে অভূতপূর্ব নাম করেছিলেন।

১৮৭৭-৭৮ খ্রীঃ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় সে সময়ের লোকেদের খাওয়া-দাওয়া অসুবিধার কথা চিন্তা করে গাজরের চাষ করলে দুর্ভিক্ষের সময় প্রাণ বাঁচানোর উপায় হিসাবে গভর্নমেণ্টকে এই বিষয়ে জ্ঞাপন করলে, গভর্ণমেণ্ট কয়েকটি জেলায় গাজরের চাষের বন্দোবস্ত করে দেন ১৮৮৭ খ্রীঃ। দু'বছর পরে রায়বেরিলী ও সুলতানপুর জেলার দুর্ভিক্ষের সময় তাঁর প্রস্তাবিত গাজর চাষের জন্য বহু প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হয়েছিল।

১৮৮২ খ্রীঃ ভারত গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিভাগে চাকরী হলে ইনি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের

শিল্পোন্নতির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন এবং বিশেষ কৃতকার্যও হন।

১৮৮৩ খ্রীঃ কলিকাতা আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে কয়েকটি বিষয়ে অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৮৮৬ বিলাতে প্রদর্শনী আরম্ভ হয়, তখন ত্রৈলোক্যনাথকে ইংলণ্ডের প্রদর্শনীতে পাঠানো হয়, সেই সময় ইউরোপের নানা স্থানে ভ্রমণ করেন এবং A visit to Europe নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে সমুদোয় কার্যাবলী ও ভ্রমণ বৃত্তান্ত বিবৃতি রয়েছে। ১৮৮৬ খ্রীঃ ত্রৈলোক্যনাথ রাজস্ব বিভাগের কর্ম পরিত্যাগ করে কলিকাতা মিউজিয়ামের চাকুরী গ্রহণ করেন। এই সময়ে ইনি গভর্ণমেণ্টের অনুমতি অনুসারে Art Manufactures of India নামক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। কিন্তু বাংলা দেশে সাহিত্যিক হিসাবেই তাঁর পরিচয়। তিনি বাংলা সাহিত্যে অজ্ঞাত পূর্বক এক উদ্ভট হাস্যরসের প্রবর্তক ছিলেন। বাংলা ভাষায় ইনি একজন প্রসিদ্ধ লেখক। বঙ্গবাসী অফিস হতে প্রকাশিত জন্মভূমি মাসিক পত্রিকায় ইনি অনেক ভালো ভালো প্রবন্ধ লিখেছিলেন। "বিশ্বকোষ" নামক অভিধান ইঁহার প্রচেষ্টাতেই আরম্ভ হয়। "বিশ্বকোষ" অভিধান রচনায় ভ্রাতা রঙ্গলালকে প্রচুর সাহায্য করেন। জন্মভূমি সাপ্তাহিক পত্রিকায় নিয়মিত লেখক ছিলেন। Wealth of India মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা কার্যেও তিনি সাহায্য করতেন।

ইনার রচিত বাংলা গ্রন্থ কঙ্কাবতী (১৯০৭), ফোক্‌লা দিগম্বর (১৩০৭), মুক্তমালা (১৯০১ খ্রীঃ), মজার গল্প (১৩১২), পাপের পরিণাম, ডমরু চরিত (১৯২৩ খ্রীঃ) নয়ন চাঁদের ব্যবসা, জাপানের উপকথা, লুল্লু, বীরবালা প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাহা ছাড়া A Descriptive catalogue of Products, A Hand Book of Indian Products, 'A list of Indian Economic Products প্রভৃতি এবং বিজ্ঞানবোধ ও আরো কয়েকটি বিদ্যালয় পাঠ্যের তিনি প্রণেতা। তাঁহাব রচিত 'ডমরু চরিত' অপূর্ব সৃষ্টি। এই বই সকল পাঠক পাঠিকার মন জয় করতে পেরেছে। "কঙ্কাবতী" উপন্যাস সম্বন্ধে *স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের প্রসঙ্গে বলেছেন "এইরূপ অদ্ভুত রূপকথা ভাল করিয়া লেখা বিশেষ ক্ষমতার কাজ। ...এতদিন পরে বাঙ্গলায় এমন লেখকের অভ্যুদয়...যাঁহার লেখা আমাদের দেশের বালক বালিকাদের এবং তাঁদের পিতামাতার মনোরঞ্জন করিতে পারিবে।"* বস্তুত সার্থক ফ্যানটাসীর পাঠকদের মধ্যে বয়সের ভেদাভেদ নেই এবং তার কাহিনী কখনও পুরোনো হয় না। একশ বছর যাবৎ বাংলা সাহিত্যের পাঠক মহলে কঙ্কাবতীর অক্ষুণ্ণ সমাদর আজ ও সেই কথা প্রমাণ করে চলেছে।

১৮৯৬ খ্রীঃ ইনি পেনসন গ্রহণ করেন। অমর লেখক ত্রৈলোক্যনাথ মাত্র ৭৩ বছর বয়সে, সকলকে কাঁদিয়ে ১৯১৯ খ্রীঃ ১১ই মার্চ ইহলোক ত্যাগ করে অমরত্ব লাভ করেন।

সাহায্যকারী পুস্তক — (১) সংসদ বাঙ্গালি চরিতাভীধান। (২) ভারতকোষ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। (৩) সরল বাংলা অভিধান সুবলচন্দ্র মিত্র। (৪) কঙ্কাবতী। মিত্র ও ঘোষ।

প্রফুল্ল কুমার পাত্র — কলিকাতা ৯

ফোক্‌লা দিগম্বর

প্রথম ভাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ – বাঙ্গালীবালিকা

"এই বাটীতে ডাক্তারবাবু আছেন?"

বাহির হইতে একজন এই কথা জিজ্ঞাসা কবিল।

"এ বাড়ীতে ডাক্তার আছেন?"

আগ্রহেব সহিত পুনবায় কে এই কথা জিজ্ঞাসিল। বামা-কণ্ঠ বলিয়া বোধ হইল।

রাত্রি তখন প্রায় দশটা বাজিয়াছে। আমার আহাবেব স্থান হইযাছে। আমি আহার করিতে যাইতেছি।

কে এই কথা জিজ্ঞাসা কবিতেছে, তাহা দেখিবার নিমিত্ত লণ্ঠনটি হাতে লইয়া, আমি বাহিবে আসিলাম। দ্বারের নিকট যাই গিয়া উপস্থিত হইয়াছি, আর পুনরায় সেই স্বর অতি আগ্রহ সহকাবে আমাকে জিজ্ঞাসা কবিল,—"মহাশয কি ডাক্তাব?"

লণ্ঠণটি আমি তুলিয়া ধবিলাম। তখন আলোকের সহায়তায় দেখিতে পাইলাম যে, একটি স্ত্রীলোক এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিল। স্ত্রীলোক বটে; কিন্তু বয়স্কা নহে। পূর্ণযুবতীও তাহাকে বলিতে পাবি না; কারণ, তাহাব বয়স ত্রযোদশ কি চতুর্দশ বৎসরের অধিক হইবে না।

আমি বিস্মিত হইল'ম। একে স্থান কাশী, তাহাতে রাত্রিকাল। রাত্রি দশটার সময় এরূপ অল্পবয়স্কা বাঙ্গালীব মেয়ে ঘর হ'তে বাহিব হইয়াছে কেন? বালিকা কি হতভাগিনী?—জঘন্য ব্যবসায়-অবলম্বিনী?

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনস্কভাবে আমি উত্তর করিলাম,—'তুমি বোধ হয়, রামকমল ডাক্তারকে খুঁজিতেছ? এ বাড়ী তাঁহার নহে। আরও একটু আগে গিয়া বামদিকে যাইবে; সেই স্থানে জিজ্ঞাসা কবিলেই রামকমল ডাক্তারের বাড়ী লোকে তোমাকে দেখাইয়া দিবে।'

আমার এই কথা শুনিয়া বালিকাটি কাঁদিয়া ফেলিল। চক্ষুর জল মুছিতে মুছিতে সে বলিতে লাগিল,—'ও মা! তবে আমি কি কবির? রামকমল ডাক্তার রামনগর গিয়াছেন। আজ তিনি ফিরিয়া আসিবেন না। আমি তাঁহার বাড়ীতে গিয়াছিলাম। তাঁহার চাকরেরা আমাকে এই কথা বলিল। তাহারা আমাকে বলিয়া দিল যে, এই বাড়ীতেও একজন ডাক্তার সম্প্রতি কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন, তাই আমি এখানে আসিয়াছি। ও মা, তবে কি হইবে? বিনা চিকিৎসায় বাবু হয়ত মারা পড়িবেন; তাহা হইলে আমার দশা কি হইবে?'

বিদেশে সেই রাত্রিতে সেই বাঙ্গালী-কন্যার খেদ শুনিয়া মনে আমার বড় দুঃখ হইল।

কুচরিত্রা স্ত্রীলোক বলিয়া পূর্বে যে সন্দেহ হইয়াছিল তাহার কথা শুনিয়া এক্ষণে সে সন্দেহ অনেকটা দূর হইল। এতক্ষণ পর্যন্ত তাহার মুখশ্রী আমি নিরীক্ষণ করিয়া দেখি নাই। আমার খাবার প্রস্তুত ছিল; দুই-চারি কথায় তাহাকে বিদায় করিয়া দিব, কেবল এই ইচ্ছা করিতেছিলাম।

এক্ষণে লণ্ঠনটি পুনরায় তুলিয়া ধরিলাম। লণ্ঠনের আলোক পূর্বাপেক্ষা উজ্জ্বলভাবে বালিকার মুখের উপর পড়িল। বালিকার রূপ ও ভাবভক্তি দেখিয়া আমি চমকিত হইলাম। পূর্বেই বলিয়াছি যে, তাহার বয়স ত্রয়োদশ কি চতুর্দশ বৎসর। একখানি সামান্য সাদা কালাপেড়ে কাপড় সে পরিধান করিয়াছিল,। কাপড়খানি সামান্য বটে; কিন্তু পরিষ্কার ছিল। তাহাতে পাছা ছিল না। কাপড়ের ভিতর শেমিজ ছিল; কিন্তু গায়ে জ্যাকেট কিংবা অন্য কোনপ্রকার জামা ছিল না। বালিকার দুই হাতে দুইগাছি সোনার বালা ছিল। কানে দুইটি ইয়ারিং ছিল। শরীরের অন্য কোন স্থানে কোনরূপ গহনা ছিল না। মস্তকের অর্ধেকভাগ সেই কালাপেড়ে শাড়ী দ্বারা আবৃত ছিল। ঝিউড়ি মেয়ে ঘর হইতে বাহির হইলে যেরূপ লজ্জা করা উচিত বোধ করে, অথচ লজ্জা করিতে তাহার লজ্জা হয়, মস্তকের অর্ধভাগ কাপড় দ্বারা আবরণে যেন সেইরূপ ভাব প্রকাশ পাইতেছিল। বালিকার হইয়া সেই কাপড়ের আবরণ যেন সকলকে বলিতেছিল,—"লজ্জা করা আমার উচিত বটে; কিন্তু লজ্জা করিতে এখনও আমি শিক্ষা করি নাই, সেজন্য তোমরা সকলে আমাব নিন্দা করিও না।" বালিকা সেদিন বোধ হয় চুল বাঁধে নাই। সে নিমিত্তর কোঁকড়া কোঁকড়া কেশরাশি থোলো থোলো হইয়া, তাহার কাঁধের উপব পডিয়াছিল। শুভ্রবর্ণ গলদেশের উপর সেই কেশরাশি পড়িয়া অপূর্ব শোভার আবির্ভাব হইয়াছিল। বালিকা গৌরবর্ণ, কিন্তু এখন বোধ হয়, অনেক দূর দৌড়িয়া আসিয়া থাকিবে; কারণ সেই গৌরবর্ণের ভিতর হইতে রক্তিম আভা ফুটিয়া বাহির হইতেছিল।

এরূপ মুখশ্রী বিশিষ্ট মানুষের চক্ষু কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এ বালিকার তাহা নহে। ইহার চক্ষুর কিরূপ বর্ণ, তাহা আমি ঠিক প্রকাশ. করিয়া বলিতে পারি না। নীলবর্ণ সাগরজলে সূর্যকিরণ মিশ্রিত করিলে যেরূপ এক নূতন প্রকার বর্ণের সৃষ্টি হয়, বালিকার চক্ষুতারা দুইটি সেইরূপ এক অদ্ভুত নূতন বর্ণে রঞ্জিত ছিল। আমার এত বয়স হইল, এরূপ চক্ষু কখন কাহারও দেখি নাই। চক্ষুর পাতাগুলি দীর্ঘ, নিবিড় ও ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। ভ্রূযুগলও সেইরূপ; কিন্তু অধিক ঘন বা স্থূল নহে। ফল কথা, বালিকা বিলক্ষণ সুন্দরী। কথাবার্তা ও ভাবভঙ্গি দেখিয়া তাহাকে ভদ্রকন্যা বলিয়া বোধ হইল। পাপ, কপটতা বা কুচিন্তা কখনও যে তাহার মনে উদয় হয় নাই, তাহাও সেই ভাবভঙ্গি তে প্রকাশ পাইতেছিল। সত্ত্ব, সরলতা, সাধুতা ও শিশুভাব যেন তাহার মুখশ্রীতে দেদীপ্যমান ছিল। এই অপূর্ব রূপ, এই সরল ভাব দেখিয়া কে না বশ হইয়া পড়ে? তাহার উপর, যখন সে বিমল মুখজ্যোতিঃ মনোদুঃখে মলিনতার আচ্ছাদিত হয়, যখন সেই সূর্য্যকিরণমিশ্রিত সাগরজল-গঠিত চক্ষু দুইটি হইতে অশ্রুবারি বিগলিত হয়, তখন সেই

বালিকার দুঃখ নিবারণের নিমিত্ত লোকে কি না করিতে পারে? ক্ষুধা-তৃষ্ণা আমি সব ভুলিয়া গেলাম। আমার অন্ন প্রস্তুত; তাহা পড়িয়া রহিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ – আমি বড় বোকা

বালিকার রূপ, বালিকার দুঃখ দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম। আমি বলিলাম,—'রামকমলবাবু যখন বাড়ী নাই, তখন আমাকে যাইতে হইবে। আমি একজন ডাক্তার বটে; কিন্তু এ স্থানে আমি ডাক্তারি করি না। কলিকাতা হইতে কেবল দুইদিন আমি এ স্থানে আসিয়াছি।'

বালিকা চক্ষু মুছিয়া কাতরস্বরে বলিল,—'ও মহাশয়! তবে আসুন, তবে শীঘ্র আসুন; বিলম্ব করিলে তিনি মারা পড়িবেন; বিলম্ব করিবেন না, শীঘ্র আসুন।'

বালিকার জুলুম দেখিয়া মনে মনে আমি একটু হাসিলাম। কিন্তু যাহার এরূপ দেবদুর্লভ সৌন্দর্য, পৃথিবীতে সে জুলুম করিবে না ত' আর করিবে কে? আমি ত' আমি, পৃথিবীর সকল লোককেই সেই অলৌকিক রূপলাবণ্য বিশিষ্ট বালিকার হুকুম 'যে আজ্ঞা' বলিয়া মানিতে হয়। অতি নম্রভাবে আমি বলিলাম,—'না, আমি বিলম্ব করিব না, শীঘ্র চাদরখানা লইয়া আসি।'

তখন আমি ব্রহ্মদেশে কর্ম করিতাম। ছুটি লইয়া দেশে আসিয়াছিলাম। আমার পিতামহী কাশীবাসিনী হইয়াছিলেন। দুই-চারি দিনের নিমিত্ত তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলাম। এক বৃদ্ধ চাকর ব্যতীত অন্য কাহাকেও আমি সঙ্গে আনি নাই। আমি মনে করিলাম যে বালিকার বাটী নিকটেই হইবে। সেজন্য গাড়ি আনিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিলাম না। চাদরখানি গায়ে দিয়া আমার ডাক্তারি ব্যাগটি ও লণ্ঠনটি নিজেই হাতে করিয়া ঘর হইতে বাহির হইলাম। রাত্রিকালে আমার সে বৃদ্ধ চাকরকে সঙ্গে লইতে ইচ্ছা করিলাম না। বালিকা দ্রুতবেগে আগে আগে চলিতে লাগিল, আমি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলাম। তাহার বয়স অল্প; সে প্রায় ছুটিয়া যাইতে লাগিল। আমি যদিও ঠিক বৃদ্ধ নাই, তথাপি আমার বয়ঃক্রম তখন পঞ্চাশের নিকট হইয়াছিল। শীঘ্রই আমার শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল। তাহাতে একহাতে ব্যাগ, অপর হাতে লণ্ঠন,—দুই হাতে দুইটি লইয়া যাইতে আমার কষ্টবোধ হইতে লাগিল। তখন আমি বালিকাকে বলিলাম,—'একটু ধীরে ধীরে চল; অতিদ্রুত আমি যাইতে পারিব না।'

বালিকা তখন আমার দিকে চাহিয়া দেখিল। আমি যে বালক নই, কি যুবা নই, আমি যে বৃদ্ধ, বালিকা তখন প্রথম যেন তাহা বুঝিতে পারিল। কিন্তু অপ্রতিভ হইয়া সে আমার হাত হইতে লণ্টনটি কাড়িয়া লইল ও ব্যাগটি লইতেও হাত বাড়াইল। তাহাকে আমি ব্যাগ লইতে দিলাম না। তখন হইতে বালিকা একটু ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল।

এতক্ষণ পর্যন্ত কোন কথাই আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই। অবসর পাইয়া এইবার আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'কাহার পীড়া হইয়াছে? কি হইয়াছে?'

বালিকা উত্তর করিল,—'বাবু বড় পড়িয়া গিয়াছেন; বড় লাগিয়াছে, বড় রক্ত পড়িতেছে।'

'বাবু' অর্থে অনুমানে স্বামী বলিয়া বুঝিলাম। কিন্তু এরূপ বিপদের সময় বালিকা পাছে লজ্জা পায়, সে নিমিত্ত বিশেষ করিয়া আর সে কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না। 'বাবু' অর্থে না হয় স্বামী হইল; কিন্তু ভদ্রঘরের বাঙ্গালী-কন্যা এত রাত্রিতে ঘর হইতে একলা ডাক্তার ডাকিতে কেন বাহির হইয়াছে? তাহার বাড়ীর অন্য কোন লোক আসে নাই কেন? অথবা চাকর-বাকর কেহ আসে নাই কেন? ইহার মর্ম আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। অবশেষে আমি মনে মনে ভাবিলাম,—'আমি ডাক্তার মানুষ, লোকের রোগ দূর করা, লোকের শারীরিক যাতনা নিবারণ করা আমার কাজ। আমরা সাধু জানি না, পাপী জানি না;—রোগের চিকিৎসা লইয়া আমাদের কথা। লোকের ঘর-সংসারের কথায় আমার প্রয়োজন কি? সে সকল কথা বালিকাকে আমি কিছুমাত্র জিজ্ঞাসা করিব না।'

এইরূপ ভাবিয়া আমি তাহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম,—'তোমার বাবু কখন্ পড়িয়া গিয়াছেন? কোথায় লাগিয়াছে? তাঁহার জ্ঞান আছে, না তিনি অজ্ঞান হইয়া গিয়াছেন?'

বালিকা একেবারে সকল কথার উত্তর দিল না; ক্রমে ক্রমে একটি একটি করিয়া বলিতে লাগিল,—'আজ প্রাতঃকালে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিলেন। দাঁড়াইতে পারেন না। কথা কহিতে পারেন না। আমি তাঁহাকে বিছানায় শয়ন করিতে বলিলাম; প্রথম সে কথা তিনি শুনিলেন না। তাহার পর শুইয়া পড়িলেন। চাঁদর ছিঁড়িয়া কাঁধে বাঁধিয়াছিলেন। তাহার ভিতর হইতে ক্রমাগত রক্ত পড়িতেছিল। আমি ডাক্তার আনিতে চাহিলাম। তিনি মানা করিলেন। সমস্ত দিন রক্ত পড়িল। মুখ তাঁহার সাদা হইয়া গেল। দুর্বল হইয়া পড়িলেন। তাহার পর এখন তিনি নিজেই ডাক্তার আনিতে বলিলেন। ডাক্তার আনিবার নিমিত্ত সমস্ত দিন আমি কতবার বলিয়াছিলাম, তিনি আনিতে দেন নাই। এখন ডাক্তারের জন্য নিজেই ব্যস্ত হইয়াছেন। কি যে কপালে আছে। তা বলিতে পারিব নাই। আমি এখানে আর কখনও আসি নাই। কাহাকেও আমি জানি না। লোককে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে রামকমল ডাক্তারের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম। রামকমল ডাক্তার বাড়ী নাই। তাঁহার চাকরেরা আপনার ঠিকানা বলিয়া দিল। সেজন্য আপনার নিকট দৌড়িয়া গেলাম।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'তোমরা এ স্থানে থাক না? কাশীতে তোমরা কবে আসিয়াছ?'

বালিকা উত্তর করিল,—'না না, আমরা এখানে থাকি না, আমরা এখানে সম্প্রতি আসিয়াছি। এ স্থানে কাহাকেও আমরা, জানি না। ইস্! করিলাম কি? আমরা কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, এ সব পরিচয় দিতে বাবু মানা করিয়াছেন। পাছে কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করে সেইজন্য বাবু ডাক্তার আনিতে ইচ্ছা করেন নাই। আমি বড় বোকা তাই এত

কথা বলিয়া ফেলিলাম।'

আমার মনে পুনরায় ঘোরতর সন্দেহ হইল,—কাশী স্থান! কুকর্ম্মান্বিত লোক দেশ হইতে পলায়ন করিয়া এইস্থানে আশ্রয় লাভ করে, এ বালিকাও সেইরূপ না কি? আহা তাই হইলে কি দুঃখের বিষয়! বালিকার প্রতি আমার মন এত আকৃষ্ট হইয়াছিল যে, সেই কথা ভাবিয়া আমি ঘোর শোকাকুল হইয়া পড়িলাম। আবার ভাবিলাম, না, না, তাহা কখনই হইতে পারে না। লজ্জাশীলতা, কোমলতা, পতিব্রত্য সতী-সাবিত্রী ভাব বালিকার মুখশ্রীতে যেন অঙ্কিত রহিয়াছে। এরূপ লক্ষ্মীস্বরূপা কন্যা দুষ্কর্ম্মান্বিতা হইতে পারে না। ইহারা কে, কি বৃতান্ত,—সে সমুদয় গোপন রাখিবার বোধ হয় কোন কারণ আছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ – এখন লজ্জা করিতে পারি না

আমি এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সময় বালিকা পুনরায় বলিল,—'বাবু কে, কোথা হইতে আনিয়াছেন, সেসব তাঁহাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিবেন না। পাছে সে সব কথা কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে, সেই ভয়ে তিনি এতক্ষণ ডাক্তার আনিতে দেন নাই। বাবু গোপনে আমাকে বিবাহ কবিয়াছেন। আমাব মেসোমহাশয ও মাসী তাঁহার সহিত আমার বিবাহ দিয়াছেন। বাবুর পিতা জানিতে পারিলে বড়ই রাগ কবিবেন, সেই জন্য এখন তিনি এ কথা গোপন রাখিতেছেন! এইবার পাশ দিযা বাবু দেশে গিযা, তাঁহার পিতাকে সকল কথা বলিবেন। তখন আর কোন কথা গোপন কবিতে হইবে না। ঐ যা! পুনরায় অনেক কথা বলিয়া ফেলিলাম; কে জানে, লোকে কি করিয়া মনে কথা রাখে, আমি ত' তা পারি না!'

কথা গোপন রাখিবাব ভাব দেখিয়া আমি মনে মনে একটু হাসিলাম। যাহা হইক, বালিকা যে স্বামীর সহিত কাশী আসিযাছে, ইহার ভিতর যে কোন মন্দ বিষয় নাই, এই কথা শুনিয়া আমি আনন্দিত হইলাম। এই অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই বালিকার প্রতি আমার মনে একপ্রকার স্নেহের উদয় হইযাছিল।

বালিকা পুনরায় বলিল,—'বাবু বড়ই দুর্বল হইয়াছেন। মুখে যেন আর কিছু মাত্র রক্ত নাই। মুখ এমনই সাদা হইয়া গিয়াছে। আমার কপালে যে কি আছে, তা জানি না। আমাদের নূতন বিবাহ হইয়াছে। আমার লজ্জা করা উচিত; কিন্তু এই বিদেশে আমাদের কেউ নাই। তাহাব উপর এই ঘোর বিপদ! এ বিপদের সময় আমি লজ্জা করিতে পারি না। তাহাতে আমাকে যে যাই বলুক!'

এই কথা বলিয়া বালিকা যেন ঈষৎ রুষ্টভাবে আমার দিকে চাহিল। সেই রুষ্টভাবের যেন এইরূপ অর্থ,—'তুমি আমাকে বেহায়া ভাবিতেছ! এখন আমার বাবুর প্রাণ লইয়া টানাটানি! তোমার ইচ্ছা যে, এখন আমি একহাত ঘোমটা দিয়া বসিয়া থাকি! বটে!'

বালিকা অবশ্য এরূপ কোন কথা প্রকাশ করিয়া বলে নাই। মনে মনে তাহার এরূপ চিন্তা উদয় হইয়াছিল কি না, তাহাও আমি জানি না। প্রকৃত সে কোপাবিষ্টভাবে আমার প্রতি চাহিয়াছিল কি না, তাহাও আমি ঠিক বলিতে পারি না; কিন্তু এই অল্পক্ষণের মধ্যেই

তাহার উপর আমার এরূপ বাৎসল্যভাবের উদয় হইয়াছিল যে পাছে সে রাগ করে,—আমার মনে সেই ভয় হইল। আমি যেন কত দোষ করিয়াছি, আমি যেন কত অপরাধে অপরাধী হইয়াছি,—সেইরূপ অতি বিনীতভাবে আমি বলিলাম,—না, তোমাকে আমি বেহায়া ভাবি নাই। বরং এই বিপদের সময় এত রাত্রিতে অপরিচিত স্থানে তুমি যে সাহস করিয়া ঘর হইতে বাহির হইতে পারিয়াছ, তাহার জন্য তোমার আমি প্রশংসা করি।'

বালিকা বলিল,—'বিপদের সময় লোকের ভয় থাকে না। তাছাড়া আমি পল্লীগ্রামের মেয়ে। যখন আমি বালিকা ছিলাম, তখন মাঠে-মাঠে আমরা কত বেড়াইতাম। ঐ যা। আবার একটা কথা বলিয়া ফেলিলাম। দূর ছাই! কত সাবধান হইব?'

যাইতে যাইতে এইরূপ কথাবার্তা হইতে লাগিল বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে আমরা দুইজনই দ্রুতপদে পথ চলিতেছিলাম। পথ আর ফুরায় না। কিন্তু কতদূর যাইতে হইবে, সে কথা আমি জিজ্ঞাসা করিলাম না। বালিকা কি করিয়া পথ চিনিয়া যাইতে পারিল, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। বোধ হয়, আমার মনের ভাব বুঝিয়া সে বলিল,—'সন্ধ্যার পর এইসব রাস্তায় বাবু অনেকবার আমাকে বেড়াইতে আনিয়াছিলেন। এই পথ দিয়া মালীর স্ত্রীর সঙ্গে দুই-একবার বিশ্বেশ্বরের আরতি দেখিতে গিয়াছিলাম। কাশীতে কোন দোষ নাই। সেজন্য আমি বাবুর সহিত বেড়াইতে আসিয়াছিলাম।'

চতুর্থ পরিচ্ছেদ – ঘরের কোণে তুমি দাঁড়াও

ক্রমে আমরা সহর পার হইলাম। মাঠ ও বাগান পড়িল। এতক্ষণ বড় রাস্তা দিয়া যাইতেছিলাম। বড় রাস্তার বামপার্শ্বে বৃহৎ একটি বাগান দেখিতে পাইলাম। বালিকা সেই বাগানের ভিতর প্রবেশ করিল। নিকটে গিয়া জানিতে পারিলাম যে, সে বাগানটি বিলাতী কুলের গাছে পরিপূর্ণ। অন্য কোনপ্রকার গাছ বড় দেখিতে পাইলাম না। জনমানবের সহিত সাক্ষাৎ হইল না। বাগানের মাঝখানে একস্থানে একটি খোলার বাড়ী ছিল। বালিকা সেই খোলার বাড়িতে প্রবেশ করিল। আমার বোধ হইল যে, খোলার বাড়ীটি তিন-চারটি কুঠরীতে বিভক্ত ছিল। তাহার একটি ঘরে বালিকা প্রবেশ করিল। ঘরের একপার্শ্বে একটি ল্যাম্প জ্বলিতেছিল। মেঝেতে বড় একটি চাটাই বিস্তৃত ছিল। ঘরের অন্য এক পার্শ্বে দুইখানি চারপাই ছিল। একখানি চারপাইয়ে একটি গৌরবর্ণ যুবক শয়ন করিয়াছিল। যুবকের বয়ঃক্রম উনিশ কি কুড়ি হইবে, তাহার অধিক হইবে না। রক্তস্রাবে মুখ এখন শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু যুবক যে সুন্দর পুরুষ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সেই খাটিয়ার নিকটে দাঁড়াইয়া বালিকা বলিল,—'বাবু! ইনি ডাক্তার মহাশয়। ইঁহাকে আমি আনিয়াছি। ইনি এ স্থানের ডাক্তার নহেন। ইনি কলিকাতার ভাল ডাক্তার। সম্প্রতি ইনি এ স্থানে আসিয়াছেন। ইস্! তোমার মুখে যেন আর একটুও রক্ত নাই।'

বাস্তবিক সেই যুবকের মুখ রক্তহীন হইয়াছিল। শরীর হইতে অধিক রক্তস্রাব হইলে মুখ যেরূপ উজ্জ্বল ও চঞ্চল হয়, যুবকের সেইরূপ হইয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া আমার ভয়

হইল।

যুবক বলিল,—'মহাশয়! আসিয়াছেন, ভাল হইয়াছে।'

তাহার পর সেই বালিকার দিকে চাহিয়া সে পুনরায় বলিল,—'কুসী? তুমি একবার ঘরের বাহিরে যাও।'

আমি বুঝিলাম যে, সেই বালিকার নাম 'কুসী', অন্ততঃ তাহার ডাকনাম কুসী। ভাল নাম কি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। এই সময়ে বালিকার মুখের দিকে আমার দৃষ্টি পড়িল। আমি দেখিলাম যে, তাহার বাম গালে একটি কৃষ্ণবর্ণের আঁচিল রহিয়াছে। শুভ্র গালের উপর সেই আঁচিলটি থাকায় মুখের সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি হইয়াছিল। আঁচিলের উপর কেন আমার দৃষ্টি পড়িল, তাহা আমি জানি না, কিন্তু আঁচিল সংযুক্ত সেই গণ্ডদেশ যেন আমার মনে অঙ্কিত হইয়া গেল। বালিকা যুবককে 'বাবু' বলিয়া সম্বোধন করিল। এখন হইতে আমিও তাহাকে 'বাবু' বলিব।

বাবু বলিল,—'কুসী! তুমি একবার ঘরের বাহিরে যাও ডাক্তারবাবু আমার কাঁধ পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। রক্ত দেখিলে তোমার ভয় হইবে।'

কুসী উত্তর করিল,—'না বাবু! তুমি আর যা বল তাই করিব, তোমাকে একেলা ছাড়িয়া আমি এ ঘরের বাহিরে যাইব না।'

বাবু বলিল,—"আচ্ছা কুসী! তবে তুমি এক কাজ কর, ঘরের ঐ কোণে দাঁড়াইয়া প্রাচীরের দিকে মুখ করিয়া থাক, আমার দিকে চাহিও না। যদি আবশ্যক হয়, তাহা হইলে তোমাকে আমি ডাকব।'

কুসী আস্তে আস্তে ঘরের কোণে গিয়া দাঁড়াইল। প্রাচীরের দিকে মুখ করিয়া রহিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ – ঘোরতর সন্দেহ

বাবু আপনার স্কন্ধের দিকে দৃষ্টি করিয়া, চক্ষু টিপিয়া আমার প্রতি ইসারা করিল। কিন্তু সে ইঙ্গিতের অর্থ কি, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। তাহার পর বাবু বলিল,—'আমি বড় পড়িয়া গিয়াছি। কাশীর ঘাট উচ্চ। সেই ঘাট হইতে পড়িয়া গিয়াছি। নিম্নে একখণ্ড তীক্ষ্ণ প্রস্তর ছিল। আমার কাঁধে তাহা ফুটিয়া গিয়াছিল। অনেক রক্ত পড়িয়াছে।'

এই কথা বলিয়া তাহার গায়ে যে বিছানার মোটা চাদরখানি ছিল, প্রথম সেই চাদরখানি বাবু খুলিয়া ফেলিল; তাহার পর স্কন্ধে আহত স্থানে যে ছিন্ন চাদর বাঁধা ছিল তাহাও খুলিয়া ফেলিল।

আমি দেখিলাম যে, স্কন্ধে একটি গোলাকার ছিদ্র হইয়াছে। প্রস্তরখণ্ড দ্বারা আহত হইলে সেরূপ ক্ষত হয় না; বন্দুক অথবা পিস্তলের গুলি লাগিলে যেরূপ গোলাকার ছিদ্র হয়, তাহাই হইয়াছিল।

বাবু বলিল,—'সমস্ত দিন হইতে এরূপ রক্ত পড়ে নাই; অল্পক্ষণ হইল, অধিক শোণিতস্রাব হইতেছে।'

এই কথা বলিয়া বাবু পুনরায় চক্ষু টিপিয়া আমার প্রতি ইঙ্গিত করিল। এবার আমি তাহার অর্থ বুঝিলাম। পিস্তলের গুলি দ্বারা সে যে আহত হইয়াছিল, এ কথা সে বালিকার নিকট গোপন করিতেছিল। বাবুর স্কন্ধে গুলির দাগ দেখিয়া পুনরায় আমার বড় সন্দেহ হইল। এই বালিকা প্রকৃত কি ইহার স্ত্রী নহে? অন্য কাহারও স্ত্রী অথবা কাহারও কন্যাকে বাবু কি বাহির করিয়া আনিয়াছে? সে নিমিত্ত কন্যার স্বামী, পিতা, ভ্রাতা অথবা কোন আত্মীয় ইহাকে কি গুলি মারিয়াছে? আমার মনে ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হইল। আমি ভাবিলাম,—'এই পাপিষ্ঠ নরাধম লক্ষ্মীরূপা বালিকার ইহকাল পরকাল নষ্ট করিয়াছে। যাহারা ইহাকে গুলি করিয়াছিল, একবারে তাহারা ইহাকে বধ করে নাই কেন? আমি ইহার চিকিৎসা করিব না। রক্তস্রাব হইয়া এ মৃত্যুমুখে পতিত হউক। তাহাব পর, বালিকাকে আমি তাহার পিতার নিকট পাঠাইয়া দিব।' এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সময় বাবুর মুখের দিকে আমার দৃষ্টি পড়িল। তাহার মুখে ভয় অথবা কুকর্মজনিত লজ্জার চিহ্ন লেশমাত্র দেখিতে পাইলাম না। কুকর্মান্বিত অপরাধীর মুখে এরূপ শান্তি বিরাজ করে না। বাবুর স্থির শান্ত মুখ দেখিয়াও বালিকার কথা স্মরণ করিয়া আমার ক্রোধের কিছু উপশম হইল। ভালমন্দ আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কোনও কথা জিজ্ঞাসা কবিতে বালিকা আমাকে নিষেধ করিয়াছিল। আমি ভাবিলাম,—'ইহাদেব ভিতর কি গুপ্ত কথা আছে তাহা জানিয়া আমার প্রয়োজন কি? আমি ডাক্তার, ডাক্তারি করিতে আসিয়াছি, ডাক্তাবি করিয়া চলিয়া যাই।'

এইরূপ ভাবিয়া আমি বলিলাম,—'গুরুতর আঘাত লাগিযাছে বটে। সেটা—সেই বস্তুটা এখনও কি ইহার ভিতর আছে?'

আমার প্রশ্নের মর্ম এই যে, গুলিটা বাহির হইয়া গিয়াছে, না এখনও স্কন্ধের ভিতর আছে?

বাবু উত্তর করিল,—'পাথবের টুকরো ভিতরে নাই আমি নিজে তাহা বাহির করিয়া ফেলিয়াছি।'

এই কথা বলিয়া বালিসের নীচে হইতে যুবক একটি গুলি বাহির করিয়া চুপি চুপি আমাকে দেখাইল।

বন্দুক অথবা পিস্তলের গুলি মানুষের গায়ে লাগিলে এত শোণিতস্রাব হয় না। এত রক্ত কেন পড়িল, সেই কথা আমি ভাবিতেছিলাম। ক্ষতস্থানের প্রতি দৃষ্টি করিয়া দেখিতে পাইলাম যে, তাহার একপার্শ্বে কাটা দাগ রহিয়াছে। পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে গুলির আঘাত হইতে অধিক শোণিতপাত হয় নাই; সেই কর্ত্তিত স্থান হইতেই শোণিতধারা বহিতেছিল।

বাবুকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'এ কি? এ দাগ কোথা হইতে আসিল?'

বাবু উত্তর করিল,—'ঐ দ্রব্যটা (অর্থাৎ গুলিটা) আমার স্কন্ধের ভিতর রহিয়া গিয়াছিল, আমি আপনি ছুরি দিয়া কাটিয়া তাহাকে বাহির করিয়াছি।' এই কথা বলিয়া বাবু

হাসিয়া উঠিল। হাসি শেষ হইতে সে অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

নিজে ছুরি চালনা করিয়া, বাবু বড় অন্যায় কাজ করিয়াছিল। কারণ, সেই ছুরির আঘাত হইতে শোণিতস্রাব হইতেছিল; গুলির আঘাত হইতে বড় নয়। ছুরি চালনার রক্তস্রাব হইতে বাবুর চাই কি মৃত্যু ঘটিতে পারিত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ – বিপদের সম্ভাবনা আছে

যাই হউক, বাবুর মূর্চ্ছায় আমার পক্ষে সুবিধা হইল। মূর্চ্ছিত অবস্থা না হইলে আমি ক্ষতস্থান ভাল করিয়া পরীক্ষা করিতে পারিতাম না, অন্ততঃ রোগীর বড় যাতনা হইত। সেই মূর্চ্ছিত অবস্থায় তাহাকে রাখিয়া, আমি রক্তবন্ধ করিলাম ও আহত স্থান ভাল করিয়া ড্রেস করিলাম। পকেট-কেস হতে ছোট একশিশি ব্র্যাণ্ডি ও চারি-পাঁচটি নিতান্ত প্রয়োজনীয় ঔষধ আমার ব্যাগের ভিতর থাকে। যখন আমি বিদেশে গমন করি, তখন এই ব্যাগটি সর্বদাই আমার কাছে বাখি। বাবুর মুখে একটু ব্র্যাণ্ডি দিয়া তাহার আমি চৈতন্য উৎপন্ন করিলাম।

বাবু চক্ষু উন্মীলিত করিয়া বলিল,—'এ কি! আমি কোথায় আসিয়াছি? এ কাহাদের বাড়ী? কুসী! কুসী কোথায়?'

এতক্ষণ ধরিয়' কুসী ঘরের কোণে দাঁড়াইয়া ছিল। বাবু যে অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিল সে তাহার বিন্দুবিসর্গ জানিতে পার নাই। কুসী বলিয়া বাবু যাই ডাকিল, আর সে বিছানার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল।

কুসী বলিল,— 'কেন বাবু! আমাকে ডাকিলে কেন? তুমি কেমন আছ?

মৃদুস্বরে বাবু বলিল,—'এখন আমার সব মনে পড়িতেছে। আমি বুঝিয়াছি, আমি অনেক ভাল আছি, কুসী!'

'আমি ভাল আছি এই কথা বলিবার সময় বাবু আমার মুখপানে চাহিল। চক্ষুপলকের সহায়তায় আমাকে যেন জিজ্ঞাসা করিল,—'সত্য সত্য কি আমি ভাল আছি? না কোন বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে?'

তাহার মনের ভাব বুঝিয়া আমি বলিলাম,—'এ ঘা শীঘ্রই ভাল হইয়া যাইবে। ইহাতে কোন বিপদের আশঙ্কা নাই! তবে দিনকত তোমাকে স্থিরভাবে শয়ন করিয়া থাকিতে হইবে।'

দুইজনেই বালক-বালিকা,—সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। এ স্থানে তাহাদের যে কেহ আত্মীয়-স্বজন অথবা বন্ধু-বান্ধব নাই, বালিকার মুখে পূর্বেই তাহা আমি শুনিয়াছিলাম। বালিকার উপর আমার স্নেহ পড়িয়াছিল; তাহার অনুরোধে বাবুর প্রতিও আমার ভালবাসা হইয়াছিল। বাবুর স্কন্ধে আঘাতটি গুরুতর;—যদিও মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। যাহা হউক, ইহাদের আত্মীয়-স্বজনের নিকট সংবাদ প্রেরণ করা কর্তব্য। ইহারা প্রকৃত আমার দয়া ও স্নেহের পাত্র কি না, প্রথম তাহা আমাকে জানিতে হইবে।

এইরূপ মনে করিয়া আমি বাবুকে বলিলাম,—'দেখ তোমাকে আমি একটা কথা বলি। তোমরা উভয়েই ভদ্রলোকের পুত্র-কন্যা বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। কিন্তু তোমরা যে অবস্থায় কাশীর বাহিরে এই বনের ভিতর একাকী রহিয়াছ, তাহা দেখিয়া আমার বড় সন্দেহ হইতেছে। ইহার ভিতর যদি কোন পাপ থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয় আমি তাহার প্রতিবিধান করিব। তোমাকে আমি হাসপাতালে পাঠাইয়া দিব। তারপর এই বালিকার পিতামাতার সন্ধান করিয়া তাঁহাদিগের নিকটে ইহাকে আমি পাঠাইয়া দিব।'

সপ্তম পরিচ্ছেদ – অভিভাবকের অভাব

আমার এই কথা শুনিয়া বালিকা মস্তক অবনত করিয়া ঈষৎ হাসিতে লাগিল। বাবু হো হো করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। তাহার সে হাসি আর থামে না। আমায় ভয় হইল, পুনরায় পাছে রক্তস্রাব আরম্ভ হয়। কিছু রাগত হইয়া আমি বলিলাম,—'হাসি তামাসার কথা আমি কিছু বলি নাই। আমি তোমাদের পিতার বয়সের লোক, আমার কথায় এরূপ বিদ্রূপ করা তোমার উচিত নয়।'

এই কথা বলিলাম বটে, কিন্তু কুসীর ভাব ও বাবুর হাসি দেখিয়া আমার নিশ্চয় প্রতীতি হইল যে, ইহাদের মধ্যে কোন প্রকার পাপ নাই।

বাবু আমাকে বলিল, 'মহাশয়! এইরূপ কথা উঠিবে বলিয়াই আমি সমস্ত দিন ডাক্তার আনিতে দিই নাই। যাই হউক, আমি সত্য সত্য আপনাকে বলিতেছি যে, কুসী আমার বিবাহিতা স্ত্রী। বাপ রে! আপনি যা মনে করিতেছেন, কুসী যদি তা হইত, তাহা হইলে এ প্রাণ কি আমি রাখিতে পারিতাম? আমার কুসী পাপিনী। এ কথা ভাবিতে গেলেও আমার বুক ফাটিয়া যায়। ভিতরের কথা এই যে, পিতার অমতে আমি কুসীকে বিবাহ করিয়াছি; অর্থাৎ কি না, আমার পিতা এ কথার বিন্দু বিসর্গ জানেন না। আমার পিতা বড় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তেজস্বী ব্যক্তি। তাঁহাকে না বলিয়া আমি এই কাজ করিয়াছি। তিনি জানিতে পারিলে বোধহয়, আমার বিশেষ ক্ষতি হইবে আমাদের অন্ততঃ। আমার নিবাস বঙ্গদেশে। আমি কলেজে অধ্যয়ন করি! তিনি হয়ত আমার খরচপত্র বন্ধ করিয়া দিবেন। তখন আমি কি করিব? সেইজন্য মনে করিয়াছি যে, এবার বি-এল, পরীক্ষা দিয়ে যখন দেশে যাইব, তখন পিতাকে সকল কথা বলিব। তখন পিতা বাড়ী হইতে দূর করিয়া দেন দিবেন। বি-এল পরীক্ষা দিতে পারিলে ওকালতী করিয়া কি অন্য কাজ করিয়া কোনমতে কুসীকে প্রতিপালন করিতে পারিব। এক্ষণে আপনাকে মিনতি করি যে, আর অধিক কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন না। কি করিয়া আমি আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাও জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নাই।'

বাবুর এই সকল কথা শুনিয়া আমার সন্দেহ দূর হইল। কুসীকে একবার আমি বাহিরে যাইতে বললাম। কুসী অন্তরালে গমন করিলে, আমি বাবুকে পুনরায় বলিলাম,—একে বিদেশ, তোমার এ স্থানে পরিচিত লোক কেহ নাই; তাহার উপর তুমি এইরূপ গুরুতর

আহত হইয়াছ। যদিও সে ভয় নাই, তথাপি দৈবের কথা কিছুই বলিতে পারা যায় না। যদি কোনরূপ দুর্ঘটনা ঘটে, তাহা হইলে এই বালিকার গতি কি হইবে? এ অবস্থায় হয় তোমার অভিবাবকদিগকে, না হয় বালিকার অভিভাবকদিগকে তারযোগে সংবাদ প্রেরণ করা কর্তব্য।'

যুবক উত্তর করিল—'আমার অভিভাবকবর্গকে সংবাদ দিতে পারি না। কেন পারি না, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। কুসীর অভিভাবক নাই; একমাত্র মেসোমহাশয় আছেন; তিনি শয্যাধরা পীড়িত। যদি আমার ভালমন্দ হয়, তাহা হইলে মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া একখানি টিকিট কিনিয়া, স্ত্রীলোকের গাড়ীতে কুসীকে বসাইয়া দিবেন। কুসী দেশে চলিয়া যাইবে। কোথাকার টিকিট কিনিতে হইবে, কুসী তখন আপনাকে বলিয়া দিবে। কিন্তু বিপদ ঘটিবার কোনরূপ সম্ভাবনা আছে কি?'

আমি উত্তর করিলাম,—'না, সে ভয় নাই, এরূপ আঘাতে কোন ভয়ের কারণ নাই।' তাহার পর আমি বালিকাকে ডাকিয়া বলিলাম,—'তোমার স্বামী পীড়িত, এ অবস্থায় তোমার একলা থাকা উচিত নয়; তোমার কাছে থাকে, এমন লোক এখানে কি কেহই নাই?'

বালিকা উত্তর করিল,—'মালীর স্ত্রী আমাদের কাজকর্ম করে; কিন্তু সে রাত্রিতে থাকে না। তাহার ছোট ছোট ছেলে-পিলে আছে; সন্ধ্যা হইলেই সে চলিয়া যায়।

আমি বলিলাম,—'আমার একজন বৃদ্ধ চাকর আছে। আমার নিকট সে অনেক দিন আছে; যদি বল ত' তাহাকে আমি পাঠাইয়া দিই; কিন্তু পথ চিনিয়া সে আসিবে কি করিয়া, আমি তাই ভাবিতেছি।'

বাবু বলিল,—'রাত্রিতে এ স্থানে কেহ থাকে, তাহা কি নিতান্ত প্রয়োজন?'

আমি উত্তর করিলাম,—'নিতান্ত প্রয়োজন নয়, তবে এই অল্পবয়স্কা বালিকা একেলা থাকিবে, তাই বলিতেছি।'

বাবু বলিল,—'তবে কাজ নাই, কাহাকেও পাঠাইতে হইবে না।'

অষ্টম পরিচ্ছেদ – আমি ঘোর অপরাধী

আমি পুনরায় বলিলাম,—'আর একটি কথা আছে; রাত্রিতে যাহাতে ভালরূপ তোমার নিদ্রা হয়, আমি সেই প্রকার কোনরূপ ঔষধ তোমাকে দিব। কারণ জ্বর যাহাতে না হয়, সে বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে। আমার ব্যাগে সেরূপ ঔষধ নাই। কোন ডাক্তারখানায় গিয়া সে ঔষধ আনিতে হইবে। কে সে ঔষধ আনিবে? আমি নিজে না হয় ডাক্তারখানা হইতে ঔষধ লইলাম; কিন্তু কাহার দ্বারা পাঠাইয়া দিব? আমার চাকরকে দিয়া পাঠাইতে পারিতাম; কিন্তু সে পথ চিনিয়া আসিতে পারিবে না। আমরাও এখানে কেবল দুইদিন আসিয়াছি। আমার চাকর একে বৃদ্ধ, তাহাতে পথঘাট জানে না। এ রাত্রিকালে কিছুতেই সে এতদূর আসিতে পারিবে না।'

এই কথা শুনিয়া কুসী বলিল,—'আপনার সঙ্গে আমি না হয় যাই।'

বাবু বলিল,—'তা কি কখন হয়? এত রাত্রিতে পুনরায় তোমাকে আমি ততদূর পাঠাইতে পারি না। প্রাণের আশঙ্কা হইয়াছিল, তাই একবার পাঠাইয়া ছিলাম! কাশী স্থান! এ রাত্রিতে আবার তোমাকে পাঠাইতে পারি না।'

কুসী আমার পানে চাহিল। তাহার সেই অদ্ভুত নয়নযুগল ছলছল করিয়া আসিল। যেন যত দোষ আমার, এইভাবে কুসী আমাকে বলিল,—'ঔষধ না খাইলে বাবুর যদি নিদ্রা না হয়। যদি জ্বর আসে, তাহা হইলে কি হইবে?'

কথাগুলিতে যেন আমার প্রতি ভর্ৎসনার ভাব মিশ্রিত ছিল। কিন্তু কুসী যাহা বলে, তাহাই মিষ্ট। কুসীর উপর রাগ করিবার যো নাই। ক্ষুধায় আমি প্রপীড়িত হইয়াছিলাম, রাত্রি অধিক হইয়াছিল। এক ক্রোশের অধিক পথ চলিয়া আমি শ্রান্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু কুসীর কাঁদ কাঁদ মুখ ও ছল্‌ছল্‌ চক্ষু দেখিয়া সে সব আমি ভুলিয়া যাইলাম। আমি বলিলাম,—'আচ্ছা, তবে আমিই না হয় আর একবার আসিব। ডাক্তারখানা হইতে ঔষধ লইয়া, আমি নিজেই পুনরায় আসিব।'

বাবু বলিল,—'তা কি কখন হয়! অনুগ্রহ করিয়া আপনি যে একবার আসিলেন, তাহাই যথেষ্ট। পুনরায় আপনাকে আমি কষ্ট দিতে পারি না।'

কুসী বলিল,—'ঔষধ না আনিলে চলিবে কেন? যদি তোমার জ্বর হয়, তখন কি হইবে?'

কুসীর সকলতাতেই আব্দার। তাহার বাবুর অসুখ!—পৃথিবীশুদ্ধ লোকের বাবুর জন্য পরিশ্রম করা উচিত, কুসীর ইচ্ছা এইরূপ। যাহা হউক, ঔষধ লইয়া আমাকে পুনরায় আসিতে হইবে তাহাই স্থির হইল।

আসিবার সময় বাবু আমার হাতে একখানি কুড়ি টাকার নোট গুঁজিয়া দিল। বাবু বলিল—'এই রাত্রিতে আপনাকে বড় কষ্ট দিয়াছি। যাহা দিলাম তাহা আপনার উপযুক্ত নহে। কিন্তু অধিক টাকা আমার সঙ্গে নাই, অনুগ্রহ করিয়া ইহাকে গ্রহণ করুন।'

আমি টাকা লইলাম না। আমি বলিলাম,—'ব্রহ্মদেশে আমি কর্ম করি। সেই স্থানের আমি সরকারী ডাক্তার। সেস্থানে লোকের বাটী গিয়া ভিজিট গ্রহণ করি সত্য; কিন্তু এ স্থানে আমি টাকা লইব না। ছুটি লইয়া আমি দেশে আসিয়াছিলাম। কার্য্যোপলক্ষ্যে অল্পদিনের নিমিত্ত কাশী আসিয়াছি। এ স্থানে ডাক্তারী করিতে আমি আসি নাই। এ বালিকার অনুরোধে তোমাকে আমি দেখিতে আসিলাম। আমাকে টাকা দিতে হইবে না। তবে দুইদিন পরে আমি দেশে প্রতিগমন করিব। রামকমল ডাক্তারকে তোমার কথা বলিয়া যাইব। তাঁহাকে বোধ হয়, টাকা দিতে হইবে।'

এই কথা বলিয়া আমি সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম। টাকা লইলাম না বটে; কিন্তু বাবু যে ধনবান্‌ লোকের পুত্র, তাহা বুঝিতে পারিলাম। সামান্য লোকে একেবারে কুড়ি টাকা বাহির করিয়া দিতে পারে না। যতক্ষণ কুসীর নিকট ছিলাম, ততক্ষণ আমার মন ঠিক

যেন কাদার ন্যায় কোমল ছিল। সেই মন লইয়া কুসী যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেছিল। কুসী যাহা আজ্ঞা, করিতেছিল, তাহাই আমি স্বীকার করিতেছিলাম। কিন্তু যাই বাহিরে আসিলাম, আর আমার অন্তঃকরণ কঠিন ভাব ধারণ করিল। ক্ষুধায় পেট জ্বলিয়া উলি। শ্রন্তিজনিত দুর্বলতা অনুভব করিতে লাগিলাম। মনে মনে করিলাম,—'কি পাগল আমি যে, এই রাত্রিতে পুনরায় এতদূর আসিতে অঙ্গীকার করিয়া বসিলাম।'

যাহা হউক, যখন অঙ্গীকার করিয়াছি, তখন তাহা করিতেই হইবে। পথে ডাক্তারখানা হইতে যথা প্রয়োজন ঔষধ লইলাম। তাহার পর আমার বাসায় আসিয়া আহার করিলাম। আহার করিয়া পুনরায় সেই একক্রোশ পথ গিয়া ঔষধ দিয়া আসিলাম। সে রাত্রিতে আর ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলাম না। দ্বারে কুসীকে ডাকিয়া তাহার হস্তে ঔষধ দিয়া চলিয়া আসিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে পুনরায় সেই বাগানে যাইলাম। রাত্রিতে বাবু নিদ্রা গিয়াছিল। তাহার জ্বর হয় নাই। যুবকাল। বাবু যে সত্বর আরোগ্যলাভ করিতে পারিবে সম্পূর্ণ সেই সম্ভাবনা হইল।

আমি আর দুইদিন কাশীতে রহিলাম। বাবু উঠিয়া বসিতে সমর্থ হইল। যাহা হউক, তবুও আমি রামকমল ডাক্তার মহাশয়কে বাবুর জন্য অনেক করিয়া বলিয়া আসিলাম।

বিদায় হইবার সময় বাবু আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। কুসী আমার জন্য কাঁদিতে লাগিল। আমি বলিলাম,—'কুসী! তোমাকে প্রথম দেখিয়াই আমার মনে এক অপূর্ব স্নেহের উদয় হইয়াছিল। সেই অবধি তোমাকে আমি ঠিক আমার কন্যার মত স্নেহ করি। লোকের সহিত কত কি পাতায়, আমি তোমাকে মেয়ে বলিয়া জানিব, তুমি আমাকে পিতা বলিয়া জানিও। কিন্তু দুঃখেব বিষয় এই যে, জীবনে আর বোধ হয় তোমাদের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে না।'

কুসী উত্তর করিল,—'আপনি মহাত্মা লোক। আমি আমার নিজের পিতাকে জানি না, তাঁহাকে কখনও দেখি নাই। আমার বড় ভাগ্য যে, আজ আমি পিতা পাইলাম।

এই কথা বলিয়া কুসী চক্ষু মুছিতে লাগিল। তাহার পর নিতান্ত উৎসুক নেত্রে সে বাবুর পানে চাহিল। আমাকে তাহাদের নাম-ধাম প্রকাশ করিয়া বলে, কুসীর সেইরূপ ইচ্ছা। কিন্তু বাবু তাহাকে নিষেধ করিল। বাবু বলিল,—'কুসী! তাড়াতাড়ি করিও না। একটু অপেক্ষা কর। এখন পরিচয় দিয়া লাভ কি?' তাহার পর আমার দিকে দৃষ্টি করিয়া বাবু পুনরায় বলিল,—'ভগবান যদি দিন দেন, তাহা হইলে আপনাকে শীঘ্রই পত্র লিখিব। মহাশয়ের নাম ও ঠিকানা আমি আমার পুস্তকে লিখিয়া লইতেছি।'

আমি বলিলাম,—'আমার নাম যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী। লোকে আমাকে যাদব ডাক্তার বলিয়া জানে।' ব্রহ্মদেশে যে স্থানে আমি কর্ম করিতাম, সেই ঠিকানা আমি বাবুকে বলিলাম। বাবু আপনার পুস্তকে তাহা লিখিয়া লইল।

এইরূপে কুসী ও বাবুর নিকট বিদায় লইয়া আমি চলিয়া আসিলাম। বাঙ্গালা ১৩০২

সালের পূজার সময় কাশীতে কুসী ও বাবুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়।

দ্বিতীয় ভাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ – রসময় রায়

সেইদিন আমি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলাম। তাহার পর ছুটি ফুরাইলে আমি পুনরায় ব্রহ্মদেশে যাইলাম। প্রথম প্রথম কুসী ও বাবুকে সর্বদাই মনে হইত। বাবু আমাকে চিঠি লিখিবে বলিয়াছিল। কিন্তু তাহার নিকট হইতে চিঠিপত্র কিছুই পাইলাম না। তাহার নাম-ধাম ঠিকানা আমাকে বলে নাই। আমি যে কোন অনুসন্ধান করিব, সে উপায়ও ছিল না; সুতরাং যত দিন গত হইতে লাগিল, ততই তাহারা আমার স্মৃতিপথ হইতে অন্তর্হিত হইতে লাগিল। অবশেষে আমি তাহাদিগকে একেবারেই ভুলিয়া যাইলাম। কুসী ও বাবু বলিয়া পৃথিবীতে যে কেউ আছে, তাহা আর আমার মনে বড় হইত না।

দুই বৎসর কাটিয়া গেল। ১৩০৩ সালে আমি সরকারী কর্ম পরিত্যাগ করিলাম। পেনসন লইয়া কিছুদিন দেশে আসিয়া স্বগ্রামে বাস করিলাম। কিন্তু চিরকাল বিদেশে থাকা আমার ভাল লাগিল না। তাহার পর ম্যালেরিয়া জ্বরের উপদ্রবেও বিলক্ষণ উৎপীড়িত হইলাম। সেজন্য ১৩০৪ সালের শীতকাল আমি বায়ু পরিবর্তন ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের নানা স্থান দর্শন করিবার নিমিত্ত ঘর হইতে বাহির হইলাম। এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, আগ্রা, দিল্লী, অমৃতসর প্রভৃতি নানা স্থান হইয়া অবশেষে লাহোরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। লাহোরে আসিয়া খাইবার প্রভৃতি সীমান্তের গিরিসঙ্কট দেখিতে আমার বড়ই সাধ হইল। কিন্তু দুরন্ত পাঠানদিগের গল্প শুনিয়া সে বাসনা আমাকে পরিত্যাগ করিতে হইল। গ্রীষ্মকাল পড়িলেই কাশ্মীর যাইব। এইরূপ মানস করিলাম।

চৈত্র মাসের প্রথমে একদিন আমি লাহোরের পথে বেড়াইতেছি, এমন সময় রসময়বাবুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। অনেক দিন ব্রহ্মদেশে আমরা একসঙ্গে একস্থানে ছিলাম। তাঁহার সহিত আমার বিশেষ বন্ধুতা ছিল না, কারণ, তাঁহার প্রকৃতি একরূপ, আমার প্রকৃতি অন্যরূপ। তবে বিদেশে একসঙ্গে অল্পসংখ্যক বাঙ্গালী থাকিলে পরস্পর অনেকটা ঘনিষ্ঠতা হয়। ব্রহ্মদেশে থাকিতে রসময়বাবুর সহিত আমার সেইরূপ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। অবশ্য একথা বলা বাহুল্য যে, তাঁহার নাম প্রকৃত রসময় নহে। এই গল্পে যে, সমুদায় নামের উল্লেখ হইতেছে তাহা প্রকৃত নহে। কারণ, অন্ততঃ দুইটি সংসারের কথা ইহাতে রহিয়াছে। প্রকৃত নাম দিয়া লোকের সংসারের কথা সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করা উচিত নহে।

দূর হইতে রসময়বাবু আমাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া আমার হাত ধরিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'রসময়বাবু। আপনি এখানে কি করিয়া আসিলেন?'

রসময়বাবু উত্তর করিলেন,—'কেন? আপনি শুনেন নাই? আমি পাঞ্জাবে বদলি হইয়াছি। প্রথম একটি বড় ছাউনিতে আমাদের অফিস ছিল। এক্ষণে সীমান্তে সামান্য একটি

স্থানে আছি। কিন্তু যাদববাবু! আপনি এ স্থানে কি করিয়া আসিলেন?'

আমি বলিলাম,—'পেনসন লইয়া আপনাদের নিকট হইতে চলিয়া আসিলাম। তাহার পর দিনকতক দেশে রহিলাম। ম্যালেরিয়া জ্বরে বড়ই ভুগিতেছিলাম, সেইজন্য পশ্চিম বেড়াইতে আসিয়াছি।

রসময়বাবু পুনরায় বলিলেন,—'আর শুনিয়াছেন? না,—বলিলে আপনি উপহাস করিবেন, আপনাকে সে কথা বলিব না।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'কি কথা? উপহাস করিবার কি কথা আছে?'

রসময়বাবু উত্তর করিলে,—'আমি পুনরায় বিবাহ করিয়াছি। এই বয়সে পুনরায় বিবাহ করিয়াছি।

আমি বলিলাম,—'তবে বর্মাণীকে ভুলিয়া গিয়াছেন? তাহার শোকে সেদিন যে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছিলেন?'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ – এত বড় কন্যা

ব্রহ্মদেশে থাকিতে রসময়বাবুর স্ত্রী-পুত্র-পরিবার ছিল না। বহুদিন পূর্বে তাঁহার স্ত্রী বিয়োগ হইয়াছিল। ব্রহ্মদেশে একজন স্ত্রীলোক লইয়া সে স্থানে তিনি ঘরসংসার করিয়াছিলেন। রসময়বাবুর আর একটি দোষ ছিল। অতিরিক্ত পান দোষটাও তাঁহার ছিল। সেইজন্য পূর্বেই বলিয়াছি যে আমার সহিত তাঁহার বিশেষ মিত্রতা ছিল না। তাঁহার স্বভাব একরূপ, আমার স্বভাব অন্যরূপ! ব্রহ্মদেশে থাকিতে পুনরায় বিবাহ করিবার নিমিত্ত দুই-একবার তাঁহাকে আমরা অনুরোধ করিয়াছিলাম; কিন্তু বর্মাণী তাঁহার সংসারে সদাচারে থাকিয়া একপ্রকার স্ত্রীর ন্যায় ঘরকন্না করিতেছিল। পাছে তাহার প্রতি নিষ্ঠুরতা হয়, সেজন্য রসময়বাবুকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি নাই। আর জোর করিয়া বলিলেই বা তিনি আমাদের কথা শুনিবেন কেন? আমি পেনসন লইয়া ব্রহ্মদেশ হইতে চলিয়া আসিবার অল্পদিন পূর্বে বর্মাণীর মৃত্যু হয়। সেই শোকে রসময়বাবু ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছিলেন।

রসময়বাবু বলিলেন,—'সত্য বটে, বর্মাণীর শোকে আমি ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছিলাম। পুনরায় বিবাহ করিবার কারণও তাই। মন আমার যেন সর্বদাই উদাস থাকিত। সংসারে আমার কেহ নাই, সর্বদাই যেন সেইরূপ বোধ হইত। পরিবার বিয়োগ হইলে লোকে যে বলে, 'গৃহ-শূণ্য' হইয়াছে, সে সত্য কথা। গৃহ-শূণ্য হওয়ার ভোগও আমি একবার ভুগিয়াছি। আমার শরীরটা কিছু মায়াবী। সহজেই আমি কাতর হইয়া পড়ি। আমার প্রথম পত্নীর যখন বিয়োগ হয়, তখনও আমি পাগলের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছিলাম।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'কবে সে ঘটনা ঘটিয়াছিল?'

রসময়বাবু উত্তর করিলেন,—'সে অনেক দিনের কথা। তখন আপনার সহিত আমার আলাপ হয় নাই। সেই পরিবারের শোকে আমি দেশত্যাগী হই। নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া

অবশেষে ব্রহ্মদেশে গিয়া উপস্থিত হই। কমিসেরি বিভাগে ভাল কর্ম মিলিল, সেজন্য সেই স্থানেই রহিয়া যাইলাম। আপনি এখন এ স্থানে কিছুদিন থাকিবেন?'

আমি উত্তর করিলাম,—'না শীঘ্রই কাশ্মীরে যাইব বলিয়া মানস করিতেছি। সীমান্তের কথা খবরের কাগজে অনেক পড়িয়াছি। সেই সীমান্ত কিরূপ, তাহা দেখিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সে দিকে কাহাকেও আমি জানি না। পাঠানদের উপদ্রবের কথা শুনিয়া অপরিচিত স্থানে একেলা যাইতেও সাহস করি না। সেজন্য কাশ্মীর যাইব মনে করিতেছি।'

রসময়বাবু বলিলেন,—'তার ভাবনা কি? আমি উজিরগড়ে থাকি। সে স্থান একেবারে সীমান্তে। আমাদের পল্টন এখন সেই স্থানে রহিয়াছে। উজিরগড় ছোট একটি ছাউনি চৌকি বলিলেও চলে। সে স্থানে বাঙ্গালী অধিক নাই, আমরা কেবল আটজন সেখানে আছি। আপনাকে অতি আদরে রাখিব। দেখিবার যাহা কিছু আছে তাহা দেখাইব। আমি বিবাহ করিতে কলিকাতা গিয়াছিলাম। নববিবাহিতা স্ত্রী লইয়া উজিরগড়ে প্রত্যাগমন করিতেছি। আপনি আমার বাসায় থাকিবেন। কি বলেন? উজিরগড়ে যাইবেন তো?'

আমি উত্তর করিলাম,—'আচ্ছা, যাইব। কিন্তু কাশ্মীর দেখিতে আমার মন হইয়াছে। কাশ্মীর হইতে প্রত্যাগমন করিয়া আপনার নিকটে যাইব।'

রসময়বাবু বলিলেন,—'১৫ই বৈশাখের পূর্বে যদি আমার নিকট গমন করেন তাহা হইলে আমার বড় উপকার হয়। সেইদিন আমার কন্যার বিবাহ হইবে। আপনারা পাঁচজনে দাঁড়াইয়া থাকিলে সেই কাজ সুচারুরূপে নির্বাহিত হইবে।'

আমি আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—'আপনার কন্যা? আপনার আবার কন্যা কোথা হইতে আসিল'? সগর্ভা সপুত্রা সকন্যা স্ত্রী বিবাহ করিয়া আনিলেন না কি?'

রসময়বাবু একটু হাসিয়া উত্তর করিলেন,—'তা নয়। এ আমার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর কন্যা।'

আমি বলিলাম,—'আপনার প্রথম পক্ষের স্ত্রী তো বহুকাল গত হইয়াছে। বর্মায় তের-চৌদ্দ বৎসর আমরা একত্রে ছিলাম। আপনি এই বলিবেন, তাহার পূর্বে আপনার স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছিল। এত বড় অবিবাহিতা কন্যা আছে? ব্রহ্মদেশে থাকিতে আপনার এ কন্যার কথা কখনও শুনি নাই।'

রসময়বাবু উত্তর করিলেন,—'সে সকল কথা আমি আপনাকে পরে বলিব। কন্যা বড় হইয়াছে সত্য। এদেশে একটি ভাল পাত্র স্থির করিয়াছি। বিবাহ করিতে তিনি দেশে যাইতে পারিবেন না। তাই আমি কন্যা আনিতে গিয়াছিলাম। দেশে সেইজন্যই আমি গিয়াছিলাম। নিজে বিবাহ করিব বলিয়া যাই নাই। কিন্তু দেশে উপস্থিত হইয়া একটি বড় পাত্রী মিলিয়া গেল। আমার মন উদাসী ছিল। আমি নিজেও বিবাহ করিলাম। বিদেশে বিবাহ দিবার নিমিত্ত কেবল কন্যাকে ঘাড়ে করিয়া আনা ভাল দেখায় না, সেই কারণে নববিবাহিতা স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া আনিলাম। তবে কেমন? বৈশাখ মাসের প্রথমে আপনি উজিরগড়ে যাইবেন তো?'

আমি বলিলাম,—'যাইতে খুব চেষ্টা করিব।'

তৃতীয় পরিচ্ছেদ – রসময়ের অনুতাপ

এইরূপ কথাবার্তার পর রসময়বাবু প্রস্থান করিলেন। চৈত্র মাসের প্রথমে লাহোরে রসময়বাবুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। দুই-চারি দিন পরে আমি কাশ্মীর গমন করিলাম। কাশ্মীরে পর্বত, হ্রদ, বন, উপবনের সৌন্দর্য দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হইলাম। বৈশাখ মাসের প্রথমে কাশ্মীর হইতে প্রত্যাগমন করিলাম, ৫ই বৈশাখ উজিরগড়ে গিয়া উপস্থিত হইলাম। অতি সমাদরে রসময়বাবু আমাকে তাঁহার বাসায় স্থান দিলেন। ১৫ই বৈশাখ রসময়বাবুর কন্যার বিবাহ হইবে। আমি যখন উজিরগড়ে গিয়া উপস্থিত হইলাম, তখন বিবাহের আয়োজন হইতেছিল।

সেইদিন সন্ধ্যাবেলা রসময়বাবু আমাকে বলিলেন,—'আপনি এ স্থানে আসায় আমার আর একটি উপকার হইয়াছে। দুই-চারি দিন বিশ্রাম করিয়া আপনার পথশ্রান্তি দূর হইলে, আমার কন্যাকে একবার দেখিতে হইবে। কন্যার ভাবগতিক আমি কিছুই বুঝিতে পারি না। তাহার শরীরে কোনরূপ পীড়া আছে বলিয়া বোধ হয়। মুখ মলিন, শরীর রুগ্ন ও কৃশ। তাহার পর কোনরূপ বায়ুর ছিট আছে কি না, তাহাও জানি না; মুখে তাহার কথা নাই, সর্বদাই ঘাড় হেঁট করিয়া থাকে, সর্বদাই যেন ঘোর চিন্তায় মগ্ন। ইহার পূর্বে আমি আমার কন্যাকে কখন দেখি নাই।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'আপনার কন্যা এতদিন কোথায় ছিল?'

রসময়বাবু উত্তর করিলেন,—'আপনারা সকলেই জানেন যে, আমি নিতান্ত সাধু ছিলাম না। এই কন্যার প্রতি আমি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছি সেজন্য এখন আমার বড়ই অনুতাপ হয়। নিজের দোষ স্বীকার করাই ভাল, একঝুড়ি মিথ্যা কথা বলিয়া তাহা আর গোপন করা উচিত নয়।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'কন্যার প্রতি আপনি কি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিলেন?'

রসময়বাবু উত্তর করিলেন,—'এই কন্যা যখন ছয় দিনের, তখন আমার স্ত্রী সূতিকাগারে পরলোকপ্রাপ্ত হয়। শোকে আমি অধীর হইয়া পড়িলাম। আমার এক আত্মীয় ও তাঁহার স্ত্রী নিঃসন্তান ছিলেন। নব-প্রসূতা শিশুকে তাঁহাদের হস্তে সমর্পণ করিয়া আমি দেশ হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া অবশেষে ব্রহ্মদেশে গিয়া উপস্থিত হইলাম। কন্যার প্রতিপালনের নিমিত্ত প্রথম প্রথম তাঁহাদিগের নিকট কিছু খরচ পাঠাইতাম। তাহার পর বন্ধ করিয়া দিলাম।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'আপনার সে আত্মীয় কি সঙ্গতিপন্ন লোক?'

রসময়বাবু উত্তর করিলেন,—কিছুমাত্র নয়। সামান্য একটু চাকরী করিয়া তিনি দিনযাপন করিতেন। যখন কন্যা বিবাহযোগ্যা হইল, তখন তিনি আমাকে বার বার পত্র লিখিলেন। আমি পত্রের উত্তর দিলাম না। বিবাহের নিমিত্ত একটি টাকাও প্রেরণ করিলাম

না। তিনি গরীব, টাকা কোথায় পাইবেন যে, আমার কন্যার বিবাহ দিবেন। শেষকালটায় তিনি রোগগ্রস্ত হইয়া অনেকদিন শয্যাশায়ী হইয়াছিলেন। এইসব কারণে আমার কন্যা বড় হইয়া পড়িয়াছে; আজ পর্যন্ত তাহার বিবাহ হয় নাই। তাহার পর আমার সেই আত্মীয়ের পরলোক হয়। তাঁহার স্ত্রী আমার কন্যাটিকে লইয়া একেবারে নিঃসহায় হইয়া পড়েন। তিনি পুনরায় আমাকে পত্র লিখিলেন সেই সময় বর্মাণীর মৃত্যু হইয়াছিল। আমার চক্ষু উন্মুক্ত হইয়াছিল। আমি খরচপত্র পাঠাইয়া দিলাম ও একটি সুপাত্র অনুসন্ধান করিতে আমার সেই আত্মীয়কে লিখিলাম। কিন্তু ভালরূপ পাত্রের সন্ধান হইল না। এই সময়ে আমি পাঞ্জাবে বদলি হলাম। মনে করিয়াছিলাম যে, এ স্থানে আসিবার সময় কলিকাতায় দিনকত থাকিব। সেই স্থানে থাকিয়া, ভাল একটি পাত্রের অনুসন্ধান করিয়া, কন্যার বিবাহ দিয়া তবে পাঞ্জাবে আসিব। কিন্তু কলিকাতায় কিছুদিন অবস্থিতি করিবার নিমিত্ত ছুটি পাইলাম না। বরাবর আমাকে পঞ্জাবে আসিতে হইল। প্রথম একটি বড় ছাউনিতে আমাদের আফিস হইয়াছিল। সেই স্থানে দিগম্বরবাবুর সহিত আমার আলাপ হয়।'

চতুর্থ পরিচ্ছেদ – কন্যা আমার সুখে থাকিবে

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'দিগম্বরবাবু কে?'

রসময়বাবু উত্তর করিলেন,—'দিগম্বরবাবু কে? কেন, ফোক্‌লা দিগম্বর।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'ফোক্‌লা দিগম্বর কে?'

রসময়বাবু কিছু বিস্মিত হইয়া উত্তর করিলেন,—'ফোক্‌লা দিগম্বর কে? ফোক্‌লা দিগম্বরের নাম শুনেন নাই? তাহার যে অনেক টাকা। এ অঞ্চলে সকলেই যে তাহাকে জানে।'

আমি বলিলাম,—'না, আমি কখনও ফোক্‌লা দিগম্বরের নাম শুনি নাই। তিনি কে?'

রসময়বাবু উত্তর করিলেন,—'দিগম্বরবাবু আমার হবু জামাতা। তিনিও কমিসেরি বিভাগে কর্ম করেন। কিছুদিন পূর্বে এলাহাবাদ কি আগ্রা হইতে পঞ্জাবে আসিয়াছেন। বিলক্ষণ সঙ্গতি করিয়াছেন। আমি যখন পাঞ্জাবে আগমন করি, সেই সময় তাঁহার পত্নীবিয়োগ হইয়াছিল।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'দিগম্বরবাবু সুপাত্র?'

রসময়বাবু উত্তর করিলেন,—'দেখিতে তিনি সুপুরুষ নহেন, বয়সও হইয়াছে, তবে সঙ্গতিপন্ন লোক। কন্যা আমার সুখে থাকিবে।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'আর-পক্ষের তাঁহার পুত্রাদি আছে?'

রসময়বাবু বলিলেন,—'আছে। পুত্র-কন্যা কেন, শুনিয়াছি, পৌত্র-দৌহিত্রও আছে। পাছে এ বিবাহে তাহারা আপত্তি করে, সেইজন্য দিগম্বরবাবু দেশে গিয়া বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। সেইজন্য আমাকেও এই স্থানে কন্যার বিবাহ দিতে হইল।'

আমি বলিলাম,—'এরূপ পাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দেওয়া কি উচিত হয়?'

রসময়বাবু বলিলেন,—'কি করি! সেদিন হিসাব করিয়া দেখিলাম যে আমার কন্যার বয়ঃক্রম ষোল বৎসর হইয়া থাকিবে। দেশে আমার এমন কোন অভিভাবক নাই যে, তাঁহাকে ভাল পাত্রের অনুসন্ধান করিতে বলি। চাকরী ছাড়িয়া আমি নিজেও যাইতে পারি না। তাহা ভিন্ন ভাল পাত্রের সহিত বিবাহ দিতে অনেক টাকার প্রয়োজন। সে টাকা আমার নাই। দিগম্বরবাবু বৃদ্ধই হউন আর যাহাই হউন, কন্যার বিবাহ না দিয়া আর আমি রাখিতে পারি না।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'দিগম্বরবাবুর বয়স কত হইবে?'

রসময়বাবু উত্তর করিলেন,—'তা ঠিক বলিতে পারি না। ষাট হইয়াছে কি হয় নাই।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—তাঁহার দাঁত নাই সেইজন্য লোকে তাঁহাকে ফোক্‌লা দিগম্বর বলে?'

রসময়বাবু উত্তর করিলেন,—'কেবল তা নয়। তাঁহার দন্তহীন মাড়ি কৃষ্ণবর্ণ ও কিছু উচ্চ। অল্পবয়স্ক যুবকের মত দেখাইবে বলিয়া সর্বদা তিনি হাস্য-পরিহাস করিয়া থাকেন। সেইসময় মাড়ি দুইটি বাহির হইয়া পড়ে। সেইজন্য লোক তাঁহাকে ফোক্‌লা দিগম্বর বলে। কিন্তু তাঁহার অনেক টাকা আছে। কন্যা আমার সুখে থাকিবে।' আমি আর কি বলিব! আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ – আমার স্মরণ হইল

দিগম্বরবাবু বৃদ্ধই হউন আর যুবাই হউন, তাঁহার প্রাণে যে সখ আছে, পরদিন তাহা আমি জানিতে পারিলাম। কারণ, প্রাণে সখ না থাকিলে, কেহ আর হবু স্ত্রীর ফটোগ্রাফ দর্শন করিতে ইচ্ছা করে না। এ পর্যন্ত তিনি রসময়বাবুর কন্যাকে দেখেন নাই। কন্যা না দেখিয়াই সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল। মনে করিলেই এ স্থানে আসিয়া অনায়াসে কন্যা দেখিয়া যাইতে পারিতেন; কিন্তু তাহা তিনি করেন নাই।

রসময়বাবু কন্যা আনিতে যখন দেশে গিয়াছিলেন, তখন কন্যার ফটোগ্রাফ লইবার নিমিত্ত তিনি অনুরোধ করিয়াছিলেন। কলিকাতায় সেই ফটোগ্রাফ গৃহীত হইয়াছিল। আজ ডাকে সেই ফটোগ্রাফ আসিয়া উপস্থিত হইল পুলিন্দাটি খুলিয়া সেই ছবি সকলে দেখিতে লাগিলেন। তাহাতে রসময়বাবুর নিজের তাঁহার নববিবাহিতা পত্নীর ও কন্যার ছবি এ স্থানে রসময়বাবুর সংসারে অভিভাবকস্বরূপ একজন বয়স্কা বিধবা স্ত্রীলোক ছিলেন। তিনি কে, তখন তাহা আমি জানিতে পারি নাই। তাঁহার ফটোগ্রাফ ছিল না। এক-একজনের ছয় ছয়খানি করিয়া ছবি ছিল। একখানি ছবি আমার হাতে দিয়া রসময়বাবু বলিলেন,—'ইহা আমার কন্যার ছবি। কেমন, আমার কন্যা সুন্দরী নয়?'

ছবিখানি হাতে লইয়া আমি চমকিত হইলাম। যাহার ছবি, তাহাকে যেন কোথায় দেখিয়াছি, এইরূপ আমার মনে হইল। কিন্তু কবে কোথায় দেখিয়াছি, তাহা আমি স্মরণ করিতে পারিলাম না। চিন্তা করিয়া স্মরণ করিতে চেষ্টা করিতেছি, এমন সময় রসময়বাবু

পুনরায় বলিলেন,—চুপ করিয়া রহিলেন যে? কন্যা আমার সুন্দরী নহে?'

আমি বলিলাম,—'সুন্দরী! চমৎকার রূপবতী কন্যা। ছবিখানি তুলিয়াছেও ভাল। কিন্তু বাম গালের এই স্থানে একটু যেন মুছিয়া গিয়াছে। আর একখানি দেখি?'

রসময়বাবু কন্যার আর পাঁচখানি ছবি আমার হাতে দিলেন একে একে সকল গুলিরই বাম গালের এক স্থানে সেই মোছা দাগটি দেখিতে পাইলাম। তখন রসময়বাবু হাসিয়া বলিলেন,—'বাম গালে এ স্থানটা মুছিয়া যায় নাই আমার কন্যার এই স্থানে ক্ষুদ্র একটি আঁচিল আছে, ইহা তার দাগ।'

যাহার এ ফটোগ্রাফ, তাহাকে কোথায় যে দেখিয়াছি তবুও আমার মনে হইল না। সকলের দেখা হইলে রসময়বাবু দুইখানি ছবি সেই দিনের ডাকেই দিগম্বরবাবুর নিকট প্রেরণ করিলেন। তাহার পরদিন রসময়বাবু পরিবারবর্গ নদীতে স্নান করিতে গিয়াছিলেন। বেলা প্রায় এগারটা বাজিয়া গিয়াছিল। রসময়বাবু আফিসে গিয়াছিলেন। বাহিরের ঘরে আমি একাকী বসিয়া আছি, এমন সময় রসময়বাবুর পরিবারবর্গ যে এক্কাতে স্নান করিতে গিয়াছিলেন, সেই এক্কা ফিরিয়া আসিল। রসময়বাবুর বাসার সম্মুখে সামান্য একটু বাগানের মত ছিল। বাগানের পর বাড়ী। প্রথম বৈঠকখানা, তাহার পশ্চাতে অন্দরমহলে যাইবার নিমিত্ত বাগানের ভিতর বৈঠকখানার পার্শ্বে একটি খিড়কি দ্বার ছিল। এক্কা সেই খিড়কির দ্বারে গিয়া লাগিল। এক্কা হইতে নামিয়া স্ত্রীলোকেরা একে একে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। স্ত্রীলোকেরা সকলেই এতক্ষণে বাটীর ভিতর গিয়া থাকিবে, এই মনে করিয়া, আমি বৈঠকখানার বারান্দায় দাঁড়াইলাম। এক্কা চলিয়া যায় নাই। বৈঠকখানার বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেই এক্কা, তাহার গেড়াও ভীমসদৃশ দেহবিশিষ্ট সেই এক্কাওয়ালাকে দেখিতে লাগিলাম। এমন সময় সেই খিড়কি দ্বারের নিকট বাটীর ভিতর হইতে কে বলিল,—ও কুসুম! এক্কার উপর ভিজা গামছাখানা পড়িয়া আছে। নিয়ে এস তো মা!'

রসময়বাবুর পরিবারের মধ্যে যে অভিভাবক স্বরূপ একজন বয়স্কা বিধবা স্ত্রীলোক আছেন, এ কণ্ঠস্বর তাঁহার। তিনি রসময়বাবুর ভগিনী কি কে, এখন পর্যন্ত তাহা আমি জানিতে পারি নাই।

তাঁহার সেই কথা শুনিয়া একটি যুবতী স্ত্রীলোক বাটীর ভিতর হইতে ধীরে ধীরে ঘাড় হেঁট করিয়া বাহির হইল। এক্কার পর্দা তুলিয়া তাহার ভিতর হইতে গামছাখানি লইয়া পুনরায় সেইরূপ ঘাড় হেঁট করিয়া বাটীর ভিতর সে চলিয়া গেল। গামছা লইয়া যাইতে এক মিনিট কালও অতিবাহিত হয় নাই। কিন্তু তাহার ঘোমটা ছিল না, মাথায় কাপড় পর্যন্ত ছিল না। মাথা হেঁট করিয়া ছিল বটে, তথাপি আমি তাহার মুখ দেখিতে পাইলাম। তাহার মুখ দেখিয়া আমার ঝাঁৎ করিয়া পূর্বকথা সমুদয় স্মরণ হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ – কাশীর কুসী বটে

এইমাত্র আমি যাহাকে দেখিলাম, সে কুসী ভিন্ন আর কেহ নয়। সেদিন যাহার ছবি দেখিয়াছিলাম, সে-ও কুসী ব্যতীত আর কেহ নয়। সেই মুখ, সেই বাম গালে আঁচিল।

কুসী বটে, কিন্তু সে কুসী আর নাই! কেবল তিন বৎসর পূর্বে তাহাকে আমি দেখিয়াছিলাম। ইহার মধ্যেই সে বিশ্রী হইয়া গিয়াছে। সে পুরন্ত গাল তাহার নাই। রক্তিম-আভা-সম্বলিত সে বর্ণ এখন নাই। চক্ষু বসিয়া গিয়াছে, চক্ষের কোলে কালি মাড়িয়া দিয়াছে। সঙ্কটাপন্ন পীড়া হইলে লোক যেরূপ হয়, কুসীর আকার এখন সেইরূপ হইয়া গিয়াছে!

এ কি সেই কাশীর কুসী? ঠিক সেইরূপ মুখ বটে, কিন্তু কুসীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পুনরায় তাঁহার বিবাহ কি করিয়া হইবে? এ কুসী কি না, এই বিষয়ে আমার মনে বড় সন্দেহ উপস্থিত হইল। একবার মনে হয়, এ আর কেহ নহে, নিশ্চয় কুসী। আবার মনে হয় যে, না, তা নয়, কুসীর সহিত রসময়বাবুর কন্যার সাদৃশ্য আছে, এই মাত্র। সেই সাদৃশ্য দেখিয়া আমি এইরূপ ভ্রমে পতিত হইতেছি। আবার মনে হয় যে, কেবল মুখশ্রীর সাদৃশ্য নয়,—'তাহার নাম কুসী, ইহার নাম কুসুম; কুসুমের সংক্ষেপে কুসী। তাহার পর, সেই বাম গণ্ডদেশে আঁচিল। নাম এক, বয়স এক, মুখশ্রী এক, ঠিক এক স্থানে এক প্রকার আঁচিল। এ নিশ্চয় আমার সেই পাতানো কন্যা কুসী।

কিন্তু আবার যখন ভাবি যে, তবে পুনরায় বিবাহ হইতেছে কেন, তখন আবার মনে বড় সন্দেহ হয়! বয়স অধিক হইয়াছিল, সেজন্য রসময়বাবুর কন্যা কাহারও সম্মুখে বাহির হয় না। গোপনে যে তাহার সহিত কোন কথা কহিব, সে উপায় ছিল না। আমি বাটীর ভিতর যখন আহার করিতে যাই, কুসী তখন অবশ্য আমায় দেখিতে পায়। যদি প্রকৃত সে কুসী হয়, তাহা হইলে আমার সহিত সে দেখা করে না কেন? পুনরায় বিবাহ করিতেছে; সেই লজ্জায় দেখা করে না? যাহা হউক, রসময়বাবু যখন কন্যাকে দেখাইবেন, তখন এ রহস্য ভেদ করিতে চেষ্টা করিব।

রসময়বাবু বাটী আসিলে, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—'কৈ আপনার কন্যাকে দেখাইলেন না?'

রসময়বাবু উত্তর করিলেন,—'পথশ্রমে আপনি শ্রান্ত ছিলেন, সেইজন্য দেখাই নাই; তাহার পর, আজ তাহারা নদীতে স্নান করিতে গিয়াছিল। সন্ধ্যার সময় দেখাইব।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'আপনার কন্যার কি হইয়াছে, ভাল করিয়া বলুন দেখি, শুনি।'

রসময়বাবু উত্তর করিলেন,—'কি হইয়াছে, তাহা আমি নিজেই জানি না। সেদিন কলিকাতায় তাহার সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হইল। শুনিয়াছি যে, দুই বৎসর পূর্বে তাহার জ্বর-বিকার হইয়াছিল; তাহার পর, একপ্রকার পাগলের মত হইয়া আছে। শরীর দিন দিন শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। কাহারও সহিত সে কথা কয় না। আমার সহিত এ পর্যন্ত

সে একটিও কথা কয় নাই। তবে সেদিন আমার নিকট আসিয়া বলিল—'বাবা আমার বিবাহ দিবেন না; বিবাহের পূর্বেই আমি মরিয়া যাইব। সকলের সাক্ষাতে সে ক্রমাগত এই কথা বলিতেছে! কিন্তু বিবাহ হইলেই বোধ হয়, সব ভাল হইয়া যাইবে। সেইজন্য বিবাহের নিমিত্ত আমি তারও ব্যস্ত হইয়াছি।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'আপনার কন্যার নাম কুসুম?'

রসময়বাবু উত্তর করিলেন,—'হাঁ'।

সেইদিন সন্ধ্যাবেলা রসময়বাবু ও আমি দুইজনে বৈঠকখানায় বসিয়াছিলাম। সেই সময় তিনি কন্যাকে ডাকিয়া আনিলেন। কুসুম অবগুণ্ঠিত হয় নাই সত্য, কিন্তু যতদূর পারিয়াছিল, ততদূর শরীরকে বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিয়াছিল। অতি ভয়ে ভয়ে মস্তক অবনত করিয়া সে আমার সম্মুখে দাঁড়াইল। সেই কাশীর কুসী বটে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সে কুসী আর নাই তাহার ছায়া মাত্র রহিয়া গিয়াছে। তাহার শরীর অতিশয় কৃশ হইয়া গিয়াছে। চক্ষু বসিয়া গিয়াছে। তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। যেন ঠিক মৃত লোকের আকার হইয়াছে। কতবার তাহাকে আমি মস্তক তুলিতে বলিলাম। কিন্তু কিছুতেই সে মস্তক উত্তোলন করিল না, ঘাড় হেঁট করিয়া মাটির দিকে চাহিয়া রহিল। আমি নানারূপ প্রশ্ন করিলাম। কিন্তু সকল কথাতেই হয় 'হ্যাঁ, আর না হয় 'না'—এইরূপ উত্তর দিল। আমার দিকে একবার চাহিয়া দেখিল না। অবশেষে সে কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার শরীরের অবস্থা দেখিয়া আমার বড় দয়া হইল। সে কোন কথা বলিবে না, সুতরাং আর তাহাকে কষ্ট দেওয়া বৃথা। সে নিমিত্ত আমি তাহাকে বাটীর ভিতর যাইতে বলিলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ – আমি করি কি

কুসী বাটীর ভিতর চলিয়া যাইলে, তাঁহার পিতা আমাকে বলিলেন,—দেখিলেন তো মহাশয়! ইহার মনের গতিক ভাল নহে। সেই বিকারের পর হইতে ইহার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া গিয়াছে; কিয়ৎ পরিমাণে বায়ুগ্রস্ত হইয়াছে। বিবাহ হইয়া গেলে, নানারূপ বসন-ভূষণ পাইয়া, বোধহয় সারিয়া যাইবে।'

আমি উত্তর করিলাম,—'বায়ুগ্রস্ত হইয়াছে কি না, তাহা আমি জানি না, কিন্তু ইহার মনের অবস্থা যে নিতান্ত মন্দ, তাহা নিশ্চয় কথা। সে নিমিত্ত শরীরের অবস্থাও ভাল নহে। আপনার কন্যা যাহা বলে, সত্য সত্য তাহাই বা ঘটে!'

যাহা হউক, আমি ঔষধাদি প্রদান করিলাম না। কোনরূপ ঘোরতর দুশ্চিন্তার নিমিত্ত শরীরের এইরূপ অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে ঔষধ দিয়া কি হইবে? বোধ হয়, দ্বিতীয়বার এই বিবাহই যত অনর্থের মূল। রসময়বাবু কেন এ কাজ করিতেছেন তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। কুসীর স্বামী 'বাবু' কোথায় গেল, তাহাও জানি না। এ বিধবা বিবাহ নহে। তাহা যদি হইত, তাহা হইলেও না হয়, এ ব্যাপারে অর্থ বুঝিতে পারিতাম। কুসীর যে একবার বিবাহ হইয়াছে, সে কথা গোপন রাখা হইতেছে। কাশীতে কুসীর সহিত যখন

আমার সাক্ষাৎ হয়, রসময়বাবু সে সময় ব্রহ্মদেশে ছিলেন। কুসীর যে একবার বিবাহ হইয়াছে তিনি কি তা জানেন না? ফল কথা, ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। যাহা ইচ্ছা হউক, আমার এত ভাবনার আবশ্যক কি? এই বিবাহের শেষ পর্যন্ত দেখিয়া, আমি এ স্থান হইতে চলিয়া যাইব। এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি চুপ হইয়া রহিলাম, আর কুসীকে দেখিতে চাহিলাম না। তবে কুসী কেমন আছে, সে কথা প্রতিদিন জিজ্ঞাসা করিতাম। রসময়বাবু প্রতিদিন বলিতেন,—'সেইরকম আছে; কথা তো সে কয় না, তবে মাঝে মাঝে বলে যে,—তাহার বিবাহ দিতে হইবে না, বিবাহের পূর্বেই সে মরিয়া যাইবে। বৃথা সকল আয়োজন হইতেছে।'

আমি চুপ করিয়া রহিলাম বটে, কিন্তু মন আমার বড়ই উদ্বিগ্ন হইল। এ বিবাহ যাহাতে না হয় সম্পূর্ণ সেই ইচ্ছা হইল। কাশীর কথা প্রকাশ করিয়া এ বিবাহ নিবারণ করি, সে ইচ্ছা বার বার আমার মনে উদয় হইল। কিন্তু 'বাবু' যদি ইহার যথার্থ স্বামী না হয়? সে বিষয়েও যদি কোনরূপ গোল থাকে? তাহা হইলে, কাশীর কথা প্রকাশ করিয়া আমি নিজেই ঘোর বিপদে পড়িব। মাঝে মাঝে এ সন্দেহ আমার মনে উদয় হইল বটে, কিন্তু কুসী যে দুশ্চরিত্রা, সে কথা আমার কিছুতেই বিশ্বাস হইল না। যাহা হউক, আমি দুইদিনের জন্য এ স্থানে বেড়াইতে আসিয়াছি। পরের কথায় হস্তক্ষেপ করিয়া কেন আমি সকলের বিরাগভাজন হইব? কুসীর প্রতি কোনরূপ অত্যাচার কি হইতেছে? তাহা যদি হয়, আর কুসী যদি একটা কথা আমাকে বলে, তাহা হইলে, যেমন করিয়া পারি, আমি এ বিবাহ নিবারণ করিব! কুসী আমাকে হয় চিঠি লিখিবে, না হয় গোপন কিছু বলিবে, প্রতিদিন এই আশা করিতে লাগিলাম। কিন্তু দিনের পর দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল। বিবাহের দিন নিকটবর্তী হইল। তবুও কুসী আমাকে কিছু বলিল না। এ অবস্থায় আমি কি করিতে পারি? ভগবানের যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে, এই কথা ভাবিয়া আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল। বরযাত্রীদিগের থাকিবার নিমিত্ত রসময়বাবু নিকটে একখানি বাটী ভাড়া করিলেন। বিবাহের পূর্বদিন বর ও বরযাত্রিগণ আসিয়া উপস্থিত হইবে। খাদ্যসামগ্রী প্রভৃতির তদনুযায়ী আয়োজন হইতে লাগিল। উজিরগড়ে পুরোহিত ছিল না যে স্থান হইতে বর আসিবে, কন্যাপক্ষের পুরোহিতও সে স্থান হইতে আসিবে। রসময়বাবুর বৈঠকখানাটি বড় ছিল তাহার একপার্শ্বে কন্যাদান হইবে। অপর পার্শ্বে ও বারান্দায় সভা হইবে।

ক্রমে বিবাহের পূর্ব দিন উপস্থিত হইল। অপরাহ্ন চারিটার গাড়ীতে বর ও বরযাত্রিগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বরের পরিধানে মূল্যবান চেলি, গায়ে ফুলকাটা কামিজ, গলায় দীর্ঘ সোনার চেন হাতে পাথর বসান পানিপথের যাঁতি। ফল কথা, বরসজ্জার কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই। যুবা বর হইলে এরূপ সজ্জা করে কি না, সন্দেহ। কিন্তু সজ্জা হইলে কি হয়, বরের রূপ দেখিয়া আমার ভক্তি উড়িয়া গেল। বয়স ষাট বৎসরের কম নহে, কৃষ্ণকায়, মুখে একটিও দাঁত নাই, মাথায় একগাছি কাল চুল নাই; অতি কদাকার বৃদ্ধ।

তাহার পর সেই ফোক্‌লা মাড়ি বাহির করিয়া বিবাহের আনন্দে যখন তিনি রসিকতা করিয়া হাস্য করিতেছিলেন, তখন এরূপ কিম্ভূত কদাকার রূপ বাহির হইতেছিল সে সত্য কথা বলিতে কি, তাঁহার দুই গালে দুই থাবড়া মারিতে আমার নিতান্ত ইচ্ছা হইতেছিল। দিগম্বরবাবু আমার কি ক্ষতি করিয়াছেন যে, তাঁহার উপর আমার এত রাগ? আমার পাতানো মেয়ে কুসী,—'বাবু' হেন সুন্দর সুশীল যুবকের হাত হইতে এইরূপ কদাকার হোঁদল কুৎকুতের হাতে গিয়া পড়িবে, সেই চিন্তা আমার অসহ্য হইয়াছিল। যাহা হউক, এসব চিন্তা আমি মন হইতে দূর করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

বিবাহ সম্বন্ধে কোন কথায় লিপ্ত না থাকিয়া, কেবল অভ্যাগত বরযাত্রীদিগের যাহাতে কোন কষ্ট না হয়, সে কার্যে ব্যস্ত রহিলাম।

বর ও বরযাত্রিগণ তাঁহাদিগের বাসায় উপবেশন করিলে, সে স্থানে সহসা একটু গোলযোগ উপস্থিত হইল। কি হইয়াছে, জানিবার নিমিত্ত তাড়াতাড়ি আমি সে স্থানে গমন করিলাম। সে স্থানে গিয়া দেখিলাম যে, ফোক্‌লা মহাশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া একজন যুবক বরযাত্রীকে ভর্ৎসনা করিতেছেন। আমাকে দেখিয়া তিনি কিছু অপ্রস্তুত হইয়া ধীরভাবে মিনতি করিয়া সে যুবককে বলিলেন,—'দে না ভাই, রসিক এ কি তামাসার সময়?'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'কি হইয়াছে মহাশয়?'

বর উত্তর করিলেন,—এই দেখুন দেখি মহাশয়! আমার যাঁতিখানি লুকাইয়া রাখিয়াছে। যাঁতিখানি, এই এই এই এমনি করিয়া ট্যাঁকে গুঁজিয়া রাখিতে হয়। যাঁতিখানি ট্যাঁকে গুঁজিয়া না রাখিলে বরের অকল্যাণ হয়।'

কি করিয়া যাঁতিখানি ট্যাঁকে গুঁজিয়া রাখিতে হয়, বর আমাকে দেখাইলেন। আমি দেখিলাম বরযাত্রিগণ সকলেই চুপে চুপে হাসিতে ছিলেন। বর পুনরায় আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—'মহাশয়! যাঁতিখানি ফিরাইয়া দিতে আপনি রসিককে বলুন। এ সময় কিছু লোহার দ্রব্য শরীরে না রাখিলে ভূতে পায়।'

একজন বরযাত্রী আস্তে আস্তে বলিলেন,—'ভূত,—আপনার চেহারা দেখিলে ভয়ে পলাইবে না?'

আমি আর কি বলিব, লজ্জায় ঘৃণায় আমি সে স্থান হইতে চলিয়া আসিলাম। মনে মনে কহিলাম,—'হায় হায়! কুসীর কপালে কি এই ছিল!'

অষ্টম পরিচ্ছেদ – মাসীর খেদ

সন্ধ্যার পর রসময়বাবু বরযাত্রীদিগের বাসায় আসিয়া, হব জামাইবাবুকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার নিজের বাটীতে গমন করিলেন। তাঁহাকে বাটীর ভিতর লইয়া অতি সমাদরের সহিত জলখাবার খাইতে দিলেন। জলযোগ করিয়া দিগম্বরবাবু বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন। সেই সময় আমিও সে স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। বৈঠকখানার ভিতর অন্তঃপুরের দিকে দ্বারের নিকট আমি গিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছি, এমন সময় বাড়ীর ভিতর

হইতে অল্প অল্প ক্রন্দনের শব্দ আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। রসময়বাবুর সংসারে অভিভাবকস্বরূপ সেই যে বয়স্কা স্ত্রীলোকটি আছেন, তিনিই কাঁদিতেছিলেন। কাঁদিয়া কাঁদিয়া তিনি বলিতেছিলেন,—'হতভাগি! কেন যে এত রূপ লইয়া জগতে আসিয়াছিস্! তোকে ছয়দিনের রাখিয়া তোর মা আঁতুড়ঘরে মরিয়া গেল। সেইদিন হইতে তোকে আমি প্রতিপালন করিলাম। তোর বাপ তোকে ফেলিয়া চলিয়া গেল। নিজে না খাইয়া তোকে আমি মানুষ করিলাম। একবার যা তোর কপালে ছিল, তা হইল। তোর জন্য ধর্ম কর্ম সব জলাঞ্জলি দিলাম। কত মিথ্যা কথা বলিলাম। কত কথা মনে রাখিলাম। তোর সুখের জন্য আমি ইহকাল পরকাল সব নষ্ট করিলাম, শেষে একটা বুড়ো চাঁড়ালের হাতে পড়িবি বলিয়া কি, আমি এতসব করিলাম? ছিঃ! ছিঃ কি তোর অদৃষ্ট।'

দিগম্বরবাবু এ কথা শুনিতে পাইলেন কি না, তাহা আমি বলিতে পারি না। বোধ হয়, তিনি শুনিতে পান নাই; কারণ, সেই সময় তিনি রসময়বাবু প্রভৃতির সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। আমি নিজেও সকল কথা শুনিতে পাই নাই; কেবল গুটিকতক কথা আমার কানে প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু তাহাতেই আমি বুঝিলাম যে এই স্ত্রীলোক রসময়বাবুর ভগ্নী নহেন; ইনি তাঁহার সেই আত্মীয়ের স্ত্রী,—যিনি কুসীকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। ফল কথা, ইনি আর কেহ নহেন, ইনি কুসীর মাসী,—যাঁহার কথা কাশীতে যখন আমি খবর দিতে ইচ্ছা করি, তখন কুসী ও 'বাবু' আমাকে বলিয়াছিল যে, মেসোমহাশয় ও মাসী ভিন্ন সংসারে কুসীর আর কেহ নাই; তাঁহারাই 'বাবু'র সহিত কুসীর বিবাহ দিয়াছিলেন। সেই সময় আরও শুনিয়াছিলাম যে কুসীর মেসোমহাশয় পীড়িত ছিলেন। রসময়বাবুও সেদিন এই কথা বলিয়াছিলেন কুসীর প্রতিপালকদিগকে তিনি কেবল আমার আত্মীয় এই বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। এখন আমি বুঝিলাম যে, সেই 'আত্মীয়' তাঁহার ভায়রাভাই ও প্রথমপক্ষের শালী ব্যতীত অন্য কেহ নহে।

বিবাহের দিন বৈকাল বেলা রসময়বাবু আমাকে বলিলেন যে,—'কুসুম আজ সমস্ত দিন বিছানায় পড়িয়া আছে, কিছুতেই উঠিতেছে না। ক্রমাগত বলিতেছে যে, এ সব উদ্যোগ বৃথা, বিবাহের পূর্বেই সে মরিয়া যাইবে। আপনি পূর্বে বলিয়াছিলেন যে তাহার আকার ঠিক মৃতলোকের ন্যায়। কিন্তু আজ একবার দেখিবেন চলুন। সত্য সত্যই সে মরিয়া যাইবে না কি?'

রসময়বাবুর সহিত আমি বাটীর ভিতরে যাইলাম। কুসী বিছানায় পড়িয়া আছে। কিন্তু তাহার চক্ষে জল নাই। মুখ পূর্বেই বিবর্ণ ছিল, আজ আরও হইয়াছে। আমাকে দেখিয়া সে চক্ষু মুদ্রিত করিল। তাহাকে আরও শবের ন্যায় দেখাইতে লাগিল। কুসীকে বিছানা হইতে উঠিতে আমি বার বার অনুরোধ করিলাম।

তাহার পিতার সাক্ষাতেই আমি তাহাকে বলিলাম,—'কুসুম! আমি ডাক্তার! বুড়ো মানুষ! আমার এখন কাশীবাস হইলেই হয়। কাশী জান তো? সেই কাশীতে গিয়া থাকিলেই হয়। তোমার মনে যদি কোন কথা থাকে তো চুপি চুপি আমাকে বল আমি সত্য করিয়া

বলিতেছি যে, নিশ্চয় তোমার মত আমার একটি পাতানো কন্যা ছিল। তাহাকে আমি বড় ভালবাসিতাম। তাহার জন্য আমি সর্বস্বান্ত হইতে প্রস্তুত আছি কুসুম, মা! যদি তোমার মনে কোন কথা থাকে, তাহা হইলে আমাকে গোপনে বল। তোমার পিতাকে বাহিরে যাইতে বলি।'

এই শেষকালেও যদি বিবাহ নিবারণ করিতে পারি, সেই আশায় আমি এত কথা বলিলাম। কিন্তু এই ঘটনার প্রকৃত অর্থ কি, তাহা আমি জানিতে না পারিলে, কি করিয়া আমি প্রতিবন্ধকতা করি? আমার প্রতি কুসীর বিশ্বাস হইবে, নির্ভয়ে সে আমাকে মনের কথা বলিতে সাহস করিবে, সেই জন্য আমি 'কাশী' শব্দ কয়বার উচ্চারণ করিলাম, সেই জন্য পাতানো মেয়ের কথা উল্লেখ করিলাম। কিন্তু কুসী চক্ষু উন্মীলিত করিল না, একটি কথাও বলিল না, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ঠিক যেন মৃতলোকের মত পড়িয়া রহিল আমি কুসীর হাত দেখিলাম, নাড়ী অতি দুর্বল বটে, কিন্তু তাহাতে কোনরূপ রোগের চিহ্ন অথবা আশু মৃত্যলক্ষণ কিছুই দেখিতে পাইলাম না। বাহিরে আসিয়া রসময়বাবুকে বলিলাম যে,— 'আপনার কন্যার যেরূপ নাড়ী আমি দেখিলাম, তাহাতে মৃত্যু হইবার কোন ভয় নাই।'

নবম পরিচ্ছেদ – কিঁষ্টা! কিঁষ্টা কুঁথায় রে

কুসীর যে আর একবার বিবাহ হইয়াছে, কাশীতে তাহার পতিকে যে আমি দেখিয়াছি, সেই সব কথা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত সে দিনও আমার বার বার ইচ্ছা হইল। কিন্তু রসময়বাবু সে কথা অবগত আছেন কি না-আছেন, তাহা আমি জানিতে পারি নাই। সকল কথা প্রকাশ করিলে কুসীর পক্ষে ভাল হইবে কি মন্দ হইবে, তাহাও আমি স্থির করিতে পারিলাম না। তাহার পর ইহাদের সহিত আমার কোন সুবাদ সম্পর্ক নাই। বৃথা পরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপের প্রয়োজন কি? এরূপ ভাবিয়া-চিন্তিয়া আমি চুপ করিয়া রহিলাম। কিন্তু এই কয় দিন ধরিয়া, যাহাতে এ বিবাহ না হয়, সে নিমিত্ত নিয়তই ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছিলাম। কোনরূপ দৈবঘটনা সূত্রে এ বিবাহ নিবারিত হইবে, কয় দিন ধরিয়া সেই আশা আমার মনে বলবতী ছিল। কিন্তু বিবাহলগ্ন যতই নিকটবর্তী হইতে লাগিল, ততই সে আশা আমার মন হইতে তিরোহিত হইতে লাগিল। তবুও সন্ধ্যা পর্যন্ত, একটু কোনরূপ শব্দ হয়, কি কেহ উচ্চৈঃস্বরে কথা কয়, কি কেহ কোন স্থান হইতে দৌড়িয়া আসে, আর আমার হৃৎপিণ্ড 'দুড় দুড়' করিয়া উঠে, আর আমি মনে ভাবি, এইবার বুঝি এই কাল-বিবাহ-নিবারণের ঘটনা ঘটিল।

আর একটি কথা। 'বাবু'র সহিত হয় তো কুসীর বিবাহ হয় নাই। এই সব ব্যাপারের ভিতর হয় তো কোন মন্দ কথা আছে। সে সন্দেহও আমার মনে বার বার উদয় হইতে লাগল। কিন্তু যখন আবার কুসীর সেই মধুমাখা মুখ আর 'বাবু'র সেই সরল ভাব চিন্তা

করিয়া দেখি, তখন সে সন্দেহ আমার মন হইতে তিরোহিত হয়। ফল কথা, আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

কোনরূপ দৈব ঘটনা ঘটিয়া এ কাল-বিবাহ বন্ধ হইয়া যাইবে, অনুক্ষণ আমি সেই আশা করিতেছিলাম; কিন্তু আমার সকল আশা বৃথা হইল। সন্ধ্যা উপস্থিত হইল, বিবাহ নিবারণের নিমিত্ত কোনরূপ ঘটনা ঘটিল না। বিবাহের লগ্ন উপস্থিত হইল।

যথাসময়ে সভায় বরকে আনিবার নিমিত্ত রসময়বাবু আমাকে প্রেরণ করিলেন। বরযাত্রীদিগের বাসায় গমন করিয়া বর ও বরযাত্রীদিগকে আমি গাত্রোত্থান করিতে বলিলাম। আর সকলে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বর উঠিলেন না। তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন,—'কিঁষ্টা! ও কিঁষ্টা!'

আমি হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। ইহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। মনে মনে কহিলাম যে, 'এ হতভাগা ফোক্লার সব বিটকেল!'

বর পুনরায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—'কিঁষ্টা! কিঁষ্টা কুঁথায় রে! যে বাটীতে বরযাত্রীদিগের বাসা হইয়াছিল, সেই স্থানে ফুলের বাগান ছিল। বৈশাখ মাস। সেই বাগানে অনেক যুঁই, চামেলি, বেলা প্রভৃতি ফুটিয়া ছিল। সেই ফুলবাগান হইতে এক জন চীৎকার করিয়া উঠিল,—'ঐঃ! এই পদাই আজ্ঞে।'

তখন আমি বুঝিতে পারিলাম যে, দিগম্বরবাবুর সঙ্গে যে বাঙ্গালী চাকর ছিল, তাহার নাম কিষ্টা বা কৃষ্ণ। তাহাতে তিনি ডাকিতেছিলেন। কিষ্টার বাড়ী বোধ হয় পশ্চিমবংগে। দিগম্বরবাবু পুনরায় চীৎকার করিয়া বলিলেন, 'ঐঃ। শীগ্‌গির আয়! লগ্ন ভষ্ম হঁয় যেঁ রে!'

কিষ্টা তাড়াতাড়ি আসিয়া তাঁহার হাতে একছড়া ফুলের মালা দিল। বাগান হইতে ফুল লইয়া চুপি চুপি একছড়া মালা গাঁথিতে চাকরকে তিনি আজ্ঞা করিয়াছিলেন। সেই মালার জন্য ব্যস্ত হইয়া তিনি চাকরকে ডাকিতেছিলেন। মালা পাইয়া হৃষ্টচিত্তে তাহা গলায় পরিয়া বর গাত্রোত্থান করিলেন।

বর গাত্রোত্থান করিয়াছেন এমন সময় রসময়বাবু হাঁপাইতে হাঁপাইতে দৌড়িয়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন ঠিক সন্ধ্যা হইয়াছিল; সন্ধ্যার পরেই বিবাহের লগ্ন ছিল। রাত্রি দশটার পর আর এক লগ্ন ছিল। রসময়বাবু আমার কানে কানে বলিলেন,—'কুসুম কিরূপ করিতেছে, শীঘ্র চলুন।'

তাহার পর বরযাত্রীদিগকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন—'মহাশয়গণ! আমার কন্যার শরীর সহসা কিছু অসুস্থ হইয়াছে। এ প্রথম লগ্নে বোধ হয় বিবাহ হইবে না। রাত্রি দশটার পর যে লগ্ন আছে, সেই লগ্নে বিবাহ হইবে।'

রসময়বাবুর সহিত তাড়াতাড়ি আমি তাঁহার বাটীতে যাইলাম। যে ঘরে কুসী শয়ন করিয়াছিল, সেই ঘরে তিনি আমাকে লইয়া গেলেন। আমি দেখিলাম যে, কুসীর মুখ নিতান্ত রক্তহীন হইয়া বিবর্ণ হইয়াছে। চক্ষু বুজিয়া সে শয়ন করিয়া আছে। ডাকিলে উত্তর প্রদান করে না। হাত ধরিয়া দেখিলাম যে, তাহার নাড়ী আরও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। ঘর

হইতে বাহির হইয়া আমি রসময়বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—'আপনার বাড়ীতে অভিভাবক-স্বরূপ যে স্ত্রীলোকটি আছেন, তিনি কি আপনার শালী, কুসুমের মাসী? তিনিই কি কুসুমকে প্রতিপালন করিয়াছেন?'

রসময়বাবু উত্তর করিলেন,—হাঁ! তিনিই কুসুমের মাসী, তিনিই কুসুমকে প্রতিপালন করিয়াছেন।

আমি বলিলাম,—'আপনার কন্যার লক্ষণ আমি ভাল দেখিলাম না। তাহাকে কিছু ঔষধ দিতে হইবে। কিন্তু কুসুমের মাসীকে আমি গোপনে দুই চারিটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি। স্ত্রীলোকদিগের নানা প্রকার রোগ হয়। ডাক্তার ভিন্ন অন্য লোকের সে সব কথা শুনিয়া আবশ্যক নাই। কুসুমের মাসীকে জিজ্ঞাসা করিয়া, তাহার পরে আমি ঔষধের ব্যবস্থা করিব।'

বাড়ীর ভিতর একপার্শ্বে ছোট একটি ঘর ছিল, সেই ঘরে আলো জ্বলিতেছিল। দুই জন পাঞ্জাবী স্ত্রীলোক তাহার ভিতর বসিয়া কি করিতেছিল। রসময়বাবু তাহাদিগকে সে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিলেন। ঘরের ভিতর দ্বারের নিকট একখানি চারপাই ছিল। আমাকে সেই চারপাইয়ে বসিতে বলিয়া রসময়বাবু চলিয়া গেলেন।

অল্পক্ষণ পরে কুসুমের মাসী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সম্পূর্ণভাবে নয়, কিন্তু ঘোমটা দ্বারা কতকটা তিনি মুখ আবৃত করিয়াছিলেন।

আমি তাঁহাকে বলিলাম,—'কুসুমের প্রাণ সংশয় হইয়াছে। আপনি বোধ হয় জানেন যে, আমি একজন ডাক্তার। আপনাকে সকল কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া আমি তাহাকে ঔষধ দিতে পারিতেছি না। তাহার সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। আপনি বসুন। দাঁড়াইয়া থাকিলে হইবে না।'

মাসী মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন,—'কুসুমকে তুমি ভাল কর, বাবা! কুসুমকে লইয়া আমি সংসারে আছি। ছয় দিনের মেয়েকে আমার হাতে দিয়া তাহার মা মারা পড়িয়াছে। সেই অবধি আমি তাহাকে মানুষ করিয়াছি। তুমি তাকে ভাল কর, বাবা!'

আমি উত্তর করিলাম,—'রসমময়বাবুর সহিত আমার ভাই সম্পর্ক। কুসুমকে আমি কন্যার মত দেখি। সে জন্য আপনি আমাকে বাবা বলিতে পারেন না। কুসুমকে ভাল করিতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। তাহার রোগের কারণ কি, তাহা জানিতে না পারিলে কি করিয়া আমি ঔষধ দিব?'

মাসী বলিলেন,—'আর বৎসর এই সময় তাহার জ্বর-বিকার হয়। তাহার পর—'

আমি বলিলাম,—'সে কথা নয়। আমি আপনাকে যে যে কথা জিজ্ঞাসা করিব, তাহার উত্তর ঠিক দিবেন কি না?'

মাসী উত্তর করিলেন,—তা কেন দিব না। আমার কুসীর প্রাণ বড়, না আর কিছু বড়।'

আমি বলিলাম,—'তবে আপনি বসুন। অনেক কথা আমি জিজ্ঞাসা করিব।'

মাসী দ্বারের নিকট ভূমিতে উপবেশন করিলেন। আমি চারপাইয়ের উপর বসিয়া

রহিলাম।

আমি বলিলাম,—'কুসুমকে আমি ইহার পূর্বে দেখিয়াছি। দুই বৎসরের অধিক হইল, তাহার সহিত কাশীতে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাহার সহিত সে সময় একজন অল্পবয়স্ক পুরুষ মানুষ ছিল। কুসুম তাকে 'বাবু' বলিয়া ডাকিত। কুসুম আমাকে বলিয়াছিল যে, 'বাবু' তাহার স্বামী। সে কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এ সব আবার কি?'

আমার পা দুইটি ভূমিতে ছিল। কুসুমের মাসী শশব্যস্ত হইয়া সেই পা জড়াইয়া ধরিলেন।

মাসী বলিলেন,—পাপ হউক, পূণ্য হউক, কুসীর ভালর জন্য আমি কাজ করিতেছি। তোমার পায়ে পড়ি, তুমি কোন কথা প্রকাশ করিও না। প্রকাশ করিলে বড় কেলেঙ্কারি হইবে। পৃথিবীতে আমি আর মুখ দেখাইতে পারিব না। যতক্ষণ না তুমি আমার কথা স্বীকার করিবে, ততক্ষণ আমি তোমার পা ছাড়িব না।'

'ও কি করেন! ও কি করেন!' বলিয়া আমি আমার পা সরাইয়া লইতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু মাসী কিছুতেই আমার পা ছাড়িলেন না। আমি বড় বিপদে পড়িলাম।

আমি বলিলাম,—'আপনি স্থির হউন। কেহ যদি এ স্থানে আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে সে কি মনে করিবে! যদি কুসুমের প্রতি নিতান্ত কোনরূপ অন্যায় না দেখি, তাহা হইলে আমি প্রকাশ করিব না। আপনাদের ঘরের কথায় আমার প্রয়োজন কি? পাপ হয়, পূণ্য হয়, তাহার জন্য আপনারা দায়ী। আমার তাহাতে কি? কিন্তু কুসীর প্রতি আপনারা কোন অত্যাচার করিতেছেন কি না, তাহা আমাকে বুঝিয়া দেখিতে হইবে।'

মাসী উত্তর করিলেন,—'কুসীর প্রতি অত্যাচার! যাহার জন্য এই কলঙ্কের পসরা আমি মাথায় লইতেছি, তাহার প্রতি আমি অত্যাচার করিব! রায় মহাশয় কোন কথা জানে না।'

আমি বলিলাম,—'রসময়বাবু যে কিছু জানেন না, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি। এখন বলুন, সে 'বাবু' কে? সে প্রকৃত কুসুমের স্বামী কি না? যদি কুসুমের সহিত তাহার বিবাহ হইয়া থাকে, তাহা হইলে পুনরায় বিবাহ দিতেছেন কেন?

ইতিপূর্বে মাসী আমার পা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এখন তিনি পুনরায় দ্বারের নিকট গিয়া বসিলেন। কাহাকেও আসিতে দেখিলে তিনি সাবধান হইতে পারিবেন, সে নিমিত্ত দ্বারের একটু বাহিরে বারেণ্ডাতে তিনি উপবেশন করিলেন! তাহার পর তিনি পূর্ব বৃত্তান্ত আমাকে বলিতে লাগিলেন।

এই পূর্ব বৃত্তান্ত আমি আমার নিজের কথাতে বলিব; কুসুমের মাসী যে ভাবে বলিয়াছেন, সে ভাবে বলিব না। তাহার কারণ এই, যে তিনি সংক্ষেপে সকল কথা বলিয়াছিলেন!

এই সমুদয় ঘটনার পরে অন্যান্য লোকের মুখ হইতে আমি যে সকল কথা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহাও আমি এই বিবরণে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিলাম।'

তৃতীয় ভাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ – সূতিকাগার

কুসীর পূর্ব বৃত্তান্ত অবগত হইতে হইলে, আমাদিগের চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তঃপাতী সামান্য একখানি গ্রামে গমন করিতে হইবে। সেই গ্রামে একটি একতালা সেই কোটা বাড়ীতে দুইটি ঘর আছে। তাহার সম্মুখে একখানি চালা ঘর আছে। সেই চালার এক ভাগ দর্‌মা দ্বারা আবৃত। সেই ভাগে রান্না হয়। অপর ভাগ আবৃত নহে, তাহাতে কাঠ পাতা ঘুঁটে প্রভৃতি দ্রব্য থাকে।

চালার সে ভাগে এখন কাষ্ঠ প্রভৃতি দ্রব্য নাই। কাঁচা নারিকেল পাতা দিয়া এখন সেই ভাগ সামান্যভাবে আবৃত করা হইয়াছে। আস্ত নারিকেল পাতাগুলি এরূপ দূরে দূরে সন্নিবেশিত হইয়াছে যে, তাহা দ্বারা কেবল একটু আড়াল হইয়াছে মাত্র।

আমি এখনকার কথা বলিতেছি না; পনর ষোল বৎসর পূর্বে যাহা ঘটিয়াছিল, সেই কথা বলিতেছি। এ সমুদয় ঘটনা আমি চক্ষে দেখি নাই; সে স্থানে আমি উপস্থিতও ছিলাম না। কুসীর মাসী ও অন্যান্য লোকের মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহাই আমি বলিতেছি।

বর্ষাকাল। দুর্জ্জয় বাদল। টিপ টিপ করিয়া সর্বদাই জল পড়িতেছে। মাঝে মাঝে এক একবার ঘোর করিয়া প্রবল ধারায় বৃষ্টি হইতেছে। হু-হু করিয়া শীতল পূর্ব বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। ঘর হইতে বাহির হয়, কাহার সাধ্য? এই দুর্যোগে নারিকেল পত্র দ্বারা আবৃত সেই চালার ভিতর এক ভদ্রমহিলা শয়ন করিয়া আছে। একখানি গলিত, নানা স্থানে ছিন্ন পুরাতন ময়লা বস্ত্র স্ত্রীলোকটি পরিধান করিয়াছিলেন। সেইরূপ একখানি ছিন্ন, পুরাতন মাদুর ও ছোট একটি ময়লা বালিশ ভিন্ন আর কিছু বিছানা ছিল না। যে মৃত্তিকার উপর এই মাদুরটি বিস্তৃত ছিল, তাহা নিতান্ত আর্দ্র ছিল। তাহা ব্যতীত নারিকেলপাতার ফাঁক দিয়া, মাঝে মাঝে জলের ঝাপটা আসিতেছিল; তাহাতে বিছানা, স্ত্রীলোকটির পরিধেয় কাপড় ও সর্বশরীর ভিজিয়া যাইতেছিল, পাতার ফাঁক দিয়া সর্বদাই বাতাস আসিতেছিল। সেই ভিজা মেঝেতে, ভিজা মাদুরের ভিজা কাপড়ে স্ত্রীলোকটি পড়িয়া ছিল। এরূপ অবস্থায় সহজ মানুষের কম্প উপস্থিত হয়। কিন্তু সে স্ত্রীলোকটির অবস্থা সহজ ছিল না। বিছানার নিকট কিঞ্চিৎ দূরে কাঠের আগুন জ্বলিতেছিল বটে, কিন্তু তাহাতে সে চালার ভিতর বিন্দুমাত্র উত্তাপের সঞ্চার হয় নাই। স্ত্রীলোক এবং আগুন এই দুইয়ের মধ্যস্থলে ছিন্ন বস্ত্র দ্বারা আবৃত একটি নবপ্রসূত শিশু নিদ্রা যাইতেছিল। আজ চারিদিন এই শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ইহাই সূতিকাগার। যে স্ত্রীলোকটি মাদুরে শয়ন করিয়াছিলেন, তিনিই প্রসূতি। এই সঙ্কট সময়ে তিনি এইরূপ আর্দ্র নারিকেলপাতায় সামান্যভাবে আবৃত চালাঘরে পড়িয়া ভিজিতেছিলেন। কেবল তাহা নহে। তিনি উৎকট রোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন। প্রসবের একদিন পরে তাঁহার জ্বর হয়, তাহার পরদিনই সেই জ্বর,—বিকারে পরিণত হয়; এক্ষণে তিনি একেবারে জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছেন। জ্ঞানশূন্য হইয়া ক্রমাগত এ পাশ ওপাশ

করিতেছেন; ক্রমাগত তাঁহার মস্তক সেই ক্ষুদ্র বালিশের উপর হইতে পড়িয়া যাইতেছেন। কখনও উচ্চৈঃস্বরে কখনও বা বিড়বিড় করিয়া তিনি বকিতেছেন। তাঁহার শিয়রদেশে আর একটি স্ত্রীলোক বসিয়া আছেন। তিনি দাই নহেন, ভদ্র-কন্যা বলিয়া তাঁহাকে বোধ হয়। পীড়িতা স্ত্রীলোকের সহিত তাঁহার মুখের সাদৃশ্য দেখিয়া, তাঁহাকে বড় ভগিনী বলিয়া বোধ হয়। পীড়িতার মস্তক যখন বালিশ হইতে নীচে পড়িয়া যাইতেছিল, তখন তাঁহার মস্তক পুনরায় তিনি বালিশের উপর তুলিতেছিলেন। ঘোর তৃষ্ণায় কাতর হইয়া পীড়িতা তখন হাঁ করিতেছিলেন, তখন একটু জল দিয়া তিনি তাঁহার শুষ্ক মুখ ক্ষণকালের নিমিত্ত সিক্ত করিতেছিলেন। পীড়িতা যখন বিড়বিড় করিয়া বকিতেছিলেন, তখন তিনি তাঁহার মস্তক অবনত করিয়া তাহার মুখের নিকট আপনার কান রাখিয়া কথা বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু সে সমুদয় প্রলাপ বাক্য, সে কথার কোন অর্থ ছিল না। বিকারের বলে পীড়িতা যখন উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেছিলেন, তখন তিনি মাঝে মাঝে তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া বলিতেছিলেন,—'ক্ষান্ত। স্থির হও; ক্ষান্ত। স্থির হও।' রোগীর সেবা করিতে করিতে মাঝে মাঝে তিনি সেই নবপ্রসূত শিশুটিকে তুলিয়া পালিতা দ্বারা গাভীদুগ্ধ পান করাইতেছিলেন। পীড়িতা ও অপর সেই স্ত্রীলোকটি ব্যতীত এ বাড়ীতে জনমানব আর কেহ ছিল না। অপর স্ত্রীলোকটি পীড়িতার বড় ভগিনী বটেন। তাঁহার বাটী এই গ্রাম হইতে আট দশ ক্রোশ দূরে। ভগিনীর পূর্ণ গর্ভাবস্থা উপস্থিত হইলে, তাঁহার শুশ্রূষার নিমিত্ত তিনি আসিয়াছিলেন। তাহার পর এই বিপদ!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ – পীড়িতা প্রসূতি

পীড়িতা প্রসূতির এইরূপ অবস্থা। সে সংসারের এইরূপ অবস্থা। অপরাহ্ন হইয়াছে, বেলা প্রায় ছয়টা বাজিয়া গিয়াছে। বৃষ্টি নিয়তই পড়িতেছে। মেঘাচ্ছন্ন পৃথিবীকে সন্ধ্যার অন্ধকার ঢাকিবার উপক্রম করিতেছে। এই সময় একজন প্রতিবাসিনী ভিজিতে ভিজিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

প্রতিবাসিনী জিজ্ঞাসা করিলেন,—'বৌ এখন কেমন আছে গা?'

পীড়িতার ভগিনী উত্তর করিলেন,—'আর বাছা! কেমন থাকার কথা আর নেই। এখন রাতটি কাটিলে হয়।'

এই বলিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। চক্ষু দিয়া তাঁহার টপ টপ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। পীড়িতার মাথা পুনরায় বালিশের নিম্নে গিয়া পড়িল। আঁচল দিয়া চক্ষু মুছিয়া তাড়াতাড়ি তিনি মাথাটি তুলিয়া বালিশের উপর রাখিলেন।

প্রতিবাসিনী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'রসময়ের কোন খবর নাই?'

ভগিনী উত্তর করিলেন,—'পরশ্ব তাহাকে পত্র দিয়াছি। চিঠিখানি রেজেষ্টারি করিয়াছি, কাল সে পাইয়া থাকিবে। আজ তাহার আসা উচিত ছিল, কিন্তু এ দুর্যোগে সে কি করিয়া আসিবে, তাই ভাবিতেছি।'

প্রতিবাসিনী জিজ্ঞাসা করিলেন,—'খুকী কেমন আছে?

ভগিনী উত্তর করিলেন,—'সে আছে ভাল! পোড়ারমুখী মাকে খাইতে আসিয়াছিল। দেখ গা পৃথিবীতে আর আমাদের কেহ নাই; মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই! সংসারে আমরা কেবল এই ক্ষান্ত ছিল। দিদি বলিতে ক্ষান্ত অজ্ঞান হইত। আমার ছেলে-পিলে নাই। মনে করিয়াছিলাম, ক্ষান্তর পাঁচটা হইবে; তাদের মুখ দেখিয়া আমি সুখী হইব। কর্তাও ক্ষান্তকে বড় ভালবাসেন। রায় মহাশয়ের পত্র যাই তিনি পাইলেন, আর তৎক্ষণাৎ আমাকে পাঠাইয়া দিলেন। ক্ষান্তর ছেলে হইবে, মনে মনে কত আশা করিয়া আমি আসিলাম। ক্ষান্ত যে আমাকে ফেলিয়া চলিয়া যাইবে, এ কথা কখনও মনে ভাবি নাই।'

এই কথা বলিয়া তিনি পুনরায় কাঁদিতে লাগিলেন। প্রতিবাসিনী প্রবোধ দিয়া বলিলেন,—'ভয় নাই, ভাল হইবে। মানুষের রোগ কি হয় না! যদুর স্ত্রীর আঁতুড়ে এইরূপ হইয়াছিল। ভাল হইয়া আবার কত ছেলে-পিলে তাহার হইয়াছে। দাই কোথায় গেল?

ভগিনী উত্তর করিলেন,—'দুই প্রহরের সময় খাইবার নিমিত্ত সে বাটী গিয়াছে। সেই পর্যন্ত এখনও আসে নাই; বোধ হয় শীঘ্রই আসিবে।'

প্রতিবাসিনী বলিলেন,—'ঔষধ-পালা কিছুই হয় নাই?'

ভগিনী উত্তর করিলেন, —'এ গ্রামে ডাক্তার নাই, কবিরাজ নাই, ঔষধ-পালা কি করিয়া হইবে? দাই কি ঔষধ দিয়াছিল।'

প্রতিবাসিনী বলিলেন,—'দাই আসিলে, তেল গরম করিয়া সর্ব শরীরে মাখাইয়া উত্তমরূপে তাপ দিতে বলিবে।' এই বলিয়া প্রতিবাসিনী চলিয়া গেলেন।

বলা বাহুল্য যে, এই পীড়িতা স্ত্রীলোকটি আর কেহ নহেন, ইনি রসময়বাবুর প্রথম পক্ষের স্ত্রী। রসময়বাবু তখন কলিকাতায় কর্ম করিতেন। তিনি তখন অতি অল্প বেতন পাইতেন। দাস দাসী রাখিবার তখন তাঁহার ক্ষমতা ছিল না। তাঁহার জন্য অভিভাবকও কেহ ছিলেন না। অগত্যা স্ত্রীকে একেলা ছাড়িয়া কলিকাতায় তাঁহাকে থাকিতে হইত। কিন্তু তাহার জন্য বিশেষ ভাবনার কোন কারণ ছিল না; প্রতিবাসী ও প্রতিবাসিনীগণ সকলেই তাঁহার স্ত্রীর তত্ত্বাবধান করিতেন। এই বিপদের সময়ও তাঁহারা দিনের মধ্যে ভিজিতে ভিজিতে অনেক বার আসিয়া তত্ত্ব লইতেছিলেন। আবশ্যক হইলে তাঁহারা ডাক্তার আনিয়া দিতেন। কিন্তু চারি ক্রোশ দূরে একখানি গণ্ডগ্রাম হইতে ডাক্তার আনিতে হইত। একবার ডাক্তার আনিতে দশ টাকা খরচ হয়। সে টাকা রসময়বাবুর স্ত্রীর ভগিনীর হাতে ছিল না। প্রসবকালে ভগিনীর সেবা করিবার নিমিত্ত সম্প্রতি তিনি সেই গ্রামে আসিয়াছিলেন। তাঁহার স্বামী অল্প বেতনে সামান্য একটি চাকরী করিয়া দিনপাত করিতেন। সেজন্য টাকা-কড়ি লইয়া তিনি ভগিনীর গৃহে আগমন করেন নাই। বাঁধা দিয়া টাকা কর্জ করিবেন এরূপ গহনাও তাঁহার নিকট ছিল না। রসময়বাবুর নিকট তিনি পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। ভগিনীপতি শীঘ্রই আসিয়া উপস্থিত হইবে। সে আসিয়া ডাক্তার আনবে, সেই প্রতীক্ষায় তিনি পথপানে চাহিয়া ছিলেন।

রসময়বাবু সন্ধ্যার পর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্ত্রীর অবস্থা দেখিয়া তিনি অধীর হইয়া পড়িলেন। সেই রাত্রিতেই তিনি চারি ক্রোশ দূরে ডাক্তার আনিতে দৌড়িলেন। কিন্তু সে দুর্যোগে পালকী-বেহারাগণ বাহির হইতে সম্মত হইল না। স্ত্রীর অবস্থা বলিয়া ডাক্তারের নিকট হইতে কিছু ঔষধ লইয়া বিরস বদনে রাত্রি দুইটার সময় তিনি প্রত্যাগমন করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ – খুকীকে ভুলিও না

পরদিন প্রাতঃকালে ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এরূপ রোগ আমি অনেক দেখিয়াছি; ভালরূপ চিকিৎসা হইলেও এ রোগে ক্বচিৎ কেহ রক্ষা পাইয়া থাকে। ডাক্তার আসিয়া প্রথম সূতিকাঘর দেখিয়াই জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন,—'এরূপ স্থানে সুস্থ মানুষ থাকিলেও মরিয়া যায়! কোন্ প্রাণে পীড়িতা প্রসূতিকে আপনারা এরূপ স্থানে রাখিয়াছেন?'

রসময়বাবু কোন উত্তর করিলেন না। কিন্তু একজন প্রবীণ প্রতিবাসী বলিলেন,—'আপনি যে বিলাতী সাহেব দেখিতে পাই। আপনার বাড়ীতে কি হয়? আপনি যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন আপনার আঁতুড় ঘরের জন্য মার্‌বেল পাথরের মনুমেণ্ট প্রস্তুত হইয়াছিল না কি?'

ডাক্তার কিছু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন,—'প্রসূতিকে আপনারা ঘরের মধ্যে লইয়া যাইতে পারেন না?'

রসময়বাবু উত্তর করিলেন,—'পল্লীগ্রাম। দুই-চারিটা নাকরকেলপাতা দিয়া চিরকাল আমাদের আঁতুড় ঘর হয়। আজ যদি আমি তাহার অন্যথা করি, তাহা হইলে সকলে আমার নিন্দা করিবে।

ডাক্তার আর কোন কথা বলিলেন না, বলিবার বড় প্রয়োজনও ছিল না; কারণ, পীড়িতার তখন আসন্নকাল উপস্থিত হইয়াছিল। ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া ডাক্তার চলিয়া গেলেন।

পীড়িতা প্রসূতি যে এপাশ ওপাশ করিতেছিলেন ক্রমে তাহা স্থির হইয়া আসিল। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস কার্য অতি কষ্টে সম্পন্ন হইতে লাগিল। রসময়বাবু ও তাঁহার শালী বুঝিলেন যে, আর অধিক বিলম্ব নাই। দুইজনে দুই পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন। অবিরল ধারায় চক্ষুর জল পড়িয়া, দুইজনের বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

অপরাহ্ন প্রায় তিনটা বাজিয়া থাকিবে. এমন সময় রোগিণীর সহসা একটু জ্ঞানের উদয় হইল। বিস্মিত মনে তিনি চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। তাহার পর অতি ধীরে ধীরে তিনি বলিলেন,—'এ কি! আমি কোথায়?'

মস্তক অবনত করিয়া রসময়বাবু তাঁহার মুখের নিকট আপনার কর্ণ রাখিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ তিনি আর কোন কথা বলিলেন না। স্থিরভাবে তিনি যেন চিন্তা করিতে লাগিলেন।

চিন্তা করিয়া তাঁহার যেন সকল কথা মনে হইল। তখন ভগিনীর মুখের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন,—'দিদি!'

নিকটে অগ্রসর হইয়া, ভগিনী মস্তক অবনত করিয়া, কান পাতিয়া রহিলেন। রোগিণী অতি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'যা হইয়াছিল, তা আছে?'

ভগিনী উত্তর করিলেন,—'আছে বই কি!'

এই বলিয়া তিনি তাড়াতাড়ি খুকীকে লইয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিলেন। রোগিণী আস্তে আস্তে খুকীর ক্ষুদ্র হস্তটি ধরিয়া ভগিনীর হস্তের উপর রাখিয়া বলিলেন,—'তোমাকে দিলাম।'

তাহার পর রসময়বাবুর হাতটি ধরিয়া তিনি সেইরূপ মৃদুস্বরে বলিলেন,—'বাবু! তবে যাই! কিছু মনে করিও না। তুমি পুনরায় বিবাহ করিবে। আমাকে একেবারে ভুলিও না। খুকী দিদির কাছে থাকিবে? খুকীকে ভুলিও না। তবে যাই।'

অতি কষ্টে, হাঁপাতে হাঁপাতে, এক একটি করিয়া এই কথাগুলি তিনি রসময়বাবুকে বলিলেন। তাহার পর আর তিনি কথা কহিতে পারিলেন না। পরমুহূর্তেই তাঁহার ভগিনী কাঁদিয়া উঠিলেন। এই অল্প বয়সেই তাঁহার ইহলীলা সমাপ্ত হইয়া গেল। কাঁদিতে কাঁদিতে রসময়বাবু সে স্থান হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

কিছুদিন পরে রসময়বাবু শালী,—খুকীকে লইয়া স্বগ্রামে প্রস্থান করিলেন। রসময়বাবুও কলিকাতা চলিয়া গেলেন। রসময়বাবু একবার আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার অন্তঃকরণ নিতান্ত কোমল। সে কথা সত্য। বর্মাণীর মৃত্যুর পর তিনি যে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছিলেন, তাহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলাম। আমি শুনিয়াছি যে, তাঁহার এই প্রথম স্ত্রী-বিয়োগের পরেও তিনি শোকে অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন। সূতিকাগারে পত্নীর পীড়া হইয়াছে, এই কথা শুনিয়া রোগিণীর নিমিত্ত কলিকাতা হইতে তিনি এক বোতল ব্র্যাণ্ডি লইয়া গিয়াছিলেন। শোক-নিবারণের নিমিত্ত সেই ব্র্যাণ্ডি তিনি একটু একটু পান করিতে আরম্ভ করিলেন। মদ্যপান করিতে তিনি এইরূপে শিক্ষা করিলেন। পত্নীবিয়োগে রসময়বাবু এতদূর অধীর হইয়া পড়িলেন যে, কাজ-কর্ম তিনি আর কিছুই করিতে পারিলেন না। চাকরী ছাড়িয়া পাগলের ন্যায় তিনি দেশ-পর্যটনে বাহির হইলেন। বহুদেশ ভ্রমণ করিয়া, অবশেষে তিনি ব্রহ্মদেশে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে রসময়বাবুর সহিত আমার আলাপ পরিচয় হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ – নিবিড় বনে দেবকন্যা

রসময়বাবুর শালী,—কন্যাটিকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। যখন সে ছয় মাসের হইল, তখন তাঁহারা স্ত্রী-পুরুষ পরামর্শ করিয়া, তাহার নাম কুসুমকুমারী রাখিলেন। বলা বাহুল্য যে, তাহাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত ফোক্‌লা দিগম্বর মহাশয়ের শুভাগমন হইয়াছে। ব্রহ্মদেশে কর্ম পাইয়া রসময়বাবু প্রথম প্রথম ভায়রাভাইকে চিঠিপত্র লিখিতেন। কুসীর প্রতিপালনের নিমিত্ত মাঝে মাঝে টাকাও পাঠাইতেন। কুসীর যখন পাঁচ বৎসর বয়স, তখন

বর্মাণী তাঁহার গৃহের গৃহিণীত্ব-পদ প্রাপ্ত হইল। সেই সময় হইতে তাঁহার পান-দোষও দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল! ক্রমে ক্রমে তিনি ভায়রাভাইকে পত্রাদি লেখা বন্ধ করিয়া দিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি কুসীকে বিস্মৃত হইলেন। সেই সময় হইতে কন্যার প্রতিপালনের নিমিত্ত আর একটি পয়সাও তিনি প্রেরণ করিলেন না।

কুসীর মেসোমহাশয় আট টাকা বেতনের সামান্য একটি চাকরী করিতেন। পল্লীগ্রামের খরচ অল্প, সেই আট টাকাতেই কোনরূপে তাঁহার দিনপাত হইত। ইহাতে কষ্টে সংসার চলে বটে, কিন্তু সঞ্চয় কিছু হয় না। সে নিমিত্ত কুসীর বয়ঃক্রম যখন দশ বৎসর হইল, তখন তাহার বিবাহের নিমিত্ত ইনি বড়ই চিন্তিত হইলেন। তিনি দেখিলেন যে অতি সংক্ষেপে বিবাহ দিলেও দুই শত টাকার কমে হয় না। কিন্তু যখন দুইটি পয়সা হাতে নাই, তখন দুই শত টাকা তিনি কোথায় পাইবেন? কুসীর বিবাহের নিমিত্ত রসময়বাবুকে ইনি বার বার পত্র লিখিলেন। রসময়বাবু একখানি পত্রেরও উত্তর দিলেন না। কুসীর বয়স বারো বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তবুও তাহার বিবাহ হইল না। এই সময় আর একটা বিপদ ঘটিল। কুসীর মেসোমহাশয় পীড়াগ্রস্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। কুসীর বিবাহ দেওয়া দূরে থাকুক, তাঁহাদের দিন চলা ভার হইয়া উঠিল।

আমাদের চিন্তা করা বৃথা, যিনি মাথার উপরে আছেন, তিনি যাহা করেন, তাহাই হয়। মেসোমহাশয়ের বাটী হইতে কিছুদূরে গ্রামের প্রান্তভাগে বৃহৎ একটি বাগান আছে? সেই বাগানের মাঝখানে একটি পুষ্করিণী আছে। উপরে আম, কাঁঠাল, নারিকেল প্রভৃতি ফলের গাছ, নিম্নে ছোট ছোট বন-গাছ নানা প্রকার তরু-পল্লীর সম্বলিত নিবিড় বন দ্বারা পুকুরটির চারি ধার আবৃত রহিয়াছে। পুকুরটিতে বাঁধা ঘাট নাই; সে স্থানে বড় কেহ স্নান করিতে অথবা জল আনিতে যায় না। দুই ধারে বন মাঝখানে গরু ও মানুষ-জন যাইবার নিমিত্ত সামান্য একটু সঙ্কীর্ণ পথ। সেই পথ পুষ্করিণীর এক পার্শ্বে একটি মেটে ঘাটে গিয়া শেষ হইয়াছে। মানুষে এ ঘাটটি প্রস্তুত করে নাই, গরু-বাছুর নামিয়া সামান্য একটু ঘাটের মত হইয়াছে এই মাত্র। স্থানটি নির্জন।

একদিন অপরাহ্নে, এই নির্জন স্থানে, জলের ধারে সেই মেটে ঘাটে বসিয়া, একটি বালিকা হাপুশ-নয়নে কাঁদিতেছিল। বালিকা? বালিকা বটে, কিন্তু বয়ঃক্রম দ্বাদশ উত্তীর্ণ হইয়া থাকিবে। তবে তাহার সিঁথিতে সিন্দুর ছিল না। আমি অবশ্য তাহা দেখি নাই; কারণ, আমি সে স্থানে উপস্থিত ছিলাম না। কিন্তু পুষ্করিণীর অপর পার্শ্বে বনের ভিতর লুক্কায়িত থাকিয়া, ছোট একগাছি ছিপ লইয়া, যে লোকটি সমুদয় দেখিয়াছিল। কি নিমিত্ত বালিকা ক্রন্দন করিতেছিল, তাহাও সে বুঝিতে পারিয়াছিল। একবার ঐ লোকটিকে ভাল করিয়া দেখ। ফুট গৌরবর্ণ বিমলকান্তি, সত্য-উচ্চভাব-দয়া-মায়া-পূর্ণ মুখশ্রী,—'নানা গুণ সম্পন্ন ঐ যে যুবক বনের ভিতর বসিয়া আছে, উহাকে একবার ভাল করিয়া দেখ। যেদিন কুসী মাতৃহীনা হয়, সেই রাত্রিতে বিধাতা আসিয়া উহারই নাম শিশুর ললাটে লিখিয়াছিলেন।

যুবকের বয়ঃক্রম সতের কি আঠারো হইবে। কিছুক্ষণ পূর্বে বাম হস্তে একটু ময়দা

মাখিতে মাখিতে দক্ষিণ হস্তে পুঁটিমাছ ধরিবার ছোট ছিপ গাছটি লইয়া, সে এই পুষ্করিণীর ধারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। প্রথম ঘাটের নিকট গিয়া দেখিল যে সে স্থানে অতিশয় রৌদ্র। সে নিমিত্ত পুকুরের বিপরীত দিকে গিয়া অতি কষ্টে জঙ্গল ঠেলিয়া, বনের ভিতর সে মাছ ধরিতে বসিয়াছিল।

অল্পক্ষণ পরেই ঘাটের দিকে মানুষের পদশব্দ হইল। সে চাহিয়া দেখিল। আলৌকিক রূপলাবন্য সম্পন্না এক বালিকাকে সেই নির্জন স্থানে একাকী আসিতে দেখিয়া যুবক চমকিত হইল। বালিকার যৌবন আগতপ্রায়! এ নিবিড় বনে—এই নির্জন স্থানে কোন দেবকন্যা আগমন করিলেন না কি! এমন রূপ তো কখনও দেখি নাই। অনিমেষ নয়নে সে বালিকার দিকে চাহিয়া রহিল। সামান্য একখানি পাছা-পেড়ে বিলাতী শাড়ী সেই বালিকা পরিধান করিয়াছিল।

কিন্তু তাহার উজ্জ্বল শুভ্র দেহের উপর স্থানে কাপড়ের কালো পাড়টি পড়িয়া, কি এক অপূর্ব সৌন্দর্যের আবির্ভাব হইয়াছিল। হাতে গাছকত কাচের চুড়ী ব্যতীত তাহার শরীরে অন্য কোন অলঙ্কার ছিল না। কিন্তু সেই গোল কোমল শুভ্র হস্তে কৃষ্ণবর্ণের চুড়ী—কেমন অপূর্ব শোভার সৃষ্টি করিয়াছিল। নিবিড় চাকচিক্যশালী কেশগুলি,—মস্তকের মধ্যস্থলে কেমন একটি সুক্ষ্ম রেখা দ্বারা দ্বিখণ্ডিত হইয়াছিল। ললাটের উপর সীঁথির আরম্ভ-স্থলে সিন্দুরবিন্দু ছিল না। নিমেষের মধ্যে তাহাও যুবকের নয়নগোচর হইয়াছিল। মস্তক অবনত করিয়া বালিকা আসিতেছিল, সে নিমিত্ত চক্ষুদ্বয় ভূমির দিকে অবনত ছিল। ঘোর কৃষ্ণবর্ণের সুদীর্ঘ ঘন অবনত সেই চক্ষু-পল্লবশ্রেণী দেখিলেই মানুষের মন মোহিত হইয়া যায়। কিন্তু তাহার অন্তরালে যে তরল অনল গঠিত নীলপঙ্কজ-সদৃশ্য নয়ন দুটি রহিয়াছে তাহা দেখিলে মানুষের কি হয়? আর গোপন করিবার আবশ্যক কি? এই বালিকা আমাদের কুসী। তাই বলি, হে ফোগলেন্দ্র! আর জন্মে তুমি কিরূপ তপস্যা করিয়াছিলে?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ – অপরাহ্নের অবগাহন

পুষ্করিণীর অপর পার্শ্বে বসিয়া ছিপগাছটি হাতে করিয়া, যুবক অনিমেষ-নয়নে কুসীর দিকে চাহিয়া রহিল। বামকক্ষে কলসী লইয়া ভূমির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কুসী দ্রুতবেগে সেই সামান্য ঘাট দিয়া জল অভিমুখে নামিতে লাগিল। ঘাটের সঙ্কীর্ণ পথ পিচ্ছিল ছিল, সহসা পদস্খলিত হইয়া কুসী ভূমির উপর পতিত হইল। পতিত হইয়া সেই নিম্নগামী পথ দিয়া আরও কিছুদূর সে হড়িয়া পড়িল। কক্ষদেশ হইতে কলসীটি পৃথক হইয়া গেল, পরক্ষণেই তাহা গড়াইয়া জলে গিয়া পড়িল। আশ্বিন মাস। পুষ্করিণী তখন জলপূর্ণ ছিল। যে স্থানে কলসীটি ডুবিয়া গেল, সে স্থানে গুটিকত বুদ্‌বুদ্ উঠিল। কুসী তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। সেই বুদ্‌বুদের দিকে চাহিয়া সে কাঁদিতে লাগিল।

যুবক মনে করিল যে, বালিকাকে অতিশয় আঘাত লাগিয়া থাকিবে, সেজন্য সে কাঁদিতেছে। সেই মুহূর্তে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। কোন কথা না বলিয়া, বন ভাঙ্গিয়া অতি

দ্রুতবেগে সে উপরে উঠিতে চেষ্টা করিল। বনে ছিপের সূতা জড়াইয়া গেল। ব্যস্ত হইয়া এক টান মারিয়া সে সূতা ছিঁড়িয়া ফেলিল। ছিপগাছটি এক গাছে লাগিল। ক্রোধভরে ছিপটি ভাঙ্গিয়া সে দূরে নিক্ষেপ করিল। বন পার হইয়া সে উপরে উঠিল; বন পার হইয়া পুষ্করিণীর পাড় প্রদক্ষিণ করিয়া, যথাসাধ্য দ্রুতবেগে সে ঘাটের দিকে দৌড়িতে লাগিল। কাঁটা-খোঁচায় তাহার পরিধেয় কাপড় ফালা-ফালা হইয়া ছিঁড়িয়া গেল; পদদ্বয়ের নানাস্থান হইতে রক্তধারা পড়িতে লাগিল। সে সমুদয়ের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সে বন-জঙ্গল অতিক্রম করিতে লাগিল। অবশেষে ব্যস্ত হইয়া, সে সেই ঘাটের উপরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর বালিকার নিকট যাইবার নিমিত্ত সেই পিচ্ছিল নিম্নগামী পথ দিয়া সে-ও দ্রুতবেগে নামিতে লাগিল। কিন্তু হায়! কথায় আছে,—'দেবি তুমি যাও কোথা? না, তাড়াতাড়ি যেথা।' তাড়াতাড়িতে যুবকেরও পদস্খলিত হইল, যুবকও পড়িয়া গেল; সেই পিচ্ছিল নিম্নগামী পথ দিয়া একেবারে সে জলে গিয়া পড়িল। কিনারার অতি অল্পদূরেই গভীর জল ছিল। ক্ষণকালের নিমিত্ত যুবক একেবারে ডুবিয়া গেল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে ভাসিয়া উঠিল। যদি সে সাঁতার না জানিত, তাহা হইলে, আজ এই স্থানে ঘোর বিপদ ঘটিত। তাহা হইলে, আমার এ পুস্তকও আর লেখা হইত না।

যাহা হউক, সামান্য একটু সন্তরণ দিয়া, যুবক পুনরায় কুলে আসিয়া উপনীত হইল। সে স্থানে আসিয়া অতি সাবধানে অতি ধীরে ধীরে, পায়ের নখ আর্দ্র মৃত্তিকার উপর প্রোথিত করিয়া, পুনরায় সে উঠিতে লাগিল। যে স্থানে বালিকা উপবেশন করিয়াছিল তাহার নিকটে আসিয়া সে-ও তাহার পার্শ্বে বসিয়া পড়িল।

যুবক যখন মাছ ধরিতেছিল, তখন কুসী তাহাকে দেখে নাই। তাহার পর বনে যখন শব্দ হইতে লাগিল, তখন সে মনে করিল যে, গরু-বাছুরে বুঝি এইরূপ শব্দ করিতেছে। ঘাটের উপর আসিয়া যুবক উপস্থিত হইলে, কুসী সেই দিকে চাহিয়া দেখিল। সেই নির্জন স্থানে অকস্মাৎ একজন মানুষ দেখিয়া তাহার অতিশয় ভয় হইল; পরক্ষণেই যখন সেই মানুষ উপবিষ্ট অবস্থায় দুই হাত দুই দিকে মাটিতে রাখিয়া হড়হড় শব্দে অতি দ্রুতবেগে জল অভিমুখে নামিতে লাগিল, তখন কুসী ঘোরতর বিস্মিত হইল। অবশেষে যখন সে জলে ডুবিয়া গেল, তখন তাহার ভয়ের আর সীমা রহিল না। লোক ডাকিবার নিমিত্ত সে চীৎকার করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই সে-মানুষ ভাসিয়া উঠিল। এ সমুদয় ঘটনা অতি অল্পকালের মধ্যেই ঘটিয়া গেল। একটি ঘটনার পর আর একটি ঘটনা এত সত্বর ঘটিয়া গেল যে, কোন্ অবস্থায় কি করা কর্তব্য, সে কথা ভাবিবার চিন্তিবার নিমিত্ত কুসী আর সময় পাইল না। সাঁতার দিয়া কুলে উপনীত হইয়াও যুবক সহজে উপরে উঠিতে পারে নাই। স্থানটি এমনি পিচ্ছিল ছিল, আর নিকটেই জল এত গভীর ছিল যে, দুই তিন বার চেষ্টা করিয়াও সে সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে নাই। নিকটে গিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে তুলিবার নিমিত্ত কুসী এই সময় উঠিয়া দাঁড়াইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু সে উঠিতে পারিল না। তাহার দক্ষিণ পায়ের গাঁটিতে অতিশয় বেদনা হইল। পড়িয়া গিয়া তাহার

পায়ে যে আঘাত লাগিয়াছে, পূর্বে সে জানিতে পারে নাই। উঠিতে গিয়া এখন সে তাহা জানিতে পারিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ – পায়ে বড় ব্যথা

যাহা হউক, অতি কষ্টে উপরে উঠিয়া যুবক বালিকার নিকট আসিয়া বসিল। ইহার পূর্বেই কুসীর ক্রন্দন থামিয়া গিয়াছিল। এখন আর বিপদের আশঙ্কা নাই। যেভাবে যুবকের পতন হইয়াছিল, কুসীর এখন তাহাই স্মরণ হইল। কুসীর গণ্ডদেশে কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত হইয়া ওষ্ঠদ্বয়ে ঈষৎ হাসির চিহ্ন উদিত হইল। যুবকও হাসিয়া ফেলিল।

তাহার পর যুবক বলিল,—'তুমিও তো পড়িয়া গিয়াছিলে! তুমি মনে করিয়াছ, তাহা আমি দেখি নাই। কিন্তু পুষ্করিণী ও-পারে বনের ভিতর বসিয়া আমি সব দেখিয়াছি। তোমাকে কি বড় লাগিয়াছে? তাই কি তুমি কাঁদিতেছিলে?'

কুসীর এখন লজ্জা হইল। লজ্জায় তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। ঘাড় হেঁট করিয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

যুবক পুনরায় বলিল,—আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তোমাকে কি বড় লাগিয়াছে? সেই জন্য কি তুমি কাঁদিতেছিলে?'

কুসী দেখিল যে, উত্তর না দিলে আর চলে না। আস্তে আস্তে সে বলিল,—'আমি সেজন্য কাঁদি নাই।'

যুবক জিজ্ঞাসা করিল,—'তবে কি জন্য কাঁদিতেছিলে?'

কুসী পুনরায় চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু যুবক ছাড়িবার পাত্র নহে। বার বার সে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল,—'তবে কেন তুমি কাঁদিতেছিলে?'

নিরূপায় হইয়া কুসী সেইরূপ মৃদুস্বরে উত্তর করিল,—'আমি জল লইতে আসিয়াছিলাম। আমার কলসী জলে পড়িয়া গিয়াছে। আমাদের বাড়ীতে আর কলসী নাই।'

যুবক বলিল,—'ওঃ! দুই পয়সার একটা মেটে কলসীর জন্য তুমি কাঁদিতেছিলে? তাহার জন্য আবার কান্না কি?'

কুসী উত্তর করিল,—'মাসী-মা আমাকে বকিবেন?'

যুবক উত্তর করিল,—'হঠাৎ তুমি পড়িয়া গিয়াছ; তাই কলসীও গিয়াছে, সেজন্য তিনি বকিবেন কেন।'

কুসীর ইচ্ছা নয় যে, সকল কথার উত্তর প্রদান করে। কিন্তু সে অপরিচিত যুবক কিছুতেই তাহাকে ছাড়ে না। বাড়ী পলাইবার নিমিত্ত, কুসীর এখন চেষ্টা হইল, কিন্তু তাহার পায়ে অতিশয় ব্যথা হইয়াছিল।

যুবক বলিল,—'তুমি বাড়ী পলাইবার জন্য ইচ্ছা করিতেছ। কিন্তু আমার সকল কথার উত্তর না দিলে কিছুতেই আমি পথ ছাড়িয়া দিব না। তুমি বলিলে তোমাদের বাড়ীতে আর কলসী নাই; পিত্তলের ঘড়া আছে?'

কুসী উত্তর করিল,—'না।'

যুবক জিজ্ঞাসা করিল,—'কখনও ছিল?'

কুসী উত্তর করিল,—'ছিল।'

যুবক জিজ্ঞাসা করিল,—'সে ঘড়া কি হইয়াছে? চোরে লইয়া গিয়াছে?'

কুসী বলিল, 'আমি বাড়ী যাই।'

যুবক দেখিল যে, বালিকা বিরক্ত হইতেছে। আর অধিক কথা সে জিজ্ঞাসা করিল না। সে বলিল,—'রও! তোমার কলসী আমি তুলিয়া দিতেছি।'

কুসী তাহাকে নিবারণ করিতে না করিতে, সে জলে ঝাঁপ দিল। ডুব দিয়া কলসী তুলিল, কিন্তু পূর্ণঘড়া গভীর জল হইতে উপরে তুলিতে না তুলিতে, দুই খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল।

তখন যুবক বলিল,—'ঐ যা! কলসীটি ভাঙ্গিয়া গেল। এবার কিন্তু আমার দোষ।'

পুনরায় অতি সাবধানে পদক্ষেপ করিয়া যুবক উপরে উঠিয়া কুসীর নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। বাটী প্রত্যাগমন করিবার নিমিত্ত কুসী এইবার দাঁড়াইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু সে দাঁড়াইতে পারিল না, একটু উঠিয়া পুনরায় বসিয়া পড়িল; তাহার পায়ে অতিশয় বেদনা হইল। কুসী কাঁদিতে লাগিল।

যুবক জিজ্ঞাসা করিল,—'তোমার পায়ে অতিশয় লাগিয়াছে?'

কুসী উত্তর করিল,—'আমি দাঁড়াইতে পারিতেছি না। উঠিতে গেলেই আমার পায়ের গাঁটিতে বড় লাগে। আমি কি করিয়া বাড়ী যাইব।'

যুবক বলিল,—'চল! আমি তোমার হাত ধরিয়া লইয়া যাই।'

কুসী বলিল,—'না। তুমি আমার বাড়ীতে যদি খবর দাও।'

যুবক জিজ্ঞাসা করিল,—'কোন্ বাড়ী? কাহার বাড়ী?'

কুসী উত্তর করিল,—'নিমাই হালদারের বাড়ী আমার মাসীকে বলিবে।'

সপ্তম পরিচ্ছেদ – বাঙ্গাল দেশের মানুষ

আর কোন কথা না বলিয়া, যুবক তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল; নিমাই হালদারের বাটী অনুসন্ধান করিয়া, কুসীর মাসীকে সে সংবাদ প্রদান করিল। মাসী আসিয়া কুসীকে কোলে লইয়া গৃহে গমন করিলেন।

শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিয়া কিছুক্ষণ পরে যুবক, পুনরায় নিমাই হালদারের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। হালদার মহাশয়ের কেবল একখানি মেটে ঘর ছিল। ঘরের ভিতর তক্তোপোষের উপর তিনি শয়ন করিয়াছিলেন। সেই ঘরের দাওয়া বা পিঁড়াতে একটি মাদুরের উপর পা ছড়াইয়া, দেওয়ালের গায়ে কাষ্ঠ পিঁড়া ঠেস দিয়া, কুসী তখন বসিয়াছিল। মাসী তাহার নিকটে বসিয়া পৈতা কাটিতেছিলেন।

মাসীকে যুবক জিজ্ঞাসা করিল,—'তোমাদের মেয়েটি বড় পড়িয়া গিয়াছিল। তাহাকে

কি অধিক আঘাত লাগিয়াছে।'

মাসী উত্তর করিলেন,—'কুসী দাঁড়াইতে পারিতেছে না। সে জন্য বোধ হয়, অধিক লাগিয়া থাকিবে। হালদার মহাশয় বড় পিট্‌পিটে লোক। তিনি বলেন যে, যে পুষ্করিণীতে অধিক লোক স্নান করে, গায়ের তেল-ময়লা সব ধুইয়া যায়, সে পুকুরের জল খাইতে নাই। তাই কুসী ঐ বাগানের পুষ্করিণী হইতে জল লইয়া আসে। কিন্তু যে ঘাট! ভাগ্যে মেয়ে আমার জলে পড়ে নাই। বোসো-না বাছা!'

এই বলিয়া মাসী একখানি তালপাতার চটি সরাইয়া দিলেন। যুবক সেই চটির উপর উপবেশন করিল।

মাসী পুনরায় বলিলেন,—'কুসী তোমার অনেক সুখ্যাতি করিতেছিল। তুমি তাহাকে তুলিতে গিয়া নিজে পড়িয়া গিয়াছিলে? তাহার পর ডুব দিয়া কলসী তুলিতে গিয়াছিলে? কলসীর জন্য কুসী কাঁদিতেছিল। কি করিব, বাছা! এখন আমাদের বড় অসময় পড়িয়াছে। কর্তা বিছানায় পড়িয়া আছেন। সংসার চলা আমাদের ভার হইয়াছে। দুই পয়সার কলসীর বটে, কিন্তু এখন আমাদের দুইটি পয়সা নয়, দুইটি মোহর। তুমি বুঝি রামপদদের বাড়ীতে আসিয়াছ?'

যুবক উত্তর করিল,—'হাঁ গো। আমি রামপদর বন্ধু। কলিকাতায় আমরা এক বাসায় থাকি, এক কলেজে পড়ি। এবার পূজার ছুটির সময় আমি বাড়ী যাই নাই। রামপদ আমাকে এ স্থানে ধরিয়া আনিয়াছে।'

মাসী বলিলেন,—'কলিকাতা হইতে রামপদর একজন বন্ধু আসিয়াছে তা শুনিয়াছি কিন্তু তোমাকে দেখি নাই। তোমাদের বাড়ী কোথায়?'

যুবক উত্তর করিল,—'আমাদের বাড়ী বাঙ্গালা দেশে। আমরা হ্যান ক্যান করিয়া কথা বলি। বাঙ্গালা কথা কখনও শুনিয়াছেন?

কুসী শুনেনি?

মেয়েটির নাম বুঝি কুসী?'

বাঙ্গাল কথার নাম শুনিয়া কুসী ইষৎ হাসিল, কিন্তু কোন উত্তর করিল না। মস্তক অবনত করিয়া সে পায়ের নখ খুঁটিতে লাগিল।

মাসী বলিলেন,—'হাঁ, বাছা! ছদিনের মেয়ে আমার হাতে দিয়া কুসীর মা চলিয়া গিয়াছে। আমি ইহাকে প্রতিপালন করিয়াছি। আমরাই ইহার নাম কুসুমকুমারী রাখিয়াছি। দুঃখের কথা বলিব কি, বাছা! ইহার বাপ বেশ দু-পয়সা রোজগার করে, কিন্তু মেয়ের খোঁজ-খবর কিছুই লয় না। এই এত বড় মেয়ে হইল, এখনও ইহার আমরা বিবাহ দিতে পারি নাই। একবার সাগরে গিয়া, আমি বাঙ্গাল দেশের মানুষ দেখিয়াছিলাম। কিন্তু তোমার কথা তো বাছা সেরূপ নয়! তোমার কথা খুব মিষ্ট, শুনিলে প্রাণ শীতল হয়। তোমার নাম কি বাছা?'

যুবক উত্তর করিল,—'আমার নাম হীরালাল। আমরা ব্রাহ্মণ, বাঁড়ুয্যে।'

এইরূপ কথাবার্তার পর হীরালাল চলিয়া গেল।

সে রাত্রিতে কুসীর অনেকক্ষণ পর্যন্ত কি নিদ্রা আসে নাই? হীরালালের মুখ বারবার তাহার মনে কি উদয় হইয়াছিল? হীরালাল কখন্ কি বলিয়াছিল তাহার এক একটি কথা কি তাহার মনে অঙ্কিত হইয়াছিল? আবার হীরালাল আসিবে কি না, আবার তাহার সহিত দেখা হইবে কি না,—এ কথা সে কি বার বার ভাবিয়াছিল? পাছে তাহার সহিত আর দেখা না হয়, সেই চিন্তা করিয়া তাহার চক্ষুর্দ্বয় কি ছল্‌ছল্ করিয়াছিল? হীরালাল ব্রাহ্মণ, বাঁড়ুয্যে। ইহা শুনিয়া কুসীর মনে কি কোনরূপ আশার সঞ্চার হইয়াছিল? আমি এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ – রামপদর ক্রোধ

এক প্রতিবাসীর পুত্রের নাম রামপদ। রামপদ কলিকাতায় থাকিয়া কলেজে বিদ্যা অধ্যয়ন করে। হীরালাল ও রামপদ এক বাসায় থাকে, এক কলেজে পড়ে; দুই জনে বড় ভাব। এবার পূজার ছুটিতে হীরালাল দেশে গমন করে নাই। অনেক অনুরোধ করিয়া, রামপদ তাহাকে আপনার বাটীতে আনিয়াছে।

কলিকাতায় সর্বদা আবদ্ধ থাকিতে হয়; সে জন্য পল্লীগ্রামে আসিয়া হীরালালের আর আনন্দের সীমা নাই। সকাল, সন্ধ্যা, সে মাঠে-ঘাটে ভ্রমণ করিত; এর বাড়ী, যাইত। আর যখন তখন পুট্‌লে ছিপগাছটি লইয়া, এ-পুকুর সে-পুকুর করিয়া বেড়াইত বড় মাছ ধরিবার নিমিত্ত ছিপ ফেলিয়া, তীর্থের কাকের ন্যায় একদৃষ্টে ফাতাপানে চাহিয়া থাকিবার ধৈর্য্য তাহার ছিল না।

সেইদিন সন্ধ্যাবেলা হীরালাল ও রামপদ পুস্তক হাতে লইয়া বসিল। 'অধ্যয়ন করিতেছি' এই কথা বলিয়া, মনকে প্রবোধ দিবার নিমিত্ত তাহারা পুস্তক হাতে লইয়াছিল, পড়িবার নিমিত্ত নহে; পুস্তক হাতে করিয়া গল্প-গুজব করিলে, বড় একটা দোষ হয় না। দুই জন্যেই কিন্তু সুবুদ্ধি বালক। বিদ্যালয়ে ইহাদের বিলক্ষণ সুখ্যাতি আছে। ছুটির সময় দিন-কত আলস্যে কাটাইলে বিশেষ কোন ক্ষতি হইবে না;—এইরূপ মনে করিয়া পড়াশুনা আপাততঃ তাহারা তুলিয়া রাখিয়াছে।

অন্যমনস্ক ভাবে পুস্তকখানির পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে হীরালাল বলিল,—'রামপদ! আজ ভাই আমি এক Adventure-য়ে (ঘটনায়) পড়িয়াছিলাম।'

রামপদ বলিল,—'এক প্রকাণ্ড বাঘ তোমাকে গ্রাস করিতে আসিয়াছিল? আর তুমি অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া তাহার পা ধরিয়া আছাড় মারিয়াছিলে?'

হীরালাল কিছু রাগতঃ হইয়া উত্তর করিল,—'তামাসার কথা নয়! বড়ই শোচনীয় অবস্থা। আহা! এরূপ সোনার প্রতিমা কতই না কষ্ট পাইতেছে। তাহার সেই মলিন মুখখানি মনে করিলে, আমার বুক ফাটিয়া যায়।'

রামপদ বলিল,—'বুঝিয়াছি কি হইয়াছে, তুমি ল'ভে (ভালবাসায়) পড়িয়াছ। তুমি

কুসীকে দেখিয়াছ। আমার অনুমান যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে তোমাকে দোষ দিই না। পথের লোকও কুসীর রূপে মোহিত হয়; শত্রুকেও মুগ্ধ হইয়া তাহার পানে চাহিয়া দেখিতে হয়। কেন যে এখনও কোনও বড়মানুষের ঘরে তাহার বিবাহ হয় নাই, তাহাই আশ্চর্য্য কথা। যদি এক গোত্র না হইত, তাহা হইলে আমি নিজেই কুসীকে বিবাহ করিতাম।'

হীরালাল উত্তর করিল,—'ল'ভে পড়ি আর না পড়ি, কিন্তু এরূপ লক্ষ্মীরূপিণী বালিকা যে অন্ন-বস্ত্রের কষ্ট পাইতেছে, তাহা শুনিলে বড় দুঃখ হয়। এই পাড়াগাঁয়ে, গরীবের ঘরে, এমন অদ্ভুত সুন্দরী কন্যা কি করিয়া জন্মগ্রহণ করিল, তাই আমি ভাবিতেছি।'

রামপদ বলিল,—

"Full many a gem of purest ray serene,
The dark unfathomed caves of occan dear;
Full many a flower is born to blush unseen,
And waste its sweetness in the desertair.

[কত শত মণি যার কিরণ উজ্জ্বল,
সিন্ধু মাঝে আছে যথা সলিল অতল।
কত শত ফুল ফুটে অরণ্য-ভিতর,
বৃথা নষ্ট হয় যার গন্ধ মনোহর।।]

কুসীকে তুমি কোথায় দেখিলে?'

হীরালাল যে স্থানে মাছ ধরিতে গিয়াছিল, সেই পুকুরে কুসী কিরূপে পড়িয়া গিয়াছিল, অবশেষে মাসীর সহিত কিরূপ কথাবার্তা হইয়াছিল, আদ্যোপান্ত সমুদয় কথা সে রামপদর নিকট বর্ণনা করিল।

তাহার পর হীরালাল বলিল,—'ইংরাজী পুস্তকে সেকালের নাইট (বীর) দিগের কথা অনেক পড়িয়াছি। কিরূপে কোন দুর্বৃত্ত দানব পরমাসুন্দরী কোন রাজকন্যাকে হরণ করিয়া দুর্গমধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিত, কিরূপে কোন্ বীর তুমুল যুদ্ধ করিয়া সেই দানবকে নিধন করিয়া রাজকন্যার উদ্ধারসাধন করিত, কিরূপ অশ্রুপূর্ণ নয়নে সেই যুবতী কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিত, সেই ঢুলু ঢুলু নয়নের কুটিল কটাক্ষে দিশাহারা হইয়া কিরূপে বীর আপনার মন-প্রাণ তাহার পায়ে সঁপিত, আজ সেই সকল কথা ক্রমাগত আমার মনে উদিত হইতেছে।'

রামপদ বলিল,—'দেখ হীরালাল! তাহারা গরীব, তাহারা পীড়িত, তাহারা বিপন্ন। তাহাদের কথা লইয়া এরূপ তামাসা-ফষ্টি করা তোমার উচিত নয়। তাহারা আমাদের প্রতিবাসী। আমরা ও গ্রামের সকলে তাহাদের রক্ষক।'

হীরালাল বলিল,—'তুমি রাগ কর, এমন কথা আমি কিছু বলি নাই। আমি প্রকৃতই তাহাদের দুঃখে নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছি। আমা দ্বারা তাহাদের যদি কোন সাহায্য হয়, তাহা করিতে আমি প্রস্তুত আছি।'

রামপদ উত্তর করিল,—'তাহারা তোমার নিকট বোধ হয় ভিক্ষা প্রার্থনা করে নাই।'

হীরালাল বলিল,—'তুমি এই বলিলে যে, কুসী তোমার সগোত্র, তবে তুমি রাগ কর কেন?'

রামপদ হাসিয়া উঠিল। রামপদ বলিল,—'হীরালাল! তোমার সহিত আমার কখনও ঝগড়া হয় নাই, আজও হইবে না।'

তাহার পর, কুসী, তাহার পিতা, মাসী ও মোসোমহাশয়ের সমুদয় পরিচয় রামপদ প্রদান করিল; আর তাহাদের বর্তমান অবস্থা কি, তাহাও সে হীরালালকে বলিল, তাহাদের অবস্থার কথা শুনিয়া, হীরালালের মনে আরও দুঃখ হইল।

নবম পরিচ্ছেদ – নানা প্রতিবন্ধকতা

আহারাদির পর শয্যায় শয়ন করিয়া অনেক রাত্রি পর্যন্ত হীরালাল কুসীকে চিন্তা করিতে লাগিল। অবশেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে মনে সে এই স্থির করিল যে, 'কুসীর সহিত আর আমি সাক্ষাৎ করিব না। সাক্ষাৎ করিয়া কোন ফল নাই; মনে অসুখ হইবে ব্যতীত আর সুখ হইবে না।'

পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া সে মাঠের দিকে বেড়াইতে গেল। মাঠে যাইলে কি হইবে মন তাহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিল। সেই মনে কুসীর মুখখানি চিত্রিত হইয়াছিল। মন হইতে সেই চিত্রখানি মুছিয়া ফেলিবার নিমিত্র হীরালাল বার বার চেষ্টা করিতে লাগিল। একেবারে মুছিয়া ফেলা দূরে থাকুক, অধিকক্ষণের নিমিত্ত সে তাহা আচ্ছাদিত অবস্থাও রাখিতে পারিল না। অন্য চিন্তা দ্বারা এক একবার সে সেই চিত্রখানিকে আবৃত করে, কিন্তু আবার একটু অনমনস্ক হয়, আর পুনরায় তাহা বাহির হইয়া পড়ে। হীরালালের তখন যেন চমক হয়, সে তখন আপনাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলে,—'দূর ছাই! আবার তাহাকে ভাবিতেছি!'

মাঠ হইতে বাটী প্রত্যাগমনের দুইটি পথ ছিল; একটি কুসীর বাটীর সম্মুখ হইয়া, অপরটি অন্য দিক দিয়া। ভুলক্রমে অবশ্য, হীরালাল প্রথম পথটি অনুসরণ করিল। ভুলক্রমে যখন এই পথে আসিয়া পড়িয়াছি, তখন কুসী আজ কেমন আছে না দেখিয়া যাওয়াটাও ভাল হয় না। সেই কথা জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত ভুলক্রমে মেসোমহাশয়ের বাটীতে সে গমন করিল।

পূর্বদিন অপেক্ষা কুসীর বেদনা অধিক হইয়াছিল। সেজন্য মাসীকে হীরালাল বলিল,— কুসীর পায়ে একটু ঔষধ দিতে হইবে, ও-বেলা আমি ঔষধ আনিয়া দিব।' এ কথাটাও কি সে ভুলক্রমে বলিয়াছিল?

হীরালাল যে ডাক্তারখানা হইতে মূল্য দিয়া ঔষধ আনিবে, মাসী তাহা বুঝিতে পারেন নাই। সে জন্য তিনি কোনও আপত্তি করিলেন না। আজ মেসোমহাশয়ের সহিতও হীরালালের আলাপ হইল। ঘরের ভিতর গিয়া তাঁহার তক্তপোষের এক পার্শ্বে বসিয়া হীরালাল অনেকক্ষণ গল্প-গাছা করিল। মেসোমহাশয় কুসীর ও কুসীর পিতার কথা অনেক

বলিলেন। তাহার বাড়ী কোথায়, তাহারা কোন্ গাঁই, কাহার সন্তান স্বভাব কি ভঙ্গ, সে সকল পরিচয়ও হীরালালকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন। মেসোমহাশয়ের নিজের পীড়ার কথাও অনেক হইল।

অপরাহ্নে হীরালাল যথারীতি আর একগাছি ছিপ লইয়া রামপদদিগের ঘর হইতে বাহির হইল। কিন্তু সে দিন সে মাছ ধরিতে যাইল না। লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া একটি মাঠ পার হইয়া নিকটস্থ একটি গ্রাম অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। সেই গ্রামে ডাক্তারখানা ছিল। সেই গ্রামে উপস্থিত হইয়া ডাক্তারের সহিত পরামর্শ করিয়া, সে কুসীর জন্য কিছু ঔষধ ক্রয় করিল। যাহাতে শরীরে বল হয় ও রাত্রিতে নিদ্রা হয়, মেসোমহাশয়ের নিমিত্ত কিছু ঔষধ লইল। কুসীর ঔষধ শিশিতে ও মেসোমহাশয়ের ঔষধ কৌটাতে ছিল। ভুল হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। পথে আসিতে আসিতে সে দুইটি ঔষধ হইতেই ডাক্তারখানার কাগজ তুলিয়া ফেলিল; কুসীদের বাটীতে আসিয়া সে ঔষধ দুইটি মাসীকে প্রদান করিল। পায়ে কিরূপে ঔষধ লাগাইতে হয়, তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে অনেক বিলম্ব হয়; সেই জন্য তাহা বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত কুসীর নিকট হীরালালকে অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে হইল। কুসীর নিকট হীরালাল বসিয়া কেবল যে ঔষধের কথা বলিল, তাহা নহে, বঙ্গদেশের কথা, কলিকাতার কথা, নানাপ্রকার গল্প হইল। পূর্বদিন অপেক্ষা আজ কুসী কিছু ভয়-ভাঙ্গা হইয়াছিল বটে, কিন্তু লজ্জায় সর্বদাই তাহাকে মুখ অবনত করিয়া থাকিতে হইয়াছিল। মাঝে মাঝে কেবল দুই একটি কথার উত্তর দিতে সমর্থ হইয়াছিল। হীরালাল চলিয়া গেলে কুসী মনে মনে ভাবিল,—'ইহাকে দেখিলেই আমার এত লজ্জা হয় কেন? অন্য লোককে দেখিলে তো এত লজ্জা হয় না!'

সেই রাত্রিতে গৃহিণীকে সম্বোধন করিয়া মেসোমহাশয় বলিলেন,—'ছোকরা বড় ভাল। বড়ঘরের ছেলে। অমনি একটি ছেলের হাতে কুসীকে দিয়া মরিতে পারিতাম। কিন্তু তাহার পরিচয় লইয়া বুঝিতে পারিলাম যে, সে আশা বৃথা। ইহারা বঙ্গদেশের বড় কুলীন; আমাদের ঘরে ইহারা বিবাহ করিবে না।'

সেই দিন সন্ধ্যাবেলা হীরালাল বলিল,—'রামপদ! কুসীদের অবস্থা আমি যতই ভাবিতেছি, ততই আমার মনে দুঃখ হইতেছে। কুসীর মেসোমহাশয় অধিক দিন বোধ হয়, আর বাঁচিবেন না; তখন ইহাদের দশা কি হইবে?'

রামপদ উত্তর করিল,—'তুমি দুই দিনের জন্য এখানে আসিয়াছ, ইহাদের কথায় তোমার থাকিবার আবশ্যক কি? তুমি যদি না আসিতে, তাহা হইলে কি হইত? পাড়া-প্রতিবাসী আমরা পাঁচজনে আছি, আমরা অবশ্য দেখিতাম।'

হীরালাল বলিল,—'তবে এখন দেখ না কেন? সে দিন দুপয়সার একটি মেটে কলসীর জন্য সে কাঁদিতে লাগিল। নিতান্ত অভাব না হইলে দুই পয়সার কলসীর জন্য কেহ কাঁদে না!'

রামপদ বলিল,—'তাহাদের প্রতি যদি তোমার এতই দয়া হইয়াছে, তাহা হইলে

তাহাদের দুঃখ নিবারণ কর না কেন? কুসী ব্রাহ্মণের মেয়ে, মনে করলেই তুমি তাহাকে বিবাহ করিতে পার। তুমি বড় মানুষের ছেলে, তোমাদের অর্থের অভাব নাই; তুমি কুসীকে বিবাহ করিলেই তাহাদের দুঃখমোচন হয়।'

হীরালাল উত্তর করিল,—'মনে করিলেই আমি সে কাজ করিতে পারি না। অনেক প্রতিবন্ধক আছে।'

রামপদ জিজ্ঞাসা করিল,—'প্রতিবন্ধক কি, তা শুনিতে পাই না?'

হীরালাল উত্তর করিল,—'আমি স্বভাবকুলীন, কুসীকে বিবাহ করিলে আমার কুল ভাঙ্গিয়া যাইবে।'

রামপদ বলিল,—'লেখা-পড়া শিখিয়া তোমার বিদ্যা বড় মন্দ হয় নাই! এক কর্ম কর,—পাঁচ শত বিবাহ কর, নম্বর-ওয়ারি পত্নীদিগের খাতা কর, এ শ্বশুরবাড়ী হইতে সে শ্বশুরবাড়ী গস্ত করিয়া বেড়াও; দুই তিন বৎসর অন্তর এক এক শ্বশুরবাড়ী গিয়া দেখ যে, চমৎকার খোকা-খুকী দ্বারা তোমার স্ত্রীর কোল আলোকিত হইয়া আছে।'

হীরালাল উত্তর করিল,—'কুলীনগিরির কথা ছাড়িয়া দিলাম। আমি স্বকৃতভঙ্গ হইলেও চারি পুরুষ পর্যন্ত বংশের সম্মান থাকিবে; ততদিন কুলীনগিরি উঠিয়া যাইবে। কিন্তু বিশেষ প্রতিবন্ধক এই যে, আমার পিতামাতা বর্তমান। পিতার অমতে একাজ কি করিয়া করি? তাহার পর দেশে এক ব্যক্তির কন্যার সহিত বিবাহ দিবেন বলিয়া, শিশুকাল হইতে পিতা আমার সম্বন্ধ স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। সে ব্যক্তির এই এক কন্যা ব্যতীত অন্য সন্তান-সন্ততি নাই। তাঁহার সমুদয় বিষয় আমি পাইব।'

রামপদ উত্তর করিল,—'সম্পত্তির কথা বড় ধরিনা। কিন্তু তোমার পিতার অমতে এরূপ কাজ তুমি কি করিয়া করিবে, তাহাই ভাবিতেছি।'

হীরালাল বলিল,—'তাহা করিলে পিতা আর আমার মুখদর্শন করিবেন না।'

রামপদ বলিল,—'তুমি কলিকাতা চলিয়া যাও; আর তুমি এস্থানে থাকিও না।'

দশম পরিচ্ছেদ – তোমার কি মত

হীরালাল সত্বর কলিকাতা চলিয়া যাইবে, ইহাই স্থির হইল। পরদিন প্রাতঃকালে কুসীকে একবার দেখিতে যাইল। মেসোমহাশয়ের বাটীতে গমন করিয়া তাঁহার নিকট ও মাসীর নিকট সে বিদায় গ্রহণ করিল। তাহার পর, কি সূত্রে সে কুসীর নিকট সে বিদায় গ্রহণ করিবে, তাহাই সে ভাবিতে লাগিল।

হীরালাল যখন তাহাদের বাটীতে আসিল, তখন কুসী পিঁড়াতে মাদুরে বসিয়া পৈতা কাটিতেছিল। দূর হইতে হীরালালকে দেখিয়া সে কাটনার ডালাটি আপনার পশ্চাতে লুক্কায়িত করিল ও তাহার পর ভাল মানুষের মত পুনরায় দেয়ালে ঠেস দিয়া বসিল। হীরালাল কিন্তু ডালা দেখিতে পাইয়াছিল। কুসী এখনও চলিতে ফিরিতে পারে না। হীরালাল তাহার নিকট গিয়া বলিল,—'তোমার পায়ের ব্যথা কমে নাই? তুমি বোধ হয়,

ভাল করিয়া ঔষধ দাও না। কই! তোমার পা দেখি!'

যদি বা পা একটু খোলা ছিল, তা হীরালালের এই কথা শুনিবামাত্র সমুদয় পা-টুকু কুসী ভাল করিয়া কাপড় দিয়া ঢাকিয়া ফেলিল।

হীরালাল হাসিয়া বলিল,—'বা! বেশ! আমি পা দেখিতে চাহিলাম, তুমি আরও ভাল করিয়া ঢাকিয়া ফেলিলে! তোমার যে পায়ে আঘাত লাগিয়াছে, সেই পা একবার আমি দেখিব, তাহাতে দোষ কি আছে?'

মাসীও,—কুসীকে বকিতে লাগিলেন। মাসী বলিলেন,—'একবার পা-টা দেখাইতে দোষ কি আছে? মেয়ের সকল তাতেই লজ্জা!'

হীরালাল কুসীর নিকটে বসিয়া পড়িল। হীরালাল বলিল,—যদি তুমি আপনি আপনি দেখাও তো ভাল, তা না হইলে এখনি তোমার পা আমি টানিয়া বাহির করিব। তখন বেদনায় তুমি কাঁদিয়া ফেলিবে।'

নিরুপায় হইয়া কুসী পা একটু বাহির করিল; কিন্তু হীরালাল যাই পা টিপিয়া দেখিবার উপক্রম করিল, আর কুসী তাড়াতাড়ি পুনরায় ঢাকিয়া ফেলিল। হীরালাল ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—'ভয় নাই! তোমার পা আমি খাইয়া ফেলিব না। একটু হাত দিয়া দেখি, কোথায় অধিক ব্যথা, তাহা হইলে বুঝিতে পারিব।'

পুনরায় পা বাহির করিতে কুসী কিছুতেই সম্মত হইল না। মাসী বকিতে লাগিলেন। হীরালাল বুঝাইতে লাগিল। অনেক সাধ্যসাধনার পর অগত্যা পুনরায় সে পায়ের তলভাগ একটু বাহির করিল। যে যে স্থান স্ফীত হইয়াছিল ও যে যে স্থানে বেদনা ছিল, হীরালাল টিপিয়া টিপিয়া দেখিলে লাগিল।

পা পরীক্ষা করিতে করিতে হীরালাল অতি মৃদুস্বরে বলিল,—'কুসী কাল আমি কলিকাতা চলিয়া যাইব।'

হীরালাল যাই একথা বলিল, আর তৎক্ষণাৎ কুসী আপনার পা সরাইয়া লইল। যে পা আজ কয়দিন সে অতি ভয়ে-ভয়ে অতি ধীরে ধীরে নাড়িতে-চাড়িতেছিল, এখন ব্যথা, বেদনা, ক্লেশ সব বিস্মৃত হইয়া, সেই পা অতি সত্বর সরাইয়া লইল। কিন্তু এরূপ করিয়া তাহার যে বেদনা হয় নাই তাহা নহে, কারণ, সেই মুহূর্তেই ক্লেশের চিহ্ন তাহার মুখমণ্ডলে প্রতীয়মান হইল।

হীরালালের হৃদয়-তন্ত্রী সেই মুহূর্তে বাজিয়া উঠিল। কেন কুসী হঠাৎ আপনার পা সরাইয়া লইল, হীরালাল তাহা বুঝিতে পারিল। কুসী ঈষৎ রাগ করিল; তাহাতেই পৃথিবী অন্ধকার দেখিল। হীরালাল বুঝিল যে, নিয়তি তাকে এই স্থানে টানিয়া আনিয়াছে।—কুসী বিনা সংসার বৃথা! জীবন বৃথা! কুলমর্যাদা? ধনসম্পত্তি? কুসীর তুলনায় সে সমুদয় কি ছার বস্তু! আবশ্যক হইলে সে কুসীর নিমিত্ত প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন করিতে পারে। কুসী অভাবে প্রাণে প্রয়োজন কি? তোমরা হীরালালকে দোষ দিও না। এ নূতন কথা নহে, চিরকাল এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে; এখনও ঘটিতেছে। অসংখ্য নরনারী এই সংসারক্ষেত্রে নিয়তই

বিচরণ করিতেছে। স্ত্রী-পুরুষ সম্বন্ধে কিছুদিন ইহলোকে আবদ্ধ থাকিয়া, কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। তাহাতে বিশেষত্ব কিছুই নাই। কিন্তু প্রকৃত যে যাহার পুরুষ, প্রকত যে যাহার প্রকৃতি, যখন এইরূপ দুই জনে সহসা চারি চক্ষু হইয়া যায়, তখনই পুরুষ-প্রকৃতির অর্থ মানুষের উপলব্ধি হয়। সেই দুই জনে বুঝিতে পারে যে, তাহারা দুই নহে, তাহারা এক;—এক মন, এক প্রাণ, কেবল দেহ ভিন্ন। তাহারা বুঝিতে পারে যে, এক নিয়তিসূত্রে বিধাতা দুইজনকে একত্রে বন্ধন করিয়াছেন। সে বন্ধন কে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে? হীরালাল তাহা বুঝিতে পারিল; কুসী তাহা বুঝিতে পারিল না; কিন্তু অনুভব করিল। অবলম্বিত তরুকে সহসা কাড়িয়া লইলে লতার যে গতি হয়, কুসীর প্রাণের আজ সেই অবস্থা হইল। জগতে আর যেন তাহার কেহই নাই,—সেইরূপ নিঃসহায় ভাব দ্বারা কুসীর মন আচ্ছন্ন হইল; লতার ন্যায় ভূতলে পড়িয়া, কুসীর প্রাণ যেন ধূলায় ধূসরিত হইতে লাগিল। যাহাতে কান্না না আসিয়া যায়, মস্তক অবনত করিয়া কুসী সেই চেষ্টা করিতে লাগিল।

হীরালাল বলিল,—'আমি কলিকাতা যাইব শুনিয়া, তুমি আমার উপর রাগ করিলে?'

কোন উত্তর নাই।

হীরালাল পুনরায় বলিল,—'কুসী! বল না, কি হইয়াছে? চুপ করিয়া রহিলে কেন?

কোন উত্তর নাই। মস্তক আরও অবনত হইল।

হীরালাল পুনরায় বলিল,—'আমি কলিকাতা যাই, তাহা তোমার ইচ্ছা নহে?'

কোন উত্তর নাই।

হীরালাল পুনরায় বলিল,—'কেবল 'হাঁ' কি 'না' এই দুইটি কথার একটি কথা বল। আমি কলিকাতায় যাইব কি না যাইব? হাঁ কি না?'

কোন উত্তর নাই।

হীরালাল পুনরায় বলিল,—'আমি সত্য বলিতেছি, তুমি যাহা বলিবে, তাহাই আমি করিব। তুমি যদি কলিকাতায় যাইতে বল, তাহা হইলে আমি যাইব; তুমি যদি যাইতে মানা কর, তাহা হইলে আমি যাইব না। আচ্ছা! কথা কহিয়া বলিতে হইবে না; তুমি ঘাড় নাড়িয়া বল,—আমি কি করিব? আমি যাইব কি যাইব না?'

যতদূর সাধ্য, ততদূর মস্তক অবনত করিয়া, কুসী এইবার ঈষৎ ঘাড় নাড়িল।

হীরালাল বলিল,—'তবে আমি যাইব না?'

আরও একটু স্পষ্টভাবে কুসী ঘাড় নাড়িল।

কিন্তু হীরালাল যেন বুঝিয়াও বুঝিল না। হীরালাল বলিল,—'তোমার ঘাড় নাড়া আমি ভালরূপ বুঝিতে পারিতেছি না। এইবার তুমি কথা কহিয়া বল।'

কুসী অতি মৃদুস্বরে বলিল,—'না।'

হীরালাল বলিল,—'তা বেশ! যতদিন আমার ছুটি থাকিবে ততদিন আমি কলিকাতা যাইব না। এখন আমার দিকে চাহিয়া দেখ।'

যদি বা কুসী মুখখানি অল্প তুলিয়াছিল, কিন্তু হীরালাল যাই বলিল,—'আমার দিকে

চাহিয়া দেখ'—আর সেই মুহূর্তেই পুনরায় তাহা অবনত হইয়া গেল।

হীরালাল বলিল,—'আমার দিকে যদি তুমি চাহিয়া না দেখ, তাহা হইলে কিন্তু আমি কলিকাতায় চলিয়া যাইব।'

একাদশ পরিচ্ছেদ – সংসারের কথা

চাহিয়া দেখিবে কি, কুসীর চক্ষু তখন জলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু হীরালাল কলিকাতা যাইবার ভয় দেখাইল। সেজন্য অগত্যা তাঁহাকে মুখ তুলিতে হইল। আঁচলে চক্ষু দুইটি মুছিয়া, ঈষৎ হাসিমুখে হীরালালের দিকে সে চাহিয়া দেখিল। কালো মেঘ দ্বারা কতক আচ্ছাদিত,—সূর্যকিরণ দ্বারা কতক আলোকিত,—আকাশ যেরূপ দেখায়, কুসীর মুখখানি তখন সেইরূপ দেখাইতে লাগিল।

হীরালাল বলিল,—'আজ কয়দিন দেখিতেছি, তোমার বাম গালে একটু কালি লাগিয়াছে। যখন তোমার হাসি হাসি মুখ হয়, তখন ঠিক ঐ স্থানটিতে টোল পড়ে। তাহাতে বড় সুন্দর দেখায়; সেইজন্য ঐ কালো দাগটি আমি ধুইয়া ফেলিতে বলি নাই।'

আরও একটু সহাস্যবদনে কুসী বলিল,—'যাও! তুমি যেন আর জান না! তুমি আমাকে ক্ষেপাইতেছ। ও কালির দাগ নয়, উহাকে তিল, না জরুর, না কি বলে।

হীরালাল বলিল,—'বটে! তবে ছুরি দিয়া চাঁচিয়া ফেলিলেই চলিবে।'

কুসী বলিল,—যাও!'

হীরালাল বলিল,—'কুসী! তামাসার কথা নহে। আমি তোমাকে দুই কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমাদের সংসারের কথা! —আমাকে পর ভাবিও না। ঠিক ঠিক উত্তর দাও।'

মৃদুস্বরে কুসী জিজ্ঞাসা করিল,—'কি কথা?'

হীরালাল বলিল,—'তোমার মেসোমহাশয়ের যে রোগ হইয়াছে, তাকে পক্ষাঘাত বলে। ভাল হইয়া আর যে তিনি কাজকর্ম করিতে পারিবেন, তাহা বোধ হয় না। এমন কি, অধিক দিন তিনি না বাঁচিলেও বাঁচিতে পারেন। তাঁহার অবর্তমানে তোমাদের সংসার চলিবে কি করিয়া, তাহাই আমি ভাবিতেছি।'

হীরালাল যে তাহাকে বিবাহ করিবে, কুসীর মনে সে চিন্তা একেবারেই উদিত হয় নাই। নাটক-নভেলের 'লভ' কাহাকে বলে, ভালোবাসা কাহাকে বলে, সে সব কথা কুসী কিছু জানে না। হীরালাল কলিকাতা চলিয়া যাইবে, তাহা শুনিয়া তাহার মনে দুঃখ হইল; পৃথিবী সে শূন্য দেখিল, তাহাই সে জানে। কোন বিষয় গোপন করিতে সে শিক্ষা করে নাই; সেজন্য তাহার মনের ভাব মুখে প্রকাশ হইয়া পড়িল, সেজন্য সে তাহাকে কলিকাতা যাইতে মানা করিল।

হীরালাল যখন সংসারের কথা জিজ্ঞাস করিল, কুসী তাহার কিছুই উত্তর করিতে পারিল না। সে কেবল বলিল,—'আমি জানি না।'

হীরালাল জিজ্ঞাসা করিল,—'এখন তোমাদের সংসার কি করিয়া চলিতেছে?'

কুসী উত্তর করিল,—'মেসোমহাশয়ের কিছু জমি আছে। তিনি ধান পাইয়াছিলেন। তাহাতেই এখন চলিতেছে।'

হীরালাল জিজ্ঞাসা করিল,—'সে ধানে বারো মাস চলে?'

কুসী বলিল,—'সে কথা আমি বলিব না। ঘরের কথা বলিতে নাই।'

হীরালাল বলিল,—'তবে তুমি আমাকে পর ভাব! এ তোমার বড় অন্যায়। আমার দিব্যি! তোমাকে বলিতেই হইবে। আমি বৃথা এ সব কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি না। বিশেষ কারণ আছে, সেইজন্য জিজ্ঞাসা করিতেছি।'

নিরুপায় হইয়া কুসীকে সকল কথা বলিতে হইল। লজ্জায় আধোবদন হইয়া সে বলিল,—'বারো মাস চলে না। আর অল্পই ধান আছে। পৌষ মাসের এ দিকে পুনরায় আর আমরা ধান পাইব না। সেজন্য যাহাতে পৌষ মাস পর্যন্ত চলে, আমরা তাহাই করিতেছি।'

হীরালাল জিজ্ঞাসা করিল,—'সে আবার কি?'

কুসী পুনরায় চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু হীরালাল কিছুতেই ছাড়িল না।

তখন ছলছল চক্ষে কুসী বলিল,—'মাসী-মা এখন একবেলা আহার করেন। সেইরূপ করিতে আমিও চাহিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি কিছুতেই শুনিলেন না। তাঁহাকে লুকাইয়া যতদূর পারি, ততদূর আমিও অল্প আহার করিতেছি।'

হীরালাল বলিল,—'সর্বনাশ! কুসী! তুমি আধপেটা খাইয়া থাক?'

কুসী উত্তর করিল,—'না, তা নয়। আমি অধিক করিয়া তরকারি খাই।'

হীরালাল জিজ্ঞাসা করিল,—মাছ-তরকারির পয়সা কোথা হইতে হয়?'

কুসী উত্তর করিল,—'মাছ আমরা কিনি না। তরকারি আমাদের কিনিতে হয় না। পাড়ায় যাহার বাড়ীতে যাহা হয়, আমাদিগকে সকলে তাহা দিয়া যায়। তারপর সজিনা শাক আছে, কল্‌মি শাক আছে, ডুমুর আছে, থোড় আছে, পাড়িয়া কি তুলিয়া কি কাটিয়া আনিলেই হয়। অধিক করিয়া সেই সব খাইলে আর ক্ষুধা পায় না।'

হীরালাল জিজ্ঞাসা করিলে,—'তেল নুন কি করিয়া হয়?'

কাটনার ডালার দিকে দৃষ্টি করিয়া, কুসী উত্তর করিল,—'মাসী-মা ও আমি দুজনেই পৈতা কাটি। আমি একদিনে একটা পৈতা কাটিতে পারি। তাহা এক পয়সায় বিক্রীত হয়। মাসী-মা চক্ষে ভাল দেখিতে পান না। দুই দিনে তিনি একটা পৈতা কাটিতে পারেন। রাত্রিতে সূতা কাটিলে আমি আরও অধিক পৈতা কাটিতে পারি। কিন্তু তাহাতে তেল খরচ হয়।'

এইসব কথা শুনিয়া হীরালালের মনে বড় কষ্ট হইল। কুসীর দুঃখে হীরালালের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। আর কোন কথা না বলিয়া, হীরালাল তখন সে স্থান হইতে উঠিল; দ্রুতবেগে রামপদর নিকট গমন করিল। যে পথ দিয়া হীরালাল চলিয়া গেল, কুসী বিরস-বদনে একদৃষ্টে সেইদিকে চাহিয়া রহিল। কুসী ভাবিল,—'এমন কি কথা বলিয়াছি যে, ইনি রাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। আমরা বড় দুঃখী, সেইজন্য কি ইনি চলিয়া গেলেন? আর

কখনও কি আসিবেন না।' এইরূপ ভাবিয়া কুসী দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

বড় ঘরের নিকট সামান্য একটি রান্নাচালা ছিল। কুসীর মাসী তাহার ভিতর রন্ধন করিতেছিলেন। তিনি গোপনভাবে হীরালাল ও কুসীর ভাব-ভক্তি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। কিন্তু তাহাদের কথাবার্তা তিনি শুনিতে পান নাই। হীরালাল চলিয়া যাইলে, তিনি বড় ঘরে প্রবেশ করিয়া হাসিতে হাসিতে স্বামীকে বলিলেন,—'বিধাতা বা আপনি কুসীর বর আনিয়া দিলেন।'

তাঁহার স্বামী বলিলেন,—'তুমি পাগল না কি!'

গৃহিণী বলিলেন,—'দেখিতে পাইবে!'

এই বলিয়া পুনরায় তিনি রান্নাচালায় প্রতিগমন করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ – The Die is cast

বাটী গিয়া হীরালাল বলিল,—'রামপদ! The Die is cast (পাশা ফেলিয়াছি;—অর্থাৎ এ কাজ করিব বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছি)।

রামপদ জিজ্ঞাসা করিল,—'কি হইয়াছে?'

হীরালাল উত্তর করিল,—'কুসীর মুখে আজ তাহাদের সংসারের কথা যাহা শুনিলাম, তাহাতে আমার মন বড়ই অস্থির হইয়াছে। আমি তাহাকে নিশ্চয় বিবাহ করিব।

রামপদ বলিল,—'তোমার পিতা?'

হীরালাল উত্তর করিল,—'আমার কপালে যাহা থাকে, তাহাই হইবে। পিতা অতিশয় রাগ করিবেন, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। তিনি যেরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক, তাহাতে চাই কি আমাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিলেও দিতে পারেন; আমাকে ত্যাজ্য পুত্র করিলেও করিতে পারেন। কিন্তু সে ভয় করিয়া আমি কাপুরুষ হইতে পারি না। আজ আমি যাহা শুনিলাম, তাহা শুনিয়া যদি আমি চুপ করিয়া থাকি, যদি যথাসাধ্য তাহার প্রতীকার করিতে চেষ্টা না করি, তাহা হইলে আমা অপেক্ষা নরাধাম আর পৃথিবীতে নাই। এখন তুমি সহায়তা কর।'

রামপদ জিজ্ঞাসা করিল,—'এ বিষয়ে আমি তোমার কি সহায়তা করিতে পারি।'

হীরালাল উত্তর করিল,—'তুমি কুসীর মেসোমহাশয়ের নিকট গমন কর। তাঁহাকে এ বিষয়ে সম্মত কর। তাঁহার নিকট কোন কথা গোপন করিবে না। আমি যে পিতার বিনা অনুমতিতে এ কাজ করিতেছি, তাঁহাকে সে কথা বলিবে। পিতার অনুমতি প্রার্থনা করিতে গেলে, এ কাজ যে কিছুতেই হইবে না, তাহাও তাঁহাকে বলিবে। এই কাজের জন্য আমার পিতা যে আমাকে বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিতে পারেন, তাহাও তাঁহাকে বলিবে। কারণ, যদি তাঁহাদের মনে টাকা কি গহনার লোভ থাকে, আর কার্য্যে যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে পরে তাঁহারা আমার উপর দোষারোপ করিতে পারেন। সেজন্য কোন কথা তাঁহাদিগের নিকট গোপন করিবে না। আর একটা কথা, এই বিবাহ কার্য্য আপাততঃ

গোপনে সম্পন্ন করিতে হইবে, দুই বৎসর কাল এ কথা গোপন রাখিতে হইবে। তাহার পরে যাহা হয় হইবে।'

রামপদ জিজ্ঞাসা করিল,—'যদি সত্য সত্যই তোমার পিতা তোমাকে বাটী হইতে দূর করেন, তাহা হইলে তুমি কি করিবে? নিজের বা কি করিবে, আর ইহাদের বা কি উপকার করিতে পারিবে?'

হীরালাল উত্তর করিল,—'সেইজন্য বিবাহ গোপন করিতে চাহিতেছি, সেইজন্য এ কথা আপাততঃ গোপন রাখিতে ইচ্ছা করিতেছি। শুন রামপদ! আমি মনে মনে এই স্থির করিয়াছি;—কলিকাতার খরচের নিমিত্ত পিতা আমাকে মাসে মাসে টাকা প্রদান করেন, তাহা হইতে আমি কিছু কিছু বাঁচাইতে পারিব। আপাততঃ সেই টাকা আমি মেসোমহাশয়কে দিব। চাকরী করিয়া কুসীর মেসোমহাশয় যে বেতন পাইতেন, তাহা অপেক্ষা আমি অধিক দিতে পারিব। সুতরাং এ পল্লীগ্রামে তাহাদের আর অন্ন-বস্ত্রের কষ্ট থাকিবে না। তাহার পর, বড়দিনের ছুটির সময় আমি দেশে গিয়া, মাতার নিকট হইতে কিছু টাকা লইয়া আসিব। কুসীর মেসোমহাশয়ের ভালরূপ চিকিৎসা হয় নাই। এ রোগে চিকিৎসা হইলেও যে বিশেষ কিছু ফল হইবে, তাহা বোধ হয় না। তবু, তাঁহাকে কলিকাতা লইয়া গিয়া একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব। সেই সময় কলিকাতাতেই আমি গোপনে কুসীকে বিবাহ করিব। কেবল তুমি ও আর দুই চারিজন আমাদের বন্ধু সে কথা জানিবে, আর কাহাকেও জানিতে দিব না। আমার বোধ হয় যে, পরবৎসর আমি বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিব। যদি বি-এল পরীক্ষায় আমি উত্তীর্ণ হইতে পারি, তাহা হইলে পরীক্ষার পরেই পিতার নিকট গিয়া সকল কথা প্রকাশ করিব। পিতা যদি ক্ষমা করেন তো ভালই; কিন্তু যদি রাগ করিয়া তিনি আমার খরচপত্র বন্ধ করিয়া দেন, তাহা হইলে ওকালতী করিয়া হউক, অথবা কেরাণীগিরি করিয়া হউক, কুসীকে আমি প্রতিপালন করিতে পারিব। সুবিধার বিষয় এই যে, ইহার ভিতর পিতা আমাকে বিবাহ করিতে বলিবেন না। আমি বি-এল, কি এম-এ, পাশ করিলে, তবে তিনি আমার বিবাহ দিবেন; এই কথা স্থির হইয়াছে।'

রামপদর সহিত হীরালালের এইরূপ অনেক কথা হইল, দুইজনে অনেক পরামর্শ করিল।

সেইদিন সন্ধ্যাবেলা কুসীর মেসোমহাশয়ের নিকট গমন করিল। পিতার অমতে হীরালাল এই কাজ করিবে, সেজন্য মেসোমহাশয় প্রথম এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। কিন্তু রামপদ তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিল যে, সম্মতি প্রার্থনা করিতে গেলে হীরালালের পিতা কিছুতেই সম্মতি দান করিবেন না। তাঁহার এই পীড়িত অবস্থা, তাঁহার অর্থ নাই, কুসীর পিতার ব্যবহার, এইরূপ নানা বিষয় রামপদ মেসোমহাশয়কে বুঝাইয়া বলিল। মাসী-মাও হীরালালের পক্ষ হইয়া স্বামীকে বুঝাইতে লাগিলেন। অবশেষে অগত্যা কুসীর মেসোমহাশয় এ কাজ করিতে সম্মত হইলেন।

মেসোমহাশয় বলিলেন,—'আমি নিশ্চয় বুঝিতেছি যে, এরূপ কাজ করা আমার উচিত

নয়। কিন্তু উপায় নাই। কুসীর পিতাকে আমি কত যে চিঠি লিখিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। আমার একখানি পত্রেরও সে উত্তর দিল না। সে একেবারে বে-হেড হইয়া গিয়াছে। পরমা সুন্দরী মেয়ে, আমার অবর্তমানে তাহার কি হইবে—তাহাই ভাবনা। কোন একটি ভদ্রলোকের ছেলের হাতে তাহাকে সমর্পণ করিয়া যাইতে পারিলে, আমি নিশ্চন্ত হই; সেইজন্য আমি সম্মত হইলাম। যদি ইহাতে কোন পাপ থাকে, ভগবান্ আমাকে ক্ষমা করিবেন।'

হীরালালের সহিত কুসীর বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইল। কিন্তু এক রামপদ ভিন্ন এ কথা আর কেহ জানিতে পারিল না।

এ বিষয়ে আর অধিক কিছু বলিবার নাই। যতদিন কুসীর পায়ে বেদনা ছিল, ততদিন হীরালাল আসিয়া তাহার নিকট বসিয়া গল্প করিত। বেদনা ভাল হইয়া গেলে পাছে হীরালাল আর না আসে, পাছে সেরূপ কথাবার্তা আর না হয়, সেজন্য কুসীর পা সুস্থ হইতে কি কিছু বিলম্ব হইয়াছিল? অবশেষে তাহার পা যখন একান্তই ভাল হইয়া গেল, তখন কুসী কি পায়ের উপর রাগ করে নাই? কি জানি! পরের কথায় আমার আবশ্যক কি! আর একটি কথা, ইহার মধ্যে হীরালালের সহিত কুসীর কি একবারও বিবাদ হয় নাই? একবার কেন? প্রায় প্রতিদিনই বিবাদ হইত। কিরূপে পায়ে ঔষধ দিতে হইবে তাহা লইয়া বিবাদ হইত। হীরালাল দুই বেলা কুসীর কাটনা ডালা ভাঙ্গিয়া দিতে যাইত, তাহা লইয়া বিবাদ হইত। হীরালাল নিজে পৈতা-সূতা কাটিতে গিয়া কুসীর টেকো আড়া করিয়া দিত; তাহা লইয়া ঝগড়া হইত। এইরূপ নানা কারণে দুইজনে বিবাদ হইত। কুসী বড় দুষ্ট! বিবাদের পর প্রায় এক মিনিট কাল সে হীরালালের সহিত কথা কহিত না, মুখ হাঁড়ি করিয়া থাকিত। হীরালাল সেজন্য মাসীর নিকট নালিশ করিত। মাসী বলিতেন,—'যা বাছা! তোদের ও শিয়াল-কুকুরের ঝগড়া!' সেই কথা শুনিয়া কাজেই কুসীর মুখে হাসির উদয় হইত, কাজেই তাহাকে পুনরায় কথা কহিতে হইত। হায়! সে এক সুখের দিন গিয়াছে!

হীরালালের ছুটি ফুরাইল, পরদিন হীরালাল কলিকাতা যাইবে। সেদিন কতবার হীরালাল কুসীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে গিয়াছিল। বিদায় গ্রহণ আর ফুরায় না। ভাগ্যে নিমাই হালদারের বাড়ী গ্রামের প্রান্তভাগে ছিল। তা না হইলে, পাড়ার লোকে কি মনে করিত, কে জানে!

এই সকল বিদায় গ্রহণের সময়, একবার হীরালাল জিজ্ঞাসা করিল,—'কুসী! তুমি লিখিতে-পড়িতে পার?'

কুসী উত্তর করিল,—'রামপদ ও গ্রামের অন্যান্য লোক মেয়েদের একটি স্কুল করিয়াছে। ছেলেবেলায় সেই স্কুলে আমি পড়িতে যাইতাম। আমার মাসীও লেখাপড়া জানেন। তাহার নিকট আমি রামায়ণ ও মহাভারত পড়িতে শিখিয়াছিলাম।

হীরালাল বলিল,—'আমি তোমার নিকট খানকত খাম দিয়া যাইব। তাহার উপর

আমার নাম ও কলিকাতার ঠিকানা লেখা থাকিবে। মাঝে মাঝে আমি তোমাকে পত্র দিব। তোমার মেসোমহাশয় কেমন থাকেন, তুমি আমাকে লিখিবে।' মেসোমহাশয় কেমন কেবল তাহাই জানিবার নিমিত্ত হীরালালের বাসনা। কুসীর চিটিতে যে আর কোন কথা লেখা থাকে, তাহা তাহার বাসনা নয়। না, মোটে নয়,—'একেবারেই নয়! হীরালাল! পৃথিবীর লোক কি সব বোকা!

পরদিন হীরালাল ও রামপদ কলিকাতা যাত্রা করিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ – শুভ সংবাদ বা মন্দ সংবাদ

কলিকাতা প্রত্যাগমন করিয়া হীরালাল কলেজে অধ্যয়ন করিতে লাগিল। পিতা তাহাকে যে খরচ দিতেন, তাহা হইতে কিছু টাকা বাঁচাইয়া মেসোমহাশয়ের নিকট সে পাঠাইত। মেসোমহাশয়ের সংসারে অন্নকষ্ট দূর হইল।

বড়দিনের ছুটির সময় হীরালাল দেশে গমন করিল। হীরালালের আর দুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিল। কিন্তু মাতা,—'কনিষ্ঠ পুত্র হীরালালকেই অধিক ভালবাসতেন। সে যখন যাহা চাহিত, তাহাকে তিনি দিতেন। মাতার নিকট হইতে কিছু টাকা লইয়া হীরালাল কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিল। কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া মেসোমহাশয়কে সে স্থানে আনিবার নিমিত্ত রামপদকে তাহাদিগের গ্রামে প্রেরণ করিল। স্ত্রী ও কুসীকে লইয়া অল্পদিন পরে তিনি কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হীরালাল তাঁহাদের জন্য একটি বাটী ভাড়া করিয়াছিল। তাঁহারা সেই বাটীতে রহিলেন।

বড় বড় ডাক্তার আনিয়া, হীরালাল মেসোমহাশয়কে দেখাইল। কিছুদিন ডাক্তারি চিকিৎসা চলিল; কিন্তু তাহাতে বিশেষ কিছু উপকার হইল না। অবশেষে তাঁহার কবিরাজী চিকিৎসা হইতে লাগিল।

পৌষ-মাস মেসোমহাশয় কলিকাতা আসিয়াছিলেন। মাঘ মাসে হীরালালের সহিত কুসীর বিবাহ কার্য সম্পন্ন হইল। মেসোমহাশয় পীড়িত; সেজন্য কুসীর মাসি কন্যা সম্প্রদান করিলেন। বিবাহ অতি গোপনে হইল। কলিকাতার ঠিকা পুরোহিত, ঠিকা নাপিত, রামপদ ও হীরালালের তিন চারি জন বন্ধু, কলিকাতার জনকত সধবা ব্রাহ্মণী,—'বিবাহ কালে কেবল এই কয়জন উপস্থিত ছিলেন। মেসোমশাহয়ের গ্রামের লোক, অথবা তাঁহারা কি হীরালালের আত্মীয়-স্বজন কেহই এ কথা জানিতে পারিল না। দুই বৎসর কাল এ কথা গোপন রাখিতে হইবে, তাহাই তখন স্থির হইল। বিবাহের কিছুদিন পরে মেসোমহাশয় কুসীকে লইয়া স্বগ্রামে প্রত্যাগমন করিলেন।

পরবৎসর পূজার পূর্বে হীরালাল শুনিল যে, তাড়িৎ-চিকিৎসায় পক্ষাঘাত রোগের বিশেষ উপকার হয়। সেজন্যও বটে, আর কুসীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে বলিয়াও বটে, রামপদ দ্বারা পুনরায় সে মেসোমহাশয়কে কলিকাতায় আনয়ন করিল। কুসীর সহিত হীরালালের যে বিবাহ হইয়াছিল, রামপদ ভিন্ন গ্রামের অন্য কেহ সে কথা জানিত না।

সর্বদা যাতায়াত করিলে প্রতিবাসীদিগের মনে পাছে কোনরূপ সন্দেহ জন্মে, সেজন্য হীরালাল নিজে আর সে গ্রামে বড় যাইত না। সংসার খরচ ও কলকাতা-গমনের ব্যয় সম্বন্ধে কুসীর মাসী সকলকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার ভগিনীপতি, অর্থাৎ কুসীর পিতা, পুনরায় টাকা পাঠাইতে আরম্ভ করিয়াছেন।

মেসোমহাশয় সপরিবারে কলিকাতা আগমন করিলেন। হীরালালের উদ্যোগে তাঁহার তাড়িৎ-চিকিৎসা হইতে লাগিল। ক্রমে পূজার সময় উপস্থিত হইল। কলিকাতার বিদ্যালয়সমূহ পূজার ছুটিতে বন্ধ হইল। সেই অবকাশে কুসীকে লইয়া হীরালাল কাশী বেড়াইতে গেল। মাসী ও মেসোমহাশয় কলিকাতায় রহিলেন।

হীরালালের অনেক দেশের লোক কাশী-বাসী হইয়া আছে। পাছে তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ হয়, পাছে তাহারা হীরালালের বাসায় আসিয়া কুসীকে দেখিতে পায়, সেই ভয়ে সে কাশীর বাহিরে একটি বাগানের ভিতর নিভৃতে বাস করিতেছিল। কিন্তু সন্ধ্যার পর কুসীকে লইয়া সে নানাস্থানে বেড়াইতে যাইত। সেইজন্য কুসী কাশীর পথ-ঘাট চিনিতে সমর্থ হইয়াছিল।

স্ত্রীলোক সঙ্গে লইয়া একাকী বিদেশে যাইতেছে, চোর-ডাকাত মন্দলোকের ভয় আছে, সেজন্য কোন বন্ধুর নিকট হইতে হীরালাল একটি পাঁচনলি পিস্তল চাহিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু পিস্তলের পাস তাহার নিকট ছিল না। কাশীতে গিয়া সে কথা তাহার স্মরণ হইল। যে বাগানে সে বাস করিতেছিল, সে স্থানে পিস্তল ছুঁড়িলে পাছে পুলিসের লোক আসিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করে, সে নিমিত্ত একদিন প্রাতঃকালে সে দূরে মাঠের মাঝে গিয়ে নির্জন স্থানে বসিয়া পিস্তলটি পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছিল। পিস্তলের ব্যবহার হীরালাল ভালরূপে জানিত না। অসাবধানবশতঃ সহসা একবার আওয়াজ হইয়া, তাহার স্কন্ধদেশে গুলি প্রবেশ করিল। বয়োঃক্রমসুলভ সাহস ও চপলতাবশতঃ নিজেই ছুরি দিয়া তাহার স্কন্ধের মাংস কাটিয়া সে গুলিটি বাহির করিয়াছিল। তাহার পর চাদরখানি ছিঁড়িয়া সেই ক্ষতস্তানের উপর বাঁধিয়া, বাসায় প্রত্যাগমন করিয়াছিল। সেই ক্ষতস্থান হইতে অতিশয় রক্তস্রাব হয়। বলা বাহুল্য যে, হীরালাল কাশীর সেই "বাবু" ব্যতীত আর কেহ নহে! পিস্তলের গুলির দ্বারা সে আহত হইয়াছে। তাহা শুনিয়া কুসীর পাছে অতিশয় ভয় হয়, পাছে কান্নাকাটি করে, সেজন্য এ ঘটনার প্রকৃত বিবরণ কুসীকে প্রদান করে নাই।

পূজার ছুটির পর হীরালাল কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিল। তড়িৎ-চিকিৎসায় মেসোমহাশয়ের প্রথম প্রথম কিছু উপকার হইয়াছিল বটে কিন্তু সে উপকার চিরস্থায়ী হইল না। আরোগ্যলাভ সম্বন্ধে হতাশ হইয়া, মেসোমহাশয়, স্ত্রী ও কুসীকে লইয়া স্বগ্রামে প্রত্যাগমন করিলেন।

হীরালাল যখন কাশী গিয়াছিল, সেই সময় দেশে এক বড় শোচনীয় ঘটনা ঘটিয়াছিল। পূজার ছুটির সময় রামপদ গ্রামে গিয়াছিল। ছুটির শেষ ভাগে রামপদ ম্যালেরিয়া জ্বর দ্বারা আক্রান্ত হইয়া, চারিদিনের জ্বরে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া

হীরালাল সেই শোকসংবাদ শুনিয়া, নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িল। রামপদ উচ্চভাবাপন্ন পরোপকারী সত্যনিষ্ঠ যুবক ছিল। দেশের দূরদৃষ্ট যে, এরূপ যুবক অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইল!

ক্রমে শীতকাল উপস্থিত হইল। অগ্রহায়ণ মাসে আর একটি বিপদ ঘটিল। একদিন রাত্রিকালে কিরূপ এক প্রকার শব্দ হইয়া, মেসোমহাশয়ের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্য সম্পন্ন হইতেছিল। সেই শব্দে তাঁহার গৃহিণীর ও কুসীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। দুইজনে উঠিয়া দেখিলেন যে, মেসোমহাশয়ের জ্ঞান নাই, মুখে কথা নাই। তাহার পরদিন তাঁহার মৃত্যু হইল। সকলেই জানিত যে, তিনি আর অধিক দিন জীবিত থাকিবেন না। তাহার পর, শেষ অবস্থায় তাঁহার বাঁচিয়া থাকা এক প্রকার বিড়ম্বনা হইয়াছিল। সে তাঁহার মৃত্যুজনিত শোক পূর্ব হইতেই আত্মীয়-স্বজনের একপ্রকার সহ্য হইয়াছিল। এখন কুসীর অভিভাবক বল, সহায় বল, সম্পত্তি বল, এক হীরালাল ব্যতীত জগতে আর কেহ রহিল না।

চর্তুদশ পরিচ্ছেদ – ঘোরতর অপমান

মেসোমহাশয়ের মৃত্যুর অল্পদিন পরেই বি-এল পরীক্ষার সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। কুসীর অবস্থা স্মরণ করিয়া, হীরালাল রাত্রিদিন পরিশ্রম করিয়াছিল। বি-এল পরীক্ষায় সে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইল। এম-এ পরীক্ষা সে দিয়াছিল কি না তাহা আমি জানি না, বলিতে পারি না।

বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, হীরালাল তৎক্ষণাৎ দেশে গমন করিতে পারে নাই। বৈশাখ মাসে সে দেশে গমন করিল। দেশ হইতে কুসীকে যে দুইখানি পত্র সে লিখিয়াছিল, তাহা আমি দেখিয়াছি। কুসী ও হীরালাল, এই দুইজনের মধ্যে যেরূপ পবিত্র প্রণয়, তাহাতে সে পত্র সাধারণের পাঠোপযোগী নহে। এরূপ অবস্থায় বাক্য দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করিতে না পারিয়া, হৃদয়ের আবেগে মানুষ কত কি যে বলিয়া ফেলে তাহা পাঠ করিলে লেখককে পাগল বলিয়া সন্দেহ হয়। হীরালালকে সাধারণের নিকট হাস্যাস্পদ করা আমার অভিপ্রায় নহে। সে নিমিত্ত দুইখানি চিঠির কেবল সারাংশ এ স্থানে প্রদান করিলাম।

প্রথম চিঠিখানির সারাংশ এইরূপ,—

প্রাণাধিকা কুসী!

আমি নিরাপদে বাটী পৌঁছিয়াছি। আমাকে দেখিয়া পিতা, মাতা, ভ্রাতা সকলেই সাতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন। পিতার নিকট এখনও আমাদের গোপন কথা বলিতে সাহস করি নাই। এত আনন্দে পাছে নিরানন্দ হয়, এত আদরে পাছে আমার অনাদর হয়, সেই ভয়ে আমি যেন কাপুরুষের মত হইয়া আছি। কিন্তু শীঘ্রই আমাকে সে কথা বলিতে হইবে। কারণ, ইহার মধ্যেই পূর্বসম্বন্ধ অনুসারে আমার বিবাহের কথা দুই একবার উত্থাপিত হইয়াছিল। দুই একদিনের মধ্যে সাহসে ভর করিয়া পিতার নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত প্রকাশ

করিব; তাহার পর, কপালে যাহা আছে, তাহাই হইবে। পিতা আমার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক; সেইজন্য আমার বড় ভয় হইতেছে।"

চারি পাঁচ দিন পরে কুসী দ্বিতীয় পত্রখানি পাইল। তাহার মর্ম এইরূপ

'প্রাণাধিকা কুসী!'

ঘোর বিপদ! আমি আজ পনর মাস ধরিয়া যে ভয় করিতেছিলাম, তাহাই ঘটিয়াছে। তোমার সহিত আমার বিবাহের কথা পিতার নিকট প্রকাশ করিলাম। ক্রোধে পিতা কাঁপিতে লাগিলেন। তাহার পর তিনি বলিলেন,—'তোর আর মুখদর্শন করিব না। এই মুহূর্তে তুই আমার বাড়ী হইতে দূর হইয়া যা।' আমি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। মনে করিলাম যে, একটু রাগ পড়িলে তিনি আমাকে ক্ষমা করিবেন। কিন্তু কুসী! কি ঘৃণার কথা! আমাকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিবার নিমিত্ত তিনি দ্বারবানদিগকে আজ্ঞা করিলেন!'

'এরূপ অপমানিত আমি জন্মে কখনও হই নাই। শিশুকাল হইতে আমি আদরে লালিত-পালিত হইয়াছিলাম। দ্বারবান আমাকে গলা ধাক্কা দিয়া বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিবে! ছি, ছি, কি ঘৃণার কথা!

'যাই হউক কুসী, ভয় করিও না। তোমার জন্য আমি এরূপ অপমানিত হইলাম, সেজন্য মনে তুমি দুঃখ করিও না।

'পিতা আমার মুখ দেখিবেন না? বেশ! আমিও তাঁহাকে আমাব মুখ দেখাইতে ইচ্ছা করি না। আমি তাঁহার বাড়ীতে আর যাইব না। তাঁহার টাকা, তাঁহার সম্পত্তি—আমি আর কিছুই চাই না। লজ্জায় ঘৃণায় ক্রোধে আমি আত্মহত্যা করিব বলিয়া, মনে করিয়াছিলাম। আমি মনে করিলাম যে, যেমন তিনি আমাকে অপমান করিয়েছেন, তেমন আমি তাঁহাকে পুত্রশোকে কাতর করিব। অপমানের জ্বালায় আমি এত জ্ঞানশূন্য পাগলের মত হইয়াছিলাম যে, আমার নিশ্চয় বোধ হয়, আমি এ কাজ করিয়া ফেলিতাম। কিন্তু কুসী! তিমিরাবৃত আকাশে যেরূপ চাঁদের উদয় হয় আমারও অন্ধকারময় মনে সেই সময় তোমার চাঁদ মুখখানি উদয় হইল। সেই মধুমাখা মুখখানি স্মরণ করিয়া, আমার মন হইতে সকল দুঃখ দূর হইল।

'যাহা হউক, কুসী! তুমি ভয় করিও না। আমি যদি মানুষ হই, আমার নাম যদি হীরালাল হয়, তাহা হইলে দেখিও, আমি অর্থ উপার্জন করিতে পারি কি না। সেজন্য, কুসী, তুমি কিছুমাত্র ভয় করিও না। তবে আপাততঃ তোমাকে বসনে-ভূষণে সুসজ্জিত করিতে পারিলাম না, তাহাই আমার দুঃখ।

'আমি একজন প্রতিবাসীর বাটীতে আছি। অদ্য সন্ধ্যাবেলা সেই স্থানে গোপনে মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিব। তাঁহার নিকট হইতে বিদায় হইয়া, কল্যাই কলিকাতা রওনা হইব। দুই চারিদিনের মধ্যে তোমার সাক্ষাৎ হইলে সমুদয় বৃত্তান্ত আরও ভাল করিয়া তোমাকে বলিব।'

দুই চারিদিন অতীত হইয়া গেল, আট দিন অতিবাহিত হইল, দশ দিন অতিবাহিত

হইল, হীরালাল কুসীর সহিত সাক্ষাৎ করিল না। হীরালাল আর কোন চিঠিপত্র লিখল না। হীরালালের কোন সংবাদ নাই। কুসী ও তাহার মাসী-মা বড়ই উদ্বিগ্ন হইলেন। দিনের পর দিন যতই যাইতে লাগিল। কুসী যে কোনও সন্ধান লইবে, তাহার উপায় ছিল না। কাহাকে সে পত্র লিখিবে? পাছে কুসীর পত্র কাহারও হাতে পড়ে, সে জন্য হীরালাল তাহাকে দেশের ঠিকানাসম্বলিত খাম দিয়া যায় নাই। হীরালালের বাড়ী কোথায়, কুসী তাহা জানিত না। মাসীও জানিতেন না। জানিত কেবল রামপদ, আর জানিতেন মেসোমহাশয়। তাঁহারা জীবিত নাই। তাহার পর হীরালালের ঠিকানা জানিলেও কুসী কি করিয়া পত্র লিখিবে! সে নিজের বাড়ীতে নাই। তাহার পিতা তাহার উপর খড়্গহস্ত হইয়াছেন। বিবাহের সময় হীরালালের যে দুই চারজন বন্ধু উপস্থিত ছিল, তাহাদের নাম-ধাম কুসী কিছুই জানে না। হীরালালের সন্ধান করিবার কোন উপায় ছিল না। পনর দিন এইভাবে কাটিয়া গেল। দুর্ভাবনার আর সীমা পরিসীমা রহিল না।

ষোল দিনের দিন, কুসী দূর হইতে ডাক-পেয়াদাকে দেখিতে পাইল। কুসীর আর আনন্দের সীমা রহিল না। ডাকহরকরা তাহাদের বাড়ী পর্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হয়, সে বিলম্ব কুসীর সহ্য হইল না। দৌড়িয়া আগে গিয়া তাহার নিকট হইতে পত্র চাহিয়া লইল। একখানি ছাপা কাগজ ডাকে আসিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের উপর যে শিরোনামা লেখা ছিল, তাহা দেখিয়া কুসীর মুখখানি মলিন হইল। দুইখানিই তাহার মাসীর নামে আসিয়াছিল। শিরোনামা হীরালালের হস্তাক্ষরে লিখিত হয় নাই। অজানিত অপরিচিত হস্তাক্ষরে মাসীকে কে পত্র লিখিল, কাগজ ও চিঠিখানি হাতে লইয়া কুসী তাহাই ভাবিতে লাগিল। চিঠিখানির সহিত আর একখানি ক্ষুদ্র হরিদ্রাবর্ণের কাগজ সংলগ্ন ছিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ – রেজিষ্টারি চিঠি

ডাকহরকরা বলিল,—'একখানি রেজিষ্টারি চিঠি, বাড়ী চল, রসিদে সহি করিয়া দিবে। তোমার মাসীর চিঠি।'

চিঠি ও কাগজখানি হাতে লইয়া, বিরসবদনে কুসী গৃহ অভিমুখে চলিতে লাগিল। ডাকহরকরা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিল। গৃহে আসিয়া কুসী ঘরের ভিতর হইতে দোয়াত-কলম বাহির করিয়া দিল। মাসী রসিদে স্বাক্ষর করিলেন। ডাকহরকরা মোহর দেখিয়া লইতে বলিল। মোহর ঠিক ছিল। চিঠি দিয়া ডাকহরকরা চলিয়া গেল।

চিঠিখানির চারিদিকে সূতা দিয়া বাঁধা ছিল, খামের বিপরীত দিকে সেই সূতোর সহিত জড়িত গালার মোহর ছিল। দাঁত দিয়া কুসী সূতা ছিন্ন করিয়া চিঠিখানি মাসীর হাতে দিল। ছাপা কাগজখানি সে আপনি খুলিতে খুলিতে বলিল,—'এ দেখিতেছি খবরের কাগজ। তোমার নামে আবার খবরের কাগজ কে পাঠাইল?'

মাসীও সেই সময়ে চিঠিখানি খুলিলেন। চিঠির সঙ্গে অনেকগুলি নোটও বাহির হইয়া পড়িল। পত্রখানি দীর্ঘ ছিল না। কিন্তু বয়সের গুণে মাসীর দৃষ্টিশক্তির হ্রাস হইয়াছিল।

পড়িতে তাহার বিলম্ব হইল।

খবরের কাগজখানি খুলিয়া কুসী দেখিল যে, তাহার একপার্শ্বে লাল রেখার দ্বারা কে চিহ্নিত করিয়াছে; প্রথমেই কুসী সেই অংশ পাঠ করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরেই অতি কাতর স্বরে কুসী বলিয়া উঠিল,—'এ কি মাসি! এ কি সর্বনাশ!'

এই কথা বলিয়া সে মাসীর দিকে দৃষ্টি করিল। সে দেখিল যে, পত্রখানি মাসীর হাতে আছে বটে, কিন্তু তিনি তাহা পড়িতেছেন না। মাসীর হাত থর-থর করিয়া কাঁপিতেছে।

মাসীর হাত হইতে কুসী চিঠিখানি কাড়িয়া লইল। নিমেষের মধ্যে তাহার চক্ষু পত্রের উপর হইতে নীচে পর্যন্ত ভ্রমণ করিল। পরক্ষণেই কুসী মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল।

প্রতিবাসীদিগের নিকট এখন আর কোন কথা গোপন করিবার আবশ্যকতা ছিল না। কিন্তু গত পনর মাস ধরিয়া কুসীর বিবাহের কথা মাসী সকলের নিকট গোপন করিতে ছিলেন। এ কথা গোপন করা তাঁহার একপ্রকার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। সেই অভ্যাসবশতঃ তিনি চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিলেন না। কোনরূপ গোল করিলেন না। তাঁহার নিজেরও মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হইয়াছিল। কিন্তু বিশেষরূপ চেষ্টা করিয়া, তিনি আপনার মন সংযত করিলেন। তাঁহার চক্ষেও সেই সময় জল আসিয়া গেল, সেই জলের সহায়তায় তিনি কথঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধরিতে সমর্থ হইলেন। মূর্চ্ছিতা কুসীকে কোলে লইয়া তিনি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন; তক্তোপোষের উপর সেই অবসন্ন দেহ শয়ন করাইলেন। তাহার পর, পুনরায় বাহিরে আসিয়া চিঠি, নোট ও খবরের কাগজ লইয়া গেলেন। ঘরের ভিতরে একটি ভাঙ্গা বাক্সের ভিতর সাবধানে সেগুলি রাখিয়া দিলেন।

চিঠিপত্র রাখিয়া মাসী কুসীর নিকট আসিয়া উপবেশন করিলেন। কুসীর মুখে জল দিয়া তাহার শিয়রে বসিয়া নীরবে তাহাকে বাতাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার চক্ষু হইতে ক্রমাগত বারিধারা বিগলিত হইতে লাগিল। কথা কহিবার তাঁহার শক্তি ছিল না।

কিছুক্ষণ পরে কুসী একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিল। কিন্তু সে পাগলের দৃষ্টি, সহজ দৃষ্টি নহে। কি ঘটনা ঘটিয়াছে, কেন সে বিছানায় শুইয়া আছে, মাসী কেন কাঁদিতেছেন, কুসী যেন কিছুই জানে না। একদৃষ্টিতে একদিক্ পানে সে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া, সকল কথা তাহার যেন স্মরণ হইল। যা তাহার স্মরণ হইল, আর,—'মাসী! এ কি হইল!'—এই কথা বলিয়া সে পুনরায় মূর্চ্ছিত হইল।

ক্ষণকালের নিমিত্ত জ্ঞান ও পরক্ষণেই অজ্ঞান, এইরূপ অবস্থা কুসীর বার বার হইতে লাগিল। তাহার নিকট বসিয়া নীরবে মাসী কাঁদিতে লাগিলেন ও তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যার পূর্বে ডাকহরকরা চিঠি দিয়া গিয়াছিল। ক্রমে সন্ধ্যা হইল, ক্রমে রাত্রি হইল। রাত্রি যখন প্রায় দশটা, তখন কুসীর ভালরূপে একবার জ্ঞানের উদয় হইল। কুসী বলিল,—'মাসী।

সে চিঠি আর সে কাগজ একবার দেখি!'

নীরবে বাক্স হইতে চিঠি ও কাগজ আনিয়া তিনি কুসীর হাতে দিলেন। তক্তোপোষের নিকট প্রদীপটি সরাইয়া দিলেন। কুসীর চক্ষুতে জলের লেশমাত্র নাই। ধীরভাবে বিশেষরূপে মনোযোগের সহিত কুসী পত্রখানি প্রথম আদ্যোপ্রান্ত পাঠ করিল। তাঁহার পর খবরের কাগজের লাল চিহ্নিত স্থানটিও সেইরূপ ধীরভাবে পাঠ করা যেই সমাপ্ত হইল, আর কুসীর হাত কাঁপিতে লাগিল। তাহার হাত হইতে কাগজ দুইখানি পড়িয়া গেল। অবশেষে প্রবল বেগে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, কুসী পুনরায় মূর্চ্ছিত হইল।

সে চিঠি ও সংবাদপত্র আমি দেখিয়াছি। চিঠিখানিতে এইরূপ লেখা ছিল—

'প্রণাম পুরঃসর নিবেদন—

'হীরালালবাবু আমার পরম বন্ধু ছিলেন। গত ১৯শে বৈশাখ রাত্রিকালে পদ্মা নদীতে নৌকাডুবি হইয়া, তিনি মারা পড়িয়াছেন। সেজন্য আমি যে কি পর্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না' বিধাতার লিখন, কে খণ্ডাইতে পারে?

'আপনার নিকট পাঠাইবার নিমিত্ত, দেশ হইতে হীরালালবাবু আমার নিকট দুইশত টাকা প্রেরণ করিয়াছিলেন। কার্যে ব্যস্ত থাকা প্রযুক্ত এতদিন আমি পাঠাইতে পারি নাই। এক্ষণে সেই টাকা আপনার নিকট পাঠাইলাম।

'হীরালালবাবুর নব-বিবাহিতা পত্নীর জন্য আমি বড়ই কাতর হইয়াছি। তাঁহাকে আপনি বিশেষ সাবধানে রাখিবেন। অধিক আর কি লিখিব। ইতি—লোচন ঘোষ।'

লোচন ঘোষ কে, তাহা মাসীও জানিতেন না। লোচন ঘোষের নাম পর্যন্ত মাসী কখনও শ্রবণ করেন নাই। চিঠিতে তাহার ঠিকানা ছিল না।

খবরের কাগজে সংবাদটি এইরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল;—

'পদ্মা নদীতে সম্প্রতি এক বিষম দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। সেদিন হরিহরপুর হইতে একখানি নৌকা গোয়ালন্দ অভিমুখে আসিতেছিল। দাঁড়ি-মাঝি ব্যতীত নৌকাতে অনেকগুলি আরোহী ছিল। সন্ধ্যার পর হঠাৎ ঝড় উঠিয়া নৌকাখানি জলমগ্ন হইল। দুইজন মাঝি ব্যতীত নৌকার সমস্ত লোক জলমগ্ন হইয়া মারা পড়িয়াছে। আমরা শুনিয়া আরও দুঃখিত হইলাম যে, মজিদপুরের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু বিধূভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র হীরালালবাবু এই নৌকাতে ছিলেন। হীরালালবাবু বাটীতে রাগ করিয়া কলিকাতা আসিতেছিলেন। সে নিমিত্ত তিনি এরূপ নৌকাতে আরোহন করিয়াছিলেন। হীরালালবাবু গত বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার অকাল-মৃত্যুতে আমরা নিতান্ত দুঃখিত হইলাম।'

পূর্বেই বলিয়াছি যে, এই সমুদয় পূর্ব-বিবরণ কুসীর মাসী আমাকে যে ভাবে বলিয়াছিলেন, আমি এ স্থানে সে ভাবে বলি নাই। আমি আমার নিজের কথায় তাহা বর্ণনা করিলাম। কুসুমের মাসী এই সমুদয় পূর্ব কথা অতি সংক্ষেপে বলিয়াছিলেন। এই সমুদয় কথা বলিতে অতি অল্প সময়ই লাগিয়াছিল। পরে অন্য লোকের নিকট হইতে আমি যে সমুদয় তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাও এই মাসীর বিবরণের ভিতর যথাস্থানে সন্নিবেশিত

করিয়াছি। সে জন্য আমার বিবরণ কিছু বিস্তারিত হইয়াছে।

কুসুমের মাসী এই পর্যন্ত পূর্ব-পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, এমন সময় রসময়বাবু দূর হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তোমাদের কথা এখনও শেষ হয় নাই? এদিকে যে অনেক কাজ পড়িয়া আছে!' তাহার উত্তরে, মাসী অল্প উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—'যাই!'

তাহার পর আমাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন, 'রায় মহাশয় এদিকে আসিতেছে। দোহাই তোমার! প্রকাশ করিও না। আমার মুখে চুণ-কালি দিও না। আর সকল কথা পরে বলিব।'

রসময়বাবু নিকটে আসিয়া শালীকে বিবাহ সম্বন্ধে কোন একটা দ্রব্যের কথা বলিলেন। কুসুমের মাসী তৎক্ষণাৎ সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

তাহার পর রসময়বাবু আমাকে বলিলেন,—'কুসুমের কি রোগ হইয়াছে, তহা কি কিছু বুঝিতে পারিলেন? এখন একটু যেন ভাল আছে বলিয়া বোধ হয়। আমার স্ত্রীর অনেক সাধ্য সাধনায় এখন একটু দুধ পান করিয়াছে।'

আমি উত্তর করিলাম,—'কতকটা বুঝিয়াছি; তাহাকে একটু ঔষধ দিতে হইবে। একটা শিশি দিতে পারেন?'এই কথা বলিয়া আমি বাহিরে গমন করিলাম। রসময়বাবুও একটা শিশি লইয়া বাহিরে আসিলেন।

আমার ব্যাগ হইতে ঔষধ বাহির করিয়া, তাহা প্রস্তুত করিতে করিতে আমি ভাবিলাম,—'তবে এ বিধবা বিবাহ! বাবু জীবিত নাই। যাহাদের কন্যা, তাহারা বুঝিবে। আমার কথায় কাজ কি? কিন্তু বাবুর জন্য আমার বড় দুঃখ হইল। তাহার সেই হাসি মুখখানি আমার মনে পড়িতে লাগিল। ঔষধ প্রস্তুত করিয়া আমি রসময়বাবুকে দিলাম; তিনি বাটীর ভিতর গমন করিলেন। আমি বরযাত্রীদিগের বাসায় গমন করিলাম।

চতুর্থ ভাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ – মৃত্যু নহে মূর্চ্ছা

বরযাত্রীদিগের বাসায় গমন করিয়া, নীরবে একপার্শ্বে আমি উপবেশন করিলাম। সে স্থানে বসিয়া একবার দিগম্বরবাবুর মুখপানে চাহিয়া দেখি, একবার 'বাবুর মুখখানি স্মরণ করি। দেবকুমার ও বাঁদরের যদি তুলনা হয়, তথাপি এ দুইজনে তুলনা হয় না। 'বাবু'র জন্য শোক হইল, কুসীর দুঃখে ঘোরতর দুঃখিত হইলাম। আজ কুসীর মৃত্যু না হউক, কিন্তু কুসী যে আর অধিক দিন বাঁচিবে না, তাহা এখন আমি নিশ্চয় বুঝিলাম। কুসী মরিয়া যাইবে, তাহা ভাবিয়া আর আমার বড় কষ্ট হইল না। 'বাবু' যে স্থানে গিয়াছে, কুসীও সেই স্থানে যাউক, এখন বরং সে ইচ্ছা আমার মনে উদয় হইল।

রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল, পুনরায় বিবাহের লগ্ন উপস্থিত হইল। রসময়বাবু নিজে এবার বর লইতে আসিলেন।

আমাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন,—'আপনি এখানে বসিয়া আছেন? আপনাকে

এতক্ষণ খুঁজিতেছিলাম। কেন ভাই, এত বিমর্ষ কেন?'

আমি উত্তর করিলাম,—'আপনার কন্যার জন্য আমি কিছু চিন্তিত আছি।'

রসময়বাবু উত্তর করিলেন,—'একবার এই কাজটা ভালয় ভালয় হইয়া গেলে হয়। স্ত্রীলোক। গহনা-গাঁটি পাইয়া মনে আনন্দ হইলে, এরূপ ভাবটা কাটিয়া যাইবে। শুনিয়াছি, বাতশ্লেষ্মা বিকার হইলে একটা না একটা অঙ্গহানি হয়; অঙ্গহানি না হইয়া কুসীর মন বিকৃত হইয়াছে।'

বর ও বরযাত্রিগণ গাত্রোত্থান করিলেন। রসময়বাবুর বৈঠকখানাটি প্রশস্ত ছিল; তাহার একপার্শ্বে বাড়ীর ভিতরের সামিল ছোট একটি ঘর ছিল। বৈঠকখানার সেই অংশে ক্ষুদ্র ঘর দিয়া বাটীর ভিতর যাইবার দ্বারের নিকট কন্যা সম্প্রদানের স্থান হইয়াছিল। বৈঠকখানার অবশিষ্ট অংশে বরযাত্রী ও কন্যা যাত্রীদিগের বসিবার স্থান হইয়াছিল। বর, বরযাত্রী ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগন সভায় উপবেশন করিলেন। রসময়বাবুর বাটীর বাগান ও সম্মুখে প্রশস্ত রাজ-পথ লোকে পূর্ণ হইয়া গেল। বাটীর ভিতর বাঙ্গালী, পঞ্জাবী ও হিন্দুস্থানী স্ত্রীগণের কলরব প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল!

বিবাহের লগ্ন উপস্থিত হইল। কন্যা সম্প্রদান করিবার নিমিত্ত রসময়বাবু সভাস্থ লোকদিগের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তাহার পর, বিবাহ স্থানে তিনি নিজের আসনে গিয়া উপবেশন করিলেন; বর তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট হইলেন। দুই পুরোহিত দুইজনের পশ্চাতে বসিলেন।

যথাবিধি সঙ্কল্পাদি মন্ত্র পাঠের পর, বিবাহ স্থলে কন্যা আনয়নের নিমিত্ত আদেশ হইল। একপার্শ্বে বসিয়া নীরবে আমি এই সমুদয় ব্যাপার দর্শন করিতে লাগিলাম। একজন বলিষ্ঠ পঞ্জাবী স্ত্রীলোক কন্যাকে কোলে করিয়া বাহিরে আনিল। তাহার পশ্চাতে কুসুমের মাসী ও অন্যান্য স্ত্রীগণ আগমন করিলেন।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, বৈঠকখানার যে পার্শ্বে কন্যা-সম্প্রদানের নিমিত্ত স্থান হইয়াছিল, তাহার পশ্চাদিকে বাড়ীর ভিতরের সামিল ছোট একটি ঘর ছিল। সেই দ্বারের নিকট কুসুমের মাসী ও অন্যান্য স্ত্রীগণ উপবেশন করিলেন।

পঞ্জাবী স্ত্রীলোকটি কন্যাকে আনিয়া নির্দিষ্ট আসনে বসাইল। কিন্তু যাই সে ছাড়িয়া দিল, আর কন্যা তৎক্ষণাৎ মুখ 'থুবড়িয়া' ভূতলে পতিত হইল।

'কি হইল, কি হইল' বলিয়া কন্যার পিতা, বর, পুরোহিতদ্বয় ও অন্যান্য লোক ব্যস্ত হইয়া তুলিতে গেলেন! চারিদিকে হৈ হৈ রৈ রৈ পড়িয়া গেল। বাটীর ভিতর দিকে সেই ছোট ঘরটিতে কুসুমের মাসী বসিয়াছিলেন। 'ও মা! এ কি হইল!' বলিয়া তিনি কাঁদিয়া উঠিলেন। সে স্থানে উপবিষ্টা অন্যান্য স্ত্রীগণও তাঁহার কান্নার সহিত আপন আপন সুরে জুড়িয়া দিলেন।

আমি অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছিলাম। সহসা এই গোলযোগে আমার চমক হইল। আমি ডাক্তার,—আমি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না; সত্বর সেই ধরাশায়িনী

কন্যার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম।

রসময়বাবু, কন্যার এক হাত ধরিয়া, তাহাকে তুলিতে চেষ্টা করিতেছিলেন; দিগম্বর বাবু অপর হাত ধরিয়া টানাটানি করিতেছিলেন। আমি তাঁহাদিগকে নিষেধ করিলাম।

কুসুমের মুখ তাম্রপাত্রের উপর পড়িয়াছিল। নিকটে বসিয়া অতি সাবধানে তাহার মুখটি তুলিয়া, আমি আমার উরুদেশে রাখিলাম। তাহার মুখটি ফিরাইয়া আমি দেখিলাম যে, তাহার নাসিকা হইতে শোণিতস্রাব হইতেছে, আম্রপাত্রের কাণা লাগিয়া তাহার ওষ্ঠও কাটিয়া গিয়াছে। সেই কর্তিত স্থান দিয়াও রক্ত পড়িতেছিল। নাসিকা ও মুখে রক্ত দেখিয়া আমার বড় ভয় হইল। মনে করিলাম যে, কুসুম বরাবর যাহা বলিয়া আসিতেছিল, তাহাই বা সত্য হয়। তাহার নাড়ী টিপিয়া দেখিলাম। নাড়ী দেখিয়া আমার মন আশ্বাসিত হইল। সে যে মৃত্যুমুখে পতিত হয় নাই, কেবল মূর্চ্ছিত হইয়াছে, নাড়ী দেখিয়া তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম। কোসা হইতে জল লইয়া তাহার চক্ষু ও মুখে সিঞ্চন করিলাম। বাটীর ভিতর হইতে শীঘ্র পাখা আনিবার নিমিত্ত রসময়বাবুকে প্রেরণ করিলাম। বর, বরযাত্রী প্রভৃতি লোকগণ চারিদিকে বায়ুরোধ করিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহাদিগকে দূরে সরিয়া যাইতে বার বার বলিলাম। কিন্তু কেহই আমার কথা শুনিলেন না। জনতা করিয়া সেই মূর্চ্ছিতা কন্যাকে ঘিরিয়া সকলে দাঁড়াইলেন। সকলেই ঔষধ জানেন। সেই সমুদয় ঔষধ প্রয়োগ করিবার নিমিত্ত সকলে আমাকে পরামর্শ দিতে লাগিলেন।

রসময়বাবু দৌড়িয়া বাড়ীর ভিতর হইতে পাখা লইয়া আসিলেন। দ্বারের নিকটে কুসুমের মাসী বসিয়া 'হায় হতাশ' করিতেছিলেন। নিকটে আসিয়া আমি তাঁহাকে বাতাস করিতে বলিলাম। কুসুমের মাথা আমার উরুদেশে রহিল। বামহস্তে আমি তাহার নাড়ী ধরিয়া রহিলাম। দক্ষিণহস্তে তাহার মুখে জল সিঞ্চন করিয়া, তাহার চৈতন্য উৎপাদনের নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ – তুমি তো বড় তেরপেগু

এই বিপদের সময় দিগম্বরবাবু এক গোল উপস্থিত করিলেন। আমাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন,—'তুমি তো বড় তেরপেগু দেখিতে পাই! কি বলিয়া তুমি আমার স্ত্রীকে কোলে লইয়া বসিলে? ডাক্তারি করিবে, ডাক্তারি কর; পরের স্ত্রীকে কোলে করিয়া ডাক্তারি করিতে হয়, এ তো কখনও শুনি নাই।'

এই বলিয়া তিনি আমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া, কুসীকে আমার কোল হইতে কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করিলেন। অচেতন হইয়া কুসী পড়িয়া আছে, তাহার প্রাণ-সংশয়; এরূপ সময়ে ফোকলার এই পাগলামি দেখিয়া আমার কিছু রাগ হইল। আমি বলিলাম—'You are a brute' (অর্থাৎ তুমি একটা পশু!)

দিগম্বরবাবু আরও বুক্রোধাবিষ্ট হইয়া, আমাকে এক ধাক্কা মারিলেন। আমি ঝুঁকিয়া

পড়িলাম। পুনরায় উঠিয়া, বরযাত্রীগণকে সম্বোধন করিয়া আমি বলিলাম,—'মহাশয়গণ! এ বে-পাগলা বুড়াকে লইয়া আপনারা বাসায় গমন করুন। কন্যার অবস্থা দেখুন,—বাঁচে কি না তাহার ঠিক নাই। এ সময়ে এরূপ পাগলামি ভাল দেখায় না।'

হবু-জামাজার ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া, ঘৃণায় ও ক্রোধে রসময়বাবুর চক্ষুদ্বয় আরক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি আত্মসংবরণ করিয়া, দিগম্বরবাবুকে বাসায় লইয়া যাইবার নিমিত্ত, অতি বিনয়ভাবে সকলের নিকট অনুরোধ করিলেন।

দুইজন বরযাত্রী দিগম্বরবাবুর দুই হাত ধরিয়া টানিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই যাইবেন না। ক্রোধে তিনি কাঁপিতে লাগিলেন। অতিশয় বল প্রকাশ করিয়া, আমার দিকে ঝুঁকিয়া ঝুঁকিয়া, ঘুসি দেখাইয়া তিনি আস্ফালন করিতে লাগিলেন। দুইজনে তাঁহাকে টানিয়া রাখিয়াছিল, তাহা না হইলে, আমাকে বোধ হয়, চড়টা চাপড়টা, কিলটা-ঘুসিটা খাইতে হইত। সেই সময় ফোকলা মুখে হাউ হাউ করিয়া তিনি কত কি বলিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখ-গহ্বরের দুইপার্শ্বে সাদা ফেকো পড়িয়াছিল, তাহা ঢাকিবার নিমিত্ত থেঁতো-করা পান সর্বদাই তিনি মুখে রাখিতেন। তাম্বুলরঞ্জিত লালা,—রক্তের ন্যায় তাঁহার কষ দিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। ফুলকাটা কামিজের বক্ষদেশ ও বেলফুলের মালা ভিজিয়া গেল। ঘোর উগ্রমূর্তি! তাহার উপর শোণিত-প্রায় লালার প্রবাহ,—তাঁহাকে ঠিক যেন রক্তমুখী মন্দা-কালীর ন্যায় দেখাইতে লাগিল। একে সেই হাউ হাউ, তাহার উপর আমার মন তখন মূর্চ্ছিতা কুসীর দিকে, সকল কথা আমি তাঁহার বুঝিতে পারিলাম না। দুই একটা কথা কেবল আমার কর্ণগোচর হইল, যথা,—'তুমি আমাকে বুড়ো বলিলে! এরূপ কটু কথা কেহ কখন আমাকে বলে নাই! তোমার নামে আমি ড্যামেজের নালিশ করিব। তোমাকে জেলে দিব; যত টাকা খরচ হয়, তাহা করিব।' ইত্যাদি।

রসময়বাবু একটু রাগিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন,—'মহাশয়গণ! আপনারা কি তামাসা দেখিতেছেন? কন্যার অবস্থা দেখিয়া, আপনাদের কি একটু দয়া হয় না? আর তোমার বাপু কি একটু জ্ঞান নাই? আমার কন্যা যদি বাঁচে, তবে তো তোমার সহিত বিবাহ হইবে? এখন আপনারা বাসায় গমন করুন।'

রসময়বাবুর এই কথা শুনিয়া, দিগম্বরবাবু একটু নরম হইলেন। তিনি বলিলেন,—'আচ্ছা, আর আমি গোল করিব না। আমি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব। আমার হাতে একখানা পাখা দাও, আমার স্ত্রীকে আমি বাতাস করি।'

যেমন করিয়াই হউক, পাগ্‌লাকে এখন শান্ত করাই শ্রেয়ঃ মনে করিলাম। চক্ষু টিপিয়া রসময়বাবুকে আমি ইসারা করিলাম। তিনি দিগম্বরবাবুর হাতে একখানি পাখা দিলেন। দিগম্বরবাবু আমার নিকটে বসিয়া, কুসীর মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়া, বাতাস করিতে লাগিলেন। দুই একবার পাখা নাড়িয়া মূর্চ্ছিতা কুসীকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন,—'কন্যা! তোমার জন্য আমি অনেক গহনা আনিয়াছি। একবাক্স গহনা আনয়াছি। আমাদের বাসায় আছে। তুমি চক্ষু চাহিয়া দেখ। এখনই সে গহনা তোমাকে আমি দেখাইব।'

গহনার লোভে কুসী চক্ষু চাহিল না। মৃতবৎ সে পড়িয়া রহিল।

দিগম্বরবাবু উচ্চৈঃস্বরে চাকরকে ডাকিলেন,—'কিঁষ্টা! কিঁষ্টা! কিঁষ্টা! কুঁথায় রে!'

ভিড়ের ভিতর হইতে কিঁষ্টা উত্তর দিল,—'হো! পদাই আজ্ঞা।' অর্থাৎ 'আমি পশ্চাতেই আছি।'

দিগম্বরবাবু বলিলেন,—'বাসায় যা,ছোট্রু সিংহের কাছ হইতে গহনার বাক্সটা চাহিয়া আন।'

রসময়বাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—আপনি নিতান্ত পাগল! ছিঃ!'

মানুষ সব কি বে-আড়া! দিগম্বরবাবু সকলের প্রশংসাভাজন হইতে এত চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তবুও কেহ তাঁহার প্রশংসা করে না। গহনা দেখিয়া কোথায় সকল লোকে তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিবে, না গহনার নাম শুনিয়া সকলে বিরক্ত হইল! দুঃখিত হইয়া কিষ্টাকে তিনি গহনার বাক্স আনিতে মানা করিলেন। সকলের অত্যাচারে নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া, বিরসবদনে তিনি পুনরায় কুসীকে বাতাস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু দুই চারিবার পাখা নাড়িয়া, এবার তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া চুপি চুপি বলিলেন, 'আমি তোমাদিগকে বেশ চিনি। লোকের কান মলিয়া তোমরা ভিজিট নাও। বাপের ব্যায়রাম হইলেও, ভিজিট ছাড় না। তোমরা ভিজিটখোর! আমি যা বলি তা যদি কর, তাহা হইলে তোমাকে আমি ভিজিট দিব। কন্যার মাথাটি তুমি আমার কোলে দাও। পর-পুরুষের কোলে যুবতী স্ত্রীলোকের মাথা রাখা উচিত নয়, তাই বলিতেছি।'

আমি সে কথার কোন উত্তর করিলাম না। ভিজিটের লোভে কুসীর মস্তক তাঁহার কোলে দিলাম না। কুসীকে এখন চেতন করিতে পারিলাম না, সে জন্য আমার বড় ভয় হইল। তাহার নাসিকা হইতে যে রক্তস্রাব হইতেছিল, তাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। তাহার নাড়ী অতিশয় দুর্বল হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ভয়ের লক্ষণ দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু এখনও চেতন হয় না কেন? পাছে সহসা হৃৎপিণ্ডের কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়, সে জন্য আমার বড় ভয় হইল। হৃৎপিণ্ড পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত মস্তক অবনত করিয়া, আমি আমার কর্ণ,—কুসীর বক্ষস্থলের বামপ্রদেশে রাখিতে যাইতেছি, এমন সময় দিগম্বরবাবু বলিয়া উঠিলেন,—'ও আবার কি! বেল্লিক!' এই বলিয়া আমার সেই কিঞ্চিৎ অবনত বামগালে ঠাস করিয়া তিনি সবলে এক চপেটাঘাত করিলেন।

চারিদিকে সকলে ছি ছি করিয়া উঠিল। আমি স্তম্ভিত হইলাম। কিন্তু এ বিষয় লইয়া আর অধিক গোল হইল না; কারণ, সেই সময় সকলের দৃষ্টি অন্যদিকে পড়িল। যেস্থানে কুসীকে লইয়া আমি বসিয়াছিলাম, তাহার চারিদিকে লোক দাঁড়াইয়াছিল। বার বার অনুরোধ করিয়াও, আমি সে ভিড় কমাইতে পারি নাই। সেই ভিড়ের পশ্চাৎ দিকে এখন একটু গোল উঠিল। সকলে দেখিল যে একজন সন্ন্যাসী অতি ব্যগ্রভাবে দুই হাতে দুই দিকে লোক সরাইয়া, ভিড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইতেছেন'। গৈরিক বস্ত্র দ্বারা সন্ন্যাসীর দেহ আবৃত ছিল। তাহার শরীর ধূলায় ধূসরিত হইয়াছিল। ভিড় ঠেলিয়া সন্ন্যাসী ক্রমে আমাদিগের

নিকট উপস্থিত হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ – দেখ না দাদা

আমার গালে চড় মারিয়া দিগম্বরবাবু একটু অপ্রতিভ হইয়াছিলেন। সন্ন্যাসীকে দেখিয়া এখন তিনি বলিয়া উঠিলেন,—ভাল হইয়াছে যে, এই সন্ন্যাসীঠাকুর আসিয়াছেন। কন্যাকে ইনি এখনই ভাল করিবেন। ইঁহারা সন্ন্যাসী, পবিত্র পুরুষ, পর-স্ত্রী ইঁহারা স্পর্শ করেন না। দূর হইতে ঝাড়-ফুঁক করিবেন। ডাক্তারবাবু কিছু মনে করিও না। এখন তুমি সরিয়া যাও, ডাক্তারি চিকিৎসা আর আমি করাইব না। আমি ইহাকে কোলে লইয়া বসি। সন্ন্যাসীঠাকুর দূরে বসিয়া ঝাড়-ফুঁক করিবেন।

সন্ন্যাসীঠাকুর কিন্তু দূর হইতে ঝাড়-ফুঁক করিলেন না। দিগম্বরবাবুর পা মাড়াইয়া তিনি আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পায়ের অঙ্গুলীতে যে জুতার কড়া ছিল, সন্ন্যাসীঠাকুরের পা ঠিক তাহার উপর পড়িয়াছিল। যাতনায় দিগম্বরবাবু উঃ কবিয়া উঠিলেন। তাঁহার সে কাতরতা-সূচক শব্দের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, সন্ন্যাসীঠাকুর সবলে তাঁহাকে এক ঠেলা মারিলেন। দিগম্বরবাবু শুইয়া পড়িলেন। তাহাতে একটু স্থান হইল। সেই স্থানে বসিয়া তিনি আমাকে অন্যদিকে ঠেলিয়া দিলেন। আমিও অন্যদিকে শুইয়া পড়িলাম। তাহাতে একটু স্থান হইল।এদিকে এক ঠেলা ওদিকে এক ঠেলা মারিয়া সন্যাসীঠাকুর যে স্থান করিলেন, সেই স্থানে তিনি ভাল করিয়া উপবেশন করিলেন। তাহার পর বাম হাতে কুসীর গলদেশ বেষ্টন করিয়া, আমার উরুদেশ হইতে তাহাকে উত্তোলন করিলেন। কুসীর মস্তক তাঁহার বাম হাতের উপর রহিল। অর্ধশায়িতভাবে কন্যাকে বসাইয়া, তিনি নিজের মস্তক অবনত করিয়া, কুসীর, দক্ষিণ কর্ণে অতি মৃদুস্বরে বলিলেন,—'কুসী! কুসী!

দিগম্বরবাবু জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন,—'ও ভাই রসময়! দেখ না দাদা, এ আবার কি বলে!'

রসময় কোন উত্তর করিলেন না; বিস্মিত হইয়া সন্ন্যাসীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

দিগম্বরবাবু এবার সন্ন্যাসী ঠাকুরকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন,—'বলি, ও গোঁসাইজি! এ তোমার কিরূপ ব্যবহার বল দেখি! আমি তোমাকে ভাল মানুষ মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু এই ভিজিট-খোরের চেয়ে তুমি আবার এককাঠি সরেশ! ইনি তবু পায়ের উপর কন্যাকে রাখিয়াছিলেন। তুমি তাহাকে বুকে তুলিয়া লইলে! কন্যা যে বালিকা নয়, পূর্ণ যুবতী, তাহা কি তোমার জ্ঞান নাই? ভণ্ড তপস্বি!

দিগম্বরবাবুর কথায় কেহ উত্তর করিল না। পাগল বলিয়া সকলে তাঁহার কথা তুচ্ছ করিল। কন্যার কানের নিকট মুখ রাখিয়া, সন্ন্যাসী মৃদুস্বরে বারবার কেবল—'কুসী! কুসী! বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন।

সন্ন্যাসীর আশ্চর্য-শক্তি দেখিয়া রসময়বাবু প্রভৃতি সকলেই বিস্মিত হইলেন; সন্ন্যাসী সম্পূর্ণ অপরিচিত লোক; রসময়বাবু কখন তাঁহাকে দর্শন করেন নাই; উজিরগড়ের কেহ

তাঁহাকে কখন দেখে নাই। তথাপি তিনি রসময়বাবুর কন্যার নাম—ভাল নাম নহে, ডাক নাম,—উচ্চারণ করিতে সমর্থ হইলেন। সন্ন্যাসী-মহান্তদিগের কিছুই অবিদিত থাকে না। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সকলই তাঁহারা প্রত্যক্ষ দেখিয়া থাকেন।

সন্ন্যাসীর অদ্ভুত আরও বিশেষরূপ পরিচয় শীঘ্রই সকলে পাইল। তিনি কোনরূপ ঔষধ প্রদান করিলেন না, অথবা কোনরূপ মন্ত্র পাঠ করিলেন না। কেবল কন্যার নাম ধরিয়া ডাকিলেন। কিন্তু তাহাতেই সেই মৃতপ্রায় কন্যা জীবন প্রাপ্ত হইল। এতক্ষণ ধরিয়া যাহার আমি চৈতন্য উৎপাদন করিতে পারি নাই, সন্ন্যাসীঠাকুরের অদ্ভুত তপস্যা বলে এখন তাহার চৈতন্য হইল। কুসী প্রথমে একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। তাহার পর, সে চক্ষু উন্মীলন করিল। কিছুক্ষণের নিমিত্ত সন্ন্যাসীর মুখের দিকে সে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। পুনরায় একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, সে চক্ষু মুদ্রিত করিল। চক্ষু, উন্মীলন, সন্ন্যাসীর প্রতি দৃষ্টি, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ, চক্ষু মুদ্রিতকরণ, তিন চারিবার সে এইরূপ করিল। শেষবার যখন সে চক্ষু উন্মীলন করিল, তখন ধীরে ধীরে বাম হস্তে মাথার কাপড়টি খুঁজিয়া, ঘোমটাটি টানিয়া দিল। তাহার পর দক্ষিণ হস্তটি সন্ন্যাসীর গলদেশের পশ্চাদভাগে রাখিল। অবশেষে আপনার মস্তকটি সন্ন্যাসীর বাম হাত হইতে সরাইয়া, তাঁহার বক্ষঃস্থলে রাখিল। হস্তও মস্তক এইরূপ রাখিয়া, সে চক্ষু বুজিল। সুস্থ হইয়া যে সে এখন নিদ্রা যাইবে, তাহার ভাব দেখিয়া এইরূপ সকলের বোধ হইল।

কুসুম বালিকা নহে। সন্ন্যাসীর বক্ষঃস্থলে কি ভাবিয়া সে আপনার মস্তক রাখিল! সন্ন্যাসীও বৃদ্ধ ছিলেন না; তাঁহার বয়স অধিক হয় নাই। তথাপি কুসুম তাহাকে দেখিয়া কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইল না। যুবক ও উলঙ্গ শুকদেব গোস্বামীকে দেখিয়া অপ্সরাগণ লজ্জা করে নাই, কিন্তু বৃদ্ধ বল্কল—পরিধেয় ব্যাসকে দেখিয়া তাহারা লজ্জা করিয়াছিল! সন্ন্যাসীর অদ্ভুত মাহাত্ম্য দেখিয়া, রসময়বাবু প্রভৃতি সকলেই বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন।

কেবল দিগম্বরবাবু সন্ন্যাসীর মাহাত্ম্য দর্শনে মুগ্ধ হইলেন না। রসময়বাবুকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন—'রসময়! তোমার কি ঘৃণা পিত্তি একেবারে নাই হে? তোমার চক্ষের উপর তোমার যুবতী কন্যাকে কেহ বা কোলে করিতেছে, কেহ বা বুকে করিয়া লইতেছে, ইহাতে তোমার কি লজ্জা বোধ হয় না? ছিঃ?

তাহার পর সন্ন্যাসীকে সম্বোধন করিয়া তিনি বললেন,—সন্ন্যাসীঠাকুর! কন্যার এখন জ্ঞান হইয়াছে। আর ইহার চিকিৎসা করিতে হইবে না। এ রসময়ের কন্যা; আমি ইহার বর। আমার সহিত এখনি ইহার বিবাহ হইবে। কতক মন্ত্র বলা হইয়াছে, আর গোটাকতক মন্ত্র বলিলেই হয়। কন্যাকে ছাড়িয়া দিয়া, এখন আপনি একটু সরিয়া বসুন। বাকী কয়টা মন্ত্র আমি পড়িয়া লই। আসুন পুরোহিত মহাশয় আসুন! রসময়! আয় দাদা। কাজটা শেষ করিয়া ফেলি। এই সব গোলমালে লগ্ন ভ্রষ্ঠ হইয়া গেল।'

হবু জামাতাকে রসময়বাবু এখন বিলক্ষণ চিনিয়াছিলেন। তাহার প্রতি এখন তাঁহার ঘোরতর অভক্তি জন্মিয়াছিল। রসময়বাবু তাঁহাকে কি উত্তর দিবেন, তাহা ভাবিতেছেন,

এমন সময় বৈঠকখানার বাহিরে সেই জনতার ভিতর আবার কি গোল হইল। আমার মুখপানে চাহিয়া রসময়বাবু বলিলেন—'আবার কি উৎপাত ঘটে দেখ। সকলেই কন্যার বিবাহ দিয়া থাকে কিন্তু এমন কেলেঙ্কারি আর কখনও দেখি নাই। লোকের কাছে যে মুখ দেখাইব, সে যো আর আমার রইল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ – গলা-ভাঙ্গা দিগম্বরী

বাস্তবিক এই সময় আর একটি ঘটনা ঘটিল। ভিড় ঠেলিয়া একজন মানুষ বৈঠকখানার ভিতর প্রবেশ করিলেন। তাঁহার লম্বা-চওড়া চেহারা দেখিয়া, প্রথম তাঁহাকে পুরুষ-মানুষ বলিয়া আমার ভ্রম হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র দেখিয়া সে ভ্রম আমার দূর হইল। চওড়া কস্তাপেড়ে শাড়ী তিনি পরিয়াছিলেন। মুখখানি বড় একটি হাঁড়ির মতো ছিল। সেই হাঁড়ির মধ্যস্থলে উচ্চ নাসিকা দ্বারা, দুই পার্শ্ব দুই গালের অস্থি দ্বারা, নিম্নদেশ মুখ-গহ্বর দ্বারা, আর তাহার উপর কতকগুলি বড় বড় গোঁফের কেশ দ্বারা সুশোভিত ছিল। যদি কোন মানুষের ঠিক বাঁশির মত নাক থাকে তাহা হইলে তাঁহার ছিল। মাথার সম্মুখভাগে টাক পড়িয়াছিল। কতক সেই টাকের উপর হইতে, কতক কাঁচা-পাকা চুলের ভিতর হইতে সিঁন্দুরের ছটা বাহির হইতেছিল। শীতলাদেবী কি সুভদ্র ঠাকুরাণীরও লালটদেশের এতখানি অংশ সিন্দুরে রঞ্জিত ছিল কিনা, তা সন্দেহ। সেই সিঁন্দুরের ছটা দেখিয়া বোধ হয়, যেন তাঁহার সমস্ত শরীরটি পতি ভক্তিকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে; শরীরে পতিভক্তি আর ধরে না, তাই তাহার কতকটা এখন মাতা ফুঁড়িয়া বাহির হইতেছে। স্ত্রীলোকটি শ্যামবর্ণা, তাঁহার দেহটি যেমনি দীর্ঘে, তেমনি প্রস্থে; পাঠানদিগের দেশেও তাঁহার প্রতি একবার ফিরিয়া চাহিতে হয়; তাঁহার নাকে নখ ও হাতে শাঁখা ছিল। বয়ঃক্রমে পঞ্চাশের অধিক হইবে। কিন্তু এখনও তাঁহার দেহে যে অপরিমিত বল ছিল, তাঁহার আকৃতি ও ভঙ্গীতে প্রকাশ পাইতেছিল। স্ত্রীলোকটি যে আমাদের দেশের লোক, বাঙ্গালী, পরিধেয় বস্ত্র দেখিয়া প্রথমেই তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম। আরও ভালরূপে নিরীক্ষণ করিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি ভদ্রকন্যা ও ভদ্ররমণী, আকৃতি-প্রকৃতি যেরূপ হউক না কেন। সিঁন্দুর প্রসঙ্গে আমি তাঁহার পতিভক্তির উল্লেখ করিয়াছি। সেই সম্বন্ধে তাঁহার দন্তপূর্ণ মুখখানি আরও পরিচয় প্রদান করিতেছিল। সেই মুখখানি যেন পৃথিবীর সমস্ত নারীকুলকে বলিতেছিল, 'ওরে অভাগীরা। পতিপরায়ণা সতী কাহারে বলে, যদি তোদের দেখিতে সাধ থাকে, তবে আয়। এই আমাকে দেখিয়া যা; আমি তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত, সাক্ষাৎ পতিভক্তি মূর্তিমতী হইয়া আমি এই পৃথিবীতে অধিষ্ঠান করিয়াছি।'

জনতা ঠেলিয়া তিনি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া অর্ধভগ্ন গম্ভীর স্বরে তিনি বলিলেন,—'কৈ! কোথায়! সে ফোক্‌লা কোথায়! সে মুখ পোড়া নচ্ছার কোথায়!

তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া, সকলে অবাক হইয়াছিল; এখন তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া সকলে আরও অবাক হইল। অর্ধভগ্ন গুরুগম্ভীর স্বর। কিসের সহিত সে স্বরের তুলনা করিব? ছেঁড়া জয়ঢাকের শব্দের সহিত? এতক্ষণ ঘরের ভিতর কত গোলমাল হইতেছিল; কুসুমের চৈতন্য উৎপাদনের নিমিত্ত কত লোক কত ঔষধের কথা বলিতেছিল; তাহার পর বিবাহের কথা, সন্ন্যাসী মহান্তের কথা;—সকলেই একসঙ্গে নানারূপ কথোপকথন করিতেছিল। কিন্তু এখন তাঁহার সেই কণ্ঠস্বর শুনিয়া, সকলেই একেবারে নিস্তব্ধ হইল। পিপীলিকার পদশব্দটি পর্যন্ত ঘরে আর রইল না।

গলাভাঙ্গা স্ত্রীলোকটি পুনরায় বলিলেন,—'কৈ! সে ফোক্‌লা মুখপোড়া কোথায়?

আমার নিকটে বসিয়া, ফোক্‌লা একদৃষ্টে কুসী ও সন্ন্যাসীর মুখপানে চাহিয়া পাখা নাড়িতেছিলেন। 'ফোক্‌লা মুখপোড়া কোথায়? এই গম্ভীর শব্দ শুনিয়া তাঁহার মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল। পাখাখানি তাঁহার হাত হইতে পড়িয়া গেল। আমার পশ্চাৎ দিকে তিনি লুকাইতে চেষ্টা করিলেন। স্ত্রীলোকটি কে, তখন আমি বুঝিতে পারিলাম, ফোক্‌লাকে আমি লুকাইতে দিলাম না; আমার পশ্চাৎ দিকে তিনিও যত সরিয়া আসেন, আমিও তত সরিয়া যাই।

ইতিমধ্যে সেই স্ত্রীলোকের দৃষ্টি তাঁহার উপর পড়িল। তিনি বলিলেন,—'এই যে পোড়া মুখ লুকাইতেছেন। হ্যাঁরে! ড্যাক্‌রা এ সব তোর কি কারখানা বল্‌ দেখি?'

দিগম্বরবাবু বলিলেন,—'কে ও! মনুর মা! তুমি কোথা হইতে?'

গলা-ভাঙ্গা উত্তর করিলেন,—'কি হইয়াছে? তোমার মুণ্ডু হইয়াছে। এইজন্য বুঝি আমাকে দেশে পাঠান হল। আমি যেন আর কোন খবর পাইব না। আমার যেন আর কেউ নাই! তাই সে দিন খবর পাইয়াছি। আমি বলিলাম—'বিন্দী! চল! ফোক্‌লা মুখপোড়া আবার মরিতেছে'—

ভিড়ের একপার্শ্ব হইতে কে একজন বলিয়া উঠিল,—'হা গো! এই আমি। আমার নাম বিন্দী।'

সকলের দৃষ্টি এখন বিন্দীর উপর পড়িল। বিন্দী গলা-ভাঙ্গার সংসারে চাকরাণী ছিল। স্ত্রী-পুরুষের যুদ্ধের সময় বিন্দী গৃহিনীর বিশেষরূপ সহায়তা করিত। সেজন্য গলা-ভাঙ্গা তাহাকে বড় ভালবাসিতেন! বিন্দী এখন সেতোগিরি করে। রসময়বাবুর অফিসের (পাঞ্জাবী নহে) হিন্দুস্থানী চাপরাসীকে সম্মুখে পাইয়া, বিন্দী তাহাকে পরিচয় দিতে আরম্ভ করিল। বিন্দী বলিল,—এই দেখ দেখি গা! মিন্‌সের একবার আক্কেল।

আর একবার অমনি করিয়াছিল। তোর বয়স হইয়াছে! ঘরে অমন গিন্নী রহিয়াছে! কেন, আমার গিন্নী-মা দেখিতে মন্দ কি? চক্ষের কোল একটু বসিয়া গেছে, এই যা! তোর ছেলে রহিয়াছে! মেয়ে রহিয়াছে। নাতি রহিয়াছে। নাতিনী রহিয়াছে। তোর আবার বে কেন?

হিন্দস্থানী চাপরাসী কোন সময়ে কলিকাতা আসিয়াছিল, সে জন্য বাঙ্গলা ভাষা সে

অতি সুন্দর জানিত। বিশুদ্ধ বাঙ্গলায় সে বলিল,—'হামিও সেই বাত বলি। বুড়ো আদমির আবার শাদি-বিহা কাহে, শাদি-বিহা হো তোর হামার।'

বিন্দী বলিল,'দূর মুখ-পোড়া! না, তামাসার কথা নয়। প্রয়াগে থাকিতে বুড়ো আর একবার এই রঙ্গ করিয়াছিল। আমার গেরোশন্নি হইয়াছে, এই কথা বলিয়া বুড়ো আর একজন মেয়েকে বে করিতে চাহিয়াছেন। বালাই আর কি! গেরো-শন্নি হবে কেন গা! আমার গিন্নী-মা কেমন শক্ত, কেমন দড় রহিয়াছিল। আর দেখ জমাদ্দার! এই কারে দোষ দিব! এই বাবুগুলোই বা কি বল দেখি? চোখের মাথা খেয়ে গয়নার লোভে এই তিনকেলে ফোকলা বুড়োর হাতে তারে মেয়ে গুঁজে দেবে, তা ও বেচারাই বা করে কি?

চাপরাসী বলিল,—'হামিও সেই বাত বলি।'

বিন্দী বলিল,—'হাঁ ভাই জমাদ্দার! তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ। ভাগ্যে গিন্নীমায়ের ভগিনীপতির ভায়রা ভাই খবরটি দিল, তাই তো তিনি জানিতে পারিলেন। তাই গিন্নী-মা বলিলেন,—'বিন্দী! বুড়ো আমার মেতেছে। চল, ফের যাই; গিয়া ঝাঁটার বাড়ীতে বিষ ঝাড়াই।' আমি বলিলাম, যাব বই কি, গিন্নী-মা! যখন তোমার এমন বিপদ, তখন আমি তোমা- ক নিয়ে যাব। আমি পথেঘাট সব জানি। কত লোককে আমি কাশী বৃন্দাবনে নিয়ে যাই। ঠাকুরবাড়ীও কতবার গিয়াছি। মেয়েমানুষ হইলে কি হয় গিন্নী-মাকে পিণ্ডিতে তো আনিলাম বাছা।'

গলা-ভাঙ্গা এখন বিন্দীর কথাটি লুফিয়া লইলেন। তিনি বলিলেন,—'হাঁ, বিন্দী বলিয়াছে ভাল। আমারা দুইজনে পিণ্ডিতে আসিলাম। তোমার বাসায় যেখানে তোমার পিণ্ডি চটিকান রহিয়াছে, সেই বাড়ীতে যাইলাম। বিছানার শিয়রে, দেয়ালের গায়ে,—দেখিলাম, ছোট একটি বাঁধানো ছবি রহিয়াছে। এই ছুঁড়ির ছবি বুঝি! লোকের মুখে শুনিলাম যে, বাবু বে করিতে গিয়াছেন। হ্যাঁ রে, মুখপোড়া! তোর না দুটো আইবুড়ো বড় বড় নাতিনী রহিয়াছে।

ভয়ে দিগম্বরবাবু একেবারে কাঁটা হইয়া গিয়াছেন। বিবাহ বিষয়ে এখন তিনি সম্পূর্ণ হতাশ হইলেন। তাঁহার যে গৃহ-শূন্য হয় নাই, তিনি যে মিথ্যা কথা বলিয়াছিলেন, সে কথা এখন প্রকাশ হইয়া পড়িল। তিনি যে ধনবান লোক, তাঁহার স্ত্রীর ভাব দেখিয়া তাহাও বোধ হইল না। তাঁহার সব মিথ্যা, সব ফাঁকি,—আমার মনে এইরূপ বিশ্বাস হইল। দিগম্বরবাবু ভাবিলেন যে তাঁহার যে স্ত্রী আছে,—বিশেষতঃ এরূপ খাণ্ডার স্ত্রী আছে, তাহা জানিয়া, রসময়বাবু আর তাঁহার সহিত কন্যার বিবাহ দিবেন না। রসময়বাবু সম্মত হইলেই বা ফল কি? স্ত্রী তাহা হইলে প্রহারের চোটে তাঁহার হাড়-গোড় চূর্ণ করিয়া দিবে। গলা-ভাঙ্গার হাতে কতবার তাঁহার উত্তম-মধ্যম হইয়া গিয়াছে। এলাহাবাদে থাকিতে এইরূপ আর একবার তিনি বিবাহের আয়োজন করিয়াছিলেন। মৌ হইতে সে-বার যখন এলাহাবাদে বদলি হইয়াছিলেন। উত্তর পশ্চিম হইতে পঞ্জাবে বদলি হইবার সময় এবারও সেইরূপ গৃহিণীকে সঙ্গে লইয়া আসেন নাই। তাঁহাকে দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নীবিয়োগ হইয়াছে—পঞ্জাবে আসিয়া সকলকে এইরূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। এই ভয়ে তিনি

দেশে এতবড় ধিঙ্গী কুসীকে বিবাহ করিতে সম্মত হন নাই। এলাহাবাদে যে বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল, তাহাতে দিগম্বরবাবুকে এবারের মত বরসজ্জা করিতে হয় নাই। বিবাহদিনের পূর্বেই তাঁহার স্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহার পর, গাত্র বেদনার যোগাড় হইয়া পড়ে, সেজন্য ভয়ে জড়-সড় হইয়া তিনি সুর ফিরাইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ – সূতা বাঁধা কেন ড্যাক্‌রা

দিগম্বরবাবু বলিলেন,—'বে! কার রে? আমি বে করতে আসি নাই মাইরি বলিতেছি, আমি বে করিতে আসি নাই। হয় না হয়, তুমি বরং এই রসময়বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ। না, দাদা?

গলা-ভাঙ্গা উত্তর করিলেন,—'তোর বে নয়? তবে তোর হাতে সূতা বাঁধা কেন রে ড্যাক্‌রা?

দিগম্বরবাবু উত্তর করিলেন,—'হাতে সূতা বাঁধা? কার? আমার?

স্ত্রী বলিলেন,—'একবার ন্যাকামি দেখ! হাতে সূতা বাঁধা কেন তা বল?

বিন্দী ও সেই কথায় যোগ দিয়া বলিল,—'তা বাছা! তোমার বলিতে হইবে। হাতে সূতা বাঁধা কেন, তা তোমায় বলিতে হইবে।'

নিজের হাতে সূতা দেখিয়া দিগম্বরবাবু অতিশয় বিস্মিত হইলেন। কিরূপে কোথা হইতে তাঁহার হাতে সূতা আসিয়া গেল, ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি তাহা মনে করিতে পারিলেন না। কিন্তু ইহার কারণ না বলিলেও নয়। সেজন্য একটু ইতস্ততঃ করিয়া তিনি উত্তর করিলেন,—'হাতে সূতা বাঁধা! তাই তো! ওটা আমার ঠাওর হয় নি।

গলা-ভাঙ্গা উত্তর করিলেন,—'ওটা তোমার ঠাওর হয় নি। পিণ্ডিতে চল। তোমার বাসায় গিয়া যাহাতে ঠাওর হয়, তাই করিব। ঝাঁটার বাড়িতে তোমার ঠাওর করিয়া দিব। তবে আমার নাম জগদম্বা বাম্‌নী।'

বরযাত্রীদিগের একজন ভিড়ের মাঝখান হইতে বলিলেন,—'জগদম্বা বাম্‌নী! না গলা-ভাঙ্গা দিগম্বরী?'

দিগম্বরবাবুর স্ত্রী এই কথা শুনিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন। তৎক্ষণাৎ সেই দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—'কোন আটকুঁড়ীর বেটা কথা বলে রে? তোর মা হউক গলা-ভাঙ্গা দিগম্বরী! মর্! যত বড় মুখ, তত বড় কথা। হাড়হাবাতে বাহাত্তুরে ফোক্‌লা। তোর জন্যে আমাকে এইরূপ অপমান হইতে হইল।'

দেশে ও অন্যান্য স্থানে দিগম্বরবাবুর স্ত্রীকে অনেকেই জানিত। কেবল জানিত তাহা নহে, স্ত্রী-পুরুষ সকলেই তাহাকে ভয় করিত। বরযাত্রীদিগের মধ্যে কেহ বোধ হয়, ইঁহার সুখ্যাতি শুনিয়া থাকিবে। পরিচিত লোকেরা আড়ালে ইঁহাকে 'গলাভাঙ্গা দিগম্বরী বলিত। কিন্তু তাঁহার সম্মুখে সে নাম উচ্চারণ করে, কাহার সাধ্য। দিগম্বরী ইঁহার প্রকৃত নাম নহে, ইঁহার প্রকৃত নাম জগদম্বা। দিগম্বরবাবুর স্ত্রী, সেইজন্য দুষ্টলোকে ইঁহার নাম দিগম্বরী

রাখিয়াছিল। তাহার পর কর্তাটির যখন নিজস্ব একটি বিশেষণ আছে, তখন ইঁহারও একটি বিশেষণ আবশ্যক। ইঁহার কণ্ঠস্বর ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘগর্জ্জনের ন্যায়; সেজন্য দিগম্বরী নামের পূর্বে গলা-ভাঙ্গা বিশেষণটিও দুষ্টলোকে যোগ করিয়াছিল। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, ইঁহার যে 'গলা-ভাঙ্গা' নাম হইবে, সে কিছু বিচিত্র কথা নহে। নামকরণের ভার আমার উপর হইলে, আমিও ঐ নামটি তাঁহাকে বাছিয়া দিতাম।

আড়াল হইতে কে তাঁহাকে 'গলা-ভাঙ্গা দিগম্বরী' বলিল, সেজন্য প্রথম তাঁহার অতিশয় ক্রোধ হইল। তাহার পর, তাঁহার অপমান বোধ হইল। তাহার পর তাঁহার দুঃখ হইল। তাহার পর তাঁহার কান্না আসিয়া গেল। তৎক্ষণাৎ সভাস্থলেই তিনি থপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। তাহার পর ঘরের দেওয়ালটিতে তিনি ঠেস দিলেন, তাহার পর পা দুইটি তিনি ছড়াইয়া দিলেন। অবশেষে তাঁহার ফাটা কণ্ঠভেরীর গগনস্পর্শী শব্দে তিনি জগৎ নিনাদিত করিলেন। এ দুঃখের সময়, তাঁহার জীবিত পুত্র, কন্যা, পৌত্র, দৌহিত্র,—তাহাদিগকে তাঁহার স্মরণ হইল না। ত্রিশ বৎসর পূর্বে আঁতুড়ঘরে তাঁহার একটি তিনদিনের কন্যা মারা পড়িয়াছিল, তাহাকে এখন তাঁহার স্মরণ হইল। সেই শোক এখন তাঁহার উথলিয়া পড়িল। তাহাকে স্মরণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে তিনি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন,—'কোথায় রে! খুকী রে! একবার দেখিয়া যা! এখানে তোর মায়ের দশা কি হইয়াছে! তোর মাকে গলা-ভাঙ্গা বলিয়া আঁটকুড়ার বেটারা অপমান করিতেছে। কোথায় রে! আমার খুকী কোথায় গেলি রে! ইত্যাদি। আহা! বড় দুঃখের বিষয় যে, —সে খুকী থাকিলে, এতক্ষণ কোন্‌কালে আসিয়া রক্ষা করিত! বিবাহ-সভায় হুলস্থূল পড়িয়া গেল। নূতন ধরণের এই অভিনয় দেখিয়া, সভার সভ্যগণ পরম প্রীতি উপভোগ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছুক্ষণ কাঁদিয়া গলা-ভাঙ্গার নিদ্রার আবেশ হইল। কান্নার সুর কিছু ঢিমে হইল, মাঝে মাঝে কথার ফাঁক পড়িতে লাগিল; ক্রমে তাঁহার ঢুল আসিল। ঢুল আসায় তাঁহার মস্তক সম্মুখ দিকে অবনত হইতে লাগিল। একটু অবনত হইল, আরও অবনত হইল, আরও অবনত হইল। ক্রমে পায়ের নিকট মস্তক আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি মনে করিলাম, এইবার ইঁহাকে ধরা উচিত হইতেছে, তা না হইলে মুখ থুবুড়িয়া ইঁহার মস্তক মাটিতে গিয়া পড়িবে। কিন্তু মাথা যাই মাটিতে পড়-পড় হইল, আর তৎক্ষণাৎ ইনি সোজা হইয়া বসিলেন। সোজা হইয়া মৃদুস্বরে একবার বলিলেন,—'কোথায় আমার খুকী রে।' এই কথা বলিয়া পুনরায় তাঁহার ঢুল আসিয়া গেল। পুনরায় সেইভাবে তাঁহার মস্তক অবনত হইতে আরম্ভ হইল। পুনরায় তিনি মাটিতে পড়-পড় হইলেন। যাই পতিতপ্রায় হইলেন, আর সেই মুহূর্তে পুনরায় তিনি সোজা হইয়া, 'কোথায় আমার খুকী রে?' এই কথা বলিয়া একবার মৃদুস্বরে কাঁদিলেন। আবার পুনরায় ঢুল আসিয়া গেল, এইরূপ ক্রমাগত হইতে লাগিল। প্রতিবার যাই তিনি পড়-পড় হইতে লাগিলেন, আর সেই সময় আমার বক্ষঃস্থল ধড়ফড় করিয়া উঠিতে লাগিল। আমি মনে করিলাম এইবার মাটিতে পড়িয়া ঐ বাঁশী-নাক না ছেঁচিয়া যায়। তাঁহাকে ধরিবার নিমিত্ত দুই একবার আমি প্রস্তুতও হইয়াছিলাম। ফলকথা,

তাঁহার বার বার এই পড়-পড় ভাব আমার পক্ষে একপ্রকার সাজা হইয়াছিল।

রসময়বাবু অবাক! একবার গলা-ভাঙ্গার দিকে, একবার দিগম্বরের দিকে, একবার আমার দিকে, একবার রসময়বাবু কেন? অনেকেই সে রাত্রিতে অবাক হইয়াছিল। উপন্যাসেও এরূপ ঘটনা হয় না। সকলেই বুঝিল যে, এ বিবাহ আর হইবে না।

এই সময় বাড়ীর ভিতর হইতে পঞ্জাবী চাকরাণী আসিয়া রসময়বাবুকে ডাকিল। রসময়বাবু তাহার সঙ্গে বাটীর ভিতর গমন করিলেন। একটু পরেই ফিরিয়া আসিয়া তিনি আমাকে ডাকিলেন। আমিও তাঁহার সঙ্গে বাটীর ভিতর গমন করিলাম।

রসময়বাবু আমাকে বলিলেন,—'যাদববাবু! কি কেলেঙ্কারি। কি লজ্জা। এ অঞ্চলে আমি আর মুখ দেখাইতে পারিব না। সে যাহা হউক, আবার এক বিপদের কথা শুনুন। আমার শালী কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। আমার স্ত্রীর নিকট হইতে কুড়িটি টাকা লইয়া তিনি কোথায় গিয়াছেন। আমার স্ত্রী অত বুঝিতে পারে নাই। সে মনে করিল, বিবাহের কি কাজের জন্য টাকার প্রয়োজন হইয়াছে। তাহার পর, কোন স্থানে তাহাকে দেখিতে না পাইয়া, সে ও চাকরাণী তন্ন তন্ন করিয়া সকল স্থানে অন্বেষণ করিয়াছে। আমিও সকল স্থানে খুঁজিয়া দেখিলাম কোন স্থানে তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। কি কুক্ষণে আজ রাত্রি প্রভাত হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। চাকরীর স্থানে আমার অপমানের আর সীমা রহিল না।'

আমি বলিলাম,—'কুসুমের মূৰ্চ্ছা হইলে, তিনি তাহাকে পাখার বাতাস করিতেছিলেন। যখন সন্ন্যাসীঠাকুর আসিয়া আমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া, কুসুমকে আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইলেন, সেই সময় হইতে আর আমি তাঁহাকে দেখি নাই।'

রসময়বাবু উত্তর করিলেন,—'হাঁ! সেই সময় তিনি বাটীর ভিতর গমন করেন। ছোটঘর হইতে আমার স্ত্রীকে ডাকিয়া, তাহার নিকট হইতে টাকা চাহিয়া লইলেন। আমার স্ত্রী পুনরায় বাহিরের ছোটঘরে প্রত্যাগমন করিল; আমার শালী বাটীর ভিতর রহিলেন। তাহার পর, আর কেহ তাঁহাকে দেখে নাই। কিছুক্ষণ পরে আমার স্ত্রী বাটীর ভিতর আসিয়া, তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া, চারিদিকে অন্বেষণ করিতে লাগিল; তাঁহাকে দেখিতে পাই না। তিনি বাটীতে নাই; তিনি কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। কেন, তা বলিতে পারি না।'

আমি বলিলাম,—'তবে কি তিনি বাগানের দ্বার দিয়া গিয়াছেন?'

রসময়বাবু উত্তর করিলেন,—হাঁ! তাহাই বোধ হয়।'

আমি বলিলাম,—'আমি তাঁহার অনুসন্ধান করিতে যাইতেছি। অন্য কোন বাঙ্গালীর বাটীতে বোধ হয় থাকিবেন। আপনি কুসীর নিকট গমন করুন। সন্ন্যাসী মহাশয় বড়ই উপকার করিয়াছেন। কুসুম পাছে মারা পড়ে, সেজন্য আমার বড় ভয় হইয়াছিল। তিনি কুসুমের জীবন দান করিয়াছেন। তাঁহার অনুমতি লইয়া, কুসুমকে আপনি বাটীর ভিতর আনয়ন করুন। তাহাকে সে স্থানে আর রাখা উচিত হয় না। বরযাত্রীদিগকেও বিদায় করুন। দিগম্বরবাবুর সহিত কন্যার বিবাহ দিতে আর বোধ হয়, আপনার ইচ্ছা নাই?'

রসময়বাবু উত্তর করিলেন,—'রাম! আমি তো ক্ষেপি নি।'

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ – রেল-ষ্টেশন

আমি খিড়কি দ্বার অভিমুখে যাইলাম; রসময়বাবু বৈঠকখানা-ঘরে প্রত্যাগমন করিলেন। খিড়কি-দ্বার দিয়া আমি বাগানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সে স্থানে অনেকগুলি ঐ দেশী স্ত্রী ও পুরুষ দাঁড়াইয়া বিবাহের তামাসা দেখিতেছিল। মাসীর কথা আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। একজন স্ত্রীলোক আমাকে বলিল যে, কিছুক্ষণ পূর্বে সে যখন এই বাটীতে আসিতেছিল, তখন পথে তাহার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সেই পথ দিয়া তিনি দ্রুতবেগে যাইতেছিলেন। সে কোন পথ, তাহা আমি জানিয়া লইলাম। সে রাস্তার নাম 'ষ্টেশন-রোড' রেল-ষ্টেশন অভিমুখে তাহা গিয়াছে। সেই রাস্তার উপর হারাণবাবুর বাড়ী। আমি মনে করিলাম যে, মাসী বোধ হয় হারাণবাবুর বাড়ীতে গিয়াছেন।

সেই পথ ধরিয়া হারাণবাবুর গৃহ অভিমুখে আমি গমন করিতে লাগিলাম। গ্রীষ্মকাল। সুন্দর চন্দ্রালোকে দিনের মত পথ-ঘাট আলোকিত হইয়াছিল। সেজন্য পথ চলিতে আমার কষ্ট হইল না। কুসুমের বাটী হইতে হঠাৎ কেন বাহির হইলেন, সেই কথা আমি ভাবিতে লাগিলাম। কুসীর তিনি বিধবা বিবাহ দিতেছেন। এই কথা প্রকাশ হইবার কোনরূপ সূচনা হইয়া থাকিবে, সেই ভয়ে বোধ হয়, তিনি বাটী হইতে বাহির হইয়াছেন। মনে মনে আমার এইরূপ সন্দেহ হইল।

যাহা হউক, দিগম্বরবাবুর সহিত কুসীর যে বিবাহ হইল না, সেজন্য আমি আহ্লাদিত হইলাম। আহ্লাদ আর কি করিয়া বলিব? মৃত হীরালামকে তো আর ফিরিয়া আনিতে পারিব না। সন্ন্যাসীঠাকুর আপাততঃ কুসীর চেতনা উৎপাদন করিলেন। তাহাকে সম্পূর্ণরূপে ভাল করিলেও তিনি করিতে পারেন। কিন্তু তাহাতে আর আহ্লাদ কি? এ জীবনে কুসীর আর সুখ হইবে না। চিরকাল তাহাকে দুঃখে কাটাইতে হইবে।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আমি পথ চলিতে লাগিলাম। কিছুদূরে গিয়াছি, এমন সময়ে দেখিলাম যে, ষ্টেশনের দিক হইতে একখানি এক্কা আসিতেছে। রসময়বাবুর বাসা হইতে ষ্টেশন প্রায় তিন মাইল পথ। আমাকে দেখিয়া এক্কাওয়ালা জিজ্ঞাসা করিল,—'বাবু, ভাড়া হবে?'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'অমি হারাণবাবুর বাড়ী যাইব, সে স্থান হইতে পুনরায় রসময়বাবুর বাটীতে ফিরিয়া আসিব। কত নিবি?

ভাড়া চুক্তি হইল। আমি এক্কার উপর উঠিলাম। ঘোড়া ফিরাইয়া এক্কাওয়ালা আমাকে বলিল যে, এইমাত্র সে একজন বাঙ্গালী স্ত্রীলোককে ষ্টেশনে রাখিয়া আসিয়াছে।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'কি?'

এক্কাওয়ালা উত্তর করিল,—'কিছুক্ষণ পূর্বে একজন বাঙ্গালী স্ত্রীলোক আমার এক্কা ভাড়া করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে ষ্টেশনে লইয়া যাইলাম। সে স্থানে উপস্থিত হইয়া,

তিনি আমাকে লাহোরের টিকিট কিনিয়া দিতে বলিলেন। প্রাতঃকালে পাঁচটার সময় গাড়ী যায়। টিকিটবাবু আমাকে টিকিট দিলেন না। ষ্টেশনের নিকট যে সরাই আছে, স্ত্রীলোকটিকে আমি সেই স্থানে রাখিয়া আসিলাম। ভেটিয়ারাকে বলিয়া আসিয়াছি, পাঁচটার সময় সে তাঁহাকে টিকিট কিনিয়া দিবে।'

স্ত্রীলোকটি কিরূপ, তাহার বয়স কত, সেইসব কথা আমি এক্কাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। যেরূপ বিবরণ সে আমাকে দিল, তাহাতে আমি নিশ্চয় বুঝিলাম যে, সে স্ত্রীলোকটি কুসীর মাসী ব্যতীত অন্য কেহ নয়। হারাণবাবুর বাটী না গিয়া এক্কাওয়ালাকে আমি ষ্টেশনের নিকট সেই সরাইয়ে যাইতে বলিলাম। পুরস্কারের লোভে এক্কাওয়ালা দ্রুত এক্কা হাঁকাইয়া দিল।

আমি পুনরায় এই কথা সকলকে বলিয়া রাখি যে, যে স্থানে এই সমুদয় ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার প্রকৃত নাম আমি দিই নাই। স্থান সম্বন্ধে আমার কেহ কোনরূপ ভুল ধরিবেন না।

ষ্টেশনের নিকট সেই পান্থশালায় গিয়া আমি উপস্থিত হইলাম। পান্থনিবাসের প্রাঙ্গণে একটি খাটিয়ার উপর গালে হাত দিয়া বসিয়া কুসীর মাসী ভাবিতেছিলেন। এক্কা দাঁড়াইয়া রহিল। আমি সেই খাটিয়ার একপার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিলাম। মাসী আমাকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন।

আমি তাঁহাকে বলিলাম,—'এ কি আপনি ভাল কাজ করিয়াছেন? এখন বাড়ী চলুন।'

মাসী উত্তর করিলেন,—'আমি এ পোড়া-মুখ আর কাহাকেও দেখাইব না। আমি কাশী চলিয়া যাইব। সে স্থানে ভিক্ষা মাগিয়া খাইব।'

আমি বলিলাম,—'কাশী যাইতে হইবে কেন? হইয়াছে কি? আপনার সে কথা তো প্রকাশ হয় নাই। তবে আপনার ভাবনা কি?'

আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মাসী আমাকে বলিলেন,—'প্রকাশ হয় নাই! তুমি পাগল না কি!'

আমি উত্তর করিলাম,—'না, আমি পাগল নই। পাগলের লক্ষণ আমাতে আপনি কি দেখিলেন? আমি সত্য বলিতেছি, আপনার সে কথা প্রকাশ হয় নাই। অন্ততঃ আমি কাহাকেও কোন কথা বলি নাই। তাহার পর, আপনি যে কাজ করিতেছিলেন, তাহা স্থগিত হইয়া গিয়াছে। দিগম্বরবাবুর সহিত কুসীর বিবাহ হইবে না। তবে আর আপনার ভয় কি? বাড়ী চলুন।'

মাসী উত্তর করিলেন,—'তুমি পাগল!'

কুসুমের মাসী এরূপ কথা বলিলেন কেন, ইহার অর্থ আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কুসুমের যে একবার বিবাহ হইয়াছিল, আমি ব্যতীত উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে আর কেহ কি সে কথা অবগত আছে? পাছে সে প্রকাশ করে, সেই ভয়ে কি মাসী বাটী হইতে পলায়ন করিয়াছেন? কিন্তু যখন বিবাহ হইল না, তখন আর বিশেষ ভয়ের কারণ কি? কুসুমের পূর্ব-বিবাহ গোপন করিয়া মাসী এই কাণ্ড করিয়াছেন; সে কথা শুনিলে রসময়বাবু যে রাগ করিবেন, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু দৈবঘটনায় যখন বিবাহ বন্ধ

হইয়া গিয়াছে, তখন বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই। রসময়বাবুকে আমি বুঝাইয়া ঠাণ্ডা করিতে পারিব। এই মনে করিয়া বাটী যাইবার নিমিত্ত আমি কুসুমের মাসীকে বার বার অনুরোধ করিলাম। কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না। অবশেষে আমি বুঝিলাম যে, ইহার মন হইতে ভয় দূর করিতে একটু সময় লাগিবে। সেজন্য এখনকার কথা চাপা দিয়া, পুনরায় আমি সেই পূর্ব কথার উল্লেখ করিলাম।

আমি বলিলাম,—'আচ্ছা! ভাল! আপনি যদি একান্তই কাশী যাইবেন, আর আমি যদি একান্তই উচিত বিবেচনা করি, তাহা হইলে টিকিট কিনিয়া আমিই না হয় আপনাকে গাড়ীতে বসাইয়া দিব। কিন্তু গাড়ীর এখনও অনেক বিলম্ব আছে। গাড়ী সকালবেলা পাঁচটার সময় ছাড়িবে। এখনও বোধ হয় রাত্রি দুই প্রহর হয় নাই সেদিন কথা বলিতে বলিতে রসময়বাবু আসিয়া পড়িলেন। কথা শেষ হয় নাই। তাহার পর কি হইল?'

আমি তাঁহাকে কাশী পাঠাইয়া দিব, এই কথা শুনিয়া মাসী কিছু স্থির হইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—'সেদিন তুমি কোন পর্যন্ত শুনিয়াছিলে?'

আমি উত্তর করিলাম,—'লোচন ঘোষ নামক এক ব্যক্তি হীরালালের মৃত্যুসংবাদ দিয়া আপনাকে চিঠি লিখিয়াছিল। সেই চিঠির সঙ্গে একখানি খবরের কাগজও আসিয়াছিল। সেই চিঠি ও সেই কাগজ পড়িয়া কুসী অজ্ঞান হইয়া পড়িল। সেদিন আমি এই পর্যন্ত শুনিয়াছিলাম। তাহার পর কি হইল?

তাহার পর হইতে মাসী পূর্ব বৃত্তান্ত আমাকে বলিতে লাগিলেন। কিন্তু সে সমুদয় কথা মাসী আমাকে যেভাবে বলিয়াছেন, আমি সেভাবে বলিব না। আমি আমার নিজের ভাষায় সে বিবরণ প্রদান করিব।

সপ্তম পরিচ্ছেদ – ঘোর-বিকার

এখন আমামিদগকে সেই পুনরায় মেসোমহাশয়ের গ্রামে যাইতে হবে। দুই বৎসর পূর্বে সেই স্থানে যাহা ঘটিয়াছিল, এখন তাহাই আমি বলিব। লোচন ঘোষ যে চিঠি লিখিয়াছিল, কুসী তাহা ভালরূপে পাঠ করিল। তাহার সহিত যে সংবাদপত্র আসিয়াছিল, তাহাও সে ভালরূপে পাঠ করিল। চিঠি ও সংবাদপত্র পাঠ করিয়া এবার কুসীর যে মূর্চ্ছা হইল, সে মূর্চ্ছা আর সহজে ভাঙ্গিল না। সমস্ত রাত্রি কুসী অচেতন অবস্থায় রহিল। শেষ রাত্রিতে অতিশয় জ্বর হইল, চক্ষু দুইটি রক্তবর্ণ হইল, কপালে হাত দিয়া সে কাতরতাসূচক শব্দ করিতে লাগিল, এ-পাশে ও-পাশে সে মস্তক চালনা করিতে লাগিল। মাসী একদৃষ্টে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন, একটু ছিন্নবস্ত্র জলে ভিজাইয়া মাঝে মাঝে তাহার ওষ্ঠ ও চক্ষুদ্বয় মুছাইতে লাগিলেন। মাসী নিজেও একপ্রকার জ্ঞানহত হইয়াছিলেন। অশ্রুজলে ক্রমাগত তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র ভিজিয়া যাইতেছিল।

প্রাতঃকাল হইলে তিনি একজন প্রবীণ প্রতিবাসীকে ডাকিয়া আনিলেন। ইনি ভালরূপ নাড়ী পরীক্ষা করিতে জানিতেন। হাত দেখিয়া ইনি বলিলেন যে, কুসীর ঘোর জ্বর-বিকার

হইয়াছে। সত্বর ডাক্তার আনয়ন করা আবশ্যক।

মাসী পূর্বদিন দুইশত টাকা পাইয়াছিলেন। হীরালালের বন্ধু লোচন ঘোষ তাহা প্রেরণ করিয়াছিল। একজন প্রতিবেশীকে তিনি ডাক্তার আনিতে পাঠাইলেন।

ডাক্তার আসিয়াই কুসীর মস্তক মুণ্ডনের আদেশ করিলেন। নাপিত আসিল, কুসীকে নেড়া করিবার নিমিত্ত সমুদয় আয়োজন হইল। কিন্তু কুসী এরূপ অস্থির অবস্থায় ছিল, এরূপ উঠিতে বসিতেছিল ও মাথা নাড়িতেছিল যে, নাপিত ক্ষুর চালনা করিতে সাহস করিল না। মস্তক মুণ্ডন না করিবার আর একটি কারণ ছিল। কুসীর অলৌকিক রূপ দেখিয়া চুল কাটিয়া ফেলিতে দুইজনেরই মায়া হইল! সেই সময় দুই-তিনজন প্রতিবেশিনীও আসিয়া বলিলেন,—'তা কি কখন হয়! আইবুড়ো মেয়ে! সহজেই ইহার বিবাহ হইতেছে না। তাহার উপর নেড়া-বোঁচা করিলে, আর কি ইহার বিবাহ হইবে?'

কুসীর সেই কটিদেশ-লম্বিত ঘোর কৃষ্ণবর্ণের উজ্জ্বল কেশরাশি এইরূপে বাঁচিয়া গেল। সেই চুলের উপরেই ছিন্নবস্ত্র রাখিয়া ডাক্তার জলসিঞ্চন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতেও কুসীর জ্ঞান হইল না।

সেই দিন বৈকালবেলা কয়েকজন প্রতিবেশিনী কুসীকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। মাসী কুসীর নিকট বসিয়া কাঁদিতেছিলেন।

একজন প্রতিবেশিনী বলিলেন,—'আহা! কাঁদিবে না গা! ছয় দিনের মেয়ে মানুষ করিয়াছে। সংসারে ওর আর আছে কে, তা বল?'

আর একজন বলিলেন,—'আর শুনিয়াছ! সেই যে রামপদর সঙ্গে আমাদের গ্রামে একটি ছেলে আসিত, যাহার নাম মাণিকলাল না কি ছিল,—আহা! সে ছেলেটি মারা পড়িয়াছে। হঠাৎ নৌকাডুবি হইয়া মারা পড়িয়াছে। কর্তা খবরের কাগজে দেখিয়াছেন।'

আর একজন বলিল,—'তাহার নাম হীরালাল ছিল। ছেলেটি বড় ভাল ছিল। আহা! তার বাপমায়ের মন যে কি হইতেছে!'

অজ্ঞান অবস্থাতেই কুসী চীৎকার করিয়ে উঠিল,—'হীরালাল! বাবু! কোথায়! ইস! বাবু! তোমার কাপড়ে কি রক্ত! চাদর ফুটিয়া বাহির হইতেছে। যাই আমি ডাক্তার আনি।'

তৃতীয় প্রতিবেশিনী বলিলেন,—'তোমাদের বিবেচনা নাই। বিকারের রোগীর কাছে মৃত্যুসংবাদ দিতে নাই। তোমরা হীরালালের গল্প করিলে, আর কুসীও দেখ সেই কথা বকিতে লাগিল।'

ইহার পূর্বে প্রলাপের সহিত কুসী আরও অনেকবার 'বাবুর নাম করিতেছিল। প্রতিবেশিনীদিগের কথায় কুসীর মাসী কোন উত্তর করিলেন না।

কুসী প্রায় কুড়িদিন এইরূপ অজ্ঞান অবস্থায় রহিল। তাহার পর ক্রমে বিকার কাটিয়া গেল। ক্রমে ক্রমে সে স্থির হইল। ক্রমে কুসী আরোগ্যলাভ করিতে লাগিল।

এ যাত্রা কুসীর প্রাণরক্ষা হইল বটে, কিন্তু তাহার শরীর একেবারে ভগ্ন হইয়া গেল। সে গোল গড়ন ঘুচিয়া তাহার হস্ত পদ অস্থি-চর্ম সার হইল। সে উজ্জ্বল ফুট ফুটে গৌরবর্ণ

ঘুচিয়া একপ্রকার রক্তহীন পাণ্ডুবর্ণে তাহার মুখশ্রী আচ্ছাদিত হইল। তাহার ভাসা ভাসা চক্ষু দুইটি বসিয়া গেল। চক্ষুর কোলে কালি মারিয়া দিল। যে চক্ষুর বর্ণ আমি সূর্য্য-কিরণমিশ্রিত নীল সমুদ্রজলের সহিত তুলনা করিয়াছিলাম, কিরূপ ঘোলা হইয়া সে চক্ষু এখন বিবর্ণ হইয়া গেল। তাহার মনও বিকৃত হইয়াছিল। ঠিক উন্মাদ নয়। কোনরূপ উপদ্রব সে করিত না। কিন্তু সে কাহারও সহিত কথা কহিত না। একস্থানে চুপ করিয়া বসিয়া সর্বদাই সে কি ভাবিত। তাহার সহিত কোন কথা কহিলে সে উত্তর দিত না। সর্বদাই এরূপ অন্যমনস্ক ভাবে সে বসিয়া থাকিতে যে, কাহারও কথা সে শুনিতে পাইত কিনা সন্দেহ। কাছে দাঁড়াইয়া তিন চারিবার তাহাকে ডাকিলে, তবে তাহার চমক হইত। চমক হইয়া লোকের মুখপানে সে ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকিত। তাহার পর তো কেবল 'অ্যাঁ' এই কথাটি বলিয়া পুনরায় অন্যমনস্ক হইয়া যাইত। রোগ হইতে উঠিয়া প্রথম প্রথম কুসীর শরীর ও মনের অবস্থা এইরূপ হইয়াছিল। তাহারপর ক্রমে ক্রমে সে একটু যেন ভাল হইয়াছিল। তাহার সৌন্দর্য্য পুনরায় কিছু কিছু ফুটিয়াছিল, পূর্বাপেক্ষা তাহার মনে জ্ঞানের সঞ্চার হইয়াছিল। সকলের কথা সে বুঝিতে পারিত, দুই একটি কথার উত্তর ও প্রদান করিত। কিন্তু যতই হউক, কাশীতে আমি যে কুসী দেখিয়াছিলাম, সে কুসীর আর কিছুই ছিল না।

লোচন ঘোষ যে দুইশত টাকা প্রেরণ করিয়াছিল, তাহার অধিকাংশ কুসীর চিকিৎসায় খরচ হইয়া গেল। কুসীর মাসীর বড় চিন্তা হইল। হীরালাল নাই। তাঁহার নিজের যাহা হউক, কুসীকে এখন কে প্রতিপালন করিবে? তিনি অকুল পাথার দেখিতে লাগিলেন। ভাবিয়াচিন্তিয়া আর কোন উপায় ঠিক করিতে না পারিয়া, তিনি কুসীর পিতাকে একখানি পত্র লিখিলেন। কুসীর মেসো-মহাশয়ের কাল হইয়াছে, তাঁহারা নিঃসহায় হইয়া পড়িয়াছেন, চিঠিতে কেবল সেই কথা লিখিলেন। কুসীর যে বিবাহ হইয়াছিল, তাহার পর কুসী যে বিধবা হইয়াছে, ভগিনীপতিকে সে সকল কথা তিনি কিছু লিখিলেন না। তিনি ভাবিলেন যে, এখনও কন্যা অবিবাহিতা আছে, এই কথা মনে করিয়া তিনি চিন্তিত হইবেন ও সত্বর পত্রের উত্তর প্রদান করিবেন। যে কারণেই হউক, তিনি কুসীর বিবাহের কথা চিঠিতে উল্লেখ করে নাই।

সৌভাগ্যক্রমে সেই বর্মাণীর মৃত্যু হইয়াছিল। রসময়বাবুর চক্ষু উন্মুক্ত হইয়াছিল। অনেক কষ্টে পানদোষ হইতে তিনি নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন। শালীর পত্র পাইয়া তাঁহার মনে অতিশয় অনুতাপ হইল। কন্যার প্রতি তিনি যে অতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছেন, তখন তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। পত্রের উত্তরে তিনি কুসীর মাসীর নিকট টাকা পাঠাইলেন ও কুসীর বিবাহের নিমিত্ত একটি সুপাত্রের অনুসন্ধান করিতে বলিলেন। এই সম্বন্ধে তিনি লিখিলেন,—'ছুটীর জন্য আমি দরখাস্ত করিয়াছিলাম; কিন্তু ছুটী পাইলাম না। মনে করিয়াছিলাম যে, আমি নিজে দেশে গিয়া একটি পাত্র অনুসন্ধান করিয়া কুসুমের বিবাহ দিব; কিন্তু তাহা হইল না। তোমরাই একটি সুপাত্র অনুসন্ধান করিয়া আমাকে লিখিবে।

আমি বিবাহের খরচ পাঠাইয়া দিব।'

এই পত্র পাইয়া কুসুমের মাসী চুপ করিয়া রহিলেন। পাত্রের আর কি অনুসন্ধান করিবেন। তাহা কিছু করিলেন না, কুসীর যে বিবাহ হইয়াছিল, ভগিনীপতিকে তাহাও তিনি লিখিলেন না। তাহার পর, প্রতি পত্রে রসময়বাবুর কন্যার বিবাহের কথা লিখিতেন কিন্তু কুসুমের মাসী সে বিষয়ের কোন উত্তর দিতেন না। কুসীর পুনরায় যে তিনি বিবাহ দিবেন, সে চিন্তা এখনও তাঁহার মনে উদয় হয় নাই, স্বপ্নেও তিনি তাহা ভাবেন নাই।

অষ্টম পরিচ্ছেদ – মাসীর চিন্তা

ইহার অল্পদিন পরে, কুসুমের মাসী আর একখানি পত্র পাইলেন। তাহাতে রসময়বাবু লিখিয়াছিলেন,—'আমি পঞ্জাবে বদলি হইয়াছি। আমি ভাবিয়াছিলাম যে, পঞ্জাবে যাইবার সময় কলিকাতায় কিছুদিন অবস্থিতি করিতে অনুমতি পাইব, আর সেই অবসরে কন্যার বিবাহ দিতে পারিব, কিন্তু তাহা হইল না। আমাকে সোজা পঞ্জাবে যাইতে হইবে। একদিনও আমি কলিকাতায় থাকিতে পাইব না। অতএব তুমি একটি সুপাত্র ঠিক করিয়া রাখিবে। সব ঠিক করিয়া রাখিবে। সব ঠিক হইলে, পনের ষোল দিনের ছুটী লইয়া আমি পঞ্জাব হইতে কলিকাতায় আসিব, আসিয়া কুসুমের বিবাহ দিব।'

এ পত্র পাইয়াও কুসুমের মাসী চুপ করিয়া রহিলেন। হীরালালের সহিত কুসুমের বিবাহের কথা তিনি ভগিনীপতিকে জানাইলেন না। কিন্তু পুনরায় যে কুসীর বিবাহ দিবেন, এখনও সে চিন্তা তাঁহার মনে উদয় হয় নাই, এখনও সে কথা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই।

কিছুদিন পরে পঞ্জাব হইতে রসময়বাবু পত্র লিখিলেন। অন্যান্য কথার পর তিনি লিখিলেন,—'কুসুমের পাত্র ঠিক করিবার নিমিত্ত আমি তোমাকে বার বার লিখিতেছি। মনে করিয়া দেখ, কন্যা কত বড় হইয়াছে। সে আমার দোষ বটে। কিন্তু যা হইবার তাহা হইয়াছে। এখন আর নিশ্চিত থাকা উচিত নহে। এ সম্বন্ধে তুমি কতদূর কি করিলে, শীঘ্র তুমি তাহা আমাকে লিখিবে।'

এই পত্র পাইয়া কুসীর মাসী আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। কিন্তু কুসীর যে বিবাহ হইয়া গিয়াছে, সে কথা তিনি এখনও ভগিনীপতিকে লিখিলেন না।

তিনি মনে করিলেন যে, সাক্ষাৎ হইলে আদ্যোপান্ত সে সমুদয় বৃত্তান্ত তিনি কুসীর পিতাকে বলিবেন। আপাততঃ তিনি এই কথা লিখিলেন,—'আমি স্ত্রীলোক। কি করিয়া আমি পাত্রের অনুসন্ধান করিব? ঘটক কোথায় থাকে, তাহাও আমি জানি না। তুমি নিজে যাহা হয় করিবে। এতদিন যখন গিয়াছে, তখন আর কিছুদিন বিলম্ব হইলে বিশেষ কোন ক্ষতি নাই।'

এই পত্র পাইয়া রসময়বাবু পুনরায় ছুটির জন্য আবেদন করিলেন, কিন্তু তিনি ছুটি পাইলেন না। ইহার কিছুদিন পূর্বে পঞ্জাবেই দিগম্বরবাবুর সহিত তাঁহার আলাপ হইয়াছিল। তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছে, পুনরায় বিবাহ করিতে তাঁহার ইচ্ছা আছে, তাঁহার অনেক গহণা আছে, কোম্পানীর কাগজ আছে, সে সমুদয় কাগজ তিনি নূতন বধূর নামে লিখিয়া দিবেন, দেশে

তাঁহার অনেক সম্পত্তি আছে, এইরূপ কথা সকলের নিকট তিনি সর্বদাই প্রকাশ করিতেন। শালী পাত্রের অনুসন্ধান করিতে পারিলেন না। তাঁহাকে নিজে গিয়া সেকাজ করিতে হইলে অধিক দিনের ছুটী আবশ্যক সে ছুটী তিনি পাইলেন না। সাহেব কেবল পনের দিনের নিমিত্ত তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইলেন। পথে তাঁহার সাত আট দিন কাটিয়া যাইবে। অবশিষ্ট কয়দিনে পাত্র অনুসন্ধান ও বিবাহ শেষ হইতে পারে না। তিনি হিসাব করিয়া দেখিলেন যে কন্যার বয়স ষোল বৎসর হইয়াছে।

রয়ময়বাবু ভাবিলেন যে,—'কন্যার বিবাহ আমাকে দিতেই হইবে। আর আমি তাহাকে অবিবাহিতা রাখিতে পারি না।'

নিরুপায় হইয়া দিগম্বরবাবুর সহিত তিনি সম্বন্ধ স্থির করিলেন। দিগম্বরবাবুর সহিত বিবাহের কথা যখন রসময়বাবু আমাকে প্রথম বলিয়াছিলেন, তখন তাঁহার পূর্ব-আচার-ব্যবহার স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রতি আমার বড়ই অভক্তি হইয়াছিল। কিন্তু মাসীর মুখে এখন সবিশেষ বৃত্তান্ত শুনিয়া অনেকটা তাঁহাকে নির্দোষ বলিয়া আমার প্রতীতি হইল। দিগম্বরবাবুর সহিত বিবাহ স্থির করিয়া তিনি শালীকে পত্র লিখিলেন—রসময়-বাবু লিখিলেন—'আমি কুসুমের জন্য এস্থানে একটি পাত্র স্থির করিয়াছি। তিনি দেশে গিয়া বিবাহ করিতে পারিবেন না। এইস্থানে কুসুমকে আনিয়া বিবাহ দিতে হইবে। তুমিও কুসুম ঠিক থাকিবে। পনের দিনের ছুটী লইয়া আমি দেশে যাইতেছি। শীঘ্রই দেশে গিয়া তোমাদিগকে এইস্থানে লইয়া আসিব।'

এই পত্র পাইয়া কুসুমের মাসীর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। তিনি ভাবিলেন,—'আমি মনে করিয়াছিলাম যে, যখন সে পাত্র অনুসন্ধান করিতে দেশে আসিবে, তখন আমি সকল কথা তাহাকে খুলিয়া বলিব। খোট্টার দেশে যে আবার পাত্র মিলিবে, তাহা আমি কেমন করিয়া জানিব? এখন আমি করি কি? পাত্র ঠিক করিয়া মেয়ে লইতে সে দেশে আসিতেছে। এখন আমি তাহাকে কি করিয়া বলি যে, তোমার মেয়ের বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তোমার মেয়ে বিধবা হইয়াছে।' কুসুমের মাসী অতিশয় চিন্তিত হইলেন।

এই সময় তাঁহাকে গ্রামে এক দো-পড়া মেয়ে লইয়া দলাদলি হইয়াছিল। সে কন্যাটির পিতামাতা প্রথম একস্থানে মেয়েটিকে বিক্রয় করে, অর্থাৎ টাকা লইয়া একজনকে কন্যাটি সম্প্রদান করে। কিছুদিন পরে, তাহার মাতামহের বাড়ীতে পাঠাইয়া, তাহাকে আর একটি লোকের নিকট বিক্রয় করে। সেই বিষয় লইয়া এখন মোকর্দ্দমা মামলা ও দলাদলি চলিতেছিল। কন্যার দুই পতিতে পতিতে মোকর্দ্দমা, শ্বশুর-জামাতার মোকর্দ্দমা আর গ্রামের দুইপক্ষে দলাদলি। কুসুমের মাসী বাল্যকাল হইতে যতগুলি দো-পড়া মেয়ের কথা শুনিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া দেখিলেন। মনে মনে তিনি বলিলেন,—'ঐ দেখ রঘুর মা। ওর দুইবার বিবাহ হইয়াছিল, এখন কেমন তাহার সুখ-ঐশ্বর্য্য হইয়াছে। আমি যদি চুপ করিয়া থাকি, আর একাজ যদি হইয়া যায়, তাহা হইলে দো-পড়ার মত ততটা' দোষের কথা হয় না। হীরালাল নাই সেজন্য 'ততটা' দোষের কথা হয় না। হীরালালকে তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। একটি দীর্ঘনিশ্বাস তিনি পরিত্যাগ করিলেন, তাঁহার চক্ষুতে জল আসিয়া গেল।

ইহার মধ্যে একটা একাদশী পড়িল। একদশী করিতে মাসী,—'কুসীকে বার বার মানা করিতেন; কিন্তু কুসী তাহা শুনিত না। সে নিরম্বু উপবাস করিত। গ্রীষ্মকাল পড়িয়াছে, এই একাদশীর দিন সূর্য্যের বড়ই উত্তাপ হইল। জল-পিপাসায় তাহার বুকের ছাতি ফাটিয়া যাইতে লাগিল। সমস্তদিন কুসী মাথায় ও গায়ে জল ঢালিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া মাসীর মনোদুঃখের আর সীমা-পরিসীমা রহিল না। দো-পড়া মেয়ের কথা এখন হইতে সর্বদাই তাঁহার মনে জাগিতে লাগিল।। তা যদি হয়, তবে এ বা নয় কেন? তিনি এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, কি করা কর্তব্য, এখনও মাসী তাহাস্থির করিতে পরিলেন না। কিন্তু পঞ্জাবে যাইবার নিমিত্ত তিনি জিনিষপত্র গুছাইতে গুছাইতে ভাঙ্গা বাক্স হইতে লোচন ঘোষের চিঠি ও সেই খবরের কাগজ বাহির হইল। পোড়াইবার নিমিত্ত সেই দুইখানি কাগজ মাসী রান্নাঘরে লইয়া গেলেন। উনানে ফেলিয়া দিবার পূর্বে তিনি চিঠিখানি একবার পড়িয়া দেখিলেন। তাহার পর খবরের কাগজের সেই স্থানটিও পাঠ করিলেন। সেই লাল চিহ্নিত স্থানটি পাঠ করিয়া, তিনি কাগজখানি এ-দিক ও-দিক দেখিতে লাগিলেন। সহসা আর একটি স্থানে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। আর একটি সংবাদের প্রারম্ভে বড বড় অক্ষরে 'বিধবা-বিবাহ এই দুইটি কথা ছিল। কোন স্থানে এক বিধবা-বিবাহ হইয়াছিল। সংবাদরূপে সেই বিবরণ খবরের কাগজে প্রকাশিত হইয়াছিল। চিঠি ও খবরের কাগজ মাসী আর পোডাইলেন না, কাগজ দুইখানি পুনরায় তুলিয়া বাখিলেন।

মাসী ভাবিতে লাগিলেন, তবে বিধবা-বিবাহ হয়। বিদ্যাসাগরের কথা তিনি শুনিয়াছিলেন।

আমার মুখপানে চাহিয়া কুসুমের মাসী বলিলেন,—'দেখ ডাক্তারবাবু। কুসীকে আমি প্রতিপালন করিয়াছিলাম। তাহার অবস্থা দেখিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল; আমি ভাবিলাম যে, ইহাতে যদি কোন পাপ থাকে তো সে পাপ আমার হউক, কুসীর যদি পুনরায় বিবাহ হয় তো হউক, তাহাকে আমি প্রতিবন্ধক হইব না। কিন্তু আমি তখন এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিলাম যে, ইহাতে কোন পাপ নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় পণ্ডিত, ধার্মিক, দয়াবান, পরপোকারী লোক ছিলেন। ইহাতে যদি পাপ থাকিত, তাহা হইলে কখনই তিনি বিধান দিতেন না।'

আমি বলিলাম,—'যে সকল বালিকা অতি অল্পবয়সে বিধবা হয়, স্বামীর সহিত যাহাদের কখন সাক্ষাৎ হয় নাই, সংসার-ধর্মের বিষয়ে যাহারা কিছুই জানে না, এইরূপ বিধবা বালিকাদিগের পুনরায় বিবাহ নিমিত্ত বিদ্যাসাগর-মহাশয় বিধান দিয়াছিলেন।'

মাসী উত্তর করিলেন,—'অতশত আমি বুঝি নাই। কুসীর পুনরায় বিবাহ হইলে যে কোন পাপ হইবে না, তাহাই ভাবিয়া সে সময় আমি মনকে প্রবোধ দিলাম। আমি ভাবিলাম যে, আমি নিজে উদ্যোগ করিয়া এ কাজ করিব না। তবে হয় হউক তাহাতে আমি আপত্তি করিব না। এইরূপ ভাবিলাম বটে, কিন্তু হীরালালের জন্য আমার মনে যে কি শোক উথলিয়া উঠিল, তাহা আর তোমাকে আমি কি বলিব। যাহা হউক, আমি পঞ্জাবে আসিবার জন্য ব্যস্ত হইতে লাগিলাম, আর কুসীর নিকট এ কথা কি করিয়া বলিব, তাহাকে কি

করিয়া সম্মত করিব, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম।'

নবম পরিচ্ছেদ -- তিন সত্য

পাঁচ ছয় দিনের পরে রসময়বাবুর নিকট হইতে মাসী আর একখানি পত্র পাইলেন। সে পত্রখানি তিনি কলিকাতা হইতে লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন,—'আমি কলিকাতায় পৌঁছিয়াছি। এ স্থানে আসিয়া আর একটি বিশেষ কার্য্যে আমি ব্যস্ত আছি। সেজন্য তোমাদিগকে আনিতে আমি নিজে যাইতে পারিব না। গ্রামের কোন লোককে সঙ্গে লইয়া তোমরা কলিকাতায় আসিবে।'

কলিকাতায় আসিয়া রসময়বাবু কি এমন বিশেষ কার্যে ব্যস্ত হইয়াছেন? পঞ্জাবে থাকিতেই তাঁহার বিবাহের কথা হইয়াছিল। সে-কন্যা দেশে ছিল। কলিকাতা আসিয়া সেই কথা পাকাপাকি হইল। তিনি কন্যা দেখিলেন। কন্যা বয়ঃস্থা ছিল, দেখিতে শুনিতে নিতান্ত মন্দ নয়। বর্মণীর মৃত্যুর পর হইতে তাঁহার মন নিতান্ত উদাস ছিল। পুনরায় বিবাহ করিতে তাহার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু নিজের নিকট নিজে তিনি সে ইচ্ছা গোপন করিতে লাগিলেন। আপনার মনকে আপনি তিনি এই বলিয়া বুঝাইলেন, 'আমার বয়স হইয়াছে, এ বয়সে পুনরায় আর বিবাহ না করাই ভাল। কিন্তু, আমি যদি কেবল শালী ও কন্যাকে লইয়া পঞ্জাবে যাই, তাহা হইলে লোকে বলিবে, মেয়ে ঘাড়ে করিয়া আনিয়া বিবাহ দিল। তাহার চেয়ে যদি আমি বিবাহ করিয়া পরিবার লইয়া পঞ্জাবে যাই, আর সেইসঙ্গে আমার কন্যা ও অভিভাবক-স্বরূপ বৃদ্ধা শালীকে যদি লইয়া যাই, তাহা হইলে কেহ আর সে কথা বলিতে পারিবে না।' এইরূপ তর্ক-বিতর্ক করিয়া রসময়বাবু আপনার মনকে বুঝাইলেন, মনকে বুঝাইয়া তিনি নিজের বিবাহের কার্যে ব্যস্ত হইলেন। বিবাহের পর পঞ্জাবে যাইবার কেবল দুই দিন পূর্বে যাহাতে কুসুম ও তাহার মাসী কলিকাতা আসিয়া উপস্থিত হয়, রসময়বাবু সেইরূপ দিন ধার্য্য করিয়া তাহাদিগকে পত্র লিখিয়াছিলেন। কলিকাতায় আসিয়া রসময়বাবু এক বন্ধুর বাটীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সেই স্থান হইতেই তাঁহার বিবাহ হইবে, এইরূপ স্থির হইয়াছিল। কুসুম ও তাঁহার মাসীকে কলিকাতায় সেই ঠিকানায় আসিতে লিখিয়াছিলেন।

কলিকাতায় এদিকে রসময়বাবুর বিবাহ হইয়া গেল, গ্রামে ওদিকে কুসুম ও তাহার মাসীর যাত্রা করিবার সময় উপস্থিত হইল। কলিকাতা যাইবার পূর্বদিন রাত্রিতে বিছানায় শয়ন করিয়া মাসী বলিলেন,—'কুসুম! মা আমার!'

কুসী উত্তর করিল,—'কি , মাসী!' মাসী বলিলেন,—'আমি তোমাকে একটা কথা বলি?'

কুসী জিজ্ঞাসা করিল,—'কি মাসী?'

মাসী বলিলেন,—'তুমি বল, আমি যাহা বলিব, তাহা করিবে?'

কুসী কাহারও সহিত অধিক কথা কহিত না। সকল কথা তাহার কর্ণগোচর হইত কি

না, তাহাও সন্দেহ—সর্বদাই সে অন্যমনস্কভাবে থাকিত। 'হাঁ' কি 'না' এই দুইটি কথার অধিক সে বলিত না। কুসী জিজ্ঞাসা করিল,—'কি মাসী?'

মাসী উত্তর করিলেন,—'আগে তুমি তিন সত্য করিয়া স্বীকার কর যে, আমি যাহা বলিব, তাই তুমি করিবে, তবে আমি বলিব।' কুসী বলিল,—'হাঁ মাসী।'

মাসী বলিলেন,—'তুমি আমার গায়ে হাত দিয়া বল!'

কুসী ইহার মর্ম কিছুই বুঝিতে পারে নাই। মাসীর সকল কথা সে শুনিয়াছিল কি না, তাহাও সন্দেহ। মাসীর গায়ে হাত দিয়া সে বলিল,—'হাঁ মাসী?'

মাসী বলিল,—'দেখ কুসী। তোমার যে একবার বিবাহ হইয়াছিল, কলিকাতা গিয়া সে কথা তুমি তোমার বাপকে কি কাহাকেও বলিতে পারিবে না। কেমন, বলিবে না বল?'

অন্যমনস্কভাবে কুসী বলিল,—'না, মাসী।'

মাসী বলিলেন,—'আমার মাথা খাও, তুমি সে কথা কাহাকেও বলিবে না। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে যে, তুমি একবেলা ভাত খাও কেন, তুমি মাছ খাও না কেন, একাদশীর দিন উপবাস কর কেন, আমি সকলকে বলিব যে, কবিরাজ এইরূপ করিতে বলিয়াছে। তুমি যেন আর কিছু বলিয়া ফেলিও না।' পুনরায় অন্যমনস্কভাবে কুসী বলিল,—'না মাসী।'

কুসী কাহারও সহিত কথা কহে না, বুদ্ধিশুদ্ধি-হীন একপ্রকার জড়ের মত সে হইয়া আছে। সে যে কাহাকেও কোন কথা বলিবে না, সে বিষয়ে মাসী একরূপ নিশ্চিত হইলেন। কিন্তু পুনরায় তাহার বিবাহ হইবে, এই কথা শুনিলে সে কি করিবে, সে কি বলিবে, সে সম্বন্ধে মাসী নিশ্চিত হইতে পারিলেন না। যাহা হউক, সে রাত্রিতে এই পর্যন্ত কথাবার্তা হইল। পুনরায় যে তাহার বিবাহ হইবে, সে রাত্রিতে মাসী তাহাকে বলিল না।

কুসীকে লইয়া মাসী কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। কুসী পিতাকে গিয়া প্রণাম করিল। ছয়দিনের কন্যাকে চকিতের ন্যায় একবার তিনি দেখিয়াছিলেন। তাহার পর আজ পুনরায় তাহাকে দেখিলেন। পিতা তাহাকে নানারূপ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু কুসী ঘাড় হেঁট করিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল, কেবল 'হাঁ' কি 'না' বলিয়া দুই একটি প্রশ্নের উত্তর দিল। রসময়বাবু দেখিলেন যে, তাঁহার কন্যা পীড়িতা; তাহার মনের অবস্থা বিষয়েও তাঁহার সন্দেহ জন্মিল। তাহার জ্বর-বিকারের কথা মাসী তাঁহাকে পূর্বেই বলিয়াছিলেন। বাত-শ্লেষ্মা বিকারের পর কাহারও কাহারও এইরূপ হয়, তিনি তাহা শুনিয়াছিলেন। তিনি মনে করিলেন যে, বায়ু-পরিবর্তন করিলে, ভালরূপ আহার পাইলে, তাহার পর বিবাহ হইলে, রোগ ভাল হইয়া যাইবে। এই সময় কুসীর বামগালে সেই কালো দাগটির প্রতি রসময়বাবুর দৃষ্টি পড়িল। সেই দাগটিকে ঠিক আঁচিল বলিতে পারা যায় না। আঁচিলের ন্যায় ইহা তত স্থূল নহে, তিলের মত ইহা তত ক্ষুদ্র নহে, ইহাকে সচরাচর লোকে জরুল না কি বলে।

রসময়বাবু যে পুনরায় বিবাহ করিয়াছেন, কলিকাতায় আসিয়া মাসী তাহা জানিতে পারিলেন। নব-মাতার সহিত কুসুমের সাক্ষাৎ হইল। তিনি নূতন বধূ, এক হাত ঘোমটা

দিয়া থাকেন। কুসীর মনের তো ঐ অবস্থা। দুইজনে কথা বড় কিছু হইল না। কুসীর যে পুনরায় বিবাহ হইবে, কলিকাতায় থাকিতে কুসী তাহা জানিতে পারে নাই। নববধূ হয় তো সে কথা জানিতেন না। তিনি সে বিষয়ে কুসুমকে কিছু বলেন নাই, মাসীও কিছু বলেন নাই।

পরদিন ফটোগ্রাফ গ্রহণের ধূম পড়িয়া গেল। পঞ্জাব হইতে আসিবার সময় রসময়বাবুকে দিগম্বরবাবু পৈ-পৈ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন যে, কন্যার যেন ফটোগ্রাফ গৃহীত হয়। রসময়বাবু নিজের নববিবাহিতা পত্নীর ও কুসীর ফটোগ্রাফ লইলেন। কুসী কোনও কথাতেই নাই। তোমরা যা কর; কোন বিষয়ে, আপত্তি করিবার তাহার শক্তি নাই। কিন্তু নববধূর ছবি বড় সহজে হয় নাই। মুখ খুলিতে তিনি কিছুতেই সম্মত হন নাই। অনেক সাধ্য-সাধনায়, অবশেষে কিছু তিরস্কারের পর তবে এ কাজ হইয়াছিল।

রসময়বাবু সপরিবারে পঞ্জাব আসিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। পথে লাহোরে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইল। উজিরগড়ে উপস্থিত হইয়া, বিবাহের কথা ক্রমে ক্রমে কুসীর কানে উঠিল। সহজেই কুসী স্তম্ভিত হইল। স্তম্ভিত সামান্য কথা, চলিত কথায় যেমন বলে,—'আক্কেল গুড়ুম, কুসীর তাহাই হইল।

রাত্রিতেই মাসীর নিকট কুসী শয়ন করিত। সেই রাত্রিতেই সে মাসীকে বলিল,—'মাসী এ কি কথা শুনিতে পাই!'

মাসী জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কি কথা? কুসী উত্তর করিল,—'আবার বে!'

মাসী বলিলেন,—'হাঁ, আমি তোমার পুনরায় বিবাহ দিব।'

কুসী বলিল,—'ছি মাসী! ও কথা মুখে আনিও না।'

মাসী বলিলেন,—'কুসী! তুমি আমার কাছে তিন সত্য করিয়াছ; আমার গায়ে হাত দিয়া বলিয়াছ যে, আর একবার তোমার যে বিবাহ হইয়াছিল, সে কথা তুমি কাহাকেও বলিবে না।'

কুসী বলিল,—'কিন্তু আবার বে করিব, এ কথা তো বলি নাই।'

মাসী বলিলেন,—'তা বল আর নাই বল, আমরা তোমার পুনরায় বিবাহ দিব।'

কুসী বলিল,—'মাসী! এ কাজ কিছুতেই হইবে না।'

মাসী বলিলেন,—'দেখ কুসী! ছয় দিনের মেয়ে আমার হাতে দিয়া তোমার মা চলিয়া গেল। সেই অবধি আমি তোমাকে প্রতিপালন করিয়াছি। প্রাণের অপেক্ষা তোমাকে আমি ভালবাসি। আজ দুই বৎসর তোমার মুখপানে চাহিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। তোমার এ অবস্থা আমি আর দেখিতে পারি না। তোমার ভালর জন্য আমি এ কাজ করিতেছি।'

কুসী পুনরায় বলিল,—'না মাসী! এ কাজ কিছুতেই হইবে না।'

মাসী বলিলেন,—'পূর্বের কথা কিছুতেই প্রকাশ হইবে না। রামপদ নাই, সে কথা আর কেহ জানে না। তোমার যে একবার বিবাহ হইয়াছিল, তোমার বাপ তাহা জানে না।

তাহাকে আমি সে কথা বলি নাই। তোমাকে আইবুড়ো মনে করিয়া, সে এই বিবাহের আয়োজন করিয়াছে। ভাল বর ঠিক হইয়াছে। সে তোমাকে ভাল ভাল কাপড় দিবে, ভাল ভাল গহনা দিবে, তোমার নামে কোম্পানীর কাগজ লিখিয়া দিবে।'

কুসী বলিল,—'না মাসী! এ কাজ কিছুতেই হইবে না।'

মাসী বলিলেন,—'এখন আর কি করিয়া বন্ধ হইবে? এখন যদি আমি গিয়া তোমার বাপকে বলি যে, কুসীর আর একবার বিবাহ হইয়াছিল, তাহা হইলে সে কি মনে করিবে! তাহাকে না বলিয়া পূর্বে তোমার বিবাহ দিয়াছি তাহার পর সে বিবাহ আমি এতদিন গোপন করিয়াছি, এজন্য তোমার বাপ চাই কি আমাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিতে পারে। এ বৃদ্ধবয়সে তাহা হইলে আমি কোথায় যাইব! তোমার কি ইচ্ছা যে, আমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াই?'

কুসী চুপ করিয়া রহিল।

মাসী পুনরায় বলিলেন,—'দেখ কুসী! এখন আর উপায় নাই। এ কাজ আর বন্ধ হয় না। এখন যদি তুমি তোমার বাপকে বলিয়া দাও, তাহা হইলে এ মুখ আর আমি কাহাকেও দেখাইতে পারিব না। আমি তাহা হইলে গলায় দড়ি দিয়া মরিব।'

কুসী চুপ করিয়া রহিল। অনেকক্ষণ চুপ থাকিয়া কুসী বলিল,—'মাসী! তুমি যাহা বলিলে, আমি তাহা শুনিলাম। এখন আমি যাহা বলি, তুমি শুন! এ বিবাহ কিছুতেই হইবে না। এ কাল-বিবাহ হইবার পূর্বেই আমি মরিয়া যাইব।'

মাসীর সহিত এতক্ষণ কুসী যেভাবে কথা কহিল, তাহাতে তাহার মনের যে কিছু বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছিল, তাহা বোধ হয় না। কুসী পাগল হয় নাই, বায়ুগ্রস্ত হয় নাই, এই দুই বৎসর সে দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন ছিল। দুঃখের ভারে তাহার হৃদয় একেবারে ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। সে অবস্থায় পৃথিবীর কোন বিষয়ে সে আর কি করিয়া লিপ্ত হয়! কি করিয়া সে আর লোকের সহিত কথা কয়! তাহার চক্ষু, তাহার কর্ণ, তাহার বাক্‌শক্তি, তাহার মন, তাহার প্রাণ সর্বদা সেইখানে ছিল,—সেই যেখানে হীরালাল।

যদি সন্ন্যাসীঠাকুর না আসতেন, তাহা হইলে আমার বোধ হয়, কুসী আজ রাত্রিতেই মারা পড়িত।

'আমি অমুক দিন মারা পড়িব' এইরূপ ভাবিয়া অনেক লোক মারা পড়িয়াছে। কিম্বা 'তুমি অমুক দিন মারা পড়িবে' এইরূপ শুনিয়াও অনেক লোক মারা পড়িয়াছে। একপ্রকার বিদ্যা আছে তাহাকে হিপনটিসম (Hypnotism) বলে; তাহাতে মানুষের মনের অবস্থা পরিবর্তিত করিতে পারা যায়। তাহার মনের অবস্থা পরিবর্তন করিয়া, তাহাকে তুমি যেরূপ চিন্তা করিতে বলিবে, যে কাজ করিতে বলিবে, সে তাহা করিবে। এইরূপ মনের অবস্থা কোন কোন লোকের নিজে নিজেই হয়। তখন সে যেরূপ চিন্তা করে কার্য্যে তাহা পরিণত হয়। ইহাকে স্বতঃপ্রবৃত্তি (Selfsuggestion) বলে। কুসীরও বোধ হয়, তাহাই ঘটিয়াছিল। যেদিন হইতে সে বিবাহের কথা শুনিয়াছিল, সেইদিন হইতে সে আরও শীর্ণ,

আরও বিবর্ণ হইতে লাগিল।

বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল বটে, কিন্তু তাহার জন্য সে ভীত হইল না। আর একবার যে তাহার বিবাহ হইয়াছিল সে প্রকাশ করিল না। সে নিশ্চয় বুঝিয়াছিল যে, এ বিবাহের পূর্বেই সে মরিয়া যাইবে। পিতার মিছামিছি টাকা খরচ হইতেছে সেজন্য সে সর্বদা বলিত,—'এ সব কেন! আমি পূর্বেই মরিয়া যাইব।' সাহস করিয়া একদিন তাহার পিতার নিকটে গিয়াও সে এই কথা বলিয়াছিল। কিন্তু তাহার কথা কেহই শুনিলেন না। সে বায়ুগ্রস্ত হইয়াছে, বিবাহ হইলেই সব ভুলিয়া যাইবে, এই কথা বলিয়া পিতা ও মাসী তাহার কথা উড়াইয়া দিলেন। এই অবস্থায় আমি রসময়বাবুর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

মাসীর বিবরণ সমাপ্ত হইল! পুনরায় বলি যে মাসীর এই পূর্ব বিবরণ আমি আমার নিজের ভাষায় প্রদান করিলাম। এই বিবরণ সম্বন্ধে আমি নিজে যাহা দেখিয়াছি ও ইহার পবে অন্যান্য লোকের মুখ হইতে যাহা অবগত হইয়াছি, তাহাও যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছি।

দশম পরিচ্ছেদ – ভগবান রক্ষা করিয়াছেন

মাসীর কথা সমাপ্ত হইলে, আমি তাঁহাকে বলিলাম যে,—'তবে এখন বাড়ী চলুন!

মাসী উত্তর করিলেন,—বাড়ী! রায়মহাশয়ের বাড়ীতে আর আমি যাইব না। এ পোড়া মুখ আর সেখানে আমি দেখাইব না।'

আমি বলিলাম,—'কুসীর একবার বিবাহ হইয়া গিয়াছে শুনিলে রসময়বাবু রাগ করিবেন বটে, কিন্তু আপনি কুসীর ভালর জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। যাহা হউক, কুসীর আজ যখন বিবাহ হইয়া যায় নাই, তখন বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই। সেজন্য আমি তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে পারিব। আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে, তিনি আপনাকে একটি কথাও বলিবেন না। আর একটি কথা, কুসীর যে একবার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, সে কথা এখন তাঁহাকে বলিবার বা আবশ্যক কি? পুনরায় যখন তিনি পাত্রের অনুসন্ধান করিবেন, সেই সময় তাঁহাকে বলিলেই চলিবে।'

মাসী বলিলেন,—'তোমার কথা আমি বুঝিতে পারি না। তুমি বলিতেছ যে, কুসীর পূর্ব-বিবাহের কথা প্রকাশ হয় নাই। তবে দিগম্বরবাবুর সহিত তাহার বিবাহ বন্ধ হইল কি করিয়া?'

আমি উত্তর করিলাম,—আপনি তা জানেন না? না,—তখন আপনি সে স্থানে ছিলেন না। আপনি বাড়ীর ভিতর চলিয়া গিয়াছিলেন। দিগম্বরবাবুর স্ত্রী আছেন। তাঁহার গৃহ শূন্য হয় নাই, সে মিথ্যা কথা। ফাঁকি দিয়া তিনি এই বিবাহ করিতেছিলেন। তাঁহার সেই স্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বাপ! এমন মেয়েমানুষ কখন দেখি নাই। তাহার পর সঙ্গে যে দাসীটি আনিয়াছেন, সে-ও এক ধনুর্দ্ধর! এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ। আমি মনে করিলাম সভার মধ্যেই বা দিগম্বরবাবুকে তিনি ঝাঁটা পেটা করেন! যাহা হউক,

সেইজন্য বিবাহ বন্ধ হইয়া গিয়াছে।'

মাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আর—সন্ন্যাসী?'

আমি উত্তর করিলাম,—"তিনি কুসীর চিকিৎসা করিতেছেন। কুসীকে তিনি অনেকটা ভাল করিয়াছেন। এখন আপনি বাড়ী চলুন। পূর্ব কথা প্রকাশ পায় নাই, কুসীর আজ পুনরায় বিবাহ হয় নাই, বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই। মনে করিয়া দেখুন আপনার কত পূণ্যবল! ভগবান রক্ষা করিয়াছেন!'

মাসী উত্তর করিলেন,—'ভগবান রক্ষা করিয়াছেন, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। প্রথম লগ্নে যদি বিবাহ হইয়া যাইত, তাহা হইলে যে কি হইত। ভগবান রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু রায়মহাশয়ের বাটীতে আমি আর যাইব না। তুমি পাগল, তাই আমাকে যাইতে বলিতেছ। তুমি বাটী ফিরিয়া যাও। আমি কাশী যাইব! তোমায় টিকিট কিনিয়া দিতে হইবে না। আমি কিনিতে পারিব।'

এখন আমি একটু প্রতারণা করিলাম। জানিয়া শুনিয়া আমি কখনও মিথ্যাকথা বলি না, কি কাহারও সহিত প্রতারণা করি না। কিন্তু আজ আমি তাহা করিয়া ফেলিলাম। যদিচ ভালর জন্য আমি সে কাজ করিলাম, তথাপি সে কথা মনে হইলে এখনও আমার লজ্জা হয়।

আমি বলিলাম—'তা কি কখন হয়। আপনি স্ত্রীলোক, এ বিদেশ, ভয়ঙ্কর দেশ। এই রাত্রিকালে এ স্থানে আপনাকে একেলা ছাড়িয়া যাইতে পারি না। এক্কা দাঁড়াইয়া আছে; চলুন স্টেশনে যাই, সেই স্থানে গিয়া চলুন বসিয়া থাকি। তাহার পর গাড়ীর সময় হইলে টিকিট কিনিয়া আপনাকে আমি গাড়ীতে বসাইয়া দিব।'

মাসী বলিলেন,—'এখনও অনেক বিলম্ব আছে। এত আগে থাকিতে গিয়া কি হইবে?'

আমি বলিলাম,—'এ স্থানে বসিয়া থাকিলেই বা কি হইবে? তাহা অপেক্ষা চলুন স্টেশনে গিয়া বসিয়া থাকি।'

মাসী সে কথায় সম্মত হইলেন। এক্কাওয়ালাকে আমি প্রস্তুত হইতে বলিলাম। সেই সময় তাহাকে গোপনভাবেও কিছু উপদেশ দিলাম! মাসী এক্কার উপরে উঠিলেন। আমিও উঠিয়া তাঁহার একপার্শ্বে বসিলাম। এক্কাওয়ালা এক্কা হাঁকাইয়া দিল। এক্কা দ্বিগুণ বেগে দৌড়িতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে মাসী বলিলেন,—'ষ্টেশন যে অতি নিকটে? সে স্থানে পৌঁছিতে এত বিলম্ব হইতেছে কেন?'

আমি কোন উত্তর করিলাম না।

এক্কা দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরে মাসী পুনরায় বলিলেন,—'আমি বুঝিতে পারিয়াছি, ফাঁকি দিয়া তুমি আমাকে বাড়ী লয়িা যাইতেছ। কিছুতেই আমি বাড়ী যাইব না। গাড়ীওয়ালা! গাড়ীওয়ালা! দাঁড়া! আমি নামিয়া যাই।'

আমি এক্কাওয়ালার গা টিপিলাম। মাসীর কথা সে শুনিল না। এক্কা দ্রুতবেগে চলিতে

লাগিল। আমি তাঁহাকে বলিলাম,—'দেখুন! রসময়বাবুর আপনি অনেক ঘাড় হেঁট করিয়াছেন, আজ এই বিবাহসভায় যে কাণ্ড হইয়াছে, ভদ্রলোকের ঘরে সেরূপ কখনও হয় না। রসময়বাবু পূর্বে যে পাপ করিয়াছেন, মেয়ের যে এতদিন খোঁজখবর তিনি লন নাই, সেই সকল পাপের ফল আজ বিলক্ষণ ভোগ করিয়াছেন। আর কেলেঙ্কারি করিবেন না, আর তাঁহার মাথা কাটিবেন না।'

মাসী উত্তর করিলেন,—'তুমি জান না, তাই এমন কথা বলিতেছ। সে স্থানে আর আমি কিছুতেই যাইব না।'

এই কথা বলিয়া মাসী পাগলিনীর মত হইয়া এক্কা হইতে লাফাইয়া পড়িবার উপক্রম করিলেন। আমি বড়ই বিপদে পড়িলাম। আমি তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারি না।

একাদশ পরিচ্ছেদ – হিপ্ হিপ্ হুরে

এই সময় যে স্থানে এক্কা গিয়া উপস্থিত হইল, সে স্থানে এক অপূর্ব দৃশ্য আমাদের নয়নগোচর হইল। সেই দৃশ্য দেখিয়া মাসী এক্কাতে স্থির হইয়া বসিলেন। এক্কাওয়ালাকে আমি এক্কা থামাইতে বলিলাম। যে দৃশ্যটি আমাদের নয়নগোচর হইল, তাহা এই,— 'আমরা দেখিলাম যে, একদল বাঙ্গালী ষ্টেশন অভিমুখে আসিতেছেন। এক্কা যখন স্থির হইয়া দাঁড়াইল, তখন দেখিলাম যে, তাঁহারা সেই বরযাত্রীদল। সেই দলের আগে আগে বিরসবদনে সভয় মনে দিগম্বরবাবু চলিয়াছেন। তাঁহার মুখ ঈষৎ হাঁ হইয়া গিয়াছে, বেশ আলু-থালু হইয়াছে, আঁকাবাঁকা পা ফেলিতে ফেলিতে দুলিতে দুলিতে ন্যালা-পাগলার মত তিনি চলিয়াছেন। তাঁহার ঠিক পশ্চাতে একধারে বিন্দী ও অন্যধারে গলা-ভাঙ্গা দিগম্বরী। বিন্দীর হাতে একটি ছাতি, দিগম্বরীর হাতে একগাছি ঝাঁটা। ঝাঁটাগাছটা তিনি বোধ হয় সঙ্গে করিয়া আনেন নাই, রসময়বাবুর বাটী হইতে সংগ্রহ করিয়া থাকিবেন। লোকে ঠিক যেমন মহিষকে তাড়াইয়া লইয়া যায়, বিন্দী ও তিনি সেইরূপ দিগম্বরবাবুকে তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছেন। বিন্দী ও দিগম্বরীর এক ধারে ছোট্টু সিং অনাধারে কিষ্ট। ছোট্টুর হাতে গহনার বাক্স, আর কিষ্টার হাতে দিগম্বরবাবুর পোষাক রাখিবার কার্পেটের ব্যাগ। ইহাদের পশ্চাতে বরযাত্রীগণ। বরযাত্রীগণের মধ্যে কেহ কেহ উলু দিতেছিলেন, কেহ কেহ পোঁ পোঁ করিয়া মুখে শঙ্খ বাজাইতেছিলেন, কেহ কেহ বা ইংরাজী ধরণের 'হিপ্ হিপ্ হুরে! হিপ্ হিপ্ হুরে! জয়ধ্বনি করিতেছিলেন। সকলের পশ্চাতে জনকতক লোক চেঙ্গারি মাথায় করিয়া আসিতেছিল।

ইঁহাদের সঙ্গে একজন সিপাহী ছিল। বাবুদিগকে সে বার বার চুপ করিতে অনুরোধ করিতেছিল। সে বলিতেছিল,—'বাবুসাহেব! আপলোক আএসা গোলমাল ন কিজিয়ে। ইয়ে ছাইনি হায়। বড়ি খারাপ জায়গা। রসময়বাবু সাহেবসে হুকুম লিয়া সচ, মগর আএসা গোলমাল করনেসে কুছ বখেড়া উঠেগো।'

আমি পুনরায় বলিয়া রাখি, যে স্থানে এই সমুদয় ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার প্রকৃত নাম আমি প্রদান করি নাই। স্থান সম্বন্ধে কেঁহ আমার ভুল ধরিবেন না।

এই ব্যাপার দেখিয়া আমি আশ্চর্য হইলাম। দিগম্বরবাবু ও তাঁহার পরিচালিকাগণ একটু অগ্রসর হইলে আমি একজন বরযাত্রীকে ডাকিলাম। পাছে মাসী পলায়ন করেন, সেই ভয়ে আমি এক্কা হইতে নামিতে সাহস করিলাম না। কতকগুলি বরযাত্রী আসিয়া আমার এক্কা ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। রাত্রি দুই প্রহরের সময় বিদেশে, এরূপ কঠোর স্থানে পথের মাঝে গোল করিতে আমি তাঁহাদিগকে প্রথম নিষেধ করিলাম। তাহার পর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'আপনারা ইহার মধ্যে চলিয়া আসিলেন কেন? আহারাদি করিয়া তাহার পর আসিলে ভাল হইত না? গাড়ীর এখন অনেক বিলম্ব আছে!'

একজন বরযাত্রী উত্তর করিলেন,—'আজ যে অভিনয় দেখিয়াছি, তাহাতে পেট ভরিয়া গিয়াছে, আহারাদির আর আবশ্যক নাই।'

আর একজন বলিলেন,—'না মহাশয়! আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। ঐ সকল ঘটনার পর সে স্থানে আর থাকা আমরা উচিত বোধ করিলাম না। বিশেষতঃ পাছে গলাভাঙ্গা ঠাকুরাণী কোনরূপ একটা ঢলাঢলি করিয়া বসেন, সেই ভয়ে আরও আমরা চলিয়া আসিলাম। তিনি না করিতে পারেন এমন কাজ নাই। সঙ্গে আবার বিন্দী আছে। সে-ও একজন নামজাদা সেপাই। আমরা বরযাত্রী আসিয়াছিল, সেই অপরাধে আমাদিগকেও হয় তো দিগম্বরী প্রহার করিতে পারেন। আহারাদির বিষয়ে আপনার কোন চিন্তা নাই, রসময়বাবু প্রচুর খাদ্য সামগ্রী আমাদিগকে দিয়াছেন। চেঙ্গারি করিয়া ঐ দেখুন, লোকে তাহা লইয়া যাইতেছে। ষ্টেশনের নিকট গাছতলায় বসিয়া আমরা সকলে আহার করিব। তাহার পর প্রাতঃকালের গাড়ীতে চলিয়া যাইব।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'রসময়বাবুর কন্যা এখন কেমন আছে?'

বরযাত্রী উত্তর করিলেন—'কন্যা এখন বেশ আছে। একবার সন্ন্যাসী তাহার কানে কানে কি বলিলেন, তাহাতে তাহার মুখে একটু হাসিও দেখিয়াছিলাম। রসময়বাবু তাহাকে এখন বাটীর ভিতর লইয়া গিয়াছেন। সন্ন্যাসীও বাটীর ভিতর গিয়াছিলেন। শুনিলাম যে, কন্যা গুড়-বুড় করিয়া তাঁহার সহিত অনেক কথোপকথনও করিয়াছিল। সন্ন্যাসীর ক্ষমতা আছে বলিতে হইবে।'

আর একজন বরযাত্রী বলিলেন,—কন্যার রোগও হয় নাই, মূর্চ্ছাও হয় নাই, সব ঠাট। বরের রূপ-গুণের কথা শুনিয়া সে এইরূপ ঠাট করিয়া পড়িয়াছিল। তাহার পর নবীন তপস্বীকে পাইয়া, নবীন তপস্বিনী হইবার সাধে তাহার রোগ ভাল হইয়া গিয়াছে, হাসি দেখা দিয়াছে, কথা ফুটিয়াছে। দিগম্বরী নম্বর টু হইতে তাহার ইচ্ছা নাই।'

সে কথায় আর আমি কোন উত্তর করিলাম না। এক্কাওয়ালাকে পুনরায় এক্কা হাঁকাইতে বলিলাম। যাইতে যাইতে আমি মাসীকে বলিলাম,—'শুনিলেন তো! কুসী ভাল আছে। আপনাকে কেহ কিছু বলিবে না, সে ভয় আপনি করিবেন না, সে ভার আমার রহিল।'

মাসী কোন উত্তর করিলেন না। আমি দেখিলাম যে, তিনি কাঁদিতেছেন। আমি তাঁহাকে আর কিছু বলিলাম না!

রসময়বাবুর বাটিতে এক্কা আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিলাম যে, তিনি দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। দ্বার ঠেলিয়া আমি ডাকিতে লাগিলাম। তাঁহার পঞ্জাবী চাকর আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। এক্কাওয়ালাকে তাহার ভাড়া দিয়া, মাসীকে সঙ্গে লইয়া, আমি বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। বাটীতে দেখিলাম যে, জনপ্রাণী নাই। কিছুক্ষণ পূর্বে যে স্থান লোকের কলরবে পূর্ণ ছিল, এখন সেই স্থান নির্জন ও নিস্তব্ধ হইয়াছিল। খিড়কি-দ্বার দিয়া আমরা দুইজনে একেবারে ভিতর বাড়ীতে যাইলাম। মাসী একটি ঘরে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিতে উদ্যত হইলেন। বোধ হয় সে ঘরটি তাঁহার। বাহির হইতে আমি দ্বার ঠেলিয়া ধরিলাম।

আমি বলিলাম,—'দ্বারে খিল দিতেছেন কেন?'

মাসী উত্তর করিলেন,—'তোমার সে ভয় নাই। আমি আত্মহত্যা করিব না। অনেক পাপ করিয়াছি। সে পাপ আর করিব না।'

আমি দ্বার ছাড়িয়া দিলাম। মাসী দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ পুনরায় ঈষৎ একটু খুলিয়া আমাকে তিনি ডাকিলেন। আমি তাঁহার নিকট ফিরিয়া যাইলাম।

মাসী বলিলেন,—'একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'কি কথা?'

মাসী উত্তর করিলেন,—'তুমি কুসীর 'বাবু'কে দেখিয়াছিলে?'

আমি উত্তর করিলাম,—'হাঁ! কাশীতে আমি তাহাকে দেখিয়াছিলাম।'

মাসী বলিলেন,—সন্ন্যাসীকে গিয়া একবার ভাল করিয়া দেখ।'

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ – ওটা ঠাওর হয় নাই

এই বলিয়া মাসী ঝনাৎ করিয়া কপাট বন্ধ করিয়া দিলেন। আমি এমনি বোকা যে, তবুও মাসীর কথা বুঝিতে পারিলাম না। সন্ন্যাসী ও রসময়বাবু বৈঠকখানায় আছেন শুনিয়া, আমি সেইস্থানে গমন করিলাম। সে স্থানে গিয়া দেখিলাম যে, কেবল তাঁহারাই দুইজনে আছেন, অন্যকোন লোক নাই। তাঁহাদের দুইজনে কথোপকথন হইতেছিল। বৈঠকখানায় গিয়া আমি যাই পদার্পণ করিয়াছি, আর সন্ন্যাসীঠাকুর শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাহার পর আমার নিকটে আসিয়া আমাকে প্রণাম করিয়া আমার পদধূলি গ্রহণ করিলেন।

আমি বলিলাম,—'ও কি করেন! ও কি করেন! ছোট হইলে কি হয়, আপনি সন্ন্যাসী আপনি নারায়ণ!' সন্ন্যাসী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তাহার পর তিনি বলিলেন,—'আপনি যে আমাকে চিনিতে পারেন নাই, প্রথমেই তাহা আমি বুঝিয়াছিলাম।'

এইবার আমি ভালরূপে সন্ন্যাসীকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম। ভালরূপে তাঁহাকে দেখিয়া বিস্ময়ে ও আনন্দে আমার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। আশ্চর্য্য হইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'কে ও, বাবু!'

'হাঁ, আমি সেই কাশীর বাবু', এই কথা বলিয়া সন্ন্যাসী পুনরায় আমাকে প্রণাম করিল ও পুনরায় আমার পদধূলি লইল। কুসুমের মাসী বাড়ী ফিরিতে কেন এত আপত্তি করিতেছিলেন, কেন আমাকে বার বার পাগল বলিতেছিলেন, তাহার অর্থ এখন আমি বুঝিতে পারিলাম। সন্ন্যাসীবেশে হীরালাল উপস্থিত হইবামাত্র তিনি তাহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন। সেজন্য বিবাহসভা হইতে তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গিয়া রসময়বাবুর স্ত্রীর নিকট হইতে টাকা লইয়া বাড়ী হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। হীরালালকে কি করিয়া পুনরায় তিনি মুখ দেখাইবেন, সেই ভয়ে তিনি এত কাতর হইয়াছিলেন।

কুসুমও যে হীরালালকে চিনিতে পারিয়াছিল, তাহাও আমি এখন বুঝিতে পারিলাম বাবুর কণ্ঠস্বর তাহার পক্ষে মহৌষধ স্বরূপ হইয়াছিল। সেই ঔষধের বলেই তাহার উৎপাদিত হইয়াছিল। চৈতন হইয়া সহজে তাহার মনে প্রতীতি হয় নাই যে, মৃতমানুষ পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছে। সেজন্য বারবার নিরীক্ষণ করিয়াছিল ও চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চিন্তা করিয়াছিল। অবশেষে যখন তাহার মনে প্রতীতি হইল যে, এই সন্ন্যাসী সত্য সত্যই তাহার 'বাবু' তখন সে আপনার হাতটি তাহার গলায় দিল, আপনার মস্তকটি তাহার বক্ষঃস্থলে রাখিল, যেন এ জীবনে আর তাহা হইতে সে বিচ্ছিন্ন হইবে না।

আমি যে 'বাবু'কে চিনিতে পারি নাই, তাহার কারণ এই যে, কাশীতে অল্পক্ষণের নিমিত্ত আমি কেবল দুই তিন বার তাহাতে দেখিয়াছিলাম। তাহার পর, তখন তাহার গোঁপ-দাড়ি উঠে নাই। এখন নবীন শ্মশ্রু দ্বারা তাহার মুখমণ্ডলের অধোদেশ আবৃত হইয়াছিল। পথশ্রমে তাহার সে উজ্জ্বল কান্তিও অনেকটা মলিন হইয়া গিয়াছিল।

রসময়বাবু আমাকে বলিলেন,—জামাইবাবু আমাকে সকল কথা বলিয়াছেন। এরূপ ঘটনা উপন্যাসে দেখিতে পাই না। এত অপমান এত লাঞ্ছনার পর আমার যে আবার সুখ হইবে, তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। এখন কুসুমের মাসী বাড়ী আসিলেই হয়, তাহা হইলে আমার সকল চিন্তা দূর হয়! তাঁহাকে আপনি খুঁজিয়া পান নাই?'

আমি উত্তর করিলাম,—'হাঁ। তাঁহাকে আমি বাড়ী আনিয়াছি। 'বাবু!' তুমি গিয়া তাঁহাকে প্রবোধ দাও। আমাদের কথায় হইবে না। তোমাকে কি করিয়া তিনি মুখ দেখাইবেন, সেই লজ্জায় তিনি অভিভূত হইয়া আছেন। দ্বার বন্ধ করিয়া ঘরের ভিতর তিনি পড়িয়া আছেন। চল 'বাবু!' তাঁহাকে তুমি সান্ত্বনা করিবে চল। রসময়বাবু! আপনি আসিবেন না?'

'বাবু আমার সহিত চলিল। দ্বারে ধাক্কা মারিয়া কুসুমের মাসীকে আমি ডাকিতে লাগিলাম। আমি বলিলাম,—বিশেষ একটা কথা আছে দ্বার একবার খুলিয়া দিন।'

আমার কণ্ঠস্বর শুনিয়া তিনি দ্বার খুলিয়া দিলেন। তিনি দ্বার খুলিলেন, আর 'বাবু' গিয়া তাঁহার পায়ে পড়িল। মাসী পূর্ব হইতেই রোদন করিতেছিলেন, এখন আরও কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার কান্না দেখিয়া 'বাবু' ও কাঁদিয়া ফেলিল।

কিছুক্ষণ পরে বাবু বলিল,—মাসী-মা! আর কাঁদিও না। আমি যে পুনরায় বাঁচিয়া

আসিয়াছি, সেজন্য এখন আহ্লাদ করিবার সময়, এখন কাঁদিবার সময় নয়।'

কাঁদিতে কাঁদিতে মাসী বলিলেন,—'এ পোড়ামুখ আমি তোমাকে কি করিয়া দেখাইব। আমার মরণ কেন হইল না।' 'বাবু' বলিল,—'কেন মাসী মা! হইয়াছে কি! এ সমুদয় আমার দোষ। আমি যদি না মিথ্যা সংবাদ দিতাম, তাহা হইলে তো আর এরূপ হইত না! যাহা হউক, কুসী যে মারা যায় নাই, তাহাই আমার সৌভাগ্য!'

মাসী কোন উত্তর করিলেন না। নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন।

'বাবু' পুনরায় বলিল,—'কুসীকে আপনি বড় ভালবাসেন। কুসীর ভালর জন্য আপনি এ কাজ করিতে গিয়াছিলেন। আমি হইলে, আমিও বোধ হয় ঐরূপ করিতাম। তাহাতে আর কান্না কি? সমুদয় আমার দোষ। সে যাহা হউক, এখন আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে। সন্ন্যাসীর বেশে আজ দুই বৎসর মাঠে-ঘাটে বেড়াইতেছি। চল মাসী-মা! আমাকে খাবার দিবে চল। তুমি নিজে আমাকে খাবার দিবে, তুমি আমার কাছে বসিয়া থাকিবে, তবে আমি আহার করিব, তা না হইলে আমি আহার করিব না। আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে, মাসী-মা। না খাইতে পাইয়া, এই দেখ আমি কত রোগা হইয়া গিয়াছি।'

পথ-শ্রান্তিতে হীরালাল নিতান্ত শ্রান্ত আছে, না খাইতে পাইয়া তাহার শরীর কৃশ হইয়া গিয়াছে, এখন তাহার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে, এরূপ কথা শুনিয়া মাসী আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। চক্ষু মুছিতে মুছিতে তৎক্ষণাৎ তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, আহারীয় সামগ্রী আয়োজন করিয়া কাছে বসিয়া হীরালালকে তিনি আহার করাইলেন। সেই আহারের সময় নানারূপ কথা হইল।

পরদিন আমি হীরালালকে বলিলাম,—'তুমি তো বড় Naughty boy (বদ্ ছোকরা) দেখিতে পাই। আচ্ছা কীর্ত্তি তুমি করিয়াছ। কোন্ বিবেচনায় তুমি এরূপ মৃত্যুসংবাদ দিলে? দৈববলে কেবল কুসী বাঁচিয়া গিয়াছে। সে যদি মরিয়া যাইত, তাহা হইলে কি হইত?'

হীরালাল উত্তর করিল,—'আমি যে বড় মন্দ কাজ করিয়াছি, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। এতদূর যে হইবে, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। হাতে সূতা বাঁধা সম্বন্ধে কাল রাত্রিতে দিগম্বরবাবু যাহা বলিয়াছেন, এ বিষয়ে আমারও সেই কথা,—ওটা আমার ঠাওর হয় নাই।

দিগম্বরবাবুর ঠাওর স্মরণ করিয়া আমি হাসিয়া ফেলিলাম। আমি বলিলাম,—'বাবু! তুমি যে কাজ করিয়াছ, তাহার উপযুক্ত দণ্ড কিছু হয় নাই। দিগম্বরবাবু কুসীকে বিবাহ করিয়া লইয়া যাইতেন, তাহা হইলে ঠিক হইত। আগে যদি জানিতাম যে, তুমি এই কীর্ত্তি করিয়াছ, তাহা হইলে আমি নিজেই উদ্যোগী হইয়া তাঁহার সহিত কুসীর বিবাহ দিতাম। যাই হউক, এখন কুসী ভাল হইলে হয়। তাহার শরীরের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে আমার বড়ই ভয় আছে।'

হীরালাল উত্তর করিল, কুসীর নিমিত্ত আর চিন্তা নাই। আজ যদি তাহাকে দেখিতেন

তাহা হইলে এ কথা আপনি বলিতেন না। দাঁড়ান! আমি তাহাকে আপনার নিকট আনিতেছি।'

এই কথা বলিয়া 'বাবু' দৌড়িয়া বাটীর ভিতর গমন করিল। সে সময় রসময়বাবু বাটীতে ছিলেন না। অল্পক্ষণ পরেই কুসীকে লইয়া 'বাবু' বৈঠকখানায় প্রত্যাগমন করিল। কুসী কিছুতেই আসিবে না, 'বাবু'-ও কিছুতেই ছাড়িবে না। কুসীকে সে টানিয়া আনিতে লাগিল। কুসী বৈঠকখানার দ্বারটি ধরিল। সেই দ্বার ছাড়াইতে বাবুকে বল প্রকাশ করিতে হইল। তাহাতেই আমি বুঝিলাম যে, কুসীর জন্য আর কোন ভাবনা নাই বটে। যে লোকের শরীর কাল অসাড়, অবশ, মৃতপ্রায় হইয়াছিল, আজ সে সবলে দ্বার ধরিতে পারিল। এই একদিনেই কুসীর মুখশ্রী অনেক পরিবর্তিত হইয়াছিল। কুসীর চক্ষুদ্বয়ে পুনরায় জ্যোতির সঞ্চার হইয়াছিল। বৈঠকখানায় আসিয়া কুসী আমার পশ্চাদিকে লুকায়িত হইল। আমি কুসীর হাতটি ধরিয়া একটু হাসিলাম; ঘাড় হেঁট করিয়া কুসীও একটু হাসিল। সেই কাশীর হাসি।

হীরালালকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'বাবু! সে লোচন ঘোষ কে?' বাবু উত্তর করিল,—'লোচন ঘোষ! সে আবার কে?'

আমি বলিলাম,—'সেই যে, কুসীর মাসীকে পত্র লিখিয়াছিল?

বাবু হাসিয়া বলিল,—'ওঃ! লোচন ঘোষ কেহ নাই। কলিকাতায় যাহারা রসিদ, বিল, দরখাস্ত প্রভৃতি লিখিয়া জীবিকানির্বাহ করে, তাহাদের একজনকে দুই আনা পয়সা দিয়া আমি সেই চিঠি লেখা সমাপ্ত হইলে স্বাক্ষরের সময় সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,—নাম? আমি তখন আর নাম খুঁজিয়া পাই না; তাই যা মনে আসিল, বলিয়া ফেলিলাম। আমি বলিলাম,—'লেখ, লোচন ঘোষ।' চিঠি ও খবরের কাগজ মাসী-মায়ের নিকট আমিই প্রেরণ করিয়াছিলাম।'

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ – অজ্ঞাতবাসের বিবরণ

'বাবু'কে আমি পূর্ব-কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। অন্যান্য কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আমি বলিলাম,—বাবু! তোমার নৌকা কি সত্য ডুবিয়া গিয়াছিল?

বাবু উত্তর করিল,—'ওরে বাপ রে! সে যে কি আশ্চর্য্য বাঁচিয়াছিলাম, তাহা আর আপনাকে কি বলিব। বৈশাখ মাস ঠিক দুই বৎসর আগে আর কি! আমরা গোয়ালন্দ আসিতেছিলাম। সন্ধ্যার ঠিক পরেই পশ্চিম-উত্তর দিকে ভয়ানক মেঘ উঠিল। নিবিড় অন্ধকারে পৃথিবী ঢাকিয়া গেল। আরোহিগণ নৌকা কিনারায় লাগাইতে বলিল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ প্রবল ঝড় উঠিল; এক ঝাপটে নৌকাখানি উল্টাইয়া পড়িল। আমি অতিকষ্টে তাহার ভিতর হইতে বাহির হইলাম। একজন আমাকে জড়াইয়া ধরিল। তাহার হাত হইতে আপনাকে ছাড়াইবার নিমিত্ত আমি চেষ্টা করিতে লাগিলাম। সেই সময় নৌকার বাঁশ হউক কি কিছু হউক আমার মাথায় লাগিয়া গেল। এই দেখুন, এখনও আমার মাথায় তাহার দাগ

রহিয়াছে। অনেক কষ্টে আমি সে লোকের হাত হইতে আপনাকে ছাড়াইলাম। তাহার পর অনেক কষ্টে কিনারায় আসিয়া উঠিলাম। সে অন্ধকারে কে কোথায় গেল, তাহার কিছুই আমি জানিতে পারিলাম না। কিনারায় উঠিয়া একটি মাঠ পার হইয়া একখানি গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেই গ্রামে একজনের বাড়ীতে আশ্রয় লইলাম। রাত্রির শেষভাগে আমার ভয়ানক জ্বর হইল।'

আমি একখানি চেয়ারে বসিয়াছিলাম। আমার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আমার বামস্কন্ধের উপর তাহার বামহাত রাখিয়া কুসী একমনে নৌকা-ডুবির বিবরণ শুনিতেছিল। এই পর্যন্ত শুনিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল, তাহার চক্ষু দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। এই সময় হীরালালের দৃষ্টি কুসীর উপর পড়িল।

হীরালাল বলিল,—'কুসী! তুমি কাঁদিতেছ। এখন আবার কান্না কিসের? ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করিয়াছেন, তাই আমি বাঁচিয়াছি! চুপ কর।'

আমিও কুসীর দিকে ফিরিয়া দেখিলাম। আমিও তাহাকে বলিলাম,—কুসী। আহ্লাদের সময়, কান্নার সময় নয়। কাঁদিয়া পুনরায় কি রোগ করিবে? চুপ কর!'

হীরালাল পুনরায় বলিল,—'আট দিন আমি অজ্ঞান অভিভূত হইয়া পড়িয়া রহিলাম। যাহাদের বাড়ী আমি আশ্রয় লইয়াছিলাম, তাহারা আমার অনেক উপকার করিয়াছে, মেয়ে-পুরুষে তাহারা আমার সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছে। বাড়ী হইতে চলিয়া আসিবার সময় মা আমাকে অনেকগুলি টাকা দিয়াছিলেন। নোটগুলি মানিব্যাগের ভিতর রাখিয়া সর্বদা আমার কোমরে বাঁধিয়া রাখিতাম। টাকাগুলি সেইজন্য বাঁচিয়া গিয়াছিল। ভিজিয়াও নোট নষ্ট হয় নাই। সজ্জনের বাটীতে আশ্রয় লইয়াছিলাম, সেজন্য আমার জ্বরের সময় সেগুলি চুরি যায় নাই।

'আটদিনের পর আমার জ্বর ছাড়িয়া গেল। ক্রমে আমি আরোগ্য লাভ করিলাম। শরীরে যখন একটু বল হইল, তখন আমি গোয়ালন্দ আসিলাম। কলিকাতায় আসিবার নিমিত্ত রেলগাড়ীতে চড়িলাম। গাড়ীতে এক ব্যক্তির নিকট একখানি বাঙ্গালা খবরের কাগজ ছিল। পড়িবার নিমিত্ত সেই খবরের কাগজখানি আমি একবার চাহিয়া লইলাম। সেই খবরের কাগজে আমি আমার মৃত্যুসংবাদ দেখিলাম, তাহা দেখিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম না। নৌকা যেভাবে উলটিয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে জন-প্রাণীর বাঁচিবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু সেই সংবাদপত্র পাঠ করিয়া আমি অবগত হইলাম যে, দুইজন মাঝির প্রাণরক্ষা হইয়াছে।

'আমার মৃত্যুসংবাদ খবরের কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া আমি ভাবিতে লাগিলাম। ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি স্থির করিলাম যে, কিছুদিনের নিমিত্ত আমি এ সংবাদে প্রতিবাদ করিব না। পিতা কর্ত্তৃক সেই ঘোরতর অপমানের কথা তখনও আমার মনে জাগরিত ছিল। আমি ভাবিলাম যে, আমাকে যেরূপ তিনি দুঃখ দিয়াছেন, সেইরূপ তিনিও দিনকত পুত্রশোক ভোগ করুন।

'তাহার পর কুসীর ভাবনা মনে উদয় হইল। আমি যে জীবিত আছি, এ কথা কুসীকে জানাইব কিনা, অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমি ভাবিলাম যে, যদি কুসীকে বলি যে, জীবিত আছি, তাহা হইলে কলিকাতার আমার বন্ধু-বান্ধবও সে কথা জানিতে পারিবে, আমার দেশের লোকও জানিবে। সেজন্য কুসীর নিকটও গোপন করিব, এইরূপ আমি স্থির করিলাম। কিন্তু তাহাতে যে এরূপ বিপদ ঘটিবে, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই।

'তাহার পর আমি ভাবিলাম যে, সংসার খরচের নিমিত্ত মাসীমায়ের নিকট কিছু টাকা পাঠাইতে হইবে। সেইজন্য আমি নিজেই নিজের মৃত্যুসংবাদ দিতে বাধ্য হইলাম। লোচন ঘোষের নামে সেই পত্রখানি লিখিয়া পাঠাইলাম, আর আমার মৃত্যুসংবাদ সম্বলিত একখানি সংবাদপত্রও প্রেরণ করিলাম।

'কিন্তু এত অধিক দিন যে আমাকে অজ্ঞাতবাসে থাকিতে হইবে, তখন তাহা আমি ভাবি নাই। আমি মনে করিয়াছিলাম যে, আপাততঃ আমাকে একটি চাকরীর যোগাড় করিতে হইবে। চাকরী হইলেই আমি কুসীকে আপনার নিকট আনিব। গেরুয়া-বস্ত্র ধারণ করিলে অল্প খরচে নানা স্থান ভ্রমণ করিতে পারিব, সেজন্য সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিলাম। কিন্তু এরূপ বেশ ধারণ করিয়া আমি ভাল কাজ করি নাই। পাছে লোকে আমাকে ভণ্ড মনে করে, সেজন্য অনেক স্থানে চাকরীর চেষ্টা করিতে পারি নাই। সত্য কথা বলিতে কি, আমি চাকরীর চেষ্টা ভাল করিয়া করি-ও নাই। মনে করিলাম যে, কুসীর নিকট আমি দুইশত টাকা প্রেরণ করিয়াছি। তাহাতে দুই বৎসর পল্লীগ্রামে একরূপ চলিয়া যাইবে। এই মনে করিয়া ভারতবর্ষের নানা স্থানে আমি ভ্রমণ করিতে লাগিলাম।

'আজ প্রায় একমাস হইল, কুসীর জন্য আমার প্রাণ বড়ই কাতর হইল। আমি তখন মহীশূর অঞ্চলে ভ্রমণ করিতেছিলাম। তৎক্ষণাৎ আমি কলিকাতায় আসিলাম। কলিকাতা হইতে কুসীদের গ্রামে গমন করিলাম। সে স্থানে শুনিলাম যে, কুসীকে লইয়া মাসী-মা কুসীর পিতার নিকট গমন করিয়াছেন। কুসীর পিতা এখন কোথায় আছেন, সে কথা আর আমি কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলাম না। কুসীর পিতা যে ব্রহ্মদেশে থাকিতেন, তাহা আমি জানিতাম। আমি মনে করিলাম যে এখনও তিনি সেই ব্রহ্মদেশে আছেন। আমি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলাম। কলিকাতা হইতে ব্রহ্মদেশে গমন করিলাম। ব্রহ্মদেশে গিয়া আমি জানিতে পারিলাম যে, তিনি পঞ্জাবে বদলি হইয়াছেন। তখন আমার বড় ভয় হইল। আমি ভাবিলাম,—'কোন বিপদ ঘটিবে না কি? তা না হইলে এরূপ বিড়ম্বনা হয় কেন? যাহা হউক, তাড়াতাড়ি আমি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলাম। কলিকাতায় কালবিলম্ব না করিয়া পঞ্জাবে আসিলাম। শ্বশুরমহাশয় প্রথম যে বড় ছাউনিতে বদলি হইয়াছিলেন, গতকল্য সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেই স্থানে এই বিবাহের কথা শুনিলাম। প্রথমে মনে করিলাম যে শ্বশুরমহাশয়ের অন্য কোন কন্যা আছে। কিন্তু দুই বৎসর পূর্বে আমি শুনিয়াছিলাম যে, তিনি বিবাহ করেন নাই, এক কুসী ভিন্ন তাঁহার অন্য সন্তান-সন্ততি নাই।

ঘোরতর বিস্মিত হইয়া আমি সেই বড় ছাউনি হইতে রওনা হইলাম। পথে কত কি যে ভাবিতে লাগিলাম, তাহা আপনাকে আর কি বলিব। আমি যে গাড়ীতে আসিলাম, সেই গাড়ীতে দিগম্বরবাবুর স্ত্রীও আসিয়াছিলেন। ফলকথা, আমিই তাঁহাকে ও বিন্দীকে টিকিট কিনিয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি যে আমার স্ত্রীর বরের স্ত্রী, আর এই অভিনয়ে তিনি যে একজন প্রধান Actress (নায়িকা), তখন তাহা আমি জানিতে পারি নাই। তাহার পর কি হইল, আপনি জানেন।'

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ – ফয়ে ওকার দিয়া যাহা হয়

একমনে কুসী এই বিবরণ শ্রবণ করিতেছিল। তাহার দিকে ফিরিয়া আমি বলিলাম,—'কুসী! শুনিলে তো তোমার 'বাবু'র বিদ্যা।'

'বাবু' বলিল,—'হাঁ কুসী! আমি বড় অন্যায় কাজ করিয়াছি। আমি বুঝিতে পারি নাই যে এতদূর হইবে। সে যাহা হউক, কুসী, তুমি যাদববাবুকে দেখিয়া লজ্জা করিতে পারিবে না। ইনি আমাদের অনেক উপকার করিয়াছেন। ইঁহার সাক্ষাতে কাশীতে যেরূপ আমার সহিত হাসিতে, কথা কহিতে, এখনও তাহাই করিতে হইবে। মনে নাই, কাশীতে তুমি ইঁহাকে বাপ বলিয়াছিলে।?'

কুসীর আধ-ঘোমটা ছিল। 'বাবু উঠিয়া তাহার সে ঘোম্‌টাটুকুও খুলিয়া দিল। কুসী আপত্তি করিল, হাত দিয়া কাপড় টানিয়া ধরিল, কিন্তু 'বাবু' তাহা শুনিল না। এখন কেবল তাহার মাথায় কাপড় রহিল। এই গোলমালের পর কুসী আমার কানে-কানে বলিল,—'আপনাকে আমি জ্যেঠা-মহাশয় বলিব।'

বাবা না বলিয়া কেন সে আমাকে জ্যেঠা-মহাশয় বলিবে, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম। আমি বলিলাম,—'বেশ!' অতঃপর কুসী বাটীর ভিতর চলিয়া গেল।

মাসীর লজ্জা ভাঙ্গা হইয়া গেল। তিনি যে কাজ করিয়াছিলেন, সে সম্পর্কে কোন কথা আর কেহ উত্থাপন করিল না। রূপে-গুণে বিভূষিত জামাতা পাইয়া রসময়বাবুর মনে আর আনন্দ ধরে না। কুসীর স্বাস্থ্যের দিন দিন উন্নতি হইতে লাগিল। কুসীর সেই উজ্জ্বল গৌরবর্ণ পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় ফুটিয়া উঠিল। তাহার গণ্ডদেশ পূরন্ত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় তাহাতে টোল খাইতে লাগিল। তাহার চক্ষু পুনরায় ভাসিয়া উঠিল। চক্ষু-তারা দুইটি সূর্য্যালোক-মিশ্রিত নীল-সমুদ্রজল-সাদৃশ বর্ণে রঞ্জিত হইয়া ঢুলু ঢুলু করিতে লাগিল। কাশীর সেই সরল ভাব, সেই মধুর হাসি পুনরায় কুসীর মুখে দেখা দিল। বয়সের গুণে তাহার কথাবার্তায় কেবল পূর্বাপেক্ষা একটু গাম্ভীর্য্যের লক্ষণ প্রতীয়মান হইল। তা না হইলে আর সকল বিষয়ে ঠিক সেই কাশীর কুসী হইল। মাঝে মাঝে সে আমার নিকট আসিয়া আমার পাকা চুল তুলিয়া দিত। সেই সময় সে আমাকে কত কথা বলিত।

একদিন আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—'কুসী! যখন দিগম্বরবাবুর সহিত তোমার বিবাহের কথা হইয়াছিল, তখন আমি মনে করিয়াছিলাম যে, সে বিবাহ নিবারণ করিবার

নিমিত্ত তুমি আমাকে চেষ্টা করিতে বলিবে। তাহা কর নাই কেন?'

কুসী উত্তর করিল,—'পাছে মাসী আত্মহত্যা করেন, আমি সেই ভয় করিয়াছিলাম। কিন্তু আমি নিশ্চয় বুঝিয়াছিলাম যে, এ বিবাহ হইবে না, বিবাহের পূর্বে আমি মরিয়া যাইব। তবে আর মিছামিছি গোলমাল করিবার আবশ্যক কি? আর দেখুন, জ্যেঠা-মহাশয়! এই দুই বৎসর আমি মানুষ ছিলাম না। আমি যে কি ছিলাম, তাহা আমি বলিতে পারি না। আমার যেন জ্ঞান গোচর কিছুই ছিল না। যেন ভয়ানক একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি, এ দুই বৎসর আর ঠিক তাহাই বলিয়া মনে হয়!'

চারি পাঁচ দিন পর আমি হীরালালকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—'বাবু তোমার পিতাকে তুমি পত্র লিখিয়াছ?' 'বাবু' উত্তর করিল,—'না জ্যেঠা-মহাশয়! তাঁহাকে এখনও পত্র লিখি নাই। তাঁহারা জানেন যে, আমি মরিয়া গিয়াছি। দুই বৎসর অতীত হইয়া গেল। তাঁহারা হয় তো আমাকে ভুলিয়া গিয়াছেন! চিঠি লিখিতে আমার লজ্জা করিতেছে।'

'বাবু'র নিকট হইতে আমি তাহার পিতার ঠিকানা জানিয়া লইলাম। আমি নিজেই তাঁহাকে পত্র লিখিলাম। প্রত্যুত্তর আসিবার সময় অতীত হইল, তথাপি আমি আমার পত্রের উত্তর পাইলাম না। আমার ভয় হইল। তিনি কি এখনও 'বাবু'কে ক্ষমা করেন নাই? অথবা সে স্থানে কি কোনরূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে?

চারিদিন পরে আমার চিন্তা দূর হইল। হীরালালের পিতা নিজেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হীরালালের মাতা ও এক ভ্রাতাও তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, পুত্র জীবিত আছে শুনিয়া পিতা-মাতা যেন স্বর্গ হাত বাড়াইয়া পাইলেন। আমার পত্র পাইয়া হীরালালের মাতা পুত্রকে সত্বর দেখিবার নিমিত্ত কাঁদিয়া-কাটিয়া ধূম করিয়াছিলেন। সেজন্য চিঠি না লিখিয়া তাঁহারা নিজেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ভাগ্যে রসময়বাবুর বাড়ীটি বড় ছিল, সেজন্য সকলের তাহাতে স্থান হইল। পিতা-পুত্রে কিরূপে সাক্ষাৎ হইল, কুসীকে তাঁহারা কত আদর করিলেন, কত বসনভূষণে তাহাকে তাঁহারা ভূষিত করিলেন, রসময়বাবু ও মাসীর সহিত তাঁহাদের কিরূপ পরিচয় হইল, আমার সহিত তাঁহাদের কিরূপ সদ্ভাব জন্মিল সে সব কথা লিখিয়া পুস্তকের কলেবর আর বৃদ্ধি করিব না; ফলকথা এই যে সকলের সহিত সকলের বিশেষরূপে সদ্ভাব হইল। পুত্রকে জীবিত পাইয়া, কুসী হেন পুত্রবধূ পাইয়া, হীরালালের পিতা-মাতা পরম সুখী হইলেন। হীরালাল যেন জামাতা পাইয়া, তাহার পিতা-মাতার ন্যায় সমৃদ্ধিশালী সদাশয় কুটুম্ব পাইয়া রসময়বাবু ও কুসুমের মাসী পরম আনন্দিত হইলেন। সকলের আনন্দে আমিও আনন্দিত হইলাম।

কিছুদিন সেই স্থানে বাস করিয়া হীরালালের পিতা-মাতা পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া দেশে প্রত্যাগমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। কুসুমের মাসীকে সঙ্গে লইয়া যাইবার নিমিত্ত তাঁহারা বিশেষরূপে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু রসময়বাবুর সংসারে অন্য কোন অভিভাবক ছিলেন না, সেজন্য তখন তিনি যাইতে পারিলেন না। কিন্তু ইহার কিছুদিন পরে রসময়বাবু

শ্বশুরবাড়ী সম্পর্কীয়া একজন বয়স্কা স্ত্রীলোক অভিভাবকস্বরূপ পাইলেন। মাসী এখন কুসুমের নিকটে আছেন।

আমাকেও সঙ্গে লইয়া যাইবার নিমিত্ত হীরালাল নিজে ও তাহার পিতা অনেক অনুরোধ করিলেন। সে প্রস্তাবে প্রথম আমি সম্মত হইতে পারি নাই। কিন্তু কুসী এক কাণ্ড করিয়া বসিল। দেশে প্রত্যাগমন করিবার দুইদিন পূর্বে একদিন দুই প্রহরের সময় আমি বৈঠকখানায় শয়ন করিয়া আছি। কুসী আস্তে আস্তে আমার শিয়রে আসিয়া বসিল। শিয়রে বসিয়া আমার পাকা চুল তুলিতে লাগিল। পাকা চুল আর কি ছাই তুলিবে, আমার অধিকাংশ চুল পাকিয়া গিয়াছিল, অল্পই কাঁচা ছিল। আর সে মাথা খুঁটিতে লাগিল।

মাথা খুঁটিতে খুঁটিতে কুসী বলিল,—'জ্যেঠা-মহাশয়! আপনি আমাদের সঙ্গে সেই পূর্বদেশে যাইবেন কি না, তাহা বলুন।'

আমি উত্তর করিলাম,—'আমি কোথায় যাইব? তুমি যাইবে শ্বশুরবাড়ী, সে স্থানে আমি কিজন্য যাইব?' যেই আমি এই কথা বলিয়াছি, আর কুসী আমার মাথার অনেকগুলি চুল একসঙ্গে ধরিয়া একটু টান মারিল। যত লাগুক, না লাগুক আমি কিন্তু বলিয়া উঠিলাম,— 'উঃ! লাগে, ছাড়িয়া দাও!' কুসী বলিল,—'কখনই না। যতক্ষণ না বলিবেন যে, আমি যাব, ততক্ষণ আমি ছাড়িব না।'

কাজেই আমাকে বলিতে হইল যে, আমি যাব। কাজেই আমাকে যাইতে হইল। কাজেই কুসীর শ্বশুরবাড়ীতে আমাকে কিছুদিন বাস করিতে হইল। কাজেই সে স্থান হইতে পুনরায় বিদায় গ্রহণের সময় কুসীর কান্না দেখিয়া আমাকেও কাঁদিয়া ফেলিতে হইল।

সে স্থান হইতে আমি স্বগ্রামে প্রত্যাগমন করিলাম। কার্য্যোপলক্ষ্যে কলিকাতায় আমাকে সর্বদা গমন করিতে হয়। কলিকাতার পথে একদিন সহসা বিন্দীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। তাহার সহিত প্রায় একশত স্ত্রীলোক আর দুই-একজন পুরুষ-মানুষ ছিল। আমি কোন কথা বলিতে না বলিতে, বিন্দী আসিয়া আমায় ধরিল। বিন্দী বলিল,——'কেও ডাক্তারবাবু, আমাকে চিনিতে পারেন?'

আমি উত্তর করিলাম—'তোমাকে আমি বিলক্ষণ চিনিতে পারি, কিন্তু তুমি আমাকে চিনিলে কি করিয়া?'

বিন্দী বলিল,—'আমি! আমি সকলকেই চিনিতে পারি। সেই যে উজিরগড়ের ঢলাচলিতে আপনি ছিলেন! আপনি কে, সে কথা আমি জমাদারকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'দিগম্বরবাবু আর তাঁহার স্ত্রী, এখন কোথায়?'

বিন্দী উত্তর করিল,—'নাতিনীর বিবাহ দিতে তিনি দেশে আসিয়াছেন; আমিও সেই সঙ্গে দেশে আসিয়াছি। আমি কি সে দেশে থাকতে পারি। আমি সেথোগিরি করি, তাহাতে বেশ দু-পয়সা পাওনা আছে, এই দেখুন কতগুলি লোককে কালীঘাট লইয়া যাইতেছি। আমি কি সেই খোট্টার দেশে বসিয়া থাকিতে পারি। তাহার পর আমার গিন্নীমায়ের তেজ দেখিয়া আমি নূতন একটি ফন বাহির করিয়াছি। উদ্ধব দা ঠাকুর আর আমি

দুইজনে ভাগে সেই কাজ করি। পাওনা-থোওনা যা হয়, দুইজনে আমরা ভাগ করিয়া লই। উদ্ধব দা-ঠাকুর হইয়াছেন পুরোহিত, আমি হইয়াছি মাইজী স্বামী। সে কাজের জন্য আমার রং করা আল্‌খেল্লা আছে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'সে আবার কি ফন?'

বিন্দী উত্তর করিল,—'এই কলিকাতায় মাইজী স্বামী হইয়া আমি টিকিদার বাবুদের বাড়ী যাই। বাবু আর বাবুয়ানীরা আমার খুব আদর করেন। সকলেই বলেন,—মাইজী স্বামী আসিয়াছেন। তাহার পর বাবুরা আফিস চলিয়া গেলে আমি গৃহিণীদের বলি—'গিন্নীবাবু! সাবিত্রীব্রত ঘুচিয়া এখন এক নূতন ব্রত উঠিয়াছে, তাহা করিবেন? গিন্নীবাবু জিজ্ঞাসা করেন,—কি ব্রত? আমি বলি, ইহার নাম দিগম্বরী-ব্রত। গিন্নীবাবু জিজ্ঞাসা করেন,—সে ব্রত করিলে কি হয়? আমি বলি,—সে ব্রত করিলে স্বামী চিরকাল পদানত হইয়া থাকে। অনেকেই এখন সেই ব্রত করিতেছেন।' লেখাপড়া শিখিয়া যাঁহাদের মেজাজ গরম হইয়া গিয়াছে, সংসারে কাজকর্ম যাঁহারা কিছুমাত্র করেন না, পঙ্গুর মত কেবল বসিয়া থাকেন, আর রং-বেরঙের পোষাক কিনিয়া স্বামীকে যাঁহারা ফতুর করেন, সেইসব মেয়েদের মধ্যে এই দিগম্বরী-ব্রতটি বিলক্ষণ চলন হইয়াছে! লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়া আমি 'গিন্নীবাবু'র যোগাড় করি, উদ্ধব দা-ঠাকুর পূজা করেন, আর মন্ত্র পড়ান। এখন হইতে সাবিত্রী-ব্রত আর কাহাকেও করিতে হইবে না, এই নূতন দিগম্বরী-ব্রত করিলেই চলিবে। এই নূতন ব্রতের কথা আপনিও পাঁচজনকে বলিবেন।'

আমি উত্তর করিলাম—'সেই উজিরগড়ের ঘটনা সম্বন্ধে আমি একখানি বই লিখিতেছি। সেই পুস্তকে এই নূতন ব্রতের কথা লিখিব।'

এই সময় উদ্ধব দা-ঠাকুর আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন, "দিগম্বরী-ব্রতের ফলের কথাটা ভাল করিয়া লিখিবেন। যে কুলকামিনী এ ব্রত করেন, তাঁহার জীবন সার্থক হয়। এ জনমে পতি তাঁহার পদানত হইয়া থাকে। গলাভাঙ্গা দিগম্বরীর মত তাঁহার রূপ হয়, গুণ হয় ও পতিভক্তি হয়, আর ফোক্‌লা দিগম্বরের মত রূপবান্ গুণবান্ স্ত্রীপরায়ণ স্বামী তিনি লাভ করেন।'

এই কথা বলিয়া যাত্রী লইয়া বিন্দীর সহিত উদ্ধব দা-ঠাকুর প্রস্থান করিলেন। কলিকাতা হইতে স্বগ্রামে আসিয়া আমি এই পুস্তকখানি লিখিলাম।

পুস্তকখানি লিখিয়া ইহার নাম কি দিব, তাহা ভাবিতেছি, এমন সময় পশ্চাল্লিখিত পত্রখানি আমি পাইলাম।

'পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ডাক্তার মহাশয় বরাবরেষু।

মহাশয়!

বিন্দীর মুখে শুনিলাম যে, উজিরগড়ের ঘটনা সম্বন্ধে আপনি একখানি পুস্তক লিখিতেছেন। আমার নাম ইতিপূর্বে কখনও ছাপা হয় নাই। আপনার পুস্তকে আমার নাম ছাপা হইলে, জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিব। সেজন্য আমি বড়ই আনন্দিত হইয়াছি, আর সেজন্য আপনাকে আমি শত শত ধন্যবাদ করি। কিন্তু আপনার

নিকট আমার দুইটি নিবেদন আছে। প্রথমতএই যে, আমার নামটি আপনি ভাল স্থানে বড় বড় অক্ষরে ছাপিবেন। তাহা যদি করেন, তাহা হইলে আপনাকে আমি ভিজিট দিব। দ্বিতীয়ত এই যে, আমার নাম লইয়া লোকের যাহাতে ভ্রম না হয়, সে বিষয়ে সাবধান হইবেন। কারণ, এ অঞ্চলে অনেকগুলি দিগম্বর আছেন। একজন দীর্ঘ ও স্থূল, সেজন্য সকলে তাঁহাকে ধেড়ে দিগম্বর বলে। একজন খর্ব ও কৃশ, সেজন্য সকলে তাহাকে মর্কট দিগম্বর বলে। একজনের সম্মুখের দন্ত কিছু উচ্চ, সেজন্য সকলে তাহাকে দাঁতাল দিগম্বর বলে। আর উর্দ্ধকের দাঁতুপ্রযুক্ত আমার এই যৌবন-কালেই দাঁত পড়িয়া গিয়াছে, সেজন্য সকলে আমাকে দন্তহীন দিগম্বর বলে। কথাটি কিন্তু দন্তহীন নয়। প্রকাশ করিয়া না বলিলে লোকে আমাকে চিনিতে পারিবে না, লোকে মনে করিবে এ অন্য দিগম্বর। সেজন্য আপনি প্রকাশ করিয়া ছাপিবেন, তাহাতে আমি রাগ করিব না। আসল কথাটি কি, তাহা বোধ হয় আপনার মনে আছে?—সেই যয়ে ওকার। ইতি— আপনার বংশবদ — শ্রীদিগম্বর শর্ম্মা'

এবার আমি আর ভিজিটের লোভ ছাড়িতে পারিলাম না। সেজন্য পুস্তকখানির নাম এইরূপ হইল।

—o—

পাপের পরিণাম

প্রথম ভাগ

প্রথম অধ্যায়— সূচনা

বিজয় কলিকাতায় পড়িতেন। অনেকদিন পূর্বে তাঁহার মাতার পরলোক হইয়াছিল। এক্ষণে পিতার পরলোক হইল। খরচ অভাবে তাঁহার লেখাপড়া বন্ধ হইয়া গেল। এক জ্যেষ্ঠভ্রাতা ব্যতীত তাঁহার আর কেহ ছিল না। জ্যেষ্ঠভ্রাতা পশ্চিমে কর্ম করিতেন। নিরুপায় হইয়া বিজয় তাঁহার নিকট চলিয়া গেলেন।

ভ্রাতৃজায়া তাহাতে বড় অসন্তুষ্ট হইলেন। প্রথমদিন হইতেই বিজয়কে তাড়াইতে চেষ্টা করিলেন। ভাই, স্ত্রীর নিতান্ত অনুগত। তাঁহার নিজের চক্ষু থাকিয়াও ছিল না, কর্ণ ছিল না, মন ছিল না। গৃহিনীর চক্ষু দিয়া তিনি দেখিতেন, তাঁহার কর্ণ দিয়া শুনিতেন, তাঁহার মন দিয়া তিনি ভাল মন্দ বিচার করিতেন। ফলকথা, গৃহিণী তাঁহাকে যাহা বলিতেন, তিনি তাহাই করিতেন। ভাইও বিজয়কে দূর করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ইতিপূর্বে দেশ হইতে একজন ভদ্রলোক এই স্থানে আসিয়াছিলেন। সামান্য একটি ঘর ভাড়া করিয়া নির্জনে একাকী বাস করিতেন। একমাত্র বিজয়ের সহিত তাহার আলাপ-পরিচয় হইয়াছিল। সন্ধ্যার সময় তিনি ও বিজয় গঙ্গাতীরে কোন এক নিভৃত স্থানে গিয়া

বসিতেন।

একদিন বিজয়কে নিতান্ত বিষণ্ণবদন দেখিয়া তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বিজয় আপনার দুঃখের কাহিনী তাঁহাকে বলিলেন। এই লোকটির নাম বেণীমাধব হালদার।

বেণীবাবু বলিলেন,—'তুমি ও নিয়ে ভাবিও না, কলিকাতা গিয়া কর্ম্মকাজের চেষ্টা কর। এক বৎসর খরচের নিমিত্ত তোমাকে আমি দুইশত টাকা দিব। এক বৎসরের ভিতর কর্ম্মকাজ হয় ভালই; না হয় পরে দেখা যাইবে।

বিজয় তাঁহাকে বার বার ধন্যবাদ করিলেন, আর তিনি বলিলেন,—' এ টাকা আমি ভিক্ষাস্বরূপ লইব না। সাধ্য হইলেই আপনার টাকা আমি পরিশোধ করিব।'

বেণীমাধব বলিলেন,—'ধন্যবাদে আমার প্রয়োজন নাই। যদি যথার্থই তোমার মনে হয় যে, আমি তোমার উপকার করিলাম, তাহা হইলে পরে আমার নিন্দা করিও না, আর আমার কোন অনিষ্ট করিও না।'

বিজয় বলিলেন,—'বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা।'

বেণীবাবু উত্তর করিলেন,—'লোকে বলে বটে, কিন্তু ঠিক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা নহে। অনেক পূর্ব্বে একজন ফরাশি বলিয়াছিল,—'অমুক আমার নিন্দা করিতেছে বটে, কেন বল দেখি? আমি তো কখনও তাহার কোন উপকার করি নাই।'

বিজয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আপনি কোন লোকের উপকার করিয়াছিলেন না তাহার পর সে আপনার অপকার করিয়াছিল।'

বেণীবাবু উত্তর করিলেন,—'এ সম্বন্ধে আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না।'

বেণীবাবু বিজয়কে টাকা দিলেন। কলিকাতা যাত্রা করিবার পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার সময় বিজয় যথারীতি গঙ্গাতীরে সেই নিভৃত স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বেণীবাবুকে সে স্থানে দেখিতে পাইলেন না।

বিজয় মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—'আশ্চর্য কথা! কাল প্রাতে আমি কলিকাতা যাইব। তাঁহার নিকট আজ আমি বিদায় লইব। প্রতিদিন তিনি আসেন। আজ কেন আসেন নাই!'

বেণীবাবু একাকী থাকিতেন। তাঁহার বাসায় কোন লোককে যাইতে দিতেন না। বিজয়কেও তিনি মানা করিয়াছিলেন।

কিন্তু বিজয় আজ থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার বাসায় তিনি গমন করিলেন। গিয়া দেখিলেন যে, বেণীবাবুর ভয়ানক জ্বর হইয়াছে।

বিজয় বলিলেন,—'চারিদিকে বসন্ত হইতেছে। আপনি আরোগ্যলাভ না করিলে আমি কলিকাতায় যাইতে পারি না।'

বেণীবাবু উত্তর রিলেন,—'জ্বরটা অধিক হইয়াছে বটে। বোধ হয়, ম্যালেরিয়া জ্বর। দুই এক দিনের মধ্যে আমি ভাল হইব। আমার জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই। কল্য প্রাতে তুমি কলিকাতায় চলিয়া যাও।

বিজয় তাঁহার কথা শুনিলেন না।বেনীবাবুর জ্বর আরও বৃদ্ধি হইল। চারিদিনের দিন

তাঁহার সর্ব শরীরে বসন্ত দেখাদিল। আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া রাত্রিদিন বিজয় তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন।

পীড়া কঠিন হইয়া উঠিল। এ রোগের চিকিৎসকগণ আসিয়া বলিল যে, জীবনের আশা নাই। বেনীবাবু উত্তর করিলেন,—'পৃথিবীতে আমার আত্মীয়স্বজন কেউ নেই। যে ছিল সে নির্দয়ভাবে আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে।'

রাত্রি অবসান হইয়াছে। সমস্ত রাত্রি বিজয় বেনীবাবুর নিকট বসিয়া আছেন। রোগী অজ্ঞান -অভিভূত হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিলেন। এখন চক্ষু চাহিয়া তিনি বলিলেন—বিজয়! তুমি আমার অনেক করিলে! অতি ভয়ানক রোগ। এ রোগে মানুষ মানুষের কাছে যায় না। প্রাণের ভয় না করিয়া রাত্রিদিন আমার সেবা করিলে। দেখ, আম নিতান্ত্য নিঃস্ব নহি। গোলকধাম গ্রামে আমার বাটী, বাগান ও অনেক ভূমি আছে। সেই গ্রামে আমার জমিদারী আছে।এসমূহ বিষয় তোমাকে উইল করে দান করিব। তুমি শীঘ্র ইহার আয়োজন কর। আজ রাত্রিতে বোধ হয় আমাকে যাইতে হইবে। অতএব তুমি বিলম্ব করিও না। শেষ অবস্থায় হয়ত আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িতে পারি। উইল রেজিষ্টারী না করিলে ও চলে, কিন্তু তুমি আমার নিস্পর সেজন্য রেজিষ্টারী করিতে পারিলে ভাল হয়।'

বিজয় প্রথমে কিছুতেই সম্মত হইল না। কিন্তু উইলের জন্য রোগী নিত্যান্ত ব্যস্ত হইলেন।বেনীবাবু তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, যদি তিনি আরোগ্যলাভ করেন, তাহা হইলে উইল ছিঁড়িয়া ফেলিলেই হইবে। অথবা অন্য উইল করিলেও চলিবে। অগত্যা বিজয় সম্মত হইলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় – উইল

কি করিয়া উইল করিতে হয়, কি করিয়া রেজিষ্টারী করিতে হয়, বিজয় তাহার কিছুতেই জানিতেন না। তাঁহার জ্যেষ্ঠ রাইচরণ রায়মহাশয়কে গিয়া তিনি সকল কথা বলিলেন। বিজয় যেদিন হইতে বসন্ত-রোগীর সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সেইদিন হইতে জ্যেষ্ঠ তাঁহাকে বাড়ীতে আসিতে দিতেন না। বাহিরে দাঁড়াইয়া বিজয় ভ্রাতাকে সকল কথা বলিলেন।

রাইচরণ মহাশয় আর্শ্চয্যান্বিত হইলেন। কোথাকার কে একজন নিস্পর, যাঁহার সহিত অল্পদিন পূর্বে কিছুমাত্র আলাপ-পরিচয় ছিল না, তিনি বিজয়কে এত টাকার সম্পত্তি দিয়া যাইতেছেন, ইহা অপেক্ষা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? মুখে তিনি আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু মনে মনে তাঁহার হিংসা হইল। বিজয়কে বাহিরে রাখিয়া তিনি বাটীর ভিতর গমন করিলেন। কিছুক্ষণ গৃহিণীর সহিত পরামর্শ করিয়া পুনরায় বাহিরে আসিয়া তিনি কনিষ্ঠকে বলিলেন,—'বিজয়! তুমি আমার এই পত্রখানি লইয়া সাব-রেজিস্টারের নিকট গমন কর, তিনি আমার বন্ধু, আমার পত্র পাইলে তিনি বেণীবাবুর বাটীতে আসিবেন।আমার বন্ধু জগৎবাবু ও আর একজনকে লইয়া সে স্থানে আমি যাইতেছি। তাঁহারা উইলের সাক্ষী হইবেন।

বিজয়ের জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাইচরণ রায়মহাশয় দুইজন বন্ধুকে লইয়া বেণীবাবুর বাসায় উপস্থিত

হইলেন। সাবরেজিস্টারকে লইয়া বিজয়ও সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যখন উইল লেখা ও রেজিস্টারী হইল, তখন রাইচরণবাবু বিজয়কে ঔষধ আনিতে পাঠাইলেন। তিনি বলিলেন,—'আমরা সব ঠিক করিতেছি। তোমাকে কোন কাগজে স্বাক্ষর করিতে হইবে না। বেণীবাবুর নিমিত্ত তুমি শীঘ্র এই ঔষধ আনয়ন কর।'

ঔষধ লইয়া বিজয় যখন প্রত্যাগমন করিলেন, তখন তিনি দেখিলেন যে, উইল হইয়া গিয়াছে। সকলে চলিয়া গিয়াছেন, কেবল রাইচরণবাবু রোগীর নিকট বসিয়া আছেন।

রাইচরণ রায়মহাশয় বলিলেন,—'এই দেখ, উইল রেজেস্টারী করা হইয়াছে। এ কাগজ এখন আমার নিকট থাকুক। আমি এক্ষণে বাটী গমন করি।'

রায়মহাশয় চলিয়া গেলেন। বিজয় রোগীর নিকট বসিয়া রহিলেন। সমস্ত দিন কাটিয়া গেল। অপরাহ্নে পুনরায় জ্বর ফুটিল। রোগী পুনরায় অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। চক্ষু মুদিত করিয়া রোগী এ-পাশ ও-পাশ করিত লাগিলেন। বিজয় মাঝে মাঝে তাঁহার মুখে একটু একটু জল দিয়া তাঁহার শুষ্ককণ্ঠ সিক্ত করিতে লাগিলেন।

রাত্রি দুই প্রহরের সময় একটু চেতন হইল। চক্ষু চাহিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,

—'তুমি কে?

বিজয় উত্তর করিলেন,—'আমাকে চিনিতে পারেন না? আমি বিজয়।'

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'যে কাগজ তাহার নাম কি, তাহাতে লেখা হইয়াছে?'

বিজয় বলিলেন,—'উইল? হ্যাঁ, তাহা লেখা হইয়াছে।'

বেণীবাবু পুনরায় বলিলেন,—'আর একটা কথা তোমাকে বলিব। কিন্তু কি কথা তাহা ঠিক মনে হইতেছে না। এই মনে আসিতেছে, আর তৎক্ষণাৎ উড়িয়া যাইতেছে। রও—ঠিক কাপড় কাচা সাবানের মত।'

বিজয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কাপড় কাচা সাবানের মত? সে আবার কি? সাজি মাটি?'

বেণীবাবু বলিলেন,—'তাহার নাম আমার মনে হইতেছে না। এত বড়; লম্বা লম্বা। চক্ চক্ করে।'

বিজয় ভাবিলেন,—'রোগী প্রলাপ বকিতেছেন।'

কিছুক্ষণ পরে রোগী পুনরায় বলিলেন,—'কাছে মুখ লইয়া এস, তোমাকে চুপি চুপি বলিব। কোথায় রাখিয়াছি? অন্ধকার মাথার উপর। তাহাকে কি কাষ্ঠ বলে, ঝম্-ঝম্, ঝম্-ঝম্, ঝম্-ঝমি গাছ। কচি কচি মেয়েরা পড়িতে গিয়াছিল। চক্ষুর জল বাঘের গায়ে পড়িয়াছিল। সেই ঝম্-ঝম্ কাঠের ভিতর। ঝম্-ঝম্।'

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনরায় তিনি বলিলেন,—'চাবি লও। ঐ বাক্স খোল।'

বিজয় তাহাই করিলেন।

বেণীবাবু পুনরায় বলিলেন,—'দক্ষিণ পার্শ্বে দেখ। একখানি মেয়েমানুষের ছবি পাইবে তাহার উপর কি আছে? মানুষের নাক। সোনা দিয়া বাঁধাইয়াছি। তুমি সর্বদা গলায় পরিধান

করিবে। তোমার ভাল হইবে তাহার পর ঐ স্ত্রীলোককে দিবে। হা, হা, হা, সোনা দিয়া বাঁধানো মানুষের নাক, হা, হা, হা।'

বিজয় যথার্থই বাক্সের ভিতর একখানি ছবি ও সোনা দিয়া বাঁধানো মানুষের শুষ্ক নাক দেখিতে পাইলেন। বিজয় মনে ভাবিলেন,—'মৃত্যুকালে ইনি আমাকে এই নাক গলায় পরিধান করিতে আজ্ঞা করিলেন। আমি ইঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিব।'

বেণীবাবু তাহার পর অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। আর জ্ঞান হইল না। মৃদুস্বরে মাঝে মাঝে কেবল তিনি বলিতে লাগিলেন,—'অন্ধকার। মাথার উপর। কাপড় কাচা সাবান। চক্‌চকে। ঝম্-ঝম্, ঝম্‌ঝমি গাছ। তাহার ভিতর আমি রাখিয়াছি। সোনা বাঁধানো নাক। হা, হা, হা।'

নাকের কথা ব্যতীত অন্য সকল কথা প্রলাপ, অথবা ইহার কোন অর্থ আছে, বিজয় তাহা বুঝিতে পারিলেন না। রোগী ক্রমে সুস্থির হইলেন, রাত্রিশেষে তিনি ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন।

তৃতীয় অধ্যায় – টাকার লোভ

যথাসময়ে বিজয় বেণীবাবুর শ্রাদ্ধ করিলেন।

তাহার পর তিনি ভ্রাতাকে বলিলেন,—'দাদা! তবে ত আমি এক্ষণে বেণীবাবুর গ্রামে গমন করি। সে গ্রামের নাম গোলকধাম। বেণীবাবু আমাকে বলিয়াছেন যে, তাঁহার কর্মচারীর নাম নৃসিংহ বড়াল। সকলে তাঁহাকে বড়াল মহাশয় বলে। তিনি তাঁহার স্ত্রীর সহিত বেণীবাবুর বাটীতে বাস করেন। চাষবাসের কাজ ও জমিদারীর কাজ সমস্ত কাজের তিনি তত্ত্বাবধান করেন। আমি সেস্থানে গিয়া উইলের প্রোবেট লইব ও বড়ালমহাশয়ের হিসাব দেখিব। উইলখানি আমাকে প্রদান করুন।'

রায়মহাশয় উত্তর করিলেন,—'তোমাকে আমি বলিতে ভুলিয়া গিযাছি। বেণীবাবু মনে করিলেন যে, তুমি বালক, বিষয় রক্ষা করিতে পারিবে না সেজন্য তিনি আমার নামে উইল করিয়াছেন। সমুদয় বিষয় তিনি আমাকে দিয়াছেন।

বিজয়ের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি বলিলেন,—'সে কি দাদা! জ্যেষ্ঠ ভাই হইয়া আমাকে আপনি ফাঁকি দিলেন। বেণীবাবু পীড়িত ছিলেন। সে সময় তাঁহার জ্ঞান ছিল না।'

রায়মহাশয় বলিলেন,—'ও কথা বলিও না। যদি অজ্ঞান অবস্থায় তিনি উইল করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সে উইল কোন কাজের নহে। কিন্তু তখন অজ্ঞান ছিলেন না। যাঁহারা সে সময় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই সে সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবেন।'

বিজয় বলিলেন,—'তবে উইলে আমার নাম না লিখিয়া চুপি চুপি আপনার নাম বসাইয়া দিয়াছিলেন। বেনীবাবু তাহা জানিতে পারেন নাই।'

রাইচরণ বাবু বলিলেন – আমি নিজে হাতে লিখি নাই। জগজ্জীবনবাবু তাহা লিখিয়াছিলেন। সবরেজিষ্টারের সমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে তিনি উইল পাঠ করিয়া বেনী বাবুকে শুনাইয়াছিলেন।

জানিয়া শুনিয়া তবে তিনি উইলে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। যাঁহারা সে সময় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের বরং তুমি জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ।'

অনেকক্ষণ দুই ভ্রাতায় তর্ক-বিতর্ক হইল। বিজয় নিশ্চয় বুঝিলেন যে, দাদা শঠতা করিয়া উইলে নিজের নাম বসাইয়া দিয়াছেন। রুগ্ন অবস্থায় বেণীবাবু তাহা বুঝিতে পারেন নাই। কাঁদিতে কাঁদিতে জ্যেষ্ঠকে তিনি বলিলেন,—'ভাই হইয়া আপনি বড়ই নিষ্ঠুর কাজ করিলেন? আপনার সহিত তাঁহার আলাপ-পরিচয় কিছুই ছিল না। আপনি বড়ভাই, আপনাকে আর আমি কি বলিব, নিত্যন্ত অন্যায় করিয়া আপনি আমাকে বঞ্চিত করিলেন। যাহা হউক, যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। আমাকে অর্ধেক বিষয় আপনি প্রদান করুন।'

তাহাতেও রায়মহাশয় সম্মত হইলেন না। স্ত্রীর পরামর্শে বিজয়কে তিনি বাটী হইতে বাহির করিয়া দিলেন।

বিজয় কলিকাতা যাইবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। পথে যাইতে যাইতে তিনি ভাবিলেন,—'গোলোকধামে বেণীবাবুর বাড়ী। বড়াল মহাশয় তাঁহার কর্মচারী। সে স্থানের ভাবটা কিরূপ, একবার তাহা জানিয়া যাই।

বিজয় গোলকধামে গিয়া উপস্থিত হইলেন। লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া বরাবর তিনি বেণীবাবুর বাটীতে গমন করিলেন। সে স্থানে গিয়া শুনিলেন যে তাঁহার জ্যেষ্ঠ,—বড়ালমহাশয়কে বেণীবাবুর মৃত্যুসংবাদ দিয়াছেন, আর তিনি কিরূপ উইল করিয়াছেন, তাহাও লিখিয়াছেন।

বিজয় আরও দেখিলেন,—বড়ালমহাশয় বেণীবাবুর বাড়ীর অনেকগুলি ঘরের মেঝে খনন করাইতেছেন।

বড়ালমহাশয় বলিলেন,—'আপনার ভ্রাতা চারিদিন পরে এই বাটীতে আসিবেন। ঘরের মেজে সব নষ্ট হইয়া গিয়াছিল; সেজন্য মেজেগুলি নূতন করিয়া আমি করিতেছি।'

সে কথায় বিজয়ের প্রত্যয় হইল না। মেজে খুঁড়িয়া বড়ালমহাশয় যেন কি খুঁজিতেছেন,—এইরূপ তাঁহার সন্দেহ হইল। 'অন্ধকার! ঝম্-ঝমি গাছের ভিতর আমি রাখিয়াছি।' মৃত্যুকালে বেণীবাবু এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন। এ কথার কি কোন অর্থ আছে? বিজয় তাহা ভাবিতে লাগিলেন। সোনা দিয়া বাঁধানো নাক ও ছবির কথাও তিনি সেই সময় বলিয়াছেন। তাহা সত্য। তবে এ কথা সত্য হইবে না কেন? বেণীবাবুর সে সময় জ্ঞান ছিল না। তিনি এক দ্রব্যের নাম করিতে অন্য দ্রব্যের নাম করিয়াছেন। ইহাই সম্ভব। কিন্তু ঝম্-ঝমি গাছের মূলে যে কিছু সত্য আছে—বিজয়ের তাহা নিশ্চয় বিশ্বাস হইল।

বিজয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'বাটীর চারিদিক দেখিতেছি বৃহৎ বাগানের দ্বারা পরিবেষ্টিত। ইহার ভিতর ঝম্-ঝমি নামক কি কোন গাছ আছে?'

বড়লমহাশয় উত্তর করিলেন,—'ঝুম-ঝমি গাছ! কস্মিনকালে এ গাছের নাম শুনি নাই।'

বিজয় বলিলেন,—'মৃত্যুকালে বেণীবাবু বলিয়াছেন যে, কাপড়কাচা সাবানের ন্যায় কোনরূপ চক্‌চকে দ্রব্য তিনি ঝম্-ঝমি গাছের ভিতর রাখিয়াছেন। ইহার অর্থ কি?'

বড়ালমহাশয় বলিলেন,—'তবে আর আমি বৃথা ঘরের মেজে খনন করি কেন?

বিজয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'মেজে খুঁড়িয়া আপনি কি খুঁজিতেছেন?'

বিজয় বলিলেন,—'এই যে বলিলেন, তবে আর বৃথা খনন করি কেন?

বড়লমহাশয় সে প্রশ্নের ভালরূপ উত্তর দিলেন না। অন্য কথা বলিয়া সে কথা চাপা দিলেন।

বেণীবাবু একাকী পশ্চিমে গিয়াছিলেন কেন? সঙ্গতিপন্ন লোক হইয়া একাকী নিভৃতে কালযাপন করিতেছিলেন কেন,—'এই সমুদয় কথা বিজয় তাহার পর বড়ালমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু তাহারও ভালরূপ কোন উত্তর পাইলেন না। এইমাত্র কেবল তিনি জানিতে পারিলেন যে, একদিন রাত্রিকালে সহসা তিনি কাশী চলিয়া গিয়াছিলেন।

তাহার পর সেই গ্রামের দুই চারিজন লোককে তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলেন যে, বেণীবাবু ও তাহার স্ত্রী এই বাটীতে বাস করিতেন। বেণীবাবুর স্ত্রীকে গ্রামের লোক 'সোনা-বৌ' বলিয়া ডাকিত। তিনি সর্বদা পুজা-পাঠ ও জপ-তপ লইয়া থাকিতেন। কিছুদিন পরে একজন পীড়িত সন্ন্যাসী তাঁহাদের বাটীতে আগমন করেন। বিশেষরূপ যত্ন করিয়া বেণীবাবু তাঁহাকে রোগ হইতে মুক্ত করেন। সন্ন্যাসীর গায়ের বর্ণ-নিতান্ত কালো ছিল। সেজন্য 'কালো-বাবা' বলিয়া সকলে তাঁহাকে ডাকিত। প্রায় তিন বৎসর 'কালো-বাবা' বেণীবাবু বাটীতে বাস করেন। তাহার পর সহসা বেণীবাবু, 'কালো-বাবা' ও 'সোনা-বৌ' কাশী চলিয়া গেলেন। কেন এরূপ সহসা তাঁহারা কাশী গমন করিলেন, কেহ তাহা জানে না। বড়াল মহাশয়বোধ হয় ইহার বিশেষ কারণ অবগত আছেন; কিন্তু কাহাকেও তিনি কোন কথা প্রকাশ করিয়া বলেন না।

সে সন্ন্যাসী কোথায় গেলেন, বেণীবাবুর স্ত্রী 'সোনা-বৌ' বা কোথায় গেলেন, তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া বেণীবাবু অন্য স্থানে গমন করিলেন কেন,—এ সমুদয় কথার সন্ধান বিজয় কিছুই পাইলেন না।

যাহা হউক, বিজয় কলিকাতা চলিয়া গেলেন। বেণীবাবু যে টাকা দিয়াছিলেন সেই টাকায় তিনি সামান্যভাবে ব্যবসা আরম্ভ করিলেন। অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল। সকল কাজেই তিনি প্রচুর লাভ করিতে লাগিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি একজন ধনবান্ লোক হইয়া উঠিলেন। বেণীবাবুর আদেশে সোনা দিয়ে বাঁধানো সেই মানুষের নাক তিনি গলায় পরিয়াছিলেন। তাঁহার মনে ধ্রুববিশ্বাস হইল যে, এই নাক তাঁহার ভাগ্যের মূল।

চতুর্থ অধ্যায়—ভয়াবহ শব্দ

রাইচরণ রায়মহাশয় যথাসময়ে গোলোকধামে আসিয়া বেণীবাবুর বাটীতে বাস করিতে লাগিলেন। বড়ালমহাশয় তাঁহাকে সমুদয় সম্পত্তি বুঝাইয়া দিলেন। বড়ালমহাশয়কে তিনি কর্মচ্যুত করিলেন না। যেমন বেণীবাবুর সময়ে তিনি কাজকর্ম করিতেন, এখনও তিনি সেইরূপ কাজকর্ম করিতে লাগিলেন। বেণীবাবুর আত্মীয়স্বজন কেহ ছিল না। সেজন্য উইলের প্রোবেট

লইতে কোন গোলযোগ হয় নাই। কিন্তু অল্পদিন পরে গ্রামবাসীদিগের সহিত গোলযোগ উপস্থিত হইল। গ্রামের সকলেই রায়মহাশয়ের প্রজা। প্রজাদিগের খাজনা বৃদ্ধি করিতে রায়মহাশয় চেষ্টা করিলেন। তাহাদের সহিত সেজন্য নানারূপ মোকদ্দমা মামলা চলিতে লাগিল।

রায়মহাশয়ের পুত্র ছিল না, কেবল এক কন্যা। কন্যা ও জামাতা তাঁহার বাড়ীতেই থাকিত। তাহা ব্যতীত রায়মহাশয়ের স্ত্রীর ভগিনীর কন্যা অর্থাৎ বোন-ঝি ও তাঁহার দুই কন্যা এই সংসারে থাকিত। স্ত্রীর ভগিনীর কন্যা বিধবা ছিলেন।

সাত বৎসর এইরূপে কাটিয়া গেল। তাহার পর একদিন রাত্রিতে রায়মহাশয়ের সহসা নিদ্রাভঙ্গ হইল। মানুষের পদশব্দ তাঁহার কর্ণগোচর হইল। বাটীতে চোর প্রবেশ করিয়াছে, এইরূপ অনুমান করিয়া তিনি আলো জ্বালিলেন। দোতালার প্রায় সকল ঘরেই সারসি খড়খড়ি সম্বলিত জানলা ছিল। রায়মহাশয় যে ঘরে শয়ন করিয়াছিলেন, বাটীর ভিতর দিকে তাহাতে দুইটি জানালা ছিল। বিছানার নিকট যে জানালা তাহার খড়খড়ি খোলা ছিল; কিন্তু সারসি অর্থাৎ কাচ বন্ধ ছিল। রায়মহাশয় দেখিলেন যে, দালানে দাঁড়াইয়া একজন ঘোর কৃষ্ণকায় লোক সেই কাচের উপর মুখ রাখিয়া উঁকি মারিতেছে। কাচের উপর এত সবলে সে আপনার মুখ রাখিয়াছে যে, তাহার নাক যেন বসিয়া গিয়াছে। নাক যেন নাই এইরূপ বোধ হইতেছিল।

'কে ও। কে ও। বলিয়া রায়মহাশয় তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইলেন। দুড়দুড় করিয়া পদশব্দ হইল। তাহার পর আর কিছু তিনি শুনিতে বা দেখিতে পেলেন না।

বাটীর সকলে জাগিয়া উঠিল। নীচে একজন চাকর বাস করিত, সে দৌড়িয়া আসিল। রায়মহাশয়ের জামাতা উঠিলেন। বাহির বাটীতে বড়াল মহাশয় বাস করিতেন, তিনি আসিলেন। সমস্ত বাটী সকলে তন্নতন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিল। চোরের চিহ্নমাত্র কেহ দেখিতে পাইল না। সদর দরজা ও অন্তঃপুরের খিড়কি-দরজা সন্ধ্যার পর যেরূপ বন্ধ করা হইয়াছিল, এখনও সেইরূপ বন্ধ ছিল। আশ্চর্য কথা! চোর কিরূপ পলায়ন করিল? বদ্ধদ্বার জানলার ভিতর দিয়া অথবা প্রাচীর ভেদ করিয়া রক্ত-মাংসের শরীর বিশিষ্ট মানুষ পলাইতে পারে না। রায়মহাশয় কি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন? অথবা যে কৃষ্ণকায় মূর্তি তিনি দেখিয়াছিলেন, তাহা কি মানুষ নহে?

নানারূপ তর্ক-বিতর্ক হইতে লাগিল। একমাত্র বড়ালমহাশয় নিস্তব্ধ রহিলেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া অবশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'মানুষটা কিরূপ ঠিক করিয়া তাহা আমাকে বলিতে পারেন?'

রায়মহাশয় উত্তর করিলেন,—'কেবল নিমিষের নিমিত্ত সে আমার নয়নগোচর হইয়াছিল। আমি অধিক কিছু বলিতে পারি না। তবে কেবল এইমাত্র বলিতে পারি যে, তাহার বর্ণ অতিশয় কালো। বয়ঃক্রম চল্লিশ হইবে। সারসিতে এরূপ ভাবে সে আপনার নাসিকা চাপিয়া ধরিয়াছিল যে, তাহাতে নাক একবারে চেপ্‌টা হইয়া গিয়াছিল। এরূপ লোক এ গ্রামে কেহ আছে?'

বড়ালমহাশয় বলিলেন,—'না, আমি কিছু বুঝিতে পারিলাম না।'

পরদিন গ্রামে কোন বাড়ীতে পাঁঠা বলিদান হইয়াছিল। রাত্রিতে অনেকগুলি বন্ধুকে সে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। আহারাদির পর একজন লোক বাটী করিয়া একটু রাঁধা মাংস লইয়া যাইতেছিল। পথে একটি হেলা বেলাগাছ হইতে 'খুপ' করিয়া তাহার হাত হইতে পাঁঠার বাটিটি তুলিয়া লইল। ভয়ে আঁউ-মাউ করিয়া সে রুদ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল ও কিছু দূর গিয়া একেবারে অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

নদীর নিকট গ্রাম। গ্রামের ভিতর তখন বান আসিয়াছিল। মাঝে মাঝে ভূমি উচ্চ করিয়া তাহার উপর লোকে গৃহ নির্মাণ করিয়াছিল। লোকের বাটীগুলি যেন দ্বীপের ন্যায় হইয়াছিল। নিকটস্থ কয়েক বাটী হইতে লোক দৌড়িয়া আসিল। অনেক কষ্টে সেই ভয়প্রাপ্ত লোককে তাহারা সচেতন করিল। সে রাত্রিতে বেলগাছের দিকে যাইতে কেহ সাহস করিল না। পরদিন প্রাতঃকালে সকলে দেখিল যে, বেলতলায় কাঁসার বাটিটি পড়িয়া আছে। মাংসটুকু ভূত চাটিয়া-পুটিয়া খাইয়াছে।

তাহার পর দুইদিন সন্ধ্যার পর দুইজন গ্রামবাসীব সহিত ভূতটির সাক্ষাৎ হইল। তাহারা অবশ্য ঘোরতর ভীত হইয়া চীৎকার করিতে করিতে তাহার নিকট হইতে পলায়ন করিল। সেইদিন হইতে গ্রামের লোক সন্ধ্যার পর আর কেহ ঘর হইতে বাহির হইত না। সন্ধ্যা হইলেই দ্বার বন্ধ করিয়া সকলে আপনার আপনার ঘরের ভিতর বসিয়া থাকিত। গ্রামের যে দুই জনের সহিত ভূতের সাক্ষাৎ হইল, তাহারা বলিল যে, সে ঘোর কৃষ্ণবর্ণের ভূত, পুরুষ ভূত, আর তাহার নাক নাই।

দুইদিন পরে বিষম বর্ষা আরম্ভ হইল। ঘোর দুর্যোগ। টিপ্ টিপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। মাঝে মাঝে মুসলধারে বৃষ্টি আসিতেছিল। আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছিল। বাতাসের শোঁ শোঁ ও বৃষ্টি-ঝাপটের চট্ চট্ শব্দে পৃথিবী কম্পিত হইতেছিল। নদীতে আরও প্রবলবেগে বান আসিল। গ্রাম পূর্ব অপেক্ষা আরও গভীরভাবে প্লাবিত হইল। এক একটি উচ্চ স্থানের গৃহগুলিতে দ্বীপের ন্যায় দেখাইতে লাগিল। চারিদিক প্রশস্ত বাগান দ্বারা পরিবেষ্টিত রায়মহাশয়ের বৃহৎ অট্টালিকা উচ্চ ভূমিতে ছিল। তাহার ভিতর নদীর জল কখনও প্রবেশ করে না।

শোঁ শোঁ, ভোঁ ভোঁ, চট্ চট্, পট্ পট্—ঝড় ও জলের শব্দ। একে বান, তাহাতে ভূতের ভয়, তাহাতে ঘোর দুর্যোগ। আজ দিনের বেলাতেই ঘর হইতে কেহ বড় বাহির হয় নাই। মানুষের কথা দূরে থাকুক, জীব-জন্তু কাক-পক্ষীও আজ আহারান্বেষণে বাহির হয় নাই। সন্ধ্যা হইতে নিবিড় অন্ধকারে পৃথিবী আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। রাত্রি দুই প্রহর অতীত হইয়াছে। এমন সময়ে সেই বৃষ্টির শব্দ ভেদ করিয়া আর একপ্রকার শব্দ উত্থিত হইল। রায়মহাশয়ের বাটীর নিকট একটি বৃহৎ তেঁতুল গাছ আছে। সেই তেঁতুল গাছের নিবিড় শাখাপল্লবের ভিতর হইতে এই ভয়াবহ শব্দ উত্থিত হইল।

'হু হু! হু হু! হু হু হু!' শব্দটা এইরূপ। কিন্তু অতি ভয়াবহ শব্দ।

পঞ্চম অধ্যায় – খাঁদা ভূত

তেঁতুল গাছ হইতে সেই ভীষণ শব্দ উপস্থিত হইল। সেই শব্দে গ্রামের সমস্ত লোক জাগরিত হইল। কি ভয়ানক ব্যাপার! এ কি সেই খাঁদা ভূতের কাণ্ড, অথবা অন্য কোন দানাদৈত্য রাক্ষসের চীৎকার! সকলের বক্ষঃস্থল ভয়ে ধড়্‌ফড়্ করিতে লাগিল। ঘোর আতঙ্কে সকলের হস্তপদ কাঁপিতে লাগিল। বালক-বালিকাগণ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। 'চুপ চুপ' করিয়া মাতা-পিতাগণ তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। শিশুগণ মাতাগণকে জড়াইয়া ধরিল। মাতাগণ তাহাদিগকে কোলে টানিয়া লইলেন। বয়স্ক লোকগণ দুর্গা দুর্গা বলিয়া দেবতাগণকে স্মরণ করিতে লাগিল । পুরুষগণ উঠিয়া বিছানায় বসিল। আলো জ্বালিয়া তামাক সাজিবে, সে সাহস কাহারও হইল না।

'হু হু। হু হু। হু হু হু!' তেঁতুল গাছ হইতে যেই এই শব্দ উত্থিত হইল, আর চারিদিকে 'হুক্কা হুয়া, হুক্কা হুয়া হু' শৃগালগণ ডাকিয়া উঠিল। সেই সময় কাক পক্ষিগণ অন্ধকার না মানিয়া, বৃক্ষশাখা পরিত্যাগ করিয়া উড়িতে লাগিল। কা কা রবে তাহারা একবার এ ডালে বসিল, পুনরায় সে ডাল হইতে পুনরায় সে ডাল হইতে উড়িয়া অন্য ডালে গিয়া বসিতে লাগিল। নিকটস্থ বাঁশঝাড়ে বকের পাল পালকের ভিতর মস্তক লুকাইয়া বৃষ্টির জলে ভিজিতেছিল। কক্ কক্ রবে তাহারও চারিদিকে উড়িতে লাগিল। বাদুড়গণ সন্ সন্ শব্দে সে স্থান হইতে পলায়ন করিতে লাগিল। পেচকগণ হুঠ হুঠ রবে রায়মহাশয়ের অট্টালিকা-গাত্রে কোটরের ভিতর আশ্রয় লইল। কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হইলে,যেই সেই তেঁতুল গাছ তাহাদের নয়নগোচর হইল, আর তাহারা বসিয়া পড়িল। লাঙ্গুল ভিতরে রাখিয়া পশ্চাৎ পদদ্বয়ের উপর ভর দিয়া উচ্চভাবে বসিয়া, দূর হইতে তেঁতুল গাছের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া তাহারা অতি ভয়ঙ্কর শব্দে ক্রন্দন করিতে লাগিল। সেই গভীর নিশাকালে সেই চীৎকারে একে লোকের হৃদয় কম্পিত হইয়াছিল, তাহার পর আবার সেই প্লুতস্বরে কুকুরের ক্রন্দনে আতঙ্কের আর সীমা রহিল না।

অল্পক্ষণ পরে পৃথিবী নীরব হইল। কিন্তু সে স্থিরভাব অধিকক্ষণ রহিল না। তেঁতুল গাছ হইতে পুনরায় সেই ভীষণ শব্দ উত্থিত হইল— 'হু, হু, হু, হু, হু, হু।'

আর পরক্ষণেই শৃগালগণ পুনরায় ডাকিয়া উঠিল— 'হুক্কা হুয়া, হুক্কা হুয়া হু।'

পুনরায় পক্ষীর কোলাহল আরম্ভ হইল। পুনরায় কুকুরগণ কাঁদিয়া উঠিল।

অল্পক্ষণ পরে আর একাবর পৃথিবী সুস্থির হইল, কিন্তু পরমুহূর্তে পুনরায় সেই ভয়াবহ শব্দ উঠিল,— 'হু, হু, হু, হু, হু, হু, হু।'

সেই সঙ্গে শৃগালগণের ডাকে পৃথিবী পরিপূরিত হইল,—পূর্বের ন্যায় কাক-পক্ষীগণের কোলাহলে ও কুকুরের ক্রন্দনে মানুষের হৃদয় স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। তিনবার তেঁতুল গাছ হইতে হুহুঙ্কার শব্দ হইল। তিনবার চারিদিকে ঘোর কোলাহল উপস্থিত হইল, তাহার পর আর সে শব্দ হইল না। বায়ুর সন সনও বৃষ্টি-ঝাপটের চট্ চট্ ব্যতীত আর কোন শব্দ হইল না।

কিন্তু গ্রামের লোকের আর নিদ্রা হইল না। ভয়ে শঙ্কিত হইয়া দেবতাদিগকে ডাকিয়া

সকলে রাত্রি যাপন করিল। পরদিন গ্রামের লোক পরস্পর চুপি চুপি বলাবলি করিতে লাগিল,—'পুরুষ-পুরুষানুক্রমে আমরা এ স্থানে বাস করিতেছি। এরূপ বিষম ব্যাপার গ্রামে পূর্বে কখন ঘটে নাই। ভূতের কণ্ঠস্বর খোঁনা হয় সত্য, কিন্তু ভূত যে খাঁদা হয় তাহা কখনও আমরা শুনি নাই। তাহার উপর ঘোর রাত্রিতে এই ভয়ানক শব্দ! এরূপ ভয়াবহ শব্দ কেহ কখন শ্রবণ করে নাই। ভূস্বামীর পাপে এই সকল অমঙ্গল ঘটিয়াছে। রাজাবাবুর সময়ে আমরা পরম সুখে কালযাপন করিতেছিলাম। কোথা হইতে একটা অনাহূত হতভাগা লোক আসিয়া আমাদের সর্বনাশ করিল। এ গ্রামে আর আমাদের ভদ্রস্থ নাই।

পরদিন প্রাতঃকালে রাইচরণ রায়মহাশয় তাঁহার কর্মচারী বড়ালমহাশয়কে ডাকিতে পাঠালেন। ভূতের ভয়ঙ্কর চীৎকার সম্বন্ধে দুই জনে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। বড়াল বলিলেন,—'না মহাশয়! আমাদের গ্রামে পূর্বে খাঁদা ভূতের উপদ্রব ছিল না। রাত্রি দুই প্রহরের সময় এরূপ ভয়ঙ্কর চীৎকার ও কেহ শ্রবণ করে নাই।'

সেই দিন রায়মহাশয় আপনার স্ত্রীকে বলিলেন,—'দেখ রায়ণী! আমার মনে কিরূপ একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে, খাঁদা ভূত প্রথমে আমার বাটীতে আসিয়াছিল। তাহার পর আমার তেঁতুল গাছ হইতে সে বিকট শব্দ করিয়াছে। বিজয়কে প্রবঞ্চনা করিয়া আমরা এই বিষয় লইয়াছি। আমি দেখিতেছি যে, ইহাতে আমাদের ভাল হইবে না। আমাদের সর্বনাশ করিবার নিমিত্ত খাঁদা ভূতের আবির্ভাব হইয়াছে।

স্বামীকে ধমক দিয়া রায়ণী বলিলেন,—'পুরুষ-মানুষের সাহস থাকে। কিন্তু তোমার মত ভীরু পুরুষ কখন আমি দেখি নাই। লোকে কত কি উপায় অবলম্বন করিয়া সম্পত্তি লাভ করে। দেশে বড় মানুষ আছে; কি করিয়া তাহাদের বিষয় হইয়াছে, একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিও।'

ষষ্ঠ অধ্যায় – ঘোর অনুতাপ

সে বৎসর খাঁদা ভূতকে আর কেহ দেখিতে পাইল না। আর সেরূপ ভয়ঙ্কর শব্দ হইল না। কিন্তু অল্পদিন পরে রায়মহাশয়ের জামাতা রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইলেন। সেই রোগে তাঁহার মৃত্যু হইল।

এক কন্যা ব্যতীত রায়মহাশয়ের অন্য সন্তান ছিল না। সেই কন্যা বিধবা হইল; কন্যা এখনও অল্পবয়স্কা, এখনও তাহার সন্তান-সন্ততি হয় নাই। রায়মহাশয় ও তাঁহার গৃহিণী গভীর শোক-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। এত কাণ্ড করিয়া সম্পত্তি লাভ করিলেন, সে সম্পত্তি এখন কে ভোগ করিবে?

গৃহিণীর অন্তঃকরণেও ঘোর অনুতাপ উপস্থিত হইল। মিথ্যাকথা, নীচতা, নিষ্ঠুরতা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি পাপকার্য করিলে, মানুষ যে তাহার প্রতিফল পায়, এখন তাহার মনে নিশ্চয় বিশ্বাস হইল। গাছতলায় বাস করিয়া, দিনান্তে শাকান্ন ভোজন করিয়া, ধর্মপথে থাকিয়া মানুষ যদি প্রিয়জনের অকাল-মৃত্যু জনিত শোক হইতে নিষ্কৃতি পায়, সেও ভাল; তথাপি শোক-বিদীর্ণ হৃদয়ে কোটিপতি হওয়াও কিছু নহে। তিনি ভাবিলেন যে,—'এ মুহূর্তে সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া

বনে গিয়া বাস করি। যদি জামাতাকে আমি ফিরিয়া পাই।'

স্ত্রী-পুরুষে ঘোর দুঃখে দিনপাত করিতে লাগিলেন। এক বৎসর কাটিয়া গেল। পুনরায় ভাদ্রমাস আসিল। নদীর বানে গ্রাম পুনরায় প্লাবিত হইল।

রায়মহাশয় নিদ্রা যাইতেছিলেন। সহসা তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাঁহার মনে কিরূপ একটা উদয় হইল। তাড়াতাড়ি তিনি আলো জ্বালিলেন। গত বৎসরের ন্যায় ভিতর বারেন্দার দিকের খড়খড়ি খোলা ছিল, কিন্তু সারসি বন্ধ ছিল। সেই দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তিনি দেখিলেন যে, কাচের উপর মুখ রাখিয়া ঘোর কৃষ্ণবর্ণের সেই খাঁদা ভূত দাঁড়াইয়া আছে।

রায়মহাশয় ভীরু ছিলেন না। এই অমানুষিক মূর্ত্তি দেখিয়া ঘোরতর ভীত হইয়াছিলেন বটে, তথাপি তিনি সাহস করিয়া ঘর থেকে বাহির হইলেন না। কিন্তু কোন স্থানের ভূতের চিহ্ন মাত্র পাইলেন না। চাকর উপরে আসিল। গোলমাল শুনিয়া বড়ালমহাশয়ের বাহির বাড়ী হইতে আসিলেন। তন্নতন্ন করিয়া সকলে সমুদয় বাড়ী অন্বেষণ করিল। কিন্তু ভূতের চিহ্নমাত্র কেহ দেখিতে পাইল না। সদর দ্বার ও খিড়কি দ্বার পূর্বের ন্যায় বন্ধ ছিল। সুতরাং ভয় দেখাইতে অথবা চুরি করিতে, বাহির হইতে কেহ বাটীর ভিতর প্রবেশ করে নাই।

বাড়ীটি বৃহৎ। দুই মহল দুই তলা, কতক পূর্বকালের, কতক একালের চকমিলন বাটী। বাড়ীর ভিতর উত্তর দিকে দোতলায় দুইটি বৃহৎ ঘর। তাহাতে রায়মহাশয়ের কন্যা ও জামাতা বাস করিতেন। এক্ষণে একজন ঝি লইয়া তাঁহার কন্যা একাকিনী সেই দুই ঘরে বাস করেন। উত্তর-পশ্চিম কোণে একটি সিঁড়ি। পূর্বদিকে দুইটি শয়নাগার। তাহাতে রায়মহাশয়ের স্ত্রীর ভগিনী-কন্যা আপনার দুই কন্যা লইয়া বাস করেন। পূর্বে এই দুইটি ঘরে বেণীবাবুর ও তাঁহার স্ত্রী শয়ন করিতেন। ইহার পার্শ্বে একটি অন্ধকার ঘর। তাহাতে বেণীবাবুর জিনিসপত্র থাকিত। তাহার পার্শ্বে পূর্বদিকে আর একটি সিঁড়ি। অন্তঃপুরের দক্ষিণ দিকে পূজার দালানের পশ্চাৎ-প্রাচীর। পূর্বে দালানে পূজা হইত। এক্ষণে ক্রিয়াকলাপ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। দালানের সম্মুখে, বাহির-বাটীতে প্রাঙ্গন, ঘাস ও বনে পরিপূর্ণ হইয়াছে। বাহির-বাটীতে উপর ও নীচে অনেকগুলি ঘর। তাহার দুইটি ঘরে বড়ালমহাশয় সপরিবারে বাস করেন। সদর দরজা সর্বদাই বন্ধ থাকে। ভিতর-বাটীর পশ্চিম দিকে খিড়কি দ্বার। সেই দ্বার দিয়া সকলে আনাগোনা করেন।

প্রাতঃকালে রায়মহাশয় জানিতে পারিলেন যে, পূর্বদিকে যে অন্ধকার ঘর আছে, তাহার অনেকটা প্রাচীর ভূতে খনন করিয়াছে। তাহা দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইল। ভূতে কি কখন কোন স্থান খনন করে? অন্ধকার ঘর তালা দ্বারা আবদ্ধ ছিল। তালা সেইরূপ বন্ধ ছিল। সুতরাং মানুষে ঘরের প্রাচীর খনন করে নাই। কিন্তু ভূতে দেয়াল খুঁড়িল কেন?

বড়ালমহাশয়কে ডাকিয়া কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—'ভূত গত রাত্রিতে চোর-কুঠুরির প্রাচীর খনন করিয়াছে। ইহার কারণ কি, অনুমান করিতে পারেন?'

বড়ালমহাশয় কারণ অনুমান করিতে পারিলেন না।

রায়মহাশয় একটু চিন্তা করিয়া পুনরায় বলিলেন,—'এ স্থানে দেখিতেছি লোকের খনন করা যাই। মানুষেও খনন করে, ভূতেও খনন করে। এ বাড়ীতে প্রথম যখন আমরা আগমন করি, তখন আসিয়া দেখিলাম যে আপনি অনেকগুলি ঘরের মেজে খুঁড়িয়া নূতন করিয়াছেন। আপনাকে আমি এ কাজ করিতে বলি নাই। তাহার পর কখনও এ স্থান, কখনও সে স্থান, মাঝে মাঝে আপনি খনন করেন। কখনও বা ঘরের দেয়ালে ঘা মারিয়া পরীক্ষা করেন। ইহার কারণ কি, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। কোনও স্থানে ধন প্রোথিত আছে?'

বড়ালমহাশয় উত্তর করিলেন,—'বালি-কাম ফাঁপিয়াছে কি না, পুনরায় মেরামত করিতে হইবে কিনা তাহাই আমি পরীক্ষা করিয়া দেখি।'

রায়মহাশয় বলিলেন,—'বাগানের ভূমিতে বালি-কাম আবশ্যক হয় না। বাগানেরও এ স্থান সে স্থান খনন করেন কেন? কিছুদিন হইতে আপনি আবার গাছ কাটিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমার অনুমতি না লইয়া সেদিন বড় একটি শিরীষ গাছ আপনি কাটিয়াছেন। ইহার কারণ কি?' বড়ালমহশয়ের মুখ শুষ্ক হইয়া গেল। মনের অসাবধানতাবশতঃ সহসা তিনি বলিয়া ফেলিলেন,—'ঝম-ঝমির গাছ?'

রায়মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'সে আবার কি? ঝম্-ঝমির গাছ আবার কি?

বড়ালমহাশয় উত্তর করিলেন,—শিরীষ গাছের শুঁটি শুষ্ক হইলে বাতাসে ঝম্ ঝম্ করিয়া শব্দ হয়।'

রায়মহাশয় আর কোন কথা বলিলেন না। বড়ালমহাশয় যে কোন বিষয় গোপন করিতেছেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করা বৃথা বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

তারপর তিন চার রাত্রি রায়মহাশয়ের বাটীর পূর্বভাগে খুটখাট শব্দ হইল। মানুষের পদশব্দও কেহ শুনিতে পাইল। রায়মহাশয় দুই চারি জন চাকরকে দালানে শয়ন করিতে বলিলেন। সেইদিন হইতে দোতালায় আর কোন শব্দ হইল না। কিন্তু নিম্নের তলায়, বিশেষতঃ পূর্ব দিকের ঘরগুলিতে নানারূপ শব্দ হইতে লাগিল। এই সময় কোন গ্রামবাসীর সহিত খাঁদা ভূতের সাক্ষাৎ হইল। গ্রামের লোক ভয়ে জড়সড় হইয়া পড়িল। সন্ধ্যার পর ঘর হইতে বাহির হওয়া একেবারে বন্ধ হইয়া গেল।

অমাবস্যার রাত্রি আসিল। ভাদ্রমাস। বর্ষাকাল। ঘোর অন্ধকার। রাত্রি দুই প্রহরের পর সেই তেঁতুল গাছ হইতে পুনরায় সেই ভীষণ শব্দ উত্থিত হইল,—

হু, হু, হু, হু, হু, হু, হু!

পুনরায় পূর্বের ন্যায় শৃগাল ডাকিয়া উঠিল,— হুক্কা হুয়া, হুক্কা হুয়া হু।

পুনরায় পূর্বের ন্যায় জীব-জন্তু, কাক পক্ষীর কোলাহল পড়িয়া গেল। গ্রামের লোক সেইরূপে ভীত হইল। ঘোরতর অমঙ্গলের আশঙ্কা করিয়া দেবতাদিগকে তাহারা স্মরণ করিতে লাগিল। রায়মহাশয় ভাবিলেন যে,—'গত বৎসর তেঁতুল গাছ হইতে এইরূপ ভয়ানক হাঁক আসিয়াছিল। সেই হাঁকের পর আমার জামাতার পরলোক হইল। এবার আবার কি হয়

দেখ।'

সত্য সত্যই ঘোর অমঙ্গল ঘটিল। রায়মহাশয়ের বিধবা কন্যাটি পীড়িত হইল। সেই রোগেই তাহার মৃত্যু হইল। স্ত্রী-পুরুষ শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। পাপ করিয়া তাঁহারা এই সম্পত্তি লাভ করিয়াছেন। সেজন্য তাঁহাদের মনে ঘোর অনুতাপ উপস্থিত হইল। ধনবান হইয়াও মানুষ যদি নিদারুণ শোক দ্বারা সন্তপ্ত হয় তাহা হইলে সে ধনে প্রয়োজন কি? যে তেঁতুল গাছ হইতে হাঁক আসিতেছিল, সেই গাছটি রায়মহাশয় কাটিয়া ফেলিলেন। বাড়ীতে নানারূপ পূজা-পাঠ স্বস্ত্যয়ন করাইলেন। ভূতের রোজাগণের দ্বারাও নানারূপ ক্রিয়াকলাপ করাইলেন।

বড়ালমহাশয় বলিলেন,—'আমি আপনার বাটীতে বাস করি, কোনদিন আমার নিমিত্ত হয় তো হাঁক আসিবে। তেঁতুল গাছ কাটিয়া ফেলিলে কি হইবে? ভূত গাছে বসিয়া হাঁক দিবে। তন্ত্র-মন্ত্রে এ ভূত যাইবে না। খাঁদা ভূত কিজন্য আসিতেছে, বোধহয় তাহা আমি বুঝিয়াছি। সেই দ্রব্যটি তাহাকে আনিয়ে দিলেই সে বোধ হয় আর আসিবে না।'

রায়মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'সে কি দ্রব্য?'

বড়ালমহাশয় উত্তর করিলেন,—রাজাবাবুর নিকট শপথ করিয়াছিলাম যে, তাঁহার ঘরের কথা কাহাকেও আমি বলিব না। কিন্তু খাঁদা ভূতের দৌরাত্মে যখন আমাদের প্রাণ লইয়া টানাটানি হইতেছে, তখন অগত্যা আমাকে বলিতে হইল।'

রায়মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'রাজাবাবু কে?'

বড়ালমহাশয় উত্তর করিলেন,—বেণীবাবুকে আমরা রাজাবাবু বলিতাম।

সপ্তম অধ্যায় – পূর্বকথা

রায়মহাশয় বলিলেন,—'আমার সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে। এখন আর খাঁদা ভূতের উপদ্রব নিবারণ করিয়া বিশেষ কোন ফল নাই।'

বড়ালমহাশয় উত্তর করিলেন,—'এখনও আপনার প্রাণ, আপনার গৃহিণীর প্রাণ, সুচিন্তা এবং সুবালাদিদির প্রাণ, তাহাদের মাতার প্রাণ,—এই সমুদয় প্রাণের জন্য মঙ্গল কামনা করিতে হইবে। তাহার পর এই বাটীতে আমরাও বাস করি। আমাদেরও প্রাণের ভয় আছে।' —পূর্বেই বলিয়াছি যে, রায়গৃহিণীর ভগিনীর কন্যা এই বাটীতে বাস করেন। বিধবা হইয়া দুইটি কন্যা লইয়া মাসীর আশ্রয়ে তিনি দিনপাত করিতেছেন। তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা সুবালা এখনও নিতান্ত শিশু।

রায়মহাশয় বলিলেন,—'ভাল! বেণীবাবুর সংসারের কি কথা আমাকে বলিবেন, তাহা বলুন। যদি টাকা খরচ করিলে খাঁদা ভূত দূর হয়, তাহা আমি করিব।'

বড়ালমহাশয় বলিতে লাগিলেন,—'রাজাবাবু অর্থাৎ বেণীবাবু, স্ত্রী লইয়া এই বাটীতে বাস করিতেন। তাঁহার পিতা পূর্বদেশ হইতে আসিয়াছিলেন। এ অঞ্চলে তাঁহার আত্মীয়-স্বজন কেহ ছিল না। তাঁহার স্ত্রী সুন্দরী ছিলেন। সেজন্য সকলে তাঁহাকে সোনা-বৌ বলিয়া

ডাকিত। সোনা-বৌ ধর্মপরায়ণা স্ত্রীলোক ছিলেন। গরীব-দুঃখী লোককে কখনও এক পয়সা দিতেন না বটে, কিন্তু সর্বদাই পূজা-পাঠ জপ-তপ লইয়া থাকিতেন। রাজাবাবু স্ত্রীকে বড় ভালবাসিতেন, কিন্তু সোনা-বৌ তাঁহাকে সেরূপ ভালবাসিতেন না। রাজাবাবু রামপক্ষী, বিলাতী বিস্কুট প্রভৃতি সামগ্রী আহার করিতেন। সেজন্য জপ-তপ পরায়ণা স্ত্রী তাঁহাকে ঘৃণা করিতেন।

'এইরূপে তাঁহারা স্ত্রী-পুরুষে দিনযাপন করিতেছিলেন। আমি তাঁহার কর্মচারী ছিলাম। বীরু নামে রাজাবাবুর একজন প্রিয় চাকর ছিল। এক বৎসর ভাদ্রমাসে নদীতে বান আসিয়াছে। প্রাতঃকালে সকলে দেখিল যে, এই বাগানের নিম্নে নদীর কিনারায় কৃষ্ণবর্ণের একটি লোক পড়িয়া আছে। মাথায় জটা ও গলায় রুদ্রাক্ষমালা দেখিয়া তাঁহাকে সন্ন্যাসী বলিয়া বোধ হইল। আমরা দেখিলাম যে, তিনি তখনও জীবিত আছেন। রাজাবাবু তাঁহাকে আপনার বাটীতে লইয়া আসিলেন। কয়েক ঘণ্টা পরে তাঁহার চৈতন্য হইল বটে, কিন্তু তিনি জ্বর বিকার রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইলেন। নিকটে আমাদের ভাল ডাক্তার নাই। দূর হইতে সুচিকিৎসক আনাইয়া, অনেক অর্থব্যয় করিয়া, রাজাবাবু তাঁহার প্রাণরক্ষা করিলেন।

'সুস্থ হইয়া সন্ন্যাসী এই বাটীতে বাস করিতে লাগিলেন। দিনান্তে দুই সের দুগ্ধ ও ফুল-মূল ব্যতীত অন্য কোন দ্রব্য তিনি আহার করিতেন না। সেজন্য সকলে বুঝিল যে, তিনি অতি পবিত্র সাধু। গ্রামের লোকে যখন শুনিল যে, সন্ন্যাসী কেবল দুগ্ধ খাইয়া প্রাণধারণ করেন, তখন তাহাদের ভক্তির সীমা রহিল না। দলে দলে আসিয়া তাঁহার পদধূলি লইতে লাগিল। কিন্তু ভক্তি হইল সোনা-বৌয়ের? সে ভক্তির কথা আপনাকে আর কি বলিব! ভক্তিরসে তিনি একেবারে গলিয়া গেলেন।

'গলিলাম না কেবল আমি আর গলিল না বীরু চাকর। আর গলিলেন না রাজাবাবু নিজে। স্ত্রীর সহিত সন্ন্যাসীর ঘনিষ্ঠতা দেখিয়া রাজাবাবু চটিয়া গেলেন। বীরু চটিয়া গেল—সন্ন্যাসীর রামপাখী ভোজনে। রাজাবাবুর নিমিত্ত রামপাখী রান্না হইলে সন্ন্যাসী গোপনে তাহা বীরুর নিকট হইতে চাহিয়া লইতেন। আমি চটিলাম—তাঁহার ব্রাণ্ডিপানে। রাজাবাবু সুরাপান করিতেন না। কিন্তু সময় অসময়ের জন্য ঘরে তিনি দুই-এক বোতল ব্রাণ্ডি রাখিয়া দিতেন। সেই ব্রাণ্ডি লইতে সাধুকে আমি একদিন ধরিয়া ফেলিলাম। সাধু বলিলেন যে, ইহার নাম 'কারণ'; ইহা দ্রবীভূত তারা। জটাজুটধারী সন্ন্যাসীদিগকে মদ্য, মাংস, মৎস্য ও মুড়ি দিয়া পূজা করিতে হয়।

'সোনা-বৌকে সন্ন্যাসী ধর্মশিক্ষা দিতে লাগিলেন। আমরা সকলেই তাহাতে বিরক্ত হইলাম। রাজাবাবু স্ত্রীকে বড়ই ভালবাসিতেন ও তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন। সেজন্য প্রথম প্রথম তিনি কোন কথা বলিলেন না। কিন্তু অবশেষে সাধুকে তিনি বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিলেন। নদীর ধারে যে শিবমন্দির আছে। সন্ন্যাসী তাহাতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

'ইহার অল্পদিন পরে সোনা-বৌয়ের একটি কন্যা হইল। রাজাবাবু সেই কন্যাটির উপর

প্রাণমন সমর্পণ করিলেন, কিন্তু মাতার যেরূপ স্নেহ থাকা উচিত, তাহা ছিল বলিয়া আমাদের বোধ হইল না। মাতা প্রথমে তাহাকে স্তন্যপান করাইতে সম্মত হন নাই। রাজাবাবুর ভর্ৎসনায় শেষে তিনি সম্মত হইলেন। যাহা হউক, ছয় মাসের হইয়া একদিন সহসা কন্যাটি মারা পড়িল। শিশুর শোকে রাজাবাবু অধীর হইয়া পড়িলেন।

'আরও কিছুদিন গত হইল। বাটীতে একদিন রাত্রিতে আমি নিদ্রা যাইতেছি। বড়ালনী আমাকে জাগাইয়া বলিলেন,—'দেখ বাড়ীর ভিতর কি গোলমাল হইতেছে। শীঘ্র তুমি বাড়ীর ভিতর গমন কর।'

'তাড়াতাড়ি উঠিয়া আমি বাড়ীর ভিতর গমন করিলাম। দেখিলাম যে কাপড় পোড়া গন্ধে বাড়ীটি পরিপূর্ণ হইয়াছে, আর উপরে রাজাবাবুর ঘরে বীরু চীৎকার করিতেছে। তাড়াতাড়ি সেই ঘরে গিয়া দেখিলাম যে, ঘরের মাঝখানে একখানি কাপড় পুড়িতেছে। নিকটে কাঠের বাঁট সম্বলিত একটি লোহার সিক পড়িয়া আছে। রাজাবাবু খাটের উপর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পড়িয়া আছেন। কালো-বাবাকে মাটীতে ফেলিয়া বীরু তাহার বক্ষঃস্থলে হাঁটু দিয়া তাহাকে ধরিয়া আছে।

'ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র বীরু আমাকে বলিল,—'বড়ালমহাশয়! শীঘ্র এই ভণ্ড তপস্বী বেটাকে বাঁধিয়া ফেলুন। রাজাবাবুকে এ খুন করিয়াছে।'

নিকটে কাঠের আলনা হইতে আমি একখানি কাপড় লইলাম। সেই কাপড় দিয়া বীরুতে আমাতে সন্ন্যাসীকে খাটের পায়াতে বাঁধিয়া ফেলিলাম।

'তাহার পর রাজাবাবুকে গিয়া দেখিলাম। দেখিলাম যে, তিনি জীবিত আছেন। তাঁহার শিয়রে একখানি রুমাল ও একটি শিশি পড়িয়া আছে। রুমাল ও শিশি হইতে একপ্রকার উগ্র মিষ্টি গন্ধ বাহির হইতেছে। তখন আমি বুঝিলাম যে, যে ঔষদ দিয়া ডাক্তারেরা রোগীকে অজ্ঞান করে, সেই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া রাজাবাবুকে সন্ন্যাসী অজ্ঞান করিয়াছে। মাথায় জল দিয়া ও নানাপ্রকার শুশ্রুষা করিয়া আমরা রাজাবাবুর চৈতন্য উৎপাদন করিলাম। তিনি উঠিয়া বসিলেন!

'ঘরের মধ্যস্থলে যে কাপড় পুড়িতেছিল তাহার আগুন আমরা নিবাইয়া ফেলিলাম। কাপড়ের সামান্য একটু অংশ অবশিষ্ট চিল, পুড়িয়া যায় নাই। পাড় দেখিয়া চিনিতে পারিলাম যে, তাহা সোনা-বৌয়ের শাড়ী। লোহার সিক কোথা হইতে আসিল, কে আনিল, কেন আনিল, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। সিকটি হাতে করিয়া দেখিলাম যে, ঘোর উত্তপ্ত, অনেকক্ষণ পর্যন্ত কে যেন ইহাকে আগুনে রাখিয়াছে। তাড়াতাড়ি আমি উহা ফেলিয়া দিলাম। মনে করিলাম যে কাপড় পোড়া আগুনে এইরূপ উত্তপ্ত হইয়া থাকিবে।

'রাজাবাবু আমাদের দুইজনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—'দেখুন বড়ালমহাশয়! দেখ বীরু! এই পাষণ্ড আমার প্রাণবধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু ইহাকে আমি পুলিসে দিতে পারি না। মকদ্দমা করিতে গেলে নানারূপ ঘরের কথা বাহির হইয়া পড়িবে। কিন্তু এই নরাধমকে একেবারে ছাড়িয়া দিতেও পারি না। ইহার কোনরূপ দণ্ড করিতে হইবে।'

"বীরু বলিল,—'বেটার নাক কাটিয়া লইতে হইবে।' আমি-ও সেই প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। সমুদয় কথা গোপন রাখিবার নিমিত্ত আমরা দুই জনে তিন সত্য করিলাম।"

তাহার পর রাজাবাবু বলিলেন,—'বেটার নাকটি ভালরূপে কাটিয়া লইতে হইবে। নাকটি আমি চিহ্নস্বরূপ রাখিয়া দিব।'

বীরু ও আমি কালা বাবার হাত-পা উত্তমরূপে ধরিয়া রহিলাম। সুতীক্ষ্ণ ছুরি বাহির করিয়া রাজাবাবু নিজ হাতে অতি সুন্দররূপে তাহার নাকটি কাটিয়া লইলেন। তাহার পর একটি শিশিতে তাহা রাখিয়া ব্র্যাণ্ডি দ্বারা শিশিটি পরিপূর্ণ করিলেন।

সন্ন্যাসীকে আমরা ছাড়িয়া দিলাম। তহার বক্ষস্থল রক্তে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। জলে ভিজাইয়া সেই রুমালখানা আমরা তাহাকে দিলাম। রুমাল দিয়া নাক মুছিতে মুছিতে সন্ন্যাসী পলায়ন করিল।'

রায়মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'সোনা-বৌ এতক্ষণ কোথায় ছিলেন।'

বড়লমহাশয় উত্তর করিলেন,—'বাবাজী তাঁহাকে মদ্যপান করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। সেই অবধি তিনি স্বামীর নিকট শয়ন করিতেন না। তাহার পূর্বদিকে যে ঘরে রাজাবাবু শয়ন করিতেন, তাহার পাশের ঘরে তিনি থাকিতেন। রাত্রিতে আমাকে জপ করিতে হয়, এই বলিয়া তিনি স্বতন্ত্র থাকিতেন। এতক্ষণ তিনি বোধ হয় আপনার ঘরে ছিলেন। যাহা হউক, প্রাতঃকালে উঠিয়া আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। শিবের মন্দিরে সন্ন্যাসীকেও কেহ দেখিতে পাইল না। আমরা বুঝিলাম যে তাঁহারা দুইজনে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন।' — রায়মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তাহার পর?'

বড়ালমহাশয় উত্তর করিলেন,—'সোনা-বৌ যে বাটী পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, সে কথা রাজাবাবু আমাদিগকে প্রকাশ করিতে মানা করিলেন। সমুদয় জিনিসপত্র ও সম্পত্তি আমাকে বুঝাইয়া দিয়া, দুইদিন পরে রাজাবাবু বীরুকে সঙ্গে লইয়া কাশী চলিয়া গেলেন। এক্ষণে কথা এই, সে নাক কোথায়?'

অষ্টম অধ্যায় – সে নাক কোথায়

রায়মহাশয় বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—'সে নাক কোথায়?'

বড়ালমহাশয় বলিলেন,—'হাঁ! সে নাক কোথায়? যাইবার সময় রাজাবাবু আমাকে বলিয়া গেলেন,—'যে স্থানে ঐ নরাধম আর পাপিয়সী যাইবে, সেই স্থানে আমিও যাইব। সকলকে ইহাদের পাপের কথা বলিব। সকলের নিকট ইহাদিগকে ঘৃণিত করিব। কোন স্থানে ইহাদিগকে সুখে বাস করিতে দিব না। ইহাদের জীবন অসহ্য করিয়া তুলিব।' যাইবার সময় নাকের শিশি রাজাবাবু লইয়া গেলেন। সে নাক এখন কোথায়?'

রায়মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'সে নাক লইয়া কি হইবে।'

বড়ালমহাশয় উত্তর করিলেন,—'বুঝিতে পারিতেছেন না? কালা বাবা বোধ হয় এখন মরিয়া গিয়াছে। মরিয়া ভূত হইয়াছে। ভূত হইয়া আপনার নাকের জন্য সে আসিতেছে। ভাদ্রমাসে কালাবাবা নদীর বানে ভাসিয়া আসিয়াছিল। ভাদ্রমাসে তাহার নাসিকা ছেদন

হইয়াছিল। গত ভাদ্রমাসে তাহার ভূত নাসিকার জন্য আসিয়াছিল। এক্ষণে নাকটি পাইলেই সে সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া যাইবে। আমাদের প্রাণও বাঁচিয়া যাইবে। এখন সে নাক কোথায়?'

রায়মহাশয় উত্তর করিলেন,—'সে নাক এখন কোথায়, আমি কি করিয়া জানিব? রাজাবাবু নাক সঙ্গে লইয়া গেলেন। তাহার পর আর কিছু আপনি জানেন না?'

বড়ালমহাশয় উত্তর করিলেন,—'রাজাবাবু নানা স্থান হইতে মাঝে মাঝে আমাকে পত্র লিখিতেন। কিন্তু সে তাঁহার বিষয় সম্বন্ধে, নাকের বিষয় তিনি কিছু লেখেন নাই। তবে বীরু একবার আমাকে লিখিয়াছিল যে, সেঁকো বিষ প্রভৃতি মসলা দিয়া রাজাবাবু নাকটিকে টাটকা অবস্থায় রাখিয়াছেন, ইহা পচিয়া যায় নাই। তাহার পর সোনা দিয়া তাহাকে তিনি বাঁধাইয়াছেন। হারের ন্যায় চেন করিয়া নাক তাহাতে তিনি সংলগ্ন করিয়াছেন। চেন-সম্বলিত সেই নাক কখন তিনি গলায় পরিধান করেন, কখন বা বাক্সর ভিতর অতি যত্নে রাখিয়া দেন।'

রায়মহাশয় বলিলেন,—'মৃত্যুকালে তাঁহার নিকট আমি ছিলাম না। আমার ভ্রাতা বিজয় তাঁহার নিকট ছিল। বাক্সর চাবি তিনি বিজয়কে দিয়াছিলেন। বাক্সর ভিতর যে টাকা ছিল, তাহা লইয়া বিজয় তাঁহার শ্রাদ্ধ করিয়াছিল।'

বড়ালমহাশয় বলিলেন,—'বসন্ত রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া রাজাবাবু আমাকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহাই তাঁহার শেষ পত্র। সেই পত্রে বিজয়বাবুর তিনি অনেক সুখ্যাতি করিয়াছিলেন, আর উইল করিয়া সম্পত্তি তাঁহাকে দিয়া যাইবেন, এই কথা আমাকে লিখিয়াছিলেন।'

রায়মহাশয় বলিলেন,—'বিজয় তখন অজ্ঞ যুবক ছিল। পৃথিবীর বিষয় সে কিছুই জানিত না। আমরা নিষ্পর। উইল লইয়া যদি মকদ্দমা হয়, তাহা হইলে বিজয় সে বিবাদি কৃতকার্য্য হইবে না। বিষয় পাইলেও সে রক্ষা করিতে পারিবে না। এইরূপ ভাবিয়া-চিন্তিয়া বেণীবাবু শেষে আমার নামে উইল করিলেন।'

বড়ালমহাশয় বলিলেন,—'তাঁহার বাক্সতে নাক ছিল। নাকের বিষয় বিজয়বাবু বোধ হয় বলিতে পারিবেন।'

রায়মহাশয় বলিলেন,—'কল্যাই আমি বিজয়ের কাছে কলিকাতায় গমন করিব। বিজয় নাক লইয়া কি করিবে? যদি ফেলিয়া দিয়া না থাকে, তাহা হইলে তাহার নিকট হইতে নাক আনিয়া খাঁদা ভূতকে প্রদান করিব।'

বড়ালমহাশয় বলিলেন আমার নিশ্চয় মনে হইতেছে যে, নাক পাইলে খাঁদা ভূত আর আমাদিগের উপর উপদ্রব করিবে না।'

রায়মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'সোনা-বৌ কোথায় গেলেন? বীরুই বা কোথায় গেল? এ স্থান হইতে প্রস্থান করিলে, পরে কি হইল?'

বড়ালমহাশয় বলিলেন,—'বীরু মাঝে মাঝে আমাকে পত্র দিত। তাহার পত্র পাঠ করিয়া আমি অবগত হইলাম যে, কালা বাবা ও সোনা-বৌ প্রথম কাশী গিয়াছিলেন। কিন্তু

রাজাবাবু যখন সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন, অমনি তাঁহারা কাশী পরিত্যাগ করিয়া বেরিলি নামক নগরে পলায়ন করিলেন। রাজাবাবুও তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই স্থানে গমন করিলেন। তখন তাঁহারা আলমোরা পলায়ন করিলেন। আলমোরা হইতে টেহরি নামক স্থানে তাঁহারা গমন করিলেন। তাহার পর রাজাবাবু আর তাহাদের কোন সন্ধান পাইলেন না। বদ্রিনাথ, কেদারনাথ দর্শন করিয়া রাজাবাবু হরিদ্বারে আসিলেন। সেই স্থানে বিসুচিকা রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া বীরুর মৃত্যু হইল। রাজাবাবু তাহার পর, আপনি যে স্থানে ছিলেন, সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে তাঁহার পরলোক হইল। খাঁদা ভূতের আগমনে বুঝিলাম যে, কালা বাবার মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু সোনা-বৌ আছেন কি নাই; যদি থাকেন তো কোথায় আছেন, কি করিতেছেন, তাহার আমি কিছুই জানি না।'

পরদিন রায়মহাশয় কলিকাতা গমন করিলেন। বিজয়বাবু এখন ধনবান্ লোক। বৃহৎ বাটীতে বাস করেন। নানাপ্রকার মূল্যবান দ্রব্যে তাঁহার গৃহ সুসজ্জিত। লোকজন চাকর নফরে তাঁহার বাড়ী পরিপূর্ণ। সকলের মুখে রায়মহাশয় তাঁহার সুখ্যাতি শ্রবণ করিলেন। বিজয়বাবুর স্ত্রী সতীলক্ষ্মী, দয়াময়ী। তাহার নাম অন্নপূর্ণা, কাজেও তিনি তাই, সকলের তিনি মা-জননী। বিজয়বাবুর একটি পুত্র হইয়াছে। তাহার বয়স ছয় বৎসর। ছেলেটি দেখিতে যেন রাজপুত্র। তাহার মৃদু-মধুর কথা শুনিলে হৃদয় শীতল হয়, বিজয়ের সুখ ঐশ্বর্য্য, বিশেষতঃ মনে শান্তি দেখিয়া ও সেই সঙ্গে নিজের অবস্থা ভাবিয়া রায়মহাশয় একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

বিজয়বাবু জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে বিশেষরূপে অভ্যর্থনা করিলেন। দুই ভ্রাতা একত্রে বসিয়া নানারূপ কথোপকথন করিতে লাগিলেন। পূর্বের কথা কেহই উল্লেখ করিলেন না। তবে রায়মহাশয় যখন খাঁদা ভূতের দৌরাত্ম ও নিজের বিপদের বিবরণ প্রদান করিলেন, তখন বিজয়বাবু কেবল এই কথা কহিলেন,—'টাকা অতি তুচ্ছ বস্তু, টাকার জন্য পৃথিবীর লোক কেন যে পাগল, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। যম-যন্ত্রণা অপেক্ষা দুঃখ আর কিছুই নাই। অর্থবলে মানুষ যখন সে যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পায় না, তখন ধনের জন্য মানুষ কেন যে এত লালায়িত হয়, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। ঈশ্বরের নিকট টাকার জন্য কখনও আমি প্রার্থনা করি নাই। কিন্তু তিনি নিজেই আমাকে প্রচুর অর্থ দিয়াছেন। ভগবানকে প্রসন্ন রাখিলে মানুষের কোন অভাব থাকে না।'

রায়মহাশয় বলিলেন,—হাঁ, অধর্ম করিলে কিছুতেই মঙ্গল হয় না। শীঘ্র হউক বিলম্বে হউক, পাপের ফল ফলিয়া যায়। আমার ঘোর সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে। বাকি আর কিছুই নাই। বাকি আছে কেবল আমার নিজের প্রাণ ও তোমাদের বড়-বৌয়ের প্রাণ। আমাদের জন্য কোন্ দিন হয় তো হাঁক আসিবে। আমাদের প্রাণরক্ষার নিমিত্ত কেবল একমাত্র উপায় আছে। সে প্রতিকার তোমার হাতে।'

বিজয়বাবু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আমার হাতে? আমি কি করিতে পারি?' রায়মহাশয় উত্তর করিলেন,—'মৃত্যুকালে বেণীবাবু বাক্সর চাবি তোমাকে

দিয়াছিলেন?'

বিজয়বাবু বলিলেন,—'হ্যাঁ বাক্সর ভিতর যে টাকা ছিল, তাহা লইয়া আমি তাঁহার শ্রাদ্ধ করিয়াছিলাম।' রায়মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'বাক্সর ভিতর আর কি ছিল?'

বিজয়বাবু উত্তর করিলেন,—'তাঁহার বাটীর জিনিপত্রের ফর্দ ছিল। খানকয়েক চিঠি ছিল, কতকগুলি দলিল ছিল, সে সমুদয় আমি আপনাকে দিয়াছি।'

রায়মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আর কি ছিল?'

বিজয়বাবু উত্তর করিলেন,—'একখানি ছবি ছিল, আর সোনার একটি অলঙ্কার ছিল। তাহার অধিক মূল্য নহে। কিন্তু মূল্য যাহাই হউক, সে অলঙ্কার তিনি আমাকে দিয়া গেছেন। সেই অলঙ্কার গলায় পরিধান করিতে মৃত্যুকালে তিনি আমাকে বার বার অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন। তারপর যদি কখন কোন লোক আসিয়া প্রার্থনা করে, তাহা হইলে সেই অলঙ্কার তাহাকে তিনি দিতে বলিয়া গিয়াছেন।'

রায়মহাশয় বলিলেন,—'সেই অলঙ্কার আজ আমি প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি। তুমি আমাকে তাহা প্রদান কর।'

বিজয়বাবু বলিলেন,—'আপনাকে দিতে তিনি বলিয়া যান নাই। আপনাকে আমি তাহা দিব না।'

রায়মহাশয় বলিলেন,—'নিজের জন্য তাহা আমি চাই না। সে অলঙ্কার কি, ও সে দ্রব্য কাহার, তাহা যদি আমি বলিতে পারি, তাহা হইলে তুমি আমাকে দিবে কি না?'

বিজয়বাবু বলিলেন,—'সে দ্রব্য কি, তাহা বলুন দেখি, শুনি। কিন্তু এখন হইতে আমি বলিয়া রাখি যে, বেণীবাবু যাহাকে দিতে বলিয়াছেন, সে লোক ভিন্ন অন্য কাহাকেও আমি তাহা দিব না।'

রায়মহাশয় উত্তর করিলেন,—'সে দ্রব্য মানুষের নাক; সোনা দিয়া বাঁধাইয়া তাহার সহিত সোনার চেন সংলগ্ন করিয়া বেণীবাবু তাহা গলায় পরিতেন, অথবা বাক্সর ভিতর তুলিয়া রাখিতেন। সে নাক একজন সন্ন্যাসীর। সে এখন মরিয়া ভূত হইয়াছে; সে সেই খাঁদা ভূত,—সে আমার সর্বনাশ করিতেছে। নিজের নাক ফিরিয়া পাইলে সে ক্ষান্ত হইবে, আর আমার কোন অনিষ্ট করিবে না। সেজন্য নাকটি তুমি আমাকে প্রদান কর।'

বিজয়বাবু উত্তর করিলেন,—সে অলঙ্কারটি মানুষের নাক বটে, কিন্তু বেণীবাবু তাহা আপনাকে অথবা সন্ন্যাসীকে দিতে বলিয়া যান নাই। কুসংস্কার বলিতে ইচ্ছা করেন, বলুন;—কিন্তু আমার একান্ত বিশ্বাস যে, এই নাক আমার সমস্ত সৌভাগ্যের মূল। এই দেখুন, নাকটি আমি গলায় পরিয়া আছি। কিছুতেই এ নাক আমি আপনাকে দিতে পারি না। বেণীবাবু যাহাকে দিতে বলিয়া গিয়াছেন, একমাত্র সেই লোক ভিন্ন এই নাক আমি অন্য কাহাকেও দিব না।'

রায়মহাশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—'দিবে না? উইল দ্বারা বেণীবাবু আমাকে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি দিয়া গিয়াছেন। সেজন্য আইন অনুসারে এ নাক আমার। জান মকদ্দমা

করিয়া তোমার কান মলিয়া এ নাক আমি লইতে পারি?'

দুই ভ্রাতায় এইরূপ ঘোরতর বিবাদ হইল। বিজয়বাবু কিছুতেই নাক দিলেন না। হতাশ হইয়া রায়মহাশয় বাটী প্রত্যাগমন করিলেন।

নবম অধ্যায় – ভূতের আহার

ঘোরতর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রায়মহাশয় বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া গৃহিণীকে সকল কথা বলিলেন।

রায়ণী বলিলেন,—'আমি তো চিরকাল তোমাকে বলিয়া আসিতেছি যে, টাকুরপোর দয়া-ধর্ম্ম নাই।'

রায়মহাশয় বলিলেন,—'আমি মনে করিয়াছিলাম যে, আমার অবর্ত্তমানে তুমি সম্পত্তির উপস্বত্ব ভোগ করিবে। তাহার পর বিজয় ইহা পাইবে। কিন্তু এক্ষণে বিজয় যাহাতে না পায়, সেইরূপ উইল করিব।'

বড়াল মহাশয়কেও তিনি সকল কথা বলিলেন, আরও বলিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর বিজয় যাহাতে না পায়, সেইরূপ তিনি উইল করিবেন। তিনি বলিলেন,—'কিন্তু দেখুন বড়াল মহাশয়! সোনা-বৌয়ের কথা শুনিয়া আমি বড় ভীত হইয়াছি। যতদিন রায়-গৃহিণীর বয়স অধিক না হয়, ততদিন তাঁহাকে আমি দান-বিক্রয়ের ক্ষমতা দিব না। বয়ঃক্রম পঞ্চাশ বৎসর হইলে পরে তিনি দান-বিক্রয় করিতে পারিবেন।'

রায়মহাশয় এইরূপ উইল করিলেন,-

প্রথম। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভার্য্যা বিষয়ের উপস্বত্ব ভোগ করিবেন।

। যতদিন না তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হয়, ততদিন তিনি সম্পত্তি দান-বিক্রয় করিতে পারেন না।

তৃতীয়। অমুক সালের ২রা শ্রাবণ তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইবে। তাহার পর যেদিন ইচ্ছা, যাহাকে ইচ্ছা, এই সম্পত্তি দান অথবা বিক্রয় করিতে পারিবেন।

চতুর্থ। রায়-গৃহিণীর বয়ঃক্রম পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইলে, বড়াল মহাশয় পুরস্কারস্বরূপ এক হাজার টাকা পাইবেন।

পঞ্চম। যতদিন তাঁহার স্ত্রী জীবিতা থাকিবেন, ততদিন বড়াল মহাশয় ৫০ টাকা হিসাবে বেতন পাইবেন। এইরূপ উইল করিয়া বড়াল মহাশয়কে তিনি বলিলেন,—'আমার স্ত্রীর জীবনের উপর আপনার স্বার্থ রাখিয়া দিলাম। তাঁহাকে জীবিত রাখিতে আপনি যত্ন করিবেন। আমার ভাই যাহাতে এ সম্পত্তি না পায়, ইহাই আমার একান্ত ইচ্ছা। এরূপ নরাধম নিষ্ঠুর ভাই আমি কখনও দেখি নাই। আমাকে প্রবঞ্চনা করিয়া, বেণীবাবুকে ফুসলাইয়া সে এই সম্পত্তি লইতে চেষ্টা করিয়াছিল।'

রায়মহাশয় পুনরায় বলিলেন,—'উইল করিয়া এক্ষণে আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। খাঁদা ভূতের যাহা ইচ্ছা এখন করুক। কিন্তু এবার ভাদ্র মাসে পুনরায় আসিয়া যদি সে পূর্ব্বরূপ হুঙ্কার শব্দ করে, তাহা হইলে, এ গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া আমি অন্যত্র গমন করিব।

ভাদ্রমাস আসিল। খাঁদা ভূত যথারীতি উঁকি মারিতে না পারে, সেজন্য বাড়ীর ভিতর দিকের জানালা দুইটি রায় মহাশয় সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করিয়া রাখিলেন।

একদিন রাত্রিতে সহসা তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। মনে পূর্বের ন্যায় আতঙ্ক উপস্থিত হইল। 'আলো জ্বালিব না, কোনওদিকে চাহিয়া দেখিব না,'—এইরূপ বার বার মনে মনে তিনি সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু কিছুতেই তিনি থাকিতে পারিলেন না। উঠিয়া আলো জ্বালিলেন। বাগানের দিকে জানালা খোলা ছিল। সেই জানালার ধারে দাঁড়াইয়া বাগানের উপর দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন যে, নিম্নে একজন মানুষ দাঁড়াইয়া আছে! অন্ধকারে চিনিতে পারিলেন না; কিন্তু সে যে খাঁদা ভূত তাহা তিনি নিশ্চয় বুঝিলেন, রায়মহাশয় মনে মনে স্থির করিলেন,—'এবার যদি ভূতের হাঁক আসে। তাহা হইলে এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র আমি গমন করিব।'

খাঁদা ভূত এবার এক অদ্ভুত কাণ্ড করিল। অরন্ধনের পূর্ব দিনে রায়মহাশয়ের বাটীতে প্রচুর পরিমাণে অন্ন ব্যঞ্জন রন্ধন হইয়াছিল, পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া সকলে দেখিল যে, ভূত এক হাঁড়ি ইলিশ মাছ, আধ হাঁড়ি কচুশাক ও সেই পরিমাণে ভাত-ডাল খাইয়া গিয়াছে। ভূতের খোরাক, না রাক্ষসের খোরাক!

সেই রাত্রিতে রায়মহাশয় পক্ষাঘাত রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইলেন; তাঁহার অর্ধ অঙ্গ একেবারে পড়িয়া গেল, তাঁহার চলৎশক্তি একেবারে রহিত হইয়া গেল। ডাক্তার বলিল,—'এ অবস্থায় তাঁহাকে নাড়া-চাড়া করিলে হঠাৎ মৃত্যু হইতে পারে। রায়মহাশয় সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে, এবার ভূতের হাঁক আসিলে তিনি অন্যস্থানে গমন করিবেন। তাহা আর হইল না। ঘোর কষ্টে রায়মহাশয় দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

আর এক বৎসর কাটিয়া গেল। পুনরায় ভাদ্র মাস আসিল। ভাদ্রমাসের শেষে পুনরায় খাঁদা ভূতের উপদ্রব আরম্ভ হইল। গ্রামের প্রান্তভাগে একজন বিধবা সদগোপীনী বাস করিত। একদিন সন্ধ্যার পর ঘরের দাওয়া অর্থাৎ পিঁড়াতে বসিয়া সে রন্ধন করিতেছিল। হঠাৎ সেই স্থানে খাঁদা ভূত আসিয়া উপস্থিত হইল। 'মা গো' বলিয়া চীৎকার কবিয়া সদ্‌গোপীনী ঘরের ভিতর পলায়ন করিল ও দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। সে রাত্রি সে আর ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইল না। পরদিন প্রাতঃকালে সে দেখিল যে, খাঁদা ভূত তাহার ভাত-ডাল ও ব্যঞ্জন লইয়া গিয়াছে। হাঁড়ি, মালসা ও সরা করিয়া সমুদয় দ্রব্য সে লইয়া গিয়াছে। পিত্তল কাঁসার দ্রব্য লয় নাই। নিভৃতে মাঠে লইয়া খাঁদা ভূত ভাত-ব্যঞ্জন আহার করিয়াছিল। পরদিন সকালে দেখিল, সে হাঁড়ি, মালসা ও সরা সেই স্থানে পড়িয়া আছে।

দুইদিন পরে খাঁদা ভূত যথারীতি রাত্রি দুই প্রহরের সময় হাঁক দিল। খাঁদা ভূত গ্রামে আসিয়াছে শুনিয়া রায়মহাশয় ছাদের উপর লোক রাখিয়াছিলেন। সেজন্য ছাদের উপর সে হাঁক দিতে পারিল না। তাঁহার বাগানে দাঁড়াইয়া সে হুহুঙ্কার করিল।

রায়মহাশয়ের স্ত্রীর ভগিনীর বিধবা কন্যা, অর্থাৎ বোনঝি, এই সংসারে বাস করিতেছিলেন। দুইটি কন্যা লইয়া তিনি আসিয়াছিলেন। একজনের নাম সুচিন্তা, তাহার

বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর। অপর কন্যার নাম সুবালা, বয়ঃক্রম ছয় বৎসর। সুচিন্তার বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু এখনও সে শ্বশুরালয়ে ঘর করিতে যায় নাই। জামাতা মধ্যে মধ্যে রায়মহাশয়ের বাটীতে আসিতেন।

এ বৎসর ভূতের হাঁকের পর সুচিন্তার প্রসববেদনা উপস্থিত হইল। তিনদিন ঘোরতর কষ্ট পাইল; কিছুতেই প্রসব হইতে পারিল না। সেই যন্ত্রণায় তার মৃত্যু হইল। ডাক্তার বলিল,—'কন্যাটি নিতান্ত বালিকা। এত অল্পবয়সে গর্ভ হইলে তাহার ফল এইরূপ হইয়া থাকে।' বালিকার যন্ত্রণার কথা শুনিয়া রায়মহাশয়ের দুঃখ ও রাগ হইল। বালিকার মাতাকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন,—'আমার নিজের কন্যা ও জামাতা খাঁদা ভূতের দৌরাত্মে মারা পড়িয়াছে। আমি নিজে পক্ষাঘাত রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া জড়ের ন্যায় পড়িয়া আছি। দুর্ভাগ্যের চূড়ান্ত হইয়াছে। আর আমার কিছু বাকী নাই। এখন দেখিতেছি যে, আমার সংসারে যাহারা থাকিবে, একে একে সকলেই মারা পড়িবে। তুমি বাছা, অন্যত্র গমন কর। তাহা না করিলে তুমি ও তোমার সুবালা মারা পড়িবে।'

বোনঝি উত্তর করিলেন,—'আমার প্রাণ গেলেই কি, আর থাকিলেই কি? খাঁদা ভূতকে আমি ভয় করি না! ভাবনা সুবালার জন্য। তাহার কাকার নিকট আমি যাইতে পারি। কিন্তু তাঁহার স্ত্রীর সহিত আমার বনিবে না। তাঁহার স্ত্রী মন্দ লোক নহেন। কিন্তু তাঁহার গলগ্রহ হইযা আমি থাকিতে ইচ্ছা করি না। তাহার পর এ স্থানে আপনার ও মাসীমায়ের শরীর ভাল নহে, আপনাদিগকে ছাড়িয়াও আমি যাইতে ইচ্ছা করি না। বর্ষাকালে বিশেষতঃ ভাদ্রমাসে ভূতের উপদ্রব হয়। শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন,—এই তিনমাস আপনি যদি সুবালাকে তাহার কাকার নিকট রাখেন, তাহা হইলে ভাল হয়। কিন্তু বারো মাস তাহাকে ছাড়িয়া আমি থাকিতে পারিব না। বৎসরের বাকী কয় মাস সে আমার নিকট থাকিবে।'

বোন্‌ঝির দেবর অর্থাৎ সুবালার কাকার সহিত রায়মহাশয়ের আলাপ পরিচয় ছিল না। অতি দূরসম্পর্ক—স্ত্রী ভগিনীর কন্যার দেবব। তিনি কখনও রায়মহাশয়কে দেখেন নাই। যাহা হউক, পত্র লিখিয়া ও বড়ালমহাশয়কে পাঠাইয়া রায়মহাশয় স্থির করিলেন যে, আগামী শ্রাবণ মাসে সুবালা তাহার কাকার নিকট গমন করিবে। সে স্থানে সুবালা শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন এই তিন মাস থাকিবে, তাহার পর রায়মহাশয়ের বাটীতে মাতার নিকট ফিরিয়া আসিবে।

এক বৎসর কাটিয়া গেল। শ্রাবণ মাস আসিল। কিন্তু কাকার নিকট সুবালার যাওয়া হইল না। সুবালার মাতা গ্রহণী রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইলেন। সকলে তাঁহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিল। কাজেই সুবালাকে মাতার নিকট থাকিতে হইল।

দশম অধ্যায় – মাতা ও সুবালা

ভাদ্রমাস পড়িল। মাসের শেষে পুনরায় খাঁদা ভূতের আবির্ভাব হইল। 'হু হু', 'হু হু' আস্তে আস্তে এই শব্দ করিয়া রাত্রিকালে খাঁদা ভূতের উপদ্রব অধিক দিন থাকে না। ছয়

সাত দিন পরে সেই বিকট রবে হাঁক দিয়া সে কোথায় চলিয়া যায়। সেই কয়দিন গ্রামের লোক ঘোরতর শঙ্কিত হইয়া কালযাপন করে।

এবারও অরন্ধনের পূর্ব রাত্রিতে খাঁদা ভূত বড়ালমহাশয়ের হাঁড়ি খাইয়া গেল। রায়মহাশয়ের বাহির বাটীতে দুইটি ঘরে বড়লমহাশয় নিজে, তাঁহার গৃহিণী ও তাঁহার শ্যালকপুত্র ধনুকধারী নামক দশ বৎসরের একটি বালক, এই কয় জনে বাস করিতেন। নিকটে একটি ছোট ঘরে তাঁহাদের রান্না হইত। অরন্ধনের নিমিত্ত বড়ালগৃহিণী যাহা কিছু রাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন, খাঁদা ভূত তাহা খাইয়া গিয়াছিল। আর একটি আশ্চর্য কথা—আহারাদি করিয়া খাঁদা ভূত সম্মুখের রকে বসিয়া মলত্যাগ করিয়াছিল। সকলেই ঘোরতর বিস্মিত হইল। গ্রামের বৃদ্ধ লোকেরা বলিল,—'এই বয়সে অনেক ভূত দেখিয়াছি, অনেক ভূতের গল্প শুনিয়াছি; কিন্তু খাঁদা ভূতের ন্যায় অদ্ভুত ভূত কখন দেখি নাই। ভূতে পান্তাভাত ও কচুশাক খায়, কচুশাক খাইয়া মলত্যাগ করিয়া যায়, এরূপ কথা কখনওত আমরা শুনি নাই।'

রায়মহাশয়ের বাগানের পূর্বভাগে বৃহৎ এক বাঁশঝাড় ছিল। এবার সেই বাঁশঝাড়ের ভিতর বসিয়া খাঁদা ভূত হুঙ্কার দিল পরদিন সে যথারীতি কোথায় চলিয়া গেল।

হাঁকের কিছুদিন পরে সুবালার মাতার মৃত্যু হইল। গ্রহণী রোগ তাঁহার পূর্ব হইতেই হইয়াছিল। কিন্তু এই দুর্ঘটনার সমুদয় দোষ খাঁদা ভূতের উপর পড়িল। সকলেই বলিল যে, ভূতের হাঁকের জন্য তাঁহার মৃত্যু হইল। সুবালার বয়ঃক্রম এক্ষণে সাত বৎসর। কন্যাটি যে খুব রূপবতী ছিল তাহা নহে। তাহার গায়ের বর্ণ গৌরবর্ণ ছিল না, গঙ্গাজলী গমের ন্যায় এক প্রকার উজ্জ্বল মাজা মাজা বর্ণ ছিল। নাসিকাটি টিকোলা ও চক্ষু দুইটি চাক্‌চিক্যশালী কৃষ্ণবর্ণের ছিল। নিবিড় কেশরাশি হাঁটু পর্যন্ত পড়িত। মুখের ও শরীরের এক প্রকার চমৎকার মেয়েলি মেয়েলি ভাব ছিল। তাহার মৃদুমধুর ভাব ও লজ্জাশীলতা দেখিয়া এবং সুমিষ্ট কথা শুনিয়া সকলেই সুবালাকে ভালবাসিত।

মৃত্যুর একদিন পূর্বে মাতা সুবালাকে ডাকিয়া কাছে বসাইলেন। মাতা বলিলেন,—'সুবালা! তুমি সাত বৎসরের বালিকা, আমার সকল কথা এখন তুমি বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু কথাগুলি তুমি মনে করিয়া রাখিও, মাঝে মাঝে আমার কথাগুলি স্মরণ করিও। যত বড় হইবে, তত তুমি আমার কথার অর্থ বুঝিতে পারিবে। সুবালা! মা! আর তুমি আমাকে দেখিতে পাইবে না।'

সুবালা হাপুস নয়নে কাঁদিতে লাগিল। চক্ষুর জলে তাহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে সে বলিল,—'না মা! আমাকে ছাড়িয়া তুমি যাইও না। তুমি গেলে আমি কাহার কাছে থাকিব?'

মাতা বলিলেন,—'তোমার দাদামহাশয় ও দিদিমণি তোমাকে ভালবাসেন। তুমি তাঁহাদের নিকট থাকিবে। সুবালা! তোমার দিদির শোকে আমি বড় কাতর হইয়া আছি। তাহাকে স্মরণ করিয়া সর্বদা আমার বুক ফাটিতেছে। তোমার দিদি যে স্থানে গিয়াছে, আমি

সেই স্থানে যাইতেছি।' —সুবালা বলিল,—'সে কোথায় মা? সে স্থানে গেলে যদি দিদিকে দেখিতে পাই, তাহা হইলে আমিও সেইখানে যাইব। তুমি যদি মা, সেই স্থানে যাও, তাহা হইলে আমাকে সঙ্গে লইয়া চল।'

মাতা উত্তর করিলেন,—'সুবালা। মনে করিলে কেহ সে স্থানে যাইতে পারে না। আমাদের মাথার উপর যে পরমেশ্বর আছেন, তিনি না লইয়া গেলে সে স্থানে কেহ যাইতে পারে না। তিনি আমাকে ডাকিতেছেন, সেইজন্য আমি সেই স্থানে যাইতেছি। যখন তুমি বুড়ো হইবে, যখন তোমার দাঁত পড়িয়া যাইবে, চুল পাকিয়া যাইবে তখন তোমাকেও তিনি ডাকিবেন। তখন তুমি সেই স্থানে যাইবে। তখন দিদির সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবে। তখন আমাকেও তুমি সেই স্থানে দেখিতে পাইবে।'

সুবালা বলিল,—'তোমার তো চুল পাকে নাই, দাঁত পড়িয়া যায় নাই, তবে তিনি তোমাকে ডাকিতেছেন কেন?'

মাতা উত্তর করিলেন,—'কোন কোন লোককে তিনি আগে থাকিতে ডাকিয়া লন, সেইজন্য আমি যাইতেছি।'— সুবালা জিজ্ঞাসা করিল,—'সে কিরূপ স্থান মা?'

মা উত্তর করিলেন,—'সে অতি সুন্দর স্থান। সে স্থানে কোনরূপ দুঃখ নাই। তোমার দিদি রোগে কত কষ্ট পাইয়াছিল। সে স্থানে কাহারও রোগ হয় না, কেহ সেরূপ কষ্ট পায় না। তোমার দিদি আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে। তোমার দিদির জন্য আমি কত কাঁদিতেছি, তুমি কত কাঁদিয়াছ। সে স্থানে কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া যায় না, পিতা-মাতাকে সে স্থানে কাঁদিতে হয় না।' —সুবালা বলিল,—'দাদামহাশয় ও দিদিমণিও সর্বদা কাঁদেন।'

মাতা বলিলেন,—'তাঁহাদের কন্যা ও জামাতা মরিয়া গিয়াছে। সেইজন্য তাঁহারা কাঁদেন। মানুষ যদি কুকাজ না করে, সর্বদা যদি ভাল কাজ করে, তাহা হইলে তাঁহাদের পুত্র-কন্যা মরিয়া যায় না, তাহাদিগকে কাঁদিতে হয় না। বড় হইলে তোমারও পুত্র-কন্যা হইবে। তুমি কখনও কুকাজ করিও না। তাহা হইলে তুমি মনের সুখে থাকিবে কখনও তোমাকে দুঃখ ভোগ করিতে হইবে না।'

সুবালা বলিল,—'তুমি যখন যাহা বল, তাহা আমি শুনি। সেদিন সেই চড়ুই পাখী ধরিয়াছিলাম; তুমি বলিলে,—সুবালা! চড়ুই পাখীকে কষ্ট দিও না; আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম।'

মাতা বলিলেন,—'তুমি লক্ষ্মী মেয়ে। ভগবান তোমাকে কুশলে রাখুন, ভগবান তোমাকে সুখী করুন। আমি যাহা বলিতেছি, এক্ষণে ভালরূপে তাহা তুমি বুঝিতে পারিবে না। দেখ, সুবালা! কখনও মিথ্যা কথা বলিও না।' কখনও মিথ্যা আচরণ করিও না, কখনও প্রতারণা করিও না, কখনও নিষ্ঠুর হইও না, নীচের ন্যায় ব্যবহার করিও না, কখনও কাহাকেও কষ্ট দিও না। কাহারও নিকট হইতে কিছু লইব, এ প্রত্যাশা কখনও করিও না। লোককে দিতে পারি, সেই কামনা করিবে। পরমেশ্বর সর্বদা তোমার নিকটে আছেন, এই কথা ভাবিয়া সকল কাজ করিবে। বালক-বালিকাদিগকে তিনি বড়

ভালবাসেন। আমি মা, পরমেশ্বর তোমাকে দিয়াছিলেন—তুমি আমার প্রাণের সুবালা, তাঁহার অনুগ্রহে তোমাকে পাইয়াছিলাম। এস, মা! একবার জনমের মত তোমাকে আদর করি।'

সুবালা মাতার বুকের নিকট আপনার মস্তক অবনত করিল। দুই হাতে মাতা তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মুখচুম্বন করিলেন। মাতার বক্ষঃস্থলে মাথা রাখিয়া সুবালা কাঁদিতে লাগিল। মাতা সুবালাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

পরদিন সুবালার মাতার মৃত্যু হইল। সুবালা মাটীতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। কেহই তাহাকে সন্ত্বনা করিতে পারিল না। রায়মহাশয় ও তাঁহার গৃহিণী দুঃখিত হইলেন বটে, কিন্তু কথায় বলে,—'অল্প শোকে কাতর, আর অধিক শোকে পাথর' তাঁহারা পূর্ব পূর্ব দুর্ঘটনায় যেরূপ অস্থির হইয়াছিলেন, এবার ততদূর অধীর হইলেন না।

কিছুদিন পরে রায়মহাশয় সুবালাকে তাঁহার কাকার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন। সেস্থানে খুড়ীমাতা তাহাকে যথেষ্ট আদর-যত্ন করিতে লাগিলেন। কাকার পুত্র-কন্যাদিগের সহিত খেলা করিয়া মাতার শোক সুবালা অনেক পরিমাণে ভুলিয়া গেল। এইস্থানে আর একটি বালকের সহিত সুবালার সাক্ষাৎ হইল। এই বালকটির নাম বিনয়। কলিকাতায় ইহার পিতা বাস করেন। এই গ্রামে ইহার মাতুলালয়। বালকের বয়ঃক্রম দশ বৎসর। বিনয় উত্তমরূপে ঠাকুর গড়িতে পারিত। দুর্গা, কালী প্রভৃতি প্রতিমা সে গড়িয়া দিত, মনের আনন্দে বালক-বালিকাগণ তাহা পূজা করিত। কুম্ভকার হইয়া বিনয় ঠাকুর গড়িত চিত্রকর হইয়া সে রং করিত, মালী হইয়া সে পূজা করিত, কামারে হইয়া সে কচুগাছ বলিদান করিত, অন্যান্য বালকগণের সহিত ঢাকিঢুলি হইয়া সে বাজনা বাজাইত। নানা সাজে সাজিয়া সে ও অন্যান্য বালকগণ ঠাকুরের সম্মুখে যাত্রা করিত অথবা থিয়েটারের অভিনয় করিত।

কার্ত্তিক মাসে সুবালা রায়মহাশয়ের বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার সংসারের সকলেই একে একে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এক সুবালা ব্যতীত তাঁহাদের সংসারে এখন আর কেহ ছিল না। তাঁহারা স্ত্রী-পুরুষ সুবালার উপর মন-প্রাণ সমর্পণ করিলেন। কিরূপে সুবালা বাঁচিয়া থাকিবে, রাত্রিদিন এখন তাঁহাদের সেই চিন্তা হইল।

রায়মহাশয় একদিন গৃহিণীকে বলিলেন,—'এক এক বার মনে হয় যে, নূতন উইল করিয়া সুবালাকে সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী করি, অথবা পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রমের কথা কাটিয়া দিই ও যখন ইচ্ছা তখন বিষয় হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা তোমাকে প্রদান করি। কিন্তু খাঁদা ভূতের কথা মনে হইলে কিছু আর করিতে ইচ্ছা হয় না।'

গৃহিণী উত্তর করিলেন,—সুবালা আগে বাঁচিয়া থাকুক, তাহার পর অন্য কথা। আপাততঃ এ বিষয়ের সহিত সুবালার কোন সংস্রবে কাজ নাই। আমি যদি পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকি, তাহা হইলে সুবালাকে সমস্ত সম্পত্তি দিয়া যাইব।'

রায়মহাশয় বলিলেন,—'তোমাকে একটি প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। সুচিন্তা ও সুবালার

গুণে কন্যা ও জামাতাকে আমরা ভুলিয়া ছিলাম। সুচিন্তার শোক আমার হৃদয়ে যেন শেলের ন্যায় বিঁধিয়া আছে। যেরূপ নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া সে মরিয়াছে, তাহা মনে হইলে আর জ্ঞান থাকে না। আমি সর্বদাই সেই কথা ভাবিয়া থাকি। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, যদি বাঁচিয়া থাকি, তাহা হইলে অল্পবয়সে আমি সুবালার বিবাহ দিব না। পনর বৎসর পূর্ণ না হইলে তাহার বিবাহ আমি দিব না। সুবালার কাকাকে আমি এ সম্বন্ধে পত্র লিখিয়াছিলাম। তিনি আমার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন। আমার যদি পরলোক হয়, তাহা হইলে ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্বে সুবালার তিনি বিবাহ দিবেন না,—আমার নিকট তিনি এইরূপ সত্য করিয়াছেন। তুমিও আমার নিকট সেইরূপ সত্য কর; কারণ, যেরূপ রোগে পড়িয়া আছি, তাহাতে কখন কি হয়, তাহা বলিতে পারা যায় না। ডাক্তারেরা বলিয়াছে যে, আর দুইবার আমার পীড়া বৃদ্ধি হইবে, সেই সময় আমি অজ্ঞাত হইয়া পড়িব। দ্বিতীয় আক্রমণে বাঁচিয়া গেলেও যাইতে পারি। কিন্তু তৃতীয় আক্রমণে— আর কিছুতেই রক্ষা পাইব না।'

রায়মহাশয় স্ত্রীকে কঠোর সত্যে আবদ্ধ করিলেন,—(প্রথম) যে, তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইলে, উইল করিয়া সমুদয় সম্পত্তি সুবালাকে দিবেন, অন্য কাহাকেও দিবেন না। (দ্বিতীয়) যে, সুবালাব বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বৎসর পূর্ণ না হইলে তিনি তাহার বিবাহ দিবেন না।

রায়মহাশয় বলিলেন,—'আমি হিসাব করিয়া দেখিয়াছি যে, যে বৎসর শ্রাবণ মাসে তোমার বয়স পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইবে, সেই বৎসর কার্ত্তিক মাসে সুবালার বয়সও পনর বৎসর সম্পূর্ণ হইবে। সেই বৎসর শ্রাবণ মাসে তুমি উইল করিবে ও কার্ত্তিক মাসের পর যখন ইচ্ছা তখন সুবালার বিবাহ দিবে। এক্ষণে সুবালাকে ভালরূপ লেখাপড়া শিখাইতে হইবে।' সুবালার নিমিত্ত রায়মহাশয় ভাল এক জন গুরুমা নিযুক্ত করিলেন। সুবালা মনোযোগের সহিত লেখাপড়া শিখিতে লাগিল।

একাদশ অধ্যায় – জোড়া শাঁকচুন্নি

সুবালার সহিত খেলা করিবার নিমিত্ত রায়মহাশয় একজন সঙ্গিনী মনোনীত করিলেন। গ্রামে রাধা নামে গোয়ালিনী দুইটা কন্যা লইয়া বাস করিত। তাহাদের নাম ছিল চঞ্চলা ও চপলা। চঞ্চলার ভালরূপ জ্ঞান গোচর ছিল না। ঠিক পাগল না হউক, অনেকটা বটে। সেজন্য তাহার স্বামী তাহাকে লয় নাই। নাম চঞ্চলা হইলেও লোকে তাহাকে পাগলী বলিয়া ডাকিত। তাহার ছোট ভগিনী চপলার বয়স নয় দশ বৎসর হইবে। রায়মহাশয় তাহাকেই সুবালার সঙ্গিনী রূপে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু পাগলী ছোট ভগিনীকে বড়ই ভালবাসিত। কিছুক্ষণ তাহাকে না দেখিলে সে থাকিতে পারিত না। সেজন্য সেও আসিয়া সুবালার সহিত খেলা করিত। একদিন ঝগড়া করিয়া সুবালাকে সে চাপড় মারিয়াছিল। সেই অবধি রায়মহাশয় তাহাকে বাড়ীতে আসিতে দিতেন না। কিন্তু চপলাকে না দেখিয়া সে থাকিতে পারিত না। যখন সুবালা ও চপলা বাগানে খেলা করিতে যাইত, তখন পাগলীও সেই স্থানে

চুপি চুপি আসিয়া তাহাদের সহিত খেলা করিত। রায়মহাশয় জানিতে পারিয়া তাহাও বন্ধ করিয়া দিলেন। ভগিনীকে না দেখিয়া পাগলীর বড় কষ্ট হইল। চপলা সমস্ত দিন রাজামহাশয়ের বাড়ীতে থাকিত। রাত্রিতেও সুবালার নিকট একঘরে শয়ন করিত। ভগিনীকে একবার দেখিবার নিমিত্ত পাগলী কখন কখন রায়মহাশয়ের বাগানে দাঁড়াইয়া থাকিত। চপলা পূর্বদিকে দোতালায় জানালার নিকট দাঁড়াইত, দূর হইতে ভগিনীকে দেখিয়া পাগলী সন্তুষ্টচিত্তে বাড়ী ফিরিয়া যাইত।

সুবালা ও চপলার সহিত আর একজন খেলা করিত। তাহার নাম ধনুকধারী। বড়ালমহাশয়ের সে শ্যালক পুত্র। বড়ালমহাশয়ের পুত্রকন্যা ছিল না, সেজন্য তাহাকে আপনার সংসারে রাখিয়াছিলেন। সুবালা অপেক্ষা সে দুই তিন বৎসরের বড় হইবে।

সুবালা ও চপলা যখন বাগানে বেড়াইতে যাইত, ধনুকধারী তখন তাহাদের সহিত গিয়া মিলিত। যে উচ্চ গাছ হইতে বালিকা দুইটি ফুল পাড়িতে পারিত না, ধনুকধারী গাছে উঠিয়া তাহা পাড়িয়া দিত। ফুল লইয়া সুবালা ও চপলা নানারূপ অলঙ্কার গড়িয়া গায়ে পরিত।

ধনুকধারী গাছ হইতে নানারূপ ফলও তাহাদিগকে পাড়িয়া দিত। কুল, তেঁতুল, আমড়া, কামরাঙ্গা প্রভৃতি অম্লফল খাইলে রায়ণী বকিতেন। কিন্তু শিশুমুখে এই সকল দ্রব্য অপেক্ষা সুখাদ্য আর কি আছে? পাকা আমড়ার সময়, কখন টুপ করিয়া একটি আমড়া পড়িবে, সেই প্রতীক্ষায় সুবালা ও চপলা ঊর্দ্ধমুখে গাছ পানে চাহিয়া থাকিত। কাঁচা তেঁতুল, কামরাঙ্গা ও কুলের সময় আঁচলে বাঁধিয়া তাহারা লবণ লইয়া যাইত। ধনুকধারী গাছ হইতে পাড়িয়া দিত, মনের সুখে তাহারা লবণ দিয়া তাহা ভক্ষণ করিত। পাকা ও ডাসা করঞ্চাগুলি লবণ দিয়া খাইতে কি সুন্দর! কষা-বকুল-ফল কি অমৃততুল্য নহে? প্রচুর শস্য-সম্বলিত কলসীর খেজুর সুবালার ভাল লাগিত না। কেবলমাত্র খোসা দিয়া বীজটা ঢাকা সেই যে দেশী খেজুর, বল দেখি সে কেমন? ধনুকধারী কাল যে আমলকী পাড়িয়া দিয়াছে, তাহা চিবাইয়া জল খাইলে কেমন মিষ্টি লাগে!

এইরূপে সুবালা দিনযাপন করিতে লাগিল। সুবালার প্রতি রায়মহাশয় ও তাঁহার গৃহিণীর স্নেহ দিন দিন বাড়িতে লাগিল। সুবালার গুণে সকল লোক মুগ্ধ হইল। রায়মহাশয়কে সুবালা দাদামহাশয় বলিয়া ডাকিত, রায়-গৃহিণীকে আদর করিয়া সে দিদিমণি বলিত।

এই সময় গ্রামের লোকের আর একটি নূতন ভয় উপস্থিত হইল। রায়মহাশয়ের বাগানে দুইজন মালী কাজ করে,—'ত্রিলোচন ও শঙ্কারা। বাগানের উত্তর সীমায় একখানি চালাঘরে তাহারা বাস করে। একদিন রাত্রিকালে গ্রাম হইতে তাহারা বাগানে প্রত্যাগমন করিতেছিল। তাহারা দেখিল যে, সাদা কাপড় পরিধেয় দুইটি স্ত্রীলোক বাগানের ভিতর দাঁড়াইয়া আছে। চীৎকার করিয়া তাহারা তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিল। গ্রামে গিয়া তাহারা বলিল যে, সে স্ত্রীলোক দুইটির পায়ের গোড়লি সম্মুখ দিকে। গ্রামের লোকের বুঝিতে আর

বাকী রহিল না। সেই দুইটি স্ত্রীলোক মানুষ নহে, তাহারা শঙ্খচূর্ণী, যাহাকে শাঁকচুন্নি বলে। পরদিন মালী দুইজন রায়মহাশয়কে বলিল যে, স্ত্রীলোক দুইটির গায়ে বড় বড় কৃমি ঝুলিতেছিল। তাহাদের দাঁতও প্রায় একহাত লম্বা। উপর দিকে পা রাখিয়া, হাতে ভর দিয়া, দেড় হাত জিহ্বা লক্ লক্ করিয়া, বাগানের ভিতর তাহারা বন্ বন্ শব্দে ঘুরিতেছিল। তাহার পর আরও কয়জন গ্রামবাসী শাঁকচুন্নি দুইজনকে দেখিতে পাইল। গ্রামে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। আতঙ্কের আর সীমা রহিল না। সকলে বলিল যে,—'এ খাঁদা ভূতের কর্ম। কোথা হইতে একজোড়া শাঁকচুন্নি আনিয়া আমাদের গ্রামে সে ছাড়িয়া গিয়াছে; একটা নয়, দুইটা—একজোড়া। এক তো খাঁদা ভূতের জ্বালাতেই অস্থির তাহার উপর শাঁকচুন্নির উপদ্রব,—একটা নয়, একজোড়া। বল দেখি, ছেলেপুলে লইয়া এ স্থানে আমরা কি করিয়া বাস করি! একজোড়া!' গ্রামের লোক ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল।

পুনরায় শ্রাবণ মাস আসিল। শাঁকচুন্নির উপর আবার খাঁদাভূত আসিয়া পাছে কোন বিপদ ঘটায় সেই ভয়ে রায়মহাশয় আগে থাকিতে সুবালাকে তাহার কাকার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন, সে স্থানে গিয়া প্রথম সুবালার মনে সুখ হয় নাই। বিনয় তখন সে গ্রামে ছিল না। গত বৎসর বিনয় বলিয়া গিয়াছিল,—সুবালা! যখন তুমি তোমার কাকার বাড়ীতে আসিবে, আমিও সেই সময় আমার মামার বাড়ীতে আসিব।' তবে কেন বিনয় আসিল না? সুবালার মনে দুঃখ হইল। বিনয়ের উপর তাহার রাগ হইল।

চারি পাঁচ দিনের পরে বিনয়ের মাতুলানীকে সে জিজ্ঞাসা করিল,—'হ্যাঁ গা। তোমাদের বিনয় এবার মামার বাড়ী আসে নাই কেন?'

মাতুলনী ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন,—'বিনয় এখন স্কুলে পড়িতেছে। স্কুল-কামাই করিয়া সে কিরূপে আসিবে?'

মাতুলানীর সেই ঈষৎ হাসি দেখিয়া সুবালা লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রহিল। কিছু আর না বলিয়া সে স্থান হইতে সে আস্তে আস্তে প্রস্থান করিল।

যাহা হউক, কিছুদিন পরে বিনয় মাতুলের বাটিতে আসিল। সুবালা রাগ করিয়া প্রথম তাহার সহিত কথা কহে নাই। অনেক বুঝাইয়া বিনয় তাহাকে সান্ত্বনা করিল।

বিনয় বলিল,—দেখ সুবালা! তুমি যে এখানে আসিয়াছ, তাহা আমি জানিতে পারি নাই। যখন জানিতে পারিলাম, তখনও আমি আসিতে পারিলাম না। স্কুল-কামাই করিয়া কিরূপে আসিব?' সুবালা বলিল,—'আর বারে কি করিয়া আসিয়াছিলে?

বিনয় উত্তর করিল,—'গত বৎসর আমার পীড়া হইয়াছিল। সেজন্য স্কুল-কামাই করিয়া নিয়ত আমি এ স্থানে ছিলাম। এখন আমি ভাল আছি। এখন আর স্কুল-কামাই করিতে পারি না।' সুবালা জিজ্ঞাসা করিল,—'তবে আর তুমি আসিবে না? আর আমাদের সেরূপ ঠাকুর-পূজা হবে না?'

বিনয় উত্তর করিল,—'বাবা বলিয়াছেন যে, যদি অন্যদিন পরিশ্রম করিয়া ভালরূপে পড়া প্রস্তুত করিয়া রাখিতে পারি তাহা হইলে তিনি আমাকে প্রতি শনিবারে এখানে

আসিতে দিবেন। অন্যদিনে খুব পরিশ্রম করিয়া আমি পড়া করিয়া রাখিব। শনিবার দিন এখানে আসিব। রবিবার দিন থাকিব। সোমবার প্রাতঃকালে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিব।' যতদিন সুবালা খুড়ামহাশয়ের বাটীতে রহিল, ততদিন বিনয় প্রতি শনিবার মাতুলালয়ে আসিতে লাগিল। পূর্বের ন্যায় খেলাধূলা করিয়া আমোদ-আহ্লাদে সকলে দিনযাপন করিতে লাগিল।

এদিকে রায়মহাশয়ের বাটীতে এবার এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। ভাদ্র মাসের শেষে পুনরায় খাঁদা ভূতের উপদ্রব আরম্ভ হইল। একদিন রাত্রিকালে রায়মহাশয়ের বাটীর পূর্বদিকে, বাগানে সহসা দুইবার 'মা গো!' এইরূপ শব্দ হইল। কে যেন ভীত হইয়া এইরূপ শব্দ করিল। কেহ কেহ বলিল যে, সে একজনের কণ্ঠস্বর নহে, দুইজনের। একবার 'মা গো!' বলিয়া যে শব্দ হইল তাহা রায়মহাশয়ের বাটীর ঠিক পূর্বগায়ে হইয়াছিল। দ্বিতীয় বারে যে 'মা গো!' বলিয়া শব্দ, তাহা বাগানের ভিতরে কিছুদূরে হইয়াছিল। দুই শব্দ দুজনের, একজনের নহে। তাহার দুই তিন ঘণ্টা পরে বাগানের ভিতর হইতে খাঁদা ভূতের হুহুঙ্কার আসিল।

যে সময়ে রায়মহাশয়ের বাগানে 'মা গো' বলিয়া শব্দ হইয়াছিল, তাহার অল্পক্ষণ পরেই গ্রামের ভিতর আর একটি ঘটনা ঘটিল। চপলার ভগিনীর—যাহাকে পাগলী বলে, দৌড়িয়া সে বাটী আসিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল। অনেক কষ্টে যখন লোকে উহার দাঁতকপাটি ভাঙ্গিল, তখন সে 'খাঁদা ভূত' এই কথা বলিয়া পুনরায় মূর্চ্ছিতা হইল। এক একবার জ্ঞান হয়, আর পুনরায় 'খাঁদা ভূত' বলিয়া 'আউ-মাউ' করিয়া সে মূর্চ্ছিতা হয়। সমস্ত রাত্রি তাহার এইরূপ হইতে লাগিল।

রাত্রিকালে সে কোথা গিয়াছিল, কি দেখিয়া সে ভয় পাইয়াছিল, সে সম্বন্ধে কোন কথা সে বলিতে পারিল না।

আরও একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। পরদিন প্রাতঃকালে সকলে দেখিল যে, চপলা রায়মহাশয়ের বাড়ীতে নাই। বাড়ীর সদর ও খিড়কি দরজা যেমন বন্ধ, তেমনি বন্ধ ছিল, কিন্তু চপলাকে কেহ দেখিতে পাইল না। পূর্বদিকে যে ঘরে সুবালা শয়ন করিত, চপলা সেই ঘরে শয়ন করিত। যখন সুবালা এখানে ছিল, তখন দুইজনে একসঙ্গে শয়ন করিত। সুবালা এখন এখানে নাই। সেজন্য চপলা একেলা সেই ঘরে শয়ন করিত।

চপলা কোথায় গেল? কি করিয়া সে বাড়ী হইতে বাহির হইল? সে সমস্যার মীমাংসা কেহই করিতে পারিল না।

রায়মহাশয় শয্যাগত। তথাপি তিনি যথাসাধ্য চপলার অনুসন্ধান করাইলেন। চপলার মাকে তিনি সংবাদ দিলেন। মায়ের নিকট চপলা গমন করে নাই। প্রাতঃকালেও পাগলী মূর্চ্ছিতা হইতেছিল। তাহাকে লইয়া মা ব্যস্ত ছিল। চপলার কোন সংবাদ সে দিতে পারিল না। চপলা বালিকা। কাহারও সহিত কোন স্থানে সে চলিয়া যাইবে, সেরূপ বয়স তাহার হয় নাই। তাহার পর সদরও খিড়কি দরজা বন্ধ ছিল। যাইবেই বা কি করিয়া?

ভিতর-বাটী, বাহির বাটী, উপর তলা, নীচ তলা, সমস্ত বাড়ী—সকলে তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিল। সমস্ত বাগান, সমস্ত গ্রাম, বন, মাঠ, নদীর ধার সকলে খুঁজিয়া দেখিল। রায়মহাশয়ের বাগানে যতগুলি পুষ্করিণী ছিল, জাল টানিয়া তাহাতে দেখা হইল। কোন স্থানে চপলার চিহ্নমাত্র কেহ দেখিতে পাইল না। রায়মহাশয় পুলিশে খবর দিলেন। পুলিশ আসিয়াও কিছু করিতে পারিল না। চারিদিকে দশ ক্রোশ পর্যন্ত যতগুলি গ্রাম আছে, সকল স্থানে রায়মহাশয় অনুসন্ধান করাইলেন। চপলার কেহ কোন সন্ধান পাইল না।

লোকে বলে যে, মানুষকে নিশিভূতে লইয়া যায়। গাছের উপর তাহাকে বসাইয়া রাখে, অথবা মারিয়া ফেলে; গাছের উপর চপলাকে কেহ দেখিতে পাইল না। নিশিভূতে যদি মারিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার মৃতদেহ কোথায় গেল? ফলকথা, চপলার কোন সন্ধান হইল না। রায়মহাশয়ের বাটী হইতে সে একেবারে যেন উড়িয়া গেল; অবশেষে হতাশ হইয়া সকলে স্থির করিল যে, খাঁদা ভূত চপলাকে খাইয়া ফেলিয়াছে, তাহার হাড়গুলি পর্যন্ত রাখে নাই। অথবা সেই শাঁকচুন্নি দুইজন তাহাকে আপনাদের সঙ্গী করিয়া লইয়া গিয়াছে! কিন্তু খাঁদা ভূত যে তাহাকে খাইয়াছে, এই কথায় সকলের অধিক প্রত্যয় হইল।

দ্বাদশ অধ্যায় – টুপ! টুপ! টুপ

গ্রামের লোক ভয়ে অস্থির হইয়া পড়িল। সকলে বলিল যে,—খাঁদা ভূত আজ চপলাকে খাইল, কাল আমাদেরও তো খাইতে পারে। এখন উপায় কি? রায়মহাশয়ের বাটীতে অনেক পূজা-পাঠ শান্তি-স্বস্ত্যয়ন হইয়াছিল। তাহাতে কোন ফল হয় নাই। দুইবার ভূত নামানো হইয়াছিল। রোজার সহিত একটা মাম্‌দো ভূত, একটা রাঁকিনী, একটা শাঁকিনী এবং একটা হাঁকিনী আসিয়াছিল। অন্ধকার ঘরে তাহারা কেবল দুপ দাপ্ করিল, খোঁনা সুরে অনেক কথা বলিল, একধামা সন্দেশ ও দুই হাঁড়ি ক্ষীর খাইয়া গেল। কিন্তু খাঁদা ভূত কি জোড়া শাঁকচুন্নি তাহারা কিছুই করিতে পারিল না। এখন করা যায় কি।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, অনেক যুক্তি করিয়া, গ্রামের লোক রক্ষাকালীর পূজা করিল। ঠাকুর গড়া হইল, পূজা হইল। 'খাঁদা ভূত ও তাহার শাঁকচুন্নি জোড়াকে মা, তুমি দূর কর,—'এই কামনায় স্ত্রীলোকেরা ধুনা পোড়াইল। তাহার পর গ্রামের পুরুষগণ প্রতিমার সম্মুখে জোড়হাতে দাঁড়াইয়া প্রার্থনা করিল,—'হে মা রক্ষাকালী! তোমার নিকট আমরা আর কিছু চাই না, খাঁদা ভূত ও শাঁকচুন্নি জোড়ার দৌরাত্ম্য হইতে তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর। হে মা! ভূতের উপদ্রবে আমরা জর জর হইয়াছি। তুমি খাঁদা ভূতের দমন কর, শাঁকচুন্নি জোড়াকে তুমি দূর কর। যদি না কর, মা, তাহা হইলে আর কেহ তোমার পূজা করিবে না।'

রক্ষাকালী পূজা করিয়া উপকার হইল। শাঁকচুন্নি জোড়াকে আর কেহ দেখিতে পাইল না। সে বৎসর খাঁদা ভূতকে ও আর কেহ দেখিতে পাইল না।

কার্তিক মাসে সুবালা বাড়ী ফিরিয়া আসিল। বাড়ী আসিয়া সেও চপলা সম্বন্ধে

নানারূপ তদন্ত করিল। পরদিন প্রাতঃকালে যাহারা সেই পূর্বদিকের ঘর দেখিয়াছিল তাহারা বলিল, কাজকর্ম সারিয়া, আপনার ঘরে গিয়া মাদুরের উপর বসিয়া চপলা, বোধহয়, মাথা আঁচড়াইতেছিল। ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছিল। সকালবেলা আমরা দেখিলাম যে, প্রদীপের সমস্ত তেল ও সলিতা পুড়িয়া গিয়াছে। মাদুরের উপর চিরুণী ও ছেঁড়া চুল পড়িয়া আছে। এলোচুলে মাথা আঁচড়াইবার সময় ভূতে ছিদ্র পাইয়া তাহাকে উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে।'

চপলার মাতা বলিল,—'কি বলিব দিদি! দুইটি মেয়ে লইয়া এই সংসারে ছিলাম। বিধাতা তাহাতেও বাদ সাধিলেন!'

সুবালা জিজ্ঞাসা করিল,—'পাগলী রাত্রিতে কোথায় গিয়াছিল?'

গোয়ালিনী উত্তর করিল,—'তাহা আমি ঠিক বলিতে পারি না। চপলাকে পাগলী বড় ভালবাসিত, তাহাকেনা দেখিয়া সে থাকিতে পারিত না। যেদিন হইতে রায়মহাশয় তাহাকে তোমাদের বাড়ী যাইতে মানা করিলেন, সেইদিন হইতে তাহার বড় কষ্ট হইল। তোমাদের বাগানে দাঁড়াইয়া দোতালার জানালার দিকে সে একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিত। একবার যদি দূর হইতে চপলাকে সেই জানালার ধারে দেখিতে পাইত, তাহা হইলে কৃতার্থ হইয়া প্রফুল্লমুখে সে বাটী ফিরিয়া আসিত। আমি এ দিনেরবেলার কথা বলিতেছি। রাত্রিতে সে কোথায় গিয়াছিল, তাহা আমি জানি না।'

সুবালা বলিল,—'সে রাত্রে পাগলী বোধ হয় খাঁদা ভূতকে দেখিয়াছিল?'

চপলার মা উত্তর করিল,—'হাঁ দিদি! তাহাই বোধ হয় হইয়াছিল। একে তো পাগলী! তাহার উপর ভয় পাইয়াছিল। মুখ শাকবর্ণ হইয়া সে বাড়ীতে আসিয়া পড়িল। আমরা তাহার দাঁতকপাটি ভাঙ্গিলাম। কিন্তু জ্ঞান আর কিছুতে হয় না। অনেকক্ষণ পরে জ্ঞান হইল। তাহার পর 'খাঁদা ভূত' এই কথাটি বলে আর পুনরায় মূর্চ্ছিত হয়। রাত্রি দুই প্রহরের পর খাঁদা ভূতের সেই ভয়ানক 'হু হু' শব্দ হইল। শুনিয়া মেয়েটা এমনি মূর্চ্ছিত হইল যে, আমরা মনে করিলাম, আর সে বাঁচিবে না। যাহা হউক, আপাততঃ তাহার প্রাণটা বাঁচিয়াছে। কিন্তু সেই অবধি তাহারও সহিত সে ভালরূপ কথা কয় না। কবিরাজমহাশয় বলিয়াছেন যে, তাহার 'স্তম্ভিত বাই' হইয়াছে। তোমরা দিদি, বড়-মানুষ। কিন্তু আমি খাঁদা ভূতের কি করিয়াছি যে, সে আমার উপর এরূপ বাদ সাধিল। আমার একটি কন্যাকে সে একেবারে খাইয়া ফেলিল। আর একটিকে সে ভয় দেখাইয়া আরও পাগল করিল।'

বলা বাহুল্য যে, সুবালা পূর্বদিকের ঘরে আর শয়ন করিত না। পশ্চিমদিকের ঘরে সে বাস করিতে লাগিল। সুবালার খেলাইবার সঙ্গিনী আর হইল না। ওরূপ বিপদসঙ্কুল বাড়ীতে কেহই আপনার কন্যা পাঠাইতে সম্মত হইল না। গুরু-মায়ের নিকট থাকিয়া সুবালা মনোযোগের সহিত বিদ্যা অধ্যয়ন করিতে লাগিল। কখন কখন ধনুকধারী আসিয়া পড়িবার ঘরে বসিত। সুবালা বাগানে বেড়াইতে গেলেও ধনুকধারীর সহিত সর্বদা সাক্ষাৎ হইত।

সুবালার প্রতি রায়মহাশয়ের ও তাঁহার ভার্য্যার স্নেহ-মমতার আর পরিসীমা রহিল না। পাছে সুবালার কোনরূপ অনিষ্ট হয়, সেজন্য সর্বদাই তাঁহারা শঙ্কিত হইয়া রহিলেন। সুবালাকে সমুদয় সম্পত্তি লিখিয়া দিবার নিমিত্ত রায়মহাশয়ের কতবার চিন্তা করিলেন। কিন্তু এ পাপের বিষয় তাহাকে দিলে পাছে কোনরূপ অমঙ্গল ঘটে সেই ভয়ে তিনি তাহা করিলেন না। 'আমার অবর্তমানে যাহা হয় হইবে'—এইরূপ ভাবিয়া তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। পুনরায় শ্রাবণ মাষ আসিল। সুবালা খুড়ামহাশয়ের বাড়ীতে গমন করিল। সে স্থানে পূর্বের ন্যায় আমোদ-আহ্লাদে কালযাপন করিতে লাগিল।

ভাদ্র মাস পড়িল। ভাদ্র মাসের শেষে খাঁদা ভূত পুনরায় দেখা দিল। ঘোর রাত্রি। রায়মহাশয় নিদ্রা যাইতেছিলেন। সহসা তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। ঘরে আলো জ্বলিতেছিল। টুপ করিয়া একটি ঢিল তাঁহার ঘরের ভিতর পড়িল। নিম্নে বাগান হইতে জানালা দিয়া ঘরের ভিতর কে সেই ঢিলটি ফেলিল। রায়মহাশয় আপনি উঠিয়া বসিতে পারেন না। চাকর ঘরের মেঝেতে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছিল। তাহাকে তিনি ডাকিলেন,—'গদা! গদা! আমাকে তুলিয়া বসা।'

চাকর উঠিতে না উঠিতে, 'টুপ' করিয়া আর একটি ঢিল পড়িল।

'গদা! গদা! ওঠ। আমাকে তুলিয়া বসা',—রায়মহাশয় পুনরায় বলিলেন।

'টুপ'—আর একটি ঢিল পড়িল, আর সেই মুহূর্তে বাগানে, তাঁহার ঘরের ঠিক নিম্নে খাঁদা ভূতের হু হু শব্দ হইল।

রায়মহাশয় অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। পক্ষাঘাত রোগের শেষ আক্রমণ দ্বারা তিনি আক্রান্ত হইলেন। তিন ঘণ্টা পরে তাঁহার পরলোক হইল।

আহা! সেইদিন সন্ধ্যাবেলা রায়মহাশয় আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন,—'টাকা দিয়া সুস্থ শরীর ক্রয় করিতে পারা যায় না। পক্ষাঘাত রোগে আমি কষ্ট ভোগ করিতেছি। টাকা আমাকে রোগ হইতে মুক্ত করিতে পারে না। অনেক ধনবান লোকের কথা আমি শুনিয়াছি, যাঁহাদের পাকস্থলী নষ্ট হইয়া গিয়াছে, পরিপাক শক্তি একেবারে লোপ হইয়াছে, একটু সাবু খাইয়া তাঁহাদিগকে দিনপাত করিতে হয়। তাঁহারা টাকা দিয়া নূতন পাকস্থলী ক্রয় করিতে পারে না। টাকা দিয়া কেহ যৌবনকাল ক্রয় করিতে পারে না। যযাতি রাজার গল্প সকলেই অবগত আছেন। টাকা দিয়া প্রিয়জনের পরমায়ু ক্রয় করিতে পারা যায় না। আমার কথা দূরে থাকুক, বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী রাজা-মহারাজাকে তো পুত্র-কন্যার মৃত্যুজনিত মর্মভেদী শোকে সন্তাপিত হইতে হয়। হায়, হায়! তবুও অধর্ম করিয়া মানুষ অর্থোপার্জন করিতে চেষ্টা করে। সেই অধর্মের প্রতিফলস্বরূপ পরিণামে কত যে দুঃখ ভোগ করিতে হয়, সে সম্বন্ধে মানুষের যদি স্থির বিশ্বাস থাকিত, পাপের ফল যদি সঙ্গে সঙ্গে ফলিত, তাহা হইলে কখনই কেহ অধর্ম করিত না। সুবালার মাতা সর্বদাই কন্যা দুইটিকে বলিত,—'দেখ সুচিন্তা! দেখ সুবালা! মিথ্যা কথা, মিথ্যাচরণ, নীচতা, নিষ্ঠুরতা, সর্বদা বিষবৎ পরিত্যাগ করিবে। বেশ বুঝিতেছি যে, আমি আর অধিক দিন বাঁচিব না। দূর—অতিদূর পর্যন্ত আমার

মানসিক দৃষ্টি যাইতেছে! জীবনের নানা চিন্তা করিয়া আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে। আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, পাপের প্রতিফল ভুগিতেই হয়, নিশ্চয় ভুগিতে হয়, তবে দুইদিন আগে আর দুইদিন পরে।

পক্ষাঘাতের শেষ আক্রমণ দ্বারা যখন তিনি আক্রান্ত হইলেন, তখন তাঁহার জ্ঞান ছিল না। মাঝে মাঝে গুটিকত কথা বিজ্ বিজ্ করিয়া তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইতেছিল। নিকটে যাহারা ছিল, কান পাতিয়া তাহারা শুনিল। একবার তিনি বলিলেন, —'নদীকূলে কে ও বসিয়া? কি ভয়ানক মূর্তি! যমের কিঙ্কর? উহার নাক নাই। কাদা দিয়া নাক গড়িতেছে। মুখের উপর বসাইতেছে। তাহার পর ফেলিয়া দিতেছে। এইরূপ বার বার করিতেছে। ও কি পাগল, না ভূত, না যমদূত?'

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিলেন,—'অতি দূরে ঊষর প্রান্তর; পার্শ্বে, বৃক্ষলতায় বসিয়া কে ও স্ত্রীলোকটি কাঁদিতেছে? আহা! উহার মলিন বদন দেখিয়া বড়ই দুঃখ হয়। তুমিও কি বাছা পাপ করিয়াছিলে, তাহার প্রতিফল তুমিও কি ভোগ করিতেছ? পূর্বে তুমি এই বাড়ীর কর্ত্রী ছিলে? পাপের ফলে এখন তুমি অনাথিনী? তোমার হৃদয় রাত্রি-দিন দগ্ধ হইতেছে? বাছা! আমি আর তোমাকে কি বুঝাইব? আমিও সেইরূপ আগুনে দগ্ধ হইতেছি। অধিক কথা নহে, আমরা যদি লোকের মনে দুঃখ না দিতাম; লোককে আমরা যদি না কাঁদাইতাম, তাহা হইলে আমাদের কাঁদিতে হইত না।'

ক্রমে রায়মহাশয়ের গলা ঘড় ঘড় করিতে লাগিল। তাঁহার মুখমণ্ডল বিকৃত হইয়া অতি ভয়ানক মূর্তি ধারণ করিল পক্ষাঘাত রোগে যেদিক আক্রান্ত হয় নাই, তাঁহার শরীরের সেইদিক অতি ভয়ানকভাবে প্রসারিত ও কুঞ্চিত হইতে লাগিল। তাঁহার যন্ত্রণা ও বিকট আকৃতি দেখিয়া উপস্থিত ব্যক্তিদিগের ঘোরতর আতঙ্ক হইল। বড়ালমহাশয় বলিলেন,—মৃত্যুকালে অনেক লোকের নিকটে আমি উপস্থিত ছিলাম, কিন্তু এরূপ ভয়াবহ ব্যাপার কখনও আমি দর্শন করি নাই। আমি আর দেখিতে পারি না।' এই বলিয়া সে স্থান হইতে তিনি পলায়ন করিলেন। অল্পক্ষণ করে রায়ণীও সেই কথা বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘর হইতে পলায়ন করিলেন। গদা চাকরও ভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করিল! মৃতুকালে রায়মহাশয় একলা পড়িয়া রহিলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায় – ঝোঁক্ড়া-চুলো ছোঁড়া

রায়মহাশয়ের পরলোক হইলে, রায়-গৃহিণী সুবালাকে আনিতে পাঠাইলেন। সুবালা আসিয়া দাদামহাশয়ের জন্য অনেক কাঁদিল। আমাকে তোমরা সংবাদ দাও নাই কেন? আমি দাদামহাশয়কে দেখিতে পাইলাম না।' এই বলিয়া সুবালা খেদ করিতে লাগিল।

'রায়মহাশয়ের হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে। সংবাদ দিবার সময় ছিল না'—এই কথা বলিয়া সুবালাকে সকলে বুঝাইতে লাগিল।

সুবালাকে কাছে ডাকিয়া রায়-গৃহিণী অনেক আদর করিলেন। তিনি বলিলেন,—

'সুবালা আমার যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। একে একে সকলেই গেল। বাকী কেবল আমি আর তুমি। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা। তুমি কোন পাপে নাই। আমার নিশ্চয় বিশ্বাস যে, খাঁদা ভূত তোমার অনিষ্ট করিতে সাহস করিবে না। ভগবান্ তোমাকে রক্ষা করিবেন।'

সুবালা বলিল,—'তোমাকেও দিদিমণি, তিনি বাঁচাইয়া রাখিবেন।'

রায়ণী বলিলেন,—'বাঁচিয়া থাকিতে আমার তিলমাত্র সাধ নাই। তবে, কেবল তোমার নিমিত্ত আর সাত বৎসর পৃথিবীতে থাকিতে ইচ্ছা হয়। তাহা হইলে তোমাকে এই বিষয় দিয়া যাইতে পারি। এই সম্পত্তি তোমাকে দিয়া একজন রূপবান্ গুণবান বরের হস্তে তোমাকে সমর্পণ করিয়া মানে মানে যাইতে পারিলেই আমি এখন কৃতার্থ হই।'

রায়-গৃহিণী পুনরায় বলিলেন,—'আরও কথা এই সুবালা! এই সম্পত্তি পাছে অন্য লোকের হাতে পড়ে, সেজন্য আমার বড় ভয়; তুমি বোধ হয় শুনিয়া থাকিবে যে রায়মহাশয়ের এক ছোট ভাই আছে; তাহার নাম বিজয়। সে কলিকাতায় থাকে। তাহার বড় অহঙ্কার। সে বড় দুষ্ট। তোমার দাদামহাশয় আমাকে বার বার বলিয়া গিয়াছেন যে, সম্পত্তি কিছুতেই যেন সে না পায়। যদি আমার বয়ঃক্রম পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ না হয়, যদি সম্পত্তি তোমাকে আমি উইল করিয়া দিতে না পারি, তাহা হইলে সেই দুর্বৃত্ত ইহা পাইবে।'

সুবালা জিজ্ঞাসা করিল,—'তিনি বড় দুষ্ট!'

রায়-গৃহিণী উত্তর করিলেন,—'সে বড় দুষ্ট! তোমার দাদামহাশয়কে বঞ্চনা করিয়া সে এই বিষয় লইতে চেষ্টা করিয়াছিল। তাহার পর খাঁদা ভূতের উপদ্রবে উৎপীড়িত হইয়া, তোমার দাদামহাশয় যখন তাহার নিকট হইতে খাঁদা ভূতের নাক চাহিলেন, তখন সে কিছুতেই দিল না। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি তাহার কিছুমাত্র মমতা হইল না। তবেই বুঝিয়া দেখ যে, সে কেমন নির্দয়, কেমন নিষ্ঠুর!'

সুবালা জিজ্ঞাসা করিল,—'তিনি দেখিতে কিরূপ, দিদিমণি?'

রায়-গৃহিণী উত্তর করিলেন,—আমি অনেক দিন পূর্বে তাহাকে দেখিয়াছি। এখন বোধ হয়, বিভীষণের মত তাহার মুখ হইয়া থাকিবে। চক্ষু দুইটা জবা ফুলের মত হইয়া থাকিবে ভগদত্তর হাতীর মত তাহার শরীর হইয়া থাকিবে। নাকটা বাঁশের মত হইয়া থাকিবে।'

সুবালা বলিল,—'সর্বনাশ! কি ভয়ঙ্কর চেহারা!'

রায়-গৃহিণী বলিলেন,—'হাঁ, সে পাপাত্মার নাম করিও না; তোমার ভয় হইবে।'

পুনরায় বর্ষাকাল পড়িল। শ্রাবণ মাসে সুবালা কাকা-মহাশয়ের গৃহে গমন করিলেন ক্রমে তিনি বড় হইতে লাগিলেন, সেইসঙ্গে খেলাধূলাও বন্ধ হইতে লাগিল। বিনয়ের সহিত আর তিনি সেরূপ খেলা করিতেন না। তবে মনে মনে দুই জনে বিলক্ষণ প্রণয় হইয়াছিল। সেই প্রণয় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। দেখা-সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত, এক স্থানে বসিয়া গল্প-গাছা করিবার নিমিত্ত, দুইজনে সর্বদাই উৎসুক হইয়া থাকিতেন। পূর্বের ন্যায় এখন আর ঘন ঘন দেখা হইত না, যখন হইত তখন দুইজনে লেখাপড়ার গল্প করিতেন।

গত বৎসর রক্ষাকালীর পূজা করিয়া গ্রামের লোক শাঁকচুন্নির হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিল। এ বৎসরও তাহারা রক্ষাকালীর পূজা করিল! কালীর কৃপায় এ বৎসর ভাদ্রমাসে খাঁদা ভূত একেবারেই গ্রামে আসিল না! গ্রামের লোকের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। সকলে বলিল,—'রক্ষাকালী জাগ্রত দেবতা। ভূত-প্রেত সকলেই তাঁহাকে ভয় করে। তাঁহার কৃপায় খাঁদা ভূতের হাত হইতে আমরা পরিত্রাণ পাইলাম।'

নানা বিপদে বিপন্ন হইয়া রায়মহাশয় ইদানীং গ্রামের লোককে উৎপীড়ন করিতেন না। সেজন্য শেষ অবস্থায় গ্রামবাসীদের সহিত তাঁহার কতকটা সদ্ভাব হইয়াছিল। তথাপি কেহ কেহ বলিল,—'রায়মহাশয়ের পাপে খাঁদা ভূত এ গ্রামে আসিত। এখন তিনি নাই। সেজন্য খাঁদা ভূত এ গ্রামে আসে নাই।'

পর বৎসরও খাঁদা ভূতের উপদ্রব হইল না। বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া গেল। খাঁদা ভূতের দেখা নাই; গ্রামের লোক ক্রমে তাহাতে বিস্মৃত হইল। কিন্তু পাঠক। খাঁদা ভূতের জন্য দুঃখ করিবেন না। খাঁদা ভূতের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে। আর শাঁকচুন্নির হাড় দেখিয়া যদি;—থাক্, সে কোথায় এখন কাজ নাই।

খাঁদা ভূত আর আসিল না। সেজন্য বড়ালমহাশয় ও রায়-গৃহিণীর আহ্লাদ হইল। রায়ণীকে জীবিত রাখিবার নিমিত্ত বড়ালমহাশয় যথাসাধ্য যত্ন করিতে লাগিলেন। 'ইনি যতদিন জীবিত থাকিবেন, ততদিন আমি পঞ্চাশ টাকা পাইব। রাজাবাবু আমাকে যাহা দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, আমি পাই নাই, রায়-গৃহিণীকে সে কথা আমি বলিয়া দেখিব।' এইরূপ চিন্তা করিয়া বড়ালমহাশয় রায়নীকে বাঁচাইয়া রাখিবার নিমিত্ত বিধিমত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এইরূপে পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল।

রায়ণী মনে মনে ভাবিতেছিলেন,—'যখন খাঁদা ভূতের দৌরাত্ম্য দূর হইল, তখন আর ভাবনা নাই। পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। কেবল আর দুই বৎসর বাকী আছে। এ দুই বৎসর নিশ্চয়ই আমি বাঁচিয়া থাকিব। দুই বৎসর পরে শ্রাবণ মাস আসিলে সমুদয় বিষয় সুবালাকে আমি লিখিয়া দিব। তাহার পর সুবালার বিবাহ দিব। এই দুইটি কাজ হইয়া গেলে মরি—মরিব। সে মরণে আমর খেদ নাই। কিন্তু কিছুদিন হইতে রাত্রিতে আমার গলা খুস্ খুস্ করে। জর-কাসি, সে কিছু নহে।'

কিছু নহে?—তাহা বড় নয়। রাত্রিকালে সেই কাসির শব্দ ক্রমে বড়ালমহাশয়ের কর্ণগোচর হইল। তাঁহার ভয় হইল। তিনি ডাক্তার আনাইলেন। ডাক্তার বলিলেন,—'আপাততঃ কোন আশঙ্কা নাই কিন্তু আমার সন্দেহ হইতেছে।'

ডাক্তার ঔষধ দিয়া গেলেন। আপাততঃ কোন ভয় নাই বটে, কিন্তু রায়-গৃহিণী দিন দিন কৃশ হইতে লাগিলেন।

বর্ষাকালে সুবালা খুড়ামহাশয়ের গৃহে গমন করিয়াছিলেন। রায়ণীকে সর্বদা তিনি পত্র লিখিতেন। একবার তিনি লিখিলেন,—'দিদিমণি! এ স্থানে বিনয় বলিয়া একটি লোক আছেন। ছেলেবেলা হইতে তাঁহাকে আমি জানি। তাঁহার বাড়ী কলিকাতা, এই গ্রামে তাঁহার

মামার বাড়ী। তিনি বড়মানুষের ছেলে। তিনি চাকুরি করিবেন না। সেজন্য তিনি বি-এ, এম-এ পাশ করেন নাই। ছবি আঁকার দিকে তাঁহার ঝোঁক। ফটোগ্রাফ লইতে ও ছবি আঁকিতে তিনি উত্তমরূপে শিখিয়াছেন। আমার তিনি ফটোগ্রাফ লইয়াছেন। একখানি তোমার নিকট পাঠাইলাম। ঠিক যেন আমি। এখন রং দিয়া আমার বড় একখানি ছবি তিনি আঁকিতেছেন। আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে, এইরূপ তোমার একখানি ছবি আঁকা হয়। নামাবলী গায়ে দিয়া জপের মালা হাতে করিয়া তুমি বসিয়া আছ সেইরূপ ছবি আমার সাধ। আমি বিনয়কে বলিয়াছিলাম। আমাদের বাড়ী গিয়া তোমার ছবি আঁকিতে তিনি সম্মত আছেন। তাঁহার পিতা সঙ্গতিপন্ন লোক। কাহারও নিকট হইতে তিনি কিছু গ্রহণ করে না।'

প্রত্যুত্তরে রায়-গৃহিণী লিখিলেন,—'আমি মেয়েমানুষ, হতভাগিনী! আমার আবার ছবি কেন? যাহা হউক, তোমার যদি সাধ হইয়া থাকে, সে সাধ আমি পূর্ণ করিব। যদি সে লোক সম্মত হন, তাহা হইলে তুমি যখন এখানে আসিবে সেই সময় তাঁহাকে আসিতে বলিবে।'

কার্ত্তিক মাসে সুবালা বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। রায়-গৃহিণীর ছবি আঁকিবার নিমিত্ত অগ্রহায়ণ মাসে বিনয়ও সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গায়ে নামাবলী ও হাতে জপের মালা দিয়া সুবালা তাঁহাকে বসাইতেন। বিনয় তাঁহার ছবি আঁকিতেন। প্রতিদিন এক ঘণ্টার অধিক রায়-গৃহিণী বসিতে পারিতেন না। কারণ, কাসি এখনও তাঁহার ভাল হয় নাই। ক্রমেই তিনি দুর্বল ও কৃশ হইয়া পড়িতেছিলেন। ছবি শেষ হইতে সেজন্য বিলম্ব হইতেছিল। বাহির বাটীতে ভাল একটি ঘর বড়ালমহাশয় সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিয়াছিলেন। সেই ঘরে বিনয় বাস করিতেছিলেন।

যতক্ষণ ছবি আঁকা হইত, সুবালা ততক্ষণ সেই স্থানে উপস্থিত থাকিতেন। সেই সময় তিনজনে কথাবার্তা হইত। বিনয় কত হাসির গল্প করিতেন। তাহা শুনিয়া রায়ণীও হাসিতেন, সুবালাও হাসিতেন।

বিনয় ও সুবালার ভাব দেখিয়া রায়ণীর মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। রায়-গৃহিণী ভাবিলেন,—সুবালা এখন আর নিতান্ত বালিকা নহে। আমি দেখিতেছি যে, ইহাদের দুইজনে প্রণয় হইয়াছে। তাহা ভাল নহে। যুবক ব্রাহ্মণ বটে। কিন্তু ইহার পরিচয় আমি জানি না। সুবালার বাপ কিরূপ ব্রাহ্মণ, কুলীন কি বংশজ,—তাহা আমি জানি না। ছেলেটি ভাল, ধীর, শান্ত, মিষ্টভাষী। ইহার শরীরে কোন দোষ আছে বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে। ইহার বাপ শুনেতিছি বড়মানুষ। অনেক গোল। এখন আর খাঁদা ভূতের উপদ্রব নাই। সুবালাকে আর আমি তাহার কাকার বাড়ী যাইতে দিব না। সুবালার কাকাকে পত্র লিখিব। যদি হয় তো ভালই হয়। আমি নিশ্চিন্ত হই।'

চিত্র-অঙ্কনকালে ও অন্য সময়েও এইরূপ চিন্তা রায়-গৃহিণীর মনে উদয় হইত।

গুরু-মাকে সঙ্গে লইয়া বৈকাল বেলা সুবালা বাগানে বেড়াইতে যাইতেন, বিনয়ও কখন কখন সেই স্থানে যাইতেন। তিনজনে এ গাছ সেগাছ দেখিয়া বেড়াইতেন ও বেড়াইতে

বেড়াইতে বিনয় নানারূপ গল্প করিতেন। সুবালা নিজে একটি ফুলের বাগান করিয়াছিলেন। বিনয় তাঁহাকে অনেক প্রকার বিলাতী ফুলের বীজ দিয়াছিলেন। সুবালা নিজ হাতে গাছগুলির গোড়া খুঁড়িয়া নিতেন, তাহাদের মূলে জলসেচন করিতেন। কোন বীজ অঙ্কুরিত হইতেছে, কোন্ গাছে মুকুল বাহির হইতেছে কোন গাছে ফুল প্রস্ফুটিত হইতেছে, সেই সমুদয় দেখিতে তিনি বড় ভালবাসিতেন।

বিনয় ও সুবালাকে একসঙ্গে দেখিলে হিংসায় ধনুকধারীর বুক ফাটিয়া যাইত। ধনুকধারী মনে করিত,—'ঝেঁক্ড়া চুলো এ উপসর্গটা কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিল? আমি এখন কেহ নই। ধনুকধারী লঙ্কা লইয়া এস ধনুকধারী আমড়া পাড়িয়া দাও, ধনুকধারী এ কাজ কর, সে কাজ কর, তখন ধনুকধারী গোলাম ছিল,—এখন ধনুকধারী কেহ নয়। এখন ধনুকধারী কর্মচারীর শ্যালকপুত্র কীটস্য কীট, পদদলিত করিবার উপযুক্ত পাত্র।'

চিত্র-অঙ্কন কার্যে নিযুক্ত শিল্পকারগণ মাথায় বড় বড় চুল রাখিয়া দেন। প্রচলিত প্রথা অনুসারে বিনয়ও মাথায় বড় বড় চুল রাখিয়াছিলেন। সেইজন্য ধনুকধারী দ্বারা তিনি 'ঝোঁক্ড়া-চুলো' উপসর্গ নামে অভিহিত হইলেন।

রাগে গর্ গর্ করিয়া, অন্তরাল হইতে ধনুকধারী তাঁহাদিগকে দেখিতেন। 'দূর কর, আমি আর দেখিব না, দেখিলে আমার বুক ফাটিয়া যায়।' এই বলিয়া একদিন ধনুকধারী একটি গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া চক্ষু বুজিয়া রহিল। অধিকক্ষণ চক্ষু মদিত করিয়া থাকিতে পারিল না। পুনরায় চক্ষু চাহিল। সেই সময় বিনয় সুবালাকে কি বলিলেন, সুবালা হাসিয়া উঠিলেন! দূর হইতে হাসির শব্দ ধনুকধারীর কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। হাসি অতি সুমিষ্ট বটে, কিন্তু সে হাসি ঐ ঝেঁক্ড়া-চুলো ছবি-আঁকা ছোঁড়ার কথায় উৎপত্তি হইয়াছিল। ধনুকধারীর কানে যেন বিষ ঢালিয়া দিল। — দূর হইতে ভাল করিয়া তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য ধনুকধারী এক অশ্বত্থ গাছের উপর উঠিল। অতি উচ্চে ডালের উপর বসিয়া বিরসবদনে সুবালা ও বিনয়কে সে দেখিতে লাগিল।

'খুট' করিয়া গাছে একটু শব্দ হইল। বিনয়ের দৃষ্টি সেই দিকে পড়িল। বিনয় বলিলেন,—'দেখ, দেখ। অশ্বত্থ গাছে কে একটা লোক বসিয়া রহিয়াছে।'

তিনজনে নিকটে আসিলেন। নিকটে আসিয়া সুবালা তাহাকে চিনিতে পারিলেন। সুবালা জিজ্ঞাসা করিলেন,—'ধনুকধারী! তুমি গাছের উপর বসিয়া কেন?'

ধনুকধারী উত্তর করিল,—'বসিয়া আছি।' — গুরু-মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—'ঐ কি বসিয়া থাকিবার স্থান?'

ধনুকধারী উত্তর করিল,—'দোষ কি?'

সুবালা কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। হাসিতে হাসিতে তিনজনে সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। অভিমানে দুঃখে ও ক্রোধে ধনুকধারীর সর্বশরীর কাঁপিতে লাগিল।

ধনুকধারী ভাবিতে লাগিল,—'বেটার প্রখর দৃষ্টি দেখ! আমি গাছে বসিয়া আছি তা

তোর কি রে বেটা? আমি কেহ নই, কিছুতেই তোমাদের সমকক্ষ নই, আমি মানুষ নই। বটে! তোমরা ধনবান্, আমি গরীব, তোমরা ব্রাহ্মণ আমি কায়েত কোন বিষয়ে তোমাদের আমি!!'

চতুর্দশ অধ্যায় – আর সে কাল নেই

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ধনুকধারী গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিল। সে স্থানে এক ব্রাহ্মণ কুমারের সহিত দেখা হইল। ব্রাহ্মণ বলিল,—'কি হে ধনুকধারী! বিরসবদন কেন?'

ধনুকধারী উত্তর করিল,—'তোমার কি?'

ব্রাহ্মণ বলিল,—'ইস! কেউটে সাপ! তোমার পিসেমহাশয় আমাদের দেখিলে জোড়হাতে প্রণাম করেন। তুমি মেজাজ গরম করিয়া থাক। ভ্রূক্ষেপ কর না।'

ধনুকধারী উত্তর করিল,—'যাও যাও! আর সে কাল নাই। কলিকাতায় সভা হইয়াছে। এখন আর কায়স্থ নয়, বাছাধন! এখন ক্ষত্রিয়। গলায় এখন এই—সকলেই এখন পরিতেছে।'

ব্রাহ্মণ বলিল,—'যাহাদের গলায় সূতা গাছটা আছে, ভজকট ভাবিয়া তাহারা ফেলিয়া দিতেছে। যাহাদের নাই, তাহারা ইহার জন্য লালায়িত হইয়াছে। পৃথিবীর রহস্য কিছু বুঝিতে পারা যায় না। সে যাহা হউক, তোমার পিসেমহাশয় বড়াল। বড়াল কি কখনও কায়স্থ হয়?'

ধনুকধারী উত্তর করিল,—'বড়াল নহে, বটব্যাল। লোকে বড়াল বলে। বটব্যাল একটা গ্রামের নাম! তোমাদের যেমন খড়দহ। সেই গ্রামের নাম হইতে পিসেমহাশয়ের পদবী হইয়াছে। বড়াল ব্রাহ্মণ আছে, কায়স্থও আছে।'

ব্রাহ্মণ বলিল,—'তা যেন হইল, কিন্তু ব্রাহ্মণ দেখিয়া প্রণাম করিবে না কেন?'

ধনুকধারী উত্তর করিল,—'সে এখন উঠিয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ আমি দত্ত। দত্ত কাহারও ভৃত্য নহে। কায়স্থ, নামের পূর্ব্বে আর 'দাস' লিখিবে না। দাস ঘোষ, দাস বোস, এ সব এখন উঠিয়া যাইবে। আমরা রামের জাতি, কৃষ্ণের জাতি, তোমাদিগকে এখন আমাদের পায়ে—না, আর অধিক কথার প্রয়োজন নাই, সেকেলে গোঁড়ারা রাগ করিবে।'

এই বলিয়া ধনুকধারী গজ্ গজ্ করিতে করিতে সেস্থান হইতে চলিয়া গেল।

ছবি অঙ্কন শেষ হইল। বিনয় কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন। রায়ণী সুবালার কাকাকে পত্র লিখিলেন,—'আমার ছবি আঁকিতে বিনয় বলিয়া যে ছেলেটি আসিয়াছিল, সে অতি ভাল ছেলে। তাহার রূপে ও গুণে মুগ্ধ হইয়াছি। কিন্তু তোমাদের কিরূপ বংশ, তাহার কিরূপ বংশ, সে সকল কথা আমি জানি না। তাহার মামার বাড়ী তোমাদের গ্রামে। যদি কোন আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে সুবালার সহিত তাহার সম্বন্ধ হয় না? আমার শরীর ভাল নহে। কাসি কিছুতেই ভাল হইতেছে না। দিন দিন আমি কৃশ ও দুর্বল হইয়া পড়িতেছি। কোন একটি ভাল ছেলের হাতে সুবালাকে সমর্পণ করিয়া যাইতে পারিলে আমি সুখে মরিতে পারি।'

বাস্তবিক রায়ণীর শরীরের অবস্থা দিন দিন মন্দ হইতে মন্দতর হইতে লাগিল। ডাক্তারে বলিল যে, তাঁহার ক্ষয়কাস হইয়াছে, তবে আশু বিপদের আশঙ্কা নাই।

বড়ালমহাশয়ের প্রাণ উড়িয়া গেল। কিরূপে আর দুইটা বৎসর বাঁচাইয়া রাখিবেন, সেজন্য তিনি ভাবিত হইলেন। ডাক্তারদিগের নিকট অনেক মিনতি করিলেন। ডাক্তারগণ বলিল,—'ভগবান ভিন্ন মানুষের কেহ প্রাণ দিতে পারে না। দুই বৎসর দূরে থাকুক, একদিনের জন্য কেহ কাহারও পরমায়ু বৃদ্ধি করিতে পারে না। কোন কোন রোগে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া বড়জোর ঘণ্টা কয়েক মানুষকে জীবিত রাখিতে পারা যায়, কিন্তু তাহাও সন্দেহ।'

রায়-গৃহিণীর প্রথম ডাক্তারী চিকিৎসা হইল। কোন ফল হইল না। তাহার পর হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা হইল, কিছুই হইল না। অবশেষে কবিরাজী চিকিৎসা হইল। কলিকাতা হইতে অনেক বৈদ্য আসিলেন। রোগীকে তাঁহারা ঝুড়ি ঝুড়ি রংকরা কুইনাইনের বড়ি খাওয়াইলেন। বাঘিনীর দুগ্ধ, গণ্ডারের পিত্ত প্রভৃতি অনেক প্রকার সুলভ অনুমানের ব্যবস্থা করিলেন। বড়ালমহাশয় প্রাণপণে সে সমুদয় বস্তু আহরণ করিলেন। অবশেষে একজন বড় কবিরাজ আসিয়া বলিলেন,—'যদি কুম্ভীরের মাথার চুলের সাত শত একান্নটি উকুণ আনাইতে পারেন, তাহা হইলে রোগীণীকে আমি রোগ হইতে মুক্ত করতে পারি।'

বড়ালমহাশয় এইবার পরাস্ত হইলেন। সে বস্তু তিনি আনিতে পারিলেন না। এরূপ অনায়াসলভ্য দ্রব্য যদি না আনাইতে পারিলেন, তাহা হইলে রোগিণী কি করিয়া ভাল হইবেন!

সুবালার কাকামহাশয় রায়-গৃহিণীর পত্র পাইলেন। বিনয়ের বংশপরিচয় কাকামহাশয় প্রথম হইতেই অবগত ছিলেন। কুলমর্যাদা সম্বন্ধে দুই বংশে আদান-প্রদান হইতে পারে। বিনয়ের পিতা সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি। মায়ের বাড়ীর কল্যাণে সুবালা নগদ টাকা ও ভূসম্পত্তির অধিকারিণী হইবেন। তাহার পর, বিনয় পিতামাতার একমাত্র পুত্র। সুবালা সম্বন্ধে অনেক দিন হইতেই লোকে তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়াছিল। এই কথা তাঁহাকে ও সুবালাকে অনেকে তামাসা করিয়াছিল। বিনয় যাহাতে সন্তোষ লাভ করেন, তাঁহার পিতা-মাতা নিশ্চয় তাহা করিবেন। সুবালার কাকামহাশয় মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া কথাবার্তা আরম্ভ করিলেন।

সৌভাগ্যক্রমে বিনয়ের মাতা সেই সময় পিত্রালয়ে ছিলেন। প্রথম স্ত্রীলোকে কথার সূচনা হইল। বিনয়ের মাতা সম্মত হইলেন।

তাহার পর কাকামহাশয় বিনয়ের পিতার নিকট গমন করিলেন। তিনিও এ বিবাহে সম্মত হইলেন। কথা হইয়া থাকিবে কিন্তু কেন সুবালার এখন বিবাহ হইবে না, সে সমুদয় বৃত্তান্ত কাকামহাশয় বিনয়ের পিতাকে প্রদান করিলেন। কথাবার্তার সময় কাকামহাশয় সুবালার পিতার নাম করিলেন। সুবালার পিতা কে, সে সম্বন্ধে অধিক পরিচয় দিতে হইল না।

বিবাহের সম্বন্ধের সময় কেহ আর কন্যার মায়ের, মায়ের ভগিনীর পরিচয় প্রদান করেন না। রায়মহাশয় সুবালার মায়ের মেসো ছিলেন, সুবালার সহিত তাঁহার অন্য কোন নিকট সম্বন্ধ ছিল না। সেজন্য বিবাহের কথাবার্তার সময় রায়মহাশয়ের নাম পর্যন্ত কেহ উল্লেখ করিল না। সুবালা যে রায়মহাশয়ের সম্পত্তির যে উত্তরাধিকারিণী হইবেন, এ কথার বিন্দুবিসর্গ বিনয়ের পিতা জানিতে পারিলেন না। তিনি কেবল এইমাত্র শুনিলেন যে, কন্যার মাতার মাসীর ভূসম্পত্তি আছে। কন্যা সেই সম্পত্তির অধিকারিণী হইবেন। কন্যা মায়ের মাসীর নিকট থাকেন। বিনয়ের পিতা-মাতা সম্মত হইলেন। দুই বৎসর পরে, অর্থাৎ সুবালার বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বৎসর পূর্ণ হইলে বিবাহ হইবে। এখন কথা স্থির হইয়া রহিল। দুই পক্ষই এইরূপ সত্য করিলেন।

লোক-পরম্পরায় বিবাহের কথা ক্রমে সুবালার কানে উঠিল, বিনয়েরও কানে উঠিল। বলা বাহুল্য যে, দুইজনেই আহ্লাদিত হইলেন।

সুবালা ভাবিলেন,—'বিনয়কে দেখিয়া আমি কি করিয়া লজ্জা করিব? আমি যেন এ কথা শুনি নাই, সেইভাবে বিনয়ের সহিত কথোপকথন করিব।'

বিনয় ভাবিলেন,—'সুবালাকে যদি কেহ এ কথা এখনও না বলে, তাহা ভাল হয়। এ কথা শুনিলে সুবালা হয় তো আর আমার সহিত ভাল করিয়া কথা কহিবে না। যাহা হউক, আমি এ বিষয়ের বিন্দুমাত্র উল্লেখ করিব না।'

'বিবাহের কথা যেন আমি শুনি নাই, এইভাবে বিনয়ের সহিত আমি কথা কহিব,—সুবালা মনে মনে এইরূপ স্থির করিলেন বটে, কিন্তু কাজে তিনি তাহা করিতে পারিলেন না। স্বভাবতঃ লজ্জাশীলা স্ত্রীলোকের লজ্জা আপনা হইতে আসিয়া পড়ে। বিনয়ের সহিত তিনি কথোপকথন করিতেন বটে, কিন্তু মুখ তুলিয়া আর বড় চাহিতে পারিতেন না। একপ্রকার লজ্জিত, কুণ্ঠিত, শঙ্কিতভাবে তিনি বিনয়ের সহিত কথা কহিতেন।

ক্ষয়কাস! দ্রুতবেগে রায়-গৃহিণীর পীড়া বৃদ্ধি হইল না বটে, কিন্তু শুষ্ক হইয়া দেহ তাঁহার অস্থিচর্ম সার হইয়া পড়িল।

প্রায় দুই বৎসর কাটিয়া গেল। এ বৎসর শ্রাবণ মাসের ২০শে রোগিণীর বয়ঃক্রম পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইবে। আষাঢ় মাস পড়িল। আর দুইটা মাস! দুইটা মাস কেন,—একমাস কুড়ি দিন। এতদিন কাটিয়াছে; এই কয়টা দিন কি আর কাটিবে না?'

কিন্তু বর্ষা-আরম্ভে রায়-গৃহিণী ফুলিয়া পড়িলেন। উদরের দোষও হইল। শ্রাবণ মাসের ২০শে পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিবেন কি না,—ডাক্তার-বৈদ্য কেহই নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিল না।

বড়ালমহাশয় ও রায়-গৃহিণী দুইজনে পরামর্শ করিয়া এবার সকাল সকাল সুবালাকে কাকার বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। সুবালা কিছুতেই যাইতে সম্মত হন নাই। 'দিদিমণির এমন অসুখ, কি করিয়া এ অবস্থায় তাঁহাকে আমি ফেলিয়া যাইব',—এই বলিয়া সুবালা কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু রায়-গৃহিণী তাঁহার কথা শুনিলেন না। 'তুমি সেখানে না গেলে আমার

প্রাণ সুস্থির হইবে না। মন অস্থির থাকিলে আমার পীড়া বৃদ্ধি হইবে। যদি বা কিছুদিন বাঁচিতাম, তোমার ভাবনায় তাহাও বাঁচিব না। যাও দিদি, যাও! আমার কথা অমান্য করিও না।' রায়-গৃহিণী এইরূপে তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন।

সুবালা বলিলেন,—'তোমার কথা আমি অমান্য করিব না, আমি চলিলাম। কিন্তু দিদিমণি। তোমার পীড়া যদি বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে বড়ালমহাশয় তৎক্ষণাৎ যেন আমাকে সংবাদ দেন। সংবাদ পাইলেই আমি চলিয়া আসিব।' বড়ালমহাশয় স্বীকৃত হইলেন। বিরসবদনে, ছল ছল নয়নে সুবালা খুড়ামহাশয়ের বাটীতে গমন করিলেন।

পঞ্চদশ অধ্যায় – পুনরায় উইল

রায়-গৃহিণীর অবস্থা আরও মন্দ হইল। ডাক্তার-বৈদ্যগণ হতাশ হইয়া পড়িলেন। ২০শে শ্রাবণ পর্যন্ত তিনি যে বাঁচিয়া থাকিবেন, সে সম্বন্ধে বিলক্ষণ সন্দেহ হইল।

এই সময় গ্রামের লোকের আর একটি বিপদ উপস্থিত হইল। এই দুর্ভাগ্য গ্রামের লোকের কি কপাল! বিধাতা কি ইহাদিগকে সুস্থির হইয়া কালযাপন করিতে দিবেন না? প্রথম খাঁদা ভূতের জ্বালায় কয়েক বৎসর লোক জর্জ্জরিত হইল।

রাত্রি দুই প্রহরের সময় তাহার ভয়াবহ হুহুঙ্কার রবে লোকের পেটের প্লীহা চমকিত হইল। তাহার পর শাঁকচুন্নি! একটা নহে দুইটা,—একজোড়া। লক্ লক্ জিহ্বায় কাহাকে খাই, কাহাকে খাই করিয়া কিছুদিন গ্রামের লোককে উৎপীড়িত করিল। শাঁকচুন্নির উপদ্রবের সময় শঙ্করা আরও দুই তিন বার দূর হইতে তাহাদিগকে দেখিয়াছিল এবং শঙ্করাই গ্রামের লোককে শাঁকচুন্নির আকৃতি-প্রকৃতির পরিচয় দিয়াছিল। অতি কষ্টে এই দুই বিপদ হইতে লোক পরিত্রাণ পাইল।

এখন আবার এক নূতন বিভীষিকা উপস্থিত হইল। একদিন প্রাতঃকালে যুধিষ্ঠির ঘোষের পঞ্চমবর্ষীয় পুত্র হেরম্ব, পথে একটি নেকড়ার অর্থাৎ ছিন্নবস্ত্রের পুঁটুলি মাড়াইয়া ফেলিল। পথে তিনটি পুঁটুলি পড়িয়াছিল। যে-সে পথ নহে, তিন মাথার পথ, অর্থাৎ তিনটি গ্রাম্য পথ এই স্থান হইতে তিন দিকে গিয়াছিল। তেমাথা পথের ঠিক সন্ধিস্থলে পুঁটুলি তিনটি পড়িয়াছিল। লোকে ভাবিয়া দেখিল যে, গত রাত্রি শনিবারের রাত্রি ছিল। গ্রামের বিজ্ঞ লোকেরা আসিয়া পুঁটুলি তিনটি দূর হইতে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল। ভয়ে তাহারা হতভম্ব অবাক্ হইয়া রহিল! বলিবে আর ছাইভস্ম কি! এ ঘোর সর্বনাশের কথা বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারা যায় না। সেজন্য অতি গম্ভীরভাবে দুই চারি বার ঘাড় নাড়িয়া তাহারা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল।

কিন্তু গ্রামের লোক নির্বোধ নহে। বুঝিতে আর কিছু বাকি রহিল না। উহাকে তুক্ বা গুণ বলে। অতি সাংঘাতিক তুক্! এ তুক্ মাড়াইলে বা ডিঙ্গাইলে আর রক্ষা নাই। গ্রামের লোকের এরূপ সর্বনাশ কে করিয়াছে, তাহাও কি আর বুঝিতে বাকী থাকে? কাহার অনেক টাকা আছে? মরণাপন্ন-রোগগ্রস্ত হইয়া কে বিছানায় পড়িয়া আছে? কে তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছে? বড়ালমহাশয়কে সকলে ছি ছি করিতে লাগিল।

দূর হইতে পুঁটুলি তিনটির উপর অনেক শুষ্ক খড় নিক্ষেপ করিয়া অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করা হইল। তাহা যেন হইল। কিন্তু যুধিষ্ঠির ঘোষের পুত্র হেরম্ব পুঁটুলির উপর যে পা রাখিয়াছিল, এখন তাহার উপায় কি? সকলে বলিল যে, সে আর কিছুতেই রক্ষা পাইবে না! তাহার পিতামহী, তাহার মাতা, তাহার জ্যেঠাই-মা, তাহার খুড়ী-মা সকলে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। গ্রামের অন্যান্য স্ত্রীলোকও আসিয়া সেই ক্রন্দনে যোগদান করিল। ক্রন্দনের কোলাহলে গ্রাম পরিপূর্ণ হইল। বালক হেরম্ব তৎক্ষণাৎ শয্যাশায়ী হইয়া পড়িল। মুখ দিয়া তাহার কথা বাহির হয় না, দেখিতে দেখিতে সে দুর্বল হইয়া পড়িল। রোগ নহে যে, ডাক্তার-বৈদ্য আসিয়া চিকিৎসা করিবে। যুধিষ্ঠির ঘোষ মাথায় হাত দিয়া হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িল।

ভাগ্যে গ্রামে গৌরবিণী নামে এক বৃদ্ধা তিওরণী ছিল। সেকালে যখন ডাইনীর উপদ্রব অতিশয় প্রবল ছিল, তখন গৌরবিণী তাহার দিদিমায়ের নিকট হইতে অনেকগুলি আড়াই অক্ষরের মন্ত্র ও অনেকগুলি ঔষধ শিখিয়া রাখিয়াছিল। তুকের জনরব ও কান্নার রোল শুনিয়া লাঠি ধরিয়া ঠুক্ ঠুক্ করিতে করিতে গুড়ি গুড়ি গৌরবিণী বুড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। 'ভয় নাই, ভয় নাই, আমি ছেলেকে বাঁচাইব', এই বলিয়া সকলকে সে আশ্বাস প্রদান করিল। তাহার পর হেরম্বর নিকটে বসিয়া সে ঝাড়-ফু আরম্ভ করিল। মন্ত্র ও ফুৎকারের প্রভাবে বালক উঠিয়া বসিল।

গৌরবিণী বলিল যে, রাম-কবচের কর্ম নহে। এ ভূত নহে যে রাম-কবচকে ভয় করিবে। ইহাকে যাদু বলে। অবশেষে সে ঔষধসম্বলিত একটি নেকড়ার পুঁটুলি অর্থাৎ মাদুলি বালকের গলায় পরাইয়া দিল। তাহা পরিধান করিয়া বালক সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইল। গ্রামের লোক ভাবিল যে, গৌরবিণী অসাধ্য সাধন করিল, বলিতে গেলে মরা মানুষকে প্রাণদান করিল। সকলে তাহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। গৌরবিণীর আরও সুখ্যাতি এই জন্য হইল যে, মন্ত্র অথবা ঔষধের মূল্যস্বরূপ কাহারও নিকট হইতে সে একটি কপর্দকও গ্রহণ করে না। তবে কি জান যে, যে গাছের শিকড় ঔষধ স্বরূপ ব্যবহৃত হয়, সে গাছকে প্রথমে জানান্ দিতে হয়। পূর্ব রাত্রিতে সে গাছের মূলে পাঁচটি পয়সা, পাঁচ সের ধান, পাঁচ গণ্ডা পান, পাঁচ গণ্ডা সুপারি ও পাঁচ গণ্ডা বিচালি বা খড়ের আঁটি রাখিয়া আসিতে হয়।

গৌরবিণী বলিল,—'এবার আমি অনেক কষ্টে শিকড় পাইয়াছি। কিন্তু আজ রাত্রিতে ঐ সকল দ্রব্য সেই গাছের গোড়ায় রাখিতে হইবে। যদি না রাখি, তাহা হইলে ভবিষ্যতে আর আমি কখনও ঔষধ পাইব না। শিকড় দূরে থাকুক গাছটি পর্যন্ত অদৃশ্য হইয়া যাইবে।' পুত্রের প্রাণ পাইয়া যুধিষ্ঠির ঘোষ আহ্লাদে আটখানা হইয়াছিল। তৎক্ষণাৎ গৌরবিণীকে সে ঐ সকল দ্রব্য প্রদান করিল। গৌরবিণীর একটি গাই গরু ছিল।

তুক্ ক্ষান্ত হইল না। বুধবার দিন প্রাতঃকালে সকলে দেখিল যে, গ্রামের কোন পথে কতকগুলি ছেঁড়া চুল, কোন পথে সিন্দুর, কোন পথে কাণা-কড়ি পড়িয়া আছে। দুর্বৃত্ত যাদুকর মঙ্গলবার রাত্রিতে এইরূপ গুণ করিয়াছিল। গ্রামের লোক অতি সাবধানে সে

সমুদয় তুক্ পোড়াইয়া ফেলিল। এখানে পা ফেলিয়া, সেখানে পা ফেলিয়া, অতি সন্তর্পণে সকলে পথ চলিতে লাগিল। ফলকথা, এ গ্রামে বাস করা লোকের পক্ষে ভার হইয়া উঠিল। যাঁহারা এ সর্বনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা বড়লোক। ভয়ে কোন কথা কেহ তাহাদিগকে বলিতে পারিল না। কি কুক্ষণে যে এ গ্রামে রায়মহাশয় ও তাঁহার গৃহিণী পদার্পণ করিয়াছিলেন, সকলে তাহাই ভাবিতে লাগিল।

সকলে আরও বলিল যে, সুবালা দিদি এখানে থাকিলে আমাদের উপর এরূপ অত্যাচার হইত না। নিশ্চয় তিনি আমাদের দুঃখ দূর করিতেন। কত আর সতর্ক হইয়া লোক পথ চলিতে পারে? একদিন না একদিন কেহ-না কেহ গুণের উপর পা ফেলিয়া বসিবে, অথবা গুণকে ডিঙ্গাইয়া যাইবে।

সেই আশঙ্কায় লোক অস্থির হইয়া পড়িল। যাহাদের উপায় ছিল, তাহারা আপন আপন পুত্র-কন্যাদিগকে মাতুলালয়ে অথবা অন্য আত্মীয়স্বজনের নিকট পাঠাইয়া দিল। কিন্তু যাহাদের সে উপায় নাই, তাহারা করে কি? এই দুঃসময়ে গৌরবিণী তাহাদিগকে রক্ষা করিল। গৌরবিণী বলিল যে, যেমন তুক্তাক্ গুণ-জ্ঞান হউক না কেন তাহারা সেই নেকড়ার পুঁটুলি অর্থাৎ মাদুলি গলায় পরিধান করিয়া সে তুক্ মাড়াইলে অথবা ডিঙ্গাইলে কিছুমাত্র অনিষ্ট হইবে না। তাহা শুনিয়া লোকের প্রাণ অনেকটা সুস্থির হইল। প্রাণ আগে না পয়সা আগে। অতি দিন দুঃখীও এক একটি মাদুলির জন্য পাঁচটি পয়সা, পাঁচ সের ধান্য, পাঁচ গণ্ডা পান, পাঁচ গণ্ডা সুপারি ও পাঁচ গণ্ডা বিচালির আঁটি জানান্ দিতে লাগিল। পয়সা, ধান প্রভৃতির কথা যাউক, গৌরবিণীর জনমে য়াহা হয় নাই, এবার তাহা হইল। তাহার বৃহৎ একটি খড়ের গাদা হইল।

বৃদ্ধা হইয়াছিল বটে, কিন্তু গৌরবিণীর দাঁত পড়িয়া যায় নাই। অনায়াসে পান চিবাইতে পারিত। এক্ষণে রাত্রিদিন পান খাইয়া সর্বদাই সে মুখ রাঙা করিয়া রাখিত। একগাল পান চিবাইতে চিবাইতে প্রফুল্লবদনে যখন সে বিনামূল্যে লোকদিগকে ঔষধ বিতরণ করিত, তখন তাহার সেই রক্তবর্ণে রঞ্জিত মুখ দেখিয়া লোকের মন ভক্তিরসে ভিজিয়া যাইত। রাত্রিতে উঠিয়া নিকটস্থ অন্যান্য গ্রামে গৌরবিণী ঔষধ তুলিতে যাইত। সেই সময় হইতে সে গ্রামেও তুক্ আরম্ভ হইত।

কাজেই অন্যান্য গ্রামের লোকও আসিয়া গৌরবিণীর নিকট হইতে ঔষধ করিত। অন্যান্য গ্রামেও এই সুযোগে পুরুষ-চিকিৎসক ও স্ত্রী-চিকিৎসকের আবির্ভাব হইল। গৌরবিণীর ন্যায় তাহারাও বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করিতে লাগিল। কিন্তু ততদূর পসার-প্রতিপত্তি আর কাহারও হইল না।

গ্রামে মাতুঠাকুরাণী অর্থাৎ মাতঙ্গিনী নামে এক বিধবা ব্রাহ্মণী বাস করে। তাঁহার কয়েক বিঘা ভূমি আছে। ভাগে দিয়া তাহা হইতে সে ধান্য লাভ করেন, তাহাতে সুখে-স্বাচ্ছন্দে তাঁহার দিন কাটিয়া যায়। সেজন্য মাতাকে তিনি বড় ভয় করেন। তামাসা করিয়া কেহ তাঁহাকে 'দর' বলিলে আর রক্ষা থাকে না।

গালি দিয়া সে লোকের তিনি প্রাণান্ত করেন। একদিন প্রাতঃকালে তিনি উঠিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার দ্বারে একটি শুষ্ক শুভ্রকর্ণের গরুর মাথা পড়িয়া রহিয়াছে। সর্বনাশ! মাথায় আবার সিন্দুর! গ্রামের লোক দলে দলে আসিয়া তাঁহার দ্বারে দাঁড়াইল। কিন্তু এ যে কিরূপ গুণ, কেহ তাহা ভাল বুঝিতে পারিল না। অবশেষে ধনুকধারী আসিয়া ইহার প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া দিল।

ধনুকধারী বলিল,—'এই যে তুক্‌টি তোমরা দেখিতেছ, এ ঘোর সর্বনাশের তুক্, এ যে-সে তুক্ নহে। হাঁ করিয়া গরুর মুখ বাড়ীর দিকে রহিয়াছে। এই বাড়ীতে গরু ঘাস-জল খাইবে, অর্থাৎ এই বাড়ীর লোকের পরমায়ু সে ভক্ষণ করিবে।' এই কথা শুনিয়া মাতুঠাকুরাণীর মুখ ভয়ে শুষ্ক হইয়া গেল। তিনি বলিলেন,—'তাই তো বলি যে, কাল রাত্রি হইতে আমার পেট হুটপাট করে কেন! ঐ গো-ভূত আমার পেটের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে।

শিশু বাছুরের ন্যায় আমার পেটের ভিতর সে ছুটাছুটি করিতেছে। গরুতে যেরূপ ঘাস ছিঁড়িয়া খায়, আমার পেটের ভিতর নাড়ী-ভুঁড়ি সে সেইরূপ ছিঁড়িয়া খাইতেছে।' বলা বাহুল্য যে, বিধবার ঘোরতর ত্রাস হইল। তাঁহার গালাগালির শব্দে কয়েক দিন গ্রাম কম্পিত ও স্ফাটিত হইতে লাগিল। যাহা হউক, গৌরবিণী তাঁহাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিল।

কিন্তু তিনটি নেক্‌ড়ার মালা তাঁহাকে গলায় পরিধান করিতে হইল। ধনুকধারী আসিয়া যখন সে স্থানে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, তখন সকলে দেখিল যে, তাহার হাতে ও কাপড়ে সিন্দুর লাগিয়াছে। তাহা দেখিয়া সকলে বুঝিতে পারিল। বড়ালমহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া, আঙ্গুল মটকাইয়া, আকাশের দিকে চাহিয়া, বিধবা রাত্রিদিন গালি দিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া বড়ালনী একদিন তাঁহার সহিত ঝগড়া করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু মহারথী কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া নকুলের যে দশা হইয়াছিল, তাঁহারও তাহাই হইল। রণে ভঙ্গ দিয়া অবিলম্বে তাঁহাকে পলায়ন করিতে হইল। গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা গলায় বড় বড় নেকড়ার পুঁটুলি পরিধান করিল। কিছুদিন গ্রামের লোকের গলদেশ অপূর্ব শোভা ধারণ করিল।

গ্রামে নানারূপ তুক্ হইতে লাগিল। তুকের ভাব ক্রমে অধিকতর ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। গ্রামের লোক ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। একদিন প্রাতঃকালে সকলে দেখিল যে, অনেকের দ্বারে তিনটি করিয়া গোবরের পুত্তলিকা পড়িয়া আছে। পুত্তলিকাগুলির কপালে সিঁন্দুর ছিল, যেন বলিদানের নিমিত্ত উৎসর্গ করা হইয়াছিল। তাহার পর তাহাদের গলদেশ কর্ত্তিত হইয়াছিল। গলা-কাটা পুত্তলি দেখিয়া গ্রামের লোকের প্রাণ উড়িয়া গেল। সকলে ভাবিল যে, তাহাদের প্রাণ-পুত্তলির গলদেশ এইরূপে কর্তিত হইবে এবং তাহাদের পরমায়ু লইয়া রায়-গৃহিণীকে প্রদান করা হইবে।

অমাবস্যা আসিল। দৈবক্রমে সেইদিন শনিবার পড়িল। অতি সাংঘাতিক দিন। গ্রামে

গ্রামে সেদিন হুলস্থূল পড়িয়া গেল। জনরব উঠিল যে, সেইদিন বড় বাড়ীর লোকেরা নিশাজাগরণ করিবে, অর্থাৎ সন্ধ্যার পর কালীর প্রতিমা সদ্য গড়িয়া তাঁহার পূজা করিবে। তাহার পর শিবাবলি প্রদত্ত হইবে। ছাগমাংস, কলামাংস, মহামাংস ভক্ষণ করিয়া, শৃগাল-শৃগালীগণ সম্মুখের দুই পা তুলিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে থাকিবে। অবশেষে একটি ডাব-নারিকেল ছুলিয়া তাহার মুখ টাকার ন্যায় চক্রকার করিয়া কাটিতে হইবে। টাকার ন্যায় খোলার কিয়দংশ এরূপ ভাবে নারিকেলের সহিত সংলগ্ন হইয়া থাকিবে, যেন বাক্সর ডালার মত তাহাতে খুলিতে বন্ধ করিতে পারা যায়। রাত্রি দুই প্রহরের সময় রায়গৃহিণীর যাদুকর সেই নারিকেলটি লইয়া গ্রামবাসীদিগের দ্বারে আসিয়া তিনবার ডাক দিবে,—'শশধর! শশধর! শশধর!' শশধর যদি উত্তর প্রদান করে, তাহা হইলে, তাহার প্রাণ তৎক্ষণাৎ নারিকেলের মুখ বন্ধ করিয়া দিবে। সেই নারিকেলের জল রায়-গৃহিণী পান করিলে তিনি রোগ হইতে মুক্ত হইবেন। কিন্তু যে লোক উত্তর দিবে, তাহার প্রাণ বিনষ্ট হইবে। তিন ডাকে শশধর উত্তর প্রদান না করে তাহা হইলে গুণী ব্যক্তি হলধরের দ্বারে গিয়া ডাক দিবে। হলধর যদি উত্তর না প্রদান করে, তাহা হইলে গদাধরের বাড়ী যাইবে। গুণী ব্যক্তি এইরূপে সমস্ত রাত্রি লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিবে। আতঙ্কে গ্রামবাসীদিগের মন কম্পিত হইল। কি উপায়ে এই বিষম বিপদ হইতে প্রাণরক্ষা করি, তাহা ভাবিয়া সকলের মন আকুল হইল। সে রাত্রি গ্রামের সমস্ত লোক ছেলেপুলে লইয়া প্রদীপ জ্বালাইয়া বসিয়া কাটাইল। গ্রামের লোক সতর্ক হইয়াছে, কেহই উত্তর দিবে না, এইরূপ ভাবিয়া বোধ হয় বড় বাড়ীর লোক নিশাজাগরণ করিতে আগমন করিল না। অতিকষ্টে গ্রামবাসীদিগের প্রাণরক্ষা হইল।

রায়-গৃহিণীর কিন্তু কোন উপকার হইল না। কাশি, উদরাময় ও শোথ ব্যতীত তাঁহার শরীরের নানাস্থানে ক্ষত হইল। বড়ালমহাশয় ভাবিলেন যে, বিছানায় ক্রমাগত শয়ন করিয়া এইরূপ ক্ষত হইয়াছে। কিন্তু সে ক্ষত শুষ্ক হইল না। বড়ালমহাশয় হতাশ হইয়া পড়িলেন। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া অবশেষে তিনি কলিকাতা গমন করিলেন। সে স্থান হইতে ভাল একজন চিকিৎসক আনিলে ইনি পাশ করা ডাক্তার নহেন, ইহার বয়স অধিক হয় নাই। কিন্তু বড়ালমহাশয় সকলকে বলিলেন যে, চিকিৎসা সম্বন্ধে ইঁহার—অসাধারণ ক্ষমতা।

বাস্তবিক যেদিন হইতে ইনি চিকিৎসা আরম্ভ কবিলেন, সেইদিন হইতে রোগিণী অনেকটা সুস্থ বোধ করিতে লাগিলেন। বড়ালমহাশয়, বড়ালমহাশয়ের স্ত্রী, ধনুকধারী ও নূতন চিকিৎসক, এই কয় ব্যক্তি ব্যতীত অন্য লোককে রোগিণী তাঁহার কাছে আসিতে দিতেন না। তিনি বলিলেন,—'আমি দুর্বল হইয়াছি, কথা কহিতে আমার কষ্ট বোধ হয়। পাঁচজনে আসিলেই দুই একটা কথা কহিতে হয়, তাহাতে আমার অসুখ বৃদ্ধি হয়। আমার পীড়া হইয়াছে, ঘরে রথ-দোল হয় নাই যে, পুঞ্জ পুঞ্জ লোক দেখিতে আসিবে।'

উপরিউক্ত কয়জন রোগিণী সেবা করিতেন। তিনি কেমন আছেন, সে সংবাদ বাহিরের

লোক তাঁহাদের নিকট হইতেই পাইত।

দিনের পর দিন ধীরে ধীরে অতিবাহিত হইতে লাগিল। ১৫ই শ্রাবণ আসিল ও গেল, ১৬ই শ্রাবণ গেল আর গোটা কয়েক দিন। তাহা হইলেই সকলেরই মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হয়। ১৮ই শ্রাবণ হইতে চিকিৎসক এক প্রকার নূতন ধরণের চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। সেই চিকিৎসায় প্রতিদিন দুই মণ বরফের আবশ্যক। প্রতিদিন কলিকাতা হইতে দুই মণ বরফ আসিতে লাগিল।

এই সময় বড়ালমহাশয় বিজয়বাবুকে পত্র লিখিলেন,—'আপনার জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাইচরণ রায় মহাশয় কিরূপ উইল করিয়া গিয়াছেন, তাহা আপনি অবগত আছেন। আগামী ২০শে শ্রাবণ আপনার ভ্রাতৃজায়ার বয়ঃক্রম পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইবে তাহার পরদিন অর্থাৎ ২১শে শ্রাবণ তিনি উইল করিবেন। পাছে পরে কোন আপত্তি হয়, সেজন্য রায়মহাশয় পূর্ব হইতে আপনাকে সংবাদ দিতে বলিয়া গিয়াছেন। আপনি নিজে অথবা আপনার নিয়োজিত কোন লোক সেই সময় উপস্থিত থাকেন, আপনার ভ্রাতা সেইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেজন্য আপনাকে সংবাদ দিলাম।' — ২০শে শ্রাবণ আসিল। রায়-গৃহিণীর বয়স পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইল। আনন্দের আর সীমা রহিল না। বড়ালমহাশয় ধূমধাম করিয়া গ্রাম্য দেবতার পূজা দিলেন। গ্রামের ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য লোকদিগকে সমারোহের সহিত ভোজন করাইলেন। 'এ আনন্দের দিন দিদিমণি তুমি আমাকে লইয়া গেলে না,' এই বলিয়া সুবালা খেদ করিয়া রায়-গৃহিণীকে পত্র লিখিলেন।

কলিকাতা হইতে বিজয়বাবু নিজে আসিলেন না, আপনার উকিলকে পাঠাইয়া দিলেন। বড়ালমহাশয়কে তিনি লিখিলেন,—'ঐ সম্পত্তিতে আমার প্রয়োজন নাই। বড় বধূ-ঠাকুরাণী যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে প্রদান করুন। আমি কিছুমাত্র গোল করিব না। কেবল কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া আমি আমার উকিলকে প্রেরণ করিলাম।'

বিজয়বাবু যে নিজে আসিবেন না, বড়ালমহাশয় তাহা বুঝিয়াছিলেন। তিনি আসিবেন জানিলে, বড়ালমহাশয় বোধ হয় তাঁহাকে আহ্বান করিতেন না।

যাহা হউক, ২১শে শ্রাবণ রায়-গৃহিণী উইল করিলেন। বড়ালমহাশয়, উকিল ও বিজয়বাবুর উকিল, এই কয়জন সে স্থানে উপস্থিত ছিলেন। ধনুকধারী ব্যতীত আর সকলে উইল সাক্ষী হইলেন।

নতুন চিকিৎসার গুণে রোগিণী কয়দিনে বিশেষরূপে ফললাভ করিয়াছিলেন। ক্ষয়কাস ও উদরাময় রোগে এতদিন যে তিনি ভুগিতেছিলেন, মুখশ্রী দেখিয়া তাহা বোধ হইল না। তবে অনেক দিন রোগে ভুলিলে যাহা হয়,—তিনি খিটখিটে ও রাগী হইয়াছিলেন। উইল করিবার সময় চিকিৎসকের আজ্ঞায় ধকুনধারী তাঁহাকে ঔষধ দিতে গেল। ঔষধে কি একটু পড়িয়াছিল। তাহা দেখিয়া ক্রোধে তিনি কাচের গেলাস ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। গেলাসটি মেজেতে ঝনাৎ শব্দে পড়িয়া শতখণ্ডে ভাঙ্গিয়া গেল। কার্য্য সমাপ্ত হইলে উকিল দুইজন একবাক্যে বলিলেন, "আপনাকে যে এরূপ সুস্থ অবস্থায় দেখিব, সে প্রত্যাশা আমরা করি

নাই। আপনি যে কঠিন রোগে কষ্ট পাইতেছেন, আপনার মুখশ্রী দেখিয়া তাহা বোধ হয় না। ভরসা করি, শীঘ্রই আপনি সম্পূর্ণভাবে আরোগ্যলাভ করিবেন।"

এই বলিয়া সকলে প্রস্থান করিলেন। রায়-গৃহিণী যে উইল করিলেন, তাহার মর্ম এইরূপ,—প্রথম। স্থাবর-অস্থাবর সমুদয় সম্পত্তির সুবালা অধিকারিণী হইবেন। দ্বিতীয়। অনেকদিন বিশ্বাসের সহিত কাজকর্ম করিয়াছেন, সেজন্য পুরস্কার-স্বরূপ বড়ালমহাশয় এক হাজার টাকা পাইবেন। তৃতীয়। যতদিন বড়ালমহাশয় জীবিত থাকিবেন, ততদিন তিনি পঞ্চাশ টাকা হিসাবে মাসিক বেতন পাইবেন। চতুর্থ। তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার কর্মে ধনুকধারী নিযুক্ত হইবে। আপাততঃ সহকারী কর্মচারিস্বরূপ ধনুকধারী কুঁড়ি টাকা বেতন পাইবে। নূতন চিকিৎসার গুণে রায়-গৃহিণী আরোগ্যলাভ করিবেন, সকলে এইরূপ আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে আশা সফল হইল না। উইল করিবার দুইদিন পরে অর্থাৎ ২৩শে শ্রাবণ সহসা তাঁহার মৃত্যু হইল। সকলে বলিল যে, "সুবালার কি সৌভাগ্য। কেবলমাত্র দুইদিন পূর্বে যদি রায়-গৃহিণীর মৃত্যু হইত, তাহা হইলে সুবালা এ সম্পত্তি পাইতেন না। সুবালাকে বিষয় দিবার নিমিত্তই যেন তিনি জীবিতা ছিলেন।"

এই দুর্ঘটনার চারিদিন পরে বড়ালমহাশয় সুবালাকে আনাইলেন। সুবালার কাকা ও বিধবা পিসী সঙ্গে আসিলেন। কাকা কলিকাতায় কর্ম করেন। তিনি নিয়ত সুবালার কাছে থাকিতে পারিলেন না। সুবালার খুড়ীমাতা ছোট ছোট পুত্র-কন্যা লইয়া ব্যস্ত। তিনি আসিতে পারিলেন না। সুবালাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত পিসীমা তাঁহার সহিত বাস করিতে লাগিলেন। বড়ালমহাশয় সমুদয় কাজকর্ম করিতেন। কাকামহাশয় মাঝে মাঝে আসিয়া তত্ত্বাবধান করিতেন।

দিদিমণির জন্য সুবালা অনেক কাঁদিলেন। দিদিমণির মৃত্যুকালে তাঁহাকে আনয়ন করা হয় নাই, সেজন্য বড়ালমহাশয়কে তিনি অনেক ভর্ৎসনা করিলেন। "দিদিমণির শেষ অবস্থায় তোমরা আমাকে তাঁহার সেবা করিতে দিলে না।"—এই কথা বলিয়া সুবালা খেদ করিতে লাগিলেন।

রায়-গৃহিণীর শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইল। বিজয়বাবুকে সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু তিনি আসিলেন না, অথবা নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার নিমিত্ত কাহাকেও প্রেরণ করিলেন না। জ্যেষ্ঠভ্রাতা রায়মহাশয়ের মৃত্যু হইলে কলিকাতায় তিনি স্বতন্ত্রভাবে শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। বড় বধূ-ঠাকুরাণীরও তিনি স্বতন্ত্রভাবে শ্রাদ্ধ করিলেন।

তাহার পর ধীরে ধীরে দিন কাটিতে লাগিল। সুবালা সমুদয় সম্পত্তির অধিকারিণী হইলেন। বিধবা পিসীমায়ের সহিত তিনি বাস করিতে লাগিলেন। কাকামহাশয় মাঝে মাঝে আসিয়া তাঁহাদিগেকে দেখিতেন শুনিতেন।

রায়মহাশয় ও রায়-গৃহিণীর পরলোকে গ্রামের লোকের আনন্দ হইল। তাহারা ভাবিল যে, ভূতে অথবা মানুষে আর আমাদিগকে উৎপীড়িত করিবে না। সুবালা লক্ষ্মীস্বরূপা দেবী। তিনি আমাদের সকল দুঃখ দূর করিবেন। রায়বাড়ীর লোকদিগের সহিত

গ্রামবাসীদিগের এখন বিলক্ষণ সদ্ভাব হইল। কিন্তু ধনুকধারীর উপর এখনও তাহাদের সম্পূর্ণ রাগ রহিল।

ষোড়শ অধ্যায় – সুবালা

পূর্ব হইতেই সুবালার গুণে গ্রামের লোক মুগ্ধ হইয়াছিল। শৈশবকাল হইতে তিনি এই গ্রামে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। সকলে তাঁহাকে জানিত, তিনিও সকলকে জানিতেন। ব্রাহ্মণ, শুদ্র, হিন্দু, মুসলমান সকল শ্রেণীর লোকের সহিত তাঁহার একটা না একটা সুবাদ সম্পর্ক ছিল। কাহাকেও দাদা, কাহাকেও দিদি, কাহাকেও মাসী বলিয়া তিনি ডাকিতেন। গ্রামের লোকও তাঁহাকে সেইরূপ সম্পর্ক ধরিয়া ডাকিত। যথাসাধ্য তিনি লোকের দুঃখ দূর করিতেন। যাহার দুঃখ দূর করিতে পারিতেন না, সুমিষ্ট কথায় তাহাকে প্রবোধ দিতেন। তাঁহার দয়ামায়া সম্বন্ধে শত শত গল্প এই গ্রামে প্রচলিত আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দুইটি ঘটনার বিষয় এ স্থানে কেবল উল্লিখিত হইল। এ সমুদয় ঘটনা রায়-গৃহিণী জীবিত থাকিতেই ঘটিয়াছিল। সকলে তাঁহার আত্মীয়, সকলে তাঁহাকে স্নেহ করে, সেজন্য সুবালা একেলা নির্ভয়ে এ-বাড়ী সে-বাড়ী করিয়া বেড়াইতেন। একদিন অপরাহ্নে তিনি গ্রামে গিয়াছিলেন। পথের পার্শ্বে সুগ্রীব চঙ্গের ঘর চিল। সুগ্রীব গরীব মানুষ, মজুরী করিয়া সে দিনপাত করে। তাহার কেবল একখানি চালাঘর। সুবালা দেখিলেন যে, সেই ঘরের দাওয়া অর্থাৎ পিঁড়ার একপার্শ্বে সুগ্রীবের স্ত্রী মায়া, ভাত রাঁধিতেছে। কিছুদূরে তাহার তিন কি চারি বৎসরের বালক ধামি হাতে করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছে। সুবালা জিজ্ঞাসা করিলেন,—'মায়া! তোমার ছেলে কাঁদিতেছে কেন?' মায়া কোন উত্তর করিল না। সুবালা নিকটে আসিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'ভুলু কাঁদিতেছে কেন, মায়া?' তবুও মায়া কোন উত্তর করিল না। সে ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল। তাহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। মাঝে মাঝে আঁচল দিয়া সে চক্ষু মুছিতে লাগিল। সুবালা জিজাসা করিলেন,—'কেন মায়া! মায়া তবুও কোন উত্তর করিল না, কেবল কাঁদিতে লাগিল। মায়ার নিকট কোন উত্তর না পাইয়া সুবালা অবশেষে বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'ভুলু! তুমি কাঁদিতেছিলে কেন? তোমার মা কাঁদিতেছে কেন?' ভুলু বলিল,—'মা আমাকে মারিয়াছে।' তাহার মা কেন কাঁদিতেছে, ভুলা তাহা জানে না, সে প্রশ্নের ভুলু কোন উত্তর দিল না। পীড়িত ও শয্যাশায়ী হইয়া সুগ্রীব ঘরের ভিতর পড়িয়াছিল। সুবালা তাহা জানিতেন না। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, সে কাজ করিতে গিয়াছিল। বসিয়া বসিয়া অতি কষ্টে সে দ্বারের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। সে বলিল,—'কাল ইহাদের কিছু হয় নাই। সেইজন্য ভুলু কাঁদিতেছে। যাও দিদি, তুমি বাড়ী যাও, তোমার এ সব কথা শুনিয়া কাজ নাই।' সুবালা জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কিছু হয় নাই, তাহার মানে কি? তুমি আমাকে সব কথা বল, না বলিলে আমি বাড়ী যাইব না।' সুগ্রীব উত্তর করিল,—'আমি মজুরী করিয়া দিনপাত করি। রোজ আনি, রোজ খাই। আজ একমাস আমি বিছানায় পড়িয়া আছি। ঘরে ঘটি-বাটি যাহা কিছু ছিল, তাহা বেচিয়া এতদিন কোনরূপে চলিতেছিল। কিন্তু কাল আর কিছু ছিল না, সেজন্য কাল আমাদের

রান্না হয় নাই।'

সুবালা জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তবে কাল তোমরা কি খাইয়াছিলে?'

সুগ্রীব উত্তর করিল,—'আমি পীড়িত। আমার আহারের বড় প্রয়োজন নাই। মায়া কাল কিছু খায় নাই। দুইটি কলমী শাক তুলিয়া ভুলুকে সে সিদ্ধ করিয়া দিয়াছিল।'

মায়া এখন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—'দিদি! আমরা সকল সহ্য করিতে পারি; কিন্তু ভুলু কাল যখন 'আমাকে ভাত দাও, আমাকে ভাত দাও' বলিয়া ক্ষুধায় চীৎকার করিতে লাগিল, তখন আমার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তখন আমি ভাবিলাম যে, এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। ছেলেটিকে বুকে লইয়া জলে গিয়া ঝাঁপ দিই।'

সুবালা জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তাহার পর আজ কি হইল?'

সুগ্রীব উত্তর করিল,—'বেচিয়া দুই পয়সা হয়, ঘরে এমন কোন দ্রব্য ছিল না। পিতল-কাঁসার সামান্য যাহা কিছু ছিল, তাহা সব ফুরাইয়া গিয়াছিল। আজ দুই প্রহরের সময় ছেলে যখন ক্ষুধায় বড় চিৎকার করিতে লাগিল, তখন আমার হঠাৎ মনে পড়িল যে, ঘরের দ্বারে এখনও কপাট-জোড়াটি আছে। কপাট-জোড়াটি করিতে আমার দুই টাকা খরচ হইয়াছিল, কিন্তু দুর্লভ বড়াই তাহার জন্য কেবল আমাকে চারি আনা পয়সা দিল। মায়া গিয়া চৌদ্দ পয়সার চাউল, এক পয়সার লবণ ও এক পয়সার মুড়ি কিনিয়া আনিল। আমাকে ও ভুলুকে সে মুড়ি কয়টি ভাগ করিয়া দিল। ভুলু মুড়ি কয়টি খাইয়া আরও চাহিল। আমার ভাগ তখন আমি খাইয়া ফেলিয়াছিলাম, সেজন্য তাহাকে দিতে পারিলাম না। ভুলু কাঁদিতে লাগিল। মায়া তাহাকে দুইটি ভিজা চাউল দিল। কাল সমস্ত দিন, তাহার পর আজ এতক্ষণ পর্যন্ত উপবাস করিয়া আছে। সে বালক! সে কি জানে! ভিজা চাউল কয়টি খাইয়া, সে আরও চাহিল। না পাইয়া কাঁদিতে লাগিল। সেজন্য মনের দুঃখে মায়া তাহাকে একটি চাপড় মারিয়াছিল।'

সুবালা জিজ্ঞাসা করিলেন,—'এ চারি আনা পয়সায় তোমাদের কয়দিন চলিবে?'

সুগ্রীব উত্তর করিল,—আজ আর কাল অতি কষ্টে চলিবে। চৌদ্দ পয়সার চাউল আমরা কিনিয়াছি। কেবল লবণ দিয়া ইহারা ভাত খাইবে।'

সুবলা জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তাহার পর কি হইবে?'

সুগ্রীব উত্তর করিল,—'ভগবান যাহা করিবেন, তাহাই হইবে।'

সুবালা আর কোন্ কথা বলিলেন না। নিজের হাতের একগাছি বালা খুলিয়া সুগ্রীবকে দিলেন। কিন্তু সে কিছুতেই লইতে চাহিল না। সে বলিল,—'তুমি ছেলেমানুষ। বাপ রে! তোমার বালা কি আমরা লইতে পারি। তাহা কখনই হইবে না।' সুবালা তাহার কথা শুনিলেন না। বালা ফেলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

কিন্তু বাড়ী গিয়া সুবালার বড় ভয় হইল। রায়-গৃহিণী তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিবেন, সেই ভয়ে তাঁহার সহিত তিনি সাক্ষাৎ করিলেন না।

সন্ধ্যার পর রায়-গৃহিণী তাঁহাকে ডাকিতে পাঠাইলেন। কাঁপিতে কাঁপিতে সুবালা

তাঁহার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। কিছু না বলিয়া তিনি রায়-গৃহিণীর গলা জড়াইয়া ধরিলেন।

অনেক আদর করিয়া সুবালা বলিলেন,—'দিদিমণি! আজ আমি এক কাজ করিয়াছি। তাহার জন্য তুমি বোধ হয় আমাকে অতিশয় বকিবে। কিন্তু আমাকে ক্ষমা করিতে হইবে। বল যে, তোমায় ক্ষমা করিলাম। তবে তোমার আমি গলা ছাড়িয়া দিব। তাহা না বলিলে তোমার গলা আমি ছাড়িয়া দিব না।'

রায়-গৃহিণী ভাল মানুষ ছিলেন না। কিন্তু পৃথিবীতে মানুষ যতই দোষী হউক না কেন, তাহার একদিকে না একদিকে একটু গুণ থাকে। রায়-গৃহিণী সুবালাকে প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসিতেন। হাসিতে হাসিতে তিনি উত্তর করিলেন,—'তুমি যে মন্দ কাজ করিয়াছ, এ কথা কখনই আমার বিশ্বাস হয় না। যে জনমে একটিও কটুবাক্য বলে নাই, জনমে যে কাহারও মনে কষ্ট প্রদান করে নাই, তাঁহাকে আবার আমি ক্ষমা কবিব কি? কি হইয়াছে দিদি! বল, নিশ্চয় আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম।'

আদ্যোপান্ত সমুদায় ঘটনা সুবালা রায়-গৃহিণীর নিকট বর্ণনা করিলেন। মূল্যবান্ সোনার বালা তিনি দিয়া আসিয়াছেন, সেই কথা শুনিয়া অঙ্গীকার সত্ত্বেও রায়-গৃহিণী গম্ভীরভাবে চুপ করিয়া রহিলেন, কোন উত্তর করিলেন না।

এমন সময় একজন দাসী আসিয়া রায়-গৃহিণীকে বলিল,—'সুবালা দিদি কোথায় বালা ফেলিয়া আসিয়াছিলেন। সুগ্রীবেব স্ত্রী মায়া তাহা দিতে আসিয়াছে।'

'তুমি তবে বালা ফিরিয়া লইবে!'—এই কথা বলিয়া সুবালা কাঁদিতে লাগিলেন। সুবালার চক্ষুর জল দেখিয়া রায়-গৃহিণী আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন,—'না দিদি! আমি বালা ফিরিয়া লইব না। আর যদি লই, তাহা হইলে মূল্য দিয়া লইব। সুগ্রীব বালা লইয়া কি করিবে? তাহাকে তো বেচিতে হইবে? আমি তাহার নিকট কিনিয়া লইব।'

এই কথা বলিয়া তিনি বড়ালমহাশয়কে ডাকিতে পাঠাইলেন। বড়ালমহাশয় আসিলে রায়-গৃহিণী তাঁহাকে বলিলেন.—সুগ্রীব চঙ্গ পীড়িত হইয়াছে। তাহাদের বড় কষ্ট হইয়াছে। আপনার হাতের বালা খুলিয়া সুবালা তাহাকে দিয়াছিল। মায়া এখন সেই বালা ফিরিয়া দিতে আসিয়াছে। মূল্য দিয়া তাহার নিকট হইতে বালা আপনি ফিরিয়া লউন।'

এই কথা বলিয়া রায়-গৃহিণী বড়ালমহাশয়কে চক্ষু টিপিয়া ইসারা করিলেন। তাহার অর্থ এই যে, যৎসামান্য কিছু দিয়া তাহাকে বিদায় করুন, বালার সম্পূর্ণ মূল্য তাহাকে দিবেন না।

সুবালা তবুও রায়-গৃহিণীর গলা ছাড়িয়া দিলেন না। আরও অধিক স্নেহের সহিত তাঁহাকে আদর করিতে লাগিলেন। 'আমার লক্ষ্মী দিদিমণি।' এই কথা বলিয়া তিনি তাঁহার বক্ষঃস্থলে আপনার মস্তক রাখিলেন।

রায়-গৃহিণী বলিলেন,—আবার কি? যাহা বলিলাম, তাহা তো শুনিলে। এখন আমার গলা ছাড়িয়া দাও।'

সুবালা উত্তর করিলেন,—'না দিদিমণি! আমার একটি নিবেদন আছে। সে কথাটিও তুমি বড়ালমহাশয়কে বলিয়া দাও, তবে তোমার গলা ছাড়িয়া দিব।'

রায়-গৃহিণী বলিলেন,—'দেখ সুবালা! এই সমুদয় বিষয় তোমার। তুমি যাহা বলিবে, তাহাই হইবে, পৃথিবীতে আমার কোন সুখ নাই। তুমিই আমার একমাত্র সুখ। আর কি চাই, বল?'

সুবালা উত্তর করিলেন,—'দেখ দিদিমণি! সুগ্রীবের শিশুপুত্রের কথা তোমাকে এইমাত্র বলিলাম। দুইদিন সে উপবাসী ছিল। ক্ষুধায় সে চীৎকার করিতেছিল। সেই সময় আমি পথ দিয়া যাইতেছিলেন। তাহাদের দুঃখের কাহিনী শুনিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। আহা! যাহারা অতি শিশু, পৃথিবীর কথা তাহারা কি জানে? ক্ষুধা পাইলেই পিতামাতার নিকট শিশু ক্রন্দন করে। মনে করে, মা আমাকে আজ খাইতে দিতেছে না কেন? এইরূপ শিশু গ্রামে উপবাস করিয়া থাকিবে, আর আমি পাঁচ ব্যঞ্জন দিয়া ভাত খাইব, তাহা হইবে না। দিদিমণি! সে ভাত আমার পক্ষে বিষতুল্য হইবে। যোড়হাতে তোমার নিকট আমি প্রার্থনা করি, দিদিমণি! বড়ালমহাশয়কে তুমি আজ্ঞা কর, আজ হইতে এই গ্রামে কেউ যেন উপবাসী না থাকে।'

এই কথা বলিতে বলিতে সুবালা রায়-গৃহিণীর গলা ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহার সম্মুখে তিনি জোড়হাত করিয়া রহিলেন। দরদর ধারায় তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। জলে পূর্ণ হইয়া তাঁহার সেই মৃদু নয়ন দুইটি উজ্জ্বল হইল। আহা স্বর্গের শোভা তখন সেই চক্ষু দুইটিতে আবির্ভূত হইল। রায়-গৃহিণীর মন যতই নিষ্ঠুর হউক না কেন, সে অলৌকিকভাব দেখিয়া তাঁহার চিত্ত বিগলিত হইল। বড়ালমহাশয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি বলিলেন,—'বড়ালমহাশয়! সুবালা যাহা বলিতেছে, তাহা আপনি করিবেন। আপনি দেখিবেন, যেন আজ হইতে এ গ্রামে কেহ উপবাসী না থাকে।'

কিন্তু নিজের স্বভাব তিনি একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। তিনি পুনরায় বড়ালমহাশয়ের প্রতি চক্ষু টিপিয়া ইসারা করিলেন। তাহার অর্থ এই যে, 'সুবালাকে এখন' ভুলাইবার নিমিত্ত আমি এইরূপ আজ্ঞা করিতেছি, কাজে আপনি কিছু করিবেন না।

কিন্তু সুবালা ছাড়িবার পাত্রী ছিলেন না। রায়-গৃহিণী যতই ইঙ্গিত করুন না কেন, তাঁহার সে ইঙ্গিত বিফল হইল। সুবালা তাঁহার সে আজ্ঞা কার্য্যে পরিণত করিলেন। বড়ালমহাশয় মন্দ লোক ছিলেন না। তিনি সুবালার পক্ষে হইলেন।

বালার সম্পূর্ণ মূল্য সুগ্রীবকে প্রদান করা হইয়াছিল কি না, সুবালা তাহা জানেন না। কিন্তু সেইদিন হইতে তাহার দুঃখ দূর হইল। সেইদিন হইতে তাহারা উদর পূর্ণ করিয়া খাইতে পাইল। সুগ্রীবের চিকিৎসাও হইল। অল্পদিন পরে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়া পুনরায় সে কাজকর্ম করিতে সমর্থ হইল।

গ্রামে পাছে কেহ উপবাসী থাকে, সে সম্বন্ধে সুবালা সর্বদা খরতর দৃষ্টি রাখিতেন। গত কয়েক বৎসর যথাসময়ে ভালরূপ বৃষ্টি হয় নাই। সেজন্য ধানও ভালরূপ জন্মে নাই।

তাহার পর নদীর বানে বালি পড়িয়া অনেকের ভূমি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। গ্রামের লোকের সেজন্য বড় কষ্ট হইয়াছিল। সুবালা যথাসাধ্য সকলের কষ্ট দূর করিতে লাগিলেন; অন্ততঃ অন্ন বিনা কাহাকেও উপবাসী থাকিতে হইল না। গ্রামের লোক ক্রমে জানিতে পারিল যে, সুবালাকে একবার বলিলেই দুঃখ দূর হইবে, কেহ তাহাদিগের উপর অন্যায় অত্যাচার করিতে পারিবে না। দুই হাত তুলিয়া সুবালাকে সকলে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। তিনি সকল কথা রায়-গৃহিণীকে জানিতে দিতেন না। অধিক খরচ হইতেছে দেখিয়া রায়-গৃহিণী যদি বকিতেন, তাহা হইলে সুবালা আহার পরিত্যাগ করিয়া কাঁদিতে বসিতেন। কাজেই রায়-গৃহিণীকে চুপ করিয়া থাকিতে হইত।

সুবালা সম্বন্ধে আর একটি গল্প এই,—নফর ডোম নামক একজন গ্রামবাসী বাগানে কাঁচা তাল কাটিতে আসিয়াছিল। তালশাঁস ছাড়াইবে, সেজন্য তাহার স্ত্রী সঙ্গে আসিয়াছিল। দুই বৎসরের শিশুকন্যা তাহার সহিত ছিল। সুবালা সেই কন্যার হাতে দুইটি সন্দেশ দিয়াছিলেন। সন্দেশ সে কখনও খায় নাই। সেরূপ উপাদেয় মিষ্টদ্রব্য ভক্ষণ করিয়া তাহার আনন্দের আর সীমা রহিল না। তাহার মা বলিল,—'ইনি তোমার মাসী, সুবালা মাসী। ইঁহার পায়ে গড় কর।' শিশু বলিল,—'থুবালা মাথী।' সুবালা বলিলেন,—'আহা! কেমন আধ-আধ স্বরে এ আমাকে থুবালা মাসী বলিল। তোমার কন্যার নাম কি?' তাহার মাতা বলিল,—'ইহার এখনও নাম হয় নাই, ইহাকে আমরা খুকী বলিয়া ডাকি।' কিছুদিন পরে সেই কন্যার জ্বরবিকার হইল। তাহার বাঁচিবার আশা কিছুমাত্র ছিল না। একদিন রাত্রিতে বিকারের ঘোরে সে বায়না লইল যে,—'আমি থুবালা মাথীর কাছে যাইব।' তাহার পিতা-মাতা তাহাকে বিধিমতে ভুলাইতে চেষ্টা করিল। শিশু কিন্তু কিছুতেই শান্ত হইল না। সে ক্রমাগত কাঁদিতে লাগিল,—'আমি থুবালা মাথীর কাছে যাব।' পরদিন প্রাতঃকালেও সেই কথা বলিয়া সে কাঁদিতে লাগিল। রায়বাড়ীর কেহ সেই কথা শুনিয়াছিল। চাকর-চাকরাণীদের মধ্যে সেই বিষয় লইয়া হাস্য-পরিহাস হইতেছিল। তাহারা বলিতেছিল,—'নীচ লোকের একবার আস্পর্দ্ধা দেখ! সুবালা দিদি নফর ডোমের কন্যাকে সন্দেশ দিয়াছিলেন। সে এখন পীড়িত হইয়াছে। সকলে বলিতেছে যে সে বাঁচিবে না। কিন্তু সেই সন্দেশের লোভে কাল হইতে সে আবদার ধরিয়াছে যে, আমি সুবালা মাসীর কাছে যাব। নীচ লোকের একবার আস্পর্দ্ধা দেখ।

সুবালার কানে সেই কথা উঠিল। কাহাকেও কিছু না বলিয়া তৎক্ষণাৎ খানকয়েক বিস্কুট, গোটাকতক ঘড়ার খেজুর, একটু মিশ্রি ও একটি কমলালেবু লইয়া বাড়ি থেকে বাহির হইলেন। বরাবর নফর ডোমের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলেন। সে স্থানে গিয়া দেখিলেন যে, একটি অতি কদাকার ময়লা বালিশ মাথায় দিয়া একখানি চেটাইয়ের উপর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পড়িয়া আছে। তাহার মাতা নিকটে বসিয়া কাঁদিতেছে, তাহার মুখ হইতে মাছি তাড়াইতেছে, আর পিপাসায় যখন সে হাঁ করিতেছে, তখন তাহার মুখে একটু জল দিতেছে। সুবালাকে দেখিয়া ডোমনী চমকিত হইয়া দাঁড়াইল। সে বলিল,—'তুমি দিদি,

আমাদের এই কুঁড়েঘরে!'

সুবালা জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তোমার কন্যা এখন কেমন আছে, তাহা বল।'

ডোমনী উত্তর করিল,—'কাল সমস্ত রাত্রি খুকী ছট্‌ফট্ করিয়াছে ও মাথা চালিয়াছে। সেই সঙ্গে সে বায়না লইল যে, আমি সুবালা মাসীর কাছে যাইব। তোমাকে একবার মাত্র সে দেখিয়াছিল, তথাপি তোমার কথা তাহার মনে ছিল। তোমার ঐ চাঁদমুখখানি, দিদি, একবার যে দেখিয়াছে, তোমার মধুর কথা যে একবার শুনিয়াছে, সে কি আর কখনও তাহা ভুলিতে পারে? আহা! বাছা আমার কি জানে যে, তুমি কে আর আমরা কি! তোমাকে দেখিবার নিমিত্ত সে ক্রমাগত কাঁদিতে লাগিল। কিছুতেই তাহাকে আমরা ভুলাইতে পারিলাম না। আজ প্রাতঃকালেও সেই কথা বলিয়া সে কাঁদিতেছিল। এখন চুপ করিয়াছে। বোধ হয়, আর বিলম্ব নাই!'

ডোমনীর চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল।

সুবালা শিশুকে ডাকিতে লাগলেন,—'খুকী! খুকী! খুকী!'

সে চক্ষু চাহিল না, অথবা কোন উত্তর করিল না। পুনরায় সুবালা ডাকিতে লাগিলেন,—'খুকী! খুকী! চাহিয়া দেখ, তোমার জন্য কেমন খাবার আনিয়াছি।'

এই বলিয়া কমলালেবুটি তাহার হাতে দিলেন। লেবুটি সে মুঠা করিয়া ধরিল। পুনরায় সুবালা তাহাকে ডাকিতে লাগিলেন। বার বার ডাকের পর সে চক্ষু উন্মীলিত করিল। কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে সুবালার মুখের দিকে সে চাহিয়া রহিল। অবশেষে সে ব্যস্ত হইয়া হাত পা নাড়িতে লাগিল। উশখুশ করিয়া,—'আমি উঠিয়া বসিব,'—যেন এইরূপ ইচ্ছা সে প্রকাশ করিল। তাহার মা তাহাকে তুলিয়া বসাইল। তাহার পর দুই হাত সুবালার দিকে শিশু প্রসারিত করিয়া দিল।

তাহার মাতা বলিল,—'না, মা! তোমার সুবালা মাসী তোমাকে কোলে লইবেন না। তোমার জন্য তিনি কি সব আনিয়াছেন, দেখ। না, মা! তুমি তাঁহার কোলে যাইতে চাহিও না।'— এই বলিয়া ডোমনী বিস্কুট ও খেজুর তাহাতে দেখাইল। কিন্তু সেদিকে সে দৃক্‌পাত করিল না। সুবালার কোলে যাইবে, সেইজন্য হাত দুইটি প্রসারিত করিয়া একান্তমনে একদৃষ্টিতে সুবালার দিকে চাহিয়া রহিল।

শিশুর সেই উৎফুল্ল নয়ন দুইটি দেখিয়া সুবালা আর থাকিতে পারিলেন না। ডোমের কন্যাকে তিনি কোলে তুলিয়া লইলেন।

'কি কর, দিদি! কি কর, দিদি!' ব্যস্ত হইয়া ডোমনী সুবালাকে নিষেধ করিতে উদ্যত হইল। সুবালা তাহার নিষেধ শুনিলেন না।

'ছি, ছি, আমরা ডোম। আমার কন্যাকে তুমি কোলে লইলে। কি করিলে, দিদি! আমাতে কি ছুঁইতে আছে? ও মা! রায়-গৃহিণী এ কথা শুনিলে আমাকে কি বলিবেন? বড়ালমহাশয় আমাকে কি বলিবেন? গ্রামের লোক আমাকে কি বলিবে? আর নয়, দিদি! খুকী এখন চুপ করিয়াছে। চেটাইয়ের উপর পুনরায় উহাকে শয়ন করাইয়া দাও। ও মা

আমি কি করি!' —খুকী বাস্তবিক চুপ করিয়াছিল। অতি সন্তোষের সহিত দুই হাতে সুবালার গলা সে জড়াইয়া ধরিল। লেবুটির সহিত একহাত তাহার মুষ্টিবদ্ধ হইয়া রহিল। তাহার পর সুবালার স্কন্ধে সে আপনার মস্তকটি রাখিল। মনের সুখে সে চক্ষু দুইটি মুদিত করিল। তাহার মুখশ্রী শান্তিভাবে পূর্ণ হইল। সেই মুহূর্তে যেন তাহার সকল দুঃখ, সকল রোগ তিরোহিত হইল।

'ও মা, আমি কি করি!' এই কথা বলিয়া ডোমনী আপনার কপালে করাঘাত করিতে লাগিল। সুবালা তাহাকে প্রবোধ দিয়া অতি মৃদুস্বরে বলিলেন,—'চুপ, চুপ! খুকী নিদ্রা যাইবে। ঘুমাইলে তাহার জ্বর ছাড়িয়া যাইবে। চুপ, চুপ!'

নিরুপায় হইয়া ডোমনী চুপ করিল। ঘোরতর আশ্চার্য্যান্বিতা ও ভীতা হইয়া সতৃষ্ণ নয়নে সুবালার দিকে চাহিয়া, ঘরের দেয়ালে ঠেস দিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল।

শিশুকে আপনার বক্ষস্থলে ধারণ করিয়া সুবালা এদিকে-ওদিকে বেড়াইতে লাগিলেন। যথার্থই শিশু অঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল। তাহার শরীরে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। জ্বর-মগ্ন হইবার উপক্রম হইল।

প্রায় এক ঘণ্টাকাল সুবালা তাহাকে লইয়া বেড়াইলেন। যখন নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন, তখন অতি ধীরে ধীরে তিনি তাহাকে তাহার মায়ের কোলে সমর্পণ করিলেন। 'বৈকালবেলা পুনরায় আসিয়া দেখিব',—এই কথা বলিয়া তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

বাটী গিয়া বড়ালমহাশয়কে বলিয়া, কন্যাটির জন্য তিনি ভাল চিকিৎসক আনাইলেন। কিন্তু সুবালাকে দেখিয়া, সুবালার মধুর কথা শুনিয়া, সুবালাকে স্পর্শ করিয়া, সে রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছিল। চিকিৎসা বড় আর অবশ্যক হইল না।

সেই অবধি গ্রামের লোকের মনে বিশ্বাস জন্মিল যে, সুবালা লক্ষ্মীস্বরূপা দেবী। তিনি একবার স্পর্শ করিলে রোগ দূরে পলায়ন করে। রোগ দ্বারা কেহ আক্রান্ত হইলে, আগ্রহসহকারে তাহার বাড়ীর লোক সুবালাকে ডাকিয়া আনিত! অধিক বয়স্ক ব্রাহ্মণ অথবা ব্রাহ্মণী হইলে, 'সুবালা তাহার মস্তক একবার স্পর্শ করুন', এই বলিয়া তাহারা প্রার্থনা করিত। অপর জাতি হইলে সুবালার পদধূলি অতি ভক্তিভাবে মস্তকে গ্রহণ করিত।

সুবালা সম্বন্ধে এইরূপ অনেক গল্প গ্রামে প্রচলিত আছে। এই সমুদয় ঘটনা রায়-গৃহিণী জীবিত থাকিতেই ঘটিয়াছিল।

'আমাদের সুবালা তিনি এখন গ্রামের অধিশ্বরী হইলেন। এ গ্রামে ভূত-প্রেত আর আসিতে সাহস করিবে না, তুক্‌তাক্ করিয়া আর আমাদের কেহ বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করিবে না। অনাহারে অথবা বিনা চিকিৎসায় আর আমাদের মরিতে হইবে না। আমাদের সকল দুঃখ এইবার দূর হইবে।' এইরূপ ভাবিয়া গ্রামের লোকের আনন্দের আর সীমা রহিল না।

বিধাতাও গ্রামের লোকের প্রতি সুপ্রসন্ন হইলেন। কয় বৎসর যথাসম্ভব সুবৃষ্টির অভাবে ভালরূপ ধান উৎপন্ন হয় নাই। এ বৎসর সুবৃষ্টি হইল। লোকের গোলায় ধান রাখিবার

জন্য এ বৎসর স্থান হইবে না, এইরূপ সম্ভাবনা হইল। যে সমুদয় ভূমি বালি পড়িয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, এ বৎসর বন্যায় সেই বালি হয় ধুইয়া গেল অথবা তাহার উপর গভীরভাবে পলি পড়িল। সে সমুদয় ভূমি পূর্বাপেক্ষা অধিকতর উর্বরা হইল। সেজন্যও গ্রামের লোকের আনন্দের আর সীমা রহিল না।

যেরূপ মানুষের প্রতি, জীবজন্তুর প্রতিও সেইরূপ দয়ামায়া ছিল। পশু-পক্ষিগণও তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়াছিল।

দ্বিতীয় ভাগ

প্রথম অধ্যায় – ধনুকধারীর বাসনা

ভাদ্র মাসের শেষ। নদীতে বান আসিয়াছে। গ্রাম যথারীতি জলপ্লাবিত হইয়াছে। একদিন বৈকাল বেলা সুবালা একেলা বাগানে গিয়াছিলেন। তিনি যে ফুলগাছগুলি পুঁতিয়াছিলেন, তাহাদের শুষ্কপত্র ও শাখা-প্রশাখা ভাঙ্গিয়া দিতেছিলেন। এমন সময়ে সেই স্থানে ধনুকধারী গিয়া উপস্থিত হইল। সুবালা এক্ষণে প্রভুনী, ধনুকধারী তাঁহার বেতনভোগী ভৃত্য। কিন্তু বালককালের কথা এখনও ধনুকধারী ভুলিতে পারে নাই। সুবালার সহিত 'আপনি' বলিয়া কথা কহিতে কখনও অভ্যাস হয় নাই। তবে সুবালার নাম ধরিয়া ডাকিতে সে সাহস করিত না। আবশ্যক হইলে 'ও গো', 'হাঁ গো' বলিয়া কোনরূপে কাজ সারিত।

নিকটে গিয়া ধনুকধারী কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। ঘাড় হেঁট করিয়া পা দিয়া মাটি খুঁড়িতে লাগিল। কোন কথা বলিতে সাহস করিল না।

সুবালা বলিলেন,—'কিরূপ একটা গন্ধ বাহির হইল! ধনুকধারী! কি মনে করিয়া?'

ধনুকধারী উত্তর করিল—'একটি কথা বলিব?'

সুবালা বলিলেন,—'কি বলিবে, বল।'

ধনুকধারী বলিল,—বাল্যকালে আমরা এক সঙ্গে অনেক খেলা করিয়াছি। কত ফুল, কত ফল তোমাকে পাড়িয়া দিয়াছি। যখন চপলা ছিল, তখন কত আহ্লাদে-আমোদে আমবা কালক্ষেপণ করিয়াছি।'

সুবালা বলিলেন,—'এই কথা তুমি বলিতে আসিয়াছ?'

ধনুকধারী বলিল,—'যখন যাহা বলিয়াছ, তখন তাহা করিয়াছি। কুকুরের ন্যায় তোমার আজ্ঞা পালন করিয়াছি।'

সুবালা বলিলেন,—'এ আর নূতন কথা কি? তুমি বড়ালমহাশয়ের আত্মীয়—সেজন্যও বটে, আর ছেলেবেলায় তুমি আমার সঙ্গী ছিলে—সেজন্যও বটে, দিদিমণি তোমার উপকার করিয়াছেন। কুড়ি টাকা বেতনে তোমাকে তিনি কর্ম দিয়াছেন। পরে তোমার আরও ভাল হইবে সে ব্যবস্থাও তিনি করিয়া গিয়াছেন।'

ধনুকধারী বলিল,—'আমি চাকরী চাই না।'

সুবালা বলিলেন,—'চাকরী চাও না! তবে কি চাও তা বল। কাকা মহাশয় আসিলে

তাঁহাকে আমি বলিব। যদি অসঙ্গত না হয়, তাহা হইলে অবশ্য তিনি তোমার বাসনা পূর্ণ করিবেন।'– ধনুকধারী বলিল,—'পাছে তুমি রাগ কর, সেই ভয়ে সে কথা বলিতে আমার সাহস হইতেছে না।' —সুবালা উত্তর করিলেন,—'কি গন্ধ! ঠিক যেন ব্রাণ্ডির গন্ধ। রাগের কথা তুমি কি বলিবে?' —ধনুকধারী বলিল,—'আমি যাহা চাই, মনে করিলে তুমি তাহা দিতে পার, কাকামহাশয়কে বলিয়া কি হইবে?'

সুবালা বলিলেন,—'তুমি কি চাও, তাহা না জানিলে কি করিয়া উত্তর দিব?'

কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে ধনুকধারী বলিল,—'ছেলেবেলা হইতে আমি তোমাকে বড় ভালবাসি। তোমার জন্য আমি প্রাণ বিসর্জন করিতে পারি। আমি তোমাকে চাই।' —সুবালার মুখ রক্তবর্ণ হইল! স্তম্ভিত হইয়া কিছুক্ষণ ধনুকধারীর দিকে তিনি চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তুমি মদ খাইয়াছ?'

সুবালা বলিলেন,—'ছেলেবেলার কথা স্মরণ করিয়া তোমাকে আমি ক্ষমা করিলাম। যাও, বাড়ী যাও। যতক্ষণ না তোমার জ্ঞান হয়, ততক্ষণ শুইয়া নিদ্রা যাও।'

একে মনের আবেগে উন্মত্ত প্রায় হইয়াছিল, তাহার উপর আবার সুরাপান করিয়াছিল। ধনুকধারীরও ক্রোধ হইল। সুবালার সহিত সমান উত্তর করিতে তাহার সাহস হইল। ধনুকধারী বলিল,—'বাল্যকাল হইতে আমি তোমার সঙ্গে আছি। যখন যাহা বলিয়াছ, তখন তাহা করিয়াছি। একসঙ্গে কত খেলা, কত আমোদ-আহ্লাদ করিয়াছি। আজ আমি কেহ হইলাম না, আর সেই ঝোঁকড়া-চুলো ছবি-আঁকা বেটা সব হইল? সে বড়মানুষের ছেলে, আমি গরীবের ছেলে। সেইজন্য তুমি আমাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিবে? সে ব্রাহ্মণ, আমি কায়স্থ, সেইজন্য তুমি আমাকে পদদলিত করিবে? আর সেদিনই—তা জান? কলিকাতায় সভা হইয়াছিল, তাহাতে স্থির হইয়াছে যে, আমরা ক্ষত্রিয়। চারিদিকে কায়স্থরা যজ্ঞোপবীত গ্রহণ কারিতেছে। আর একমাস অশুচি নাই, এখন বারো দিন। এখন আর দাস নই, এখন বর্মা। যেমন দেবযানী—' এইরূপ বলিতে বলিতে ধনুকধারী যেন একটা সংজ্ঞা হইল। দেবযানীর গল্প বলিতে তাহার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সে বলিতে পারিল না, বলিতে বলিতে চুপ হইয়া গেল। তাহার পর ধীরে ধীরে সুমিষ্ট স্বরে সে বলিল,—'সুবালা! তোমাকে প্রাণ অপেক্ষা আমি ভালবাসি। যদি তুমি আমাকে বিবাহ না কর, তাহা হইলে এ প্রাণ আমি আর রাখিব না। এই দেখ আমি একখানি ছোরা প্রস্তুত করিয়াছি। তোমাকে আমি কিছু বলিব না, কিন্তু এই ছোরা আমি নিজের বুকে মারিয়া প্রাণ বিসর্জন করিব।'এই কথা বলিয়া জামার ভিতর হইতে একখানি ছোরা বাহির করিয়া সে সুবালাকে দেখাইল।

সুবালা একটু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—'তোমার কথায় রাগ করিব, কি হাসিব, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। তুমি পাগল হইয়াছ। উপন্যাস-পুস্তক পাঠ করিয়া তোমার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছে। যাও, বাড়ী যাও। তোমার মন্দ করিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু পুনরায় যদি ওরূপ কথা আমাকে বলিতে সাহস কর, তাহা হইলে আমি বড়ালমহাশয়কে বলিয়া দিব। তিনি তোমাকে বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিবেন।'

ধনুকধারী পুনরায় রাগিয়া উঠিল। পুনরায় সে ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিল না। সে বলিল,—'বড়ালমহাশয় আমাকে বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিবেন? হা, হা, হা! ভাল কথা

বটে! বড়ালমহাশয় আমাকে তাড়াইয়া দিবেন। হা, হা, হা!'

ধনুকধারী এই কথা বলিতে লাগিল, আর হা-হা রবে কিম্ভূতকিমাকার ভঙ্গী করিয়া বিদ্রুপের হাসি হাসিতে লাগিল। সুবালা আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া তার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

অল্পক্ষণ পরে সুবালা বলিলেন,—'তুমি মদ খাইয়াছে, তুমি পাগল হইয়াছ, তোমার এখন জ্ঞান নাই। কিন্তু তোমার মুখের ভঙ্গী ও কথার ভাব দেখিয়া আমার সন্দেহ হইতেছে। যাহা হউক, তোমার সহিত আমি তর্ক-বিতর্ক করিতে ইচ্ছা করি না। বড়ালমহাশয় কি করিয়াছেন, তাহা আমি জানি না, আর শুনিতে চাই না। তিনি বৃদ্ধ, তোমার পিসেমহাশয়। তাঁহাকে বিদ্রুপ করিতে চাও কর। কিন্তু তুমি এখন যে কথা আমাকে বলিলে, সে কথা যদি পুনরায় আমাকে বল, তাহা হইলে আমি নিজেই তোমাকে বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিব। বাড়ী আমার।

ধনুকধারী আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল,—'বাড়ী তোমার? হা, হা, হা, শুনিলে হাসি পায়। কাহার বাড়ী, বাছাধন? হা, হা, হা! জান, তোমার দর্প আমি চূর্ণ করিতে পারি? অধিক নয়, যদি একটা কথা আমি মুখ দিয়া বাহির করি, তাহা হইলে বাছাধন তোমার কি হয়?'

বিস্মিতা হইয়া সুবালা জিজ্ঞাসা করিলেন—'ও আবার কি কথা?'

সুবালার মনে ঘোরতর সন্দেহ হইল। ধনুকধারীর ভাবভঙ্গী দেখিয়া তাঁহার মনে সন্দেহ হইল যে, 'এ সকল নিতান্ত মাতালের কথা নহে! এই সমুদয় কথার কোন গূঢ় অর্থ আছে।' কিন্তু ধনুকধারী প্রকাশ করিয়া কিছু বলিল না।

ধনুকধারীর এখন পুনরায় জ্ঞান হইল। রাগের মাথায় সে এইসব কথা বলিয়াছিল। ভয়ে তাহার মুখ শুষ্ক হইয়া গেল। সে বলিল,—'সুবালা! সত্য সত্যই আমি পাগল হইয়াছি। তোমাকে ভয় দেখাইবার নিমিত্ত মিছামিছি আমি ও কথা বলিয়াছি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। জোড়হাত করিয়া তোমার নিকট আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আমি ক্ষিপ্ত হইয়াছি, এখন আমার জ্ঞান নাই। সুবালা তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আমি চলিলাম। এ সব কথা কাহাকেও বলিও না।'

এই বলিয়া ধনুকধারী সত্বর সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

দ্বিতীয় অধ্যায় – ডাকিলে কেন

সুবালা স্তম্ভিত হইয়া সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ধনুকধারী যাহা বলিল, তাহা সুরাপানে উন্মত্তের কথা, অথবা তাহার মূলে কিছু সত্য আছে? তাহার কথার ভাব বোধ হইল যে, সে মনে করিলে বড়ালমহাশয়কে জব্দ করিতে পারে, আমারও সে অনিষ্ট করিতে পারে। এই সব কথার অর্থ কি?—সুবালা এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন।

আবার ভাবিলেন।—'এ সম্পত্তি কি প্রকৃত আমার নহে? বাস্তবিক এ সম্পত্তির আমি কে? মায়ের মেসোর সম্পত্তি। আমার নিজের মেসো পর্য্যন্ত নয়। এ সম্পত্তির উপর আমার কি অধিকার আছে? আইন অনুসারে এ সম্পত্তি আমার নয়; তা যেন হইল। কিন্তু, বড়ালমহাশয়কে সে কিরূপে জব্দ করিতে পারে? ইহার মানে কি?'

ভাবিতে ভাবিতে সুবালা বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। ঘরে আসিয়া একখানি চৌকিতে তিনি বসিয়া পড়িলেন। সেই স্থানে বসিয়া ক্রমাগত তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাহার পর সমস্ত রাত্রি ধনুকধারীর ভাবভঙ্গী ও কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। সমস্ত রাত্রি তাঁহার নিদ্রা হইল না।

প্রাতঃকালে উঠিয়াও সুবালা সেই চিন্তা করিতে লাগিলেন,—'কাহাকে জিজ্ঞাসা করি? বড়ালমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিতে পারি না। ধনুকধারী তাঁহার আত্মীয়। কাহার সহিত পরামর্শ করি? কাকামহাশয়কেও বলিতে পারি না। এ কথা শুনিলেই তিনি হুলুস্থুল করিবেন, ধনুকধারীকে তৎক্ষণাৎ দূর করিয়া দিবেন। যদি সে সুরাপান পরিত্যাগ না করে, তাহা হইলে পরে তাহাতে তাড়াইতে হইবে। কিন্তু আপাততঃ তাহার মন্দ করিতে আমি ইচ্ছা করি না। উন্মত্ত অবস্থায় সে হয়তো প্রলাপ করিয়াছে; আমাকে সে যাহা বলিয়াছে, তাহা পাগলের কথা ব্যতীত আর কিছুই নহে, এ সম্পত্তি যদি প্রকৃত আমার না হয়, অথবা ইহার ভিতর যদি কোনরূপ জুয়াচুরি থাকে, তাহা হইলে, এ বিষয় আমি লইব না। যাহার বিষয়, তাহাকে ফিরাইয়া দিব। কিন্তু কাকামহাশয়কে এ কথা বলিতে পারি না। তিনি আমার কথায় কর্ণপাত করিবেন না। কাহাকে জিজ্ঞাসা করি? কাহার সহিত পরামর্শ করি?' অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া, লজ্জা-সরমে জলাঞ্জলি দিয়া, বিনয়কে তিনি পত্র লিখিলেন,—'বিশেষ একটা কথা আছে। একদিনের জন্য যদি তুমি এখানে আসিতে পার, তাহা হইলে আমার বড় উপকার হয়।'

বিনয়ের ঠিকানা তিনি জানিতেন না। তাঁহার পিতার নাম পর্যন্ত সুবালা জানিতেন না। বিনয়ের মাতুলালয়ে সেই চিঠি পাঠাইলেন। সৌভাগ্যক্রমে বিনয় সে চিঠি পাইলেন। দুইদিন পরে বৈকালবেলা বিনয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

যথারীতি সুবালা তখন বাগানে গিয়াছিলেন কোন ফুলগাছটিতে ফুল ফুটিয়াছে, কোন্‌টিতে মুকুল হইয়াছে, কোন্‌টিতে নবপল্লব বাহির হইয়াছে, এই সমুদয় দেখিতে তিনি বড় ভালবাসিতেন। এদিক ওদিক বেড়াইয়া গাছগুলি তিনি দেখিতেছিলেন। নিকটে দুইটি কাঠবিড়াল একবার এ গাছে উঠিতেছিল, পুনরায় তাহা হইতে নামিয়া দ্রুতবেগে অন্য গাছে উঠিতেছিল। চারি পাঁচটি নীলকণ্ঠ পক্ষী ফুলগাছের মূলে কীটপতঙ্গের অনুসন্ধান করিতেছিল। ছাদের আলিসা হইতে একঝাঁক গোলা পায়রা নামিয়া সুবালার চারিদিকে বিচরণ করিতেছিল।

বিনয় সেই স্থানে গমন করিলেন। সুবালা এখন সলজ্জভাবে বিনয়ের সহিত কথোপকথন করিলেন। প্রথম, ফুলগাছ সম্বন্ধে তাহাদের নানারূপ কথাবার্তা হইল। তাহার পর বিনয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'সুবালা! আমাকে তুমি কি কথা বলিবে?'

ধনুকধারী যাহা যাহা বলিয়াছিল, সুবালা আদ্যোপান্ত তাহা বর্ণন করিলেন। সুবালাকে সে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল, এই কথা শুনিয়া বিনয় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। কিন্তু বড়ালমহাশয়ের নামে সে যেভাবে হাসিয়াছিল ও সুবালাকে সম্পত্তি সম্বন্ধে সে ইঙ্গিতে যাহা বলিয়াছিল, যখন তাহা তিনি শুনিলেন, তখন তিনি গম্ভীরভাবে নীরব হইয়া রহিলেন। —কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বিনয় বলিলেন,—'জুয়াচুরি আছে, তুমি সেই

সন্দেহ করিতেছ?'

সুবালা উত্তর করিলেন,—'হাঁ, আমি যতই ভাবিতেছি, ততই আমার বিশ্বাস হইতেছে যে, ইহার ভিতরে কোনরূপ প্রতারণা আছে। সে প্রতারণা কি, তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি।' এতক্ষণ দাঁড়াইয়া কথা হইতেছিল। নিকটে একটি শুষ্ক বৃক্ষ পড়িয়াছিল। সুবালা সেই কাষ্ঠের একপার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন, বিনয় তাহার অপর পার্শ্বে বসিলেন।

বিনয় বলিলেন,—'সম্পত্তির তুমি অধিকারিণী হইয়াছ, রায়মহাশয় ও তাঁহার পত্নী যদি উইল করিয়া না যাইতেন, তাহা হইলে রায়মহাশয়ের ভ্রাতা বিজয়বাবু ইহা পাইতেন। তিনি কোন আপত্তি করেন নাই, করিবেনও না। তবে প্রতারণা আছে কি না, সে অনুসন্ধান করিয়া ফল কি?' —সুবালা উত্তর করিলেন,—প্রতারণা করিয়া আমি কাহারও সম্পত্তি ভোক করিতে চাই না। —বিনয় জিজ্ঞাসা করিলেন,— 'যদি প্রতারণা থাকে, তাহা হইলে তুমি যাহার বিষয় তাহাকে ফিরিয়া দিবে?'

সুবালা উত্তর করিলেন,—'নিশ্চয়! কিন্তু সে কথার এখন প্রয়োজন নাই। কোন রূপ গোলযোগ আছে কি না, যদি থাকে তাহা হইলে কি, তাহাই আমি এখন জানিতে ইচ্ছা করি। যতদিন তাহা জানিতে না পারিব, ততদিন আমার প্রাণ সুস্থির হইবে না।'

চুপ করিয়া বিনয় ভাবিতে লাগিলেন। এই সম্পত্তি রায়মহাশয় কিরূপে পাইয়াছিলেন, রায়মহাশয় কিরূপ উইল করিয়াছিলেন, তাহার পর সুবালা ইহা কিরূপে পাইলেন, সে সকল কথা বিনয় পূর্বে শুনিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ কিন্তু করিয়া বিনয় জিজ্ঞাসা করিলেন,— 'তোমার দিদিমণির বয়ঃক্রম কবে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল? কবে তিনি উইল করিলেন? কবে তাঁহার মৃত্যু হইল?'

সুবালা উত্তর করিলেন,—'২০শে শ্রাবণ তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল; ২১শে শ্রাবণ তিনি উইল করিলেন; ২৩শে শ্রাবণ তাঁহার মৃত্যু হইল।' —বিনয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কি রোগে তাঁহার মৃত্যু হইল? কে তাঁহার চিকিৎসা করিতেছিল?'

সুবালা উত্তর করিলেন,—'তাঁহার ক্ষয়কাসি হইয়াছিল। শেষকালে উদরের দোষও হইয়াছিল। পূর্বে অনেক বড় বড় ডাক্তার ও বৈদ্য তাঁহার চিকিৎসা করিয়াছিলেন। শেষে বড়ালমহাশয় কলিকাতা হইতে একজন চিকিৎসক আনিয়াছিলেন। শুনিলাম যে, একপ্রকার উদ্ভিদ প্রণালীতে শেষ কয়দিন তিনি চিকিৎসা করিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে প্রতিদিন দুই মণ করিয়া বরফ তিনি আনাইতেন। —বিনয় বলিলেন,—'আশ্চর্য কথা! কাস রোগে বরফ দিয়া চিকিৎসা। মৃত্যুকালে তাঁহার নিকটে কে ছিলেন?'

সুবালা উত্তর করিলেন,—'বড়ালমহাশয়, তাঁহার স্ত্রী, ধনুকধারী ও চিকিৎসক, এই কয়জন তাঁহার নিকট ছিলেন।'— বিনয় পুনরায় চিন্তা করিতে লাগিলেন,—'যদি কোন কথা থাকে, তাহা হইলে বড়ালনীর মুখ হইতে তাহা বাহির করিতে হইবে। দুইজন লোককে আমি পুলিসের কনেস্টবল সাজাইয়া আনিব। বড়ালনীকে তাহারা ভয় দেখাইবে। ভয়ে বড়ালনী বোধ হয়, সকল কথা বলিয়া ফেলিবেন। কিন্তু বড়ালমহাশয় কি ধনুকধারী

উপস্থিত থাকিলে চলিবে না।'—সুবালা বলিলেন,—'বড়ালমহাশয় প্রাতঃকালে উঠিয়া কাজে গমন করেন। দুই প্রহর পর্যন্ত তিনি বাড়ীতে থাকেন না। বড়ালমহাশয়কে বলিয়া পাঁচ ছয় দিনের নিমিত্ত ধনুকধারীকে আমি কোন স্থানে পাঠাইয়া দিব। তবে কথা এই, কৃত্রিম কোন বিষয় করিতে আমি ইচ্ছা করি না। সে এক প্রকার মিথ্যা কথা ব্যতীত আর কিছুই নহে!'

বিনয় বলিলেন,—'তবে অন্য কোনরূপ উপায় যদি স্থির করিতে পারি, তাহা আমি ভাবিয়া দেখিব। কিন্তু চারি পাঁচদিনের নিমিত্ত ধনুকধারীকে তুমি অন্যত্র প্রেরণ করিবে।'

তাহার পর বিনয় পুনরায় বলিলেন,—'আমি অতিশয় ক্লান্ত হইয়া আছি। কল্য আমি কোন কাজ করিতে পারিব না। পরদিন যাহা হয় একটা করিব। জ্যেঠাইমায়ের ছবি ভালস্থানে টাঙানো হইয়াছে?'—সুবালা জিজ্ঞাসা করিলেন,—'জ্যেঠাই-মা আবার কে?'

বিনয় হাসিয়া বলিলেন,—'আশ্চর্য! ধনুকধারীর কথা শুনিয়া আমি অন্যমনস্ক হইয়াছিলাম। তোমার দিদিমণির সে ছবি টাঙানো হইয়াছে?'

সুবালা উত্তর করিলেন,—'উত্তরদিকে যে ঘরে তিনি বাস করিতেন, ছবি এখন সেই ঘরে আছে। কিন্তু আমি শুনিয়াছি যে, মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্বে দিদিমণি পূর্ব দিকে চোরাকুঠুরির নিকট ঘরে গিয়াছিলেন। সেই ঘরে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। আমার ইচ্ছা যে, ছবি সেই ঘরে থাকে।'

বিনয় বলিলেন,—'কল্য আমি সেই ঘরের প্রাচীরের গায়ে ছবি ঝুলাইয়া দিব।'

বাহির-বাটীতে পূর্বে যে ঘরে ছিলেন, বিনয় এবারও সেই ঘরে বাস করিতে লাগিলেন। সুবালার ইচ্ছানুসারে বড়ালমহাশয় পরদিন ধনুকধারীকে কার্যোপলক্ষ্যে নিকটস্থ একখানি গ্রামে প্রেরণ করিলেন। সে কার্য শেষ হইতে পাঁচ ছয় দিন লাগিবে।

পরদিন অপরাহ্নে বিনয়, সুবালা ও তাঁহার পিসীমা রায়-গৃহিণীর ছবি লইয়া পূর্বদিকের শয়নাগারে গমন করিলেন। কোন স্থানে ছবিটি ঝুলাইলে ভাল দেখাইবে, সেই স্থান তাঁহারা মনোনীত করিতে লাগিলেন।

সুবালার একটি কুকুর ছিল, তাহার নাম বাঘা; শৈশবকালে সুবালার তাহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। বড় হইয়া সেও সুবালার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল। বাঘা ইঁহাদের সঙ্গে আসিয়াছিল। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া চোরাকুঠুরির দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া প্রথম সে ফোঁস্ ফোঁস করিতে লাগিল। তাহার পর সে গর্জন করিয়া উঠিল।

বিনয় বলিলেন,—'চোরাকুঠুরির ভিতর ইঁদুর অথবা বিড়ালের গন্ধ পাইয়াছে। সেই জন্য বোধ হয় কুকুরটা এইরূপ করিতেছে।

পিসীমা বলিলেন,—'গেল যা! কুকুরটার একবার আস্পর্দ্ধা দেখ। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। সুবালা! তোমার কুকুরকে এত আদর দিও না।'

ঈষৎ হাসিয়া সুবালা বাঘাকে বাহিরে যাইতে আদেশ করিলেন। কিন্তু প্রথম সে যাইতে সম্মত হইল না। চোরাকুঠুরির দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া সে গর্জন করিতে লাগিল। পরে

সুবালা যখন ধমক দিয়া তাহাকে বাহিরে যাইতে বলিলেন, তখন সে অতি ধীরে ধীরে ঘরের বাহিরে গিয়া দ্বারের নিকট বারেণ্ডায় বসিয়া রহিল।

ছবির নিমিত্ত স্থান মনোনীত হইতে বিনয় বলিলেন,—'চাকরের নিকট হইতে পেরেক ও হাতুড়ি লইয়া আসি।' এই বলিয়া তিনি সে ঘর হইতে প্রস্থান করিলেন।

পিসীমা ও সুবালা সেই ঘরে রহিলেন। সুবালা বলিলেন,—'পিসীমা! এই ঘরের পার্শ্বে যে ঘর, তাহাতে মা, দিদি ও আমি বাস করিতাম। তাহার পর এই ঘরে চপলা ও আমি থাকিতাম।' —পিসীমা বলিলেন,—'চপলার কথা আমি শুনিয়াছি। বড়ই আশ্চর্য কথা। সে বালিকাটির কোন সন্ধান হইল না?'

সুবালা উত্তর করিলেন,—'না পিসীমা! সকলে বলে যে, খাঁদা ভূত তাহাকে খাইয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু সে কথা আমার বিশ্বাস হয় না। তবে কিরূপে কোথায় সে গেল, আজ পর্যন্ত তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই।' —পিসীমা বলিলেন,—'খাঁদা ভূতের কথা আমি শুনিয়াছি। এই বাড়ীর সে সর্বনাশ করিয়াছে।'

সুবালা উত্তর করিলেন,—হ্যাঁ পিসীমা! এই বাড়ীর সে সর্বনাশ করিয়াছে। অন্ততঃ তাহার হাঁকের পর এই বাড়ীতে নানারূপ বিপদ ঘটিয়াছে। গভীর রাত্রিতে সে যে বিকট শব্দ করিত, তাহা আর তোমাকে কি বলিব! দাদামহাশয়ের জামাতা, তাঁহার কন্যা, আমার দিদি, আমার মা, চপলা, শেষে দাদামহাশয় নিজে,—খাঁদা ভূতের হাঁকের পর এতগুলি লোকের মৃত্যু হইয়াছে।'

পিসীমা জিজ্ঞাসা করিলেন,—'সে খাঁদা ভূত এখন কোথায় গেল?'

সুবালা উত্তর করিলেন,—'দাদামহাশয়ের মৃত্যুর পর আর সে এ গ্রামে আসে নাই।'

পিসীমা বলিলেন,—'তামাক-পোড়ার কৌটা লইয়া আসি।'

এই বলিয়া তিনি সে ঘর হইতে প্রস্থান করিলেন। পিসীমা সে ঘর হইতে প্রস্থান করিলেন তাহা দেখিয়া বাঘা পুনরায় আস্তে আস্তে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। চোরাকুঠুরির দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া পুনরায় সে ফোঁস্ ফোঁস্ ও গর্জন করিতে লাগিল। সুবালা বলিলেন,—'চুপ বাঘা! চুপ! চুপ, আয় এদিকে আয়।'

সুবালা একেলা ঘরে রহিলেন। ঘরে একখানি খাট ও বিছানা ছিল। সেই খাটের উপর তিনি বসিয়া বাঘাকে নিম্নে মেজেতে উপবেশন করিতে আদেশ করিলেন। সেই স্থানে বসিয়া চোরাকুঠুরির দ্বারের দিকে একদৃষ্টিতে বাঘা চাহিয়া রহিল।

সুবালা ভাবিতে লাগিলেন,—'দিদিমণি যদি এখন ভূত হইয়া দেখা দেন, তাহা হইলে ভয়ে আমি চীৎকার করি, সহজ মানুষের মত তাঁহার সহিত কথাবার্তা কহি? এই সময় যদি খাঁদা ভূত আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলেই বা কি করি? খাঁদা ভূত।'

শেষ দুইটি কথা—'খাঁদা ভূত!' সুবালা একটু পরিস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করিলেন। ঠিক যেন তাহার প্রত্যুত্তরে অন্ধকার ঘর হইতে খোনা স্বরে কে বলিল,—'কেঁন?'

সেই শব্দ শুনিয়া বাঘা গর্জন করিয়া উঠিল।

যে ঘরে সুবালা বসিয়াছিলেন, তাহার ঠিক পার্শ্বে অন্ধকার ঘর। দুই ঘরের মধ্যস্থলে দ্বার ছিল। দ্বারটি এখন বন্ধ ছিল। সেই ঘর হইতে 'কেঁন' এইরূপ শব্দ আসিল।

ঘোরতর বিস্মিতা ও ভীতা হইয়া সুবালা সেই দ্বারের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার কি ভ্রম হইয়াছে? না, সত্য খোনা স্বরে কে বলিল কেঁন?'

অল্পক্ষণ পরে অন্ধকার ঘর হইতে পুনরায় কে বলিল,—'তুমি আঁমাকেঁ ডাঁকিলেঁ কেঁন?' —বাঘা পুনরায় গর্জ্জন করিয়া উঠিল। সুবালা ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন।

তৃতীয় অধ্যায় – সুবালা ও পশুপক্ষী

ভয়ে সুবালার মুখ শুষ্ক হইয়া গেল। ভয়ে তাঁহার পদদ্বয় কাঁপিতে লাগিল। খাট হইতে তিনি যে পলায়ন করিবেন, অথবা সে স্থানে বসিয়া তিনি যে চীৎকার করিবেন, সে ক্ষমতা তাঁহার রহিল না। তবে বাঘা নিকটে আছে, সেজন্য কিয়ৎপরিমাণে তাঁহার মন আশ্বাসিত হইল। পূর্বেই বলিয়াছি যে সুবালা বাঘার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। বড় হইয়া সেও সে ঋণ পরিশোধ করিয়াছিল।

দীন-দুঃখী-পীড়িত-তাপিত মানুষদিগের প্রতি যেরূপ সুবালার দয়ামায়া ছিল, জীব জন্তুর প্রতিও সেইরূপ দয়া ছিল। বাড়ীতে অনেকগুলি দুগ্ধবতী গাভী ছিল। তাহাদের ভালরূপ সেবা হইতেছে কি না, প্রচুর পরিমাণে তাহারা আহার পাইয়াছে কি না, প্রতিদিন সন্ধ্যার পূর্বে সুবালা নিজে গোয়ালে গিয়া. সে বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন। কোন গরুর সম্মুখে আহার না থাকিলে কখন কখন তিনি নিজেই খড় কাটিতে বসিতেন। গোশালা সর্বদাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিত। কোন স্থানে বিন্দুমাত্র গোময় বা গোমূত্র পড়িয়া থাকিত না। কোন গরুর গাত্রে বিন্দুমাত্র ময়লা লাগিয়া থাকিত না। কোন বিষয়ে অপরিষ্কার দেখিলে তিনি নিজে পরিষ্কার করিতেন।

মাতা উপদেশ দিয়াছিলেন যে,—'সুবালা। কখনও নিষ্ঠুর হইও না। চড়ুই পাখীটি ছাড়িয়া দাও।' জ্ঞান হইলে সুবালা বুঝিয়াছিলেন যে, পক্ষীদিগকে পিঞ্জরে বন্ধ করিয়া রাখিলে তাহাদের ক্লেশ হয়, সেজন্য কখনও তিনি পক্ষী পালন করেন নাই। গাছের কোটরে দুইটি শালিক পাখীতে বাসা করিয়াছিল। তাহাদের দুইটি ছানা হইয়াছিল। দৈবক্রমে শাবক দুইটি নিম্নে মাটীতে পড়িয়া গিয়াছিল, একটি মরিয়া গিয়াছিল, অপরটি জীবিত ছিল; কিন্তু তাহার একটি পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। ছানাটিকে বাড়ী আনিয়া ভাঙ্গা পায়ে চুণ-হলুদ লেপন করিয়া, নেকড়ার ফালি দিয়া সুবালা তাহা বাঁধিয়া দিলেন। একটি চুবড়ীতে তুলা বিছাইয়া তাহার উপর ছানাটিকে রাখিয়া, পাখীদের বাসার নিকট গাছে সেই চুবড়ীটি তিনি ঝুলাইয়া দিলেন। ছানাটির মাতা-পিতা প্রথম নিকটে আসিতে সাহস করে নাই। নিকটস্থ ডালে বসিয়া কেচর-মেচর করিতে লাগিল। শাবককে বাসায় আসিবার নিমিত্ত যেন তাহারা ডাকিতে লাগিল। যখন দেখিল যে, ছানা ঘরে ফিরিয়া আসিল না, তখন ক্রমে ক্রমে নিকটে আসিয়া তাহারা মুখে আহার দিতে লাগিল। দূর হইতে সুবালা পাখী দুইটির ব্যবহার দেখিতেছিলেন। মাতা-পিতা সন্তানকে আহার দিতে লাগিল দেখিয়া

সুবালার আনন্দ হইল। সন্ধ্যা হইলে সুবালা ছানাটিকে বাড়ীতে আনিয়া রাখিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, বড় হইয়া উড়িতে শিখিলে সে তাহার মাতা-পিতার সহিত চলিয়া যাইবে। কিন্তু ততদিন পর্যন্ত মাতা-পিতা তাহাকে প্রতিপালন করিল না। ছানাটি উড়িতে শিখিবার পূর্বেই তাহারা কোন স্থানে চলিয়া গেল। তখন হইতে সুবালাকে কাজেই তাহার প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিতে হইল, পাখীটি বড় হইয়া সর্বদা সুবালার নিকট থাকিত, তাঁহার কাঁধে বসিতে, অথবা তাঁহার সহিত এ ঘর সে ঘর বেড়াইতে ভালবাসিত। রাত্রিকালে সে একটি আলমারির মাথায় শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইত। সুবালা কখনও তাহাকে পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া রাখিতেন না। গ্রীষ্মকালে দিনের বেলা কখন কখন বাগানে যাইয়া কোন গাছের পত্রের ভিতর লুক্কায়িত থাকিত। কিন্তু সুবালা ডাকিলেই সে সাড়া দিত ও গাছ হইতে উড়িয়া তাঁহার মাথায় আসিয়া বসিত। দুর্ভাগ্যক্রমে একদিন কোথা হইতে একটা উট্‌কো বিড়াল আসিয়া পাখীটিকে লইয়া পলায়ন করিল! তাহার শোকে সুবালা অনেক কাঁদিয়াছিলেন এবং তিন চারি দিন ভালরূপে আহারাদি করেন নাই।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই শালিক পাখীটি অন্যত্র পক্ষীদিগকে ডাকিয়া আনিয়া সুবালার সহিত আলাপ-পরিচয় করিয়া দিয়াছিলেন। এক দিন প্রাতঃকালে সুবালা বাগানে গিয়াছিলেন। সেই শালিক পাখীটি তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিল। সুবালার হাতে একখানি বাসি রুটি ছিল। তাহা হইতে অল্প ছিঁড়িয়া তিনি শালিক পাখীকে দিতেছিলেন। সহসা পাখী গাছের দিকে উড়িয়া গেল। সুবালা ভাবিলেন, পাখী কোথায় গেল, কেন উড়িয়া গেল! অল্পক্ষণ পরে সে আর দুইটি শালিক পক্ষীকে লইয়া ফিরিয়া আসিল; কিন্তু তাহারা নিকটে আসিতে সাহস করিল না, দূরে বসিয়া পোষা পক্ষীর আহার দেখিতে লাগিল। রুটি ছিঁড়িয়া সুবালা তাহাদের জন্য দূরে নিক্ষেপ করিলেন। দূর হইতে আহার করিয়া সেদিন তাহারা প্রস্থান করিল। এই দুইটি পক্ষী পুনরায় আসে কি না, তাহা দেখিবার নিমিত্ত সুবালা পরদিন প্রাতঃকালে সেই গাছের গোড়ায় গিয়া বসিলেন। সেদিনও সেই বন্যপক্ষী দুইটি আসিয়া উপস্থিত হইল। পূর্বদিন অপেক্ষা তাহারা আরও নিকটে আহার করিল। প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাছতলায় বসিয়া পক্ষীদিগকে আহার করা সুবালার এক খেলা হইল। পুরাতন পক্ষীটির ন্যায় নূতন দুইটি পক্ষীও সম্পূর্ণরূপে পোষ মানিল। তাহাদের দেখাদেখি অন্যান্য শালিক পক্ষীও নিয়মিতরূপে আসিতে লাগিল। নির্ভয়ে সুবালাকে ঘিরিয়া, কেচর মেচর করিয়া প্রতিদিন আহার করিতে লাগিল।

আকাশে উড়িতে উড়িতে কতকগুলি বন্য গোলা-পায়রা এই পক্ষীভোজন দেখিতে পাইল। নিম্নে অবতরণ করিয়া ভয়ে ভয়ে সুবালার দিকে তাহারা অগ্রসর হইল। অল্পাধিক আহার করিয়া সেদিন তাহারা প্রস্থান করিল। পরদিন একঝাঁক গোলা-পায়রা আসিয়া উপস্থিত হইল। পায়রাদিগের জন্য সেদিন সুবালা ছোট মটর আনিয়াছিলেন। আনন্দে মোটর ভোজন করিয়া কপোতগণ প্রস্থান করিল। তাহার পর ঝাঁকে ঝাঁকে পায়রা আসিয়া সুবালার প্রদত্ত আহার নিত্য নিত্য ভোজন করিতে লাগিল। কিছুদিন পরে তাহাদের মধ্যে

কেহ কেহ ভাবিল যে, এ স্থানে যদি এরূপ আহারের আয়োজন আছে, তবে দূরে আর যাই কেন। রায়মহাশয়ের বাড়ীর প্রাচীরগাত্রে আলিসার নিম্নে কেবল গুটিকতক কোটর ছিল। কয়েক জোড়া পায়রা গিয়া তাহা অধিকার করিল। কিন্তু সেই কোটর কয়টি লইয়া ভয়ানক কলহ উপস্থিত হইল। অন্য পায়রাগণ সেই কোটর বলপূর্বক অধিকার করিতে চেষ্টা করিল। সর্বদা এইরূপ বিবাদ হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া, বড়ালমহাশয়কে বলিয়া সুবালা ছাদেব আলিসা আরও উচ্চ করিয়া গাঁথাইলেন ও পায়রাদিগের বাসস্থানের উপযোগী অনেকগুলি ছিদ্র বা খোপ সেই প্রাচীরে রাখিয়া দিলেন। পূর্বে রায়মহাশয়ের বাটীতে একটিও পায়রা ছিল না। এক্ষণে শত শত কপোত-কপোতী আসিয়া সেই সমুদয় কোটরে বাস করিল। কিন্তু তবুও তাহাদের মধ্যে বাদ বিসম্বাদ একেবারে নিবারিত হইল না। এক একটি দুষ্টু পায়রা বিনা কারণে অন্যেব গৃহ অধিকাব করিতে চেষ্টা কবিত। যাহাদের ঘর, তাহারা আপত্তি করিলে, দুষ্টু পায়রা তাহাদিগকে অতি নিষ্ঠুরভাবে চঞ্চু ও পক্ষ দ্বারা প্রহার করিত। প্রায় প্রতিদিন সুবালাকে এইরূপ মোকদ্দমা মীমাংসা করিতে হইত। শান্তশিষ্ট কপোত-কপোতীদিগকে তিনি আদর করিতেন ও নিজের হাত হইতে তাহাদিগকে আহার খুঁটিয়া খাইতে দিতেন। কিন্তু দুষ্টুদিগকে তিনি অনেক ভর্ৎসনা করিতেন ও তাঁহার হাত হইতে আহার করিতে দিতেন না। আশ্চর্য কথা এই যে, দুষ্টুগণ সে অপমান বুঝিতে পারিত। বিরসমনে আধোবদনে দূর হইতে আহার করিয়া তাহারা চলিয়া যাইত ও কলহ বিবাদ পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় সুবালার প্রীতিভাজন হইতে চেষ্টা করিত। কোন কোন পায়রা সুবালার ক্রোড়ে বসিয়া তাঁহার নিকট হইতে আদর পাইতে চেষ্টা করিত।

কিছুদিন পরে পায়রাদিগের আর একটি নূতন শত্রু আসিয়া উপস্থিত হইল। একদিন কোথা হইতে অনেকগুলি নীলকণ্ঠ পক্ষী আসিয়া পায়রাদিগের ডিম্ব ফেলিয়া দিল ও তাহাদের কোটর অধিকার করিতে চেষ্টা করিল। সেদিন বাড়ীর ভৃত্যগণ তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিল; কিন্তু প্রতিদিন তাহাবা আসিয়া এইরূপ বিবাদ-বিসম্বাদ করিতে লাগিল। সেজন্য সুবালা তাহাদের জন্য গুটিকতক নূতন কোটর নির্মাণ করাইলেন। প্রথম তাহারা নূতন গৃহে যাইতে সম্মত হইল না। কিন্তু লাঠি হাতে করিয়া চপলার ভগিনী পাগলী পায়রাদিগকে রক্ষা করিতে লাগিল। সেজন্য নিরুপায় হইয়া তাহারা নূতন নির্মিত কোটরে গিয়া বাস করিল।

যে বৃক্ষতলে বসিয়া সুবালা পক্ষীদিগকে ভোজন প্রদান করিতেন, সেই বৃক্ষে দুইটি কাঠবিড়ালী বাস করিত। গাছে বসিয়া অনেকদিন ধরিয়া তাহারা দেখিতেছিল যে, তাহাদের বাড়ীর নিকট প্রতিদিন সদাব্রত হইতেছে। এক মানবকন্যা সেই পুণ্যকার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। এই মানবীর মুখশ্রী অতি মৃদু, অতি মধুর, দায়ামায়াতে পরিপূর্ণ। তাঁহার নিকট গমন করা উচিত কি না, অনেক দিন ধরিয়া কাঠবিড়ালী এই চিন্তায় নিমগ্ন রহিল। সুবালা ও পক্ষীগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলে, কাঠবিড়ালী দুইটি সভয়ে নিম্নে নামিয়া যৎসামান্য যাহা কিছু উচ্ছিষ্ট পড়িয়া থাকিত, দুই হাতে ভক্ষণ করিত। তাহা দেখিয়া সুবালা

কাঠবিড়ালদের জন্য ছোলা আনিতে আরম্ভ করিলেন। অন্যান্য পক্ষীদিগের ভোজন সমাপ্ত হইলে কাঠবিড়ালদিগের জন্য সুবালা গাছতলায় ছোলা ছড়াইয়া যাইতেন। সুবালা চলিয়া গেলে, গাছ হইতে নামিয়া তাহারা সেই ছোলা ভক্ষণ করিত। দিন দিন তাহাদের সাহস বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাহাদের ভয় দূর করিবার নিমিত্ত সুবালা আপনার পশ্চাৎদিকে ছোলা বিনীর্ণ করিতে লাগিলেন। মানবকন্যা অনমনস্কা আছে, আমাদিগকে দেখিতে পাইবে না, এইরূপ ভাবিয়া চুপি চুপি গাছ হইতে নামিয়া তাহারা সেই ছোলা খাইতে লাগিল। সুবালা ক্রমে নিজের পার্শ্বে ছোলা ছড়াইয়া দিলেন। নির্ভয়ে সে ছোলাও তাহারা ভক্ষণ করিতে লাগিল। তাহার পর সুবালা সম্মুখে ছোলা ফেলিলেন। সে স্থানের খাদ্যও তাহার ভক্ষণ করিল। অবশেষে তাহারা সুবালার স্কন্ধে বসিয়া তাঁহার হাত হইতে খাদ্য গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইল না।

ছোলা দেখিয়া একঝাঁক টিয়া পাখীও আহারের লোভে সে স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। শালিক পাখী, চড়ুই পাখী, পায়রা, টিয়া পাখী, কাক, কাঠবিড়াল প্রভৃতি পক্ষ-পক্ষী দ্বারা পরিবৃতা হইয়া সুবালা যখন গাছতলায় বসিয়া থাকিতেন, তখন সে বিচিত্র দৃশ্য দর্শন করিয়া সকলেই আশ্চর্যান্বিত হইত। গ্রামে কোন লোকের বাড়ীতে কুটুম্ব আসিলে, তাহারা এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে আসিত। সকলে বলিত যে, সুবালা মনুষ্য নহেন। ইনি লক্ষ্মী সরস্বতী অথবা স্বয়ং ভগবতী মানুষের আকার ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

বাগানের এক পুষ্করিণীতে সুবালা অনেকগুলি বড় বড় রুই মৎস্য পুষিয়া রাখিয়াছিলেন। সুবালার কণ্ঠস্বর তাহারা বুঝিতে পারিত। সানবাঁধা ঘাটে দাঁড়াইয়া সুবালা তখন তাহাদিগকে 'আয়, আয়' বলিয়া ডাকিতেন, তখন নিকটে আসিয়া তাহারা হুড়াহুড়ি করিত। মুড়ি ও ময়দার গুলি তিনি জলে নিক্ষেপ করিতেন। মৎস্যগণ তাহা ভক্ষণ করিত। ক্রমে এত নির্ভয় হইয়াছিল যে, আহারীয় দ্রব্য হাতে করিয়া জলের ধারে বসিলে, সুবালার হাত হইতে তাহারা কাড়িয়া খাইত। একটি রোহিত মৎস্য বড়ই দুর্দান্ত হইয়াছিল। সুবালার হাত হইতে সে সমুদয় কাড়িয়া খাইত, অন্য কাহাকেও তাঁহার নিকটে যাইতে দিত না।

পক্ষী ও মৎস্যদিগকে প্রথম প্রথম সুবালা একেলাই ভোজন প্রদান করিতেন। কিন্তু ছাদে যখন অনেক গোলা-পায়রা আসিয়া বাস করিল, তখন তাহাদিগকে আহার প্রদান করিবার নিমিত্ত রায়-গৃহিণী একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহার দ্বারা এ কাজ ভালরূপে সম্পন্ন হইল না। পায়রা দেখাইবার নিমিত্ত রাধা গোয়ালিনী একদিন পাগলীকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল। সেই সময় নীলকণ্ঠ পক্ষিগণ পায়রাদিগের উপর উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছিল। সুবালা বলিলেন,—'চঞ্চলা! এই লাঠি হাতে করিয়া এই স্থানে বসিয়া থাক। নীলকণ্ঠ পাখী আসিলে তাড়াইয়া দিও।'

পাগলী সে কাজ উত্তমরূপে করিল। তাহার ভয়ে নীলকণ্ঠ পাখীরা পায়রাদিগের উপর আর উপদ্রব করিতে সাহস করিল না। তাহাদিগের জন্য যে কয়টি নূতন খোপ প্রস্তুত হইয়াছিল, সেই খোপে গিয়া তাহারা বাস করিতে লাগিল।পরদিন প্রাতঃকালে সুবালা

পক্ষিভোজনের সময় পাগলীকে সঙ্গে লইয়া গেলেন। অন্য লোক নিকটে গেলে পক্ষিগণ তৎক্ষণাৎ উড়িয়া পলাইত, কিন্তু পাগলীকে দেখিয়া তাহারা সেরূপ ভয় করিল না। একপ্রকার আশ্চর্য-জ্ঞানবলে তাহারা বুঝিতে পারিল যে, এ আমাদের অনিষ্ট করিবে না। সুবালা সেদিন পাগলীকে পরিবেষণ করিতে দিলেন। সুবালাকে পশু-পক্ষিগণ যেরূপ ভালবাসিত, ততটা না হউক, কিন্তু পাগলীর সহিতও তাহাদের সদ্ভাব হইল। গোশালায় গাভীদিগকে, ছাদে কপোতগণকে, জলাশয়ে মৎস্যগণকে ও বৃক্ষতলে পক্ষিগণকে আহার দিবার নিমিত্ত ক্রমে ক্রমে সুবালা পাগলীকে নিযুক্ত করিলেন। কখন দুইজনে একসঙ্গে, কখন পাগলী একেলা, কখন সুবালা একেলা বৃক্ষতলে গিয়া পক্ষীদিগকে ভোজন প্রদান করিতেন। সুবালা যখন খুড়ামহাশয়ের বাড়ী যাইতেন, তখন পাগলী একেলা এই কাজ করিত। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ন্যায় তাহার মুখ সর্বদাই বিষণ্ণ হইয়া থাকিত। জীবজন্তুদিগের সহবাসে তাহার মন এখন পূর্বাপেক্ষা প্রসন্নভাব ধারণ করিল। তাহার মাতা ও সুবালার সহিত দুই একটি কথা ব্যতীত অন্য কোন নরলোকের সহিত সে কথোপকথন করিত না। কিন্তু নিভৃতে গোয়ালে বসিয়া গরুদিগের সহিত অথবা ছাদে পায়রাদিগের সহিত, অথবা ঘাটে মৎস্যদিগের সহিত, অথবা গাছতলায় পক্ষী ও কাঠবিড়ালদের সহিত সে অনেক গল্প-গাছা করিত। কিন্তু নিকটে মানুষ গেলেই অমনি সে নীরব হইত, তাহার মুখ হইতে তখন আর একটিও কথা বাহির হইত না।

বাঘার গল্প করিতে করিতে অন্যান্য পশুপক্ষীর কথা বাহির হইয়া পড়িল। সুবালা যখন সাত কি আট বৎসরের বালিকা ছিলেন, তখন একদিন তিনি গ্রামের ভিতর বেড়াইতে গিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন যে, জনকয়েক বালক ছোট একটি কুকুর-শাবকের পায়ে দড়ি বাঁধিয়া তাহাকে পুষ্করিণীর জলে ফেলিতেছে ও তুলিতেছে। নিদারুণ যাতনায় কুকুরছানাটি কাঁপিতেছে। তাহার ক্লেশ দেখিয়া নিষ্ঠুর বালকগণ হাততালি দিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছে। তাহাদের নিষ্ঠুরতা দেখিয়া সুবালার সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। অনেক ভর্ৎসনা করিয়া তাহাদের নিকট হইতে কুকুরছানাটি তিনি কাড়িয়া লইলেন। জলে ও কাদায় তাহার সর্বশরীর ময়লা ও ভিজা হইয়াছিল। সেই অবস্থাতেই সুবালা তাহাকে বুকে লইয়া বাড়ী আসিলেন। ছানাটিকে তিনি প্রতিপালন করিতে লাগিলেন এবং তাহার নাম বাঘা রাখিলেন। কালক্রমে বাঘা সাহসী ও বিক্রমশালী কুকুর হইয়া উঠিল। দৌড়াদৌড়ি করিয়া সুবালার সহিত খেলা করিতে অথবা তাঁহার সঙ্গে সকল স্থানে যাইতে বাঘা বড় ভালবাসিত। কিন্তু অন্য কুকুরের সহিত সে ঝগড়া করিত, বিড়াল দেখিলে তাড়া করিয়া যাইত, পক্ষীদিগের সে ভয় দেখাইত, সেজন্য সকল সময়ে সুবালা তাহাকে সঙ্গে যাইতে দিতেন না।

বাঘাকে লইয়া সুবালা একদিন বাগানে গিয়াছিল। বাঘা ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিতেছিল। সহসা নদীর দিকে একটা কলরব উপস্থিত হইল। বাঘা গর্জন করিয়া উঠিল। কুকুর পাছে সেই দিকে দৌড়িয়া যায়, সেজন্য নিকটে ডাকিয়া সুবালা তাহার গলার অলঙ্কৃত সুন্দর বক্লসটি ধরিয়া রহিলেন। সুবালার পশ্চাদ্দিকে কোলাহল ক্রমে নিকটবর্তী

হইতে লাগিল। সুবালার হাত হইতে মুক্ত হইয়া সেই দিকে যাইবার নিমিত্ত বাঘা লম্ফ ঝম্ফ করিতে লাগিল। মাটিতে বসিয়া দুইহাতে প্রাণপণে সুবালা তাহার গলার বক্‌লস ধরিয়া রহিলেন। কিন্তু বাঘা এত লাফালাফি করিতে লাগিল যে, তাহাকে ধরিয়া রাখা ভার হইল। পশ্চাদ্দিকের গোলমাল আরও নিকটবর্তী হইল। বাঘাকে লইয়া সুবালা ব্যস্ত ছিলেন। পশ্চাদ্দিকে কেন এত গোলমাল হইতেছিল, তাহা দেখিবার নিমিত্ত তিনি অবসর পাইতেছিলেন না। পশ্চাদ্দিকে ত্রিলোচন ও শঙ্করার কণ্ঠস্বর তিনি শুনিতে পাইলেন। উচ্চৈঃস্বরে তাহারা চীৎকার করিতেছিল,—'সুবালা দিদি, পলাও, সুবালা দিদি, পলাও!' সেই মুহূর্তে সম্মুখ দিক হইতে বড়ালমহাশয় চীৎকার করিয়া বলিলেন,—'সুবালা দিদি, বাঘাকে ছাড়িয়া দাও। শীঘ্র বাঘাকে ছাড়িয়া দাও।'

সুবালা বাঘাকে ছাড়িয়া দিলেন। তাহার পর ফিরিয়া দেখিলেন যে,—সর্বনাশ! একটা হন্যা বা ক্ষিপ্ত শৃগাল নক্ষত্রবেগে তাঁহার দিকে দৌড়িয়া আসিতেছে। তাহার পশ্চাতে ত্রিলোচন, শঙ্করা ও অন্যান্য অনেক লোক লাঠি হাতে করিয়া দৌড়িতেছে। কিন্তু সে দ্রুতগামী ক্ষিপ্ত শৃগালের সহিত কে দৌড়িতে পারে? তাহারা অনেক পশ্চাতে পড়িয়াছিল। সমুখ দিকে বড়ালমহাশয়ও অনেক দূরে দৌড়িয়া আসিতেছিলেন। কি পশ্চাতের, কি সমুখের কেহই সুবালাকে রক্ষা করিতে পারিত না। তাহারা সেস্থানে পৌঁছিবার পূর্বেই শৃগাল সুবালার উপর পড়িয়া তাঁহাকে দংশন করিয়া ক্ষত-বিক্ষত করিত। নিকটস্থ কয়েকখানি গ্রামে অনেকগুলি মানুষ ও গরুকে সে দংশন করিয়া সেই শৃগাল রায়মহাশয়ের বাগানে প্রবেশ করিয়াছিল। যে সকল মানুষ ও গরুকে সে দংশন করিয়াছিল, তিনমাসের মধ্যে তাহারা সকলেই ভয়ানক জলাতঙ্ক রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। সেজন্য সুবালাকে যদি হন্যা শৃগাল কামড়াইত, তাহা হইলে বড়ই বিপদ ঘটিত।

বাঘাকে ছাড়িয়া, পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া, সুবালা দেখিলেন যে, শৃগাল তখন প্রায় বিশহাত দূরে রহিয়াছে। কিন্তু এত দ্রুতবেগে সে দৌড়িয়া আসিতেছিল যে, নিমিষের মধ্যে সুবালার উপর আসিয়া পড়িত। ভাগ্যে বড়ালমহাশয় বাঘাকে ছাড়িয়া দিতে বলিলেন, ভাগ্যে সুবালা তৎক্ষণাৎ তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন, তাই সুবালার প্রাণরক্ষা হইল। চক্ষুর পলকে বাঘা গিয়া শৃগালের উপর পড়িল। তাহার টুঁটি ধরিয়া দুই চারিবার তাহাকে এদিক ওদিকে ঝাঁকাইল। সামান্য আঘাতেই ক্ষিপ্ত শৃগালের প্রাণবিয়োগ হয়। তীক্ষ্ণদন্ত দ্বারা তাহার গলদেশ ধরিয়া বাঘা যেই তাহাকে দুই চারিবার এদিকে ওদিকে নাড়িল, আর তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হইল। বাঘা এইরূপ কৌশলে তাহাকে ধরিয়াছিল যে, শৃগাল তাহাকে কামড়াইতে অবসর পায় নাই। কিন্তু শৃগাল যদি দংশন করিত, তাহা হইলে বাঘারও প্রাণসংশয় হইত। পশ্চাৎ ও সমুখদিকের লোকসকল আসিয়া মৃত শৃগালের নিকট দাঁড়াইল। ঘোর বিপদ হইতে সুবালা রক্ষা পাইলেন, সেজন্য সকলের আনন্দের সীমা রহিল না। বাঘাকে সকলে আদর করিতে লাগিল। অস্থি-সম্বলিত ভাল মাংস আনাইয়া রায়-গৃহিণী সেদিন বাঘাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। শৈশবকালে সুবালা বাঘার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, বাঘা এক্ষণে সেই ঋণ পরিশোধ

করিল।

অন্ধকার ঘর হইতে খোঁনা স্বরে কে যখন বলিল,—'তুঁমি আঁমাকেঁ ডাঁকিলেঁ কেঁন?' তখন বাঘা সেইদিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া মেঘগর্জনের ন্যায় গম্ভীর গর্জনে গোঙাইতে লাগিল। 'সুবালাকে একেলা ফেলিয়া যাওয়া উচিত নহে,' বোধহয় এইরূপ ভাবিয়া বাঘা সে স্থান হইতে উঠিল না, অন্ধকার ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে সে চেষ্টা করিল না।

'বাঘা আমার নিকটে আছে,' এইরূপ ভাবিয়া সুবালার মনে অনেকটা সাহসের সঞ্চার হইল। তথাপি ভয়ে তাঁহার মুখশ্রী বিবর্ণ হইল, ভয়ে তাঁহার কণ্ঠ শুষ্ক হইল, ভয়ে তাঁহার হস্তপদ কাঁপিতে লাগিল। মানুষ যতই সাহসী হউক না কেন বড় বড় বীরপুরুষের মনেও ভূতের নামে কিরূপ একটা আতঙ্ক উপস্থিত হয়। ব্যাঘ্র-ভল্লুকের সহিত সম্মুখ যুদ্ধ করিতে যাহারা কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না, রণক্ষেত্রে অকাতবে যাহারা প্রাণ বিসর্জন করিতে পারে, এরূপ লোকের হৃদয়ও ভূতের ত্রাসে কম্পিত হয়।

চতুর্থ অধ্যায় – বড়াল-গৃহিণী

ভাগ্যক্রমে এই সময় বিনয় পেরেক প্রভৃতি লইয়া উপস্থিত হইলেন। সুবালার মুখ দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কি হইয়াছে?'

হাত দিয়া সুবালা অন্ধকার ঘর দেখাইলেন।

ঘোরতর বিস্ময়াপন্ন হইয়া বিনয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'ও ঘরে কি?'

সুবালা উত্তর দিতে না দিতে চোরাকুঠীর হইতে খোনা স্বরে শব্দ আসিল,—'এঁ ঘঁরে আঁমি! আঁমি কাঁলাঁ বাঁবাঁ। আমি খাঁদা ভূত।'

সাতিশয় আশ্চর্যান্বিত হইয়া বিনয় কিছুক্ষণ সেই অন্ধকার ঘরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ভীরু বলিয়া বাঙ্গালী জাতির অপবাদ আছে, বিনয় তাহা পুস্তকে পাঠ করিয়াছিলেন। সে জন্য তিনি সংকল্প করিয়াছিলেন —'আমা হইতে যতটুকু হয়, আমি এ অপবাদ দূর করিতে চেষ্টা করিব। প্রাণ থাকে আর যায়, কোন কাজে আমি ভয় করিব না।'

খাঁদা ভূতের ভয়ে তিনি ভীত হইলেন না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—'দিনের বেলা ভূত! তুমি মানুষ না ভূত?'–সে উত্তর করিল,—'আমি জীবিত মাঁনুষ।'

সন্ন্যাসী কালা-বাবা অনেক দিন হইতে খাঁদা ভূত নামে পাঠকদিগের নিকট পরিচিত হইয়াছে। সেজন্য তাঁহাকে আমরা খাঁদা ভূত বলিয়া ডাকিব। নাসিকাবিহীন হইয়া তাহার স্বর খোনা হইয়া গিয়াছে। খোনা কথা লিখিতে ও পড়িতে কষ্ট হইবে। সেজন্য সহজ ভাষায় তাহার কথা আমরা এ স্থানে লিখিব।

বিনয় বলিলেন,—'যদি তুমি জীবিত মানুষ, তাহা হইলে ও ঘর হইতে এ ঘরে এস।

খাঁদা ভূত উত্তর করিল,—তোমাদের কুকুর আমাকে কামড়াইবে। ঘর হইতে কুকুর বাহির করিয়া দাও।'–সুবালার দিকে চাহিয়া বিনয় আস্তে আস্তে বলিলেন,—'এ আবার এক নূতন ব্যাপার! বৃত্তান্ত কি, জানিলে ভাল হয় না?'

সুবালা বাঘাকে বাহিরে যাইতে বলিলেন, কিন্তু তাঁহাকে এ ভয়ের মাঝে ছাড়িয়া বাঘা

স্বীকৃত হইল না। সুবালা তাহাকে সঙ্গে লইয়া নীচের তলায় গমন করিলেন। চাকরের নিকট বাঘাকে রাখিয়া, সত্বর তিনি প্রত্যাগমন করিলেন। মাঝের দ্বার দিয়া খাঁদা ভূত তখন সেই ঘরে প্রবেশ করিল।

ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, নাসিকাবিহীন, পলিত-কেশ,—বিকট মূর্ত্তি। সে মূর্ত্তি দিনের বেলা দেখিলে ভয় হয়, রাত্রির তো কথাই নাই।—তাহার আকৃতি দেখিয়া বিনয় পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'যথার্থই কি তুমি জীয়ন্ত মানুষ?'

খাঁদা ভূত উত্তর করিল,—'আমাকে বরং তুমি টিপিয়া দেখ।'

ঈষৎ হাসিয়া বিনয় তাহার হাত টিপিয়া দেখিলেন। যথার্থই রক্তমাংসের শরীর বটে!

বিনয় বলিলেন,—'তোমার পূর্ব-কাহিনী আমি অনেক শুনিয়াছি। তুমিই সেই কালা-বাবা! তুমিই খাঁদা ভূত সাজিয়া এ গ্রামের লোককে উৎপীড়িত করিয়াছিলে? কিজন্য পুনরায় এ স্থানে আসিয়াছ?'

খাঁদা ভূত উত্তর করিল,—'আজ তিনদিন উপবাসী আছি। ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় আমার জঠর জ্বলিয়া যাইতেছে; আমার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। যদি তোমাদের দয়া-ধর্ম থাকে, তাহা হইলে আমাকে প্রথম কিছু আহার-প্রদান কর। পরে সকল কথা বলিব।'

সুবালা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বিনয় বলিলেন,—'তোমার পিসীমাকে এখন এখানে আসিতে মানা করিবে। বলিবে যে, পূর্বদিকের সিঁড়ি দিয়া একজন বাহিরের লোক আসিয়াছে?'—মুড়ি, দুগ্ধ ও গুড় লইয়া অল্পক্ষণ পরে সুবালা ফিরিয়া আসিলেন। আহার করিয়া খাঁদা ভূত পরম পরিতোষ লাভ করিল।'

বিনয় পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কি জন্য এ স্থানে আসিয়াছে? বিনা অনুমতিতে ভদ্রলোকের অন্তঃপুরে কেন প্রবেশ করিয়াছ?'

খাঁদা ভূত উত্তর করিল,—'আমি শুনিয়াছি যে, রায়মহাশয় নামক একব্যক্তি এখন এ বাড়ীর কর্ত্তা। তিনি কোথায়? তাঁহার সহিত আমার কিছু গোপনীয় কথা আছে।'

বিনয় উত্তর করিলেন,—'রায়মহাশয়ের কাল হইয়াছে।'-খাঁদা ভূত জিজ্ঞাসা করিল,—'তবে এ বাড়ীর এখন কর্ত্তা কে? তাঁহার সহিত আমার অতি আবশ্যকীয় কথা আছে।'

সুবালাকে দেখাইয়া বিনয় উত্তর করিলেন,—'ইনিই এখন এ বাড়ীর কর্ত্রী।'

খাঁদা ভূত জিজ্ঞাসা করিল,—'ইহার এখনও বিবাহ হয় নাই?'

বিনয় উত্তর করিলেন,—'না'।

খাঁদা ভূত বলিল,—'ইনি ক্ষেত্রজ্ঞা অথবা অম্বিকা কুমারী। শাস্ত্রে বলিয়াছে—ত্রয়োদশে মহালক্ষ্মীর্দ্বিসক্ পীঠনায়িকা; ক্ষেত্রজ্ঞা পঞ্চদশভিঃ ষোড়শ চাম্বিকা স্মৃতা।'

খাঁদা ভূত পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,—'তুমি কে?'

বিনয় উত্তর করিলেন,—'আমি ইঁহাদের বন্ধু। কুটুম্ব বলিলেও চলে।'

সুবালাকে সম্বোধন করিয়া খাঁদা ভূত অতি বিনীতভাবে বলিতে লাগিল,—'মা। আমি ঘোর পাপিষ্ঠ। আমার কথা কিছু না কিছু তুমি শুনিয়া থাকিবে। দয়ার উপযুক্ত পাত্র আমি

নই। কিন্তু মা, আমি বড় দুঃখে পড়িয়াছি। যদি নিজগুণে তুমি আমাকে কৃপা কর, তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হই।'

সুবালা উত্তর করিলেন,—আমি সামান্য বালিকা, আমার নিকট কেন আপনি ঐরূপ বিনয় করিতেছেন? পাপরূপ বীজ হইতে সকল দুঃখই উৎপন্ন হয়। সুতরাং পাপ পুণ্যের বিচার করিয়া যদি দয়া করিতে হয়, তাহা হইলে কাহারও প্রতি দয়া করা হয় না। আমি কে যে, পাপ-পুণ্যের বিচার করিব! সে বিচার ভগবান্ করিবেন।'

খাঁদা ভূত বলিল,—'তোমার মুখশ্রী দেখিয়া বোধ হয় হে, তুমি মা, দয়াময়ী। তুমি মা, সাক্ষাৎ ভগবতী। নানা আকারে সেই মহাশক্তি আবির্ভূতা হন। রুধির-বসনা শ্যামারূপে তিনি বিশ্বসংসারকে চর্বণ করেন স্ব গ্রসনাৎ সর্বসত্ত্বানাং কালদন্তেন চর্বণাৎ। তদ্রক্তসঙ্ঘো দেবেশ্যা বাসোরুপেণ ভাষিতম্।ৰ অন্নপূর্ণারূপে তিনি জীবগণকে আহার প্রদান করেন, আবার জগদ্ধাত্রীরূপে তিনি মাতার ন্যায় দয়ারূপিণী মহাশক্তি। তুমি মা, আমার প্রতি কৃপা কর।'

সুবালা বলিলেন,—'আপনার কি উপকার করিতে পারি, তাহা বলুন।'

খাঁদা ভূত উত্তর কবিল,—'দিন কয়েকের জন্য আমি অন্ধকার ঘরে লুক্কায়িত থাকিব। প্রথম, সেই অনুমতি আমি প্রার্থনা করি।'

সুবালা বলিলেন,—'যদি আপনি কাহাকেও বধ করিয়া, অথবা চুরি করিয়া অথবা কোনরূপ দুষ্কর্ম করিয়া, এ স্থানে আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে কি করিয়া আপনাকে আমরা আশ্রয় প্রদান করি?'

খাঁদা ভূত উত্তর করিল,—'না, মা! সেরূপ কোন মন্দকর্ম করিয়া আমি আগমন করি নাই। আমাকে আশ্রয় প্রদান করিলে কাহারও বিন্দুমাত্র অনিষ্ট হইবে না। বরং তোমার মঙ্গ ল হইবে, আমার মঙ্গল হইবে এবং অন্যান্য লোকেরও মঙ্গল হইবে।'

সুবালা বলিলেন,—'আপনার দুঃখ দূর করিতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। কিন্তু দেখুন, আমি সামান্য বালিকা। কর্ত্তৃপক্ষদিগের বিনা অনুমতিতে কোন কাজ করা আমার উচিত নহে। বড়ালমহাশয়কে আপনি জানেন? এ স্থানে তিনি আমার রক্ষক ও অভিভাবক। তাঁহাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া আমি কোন উত্তর দিতে পারি না।

খাঁদা ভূত বলিল,—'তবে, মা, তাঁহাকে একবার ডাকিতে পাঠাও। আমার প্রতি পূর্বে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। কিন্তু বুঝাইয়া বলিলে, এখন বোধ হয়, আমার এ প্রস্তাবে তিনি সম্মত হইবেন।'

সুবালা বলিলেন—বড়ালমহাশয় বৃদ্ধ হইয়াছেন। প্রাতঃকালে তিনি কাজে গিয়াছিলেন। দুই প্রহরের পর বাটী প্রত্যাগমন করিয়া আহারাদি করিয়া একটু শয়ন করিয়াছেন। এখন তাঁহাকে আমি ডাকিব না। একঘণ্টা পরে তিনি আপনি উঠিবেন। তখন তাঁহাকে ডাকিয়া আনিব।'

চুপ করিয়া বিনয় দুইজনের কথোপকথন শুনিতেছিলেন ও মনে মনে চিন্তা

করিতেছিলেন। এক্ষণে তিনি উঠিয়া ঘরের বাহিরে বারাণ্ডায় গমন করিলেন। সে স্থানে সুবালাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'নিতান্তই কি তুমি উইল সম্বন্ধে তদন্ত করিবে? উইল সম্বন্ধে কোন কথা উত্থাপন করিয়া আর আবশ্যক কি? এ সম্পত্তি যদি আইনানুসারে তোমার না হয়, তাহা হইলে বিজয়বাবুর হইবে। কিন্তু বিজয়বাবু বড়ালমহাশয়কে লিখিয়াছেন যে, এ সম্পত্তিতে তাঁহার প্রয়োজন নাই। তিনি কোনরূপ আপত্তি করিবেন না। আর আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি যে, উইল যদি কৃত্রিমও হয়, তাহা হইলে তোমাকে বঞ্চিত করিয়া কিছুতেই তিনি এ বিষয় লইবেন না। তবে উইলের কথা তুলিয়া আর আবশ্যক কি?'

সুবালা উত্তর করিলেন,—'সত্য কি, তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি। যতদিন তাহা না জানিতে পারি ততদিন আমার প্রাণ সুস্থির হইবে না। মুহুর্মুহুঃ আমি মনে করিতে থাকিব যে, পরের ধন আমি অপহরণ করিতেছি। বিজয়বাবু কি করিবেন, সে কথায় আমার প্রয়োজন কি? আমার যাহা কর্তব্য তাহাই আমি করিব।'

বিনয় বলিলেন,—'তবে, এতক্ষণ চিন্তা করিয়া আমি এক উপায় স্থির করিয়াছি। খাঁদা ভূতের দ্বারা বড়ালনীকে ভয় দেখাইব, ভয় দেখাইয়া তাঁহার মুখ হইতে সকল কথা বাহির করিব।'—সুবালা উত্তর করিলেন,—'না তাহা হইবে না। বড়াল-দিদিকে তুমি ভয় দেখাইতে পারিবে না।'

বিনয় বলিলেন,—'তবে কি করিয়া আমি প্রকৃত তত্ত্ব বাহির করিব? কৃত্রিম পুলিসের লোক তুমি আনিতে দিবে না। বড়ালনীকে একটু ভয় দেখাইতে দিবে না। যদি কোনরূপ প্রতারণা থাকে, তাহা হইলে তুমি কি মনে করিয়াছ যে বড়ালনী সহজে তাহা প্রকাশ করিবেন? কিছুতেই নহে। এ বিষয়ে তুমি আর কোন আপত্তি করিও না, একটু ভয় পাইলে তোমার বড়াল দিদি গলিয়া যাইবেন না।'

সুবালা চুপ করিয়া রহিলেন। দুইজনে পুনরায় ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন।

খাঁদা ভূতকে সম্বোধন করিয়া বিনয় বলিলেন,—'একঘণ্টা পরে বড়ালমহাশয় আসিলে, তোমার সম্বন্ধে যাহা হউক একটা স্থির হইবে। আপাততঃ সামান্য একটু তুমি ইঁহার উপকার করিবে?'

খাঁদা ভূত জিজ্ঞাসা করিল,—'আমি ইঁহার উপকার করিব! আমি ইঁহার কি উপকার করিতে পারি?'—বিনয় বলিলেন,—'কোন একটি গোপনীয় বিষয় ইনি জানিতে ইচ্ছা করেন। বড়ালনী বোধ হয় তাহা অবগত আছেন; কিন্তু সহজে তিনি প্রকাশ করিবেন না। খাঁদা ভূত সাজিয়া তাঁহাকে একটু ভয় দেখাইতে হইবে। ভয়ে তিনি হয় তো সে কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিবেন।'

ঈষৎ হাসিয়া খাঁদা ভূত উত্তর করিল,—'বড়ালনীকে একটু ভয় দেখাইলে যদি তাঁহার উপকার হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় আমি তাহা করিব। কুমারীকে সন্তুষ্ট করিলে মানুষ অক্ষয় পূণ্য লাভ করে;—'পূতিতাঃ প্রতিপূজ্যন্তে, নির্দহন্ত্যবমানিতা। কুমারী যোগিনী সাক্ষাৎ,

কুমারী পরদেবতা।' যাহারা কুমারী পূজা করে, তাহারা সর্বত্রই পূজনীয় হয়। কুমারীকে অবজ্ঞা করিলে দেবী সবংশে তাহাকে ধ্বংস করেন; কারণ কুমারীই সাক্ষৎ যোগিনী, কুমারীই সাক্ষাৎ পরম দেবতা। আমার জ্ঞানার্ণবে উক্ত হইয়াছে,—'কুমারীপূজিয়া দেবি ফলং কোটিগুণং ভবেৎ। পুষ্পং কুমার্থে যদ্দর্ত্ত তম্মেরুসদৃশং ফলম।।' কুমারীপূজা দ্বারা কোটিগুণ ফললাভ হয়। কুমারীকে একটি পুষ্প দান করিলেও সুমেরু সদৃশ পুষ্পদানের ফল হয়।'—বিনয় বলিলেন,—'তবে তুমি পুনরায় অন্ধকার ঘরে গমন কর। বড়ালনীকে আমি ডাকিতে পাঠাই। চুপি চুপি আমি তাঁহাকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিব। তিনি যদি না বলেন, তাহা হইলে আমি সঙ্কেত করিব। তখন প্রথম তুমি কথায় ভয় দেখাইবে। তাহাতেও যদি তিনি না বলেন, তাহা হইলে পুনরায় আমি সঙ্কেত করিব। তখন এই মাঝের দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া তুমি তাঁহাকে ভয় দেখাইবে।'

খাঁদা ভূত অন্ধকার ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিল। বিনয় মাঝের দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। তাহার পর বারেণ্ডাতে গিয়া বড়ালনীকে ডাকিবার নিমিত্ত একজন চাকরকে তিনি আদেশ করিলেন।

বড়ালনী উপস্থিত হইলেন। বসিবার নিমিত্ত সুবালা মাদুর পাতিয়া দিলেন। সুবালা বলিলেন,—'বড়াল-দিদি! এই ঘরে দিদিমণি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার ছবি আমি এই ঘরে রাখিব। ভাল হইবে না, বড়াল-দিদি?'—বিনয় বলিলেন,—'চুপি চুপি কথা কহ। ঐ অন্ধকার ঘরে কে আছে। সে যেন শুনিতে না পায়।'

বড়ালনী চুপি চুপি বলিলেন,—'ছবি এখানে রাখিলে উত্তম হইবে।'

সুবালাও আস্তে আস্তে কথা কহিতে লাগিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—'শেষ অবস্থায় দিদিমণি আমার নাম করিতেন?'—বড়ালনী উত্তর করিলেন,—'তোমার নাম করিবেন না? তোমার নাম তাঁহার জপমালা হইয়াছিল। তোমাকে বিষয় লিখিয়া দিতে পারিলেন না, সেজন্য তাঁহার দুঃখের সীমা ছিল না।'

বিনয় সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন,—'উইলে তবে কে সহি করিয়াছিল?'

অন্যমনস্কভাবে বড়ালনী বলিয়া ফোলিলেন,—'কেন আমি—'

এই কথা বলিয়াই তিনি চমকিত হইলেন। কথা ফিরাইতে চেষ্টা করিলেন। তিনি বলিলেন,—'তা, এ সকল বিষয় আমি কি জানি, বল। আমি স্ত্রীলোক। আমরা গরীব মানুষ। উইলের কথা আমরা কি জানি। যখন উইল হয়, তখন আমি সে স্থানে উপস্থিত ছিলাম না। ডাক্তারের সম্মুখে বাহির হইতাম। উইল করিবার সময় দুইজন উকিল উপস্থিত ছিলেন। আমি সে স্থানে ছিলাম না। কিন্তু আমি শুনিয়াছি যে উকিল উইল লিখিয়াছিল. রায়গৃহিণী তাহাতে সহি করিয়াছিলেন।

পঞ্চম অধ্যায় — প্রকৃত বিবরণ

বিনয় বলিলেন,—বড়াল দিদি! আর গোপন করিলে চলিবে না। এখন সামান্য একটু কথার সূচনা হইয়াছে, ক্রমে সমস্ত কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। তখন বড় বিপদ ঘটিবে;

এমন কি, এ বিষয়ে যাঁহারা লিপ্ত আছেন, তাঁহাদিগকে হয় তো জেলে যাইতে হইবে। তুমি স্ত্রীলোক, তোমায় বয়স হইয়াছে এই বৃদ্ধবয়সে তোমাকে এবং বড়ালমহাশয়কে যদি জেলে যাইতে হয়, তাহা হইলে বড়ই দুঃখের বিষয় হইবে।'

বড়ালনীর হাত-পা কাঁপিতে লাগিল! কিন্তু মুখে তিনি বলিলেন,—'আমি কি জানি ভাই আমি কি বলিব? আমাকে জেলে দিতে হয়, দাও; কাটিয়া ফেলিতে হয়, ফেল; আমি কিছুই জানি না।'

বিনয় সঙ্কেত করিলেন। অন্ধকার ঘর হইতে খোনা স্বরে কে বলিয়া উঠিল—'বঁল, বঁল, সত্যঁ কঁথা বঁল, না বঁলিলে এখনি তোঁর ঘাঁড় মটকাঁইব।'

বিনয় বলিলেন,—'সর্বনাশ!'

বড়ালনী থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। পুনরায় অন্ধকার ঘর হইতে শব্দ আসিল,—'বল বল, সত্য কথা বল, না বলিলে তোকে খাইয়া ফেলিব।'

বিনয় বলিলেন,—'সর্বনাশ! খাঁদা ভূত!'

বড়ালনী তথাপি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন।

বিনয় পুনরায় সঙ্কেত করিলেন। মাঝের দ্বার অল্প খুলিয়া খাঁদা ভূত আসিয়া সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইল। বড়ালনীর কথা দূরে থাকুক, এখন তাহার সেই ত্রিভঙ্গ মুরারি বিকট রূপ দেখিয়া সুবালাও মুখ শুষ্ক হইয়া গেল।

কাঁপিতে কাঁপিতে অপরিস্ফুট স্বরে বড়ালনী বলিলেন,—'উহাকে সরিয়া যাইতে বল। ঐ, দেখ, হাঁ করিতেছে। চপলার মত আমাকে আস্তো গিলিয়া ফেলিবে। আমি সকল কথা বলিতেছি। তাহার পর আমার কপালে যাহা থাকে, তাহা হইবে।'

খাঁদা ভূতকে সরিয়া যাইবাব নিমিত্ত বিনয় আদেশ করিলেন। দ্বারের নিকট হইতে খাঁদা ভূত সরিয়া গেল। বিনয় পুনরায় দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন।

সুবালা বলিলেন,—বড়াল-দিদি! শৈশবকাল হইতে তোমরা আমাকে প্রতিপালন করিয়াছ; প্রাণ থাকিতে তোমাদের কোন অনিষ্ট হইতে আমি দিব না। নির্ভয়ে সমস্ত কথা বল। তোমার কোন ভয় নাই।'

বড়ালনী উত্তর করিলেন,—'সুবালা দিদি! ভাল বল, মন্দ বল, যাহা আমরা করিয়াছি, সে কেবল তোমার মঙ্গলের জন্যই করিয়াছি। তোমার দিদিমণি বুঝিয়াছিলেন যে, উইল করিবার পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হইবে। যাহা কিছু আমরা করিয়াছি, তাঁহারই আজ্ঞাক্রমেই করিয়াছি। তিনি এই কাজ করিবার নিমিত্ত কিরূপ কাতর স্বরে আমাদিগকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাহা যদি দেখিতে, তাহা হইলে তুমি আমাদিগকে দোষ দিতে না। আমি লেখাপড়া জানি না। নিজের কাছে বসাইয়া তাঁহার মত স্বাক্ষর করিতে শিখিবার নিমিত্ত প্রতিদিন তিনি আমাকে শিক্ষা প্রদান করিতেন। প্রতিদিন তাঁহার কাছে বসিয়া শত শত বার তাঁহার নাম আমাকে লিখিতে হইত। তাহার পর সেই কাগজ তাঁহার সাক্ষাতে আমি পোড়াইয়া ফেলিতাম। উইলের সময় তিনি জীবিত ছিলেন না। রায়-গৃহিণী সাজিয়া আমি

এই খাটের উপর শয়ন করিয়াছিলাম। উইলে আমি সহি করিয়াছিলাম। যাহা করিয়াছি, তাঁহার আজ্ঞায় করিয়াছি, আর সুবালা দিদি! তোমার ভালর জন্য করিয়াছি। সকল কথা বলিয়া ফেলিলাম। এখন আমাদিগকে রাখিতে হয় রাখ; মারিতে হয় মার; যাহা ইচ্ছা হয় তাহা কর।'

দিদিমণির জন্য সুবালা কাঁদিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বিনয় বলিলেন,—'কাঁদিলে আর কি হইবে। বড়ালমহাশয়কে এখন ডাকিতে পাঠাও। এতক্ষণে তিনি বোধ হয় উঠিয়া থাকিবেন। তিনি আসিলে প্রথমে তাঁহাকে উইলের কথা জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। তাহার পর খাঁদা ভূতের কথা।'

চক্ষু মুছিতে মুছিতে সুবালা বাহিরে গিয়া বড়ালমহাশয়কে ডাকিতে পাঠাইলেন। বড়ালমহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বিনয় বলিলেন,—'আস্তে আস্তে কথা কহিবেন। ঐ অন্ধকার ঘরে একজন আছে। সে যেন আমাদের কথা শুনিতে না পায়। আমরা সকল কথা শুনিয়াছি। আর গোপন করা বৃথা। সুবালার নামে যে উইল হইয়াছে, তাহা প্রকৃত নহে।'

সকোপ নয়নে পত্নীব দিকে দৃষ্টি করিয়া বড়ালমহাশয় বলিলেন,—'কে বলে যে উইল প্রকৃত নহে? দুইজন উকিলের সাক্ষাতে সে উইল হইয়াছিল। সুবালা দিদির সহিত তোমার বিবাহ হইবে, তাহাই জানি। এই সম্পত্তির তুমি একদিন অধিকারী হইবে, তাহাই জানি। সুবালা দিদির সহিত শত্রুতা করিয়া তুমি যে তাঁহাকে এই সম্পত্তি বঞ্চিত করিতে চেষ্টা করিবে, স্বপ্নেও তাহা ভাবি নাই।'

বিনয় উত্তর করিলেন,—'সুবালার আমি অনিষ্ট করিব না। উইল প্রকৃত হউক অথবা নাই হউক, সুবালার কোন অনিষ্ট হইবে না। সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিত থাকুন। আমি সত্য করিয়া বলিতেছি যে, সুবালার কোন অনিষ্ট হইবে না। তবে প্রকৃত ঘটনা কি হইয়াছিল, সুবালা তাহা জানিতে ইচ্ছা করেন। জাল উইল প্রস্তুত করা সামান্য অপরাধ নহে। আমার বোধ হয়, ধনুকধারী সকল কথা অবগত আছে। ধনুকধারীকে বিশ্বাস করিবেন না। তাহার কথাতেই সুবালার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। সমস্ত বিষয় সাধারণের নিকট প্রকাশ হইলে বিপদ ঘটিতে পারে। কি ঘটিয়াছিল, এক প্রকার আমরা অবগত হইয়াছি। কিন্তু বিস্তারিত বিবরণের জন্য বড়াল-দিদিকে আমরা উৎপীড়িত করিতে ইচ্ছা করি না। সেই জন্য আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।'

সুবালা বলিলেন,—'বড়ালমহাশয়! পিতা কে আমি জানি না। আমি যখন শিশু, তখন তাঁহার পরলোক হইয়াছিল। তাহার পর বড় ভগিনী ও মাতাও আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। পিতা-মাতার ন্যায় স্নেহ মমতা করিয়া আপনারাই আমাকে প্রতিপালন করিয়াছেন। তাহার পর এই উইল আমার মঙ্গলের জন্যই আপনারা করিয়াছেন। আমি যে আপনাদের অনিষ্ট করিব, সে চিন্তা মনেও স্থান দিবেন না।'

বড়ালমহাশয় উত্তর করিলেন,—'তুমি আমার মন্দ করিবে, সে ভয় আমার হয় নাই।

পাছে তুমি আমাদের সমুদয় পরিশ্রম বিফল কর, সেই ভয় আমার হইতেছে। বাল্যকাল হইতে তোমাকে আমি জানি। সমগ্র পৃথিবীর যাবতীয় ধনরত্ন যদি একদিকে হয়, আর সত্য যদি অপর দিকে হয়, তাহা হইলে সেই ধনরত্নকে তুচ্ছ করিয়া সত্যকেই তুমি গ্রহণ করিবে। সুবালা দিদি। যাহা শুনিয়াছ, তাহা শুনিয়াছ; আর অধিক কথা জানিয়া আবশ্যক নাই।'

সুবালা উত্তর করিলেন,—'যাহা শুনিয়াছি, তাহাই যথেষ্ট; তবে অকারণ আপনি বিস্তারিত বিবরণ গোপন করিতেছেন, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। এখন বলুন, কবে দিদিমণির পরলোক হইয়াছিল, উইলই বা কবে হইয়াছিল?'

কিছুক্ষণ নীরবে বড়ালমহাশয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাহার পর তিনি বলিলেন,—'যখন সকল কথা শুনিয়াছ, তখন আর গোপন করা বৃথা। ১৮ই শ্রাবণ অর্থাৎ পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইবার দুইদিন পূর্বে তোমার দিদিমণির মৃত্যু হইয়াছিল। ২২শে শ্রাবণ উইল হইয়াছিল।'

বিনয় বলিলেন,—'আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ সুবালা জানিতে ইচ্ছা করেন।'

বড়ালমহাশয় উত্তর করিলেন,—'এ সম্বন্ধে অধিক কিছু নাই। শ্রাবণ মাসের প্রথমে চিকিৎসকগণ জবাব দিল। সকলে বলিল যে, সম্ভবতঃ সাত আট দিনের মধ্যে রোগিণীর মৃত্যু হইবে। রায়-গৃহিণী নিজেও বুঝিলেন যে, তাঁহার আয়ু শেষ হইয়াছে। আমি হতাশ হইয়া পড়িলাম। যদি কোন প্রতিকার করিতে পারি, সেজন্য আমি কলিকাতায় গমন করিলাম। সে স্থানে সকলে বলিল যে, সন্ন্যাসিপ্রদত্ত স্বপ্নলব্ধ নানারূপ ঔষধ তিনি অবগত আছেন। ডাক্তার-বৈদ্য কর্তৃক পরিত্যক্ত অনেক পীড়িত ব্যক্তির প্রাণরক্ষা করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে লইয়া আসিলাম। রোগিণীকে পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার-বৈদ্যগণ যাহা বলিয়াছিলেন, তিনিও তাহাই বলিলেন। ২০শে শ্রাবণ পর্যন্ত জীবিত থাকা সম্ভব নহে, রায়-গৃহিণীকে তাহা বোধ হয় তিনি প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন। রোগিণী ও চিকিৎসক দুইজন ফুস্ ফুস্ করিয়া পরামর্শ হইতে লাগিল। দিন দুই পরে, একদিন রায়-গৃহিণী আমাকে বলিলেন—'বড়ালমহাশয়! আমার একটি কথা রাখিতে হইবে। আমার নিকট একটি সত্য করিতে হইবে? রায়-গৃহিণী উত্তর করিলেন,—'উইলের সময় পর্যন্ত যদি আমি জীবিত না থাকি, তাহা হইলে সুবালা যাহাতে সম্পত্তি পায়, তাহা আপনাকে করিতে হইবে। সে কার্যে ডাক্তারমহাশয় আপনার সহায়তা করিবেন।' আমি উত্তর করিলাম,—'কি করিয়া তাহা আমি করিব? আমি সামান্য ব্যক্তি। আমার ক্ষমতা কি? ডাক্তার বলিলেন,—'ধনবান লোকদিগের ঘরে এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। আমি উইল করিব, ধনবান লোক এইরূপ মানস করেন। আজ করিব, কাল করিব বলিয়া দিনপাত করিতে থাকেন। অবশেষে হঠাৎ একদিন তাঁহার মৃত্যু হয়। তখন তাঁহার কর্মচারিগণ অথবা আত্মীয়স্বজন একখানি উইল প্রস্তুত করেন। ইহাতে কোন পাপ নাই। কারণ, তিনি যেরূপ ইচ্ছা করিয়াছিলেন, উইল সেই ভাবে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এক্ষেত্রেও তাহাই হইবে। রায়মহাশয় যেরূপ ইচ্ছা করিয়াছিলেন, ইনি এক্ষণে যেরূপ ইচ্ছা করিতেছেন, উইল ঠিক সেইরূপ

হইবে। ভগবান করুন, ইহার অবর্তমানে আমাদিগকে এ কাজ না করিতে হয়। অদ্য আমি যে ঔষধ প্রদান করিয়াছি, তাহার গুণে ইনি হয়ত অনেক দিন জীবিত থাকিবেন।'

বড়ালমহাশয় বলিলেন,—'প্রথম রায়-গৃহিণীর কাকুতি-মিনতি, তাহার পর সুবালা দিদির মঙ্গল কামনা;—আমি সম্মত হইলাম। রায়-গৃহিণীর নিকট আমি সত্য করিলাম। বলিলাম—যে কার্য করিলে দিদির মঙ্গল হইবে, প্রাণপণে আমি সে কার্য করিব। তাহার জন্য আমাকে যদি কারাবাসে যাইতে হয়, তাহাও স্বীকার। কিন্তু ভয় এই—রায়মহাশয় কিরূপ উইল করিয়া গিয়াছেন, সেকথা চাকব-বাকর গ্রামের লোক, রায়মহাশয়ের ভ্রাতা প্রভৃতি সকলেই অবগত আছে। কবে ইঁহার পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইবে, সকলে তাহা শুনিয়াছে। অতএব তাহার পূর্বে যদি কোনরূপ অমঙ্গল ঘটে, তাহা হইলে কি হইবে?'—ডাক্তার উত্তর করিলেন,—'সে সম্বন্ধে চিন্তা নাই। আমরা তাহা গোপন রাখিব।'

'সেইদিন হইতে রোগিণীর নিকট বাহিরের লোক কেহ যাইতে পাইত না। কেবল ডাক্তার, আমি, আমার স্ত্রী ও ধনুকধারী, এই কয়জনে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিতাম। তোমার দিদিমণি ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া পড়িলেন। ডাক্তারের আদেশে কলিকাতা হইতে প্রতিদিন দুই মণ বরফ আসিতে লাগিল। কাসিরোগের চিকিৎসার জন্য শীতল বরফ। সকলে আশ্চর্য হইল, কিন্তু কেহ কিছু বলিল না। ডাক্তার বরফ ব্যবহার করিতেন না। ঐ অন্ধকার ঘরে পড়িয়া বৃথা গলিয়া যাইত। ডাক্তারের আজ্ঞায় চারি হাত লম্বা ও দুই হাত প্রস্থে একটি কাঠের বাক্স আমি প্রস্তুত করাইলাম। তাহাও তিনি ঐ অন্ধকার ঘরে রাখিয়া দিলেন।'

বড়ালনী বলিলেন,—'কি করিয়া তাঁহার নাম স্বাক্ষর করিতে হয়, এই সময় রায়-গৃহিণী আমাকে শিক্ষা দিতেছিলেন।

বড়ালমহাশয় বলিলেন,—'হাঁ, পূর্ব হইতেই তিনি নিজে স্থির করিয়াছিলেন যে, যদি তাঁহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আমার স্ত্রী উইলে সই করিবেন। শেষ পর্যন্ত তাঁহার সম্পূর্ণ জ্ঞান ছিল। ১৯ই শ্রাবণ সন্ধ্যাকালেও তিনি গল্প করিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার নাড়ী ছাড়িয়া গেল, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলিতে কষ্ট হইতে লাগিল। প্রবল শ্বাসের ভিতরও তিনি বলিতেছিলেন,—'আমি চলিলাম। দেখবেন, যাহা বলিয়াছি, তাহার যেন অন্যথা না হয়। সুবালা যেন এই সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত না হয়। এইজন্যই সুবালাকে আমি তাড়াতাড়ি তাহার কাকার বাড়ী পাঠাইয়া দিলাম। সুবালা এ স্থানে থাকিলে আপনারা কিছুই করিতে পারিতেন না। আমার কি সাধ নহে যে, সুবালার চাঁদ মুখখানি দেখিতে দেখিতে প্রাণত্যাগ করি!' বিনয়বাবু, তোমার নামও তিনি অনেকবার করিয়াছিলেন।'

ষষ্ঠ অধ্যায় — বড়ালমহাশয়ের কথা

বড়ালমহাশয় বলিতেছেন,—'রায়-গৃহিণী প্রাণত্যাগ হইলে, ডাক্তারের আদেশে তাঁহার মৃতদেহ আমরা সেই বাক্সের ভিতর রাখিলাম। উপরে ও নীচে বরফ দিয়া বাক্সটি পূর্ণ হইল। সেজন্য মৃতদেহ নষ্ট হইল না। ডাক্তার কেন যে আমাকে কাঠের বাক্স প্রস্তুত

করাইতে বলিয়াছিলেন ও কেন যে তিনি কলিকাতা হইতে প্রতিদিন দুই মণ বরফ আনাইতেছিলেন, তাহার মর্ম এখন বুঝিতে পারিলাম। রায়-গৃহিণীর যে পরলোক হইয়াছে, কেহই তাহা জানিতে পারিল না। মৃত্যুর চারিদিন পূর্বে তাঁহাকে আমরা এই ঘরে আনিয়াছিলাম। ডাক্তার, আমি, আমার গৃহিণী ও ধনুকধারী পূর্বের ন্যায় সর্বদা এই ঘরে বসিয়া থাকিতাম। পূর্বের ন্যায় যথাসময়ে এই ঘরে রোগিণীর পথ্যাদি আসিতে লাগিল। মৃত্যুর তিনদিন পরে উইল হইল। উইলের পরদিন আমরা তাহার মৃত্যুসংবাদ প্রকাশ করিলাম ও যথাবিধি তাঁহার মৃতদেহের সৎকার করিলাম। রায়মহাশয়ের পরলোক হইলে বিজয়বাবুকে আমি পত্র লিখিয়াছিলাম। সেই পত্রের তিনি যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহাতে আমি বুঝিলাম যে এ সম্পত্তি তিনি একেবারেই গ্রাহ্য করেন না। আমার নিশ্চয় বিশ্বাস হইয়াছিল যে, তিনি আসিবেন না। সেজন্য এবারও আমি তাঁহাকে পত্র লিখিলাম যে, আপনার ভ্রাতৃজায়ার বয়ঃক্রম শীঘ্রই পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইবে। তিনি উইল করিবেন। সে সময় আপনি উপস্থিত থাকেন, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। বিজয়বাবু নিজে না আসিয়া একজন উকিল পাঠাইয়া দিলেন। আমার গৃহিণী সমুদয় শরীর ঢাকিয়া রোগিণী সাজিয়া ঐ খাটে শয়ন করিলেন; রায়মহাশয় ও রায়-গৃহিণীর আজ্ঞায়, সুবালা দিদির মঙ্গলকামনায়, আমরা এই উইল প্রস্তুত করিলাম।'

দিদিমণির মৃতদেহ বাক্সর ভিতর বরফ দ্বারা রক্ষিত হইয়াছিল, সেই কথা শুনিয়া সুবালা বড়ই কাঁদিতে লাগিলেন।

তাঁহাকে অন্যমনস্ক করিবার নিমিত্ত বড়ালমহাশয়কে বিনয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'সে ডাক্তারকে কত টাকা দিতে হইয়াছিল?'

বড়ালমহাশয় উত্তর করিলেন,—'অধিক নহে। রায়-গৃহিণী নিজে তাঁহাকে আড়াই শত টাকা দিয়াছিলেন। তাহার পর আমি তাঁহাকে আর আড়াই শত টাকা দিয়াছিলাম। খাতায় চিকিৎসা খরচ বলিয়া তাহা লেখা আছে।'

তাহার পর সুবালার দিকে দৃষ্টি করিয়া বড়ালমহাশয় পুনরায় বলিলেন,—'সুবালা দিদি! বৃথা রোদন করিও না। তোমার দিদিমণির প্রাণরক্ষা করিতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলাম। তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা সম্বন্ধেও কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই। সকলেই আমরা প্রাণপণে তাঁহার সেবা করিয়াছিলাম। কয়দিন তাঁহাকে বরফে রাখিতে হইয়াছিল সত্য, কিন্তু নিরুপায় হইয়া আমাদিগকে এ কাজ করিতে হইয়াছিল।'

বিনয় বলিলেন,—'তাহাতে আর দোষ কি? বশিষ্ঠ মুনি মহারাজ দশরথের মৃতদেহকে কিরূপে রাখিয়াছিলেন, তাহা একবার স্মরণ করিয়া দেখ।'

সুবালা একটু স্থির হইল, বড়ালমহাশয় পুনরায় বলিলেন,—'এ সমুদয় কথা আমার বোধ হয় কিছুতেই প্রকাশ হইত না। ডাক্তারের উপদেশে সমুদয় কার্য হইয়াছিল। তিনি প্রকাশ করিবেন না। ভয় কেবল ধনুকধারীকে। আমি বিলক্ষণ জানি যে, সে ভাল লোক নহে। কিন্তু ধনুকধারীও এ কার্যে সম্পূর্ণ লিপ্ত ছিল। আদালতে দণ্ডের ভয়ে সেও বোধ হয়

এ কথা প্রকাশ করিবে না। উকিল দুইজন কখনও রায়-গৃহিণীকে দর্শন করেন নাই। তাঁহারা কিছু বুঝিতে পারেন নাই। বাকী আমরা দুইজন। তোমরা যদি আমাদিগকে উৎপীড়িত না করিতে, তাহা হইলে আমরা কখনও এ সম্বন্ধে একটিও কথা মুখ দিয়া বাহির করিতাম না। সকল বিবরণ এক্ষণে শ্রবণ করিলে; কিন্তু তাহাতে তোমাদের কি লাভ হইল, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। এক্ষণে আমার অনুরোধ এই যে, এ কথা আর কেহ যেন না জানিতে পারে। সুবালা দিদি সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়াছেন। অগ্রহায়ণ মাস আসিলে তুমিও ইহার অধীশ্বর হইবে। সে সম্বন্ধেও রায়-গৃহিণী আমাকে বার বার সত্যে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে, তোমারা দুইজনে সুখে-স্বচ্ছন্দে এই সম্পত্তি ভোগ করিতে থাক। বিনয়বাবু! এই উইলে তোমার সম্পূর্ণ স্বার্থ রহিয়াছে। দেখিও, যেন এ কথা আর অধিক প্রকাশ হয় না।'

ঈষৎ হাসিয়া বিনয় বলিলেন,—'উইলে আপনারও কিঞ্চিৎ স্বার্থ আছে।'

বড়ালমহাশয় উত্তর করিলেন,—'ঐ এক হাজার টাকার কথা বলিতেছ? আমাকে এক হাজার টাকা দিবার নিমিত্ত রায়মহাশয় অনুমতি করিয়াছিলেন। যে রাত্রিতে কালা-বাবার নাসিকা ছেদন হয়, সেই রাত্রিতে রাজাবাবুও আমাকে এক হাজার টাকা দিবেন বলিয়াছিলেন। অন্ততঃ এক হাজার টাকা মূল্যে একখানি সোনার ইট দিতে প্রতিশ্রুতি হইয়াছিলেন।'

আশ্চর্য হইয়া উচ্চৈস্বরে বিনয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'সোনার ইট! সে আবার কি?'

আর চুপি চুপি কথা না কহিয়া, বড়ালমহাশয়ও সহজ স্বরে উত্তর করিলেন,— 'রাজাবাবু সকল বিষয়ে বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। কিন্তু টাকা-কড়ি সম্বন্ধে তাঁহার ভাব অনেকটা সেকালের লোকের ন্যায় ছিল। একবার তাঁহার অনেকগুলি মূল্যবান নোট ও খানকয়েক কোম্পানীর কাগজ উইপোকায় নষ্ট করিয়াছিল। সেই অবধি তিনি নোট অথবা কোম্পানীর কাগজ ক্রয় করিতেন না' লম্বা লম্বা ছোট ছোট সোনার ইট গড়াইয়া তিনি রাখিয়া দিতেন। চৌকোণা কাষ্ঠখণ্ড দেখিয়াছ? ইটগুলির আকৃতি ঠিক সেইরূপ ছিল। অথবা কাপড় কাচা বিলাতি সাবান—যাহাকে বার সোপ বলে, ইটগুলি সেইরূপ ছিল; তবে তাহা অপেক্ষা অনেক ছোট ছিল। এইরূপ টাকার ইট তিনি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। হাজার টাকায় সেইরূপ একখানি ইট তিনি আমাকে দিবেন বলিয়াছিলেন।'

বিনয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'যখন এ বাটী পরিত্যাগ করিয়া তিনি বিদেশে গমন করিলেন, তখন সেই ইট তিনি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন?'

বড়ালমহাশয় উত্তর করিলেন,—'না, সে ইট এই বাড়ীতে কোন স্থানে লুক্কায়িত আছে। পূর্বে বলিয়াছি যে, টাকা-কড়ি সম্বন্ধে তাঁহার ভাব অনেকটা সেকালের মত ছিল। বোধ হয়, কোন স্থানে সেই সমুদয় ইট তিনি পুঁতিয়া রাখিয়াছেন, অথবা কোনরূপ নূতন উপায় অবলম্বন করিয়া তিনি তাহা লুক্কায়িত রাখিয়াছেন। সুবালা দিদি রাগ করিও না। আমি ভাবিলাম যে, এ কথা যদি প্রকাশ করি, তাহা হইলে রায়মহাশয়ের আজ্ঞায় সকলে এ বাড়ী

তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিবে। একটি পয়সাও আমি পাইব না। সেজন্য চুপি চুপি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। মনে করিলাম যে, যদি পাই, তাহা হইলে একখানি ইট রাখিয়া বাকীগুলি রায়মহাশয়কে প্রদান করিব। এই বাড়ীর অনেক ঘরের মেজে খুঁড়িয়া দেখিয়াছি, অনেক ঘরের দেয়াল ভাঙ্গিয়া দেখিয়াছি, বাগানে অনেক অনুসন্ধান করিয়াছি; ফলকথা খুঁজিতে আমি কিছু বাকী রাখি নাই, কিন্তু সে ইটের আমি সন্ধান পাই নাই। যাহা হউক, এতদিন পরে এ কথা আজ আমি প্রকাশ করিলাম। এক্ষণে প্রকাশ্যভাবে পুনরায় অনুসন্ধান করিব।'

অন্ধকার ঘর হইতে খোনা শব্দ আসিল,—'সে সোঁনার ইঁট আঁমার। রাঁজাবাঁবু আঁমাকে দিঁয়াছেন।'—চমকিত হইয়া বড়ালমহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'ও কে?'

একটু হাসিয়া বিনয় উত্তর করিলেন,—'খাঁদা ভূত।'

ঘোরতর বিস্মিত ও ভীত হইয়া বড়ালমহাশয় বলিলেন,—'খাঁদা ভূত! দিনের বেলা খাঁদা ভূত!'—বিনয় হাসিতে লাগিলেন। সুবালাব মুখে এইবার একটু হাসি দেখা দিল। বড়ালনী ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন।

মাঝের দ্বার খুলিয়া বিনয় বলিলেন,—'খাঁদা ভূত! এই স্থানে এস।'

খাঁদা ভূত আসিয়া সকলের সম্মুখ দাঁড়াইল। বড়ালমহাশয় একদৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতে লাগিলেন, সে-ও তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

অবশেযে বড়ালমহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'জীয়ন্ত মানুষ, না ভূত?'—বিনয় উত্তব করিলেন,—'জীয়ন্ত মানুষ। কালা-বাবা মরে নাই, ইনিই সেই কালা-বাবা।'

বিনয়ের দিকে চাহিয়া বডালনী বলিলেন,—'বটে! আমি মনে করিয়াছিলাম, তুমি অতি ভাল মানুষ; মিছিমিছি ভয় দেখইতেছিলে!'—বিনয় ঈষৎ হাস্য করিলেন।

বড়ালমহাশয় খাঁদা ভূতকে বলিলেন,—'কি মনে করিয়া পুনরায আসিয়াছ, বাপু? রাজাবাবুর সংসার ছারেখারে দিয়াছ। রায়মহাশয়ের সর্বনাশ করিয়াছ। আবার কি মনে করিয়া আসিয়াছ, বাপু?'—খাঁদা ভূত উত্তর করিল,—'রাজাবাবু সম্বন্ধে আমাকে দোষী বলিলেও বলিতে পার। কিন্তু রায়মহাশয়ের আমি কি করিয়াছি? শুনিয়াছি যে, কে একজন রায়মহাশয় আসিয়া এই বিষয়ে অধিকারী হইয়াছিলেন। আরও শুনিয়াছি যে, কয়েক বৎসরের ভিতর তাঁহার পরিবারের অনেকগুলি লোক মারা গিয়াছে। কিন্তু তাহাতে আমার দোষ কি? যাহাদের কাল পূর্ণ হইয়াছিল, তাহারা মরিয়া গিয়াছে।'

বড়ালমহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'শাকচুন্নি আনিয়া এ গ্রামে ছাড়িয়াছিলে কেন?'

খাঁদা ভূত উত্তর করিল,—'শাঁকচুন্নি! শাঁকচুন্নি আমি কোথায় পাইব?'

বড়ালমহাশয় পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'গরীব চপলাকে তুমি খাইয়াছ কেন?'

বিস্মিত হইয়া খাঁদা ভূত উত্তর করিল,—'চপলা! কে?'

বড়ালমহাশয় ভাবিলেন, সত্য বটে। এ যদি জীবিত মানুষ, ভূত নহে, তাহা হইলে, চপলাকে ও কি করিয়া ভক্ষণ করিবে? সেজন্য সে প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া তিনি অন্য

কথা জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তুমি এইমাত্র বলিলে যে, রাজাবাবু তোমাকে সোনার ইটগুলি দিয়াছেন, রাজাবাবুর সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল?'—খাঁদা ভূত উত্তর করিল,—'রাজাবাবুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই, তাঁহার ভূতের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল?'

বড়ালমহাশয় বলিলেন,—'তাঁহার ভূতের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সে কিরূপ কথা?'—খাঁদা ভূত উত্তর করিল,—'সে অনেক কথা। যদি শুনিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে গোড়া হইতে সকল বিবরণ আপনাদিগকে আমি প্রদান করি।'

সপ্তম অধ্যায় — খাঁদা ভূতের কাহিনী

খাঁদা ভূতের বৃত্তান্ত শুনিবার জন্য সকলেরই কৌতূহল জন্মিয়াছিল। বিনয় তাহাকে বসিতে বলিলেন। উপবেশন করিয়া সে আপনার বৃত্তান্ত এইরূপে বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিল।—

খাঁদা ভূত বলিল,—'বড়ালমহাশয়! কিরূপ অবস্থায় এ স্থানে আমি আগমন করি, তাহা তুমি অবগত আছ। আমরা সন্ন্যাসী মানুষ, নানা দেশে আমরা ভ্রমণ করি। এই গ্রামের কিছু উপরে ডোঙ্গা উল্টাইয়া পড়িল। নদীতে তখন বান আসিয়াছিল। প্রবল স্রোতে ভাসাইয়া তোমাদের বাগানের নিম্নে আমাকে ফেলিয়া দিল। তখন আমার জ্ঞান ছিল না, কিন্তু আমি জীবিত ছিলাম। আমরা সন্ন্যাসী, দেবতাগণ দ্বারা রক্ষিত, সহজে আমাদের মৃত্যু হয় না।

অরক্ষিতং তিষ্ঠতি দৈবরক্ষিতং
সুরক্ষিতং দৈবহতং বিনশ্যতি।
জীবত্যনাথোহপি বনে বিসর্জ্জিতঃ,
কৃতপ্রযত্নোঽপি গৃহে বিনশ্যতি।।

অর্থাৎ দেবতা দ্বারা রক্ষিত হইলে নিঃসহায় লোকও রক্ষা পায়। দেবতা দ্বারা হত হইলে সুরক্ষিত লোকও বিনাশ পায়। বনে বিসর্জ্জিত অনাথও জীবিত থাকে, কিন্তু অনেক যত্ন সত্ত্বেও মানুষ গৃহে বিনষ্ট হয়।

যাহা হউক, রাজাবাবুর গৃহে আমি বাস করিতে লাগিলাম। দেখিলাম যে, তাঁহার পত্নী জপ -তপ-রতা ধর্মপরায়ণা স্ত্রীলোক। কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে সদ্‌গুরু লাভ হয় নাই। সেজন্য আমি তাঁহাকে শিক্ষা দিতে লাগিলাম। ক্রমে যখন তাঁহার জ্ঞানের উদয় হইল, তখন শক্তিরূপে আমি তাঁহাকে বরণ করিলাম। কারণ শাস্ত্রে বলিয়াছে,—শক্তিঃ শিবঃ শিবঃ শক্তিঃ শক্তির্ব্রহ্মা জনার্দনঃ। শক্তিরিন্দ্রো রবিঃ শক্তিঃ শক্তিশ্চন্দ্রো গ্রহা ধ্রুবং।।

কিন্তু রাজাবাবু তাহা বুঝিতে পারিলেন না। ইহাতে যে কত পূণ্য হয়, বড়ালমহাশয়, তুমিও তাহা বুঝিতে পার নাই। আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া রাজাবাবু আমাকে বাড়ী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। নদীকুলে 'শিব-মন্দিরে গিয়া আমি বাস করিতে লাগিলাম। ধর্মশিক্ষার জন্য রাত্রিকালে প্রচ্ছন্নভাবে সোনা-বৌ সে স্থানে গমন করিতেন। আমিও এ

বাড়ীতে আসিতাম। রাজাবাবু তাহা জানিতে পারিলেন। এ দিকে ক্রমে আমার চক্ষুও প্রস্ফুটিত হইল। প্রস্ফুটিত জ্ঞানচক্ষু দ্বারা আমি দর্শন করিলাম যে, রাজাবাবু দেবীর ভক্ষ, তাঁহাকে বলি দেওয়া কর্তব্য।'

বড়ালমহাশয় বলিলেন,—'নরাধাম! পাষণ্ড!'

খাঁদা ভূত বলিল,—'আমি ভাবিলাম যে, এ গ্রামে রাজাবাবুর জ্ঞাতি-গোত্র কেহ নাই। বলিরূপে তাঁহাকে দেবীপদে অর্পণ করিলে সোনা-বৌ সমুদয় সম্পত্তির অধিকারিণী হইবেন। তখন তাঁহা দ্বারা এনক সৎকার্য্য সাধিত হইবে। দেবীও এই বলি লাভ করিয়া পরম সন্তুষ্ট হইবেন। কারণ, শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

'ছাগে দত্তে ভবেদ্বাগ্মী মেষে দত্তে কবির্ভবেৎ।
মহিষে ধনবৃদ্ধিঃ স্যান্মৃগে মোক্ষফলং লভেৎ।
পক্ষিদানে সমৃদ্ধিঃ স্যাদ্গোধিকায়াং মহাফলং।
নরে দত্তে মহর্দ্ধিঃ স্যাদষ্টসিদ্ধিরনুত্তমা।।'

ছাগদানে বাগ্মী, মেষদানে কবি, মহিষদানে ধন-সমৃদ্ধি-সম্পন্ন, মৃগদানে মোক্ষফল ভোগী, পক্ষিদানে ধনবান্, গোধিকাদানে মহাফল-ভোগী এবং নরবলি প্রদানে মহাসমৃদ্ধিসম্পন্ন ও অষ্টসিদ্ধির অধিকারী হয়।

কিরূপ প্রকরণ অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে বলিরূপে প্রদান করি? এক্ষণে সেই চিন্তা আমার মনে উদয় হইল। শিরচ্ছেদন করিলে, শোণিত প্রভৃতি নানারূপ চিহ্ন থাকিবে। তাহা করা উচিত নহে। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া শূল প্রয়োগে তাঁহাকে শূলিনী দেবীর তৃপ্ত্যর্থে সমর্পণ করিব এইরূপ স্থির করিলাম। চমৎকার তীক্ষ্ণ, উজ্জ্বল ও ক্ষুদ্র একটি শূল নির্মাণ করাইলাম। সে শূলের সৌন্দর্য অবলোকন করিলে, বড়ালমহাশয়! তুমিও বোধ হয় তাহা গ্রহণ করিয়া স্বর্গে যাইতে বাসনা করিতে।'— বড়ালমহাশয় বলিলেন,—'পাপিষ্ঠ!'

খাঁদা ভূত বলিল,—'হাঁ, আমিও ভাবিলাম যে, সকলের প্রকৃতি সমান নহে। চাক্-চিক্যশালী সুন্দর শূল দেখিয়া রাজাবাবু হয়ত মুগ্ধ হইবেন না। আপনি যেরূপ এখন বলিলেন, তিনিও সেইরূপ শূলে যাইতে আপত্তি করিবেন। সেজন্য প্রথম তাঁহাকে অজ্ঞান করিবার ব্যবস্থা করিলাম। সোনা-বৌ আপত্তি করিলেন। রাজাবাবু মুক্ত হইবেন, সোনা-বৌ মুক্ত হইবেন, আমি মুক্ত হইব,—শাস্ত্রের বচন উদ্ধৃত করিয়া তাঁহাকে বুঝাইলাম। তাঁহাকে আরও বলিলাম যে, 'শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা, গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন। অর্থাৎ শিব রুষ্ট হইলে গুরু রক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে কেহই রক্ষা করিতে পারে না। পুনশ্চ— 'গুরোর্হিত প্রকর্তব্যং বাঙ্মনঃকায়কর্মভিঃ।' অর্থাৎ বাক্য, মন, শরীর ও কর্ম দ্বারা গুরুর হিতসাধন করিবে।

পূজার দিনস্থির হইল। রাত্রি দুই প্রহরের সময় নিঃশব্দে আমরা রাজাবাবুর শয়নাগারে অর্থাৎ ইহার পাশের ঘরে প্রবেশ করিলাম। ঔষধ প্রয়োগে তাঁহাকে অজ্ঞান করিলাম। যথাবিধি মন্ত্র পাঠ করিয়া শূলিনী দেবীর অর্চনা আরম্ভ করিলাম। —জ্বল জ্বল শূলিনী

দুষ্টগ্রহ হুঁ ফট্ স্বাহা। শূলিনী দূর্গে হুঁ ফট্ স্বাহা। শূলিনী বরদে হুঁ ফট্ স্বাহা। শূলিনী বিন্ধ্যবাসিনি হুঁ ফুট্ স্বাহা। শূলিনী অসুরমর্দিনি যুদ্ধপ্রিয়ে ত্রাসয় ত্রাসয় হুঁ ফট্ স্বাহা। শূলিনী দেবকিদ্ধ প্রপূজিতে নন্দিনি রক্ষ রক্ষ মহাযোগেশ্বরি হুঁ ফট্ স্বাহা ইত্যাদি। কিন্তু সোনা-বৌয়ের দোষে সমুদয় পরিশ্রম বিফল হইল।

বীরু আসিয়া আমাকে ধরিয়া ফেলিল। তুমি দৌড়িয়া আসিলে। আমাকে তোমরা বাঁধিয়া ফেলিলে। রাজাবাবুকে সচেতন করিলে। তোমরা পশু, নিষ্ঠুর, ধর্ম্মাধর্ম-জ্ঞানশূন্য। তোমরা বুঝিলে না যে, আমি সাক্ষাৎ শিব।

'শূদ্রো বা যদি বান্যেঽপি চণ্ডালোঽপি জটাধরাঃ।
দীক্ষিতঃ শিবমন্ত্রেণ, স ভস্মাঙ্গী শিবো ভবেৎ।।'

তোমরা আমার নাসিকা ছেদন করিলে। রক্তাক্ত-কলেবরে আমি শিবমন্দিরে প্রত্যাগমন করিলাম। দেখিলাম যে, সে স্থানে সোনা-বৌ গিয়া ভূমিতে শয়ন করিয়া রোদন করিতেছেন। তুমি, বড়ালমহাশয়, বলিযা দিয়াছিলে যে,—এ গ্রামে পুনরায় আমাকে দেখিলে, অথবা আদালতে আমি কোনরূপ অভিযোগ উপস্থিত করিলে, তোমরা আমার প্রাণবধ করিবে। আমি বিদেশী, সহায়হীন, নির্ধন। তাহার পর সোনা-বৌ তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে স্বীকৃতা হইলেন না। নিরুপায় হইয়া প্রাণভয়ে আমি পলায়ন করিলাম। সোনা-বৌ আর কোথায় যাইবেন, তিনিও আমার সঙ্গে গমন করিলেন। প্রথম আমরা কাশী যাইলাম। সে স্থানে বাজাবাবু গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ভয়ে কাশী হইতে বেরিলি নামক স্থানে আমরা পলায়ন করিলাম। সে স্থান হইতে আলমোড়া ও তাগার পর টেহরি গমন করিলাম। নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে আমরা জলন্ধর নামক স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। রাজাবাবু আর আমাদের সন্ধান পাইলেন না।

সোনা-বৌয়েব সহিত রাত্রিদিন আমার কলহ কচ্‌কচি হইতে লাগিল। আমার প্রতি তাঁহার ভক্তি একেবারে লোপ হইল। দিবারাত্রি তাঁহার ভর্ৎসনায় জীবন আমার অসহ্য হইয়া উঠিল। আমি শুনিলাম যে, কাঙ্গড়া নামক স্থানে নাসিকার চিকিৎসক আছে। রণজিৎ সিংহের রাজত্বকালে রাজদণ্ডে অনেকের নাসিকা কর্তিত হইত। চিকিৎসকগণ ললাটের চর্মখণ্ড লইয়া নূতন নাসিকা প্রস্তুত করিয়া দিত। নূতন নাসিকা লাভ কামনায় সোনা-বৌয়ের গহনাগুলি লইয়া একখানি এক্কা ভাড়া করিয়া কাঙ্গড়া অভিমুখে আমি যাত্রা করিলাম। পথে এক্কাওয়ালা সমুদয় গহনাগুলি কাড়িয়া লইল ও গুরুতর প্রহারে মৃতবৎ করিয়া এক নির্জন স্থানে আমাকে ফেলিয়া গেল। সংজ্ঞালাভ করিয়া আমি গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিলাম। ঘোর কৃষ্ণকায় নাসিকা বিহীন ব্যক্তিকে দেখিয়া গ্রামের কুক্কুরগণ আমাকে তাড়া করিল, বালকগণ ঢিল বর্ষণ করিতে লাগিল, গৃহস্থগণ দূর দূর করিয়া আমাকে তাড়াইয়া দিল। কেহই আমাকে ভিক্ষা প্রদান করিল না। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় জর্জরীভূত হইয়া আমি জ্বালামুখী গিয়া পৌঁছিলাম। সে স্থানে একদল সন্ন্যাসী আমার প্রতি কৃপা করিয়া আশ্রয় প্রদান করিলেন। তাঁহাদের সহিত আমি তীর্থ পর্যটনে প্রবৃত্ত হইলাম।

যয়োরেব সমং বিত্তং যয়োরেব সমং কুলম্।
তয়োর্মৈত্রী বিবাহশ্চ ন তু পুষ্টবিপুষ্টয়োঃ।।

এইরূপে কিছুকাল কাটিয়া গেল। ভাদ্র মাস। রাত্রিকাল। দক্ষিণদেশে এক ধর্মশালায় আমি শয়ন করিয়া আছি। সহসা আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। আমি উঠিয়া বসিলাম। সমুখে দেখিলাম যে, রাজাবাবু দণ্ডায়মান আছেন। আমি অতিশয় ভীত হইলাম। কিন্তু রাজাবাবু আমাকে আশ্বাস প্রদানপূর্বক বলিলেন,—'তোমার ভয় নাই। মন্ত্রপূত করিয়া দেবীর উদ্দেশ্যে তুমি আমাকে উৎসর্গ করিয়াছিলে। দেবী আমাকে গ্রহণ করিয়াছেন। আমি স্বর্গে গমন করিয়াছি। কিন্তু এখনও তোমার দক্ষিণা প্রদান করা হয় নাই। তুমি অবগত আছ যে অনেকগুলি সোনার ইট আমি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছি। দক্ষিণাস্বরূপ সেই ইটগুলি আমি তোমাকে প্রদান করিলাম। যাও আমার বাটিতে গমন কর। সুবর্ণনির্মিত সেই ইটগুলি গিয়া গ্রহণ কর।'

এই কথা বলিয়া রাজাবাবু তখন অন্তর্ধান হইলেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে আমি ক্ষিপ্ত হইলাম। ঠিক উন্মাদ নহে, কারণ, আমার জ্ঞান সম্পূর্ণ রহিল। কিন্তু আমার মুখ দিয়া মাঝে মাঝে হুহু, হুহু, এইরূপ একটা শব্দ নির্গত হইতে লাগিল। অনেক চেষ্টা করিয়াও আমি আমার কণ্ঠরোধ করিতে সমর্থ হইলাম না। তাহার পর লাফালাফি ছুটাছুটি করিতে আমার নিতান্ত ইচ্ছা হইল। অনেক চেষ্টা করিয়া তাহাও আমি নিবারণ করিতে পারিলাম না। গ্রাম হইতে তৎক্ষণাৎ আমি বাহির হইলাম। হুহু, হুহু শব্দ করিতে করিতে আমি গাছে উঠিতে লাগিলাম। গাছে উঠিয়া বানরের ন্যায় এ শাখা হইতে সে শাখায় লাফাইতে লাগিলাম। আমার শরীরে অসুরের বল হইল। সহজ অবস্থায় সে সমুদয় শাখা-বিহীন, পিচ্ছিল, উচ্চ গাছে কিছুতেই উঠিতে পারিতাম না, এখন সেই সমুদয় বৃক্ষে অনায়াসে উঠিতে পারিলাম। সহজ অবস্থা অপেক্ষা এখন প্রায় চারি পাঁচ গুণ দূরে লম্ফ দিয়া যাইতে সমর্থ হইলাম। বৃক্ষে আরোহণ করিয়া পর্বতের উপর লম্ফঝম্ফ করিয়া নদীতে সাঁতার দিয়া আমি রাত্রি কাটাইলাম। আমার সম্পূর্ণ জ্ঞান ছিল, কিন্তু হুহু শব্দ উচ্চারণ করিবার অথবা লাফালাফি করিবার প্রবৃত্তি আমি কিছুতেই নিবারণ করিতে পারিলাম না। কি গাছে, কি পাহাড়ে, মাঝে মাঝে আমার সমুখে রাজাবাবু আসিয়া ক্রমাগত বলিতে লাগিলেন,—'যাও যাও, গিয়া সোনার ইট লও।' তাঁহার কথায় উত্তেজিত হইয়া আমি বঙ্গদেশাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সমস্ত রাত্রি ক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকিতাম। সেই সময় অতিক্রম করিতাম।

প্রাতঃকালে অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইতাম। সমস্ত দিন কোন নির্জন স্থানে পড়িয়া থাকিতাম, রাত্রি আগমনে ক্ষিপ্ত হইয়া হুহু করিতে করিতে কখন পথ চলিতাম, কখন গাছে উঠিতাম, কখন দৌড়াদৌড়ি অথবা লম্ফঝম্ফ করিতাম। সে অঞ্চলে অনেক নারিকেল গাছ আছে। ক্ষিপ্ত অবস্থায় নারিকেল খাইয়া জীবন ধারণ করিতাম। এইরূপে সাত কি আটদিন কাটিয়া গেল। তাহার পর একদিন রাত্রি দুই প্রহরের সময় কোন এক উচ্চ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া এ শাখা হইতে সে শাখায় লাফাইতেছিলাম, এমন সময় আমার মুখ হইতে সহসা একপ্রকার

অতি ভয়ঙ্কর অতি বিকট হুহুঙ্কার শব্দ আপনা-আপনি নির্গত হইল। হু হু হু, হু হু হু, হু হু হু, তিনবার এইপ্রকার ভয়ানক শব্দ আমার মুখ হইতে নির্গত হইল। সে শব্দ শুনিয়া আমার নিজের মন আতঙ্কে কম্পিত হইল। কাক, পক্ষী, বন্য পশুগণ পর্যন্ত সে শব্দ শুনিয়া ঘোরতর ভীত হইয়া কলরব করিয়া উঠিত।'

বড়ালমহাশয় বলিলেন,—'সে হুহুঙ্কার শব্দ আমরা কয় বৎসর উপর্য্যুপরি শ্রবণ করিয়াছি। অতি ভয়ানক শব্দ বটে।'

খাঁদা ভূত বলিল,—'আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যেই আমার মুখ হইতে সে শব্দ নির্গত হইল আর আমি সুস্থ বোধ করিলাম। মনে আমার শান্তি হইল। আমার ক্ষিপ্ত অবস্থা তিরোহিত হইল। তখন হইতে রাজাবাবু আর আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। এ গ্রামে আসিতে তখন আমার সাহস হইল না। তখন হইতে আমি এ-দিক ও-দিক ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। ভিক্ষা করিয়া অথবা ফলমূল পাড়িয়া অতি কষ্টে দিনপাত করিতে লাগিলাম।

এইরূপে এক বৎসর কাটিয়া গেল। পুনবায় ভাদ্র মাস আসিল। পুনরায় ঘোর নিশীথে রাজাবাবু আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ও সোনার ইট লইবার জন্য আমাকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। পুনরায় আমি ক্ষিপ্ত হইলাম।

পুনরায় আমি লাফালাফি, ছুটাছুটি করিয়াও বঙ্গদেশ অভিমুখে অগ্রসর হইয়া রাত্রিযাপন করিতে লাগিলাম। দিনের বেলা সুস্থ হইয়া কোন স্থানে পড়িয়া থাকিতাম। সাত আট দিন পরে পূর্বরূপ সেই ভয়াবহ অনিবার্য হুহুঙ্কার শব্দ আমার মুখ দিয়া নির্গত হইল। তাহার পর পুনরায় আমি সহজ অবস্থা প্রাপ্ত হইলাম।'

অষ্টম অধ্যায় – খাঁদা ভূতের প্রার্থনা

খাঁদা ভূত বলিতেছে,—'প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসে আমি এইরূপ ক্ষিপ্ত হইতে লাগিলাম। সেই সময় রাজাবাবুর উত্তেজনায় বঙ্গদেশের দিকে আসিতে লাগিলাম। ঠিক বলিতে পারি না, বোধহয়, সাত আট বৎসর পরে ক্ষিপ্ত অবস্থায় এই গ্রামের সন্নিকটে আসিয়া পৌঁছিলাম। এ স্থান হইতে দুই ক্রোশ দূরে পরিত্যক্ত পুরাতন নীলকুঠি আছে। সে কুঠিতে এখন মানুষের যাতায়াত নাই। দিনের বেলা আমি সেই নীলকুঠিতে লুকাইয়া রহিলাম। রাত্রিকালে সম্পূর্ণ উন্মত্ত অবস্থায় আমি এই গ্রামে প্রবেশ করিলাম। গাছে এবং লোকের চালে বসিয়া এই গ্রাম সম্বন্ধে নানা সংবাদ সংগ্রহ করিলাম। লোকের কথোপকথনে বুঝিতে পারিলাম যে, রায়মহাশয় নামে কোন ব্যক্তি রাজাবাবুর সম্পত্তির অধিকারী হইয়া তাঁহার গৃহে বাস করিতেছেন। তাঁহার বাড়ীতে গিয়া সোনার ইট লইতে রাজাবাবু ক্রমাগত আমাকে উত্তেজিত করিতেছিলেন। আমি তাঁহার বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। কিন্তু সে সোনার ইট কোথায় তিনি লুক্কায়িত রাখিয়াছেন রাজাবাবু সেকথা আমাকে প্রকাশ করিয়া বলিলেন না। তিনি কেবল বলিতে ছিলেন,—'যাও, যাও, সোনার ইট লও।' বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া এ দিক ও-দিক ঘুরিয়া-ফিরিয়া কর্ত্তার শয়নাগারের সম্মুখে বারেণ্ডায় গিয়া

দাঁড়াইলাম। কাচের জানলায় উঁকি মারিয়া তাঁহাকে দেখিলাম। মনে করিলাম,—'ইনিই রায়মহাশয়। জাগরিত হইয়া তিনি আমাকে তাড়া করিলেন। আমি সত্বর পলায়ন করিলাম। প্রথম বৎসর কয়দিন আমি এইরূপ কাটাইলাম। দিনের বেলা নীলকুঠিতে লুক্কায়িত থাকিতাম, রাত্রিকালে এই গ্রামে আসিয়া কখন গাছে, কখন লোকের চালে বসিয়া থাকিতাম। ক্রমে গ্রামের কয়জনের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। 'ভূত! ভূত! বলিয়া তাহারা পলায়ন করিল। গ্রামের লোক আমার নাম্ খাঁদা ভূত রাখিল। কিন্তু এই খাঁদা ভূত যে সেই কালা-বাবা, তাহা কেহ জানিতে পারিল না।'

বড়ালমহাশয় বলিলেন,—'সে বৎসর না হউক পরে আমি বুঝিয়াছিলাম যে, তুমিই খাঁদা ভূত।'

খাঁদা ভূত উত্তর করিল,—'নাসিকা ছেদনের গোঁসাই তুমি, তুমি বুঝিতে পারিবে না কেন?'

আমি মনে করিলাম যে, ভালই হইল। চোর বলিয়া কেহ আমাকে ধবিতে সাহস করিবে না। ভূতের ভয়ে রাত্রিতে কেহ গাছতলায় পাকা তাল কুড়াইতে যাইবে না। কারণ, ক্ষিপ্ত অবস্থায় এই গ্রামে আসিয়া পাকা তাল খাইয়া আমি জীবনধারণ করিতেছিলাম।'

বড়ালমহাশয় বলিলেন,—'কেবল পাকা তাল খাইয়া তুমি জীবনধারণ কর নাই।'

ঈষৎ হাসিয়া খাঁদা ভূত উত্তর করিল,—'হাঁ। প্রথম বৎসর একটি অবনত বেলগাছের উপর আমি বসিয়াছিলাম। দক্ষিণ হাতে লাঠি ও বাম হাতে কাঁসার বাটি লইয়া নীচে দিয়া কে যাইতেছিল। গাছের উপর বসিয়া খপ করিয়া তাহার হাত হইতে বাটিটি আমি তুলিয়া লইলাম। সে লোক চীৎকার করিয়া পলায়ন করিল। কাঁসার পাত্রে রাঁধা মাংস ছিল। অতি উত্তম পাক হইয়াছিল। সেই উপাদেয় সামগ্রী ভক্ষণ করিয়া আমি পরম প্রীতি লাভ করিয়াছিলাম। আর এক বৎসর, রায়মহাশয়ের বাটীতে অরন্ধনের অন্ন, ব্যঞ্জন, মৎস্য প্রভৃতি ভক্ষণ করিয়াছিলাম। আর এক বৎসর বড়ালমহাশয় তোমার বাটীতে অরন্ধনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু তোমার কচু-শাক আমার সহ্য হয় নাই। তৎক্ষণাৎ আমার উদরে বেদনা উপস্থিত হইল। সেই বেদনার বশীভূত হইয়া কি করিয়া ফেলিয়াছিলাম, তাহা তুমি অবগত আছ। পরদিন প্রাতঃকাল বড়ালগৃহিণীর কষ্ট হইয়া থাকিবে।'

বড়ালমহাশয় চুপি চুপি বলিলেন,—'নরাধম!' তাহার পর একটু স্পষ্টস্বরে বলিলেন,—'জাতি বিচার তোমার নাই,—না? সদ্‌গোপনীর ভাত খাইতে দোষ নাই,না?'

খাঁদা ভূত উত্তর করিল,—'ব্রহ্ম অর্পণ করিলে কোন বস্তুতে দোষ থাকে না। শাস্ত্রে বলিয়াছে—গঙ্গাতোয়ে শিলাদৌ চ স্পৃষ্টদোষোহপি বর্ত্ততে। পরব্রহ্মার্পিতে দ্রব্যে স্পৃষ্টাস্পৃষ্টং ন বিদ্যতে।।

গঙ্গাজলে ও শালগ্রাম শিলায় বরং দোষ হইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মার্পিত বস্তুতে স্পর্শ দোষ হইতে পারে না। তাহা ব্যতীত আমি বীর; কুলাচারী। খাদ্যাখাদ্যের বিচার আমাদের

নাই। তবে লোকাচারের বশবর্তী হইয়া কখন কখন আমাদিগকে নিরামিষভোজী হইতে হয়। অথবা দুগ্ধ পান করিয়া জীবনধারণ করিতে হয়।'

খাঁদা ভূত পুনরায় বলিল,—'গভীর রাত্রিতে বাটীতে প্রবেশ করিয়া চারিদিকে সোনার ইটের অনুসন্ধান করিতাম। কিন্তু কোথায় সে ইট রাখিয়াছেন, রাজাবাবু ঠিক করিয়া তাহা আমাকে বলিলেন না। সেজন্য ইটের আমি কোন সন্ধান পাইলাম না। প্রথম বৎসর কয়েক দিন পরে ঘোর দুর্যোগের সময় আমি এই বাগানে তেঁতুল গাছে বসিয়া ছিলাম। এমন সময় সেই ভয়াবহ হুহুঙ্কার শব্দ আমার মুখ হইতে বহির্গত হইল। আমি সুস্থ হইয়া এ বাগানে থাকিতে আর সাহস করিলাম না।

এ বৎসর এ স্থানে সে স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলাম। ভাদ্রমাসে পুনরায় আমি ক্ষিপ্ত হইলাম। রাজাবাবু সেই সময় পুনরায় আমাকে এই গ্রামে টানিয়া আনিলেন। এই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া পুনরায় আমি সোনার ইট অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। কিন্তু রাজাবাবু স্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন না। সুতরাং ইট আমি খুঁজিয়া পাইলাম না। প্রতি বৎসর এইরূপ চলিতে লাগিল। প্রতি বৎসর এইরূপ হতাশ হইয়া আমাকে প্রত্যাগমন করিতে হইল। কেবল এক বৎসর রাজাবাবু আমাকে দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া বলিয়াছেন,—'ঐ অন্ধকার ঘরে যাও। ঐ অন্ধকার ঘরে গিয়া দক্ষিণা গ্রহণ কর।' পরদিন রাত্রিতে একজন কৃষকের বাড়ী হইতে গোপনে একটি খন্তা আনিয়া ঐ অন্ধকার ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলাম। দিয়াসালাইয়ের কাঠি জ্বালাইয়া দেখিলাম যে, ইহার সেই পুরাতন মেজে নাই, নূতন মেজে হইয়াছে। একবার ভাবিলাম যে, যে লোক মেজে খনন করিয়াছিল, লুক্কায়িত অর্থ হয়ত তাহার হস্তগত হইয়াছে। আবার ভাবিলাম যে, না—তাহা হইলে রাজাবাবু আমাকে সোনার ইট লইতে অনুরোধ করিতেন না। প্রাচীরের অনেকটা আমি খনন করিলাম। কিন্তু কিছুই পাইলাম না। কয় বৎসর এইরূপে কাটিয়া গেল।'

বড়ালমহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন—'রায়মহাশয়ের ঘরে ঢিল ফেলিয়াছিলে কেন? জান যে, তাহাই তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল।'

খাঁদা ভূত উত্তর করিল,—'তাহা আমি জানি না। প্রতি বৎসর বারেণ্ডায় দাঁড়াইয়া ঘরে উঁকি মারা আমার অভ্যাস হইয়াছিল। সে বৎসর সেদিকের জানালা তিনি বন্ধ রাখিয়াছিলেন। সে দিক দিয়া তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া আমি সেই ঘরের পার্শ্বে বাগানে গিয়া দাঁড়াইলাম। সে দিকের জানালা উন্মুক্ত ছিল। সেই দিক দিয়া তাঁহার ঘরে দুই তিনটি ঢিল নিক্ষেপ করিলাম। কেন ঢিল ফেলিলাম, তাহা আমি জানি না। তখন আমার ক্ষিপ্ত অবস্থা। উন্মাদ দ্বারা অনুষ্ঠিত সকল কার্যের কারণ থাকে না। তোমরা বলিবে যে, যখন সে সময়ের সমস্ত ঘটনা তোমার স্মরণ রহিয়াছে, তখন তুমি উন্মাদ কি করিয়া? সত্য বটে! সে বিষয়ে চিন্তা করিয়া আমিও আশ্চর্য্যান্বিত হই। ক্ষিপ্ত দশয়ে আমার জ্ঞান থাকে; কিন্তু মনের উপরে, কার্য্যের উপরে আমার কিছুমাত্র প্রভুত্ব থাকে না। আমি মনে করি যে, কেন আমি বৃক্ষে আরোহণ করি, কেন আমি লম্ফঝম্ফ করি, রাজাবাবু আমাকে দণ্ড দিতেছেন,

কেন আমি তাঁহার কথা শুনিয়া তাঁহার বাটীতে গমন করি, কেন আমি হুহু করি, কেন আমি আমার কণ্ঠ হইতে ভয়াবহ হুহুঙ্কার শব্দ নিঃসারিত হইতে দিই! মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়াও আমি আপনাকে ঠিক রাখিতে পারি না। কে যেন বলপূর্বক সেই সমস্ত কাজ করিতে আমাকে বাধ্য করে।'

বিনয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'গত পাঁচ-ছয় বৎসর কোথায় ছিলে?'

খাঁদা ভূত উত্তর করিল,—'শেষ বৎসর এ স্থান হইতে গিয়া একদিন ক্ষুধায় বড়ই প্রপীড়িত হইয়াছিলাম। বুভুক্ষিতঃ কিং ন করোতি পাপং, ক্ষীণা জনা নিষ্করুণা ভবন্তি।' ক্ষুধার্ত লোক না করিতে পারে এমন কাজ নাই। কোন এক গ্রামে নির্জন পথে নানা অলঙ্কারে বিভূষিত এক বণিকপুত্রকে দেখিয়া তাহার গহণা কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। গ্রামের লোকে আমাকে ধরিয়া ফেলিল। চৌর্য্য ও নরহত্যা-চেষ্টার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া আমার পাঁচ বৎসর কারাবাসের দণ্ড হইল। যখন ভাদ্র মাস আসিল, তখন কারাবাসের কর্তৃপক্ষগণ জানিতে পারিল যে, আমি ক্ষিপ্ত। তাহারা আমাকে পাগলা-গারদে প্রেরণ করিল। সে স্থানে লোক ক্রমে জানিতে পারিল যে, বৎসরের মধ্যে কেবল একবার, দিন কয়েকের জন্য আমি ক্ষিপ্ত হই ও সে সময় কাহারও কোনরূপ অনিষ্ট করি না। যে কারণেই হউক পাঁচ বৎসর পরে আমাকে মুক্ত করিয়া দিল। তাহারা আমার জটা কাটিয়া দিয়াছিল।'

বড়ালমহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'এখন কি তোমার ক্ষিপ্ত অবস্থা?'

খাঁদা ভূত উত্তর করিল,—'এখন আমার সহজ অবস্থা। কিন্তু ক্ষিপ্ত-কাল আগত প্রায়।'

বড়ালমহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'এখন তবে কি জন্য আসিয়াছ?'

খাঁদা ভূত উত্তর করিল,—'কারাগারে ও পাগলা-গারদে বাসের সময় যখন ক্ষিপ্ত হইতাম, তখন রাজাবাবু সর্বদাই আমার নিকট আসিতেন। দক্ষিণা গ্রহণের নিমিত্ত এই বাড়ীতে আসিতে ক্রমাগত তিনি আমাকে বলিতেন। গুপ্তস্থান নির্দেশ করিয়া দিবার নিমিত্ত তিনি অঙ্গীকার করিয়াছেন। কিন্তু বার বার বিফলমনোরথ হইয়া আমি হতাশ হইয়া পড়িয়াছি। আমি ভাবিলাম যে রাজাবাবু স্থান দেখাইয়া দিলেও গৃহস্বামীর সহায়তা ব্যতীত আমি কিছুতেই এ অর্থ লাভ করিতে পারিব না। সেজন্য আমি স্থির করিলাম যে, এবার সুস্থ অবস্থায় গিয়া তাঁহাকে সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিব। রাজাবাবু স্থান নির্দেশ করিয়া দিলে সমুদয় অর্থ তাঁহার সম্মুখে বাহির করিব। রাজাবাবু সমস্ত ধন আমাকে দিয়াছেন সত্য, কিন্তু আমি ভাবিলাম যে, বর্তমান গৃহস্বামী তাহা আমাকে দিবেন না। সমুদয় অর্থ না হউক, অন্ততঃ তাহার কিয়দংশ তিনি আমাকে প্রদান করিবেন, তাহা লইয়া হিমালয় পর্বতের কোন নির্জন প্রদেশে অবস্থান করিয়া আমি অবশিষ্ট জীবন তপস্যায় অতিবাহিত করিব। এই মানসে—'

বড়ালমহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তবে তোমার নাকের জন্য এ স্থানে তুমি আগমন কর নাই।'—দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া খাঁদা ভূত উত্তর করিল,—'নাক! আমার নাসিকা

তোমরা ছেদন করিয়াছ। নাসিকা আর আমি কোথায় পাইব?'

বড়ালমহাশয় বলিলেন,—'তোমার নাক কোনও স্থানে আছে।'—ঘোরতর আগ্রহ সহকারে খাঁদা ভূত জিজ্ঞাসা করিল,—'কোথায়? কোথায়? কোথায়?'—কর্ত্তিত নাসিকার জন্য তাহার মনের আবেগ ও কাতরভাব দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন।

খাঁদা ভূত খেদ করিয়া বলিতে লাগিল,—'হায়, আমার নাক! ক্ষিপ্ত অবস্থায় নাকের শোকে আমার হৃদয় যে কিরূপ সন্তপ্ত হয়, তাহা আর তোমাদিগকে কি বলিব! গঙ্গামৃত্তিকা দিয়া লোক যেরূপ শিবলিঙ্গ গড়িয়া পূজা করে ও তাহার পর জলে নিক্ষেপ করে, আমিও সেইরূপ নদীকূলে বসিয়া বার বার মৃত্তিকা দ্বারা নাসিকা নির্মাণ করি ও মুখমণ্ডলে পরিধান করিয়া জলে তাহা নিক্ষেপ করি। কোথায় আমার নাক? বড়ালমহাশয়! বল, কোথায় আমার নাক? সে কর্তিত গলিত শুষ্ক নাসিকা পাইলেও আমি অনেকটা শান্তিলাভ করি।'

তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া সকলে ভাবিলেন যে, খাঁদা ভূতের এইবার বুঝি ক্ষিপ্তদশা উপস্থিত হইল। সেজন্য অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বড়ালমহাশয় নাকের কথা চাপা দিতে চেষ্টা করিলেন।

বড়ালমহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'সোনার ইট সম্বন্ধে এক্ষণে তোমার মানস কি?'

খাঁদা ভূত উত্তর করিল,—'এখন ভাদ্র মাসের শেষ ভাগ। প্রতি বৎসর এই সময় আমি ক্ষিপ্ত হই। এবার নিশ্চয়ই ক্ষিপ্ত হইব। রাজাবাবু সেই সময় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন ও কোন স্থানে সোনার ইট লুক্কায়িত আছে, তাহা তিনি আমাকে দেখাইয়া দিবেন। তোমাদের সহায়তায় আমি তাহা বাহির করিব। তাহার কিয়দংশ তোমরা আমাকে প্রদান করিবে। তাহা লইয়া আমি প্রস্থান করিব। আর কখনও এ গ্রামে আসিব না। আমার আর একটি নিবেদন এই যে, গ্রামবাসীদিগের সহিত আমি সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি না। কালা-বাবা বলিয়া একদিন তাহারা আমাকে পূজা করিত। পূজনীয় সেই কালা-বাবা নাসিকাবিহীন খাঁদা ভূত হইয়া আমাদিগকে উৎপীড়িত করিয়াছিল, তাহা জানিতে পারিলে সকলে আমাকে অতিশয় ঘৃণা করিবে। আমার প্রার্থনা এই যে, ভাদ্র মাসের অবশিষ্ট কয়টাদিন আমাকে তোমরা ঐ অন্ধকার ঘরে লুক্কায়িত থাকিবার নিমিত্ত অনুমতি প্রদান কর। লুক্কায়িত ধন বাহির হইলে, ক্ষিপ্ত অবস্থা গত হইলে, আমি এ স্থান হইতে চলিয়া যাইব।'

সুবালা ও বিনয়কে সঙ্গে লইয়া বড়ালমহাশয় বারেণ্ডায় গমন করিলেন। সে স্থানে চুপি চুপি তাঁহারা পরামর্শ করিতে লাগিলেন। বড়ালমহাশয় বলিলেন,—'রাজাবাবুর পিতা ও তিনি নিজে অনেক অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। সেই ধন এই বাড়ীতে কোন স্থানে লুক্কায়িত আছে। আমার সমুদয় অনুসন্ধান বৃথা হইয়াছে। এই অর্থ পাইলে অনেক উপকার হইবে। নদীকূলে বাঁধ বাঁধিয়া দিলে বানে আর গ্রামের লোকের অনিষ্ট হইবে না। অতএব খাঁদা ভূতের প্রস্তাবে আমাদের সম্মত হওয়া উচিত।' বিনয়ও সেইরূপ মত প্রকাশ করিলেন। সুবালা চুপ করিয়া রহিলেন।

সকলে পুনরায় ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। খাঁদা ভূতকে সম্বোধন করিয়া

বড়ালমহাশয় বলিলেন,—'এ কয়দিন তোমাকে আমরা ঐ চোরাকুঠরিতে বাস করিতে দিব। কিন্তু ঘরের দুই দ্বারে তালা দিয়া আমি বন্ধ করিয়া রাখিব। কেবল সন্ধ্যার পর একবার তোমাকে আমি ছাড়িয়া দিব। ক্ষিপ্ত অবস্থায় যদি তুমি অধিক উপদ্রব কর, তাহা হইলে তোমাকে আমি বাঁধিয়া রাখিব। যদি গুপ্তধন তুমি বাহির করিয়া দিতে পার, তাহা হইলে তাহার এক অংশ তোমাকে আমরা প্রদান করিব।'

খাঁদা ভূত উত্তর করিল,—'আমারও সেইরূপ ইচ্ছা। ক্ষিপ্ত হইয়া যদি আমি পূর্বরূপ দৌড়াদৌড়ি করি, তাহা হইলে সকলেই জানিতে পারিবে। অতএব সেই সময় আমাকে বাঁধিয়া রাখাই উচিত। যে সময় রাজাবাবু আসিয়া লুক্কায়িত ধন আমাকে দেখাইয়া দিবেন, সেই সময় যেরূপ কর্তব্য, তাহা তোমরা করিবে।'

বড়ালমহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আর একটি কথা আমি জিজ্ঞাসা করি। এ বাটীর সদর ও খিড়কি দ্বার বন্ধ থাকিত। কিরূপে তুমি বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিতে, কিরূপেই বা বাহির হইয়া পলায়ন করিতে।'

খাঁদা ভূত উত্তর করিল,—'তুমি কি তাহা জান না? এই ঘরের নিম্নে যে ঘর,—যাহার ভিতর তোমাদের কাঠ, ঘুঁটে, পাতা প্রভৃতি থাকে, সেই ঘরের পূর্বধারে বাগানের দিকে কাষ্ঠনির্মিত গরাদে সম্বলিত দুইটি জানালা আছে। একটি অনায়াসে খুলিতে ও পুনরায় যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে পারা যায়। আমি সেই পথ দিয়া এই বাটীর ভিতর প্রবেশ করিতাম ও সেই পথ দিয়া বহির্গত হইতাম। কল্য রাত্রিতেও সেই পথ দিয়া এই বাটীর ভিতর আসিয়াছিলাম। তাহার পর সামান্য একটি লৌহ-শলাকার সহায়তায় ঐ অন্ধকার ঘরের তালা খুলিয়াছিলাম। আমি ভাবিয়াছিলাম যে, এই গমনাগমনের পথ বড়ালমহাশয় তুমি অবগত আছ। কারণ একদিন রাত্রিকালে সেই ঘরের পার্শ্বে ঠিক জানালার নিকট বাগানের ভিতর তুমি বসিয়াছিলে। সে স্থানে একাকী বসিয়া তুমি কি করিতেছিলে। জানালা পথে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিব, এই মানসে আমি আসিয়াছিলাম। কিন্তু তখনও রাত্রি অধিক হয় নাই, সেজন্য ইতস্ততঃ করিতেছিলাম। জানালার নিকট আসিয়া দেখিলাম যে, কে একজন লোক সেই স্থানে বসিয়া একবার এদিকে, একবার সেদিকে হাত নাড়িতেছে। আমার ভয় হইল। অন্ধকার রাত্রি। প্রথমে তোমাকে আমি চিনিতে পারি নাই। মনে করিলাম, এ একটা ভূত, কি পাগল। তাহার পর দেখিলাম যে, তুমি। সেই মুহুর্তে তোমার দৃষ্টিও আমার উপর পড়িল। তুমি ভয়ে দ্রুতপদে পলায়ন করিলে। আমিও সে রাত্রি এ বাটীতে প্রবেশ করিতে সাহস করিলাম না। আমি পলায়ন করিতে উদ্যত হইলাম। বাগানের অতি অল্পদূরে অগ্রসর হইয়াছি, এমন সময় আমার সম্মুখ দিকে কে একজন 'মা গো।' বলিয়া চীৎকার করিল। সেই মুহূর্তে আমার পশ্চাদ্দিকে, ঠিক যে স্থানে তুমি বসিয়াছিলে, সেই স্থানে আর একজন কে 'মা গো!' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। আমার বড় ভয় হইল। বাগানের ভিতর এক বৃক্ষে আরোহণ করিয়া আমি লুক্কায়িত রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে আমার হুহুঙ্কার আসিয়া গেল। তাহার পর আমি সুস্থ বোধ করিলাম। এ গ্রাম

হইতে পলায়ন করিলাম। সে স্থানে বসিয়া তুমি কি করিতেছিলে?'

বড়ালমহাশয় সে প্রশ্নের কোন উত্তর প্রদান করিলেন না। একটু চিন্তা করিয়া কেবল বলিলেন,—'বটে।'

অন্ধকার ঘরে গোপনভাবে খাঁদা ভূতের বাসের জন্য যথাপ্রয়োজন দ্রবাদির তিনি আয়োজন করিয়া দিলেন। খাঁদা ভূত অন্ধকার ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। বড়ালমহাশয় দুই দ্বারে তালা বন্ধ করিয়া দিলেন। তাহার পর সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। প্রস্থান করিবার পূর্বে বড়ালমহাশয় বিনয় ও সুবালাকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন,—'শাঁকচুন্নির হাড় কখনও দেখিয়াছ?'—বিনয় হাসিয়া উত্তর করিলেন,'শাঁকচুন্নির হাড়! সে আবার কি?'

বড়ালমহাশয় বলিলেন,—'আজ নয়। কাল প্রাতঃকালে সকল কথা বলিব। বোধ হয় শাঁকচুন্নির হাড়ও দেখাইতে পারিব।'

নবম অধ্যায় – ভারতের বুশিডো (Bushido)

সন্ধ্যা হইতে তখনও বিলম্ব ছিল। ফুলগাছগুলি দেখিবার নিমিত্ত সুবালা তাড়াতাড়ি বাগানে গমন করিলেন। দূরে পুষ্করিণীর ঘাটে দাঁড়াইয়া পাগলী পালিত মৎস্যদিগকে আহার প্রদান করিতেছিল। তাহাকে দেখিয়া চপলার কথা সুবালার মনে পড়িল। বৃক্ষের শুষ্ক কাষ্ঠের উপর তিনি বসিয়া পড়িলেন। সে স্থানে বসিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—'উইলের প্রকৃত তত্ত্ব এখন অবগত হইলাম। খাঁদা ভূত যে ভূত নহে,—মানুষ, তাহাও এখন বুঝিলাম। কিন্তু চপলা কোথায় গেল?'

ধীরে ধীরে বিনয় সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাষ্ঠের অপর পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। বিনয় বলিলেন,—'চিন্তার বিষয় বটে! আশ্চর্য্য কথা আজ আমরা শুনিলাম। এরূপ ঘটনা উপন্যাস-পুস্তকেই কল্পিত হয়। গৃহস্থের সংসারে এইরূপ ঘটনা সত্য সত্য প্রায় ঘটে না।'

সুবালা বলিলেন,—'চপলার কথা আমি ভাবিতেছি। চপলা কোথায় গেল? যে রাত্রিতে চপলা অন্তর্হিত হয়, সে রাত্রির সেই 'মা-গো' চীৎকার খাঁদা ভূতও শুনিয়াছিল।'

বিনয় বলিলেন,—'যথাকালে এ সমস্যারও বোধ হয় মীমাংসা হইবে। কিন্তু এখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—'এ সম্পত্তি সম্বন্ধে তোমার অভিপ্রায় কি?'

সুবালা উত্তর করিলেন,—'বিজয়বাবুকে কল্য আমি পত্র লিখিব। দাদামহাশয়ের বাক্সর ভিতর একখানা কাগজে তাঁহার ঠিকানা ছিল, তাহা আমি পাইয়াছি।'

বিনয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তাঁহাকে তুমি কি লিখিবে?'

সুবালা উত্তর করিলেন,—'তাঁহাকে লিখিব যে, এ বিষয় আমার নহে, এ বিষয় আপনার। আপনি আপনার সম্পত্তি বুঝিয়া লউন।'

বিনয় বলিলেন,—'এত গোলমালে আবশ্যক কি? বড়ালমহাশয় সত্য বলিয়াছেন যে, উইল সম্বন্ধে এ প্রতারণা কেহ জানিতে পারিবে না। তুমি কেন প্রকাশ করিবে?'

সুবালা উত্তর করিলেন,—'আমি বুঝিয়াছি, কেন তুমি আমাকে এরূপ পরামর্শ দিতেছ। হায় রে টাকা! উন্নতচিত্ত লোকেরাও ইহার জন্য বিপথগামী হয়!'—একটু হাসিয়া বিনয় পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'নগদ টাকা ও কোম্পানীর কাগজ কি করিবে?'

সুবালা উত্তর করিলেন,—'কড়ায়-গণ্ডায় তাঁহাকে বুঝাইয়া দিব।'—বিনয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তুমি পথের ভিখারিণী হইবে?'—সুবালা উত্তর করিলেন,—'হাঁ।'

বিনয় বলিলেন,—'দরিদ্রের কোন স্থানে সম্মান নাই। তোমাকে সকলে অশ্রদ্ধা করিবে।'—সুবালা বলিলেন,—'তাহা আমি জানি। ধনীর মাথায় ধর ছাতি, নির্ধনের মাথায় মারো লাথি, পৃথিবীর নিয়মই এই। তা বলিয়া পরের দ্রব্য আমি অপহরণ করিতে পারি না। কেহ আমাকে কিছু প্রদান করুক,—এরূপ কামনাও কখন আমি করি না। নীচ প্রবৃত্তিবিশিষ্ট লোকেরাই ইচ্ছা করে যে, অমুক আমাকে কিছু প্রদান করুক। আমার পিতা গরীব ছিলেন। কিন্তু তিনি অসত্যবাদী, প্রতারক, ভিক্ষুক অথবা চোর ছিলেন না। নিতান্ত আত্মীয় লোকও তাঁহাকে কিছু দিলে তিনি বিরক্ত হইতেন। মা বলিতেন যে, 'যাহারা অন্য লোকের নিকট হইতে কিছু পাইব,—এরূপ প্রত্যাশা করে, ভগবান চিরকাল তাহাদিগকে পরপ্রত্যাশী করিয়া রাখেন। আমি তাঁহাদের কন্যা।'

পুনরায় ঈষৎ হাসিয়া বিনয় বলিলেন,—'আজকাল টাকা খরচ না করিলে কন্যার বিবাহ হয় না। তোমাকে যদি কেহ বিবাহ না করে?'

সুবালার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। মস্তক অবনত করিয়া একটি কাঠি লইয়া তিনি গাছের গোড়া ঘন ঘন খুঁড়িতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি বলিলেন,—'আমি বিবাহ করিতে চাই না।'

বাল্যকালে বিনয়ের সহিত সুবালার কয়েকবার ঝগড়া হইয়াছিল। বড় হইয়া দুইজনে আজ এই প্রথম ঝগড়া হইল।—বিনয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তোমার ভরণপোষণ কিরূপে হইবে?'—সুবালা উত্তর করিলেন,—'পিসীমাকে আমার কাকামহাশয় চিরকাল প্রতিপালন করিয়াছেন। একমুষ্টি ভাত আমাকেও তিনি দিবেন। তাঁহার বাড়ীতে না হয় আমি দাসী হইয়া থাকিব।'

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বিনয় বলিলেন,—'রাগিলে মানুষকে যে এত সুন্দর দেখায়, তাহা আমি জানিতাম না। রক্তবর্ণ কাগজ-নির্মিত চীনদেশীয় লণ্ঠনের ভিতর হইতে যেরূপ আলোক নির্গত হয়, তোমার কোপাবিষ্ট মুখমণ্ডল হইতে সৌন্দর্য্যের জ্যোতি সেইরূপ বাহির হইতেছিল। সত্যপথ হইতে বিচলিত করিবার বাসনায় তোমাকে আমি এত কথা বলি নাই। চপলার সমস্যা ব্যতীত এই সমুদয় অদ্ভুত ঘটনার ভিতর আরও একটি রহস্য আছে। তাহাও একদিন প্রকাশিত হইবে। যখন তাহা প্রকাশিত হইবে, তখন তুমি বুঝিতে পারিবে যে, তোমার এই সামান্য সম্পত্তি একদিন আমি লাভ করিব, সে লোভ আমি কখন করি নাই। আমার মাতা-পিতার কোন অভাব নাই। তাঁহাদের আমি একমাত্র পুত্র। তোমার সম্পত্তির আকাঙ্খা তাঁহারা করেন না। তোমার তুলনায় পৃথিবীর যাবতীয় ধনরত্নকে আমি

কাষ্ঠ লৌহের ন্যায় জ্ঞান করি। তোমার নিকট, সুবালা, আমার এই মিনতি যে, তুমি আমাকে নরাধম জ্ঞান করিও না।'

পূর্বাপেক্ষা একটু ধীরে ধীরে সুবালা এখন মৃত্তিকা খনন করিতে লাগিলেন। বাষ্পজলে তাঁহার চক্ষু দুইটি পরিপূরিত হইল। কতক মুছিয়া ফেলিলেন, কতক গোপন করিলেন, কতক নিবারণ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে সজল নয়নে প্রফুল্ল-বদনে বিনয়ের দিকে একবার চাহিয়া পুনরায় তিনি মস্তক অবনত করিলেন।

সুবালা বলিলেন,—'টাকা থাকিলে অনেকের উপকার করিতে পারা যায়, সেজন্য টাকাকে আমি তুচ্ছ জ্ঞান করি না। কিন্তু টাকায় সুখ হয় না। দাদামহাশয় ও দিদিমণির অর্থ ছিল। কিন্তু অর্থবলে তাঁহারা শরীরের স্বচ্ছন্দতা অথবা মনের শান্তিলাভ করিতে পারেন নাই। নিদারুণ শোকে তাঁহারা সন্তপ্ত হইয়াছিলেন। প্রিয়জনের প্রাণবিয়োগ-জনিত শোক হইতে মানুষ নিষ্কৃতি পায়,—তাহার কি কোন উপায় নাই?'

বিনয় উত্তর করিলেন,—'আজ তুমি খাঁদা ভূতকে বলিয়াছিলে যে, 'সকল দুঃখের মূল পাপ। পূর্বকৃত পাপের ফলে মানুষ শোক-তাপে সন্তাপিত হয়। পূর্বসঞ্চিত পাপ যদি অতি গুরুতর হয়, তাহা হইলে তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া বড়ই কঠিন কথা।' কিন্তু ঔষধের সহায়তায় মানুষ যেরূপ অনেক সময়ে বিষপান করিয়া পরিত্রাণ পায়, সেইরূপ সৎকর্মের অনুষ্ঠানে মানুষ অনেক সময় পূর্বসঞ্চিত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে, অকাল-মৃত্যু-জনিত শোক হইতে তাহারা নিষ্কৃতি পায়।'

সুবালা জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কিরূপ সৎকর্ম?'

বিনয় উত্তর করিলেন,—'আমি বীর, এই কথা বলিয়া খাঁদা ভূত আজ গর্ব করিতেছিল। কিন্তু আমিও বীর দেখিয়াছি। তাঁহাদের সহিত ও খাঁদা ভূতের সহিত আকাশ-পাতাল পার্থক্য। সেই বীরদিগের মধ্যে এক মহাত্মা কৃপা করিয়া আমাকে অনেক উপদেশ দিয়াছেন। পূর্বসঞ্চিত পাপ যদি নিতান্ত গুরুতর হয়, তাহা হইলে সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে,—'স্বধর্মরত প্রকৃত বীরগণ কখন শোক পান না, তাঁহাদের কখন অন্নবস্ত্রের কষ্ট হয় না।' এ কথার কথা নহে। আমার মনের বিশ্বাস যাহাতে দৃঢ়ীভূত হয়, সেজন্য ভূয়োভূয়ঃ প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা তিনি আমাকে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন।'

সুবালা জিজ্ঞাসা করিলেন,—'এই বীরধর্ম কি আমাদের স্বধর্ম?'

বিনয় উত্তর করিলেন,—'চরাচর জগতের গুরু শ্রীশ্রীমহাদেব কর্তৃক ইহা প্রবর্তিত হইয়াছে। ইহার অপর নাম কুলাচার। এই ধর্মে দীক্ষিত লোকদিগকে কুলাচারী, কৌলিক, কৌজ বা বীর বলে। ইহার ধর্মশাস্ত্রসমূহকে আগম তন্ত্র বলে। ভগবতী কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া মহাদেব যে সমুদয় উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহাকেই আগম তন্ত্রশাস্ত্র বলে। ইহা দুই প্রকার। মহাভারতের সময় অসংখ্য দানব মনুষ্য আকারে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের বংশ এখনও পৃথিবীতে বর্তমান আছে। মনুষ্যশরীরধারী দানবদিগকে ধ্বংস করিবার নিমিত্ত, মহাদেব পূর্বকালে অনেকগুলি তন্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন। শেষে

দেবপ্রকৃতিবিশিষ্ট মানবদিগের হিতার্থে সকল শাস্ত্রের সার সংগ্রহ করিয়া তিনি নূতন একটি তন্ত্র প্রচার করেন। আমি তোমাকে এই শেষোক্ত কথাই বলিতেছি। ইঁহার উপদেশ অনুসারে যাঁহারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন, তাঁহারাই প্রকৃত বীর। তাঁহারাই দারিদ্র্যদুঃখ ও অকালমৃত্যুজনিত শোক হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। ইঁহার মতে যাহারা কার্য না করে, মহাদেব তাহাদিগকে পশু নামে অভিহিত করিয়াছেন। শেষোক্ত এই তন্ত্রই এখন একমাত্র আগম শাস্ত্র। ইহা দ্বারা পূর্বকথিত সমুদয় ধর্মশাস্ত্র নিষ্প্রয়োজনীয় হইয়াছে। ইহা বিনা মানুষের আর অন্য উপায় নাই। শ্রীশ্রীসদাশিব নিজে বলিয়াছেন—

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে।
বিনা হ্যাগমমার্গেণ কালৌ নাস্তি গতিঃ প্রিয়েঃ।।

হে প্রিয়ে! আতি সত্য সত্য পুনঃ সত্য বলিতেছি যে, কলিকালে আগমোক্ত পথ ব্যতিরেকে গতি নাই।

শিবের বাক্য শুনিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়!

সুবালা জিজ্ঞাসা করিলেন,—'এ ধর্মের বিশেষ উপদেশ কি?'

বিনয় উত্তর করিলেন,—'পরব্রহ্মে ভক্তি ও পরোপকার তো বটেই, কিন্তু তাহা ব্যতীত ইহার ভিত্তি সত্যের উপর সংস্থাপিত। সত্য হইতে কেহ যেন কখন বিচলিত না হয়, সে সম্বন্ধে মহাদেব বার বার সকলকে সাবধান করিয়াছেন। একস্থানে তিনি বলিয়াছেন—

প্রকটেহত্র কলৌ দেবী সর্ব্বে ধর্ম্মাশ্চ দুর্ব্বলাঃ।
স্থার্স্যতোকং সত্যমাত্রং তস্মাৎ সত্যময়ো ভবেৎ।।
সত্যাধর্ম্মং সমাশ্রিত্য যৎ কর্ম্ম কুরুতে নরঃ
তদেব সফলং কর্ম্ম সত্যং জানীহি সুব্রতে।।
ন হি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মো ন পাপমনৃত্যাৎ পরম্।
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা মর্ত্ত্যঃ সত্যমেকং সমাশ্রয়েৎ।।
সত্যহীনা বৃথা পূজা সত্যহীনো বৃথো জপঃ।
সত্যহীনং তপো ব্যর্থমূষরে বপনঃ যথা।।
সত্যরূপং পরং ব্রহ্ম সত্যং হি পরমং তপঃ।
সত্যমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ সত্যাৎ পরতরং ন হি।।

হে দেবী! কলি প্রবল হইলে ধর্মই দুর্বল হইবে। কেবল একমাত্র সত্যই থাকিবে; অতএব সত্যময় হওয়া সকলেরই কর্তব্য। সত্যধর্ম আশ্রয় করিয়া মানুষ যে কাজ করিবে, সুব্রতে! নিশ্চয় জানিও, সে কাজ সফল হইবে। সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম নাই, মিথ্যা অপেক্ষা জঘন্য পাপ নাই। সেজন্য সকল অবস্থাতেই একমাত্র সত্যকে অবলম্বন করা মানুষের কর্তব্য। সত্যহীন পূজা বৃথা, সত্যহীন জপ বৃথা। যেরূপ উষর ভূমিতে বীজ বপন করিলে বৃথা হয়, সেইরূপ সত্যহীন তপস্যাও বৃথা হয়। সকল ক্রিয়ার মূল সত্য; সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই।'

সুবালা জিজ্ঞাসা করিলেন,—'জাপানীরা নানা দেশে গিয়া বিদ্যা ও জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়া স্বজাতির উন্নতিসাধন করিয়াছে। বীরধর্ম্মে সে সম্বন্ধে কোনরূপ উপদেশ আছে?'

বিনয় উত্তর করিলেন,—'সদাশিব আদেশ করিয়াছেন—

'বিত্তার্থী মানবো দেশানখিলান্ গন্তুমর্হতি।
নিষিদ্ধকৌলিকাচারং দেশং শাস্ত্রমপি ত্যজেৎ।।
গচ্ছংস্তু স্বেচ্ছয়া দেশে নিষিদ্ধকুলবর্ত্মনি।
কুলধর্ম্মাৎ পতেদ্ভূয়ঃ শুধ্যেৎ পূর্ণাভিষেকতঃ।।

'বিত্তার্থী মানবগণ সকল দেশেই গমন করিতে পারিবে। কিন্তু যে দেশে বা যে শাস্ত্রে বীরধর্ম নিষিদ্ধ, সেই দেহ ও সেই শাস্ত্র পরিত্যাগ করিবে। যে দেশে বীরমার্গ নিষিদ্ধ, সে দেশে কেহ স্বেচ্ছাক্রমে গমন করিলে বীরধর্ম হইতে পতিত হইবে, কিন্তু পুনরায় পূর্ণাভিষেক দ্বারা শুদ্ধ হইতে পারিবে।'

সুবালা জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে শিবের আজ্ঞা কিরূপ?'

বিনয় উত্তর করিলেন,—'তাঁহার আজ্ঞা এই যে, মাতা-পিতা পুত্রের ন্যায় তাহাকেও শিক্ষাপ্রদান করিবেন। যতদিন না পতি-মর্যাদা ও ধর্মশাসনে তাহার জ্ঞান জন্মে, ততদিন তাহার বিবাহ দিবেন না।'

সুবালা বলিলেন,—'পুস্তকে ও সংবাদপত্রে আমি পাঠ করিয়াছি যে, জাপানীরা পিতৃগণকে পূজা করে। তাহাদের প্রাচীন শিন্টো ধর্মে ইহার ব্যবস্থা আছে। সামুদ্রিক যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া রণার্ণবপোতপতি টগো বলিয়াছেন যে,—'যুদ্ধের সময় পিতৃগণকে আমি সাগর মধ্যে যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেছিলাম। তাঁহাদের সহায়তাতেই আমি রণে বিজয়ী হইয়াছি।' শিবপ্রোক্ত বীরধর্মে :পিতৃগণ সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা আছে?'

বিনয় উত্তর করিলেন,—'পিতৃগণের তৃপ্ত্যর্থে আমরাও শ্রাদ্ধ-তর্পাণাদি করিয়া থাকি। পিতৃলোক হইতে পিতৃগণের রশ্মি সর্বদাই আমাদের উপর পতিত হইতেছে। তাঁহাদের বংশধরগণ সৎকর্ম করিলে তাঁহারা পরম পরিতোষ লাভ করেন। তাঁহাদের বংশসম্ভূত কেহ যদি বীরধর্ম অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত হন, তাহা হইলে তাঁহাদের আনন্দের সীমা থাকে না। তাঁহার পিতৃগণ সন্তুষ্ট হইয়া দেবগণের সহিত আনন্দ অনুভব করিতে থাকেন এবং তাঁহারা পুলকিত হৃদয়ে এই গাথা গান করেন,—

'অস্মৎকুলে কুলশ্রেষ্ঠো জাতো ব্রহ্মোপদেশিকঃ।
কিমস্মাকং গয়াপিণ্ডৈঃ কিং তীর্থ শ্রাদ্ধতর্পণৈঃ।।
কিং দানৈঃ কিং জপৈর্হোমৈঃ কিমন্যৈর্বহুসাধনৈঃ।
বয়মক্ষয়তৃপ্তাঃ স্মঃ সৎপুত্রস্যাস্য সাধনাৎ।।

আমাদের কুলে ব্রহ্ম-উপাসক উৎপন্ন হইয়া আমাদের কুলকে পবিত্র করিয়াছে। আমাদের নিমিত্ত গয়াতে পিণ্ডদান, তীর্থে শ্রাদ্ধ ও তর্পণ, দান, জপ, হোম, অথবা অন্য সাধনে আবশ্যক কি? আমাদের সৎপুত্রের সাধনে আমরা অক্ষয় তৃপ্তিলাভ করিলাম।

জাপানীরা যেরূপ পিতৃগণের নিকট আপনাদের মঙ্গল প্রার্থনা করে, শিবোক্ত এই বীরধর্মেও তাহার বিধি আছে। শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া তাঁহাদিগের নিকট এইরূপে আশীর্বাদ প্রার্থনা করিতে হয়—

'আশিসো মে প্রদীয়ন্তাং পিতরঃ করুণাময়াঃ।
বেদাঃ সন্ততয়ো নিত্যং বর্দ্ধন্তাং বান্ধবা মম।।
দাদারো মে বিবর্দ্ধন্তাং বহুনান্নানি সন্তু মে।
যাচিতারঃ সদা সন্তু মা চ যাচামি কঞ্চন।।'

হে করুণাময় পিতৃগণ! আমাকে আপনারা আশীর্বাদ প্রদান করুন। আমার বিদ্যা, সন্তান ও বান্ধবগণ নিত্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক। আমার অনেক অন্ন হউক। আমার নিকট সর্বদা লোক যাঞ্চা করুক, কিন্তু আমাকে যেন কাহারও নিকট যাঞ্চা করিতে না হয়।

সুবালা জিজ্ঞাসা করিলে,—'ইহা যদি বীরের ধর্ম, তবে ইহাতে সৎসাহস অবশ্য প্রসংশিত হইয়াছে?'

বিনয় উত্তর করিলেন,—'মহাদেব বলিয়াছেন—

'ন বিভেতি রণাদ্ যো বৈ সংগ্রমেহপ্যপরাঙ্মুখঃ।
ধর্মযুদ্ধে মৃতো বাপি তেন লোকত্রয়ং জিতম্।।'

যে রণে ভীত হয় না ও রণ হইতে পরাঙ্মুখ হয় না এবং যে ব্যক্তি ধর্মযুদ্ধে মৃত হওয়াও শ্রেয়ঃ জ্ঞান করে, সেই ব্যক্তি কর্তৃক ত্রিভুবন জিত হইয়া থাকে।

ফলকথা, এই বীরধর্ম অবলম্বনে লোক মহাবলপরাক্রমশালী হয়,—'যেন লোকা ভবিষ্যন্তি মহাবলপরাক্রমাঃ।' তাহার পূর্বেই বলিয়াছি যে, ইহার প্রভাবে লোক শোক-তাপ হইতে নিস্তার পায়, অন্নবস্ত্রের কষ্ট পায় না, অবশেষে পরলোক ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করে।'

বিনয় পুনরায়,—'সংক্ষেপে তোমাকে এই বীরধর্মের কথা বলিলাম। এ ধর্ম অবলম্বন করিলে প্রথমেই সত্যের আশ্রয় লইতে হয়। কথায়-বার্তায়, আচার ব্যবহারে সকল বিষয়ে সত্য। সত্য, সত্য, সত্য ভিন্ন আর অন্য উপায় নেই। যতদিন না বাঙ্গালী সত্যের আশ্রয় লয়, ততদিন দেশের উন্নতি হইবে না। মহাদেব বলিয়াছেন যে,—'আমার প্রবর্তিত এই ধর্মের নিয়মাদি সুখে-স্বচ্ছন্দে ও বিনা আয়াসে লোক প্রতিপালন করিতে পারিবে। ভবিষ্যতে মানুষের অবস্থা কিরূপ হইবে, তাহা বুঝিয়া তাহাদের উন্নতি ও পরিত্রাণের নিমিত্ত আমি এই সমুদয় উপদেশ প্রদান করিলাম।' অন্যান্য ধর্মের নিয়ম অতি কঠোর। একগালে চড় মারিলে কয়জন লোক অন্য গাল বাড়াইয়া দিতে পারে? যে স্থলে জীবহিংসা দূরে থাকুক, 'কাটা' শব্দ উচ্চারণ করিলেও দোষ হয়, সে স্থলে গাভীবৎসকে বঞ্চনা করিয়া দুগ্ধ কিরূপে পান করিতে পারা যায়? চাউল ভক্ষণ করিয়া কিরূপে প্রাণধারণ করিতে পারা যায়? কারণ, ধান্যের গাছ তাহার শিশু সন্তানদিগের জন্য যে আহার সঞ্চয় করিয়া রাখে, তাহাকেই চাউল বলে, তাহাই অপহরণ করিয়া আমরা ভক্ষণ করি। ধর্মের কঠোর নিয়ম প্রতিপালন করিতে না পারিয়া মানুষ কপটচারী হইয়া, পরে সত্যপথ হইতে ভ্রষ্ট হয়।

সুবালা! সত্যকে পরিত্যাগ করিলেই বিপদ। সেজন্য কৃপা করিয়া মহাদেব মানুষকে এই বীরধর্ম প্রদান করিয়াছেন।'

সুবালা বলিলেন,—'মৃত্যুকালে মা আমাকে গুটি-কয়েক উপদেশ দিয়াছিলেন। তখন তাহা আমি ভালরূপ বুঝিতে পারি নাই। কথাগুলি কিন্তু আমি মনে গাঁথিয়া রাখিয়াছি। মা বলিয়াছিলেন,—'সুবালা! কখনও অসত্য কথা বলিও না, অসত্য আচরণ করিও না, নিষ্ঠুরতা ও নীচতা সর্বদা পরিত্যাগ করিবে।' অসত্য কথা কাহাকে বলে তাহা আমি জানি। পরদ্রব্য অপহরণ, প্রতারণা প্রভৃতি অপরাধকে বোধ হয় অসত্য আচরণ বলে। জীবকে কষ্ট দেওয়াকে নিষ্ঠুরতা বলে। আমি তোমাকে সেই চড়ুই পক্ষীর গল্প বলিয়াছি। পাখীটিকে ধরিয়া তাহার পায়ে সূতা বাঁধিয়া আমি খেলা করিতেছিলাম। মা বলিলেন, 'এরূপ কাজকে নিষ্ঠুরতা বলে', তৎক্ষণাৎ আমি সে চড়ুই পক্ষী ছাড়িয়া দিলাম। সেই অবধি কোন পক্ষী আমি পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া রাখি নাই। কিন্তু তবু দেখ, কত পক্ষী আমার মাথায়, আমার স্কন্ধে বসিয়া আমাকে আদর করে। আহা! আমার শালিক পাখীটিকে এখনও ভুলিতে পারি নাই। নিষ্ঠুরতা কাহাকে বলে, একপ্রকার বুঝিয়াছি। নীচ লোকের ন্যায় কুভাষা ব্যবহার করা, উপায় সত্ত্বেও তাহাদের ন্যায় ময়লা অবস্থায় দিনযাপন করা,—ইহাকেই বোধ হয় নীচতা বলে। কিন্তু মায়ের উপদেশ এখনও যে আমি ভালরূপে বুঝিয়াছি তাহা বোধ হয় না।'

দশম অধ্যায় – পুণ্ডরীক সংবাদ

বিনয় বলিলেন,—'কলিকাতায় আমাদের পাড়ায় পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যার্ণব নামে একটি লোক আছেন। সকলে তাঁহাকে পুণ্ডরীক ভট্টাচার্য মহাশয় বলিয়া ডাকে। নানা জাতির পুরোহিতগিরি করিয়া তিনি অর্থোপার্জন করিয়াছেন। তাঁহার একখানি সোনা-রূপার দোকানও আছে। তাহা হইতেও তিনি যথেষ্ট অর্থলাভ করেন। জাতি সম্বন্ধে গোল বাধাইয়াও লোকের নিকট হইতে তিনি টাকা লইতেন। এখন তিনি বৃদ্ধ ও অন্ধ হইয়াছেন। কিন্তু এক সময়ে আমাদের পাড়ায় তাঁহার বিলক্ষণ আধিপত্য ছিল। সমাজপতি বলিয়া সকলেই তাঁহাকে মান্য ও ভয় করিত। কথায় কথায় তিনি লোককে জাতিচ্যুত করিতেন। অন্যান্য লোক মেষপালের ন্যায় তাঁহার অনুসরণ করিত। তাহার কারণ এই যে, তিনি নিতান্ত শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ ছিলেন। সকলে বলিত যে, এরূপ সাত্ত্বিক পুরুষ পৃথিবীতে অতি বিরল। বাজারের মিষ্টান্ন কখন তিনি ঘরে আনিতে দিতেন না। কলের জল কখন তিনি ব্যবহার করিতেন না। গঙ্গাজলে তাঁহার রন্ধন হইত, গঙ্গাজল তিনি পান করিতেন। এখনও তিনি সেইরূপ শুদ্ধাচারী আছেন বটে; কিন্তু তাঁহার মানসম্ভ্রম অনেক কমিয়া গিয়াছে। পুণ্ডরীকের গুটি-কত গল্প আমি করিব। সেই গল্প শুনিলেই মিথ্যাচরণ, নীচতা ও নিষ্ঠুরতা কাহাকে বলে তাহা তুমি বুঝিতে পারিবে।

কলিকাতার নিকট একখানি গ্রামে পুণ্ডরীকের বাস। সেই গ্রামে এক দুঃখিনী অনাথিনী

বিধবা ব্রাহ্মণী একটি কন্যা লইয়া বাস করিতেন। অর্থাভাবে ব্রাহ্মণী তাহার বিবাহ দিতে পারিতেছিলেন না। গ্রামেরলোক চাঁদা করিল। পুণ্ডরীককে সকলে বিলক্ষণ জানিত। তাই কেবলমাত্র একটি টাকা সকলে তাঁহার নামে ফেলিয়াছিল। এক টাকার অধিক কেহই তাঁহার নিকট প্রার্থনা করে নাই। পুণ্ডরীকের তাহাতে রাগ হইল। তিনি বলিলেন,—'কি আমার নামে এক টাকা! সামান্য গৃহস্থ লোকেরা যখন কেহ দশ টাকা, কেহ পাঁচ টাকা দিতেছে, তখন আমার নামে কেবল এক টাকা। কন্যাটিকে আমি দুইগাছি সোনার বালা দিব। বরযাত্রীদিগের ভোজনের নিমিত্ত আমি একমণ সন্দেশ দিব।' ব্রাহ্মণীর আনন্দের আর সীমা রহিল না। গ্রামের লোক বলিল,—'ভট্টাচার্য মহাশয়কে আমরা চিনিতে পারি নাই। বাহিরে উনি কিছু কৃপণ বটেন; কিন্তু ভিতরে উঁহার দয়া আছে।' ফল কথা, সকলেই পুণ্ডরীককে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। গ্রামের ময়রাকে ব্রাহ্মণী একমণ সন্দেশের আজ্ঞা করিলেন। যথাসময়ে পুণ্ডরীক তাঁহাকে দুইগাছি সোনার বালা আনিয়া দিলেন। বিবাহের রাত্রিতে তিনি নিজে দাঁড়াইয়া কর্তৃত্ব করিলেন। তাঁহার অভ্যর্থনায়, তাঁহার সুমিষ্ট কথায় সকলে পরম পরিতোষ লাভ করিল। বরকর্তা বারোয়ারি প্রভৃতির টাকা তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন। পরদিন পুণ্ডরীক কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন। পুণ্ডরীক এখন এক বৃদ্ধ হইয়াছেন। বারোয়ারি প্রভৃতির টাকা আজ পর্যন্ত গ্রামের লোক তাঁহার নিকট হইতে আদায় করিতে পারে নাই। কিছুদিন পরে প্রকাশ হইল যে, কন্যাকে তিনি যে সোনার বালা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা প্রকৃত সোনার নহে, গিল্টির বালা। যাহা হউক বরকর্তা ভদ্রলোক। দুঃখিনী বিধবা ব্রাহ্মণীকে আর পীড়ন করিলেন না। সন্দেশের মূল্য পুণ্ডরীক ময়রাকে দিলেন না। তিনি নিজে ময়রাকে আজ্ঞা করেন নাই, তাঁহার কথামত ব্রাহ্মণী আজ্ঞা করিয়াছিলেন। সেজন্য ময়রা পুণ্ডরীককে ধরিতে পারিল না। ব্রাহ্মণী সেই টাকা অতিকষ্টে ক্রমে ক্রমে পরিশোধ করিলেন। পুণ্ডরীকের এইরূপ অনেক কীর্তি আছে। সেসব কথা বর্ণনা করিতে গেলে একখানি পুস্তক হইয়া পড়ে।

তাঁহার তিন পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠপুত্রকে ঘরে পড়াইবার নিমিত্ত একজন শিক্ষক ছিলেন। এক বৎসর পুত্র পরীক্ষায় ভালরূপ উত্তীর্ণ হইয়াছিল। শিক্ষক কোনরূপ পুরস্কার প্রার্থনা করেন নাই, প্রত্যাশাও করেন নাই; কিন্তু মনের আনন্দে পুণ্ডরীক পুরস্কারস্বরূপ একটি আংটী দিলেন; বলিলেন যে,—'ইহা আসল হীরার আংটী, ইহার মূল্য একশত টাকা।' কিছুদিন পরে শিক্ষকের টাকার প্রয়োজন হইল। পুণ্ডরীকের কথার উপর নির্ভর করিয়া সেই অঙ্গুরী তিনি কোন লোককে পঞ্চাশ টাকায় বিক্রয় করিলেন। কিছুদিন পরে ক্রেতার মনে সন্দেহ হইল। আংটী যাচাই করিবার নিমিত্ত তিনি বাজারে গমন করিলেন। যে দোকান হইতে পুণ্ডরীক অঙ্গুরী ক্রয় করিয়াছিলেন, দৈবক্রমে তিনি সেই দোকানে গমন করিলেন। দোকানদার বলিল, যে 'এ অঙ্গুরীয় আমিই এক ব্রাহ্মণকে বিক্রয় করিয়াছিলাম। ইহা প্রকৃত হীরক নহে, ইহা কাচ। আড়াই টাকা মূল্যে আমি ব্রাহ্মণকে বিক্রয় করিয়াছিলাম। শিক্ষকের নিকট ক্রেতা টাকা ফিরিয়া চাহিলেন। শিক্ষক টাকা খরচ করিয়া ফেলিয়াছেন, ফিরিয়া

দিতে পারিলেন না। জুয়াচুরির অভিযোগ উপস্থিত করিয়া ক্রেতা শিক্ষকের নামে আদালতে নালিশ করিলেন। কয়দিন হাজতে বাস করিয়া, অনেক টাকা খরচ করিয়া, বহু কষ্টে শিক্ষক সে বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইলেন; কিন্তু মোকদ্দমার খরচের নিমিত্ত পিতা-পিতামহের যাহা কিছু ভূমি-সম্পত্তি ছিল, সে সমুদয় তিনি বিক্রয় করিতে বাধ্য হইলেন। গরীব শিক্ষক সর্বস্বান্ত হইলেন।'

সুবালা বলিলেন,—'ছি ছি! পৃথিবীতে এমন লোকও থাকে!'

বিনয় বলিলেন,—'এরূপ কাজকে চুরি ডাকাতি বলিতে পারা যায় না। প্রবঞ্চনা বটে; কিন্তু সম্পূর্ণ স্পষ্টভাবেও নহে। প্রবঞ্চনা করিয়া অন্যের নিকট হইতে লোক কিছু গ্রহণ করে; কিন্তু পুণ্ডরীকের প্রবঞ্চনা দানে, গ্রহণে নহে। বড়মানুষি দেখাইবার নিমিত্ত, দুইদিনের জন্য সুখ্যাতি লাভ করিবার নিমিত্ত তিনি এইরূপ মিথ্যা দান করিয়াছিলেন। ইহাকে মিথ্যাচরণ বলে।

নিজের কন্যার বিবাহেও পুণ্ডরীক এইরূপ কীর্তি করিয়াছিলেন। এত রৌপ্যনির্মিত দানসামগ্রী তিনি দিয়াছিলেন যে, কি বরযাত্র, কি কন্যাযাত্র, সকলেই আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিল। সকলেই বলিল যে, রাজারাজড়াও এরূপ দান সামগ্রী দিতে পারেন না। পুণ্ডরীকের মানসম্ভ্রম যার-পর-নাই বৃদ্ধি হইল। কিন্তু সে দুইদিনের জন্য। তাঁহার জামাতার পিতা একটি বাসন হাতে করিয়াই জানিতে পারিলেন যে, সে রূপার বাসন নহে। তাহার পর পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, দানসামগ্রী বার আনা কলাই করা তাম্রনির্মিত বাসন। তিনি ভদ্রালোক, এ কথা লইয়া আর গোলমাল করিলেন না। নূতন বৈবাহিকের গুণ তিনি ঢাকিয়া লইলেন। লোকের নিকট তিনি বলিলেন যে,—'ভট্টাচার্য্য মহাশয় ব্রাহ্মণপণ্ডিত লোক, বাসন বিক্রেতা তাঁহাকে ঠকাইয়া রূপার বাসনের পরিবর্তে কলাই করা তামার বাসন দিয়াছে।' কিন্তু বন্ধুদিগের নিকট তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—'ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিকট আমি এত রূপার বাসন প্রার্থনা করি নাই। তবে মিছিমিছি কেন তিনি এরূপ প্রবঞ্চনা করিয়াছেন? ইহার পরিবর্তে যদি তিনি কাঁসার বাসন দিতেন, তাহা হইলে আমার কাজে লাগিত। কলাই করা তামার বাসন লইয়া আমি কি করিব?'

একটু চুপ করিয়া বিনয় পুনরায় বলিতে লাগিলেন—'স্পষ্টভাবে তিনি কখনও কাহাকেও প্রবঞ্চনা করিয়াছিলেন কি না, তাহা আমি জানি না। তবে একজন গোয়ালাকে তিনি একবার অতি সামান্য বিষয়ে ফাঁকি দিয়াছিলেন। গোয়ালা ঘোল বেচিতে আসিয়াছিল। তাহার নিকট হইতে পুণ্ডরীক পূর্ণ একঘটী ঘোল লইলেন। ঘটীটি বাড়ীর ভিতর লইয়া গেলেন। অন্য পাত্রে ঘোলটি ঢালিয়া ঘটীটি তিনি জলে পূর্ণ করিলেন। তাহার পর সেই একঘটী জল আনিয়া গোয়ালার হাঁড়িতে ঢালিয়া দিলেন। আশ্চর্যান্বিত হইয়া গোয়ালা জিজ্ঞাসা করিল,—'ও কি করিলেন মহাশয়?' পুণ্ডরীক উত্তর করিলেন,—'যা বেটা, এখন চলিয়া যা।' গোয়ালা জিজ্ঞাসা করিল,—'আমার পয়সা? পুণ্ডরীক উত্তর করিলেন,—'পয়সা। পয়সা আবার কি? তোর তো যেমন ছিল, তেমনি হইল। তোর তো

ঢক্‌কে ঢক্‌ বজায় হইল। পয়সা আবার কিসের?' এই বলিয়া তিনি তাহাকে বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিলেন।' — সুবালা হাসি সংবরণ করিতে পারিলেন না। হাসিতে হাসিতে তিনি বলিলেন,—'কি আশ্চর্য! পৃথিবীতে এমন লোকও থাকে!'

বিনয় বলিলেন,—'আরও দুই একটি পুণ্ডরীক কাহিনী তোমাকে বলিতেছি। পুণ্ডরীকের জামাতা একবার শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ শ্যালক অর্থাৎ পুণ্ডরীকের জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত তিনি পুষ্করিণীতে স্নান করিতে গিয়াছিলেন। দৈবক্রমে পুণ্ডরীকের পুত্র গভীর জলে গিয়া পড়িল। সে সাঁতার জানিত না, সেই জন্য হাবুডুবু খাইতে লাগিল। জামাতা তাহার প্রাণরক্ষা করিতে গেলেন। ভগিনীপতিতে সে জড়াইয়া ধরিল। উভয়ে জলমগ্ন হইলেন। শত্রুঘ্ন বাগ্‌দী নামে একজন লোক নিকটে ছিল। পুণ্ডরীকের জামাতা ও পুত্রের প্রাণরক্ষা করিবার নিমিত্ত সে জলে গিয়া পড়িল। এই কার্যে কিছুক্ষণের নিমিত্ত তাহার নিজেরও প্রাণসংশয় হইল। যাহা হউক অতি কষ্টে সে দুইজনের জীবনরক্ষা করিল। শত্রুঘ্ন বাগ্‌দীর একপাল ছেলেপুলে। ঘোরতর পরিশ্রম করিয়াও সে তাহাদিগকে উদর পূর্ণ করিয়া অন্ন দিতে পারিত না। সে ভাবিল,—নিজের প্রাণ সংশয় করিয়া আমি এই দুইজনের জীবন রক্ষা করিলাম, নিশ্চয় ভালরূপ পুরস্কার পাইব।' তাহার আশা নিতান্ত ভিত্তিশূন্য ছিল না। কারণ, জামাতা তাঁহার পিতাকে লিখিয়া দশটি টাকা আনাইলেন। শ্বশুরমহাশয়কে তিনি বলিলেন,—'শত্রুঘ্ন বাগ্‌দী আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছে, তাহাকে পুরস্কার করিবার নিমিত্ত আমার পিতা দশ টাকা প্রেরণ করিয়াছেন।' পুণ্ডরীক উত্তর করিলেন,—'আমার পুত্রেরও সে প্রাণরক্ষা করিয়াছে। আমিও তাহাকে ভালরূপে পুরস্কার করিব। ও দশ টাকা আমাকে এখন দাও, তোমার ও আমার টাকা একসঙ্গে তাহাকে দিব।' জামাতা শ্বশুরের হাতে দশ টাকা অর্পণ করিলেন; কিন্তু সেই অবধি শত্রুঘ্ন বাগ্‌দী একটি পয়সাও পাইল না।'

সুবালা বলিলেন,—'ছি ছি! কি জঘন্য লোক! কি নীচতা!'

বিনয় উত্তর করিলেন,—'হ্যাঁ, ইহাকে নীচতা বলে। সামান্য প্রবঞ্চনা ইহা নহে।'

বিনয় পুনরায় বলিলেন,—'একবার পুণ্ডরীক আপনার গ্রামে গিয়াছিলেন। গিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র—সাত বৎসরের বালক—বন হইতে একটি খরগোসের ছানা ধরিয়াছিল। শশক-শাবকটিকে সে বড় ভালবাসিত, সর্বদা তাহাকে বুকে করিয়া রাখিত। নবীন শ্যামল দূর্বদল ও কোমল নবপল্লব সংগ্রহ করিয়া অতি যত্নে তাহাকে প্রতিপালন করিত। শশক-শাবকটি দেখিয়া পুণ্ডরীকের লোভ হইল। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র তখন বালক ছিল। নিজের পুত্রের নিমিত্ত তিনি খরগোস ছানাটি লইতে ইচ্ছা করিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্রের নিকট তিনি তাহা চাহিলেন। বালক বলিল—'না জ্যেঠামহাশয়! খরগোস-ছানাটি আমি আপনাকে দিতে পারি না। অতি কষ্টে আমি ইহাকে ধরিয়াছি। ইহাকে ধরিতে আমার পায়ে কত কাঁটা ফুটিয়াছিল, কাঁটা লাগিয়া ফালা ফালা হইয়া আমার কাপড় ছিঁড়িয়া গিয়াছিল।' তাহার কথায় পুণ্ডরীক অতিশয় রাগান্বিত হইলেন। 'যেমন করিয়া পারি, খরগোস-ছানাটি আমি লইব'—মনে মনে তিনি এইরূপ সংকল্প করিলেন। বালক

তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া খরগোস-ছানাটি লুকাইয়া রাখিল। পরদিন প্রাতঃকালে পুণ্ডরীক চাদর লইয়া চলিয়া গেলেন। বালক মনে করিল যে, তিনি কলিকাতায় প্রতিগমন করিলেন। তখন সে লুক্কায়িত স্থান হইতে খরগোস-ছানাটিকে বাহির করিয়া কচি কচি পাতা তাহাকে খাইতে দিল। তাহার পর বুকে লইয়া তাহাকে আদর করিতে লাগিল। এমন সময় সহসা পুণ্ডরীক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বালকের নিকট হইতে বলপূর্বক তিনি খরগোস-ছানাটি কাড়িয়া লইলেন। বালক তাঁহার পায়ে পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল,—'ও জ্যেঠামহাশয়! আমার খরগোসটি লইবেন না। ও জ্যেঠামহাশয়! বড় কষ্টে আমি ইহাকে ধরিয়াছি। এই দেখুন, কাঁটা লাগিয়া আমার হাত কত ছিঁড়িয়া গিয়াছিল, বাবা তাহার জন্য আমাকে কত মারিয়াছিলেন। আপনার পায়ে পড়ি, জ্যেঠামহাশয়! আমার খরগোস-ছানাটি আপনি লইয়া যাইবেন না।' এইরূপ খেদ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বালক পুণ্ডরীকের পায়ে আছাড়ি-পিছাড়ি খাইতে লাগিল। তাঁহার পা দুইটি দুই হাতে ধরিয়া চক্ষুর জলে ভাসাইয়া দিল। কিন্তু পুণ্ডরীকের কিছুমাত্র দয়া হইল না। বালকের পিতা নিকটে দাঁড়াইয়া ছিলেন। শিশুপুত্রের মর্মভেদী কাতরোক্তি শুনিয়া তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল কিন্তু জ্যেষ্ঠ ধনবান, তিনি গরীব। ভয়ে তিনি কিছু বলিতে পারিলেন না। বালকের মাতা ঘোমটা দিয়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মাটীতে পড়িয়া ধূলায় ধূসরিত হইয়া শিশুপুত্র গড়াগড়ি দিতেছিল। তাড়াতাড়ি পুত্রকে তিনি কোলে লইলেন। মাতার বক্ষঃস্থলে মস্তক রাখিয়া বালক নীরবে কাঁদিতে লাগিল। মাতার দুই চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। দুইজনের চক্ষু-জলে মাতার কাপড় ভিজিয়া গেল। পুণ্ডরীকের কিছুমাত্র দয়া হইল না। নিজের পুত্রের নিমিত্ত শশক-শাবকটি লইয়া তিনি কলিকাতায় চলিয়া গেলেন।'

সুবালা চক্ষুর জল সংবরণ করিতে পারিলেন না। বালক যেরূপ কাঁদিয়াছিল, ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া তিনিও সেইরূপ কাঁদিতে লাগিলেন, আর আঁচল দিয়া ক্রমাগত চক্ষু মুছিতে লাগিলেন।

তাঁহার কান্না দেখিয়া বিনয়ও চক্ষুর জল নিবারণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার নেত্রদ্বয় ছলছল করিতে লাগিল। দুই একটি অশ্রুবিন্দু তাঁহার চক্ষু হইতে ভূতলে পতিত হইল।

বিনয় বলিলেন,—'সুবালা কাঁদিও না। যে স্থানে এই নৃশংস ব্যাপার সংঘটিত হয়, আমি তখন সেই স্থানে উপস্থিত ছিলাম। আমিও তখন বালক ছিলাম, সেই বালকের সহিত অনেক কাঁদিয়াছিলাম। সে নিষ্ঠুর ব্যাপার দেখিয়া পাড়ার লোক সকলেই কাঁদিয়াছিল যাহা হউক সে বালকের দুঃখ নিবারণ করিতে আমি সমর্থ হইয়াছিলাম। কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া পিতাকে আমি সকল কথা বলিলাম। আমার বাবা সেই বালককে চমৎকার একজোড়া বিলাতী সাদা খরগোস কিনিয়া দিলেন তাহা পাইয়া বালকের আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। এত কাণ্ড করিয়া শশক শাবক আনিয়া পুণ্ডরীক নিজের পুত্রকে দিলেন বটে, কিন্তু তাহা ভোগ হইল না। তিনদিন পরে ছানাটি মরিয়া গেল।

একাদশ অধ্যায় – বৃদ্ধ বৈবাহিক

সুবালা বলিলেন,—'পাপকর্ম করিলে এইরূপ ফলই হয়।'

বিনয় বলিলেন,—'আর অধিক বলিব না। পুণ্ডরীক সম্বন্ধে কেবল আর একটি গল্প বলিব। হাটখোলায় এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ছিলেন। দোকানে সামান্য মুহুরিগিরি করিয়া তিনি দিনপাত করিতেন। একটি শিশুকন্যা রাখিয়া তাঁহার পত্নীর পরলোক হইয়াছিল। অতি যত্নে বৃদ্ধ সেই কন্যাটিকে প্রতিপালন করিতেছিলেন। প্রাণ অপেক্ষা কন্যাটিকে তিনি ভালবাসিতেন। তাহার বিবাহকাল উপস্থিত হইল। পুণ্ডরীকের কনিষ্ঠ পুত্রের সহিত ঘটক সম্বন্ধ করিল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের অল্প শুচিবাই ছিল। তিনি ভাবিলেন যে,—বরের পিতা ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ, পৌরোহিত্য ব্যবসা! তাঁহার ঘরে অখাদ্য-কুখাদ্য যায় না এরূপ ঘরে পড়িলে কন্যা আমার শুদ্ধচারে থাকিবে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ধনবান্ লোক। কন্যা সুখেও থাকিবে।' কিন্তু ব্রাহ্মণ যদি একটু তদন্ত করিয়া দেখিতেন, তাহা হইলে পূর্বে দুই বৈবাহিকের সহিত তিনি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা জানিতে পারিতেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ হাবা-গোবা লোক ছিলেন। ঘটকেরা যাহা বলিল, তাহাই তিনি বিশ্বাস করিলেন। কন্যা সুখে থাকিবে,—'এই প্রত্যাশায় পুণ্ডরীক যাহা বলিলেন, বৃদ্ধ তাহাই দিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু সেই সমুদয় গহনা, দান-সামগ্রী প্রভৃতি আহরণ করিতে ব্রাহ্মণ সর্বস্বান্ত হইলেন। এমনকি, তাঁহাকে ঘটি-বাটি পর্যন্ত বিক্রয় করিতে হইয়াছিল। পুরাতন একজোড়া শাল ছিল, তাহা পর্যন্ত ব্রাহ্মণকে বিক্রয় করিতে হইয়াছিল।

যাহা হউক, বিবাহ হইয়া গেল। প্রাতঃকালে বর-কন্যা লইয়া বরযাত্রীগণ চলিয়া গেল। ব্রাহ্মণ মনে করিলেন যে,—'কন্যাদায় হইতে আমি উদ্ধার পাইলাম, এখন হইতে আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। কিন্তু একঘণ্টা পরে একজন লোক দৌড়িয়া আসিয়া বলিল যে,—'পুণ্ডরীক ভট্টাচার্য্য মহাশয় নব পুত্রবধূকে ঘরে তুলিতেছেন না, কি গোল হইয়াছে। শীঘ্র আপনি চলুন।' দ্রুতগামী গাড়ী করিয়া ব্রাহ্মণ নূতন বৈবাহিকের গৃহে গমন করিলেন, তিনি দেখিলেন যে, দ্বারে গাড়ীর ভিতর তাঁহার কন্যা বসিয়া আছে; প্রতিবেশীর যে চাকরাণী তাহার সঙ্গে আসিয়াছিল, সে তাহার নিকটে আছে। বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে পুণ্ডরীক কোলের নিকট বাক্স রাখিয়া বসিয়া আছেন। কন্যাকে বৃদ্ধ যে গহনাগুলি দিয়াছিলেন, পুণ্ডরীক নিক্তিতে সেগুলি বার বার ওজন করিয়া দেখিতেছেন ও কষ্টিপাথরে ঘসিয়া তাহার সোনা পরীক্ষা করিতেছেন।

বৈবাহিককে দেখিয়া তিনি বলিলেন যে,—'ওজনে ঠিক আছে কিন্তু সোনা ঠিক নহে। এ গিনি সোনা অপেক্ষা নিকৃষ্ট। আপনি আমাকে গিনি সোনার অলঙ্কার দিতে অঙ্গীকৃত হইয়াছিলেন।'

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন,—'সে কথা সত্য। পরে তাহার মীমাংসা হইবে; কিন্তু আপাততঃ পুত্রবধূ দ্বারে গাড়ীতে বসিয়া আছে। তাহাকে বাটীর ভিতর আনয়ন করুন। যথারীতি বরণাদি করিতে স্ত্রীলোকদিগকে আজ্ঞা করুন।'

পুণ্ডরীক উত্তর করিলেন,—'এ কথার মীমাংসা না হইলে আপনার কন্যা আমি ঘরে লইব না। ইচ্ছা হয় আপনার কন্যাকে আপনি লইয়া যাউন। পুত্রের আমি পুনর্বার বিবাহ দিব। এরূপ জুয়াচোরের কন্যাকে আমার প্রয়োজন নাই।'

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন,—'আমি শঠ জুয়াচোর নই। গিনি সোনা দিয়া গহনা গড়িতে স্বর্ণকারকে আমি আজ্ঞা করিয়াছিলাম। গিনি সোনার মূল্যও আমি তাহাকে দিয়াছি। স্বর্ণকার যদি কোনরূপ প্রবঞ্চনা করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে দোষ আমার নহে।'

পুণ্ডরীক উত্তর করিলেন,—'দোষ কাহার, তাহা আমি জানি না, জানিতে ইচ্ছাও করি না। আমি এইমাত্র জানি যে, যদি স্বর্ণ-রৌপ্যের ব্যবসা না করিতাম, যদি স্বর্ণ-রৌপ্য পরীক্ষা করিতে না জানিতাম, তাহা হইলে আজ আপনি আমাকে বিলক্ষণ ঠকাইতেন। আমি ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারি না। আপনার কন্যা আপনি ঘরে ফিরিয়া লইয়া যাউন।'

ব্রাহ্মণ আর তর্ক করিলেন না। পুণ্ডরীকের পা দুইটি ধরিয়া অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। কিন্তু পুণ্ডরীকের পাষাণসদৃশ কঠিন হৃদয় ব্রাহ্মণের দুঃখে অণুমাত্র ব্যথিত হইল না। পাড়ার দুই চারিজন ভদ্রলোক, পুণ্ডরীকের দুই তিনজন কুটুম্ব সেই স্থানে বসিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের দুঃখ দেখিয়া তাঁহারা দুঃখিত হইলেন। তাঁহারা পুণ্ডরীককে বলিলেন,—পুত্রবধূ ঘরে লইবেন না, সে কেমন কথা। পিতৃবংশের সহিত কন্যার এখন আর কোন সম্বন্ধ নাই। সে এখন আপনাব বংশভুক্ত হইয়াছে। আপনার গোত্র প্রাপ্ত হইয়াছে। আপনার অশৌচ এখন তাহার অশৌচ। তাহার কোনরূপ অখ্যাতি হইলে আপনার অখ্যাতি। তাহা হইলে কি করিয়া আপনি পাঁচজনকে মুখ দেখাইবেন?'

এই সমুদয় কথা শুনিয়া পুণ্ডরীক কিয়ৎ-পরিমাণ ভীত হইলেন। বৈবাহিকের নিকট হইতে একশত টাকার খৎ লইয়া পুত্রবধূকে তিনি ঘরে তুলিলেন। 'তোমার কন্যাকে আর আমি তোমার নিকট পাঠাইব না। তুমি শঠ জুয়াচোর। কন্যাকে তুমি কুশিক্ষা প্রদান করিবে।'—এইরূপ কতকগুলি মধুর বাক্যদ্বারা নব বৈবাহিককে পরিতোষ করিয়া তিনি তাঁহাকে বিদায় করিলেন।

পুণ্ডরীক ও তাঁহার স্ত্রী বালিতেন যে, পুত্রের বিবাহ দিয়া বৈবাহিকের উপর সর্বদাই চক্ষু রাঙ্গা করিয়া থাকিতে হয়, সর্বদাই তাহাকে দুই পা দিয়া থেঁৎলাইতে হয়। কয়েক মাস পরে সেই একশত টাকার জন্য তাগাদা আরম্ভ হইল। আমি সর্বস্বান্ত হইয়াছি আমার আর কিছু নাই, একেবারে একশত টাকা প্রদান করি, সে ক্ষমতা আমার নাই। ক্রমে ক্রমে পরিশোধ করিব।'—'এইরূপ মিনতি করিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সময় প্রার্থনা করিলেন। পুণ্ডরীক সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। ব্রাহ্মণের নামে তিনি নালিশ করিলেন, ডিক্রি করিলেন, ডিক্রি জারি করিলেন। কিন্তু বেচিয়া কিনিয়া লইবেন, ব্রাহ্মণের এরূপ কোন সম্পত্তি ছিল না। ডিক্রির টাকা আদায় হইল না। ব্রাহ্মণকে পুণ্ডরীক কারাবাসে পাঠাইলেন।

দুই মাস তিনি কারাগারে আবদ্ধ রহিলেন। অবশেষে একজন জ্ঞাতি পুণ্ডরীকের ঋণ পরিশোধ করিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে খালাস করিয়া আনিলেন; নিজের বাটীতে তাঁহাকে আশ্রয়

প্রদান করিলেন। লজ্জায়, ঘৃণায় মনোদুঃখে ব্রাহ্মণের শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়া ছিল। অল্পদিন পরেই তিনি নিদারুণ রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইলেন।

তাঁহার আসন্নকাল উপস্থিত হইল। কন্যা ললিতাকে তিনি একবার দেখিতে চাহিলেন। পুণ্ডরীক পাঠাইলেন না। তিনি বলিলেন যে,—'ও পাপিষ্ঠ প্রতারকের নিকট আমি আমার পুত্রবধূকে পাঠাইব না। মৃত্যুকালে কন্যাকে সে কুশিক্ষা দিয়া যাইবে।'

বৈবাহিকের নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণ করিয়াও কন্যাকে একবার দেখিবার বাসনা বৃদ্ধ পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। জ্ঞাতি এবং অন্যান্য লোকদিগকে কাকুতি-মিনতি করিয়া ক্রমাগত তিনি বলিতে লাগিলেন,—'ও' গো! তোমরা একবার আমার ললিতাকে আনিয়া দাও। একবার তাহার মুখখানি আমি দেখি। একবার তাহার দুই একটি কথা শ্রবণ করি। যখন সে নিতান্ত শিশু ছিল, তখন আমার পত্নীর পরলোক হইয়াছিল। মাতার ন্যায় আমি কন্যাটিকে অতিযত্নে প্রতিপালন করিয়াছিলাম। আমি তাহাকে কখন কুশিক্ষা প্রদান করি নাই। পিতা হইয়া কন্যাকে কেহ কখন কি কুশিক্ষা প্রদান করে? জানিয়া শুনিয়া আমি বৈবাহিককে প্রতারণা করি নাই। আমি গিনি সোনার মূল্য দিয়াছিলাম। স্বর্ণকার যদি কোনরূপ বঞ্চনা করিয়া থাকে, তাহা হইলে আমি কি করিব। আমি বৃদ্ধ আমি পীড়িত। 'ও গো! একবার তোমরা আমার ললিতাকে আনিয়া দাও।

মৃত্যুশয্যায় শায়িত দীন ক্ষীণ কাতরোক্তি শুনিয়া সকলের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। পুণ্ডরীকের নিকট বার বার তাঁহারা লোক পাঠাইলেন। অবশেষে সেই সমৃদ্ধিশালী জ্ঞাতি নিজে পর্যন্ত গমন করিলেন। পুণ্ডরীক কিছুতেই বৃদ্ধের কন্যাকে পাঠাইলেন না।

শেষ অবস্থায় বৃদ্ধ জ্ঞানশূন্য হইলেন। বিকারের প্রলাপ ললিতার জন্য তিনি অবিরত বিলাপ করিতে লাগিলেন।—

'ললিতা আসিয়াছ? এস মা! এস। এতদিন তুমি আস নাই কেন মা? তুমি তো জান মা! যে তোমাকে একদণ্ড না দেখিয়া আমি থাকিতে পারি না। তুমি তো জান মা! যে সন্ধ্যাবেলা দোকান হইতে আসিয়া আগে তোমাকে কোলে করিতাম। পায়ের নিকট বসিলি কেন মা? আমার এই হাতের নিকট ঠিক সম্মুখে এস। চক্ষুতে আর আমি ভাল দেখিতে পাই না। সব যেন অন্ধকার দেখিতেছি। সেইজন্য কাছে আসিতে বলিতেছি। তোমার মুখ আজ এত মলিন কেন মা? তোমার কাপড়খানি এত ময়লা কেন? তুমি বড় রোগা হইয়া গিয়াছ!'

এই কথা বলিতে বলিতে বৃদ্ধ একবার চমকিয়া উঠিলেন। তাহার পর তিনি বলিলেন,—'না, কই, ললিতা তো আসে নাই! তাহার শ্বশুর-শাশুড়ী তাহাকে তো পাঠান নাই। হায়! হায়! পৃথিবীতে এমন নিষ্ঠুর লোকও থাকে। মা ললিতা! শেষ কালে তোমাকে একবার দেখিতে পাইলাম না!'—।'

বিনয় বলিলেন,—"এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে বৃদ্ধের প্রাণত্যাগ হইল। সেই জ্ঞাতির নিকট আমি এই সকল কথা শুনিয়াছিলাম। এখন দেখ, সুবালা! চড়ুই পাখীর পায়ে

সুতা বাঁধিয়া খেলা করা এইরূপ নিষ্ঠুরতা, আর এ একরূপ নিষ্ঠুরতা। বালকের শশক-শাবক বলপূর্বক কাড়িয়া লওয়া, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে কারাবাসে প্রেরণ করা, শেষকালে তাহার কন্যাকে দেখিতে না দেওয়া,—এরূপ বিবরণ শ্রবণ করিলে সর্বশরীর শিহরিয়া উঠে। তুমি বোধ হয় জান, সুবালা! যে, নানা দৈত্য ভূত প্রেত পিশাচগণ কখন কখন মানুষের দেহ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে! তাহারাই এইরূপ কার্য করিতে পারে। যাহারা প্রকৃত মানুষ, তাহারা এরূপ কার্য করিতে পারে না।

চুপ কর সুবালা! আর কাঁদিও না। একদিকে যেরূপ পুণ্ডরীকের ন্যায় পাপিষ্ঠদিগের নিষ্ঠুরতার ধরণী তাপিতা হইয়া পড়েন, সেইরূপ অপর দিকে পরদুঃখ-শ্রবণজনিত তোমার মত লোকের শান্তিলাভ করেন।

আমার বয়স অধিক হয় নাই সত্য; কিন্তু পিতা আমাকে অনেক উপদেশ দিয়াছেন। একবার পুণ্ডরীক সম্বন্ধে কি কথা হইতেছিল। পুণ্ডরীককে লক্ষ্য করিয়া পিতা আমাকে বলিলেন,—'দেখ বিনয়! পুণ্ডরীকের মত লোক কখনও সুখী হয় না। তাহার মন যদি উদঘাটিত করিয়া নিরীক্ষণ কর, তাহা হইলে বুঝিবে যে, তাহার অন্তঃকরণ অশান্তিতে জর্জ্জরীভূত হইয়া আছে। যতই ধন হউক না কেন, ধনের লালসা কখনই পরিতৃপ্ত হয় না। পুণ্ডরীক ধনবান্ হইয়াছে সত্য, কিন্তু ধনলালসা তাহার মন হইতে এখনও দূর হয় নাই। ধন দিয়া পুণ্ডরীক অনেক বস্তু ক্রয় করিতে পারে, কিন্তু পুত্র-কন্যা প্রভৃতি প্রিয়জনের পরমায়ুকে ক্রয় করিতে পারে না। আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে, যেদিন তাহার পাপবৃক্ষ পরিবর্ধিত হইয়া ফল উৎপাদন করিবে, সেদিন সেই ফল পরিপুষ্ট হইবে, সেইদিন পুণ্ডরীককে যম-যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতে হইবে।'

বাস্তবিক তাহাই হইয়াছে। পুণ্ডরীকের সে তিন পুত্র ও তিন পুত্রবধূ এখন কোথায়?

যেমন পুণ্ডরীক, তেমনি তাঁহার পত্নী। তিনিও অতি শ্রদ্ধাচারিণী। তিনিও সর্বদা জপ করেন। যখন পুত্রবধূ ঘরে ছিল, তখন তিনি জপ করিতেন,—'কিরূপে বৈবাহিকের নিকট হইতে কিছু আদায় করিব, কিরূপ গালি দিয়া পুত্রবধূকে তাড়না করিব।' তিনি বলিতেন,—'বেটার বিবাহ দিয়াছি; বৈবাহিককে যেন তেন প্রকারেণ দুহিয়া লইব না?' আহা! সে বেটার গৌরব এখন তাঁহার কোথায়?

বড় বৈবাহিক যথেষ্ট টাকা ও জিনিসপত্র দিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুতেই পুণ্ডরীক ও তাঁহার পত্নীকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন নাই। বড় পুত্রবধূকে রাত্রিদিন তাঁহারা যন্ত্রণা ও গঞ্জনা দিতেন। পুণ্ডরীকের মধ্যম পুত্র তাহার সহিত অযথা তামাসা করিত। পুত্রবধূ কাঁদিয়া শ্বশুর-শাশুড়ীর নিকট নালিশ করিলে তাঁহারা কিছু বলিতেন না, বরং এই কার্যে মধ্যম পুত্রকে উৎসাহ প্রদান করিতেন। কিছুদিন পরে তাঁহারা পুত্রবধূর নামে কলঙ্ক রটাইলেন। জ্বালা, যন্ত্রণা, গঞ্জনা, তাহার উপর নিন্দা অপবাদ। বড় পুত্রবধূ তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া অবশেষে সে হতভাগিনী গলায় দড়ি দিয়া মরিল।

মধ্যম বৈবাহিকের সহিত প্রথম হইতেই পুণ্ডরীকের মুখ দেখাদেখি ছিল না। পাড়া

প্রতিবেশীদিগের নিকট হইতে বড় বড় থালা প্রভৃতি বাসন চাহিয়া লইয়া তিনি ফুলশয্যার জিনিস পাঠাইয়াছিলেন। পুণ্ডরীক সে বাসন ফেরত দিলেন না। সেই সম্বন্ধে দুইজনে মনান্তর হইল। পুণ্ডরীক মধ্যম পুত্রবধূকে ঘরে আনিলেন না। কিছুকাল পিত্রালয়ে বাস করিয়া সে এক্ষণে খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের আশ্রয় লইয়া ঘরে হইতে চলিয়া গিয়াছে।

কনিষ্ঠ পুত্রবধূ অর্থাৎ হাটখোলার সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কন্যা ললিতা রোগে মারা গিয়াছে। পুণ্ডরীকের কন্যাও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

পুণ্ডরীকের জ্যেষ্ঠপুত্র মারামারি করিয়া জেলখানায় গিয়াছিল, কারাগারে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। মধ্যম পুত্র টাকাকড়ি সম্বন্ধে পিতার সহিত বিবাদ করিয়া আফিম খাইয়া মরিয়াছে। কনিষ্ঠ পুত্র রোগাক্রান্ত হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেমানুষের দেহ অতি ক্ষণভঙ্গুর। পুণ্ডরীক-পত্নীর ন্যায় বেটায় অহঙ্কার করিতে নাই।

পুণ্ডরীক ও তাঁহার স্ত্রী ব্যতীত তাঁহার সংসারে এখন আর কেহ নাই। পুণ্ডরীক নিজেও অন্ধ হইয়া আছেন। এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও টাকার মায়া তিনি পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। যতই বৃদ্ধ হইতেছেন, ততই যেন ধনলালসা তাঁহার বৃদ্ধি হইতেছে। তাঁহার টাকা কে ভোগ করিবে, তাহার ঠিক নাই; কিন্তু তিনি এখন ভয়ানক কৃপণ হইয়াছেন। পয়সা খরচ করিতে তাঁহার বুক যেন ফাটিয়া যায়। তাঁহার গৃহিণী ভাল মাছ, ভাল তরকারী, ভাল জলখাবার গোপনে আনাইয়া ভোজন করেন; কিন্তু পুণ্ডরীক তাহা জানিতে পারিলে অনর্থ করেন। সেজন্য ঘরে থাকিলেও তাঁহার স্ত্রী কোন ভাল দ্রব্য তাঁহাকে দিতে সাহস করেন না। একদিন তাঁহার স্ত্রী গলদা চিংড়ী মাছের ঝোল করিয়া আহার করিতেছিলেন। ঝোল মাখিয়া ভাত খাইবার সময় সামান্য একটু সপ্ সপ্ শব্দ হইয়াছিল। কোথায় কি হয়, কে কি খায়, সেজন্য অন্ধ সর্বদাই কান পাতিয়া থাকেন। অন্ধের কানে সেই সপ্ সপ্ শব্দ প্রবেশ করিল। হুলস্থূল পড়িয়া গেল। অন্ধ বলিলেন,—'আমার সর্বনাশ হইল! আমি পথের ভিখারী হইলাম! তুমি দেখিতেছি, আজ ডাল রাঁধিয়াছ, তুমি আমার সর্বনাশ করিলে। ডাল রান্না! এত খরচ করিলে কুবেরের ধনাগারও শূন্য হইয়া যায়।' শঙ্কিত হইয়া স্ত্রী বলিলেন,—'না গো, না! আমি ডাল রন্ধন করি নাই। ভাত শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। একটু ফেন মাখিয়া খাইতেছি। সেইজন্য সপ্ সপ্ শব্দ হইতেছে?' সন্তুষ্ট হইয়া অন্ধ বলিলেন,—'বেশ! বেশ!' তবেই দেখ সুবালা! ঘরে ভাল দ্রব্য রান্না হইলেও স্ত্রী তাঁহাকে দিতে সাহস করেন না। একটু আলু ভাতে, কি একটু কাঁচকলা ভাতে দিয়া প্রতিদিন তাঁহাকে ভাত দিতে হয়। প্রচুর পরিমাণে ডাল থাকিলেও ভাত মাখিবার নিমিত্ত তাঁহাকে একটু ফেন দিতে হয়।'

সুবালা বলিলেন,—'কি অধর্মের ভোগ!'

বিনয় উত্তর করিলেন,—'হাঁ সুবালা! পৃথিবীর রহস্য কিছু বুঝিতে পারা যায় না। তবে এইমাত্র বলিতে পারা যায় যে, কর্মের ফল নিশ্চয়ই ভোগ করিতে হয়। আর একটি আশ্চর্য্য বিষয় এই যে পুণ্ডরীক ও তাঁহার পত্নীর মত লোকেরা নিজের দোষ দেখিতে পায়

না। তাহারা মনে করে যে, আমরা যাহা করিতেছি ইহা ধর্মসঙ্গত ভাল কাজ। পুণ্ডরীক-পত্নী মনে করিতেন যে,—'আমি বেটার মা, পুত্রবধূগন আমার বাঁদী। দিবারাত্রি তাহাদিগকে তাড়না করিব না কেন? আমি বেটার মা, বেহাইকে দুহিয়া লইব না কেন? বেহাই দিবে না কেন? যত দোষ বেহাই বেটাদের। অন্যায় কাজ তাহারা করিতেছে; আমি কোন অন্যায় কাজ করি নাই।' কিন্তু সুবালা! তোমার মন স্বভাবতঃ অতি পবিত্র। তোমাকে উপদেশ প্রদান করি সে ক্ষমতা আমার নাই। তবে মিথ্যা আচরণ, নীচতা ও নিষ্ঠুরতা কাহাকে বলে, তাহার গুটিকতক দৃষ্টান্ত আমি প্রদান করিলাম।'

সুবালা বলিলেন,—'মৃত্যুকালে আমার মাতা যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার অর্থ এখন আমি অনেকটা বুঝিতে পারিলাম।'

দ্বাদশ অধ্যায় – শাঁকচুন্নীর হাড়

বিনয় পুনরায় জিজ্ঞাসা কবিলেন,—'তবে বিজয়বাবুকে নিতান্তই তুমি পত্র লিখিবে?'

সুবালা উত্তর করিলেন,—'নিশ্চয় কল্য আমি তাঁহাকে পত্র লিখিব; কিন্তু এ কথা এক্ষণে তুমি কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না। কাকামহাশয়, পিসীমা অথবা বড়ালমহাশয় এ কথা শুনিলে আমাকে পাগল মনে করিবেন, আর বড়ই গোলযোগ করিবেন। সেজন্য কাকামহাশয় এ স্থানে না আসিতে আসিতে বিজয়বাবুকে আমি পত্র লিখিব।'

বিনয় সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন; সুবালাও নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে ধীরে ধীরে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে সুবালা বিজযবাবুকে পত্র লিখিলেন,—'আপনার জ্যেষ্ঠভ্রাতা কিরূপ উইল করিয়াছিলেন, তাহা আপনি অবগত আছেন। তাহার পর কি হইয়াছে, তাহাও আপনি জানেন। কিন্তু এখন আমি বুঝিয়াছি যে, এই সম্পত্তি আপনার, আমার নহে। অতএব আপনি আসিয়া আপনার সম্পত্তিব ভার গ্রহণ করুন। আমি আমার কাকামহাশয়ের বাড়ীতে চলিয়া যাই। আপনি এ স্থানে আগমন করিলে সকল কথাই পবিষ্কার করিয়া বলিব। আমি সামান্য বালিকা আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া শীঘ্র আসিবেন।'

কিছুক্ষণ পরে বিনয়কে সঙ্গে লইয়া বড়ালমহাশয় সুবালার নিকট আগমন করিলেন। তিনি বলিলেন,—'গতকল্য খাঁদা ভূত জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—একদিন রাত্রিতে বাগানে বসিয়া তুমি কি করিতেছিলে? তখন আমি কোন উত্তর প্রদান করি নাই। এস, আজ আমি তাহার উত্তর দিব। দুইটা শাঁকচুন্নী ও চপলার সমস্যা বোধ হয় তাহাতে মীমাংসা হইবে।'

বিনয় ও সুবালাকে সঙ্গে লইয়া বড়ালমহাশয় প্রথম নিমতলার পূর্বদিকে যে ঘরে ঘুঁটে ও কাষ্ঠ থাকে ও যে ঘরের জানলার গরাদ খুলিয়া খাঁদা ভূত বাটীর ভিতর আসিত, সেই ঘরে গমন করিলেন। বড়ালমহাশয় জানালার দুইটি কাষ্ঠনির্মিত গরাদ ধরিয়া টানিলেন। গরাদ দুইটি অনায়াসে তিনি খুলিতে পারিলেন। সেই পথে বাহির হইয়া তিনজনে বাগানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বড়ালমহাশয় পুনর্বার গরাদ দুইটি জানালাতে দিয়া দিলেন।

জানালা হইতে প্রায় দশ হাত দূরে দুইজন মালী ও একজন গ্রামবাসী দাঁড়াইয়া ছিল। স্থান নির্দেশ করিয়া বড়ালমহাশয় তাহাদিগকে খনন করিতে বলিলেন, প্রথম সে স্থানের মৃত্তিকা খনন করিয়া তাহারা সরাইয়া ফেলিল। সুবালা ও বিনয় বিস্মিত হইয়া দেখিলেন যে, মৃত্তিকার নিম্নে অনেকগুলি ইট পাশাপাশি সজ্জিত রহিয়াছে। দুইজন মালী ইটগুলি সরাইয়া ফেলিল। একখানি চতুষ্কোন তক্তার পাট বাহির হইয়া পড়িল। বড়ালমহাশয় মালীদিগকে আদেশ করিলেন,—'পার্শ্বে বসিয়া সাবধানে তক্তাখানি তুলিয়া ফেল।'

তাহারা তাহাই করিল। একটি কূপ বাহির হইয়া পড়িল। আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বিনয় ও সুবালা উঁকি মারিয়া দেখিলেন যে, কূপ শুষ্ক নহে। তাহার ভিতর জল আছে।

বড়ালমহাশয় বলিলেন,—'তোমাদিগকে এক্ষণে কিছু পূর্ব বৃত্তান্ত বলিব, তবে তোমরা বুঝিতে পারিবে। এই বাটী ও এই সম্পত্তি রাজাবাবুর পিতৃ-পিতামহের নহে। ইহা আর একজনের ছিল—তাহার বংশ এক্ষণে লোপ হইয়াছে। রাজাবাবুর পিতা পূর্বদেশের লোক। তিনি এই সম্পত্তি ক্রয় করেন। সম্পত্তি ক্রয় করিয়া এই গ্রামে আসিয়া তিনি বাস করিলেন। সে জন্য এ স্থানে রাজাবাবুর জ্ঞাতি-গোত্র, আত্মীয়-স্বজন কেহ নাই। পূর্বদেশে থাকিলেও থাকিতে পারে। তাহা আমি জানি না। রাজাবাবুও বোধ হয় জানিতেন না।

যাঁহারা এই বাটী নির্মাণ করাইয়াছিলেন ও এই বৃহৎ বাগানের পত্তন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই এই কূপ খনন করাইয়াছিলেন। গ্রীষ্মকালে নদী শুষ্ক হইলে পুষ্করিণীর জল শুষিয়া লয়। বাগানের গাছ যখন ছোট ছিল, তখন তাহাতে জলসেচনের নিমিত্ত বোধ হয় ভূস্বামী এই কূপ খনন করাইয়াছিলেন। রাজাবাবুর সময়ে বৃক্ষ সকল বড় হইয়াছিল, জলসেচনের আবশ্যকতা ছিল না। মানুষ কি গরু-বাছুর পাছে পড়িয়া যায়, সেজন্য কূপের চারিধার আমরা কাঠ দিয়া ঘিরিয়া রাখিতাম। রাজাবাবু একবার আমাকে বলিলেন,—'ও কূপটা আর কেন? কূপটী মাটী ফেলিয়া বুজাইয়া দাও।'

আমি ভাবিলাম, কূপটা একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিব না। সেজন্য রাজার অনুমতি লইয়া চতুষ্কোণ তক্তার পাট প্রস্তুত করিলাম ও তাহা দিয়া কূপের মুখ চাপা দিলাম। তক্তা শীঘ্র পচিয়া যাইবে না, এই উদ্দেশে তাহার উপর ইট বিছাইয়া দিলাম, তাহার উপর মাটী দিয়া বাগানের ভূমির সহিত সমান করিয়া দিলাম।

চারিদিকে খনন করিয়া ও গাছ কাটিয়া যখন আমি সোনার ইটের অন্বেষণ করিতেছিলাম, তখন একদিন কূপের কথা আমার স্মরণ হইল। আমি ভাবিলাম যে, কূপের মুখ গোপনে খুলিয়া রাজাবাবু হয় তো তাহার ভিতর সোনার ইট লুক্কায়িত রাখিয়াছেন। কূপের ভিতর সোনার ইট রাখিতে হইলে বাক্সর ভিতর বন্ধ করিয়া রাখিতে হইবে। কূপের ভিতর ঘটী পড়িয়া গেলে বঁড়শীর ন্যায় বড় বড় লৌহ-কন্টকের সহায়তায় লোক উপর হইতে উত্তোলন করে। দীর্ঘরজ্জু সংযুক্ত একগুচ্ছ সেইরূপ লৌহ-কন্টক আমি সংগ্রহ করিলাম। একদিন রাত্রি দশটার সময় চুপি চুপি আসিয়া আমি কূপের মুখ হইতে মৃত্তিকা ইট ও তক্তা সরাইয়া ফেলিলাম। তাহার পর রজ্জুর একদিক ধরিয়া বঁড়শীগুলি জলে

নামাইয়া দিলাম। কাঁটাগুলি কূপের নিম্নে মাটী স্পর্শ করিল, তখন তাহাদিগকে চারিদিকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে লাগিলাম যে, কূপের ভিতর বাক্স অথবা অন্য কোন দ্রব্য পড়িয়া আছে কি না। রজ্জু ধরিয়া নাড়িতে চাড়িতেছি, এমন সময় আমার দক্ষিণ দিকে একবার চাহিয়া দেখিলাম। সর্বনাশ! দেখিলাম অতি অল্পদূরে খাঁদা ভূত দাঁড়াইয়া আছে। বলা বাহুল্য যে, আমি ঘোরতর ভীত হইলাম। দড়িটি আমার হাত হইতে স্খলিত হইয়া কূপের ভিতর পতিত হইল। কূপের মুখ সেইরূপ খোলা অবস্থায় রাখিয়া আমি রুদ্ধশ্বাসে পলায়ন করিলাম। তাহার পর অতি প্রত্যূষে আসিয়া কূপের মুখ যেমন বন্ধ ছিল, সেইরূপ বন্ধ করিয়া ফেলিলাম। পাছে কেহ জানিতে পারে যে, এ স্থানের মৃত্তিকা কে খনন করিয়াছিল, সেজন্য তাহার উপর শুষ্ক পত্রাদি ছড়াইয়া দিলাম।

দিনের বেলায় পাগলী আসিয়া বাগানে দাঁড়াইত এবং চপলা দোতলার জানলার ধারে দাঁড়াইয়া তাহাকে দেখা দিত,—এ কথা আমি জানিতাম। কিন্তু গতকল্য খাঁদা ভূত যখন জানালার গরাদের কথা বলিল, তখন আমার মনে সন্দেহ হইল।'

সুবালা উত্তর করিলেন,—'হাঁ, আমারও মনে একটা সন্দেহ জন্মিয়াছিল!'

বড়ালমহাশয় বলিলেন,—'তাহার পর ঘরে গিয়া বড়ালনী যখন শাঁকচুন্নির কথা উত্থাপন করিলেন, তখন আমার আরও সন্দেহ হইল। আমি ভাবিলাম যে, ত্রিলোচন ও শঙ্করা যে একজোড়া শাঁকচুন্নি দেখিয়াছিল ও কল্পনাবলে তাহাদের অদ্ভুত আকৃতির পরিচয় দিয়াছিল এবং যাহাদের ভয়ে গ্রামবাসিগণ কিছুদিন সাতিশয় ভীত হইয়াছিল, সে জোড়া শাঁকচুন্নি পাগলী ও চপলা ব্যতীত আর কেহ নহে।'

সুবালা বলিলেন,—'আমার মনে সন্দেহ হইয়াছিল যে, খাঁদা ভূতের সম্মুখ দিকে যে 'মা গো' শব্দ হইয়াছিল, সে শব্দ পাগলী করিয়াছিল! কারণ তাহার অল্পক্ষণ পরেই পাগলী ভয় পাইয়া বাড়ী গিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল।'

বিনয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'পাগলী একটা, অন্য শাঁকচুন্নিটা কে?'

বড়ালমহাশয় উত্তর করিলেন,—'অন্য শাঁকচুন্নি আমার বোধ হয় চপলা।'

সুবালা বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—'চপলা! কি আশ্চর্য্য!'

বড়ালমহাশয় উত্তর করিলেন,—'নিশ্চয় বলিতে পারি না, কিন্তু আমার বোধ হয় যে, সে চপলা। আমার অনুমান ঠিক কি না, এখনই জানিতে পারা যাইবে। তাহার মা বলিয়াছিল যে,—'পাগলী কেবল দিনের বেলা বাগানে আসিয়া দাঁড়াইত। দূর হইতে ভগিনীকে দেখিয়া সে চলিয়া যাইত।' কিন্তু আমার বোধ হয়, সে রাত্রিকালেও চপলার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত। তখন চপলা গৃহ হইতে বাহির হইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিত। দুই ভগিনীতে কিছুক্ষণ কথোপকথন করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিত। ঐ ঘরের জানালার গরাদ যে সহজে খুলিতে পারা যায়, চপলা কোনরূপে সে সন্ধান পাইয়াছিল। পাগলী বাগানে আসিয়া দাঁড়াইলে চপলা দোতালা হইতে তাহাকে দেখিতে পাইত। তাহার পর নীচে নামিয়া কাঠ ও ঘুঁটের জানালার গরাদ খুলিয়া বাটী হইতে সে বাহির হইত।

বাহির হইয়া পুনরায় গরাদ দুইটি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া দিত। দুই ভগিনী কিছুক্ষণ বাগানে কথোপকথন করিত; লোকে মনে করিত যে, তাহারা শাঁকচুন্নি! ভয়ে কেহ তাহাদিগের নিকটে যাইত না। সেজন্য কেহ তাহাদিগকে চিনিতে পারে নাই।'

বিনয় বলিলেন,—'আপনার অনুমান সত্য বলিয়া আমার বোধ হইতেছে।'

বড়ালমহাশয় বলিলেন,—'কূপের মুখ খুলিয়া তাহার ভিতর কাঁটা ফেলিয়া আমি অনুসন্ধান করিতেছিলাম। বাটীর ভিতর প্রবেশ করিবার মানসে খাঁদা ভূত সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে দেখিল, একটা মানুষ বসিয়া কিম্ভূত কদাকার ভাবে হাত পা নাড়িতেছে! এটা মানুষ কি ভূত, এইরূপ সন্দেহ করিয়া খাঁদা ভূত সেই স্থানে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। আমার দৃষ্টি তাহার উপর পড়িল। কূপের মুখ খোলা রাখিয়া ভয়ে আমি পলায়ন করিলাম। খাঁদা ভূত আর অগ্রসর হইল না। আমাকে দেখিয়া তাহারও ভয় হইল। সে রাত্রি সে আর বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল না। বাগানের পূর্বদিকে সে ফিবিয়া গেল। ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত সেই সময় পাগলী আসিয়াছিল। উপর হইতে চপলা তাহার সাদা কাপড় দেখিতে পাইয়াছিল। তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে চপলা দোতালা হইতে একতলায় নামিল, ঘুঁটের ঘরে প্রবেশ করিল, জানালার গরাদ দুইটি খুলিল, গরাদ দুইটি পুনরায় যথাস্থানে পরাইয়া দিল, অবশেষে ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত দ্রুতবেগে দৌড়িল। এদিকে পাগলী খাঁদা ভূতকে সহসা সম্মুখে দেখিয়া, 'মা গো' বলিয়া পলায়ন করিল! ওদিকে চপলাও খোলা কূপের ভিতর পতিত হইল ও সেও সেই সময় 'মা গো' বলিয়া চীৎকার করিল। অতি প্রত্যূষে আসিয়া চুপি চুপি আমি কূপের মুখ বন্ধ কারয়া দিলাম। তাহার ভিতরে পড়িয়া, জলে ডুবিয়া, চপলা যে মরিয়া গিয়াছে, সে কথা আমি কিরূপে জানিব? জানালার গরাদ যে খোলা যায়, তাহা দিয়া লোক যে যাতায়াত করিতে পারে, চপলা যে সে পথ দিয়া বাহির হয়, এ সমুদয় কথার বিন্দুবিসর্গ তখন আমি জানিতাম না। পাগলী যদি সকল বিষয় প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিত, তাহা হইলে বোধ হয় কতকটা সন্দেহ হইত। যাহা হউক, এক্ষণে আমার অনুমান ঠিক কি না, তাহা দেখিতে হইবে।'

দুইজন মালী ব্যতীত যে তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিল কিন্তু বড়ালমহাশয় তাহাকে কূপের ভিতর নামিতে বলিলেন। কিন্তু বিনয় তাহাকে নামিতে দিলেন না। বিনয় বলিলেন যে,—'এই পুরাতন কূপের বায়ু প্রথমে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। ইহার ভিতর দূষিত বায়ু থাকিলে, যে নামিবে সে মরিয়া যাইবে।' কূপের ভিতর বিনয় একটি জ্বলন্ত বাতি নামাইয়া দিলেন। বাতি নিবিয়া গেল না, জ্বলিতে লাগিল। তখন বিনয় সে লোকটিকে কূপের ভিতর নামিতে দিলেন। সে লোক উত্তমরূপ জলে ডুব দিতে পারিত, সেজন্য বড়ালমহাশয় তাহাকে আনিয়াছিলেন। কূপে সে অবতরণ করিল। জলে ডুব দিয়া পুনরায় জলের উপর মাথা তুলিয়া সে বলিল,—'কূপের ভিতর কি আছে। একটা লম্বা দড়ি নামাইয়া দাও, তাহার অপর দিক তোমরা ধরিয়া থাক।'

মালী উপর হইতে একগাছি দড়ি নিচে নামাইয়া দিল, অপর দিক সে ধরিয়া রহিল। দড়ি ধরিয়া সে লোক পুনরায় ডুব দিল। কুপের ভিতর যাহা তাহার হাতে ঠেকিয়াছিল, তাহাতে সে দড়ি বাঁধিয়া দিল। পুনরায় জল হইতে মাথা তুলিয়া উপরের লোককে সেই দড়ি টানিতে বলিল। নয় দশ বৎসরের বালিকার কঙ্কাল সমস্ত না হউক, অনেকটা উপরে আসিয়া উঠিল। হাতের অস্থিতে এখনও গাছ কয়েক কাচের চুড়ি ছিল। চপলার হাতে সেই চুড়ি ছিল। সুবালা তাহা চিনিতে পারিলেন। সে সমুদয় যে চপলার অস্থি, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ রহিল না। কঙ্কাল হইতে যে হাড়গুলি বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল, ক্রমে সেগুলি উপরে উঠিল। যে লৌহ-কণ্টকের গুচ্ছ বড়ালমহাশয়ের হাত হইতে পড়িয়া গিয়াছিল, তাহাও উপরে উঠিল। কুপের ভিতর আর কিছু ছিল না। সমুদয় অনুসন্ধান করিয়া কুপের ভিতর যে নামিয়াছিল, সে উপরে আসিয়া উঠিল।

গ্রামে হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। এই আশ্চর্য ব্যাপার দেখিবার নিমিত্ত গ্রামের লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল। চপলার মাতা দৌড়িয়া আসিল। ছাদের উপর পাগলী পায়রাদিগকে খাবার দিতেছিল। মায়ের ক্রন্দন শুনিয়া সেও দৌড়িয়া আসিল। হাতের অস্থিতে কাচের চুড়ি যে চপলার গোয়ালিনীও তাহা চিনিতে পারিল। বলা বাহুল্য যে, চপলার মাতা কুপের ধারে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। বড়ালমহাশয়েব আজ্ঞায় কুপটি এবার ম'টী ফেলিয়া ভরাট করা হইল।

চপলা যে দৈবের ঘটনায় কুপে পড়িয়া প্রাণ হারাইয়াছে, এ কথা বিশ্বাস করিতে গ্রামের লোকের প্রবৃত্তি হইল না। খাঁদা ভূত যে তাহাকে খাইয়াছে, এ বিশ্বাস তাহাদের মন হইতে দূর হইল না। গ্রামের একজন প্রধান বিজ্ঞলোক গম্ভীর স্বরে বলিল,—'ভূত হাওয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। মৃত্তিকা, ইট, তক্তা প্রভৃতি ভেদ কবিয়া অনায়াসে তাহারা কুপের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে। উপর বন্ধ থাকিলে কি হয়, চপলাকে ধরিযা খাঁদা ভূত অনায়াসে কুপের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল। সেই স্থানে বসিয়া সে চপলার সমস্ত মাংস ভক্ষণ করিয়াছিল। কেবল মোটা মোটা হাড় ক'খানা চিবাইতে পারে নাই বলিয়া কুপের ভিতর ফেলিয়া গিয়াছিল। কাঁটা বাছিয়া তোমরা কইমাছ কি কখন খাও নাই? হাড় বাছিয়া খাঁদা ভূত সেইরূপে চপলাকে খাইয়াছিল। তোমরা যেমন কড়াইভাজা খাও, ছোট ছোট হাড়গুলি সেইরূপ সে কুড়্ কুড়্ করিয়া খাইয়াছিল।'

এ সঙ্গত কথা বটে। বড়ালমহাশয়ের অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত। সেজন্য খাঁদা ভূত যে চপলাকে খাইয়াছে—সকলের মনে সেই বিশ্বাস বদ্ধমূল রহিল। জীয়ন্ত মানুষ খাঁদা ভূত বাড়ীর ভিতর চোরকুঠুরীতে যে বসিয়া আছে, গ্রামের লোক তাহার কিছুই জানে না।

সুবালা বড়ালমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'খাঁদা ভূত ও শাঁকচুন্নির সমস্যা মীমাংসা হইল। কিন্তু শুনিয়াছি যে, দিদিমণির পীড়ার সময় দিন-কত গ্রামে ঘোরতর তুক্‌তাকের উৎপাত হইয়াছিল। তুকের ভয়ে গ্রামের লোক গ্রাম ছাড়িয়া পলাইবার উপক্রম করিয়াছিল। সে কে করিয়াছিল? সকলে বলে যে, আপনার আজ্ঞায় সেসব কাজ

হইয়াছিল।'

বড়ালমহাশয় উত্তর করিলেন,—'তুক্‌তাক্ গুণগান আমরা জানি না। গ্রামের লোক ভয় দেখাইবার জন্য ধনুকধারী তামাসা করিয়া নেকড়ার পুঁটলি প্রভৃতি পথে ফেলিত। তাহা আগে আমি জানিতাম না। পরে জানিতে পারিয়া ধনুকধারীকে অনেক ভর্ৎসনা করিয়াছিলাম। গৌররিণীর তিওরিণীর যখন উপার্জন কমিয়া আসিল, তখন সেও অন্য গ্রামে এই কাজ করিয়া আসিত।'

ত্রয়োদশ অধ্যায় — বিজয়বাবু

অপরাহ্নে সুবালাকে বিনয় বলিলেন,—'বাড়ী হইতে আমি মাতুলালয়ে আসিয়াছিলাম। সে স্থানে তোমার পত্র পাইলাম। আমার মাতাপিতা জানেন না যে, আমি এখানে আসিয়াছি। তাঁহাদের দুর্ভাবনা হইতে পারে। সেজন্য বাড়ী যাইব মনে করিয়াছিলাম কিন্তু এরূপ গোলযোগের ভিতর তোমাকে রাখিয়া কি করিয়া আমি যাই?'

সুবালা বলিলেন,—'যে পর্যন্ত বিজয়বাবু আসিয়া আপনার সম্পত্তি বুঝিয়া না লন, সে পর্যন্ত যদি থাকিতে পার, তাহা হইলে ভাল হয়। তুমি এখন যে জামা পরিয়া আছ, ইহার কাপড় অতি চমৎকার। ইহার কি মূল্য অধিক?'

বিনয় উত্তর করিলেন,—'ইহার মূল্য কি, তাহা আমি জানি না। কোনরূপ কাপড় দেখিলেই বাবা আমার জন্য ক্রয় করেন। সর্বদা আমি ভাল কাপড় চোপড় পরিয়া থাকিলে আমার মাতা-পিতার আহ্লাদ হয়। সেজন্য বাড়ীতেও আমি মূল্যবান পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকি। বিজয়বাবু আসিলে খাঁদা ভূত সম্বন্ধে তুমি কি করিবে?'

সুবালা বলিলেন,—'সে সোনার ইট এক্ষণে বিজয়বাবুর। খাঁদা ভূতের সহিত বড়ালমহাশয় যেরূপ নিয়ম করিয়াছেন, তাহা আমি তাঁহাকে বলিব। তিনি কি সে নিয়ম প্রতিপালন করিবেন না?'

বিনয় উত্তর করিলেন,—'নিশ্চয় করিবেন। বিজয়বাবু আসিলে আমি লুক্কায়িত থাকিব। তাঁহার সম্মুখে বাহির হইব না। তোমাদের সম্পত্তি সম্বন্ধে কথাবার্তা হইবে। আমি কে যে সে স্থানে উপস্থিত থাকিব। কোথায় তুমি তাঁহাকে স্থান দিবে? ভিতর গাড়ীতে, না বাহির-বাড়ীতে?'

সুবালা উত্তর করিলেন,—'এ বাড়ী তাঁহার। যে স্থানে ইচ্ছা, সেই স্থানে তিনি থাকিতে পারেন। তিনি আমার দাদামহাশয়ের ভ্রাতা। ভিতর বাড়ীতে দাদামহাশয়ের ঘর তাহার জন্য আমি সজ্জিত করিতেছি।'

বিনয় বলিলেন,—'বেশ কথা? আমি বাহির-বাড়ীতে লুকায়িত থাকিব। সেস্থানে দুটি ভাত আমার জন্য পাঠাইয়া দিবে, তাহার পর তোমাদের একটা ঠিক হইয়া গেলে আমি এ স্থান হইতে প্রস্থান করিব।'

কুপের ধারে ভগিনীর হাড় দেখিয়া পাগলীর পীড়া বৃদ্ধি হইয়াছিল। মাঝে মাঝে সে

মূর্চ্ছিত হইতেছিল। দুইদিন সে পশু-পক্ষীদিগকে আহার দিতে আসে নাই। বাগানে আতা পাকিয়াছিল। তৃতীয় দিনে তাহাকে গুটিকত আতা দিবার নিমিত্ত সুবালা প্রাতঃকালে গ্রামের ভিতর গমন করিয়াছিলেন।

আতা দিয়া ফিরিয়া আসিতেছেন, এমন সময় একবার পশ্চাৎ দিকে তিনি চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন যে, একজন বিদেশী ভদ্রলোক কিছু দূরে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছেন। পাল্‌কি হইতে নামিয়া তিনি পদব্রজে আসিতেছিলেন। তাঁহার পশ্চাতে আরও কতকটা দূরে বেহারাগণ ধীরে ধীরে খালি পাল্‌কি আনিতেছিল।

'ইনি কি বিজয়বাবু?'—এই চিন্তা সুবালার মনে এবার উদয় হইল।

আর একবার সুবালা ফিরিয়া দেখিলেন। না, ইনি বিজয়বাবু নহেন। বিভীষণ, কুম্ভকর্ণ, ভগদত্তের হাতী প্রভৃতির লক্ষণ বিন্দুমাত্র তাঁহাতে ছিল না। দিদিমণি বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার দেবরের অতি ভয়ানক আকৃতি। ইহার আকৃতি সেরূপ নহে। ক্ষণমাত্র দেখিয়া সুবালা স্থির করিলেন যে, ইনি বিজয়বাবু নহেন।

পথের পার্শ্বে একটি টগরফুলের গাছ ছিল। শুভ্রবর্ণে ফুল তাহার শাখা-প্রশাখা পরিপূর্ণ হইয়াছিল। বিদেশী লোক আগে চলিয়া যাউক,—এইরূপ ভাবিয়া সুবালা সেই গাছের নিকট গিয়া মনোনিবেশ করিয়া ফুলগুলি দেখিতে লাগিলেন।

বিদেশী লোক নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হাঁ গো মা লক্ষ্মী! রায়মহাশয়ের বাড়ী কি এই দিক্ দিয়া যাইতে হয়? অনেক দিন পূর্বে একবার আমি এই গ্রামে আসিয়াছিলাম। পথ ভুলিয়া গিয়াছি।'

সুবালা উত্তর করিলেন,—'হাঁ। একটু আগে গেলেই তাঁহার বাড়ী দেখিতে পাইবেন।'

তিনি বলিলেন,—'তুমিও না এই দিকে যাইতেছিলে?'

সুবালা উত্তর করিলেন,—'হাঁ। আমিও রায় মহাশয়ের বাড়ীতে যাইতেছিলাম।'

বিদেশী বলিলেন,—'তবে চল, আমাকে দেখিযা দাঁড়াইলে কেন?'

সুবালা বলিলেন,—'আপনি চলুন। আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমি যাইতেছি।'

আগে বিদেশী, পশ্চাতে সুবালা, রায়মহাশয়ের বাটী অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সুবালা ভাবিলেন যে,—'বিজয়বাবু নিজে না আসিয়া, বিষয় বুঝিয়া লইবার নিমিত্ত হয় তো এই লোকটিকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।'

দুই চারি পা গিয়া বিদেশী একটু হাসিয়া বলিলেন,—'তবে তুমিই সেই পাগলী?'

সুবালা উত্তর করিলেন,—'না, আমি পাগলী নই। পাগলীর অসুখ হইয়াছে। তিনদিন সে আমাদের বাটীতে আসে নাই। তাহার মায়ের কাছে সে আছে, তাহাকেই আতা দিতে আমি গিয়াছিলাম।' — বিদেশী হাসিয়া বলিলেন,—'আর কে পাগলী আছে, তাহা আমি জানি না। যে পাগলী আমাকে চিঠি লিখিয়াছিল, তাহার কথা আমি বলিতেছি।'

এই কথা বলিবার নিমিত্ত সুবালার দিকে তিনি ফিরিয়াছিলেন। ঘোরতর বিস্মিতা হইয়া সুবালা তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। 'তবে ইনিই বিজয়বাবু! কি আশ্চর্য! দিদিমণি

ইঁহার আকৃতি-প্রকৃতির যেরূপ বিবরণ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার সহিত কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই। কিম্ভূত কদাকার দূরে থাকুক, ইনি সুপুরুষ! বয়ঃক্রম চল্লিশ অথবা কিছু অধিক হইবে। কথাগুলি অতি সুমিষ্ট, আর হাসিটি কি মধুর! ইঁহার কথা উত্থাপনে পাপ আছে,—এমন কথা দিদিমণি কি করিয়া বলিয়াছিলেন! নিশ্চয় ইনি দেবতার তুল্য লোক। কেমন স্নেহের সহিত ইনি আমাকে পাগলী বলিলেন!'

মনে মনে সুবালা এইরূপ চিন্তা করিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে তিনি বলিলেন,—'হাঁ, আমিই সুবালা, আমিই আপনাকে পত্র লিখিয়াছিলাম।' – বিজয়বাবু বলিলেন,—'কি করিয়া তুমি আমাকে লিখিলে যে, বিষয় আমার নহে, আপনার?'

সুবালা উত্তর করিলেন,—এখন বাড়ী চলুন। সে কথা পরে বলিব।'

অন্যান্য কথাবার্তায় দুইজনে বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলেন। 'রায়মহাশয়ের ভাই আসিয়াছেন! রায়মহাশয়ের ভাই আসিয়াছেন!' বলিয়া একটা হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। বড়ালমহাশয় তখন বাড়ী ছিলেন না। অন্যান্য লোকে তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করিল। সুবালা তাঁহাকে উত্তরদিকে সেই রায়মহাশয়ের ঘরে লইয়া গেলেন। কুটুম্বকে ভালরূপে ভোজন করাইবার নিমিত্ত পিসীমা নিজে রন্ধন করিতে বসিলেন। বিজয়বাবু কেন আসিয়াছেন, তাহা কেহ বুঝিতে পারিল না।

আহারাদির পর সুবালা বলিলেন,—'আপনি এখন তবে একটু বিশ্রাম করুন। বড়ালমহাশয় আমাদের কর্মচারী—'

বিজয়বাবু বলিলেন,—'বড়ালমহাশয়কে আমি জানি। বহুকাল পূর্বে একবার তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তখন তিনি এই বাড়ীর মেজে খুঁড়িতেছিলেন।'

সুবালা হাসিয়া বলিলেন,—'হাঁ, সে সম্বন্ধে একটা কথা আছে, তাহাও আপনাকে পরে বলিব। আপাততঃ বড়ালমহাশয়কে কাগজপত্র প্রস্তুত করিতে বলি। বৈকালবেলা আমার কাকামহাশয়ের বাড়ীতে আমি গমন করিব।'

বিজয়বাবু বলিলেন,—'দিনেরবেলা আমি শয়ন করি না। ব্যাপার কি বল দেখি?'

সুবালা উত্তর করিলেন,—'বৃত্তান্ত কি, তাহা বলিবার পূর্বে আপনার নিকট আমার একটি নিবেদন আছে। আমার দুইটি অভিভাবক,—বাল্যকাল হইতে পিতৃমাতৃহীন এই বালিকাকে যাঁহারা প্রতিপালন করিয়াছে,—আমার স্নেহে তাঁহারা মুগ্ধ হইয়া, আমার মঙ্গল কামনায় তাঁহারা একটি কাজ করিয়াছেন। কাজ যে নিতান্ত অন্যায়, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই। যাঁহারা এ কাজে লিপ্ত ছিলেন, তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিতে হইবে। আপনার পায়ে ধরিয়া আমি এই ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছি।'

এই বলিয়া সুবালা মাটীতে বসিয়া বিজয়বাবুর দুইটি পা ধরিলেন। অতি স্নেহের সহিত বিজয়বাবু তাঁহার হাত ধরিয়া তুলিলেন। তিনি বলিলেন,—'না, মা! তুমি আমার পায়ে পড়িও না। দাদার সম্পর্কে তোমাকে আমার দিদি বলা উচিত। কিন্তু কি জানি কেন, প্রথম হইতেই তোমাকে আমার মা বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। যেই তোমাকে প্রথম দেখিলাম, আর

সেই শব্দ আমার মুখ দিয়া আপনা-আপনি বাহির হইয়া পড়িল! এত সম্পত্তির মোহ যে পরিত্যাগ করিতে পারে, সে দেবতা। তুমি মা লক্ষ্মীস্বরূপা! পৃথিবীতে এমন কি বস্তু আছে, যাহা তোমাকে আমি দিতে না পারি? তোমার যাঁহারা মঙ্গল কামনা করিয়াছেন, তুমি না বলিলেও তাঁহাদিগকে আমি ক্ষমা করিতাম। এক্ষণে সত্য সত্য করিয়া বলিতেছি যে, আমি তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিলাম। কেমন? এখন সন্তুষ্ট হইলে তো?'

সুবালা একটু হাসিযা বলিলেন,—'তবে যাই, বড়ালমহাশয়কে ডাকিয়া আনি। এ সম্পত্তির আমি কিছুই জানি না। তিনি জানেন, আর কাকামহাশয় সমস্ত বিষয় আপনাকে বুঝাইয়া দিবেন। যাই. তাঁহাকে ডাকিয়া আনি।'

বিজয়বাবু বলিলেন,—'এত ব্যস্ত হইও না। এই খাটের উপর আমার পার্শ্বে উপবেশন কর; এস দুইজনে গল্প করি। আমার জ্যেষ্ঠ—তোমার দাদামহাশয়ের শেষকালে কি বড় কষ্ট হইয়াছিল?' – সুবালা উত্তর করিলেন,—তিনি পক্ষাঘাত রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন। উঠিতে বসিতে পারিতেন না। সেজন্য অতিশয় ক্লেশ হইয়াছিল।'

বিজয়বাবু বলিলেন,—'তুমি বোধ হয় জান যে, বড় ভাইয়ের ও তাঁহার পত্নীর সহিত আমার সদ্ভাব ছিল না। কেন, তাহা তোমাব শুনিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু আমার মনে কোন বিদ্বেষভাব ছিল না। যদি বল যে, তবে তুমি এখানে আসিতে না কেন? পীড়িত হইলে তাঁহাদিগকে একবার দেখ নাই কেন? তাহাব উত্তর এই যে, আমি তাঁহাদের কোন উপকার করিতে পারিতাম না। তাহার উপর আমাকে তাঁহারা বিষ নয়নে দেখিতেন। আমি আসিলে তাঁহারা সন্তুষ্ট হইতেন না, বরং অসন্তুষ্ট হইতেন। কিন্তু আমি তাঁহাদের সংবাদ লইতাম। সেই সূত্রে তোমার কথাও আমি কিছু কিছু শুনিয়াছিলাম। বড়বৌ তোমার দিদিমণি বৃদ্ধা হইয়াছিলেন?'

সুবালা উত্তর করিলেন,—'তাঁহার চুল পাকিয়াছিল। তবে খুব যে তিনি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় না। তাঁহার একখানি ছবি আছে,—দেখিবেন?

বিজয়বাবু বলিলেন,—'কোথায আছে? চল যাই দেখি!'

পূর্বদিকের ঘবে যে স্থানে ছবি আছে, সেই দিকে দুইজন বারাণ্ডা দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। বিজয়বাবুর আগমন সংবাদ বিনয় পাইয়াছিলেন। সম্পত্তি সম্বন্ধে তিনি কি করেন, তাহা জানিবার নিমিত্ত বিনয় অতিশয় উৎসুক হইয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন,—'পূর্বদিকের সিঁড়ি দিয়া গোপনে উপরে বসিয়া থাকি। কোন লোকের দ্বারা সুবালার নিকট সংবাদ পাঠাইব। সুবালা আসিলে তাঁহার প্রমুখাৎ সকল কথা অবগত হইব। খাঁদা ভূত এখন কি করিতেছে, তাহাও গিয়া দেখিব।' এইরূপ স্থির করিযা বড়ালমহাশয়ের নিকট হইতে অন্ধকার ঘরের চাবি লইয়া তিনি চুপি চুপি পূর্বদিকের সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিলেন ও যে গৃহে রায়গৃহিণীর মৃত্যু হইয়াছিল, সেই ঘরের খাটে গিয়া বসিলেন। সেদিকে চাকর-চাকরাণী কেহ আসিলে তাহা দ্বারা সুবালাকে সংবাদ দিবেন, সেই প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। কিন্তু অল্পক্ষণ পূর্বেই বিজয়বাবু ও সুবালার কণ্ঠস্বর তিনি শুনিতে পাইলেন। বারাণ্ডা দিয়া

তাঁহারা সেই ঘরের দিকে আসিতেছিলেন। মাঝের দ্বারের তালা খুলিয়া তাড়াতাড়ি বিনয় অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করিলেন। মাদুরের উপর খাঁদা ভূত শুইয়াছিল। বিনয় বলিলেন,—'সুবালা ও আর একজন ভদ্রলোক পাশের ঘরে আসিতেছেন। নিঃশব্দে বসিয়া থাক, কথা কহিও না।' বিনয় ও খাঁদা ভূত চুপ করিয়া সেই ঘরে বসিয়া রহিলেন।

বিজয়বাবু ও সুবালা পার্শ্বের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহার দক্ষিণ গায়ে চোরকুঠুরী বা অন্ধকার ঘর,—যে স্থানে খাঁদা ভূতের সহিত বিনয় বসিয়া আছেন। ইহার উত্তর গায়ে আর একটি শয়নাগার,—যে স্থানে পূর্বে রাজাবাবু শয়ন করিতেন ও যে স্থানে পরে সুবালার মাতা বাস করিতেন।

বিজয়বাবুকে সুবালা দিদিমণির ছবি দেখাইলেন। ছবি দেখিয়া বিজয়বাবু বলিলেন—'আমি যখন দেখিয়াছিলাম, তখন তাঁহার শরীর ইহা অপেক্ষা স্থূল ছিল।'

সুবালা বলিলেন,—দিদিমণি ক্ষয়কাস রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন। সেজন্য কৃশ হইয়া গিয়াছিলেন।'

দুইজনে সেই ঘরে খাটের উপর উপবেশন করিলেন। রায়মহাশয় ও রায়গৃহিণীর সম্বন্ধে নানা কথা হইতে লাগিল।

বিজয়বাবু বলিলেন,—'আমি শুনিলাম যে, তোমার এখনও বিবাহ হয় নাই। সুবালা! সেই অবধি আমার মনে বড় আক্ষেপ হইতেছে। আমার এক পুত্র আছে,—একমাত্র পুত্র। অনেক দিন হইতে আমার গৃহিণী তাহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমি কথা দিয়াছি। সে কথার কিছুতেই আর অন্যথা হইতে পারে না। আহা সুবালা! দুই বৎসর আগে যদি তোমায় দেখিতাম। কন্যা বলিয়া তোমাকে কোলে লইতে আমার বড়ই সাধ হইতেছে। প্রাণ ভরিয়া তোমাকে মা-জননী বলিয়া ডাকিয়া ঘরে লইতে বড়ই আমার বাসনা হইতেছে; কিন্তু মা কি করিব? কোন উপায় নাই!'

সুবালা মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন। কোন উত্তর করিলেন না। কিছুক্ষণ পরে তিনি বলিলেন,—'বড়ালমহাশয়কে বলিয়া আসি না কেন? কাগজপত্র প্রস্তুত করিতে বিলম্ব হইবে।'—বিজয়বাবু বলিলেন,—'পাগলি! আমি এ বিষয় লইব না।এতোমারই থাকিবে।'

সুবালা বলিলেন,—'উইল প্রকৃত নহে।' —বিজয়বাবু উত্তর করিলেন,—'উইল প্রকৃত কি কৃত্রিম, তাহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি না; তাহা আমি জানিতে ইচ্ছাও করি না; আমি এই জানি যে, আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা এবং আমার ভ্রাতৃজায়া তোমাকে এই সম্পত্তি দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।'

সুবালা বলিলেন,—'আইন অনুসারে সম্পত্তি যদি আমার না হয়, তাহা হইলে পরের সম্পত্তি আমি লইব কেন?' এমন সময়— 'হায়! হায়!! হায়! হায়!!'

বিজয়বাবু ও সুবালার কর্ণকুহরে সহসা এই কয়টি কথা প্রবেশ করিল।

—পুনরায়—'হা আমি হতভাগিনী! হায়! হায়! হায়! হায়!'

বামা-কণ্ঠস্বর। বারেণ্ডা হইতে আসিতেছিল। নিদারুণ খেদোক্তি। হৃৎপিণ্ড ভেদ করিলে

যেরূপ প্রবলবেগে রক্তধারা নির্গত হয়, সেইরূপ বক্তার ব্যথিত বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া যেন এই বিলাপ বাক্যগুলি বাহির হইতেছিল। —বিজয়বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—ও কে?'

সুবালা উত্তর করিলেন,—'জানি না। অপরিচিত লোক। চলুন, গিয়া দেখি।'ঘর হইতে বাহির হইবার সময় সুবালা দেখিলেন যে, অন্ধকার ঘরের দ্বার খোলা রহিয়াছে! দ্বারে তিনি শিকল দিয়া দিলেন। সুতরাং বিনয় সে ঘর হইতে আর বাহির হইতে পারিলেন না।

তৃতীয় ভাগ

প্রথম অধ্যায় – সোনা-বৌ

সুবালা ও বিজয়বাবু বাহির হইয়া দেখিলেন যে, অপর ঘরের নিকট বারাণ্ডায় একজন অতি দীনহীনা মলিনবসনা ভদ্রমহিলা দাঁড়াইয়া ঐরূপ প্রলাপ বকিতেছেন। তাঁহার মুখ মলিন, তাঁহার সর্বশরীর মলিন,—ধূলায় ধূসরিত হইয়া আছে। তাঁহার বয়স হইয়াছে, তাঁহার চুল পাকিয়া গিয়াছে, তাঁহার চক্ষু বসিয়া গিয়াছে, তাঁহার চর্ম কুঞ্চিত হইয়া গিয়াছে। তথাপি তাঁহার শ্বেতলোহিত মিশ্রিত গৌরবর্ণ, মুখশ্রী ও শরীরের গঠন দেখিয়া বোধ হইতেছিল যে, সময়ে তিনি একজন অসামান্যা রূপবতী রমণী ছিলেন। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তিনি সেই ঘরের দিকে চাহিয়া আছেন। ঘরের ভিতর কে যেন আছে, তাহার সহিতই যেন তিনি কথা কহিতেছেন। কিন্তু সে দৃষ্টি অন্তরাত্মনিঃসৃত-প্রভা বিশিষ্ট ছিল না। রমণীকে দেখিয়াই সকলে বুঝিতে পারিলেন যে. তিনি ক্ষিপ্তা।

বিজয়বাবু ও সুবালা তাঁহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাদের প্রতি একবার তিনি চাহিয়া দেখিলেন। অপর দিক হইতে বাড়ীর চাকর-চাকরাণী, পিসীমা, বড়ালমহাশয়, বড়ালগৃহিণী প্রভৃতি অনেকে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সেদিকেও দুই একবার তিনি দৃষ্টি করিলেন। কিন্তু তাঁহার মন কোন মানুষকে, কোন দ্রব্যকে গ্রাহ্য করিল না। বিকৃত মস্তকের বৃথা-কল্পনা-গঠিত যে মানুষকে ঘরের ভিতর দেখিতেছিলেন, তাহার সহিতই তিনি কথোপকথন করিতেছেন। সুবালা জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তুমি কে গা?'

সুবালার দিকে তিনি চাহিয়াও দেখিলেন না, কিন্তু তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিলেন,— 'আমি কে? শুনিলে রাজাবাবু! আমাকে ইহারা জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—তুমি কে? আমি সব। আমি এ বাড়ীর সর্বেসর্বা। এ বাড়ী আমার, এ চাকর-বাকর আমার। এ জিনিসপত্র আমার! পাগল! তাই জিজ্ঞাসা কবিতেছে যে, তুমি কে? আমি আর কে, আমি সোনা-বৌ, আমি আদরের সৌনা-বৌ, আমি এই বাড়ীর অধীশ্বরী।'

সুবালা বিজয়বাবুকে চুপি চুপি বলিলেন,—'পূর্বে এই বাড়ীর যিনি কর্তা ছিলেন— বেণীবাবু, যাহাকে লোকে রাজাবাবু বলিত,—ইনি তাঁহার গৃহিণী।'

বিজয়বাবুও চুপি চুপি বলিলেন,—'আমি জানি। বেণীবাবুর মৃত্যুকালে আমি তাঁহার

নিকট ছিলাম! পরে এই সোনা-বৌয়ের কথাও কিছু কিছু শুনিয়াছি। ইনি দেখিতেছি—উন্মাদ হইয়াছেন।'

বড়ালমহাশয়ের আজ্ঞায় চাকর-চাকরাণীগণ সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল। সেস্থানে উপস্থিত রহিলেন কেবল বিজয়বাবু, সুবালা, পিসীমা, বড়ালমহাশয় ও তাঁহার গৃহিণী।

সোনা-বৌ পুনরায় আপনা-আপনি প্রলাপ বকিতে লাগিলেন,—'হায়! আমি একদিন রাজরাণী ছিলাম। কিন্তু আজ আমি কি? রাজাবাবু! রাজাবাবু! ওরূপ রুক্ষভাবে আমার উপর কটাক্ষপাত করিও না।'

দর-দর ধারায় সোনা-বৌয়ের দুই চক্ষু দিয়া বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল।

চক্ষু মুছিয়া,—'কি বলিলে? রাজাবাবু! তুমি কি বলিলে? আমাকে তুমি ঘরের ভিতর ডাকিতেছ? আমি দাসী আমাকে তুমি যা বলিবে তাই করিব। রাজাবাবু! যদি তোমার মুখ হইতে সে কালের মত একটি কথাও শুনিতে পাই, তাহা হইলে আমার জীবন সার্থক হয়। আমার বুকের ভিতর রাত্রি দিন যে দাবানল জ্বলিতেছে সে জ্বালা অনেকটা শীতল হয়।'

ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া,—'রাজাবাবু! এই ঘরে আমরা দুইজনে কত হাসি হাসিয়াছিলাম, কত আহ্লাদ-আমোদে কালাতিপাত করিয়াছিলাম। পা ঝুলাইয়া গায়ে গায়ে দুইজনে খাটের উপর বসিতাম। তুমি বলিতে যে,—'সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত লোকে গহণা ও বস্ত্রাদি পরিয়া বেশভূষা করে, কিন্তু তোমার গায়ের বর্ণের নিকট সুবর্ণ বিবর্ণ হইয়া যায়।' সেজন্য আদরে তুমি আমাকে সোনা-বৌ বলিয়া ডাকিতে। আমার চুলের কোশা হাতে করিয়া তুমি বলিতে যে,—লোকে আসিয়া দেখুক আমার সোনা-বৌয়ের কেশগুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত বহুমূল্য রেশম অপেক্ষা অনেকগুণে উজ্জ্বল ও কোমল কি না।' নিবিড় হরিৎবর্ণের বনমধ্য দিয়া প্রবাহিত সূক্ষ্ম রজতরেখা সদৃশ বর্ষকালের গিরিনির্ঝরের সহিত তুমি আমার সীঁথির তুলনা করিতে। তুমি বলিতে,—সূর্য্যালোকে আলোকিত চন্দ্রমণ্ডলে কৃষ্ণহীরক নির্মিত দুইটি তারা যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে কেবল তাহার সহিতই তোমার নয়নযুগলের তুলনা হইতে পারে। ঈষৎ রক্তিম আভায় রঞ্জিত তোমার গণ্ডদেশ দুইটি যদি কবিগণ কখনও দেখিতেন, তাহা হইলে প্রস্ফুটিতপ্রায় কমলদলের তাঁহারা প্রশংসা করিতেন না। কবি বলিয়াছেন যে তাঁহার সুন্দরীর বেণীর শোভা দর্শনে ভুজঙ্গী লজ্জিতা হইয়া বিবরে প্রবেশ করিয়াছিল। বিবর অতি সামান্য কথা। আমার সোনা-বৌয়ের ওষ্ঠদ্বয় দেখিয়া রক্তপলা সাগরগর্ভে গিয়া লুক্কায়িত হইয়াছে। মুক্তার লজ্জা আবার তাহা অপেক্ষা অধিক। অতল জলধিতলে গিয়াও তাহারা সুস্থির হয় নাই। তোমার দন্তপাঁতি দেখিয়া মনের ঘৃণায় তাহারা শুক্তিগর্ভে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।' মনে আছে কি, রাজাবাবু। এইরূপ কত প্রকার উপমা দিয়া তুমি আমার সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিতে?'

কপালে করাঘাত করিয়া, সোনা-বৌ পুনরায় বলিলেন,—'হায় হায়! আমি কি অভাগিনী যে, সে ভালবাসা হইতে আমি বঞ্চিত হইলাম। তোমার ভালবাসার কথা শুনিব বলিয়া কোন কোন দিন আমি মান করিয়া বসিয়া থাকিতাম। কত সুমিষ্ট সম্ভাষণে তুমি

আমার সেই মান ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিতে? যেসব কথা শুনিয়া মনে আমার আনন্দ হইত; কিন্তু আরও আদর পাইব বলিয়া আমি মুখ গম্ভীর করিয়া থাকিতাম। যখন দেখিতাম যে, তোমার ঘোরতর ক্লেশ হইতেছে, তখন ভাবিতাম, আর একবার সাধ্যসাধনা করিলেই মান ঘুচাইয়া তোমার সহিত কথা কহিব। কিন্তু যখন পুনরায় সুমিষ্ট স্বরে তুমি আমাকে সাধিতে তখন এই হতভাগিনী অভিমানিনী হইয়া ঘোমটা টানিয়া মুখ আবৃত করিয়া বসিয়া থাকিত। শেষে যখন আমি মান সংবরণ করিতাম, তখন রাজাবাবু! তুমি স্বর্গসুখ লাভ করিতে। প্রফুল্লবদনে প্রীতিপূর্ণ লোচনে তখন যেরূপ আমার প্রতি দৃষ্টি করিতে, আজ একবার—কেবল একবার, নিমেষ মাত্রের জন্য,—সেই মধুরভাবাপন্ন কটাক্ষপাত করিয়া এ দুঃখিনীর দুঃখ নিরীক্ষণ কর। যাহার একটু মাথা ধরিলে তুমি দিশাহারা হইতে, আজ তোমার সোহাগের সেই সোনা-বৌয়ের মস্তক অভ্যন্তর শত সহস্র বৃশ্চিক দ্বারা অহরহঃ দংশিত হইতেছে। ভালবাসা দূরে থাকুক, পীড়িতা তাপিতা দীন-দুঃখিনীর প্রতি তুমি যে দয়া করিতে, তোমার আদরের সোনা-বৌ আজ সে দয়ারও পাত্রী নহে।'

সোনা-বৌ মাটীতে বসিয়া পড়িলেন। দুই হাতে চক্ষু আবৃত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সান্তনা করিবার নিমিত্ত সুবালা তাঁহার নিকট গমন করিলেন। সুবালার হাত তিনি ছুঁড়িয়া ফেলিলেন। বলিলেন,—'তুই ছুঁড়ি কে লা? গেল যা! যাঃ!'

বিজয়বাবু সুবালাকে চুপি চুপি বলিলেন,—'এখন তুমি উহার নিকট যাইও না। শুন, আরও কি বলেন। মনের দুঃখ ব্যক্ত করিলে কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিবেন।'

সোনা-বৌ পুনরায় দাঁড়াইয়া ঘরের একদিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন,—'রাজাবাবু! একবার তুমি এ দুঃখিনীর প্রতি কৃপা-কটাক্ষ করিলে না? আমি পাপীয়সী, কৃপার পাত্রী আমি নই। হায় মা! এ হতভাগিনীকে কেন তুমি স্তনদুগ্ধে প্রতিপালন করিয়াছিলে? সূতিকাগারে মুখে লবণ দিয়া কেন তুমি তাহার প্রাণবধ কর নাই? মা! আমাকে ডাকিয়া লও মা! আমি আর এ যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি না। রাজাবাবু! মুখে হাত দিয়া এইমাত্র আমি কত কাঁদিলাম। আমি আশা করিয়াছিলাম যে, স্নেহের সহিত তুমি আমার হাত টানিয়া লইবে! মধুর বাক্যে তুমি আমাকে সান্তনা করিবে। হায় হায়! পুরাতন কথা যে ভুলিতে পারি না। আমি কি করি। কোথায় যাই!

'এই ঘরে আমরা পরম সুখে কালযাপন করিতেছিলাম। গ্রামের লোক আমার নিকট যোড়হাত করিয়া থাকিত। দাস-দাসীগণ আমার পরিচর্যা করিত। বহুমূল্য বসন-ভূষণে আমি ভূষিতা হইয়া থাকিতাম। আমার কিছুমাত্র অভাব ছিল না। আমি রাজরাণী ছিলাম। সকল সুখের উপরে আমি-সুহাগে সোহাগিনী হইয়াছিলাম। কিন্তু তাহাতেও আমি তৃপ্তিলাভ করিলাম না। আমি জপ-তপ আরম্ভ করিলাম। তুমি রাজাবাবু, আমাকে অনেক পুস্তক আনিয়া দিয়াছিলে। ধর্মপুস্তক আমরা দুইজনে পাঠ করিতাম। তাহাতে লেখা আছি যে, স্বামীই স্ত্রীলোকের জপ, স্বামীই তপ, স্বামীই তীর্থ, স্বামীই র্ম। সে উপদেশ আমার হৃদয় স্পর্শ করিল না।

'ধিক্! ধিক্ আমাকে। ধিক্ আমার জপে! ধিক্ আমার তপে! সেই সময় হইতে, রাজাবাবু, তোমাতে আমাতে ছাড়াছাড়ি আরম্ভ হইল। আহারাদি সম্বন্ধে তোমার আচার-ব্যবহার একরূপ ছিল, আমার অন্যরূপ ছিল। ফুল-বিল্বদল দিয়া আমি ঠাকুরের পূজা করিতাম; তুমি ভগবানের প্রিয় কার্য সাধন করিয়া তাঁহার উপাসনা করিতে। দুইজনে সেরূপ আর মনের মিল রহিল না।

'তাহার পর কালসর্পকে তুমি বাড়ীতে আনিলে। সে যে কালসর্প, তখন আমি তাহা বুঝিতে পারি নাই। তপস্বী জ্ঞানে তাহাকে আমি পূজা করিতে লাগিলাম। এ বস্তু খাইবে, সে বস্তু খাইবে না,—ইহাই ধর্ম। প্রথম প্রথম তিনি দুগ্ধপান করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। গ্রামের লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল। সকলে তাঁহার পূজা করিতে লাগিল। আমিও তাঁহার পূজা করিতে লাগিলাম। ধর্ম সম্বন্ধে তিনি আমাকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। তুমি, রাজাবাবু, নানা বস্তু আহার করিতে; তিনি দুগ্ধ খাইয়া থাকিতেন। তাহাতে আমি বুঝিলাম যে, তুমি ঘোর অধার্মিক, তিনি দেবতা। তোমার প্রতি ঘৃণা ও তাঁহার প্রতি ভক্তি দিন দিন আমার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তিনি আমার গুরুদেব হইলেন।'

দ্বিতীয় অধ্যায় – ঘোর অনুতাপ

বিজয়বাবু চুপি চুপি বড়ালমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কালা-বাবা? খাঁদা ভূত? যাহার নাক আমার নিকট আছে?'

বড়ালমহাশয় উত্তর করিলেন,—'হাঁ। আমরা ভ্রমে পতিত হইয়াছিলাম। সে মরে নাই। এই বাড়ীতে এখন সে লুক্কায়িত আছে। বিধাতার লীলা বুঝিতে পারা যায় না। এতকাল পরে পুনরায় দুইজনকে তিনি একত্র করিয়াছেন।'

বিজয়বাবু বলিলেন,—'এই বাড়ীতে সে লুক্কায়িত আছে? আশ্চর্য! বিধাতা আমাকেও ঠিক এই সময়ে এ স্থানে আনিয়াছেন।'

সোনা-বৌ পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—'রাজাবাবু! গুরুদেবকে তুমি বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিলে। সে যে কালসর্প, তখন আমি বুঝিতে পারি নাই। সেইজন্য গুরুদেব বলিতেছি। নদীকুলে শিবমন্দিরে গিয়া তিনি বাস করিতে লাগিলেন। তখন হইতে, রাজাবাবু, তোমার প্রতি আমার ঘোরতর অভক্তি হইল। তোমার নিকট থাকিতে, তোমার নিকট বসিতে আমি একেবারেই ইচ্ছা করিতাম। না। প্রথম তুমি আমাকে অনেক বুঝাইলে, অনেক উপদেশ দিলে। তোমার উপদেশ আমি গ্রহণ করিলাম না। তোমার কথা আমার কানে যেন বিষ ঢালিয়া দিল।

'নীচের ঘরে যে জানালা আছে, তাহার দুইটি কাঠের গরাদ গুরুদেব শিথিল করিয়া দিলেন। সেই পথ দিয়া গভীর রাত্রিতে গোপনে তিনি এই বাটীর ভিতর প্রবেশ করিতেন। কখন বা আমিও তাঁহার নিকট গমন করিতাম। ক্রমে তিনি আমাকে শিক্ষা দিলেন যে,—'দেবীর পূজায় সুরা আবশ্যক। ইহাকে কারণ বলে।' দেবী-পদে অর্পিত সুধা প্রসাদস্বরূপ

আমিও পান করিতে শিক্ষা করিলাম। ক্রমে এতদূর অভ্যাস হইল যে, সুরাপান না করিয়া আমি থাকিতে পারিতাম না। সে সময় যদি কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিত যে, তুমি সুরা চাও, কি প্রাণ চাও? অকাতরে আমি বলিতে পারিতাম যে, আমি সুরা চাই, প্রাণ চাই না।

'রাজাবাবু! ধন্য সহ্য তোমার। তুমি সব জানিতে। আমি স্ত্রীলোক, সেজন্য তুমি আমার প্রতি তোমার ঘোরতর ঘৃণা হইয়াছিল। আমাকে উপদেশ প্রদানে তুমি ক্ষান্ত হইলে। বৃক্ষাবলম্বিনী বিষময়ী লতাকে ছিঁড়িয়া বন্যহস্তী যেরূপ পদদলিত করে, তোমার হৃদয় হইতে আমাকেও সেইরূপ ছিঁড়িয়া, মনে মনে তুমি পদদলিত করিতে লাগিলে। আমি তখন গর্ভবতী। সেইজন্য তুমি বোধ হয় আমাকে বাড়ী হইতে দূর কবিলে না। পাছে তুমি সুরার গন্ধ পাও, সেইজন্য পূর্ব হইতেই আমি ঐ পার্শ্বের ঘরে শয়ন করিতেছিলাম। তুমি কিছুমাত্র আপত্তি করিলে না।

আমাদের খুকী হইল। ঐ পার্শ্বের ঘরে খুকীকে লইয়া আমি শয়ন করিতাম। খুকী দাই—মন্দাকিনী, নিম্নে মেজেতে শয়ন করিত। খুকী শিশু। পাপ-পুণ্যের বিষয় সে কি জানে! রাজাবাবু, তুমি দয়াময়। সকল জীবের প্রতি তোমার দয়া ও ভালবাসা। নিরীহ খুকীর প্রতি তুমি মন ও প্রাণ সমর্পণ করিলে।

'কিন্তু আমি? আমি পাপিষ্ঠ—খুকীকে গলগ্রহ বলিয়া বিবেচনা করিলাম। মাঝে মাঝে মন্দাকিনীকে আমি ছুটী দিতাম। সে আপনার ঘরে চলিয়া যাইত। খুকীকে একেলা ফেলিয়া গভীর রাত্রিতে আমি শিবমন্দিরে চলিয়া যাইতাম।

'ও ঘরে যাইতে আজ্ঞা করিতেছ? যেস্থানে খুকী একেলা পড়িয়া থাকিত, সেই স্থান পুনরায় আমাকে দেখিতে বলিতেছ? আচ্ছা রাজাবাবু, চল তবে ও ঘরে যাই।'

দুই ঘরের মাঝে দ্বার ছিল। সে দ্বার দিয়া সোনা-বৌ অপর ঘরে প্রবেশ করিলেন। যে ঘরে রায়-গৃহিণীর মৃত্যু হইয়াছিল, এ সেই ঘর। বিজয়বাবু, সুবালা, পিসীমা, বড়ালমহাশয় ও বড়াল-গৃহিণী, সকলেই অবাক হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই ঘরে গমন করিলেন।

সোনা-বৌ বলিলেন,—'এই খাটের উপর আমি শয়ন করিতাম। খুকী আমার কাছে থাকিত। নীচে ঐ স্থানে মন্দাকিনী শুইয়া থাকিত।

'খুকী ছয় মাসের হইল। সে হাসিতে শিখিল। তাহার শিশুমুখের হাসি ও তোমার সহাস্যবদন একত্র হইয়া কেমন এক অপূর্ব শোভা উৎপাদন করিত। কিন্তু তখন আমি অন্ধ ছিলাম। সে শোভা তখন আমার নয়নগোচর হইত না। বরং রাজাবাবু, মনে মনে তোমাকে আমি তখন বিদ্রূপ করিতাম। আমি ভাবিতাম,—'এত কেন? কন্যা কি কাহারও হয় না!'

খুকী ছয় মাসের হইল। দাঁত উঠিবার উপক্রম হইল। সেই সূত্রে তাহার জ্বর হইল। সমস্ত দিন তুমি তাহাকে বুকে করিয়া রহিলে। রাত্রিতে তাহাকে লইয়া আমি শয়ন করিলাম। খুকীর অসুখ; তথাপি মন্দাকিনীকে আমি ছুটী দিলাম। গ্রামের ভিতর আপনার বাড়ী সে চলিয়া গেল। দুই শয়নাগারের মধ্যস্থলের দ্বার তুমি খোলা রাখিয়াছিলে। আমি বন্ধ করিয়া দিলাম। খুকীর অসুখ। রাক্ষসী মা, আমি তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া গেলাম।

'শেষ রাত্রিতে বাটীতে ফিরিয়া আসিলাম। দেখিলাম যে, আমার শয়নঘরে আলো জ্বলিতেছে। তখন আমার শরীরের ও মনের স্থিরতা ছিল না। আমার মুখ দিয়া গন্ধ বাহির হইতেছিল। আলো দেখিয়া আমার বিকল শরীর অনেকটা স্থির হইল। সভয়ে আমি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম যে, হোমিওপ্যাথি ওষুধের বাক্সটি নিকটে রাখিয়া খুকীর পার্শ্বে তুমি বসিয়া আছ। একহাত মুঠা করিয়া খুকী তোমার হাত ধরিয়া আছে। মুখ তুলিয়া একবারমাত্র তুমি আমার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে। তাহার পর পুনরায় মস্তক অবনত করিয়া খুকীর মুখপানে চাহিয়া রহিলে। ভয়ে ভয়ে আমি খুকীর অপর পার্শ্বে গিয়া বসিলাম। তাহার অন্য হাতটি আমি ধরিলাম। আমার হাত সে মুঠা করিয়া ধরিল না। রাক্ষসী মাতাকে স্পর্শ করিতে যেন তাহার ঘৃণা বোধ হইল!

'তুমি কোন কথা বলিলে না। একটি কথাও তুমি আমার সহিত কহিলে না। তখনও না, পরেও না। খুকীর তড়কা হইল। অনেকক্ষণ পরে সেবারের তড়কা হইতে সে অব্যাহতি পাইল।

'প্রাতঃকালে ডাক্তার আসিল। কোন ফল হইল না। আরও তিনবার তড়কা হইল। রাক্ষসী মাকে পরিত্যাগ করিয়া এ পাপ ইহাধাম হইতে খুকী চলিয়া গেল! হায় রাজাবাবু, তোমার সহিত আমার যে সামান্য বন্ধন ছিল, জনমের মত তাহাও ছিন্ন হইয়া গেল।'

খাটের উপর উপবেশন করিয়া, দুই হস্ত দ্বারা মুখ ঢাকিয়া সোনা-বৌ পুনরায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন,—'সেইদিন হইতে আমরা বুঝিলাম যে, আর আমাদের মঙ্গল নাই। আমরা আর কে?—গুরুদেব ও আমি। ধ্যানস্থ হইয়া গুরুদেব দেখিলেন যে, তুমি দেবীর ভক্ষ্য। তোমাকে বলি দিতে পারিলে অক্ষয় পূণ্য লাভ হয়। গুরুদেব পুনরায় ধ্যানস্থ হইয়া দেখিলেন যে, তুমি শূলিনী। শূলিনী দেবী মুখবাদন করিয়া আছেন।—'এ নিষ্ঠুর প্রস্তাবে প্রথম আমি সম্মত হই নাই; কিন্তু গুরুদেব নানা প্রকার শাস্ত্রের বচন বলিয়া আমাকে প্রবোধ দিলেন। তিনি বলিলেন,—'স্বামী অপেক্ষা স্ত্রীলোকের আর প্রিয়বস্তু নাই। দাতাকর্ণ বা কি করিয়াছিলেন। তাহা অপেক্ষা স্বামী-বলি শতগুণ ফলপ্রদ। স্বয়ং ইন্দ্র স্বর্গ হইতে পুষ্পক রথ প্রেরণ করিবেন। তাহাতে আরোহণ করিয়া আমরা তিনজনে স্বর্গে গমন করিব।'

'গুরুদেব সকল বস্তুর আয়োজন করিলেন। যে ঔষধ আঘ্রাণ করিলে লোক অচেতন হয়, প্রথম তিনি সেই ঔষধ সংগ্রহ করিলেন। শূলিনী দেবীকে বলি প্রদত্ত হইবে, সেজন্য শূলপ্রয়োগে বধ করিতে হইবে। কাঠের বাঁট-সম্বলিত তীক্ষ্ণাগ্র লৌহ-নির্মিত ছোট একটি শূল তিনি গড়াইলেন। কাষ্ঠ হইতে প্রস্তুত অনেকগুলি নির্ধূম কয়লা সংগ্রহ করিয়া তিনি এই খাটের নীচে লুক্কায়িত রাখিলেন। তিনি স্থির করিলেন যে, গভীর রাত্রিতে, তুমি রাজাবাবু, যখন নিদ্রিত থাকিবে, তখন ঔষধ আঘ্রাণে তোমাকে অজ্ঞান করা হইবে; তাহার পর আমার এই ঘরে কয়লার আগুন করিয়া, সেই অগ্নির উত্তাপে লৌহনির্মিত শূলকে রক্তবর্ণ করিতে হইবে। তিনি মন্ত্রপাঠ করিতে থাকিবেন, আর আমি সেই উত্তপ্ত শূল তোমার শরীরের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট করিয়া দিব। উত্তপ্ত শূলপ্রয়োগে শরীরের ভিতর নাড়ীভুঁড়ি

সমুদয় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ও দগ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ তোমার মৃত্যু হইবে। শরীরের বাহিরে কোনরূপ চিহ্ন থাকিবে না।'

সোনা-বৌ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—'ও! কি নিষ্ঠুরতা! মনে করিতে গেলে আমার শরীর এখনও শিহরিয়া উঠে। রাজাবাবু! আমার ন্যায় পাপীয়সী রাক্ষসী পৃথিবীতে আর কে আছে? আমার মনে হয় যে, আমি মানবী নই, আমি পিশাচী। ক্ষমা?—এ পাপের ক্ষমা নাই। রাজাবাবু! তোমার নিকট ক্ষমা চাইতেও আমার লজ্জা বোধ হয়।

'নির্দিষ্ট দিনে সমুদয় আয়োজন হইল। ঘোর রাত্রিতে বাড়ীর লোক সকল যখন সুষুপ্ত হইল, তখন গুরুদেব জানালা-পথে নিঃশব্দে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। তুমি রাজাবাবু, অঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিলে। একখানি রুমাল ঔষধে সিক্ত করিয়া, তাহা দ্বারা তোমার মুখ ও নাসিকা আমরা চাপা দিলাম। হাত দিয়া তুমি মুখ হইতে রুমাল দূর করিতে চেষ্টা করিলে। আমর তোমার হাত ধরিয়া রহিলাম। তুমি পাশ ফিরিতে চেষ্টা করিলে। তাহাও আমরা বলপূর্বক নিবারণ করিলাম। অবিলম্বে তুমি অজ্ঞান হইয়া পড়িলে। কয়লার আগুন করিয়া তাহার ভিতর লৌহশূল কিছুক্ষণের নিমিত্ত প্রবিষ্ট করিয়া রাখিলাম। উত্তাপে লোহিতবর্ণ হইয়া শূল গন গন করিতে লাগিল। সে সময় তাহার আকার সাক্ষাৎ যমস্বরূপ অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। মন্ত্রপূত করিয়া গুরুদেব সেই শূল আমার হস্তে প্রদান করিলেন। মন্ত্র দ্বারা শূলিনী দেবীর তিনি আরাধনা করিতে লাগিলেন ও শূলপ্রয়োগ করিবার নিমিত্ত বার বার তিনি আমাকে আদেশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে নিষ্ঠুর কাজ করিতে আমি পারিলাম না। আমার হাত-পা কাঁপিতে লাগিল। হস্ত কম্পিত হইয়া রক্তবর্ণ শূল আমার পরিধেয় বস্ত্রে লাগিয়া গেল। কাপড় তৎক্ষণাৎ জ্বলিয়া উঠিল। আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম। সেই জ্বলন্ত কাপড় ও উত্তপ্ত শূল ঘরের মাঝে ফেলিয়া আমি সে স্থান হইতে পলায়ন করিলাম।'

বড়ালমহাশয় বিজয়বাবুকে চুপি চুপি বলিলেন,—'সে শূল আমি দেখিয়াছি। রাজাবাবু যখন বিদেশে গমন করিলেন, তখন তাঁহার চাকব বীরু সেই শূল সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল। তা না হইলে আপনাকে আমি দেখাইতে পারিতাম।'

সোনা-বৌ বলিতে লাগিলেন,—'আমার চীৎকার শুনিয়া বীরু দৌড়িয়া আসিল। বড়ালমহাশয় আসিলেন। গুরুদেবকে বীরু ধরিয়া ফেলিল। তোমাকে সচেতন করিল। তাহার পর যাহা হইল, তাহা আর আমি কি বলিব!

'পলায়ন করিয়া আমি আমার ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলাম। সম্মুখে টাকা-কড়ি, গহনা-পত্র যাহা কিছু পাইলাম তাহা লইয়া বাটী হইতে বাহির হইলাম। শিবের মন্দিরে গিয়া মাটীতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলাম।

'কিছুক্ষণ পরে গুরুদেব গিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। দেখিলাম যে, তোমরা তাঁহার নাসিকা কর্তন করিয়াছ। তাঁহার বক্ষঃস্থল রক্তে ভাসিয়া যাইতেছে। একখানি কাপড় ছিঁড়িয়া জলে ভিজাইয়া আমি মুখে বাঁধিয়া দিলাম। তিনি নালিশ করিবার প্রস্তাব করিলেন।

আমি তাহাতে সম্মত হইলাম না।

প্রাণভয়ে গুরুদেব এ গ্রাম হইতে পলায়ন করিলেন। পিতৃকুলে, মাতুলকুলে, কোন কুলে আমার স্থান ছিল না। আমি তাঁহার সঙ্গে গমন করিলাম। প্রথমে আমরা কাশী যাইলাম। ক্রমে হিমালয় পর্বতে গিয়া উঠিলাম। সে স্থানে বড় শীত। দূরে আবৃত শ্বেতবর্ণের পর্বতশ্রেণী দেখিতে পাইলাম। তাহার পর পাহাড় হইতে নামিয়া নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া বৃহৎ একটি নগরে গিয়া পৌঁছিলাম।

'ক্রমে আমার চক্ষু উন্মীলিত হইল। আমি যে অতি মহাপাতকে পাতকিনী হইয়াছি, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম। ইহ-জীবনে এ পাপের ক্ষমা নাই, তাহা জানিয়া আমি হতাশ হইয়া পড়িলাম। 'এ জীবনে আমাকে কেহ আর আদর করিবে না। সকলেই আমাকে দূর দূর করিবে।'—এই সমুদয় ভাবিয়া-চিন্তিয়া ঘোর অনুতাপে আমার হৃদয় দগ্ধ হইল। কালা-বাবাকে গুরু বলিতে আর আমার প্রবৃত্তি হইল না। সে যে আমার সর্বনাশ করিয়াছে তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম। রাত্রি দিন আমি তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলাম। আহা! রাজাবাবু, কেন তুমি যে কালসর্পকে ঘরে আনিয়াছিলে?

"সেই পিশাচ, আমার গহনা ও টাকা-কড়ি যাহা ছিল, তাহা লইয়া একদিন গোপনে প্রস্থান করিল। বিদেশে বিভূমিতে আমাকে একাকিনী ফেলিয়া নরাধম চলিয়া গেল। সে দেশের লোকের কথা আমি বুঝিতে পারি না, তাহারাও আমার কথা বুঝিতে পারেন না। সহায়হীনা, অর্থহীনা অনাথিনী হইয়া আমি পথে পথে ঘুরিতে লাগিলাম। ভাগ্যক্রমে সে দেশের এক ব্রাহ্মণী আমার প্রতি কৃপা করিয়া তাঁহার ঘরে স্থান দিলেন। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী গরীব। তাঁহারা যেরূপ শুষ্ক রুটী আহার করিতেন, আমাকেও তাহা খাইতে দিতেন। কয়েক মাস অতি কষ্টে তাঁহাদের ঘরে আমি দিনপাত করিলাম।"

তৃতীয় অধ্যায় – ঝম্‌ঝমির গাছ

সোনা-বৌ বলিতেছেন,—"রাত্রিকাল। একদিন আমি নিদ্রা যাইতেছি। সহসা আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। চক্ষু চাহিয়া আমি দেখিলাম যে, রাজাবাবু, তুমি আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছ। তাড়াতাড়ি আমি উঠিয়া বসিলাম। আনন্দের আর সীমা রহিল না। আমি ভাবিলাম যে, তুমি আমার প্রতি ভালবাসা এখনও ভুলিতে পার নাই। আমার ঘোর দুর্গতি দেখিয়া তোমার মনে দয়া হইয়াছে। আমার অপরাধ তুমি ক্ষমা করিয়াছ। অনাথিনী দাসীকে তুমি লইতে আসিয়াছ। পুনরায় আমি তোমার সোনা-বৌ হইব। পুনরায় তুমি আমাকে আদর করিবে। পুনরায় সেই সুখের দিন ফিরিয়া আসিবে।

তোমার পা দুইটি ধরিবার নিমিত্ত দুই হাত বাড়াইয়া বসিয়া বসিয়াই আমি তোমার দিকে অগ্রহর হইলাম। হায়! ঘোর ঘৃণার চক্ষে আমার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া তুমি সরিয়া দাঁড়াইলে। গলিত পচিত দুর্গন্ধযুক্ত অপবিত্র বস্তুর স্পর্শভয়ে লোকে যেরূপ সত্বর দূরে গমন করে, সেইরূপ তুমি আমার নিকট হইতে সরিয়া দাঁড়াইলে। হায়, হায়! আমি কি

ছিলাম আর কি হইলাম!

"তুমি বলিলে,—'সোনা-বৌ! বলি দিবার নিমিত্ত তোমরা আমাকে উৎসর্গ করিয়াছিলে। দেবী আমাকে গ্রহণ করিয়াছেন। আমার মৃত্যু হইয়াছে। এখন বাড়ী যাও। তোমাদের সুখের পথ হইতে কন্টক দূর হইয়াছে। কোথায় আমি সব সোনার ইট লুক্কায়িত রাখিয়াছি, তাহা তুমি অবগত আছ। যাও, সেই ধন গিয়া বাহির কর। কালা-বাবাকেও আমি সেই স্থানে যাইতে অনুরোধ করিয়াছি, সেও সেই বাড়ীতে যাইতেছে। তুমিও যাও। সোনার ইট বাহির করিয়া দুইজনে পরম সুখে কালযাপন কর।'

"আমি বলিতে যাইতেছিলাম যে,—'রাজাবাবু আমি আর দেশে যাইব না, আমি আর সে বাড়ীতে যাইব না। আমি আর কালা-মুখ সন্ন্যাসীর মুখ দেখিব না। তোমার সোনার ইটে আমার প্রয়োজন নাই। পৃথিবীর ঐশ্বর্য্যে আর আমার আবশ্যক নাই। আমি কেবল এই চাই যে, তোমার ঐ পা দু'খানি একবার আমার মাথার উপর রাখিয়া দাও।

কিন্তু মুখ তুলিয়া যেই চাহিলাম, আর দেখিলাম যে, তুমি সে স্থানে নাই। কি জানি কেন, কিন্তু সেইদিন হইতে সকলে বলিতে লাগিল যে, ঐ কাঙ্গালিনী ক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে। তুমি তাহার পর আমার নিকট সর্বদা আসিতে এবং এই বাড়ীতে আসিবার নিমিত্ত সর্বদা আমাকে উত্তেজিত করিতে। আমি তোমাকে দেখিতে পাইতাম কিন্তু অন্য কেহ তোমাকে দেখিতে পাইত না;—সেই জন্য কি লোকে আমাকে পাগলিনী বলিত? আমি তোমার সহিত কথা কহিতাম, ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সর্বদা আমি রোদন করিতাম, নিজের দুঃখের কাহিনী স্মরণ করিয়া অস্ফুটস্বরে বিলাপ করিতাম;—সেইজন্য কি লোকে বলিত যে, ঐ দেখ, পাগলী বকিতেছে। রুক্ষ কেশ, মলিন বেশ, কাদা ধূলা মাখিয়া থাকিতাম। ব্রাহ্মণী দয়া করিয়া আহার দিলে, সে আহার পড়িয়া থাকিত, সেদিকে ফিরিয়াও চাহিতাম না। রাত্রিতে নিদ্রা যাইতাম না, বসিয়া বসিয়া কেবল কাঁদিতাম,—সেই জন্য কি লোকে বলিত যে ঐ স্ত্রীলোকটা ক্ষিপ্ত হইয়াছে?

'কোন মুখে এ বাড়ীতে আমি আসিব? যে স্থানে আমি রাজরাণী ছিলাম, এ পোড়ামুখ সে স্থানে আমি কি করিয়া দেখাইব? বাড়ী আসিতে আমার প্রবৃত্তি হইল না। কিন্তু তুমি আমাকে টানিয়া আনিলে। দিন নাই, রাত নাই, সর্বদা তুমি আমার নিকট আসিয়া বলিতে—'চল, চল, বাড়ী চল। বাড়ী গিয়া সোনার ইট লও।'

'ঘোর অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে এইদিকে আসিতে হইল। কলিকাতা কোন্ দিক্ যাইতে হয়,—এই কথা লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া ধীরে ধীরে আমি বঙ্গদেশের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কোনদিন আধক্রোশ, কোনদিন একক্রোশ পথ চলিতাম। কখন বা পথ চলিতাম কখন বা পথ চলিতাম না। পথে ঘাটে গাছতলায় পড়িয়া থাকিতাম। কুকুরকে যেরূপ লোকে আহারীয় সামগ্রী ফেলিয়া দেয়, সেইভাবে যদি কেহ আমাকে কিছু খাইতে দিত, তবেই আমি খাইতাম, নতুবা অনাহারে আমি পড়িয়া থাকিতাম। দুর্বলতায় তখন আর পথ চলিতে পারিতাম না। মৃত্যুকামনা করিয়া 'পথের পার্শ্বে অথবা গাছতলায় পড়িয়া

থাকিতাম। মুমূর্ষু অবস্থায় পথে পতিত দেখিয়া কতবার লোকে আমাকে হাসপাতালে লইয়া গিয়াছিল। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক,—তোমার আদেশ প্রতিপালিত হইয়াছে। যে স্থানে পরম সুখ উপভোগ করিয়াছিলাম, যে স্থানে পরে এই মুখ পুড়িয়াছিল, বহুকাল পরে পুনরায় সেই স্থানে আসিয়াছি।

এখন, রাজাবাবু আমায় ক্ষমা কর। তুমি দয়াময়। ক্ষমার পাত্রী আমি না হইলেও নিজগুণে তুমি আমাকে ক্ষমা কর। হায়, রাজাবাবু! তোমার কি মনে পড়ে—একবার আমার জ্বর হইয়াছিল। আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া দুই হাতে আমার একটি হাত ধরিয়া, আমার মুখের দিকে চাহিয়া দিবারাত্রি তুমি আমার পার্শ্বে বসিয়াছিলে? হায়! সে একদিন গিয়াছে, আর আজ একদিন। এ সামান্য জ্বর নয়। ভীষণ দাবানলে আমি দগ্ধ হইতেছি, তথাপি তোমার স্নেহ নাই, তোমার মমতা নাই, তোমার দয়া নাই। কিন্তু তোমার দোষ নাই, রাজাবাবু! কাল-ভুজঙ্গীকে কে দয়া করে? কাল-ভুজঙ্গী অপেক্ষাও আমি অধম। আমি পিশাচী। আর আমার সহ্য হয় না। শরীর দগ্ধ হইতেছে, কিন্তু একেবারে ভস্মীভূত হয় না কেন? তোমার জন্য যে শূল আমরা করিয়াছিলাম, সেই শূলের সেই ভয়ঙ্কর মূর্তি দিবারাত্রি আমার মনের ভিতর জাগিতেছে। সেইরূপ শত শত উত্তপ্ত রক্তবর্ণের শূল দিয়া কে যেন মুহুর্মুহুঃ আমার মস্তিষ্ক বিদীর্ণ করিতেছে ও হৃৎপিণ্ড বিদ্ধ করিতেছে। নিদ্রা?—কতকাল যে নিদ্রা যায় নাই, তাহা বলিতে পারি না। নিদ্রা কাহাকে বলে, তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। আর কেন, রাজাবাবু! যথেষ্ট দণ্ড হইয়াছে। এই আমি খাটের উপর শয়ন করিলাম। একবার তোমার পা আমার মাথার উপরে দাও। পাপের যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। এখন তোমার পায়ের একটু ধূলা আমার মাথায় পড়িলেই আমি শান্তিলাভ করি। দাও, একবার তোমার পা অনাথিনী দুঃখিনীর মাথায় তুলিয়া দাও। এই আমি চক্ষু বুজিলাম। একটু পদধূলি দাও, যেন নিদ্রার আবেশে ক্ষণকালের নিমিত্তও এ নিদারুণ যন্ত্রনা বিস্মৃত হই।'

সোনা-বৌ অল্পকালের নিমিত্ত খাটের উপর শয়ন করিয়া চক্ষু বুজিয়া রহিলেন। ব্যস্ত হইয়া পুনরায় উঠিয়া তিনি বলিলেন,—'ভগবান আমার পাপ ক্ষমা করিবেন? সোনার ইট বাহির করিয়া দিলে তুমি আমার অপরাধ মার্জনা করিবে? তখন আমি শান্তি লাভ করিব? বেশ, রাজাবাবু! তুমি যাহা আজ্ঞা করিবে, আমি তাহাই করিব। তবে ঐ অন্ধকার ঘরে গিয়ে সোনার ইট বাহির করি।

মাঝের দ্বারের শৃঙ্খল খুলিয়া সোনা-বৌ চোরকুঠুরির ভিতর প্রবেশ করিলেন। এই ঘরের বারেণ্ডায় দিকের দ্বার তালা বন্ধ ছিল। মাঝের দ্বারে সুবালা শৃঙ্খল দিয়াছিলেন। বিনয় সেজন্য এ ঘর হইতে পলায়ন করিতে পারেন নাই। বিনয় ঘরের এককোণে গিয়া লুক্কায়িত হইলেন। সেই কোণে তাঁহার সম্মুখে খাঁদা ভূত দাঁড়াইয়া রহিল।

সোনা-বৌ অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে বড়ালমহাশয়ও সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। বিজয়বাবু, পিসীমা, সুবালা, বড়াল-গৃহিণী দ্বারের নিকট মাঝের ঘরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এই অবসরে বড়ালমহাশয়ের হাত টিপিয়া বিনয় বলিলেন,—

—'আমি বিনয়। খাঁদা ভূত ও আমি যে এ ঘরে লুক্কায়িত আছি, বিজয়বাবু এখন যেন জানিতে না পারেন। তিনি যদি এ ঘরে এখন আসেন তাহা হইলে আপনি আড়াল করিয়া দাঁড়াইবেন।'

সোনা-বৌ কিছুক্ষণ ঘরের ছাদের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর তিনি বলিলেন,—'বড় অন্ধকার! ঐ কড়িকাঠের ভিতর সোনার ইট আছে। সেই জন্য দুইটি মোটা মোটা কড়ি অকারণ একস্থানে রহিয়াছে। আমি স্ত্রীলোক। উচ্চ কড়িকাঠের নিকট কি করিয়া আমি উঠিব? অন্ধকারে কি করিয়া আমি দেখিব?'

বড়ালমহাশয় তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিয়া বারেণ্ডা হইতে একজন চাকরকে একটা আলো ও একটা বাঁশের ছোট মই বা সিঁড়ি আনিতে বলিলেন।

বিজয়বাবু ভাবিতে লাগিলেন,—'কড়িকাঠ' বেণীবাবু মৃত্যুকালে ঝমঝমি গাছের কথা বলিয়াছিলেন। সে সময় তাঁহার ঠিক জ্ঞান ছিল না। দ্রব্যের নাম তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এক দ্রব্যের নাম করিতে অন্য দ্রব্যের নাম করিয়াছিলেন। কড়ি নাড়িলে ঝমঝম করিয়া শব্দ হয়। 'কড়িকাঠ' নাম তিনি মনে করিতে পারেন নাই। সেজন্য বোধ হয় ঝমঝমির গাছ তিনি বলিযাছিলেন। তাহার পর বালিকাদের সম্বন্ধে উপকথা। এক বাঘেব একটি কডিগাছ ছিল, ফলস্বরূপ কড়ি ফলিয়া গাছটি অবনত হইয়াছিল। কয়েকটি বালিকা সেই কড়ি কুড়াইতেছিল। এমন সময় বাঘ হালুম শব্দে আপনাব গাছতলায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তলায় যে বালিকা-কয়জন ছিল, তাহারা দৌড়িয়া পলায়ন করিল, গাছের উপব যে ছিল, সে পলাইতে পারিল না। গাছে বসিয়া সে কাঁদিতে লাগিল। একফোঁটা চক্ষুর জল বাঘের গায়ে পড়িল। বাঘ চাটিয়া দেখিল যে, লবণের আস্বাদ!—ইত্যাদি!' ঝমঝমির গাছ কি, তাহা আমাকে বুঝাইবার নিমিত্ত, বেণীবাবু এ গল্পের উল্লেখ করিয়াছিলেন। দেখা যাউক, কি হয়।'--চাকর আলো ও ছোট একটি বাঁশের মই দিয়া গেল। বিজয়বাবু আলো লইয়া ও বড়ালমহাশয় মই লইয়া অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করিলেন।

অন্ধকার ঘর অধিক উচ্চ ছিল না। বাঁশের মইও বৃহৎ ছিল না। বড়ালমহাশয়ের হাত হইতে মই লইয়া সোনা-বৌ আপনি কড়িকাঠের গায়ে সন্নিবেশিত করিলেন। খাঁদা ভূত ও বিনয়কে আড়াল করিয়া নিম্নে দাঁড়াইয়া বড়ালমহাশয় মই ধরিয়া রহিলেন। আলো লইয়া বিজয়বাবু তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

মই দিয়া সোনা-বৌ কড়িকাঠের নিকট গিয়া উঠিলেন। দুইটি কড়িকাঠ নিকট-নিকট ছিল। তাহাদের মধ্যে হাত দিয়া সোনা-বৌ একটি কড়িকাঠ হইতে একখণ্ড ক্ষুদ্র তক্তা সরাইয়া ফেলিলেন। কড়িকাঠেব গায়ে সামান্য একটি ছিদ্র বাহির হইয়া পড়িল। ছিদ্রের ভিতর হস্ত প্রবিষ্ট করিয়া সোনা-বৌ কড়িকাঠের ভিতর হইতে সোনার ইট বাহির করিতে লাগিলেন। ঠিক ইট নহে, চতুষ্কোণ দীর্ঘ কাঠের ন্যায়! ইংরাজীতে ইহাকে 'বার' বলে।

বিজয়বাবু চুপি চুপি বড়ালমহাশয়কে বলিলেন,—'ইহাকেই চক্‌চকে কাপড় কাচা সাবান বলে বটে; মনে আছে—বেণীবাবু মৃত্যুকালে আমাকে কি বলিয়াছিলেন?'

বড়ালমহাশয় ঘাড় নাড়িয়া প্রকাশ করিলেন,—'হাঁ, আমার মনে আছে।'

অনেকগুলি সেইরূপ সোনার ইট সোনা-বৌ নিম্নে নিক্ষেপ করিলেন, তাহার পর কয়েকটা হীরের অঙ্গুরীয় ও খানকয়েক বহুমূল্য প্রস্তরজড়িত অলঙ্কার কাঠের ভিতর হইতে বাহির করিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিলেন। আর কিছু আছে কি না, তাহা দেখিবার নিমিত্ত এদিক ওদিক হাত দিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এই অবসরে বিজয়বাবু পুনরায় বড়ালমহাশয়কে বলিলেন,—'মৃত্যুকালে বেণীবাবু ইঁহার ছবি আমাকে দিয়াছিলেন। সে ছবি এখনও আমার কাছে আছে। এক্ষণে ইঁহার বয়স হইয়াছে, চুল অনেক পাকিয়া গিয়াছে, বর্ণ মলিন হইয়াছে, চক্ষু বসিয়া গিয়াছে, চর্ম কুঞ্চিত হইয়াছে। আলোতে এই সমুদয় ব্যতিক্রম স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছিল। কিন্তু এখন সামান্য আলোকে ছবির সহিত ইহার মুখের সাদৃশ্য বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইতেছে।'

বড়ালমহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'সেই সঙ্গে খাঁদা ভূতের নাক আপনাকে তিনি দিয়াছিলেন?'—বিজয়বাবু উত্তর করিলেন,—'হাঁ।'

কাঠের ভিতর আর সোনার ইট অথবা অপর কোন দ্রব্য না পাইয়া সোনা-বৌ সেই সিঁড়ির উপর নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন। একটু চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন,—'রাজাবাবু! তোমার আজ্ঞা আমি পালন করিলাম। এক্ষণে আমায় শাস্তি প্রদান কর। সে পাপিষ্ঠ নরাধম কালা-বাবা দেখা দিলে, তবে তুমি আমাকে শাস্তি প্রদান করিবে? সে পাপিষ্ঠ কোথায়?'

বড়ালমহাশয় বলিলেন,—'আপনি এখন মই হইতে নামিয়া আসুন। যাহার নাম করিলেন, সে কোথায়, আমি আপনাকে বলিব।'—সোনা-বৌ কোন উত্তর করিলেন না। উচ্চে কড়িকাঠের নিকট মইয়ের উপর দাঁড়াইয়া তিনি কি ভাবিতে লাগিলেন।

বড়ালমহাশয় বিজয়বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'সে নাক এখন কোথায়?'

বিজয়বাবু উত্তর করিলেন,—'বেণীবাবু মৃত্যুকালে আমাকে বলিয়াছিলেন যে, এই নাক সর্বদা তুমি গলায় পরিয়া থাকিবে। তাহা হইলে তোমার মঙ্গল হইবে। এই দেখুন, সোনার চেন-সম্বলিত নাক আমি গলায় পরিয়া আছি।'

বড়ালমহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কোন ব্যক্তিকে দিতে না, তিনি আদেশ করিয়াছিলেন?' বিজয়বাবু উত্তর করিলেন,—'হাঁ, যাঁহার ছবি, তাঁহাকে তিনি এই নাক দিতে বলিয়া গিয়াছিলেন। এখন বুঝিলাম যে, তাঁহার পত্নী এই সোনা-বৌকে তিনি নাক দিতে বলিয়া গিয়াছিলেন।'

উচ্চ মইয়ের উপর দাঁড়াইয়া সোনা-বৌ চিন্তা করিতেছিলেন, এই কথাগুলি বোধ হয় তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়াছিল। সহসা তিনি বলিয়া উঠিলেন,—'তবে কই দাও!'

বিজয়বাবু বলিলেন,—'আপনি নামিয়া আসুন, নামিয়া আসিলে আপনাকে দিব।'

সোনা-বৌ কোন উত্তর করিলেন না। মই হইতে তিনি নীচে নামিয়া আসিলেন না। সে স্থানে দাঁড়াইয়া নিম্নদিকে হাত বাড়াইয়া তিনি আর একবার বলিলেন,—'দাও।'

বিজয়বাবু আপনার গলদেশ হইতে নাক-সম্বলিত হার খুলিয়া তাঁহার হস্তে প্রদান

করিলেন। সেই মুহূর্তে ভূতের ন্যায় একজন লোক ঘরের কোণ হইতে হু হু হু হু শব্দ করিতে করিতে বাহির হইল। 'আঁমার নাঁক' এই বলিয়া সে লম্ফ প্রদান করিল ও সোনা-বৌয়ের হাত হইতে চেন-সম্বলিত নাক কাড়িয়া লইল। বাঁশের মই তৎক্ষণাৎ কড়িকাঠের গা হইতে স্খলিত হইয়া নিম্নে পড়িয়া গেল। সেই সঙ্গে সোনা-বৌ ভূতলে পতিত হইলেন।

নাক লইয়া খাঁদা ভূত মাঝের দ্বার দিয়া অপর ঘরে প্রবেশ করিল। দ্বারের নিকট পিসীমা, বড়ালনী ও তাঁহাদের পশ্চাতে সুবালা দাঁড়াইয়া ছিলেন। খাঁদা ভূত তাঁহাদিগকে ঠেলিয়া ফেলিল। তাহার পর সে বারেণ্ডায় বাহির হইল। সে স্থান হইতে তড় তড় শব্দে পূর্বদিকেব সিঁড়ি দিয়া নীচের তলায় নামিল। যে ঘরে কাঠ থাকে, সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া, জানাল্লার গরাদ খুলিয়া বাগানে গিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পর হু হু শব্দ করিতে করিতে বাগানের ভিতর সে অদৃশ্য হইয়া পড়িল।

চতুর্থ অধ্যায় – শিবমন্দির

বাঁশের মই সহিত সোনা-বৌ মাটীতে পড়িয়া গেলেন। তিনি উঠিয়া বসিলেন না। তাড়াতাড়ি বড়ালমহাশয় তাঁহাকে তুলিতে গেলেন। গিয়া দেখিলেন যে, সোনা-বৌ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন। বিজয়বাবুও আলো লইয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন, মাটীতে আলো রাখিয়া তিনি বলিলেন, চলুন ঐ ঘরে লইয়া যাই।'

বিজয়বাবু মাথার দিক ও বড়ালমহাশয় পায়ের দিক ধরিলেন। স্থান সঙ্কীর্ণ। দুই জনের সেই মৃতপ্রায় দেহকে বাহিরে লইয়া যাইতে কষ্ট হইতে লাগিল। সেই সময় ঘরের কোণ হইতে আর একজন লোক বাহির হইয়া তাঁহাদের সহায়তা করিলেন। তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়া বিজয়বাবু বিস্মিত হইলেন। কিন্তু কোন কথা বলিলেন না।

ধরাধরি করিয়া তাঁহারা সোনা-বৌকে অপর ঘরে লইয়া খাটের উপর শয়ন করাইলেন। তাঁহার দাঁতে দাঁতে লাগিয়াছিল। অনেক কষ্টে তাঁহার দাঁত-কপাটী ভাঙ্গিলেন। তাহার পর তাঁহাকে সচেতন করিবার নিমিত্ত বিধিমতে সকলে চেষ্টা করিলেন। সোনা-বৌয়ের জ্ঞান হইল না। অচেতন হইয়া চক্ষু বুজিয়া তিনি বিছানায় পড়িয়া রহিলেন। মাঝে মাঝে তাঁহার সর্বশরীর কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। ঘড় ঘড় শব্দে নাক দিয়া নিঃশ্বাস প্রবাহিত হইতে লাগিল। সকলে বুঝিলেন, এ পৃথিবীতে এইবার তাঁহার দুঃখের অবসান হইল।

বিজয়বাবুর সহিত পবামর্শ করিয়া বড়ালমহাশয় ডাক্তার আনিতে পাঠাইলেন। দুই ক্রোশ দূরে অন্য গ্রামে ডাক্তার বাস করেন। তাঁহাকে আনিতে বিলম্ব হইবে। সেবা-শুশ্রূষা করিবার নিমিত্ত সুবালা রোগিণীর নিকট গমন করিতেছিলেন। বিজয়বাবু তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন,—'তুমি নয়। তোমার পিসীমা ও বড়ালমহাশয়ের স্ত্রী বসিয়া থাকুন।'

অন্ধকার ঘর হইতে সোনা-বৌকে বাহির করিবার সময় যিনি সহায়তা করিয়াছিলেন, তিনি নিকটে দাঁড়াইয়া ছিলেন। বিজয়বাবু তাঁহার প্রতি বার বার দৃষ্টি করিতেছিলেন। কিন্তু এতক্ষণ কোন কথা বলেন নাই। সোনা-বৌয়ের চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষা সম্বন্ধে যখন সকল বিষয় ঠিক হইল, তখন বিজয়বাবু সহসা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তুমি

এখানে?'মস্তক অবনত করিয়া বিনয় চুপ করিয়া রহিলেন। কোন উত্তর করিলেন না।

বড়ালমহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আপনি ইঁহাকে জানেন?'

মস্তক অবনত করিয়াই বিনয় ঈষৎ হাসিলেন। বিজয়বাবু কোন উত্তর করিলেন না। বিনয়ের দিকে তিনি চাহিয়া রহিলেন।

বড়ালমহাশয় বলিলেন,—'বিনয়বাবুর সহিত সুবালা দিদির সম্বন্ধ হইয়াছে।

বিজয়বাবু যার-পর-নাই আশ্চর্যান্বিত হইলেন, আর কোন কথা তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। কেবল তিনি বলিলেন,—'কি!'

বড়ালমহাশয় পুনরায় বলিলেন—'আপনার ভ্রাতৃজায়া ঠাকুরাণী এ সম্বন্ধ স্থির করিয়া গিয়াছেন। অগ্রহায়ণ মাসে বিবাহ হইবে।

লজ্জায় কোঁচার কাপড় মুখে দিয়া বিনয় মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন।

সুবালা ঘর হইতে পলায়ন করিবার উপক্রম করিতেছিলেন, বিজয়বাবু তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। অতি স্নেহের সহিত একহাতে তাঁহার ও অপর হাতে বিনয়ের গলা তিনি জড়াইয়া ধরিলেন। বক্ষঃস্থলের দুই পার্শ্বে দুইজনের মস্তক রাখিয়া ধীরে ধীরে তিনি বলিতে লাগিলেন,—'এতক্ষণ ধরিয়া কেবল দুঃখের কাহিনী শুনিতেছিলাম। আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল। ভগবান এক্ষণে আমার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। আমার ব্যথিত হৃদয়ে তিনি অসীম আনন্দ ঢালিয়া দিলেন। মনে আমার বড় সাধ হইয়াছিল যে, তোমাকে মা, আমি পুত্রবধূ করি। পরমেশ্বর আমার সে সাধ পূর্ণ করিলেন। কন্যা বলিয়া, সুবালা, তোমাকে ঘরে লইব, আমার নিজের মা বলিয়া তোমাকে ডাকিব, ইহা অপেক্ষা ভাগ্যের কথা কি আছে! তোমাকে প্রথম দেখিয়াই মা-লক্ষ্মী বলিয়া আমি ডাকিয়াছিলাম। সত্য সত্য তুমি আমার ঘরের মা-লক্ষ্মী হইবে, তাহা ভাবিয়া আমার আনন্দ রাখিতে আর স্থান হয় না। পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ করি। তিনি আমাকে কৃতার্থ করিলেন।'

আনন্দে বিজয়বাবুর চক্ষুতে জল আসিয়া গেল, তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, মুখ হইতে আর বাক্য সরিল না। তিনি চুপ করিলেন।

পিসীমা, বড়ালমহাশয়, বড়াল-গৃহিণী, সকলেই আশ্চর্যান্বিত হইলেন। বিনয়, বিজয়বাবুর পুত্র! —রায়-গৃহিণীর দেবর-পুত্র! অভাবনীয়! অভাবনীয় কথা।

একটু স্থির হইয়া বিজয়বাবু পুনরায় বলিলেন,—'তবে তুমিই যোগেশের কন্যা? তোমার পিতাকে আমি জানিতাম। কিন্তু তোমার পিতার সহিত আমাদের বড় বৌয়ের কি সম্পর্ক?' —সুবালা আস্তে আস্তে উত্তর করিলেন,—'আমার মায়ের মাসী!'

বিজয়বাবু বলিলেন,—'বিধাতার কি ভবিতব্য! আমার গৃহিণী পিত্রালয়ে গিয়া তোমাকে অনেকবার দেখিয়াছিলেন। তিনি তোমাকে মনোনীত করিলেন। তোমার কাকা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সম্বন্ধ স্থির করিলেন।

দুই বৎসর অপেক্ষা করিবার নিমিত্ত আমার নিকট তিনি প্রার্থনা করিলেন। বিনয় বালক। আমি তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। কথাবার্তার সময় তোমার পিতার নাম

হইয়াছিল। তোমার পিতাকে আমি জানিতাম। অধিক পরিচয় বা তদন্তের আবশ্যক হইল না। কথাবার্তার সময়, তোমার মায়ের মেসোমহাশয়ের নাম কেহ করে নাই। ইতিপূর্বে তোমার নাম কখন আমি শুনি নাই। তবে কি করিয়া আমি জানিব যে, যোগেশের কন্যাও যে, আর আমার ভ্রাতৃজায়ার প্রতিপালিতা সুবালাও সে!'

একমাত্র বিনয় সে কথা জানিতেন। যে বৎসর তিনি ছবি আঁকিতে আসিয়াছিলেন, সেই বৎসর অবগত হইয়াছিলেন যে, রায়-গৃহিণী তাঁহার জ্যেঠাইমাতা। তাঁহার পিতার প্রতি রায়-গৃহিণীর ঘোরতর বিদ্বেষ দেখিয়া তাঁহার ভয় হইয়াছিল—পাছে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যায়। সেই ভয়ে এ কথা তিনি প্রকাশ করেন নাই। সুবালাকে পর্যন্ত তিনি বলেন নাই।

বিজয়বাবুর কথাবার্তায় পিসীমা ও বড়ালমহাশয় প্রভৃতি সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন যে, বিজয়বাবু কিরূপ লোক, রায়মহাশয় ও রায়-গৃহিণী তাহা বুঝিতে পারেন নাই। রায়মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত সুবালার বিবাহ হইবে, সেজন্য সকলেই আহ্লাদিত হইলেন।

সোনার ইট ও অন্যান্য দ্রব্যাদি কুড়াইয়া ফর্দ করিবার নিমিত্ত বড়ালমহাশয় অন্ধকার ঘরে গমন করিলেন। বিজয়বাবু কে,—সকলকে সে পরিচয় দিবার নিমিত্ত পিসীমা তাড়াতাড়ি নীচে যাইলেন। সুবালা পশ্চিমদিকে আপনার ঘরে পলায়ন করিলেন। বড়াল-গৃহিণী সোনা-বৌয়ের নিকট বসিয়া তাঁহার মাথায় জল দিতে লাগিলেন। বিজয়বাবু বলিলেন,—'বিনয়! তোমার মামার বাড়ী হইতে তুমি যে এখানে আসিয়াছ, তাহা আমি জানিতাম না। চল, বাগানের দিকে যাই। তোমার সহিত আমার কথা আছে।' বাগানের পূর্বপ্রান্তে গিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে পিতাপুত্রে কথাবার্তা হইতে লাগিল।

সোনা-বৌ পুনরায় আসিয়াছেন শুনিয়া গ্রামের দুই চারিজন বয়স্থা স্ত্রীলোক তাঁহাকে দেখিতে আসিল। বিজয়বাবুর পরিচয় পিসীমা তাহাদিগকে প্রদান করিলেন। সম্পর্ক অনুসারে তাহারা সুবালার সহিত রহস্য করিতে লাগিল। চাকরাণীগণ গা-টেপাটেপি করিতে লাগিল। সুবালার হবু-শাশুড়ীর দাঁত কত বড়, সে সম্বন্ধে পিসীমাও দুই একটা হাসি তামাসা করিলেন।—সুবালার লজ্জা হইল। হাসি-তামাসা এখন তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি ভাবিলেন যে,—'পৃথিবীতে অনেক লোক বাস করে। তাহাদের জীবনে এরূপ অদ্ভুত ঘটনা ঘটে না। যাহা দেখিলাম ও যাহা শুনিলাম, তাহা যেন ঠিক উপন্যাসের কথা! আমার মন বড়ই চঞ্চল হইয়াছে। সন্ধ্যা হইতে এখনও কিছু বিলম্ব আছে। কোন নিভৃত স্থানে গিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া থাকি।'

একখানি পুস্তক হাতে লইয়া সুবালা বাড়ী হইতে বাহির হইলেন। বিজয়বাবু ও বিনয় বাগানের পূর্বপ্রান্তে গিয়াছিলেন। সুবালা বাগানের পশ্চিমদিক দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। বাগানের বাহিরে কতকটা নিম্নভূমি ছিল। বানের সময় ইহা জলমগ্ন হয়। এখন নদীতে অধিক বান ছিল না। নিম্নভূমিতে এখন জল ছিল না। ইহার পর কাঁদাড়। নদীর ভাঙ্গনে খালের ন্যায় যে নালা উৎপন্ন হয়, এ স্থানে তাহাকে কাঁদাড় বলে। নদী

শিবমন্দিরের উত্তর দিকে! মন্দিরের পশ্চিমে নদী হইতে এই কাঁদাড় বাহির হইয়া, ইহার দক্ষিণ-পূর্ব দিক বেষ্টন করিয়া, পুনরায় নদীতে গিয়া মিলিত হইয়াছে। উত্তরে নদী এবং পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্বদিকে কাঁদাড়; সুতরাং দেবালয় একটি দ্বীপের ন্যায় হইয়াছে। পূর্ণ বানের সময় কাঁদাড়ে পাঁচ ছয় হাত জল হয়, কিন্তু এখন তাহাতে এক হাঁটুর অধিক জল ছিল না। বাগান ও নিম্নভূমি পার হইয়া সুবালা কাঁদাড়ের ধারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাঘা তাঁহার সহিত আসিতেছিল। কাঁদাড়ে জল দেখিয়া বাঘাকে তিনি ফিরাইয়া দিলেন। জল পার হইয়া সুবালা মন্দিরের ভূমিতে গিয়া উঠিলেন। মন্দিরের চারিদিকে একটু বাগানের মত ছিল। সে সমুদয় পার হইয়া সুবালা মন্দিরের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন।

অনেক কালের প্রাচীন মন্দির। তাহার সম্মুখে একটু রক ছিল। রকের অনেক স্থান ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। সুবালা রকের উপর উঠিলেন। রকের যে অংশ ভগ্ন হয় নাই, সেইরূপ একটি স্থান মনোনীত করিয়া মন্দিরের প্রাচীরে ঠেশ দিয়া সুবালা বসিলেন। ভাদ্র মাস; বর্ষার জলে পৃথিবী ধৌত হইয়া গিয়াছিল। গাছপালা উজ্জ্বল শ্যামল পত্রে সুশোভিত হইয়াছিল। অপরাহ্নের সূর্যকিরণ দ্রবীভূত স্বর্ণের ন্যায় হইয়া বৃক্ষ সকলের অগ্রভাগকে সুবর্ণের বর্ণে রঞ্জিত করিয়াছিল। অল্প অল্প বায়ুহিল্লোলে তাহাদের শাখা-প্রশাখা মাঝে মাঝে আলোড়িত হইতেছিল। নিম্নে নবীন দুর্বাদলে ভূমি ঘনভাবে আচ্ছাদিত হইয়াছিল। নিকটে নদীর জল সন্ সন্ শব্দে প্রবাহিত হইতেছিল, উপরে নির্মল নীলাকাশে তূলার ন্যায় দুই খণ্ড শ্বেতবর্ণের মেঘ বায়ুভরে তাড়িত হইয়া নানা আকার ধারণ করিতেছিল। অস্তপ্রায় সূর্যকিরণ তাহার উপর পতিত হইয়া রজত নির্মিত অথবা তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিল। দূরে গরুর পালের মধ্যে দুই একটি গাভী নবপ্রসূত চঞ্চল বৎসকে নিকটে না দেখিয়া হাম্বারবে তাহাকে আহ্বান করিতেছিল। গাছের উপর নিবিড় পত্রমধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া ঘুঘুপক্ষী ঘু ঘু ঘু রবে সঙ্গিনীকে ডাকিতেছিল। সুবালা ভাবিলেন,—'হায় রে, এরূপ শান্তিময়ী পৃথিবীকে মানুষ কেন অশান্তির আলয় করে!'

মন্দিরের প্রাচীরে ঠেশ দিয়া সুবালা উইলের বিষয় খাঁদা ভূতের বিষয়, সোনা-বৌয়ের বিষয়,—নানা চিন্তা করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার চক্ষু দুইটি বুজিয়া আসিল। নিদ্রার আবেশ দূর করিতে তিনি চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে চেষ্টা বিফল হইল। মন্দিরের প্রাচীরে ঠেশ দিয়া অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় গভীর নিদ্রায় তিনি অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

উপর-পাহাড়ে অধিক বৃষ্টি হইয়া থাকিবে। সহসা নদীতে বান আসিয়া পড়িল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে নদীর গর্ভ জলে পূর্ণ হইল। প্রবল বেগে নদীর জল প্রবাহিত হইতে লাগিল। যে স্থানে এতক্ষণ ঈষৎ কুল কুল শব্দ হইতেছিল, এখন সেই স্থান ঘূর্ণিত জলকল্লোলে পূর্ণ হইল। সুবালা নিদ্রিতা, সুবালা তাহার কিছুই জানেন না।

নদীর এ কূল হইতে অপর কূল পর্যন্ত জলে পূর্ণ হইল। কাঁদাড়ে গভীর জল হইল। মন্দিরের পশ্চিমে কাঁদাড়ের উৎপত্তি। প্রবল স্রোত এই স্থানে আরম্ভ হইয়া মন্দিরকে বেষ্টন করিয়া, পূর্বদিকে পুনরায় গিয়া নদীতে মিলিত হইল। কাঁদাড় হইতে রায়মহাশয়ের বাগান

পর্যন্ত যে নিম্নভূমি আছে, তাহাও এখন জলে পূর্ণ হইল। সুবালা নিদ্রিতা, কিছুই জানেন না।

উচ্চ উচ্চ বৃক্ষ আপন আপন মস্তক হইতে সুবর্ণবর্ণ ঝাড়িয়া ফেলিল। পশ্চিমে রজতবর্ণে মেঘরাশি এখন সিন্দুরবর্ণ ধারণ করিল। তাহার ভিতর লুক্কায়িত থাকিয়া সূর্যদেব আকাশের নিম্নদেশে গমন করিলেন। তথাপি সুবালার নিদ্রাভঙ্গ হইল না।—সন্ধ্যা হইল। দলে দলে কাক, বক প্রভৃতি পক্ষিগণ কেহ বা নিঃশব্দে, কেহ বা শব্দ সহকারে আপন আপন বাসস্থানে গমন করিতে লাগিল। তথাপি সুবালার নিদ্রাভঙ্গ হইল না।

অল্প অল্প অন্ধকার হইল। আকাশে দুই একটি নক্ষত্র দেখা দিল। তাহাদের প্রতিবিম্ব বারবার আলোড়িত নদীজলের ভিতর চিক্‌মিক্ করিতে লাগিল। গাছের শাখা-প্রশাখার অভ্যন্তর নিবিড় হইতে নিবিড়তর দেখাইতে লাগিল। তথাপি নিদ্রাভঙ্গ হইল না।

যেস্থানে সুবালা নিদ্রা যাইতেছিলেন, এই সময় সে স্থানে কে একজন আসিয়া রকের নিম্নে দাঁড়াইয়া উঁকি মারিতে লাগিল। তাহার দুই হাতে দুটি বোতল ছিল। সুবালাকে মন্দিরে একাকিনী দেখিয়া সে বিস্ময়াপন্ন হইল। সেই নির্জন স্থানে সুবালাকে নিদ্রিতা দেখিয়া সে আরও বিস্মিত হইল। বোতল হাতে করিয়া রকের উপর মাথা বাড়াইয়া বারবার সে উঁকি মারিতে লাগিল। তাহার পর সে স্থান হইতে সে প্রস্থান করিল। অল্পক্ষণ পরে খালি হাতে সে প্রত্যাগমন কবিল। মন্দিরের সম্মুখে একটি আম গাছ ছিল। তাহার উপর উঠিয়া শাখা পল্লবের ভিতর লুক্কায়িত থাকিয়া একদৃষ্টিতে সুবালাকে দেখিতে লাগিল। তখনও সুবালার নিদ্রাভঙ্গ হইল না। যে উঁকি মারিল, সে লোকটি কে?

পঞ্চম অধ্যায় – গুরুঠাকুরের বীরত্ব

এখানে রায়মহাশয়ের বাটীতে সোনা-বৌ মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া আছেন। পিসীমা ও বড়ালগৃহিণী তাঁহার সেবা-শুশ্রুষা করিতেছেন। তাঁহার নাসিকাপথে ঘড়্ ঘড়্ শব্দে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পাদিত হইতেছে। মাঝে মাঝে তাঁহার সর্বশরীর কম্পিত হইতেছে। মাঝে মাঝে তাঁহার দাঁতকপাটি লাগিতেছে। বিজয়বাবু, বড়ালমহাশয় ও অন্যান্য লোক তাঁহাকে সচেতন করিবার নিমিত্ত নানা উপায় অবলম্বন করিতেছেন। কিছুতেই তাঁহার জ্ঞান হইতেছে না। চক্ষু বুজিয়া তিনি পড়িয়া আছেন।

সন্ধ্যার পর ডাক্তার আসিলেন। রোগিণীকে দেখিয়াই তিনি বলিলেন যে, শীঘ্রই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন। তথাপি তিনি ঔষধাদির ব্যবস্থা করিলেন। তিনি যেরূপ উপদেশ প্রদান করিলেন, সকলে সেইরূপ কাজ করিতে লাগিলেন।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। রাত্রি হইল। রোগিণীর জ্ঞান হইল না, একবারও তিনি চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন না। মাঝে মাঝে কেবল দুই একটি কথা বিড়্ বিড়্ করিয়া তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইতে লাগিল। সে কথা কি, ভালরূপ কেহ তাহা বুঝিতে পারিল না। কেবল 'রাজাবাবু' এই কথাটি সকলে বুঝিতে পারিল।

রাত্রি প্রায় দুই ঘণ্টা হইল। সোনা-বৌয়ের আর একবার দাঁতকপাটি লাগিল। সে

দাঁতকপাটি আর কেহ ভাঙ্গিতে পারিল না। ঘন ঘন শরীর কম্পিত হইতেছিল। সে কম্পন ক্রমে হ্রাস হইতে লাগিল। অবশেষে তাঁহার শরীর স্থির হইল। ঘড় ঘড় শব্দে সবলে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস প্রবাহিত হইতেছিল। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ক্রমে কমিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। নাভি, বক্ষঃস্থল ও কণ্ঠ সঞ্চালিত হইতেছিল। ক্রমে নীরব ও স্থির হইল। সোনা-বৌয়ের প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল।

আজ সোনা-বৌ শান্তি পাইলেন। তাঁহার তাপিত হৃদয় আজ শীতল হইল। যাঁহার সুখ ঐশ্বর্য দেখিয়া লোকে হিংসা করিত, যিনি এই গ্রামের রাজরাজেশ্বরী ছিলেন, হায়! আজ অনাথিনী পাগলিনী হইয়া তিনি এই বাটীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার মর্মভেদিনী খেদোক্তি শুনিয়া আজ সকলের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছিল। পাপের পরিণাম এইরূপ হয়। মনে যাহা চিন্তা করি, মুখে যাহা প্রকাশ করি, হাতে যে কাজ করি—'মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্‌ভ্যামুদরেণ'—সে সমুদয় ব্যোমে অঙ্কিত হইয়া থাকে। কিছুই বৃথা হয় না! যথাকালে সেই সমুদয় কর্ম, সুখ ও দুঃখ উৎপাদন করে। যেমন এক একটি মানুষের, সেইরূপ এক একটি সম্প্রদায়ের, এক একটি জাতির উন্নতি ও অবনতির কারণ তাহারা হয়। হে বাঙ্গালী! একবার তোমার দুর্দশার কারণ ভাবিয়া দেখ। তোমার দুর্গতির জন্য অন্যের প্রতি দোষারোপ করিও না। একবার নিজের প্রতি চাহিয়া দেখ। মনে করিও না যে, আধুনিক কর্মদোষে তোমাদের এই দুর্দশা ঘটিয়াছে। শত শত বৎসরের সঞ্চিত পাপে আর্যসমাজ গলিত পচিত হইয়াছিল; তবে জনকয়েক বিদেশী আসিয়া তোমাদের দেবমন্দির সকল চূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তোমাদের শিলাময়ী দেবপ্রতিমা সকলকে ভাঙ্গিয়া আরোহণের সোপানে পরিণত করিয়াছিল। আজ নূতন নহে, নয় শত বৎসর পূর্বে ভারতের গৌরব-রবি অস্তাচলের তিমিরে ডুবিয়া গিয়াছে। হায় হায়! সেই অন্ধকারে এখনও ডুবিয়া আছে, আর উদয় হয় নাই। তাই হে বাঙ্গালী! তোমাকে মিনতি করিয়া বলি,—কখন সত্যপথ হইতে বিচলিত হইও না। কর্তব্যসাধনে কখন অবহেলা করিও না। বালক-বালিকাগণ! তোমরা যখন বড় হইবে, তখন জগতে যেন এই যশ ঘোষিত হয় যে—বাঙ্গালী মিথ্যাকথা বলিতে জানে না।

সোনা-বৌকে লইয়া সকলে এতক্ষণ ব্যস্ত ছিলেন। অন্যদিকে এতক্ষণ কাহারও মন ছিল না। সোনা-বৌ যখন ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন, তাঁহার সম্বন্ধে যখন সকল গোল মিটিয়া গেল, তখন পিসীমা এ-দিক ও-দিক চাহিয়া ত্রস্ত হইয়া জিজ্ঞাস করিলেন,—'সুবালাকে অনেকক্ষণ দেখি নাই! সুবালা কোথায়?'

সকলে তখন বলিল,—'তাই তো। সুবালা দিদিকে আমরা অনেকক্ষণ দেখি নাই!'

বারেণ্ডায় দাঁড়াইয়া পিসীমা দেখিলেন যে, সুবালার ঘরে আলো নাই। সেই স্থানে গিয়া দেখিলেন যে, সুবালা সেই স্থানে নাই। দোতালার যতগুলি ঘর ছিল, তাহার কোনস্থানে সুবালা নাই। ছাদে নাই, নীচের কোন ঘরে নাই, সদরবাটীতে নাই। তন্নতন্ন করিয়া সমস্ত বাটীতে সকলে অন্বেষণ করিল। বাটীতে সুবালা নাই।

পিসীমা কাঁদিতে বসিলেন। বড়ালনী কাঁদিতে লাগিলেন। দাসীগণ কাঁদিতে লাগিল।

আলো জ্বালিয়া সমস্ত বাগান সকলে অন্বেষণ করিল। তাহার পর সমস্ত গ্রামের বাড়ী বাড়ী লোকে খুঁজিয়া দেখিল। সুবালার কোন সন্ধান হইল না। একজন স্ত্রীলোক বলিল যে, সন্ধ্যার পূর্বে সুবালাকে সে শিব-মন্দিরের দিকে যাইতে দেখিয়াছিল। তৎক্ষণাৎ কয়েকজন লোক নৌকা ও ডোঙ্গা করিয়া সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইল। শিবমন্দির ও চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূমি তাহার তন্নতন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিল। সুবালার চিহ্নমাত্র তাহারা সে স্থানে দেখিতে পাইল না।

গ্রামে হাহাকার পড়িয়া গেল। গ্রামের আবাল বৃদ্ধবনিতা সকলে সুবালার অন্বেষণে বাহির হইল। সন্ধ্যার পূর্বে সহসা প্রবল বান আসিয়াছিল। গ্রামের ভিতর সমুদয় নিম্নভূমি জলে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। অনেক লোকের বাড়ী যেন এক একটি দ্বীপের ন্যায় হইয়াছিল। গ্রামের চতুর্দিকের মাঠ বন্যার জলে প্লাবিত হইয়াছিল, কোন কোন স্থান দিয়া প্রবলবেগে স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল।

যখন সমস্ত বাটী, সমস্ত বাগান ও সমস্ত গ্রাম অনুসন্ধান করিয়া সুবালার কোন সন্ধান হইল না, তখন বিজয়বাবু, বড়ালমহাশয় ও বিনয়ের ঘোরতর দুর্ভাবনা হইল। তাঁহারা ভাবিলেন যে, চপলার ন্যায় সুবালার কোন বিপদ ঘটিয়াছে। নদীতে সহসা বন্যা আসিয়াছে, কোন গভীর স্থানে পড়িয়া সুবালা জলমগ্ন হইয়াছে।

হু হু শব্দ করিতে করিতে খাঁদা ভূত যখন রায়মহাশয়ের বাটী হইতে বাহির হয় এবং বাগানের উপর দিয়া দ্রুতবেগে মাঠের দিকে যখন সে চলিয়া যায়, তখন গ্রামের কয়েকজন লোক তাহাকে দেখিয়াছিল। রুদ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়া গ্রামে গিয়া তাহার সংবাদ দিল। গ্রামে হুলস্থূল পড়িয়া গেল যে--খাঁদা ভূত পুনরায় আসিয়াছে!

তাহার পর যখন সুবালাকে কেহ খুঁজিয়া পাইল না, তখন গ্রামের লোকের বুঝিতে আর বাকী রহিল না। সকলেই ঘাড় নাড়িয়া বলিল যে, 'খাঁদা ভূত যেরূপ চপলাকে খাইয়াছিল, সুবালা দিদিকেও সেইরূপ খাইয়াছে।' কিন্তু এবার সকলের ঘোরতর রাগ হইল। সকলে বলিল,—'আর আমাদের নিস্তার নাই। আজ খাঁদা ভূত সুবালা দিদিকে খাইল, কাল আমাদের বালক-বালিকাদিগকে খাইবে। সুবালা দিদি আমাদের লক্ষ্মী। তাঁহার জন্য আমরা প্রাণ বিসর্জন করিব। যখন সুবালা দিদিকে সে খাইল, তখন আমাদিগকেও সে ভক্ষণ করুক। খাঁদা ভূতের অনুসন্ধানে আমরা বাহির হইব। যদি তাহাকে দেখিতে পাই, তাহা হইলে দেখিব সে কেমন ভূত!'

বিজয়বাবু, বড়ালমহাশয় ও বিনয় পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, সমুদয় গ্রাম, গ্রামের চারিদিকে নদী, নালা, মাঠ, জলা সকল স্থান তন্ন তন্ন করিয়া সেই রাত্রে অনুসন্ধান করিতে হইবে। তৎক্ষণাৎ শত শত মশাল প্রস্তুত হইতে লাগিল। পুরাতন কাপড়, নূতন কাপড়, যাহা সম্মুখে পাইলেন, পিসীমা তাহা বাহির করিয়া দিলেন। সেই সমুদয় কাপড় ছিঁড়িয়া মশাল প্রস্তুত হইল। বাড়ীতে যত তৈল ছিল পিসীমা তাহা বাহির করিয়া

দিলেন। তাহার পর গ্রামে যাহার বাড়ীতে যতটুকু তৈল ছিল, আপন ঘর হইতে লোকে তাহা বাহির করিয়া দিল। সে রাত্রিতে গ্রামে একফোঁটা তৈল রহিল না। গ্রামে যতগুলি নৌকা ও ডোঙা ছিল, তাহাতে বসিয়া চারিদিকে লোক ধাবিত হইল। অবশেষে গ্রামে যত কলাগাছ ছিল, সে সমুদয় কাটিয়া লোকে ভেলা প্রস্তুত করিল। যাহাদের কদলীবৃক্ষ, তাহারা অণুমাত্র আপত্তি করিল না, বরং আহ্লাদ সহকারে আপন আপন কলাগাছ সকলে দেখাইয়া দিতে লাগিল। নৌকায়, ডোঙায়ও কলার ভেলায় বসিয়া জলপথে লোক চারিদিকে সুবালার অন্বেষণে দৌড়িল। কে কোন দিকে যাইবে, বড়ালমহাশয় তাহা স্থির করিয়া দিলেন। নৌকা-ডোঙা অথবা ভেলায় যাহাদের স্থান হইল না, তাহারা পদব্রজে উচ্চ ভূমিসমূহে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম সকল দিকে শত শত লোক প্রেরিত হইল। চারি পাঁচ জন লোকের সহিত বিনয় একখানি নৌকাতে করিয়া শিবমন্দিরের দিকে গমন করিলেন। আর একখানি নৌকাতে কতোগুলি লোকের সহিত বড়ালমহাশয় গ্রামের দক্ষিণ দিকের মাঠে গমন করিলেন। বিজয়বাবু বিদেশী লোক। তিনি পথঘাট জানেন না স্ত্রীলোকদিগের রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত বড়ালমহাশয় তাঁহাকে বাটীতে রাখিয়া গেলেন।

গ্রামে একজন গুরুঠাকুর আসিয়াছিলেন। খাঁদা ভূতের দৌরাত্ম্যের কথা শুনিয়া ক্রোধানলে তাঁহার সর্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। ব্রাহ্মণপণ্ডিত হইলে কি হয়, তিনি একালের গুরুঠাকুর!—সভ্যভব্য নব্য বীরপুরুষ। সে কালের শাস্ত্রে নূতন বিজ্ঞানশাস্ত্র জোড়া দিয়া তিনি গুরুগিরি করেন। টিকিশূন্য মস্তক হইতে কিরূপে তড়িৎ-শক্তি বাহির হইয়া যায়, তাহা তিনি বিলক্ষণ অবগত আছেন। গ্রামের লোককে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—কুপো আছে।'

সকলে জিজ্ঞাসা করিল,—'কুপো কেন?' —আরক্তনয়নে নব্য গুরুঠাকুর উত্তর করিলেন,—'কুপো কেন? আমি নৃসিংহমন্ত্র জানি। নৃসিংহ কে তা জান?

'চত্বারো বাসুদেবাদ্যা নারায়ণনৃসিংহকৌ।
হয়গ্রীবো বরাহশ্চ ব্রহ্মা চেতি নবোদিতাঃ।।'

নৃসিংহমন্ত্রবলে খাঁদা ভূতকে ধরিয়া কুপোতে বন্ধ করিয়া আনিব। তখন তোমরা আমার ছি বিক্রম দেখিবে—আমি জাগ্রত গুরু। গুরুকে মানুষ জ্ঞান করিতে নাই কেন, তখন তোমরা াবুঝিবে।' —গ্রামে কুপো ছিল না। কাজেই একটি বোতল লইতে হইল। খাঁদা ভূতকে ধরিয়া সেই বোতলে বন্ধ করিয়া তিনি আনিবেন। গুরুঠাকুর বলিলেন,—

'নৃসিংহের মন্ত্র পড়ি মারিব জল ঝাঁটি।
হুহুঙ্কার শব্দে মোর ব্রহ্মাণ্ড যাবে ফাটি।।'

খাঁদা ভূতের উপর তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে করিতে গুরুঠাকুর বড়ালমহাশয়ের নৌকায় গিয়া উঠিলেন।

বিনয় ও তাঁহার সঙ্গিগণ প্রথমে শিবমন্দিরের দিকে গমন করিলেন। নৌকা হইতে

নামিয়া তাঁহারা শিবমন্দির ও তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূমি পুনরায় অতি সাবধানে অনুসন্ধান করিলেন। সুবালাকে তাঁহারা সে স্থানে দেখিতে পাইলেন না।

পুনরায় নৌকাতে উঠিয়া মন্দিরের পূর্বদিকের নালা দিয়া তাঁহারা নদীতে গিয়া পড়িলেন। প্রবল স্রোতে নৌকা অনেক দূর ভাসিয়া গেল। তাহার দক্ষিণ দিকে আর একটি কাঁদাড় বা নালা দেখিতে পাইলেন। ইহাতেও এক্ষণে প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল। নদী পরিত্যাগ করিয়া বিনয়ের নৌকা এই নালাব ভিতর প্রবেশ করিল। রায়মহাশয়ের গ্রামের পূর্বদিকে নিম্নভূমির এক বিস্তৃত মাঠ আছে। নালা দিয়া বিনয়ের নৌকা এই মাঠে আসিয়া উপস্থিত হইল। মাঠ এক্ষণে গভীর জলে প্লাবিত হইয়াছে। নদী হইতে স্রোত বাহির হইয়া ইহার ভিতর দিয়া প্রবল বেগে চলিতেছে। সমুদয় মাঠ এক্ষণে বৃহৎ একটা বিল বা জলার ন্যায় হইয়াছে। জলপ্লাবিত প্রান্তর বেষ্টন করিয়া সুবালার অন্বেষণ করিতে করিতে, গ্রামের দক্ষিণদিকে নৌকা লইয়া যাইবেন, বিনয় এইরূপ মানস করিলেন। জলার ভিতর কিছুদূরে অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময় বামদিকে, অনেকটা দূবে সহসা অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। সেই আগুনের আলোক অনেকদূর পর্যন্ত আলোকিত হইল। সেই সঙ্গে খাঁদা ভূতের ভয়াবহ হুহুঙ্কাব শব্দ সকলের কর্ণকুহরে প্রবেশ কবিল। যে স্থানে সহসা অগ্নি প্রজ্বলিত হইল, সেই স্থান হইতে ভূতের হুহুঙ্কার শব্দ উত্থিত হইল।'

এদিকে বড়ালমহাশয়ের নৌকা প্রথম গ্রামের দক্ষিণ দিকে গমন করিল। সে মাঠও এক্ষণে জলপ্লাবিত হইয়াছিল। গ্রামের দক্ষিণ দিক ঘুরিয়া ক্রমে তাঁহার নৌকা পূর্বদিকে আসিয়া উপস্থিত হইল। জলমগ্ন প্রান্তরের উত্তর সীমায় বিনয়ের নৌকা ও দক্ষিণ সীমায় বড়াল মহাশয়ের নৌকা প্রায় এককালে আসিয়া উপস্থিত হইল। বড়ালমহাশয়ের নৌকা উত্তরদিগভিমুখে কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময় সেই অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। অল্পক্ষণ পরেই খাঁদা ভূতের ভয়ানক হুহুঙ্কার শব্দ জলপ্লাবিত প্রান্তরে প্রতিধ্বনিত হইল।

হু হু, হু হু, হু হু হু। —দূরে চারিদিকে উচ্চভূমিসমূহে শৃগালগণ ডাকিয়া উঠিল—হ্যাঁকা হুয়া, হ্যাঁকা হুয়া, হ্যাঁকা হুয়া হু। বৃক্ষসকল হইতে পক্ষিগণ উঠিয়া কলরব করিতে লাগিল। দূরে গ্রামের কুক্কুরগণ উর্দ্ধমুখ হইয়া ক্রন্দন কবিতে লাগিল। রাত্রিকালে চারিদিকে ভয়ানক কোলাহল পড়িয়া গেল।

জনশূন্য জলমগ্ন প্রান্তর মাঝে সহসা দাউদাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল, তাহার পরক্ষণেই খাঁদা ভূতের হুহুঙ্কার রবে চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত হইল। এরূপ অবস্থায় কাহার হৃদয় না আতঙ্কে কম্পিত হয়? জলার একপ্রান্তে বিনয়ের নৌকা ও অপর প্রান্তে বড়ালমহাশয়ের নৌকায় যে সমুদয় গ্রামবাসী ছিল, তাহারা ঘোর ভয়ে ভীত হইল ও নৌকা ফিরাইয়া পলায়ন করিতে চেষ্টা করিল। একদিকে বিনয় ও অপরদিকে বড়ালমহাশয় তাহাদিগকে বুঝাইতে লাগিল যে, খাঁদা ভূত প্রকৃত ভূত নহে, সে জীবিত মানুষ। পূর্বে গ্রামে যে কালা বাবা ছিল, এ সেই লোক। বিনয়ের প্রবোধবাক্যে সে নৌকার লোকেরা কথঞ্চিৎ সুস্থির হইল। বড়ালমহাশয়ের সঙ্গিগণও সুস্থির হইত কিন্তু এই সময় গুরুঠাকুরের ভয়

দেখিয়া তাহারা হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল।

গুরুঠাকুরের সর্বশরীর থর থর কাঁপিতে লাগিল। ভয়ে দাঁতে দাঁতে ঘর্ষিত হইয়া কিড়্ মিড়্ শব্দ হইতে লাগিল। জ্ঞানহীন বাতুলের ন্যায় তিনি নানারূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন ও নৌকা ফিরাইবার জন্য সকলের পায়ে-হাতে পড়িতে লাগিলেন।

গুরুঠাকুর বলিলেন,—'নৌকা ফিরাও! নৌকা ফিরাও! সর্বনাশ হইল। কেন মরিতে আস্ফালন করিয়াছিলাম? ভূতে সব জানিতে পারে। আমি তাহাকে ধরিব বলিয়াছিলাম। আমার উপর তাহার আড়ি হইয়াছে। আমাকে সে এখনি খাইয়া ফেলিবে। হায় হায় দু'পয়সা পাইব বলিয়া এ গ্রামে আসিয়াছিলাম। তাহা না হইয়া প্রাণটি হারাইলাম। নৌকা ফিরাও! নৌকা ফিরাও! ক চ ট ত প। জ ড় দ গ ব। হ ব ঠ।'

বড়ালমহাশয় তাঁহাকে অনেক বুঝাইতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি বাতুলের ন্যায় হইয়াছিলেন সেই সমুদয় প্রবোধবাক্য তিনি শ্রবণ করিলেন না। আপনার মনে চীৎকার করিয়া তিনি নানারূপ খেদ করিতে লাগিলেন।

গুরুঠাকুর বলিলেন,—'ওগো তোমরা ওদিকে আর যাইও না। ওদিকে আর যাইও না। ভোমর! ভোমর! তোমার কপালে কি এই ছিল? ভোমর!—ওগো ভোমর আমার ব্রাহ্মণীর নাম—তোমাকে নীলাম্বরী শাড়ী দিব বলিয়াছিলাম। আমি ভূতের পেটে যাইলাম, কে তোমাকে আর নীলাম্বরী শাড়ী দিবে? নিতু! নিতু!—ওগো নিতু আমার ছেলের নাম—কে তোমাকে এখন বিলাতী বিস্কুট কিনিয়া দিবে? মুড়ি তোমার মুখে ভালো লাগে না। সকাল বেলা এখন কি খাইবে? ফুলদার বিলাতী বিস্কুট না হইলে তোমার চলে না, আমি নিজে এখন ভূতে বিলাতী বিস্কুট হইলাম। প্রথম সে আমার ঘাড়ের রক্ত চুষিয়া খাইবে। তাহার পর আমাকে সে পাতকোর ভিতর লইয়া যাইবে। সেই স্থানে বসিয়া প্রথম আমার মাংস খাইবে। তাহার পর বিলাতী বিস্কুটের মত কুড়্ কুড়্ করিয়া আমার হাড়গুলি খাইবে। নৌকা ফিরাও। নৌকা ফিরাও। ক চ ট ত প। জ ড় দ গ ব। হ ব ঠ।

বড়ালমহাশয় কিছু রাগিয়া বলিলেন,—'আমি বার বার আপনাকে বলিতেছি যে, ঐ হুহুঙ্কার শব্দ ভূতের নহে। একজন জীবিত ক্ষিপ্ত সন্ন্যাসী ঐরূপ শব্দ করিতেছে। আর যদি ভূতও হয়, তাহা হইলেই বা আপনার ভয় কি? আপনি নৃসিংহমন্ত্র জানেন। ভূতকে ধরিয়া বন্ধ করিবেন বলিয়া সঙ্গে বোতল আনিয়াছেন।'

গুরুঠাকুর উত্তর করিলেন,—'ও গো না! ও সামান্য ভূত নয়। ও ব্রহ্ম-রাক্ষস। প্রবিলতীক্ষ্ণ দন্তপঙক্তিরুন্নতনাশাবংশঃ প্রকটরক্তাক্তনয়ন উপচিতস্নায়ুসন্ততির্ণতগাত্রঃ শুষ্ককপোলঃ সুহুতহুতবহপিঙ্গলশ্মশ্রুকেশঃ—এই সমুদয় ব্রহ্ম রাক্ষসের লক্ষণ শাস্ত্রে আমি পড়িয়াছি। নৌকা ফিরাও! নৌকা ফিরাও! ক চ ট ত প। জ ড় দ গ ব। হ ব ঠ।'

শেষের কথাগুলি গুরুঠাকুর বিড়্ বিড়্ করিয়া উচ্চারণ করিলেন। তাঁহাকে সাহস দিবার জন্য বড়ালমহাশয় পুনরায় বলিলেন,—'এই আমি নৌকার অগ্রভাগে গিয়া দাঁড়াইলাম। ভূত প্রথমে আমাকে খাইবে, আপনাকে খাইবে না।'

এমন সময় খাঁদা ভূতের হুহুঙ্কারে পুনরায় সেই প্রান্তর কম্পিত হইল। হু হু, হু হু, হুহুহু। উক্ত ভূমিসমূহে পুনরায় শৃগালগণ ডাকিয়া উঠিল—হ্যাঁক্কা হুয়া, হ্যাঁক্কা হুয়া, হ্যাঁক্কা হুয়া হু।

পক্ষিগণ কলরব করিল। কুকুরগণ উর্দ্ধমুখে কাঁদিতে লাগিল।

গুরুঠাকুর বলিলেন,—'ঐ শুনো গো, ঐ শুন! ও সামান্য ভূতের ডাক নয়, ও ব্রহ্ম রাক্ষসের ডাক। ব্রহ্ম-রাক্ষস তোমার শুষ্ক দড়ি-দড়ি মাংস ভক্ষণ করিবে না। ছিবড়ে হইবে গো, ছিবড়ে হইবে। বড়ালমহাশয়! তুমি তোমার নিজের শরীর পানে চাহিয়া দেখ। তোমার ও শুঁটকো শরীরের চিমড়ে মাংস খাইবে না। আমি শিষ্যবাড়ী গিয়া দুধ-ঘি খাই। আমার নধর শরীরের নরম মাংস ফেলিয়া তোমার ওই শুঁটকো মাংস সে খাইবে না। ওগো! ব্রহ্ম-রাক্ষস অতি ভয়ানক বস্তু। ছোট হরিদাস ব্রহ্ম-রাক্ষস হইয়াছে—এইরূপ মনে করিয়া জগন্নাথে থাকিতে মহাপ্রভুর সঙ্গিগণও ভয়ে জড়সড় হইয়াছিল।

একদিন জগদানন্দ স্বরূপ গোবিন্দ।
কাশীশ্বর শঙ্কর দামোদব মুকুন্দ।।
সমুদ্র স্নানে গেলা সবে তবে কতোদূরে।
হরিদাস গায়েন যেন ডাকি কণ্ঠস্বরে।।
মনুষ্য না দেখি মধুর গীত মাত্র শুনে।
গোবিন্দাদি মিলি সবে কৈল অনুমানে।।
বিষ খাএ্যা হরিদাস আত্মহতি কৈল।
সেই পাপে জানি ব্রহ্ম-রাক্ষস হইল।'

উচ্চৈঃস্বরে গুরুঠাকুর এই কথা বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

জলশূন্য গভীর জলে নিমগ্ন প্রান্তর মাঝে খাঁদা ভূত কোথা হইতে আসিল?

সুবালা শিবমন্দিরে নাই! সুবালা তবে কোথায়? সন্ধ্যার সময় শিবমন্দিরে কে উঁকি ঝুঁকি মারিয়াছিল? আমগাছে উঠিয়া শাখাপল্লবের ভিতর লুক্কায়িত থাকিয়া একদৃষ্টিতে নিদ্রিতা সুবালার দিকে কে চাহিয়াছিল?

সে এখন কোথায়? সুবালা এখন কোথায়?

ষষ্ঠ অধ্যায় — জলমগ্ন প্রান্তর

সন্ধ্যার সময় যে উঁকিঝুঁকি মারিয়াছিল, তাহার পর আমগাছে উঠিয়া যে সুবালাকে দেখিতেছিল, সে ধনুর্ধারী; অন্য কেহ নহে। সুবালার ইচ্ছায় বড়ালমহাশয় ধনুকধারীকে কার্য্যোপলক্ষে অন্য গ্রামে প্রেরণ করিয়াছিলেন। আজ সে বাটী প্রত্যাগমন করিতেছিল; বর্ষাকালে বন্যা আসিলে, এ অঞ্চলের লোক এ গ্রাম হইতে সে গ্রাম, অনেক স্থানে এমন কি, এ বাড়ী হইতে সে গ্রাম, অনেক স্থানে এমন কি, বাড়ী হইতে সে বাড়ী নৌকার সহায়তা ভিন্ন গমনাগমন করিতে পারে না। সেজন্য অনেকের বাড়ীতে নৌকা অথবা তালগাছের ডোঙা থাকে এবং সকলেই প্রায় নৌকা পরিচালিত করিতে পারে। সন্ধ্যার পূর্বে

বান আসিল। কোন লোকের নিকট হইতে ধনুকধারী একখানি নৌকা চাহিয়া লইল। যে গ্রামে সে গিয়াছিল, তাহা নদীর উত্তরদিকে ছিল। ধনুকধারী নিজেই নৌকা পরিচালিত করিয়া স্বগ্রাম অভিমুখে আসিতে লাগিল। স্রোতের প্রবলবেগে ভাসিয়া শীঘ্রই সে শিবমন্দিরের নিকট উপস্থিত হইল।

দুই বোতল মদ ধনুকধারী সঙ্গে আনিয়াছিল। মদের বোতল সে বাড়ী লইয়া যাইত না। শিবমন্দিরের ভিতর প্রাচীর-গাত্রে একটি গর্ত ছিল। প্রাচীন ভগ্ন মন্দিরের গহ্বর আপনি হইয়া থাকুক, অথবা ইঁদুরে করিয়া থাকুক, অথবা খাঁদা ভূত করিয়া থাকুক, ধনুকধারী সেই গর্তের সন্ধান পাইয়া তাহার ভিতর মদের বোতল লুক্কায়িত রাখিত। আবশ্যক হইলে বাহির করিয়া সে সুরাপান করিত।

নৌকা লইয়া ধনুকধারী শিবমন্দিরের পশ্চিমে কাঁদাড়ের ভিতর প্রবেশ করিয়া কাঁদাড়ের কিনারায় নৌকা রাখিয়া, মদ দুই বোতল হাতে লইয়া, যথারীতি মন্দিরের ভিতর লুকাইয়া রাখিবার নিমিত্ত সে ভূমির উপর উঠিল। রকের নিম্নে আসিয়া,—আশ্চর্য্য। সে দেখিল, সুবালা অঘোরে নিদ্রা যাইতেছেন। দুই চারি বার উঁকিঝুঁকি মারিয়া নৌকার নিকট সে ফিরিয়া গেল। মদ দুই বোতল নৌকার ভিতর রাখিয়া, মন্দিরের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া সে আমগাছের উপর উঠিল। গাছে বসিয়া সে সুবালাকে দেখিতে লাগিল।

রাত্রি হইল। চারিদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। চমকিত হইয়া সুবালার নিদ্রাভঙ্গ হইল। 'আমি কোথায়?'—প্রথম সেই চিন্তা সুবালার মনে উদয় হইল। নানা বৃক্ষে পরিবেষ্টিত ভগ্ন মন্দির দেখিয়া সুবালার স্মরণ হইল। একাকিনী সেই নির্জন স্থানে,—সুবালার বড় ভয় হইল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া গৃহাভিমুখে তিনি গমন করিতে লাগিলেন। 'রাত্রি হইয়া গিয়াছে, তথাপি আমাকে কেহ খুঁজিতে আসে নাই কেন!'—তাহা ভাবিয়া সুবালা আশ্চর্য্যান্বিতা হইলেন।

কাঁদাড়ের ধারে গিয়া তিনি পৌঁছিলেন। সর্বনাশ। বান আসিয়াছে। কাঁদাড়ে গভীর জল হইয়াছে। তাহার ওদিকে বাগান পর্যন্ত নিম্নভূমি জলে পূর্ণ হইয়াছে। তিনি যেদিকে চাহিলেন, সেই দিকেই দেখিলেন,—জল, জল, দূর পর্যন্ত ধূ ধূ করিতেছে। নিকটে কোন লোকের বাড়ী ছিল না। দূরে বাগানের এই প্রান্তে ত্রিলোচন ও শঙ্করা মালীর ঘর ছিল। যথাসাধ্য উচ্চৈঃস্বরে সুবালা ডাকিলেন,—'ত্রিলোচন! ত্রিলোচন! শঙ্করা—শঙ্করা!'

সুবালার উচ্চৈঃস্বরে—কেবল নামে উচ্চ, কাজে অতি মৃদু শব্দ। সে শব্দ অধিক দূর গেল না। কোন উত্তর তিনি পাইলেন না। হতাশ হইয়া সেই স্থানে তিনি বসিয়া পড়িলেন। তাহার পর ভাবিলেন,—'শীঘ্রই আমার অন্বেষণে লোক বাহির হইবে। আর অধিকক্ষণ এ স্থানে আমাকে বসিয়া থাকিতে হইবে না।

সেই মুহূর্তে তাঁহার দক্ষিণ দিকে তিনি নৌকার শব্দ পাইলেন। সুবালা ডাকিয়া বলিলেন,—'কে গা! নৌকা লইয়া যাও? আমি সুবালা! আমাকে বাড়ী লইয়া চল।'

নৌকা নিকটে আসিয়া কিনারায় লাগিল। নৌকার লোক লাফ দিয়া ভূমির উপর

পড়িল। সুবালা তখন তাহাকে চিনিতে পারিলেন। তিনি বলিলেন,—'কে ও, ধনুকধারী?'

এই কথা বলিয়াই সুবালা ভাবিতে লাগিলেন,—'ইহাব সহিত যাওয়া উচিত কি না।'

পুনরায় তিনি ভাবিলেন,—'সেদিন শেষকালে এ লজ্জিত হইয়া আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিল। পুনরায় আমাকে কি ও অযথা কথা বলিতে সাহস করিবে?

তিনি আবার ভাবিলেন,—'এ নির্জ্জন স্থানে ইহার সহিত একাকী থাকা অপেক্ষা বাড়ীর দিকে যাওয়াই ভাল।'

এইরূপ চিন্তা করিয়া সুবালা বলিলেন,—'ধনুকধারী! আমাকে বাড়ী লইয়া চল।'

ধনুকধারী কোন উত্তর করিল না। সুবালা নৌকার অগ্রভাগে গিয়া বসিলেন। ধনুকধারী অপরদিকে বসিয়া নৌকা পরিচালিত করিল।

অল্পক্ষণের নিমিত্ত সুবালার মস্তক অবনত করিয়া অনমনস্কভাবে বসিয়াছিলেন। এখন একবার মুখ তুলিয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। চমকিত হইয়া তিনি বলিলেন,—ধনুকধারী! নদীর মাঝখানে তুমি নৌকা আনিলে কেন?'

ধনুকধারী উত্তর করিল,—'স্রোতে ভাসাইয়া আনিল আমি কি করিব!'

সুবালা বলিলেন,—'নৌকা ফিরাও, এখনি নৌকা ফিরাও। যে স্থানে হয় কিনারায় আমাকে নামাইয়া দাও। যেমন করিয়া পারি সে স্থান হইতে আমি বাড়ী যাইব।'

ধনুকধারী বলিল,—'বাগানের ও ধারে নৌকা লাগাইব।' সুবালা বলিলেন,—'না, তাহা হইবে না। কিনারার দিকে তুমি নৌকা লইয়া যাও। আমি নামিয়া যাইব।'

ধনুকধারী কোন উত্তর করিল না। নৌকা ফিরাইল না। কিনারার দিকে সে লইয়া গেল না। সুবালা একবার মনে করিলেন যে, 'ঝাঁপ দিয়া পড়ি।' কিন্তু নৌকা এখন কোথায় আসিয়াছিল এবং কিনারা কতদূর, অন্ধকারে তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না।

সুবালা বলিলেন,—'আজ তুমি পুনরায় মদ খাইয়াছ?'

ধনুকধারী উত্তর করিল,—'হাঁ খাইয়াছি। আবার এই দেখ, খাই।'

এই কথা বলিয়া নৌকার ভিতর হইতে সে বোতল বাহির করিল ও ছিপি খুলিয়া কতক মদ হড়-হড় করিযা আপনার মুখে ঢালিয়া দিল।-সুবালা পুনরায বলিলেন,—'নৌকা শীঘ্র কিনারার দিকে লইয়া চল, না লইয়া গেলে চীৎকার করিয়া আমি লোক ডাকিব।'

ধনুকধারী বলিল,—'লোক ডাকিবে? বটে! তবে এখনই আমি নৌকা ডুবাইয়া দিব।'

এই বলিয়া নৌকার একধারে সে এক পা ও অন্যধারে অপর পা রাখিয়া দোল দিতে লাগিল। নৌকার এধার—পুনরায় সে ধার অবনত হইয়া জলমগ্ন-প্রায় হইতে লাগিল। দোল দিতে দিতে ধনুকধারী একপ্রকার বিকট হাসি হাসিতে লাগিল।

সে মনে করিয়াছিল যে, ভয় পাইয়া সুবালা তাহার নিকট কাকুতি মিনতি করিবেন। কিন্তু সুবালা কিছুই করিলেন না। 'এ নরাধম পশুকে আমি আর কি বলিব।'—এইরূপ ভাবিয়া সুবালা চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন ও মনে মনে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ দোল দিয়া ধনুকধারী পুনরায় স্থির হইয়া দাঁড়াইল। বোতলের ছিপি খুলিয়া

আর একবার মদ্য পান করিল। পুনরায় সে বলিতে লাগিল,—'কেবল এক অঙ্গুলি থাকিতে ছাড়িলাম। নৌকার পাশ যদি আর এক আঙ্গুল নীচু করিতাম, তাহা হইলে এতক্ষণ বাছা! তোমাকে হাবুডুবু খাইতে হইত। আমার ধর্মজ্ঞান আছে, মনে দয়া আছে, তাই এ অকুল পাথারে তোমাকে ভাসাইতে বিলম্ব করিলাম। চীৎকার করিবে? করিয়া দেখ—কে তোমার চীৎকার শুনিতে পাইবে? সুবালা চুপ করিয়া রহিলেন। মনে মনে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন।

নৌকা আরও কিছুদূর স্রোতে ভাসিয়া গেল। নদীর দক্ষিণ পার্শ্বে এক বিস্তৃত নিম্নভূমির মাঠ আছে। নদীতে বান আসিলে ইহা গভীর জলে পূর্ণ হয়।

ধনুকধারী নৌকা লইয়া এই মাঠেব ভিতর প্রবেশ করিল। সমস্ত নিম্নভূমি এক্ষণে জলপ্লাবিত হইয়াছিল। সমুদ্রের ন্যায় চারিদিকে জল ধূ ধূ করিতেছিল। মাঝে মাঝে এক একটি গাছ দ্বীপের ন্যায় দাঁড়াইয়াছিল।

সম্মুখে একটি তাল গাছ দেখিতে পাইয়া নৌকা লইয়া ধনুকধারী তাহার নিকট গমন করিল। গাছটি অধিক উচ্চ নহে। তাহার কাণ্ডের পাঁচ ছয় হাত জলমগ্ন হইয়াছিল। অবশিষ্ট অংশ উপরে জাগিয়াছিল। ইহার চারিদিকে অনেকগুলি বৃহৎ ও শুষ্কপত্র নিম্নমুখ হইয়া ঝুলিতেছিল। একটি পুরাতন ও জীর্ণ রজ্জু দ্বারা ধনুকধারী এই তালগাছে নৌকা বন্ধন করিল। —পুনরায় সুরা পান করিয়া সুবালার নিকট সে আসিয়া বসিল। তাহার পর নিজের কথা যথাসাধ্য মিষ্ট করিয়া সে বলিতে লাগিল,—'সুবালা! তোমার মনে আছে, আমি সেদিন কি বলিয়াছিলাম? কি করিবে বল, আমার মনকে আমি সুস্থির করিতে পারিতেছি না। তোমাকে যদি না পাই, তাহা হইলে আর কোন বস্তুকেই আমার প্রয়োজন নাই। আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে তোমা ছাড়া হইয়া আমি এ প্রাণ রাখিব না। সেইজন্য আমি ছোরা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। এই দেখ সেই ছোরা। সর্বদা ইহা আমার বুকের উপর থাকে। কথার কথা নহে। আমি দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়াছি, তোমা ছাড়া হইয়া এ ছার প্রাণ আমি রাখিব না। তুমি দয়াময়ী। মানুষ দূরে থাকুক, পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ সকল জীবের প্রতি তোমার দয়া অসীম। কিন্তু আমার প্রতি কি তোমার বিন্দুমাত্র দয়া হয় না। ছেলেবেলার কথা স্মরণ করি। চিরকাল আমরা একসঙ্গে। যখন যাহা বলিয়াছ, তখন তাহা আমি করিয়াছি। আমার প্রতি তখন তোমার কত স্নেহ-মমতা ছিল। সে স্নেহ-মমতা এখন কোথায় গেল। ঝেঁকড়া-চুলো ছোঁড়া কে যে, আমার কাছ হইতে তোমাকে সে কাড়িয়া লইল? চল সুবালা আমরা কলিকাতা যাই। সে স্থানে গিয়া, চল আমরা অন্য ধর্মে দীক্ষিত হই। খ্রীষ্টীয় ধর্ম আছে, ব্রাহ্মধর্ম আছে, আর্য নামক আর একপ্রকার নূতন ধর্ম হইয়াছে। এক ঈশ্বরের ভজনা করিতে এই সকল ধর্মে উপদেশ প্রদান করে। ইহারা নদী নালা, গাছ পালা, নোড়া-নুড়ি, গরু বাঁদর পূজা করিতে বলে না। শোকাকুলা মাতা অথবা ভগিনীকে ইহারা জীয়ন্ত ধরিয়া পোড়াইতে বলে না। ইহাদের শাস্ত্রে বলে যে, ভগবানের চক্ষে সকল মানুষ সমান। কিন্তু আমাদের ধর্ম দেখ। জনকয়েক ছাড়া পৃথিবীর যাবতীয় মানুষকে তুমি ঘৃণা করিবে,—

আমাদের ধর্মে এইরূপ শিক্ষা প্রদান করে। অমুক কায়স্থ, উহাকে অল্প ঘৃণা করিবে; অমুক সদ্‌গোপ, উহাকে তাহা অপেক্ষা অধিক ঘৃণা করিবে; অমুক নীচ জাতি, ইহাকে স্পর্শ পর্যন্ত করিবে না। নীচ জাতিরা ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে পারিবে না। সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়কর্তার সংক্ষেপ নাম পর্যন্ত ইহারা উচ্চারণ করিতে পারিবে না। ভগবানকে ইহারা ডাকিতে পারিবে না। ইহারা পয়সা দিবে, ইহাদের হইয়া আর একজন ভগবানের পূজা করিবে। ইহারা জাতির দাসত্ব করিবে। ইহাই আমাদের ধর্মের শিক্ষা। কিন্তু আর অধিক দিন লোকে এ দৌরাত্ম্য সহ্য করিবে না। দক্ষিণে পরয়া, তিয়া প্রভৃতি জাতি ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। পূর্বদেশে নমঃশূদ্র জাতিরা ক্ষেপিয়াছে। কলিকাতায় আমাদের কায়েতরা ক্ষেপিয়াছে। এখন আর তাহারা ব্রাহ্মণ দেখিয়া প্রণাম করে না। গলায় একগাছা সূতা পরিয়া, গোঁফে চাড়া দিয়া আমাদের কায়েতরা এখন তাল ঠুকিয়া বেড়াইতেছে। 'মানুষকে ঘৃণা কর,'—বলিতে গেলে ইহাই আমাদের ধর্মের সার। কিন্তু প্রকৃত ইহা ধর্ম নহে, পাপ। এই পাপের ফলে আমাদের কি দুর্গতি হইয়াছে, তাহা দেখ। তুমি ভূগোল পড়িয়াছ, ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়াছ। বল দেখি, এরূপ জাতি পৃথিবীতে আর কোথায় আছে? সেই জন্য তোমায় বিনয় করিয়া বলি যে, চল সুবালা, আমরা কলিকাতা যাই। সে স্থানে গিয়া আমরা অন্য ধর্ম অবলম্বন করি। সেই ধর্ম অনুসারে আমরা বিবাহ করিব। তাহার পর আমরা পরম সুখে দিনযাপন করিব। তুমি মিথ্যা কথা বলিতে জান না। আমি নিশ্চয় জানি যে, একবার তুমি 'হাঁ' বলিলে, সে কথার কখন আর অন্যথা হইবে না। বল, সুবালা, আমার প্রতি দয়া করিয়া বল যে, তুমি এ কাজ করিবে। তাহা হইলে মুহূর্তে নৌকা লইয়া আমি বাড়ী যাই। তাহার পর কল্য প্রাতঃকালে দুইজনে কলিকাতা পলায়ন করিব।'

সুবালা উত্তর করিলেন,—'আমি সামান্য বালিকা ধর্মেব কথা আমি কি জানি? চিরকাল যাহা চলিয়া আসিতেছে, আমি তাহাই করি। বাল্যকালের স্নেহ-মমতা আমি ভুলি নাই। তোমাকে আমি বড় ভাই বলিয়া জানি। সেই স্নেহ-মমতা স্মরণ করিয়া তোমাকে আমি কিছু বলিব না। আমার বড় ভাই পাগল হইয়া আমাকে কুকথা বলিয়াছে,—'এইরূপ বিবেচনা করিয়া তোমাকে আমি ক্ষমা করিব। চল, নৌকা লইয়া বাড়ী চল। কল্য প্রাতঃকালে বড়ালমহাশয়কে বলিয়া তোমাকে টাকা দিব। কাশী, বৃন্দাবন প্রভৃতি নানা দেশে ভ্রমণ করিলে নানারূপ নূতন নূতন বিষয় দেখিলে তোমার এ ক্ষিপ্রতা দূর হইবে। তখন কোন স্থানে বাস করিয়া তুমি কাজকর্ম করিতে পারিবে। কিন্তু এ গ্রামে তুমি আর কখন আসিতে পারিবে না। আমার সহিত আর কখন তুমি সাক্ষাৎ করিতে পারিবে না। আমার আজ্ঞা অমান্য করিলে তোমার অনিষ্ট হইবে। তখন আর আমি তোমাকে ক্ষমা করিব না।'

ধনুকধারী হাসিয়া উত্তর করিল,—'তুমি আমার অনিষ্ট করিবে? তুমি আমাকে ক্ষমা করিবে না? তুমি এখন কোথায় আছ, বাছাধন? চারিদিকে চাহিয়া দেখ। অকূল সমুদ্রের মাঝে সামান্য একখানি নৌকাতে একাকিনী তুমি আমার নিকট বসিয়া আছ। তোমার টাকা এখন কোথায়? এখন আমি তোমার হর্তা-কর্তা বিধাতা। আমি মনে করিলে তোমার জীবন

দিতে পারি। পুনরায় তোমাকে জিজ্ঞাসা করি,—'কল্য প্রাতঃকালে আমার সহিত কলিকাতা পলায়ন করিয়া, সে স্থানে অন্য কোন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, তুমি আমাকে বিবাহ করিবে কি না? বিশেষ বিবেচনা করিয়া উত্তর দিবে। কারণ, সেই যদি বল 'হাঁ', তাহা হইলে তোমার প্রাণরক্ষা হইবে। যদি বল 'না', তাহা হইলে আমাদের দুইজনকে এই স্থানে মরিতে হইবে।'

সপ্তম অধ্যায় – ভূতে ও মাতালে

সুবালা বলিলেন,—'আমার উত্তর চাও? আমার উত্তর এই—না, না, না। আমি মরিতে ভয় করি না। ভগবানের যদি ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে মরিব। আমাকে জীবিত রাখিতে যদি তাঁহার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে এই নির্জ্জন জলাতে কোন না কোন উপায়ে তিনি আমার প্রাণরক্ষা করিবেন।'

ধনুকধারী বলিল,—'বার বার, তিন বার, এই শেষ বার আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি,—'কল্য প্রাতঃকালে আমার সহিত কলিকাতা পলায়ন করিয়া, অন্য কোন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, তুমি আমাকে বিবাহ করিবে কি না?'

সুবালা বলিলেন,—'আমিও এই শেষ বার তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি যে, তোমার প্রস্তাবে সম্মত হওয়া অপেক্ষা মৃত্যু আমার পক্ষে শত সহস্র গুণে শ্রেয়। আর আমি তোমার সহিত কথা কহিব না। তুমি অতি পাপিষ্ঠ, তুমি অতি নরাধম, তোমার সহিত কথা কহিলেও পাপ হয়। আমার উত্তর এই—না, না, না।'

ধনুকধারী বলিল,—'বটে! তবে দেখ, আমি কি করি।'

এই কথা বলিয়া ধনুকধারী প্রথমে নৌকার পশ্চাদ্‌ভাগে গমন করিল! বোতল বাহির করিয়া পুনরায় সুরা পান করিল। তাহার পর টলিতে টলিতে নৌকার মধ্যস্থলে আসিয়া বসিল। বক্ষঃস্থল হইতে ছোরা বাহির করিয়া তাহার আঘাতে তক্তা কাটিয়া নৌকার ঠিক মধ্যস্থলে একটা ছিদ্র করিল। সেই ছিদ্রপথে কল কল শব্দে নৌকার ভিতর জল প্রবেশ করিতে লাগিল।

তাহার পর সুবালার নিকট পুনরায় সে আসিয়া বসিল। পকেট হইতে সিগারেটের বাক্স ও দিয়াসলাই বাহির করিয়া একটি সিগারেট ধরাইয়া তাহার ধূমপান করিতে লাগিল।

সিগারেটের ধূম পান করিতে করিতে ধনুকধারী বলিতে লাগিল,—'ছিদ্র দিয়া যে পরিমাণে জল উঠিতেছে, তাহাতে বোধ হয় যে, আধ ঘণ্টার ভিতর নৌকা জলমগ্ন হইবে। আর আধ ঘণ্টা মাত্র আমাদের পরমায়ু আছে। আধ ঘণ্টা পরে আমরা দুইজনে পরমেশ্বরের নিকট গিয়া দাঁড়াইব। তিনি বিচার করিবেন। তাঁহার নিকট জাতিবিচার নাই। তোমার প্রতি আমার কিরূপ অসীম ভালবাসা, তাহা তিনি দেখিবেন। কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তুমি আমার এই ভালবাসা তুচ্ছ করিলে। বাল্যকালের বন্ধুকে পরিত্যাগ করিয়া ঝোঁকড়া-

?লোকে তুমি মনোনীত করিলে। এই পাপের জন্য ইহকালে অল্প বয়সে তুমি মৃত্যুমুখে পতিত হইলে। এই হইল তোমার প্রথম দণ্ড। পরলোক কুম্ভীপাক, রৌরব প্রভৃতি নরকে তোমাকে নিদারুণ কষ্ট ভোগ করিতে হইবে।

সুবালা কোন উত্তর করিলেন না। মনে মনে তিনি কেবল ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন,—'হে জগদীশ্বর! আমি বালিকা। বাঁচিয়া থাকিতে আমার বাসনা আছে। কিন্তু আমার পক্ষে কি ভাল, কি মন্দ, তুমি তাহা জান, আমি জানি না। আজ আমার মৃত্যু হইলে, যদি ভাল হয়, তবে তাহাই হউক। যদি আমাকে বাঁচাইতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে এই জনশূন্য জলামাঝে তাহার উপায় আসিয়া উপস্থিত হউক। তুমি যাহা করিবে, তাহা আমার মঙ্গলের জন্যই করিবে,—সেই বিশ্বাস আমার মনে, হে প্রভো! দৃঢ়ীভূত হউক। যদি মৃত্যুই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ হয়, তাহা হইলে আমার মন হইতে মৃত্যুভয় দূর হউক। তোমার প্রতি আমার হৃদয়ে অসীম ভক্তি হউক, মৃত্যুকে তুচ্ছ করিবার নিমিত্ত আমার মনে শক্তি হউক।'

কল কল শব্দে নৌকার ভিতর জল প্রবেশ করিতে লাগিল।

ধনুকধারী নৌকার পশ্চাদ্ভাগে গিয়া পুনরায় মদ্য পান করিল। তাহার পর সুবালার নিকট প্রত্যাগমন করিয়া সিগারেটের ধূম পান করিতে করিতে সে বলিতে লাগিল—'এ প্রাণ রাখিব না বলিয়া ছোবা গড়াইলাম। কিন্তু তখন মনে করিয়াছিলাম যে, আমি একেলা মরিব, তোমাকে কিছু বলিব না। ঝেঁকড়া-চুলোর সঙ্গে যে দিন তোমার বিবাহ হইবে, সেই দিন আমি মরিব। এইরূপ মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। কিন্তু আজ সন্ধ্যা বেলা মন্দিরের সম্মুখে আমগাছে বসিয়া যখন তোমাকে দেখিতেছিলাম, তখন ভাবিলাম যে,—আমি একেলা মরি কেন? ঝেঁকড়া-চুলোর জন্য সুবালাকে রাখিয়া যাই কেন? নদীতে বান আসিয়াছে, চারিদিক জলে প্লাবিত হইয়াছে, এই নির্জন শিবমন্দিরে কেহ নাই। সুবালাকে ধরিয়া একসঙ্গে জলে ঝাঁপ দিব—এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সময়ে তুমি জাগরিত হইয়া কাঁদাড়ের ধারে গমন করিলে। তাড়াতাড়ি গাছ হইতে নামিয়া, নৌকা লইয়া তোমার নিকট আমি উপস্থিত হইলাম। তুমি আপনি আমার নৌকায় উঠিয়া বসিলে। সমস্ত বিধাতার খেলা।'

সুবালা কোন উত্তর করিলেন না। নীরবে বসিয়া তিনি ভগবানকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। —কল কল শব্দে নৌকার ভিতর জল প্রবেশ করিতে লাগিল। নৌকা ক্রমেই জলমগ্ন হইবার উপক্রম হইল।

ধনুকধারী পুনর্বার সুরা পান করিতে গমন করিল। পুনরায় সুবালার নিকট আসিয়া বসিল। তাহার পা টলিতেছিল। তাহার কথায় জড়তা হইয়াছিল। উকি তুলিতে তুলিতে সে বলিতে লাগিল,—'এ ছোরার আর আবশ্যক নাই। ছোরা আমি এই ফেলিয়া দিলাম।'

বক্ষঃস্থল হইতে ছোরা বাহির করিয়া ধনুকধারী দূরে জলে ফেলিয়া দিল।

তাহার পর সে পুনরায় বলিতে লাগিল,—'ছোরার সাহায়তায় আর আমাকে আত্মহত্যা করিতে হইবে না। এই জলের ভিতর অবিলম্বে আমার প্রাণত্যাগ হইবে। আমি তোমাকে

বধ করিব না, তুমি আমার প্রাণবধ করিবে। আমি সাঁতার জানি, জলে আমার সহজে মৃত্যু হইত না। কিন্তু তুমি আমার মৃত্যুর কারণ হইবে। নৌকা যেই ডুবিবে, আর সেই সঙ্গে আমরাও দুইজনে জলে নিমগ্ন হইব। জলমগ্ন লোকেরা তৃণগাছটি পর্যন্ত ধরিতে চেষ্টা করে। আমাকে নিকটে পাইয়া তুমি আমাকে জড়াইয়া ধরিবে। তোমার হাত হইতে আমি আপনাকে ছাড়াইতে চেষ্টা করিব না। সঙ্গে সঙ্গে দুইজনে জলমগ্ন হইব। দুই হাতে তুমি আমাকে আলিঙ্গন করিয়া থাকিবে, সেই অবস্থায় আমার প্রাণ বাহির হইবে। ইহার অপেক্ষা আর সুখের বিষয় কি আছে। স্ব-ইচ্ছায় তুমি আমার সহিত সহ-মরণে যাইবে। তুমি আমার পতিব্রতা সতী হইবে। অরুন্ধতীকে লইয়া বশিষ্ঠ যেরূপ স্বর্গে বাস করিতেছেন, তোমাকে লইয়া সেইরূপ আমিও যুগ যুগান্তর—কত মন্বন্তর—স্বর্গধামে বাস করিব। হাঃ, হাঃ, সুবালা আমার সহিত সতী হইবে। এ কথা মনে করিলে হাসি পায়, দুঃখ হয় না।

সুবালা কোন উত্তর করিলেন না। নীরবে বসিয়া তিনি ভগবান্‌কে ধ্যান করিতে লাগিলেন।—কল কল শব্দে নৌকার ভিতর জল প্রবেশ করিতে লাগিল। জলে পূর্ণ হইতে আর অল্প বাকী রহিল। দিয়াশলাই জ্বালাইয়া ধনুকধারী সুবালাকে দেখাইল। সে বলিল,—'সুবালা! এই দেখ, আর বিলম্ব নাই। নৌকা এখনি জলমগ্ন হইবে। তখন দুইজনে আমরা স্বর্গে গমন করিব। আহা! দুইজনে একসঙ্গে জীবন বিসর্জন করিলাম। ইহা অপেক্ষা আর আনন্দের বিষয় কি আছে!'

ধনুকধারী যখন দিয়াশলাই জ্বালাইল, তখন সুবালা দেখিলেন যে, সত্য সত্যই আর বিলম্ব নাই, নৌকা প্রায় সম্পূর্ণ জলে পূর্ণ হইয়াছে, অল্পমাত্র জাগিয়া আছে, দুই চারি মিনিটের মধ্যে ইহা ডুবিয়া যাইবে, দুই চারি মিনিটের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইবে। সুবালা ভাবিলেন,—'পাপিষ্ঠ যাহা মনে করিয়াছে, তাহা আমি কিছুতেই করিব না। পাপিষ্ঠকে কিছুতেই আমি স্পর্শ করিব না। স্রোতো-বলে দূরে ভাসিয়া যাইতে চেষ্টা করিব। হে জগদীশ্বর! তোমার যাহা ইচ্ছা।'

ভগবানকে ডাকিবার সময় সুবালা আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। ধনুকধারীর হাতে তখনও দিয়াশলাইয়ের কাটি জ্বলিতেছে। সুবালার দৃষ্টি তালগাছের উপর পড়িল। শুষ্ক বড় বড় অনেকগুলি পত্র তালগাছকে বেষ্টন করিয়া নিম্নমুখ হইয়া ঝুলিতেছিল। সুবালা তাহা দেখিলেন।

সিগারেট ও দিয়াশলায়ের বাক্স সেই স্থানে রাখিয়া ধনুকধারী পুনরায় মদ্য পান করিতে গেল। সেই অবসরে সুবালা খপ্ করিয়া দিয়াশলাইয়ের বাক্স তুলিয়া লইলেন। পায়ের অঙ্গুলির উপর ভর দিয়া তিনি উচ্চ হইয়া দাঁড়াইলেন, ও দিয়াশলাই জ্বালাইয়া নিম্নমুখ তালপত্রে অগ্নি দিয়া দিলেন। উপর পাহাড়ে বৃষ্টি হইয়াছিল, সেই জন্য নদীতে বান আসিয়াছিল। কিন্তু এ অঞ্চলে কয়েক দিবস বৃষ্টি হয় নাই, সে জন্য তালপত্রগুলি সম্পূর্ণ শুষ্ক হইয়াছিল। দিয়াশলাই জ্বালাইয়া যেমন সুবালা তালপাতায় ধরিলেন, আর পাতাগুলি অমনি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। চারিদিক বহু দূর পর্যন্ত আলোকিত হইল।

তালগাছের মাথায় কে একজন বসিয়াছিল। নদীতে বান আসিবার পূর্বে সে এই মাঠে আসিয়া তালগাছের উপর উঠিয়াছিল। তাহার পর যখন সমস্ত মাঠ জলপ্লাবিত হইল, তখন সে আর পলায়ন করিতে পারিল না। গাছের উপর তাহাকে বসিয়া থাকিতে হইল। ধনুকধারী তাহা জানে না, সুবালাও তাহা জানেন না।

তালগাছ দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। অগ্নির উত্তাপ সে সহ্য করিতে পারিল না, অথবা তাহার ভয় হইল। মৃদুস্বরে হু, হু, হু, হু, শব্দ করিতে করিতে সড় সড় করিয়া সে গাছ হইতে কোনরূপ নামিয়া নৌকার উপর আসিয়া দাঁড়াইল। সুবালা তাহাকে চিনিতে পারিলেন। সুবালা বলিলেন,—'কালা বাবা! কালা বাবা! এই দুরাত্মার হাত হইতে আমাকে রক্ষা কর।'

কেন,—তাহা বলিতে পারা যায় না, সেই মুহূর্তে খাঁদা ভূত ধনুকধারীকে জড়াইয়া ধরিল। ধনুকধারীও খাঁদা ভূতকে জড়াইয়া ধরিল। খাঁদা ভূতের এখন ক্ষিপ্ত অবস্থা। সোনা-বৌয়ের নিকট হইতে আপনার নাক লইয়া সে অতি দ্রুতবেগে মাঠঘাট পার হইয়া এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। বৃক্ষারোহণ-অভ্যাসের বশবর্তী হইয়া সে এই তালগাছের উপর উঠিয়া বসিয়াছিল। পাগলের মর্জি! কেন সে ধনুকধারীকে ধরিল, তাহা বলিতে পারা যায় না। ধনুকধারী বোধ হয় ভাবিল যে,—'এই খাঁদা ভূত চপলাকে যেরূপ খাইয়াছে, সেইরূপ আমাকেও হয়তো খাইবে।' আতঙ্কের বশবর্তী হইয়া সে খাঁদা ভূতকে জড়াইয়া ধরিল।

ভীমে ও কীচকের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, মগ্ন প্রায় নৌকার উপরে সেইরূপ তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া গেল। দুইজনে ধরাধরি, জড়াজড়ি, হুড়াহুড়ি হইতে লাগিল। অজ্ঞান প্রায় হইয়া সুবালা নৌকার একপার্শ্বে বসিয়া এই ভীষণ রণ দর্শন করিতে লাগিলেন।

অল্পক্ষণ হুটোপুটির পর জলপ্লাবিত প্রান্তরের মাঝে মাঝে খাঁদা ভূতের মুখ হইতে সহসা সেই ভয়াবহ হুহুঙ্কার শব্দ নির্গত হইল। অন্য বৎসর ক্ষিপ্ত হইবার সাত আট দিন পরে খাঁদা ভূতের মুখ হইতে এই শব্দ নির্গত হইত ও তাহার পর তাহার শরীরের সুস্থতা হয়। এ বৎসর নানা কারণে তাহার মন উত্তেজিত হইয়াছিল। তাহার পর ধনুকধারীর সহিত এই তুমুল সংগ্রাম। সেইজন্য বোধহয় সদ্য সদ্য তাহার মুখ দিয়া হুহুঙ্কার শব্দ নির্গত হইল।—

হু হু, হু হু, হু হু হু ভয়ানক চীৎকারে চারিদিক—পূর্ণ হইল।

জলপ্লাবিত প্রান্তর মধ্যে চারিটি গাছে যে সমুদয় কাকপক্ষী বসিয়াছিল, তাহারা সেই ভয়ানক শব্দ শুনিয়া ভীত হইল ও ভয়ার্তরবে চারিদিক পূর্ণ করিয়া এদিক্ ওদিক উড়িতে লাগিল। আরও দূরে গ্রামের কুক্কুরগণ উর্ধমুখ হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

হু হু, হু হু, হু হু হু খাঁদা ভূতের শব্দ।

হুয়া হুয়া, হ্যাক্কা হুয়া, হুয়া হুয়া হু।—শৃগালের ডাক। তিনবার এইরূপ শব্দে পৃথিবীর পরিপরিত হইল।

কল কল শব্দে নৌকায় জল উঠিতে লাগিল। ধরাধরি, জড়াজড়ি, দুড়োদুড়ি,

হুড়োহুড়ি,—দুইজনে যুদ্ধ হইতে লাগিল! প্রজ্বলিত তালপত্রে চারিদিক আলোকিত হইল।

ঘোর বিপদে পতিত হইয়া সুবালার দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি তীক্ষ্ণ হইয়াছিল। দূরে যৎসামান্য আলোক তাঁহার নয়নগোচর হইল। তাহার পর গুরুঠাকুরের প্লুতস্বরে ছোট-হরিদাস সম্বন্ধে ক্রন্দন তিনি শুনিতে পাইলেন। দুই দিকে নৌকার শব্দও অল্প অল্প তাহার কর্ণগোচর হইল। চীৎকার করিয়া সুবালা বলিলেন,—'কে গো! নৌকা লইয়া যাও? আমি সুবালা।'

এই কয়টি কথা বলিবামাত্র, বাম দিক্ হইতে উত্তর আসিল,—যাই, যাই, ভয় নাই।'

দক্ষিণ দিক হইতেও সেই মুহূর্তে উত্তর আসিল,—ভয় নাই, ভয় নাই, যাই, যাই।'

উত্তর দিকে বিনয়ের ও দক্ষিণ দিকে বড়ালমহাশয়ের কণ্ঠস্বর বলিয়া বোধ হইল।

ব্রহ্মরাক্ষসের নিষ্ঠুর স্বভাব ও গুরুঠাকুরের নিদারুণ খেদ শুনিয়া গ্রামের লোক নৌকা ফিরাইয়া পলায়ন করিবার উপক্রম করিতেছিল। এমন সময় সুবালার কাতর ডাক সকলে শুনিতে পাইল। বড়ালমহাশয় তখন গ্রামবাসীদিগকে ধিক্কার দিয়া ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,—ঐ শুন, সুবালা দিদির কণ্ঠস্বর। ঘোরতর বিপদে পড়িয়া তিনি আমাদিগকে ডাকিতেছেন। আমি তোমাদিগকে বার বার বলিতেছি যে, যাহার হু হু শব্দ শুনিলে, সে ভূত নহে; সে জীয়ন্ত মানুষ, সে ক্ষিপ্ত। উন্মাদের হাতে সুবালা দিদিকে ফেলিয়া তোমরা পলায়ন করিবে? ছি, ছি, ধিক্ তোমাদিগকে!'

গ্রামের লোক লজ্জিত হইয়া নৌকা ফিরাইয়া যেদিকে আগুন জ্বলিতেছিল, যেদিক্ হইতে খাঁদা ভূতের হু হু শব্দ ও সুবালার কণ্ঠস্বর আসিয়াছিল, সেই দিকে দ্রুতবেগে তাহারা ধাবিত হইল। —কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বিনয় ও বড়ালমহাশয়ের নৌকা নিকটে পৌঁছিতে না পৌঁছিতে ধনুকধারী ও খাঁদা ভূত জড়াজড়ি করিয়া দুইজনে জলে পতিত হইল। জলে পড়িবামাত্র সেই স্থানে ডুবিয়া গেল। তালপাতার আলোকে সুবালা সেই স্থানে কেবল গুটিকত বুদ্ বুদ্ দেখিতে পাইলেন। তাহাদের আর কোন চিহ্ন তিনি দেখিতে পাইলেন না।

দেখিবার অবকাশও ছিল না। নৌকাখানি জলে পূর্ণ হইতে অতি সামান্যই বাকী ছিল। খাঁদা ভূতের ও ধনুকধারীর হুড়াহুড়িতে সে সামান্য অংশটি অতি সত্বর পূর্ণ হইয়া গেল। নৌকা জলমগ্ন হইল। যে জীর্ণ ও পুরাতন রজ্জু দ্বারা তালগাছে নৌকা বাঁধা ছিল, জলের ভারে তাহা ছিঁড়িয়া গেল।

সুবালা ডুবিয়া গেল। তিনি অল্প অল্প সাঁতার জানিতেন। হাত পা নাড়িয়া একবার তিনি ভাসিয়া উঠিলেন। মাথা তুলিয়া কিছুদূরে প্রজ্বলিত তালগাছ তিনি দেখিতে পাইলেন। কিন্তু স্রোত তাঁহাকে গাছ হইতে দূরে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। —পূর্বাপেক্ষা নিকট হইতে পুনরায় আশ্বাসবাক্য আসিল,—'ভয় নাই, ভয় নাই! যাই, যাই!!'

বিনয়ের নৌকা প্রথম আসিয়া তালগাছের নিকট পৌঁছিল। সে স্থানে কাহাকেও না দেখিয়া তিনি আশ্চার্যান্বিত হইলেন। তালপাতায় কে আগুন দিল! সুবালার কণ্ঠস্বর তিনি শুনিয়াছিলেন। সুবালা কোথায় গেলেন! এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। কিছুদূরে একটা কৃষ্ণবর্ণের গোলাকার পদার্থ সহসা জলের

উপর ভাসিয়া উঠিল। দ্রুতবেগে সেই স্থানে বিনয় নৌকা পরিচালিত করিলেন। কৃষ্ণবর্ণে সেই গোলাকার পদার্থ সুবালার মস্তক। হাবুডুবু খাইতে খাইতে সুবালা স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিলেন। তাড়াতাড়ি বিনয় তাঁহাকে নৌকার উপর তুলিয়া ফেলিলেন।

নৌকায় উঠিয়া সুবালা কাঁপিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। তথাপি অতি কষ্টে তিনি বলিলেন,—'ঐ তালগাছে।—ধনুকধারী ও কালা-বাবা ডুবিয়াছে।'

নৌকা লইয়া বিনয় তালগাছের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। সুবালা হাত বাড়াইয়া দেখাইলেন,—'ঐ স্থানে...ধনুকধারী ও কালা-বাবা।'...

আর তিনি বলিতে পারিলেন না। কাঁপিতে কাঁপিতে সুবালা অচেতন হইয়া পড়িলেন। বিনয় তাহা জানিতে পারিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ জলে ঝাঁপ দিয়া ডুব দিলেন। অল্পক্ষণ পরে নিঃশ্বাস লইবার জন্য জলের উপর তিনি মস্তক তুলিলেন। দীর্ঘশ্বাসে বায়ু গ্রহণ করিয়া পুনরায় তিনি ডুব দিলেন। অল্পক্ষণ পরে জলের উপর পুনরায় তিনি মস্তক উত্তোলন করিলেন। তাঁহার পরিশ্রম বিফল হইল। ধনুকধারী ও খাঁদা ভূতকে তিনি খুঁজিয়া পাইলেন না।

পুনরায় তিনি ডুব দিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় একজন গ্রামবাসী বলপূর্বক তাঁহাকে নৌকার উপর তুলিয়া ফেলিল ও তাঁহাকে ধরিয়া রহিল। সে বলিল,—'আপনার এ কাজ নয়। তাহারা যদি ডুবিয়া থাকে, তাহা হইলে আপনি তাহাদিগকে তুলিতে পারিবেন না। আপনি নিজে মারা পড়িবেন।'

এখন বিনয় জানিতে পারিলেন যে, সুবালা অচেতন হইয়াছেন। সুবালার শুশ্রূষায় তিনি এখন নিযুক্ত হইলেন। সুবালাকে সচেতন করিবার নিমিত্ত তিনি চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এই সময় বড়ালমহাশয়ের নৌকা সেই স্থানে আসিয়া পৌঁছিল। বিনয় বলিলেন,—'বড়ালমহাশয়! সুবালাকে আমি নৌকায় তুলিয়াছি। সুবালার জন্য কোন ভয় নাই। কিন্তু সুবালা অচেতন হইয়াছে। তাহাকে লইয়া আমি বাড়ী চলিলাম। শুনিলাম যে, ধনুকধারী ও খাঁদা ভূত এইস্থানে জলমগ্ন হইয়াছে। তাহাদিগকে তুলিতে আপনারা চেষ্টা করুন। সুবালাকে লইয়া আমরা বাড়ী চলিলাম।'

বিনয়ের নৌকা গৃহাভিমুখে গমন করিল। ধনুকধারী সে স্থানে ডুবিয়াছে শুনিয়া বড়ালমহাশয় আশ্চর্যান্বিত হইলেন। জলমগ্ন প্রান্তর মধ্যে ধনুকধারী কোথা হইতে আসিল! সুবালাকেই বা সেস্থানে কে আনিল! আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বড়ালমহাশয় এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

সেদিন কূপ হইতে যে লোক চপলার অস্থি তুলিয়াছিল, সে বড়ালমহাশয়ের নৌকাতে ছিল। পুরস্কারের প্রলোভন দেখাইয়া বড়ালমহাশয় তাহাকে ধনুকধারী ও খাঁদা ভূতের অনুসন্ধান করিতে আদেশ করিলেন।

অষ্টম অধ্যায় – বিকৃত মস্তিষ্ক

পুরস্কারের লোভে অন্যান্য অনেক লোকও জলে ঝাঁপ দিল। অধিক অনুসন্ধান করিতে হয় নাই। তালগাছ হইতে অল্পদূরে দুইজনকে তাহারা দেখিতে পাইল। দুইজনে পরস্পরে জড়াজড়ি করিয়াছিল। খাঁদা ভূত চেন সম্বলিত নিজের নাক গলায় পরিধান করিয়াছিল। দুই জনেরই প্রাণবিয়োগ হইয়াছিল। একখানি নৌকাতে দুইটি মৃতদেহ তুলিয়া অন্যান্য লোকের সহিত বড়ালমহাশয় গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

অল্পক্ষণ পূর্বে সুবালাকে লইয়া বিনয়ও গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। তাপ-সেক সেবাশুশ্রুষা করিতে করিতে সুবালার জ্ঞান হইল। কিরূপে ধনুকধারী তাঁহাকে সেই জনশূন্য জলপ্লাবিত মাঠে লইয়া গিয়াছিল এবং সে তাঁহাকে কিরূপ কথা বলিয়াছিল, ধীরে ধীরে সমস্ত পরিচয় বিজয়বাবু প্রভৃতিকে তিনি প্রদান করিলেন। ধনুকধারীর কুব্যবহার শুনিয়া বিজয়বাবু চুপ করিয়া রহিলেন।

লজ্জায় ও ঘৃণায় কিছুক্ষণ অধোবদন থাকিয়া বড়ালমহাশয় বলিলেন,—'সুবালা দিদি! পাষণ্ডের সকল কথা তোমাকে বলি নাই। বলিব বা কি করিয়া? কারণ, পূর্বে আমি এ সব কথা শুনি নাই। যেদিন তোমরা আমাকে উইলের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, সেই দিন ঘরে গিয়া গৃহিণী আমাকে ধনুকধারীর গুণের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। শুনিলাম যে উইল সম্বন্ধে ভয় দেখাইয়া সর্বদাই সে তাহার পিসীমার নিকট হইতে টাকা-পয়সা লইত। এক দিন টাকা না পাইয়া সে মারিতে পর্যন্ত গিয়াছিল। যাহা হউক, সব শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন দিদি, তুমি তাহাকে ক্ষমা কর।' নিদারুণ ক্লেশ ভোগ করিয়া, ঘোর ভয়ে ভীত হইয়া, অনেকক্ষণ আর্দ্রবস্ত্রে থাকিয়া সুবালা সেই রাত্রিতে জ্বর দ্বারা আক্রান্ত হইলেন।

বিজয়বাবুর আদেশে বড়ালমহাশয় থানায় সংবাদ দিয়াছিলেন। পুলিশের অনুমতি পাইয়া মৃতদেহ দুইটির তিনি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করাইলেন। বিজয়বাবুর আজ্ঞায় চেন-সম্বলিত খাঁদা ভূতের নাসিকা গঙ্গাজলে নিক্ষিপ্ত হইল।

সুবালার জ্বর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ক্রমে বিকারে পরিণত হইল। পীড়া-অতিশয় কঠিন হইয়া উঠিল। দুই চারিদিনের জন্য সকলকে তাঁহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। বিজয়বাবুর আজ্ঞায় বিনয় কলিকাতা গিয়া তাঁহার মাতাকে আনিলেন। সুবালার কাকামহাশয় সপরিবারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আত্মীয়-স্বজন সকলে অসীম স্নেহের সহিত সুবালাকে ঘিরিয়া রহিল। কায়মনঃপ্রাণে সকলে সুবালার সেবা-শুশ্রুষা করিতে লাগিলেন। ইতর-ভদ্র, আবাল-বৃদ্ধ, নর-নারী সুবালার জন্য সকলে ভগবানকে ডাকিতে লাগিল।

ভগবানের কৃপায় সুবালার রোগ ক্রমে উপশম হইল। ভগবানের কৃপায় তাঁহার প্রাণরক্ষা হইল।

সুবালা তখনও বড় দুর্বল। এইরূপ অবস্থায় একদিন তিনি বালিশে ঠেস দিয়া বসিয়া

ছন; বিজয়বাবু, কাকামহাশয়, বিনয়, বড়ালমহাশয় প্রভৃতি অনেকে সেই ঘরে বসিয়া গাছা করিতেছেন। সুবালা তাঁহাদের কথোপকথন শুনিতেছেন। এমন সময় বিনয় য়র পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'বাবা! খাঁদা ভূত বলিয়াছিল যে, রাজাবাবু ভূত য়া তাহার সহিত অনেকবার সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। সোনা-বৌও সেই কথা নয়াছিলেন। রাজাবাবু সত্য কি ভূত হইয়াছেন? ভূত হইয়া সত্যই কি তিনি এই জনের সহিত বার বার সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন?'

বিজয়বাবু কি উত্তর প্রদান করেন, তাহা শুনিবার নিমিত্ত সাতিশয় আগ্রহ সহকারে সলে কান পাতিয়া রহিলেন।

বিজয়বাবু বলিলেন,—'না; রাজাবাবু যে ভূত হইয়াছেন, তাহা আমার বিশ্বাস হয় না। ই পৃথিবীতে অনেক লোক বিকৃত মস্তিষ্কের সহিত জন্মগ্রহণ করে। তাহাদের মধ্যে নেকে বড় হইয়া ধর্ম, রাজনীতি, সমাজসংস্কার অথবা অর্থোপার্জন—এই কয় বিষয়ের ক বিষয় লইয়া পাগল হয়। কিন্তু সে সীমা অতিক্রম করিলে মানুষকে ক্ষিপ্ত বলিতে পারা য়, সে সীমা তাহারা অতিক্রম করে না। সেজন্য সহজ মানুষের ন্যায় থাকিয়া তাহারা সোরযাত্রা নির্বাহ করিতে থাকে। কিন্তু দৈব্যক্রমে কোন একটা ঘনটা ঘটিয়া যদি তাহাদের কৃত মস্তিষ্ক অধিকতর উত্তেজিত হয়, তাহা হইলে তখন তাহারা সেই সীমা পার হইয়া ক্ষপ্তদশায় উপনীত হয়। খাঁদা ভূত ও সোনা-বৌয়ের ভাগ্যে ইহাই ঘটিয়াছিল। প্রথম তো য়রা বিকৃত মস্তিষ্ক হইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। একরূপ-প্রকৃতি বিশিষ্ট দুইজন নাক ঘটনাক্রমে একত্র হইল। অতি নিষ্ঠুর কার্যে ইহারা প্রবৃত্ত হইল। ভাগ্যক্রমে সে চেষ্টা ফল হইল না। নিদ্রিত নিরপরাধ ব্যক্তিতে হত্যা করিতে ইহারা উদ্যত হইয়াছিল। সে নাক একজনের স্বামী অপরজনের প্রাণরক্ষাকর্তা। এই দুষ্কর্ম্মের চিন্তা সর্বদাই তাহাদের নে জাগরিত ছিল। সুতরাং রাজাবাবুর আকৃতি সর্বদা তাহারা মানসচক্ষে প্রত্যক্ষ দেখিত। হাদের বয়ঃক্রম যতই অধিক হইতে লাগিল, মস্তিষ্কের বিকারও সেই সঙ্গে বৃদ্ধি পাইতে াগিল। অবশেষে দুইজনেই রীতিমত ক্ষিপ্ত হইল। তবে ক্ষিপ্ততা অনেক প্রকার। সচরাচর াহাকে পাগল বলে, সোনা-বৌ তাহাই হইয়াছিলেন। খাঁদা ভূত বৎসরে একবার পাগল ইত এবং সে সময় অনেক পরিমাণে তাহার জ্ঞান থাকিত। বাল্যকালে আমাদের সহিত ।কটি বালক স্কুলে পড়িত। কিছুদিন তাহার মুখ হইতে হু হু এইরূপ একটি শব্দ নির্গত ইত। সে তাহা নিবারণ করিতে পারিত না। কিন্তু সে বালক ক্ষিপ্ত হয় নাই। খাঁদা ভূত ।থার্থ পাগল হইয়াছিল; সোনা-বৌ ও খাঁদা ভূত রাজাবাবুর ভূতকে দর্শন করে নাই, তাহাদের বিকারপ্রাপ্ত বনঃসম্ভূত ছায়া দেখিত মাত্র? তবে এ কথা নিশ্চয় জানিও যে, আমরা সর্বদা নানাপ্রকার ভৌতিক জীব দ্বারা পরিবৃত হইয়া আছি।'

বিনয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'মৃত্যুকালে জ্যেঠামহাশয় বলিয়াছিলেন যে, খাঁদা ভূত নদীতীরে বসিয়া কাদা দিয়া আপনার নাসিকা গড়িতেছে এবং সোনা-বৌ উষর প্রান্তরে বৃক্ষতলে বসিয়া কাঁদিতেছে। পরে শুনিলাম সত্য সত্যই এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল।

জ্যেঠামহাশয় কি করিয়া তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন?'

বিজয়বাবু উত্তর করিলেন,—'আমাদের শরীর ও মনের অভ্যন্তরে যাহা আছে, তাহাকে লোকে জীবাত্মা বলে। পৃথিবীতে তাহাকে ইন্দ্রিয়ের বশীভূত থাকিয়া কাজ করিতে হয়, সেজন্য তাহার শক্তি অল্প। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাতে অসীম শক্তি নিহিত আছে। কোন কোন মানুষে সেই শক্তি আপনা আপনি বিকশিত হয়, কোন কোন মানুষ নিয়মানুসারে যত্ন করিয়া সেই শক্তি বিকশিত করে, কোন কোন মানুষ পীড়িত অবস্থায় অথবা মৃত্যুকালে সেই শক্তি কিয়ৎপরিমাণে বিকশিত হয়। এই শক্তি বিকশিত হইলে মানুষের অনেক প্রকার অদ্ভুত ক্ষমতা হয়। অনেক দূরে কোনরূপ শব্দ হইলে কেহ বা তাহা শুনিতে পায়। ইংরাজীতে ইহাকে ক্লের-অডিয়েন্স (Clair-audience) বলে। অনেক দূরের ঘটনাসমূহ কেহ বা দেখিতে পায়। ইংরাজীতে ইহাকে ক্লের-ভয়ান্স (Clair-voyance) বলে। পাপী ও দানব বংশসম্ভূত, মনুষ্যজাতির অহিতকারী ব্যক্তিদিগের শরীর হইতে যে একপ্রকাব কদাকার নীল আভা বাহির হয়, তাহাও কোন কোন ব্যক্তির দৃষ্টিগোচর হয় ও সেইরূপ লোকের দেহ হইতে যে একপ্রকার দুর্গন্ধ বাহির হয়, তাহাও তাহাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত হয়। সকল মানুষ সর্বদা যে সমুদয় ভালমন্দ ভৌতিক জীবগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া আছে, তাহাদিগকে কেহ কেহ দেখিতে পায়। এইরূপ শক্তিসম্পন্ন লোকেব মধ্যে অনেক মহাত্মা আছেন, যাঁহাদের আশীর্বাদে লোকের নিশ্চয মঙ্গল হয়। তাঁহাদেব অভিশাপও অতি ভয়ানক। মৃত্যুকালে আমার দাদামহাশয়ের মানসিক বৃত্তিসমূহ কিয়দংশে উত্তেজিত হইয়াছিল, তাহার প্রভাবেই তিনি খাঁদা ভূতের নাসিকাগঠন ও সোনা-বৌয়ের অরন্যে রোদন দর্শন করিয়াছিলেন।'

সুবালা সুস্থ ও সবল হইলে একদিন বিজয়বাবু সকলের সাক্ষাতে তাঁহাকে বলিলেন—'সুবালা! এই সম্পত্তি অতিশয় অমঙ্গলজনক অর্থাৎ অপয়া। পূর্বে যাঁহাদের ইহা ছিল, তাঁহারা নির্বংশ হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের চিহ্নমাত্র এখন এ গ্রামে নাই। তাহার পর আমার দাদামহাশয় ইহার অধিকারী হইয়াছিলেন। ইহা লাভ করিয়া তাঁহারও সুখ হয় নাই। অতএব এ সম্পত্তি আমিও লইব না এবং তোমাকেও লইতে দিব না।'

সুবালা সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

তাহার পর সুবালার কাকামহাশয়ের দিকে চাহিয়া বিজয়বাবু বলিলেন,—'আপনি যদি এ সম্পত্তি লইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আপনাকে ইহা আমি লিখিয়া দিতে পারি।'

কাকামহাশয় উত্তর করিলেন,—'না ভাই! আমার ইহাতে প্রয়োজন নাই। আমি গরীব মানুষ বটে, কিন্তু এ সম্পত্তিতে আমার কোন অধিকার নাই। ইহা লইলে আমারও মঙ্গল হইবে না। আমিও পুত্র-কন্যা লইয়া ঘর করি। তাহাদের প্রাণ বড়, না টাকা বড়!'

বেণীবাবুর কোন আত্মীয় আছেন কি না, বিজয়বাবু এখন সেই অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। বেণীবাবুর পিতা পূর্বদেশ হইতে এ অঞ্চলে আসিয়া জেলায় মোক্তারি করিতেন। জেলার কাছারীর কাগজপত্রে অন্বেষণ করিয়া তিনি পূর্বদেশে তাঁহার জন্মস্থানের

নাম বাহির করিলেন। তাহার পর জানিতে পারিলেন যে, সে গ্রামে তাঁহাদের জ্ঞাতি-গোত্র অনেকেই জীবিত আছেন। সর্বাপেক্ষা যিনি নিকট জ্ঞাতি, তাঁহাকে আনাইয়া বিজয়বাবু এই সম্পত্তি তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। কিন্তু কড়িকাঠের ভিতর হইতে যে 'বার' সোনা ও নগদ টাকা প্রভৃতি বাহির হইয়াছিল, সে সমুদয় কতকগুলি সৎকার্য্যে তিনি নিয়োজিত করিলেন। প্রথম—সুবালা নিয়ম করিয়াছিলেন যে, এ গ্রামের কোন লোক উপবাসী থাকিবে না, অথবা পীড়িত হইলে বিনা চিকিৎসায় পড়িয়া থাকিবে না, সেই নিয়ম-অনুযায়ী চিরকাল কার্য হইবার নিমিত্ত কতক টাকা নিয়োজিত হইল। দ্বিতীয়—সুবালা যেরূপ পশুপক্ষীদিগের আহার প্রদান করিতেন, চিরকাল সেইরূপ আহার প্রদানের নিমিত্ত ব্যবস্থা হইল। তৃতীয়—নদীর তীরে যে বাঁধ পুনরায় বাঁধিয়া দিলেন। চতুর্থ—গ্রামে তিনি একটি বিদ্যালয় সংস্থাপিত করিলেন। পঞ্চম—গ্রামের পথঘাট ও জলনির্গমের পথ ভালরূপে প্রস্তুত করিয়া দিলেন। ষষ্ঠ—নিকটস্থ একখানি গ্রামে লোকের জলকষ্ট ছিল, সে স্থানে বিজয়বাবু একটি পুষ্করিণী খননের নিমিত্ত অর্থ প্রদান করিলেন। সপ্তম—বড়ালমহাশয় ও বড়াল-গৃহিণী যাহাতে অবশিষ্ট জীবন পরম সুখে যাপন করিতে পারেন, সেজন্য প্রচুর অর্থ তাঁহাদিগের হস্তে তিনি সমর্পণ করিলেন। অষ্টম—চপলার মাতা ও তাহার ভগিনীর ভরণপোষণের নিমিত্ত বিজয়বাবু ভালরূপ ব্যবস্থা করিলেন। পশুপক্ষীদিগের আহার দিবার নিমিত্ত পাগলীকে তিনি নিযুক্ত রাখিলেন। বাঘা কুকুরকে সুবালা আপনার সঙ্গে লইয়া গেলেন।

সুবালা এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন, তাহা শুনিয়া গ্রামে হাহাকার পড়িয়া গেল। সীতা-সহিত রাম-লক্ষ্মণ ও দ্রৌপদী সহিত পঞ্চপাণ্ডব যখন বনে গিয়াছিলেন, তখন প্রজাগণ যেরূপ বলিয়াছিল, গ্রামবাসিগণ এখন সেইরূপ বলিতে লাগিল। সকলে বলিল যে,—সুবালা দিদিকে ছাড়িয়া আমরা এ গ্রামে থাকিতে পারিব না; তিনি যে স্থানে যাইবেন, আমরাও সেইস্থানে যাইব।' কেহ কেহ বিজয়বাবু ও কাকামহাশয়ের পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অনেক বিলাপ করিয়া তাহারা বলিতে লাগিল,—'আমাদের লক্ষ্মীকে আপনারা লইয়া যাইবেন না। সুবালা দিদি গ্রামের অধীশ্বরী হইয়াছেন, তাহা ভাবিয়া আমাদের মনে বড় ভরসা হইয়াছিল। ভগবানও সেইদিন হইতে আমাদের প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়াছেন। কত বৎসর পরে এ বৎসর সুবৃষ্টি হইয়াছে। এ বৎসর প্রচুর ধান্য জন্মিবে, তাহার লক্ষণ চারিদিকে প্রতীয়মান হইতেছে। এই সময় জ্বরের প্রাদুর্ভাব হয়, কিন্তু এ বৎসর হয় নাই। আমরা পরম সুখে কালযাপন করিতেছি। আমাদিগকে হতাশ করিয়া, পুনরায় আমাদিগকে দুঃখসাগরে ভাসাইয়া, আমাদের লক্ষ্মীকে আপনারা লইয়া যাইবেন না।'

নবম অধ্যায় – শেষ কথা

তাহাদের ক্রন্দন দেখিয়া সুবালাও সেই সঙ্গে কাঁদিতে লাগিলেন। সুবালাও বলিলেন,— 'তোমরা ভয় করিও না। আমি তোমাদিগকে কখনও ভুলিব না। সর্বদাই তোমাদের তত্ত্ব লইব। তোমরা যাহাতে সুখে থাক, সর্বদাই আমি সে চেষ্টা করিব। বিপদ আপদ হইলে,

তোমরা আমাকে সংবাদ দিবে। তোমাদিগকে দায় হইতে উদ্ধার করিতে যথাসাধ্য আমি চেষ্টা করিব।'

বিজয়বাবু, বিনয় ও তাঁহার মাতা কলিকাতা গমন করিলেন। খুড়ী-মা ও পিসীমায়ের সহিত সুবালা তাঁহার কাকামহাশয়ের বাটীতে গমন করিলেন। গ্রামে সেই সময় পুনরায় কান্নার রেলে পড়িয়া গেল। স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা, শিশু, বৃদ্ধ, ইতর-ভদ্র—সকলে আসিয়া তাঁহার পালকী ঘিরিয়া দাঁড়াইল। অতি কষ্টে তাহাদের নিকট হইতে সুবালা বিদায় প্রাপ্ত হইলেন। গ্রামের বালক-বালিকাগণ বহুদূর পর্যন্ত তাঁহার পালকীর সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িয়া যাইতে লাগিল। পথে পাল্কী থামাইয়া সুবালা তাহাদিগকে সিকি, দুয়ানি ও পয়সা প্রদান করিলেন এবং অনেক প্রবোধ দিয়া তাহাদিগকে বাটী ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন।

বড়ালমহাশয় ও বড়াল-গৃহিণী সুবালার সহিত তাঁহার কাকামহাশয়ের গ্রামে গমন করিলেন। 'অল্পদিন সে স্থানে থাকিব, তাহার পর ফিরিয়া আসিব'—এইরূপ মনন করিয়া তাঁহারা গিয়াছিলেন। কিন্তু সুবালা তাঁহাদিগকে ছাড়িলেন না এবং তাঁহারাও সুবালাকে ছাড়িয়া আসিতে পারিলেন না। কয়েক মাস তাঁহারা সেই গ্রামে রহিলেন, তাহার পর সুবালার সহিত তাঁহারা কলিকাতা গমন করিলেন। অনেক দিন পরে তবে বিজয়বাবু তাঁহাদিগকে গ্রামে প্রত্যাগমন করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন।

যথাসময়ে শুভদিনে ও শুভক্ষণে বিনয়ের সহিত সুবালার বিবাহ হইল। বিজয়বাবুও তাঁহার গৃহিণীর আনন্দের সীমা রহিল না। অতি গৌরবের সহিত তাঁহারা সকলকে বলিতে লাগিলেন,—এস! তোমরা আমাদের মা-লক্ষ্মীকে দেখ।'

সুবালার দয়া-মায়া ও ধর্মপরায়ণতার বিবরণ শ্রবণ করিয়া সকলেই চমৎকৃত হইল ও সকলেই শতমুখে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল।

পাক স্পর্শ অর্থাৎ বৌভাতের দিন বিনয়ের অনেকগুলি বন্ধু নববধূকে দেখিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। বিবাহ প্রভৃতি ক্রিয়া উপলক্ষ্যে বস্ত্রাদি প্রদানের প্রথা অনেকের পক্ষে দণ্ডস্বরূপ হইয়াছে। তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ পাছে সেই দণ্ডে দণ্ডিত হন, সেই নববধূ দেখাইতে বিজয়বাবু প্রথম সম্মত হন নাই। কিন্তু বিনয়ের বন্ধুগণের নিতান্ত অনুরোধে শেষে তাঁহাকে সম্মত হইতে হইল।

পাড়ার অল্প বয়স্কা কন্যা ও বধূগণের দ্বারা পরিবৃতা ও একহাত ঘোমটা দ্বারা অবগুণ্ঠিতা হইয়া, সুবালা একটি ঘরে বসিয়াছিলেন। বিনয়কে ও তাঁহার বন্ধুগণকে সঙ্গে লইয়া বিজয়বাবু সেই ঘরের সম্মুখে বারাণ্ডায় গিয়া দাঁড়াইলেন, পাড়ার একটি কন্যা সুবালাকে বাহিরে আনিল। বিজয়বাবুর আজ্ঞায়—একদিকে বিনয় ও অপর দিকে সুবালা—তাঁহার দুইপার্শ্বে দুইজন দণ্ডায়মান হইলেন। পাড়ার সেই কন্যা অবগুণ্ঠন খুলিয়া নববধূর মুখ সকলকে দেখাইল।

লজ্জায় ও ভয়ে নববধূর পদদ্বয় ঈষৎ কম্পিত হইতেছিল। ঘোর কৃষ্ণবর্ণের চক্ষু-পল্লবগুলি মুদিত নয়নদ্বয়ের উপর পড়িয়া, আহা! কি অপূর্ব শোভার আবির্ভাব হইয়াছিল।

লোকে—'আহা মরি!' বলে, সুবালা সেরূপ রূপবতী ছিলেন না। তাঁহার সৌন্দর্য্য চাকচিক্যশালী সূর্য্যকিরণ দ্বারা গঠিত হয় নাই। তাঁহার সৌন্দর্য্য শরৎকালের পূর্ণচন্দ্রের মৃদু-মধুর সুশীতল রশ্মি দ্বারা গঠিত হইয়াছিল। সাগর হইতে উঠিয়া অমৃতভাণ্ড ভূতলে রাখিয়া লক্ষ্মী যখন দেবগণের সম্মুখে লজ্জায় মস্তক অবনত করিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, যুবকবৃন্দের সম্মুখে দণ্ডায়মানা সুবালাকে আজ সেইরূপ দেখাইতে লাগিল।

বিজয়বাবু বলিলেন,—'সুবালা, মা! একবাব তুমি চক্ষু উন্মীলিত কর। তোমার ঐ দয়া-মায়া পূর্ণ মৃদুভাবাপন্ন মৃগনয়ন দুইটি দেখিয়া সকলের মনে আনন্দ হউক। প্রসন্নবদনে বিস্ফারিতলোচনে সকলের দিকে একবার চাহিয়া দেখ, মা!'

এই বলিয়া বিজয়বাবু পুনরায় তাঁহার ঘোমটা উন্মোচন করিয়া তাঁহার মাথায় কাপড় সরাইয়া দিলেন। শ্বশুরমহাশয়ের আজ্ঞা সুবালা লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না। ক্ষণকালের নিমিত্ত একবার তিনি চাহিয়া দেখিলেন। তাহার পর লজ্জায় পুনরায় তিনি অবগুণ্ঠনে মস্তক ও বদনমণ্ডল আবৃত করিয়া অধোমুখ হইয়া রহিলেন।

বিজয়বাবু অতি স্নেহের সহিত এক হাত বিনয়ের স্কন্ধে ও অপর হাত সুবালার স্কন্ধে রাখিয়া উপস্থিত যুবকবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—'বৎসগণ! কার্য্যোপলক্ষে অনেক লোকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। অনেকের ব্যবহার দেখিয়া আমি হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলাম। ভাবিতাম যে, সত্য, সাধুতা কর্তব্যপরায়ণতা এ দেশে অতি বিরল। যে দেশে সত্য, সাধুতা ও কর্তব্যপরায়ণতা নাই, সে দেশের কিছুতেই মঙ্গল হয় না। আমি ভাবিয়াছিলাম যে, কালক্রমে এই বাঙ্গালী জাতি ধ্বংস হইয়া যাইবে। যাহারা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাদিগকে কুলি-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া অতি কষ্টে দিনপাত করিতে হইবে। কিন্তু আমার পুত্রবধূকে দেখিয়া আমার মনে এখন আশার সঞ্চার হইয়াছে। 'যাহা সত্য, যাহা ধর্মসঙ্গত, যাহা কর্তব্য, তাহা আমি করিব,—এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া আমার পুত্রবধূ কিরূপ মূল্যবান সম্পত্তি ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তাহা তোমরা সকলেই শুনিয়াছ। যে জাতির মধ্যে এরূপ সত্যপরায়ণা বালিকা জন্মিতে পারে, সে জাতির জন্য ভাবনা নাই। আমার পুত্রবধূ যে কেবল একেলা ধর্মপরায়ণা, তাহা কখনই নহে। বোধ হয় দেশে তাঁহার মত শতশত বালক-বালিকা আছে। তাহাদিগকে আমরা জানি না এইমাত্র তবে আর আমাদের ভাবনা কি? ঈশ্বর বাঙ্গালী জাতিকে যেরূপ প্রখর বুদ্ধি দ্বারা বিভূষিত করিয়াছেন সেরূপ প্রখর বুদ্ধি অন্য কোন জাতিকে তিনি প্রদান করেন নাই। এই প্রখর বুদ্ধি যখন সত্য সাধুতা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা দ্বারা আরও প্রভাব বিশিষ্ট হইবে, তখন বাঙ্গালী জাতি পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইবে। পুত্রগণ! আমি ও আমার সমসাময়িক ব্যক্তিগণ ক্রমে বৃদ্ধ হইয়া পড়িতেছি। অল্পদিন পরে পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগকে পরলোকগমন করিতে হইবে। তখন বাঙ্গালী জাতির মান-সম্ভ্রম ও গৌরব তোমাদের হস্তে ন্যস্ত হইবে। বাঙ্গালী জাতির নানারূপ কলঙ্ক আছে। বাঙ্গালী জাতি ভীরু, সম্পন্ন করে না। সেইজন্য বাঙ্গালী পরস্পরকে বিশ্বাস করে না, আর সেই নিমিত্ত পাঁচজনে মিলিত হইয়া

কোন কাজ করিতে পারে না। অন্য জাতির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়াও বাঙ্গালীর জ্ঞান হয় না। তিনশত বৎসর পূর্বে এক ইংরাজ বণিকসম্প্রদায় জনকত মুহুরিকে এ দেশে প্রেরণ করিলেন। বিলাত হইতে ভারত তখন ছয় মাসের পথ ছিল। তথাপি সেই বণিকসম্প্রদায় জনকয়েক মুহুরির সহায়তায় এই বিশাল-ভারত সাম্রাজ্য সংস্থাপিত করিলেন। এখনও দেখ—বিলাতে থাকেন ধনী, ভারতের পূর্বপ্রান্তে আসামের নিবিড় বনে তাঁহারা সামান্য কর্মচারী প্রেরণ করেন। কর্মচারী বন কাটিয়া চাষের ক্ষেত্র করিয়া বিপুল অর্থ উপার্জন করেন। কিন্তু বাঙ্গালী কোন কার্য্যের সূচনা করিয়া, কেবল দুই ক্রোশ মাত্র দূরে কর্মচারী পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত মনে থাকিতে পারে না। বহুদিন হইতে এইরূপ নানাপ্রকার কলঙ্কের পসরা বাঙ্গালী জাতি মাথায় বহন করিয়া আসিতেছেন। বৎসগণ। বাঙ্গালী জাতির এই সমুদয় কলঙ্ক তোমাদিগকে দূর করিতে হইবে। প্রধান কথা এই যে, সত্য, সত্য, সত্য ভিন্ন আমাদের অন্য গতি নাই। সর্বদা সত্যকথা বলিবে। ভুলিয়াও কখন অসত্য কথা বলিবে না। কখনও সত্যপথ হইতে বিচলিত হইবে না। 'অসত্য কথা, অসত্য আচরণ বাঙ্গালী একেবারেই জানে না,—যখন আমাদের এই যশ জগতে ঘোষিত হইবে, তখন বাঙ্গালীর ঘর ধনধান্যে পূর্ণ হইবে, বাঙ্গালী বিদ্যা, বুদ্ধি ও ধর্মপ্রভাবে জগতে নূতন প্রাণের সঞ্চার হইবে, সকল জাতি তখন বাঙ্গালীকে পূজা করিবে, বাঙ্গালীর গৌরবে তখন সমস্ত পৃথিবী আলোকিত হইবে। বৎসগণ! একমাত্র সত্য, সত্য, সত্য ভিন্ন আর আমাদের অন্য গতি নাই। পুনরায় বলি,—সত্যপথ হইতে কখনও বিচলিত হইবে না। তোমাদের নিকট আমার এই একান্ত মিনতি।

'আর একটি উপদেশ তোমাদিগকে আমি প্রদান করি। অন্যের কাছ হইতে কিছু লইব, অন্য লোক আমাকে দিউক,—কখনও এরূপ কামনা করিবে না। নীচপ্রবৃত্তি-বিশিষ্ট লোকেরা এইরূপ কামনা করে। যাহারা অন্য লোকের নিকট হইতে কিছু লইতে চেষ্টা করে, জগদীশ্বর চিরকাল তাহাদিগকে পর-প্রত্যাশী করিয়া রাখে। আমি এরূপ অনেক লোককে দেখিয়াছি। তাহাদের মনে লজ্জা নাই। কিন্তু সাধারণের নিকট তাহারা যে কিরূপ ঘৃণার পাত্র, তাহা তাহারা জানে না। কাহারও নিকট হইতে যেন কিছু লইতে না হয় অন্য লোককে যেন দিতে পারি, জগদীশ্বরের নিকট ও পিতৃলোকের নিকট সর্বদা এইরূপ প্রার্থনা করিবে।'

তাহার পর সুবালার নিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন,—'মা সুবালা! সর্বগুণে গুণান্বিতা তুমি, তোমাকে আমি এখন এই আশীর্বাদ করি যে, তুমি সত্যবাদী, ধর্মপরায়ণ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ বীরপুত্রদিগের জননী হও।'

সুবালাকে লইয়া পাড়ার কন্যাটি পুনরায় ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। বিনয়ের বন্ধুগণ বাহির-বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। বিজয়ের মাতা-পিতা—পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া—মনের সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

—o—

ডমরু-চরিত

প্রথম গল্প

প্রথম পরিচ্ছেদ – সূচনা

ডমরুধর বলিলেন,—'এই যে দুর্গোৎসবটি, এটি তোমরা সামান্য জ্ঞান করিও না। কিন্তু এখানকার বাবুদের সে বোধ নাই। বাবুরা এখন হাওয়াখোর হইয়াছেন। দেশে হাওয়া নাই, বিদেশে গমন করিয়া বাবুরা হাওয়া সেবন করেন, আর বাপপিতামহের পূজার দালান ছুঁচো-চামচিকাতে অপরিষ্কার করে।'

লম্বোদর বলিলেন,—'সত্য কথা! সেকালে পূজার সময় লোকে বিদেশ হইতে বাড়ী আসিত। বন্ধু-বান্ধবের সহিত মিলিত হইত। যাহার যেমন ক্ষমতা মায়ের পূজা করিত, গরীব-দুঃখীরা অন্ততঃ একসরা খয়ে-মুড়কি ও দুইটি নারিকেল-নাড়ু পাইত।'

শঙ্কর ঘোষ বলিলেন,—'শুনিয়াছি যে, কলিকাতায় পূজা করা এক নূতন ব্যবসা হইয়াছে। একটি প্রতিমা খাড়া করিয়া বন্ধু-বান্ধবদিগকে লোক নিমন্ত্রণ করে, পরে তাহাদের কান মলিয়া প্রণামি আদায় করে। পূজা করিয়া অনেকে দুই পয়সা উপার্জন করে।'

ডমরুধর বলিলেন,—'তাহাতে আর দোষ কি? পূজার সময় আমি আমার প্রজাগণকে নিমন্ত্রণ করি। ভক্তিভাবে মায়ের পাদপদ্মে তাহারা যদি কিছু প্রণামি প্রদান করে, তাহাতে আর আপত্তি কি? যাহা, বিলক্ষণ ঠেকিয়া এই দুর্গোৎসব আরম্ভ করিয়াছি। আমি এখন বুঝিয়াছি যে, ভগবতীর আরাধনা করিলে ধনসম্পদ হয়।'

পুরোহিত বলিলেন,—'তে সম্মতা জনপদেষু ধনানি তেষাং, তেষাং যশাংসি ন চ সীদতি ধর্মবর্গঃ। হে দেবী! তুমি যাহার প্রতি কৃপা কর, জনপদে সে পূজিত হয়; তাহার ধন ও যশ হয়, তাহার ধর্ম অক্ষুন্ন থাকে।

কলিকাতার দক্ষিণে একখানি গ্রামে ডমরুধরের বাস। প্রথম বয়সে তিনি নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন। অনেক কৌশল করিয়া সাধ্যমতে একটি পয়সাও খরচ না করিয়া তিনি প্রভুত ধনশালী হইয়াছেন। অন্যান্য সম্পত্তির মধ্যে সুন্দরবনের আবাদে তাঁহার এখন বিলক্ষণ লাভ হইয়াছে। ডমরুধর এখন পাকা ইমারতে বাস করেন। পূজার পঞ্চমীর দিন সন্ধ্যার পর দালানে, যেস্থানে প্রতিমা হইয়াছে, সেই স্থানে গল্পগাছা প্রসঙ্গে এরূপ কথাবার্তা হইতেছিল।

ডমরুধর পুনরায় বলিলেন,—'হাঁ! মা, আমাকে ঘোরতর বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই বিপদে পড়িয়া, একান্ত মনে মাকে ডাকিয়া আমি বলিয়াছিলাম, 'মা!

তুমি আমাকে এ সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ কর। তাহা করিলে প্রতি বৎসর আমি তোমার পূজা করিব'।'

লম্বোদর বলিলেন,—'তুমি তো কেবল তিন বৎসরের ভিতর তোমাকে তো কোন বিপদে পড়িতে দেখি নাই। বরং তিন বৎসর পূর্বে এই বৃদ্ধবয়সে তুমি নূতন পত্নী লাভ করিয়াছ।'

ডমরুধর বলিলেন,—'তিন বৎসর পূর্বে আমি ঘোরতর বিপদে পড়িয়াছিলাম। তৃতীয় পক্ষ বিবাহের সময় আমি সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিলাম। গ্রামের লোক, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব কেহই সে কথা জানে না। মুখ ফুটিয়া আজ পর্যন্ত কাহারও নিকট সে কথা আমি প্রকাশ করি নাই। মা জগদম্বা আমাকে সে বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। দুর্গতিনাশিনী দুর্গার প্রতি লোকের ভক্তি ক্রমে লোপ হইতেছে। কলেরা ম্যালেরিয়া বসন্ত প্লেগ তো আছেই, মায়ের প্রতি ভক্তির অভাবে এখন আবার ফুলো রোগ দেখা দিয়াছে ঘুমন্ত রোগও আসিয়াছে। জগদম্বার প্রতি ভক্তি থাকিলে লোকের এসব বিপদ হয় না।'

পুরোহিত অপরিস্ফুট স্বরে বলিলেন,—
'দুর্গে! স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ,
স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি।।
দারিদ্র্যদুঃখ ভয়হারিণি! কা ত্বদন্যা,
সর্বোপকারকরণায় সদার্দ্র চিন্তা।।"

হে দুর্গে! বিপদে পড়িয়া তোমাকে স্মরণ করিলে জীবগণের ভয় তুমি দূর কর। সুস্থ অবস্থায় তোমাকে স্মরণ করিলে তুমি তাহাদের মঙ্গল কর। হে দারিদ্র্যদুঃখহারিণি! সর্বপ্রকার উপকার করিবার নিমিত্ত তুমি ভিন্ন দয়ার্দ্রচিন্তা আর কে আছে?'

লম্বোদর বলিলেন,—'কিন্তু বিপদটা কি? কি বিপদে তুমি পড়িয়াছিলে?' ডমরুধর বলিলেন,—'এতদিন পরে সে বিপদের কথা আজ আমি প্রকাশ করিতেছি, শুন।'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ – ঠিক কন্দর্প পুরুষ কি

ডমরুধর বলিলেন,—'আমার তৃতীয় বিবাহের সময় এ বিপদ ঘটিয়াছিল। আমার বয়স তখন পঁয়ষট্টি বৎসর। এত বয়সে লোক বিবাহ করে না। তবে আমার ছেলে-বেটা মানুষ হইল না। আমি তাহাকে ত্যাজ্যপুত্র করিলাম। কোথায় সে চলিয়া গেল। সে একটি স্বতন্ত্র গল্প।'

শঙ্কর ঘোষ বলিলেন,—'সে গল্প আর একদিন হইবে।'

ডমরুধর বলিলেন,—'তাহার পর বিবাহ না করিলে গৃহ শূন্য হইয়া থাকে। কিন্তু বিবাহ করিলেও কি হয়, তা জান তো লম্বোদর?'

লম্বোদর উত্তর করিলেন,—'খ্যাচ খ্যাচ, রাত্রি দিন খ্যাচ খ্যাচ।'

ডমরুধর বলিলেন,—'হাঁ, তুমি ভুক্তভোগী। ঘটনাচক্রে আমার এই বিবাহের কথা স্থির হইয়াছিল। আমডাঙ্গার মাঠে আমার যে বৃহৎ বাগান আছে, সে বৎসর বৈশাখ মাসে সেই বাগানে গিয়া আমি বেড়াইতেছিলাম। দুই চারি দিন পূর্বে আমার পুরাতন উড়ে মালী দেশে গিয়াছিল, ভাইপোকে তাহার স্থানে রাখিয়া গিয়াছিল। সে আমাকে কখন দেখে নাই, আমি তাহাকে কখন দেখি নাই। ঘোষের জামাতা সেই ছোঁড়ার সহিত সড় করিয়া চোর বলিয়া আমাকে বাঁধিয়া ফেলিল। তাহার পর মারিতে মারিতে কুতবপুরের মহকুমাতে আমাকে লইয়া গেল। কিন্তু সে আবার একটি স্বতন্ত্র গল্প।'

শঙ্কর ঘোষ জিজ্ঞাসা করিলেন,—'এই বিপদ?'

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—'রাম রাম! এ সামান্য কথা ইহা অপেক্ষা ঘোরতর সঙ্কটে আমি পড়িয়াছিলাম। সেই সঙ্কট হইতে মা দুর্গা আমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন।'

দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ডমরুধর পুনরায় বলিলেন,—'কুতবপুরে ঘটকীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল, পুনরায় বিবাহ করিতে সে আমাকে প্রবলত্তি দিল। আমি বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। বিবাহের কথাবার্তা চলিতে লাগিল। টাকায় কি না হয়? বাঁশপুরে এক বয়স্কা কন্যার সহিত বিবাহ স্থির হইল। তিনিই আমার বর্তমান গৃহিণী।'

লম্বোদর বলিলেন,—'সে কথা আমরা জানি, আমরা বরযাত্র গিয়াছিলাম।'

ডমরুধর বলিলেন,—'কন্যার মাতা-পিতা অর্থহীন বটে, কিন্তু আমার নিকট হইতে নগদ টাকা চাহিলেন না। তবে ঘটকী বলিল যে, বিবাহের সমুদয় খরচা আমাকে দিতে হইবে এবং কন্যার শরীরে যেখানে যা ধরে, সেইরূপ অলঙ্কার দিতে হইবে। তোমরা জান যে, আমি কখন একটি পয়সা বাজে খরচ করি না। লোক পাছে অলস হইয়া পড়ে সেই ভয়ে ভিখারীকে কখন মুষ্টিভিক্ষা প্রদান করি না। সেক্‌রার পেট ভরাইতে প্রথম আমি সম্মত হইলাম না। আমি বলিলাম যে, গহনার পরিবর্তে কন্যার আঁচলে নোট বাঁধিয়া দিব। কিন্তু কন্যার মাতা-পিতা সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। অবশেষে আমি ভাবিয়া দেখিলাম যে, আমার বয়স পঁয়ষট্টি বৎসর, তাহার পর আমাকে দেখিয়া কেহ বলে না যে, ইনি সাক্ষাৎ কন্দর্প-পুরুষ। নিজের কথা নিজে বলিতে ক্ষতি নাই;—এই দেখ, আমার দেহের বর্ণটি ঠিক যেন দময়ন্তীর পোড়া শোউল মাছ। দাঁত একটিও নাই, মাথার মাঝখানে টাক, তাহার চারিদিকে চুল, তাহাতে একগাছিও কাঁচা চুল নাই, মুখে ঠোঁটের দুইপাশে সাদা সাদা সব কি হইয়াছে। এইসব কথা ভাবিয়া গহনা দিতে আমি সম্মত হইলাম! যতদূর সাধ্য সাদা মাটা পেটা সোনার গহনা গড়াইলাম; কিন্তু তাহাতেও আমার অনেক টাকা খরচ হইল। ফর্দ অনেক। একবাক্স গহনা হইল।'

শঙ্কর ঘোষ বলিলেন,—'তা বটে! কিন্তু বিপদটা কি?'

ডমরুধর বলিলেন,—'ব্যস্ত হইও না। শুন।'

তৃতীয় পরিচ্ছেদ – গাছে-ঝোলা সাধু

ডমরুধর বলিলেন,—'গ্রামের প্রান্তভাগে বিন্দী গোয়ালিনীর যে ভিটা আছে, সে জমি আমার। কিছুদিন পূর্বে বিন্দী মরিয়া গিয়াছিল। তাহার চালাঘরখানি তখনও ছিল। দুইজন চেলা সঙ্গে কোথা হইতে এক সাধু আসিয়া সেই চালাঘরে আশ্রয় লইল। সে সাধুকে তোমরা সকলেই দেখিয়াছ, তাহাকে সকলেই জান। সাধুর দুইটি চক্ষু অন্ধ। চেলারা বলিল যে, তাহার বয়স পাঁচশত তিপ্পান্ন বৎসর। চালাঘরের সম্মুখে যে আমগাছ আছে, চেলারা তাহার ডালে সাধুর দুই পা বাঁধিয়া দিত। প্রতিদিন প্রাতঃকালে এক ঘণ্টাকাল নীচের দিকে মুখ করিয়া সাধু ঝুলিয়া থাকিত। চারিদিকে হৈ-হৈ পড়িয়া গেল। যাহারা বি-এ, এম-এ পাস করিয়াছে, সেই ছোঁড়ারা আসিয়া সাধুর কেহ পা টিপিতে লাগিল, কেহ বাতাস করিতে লাগিল, সকলেই পাদোদক খাইতে লাগিল। একখানি হুজুগে ইংরেজী কাগজের লোক আসিয়া সাধুকে দর্শন করিল ও তাহাদের কাগজে সাধুর মহিমা গান করিয়া দীর্ঘ দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিতে লাগিল। ফল কথা, দেশের লোকের ভক্তি একেবারে উথলিয়া পড়িল। সাধুর মাথার নিম্নে চেলারা একটি ধামা রাখিল; সেই ধামায় পয়সা-বৃষ্টি হইতে লাগিল।'

লম্বোদর বলিলেন,—'তুমিও সেই হুজুগে দু'পয়সা লাভ করিয়াছিলে!'

ডমরুধর বলিলেন,—'সে জমি আমার, সে চালা আমার, সে আমগাছ আমার; কেন আমি লাভ করিব না? আমি সাধুকে গিয়া বলিলাম,—'ঠাকুর! সন্ন্যাসী মোহান্তের প্রতি আমার যে ভক্তি নাই, তাহা নহে। তবে কি জান, আমি বিষয়ী লোক। তুমি আমার জমিতে আস্তানা গাড়িয়াছ। দু'পয়সা বিলক্ষণ তোমার আমদানি হইতেছে। ভূস্বামীকে ট্যাক্স দিতে হইবে।'

সাধু উত্তর করিলেন,—'আমরা উদাসীন। আমি নিজে বায়ু ভক্ষণ করি। চেলারা এখনও যৎকিঞ্চিৎ আহার করে। দীন দুঃখীকে আমরা কিছু দান করি। কোন পরিব্রাজক আসিলে তাহার সেবার কিঞ্চিৎ অর্থব্যয় করি। সেজন্য পুণ্যাত্মা ভক্তগণ যাহা প্রদান করে, আমার শিষ্যদ্বয় এ স্থানে খরচের জন্য তাহার অর্দ্ধেক রাখিয়া, অবশিষ্ট ধন প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় তোমাকে দিয়া আসিবে।' বলা বাহুল্য যে, আহ্লাদ সহকারে আমি এ প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। কোনদিন চারি টাকা কোনদিন পাঁচ টাকা আমার লাভ হইতে লাগিল। সন্ন্যাসীর প্রতি আমার প্রগাঢ় ভক্তি হইল। যাহাতে তাহার পসার-প্রতিপত্তি আরও বৃদ্ধি হয়, দেশের যত উজবুক যাহাতে তাহার গোঁড়া হয়, সেজন্য আমি চেষ্টা করিতে লাগিলাম। মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম যে, দুগ্ধবতী গাভীর ন্যায় সন্ন্যাসীটিকে আমি পুষিয়া রাখিব। কিন্তু একটা হুজুগ লইয়া বাঙ্গালী অধিক দিন থাকিতে পারে না। হুজুগ একটু পুরাতন হইলেই বাঙ্গালী পুনরায় নতুন হুজুগের সৃষ্টি করে। অথবা এই বঙ্গভূমির মাটির গুণে আপনা হইতেই নূতন হুজুগের উৎপত্তি হয়। এই সময় এ স্থান হইতে চারি ক্রোশ দূরে পাঁচগেছে রসিক মণ্ডলের সপ্তমবর্ষীয়া কন্যার স্কন্ধে মাকালঠাকুর অধিষ্ঠান হইলেন। রসিম মণ্ডল জাতিতে পোদ। মাকালঠাকুরের ভরে সেই কন্যা লোককে ঔষধ দিতে লাগিল।

দেবদত্ত ঔষধের গুণে অন্ধের চক্ষু, বধিরের কর্ণ, পঙ্গুর পা হইতে লাগিল। বোবার কথা ফুটিতে লাগিল। কতকগুলি সুস্থ লোককে কানা খোঁড়া, হাবা কালা, জোরে অম্বুলে সাজাইতে হয়, তা না করিলে এ কাজে পসার হয় না। তুলসীর মালা গলায় দিয়া সেই ইংরাজী কাগজের লেখকও সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইল। ভক্তিতে গদগদ হইয়া কত কি তাহাদের কাগজে লিখিয়া বসিল। বি-এ, এম-এ পাস করা ছোঁড়ারা আবার সন্ন্যাসীকে ছাড়িয়া সেই পোদ ছুঁড়ীর পাদক-জল খাইতে গেল। কাতারে কাতারে সেই গ্রামে লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল। রসিক মণ্ডলের ঘরে টাকা-পয়সা আর ধরে না। আমার সন্ন্যাসীর আস্তানা ভোঁ ভোঁ হইয়া গেল। রসিক মণ্ডলের মত আমার কেন বুদ্ধি যোগায় নাই, আমি কেন সেইরূপ ফন্দি করি নাই, আমি কেন একটা ছোট ছুঁড়ীকে বাহির করি নাই, সেই আপশোষে আমার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

এইরূপ দুঃখে আছি, এমন সময় একজন চেলা সন্ন্যাসীর হাত ধরিয়া আমার বাড়ীতে আনিয়া উপস্থিত করিল। সন্ন্যাসী বলিল যে, নিভৃতে তোমার সহিত কোন কথা আছে। আমি, সন্ন্যাসী ও তাহার চেলা এক ঘরে যাইলাম। সন্ন্যাসী বলিল যে, ট্যাক্স বন্ধ হইয়া গিয়াছে, সে জন্য নিশ্চয় তোমার মনে সন্দ হইয়াছে, কিন্তু দুঃখ করিও না, অন্য উপায়ে তোমাকে আমি বিপুল ধনের অধিকারী করিব। একটি টাকা দাও দেখি!

সন্ন্যাসীর হাতে আমি একটি টাকা দিলাম। সেই টাকাটিকে তৎক্ষণাৎ দ্বিগুণ করিয়া দুইটি টাকা আমার হাতে দিল। তাহার পর সন্ন্যাসীর আদেশে ভিতর হইতে একটি মোহর আনিয়া দিলাম, তাহাও ডবল করিয়া দুইটি মোহর সন্ন্যাসী আমার হাতে দিল। শেষে একখানি দশ টাকার নোটও ডবল করিয়া আমার হাতে দিল।

তাহার পর সন্ন্যাসী আমাকে বলিল,—'এ কাজ অধিক পরিমাণে করিতে গেলে পূজা-পাঠের আবশ্যক। তোমার ঘরে যত টাকা, মোহর, নোট, সোনা-রূপা আছে, পূজা-পাঠ করিয়া সমুদয় আমি ডবল করিয়া দিব।

আমি উত্তর করিলাম,—'সন্ন্যাসীঠাকুর! আমি নিতান্ত বোকা নই। এরূপ বুজরুকির কথা আমি অনেক শুনিয়াছি। গৃহস্থের বাড়ী গিয়া দুই-একটি টাকা অথবা নোট ডবল করিয়া তোমরা গৃহস্বামীর বিশ্বাস উৎপাদন কর। তোমাদের কুহকে পড়িয়া গৃহস্বামী ঘরের সমুদয় টাকা-কড়ি গহনা-পত্র আনিয়া দেয়। হাঁড়ী অথবা বাক্সের ভিতর সেগুলি বন্ধ করিয়া তোমরা পূজা কর। পূজা সমাপ্ত করিয়া সাত দিন কি আট দিন পরে গৃহস্বামীকে খুলিয়া দেখিতে বল। সেই অবসরে তোমরা চম্পট দাও। সাত আট দিন পরে গৃহস্বামী খুলিয়া দেখে যে হাঁড়ী ঢন ঢন্। বাজিকরের ও-চালাকি আমার কাছে খাটিবে না।'

সন্ন্যাসী বলিল,—'পূজা-পাঠ করিয়া আমি চলিয়া যাইব না। তোমার ঘরে তুমি আমাকে বন্ধ করিয়া রাখিও। আর দেখ আমি অন্ধ। কাহারও সহায়তা ভিন্ন দুই পা চলিতে পারি না। পলাইব কি করিয়া? পূজার দিন কোন শিষ্যকে আমি এ স্থানে আসিতে দিব-না। সাত দিন পরে তোমাকে টাকা-কড়ি খুলিয়া দেখিতে বলিব না; পূজা সমাপ্ত হইলেই

তৎক্ষণাৎ তুমি খুলিয়া দেখিবে যে, সমুদয় সম্পত্তি দ্বিগুণ হইয়া গিয়াছে।'

সন্ন্যাসীর এরূপ প্রস্তাবে আমি সম্মত হইলাম। সন্ন্যাসী শুভদিন ও শুভলগ্ন স্থির করিল। পূজা ও হোমের উপকরণের ফর্দ দিল। সে সমুদয় আমি সংগ্রহ করিলাম। বাড়ীর দোতলায় নিভৃত একটি ঘরে পূজার আয়োজন করিলাম। ঘরে টাকা, মোহর নোট যত ছিল ও বিবাহের নিমিত্ত যে গহনা গড়াইয়াছিলাম, সে সমুদয় বৃহৎ একটি বাক্সের মধ্যে বন্ধ করিয়া পূজার স্থানে লইয়া যাইলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ – চিত্রগুপ্তের গলায় দড়ি—মোটা দড়ি নয়

নির্ধারিত দিন সন্ধ্যার সময় কেবল সন্ন্যাসী ও আমি সেই ঘরে গিয়া উপবেশন করিলাম। সন্ন্যাসী পাছে কোনরূপে পলায়ন করে, সেজন্য ঘরের দ্বারে চাকরকে কুলুপ দিয়া বন্ধ করিতে বলিলাম এবং একটু দূরে তাহাকে সতর্কভাবে পাহারা দিতে আদেশ করিলাম। সন্ন্যাসী ঘট স্থাপন করিল। দধি, পিঠালি ও সিঁদুর দিয়া ঘটে কি সব অঙ্কন করিল। তাহর পর ফট্ বষট্ শ্রীং ঐং এইরূপ কত কি মন্ত্র উচ্চারণ করিল। অবশেষে হোম করিতে আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণ পরে স্বাহা স্বাহা বলিয়া আগুনে ঘৃত দিয়া সন্ন্যাসী আপনার থলি হাতড়াইয়া একটি টিনের কৌটা বাহির করিল। সেই কৌটাতে এক প্রকাব সবুজ রঙের গুঁড়া ছিল। হরিৎ বর্ণের সেই চূর্ণ সন্ন্যাসী আগুনে ফেলিয়া দিল।

ঘর সবুজ বর্ণের ধূমে পরিপূর্ণ হইল। আমার নিদ্রার আবেশ হইল। আমি ভাবিলাম যে, এইবার সন্ন্যাসী বেটা একটা কাণ্ড করিবে, আমাকে অজ্ঞান করিয়া আমার টাকাকড়ি লইয়া কোনরূপে পলায়ন করিবে। উঠিয়া, দ্বারে ধাক্কা মাবিয়া আমার চাকরকে ডাকিব এইরূপ মানস করিলাম। আমি উঠিতে পারিলাম না। আমার হাত-পা অবশ অষাড় হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু আমার জ্ঞান ছিল। হঠাৎ আমার মাথা হইতে 'আমি' বাহির হইয়া পড়িলাম। আমার শরীরটি তৎক্ষণাৎ মাটীর উপর শুইয়া পড়িল। শরীর হইতে 'আমি' বাহির হইয়াছি, তাহার দিকে তখন চাহিয়া দেখিলাম। দেখিলাম যে সে 'আমি' অতি ক্ষুদ্র, ঠিক বুড়ো আঙ্গুলের মত, আর সে শরীর বায়ু দিয়া গঠিত। সেই ক্ষুদ্রশরীরে আমি উপর দিকে উঠিতে লাগিলাম। সূক্ষ্ম বা লিঙ্গশরীরের কথা পূর্বে শুনিয়াছিলাম। মনে করিলাম যে, ঔষধের ধূমে সন্ন্যাসী আমাকে হত্যা করিয়াছে, মৃত্যুর পর লোকের যে লিঙ্গশরীর থাকে, তাহাই এখন যমের বাড়ী যাইতেছে।

ছাদ ফুঁড়িয়া আমি উপরে উঠিয়া পড়িলাম! সোঁ সোঁ করিয়া আকাশপথে চলিলাম। দূর-দূর-দূর—কতদূর উপরে উঠিয়া পড়িলাম, তাহা বলিতে পারি না। মেঘ পার হইয়া যাইলাম, চন্দ্রলোক পার হইয়া যাইলাম, সূর্য্যালোকে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সে স্থানে আশ্চর্য ঘটনা দর্শন করিলাম। দেখিলাম যে, আকাশ-বুড়ী এক কদমগাছতলায় বসিয়া, আঁশবঁটি দিয়া সূর্যটিকে কুটি কুটি করিয়া কাটিতেছে, আর ছোট ছোট সেই সূর্যখণ্ডগুলি আকাশ-পটে জুড়িয়া দিতেছে। তখন আমি ভাবিলাম,—'ওঃ! নক্ষত্র এই প্রকার হয় বটে!

তবে এই যে নক্ষত্র সব, ইহারা সূর্যখণ্ড ব্যতীত আর কিছুই নহে! যে খণ্ডগুলি বুড়ী আকাশ-পটে ভাল করিয়া জুড়িয়া দিতে পারে না, আলগা হইয়া সেইগুলি খসিয়া পড়ে। তখন লোকে বলে,—'নক্ষত্র পাত হইল।' কিছুক্ষণ পরে আমার ভয় হইল যে,—সূর্যটি তো গেল, পৃথিবীতে পুনরায় দিন হইবে কি করিয়া? আকাশ-বুড়ী আমার মনের ভাব বুঝিয়া হাসিয়া বলিল,—'ভোরে ভোরে উঠিয়া আকাশ ঝাড়ু দিয়া সমুদয় নক্ষত্রগুলি আমি একত্র করিব। সেইগুলি জুড়িয়া পুনরায় আস্ত সূর্য করিয়া প্রাতঃকালে উদয় হইতে পাঠাইব। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা আঁশবঁটি দিয়া সূর্য কাটিয়া নক্ষত্র করি, সকালবেলা আবার জুড়িয়া আস্ত সূর্য প্রস্তুত করি। আমার এই কাজ।'

আকাশ-বুড়ীর নিকট হইতে বিদায় হইয়া, আমি ভাবিলাম যে, নভোমণ্ডলের সমুদয় ব্যাপারটা ভাল করিয়া দেখিতে হইবে। এইরূপ ভাবিয়া পুনরায় আমি শূন্যপথে সোঁ সোঁ করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। কিন্তু সর্বনাশ! কিছুদূর গিয়া দেখি যে, দুইটা বিকটাকার যমদূত আমার আর একটা সূক্ষ্ম শরীরকে লইয়া যাইতেছে। আমার বড় ভয় হইল। সে স্থানে মেঘ নাই যে, তাহার ভিতর লুকাইব। পলাইবার সময় পাইলাম না। খপ করিয়া তাহারা আমাকে ধরিয়া ফেলিল। একজন জিজ্ঞাসা করিল,—'তুই বেটা কে রে? সত্য যুগের রাজা হরিশ্চন্দ্র ভিন্ন বে-ওয়ারিশ হইয়া আর কাহারও এখানে বেড়াইবার হুকুম নাই। নিশ্চয় তুমি বেটা কুম্ভিপাক অথবা রৌরব নরকের ফেরারি আসামী।' এই বলিয়া তাহারা আমাকে বাঁধিয়া ফেলিল ও ধাক্কা মারিতে মারিতে লইয়া চলিল।

ক্রমে আমরা যমপুরীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। যম দরবার করিয়া সিংহাসনে বসিয়া আছেন। পাশে স্তূপাকার খাতাপত্রের সহিত চিত্রগুপ্ত, সম্মুখে ডাঙ্গস হাতে ভীষণমূর্তি যমদূতের পাল। আমাদের দুইজনকে যমদূতেরা সেই রাজসভায় হাজির করিল। প্রথমে অপর লোকটির বিচার আরম্ভ হইল।

চিত্রগুপ্ত তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তোমার নাম?'

সে উত্তর করিল,—'আমার নাম বৃন্দাবন গুঁই।'

তাহার পর কোথায়, কি জাতি প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিয়া খাতাপত্র দেখিয়া যমকে চিত্রগুপ্ত বলিলেন,—'মহাশয়! এ লোকটি অতি ধার্মিক, অতি পুণ্যবান। পৃথিবীতে বসিয়া এ বার মাসে তের পার্বন করিত, দীন-দুঃখীর প্রতি সর্বদা দয়া করিত, সত্য ও পরোপকার ইহার ব্রত ছিল।'

এই কথা শুনিয়া যম চটিয়া গেলেন। তিনি বলিলেন,—'চিত্রগুপ্ত! তোমাকে আমি বারবার বলিয়াছি যে, পৃথিবীতে গিয়া মানুষ কি কাজ করিয়াছে, কি কাজ না করিয়াছে, তাহার আমি বিচার করি না। মানুষ কি খাইয়াছে, কি না খাইয়াছে, তাহার আমি বিচার করি। ব্রহ্মহত্যা, গো-হত্যা, স্ত্রী-হত্যা করিলে এখন মানুষের পাপ হয় না, অশাস্ত্রীয় খাদ্য খাইলে মানুষের পাপ হয়। তবে শিবোক্ত তন্ত্রশাস্ত্র মতে সংশোধন করিয়া খাইলে পাপ হয় না। তন্ত্রশাস্ত্রে শিব বলিয়াছেন,—

'গো-মেষাশ্ব-মহিষন-গোধাজোষ্ট্র-মৃগোদ্ভবম্।
মহামাংসাষ্টকং প্রোক্তং দেবতাপ্রীতিকারম্।।'

গোমাংস, মেষমাংস, অশ্বমাংস, মহিষমাংস, গাধামাংস, ছাগমাংস, উষ্ট্রমাংস ও মৃগমাংস—এই অষ্টবিধ মাংসকে মহামাংস বলে। এই সকল মাংসই দেবতাদিগের তৃপ্তিদায়ক। 'ওঁ প্রতদ্বিষ্ণুস্তবতে' অথবা 'ওঁ ব্রহ্মার্পণমস্তু' এই মন্ত্রে সংশোধন করিয়া লইলে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণও এই সমুদয় মাংস ভক্ষণ করিতে পারে। মৃগমাংসের ভিতর শূকরের মাংসও ধরিয়াও লইতে হইবে। তন্ত্রশাস্ত্রে যাহাকে কলামাংস বলে, শিব তাহা খাইতেও অনুমতি দিয়াছেন আর দেখ, চিত্রগুপ্ত! তুমি এ কেরাণীগিরি ছাড়িয়া দাও। পৃথিবীতে তোমার বংশধর কায়স্থগণ কি করিতেছে, একবার চাহিয়া দেখ। উড়ে গয়লার মত এক এক গাছা সূতা অনেকে গলায় পরিতেছে। ব্রাহ্মণকে তাহারা আর প্রণাম করে না। ইংরাজী পড়িয়া তাহাদের মেজাজ আগুন হইয়া গিয়াছে। তাই বলি হে, চিত্রগুপ্ত! তুমিও ইংরাজী পড়। ইংরাজী পড়িয়া তোমার হেডটি গরম কর। হেডটি গরম করিয়া তুমিও গলায় দড়ি দাও। মোটা দড়ি নয়। বুঝিয়াছ তো? গলায় দড়ি দিয়া 'চিত্রবর্ম্মা' নাম গ্রহণ কর।

এই কথা বলিয়া যম নিজে সেই লোকটিকে জেরা করিতে লাগিলেন,—'কেমন হে বাপু! কখনও বিলাতি বিস্কুট খাইয়াছিলে?

সে উত্তর করিল,—'আজ্ঞে না।'

যম জিজ্ঞাসা করিলেন,—'বিলাতি পানি? যাহা খুলিতে ফট্ করিয়া শব্দ হয়? যাহার জল বিজবিজ করে?'

সে উত্তর করিল,—'আজ্ঞে না।'

যম পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'সত্য করিয়া বল, কোনরূপ অশাস্ত্রীয় খাদ্য ভক্ষণ করিয়াছিলে কি না?

সে ভাবিয়া-চিন্তিয়া উত্তর করিল,—'আজ্ঞা একবার ভ্রমক্রমে একাদশীর দিন পুঁইশাক খাইয়া ফেলিয়াছিলাম।'

যমের সর্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন,—'সর্বনাশ! করিয়াছ কি! একাদশীর দিন পুঁইশাক! ওরে এই মুহূর্তে ইহাকে রৌরব নরকে নিক্ষেপ কর। ইহার পূর্বপুরুষ, যাহারা স্বর্গে আছে, তাহাদিগেকেও সে নরকে নিক্ষেপ কর। পরে ইহার বংশধরগণের চৌদ্দ পুরুষ পর্যন্তও সেই নরকে যাইবে। চিত্রগুপ্ত! আমার এই আদেশ তোমার খাতায় লিখিয়া রাখ।'

যমের এই বিচার দেখিয়া আমি তো অবাক। এইবার আমার বিচার। কিন্তু আমার বিচার আরম্ভ হইতে না হইতে আমি উচ্চৈঃস্বরে বলিলাম,—'মহারাজ! আমি কখন একাদশীর দিন পুঁইশাক ভক্ষণ করি নাই।'

আমার কথায় যম চমৎকৃত হইলেন। হর্ষোৎফুল্ল লোচনে তিনি বলিলেন,—'সাধু সাধু! এই লোকটি একাদশীর দিন পুঁইশাক খায় নাই। সাধু সাধু! এই মহাত্মার শুভাগমনে আমার যমালয় পবিত্র হইল। যমনীকে শীঘ্র শঙ্খ বাজাইতে বল। যমকন্যাদিগকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে

বল। বিশ্বকর্মাকে ডাকিয়া আন,—ভূঃ ভূবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ সত্যলোক পারে ধ্রুবলোকের উপরে এই মহাত্মার জন্য মন্দাকিনী কলকলিত, পারিজাত-পরিশোভিত কোকিল কুহরিত, অপ্সারাপদ-নূপুর-ঝুনঝুনিত হীরা-মাণিক খচিত নূতন একটি স্বর্গ নির্মাণ করিতে বল।'

চিত্রগুপ্তের—ও থুড়ি! চিত্রবর্মার হিংসা হইল। তিনি বলিলেন,—মহাশয়! পৃথিবীতে লোকটির এখনও আয়ু শেষ হয় নাই স্থূল দেহের রক্তমাংসের আঁসটে গন্ধ এখনও ইহার সূক্ষ্ম শরীরে রহিয়াছে।

এই কথা শুনিয়া যম চটিয়া আগুন হইলেন। আমার আদর লোপ হইল। তিনি বলিলেন,—'কি! সাদা সাদা গোল গোল হাঁসের ডিমের গন্ধ গায়ে। মার ইহার মাথায় দশ ঘা ডাঙ্গস মার্।'

যম বলিবামাত্র তাঁহার একজন দূত আমার মাথায় এক ঘা ডাঙ্গস মারিল। বলিব কি হে, মাথায় আমার যেন ঠিক বজ্রাঘাত হইল। যাতনায় ত্রাহি মধুসূদন বলিয়া আমি চীৎকার করিতে লাগিলাম। সেই এক ঘা ডাঙ্গসে যমপুরী হইতে আকাশপথে অনেক নিম্নে আসিয়া পড়িলাম। দমাস করিয়া আর এক ডাঙ্গসের ঘা। শূন্যপথে আরও নীচে আসিয়া পড়িলাম। আর এক ঘা! আরও নিম্নে আসিয়া পড়িলাম। এইরূপ দশম আঘাতে পৃথিবীতে আসিয়া আমার বাড়ীর ছাদ ফুঁড়িয়া আমার সূক্ষ্ম শরীর পুনরায় সেই পূজার ঘরে আসিয়া পড়িল।

নিজের বাড়ীতে সেই পূজার ঘরে আসিয়া ক্ষুদ্র মাথায় ক্ষুদ্র হাত বুলাইতে লাগিলাম। প্রহারের চোটে চক্ষুতে সরিষা-ফুল দেখিতেছিলাম। অনেকক্ষণ কিছুই দেখিতে পাইলাম না। অনেকক্ষণ পরে চাহিয়া দেখি যে, 'আমি' বসিয়া আছি। অর্থাৎ আমার সেই বড় শরীর আসনে বসিয়া আছে, আর সন্ন্যাসীব শরীর মাটীতে পড়িয়া আছে। কি হইয়াছে, তখন বুঝিতে পারিলাম। বুঝিলাম, যে সবুজ গুঁড়ার ধূম দিয়া আমার শরীর হইতে প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, আর সকল কোষ বাহির করিয়া, সন্ন্যাসী আপনার সূক্ষ্ম শরীর দ্বারা আমার স্থূল অন্নময় কোষ অধিকার করিয়াছে। আমার শরীর বটে, কিন্তু ঐ যে আসনে বসিয়া আছে, ও আমি নই, ও সন্ন্যাসী সূক্ষ্ম শরীরে মুখ দিয়া আমি সন্ন্যাসীর সহিত কথোপকথন করিতে পারিলাম না। সেজন্য নিরুপায় হইয়া আমি সন্ন্যাসীর দেহে প্রবেশ করিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ – ডমরুধরের তপস্যা

সন্ন্যাসীর দেহে প্রবিষ্ট হইয়া আমি উঠিয়া বসিলাম। তাহার পর ক্রোধে আমি সন্ন্যাসীকে বলিলাম,—'ভণ্ড! আমার শরীর ছাড়িয়া নিজের শরীরে পুনরায় প্রবেশ কর।'

সন্ন্যাসী উত্তর করিল,—'এ পৃথিবীতে অন্ধ হইয়া দুঃখে কালযাপন করিতেছিলাম। ভোগবাসনা এখনও আমার পরিতৃপ্ত হয় নাই। মানস করিয়াছিলাম যে কোন যুবা ধনবান লোকের শরীরে আশ্রয় করিব। সেরূপ লোকের যোগাড় করিতে পারি নাই। কাজেই তোমার জীর্ণ শরীরে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইয়াছি। তোমার এই শরীর দ্বারা এখন সুখাদ্য

ভক্ষণ করিব, নানারূপ আমোদ-প্রমোদ করিব। তোমার বিবাহসম্বন্ধ হইয়াছে। তোমার শরীরে আমি বিবাহ করিব, তোমার গৃহিণীকে লইয়া ঘরকন্না করিব। মিছামিছি তুমি গোল করিও না। লোকের নিজের যেরূপ অভ্যাস হয় অর্থাৎ শরীরকে আত্মা বলিয়া মনে হয়, অন্য লোকেরও সেইরূপ হয়। তোমার শরীর দেখিয়া সকলে বলিবে যে, এই সন্ন্যাসী। কেহই বিশ্বাস করিবে না যে, আমার আত্মা তোমার শরীরে প্রবেশ করিয়াছে। শঙ্করাচার্য্য ও হস্তামলকের গল্প শুনিয়া থাকিবে। আজ তাই হইয়াছে! বেশীরভাগ কেবল একটু 'হের-ফের।' —ক্রোধে অধীর হইয়া হাতড়াইতে হাতড়াইতে আমি সন্ন্যাসীর গলা টিপিয়া ধরিলাম। কিন্তু তখন আমি পাঁচ শত তিপ্পান্ন বৎসরের পুরাতন সন্ন্যাসীর শরীরে ছিলাম। তাহার উপর আবার দুই চক্ষু অন্ধ। সন্ন্যাসীর আমি কিছুই করিতে পারিলাম না। হাসিয়া সে দূরে আমাকে ফেলিয়া দিল।

আমার দেহধারী সন্ন্যাসী পুনরায় বলিল,—'যদি গোলমাল কর, তাহা হইলে তোমার ঘোরতর অনিষ্ট হইবে। তোমার চাকরের দ্বারাই তোমাকে আমি এই বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিব। ঐ অন্ধ ও বৃদ্ধ শরীর লইয়া তখন তুমি কি করিয়া দিনযাপন করিবে? আমার শিষ্যদ্বয় এ ব্যাপার অবগত আছে, তাহাদিগকে ডাকিতে পাঠাইয়াছি। তাহাদের সহিত আস্তে আস্তে আমার আস্তানায় গমন কর। প্রাতঃকালে একঘণ্টা কাল তাহারা তোমাকে নীচের দিকে মুখ করিয়া ঝুলাইবে। সমস্ত দিন তুমি বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিবে। ঘোর রাত্রিতে চুপি চুপি আহার করিবে। যতদিন তোমার ঐ বর্তমান শরীর জীবিত থাকে, ততদিন তোমাকে আমি খাইতে দিব।'

আর উপায় কি? আমি নীরব হইয়া বসিয়া রহিলাম। সন্ন্যাসীর দুই জন চেলা আসিয়া আমার দুই হাত ধরিয়া লইয়া চলিল। অন্ধ দুইটি চক্ষু দিয়া দরদর ধারায় অশ্রুপাত হইতে লাগিল। বিন্দু গোয়ালিনীর চালাঘরে আমাকে লইয়া গেল। সে রাত্রি মাটির উপর পড়িয়া কাঁদিয়া কাটাইলাম। পরদিন প্রত্যুষে চেলা দুইজন আমার দুই পায়ে দড়ি বাঁধিয়া আমগাছের ডালে ঝুলাইয়া দিল। এক ঘণ্টাকাল অধোমুখে আমি ঝুলিতে লাগিলাম। সে যে কি যাতনা, তাহা আর তোমাদিগকে কি বলিব। অন্ধ তা না হইলে চক্ষু দুইটি ঘোর রক্তবর্ণে রঞ্জিত হইত। সন্ন্যাসীর গায়ের বর্ণও কাল ছিল, তা না হইলে মুখ লাল হইয়া যাইত। ঘোর কষ্ট! ঘোর কষ্ট! কেন যে দম আটকাইয়া মরিয়া যাই নাই, তাহাই আশ্চর্য্য।

লম্বোদর প্রভৃতি একবাক্যে বলিয়া উঠিল,—'ঈশ! তুমি ত সামান্য বিপদে পড় নাই।'

ডমরুধর বলিলেন,—'হাঁ আমি ঘোর বিপদে পড়িয়াছিলাম। কেবল মা দুর্গার কৃপায় আমি সে বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলাম।'

ডমরুধর বলিতে লাগিলেন,—'এক ঘণ্টা পরে তাহারা আমাকে গাছ হইতে নামাইয়া লইল। তাহার পর সমস্ত দিন তাহারা আমাকে জলটুকু পর্য্যন্ত খাইতে দিল না। তাহারা কিন্তু একে একে আমার বাড়ীতে গিয়া আহার করিয়া আসিল। আসিয়া বলিল যে—ডমরুবাবুর বাড়ীতে আজ খুব ঘটা। পাঁচ ছয়টা খাসি কাটা হইয়াছে। নানা দ্রব্য প্রস্তুত

হইয়াছে। গ্রামশুদ্ধকে তিনি নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, তাঁহার বিবাহ পর্য্যন্ত প্রতিদিন মহাসমারোহের সহিত সকলকে ভোজন করাইবেন।'

লম্বোদর বলিলেন,—'হাঁ! সেই সময় দিনকত তোমার বাড়ীতে খুব ধূম হইয়াছিল। প্রতিদিন ষোড়শ উপাচারে তোমার বাড়ীতে আমরা ভোজন করিয়াছিলাম। তখন তোমার সেই শরীরটিকে 'তুমি বলিয়াই আমরা মনে করিয়াছিলাম। সহসা তোমার মতিগতির কিরূপে পরিবর্তন হইল, তাহা ভাবিয়া সকলে আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম। তোমার কেনারাম চাকর ও চেলা দুইজন বলিল যে, সন্ন্যাসী ঠাকুর তোমার সমুদয় সম্পত্তি ডবল করিয়া দিয়াছেন, সেই আহ্লাদে তুমি মুক্ত হস্ত হইয়াছ। কেহ কেহ বলিল যে, নূতন বিবাহের আমোদে আটখানা হইয়া তুমি এত টাকা খরচ করিতেছ। কিন্তু এখন বুঝিলাম যে, সে তুমি নও, তোমার শরীরে অধিষ্ঠিত সন্ন্যাসী।'

ডমরুধর বলিলেন,—'আমি বৃথা টাকা খরচ করিব? আমি সে পাত্র নই। 'আমি' সাজিয়া সন্ন্যাসী বেটা আমার সম্পত্তি নষ্ট করিতেছে, তাহা ভাবিয়া বুক আমার ফাটিয়া যাইতে লাগিল। ঘোর রাত্রিতে একজন চেলা আমার জন্য খাবার লইয়া আসিল। পোলাও, কালিয়া, কুর্মা, কোপ্তা, কাটলেট, সন্দেশ, রসগোল্লা, খাজা, গজা, বেদানা, আঙ্গুর, সেব প্রভৃতি সামগ্রী! ঈষৎ হাসিয়া চেলা বলিল,—'আপনার প্রতি ডমরুবাবুর বড় ভক্তি! উঠুন, আহার করুন।' কিন্তু ছাই আমি আর খাইব কি। আমার সর্বনাশ করিয়া সেই সমুদয় সুখাদ্য প্রস্তুত হইয়াছে তাহাই ভাবিয়া আমার প্রাণ আকুল হইয়া পড়িল।

পরদিন প্রাতঃকালে পুনরায় আমাকে তাহারা গাছে ঝুলাইয়া দিল। তাহার পর সমস্ত দিন অনশনে রাখিয়া গভীর রাত্রিতে আমাকে খাবার দিল। প্রতিদিন এই ভাবে চলিতে লাগিল। ওদিকে আমার নিজ বাটীতে ধূমধামের সীমা-পরিসীমা নাই। প্রতিদিন যজ্ঞ। দিনের বেলা সাধারণ লোকের ভোজন, রাত্রিতে বন্ধু-বান্ধবের ফিস্টি। শুনিলাম, ঐ ফিস্টিতে সন্ন্যাসী বন্ধুবান্ধবের সহিত কিছু উচ্চ রকমের স্ফূর্ত্তি করিতেছিল। সেরি শ্যাম্পেন প্রভৃতি বহুমূল্য মদ চলিতেছিল। কেবল আমার টাকার শ্রাদ্ধ!

ক্রমে শ্রাবণ মাস আসিল। আমার বিবাহের জন্য যে শুভদিন স্থির হইয়াছিল, সেই দিন নিকটবর্ত্তি হইল। যে শরীরে আমি অবস্থান করিতেছিলাম, তাহা অন্ধ বটে, কিন্তু কান তো অন্ধ ছিল না; কয়দিন আগে থাকিতে রোশন চৌকির ব্যঞ্জনা আমার কানে প্রবেশ করিতেছিল। তাহার পর বিবাহের পূর্ব দিনে ইংরাজি বাজনা, দেশী বাজনা, ঢাক ঢোল সানাইয়ের রোলে ও লোকের কোলাহলে আমার কান ছেঁদা হইয়া গেল। শুনিলাম যে 'ডমরুবাবু মহাসমারোহের সহিত বিবাহ করিতে যাইবেন।

পাছে কোন যমদূতের সহিত সাক্ষাৎ হয়, পাছে বেওয়ারিস আমাসী বলিয়া আমাকে ধরিয়া লইয়া যায়, পাছে পুনরায় আমার মাথায় ডাঙ্গস মারে, সেই ভয়ে এতদিন সন্ন্যাসীর শরীর হইতে আমার সূক্ষ্ম শরীর বাহির করিতে চেষ্টা করি নাই। কিন্তু একে আমার টাকার শ্রাদ্ধ তাহার উপর সন্ন্যাসী আমার শরীরে আমার জন্য মনোনীত কন্যাকে গিয়া বিবাহ

করিবে এই দুঃখে মনের ভিতর দাবানল জ্বলিতে লাগিল। সে চেলা দুইজন যখন গাছ হইতে আমাকে নামাইয়া চলিয়া গেল, তখন আমি আর থাকিতে পারিলাম। সন্ন্যাসীর শরীর হইতে বাহির হইবার নিমিত্ত বার বার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। অবশেষে কৃতকার্য্য হইলাম, সন্ন্যাসীর শরীর অন্ধ, কিন্তু আমার লিঙ্গ শরীর অন্ধ নহে। অনেক দিন পরে পৃথিবীর বস্তুসমূহ দেখিয়া মনে আমার আনন্দ হইল। সন্ন্যাসীর দেহ বিন্দীর চালাঘরে ফেলিয়া সূক্ষ্ম শরীরে আমি আমার নিজের বাটীতে গমন করিলাম। সে স্থানের ঘোর ঘটা দেখিয়া আমার প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। বাড়ীটি সুসজ্জিত হইয়াছে, কোন স্থানে বাজনাওয়ালারা বসিয়া আছে, কোন স্থানে রোশনাইয়ের বন্দোবস্ত হইতেছে, বরযাত্রীদিগের নিমিত্ত কলিকাতা হইতে অনেকগুলি ফাষ্টোকেলাস গাড়ি আসিয়াছে। আমাদের গ্রাম হইতে কন্যার গ্রাম সাত ক্রোশ পথ ভাল নহে—মেটে রাস্তা কিন্তু শুনিলাম যে, অনেক টাকা খরচ করিয়া 'ডমরুবাবু' সে রাস্তা মেরামত করিয়াছেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ – ছাল-ছাড়ান বাঘ

এইরূপে চারিদিকে আমি দেখিয়া বেড়াইলাম। বলা বাহুল্য যে, আমাকে কেহ দেখিতে পাইল না সূক্ষ্ম শরীর অতি ক্ষুদ্র, হাওয়া দিয়া গঠিত সূক্ষ্ম শরীর কেহ দেখিতে পায় না। একে যমদূতের ভয়, তাহার উপর আবার এই সমুদয় হৃদয়-বিদারক দৃশ্য। সে স্থানে আমি অধিকক্ষণ তিষ্ঠিতে পারিলাম না। আমি ভাবিলাম,—'দূর কর! বনে গিয়া বসিয়া থাকি। সুন্দরবনে মনুষ্যের অধিক বাস নাই, যমদূতদিগের সেদিকে বড় যাতায়াত নাই, সেই সুন্দরবনে গিয়া বসিয়া থাকি।'

বায়ুবেগে সুন্দরবনের দিকে চলিলাম। প্রথম আমি আমার আবাদে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সে স্থানে আমার কোন কর্ম্মচারীকে দেখিতে পাইলাম না। কেহ মাছ, কেহ ঘৃত, কেহ মধু, কেহ পাঁঠা লইয়া তাহারা 'আমার, বিবাহে নিমন্ত্রণে গিয়াছিল। সে স্থান হইতে আমি গভীর বনে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম যে, এক গাঙের ধারে একখানি নৌকা লাগিয়া আছে, উপরে পাঁচ ছয়জন কাঠুরিয়া কাঠ কাটিতেছে। তাহাদের সঙ্গে মুগুর হাতে একজন ফকীর আছে। মন্ত্র পড়িয়া ফকীর বাঘদিগের মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। নির্ভয়ে কাঠুরিয়াগণ কাঠ কাটিতেছে। সেই স্থানে গিয়া আমি একটি শুষ্ক কাঠের উপর উপবেশন করিলাম বলা বাহুল্য যে, তাহারা আমাকে দেখিতে পাইল না।

এই স্থানে বসিয়া মনে বেদনায় আমি কাঁদিতে লাগিলাম। অশ্রুজলে আমার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল। না এদিক, না ওদিক, না মরা না বাঁচা, আমার অবস্থা ভাবিয়া আমি আকুল হইলাম। আজ 'আমি' সাজিয়া সন্ন্যাসী আমার কন্যাকে বিবাহ করিবে, বাসরঘরে সন্ন্যাসী গান করিবে, তাহার পর ফুলশয্যা হইবে,—ওঃ! আমার প্রাণে সয় না। হায় হায়! আমার সব গেল। হঠাৎ এই সময় মা দুর্গাকে আমার স্মরণ হইল। প্রাণ ভরিয়া মাকে আমি ডাকিতে লাগিলাম। আমি বলিলাম,—'মা'! তুমি জগতের মা! তোমার এই অভাগা পুত্রের

প্রতি তুমি কৃপা কর। মহিষাসুরের হাত হইতে দেবতাদিগকে তুমি পরিত্রাণ করিয়াছিলে, সন্ন্যাসীর হাত হইতে তুমি আমাকে নিস্তার কর। মনসা লক্ষ্মীর কখন পূজা করি নাই, ঘেঁটু পূজাও করি নাই, কোন দেবতার পূজা করি নাই। কিন্তু এখন হইতে, মা প্রতি বৎসর তোমার পূজা করিব। অকালে তোমার পূজা করিয়া রামচন্দ্র বিপদ হইতে উদ্ধার হইয়াছিলেন। আমিও মা! সেইরূপ অকালে তোমার পূজা করিব। তুমি আমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার কর।' ব্রজের নন্দ ঘোষের স্বজাতি কলিকাতার হরিভক্ত গোয়ালা মহাপ্রভুরা কসাইকে যখন নব প্রসূত গোবৎস বিক্রয় করুন, কসাই যখন শিশু বৎসে গলায় দড়ি দিয়া হিঁচড়াইয়া লইয়া যায় তখন সেই দুধের বাছুরটি নিদারুণ কাতরকণ্ঠে যেরূপ মা মা বলিয়া ডাকিতে থাকে, সেইরূপ কাতর স্বরে আমিও মা দুর্গাকে ডাকিতে লাগিলাম।

জগদম্বার মহিমা কে জানে! প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে ডাকিলে তিনি কৃপা করেন। জগদম্বা আমায় কৃপা করিলেন। বন হইতে হঠাৎ এক বাঘ আসিয়া কাঠুরিয়াদিগের মাঝখানে পড়িল।

সুন্দরবনের মানুষখেকো প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র! শরীরটি হরিদ্রাবর্ণের লোমে আচ্ছাদিত, তাহার উপর কাল কাল ডোরা। এ তোমার চিতে বাঘ নয়, গুল বাঘ নয়, এ বাবা, টাইগার! ইংরাজিতে যাহাকে রয়াল টাইগার বলে, এ সেই আসল রয়াল টাইগার।

এক চাপড়ে একজন কাঠুরিয়াকে বাঘ ভূতলশায়ী করিল, ফকীরের মন্ত্রে তাহার মুখ বন্ধ ছিল, মুখে করিয়া তাহাকে সে ধরিতে পারিল না। সেই স্থানে শুইয়া থাপা দিয়া মানুষটাকে পিঠে তুলিতে চেষ্টা করিল। না মোটা না সরু নিকটে একটা গাছ ছিল। বাঘেরী দীর্ণ লাঙ্গুলটি সেই গাছের পাশে পড়িয়াছিল। একজন কাঠুরিয়ার একবার উপস্থিত বুদ্ধি দেখ! বাঘের লাঙ্গুলটি লইয়া সে সেই গাছে এক পাক দিয়া দিল তাহার পর লেজের আগাটি সে টানিয়া ধরিল।

বাঘের ভয় হইল। বাঘ মনে করিল,—মানুষ ধরিয়া মানুষ খাইয়া বুড়া হইলাম, আমার লেজ লইয়া কখন কেহ টানাটানি করে নাই। আজ বাপধন! তোমাদের একি নূতন কাণ্ড! পলায়ন করিতে বাঘ চেষ্টা করিল। একবার, দুইবার, তিনবার বিষম বল প্রকাশ করিয়া বাঘ পালাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু গাছে লেজের পাক, বাঘ পলাইতে পারিল না। অসুরের মত বাঘ যেরূপ বল প্রকাশ করিতেছিল, তাহাতে আমার মনে হইল যে, বাঃ? লেজটি বা ছিঁড়িয়া যায়। কিন্তু দৈবের ঘটনা ঘটিল। প্রাণের দায়ে ঘোরতর বলে বাঘ শেষকালে যেমন এক হ্যাঁচকা টান মারিল, আর চামড়া হইতে তাহার আস্ত শরীরটা বাহির হইয়া পড়িল। অস্থি মাংসের দগদগে গোটা শরীর, কিন্তু উপরে চর্ম নাই! পাকা আমের নীচের দিকটা সবলে টিপিয়া ধরিলে যেরূপ আঁটিটা হড়াৎ করিয়া বাহির হইয়া পড়ে, বাঘের ছাল হইতে শরীরটি সেইরূপ বাহির হইয়া পড়িল, কলিকাতার হিন্দু কসাই মহাশয়েরা জীবন্ত পাঁঠার ছাল ছাড়াইলে চর্মবিহীন পাঁঠার শরীর যেরূপ হয়, বাঘের শরীরও সেইরূপ হইল। মাংসে বাঘ রুদ্ধশ্বাসে বনে পলায়ন করিল। ফকীর ও কাঠুরিয়াগণ ঘোরতর বিস্মৃত হইয়া এক

দৃষ্টে হাঁ করিয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিল। বাঘের লাঙ্গুল লইয়া গাছে যে পাক দিয়াছিল, লেজ ফেলিয়া দিয়া সেও সেই দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। বাঘশূন্য ব্যাঘ্রচর্ম সেই স্থানে পড়িয়া রহিল। আমার কি মতি হইল, গরম গরম সেই বাঘ ছালের ভিতর আমি প্রবেশ করিলাম। ব্যাঘ্র চর্ম্মের ভিতর আমার সূক্ষ্ম শরীর প্রবিষ্ট হইবামাত্র ছালটা সজীব হইল। গা-ঝাড়া দিয়া আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। গাছ হইতে লাঙ্গুলটি সরাইয়া লইলাম। পাছে ফের পাক দেয়। তাহার পর দুই একবার আস্ফালন করিলাম। পূর্বে তো অবাক হইয়াছিলাম, তাহা অপেক্ষা এখন দশগুণ অবাক হইয়া ফকীর ও কাঠুরিয়াগণ দৌড়িয়া নৌকায় গিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি নৌকা নদীর মাঝখানে লইয়া দ্রুতবেগে ভাটার স্রোতে তাহারা পলায়ন করিল।

এখন এই নূতন শরীরের প্রতি একবার আমি চাহিয়া দেখিলাম। এখন আমি সুন্দরবনের কেঁদো বাঘ হইয়াছি—সেই যারে বলে রয়াল টাইগার ভাবিলাম যে,—এ মন্দ নয়, এখন যাই, এই শরীরে বিবাহ-আসরে গিয়া উপস্থিত হই। এখন দেখি সন্ন্যাসী বেটা কেমন করিয়া আমার কন্যাকে বিবাহ করে। এইরূপ স্থির করিয়া আমি দৌড়িলাম। সাঁতার দিয়া অথবা লম্ফ দিয়া শত শত নদী-নালা পার হইলাম। যে গ্রামে কন্যার বাড়ী, সন্ধ্যার সময় তাহার এক ক্রোশ দূরে গিয়া পৌঁছিলাম। দূর হইতে আলো দেখিয়া ও বাজনা-বাদ্যের শব্দ শুনিয়া বুঝিলাম যে, ঐ বর আসিতেছে। সেই দিকে দ্রুতবেগে ধাবিত হইলাম। আলুম করিয়া এক লাফ দিয়া প্রথম বাদ্যকরদিগের ভিতর পড়িলাম, কালো কালো বিলাতী সাহেবরা কোট-পেন্ট পিঁধে যাহারা বিলাতী বাজনা বাজাইতেছিল, তাহারা আমার সেই মেঘগর্জ্জনের ন্যায় আলুম শব্দ শুনিয়া আর আমার সেই রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া আপন আপন যন্ত্র ফেলিয়া যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিল। ঢাকী ঢুলীদের তো কথাই নাই। তাহাদের কেহ পলাইল, কেহ কেহ সেই স্থানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। যাহারা আলো প্রভৃতি লইয়া চলিয়াছিল, তাহারাও পলায়ন করিল। তাহার পর পুনরায় আলুম করিয়া আমি বরযাত্রদিগের গাড়ীর নিকট উপস্থিত হইলাম। টপ টপ করিয়া তাহারা গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িল ও যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিল।

লম্বোদর বলিলেন,—'আমিও বরযাত্র গিয়াছিলাম। আমি একটি গাছে গিয়া উঠিয়াছিলাম।'

শঙ্কর ঘোষ বলিলেন,—'গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িতে আমার পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। শেষে কেলেহাঁড়ী মাথায় দিয়া সমস্ত রাত্রি একটা পুষ্করিণীতে গা ডুবাইয়া বসিয়া রহিলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ – ডমরুধরের গলায় কফ

ডমরুধর বলিলেন,—'তাহার পর লম্ফ দিয়া একেবারে আমি বরের চারি ঘোড়ার গাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। ঘোর ত্রাসে সন্ন্যাসীর হৃৎকম্প হইল। আমার শরীর হইতে ফট করিয়া সে সূক্ষ্মশরীর বাহির করিল। আপনার সূক্ষ্মশরীর লইয়া কোথায় যে পলায়ন

করিল, তাহা বলিতে পারি না। সেই দিন হইতে তাহাকে অথবা তাহার চেলা দুইজনকে আর কখনও দেখিতে পাই নাই।

আমি দেখিলাম যে, গাড়ীর উপর আমার দেহটি পড়িয়া রহিয়াছে। বাঘছাল হইতে বাহির হইয়া তৎক্ষণাৎ আমি নিজদেহে প্রবেশ করিলাম। গাড়ীর গদিতে বাঘ-ছালখানি পাতিয়া তাহার উপর আমি গেট হইয়া বসিলাম। নিজের শরীর পুনরায় পাইয়া আনন্দে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলাম। কন্যার জন্য যে সমুদয় গহনা প্রস্তুত করিয়াছিলাম, সম্মুখে দেখিলাম যে সেই গহনার বাক্সটি রহিয়াছে। পরে শুনিলাম যে ঘটকীর পরামর্শে সন্ন্যাসী এই গহনার বাক্স সঙ্গে আনিয়াছিল।

এখন বিবাহ-বাড়ীতে যাইতে হইবে। কিন্তু নিকটে জনপ্রাণী ছিল না। একেলা বিবাহ বাড়ীতে যাইতে পারি না। গাড়ী হইতে নামিলাম। পথ হইতে একটি ঢোল লইয়া নিজেই ঢ্যাং ঢ্যাং করিয়া বাজাইতে লাগিলাম। যে তিন চারি জন ঢাকী ঢুলী বাঘ দেখিয়া মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল, ক্রমে তাহাদের চেতনা হইল। পিট্ পিট্ করিয়া আমার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া তাহারা উঠিয়া বসিল। অন্য বাদ্যকর কেহ আসিল না। পরে শুনিলাম যে, তাহারা প্রাণপণে দৌড়িয়া একেবারে কলিকাতা গিয়া তবে নিঃশ্বাস ফেলিয়াছিল। ভালই হইয়াছিল। তাহাদিগকে টাকা দিতে হয় নাই। বিবাহের পরদিন, কন্যা লইয়া যখন নিজ গ্রামে আমি প্রত্যাগমন করি, তখন তাহাদের যন্ত্রগুলি আমি কুড়াইয়া আনিয়াছিলাম। কিছুদিন পরে যখন তাহারা আসিল, তখন অনেক কষ্টে আমার নিকট হইতে যন্ত্রগুলি বাহির করিল। টাকা আর চাহিবে কোন লজ্জায়?

আমার কেনারাম চাকর ও দুই চারিজন বরযাত্র ক্রমে আসিয়া জুটিল। প্রথম তাহারা মনে করিয়াছিল যে, নিকটে মানুষ আনিবার নিমিত্ত বাঘ স্বয়ং ঢোল বাজাইতেছে। যাহা হউক, সেই দুই চারিজন বরযাত্র ও দুই চারিজন বাদ্যকর লইয়া আমি বিবাহ-বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। অধিক কথায় প্রয়োজন কি? প্রথম তো কন্যা সম্প্রদান হইল। তাহার পর আমাকে সকলে ছাদনাতলায় লইয়া গেল। এক পাল স্ত্রীলোক আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তাড়কা রাক্ষসীর মত এক মাগী প্রথম আমার এক কান মলিয়া দিল, আর বলিল,—'বিবাহ তৃতীয় পক্ষে, সে কেবল পিত্তি রক্ষে।' পুনরায় আর এক কান মলিয়া বলিল,—'বিবাহ তৃতীয় পক্ষে; সে কেবল পিত্তি রক্ষে।' এইরূপে একবার এ কান একবার সে কান মলিতে লাগিল এবং ঐ কথা বলিতে লাগিল। মাগীর হাত কি কড়া। আমি মনে করিলাম যে, সাঁড়াশি দিয়া বুঝি আমার কান ছিঁড়িয়া লইতেছে। তার দেখাদেখি, নয়-দশ বৎসরের একটা ফচকে ছুঁড়ি ডিঙ্গি দিয়া আমার কান টানিতে লাগিল আর ঐ কথা বলিতে লাগিল। আমার আর সহ্য হইল না। আমি বলিলাম,—'নে নে! তোর আর ফচকুমিতে কাজ নাই, আমি তোর পিতেমোর বয়সি।'

কিন্তু এই সময়ে আবার এক বিপত্তি ঘটিল। বরণ-ডালা হস্তে আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী বরণ করিতে আসিলেন। আমার মুখপানে একবার কটাক্ষ করিয়াই তিনি অজ্ঞান! বরণ-

ডালা ফেলিয়া, কন্যার হাত ধরিয়া, প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে গিয়া মাটির উপর শুইয়া পড়িলেন। সেই স্থানে শুইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। কান্নার সুরে তিনি বলিলেন,—'ও গো, মা গো, ও পোড়া বাঁদরের হাতে তোরে কি করিয়া দিব গো! ও গো মা গো! ও বুড়ো ডেক্‌রার হাতে কি করিয়া তোকে দিব গো! ঘরে যে কালীঘাটের কালীর পট আছে, যা এক পয়সা দিয়া কিনিয়াছিলাম, তার মত তোর যে মুখখানি গো! তুই আমার কেলেসোনা গো!' ইত্যাদি। কালীঘাটের পটের মত মুখ বটে! কন্যাকে বাড়ী আনিয়া যখন ভাল করিয়া প্রথম তাঁহার মুখ দেখিলাম, তখন আমার মনে হইল যে, ইনি মানুষ নহেন, কালীঘাটের মা কালীর বাচ্চা।

হুড়তে পুড়তে এই সময় ঘটকী আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। ঘটকী বলিল,—'শীঘ্র গহনার বাক্স লইয়া এস।'

কেনা চাকরের নিকট গহনার বাক্স আমি রাখিয়াছিলাম। গহনার বাক্স সে লইয়া আসিল। আমার নিকট হইতে চাবি লইয়া বাক্স খুলিয়া ঘটকী কন্যার গায়ে গহনা পরাইতে বসিল। বাম হাতে তাগা, জসম, তাবিজ, বাজু চুড়ি ও বালা পরাইল। কন্যার কালো গায়ে সোনা ঝক্‌মক্ করিতে লাগিল। শাশুড়ী ঠাকুরাণী চক্ষুর জলের ভিতর দিয়া আড়ে আড়ে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার কান্নার সুর ক্রমে ঢিলে হইয়া আসিল, আমার রূপবর্ণনাও কিঞ্চিৎ শিথিল হইল। এখন তিনি বলিলেন,—'ওগো মা গো! কালীঘাটের কালী ঠাকুরের মত তোর যে মুখখানি গো!' এবার এ পর্যন্ত হইল।

যখন অপর হস্তে সমুদয় গহনা পরানো হইল, তখন তিনি বলিলেন,—'ওগো মা গো! কালীঘাটের কালী ঠাকুরের মত!' এইবার এই পর্যন্ত হইল।

যখন গলার গহনা পরানো হইল, তখন চক্ষু মুছিয়া একবার ভাল করিয়া দেখিলেন। তাহার পর কান্নার সুরে বলিলেন,—'ওগো মা গো! কালীঘাটের—।' এবার এই পর্যন্ত।

এইরূপে ক্রমেই কান্নার সুর মৃদু ও ছন্দ পাপড়িভাঙ্গা হইয়া আসিল। অবশেষে কন্যার যখন সমুদয় ভূষণে ভূষিত হইল, তখন তিনি উঠিয়া বসিলেন, দুইবার চক্ষু মুছিয়া বলিলেন,—'তা হউক! আমার এলোকেশী সুখে থাকিবে।'

শুভদিনে শুভক্ষণে আমার বিবাহ হইয়া গেল। পরদিন কন্যা লইয়া আমি গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলাম। কিন্তু দুঃখের কথা বলিব কি—সেই তাড়কা রাক্ষসীর-বোলে সকলে যেন লুফিয়া লইল। সেই দিন হইতে সকলে আমার স্ত্রীর নাম রাখিল 'পিত্তি রক্ষে।' কেবল স্ত্রী কেন? আমি একটু বুঝিয়া সুঝিয়া খরচপত্র করি বলিয়া কেহ আমার নাম করে না। আড়ালে সকলে আমাকেও 'পিত্তি-রক্ষে' বলে। আমার গৃহিণী ঘোষেদের গঙ্গায় স্নান করিতে যাইতেন। ছোঁড়ারা তাঁহাকে 'পিত্তি রক্ষে' বলে ক্ষেপাইত। সে জন্য এখন ভোরে ভোরে তিনি বসুদের গঙ্গায় স্নান করেন। কিন্তু যাই বল আর যাই কও, আমাদের কাটী গঙ্গার যেমন মাহাত্ম্য, তেমন আর কোন গঙ্গার নয়; হরিদ্বার, প্রয়াগ, বৃন্দাবনের গঙ্গা কোথায় লাগে!

সন্ন্যাসী আমার কত টাকা নষ্ট করিয়াছিল? সে কথায় এখন আর প্রয়োজন কি? কিন্তু চিরকাল আমি কপালে পুরুষ, আমার সৌভাগ্যক্রমে এই সময় স্বদেশী হিড়িকটি পড়িল। আমি এক কোম্পানী খুলিলাম। পূর্বদেশের এক ছোকরাকে চারিদিকে বক্তৃতা করিতে পাঠাইলাম। তাহার বক্তৃতার ধমকে শত শত গরীব কেরাণী স্ত্রীর গহনা বেচিয়া শেয়ার কিনিল; শত শত দীন দরিদ্র লোকও ঘটি বাটি বেচিয়া আমার নিকট টাকা পাঠাইল। তারপর—এঁঃ—এঁঃ—এঁঃ—এঁঃগলায় কিরূপ কফ বসিয়াছে। লম্বোদর বলিলেন,—'কফ কাশীতে আবশ্যক কি? স্পষ্ট বল না কেন যে, সমুদয় টাকাগুলি তুমি হাত করিয়াছ। তাহার পর, দেশশুদ্ধ লোক এখন মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতেছে।'

ডমরুধর বলিলেন,—'ভাগ্যবান্ পুরুষদিগের টাকা একদিক দিয়া যায়, অন্যদিক দিয়া আসে। যাহা হউক, মা দুর্গা আমাকে সেই সন্ন্যাসী সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিয়া ছিলেন। সেই অবধি প্রতি বৎসর আমি মা দশভুজার পূজা করি।'

পুরোহিত বলিলেন,—

'যদি বাপি বরো দেয়স্ত্বয়াস্মাকং মহেশ্বরি।
সংস্মৃতা সংস্মৃতা ত্বং নো হিংসেথায় পরমাপদঃ।।

দেবগণ বলিলেন,—'হে মহেশ্বরি! যদি আমাদিগকে বর দিবে, তবে ঘোর বিপদে পড়িয়া তোমাকে স্মরণ করিলে, তুমি আমাদিগকে রক্ষা করিও।' —সমাপ্ত

মন্তব্য। 'পিত্তিরক্ষে' বলিয়াছেন যে—'পাঠকদিগের যদি আমার গল্পের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিবেন। সে বাঘছাল আমার ঘরে আছে। আমি তাঁহাদিগকে দেখাইব। তাঁহাদের সন্দেহ দূর হইবে।'

দ্বিতীয় গল্প

প্রথম পরিচ্ছেদ – পূর্ব কাহিনী

ডমরুধর বলিলেন,—'পূজার সময় সন্ন্যাসী সঙ্কটের গল্পে আমার সম্বন্ধে আরও দুইটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছিলাম। কিন্তু আমার একটু পূর্ব কাহিনী না বলিলে তোমরা সমুদয় বিষয় বুঝিতে পারিবে না। আজ যদি কৃত্তিবাস, কাশীদাস না থাকিতেন তাহা হইলে আমার বুদ্ধি, আমার বীরত্ব, আমার কীর্তির বিষয়ে তাঁহারা ছড়া বাঁধিতেন। ঘরে ঘরে, লোকে তাহা পাঠ করিয়া কৃতার্থ হইত। আর, যাত্রায় যাহারা দূতী সাজে, হাত নাড়িয়া নাড়িয়া তাহারা আমার বিষয়ে গান করিত। এক দিন রেলগাড়ীতে যাইবার সময় শুনিয়াছিলাম যে, কে এক জন মাইকেল ছিলেন। কে এক জন আবার তাঁহার জীবন-চরিত লিখিয়াছিলেন। এ বৎসর আমার বাগানে অনেক কাঁচকলা হইয়াছে। খরিদদার নাই, যিনি মাইকেলের জীবন-চরিত লিখিয়াছেন তিনি যদি আমার বিষয়ে সেইরূপ একখানি পুস্তক লেখেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আমি তের পণ কাঁচকলা দিতে সম্মত আছি।

আমার পিতা জমিদারী কাছারিতে মুহুরিগিরি করিতেন। যৎসামান্য যাহা বেতন

পাইতেন, অতি কষ্টে তাহাতে আমাদের দিনপাত হইত। মাতা-পিতা থাকিতে আমার প্রথম নম্বরের বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহাদের পরলোক গমনে কলিকাতায় হর ঘোষের কাপড়ের দোকানে কাজ করিতাম। মাহিনা পাঁচ টাকা আর খাওয়া। যে বাড়ীতে বাবুর বাসা ছিল, তাহার নীচের এক সেঁতালে ঘরে আমি থাকিতাম। বাবুর এক চাকরাণী ব্যতীত অন্য চাকর ছিল না। তাঁহার গৃহিণী স্বয়ং রন্ধন করিতেন। রান্না হইত—অন্ততঃ আমার ও ঝিয়ের জন্য—মুসুর দাল ও বেগুন বা আলু বা কুমড়া ভাজা। মুসুর দালে কেবল একটু হলুদের রং দেখিতে পাইতাম, দালের সম্পর্ক তাহাতে থাকিত কি না সন্দেহ। তাহার পর বলিহারি যাই গৃহিণীর হাত! কি করিয়া যে তিনি সেরূপ ঝিঁঝির পাতের ন্যায় বেগুন কাটিতেন, তাহাই আশ্চর্য্য! অভ্রের চেয়ে বোধ হয় পাতলা। বাজারে যে চিংড়ি মাছ বিক্রয় হইত না যাহার বর্ণ লাল হইয়া যাইত, বেলা একটার সময় কালেভদ্রে সেই চিংড়ি মাছ আসিত। তাহার গন্ধে পাড়ার লোককে নাকে কাপড় দিতে হইত। সেই চিংড়ি মাছের ধড়গুলি বাবু ও তাঁহার গৃহিণী খাইতেন! মাথাগুলি আমাদের জন্য ঝাল দিয়া রান্না হইত। যে দিন চিংড়ি মাছ হইত, সেদিন আমাদের আহ্লাদের সীমা থাকিত না। সেই পচা চিংড়ি অমৃত জ্ঞান করিয়া আমরা খাইতাম। দুইবার ভাত চাহিয়া লইতাম। অধিক ভাত খরচ হইত বলিয়া চিংড়ি কিছুদিন পরে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর একগাঁট তেঁতুল ট্যাকে কবিয়া আমি ভাত খাইতে বসিতাম। তাহা দিয়া কোনরূপে ভাত উদরস্থ করিতাম। যাহা হউক, এক স্থানে তাহা আমি শিক্ষা পাইয়াছিলাম, পরে তাহাতে আমার বিশেষ উপকার হইয়াছিল। আমি বুঝিয়াছিলাম যে টাকা উপার্জ্জন করিলেই টাকা থাকে না; টাকা খরচ না করিলেই টাকা থাকে।

আমার বোধ হয় রাক্ষসগণ। আমার যখন পঁচিশ বৎসর বয়স, তখন আমার প্রথম গৃহিণীর কাল হইল। তাঁহার সন্তানাদি হয় নাই। তাহার পর দশ বৎসর পর্যন্ত আমার আর বিবাহ হইল না। আমার অবস্থা সেই; লোকে বিবাহ দিবে কেন?

এই সময় পাশের বাড়ী আমাদের এক স্বজাতি ভাড়া লইলেন। তাঁহার নাম প্রহ্লাদ সেন। দোতালায় সপরিবারে তিনি বাস করিলেন। একজন আত্মীয়কে নীচের দুইটি ঘর ভাড়া দিলেন। তাঁহার নাম গোলক দে। প্রহ্লাদ বাবু কোন বণিকের আফিসে কাজ করিতেন। অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না, তবে টাকাকড়ি কি গহণাপত্র কিছু ছিল না। গোলোক বাবু সরকারী অফিসে অল্প টাকা বেতনে কেরাণিগিরি করিতেন। তাঁহার পুত্র পশ্চিমে কোথায় কাজ করিতেন, কলিকাতায় তিনি ও তাঁহার গৃহিণী থাকিতেন।

প্রহ্লাদবাবুর গৃহিণী, তাঁহার মাতা, এক বিধবা ভগিনী, দুই শিশু-পুত্র ও এক কন্যা, তাঁহার পরিবার এই ছিল। এই সময়ে কন্যাটির বয়স দশ কি এগার ছিল। আমি তাহাকে যখন প্রথম দেখিলাম, তখন অকস্মাৎ আমার মনে উদয় হইল—কে যেন আমার কানে কানে বলিয়া দিল যে,—ডমরুধর। এই কন্যাটি তোমার দ্বিতীয় পক্ষ হইবে। তোমার জন্যই বিধাতা ইহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু কি করিয়া কন্যার পিতার নিকট কথা উত্থাপন

করি? বয়স তখন আমার পঁয়ত্রিশ বৎসর, রূপ আমার এই, অবস্থা আমার এই—কথা উত্থাপন করিলে তিনি হয়ত হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন। কিন্তু বিধাতার ভবিতব্য কে খণ্ডাইতে পারে? এই সময় এক ঘটনা ঘটিল, কন্যাটি নিদারুণ রোগে দ্বারা আক্রান্ত হইল। এই সূত্রে পাশের বাড়ীতে আমি যাওয়া-আসা করিতে লাগিলাম। আপনার কন্যা আজ কেমন আছে? দুইবেলা প্রহ্লাদবাবুকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। ক্রমে তাঁহাদের জন্য কিছু কাজকর্ম্মও করিতে লাগিলাম। প্রয়োজন হইলে ঔষধ আনিয়া দিতাম ও ডাক্তারের বাড়ী যাইতাম। নিজের পয়সা দিয়া বড়বাজার হইতে ছাড়ানো বেদানা আনিয়া দিতাম। ডাক্তারের সঙ্গে বাড়ীর ভিতর গিয়া দুই তিনবার কন্যাটিকেও দেখিলাম। কন্যাটির রূপ ছিল না, তথাপি তাহাকে দেখিয়া আমার মন আরও মোহিত হইয়া গেল। এইরূপ আত্মীয়তার গুণে প্রহ্লাদবাবুর সহিত আমার অনেকটা সৌহার্দ্য জন্মিল। শুনিলাম যে, কন্যাটির নাম মালতী। কেমন সুন্দর নাম দেখিয়াছ? নামটি শুনিলে কান জুড়ায়।

ভগবানের কৃপায় মালতী আরোগ্যলাভ করিল। আমাদের ঝিকে মাঝে মাঝে দুই একটি সন্দেশ, দুই একটি রসগোল্লা, দুই একখানি জিলেপি দিয়া বশ করিলাম, ক্রমে তাহার দ্বারা প্রহ্লাদবাবুর মাতা, স্ত্রী ও বিধবা ভগিনীর নিকট কথা উত্থাপন করিলাম। প্রহ্লাদবাবুর ভগিনী সংসারের কর্ত্রী। যা বলিয়াছিলাম,—সে কথা তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন,—'কি। ঐ জলার ভূতটার সঙ্গে মালতীর বিবাহ দিব? পোড়া কপাল!'

কিন্তু কন্যার বিবাহের নিমিত্ত প্রহ্লাদবাবু বিব্রত ছিলেন? তাঁহার টাকা ছিল না। কি করিয়া কন্যাদায় হইতে তিনি উদ্ধার হইবেন, সর্বদাই তাহা ভাবিতেছিলেন। সুতরাং ঝি যে প্রস্তাব করিয়াছিল, সম্পূর্ণরূপে তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিলেন না। তিনি বলিলেন,—'পুরুষমানুষের পক্ষে পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স কিছু অধিক নহে। তাহার পর রূপে কি করে, গুণ থাকিলেই হইল। মালতীর পীড়ার সময় সে আমাদের অনেক উপকার করিয়াছে। তাহাতে বোধ হয় যে, ডমরুধর মন্দ লোক নহে। কিন্তু কথা এই যে, সে সামান্য বেতনে কাপড়ের দোকানে কাজ করে। পরিবার প্রতিপালন সে কি করিয়া করিবে?'

এ বিষয়ে পূর্ব হইতেই আমি ঝিকে শিক্ষা দিয়াছিলাম। আমার অবস্থা সম্বন্ধে যখন কথা উঠিল, তখন ঝি বলিল যে, 'দেশে ডমরুবাবুর অনেক জমি আছে, তাহাতে অনেক ধান হয়। আম-কাঁঠাল-নারিকেলেরও অনেক বাগান আছে।' বলা বাহুল্য যে, এ সব কথা সমুদয় মিথ্যা। এ সময়ে আমার কিছুই ছিল না। কন্যার মাতা, পিতা ও পিতামহী এক প্রকার সম্মত হইলেন। কিন্তু প্রহ্লাদবাবুর ভগিনী ক্রমাগত আপত্তি করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি বলিলেন যে,—হবু জামাতার যদি এত সম্পত্তি আছে, তাহা হইলে তাহাকে অন্ততঃ পাঁচশত টাকার গহনা দিতে হইবে। এ কথা শুনিয়া আমি হতাশ হইয়া পড়িলাম। পাঁচশত টাকা দূরে থাকুক, তখন আমার পাঁচশত কড়া কড়ি ছিল না।

কিন্তু মালতী পয়মন্ত কন্যা। এই সময় সহসা আমার ভাগ্য খুলিয়া গেল। অভাবনীয় ঘটনাক্রমে অকস্মাৎ আমি দেড় হাজারের অধিক টাকা পাইলাম। আমার আনন্দের

পরিসীমা রহিল না। কিন্তু মুখ ফুটিয়া আমি আনন্দ প্রকাশ করিতে পারিলাম না। আমার সৌভাগ্যের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে পারিলাম না। আমি আমার গ্রামে যাইলাম। তেরশত টাকা কোন স্থানে লুক্কায়িত রাখিলাম। দুইশত টাকা লইয়া ফিরিয়া আসিলাম।

কলিকাতায় আসিয়া প্রহ্লাদবাবুর কন্যাকে আমি পাঁচশত টাকার গহনা দিতে স্বীকৃত হইলাম। বিবাহের সমুদয় আয়োজন হইল। এ বিবাহে কোন বিড়ম্বনা ঘটে নাই। শুভদিনে আমার দ্বিতীয় বারের বিবাহ-কার্য সম্পন্ন হইয়া গেল। সেইদিন সন্ধ্যাবেলা কন্যার নিমিত্ত পাঁচশত টাকার গহনা আমি পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। এই পাঁচশত টাকার গহনা আমি একশত টাকায় ক্রয় করিয়াছিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ – একশত মোহর

ইহার ছয় মাস পরম সুখে অতিবাহিত হইয়া গেল। পাশেই শ্বশুরবাড়ী। সে স্থানে সর্বদাই আমার নিমন্ত্রণ হইত। আমার আদরের সীমা ছিল না। যখন আহার করিতে বসিতাম, তখন এটা খাই কি সেটা খাই, সর্বদাই এই গোলে পড়িতাম। এত দ্রব্য তাঁহারা আমার সম্মুখে দিতেন।

কিন্তু চিরদিন সমান যায় না। একদিন বেলা নয়টার সময় আহার করিয়া দোকানে যাইবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় আমার শ্বশুরবাড়ীর নীচের তলায় ঠিক আমার ঘরের পাশের ঘরে একটা ভয়ানক কোলাহল পড়িয়া গেল। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, আমার শ্বশুরবাড়ীর নীচের তলায় গোলোকবাবু নামে আমাদের একজন স্বজাতি বাস করিতেন। এ বাড়ীতে আমার ঘর, সে বাড়ীতে তাঁহার ঘর, ঠিক গায়ে গায়ে ছিল। এ বাড়ীতে আমার ঘর যেরূপ স্যাঁৎসেঁতে কদর্য ছিল, গোলোকবাবুর সেইরূপ ছিল না। তাঁহার ঘরটি খট্‌খটে শুষ্ক ফিট্‌ফাট ছিল। তিনি নিজে সরকারী অফিসে কাজ করিতেন, পশ্চিমে কোথায় তাঁহার পুত্র কাজ করিত। তাঁহার অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না। গোলোকবাবুর বয়স হইয়াছিল। কলিকাতায় কেবল তিনি নিজে ও তাঁহার বয়স্কা গৃহিণী থাকিতেন। গোলোকবাবুর ঘরেই এই কোলাহল হইয়াছিল।

গোল শুনিয়া আমি আমার শ্বশুরবাড়ীতে দৌড়িয়া যাইলাম, মনে করিলাম, হয় তো কোন বিপদ ঘটিয়া থাকিবে। সে স্থানে গিয়া দেখিলাম যে, আমার শ্বশুরবাড়ীর সমুদয় লোক নীচে আসিয়াছেন। আমাকে দেখিয়া মালতী উপরে পলায়ন করিল। অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা ঘোমটা দিলেন। আমার শ্বশুরমহাশয়ের নিকট শুনিলাম যে, গোলোকবাবুর পুত্র মাঝে মাঝে পিতার নিকট টাকা পাঠাইতেন। পিতা টাকার মোহর গাঁথাইয়া তাঁহার ঘরের প্রাচীরের গায়ে যে আলমারি আছে, একটি বগ্‌লি অর্থাৎ থলি করিয়া তাহার ভিতর রাখিয়া দিতেন। ক্রমে ক্রমে তিনি একশত মোহর গাঁথাইয়া আলমারির ভিতর রাখিয়াছিলেন। ঘরের প্রাচীরের গায়ে আলমারি, তাহাতে চারিটি তক্তার খোপ ছিল, সম্মুখে কাঠের কপাট ছিল, কপাট সর্বদা চাবি-বন্ধ থাকিত। গোলেকবাবুর এই একশত

মোহর চুরি গিয়াছিল। তাহার জন্যই এ গোলমাল। গোলোকবাবু মনের দুঃখে নীরবে বসিয়া আছেন, তাঁহার স্ত্রী কাঁদিতেছেন। কবে চুরি গিয়াছে, তাহা তিনি বলিতে পারেন না। তিনি বলিলেন যে, এক বৎসর পূর্বে ঐ মোহরগুলি তিনি আলমারির ভিতর রাখিয়াছিলেন। তাহার পর আর তিনি নূতন মোহর ক্রয় করিতে পারেন নাই। তিনি বলিলেন যে, এ ঘরে কেবল তিনি ও তাঁহার স্ত্রী থাকেন, অন্য কেহ এ ঘরে প্রবেশ করে না। সে জন্য কাহাকেও তিনি সন্দেহ করিতে পারেন না। আমার শ্বশুরমহাশয় পুলিশে খবর দিবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু আমি তাহাতে আপত্তি করিলাম। আমি বলিলাম যে,— 'কখন কবে চুরি গিয়াছে, তাহার কোন ঠিক নাই, কাহারও প্রতি গোলোকবাবুর সন্দেহ হয় না, তখন মিছিমিছি পুলিশে আর সংবাদ দিয়া কি হইবে?' পুলিশে আর সংবাদ দেওয়া হইল না।

সন্ধ্যার পর যখন আমি দোকান হইতে ফিরিয়া আসিলাম, তখন আমার শ্বশুর প্রহ্লাদবাবু আমাকে ডাকিয়া বলিলেন,—'ডমরুধর। বড় বিপদের কথা। পাশের বাড়ীতে তুমি যে ঘরে বাস কর, আর এ বাড়ীতে গোলোকবাবু যে ঘরে বাস করেন, এই দুই ঘরের কেবল একটি প্রাচীর, দুই ঘরের কড়ি সেই এক দেওয়ালের উপর। গোলোকবাবুর ঘরে যে স্থানে সে আলমারি আছে, সে স্থানের দেওয়ালটি কাজেই অতিশয় পাতলা। আজ তিনি আলমারির ভিতর ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিতেছিলেন, যে স্থানে তিনি মোহর রাখিয়াছিলেন, তাহার হাত লাগিতেই সেই স্থানের দেওয়ালটি ভাঙ্গিয়া গেল। তখন তিনি দেখিলেন যে, সে স্থানে দেওয়ালে ইট ছিল না, কেবল একটু বালি থাম ছিল। সেই বালি ভাঙ্গিয়া প্রাচীরের ফুটা হইয়া গেল। দুই ঘরের এক দেওয়াল, সুতরাং সেই ছিদ্র তোমার ঘরেও হইল। তোমার উপর এখন বিলক্ষণ সন্দেহ হইয়াছে। যদি মোহরগুলি তুমি বাপু লইয়া থাক, তাহা হইলে আস্তে আস্তে ফিরাইয়া দাও। তাহা হইলে সকল কথা মিটিয়া যাইবে। তা না হইলে বড় গোলমাল হইবে।'

এই কথা শুনিয়া আমি যেন আকাশ হইতে পড়িলাম,—'সে কি মহাশয়! আমি ভদ্র সন্তান, আমি চোর নই। তাহার পর আপনি আমার শ্বশুর। আমাকে ওরূপ কথা বলিবেন না।' —তাহার পর গোলোকবাবু নিজে এবং তাঁহার গৃহিণী আমাকে অনেক মিনতি করিয়া বলিলেন,—'বাপু! ভুলভ্রান্তিক্রমে যদি মোহরগুলি তোমার হাতে পড়িয়া থাকে, তামাসা করিয়া যদি রাখিয়া থাক, তাহা হইলে ফিরাইয়া দাও, তোমার পায়ে পড়ি, মোহরগুলি ফিরাইয়া দাও।'

তাঁহাদের উপর আমি রাগিয়া উঠিলাম যে,—'আমাকে আপনারা চোর বলেন। আপনারা ভাল মানুষ নহে।' ইত্যাদি।

ক্রমে এ কথা আমার মনিব হর ঘোষের কানে উঠিল। মোহর ফিরিয়া দিতে তিনিও আমাকে অনুরোধ করিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম,—'মহাশয়! আজ কয়েক বৎসর আপনার দোকানে কাজ করিতেছি, আর কয় বৎসর আপনার বাটীতে বাস করিতেছি। এক

পয়সা কখন কি আপনার লইয়াছি? আমার প্রতি সন্দেহ হয় এমন কাজ কখন কি আমি করিয়াছি?'

দিনকয়েক বিলক্ষণ গোল চলিল, দেখ, লম্বোদর! মানুষ হাজার বুদ্ধিমান হউক, এরূপ কাজে একটা-না একটা ভুল করে। আমিও তাহাই করিয়াছিলাম। এ অনেক দিনের কথা হইল, এখন আর প্রকাশ করিতে দোষ নাই। প্রকৃত ঘটনা এই হইয়াছিল,—মশার দৌরাত্মে রাত্রিতে আমার নিদ্রা হইত না। অনেক কষ্টে পাঁচসিকা দিয়া একটি মশারি কিনিয়াছিলাম। মশারিটি খাটাইবার নিমিত্ত দেওয়ালে একটি পেরেক মারিতেছিলাম। পেরেক মারিতে হঠাৎ দেওয়ালের কতকটা বালি ভাঙ্গিয়া পড়িল। সেই স্থানটিতে একটি ছিদ্র হইল। ছিদ্রের ভিতর আমি হাত দিলাম। হাতে কি এক ভারী দ্রব্য ঠেকিয়া গেল। বাহির করিয়া দেখিলাম যে, মোহরপূর্ণ এক বগলি। তৎক্ষণাৎ আমি আমার ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া দিলাম। তাহার পর পুনরায় গর্তের ভিতর হাত দিয়া দেখিলাম যে, তাহার অপর পার্শ্বে কাঠ। হাতে সেই কাঠ ঠেকিয়া গেল। তখন ইহার অর্থ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু তাহার পর প্রকাশ হইলে যে, আমার ঘরের ও গোলোকবাবুর ঘবের এক প্রাচীর, প্রাচীবের অপর পার্শ্বে গোলোকবাবুর ঘবে আলমারি, আমাব হাতে আলমারির কপাট ঠেকিয়াছিল।

বলা বাহুল্য যে মোহরগুলি পাইযা আমাব যেন স্বর্গলাভ হইল। চুপি চুপি সেইগুলি গণিতে লাগিলাম। পাছে শব্দ হয়, সেজন্য একটি একটি করিয়া গণিলাম একশত মোহর। চিরকাল পরিশ্রম করিলেও কখন আমি এত টাকা উপার্জন করিতে পারিতাম না। দেখিলাম যে, এ সেকালের মোহর নহে, বিলাতি মোহর, যাহাকে লোকে গিনি বলে। পরদিন একটু বালি ও চুণ আনিয়া দেওয়ালের ছিদ্রটি বুজাইয়া দিলাম। তাহার পর বাজারে গিয়া মোহরগুলি বিক্রয় করিলাম। পনর শত টাকার অধিক হইল। দেশে গিয়া তেরশত টাকা কোন এক নিভৃত স্থানে পুঁতিয়া রাখিলাম। বিবাহেব নিমিত্ত বাকী টাকা কাছে রাখিয়া দিলাম। মোহর যে গিযাছে. ভাগ্যে গোলোকবাবু ছয় মাস পর্যন্ত দেখেন নাই। যে সময় মোহর হস্তগত হইয়াছিল, সে সময় যদি তিনি খোঁজ করিতেন, তাহা হইলে আমার আর বিবাহ হইত না।

বলিতেছিলাম যে, এই মোহর সম্বন্ধে আমি একটি ভুল করিয়াছিলাম। বড়বাজারে আমাদের কাপড়ের দোকানের পার্শ্বে এক পোদ্দারের দোকান ছিল। সেই দোকানে আমি মোহরগুলি বিক্রয় করিয়াছিলাম। একটু দূরে গিয়া যদি এ কাজ করিতাম, তাহা হইলে আর বিশেষ কোন গণ্ডগোল হইত না। পাশেই দোকান, সেজন্য পোদ্দারের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে আমার মনিব হর ঘোষ মহাশয় আমি যে মোহর বেচিয়াছিলাম, তাহা জানিতে পারিলেন। প্রহ্লাদবাবুকে তিনি বলিয়া দিলেন। সকলে জটলা করিয়া আমাকে মোহর বিক্রয়ের টাকা গোলোকবাবুকে দিতে বলিলেন। আমি বলিলাম যে,—'এ মোহর আমার মায়ের ছিল। মৃত্যুকালে মা আমাকে দিয়া গিয়াছিলেন। বিবাহে ও অন্যান্য বিষয়ে মোহর বিক্রয়ের টাকা আমি খরচ করিয়া ফেলিয়াছি। সে টাকা এখন আমি কোথায় পাইব, আর যদি থাকিত,

তাহা হইলে কেনই বা দিব?'

অবশ্য আমার এ কথা তাঁহারা বিশ্বাস করিলেন না। যখন নিতান্ত আমার নিকট হইতে তাঁহারা টাকা আদায় করিতে পারিলেন না, তখন আমাকে পুলিশে দিবার নিমিত্ত তাঁহারা স্থির করিলেন। আমি মনে মনে ভাবিলাম,—'তাহাতে ক্ষতি কি? এক বৎসর কি দুই বৎসর যদি আমার জেল হয়, তাহা হইলে মেয়াদ খাটিয়া পরে সেই টাকা লইয়া কোনরূপ ব্যবসা করিব। আর এখন যদি টাকাগুলি দিয়া দিই, তাহা হইলে আমার দশা কি হইবে? ভগবান আমাকে মোহরগুলি দিয়াছেন। সে টাকা ফিরিয়া দিলে আমার মহাপাতক হইবে।'

কিন্তু আমাকে পুলিশে দেওয়া হইল না। আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী কাঁদিয়া কাটিয়া কুরুক্ষেত্র করিলেন! অবশেষে সকলে মিলিয়া আমার নিকট হইতে গোলকবাবুর পুত্রের নামে এক হাজার টাকার হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া লইলেন। আর আমি মালতীকে যে গহনাগুলি দিয়াছিলাম, প্রহ্লাদবাবু সেগুলি গোলকবাবুকে দিয়া দিলেন। তাঁহারা আরও অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে, আমার বিবাহের সময় যে জমি-জোরাত বাগান-বাগিচার কথা বলিয়াছিলাম, সে সমুদয় মিথ্যা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ – সুন্দরবনের অদ্ভুত জীব

আমার নিকট হইতে ইঁহারা যখন হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া লইলেন, তখন আমি মনে মনে ভাবিলাম,—'যত পার হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া লও। উপুড় হস্ত কখন আমি করিব না। নালিশ করিবে? ডিক্রি করিবে? ডিক্রী ধুইয়া খাইও। কি বেচিয়া লইবে বাপু?'

বস্তুতঃ এ হ্যাণ্ডনোটের একটি পয়সাও আমাকে দিতে হয় নাই। ইহার কিছুদিন পরে গোলোকবাবু কর্মত্যাগ করিয়া কাশী চলিয়া গেলেন। সে স্থানে তাঁহার ও তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হইল। টাকা সম্বন্ধে তাঁহার পুত্র আমাকে পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহার উত্তর আমি দিই নাই, তাহা নহে। দুইটা ছুঁড়ী! সে কথা পরে বলিব।

হর ঘোষ আমাকে দোকান হইতে ছাড়াইয়া দিলেন। সেজন্য আমি দুঃখিত হইলাম না। মনে জানি যে, আমার সেই তেরশত টাকা আছে। পূর্বেই মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম যে, সেই টাকা দিয়া হয় জমিদারী কিনিব আর না হয় ব্যবসা করিব, কিন্তু যতদিন ঐ হ্যাণ্ডনোটের ভয় থাকিবে, ততদিন কিছু করিব না।

আমার শ্বশুরমহাশয় বলিলেন,—'তোমাকে আর আমার বাড়ীতে আসিতে দিব না। আজ হইতে জানিলাম যে, আমার কন্যা বিধবা হইয়াছে। তোমার মুখ দেখিলেও পাপ হয়, আর জন্মে অনেক পাপ করিয়াছিলাম, সেজন্য তোমা হেন ইতরের হাতে আমি কন্যা দিয়াছি। তোমার ঘরে আমি কন্যা পাঠাইব না।'

আমি ভাবিলাম যে,—'বটে, এখন আমার পুঁজি হইয়াছে, কি করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতে হয়, হর ঘোষের বাড়ীতে তাহা আমি শিখিয়াছি। যেমন করিয়া পারি আমি ধনবান হইব, টাকা হইলে কেহ জিজ্ঞাসা করে না যে, অমুক কি করিয়া সম্পত্তিশালী হইয়াছে।

জাল করিয়া হউক, চুরি করিয়া হউক, যেমন করিয়া লোক বড় মানুষ হউক না কেন, অমুকের টাকা আছে, এই কথা শুনিলেই ইতর-ভদ্র সকলেই গিয়া তাহার পদলেহন করে, সকলেই তাহার পায়ে তৈল মর্দন করে, একবার আমার টাকা হউক, তখন দেখিব যে, তুমি বাছাধন আমার বাড়ীতে ফ্যান চাটিতে যাও কি না।' অবশ্য এসব মনের চিন্তা প্রকাশ করিলাম না, কিন্তু যথাকালে আমার সে ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছিল।

আমার শ্বশুরমহাশয়ের রাগের আর একটি কারণ ছিল, মালতীকে আমি যে পাঁচশত টাকার গহনা দিয়াছিলাম, তাহা একশত টাকায় ক্রয় করিয়াছিলাম। দুইখানি ব্যতীত সমুদয় অলঙ্কার কেমিক্যাল সোনার অর্থাৎ গিল্টির গহনা ছিল। সুতরাং গহনাগুলি পাইয়া গোলোকবাবুর বিশেষ লাভ হয় নাই।

হর ঘোষের দোকান হইতে বাহির হইয়া কিছুদিন আমি সুন্দরবনের এক আবাদে চাকরী করিয়াছিলাম। সেই সময় আবাদ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা জন্মিল। কিছুদিন পরে যখন হ্যাণ্ডনোটের ভয় যাইল, তখন নিজের জন্য আমি একটি আবাদ খুঁজিতে লাগিলাম। খুঁজিতে খুঁজিতে শুনিলাম যে, দূরে নিবিড় বনের নিকট এক আবাদ সুলভমূল্যে বিক্রয় হইবে। যাঁহার আবাদ, তাঁহার নিকট গিয়া সমুদয় তত্ত্ব আমি অবগত হইলাম। তিনি বলিলেন যে, এই আবাদ তিনি পাঁচ হাজার টাকায় ক্রয় করিয়াছিলেন। নোনাজল প্রবেশ নিবারণের নিমিত্ত ইহাতে তিনি ভেড়ী অর্থাৎ বাঁধ বাঁধিয়াছিলেন, পানীয় জলের নিমিত্ত পুষ্করিণী খনন করিয়াছিলেন, দুই চারি ঘর প্রজাও বসাইয়াছিলেন, কিন্তু সহসা তাঁহার বাঁধ কয়েক স্থানে ভাঙ্গিয়া গেল, আবাদের ভিতর নোনাজল প্রবেশ করিল, প্রজাগণ পলায়ন করিল, সে আবাদ পুনরায় বনে আবৃত হইয়া পড়িল। পুনরায় উঠিত করিবার টাকা তাঁহার নাই। সেজন্য তিনি আবাদ বিক্রয় করিয়া ফেলিবেন। এই সম্পত্তি তিনি পাঁচ হাজার টাকায় ক্রয় করিয়াছিলেন। এক্ষণে এক হাজার টাকা পাইলে ছাড়িয়া দিবেন। আমি একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া সে স্থান দেখিতে যাইলাম। কিন্তু বাঘের ভয়ে নৌকা হইতে নীচে নামিলাম না। এ অঞ্চলে তখন অধিক আবাদ হয় নাই, চারিদিক আবৃত ছিল, সেজন্য বিলক্ষণ বাঘের ভয় ছিল। নৌকার উপর হইতে স্থানটি দেখিয়া আমার মনোনীত হইল। মনে ভাবিলাম যে একটু বিপদের আশঙ্কা না থাকিলে এরূপ সম্পত্তি হাজার টাকায় পাওয়া যায় না। মোহর প্রদান করিয়া ভগবান আমার প্রতি কৃপা করিয়াছেন। আমার পড়তা খুলিয়া গিয়াছে। একটু যত্ন করিলেই এই আবাদে পরে সোনা ফলিবে। আরও ভাবিলাম যে, আমার কাছে পূর্ব হইতেই তেরশত টাকা ছিল। তাহার পর আবাদে কাজ করিয়া আরও পাঁচশত টাকা সঞ্চয় করিয়াছি। এক হাজার টাকা দিয়া সম্পত্তি ক্রয় করিলে আমার কাছে আটশত টাকা থাকিবে। ভেড়ি বাঁধিতে, বন কাটিতে, প্রজা বসাইতে এই আটশত টাকা খরচ করিব। তাহার পরে মাছের তেলে মাছ ভাজিব, অর্থাৎ ইহার আয় হইতেই বাকি ভূমি উঠিত করিব। এইরূপ ভাবিয়া-চিন্তিয়া সে বিষয় আমি ক্রয় করিলাম। তাহার পর শুন বিপত্তির কথা।

আবাদে কাজ করিবার সময় একজন সাঁইয়ের সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল। মন্ত্রবলে যাহারা বাঘ দূর করিতে পারে, এরূপ লোককে সাঁই বলে। বড়গোছের একখানি নৌকা ভাড়া করিলাম। তাহাতে ছয়জন মাঝি ছিল। আবাদে কোথায় কি করিতে হইবে, তাহা দেখিবার নিমিত্ত সাঁই ও আমি যাত্রা করিলাম। আমাদের পাশেই এক গাঙ ছিল। এই নদী দিয়া পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের নৌকা যাতায়াত করিত। আমি, সাঁই ও তিনজন মাল্লা লাঠিসোটা লইয়া আবাদের এদিক-ওদিক কিয়ৎপরিমাণে ভ্রমণ করিলাম। অনেক ভূমি বনে আবৃত, সকল স্থান দেখিতে পারিলাম না। যে যে স্থানে বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তাহা দেখিলাম। পুষ্করিণীটি উচ্চ ভূমিতে ছিল, তবুও কতক পরিমাণে তাহার ভিতর জোয়ারের নোনাজল প্রবেশ করিয়াছিল। যে কয়জন কৃষক বাস করিয়াছিল, একখানি ব্যতীত আর সকলের ঘর ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছিল। সেই একখানি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে আমার ইচ্ছা হইল। কিন্তু একটু আগে গিয়া দেখিলাম যে, একটি মৃত ব্যাঘ্র সেই স্থানে পড়িয়া রহিয়াছে। কিছুক্ষণ তাহার নিকট দাঁড়াইয়া আমরা দেখিতে লাগিলাম। আমার সাঁই বলিল যে, এ ব্যাঘ্রটিকে অন্য কোন সাঁই মন্ত্রবলে বধ করিয়া থাকিবে। কারণ, ইহার শরীরে গুলী অথবা অন্য কোন অস্ত্রচিহ্ন নাই।

তাহাব পর কৃষকের ভগ্নগৃহ অভিমুখে আমরা গমন করিলাম। এ ঘরখানির চারিদিকে প্রাচীর ও উপরে চাল ছিল, কিন্তু ঘরের দ্বারে আগড় অথবা কপাট ছিল না, যেই আমরা দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়াছি, আর ঘরের ভিতরে বন্ বন্ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল। প্রথমে মনে করিলাম যে, লক্ষ লক্ষ মৌমাছির গুনগুন্ রব। ভিতরে হয় তো বৃহৎ একটি চাক হইয়াছে। পরক্ষণেই যাহা দেখিলাম, তাহাতে ঘোরতর আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। কালো কালো চড়াই পাখীর ন্যায় শত শত কি সব দেওয়ালের গায়ে বসিয়া আছে। তাহাদের সর্বশরীর কালো, কিন্তু পেটগুলি রক্তবর্ণের. তাহাদের দুইটি করিয়া ডানা আছে, উড়িবার নিমিত্ত ডানাগুলি নাড়িতেছে। তাহাতেই এরূপ বন্ বন্ শব্দ হইতেছে, রক্তবর্ণের কোন দ্রব্য খাইয়া পেট পূর্ণ করিয়াছে, সেজন্য উড়িতে পারিতেছে না। এ কি জীব? কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। যে জীব হউক, এই জীবই রক্তপান করিয়া ব্যাঘ্রটিকে বধ করিয়া থাকিবে। সেই সময় সাঁই এক বড় নির্বোধের কাজ করিয়া বসিল, লাঠি দ্বারা মাটিতে আঘাত করিয়া শব্দ করিল। গুটিদশ জীব যাহারা সম্পূর্ণভাবে উদর পূর্ণ করিয়া রক্তপান করে নাই, প্রাচীরের গা হইতে উড্ডীয়মান হইল। সাঁই সকলের অগ্রে ছিল, জীব কয়টি তাহার গায়ে আসিয়া বসিল, প্রাণ গেল বলিয়া সাঁই ভূতলে পতিত হইয়া ছটফট করিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ – মশার মাংস

ডমরুধর বলিতে লাগিলেন,—আমরা দেখিলাম যে, সাঁইয়ের গায়ে দশ-বারোটি কালো জীব বসিয়াছে। যাতনায় সাঁই ছট্‌ফট্ করিতেছে। লাঠি দিয়া আমি সেই জীবগুলিকে তাড়াইতে চেষ্টা করিলাম। আমার লাঠির আঘাতে সাঁইয়ের দেহ হইতে তিনটি জীব

উড্ডীয়মান হইল। তাহাদের একটি আমার গায়ে বসিতে আসিল। সবলে তাহার উপর আমি লাঠি মারিলাম। লাঠির আঘাতে জীবটি মৃত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। আমি তাহার মৃতদেহ তুলিয়া লইলাম। ইতিমধ্যে আর দুইটি জীব একজন মাঝির গায়ে গিয়া বসিল। মাঝি চীৎকার করিয়া উঠিল। দশ-বারো হাত দৌড়িয়া গিয়া সেও মাটিতে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। আমি বুঝিলাম যে, এ জীব কেবল যে রক্তপান করে, তাহা নহে, ইহার ভয়ানক বিষও আছে। তখন অবশিষ্ট দুইজন মাঝির সহিত আমি দৌড়িয়া নৌকায় গিয়া উঠিলাম ও তৎক্ষণাৎ নৌকা ছাড়িয়া দিয়া সে স্থান হইতে পলায়ন করিলাম।

নৌকায় বসিয়া আমি ভাবিতে লাগিলাম। মনে করিলাম যে, মোহর বিক্রয়ের টাকাগুলি বুঝি জলাঞ্জলি দিলাম, পাপের ধন বুঝি প্রয়শ্চিত্তে গেল। এখন বুঝিতে পারিলাম যে, পাঁচ হাজার টাকার সম্পত্তি কেন সে লোক এক হাজার টাকায় বিক্রয় করিয়াছে। যে জীবটিকে লাঠি দিয়া মারিয়াছিলাম, যাহার মৃতদেহ আমি তুলিয়া লইয়াছিলাম, তাহা এখন পর্যন্ত আমার হাতেই ছিল। নৌকার উপর রাখিয়া সেইটিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ উল্টাইয়া পাল্টাইয়া আমি ঘোরতর আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। দেখিলাম যে,—সে অন্য কোন জীব নহে, বৃহৎ মশা! চড়াই পাখীর ন্যায় বৃহৎ মশা! মশা যে এত বড় হয়, তাহা কখন শুনি নাই। শরীরটি চড়াই পাখীর ন্যায় বড়, শুঁড়টি বৃহৎ জোঁকের ন্যায়। ডাক্তারেরা যেরূপ ছুরি দিয়া ফোঁড়া কাটে শুঁড়ের আগায় সেইরূপ ধারালো পদার্থ আছে। জীব-জন্তু অথবা মানুষের গায়ে বসিয়া প্রথম সেই ছুরি দিয়া কতক চর্ম ও মাংস কাটিয়া লয়। তারপর সেইস্থানে শুঁড় বসাইয়া রক্তপান করে! কেবল যে রক্তপান করিয়া জীব-জন্তুর প্রাণ বিনষ্ট করে তাহা নহে, ইহাদের ভয়ানক বিষ আছে, সেই বিষে অপর প্রাণী ধড়ফড় করিয়া মরিয়া যায়।

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কি করিয়া জানিলে যে, যে জীব কোন নূতন পক্ষী নহে?'

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—'পক্ষীদের দুইটি পা থাকে, ইহার ছয়টি পা; পক্ষীদের ডানায় পালক ছিল না; পক্ষীদের ঠোঁট থাকে, ঠোঁটের স্থানে ইহার শুঁড় ছিল। পক্ষীদের শরীরে হাড় থাকে, ইহার শরীর কাদার ন্যায় নরম। সেইজন্য আমি স্থির করিলাম যে, ইহা পক্ষী নহে, মশা।'

লম্বোদর বলিলেন,—'মশা যে এত বড় হয়, তাহা আমার বিশ্বাস হয় না।'

শঙ্কর ঘোষ বলিলেন,—'কেন বিশ্বাস হইবে না? হস্তী বৃহৎ মশা ব্যতীত আর কিছুই নহে। মশার শুঁড় আছে, হস্তীরও শুঁড় আছে। তবে হস্তী যদি রক্তপান করিত তাহা হইলে পৃথিবীতে অপর কোন জীব থাকিত না। সেই জন্য হস্তী গাছপালা খাইয়া প্রাণধারণ করে।'

ডমরুধর বলিলেন,—'তাহা ভিন্ন আমি এ কথায় প্রমাণ রাখিয়াছি। যেমন সেই বাঘের ছালখানি ঘরে রাখিয়াছি, সেইরূপ এই মশার প্রমাণস্বরূপ আমি জোঁক রাখিয়াছি। আমাদের গ্রামের নিকট যে বিল আছে, মশার শুঁড়টি কাটিয়া আমি সেই বিলে ছাড়িয়া

দিয়াছিলাম। সেই শুঁড় হইতে এখন অনেক বড় বড় জোঁক হইয়াছে। আমার কথায় তোমাদের প্রত্যয় না হয়, জলায় একবার নামিয়া দেখ। প্রমাণ ছাড়া আমি কথা বলি না।'

লম্বোদর বলিলেন,—'মশার শুঁড় পচিয়া জোঁক হইতে পারে না।'

শঙ্কর ঘোষ বলিলেন,—'কেন হইবে না? স্বে হইতে স্বেদজ জীব হয়। বাদা বনের পাতা পচিয়া চিংড়ি মাছ হয়। কোন বি-এ অথবা এম-এ অথবা কি একটা পাশ করা লোক কৃষিকার্য সম্বন্ধে একখানা বাঙ্গালা স্কুলপাঠ্য পুস্তক লিখিয়াছিলেন। পুদিনা গাছ সম্বন্ধে তাহাতে তিনি এরূপ লিখিয়াছিলেন,—একখণ্ড দড়িতে গুড় মাখাইয়া বাহিরে বাঁধিয়া দিবে। গুড়ের লোভে তাহাতে মাছি বসিয়া মলত্যাগ করিবে। মাছির মল-মুত্রে দড়িটি যখন পূর্ণ হইবে, তখন সেই দড়ি রোপণ করিবে। তাহা হইতে পুদিনা গাছ উৎপন্ন হইবে। মক্ষিকার বিষ্ঠায় যদি পুদিনা গাছ হইতে পারে, তাহা হইলে মশার শুঁড় হইতে জোঁক হইবে না কেন?'

ডমরুধর বলিতে লাগিলেন,—'যাহা হউক, আমার বড়ই চিন্তা হইল। এত কষ্টের টাকা সব বৃথায় গেল, তাহা ভাবিয়া আমার মন আকুল হইল। কিন্তু আমি সহজে কোন কাজে হতাশ হই না। গ্রামে আসিয়া অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বৃহৎ একটি মশারি প্রস্তুত করিলাম। কাপড়ের মশারি নহে, নেটের মশারি নহে, জেলেরা যে জাল দিয়া মাছ ধরে, সেই জালের মশারি। তাহার পর পাঁচজন সাঁওতালকে চাকর রাখিলাম। একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া সেই পাঁচজন সাঁওতালের সঙ্গে পুনরায় আবাদে গমন করিলাম। ধীরে ধীরে আমরা নৌকা হইতে নামিলাম। চারি কোণে চারিটি বাঁশ দিয়া চারিজন মাঝি ভিতর হইতে মশারি উচ্চ করিয়া ধরিল। তীর-ধনু হাতে লইয়া চারিপার্শ্বে চারিজন সাঁওতাল দাঁড়াইল। একজন সাঁওতালের সহিত আমি মশারির মাঝখানে রহিলাম। মশারির ভিতর থাকিয়া আমরা দশজন আবাদের অভ্যন্তরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অধিক দূর যাইতে হয় নাই। বৃহৎ মশকগণ বোধ হয় অনেক দিন উপবাসী ছিল। মানুষের গন্ধ পাইয়া পালে পালে তাহারা মশারির গায়ে আসিয়া বসিল। কিন্তু মশারীর ভিতর প্রবেশ করিতে পারিল না। সাঁওতাল পাঁচজন ক্রম্যাগত তাহাদিগকে তীর দিয়া বধ করিতে লাগিল। সেদিন আমরা আড়াই হাজার মশা মারিয়াছিলাম। সন্ধ্যাবেলা কাজ বন্ধ করিয়া পুনরায় নৌকায় ফিরিয়া আসিলাম। সাঁওতালগণ এক ঝুড়ি মৃত মশা সঙ্গে আনিয়াছিল। শুঁড়, ডানা ও পা ফেলিয়া দিয়া সাঁওতালরা মশা পোড়াইয়া ভক্ষণ করিল। তাহারা বলিল যে, ইহার মাংস অতি উপাদেয়, ঠিক বাদুড়ের মাংসের মত। আমাকে একটু চাখিয়া দেখিতে বলিল, কিন্তু আমার রুচি হইল না।

পরদিন আমরা দুই হাজার মশা বধ করিলাম, তাহার পরদিন যোলশত, তাহার পরদিন বারশত, এইরূপ প্রতিদিন মশার সংখ্যা কম হইতে লাগিল। পঁয়ত্রিশ দিনে মশা একেবারে নিঃশেষ হইয়া গেল। হয় আমরা সমুদয় মশা মারিয়া ফেলিলাম, আর না হয় অবশিষ্ট মশা নিবিড় বনে পলায়ন করিল। সেই অবধি আমাদের আবাদে এ বৃহৎ জাতীয় মশার উপদ্রব

হয় নাই। মশার হাত হইতে অর্থাৎ শুঁড় হইতে পরিত্রাণ পাইয়া আমি আবাদের চারিদিকে পুনরায় ভেড়ি বাঁধাইলাম। বন কাটিয়া ও পুষ্করিণীর সংস্কার করিয়া কয়েক ঘর প্রজা বসাইলাম। এই সমুদয় কাজ করিতে আমার আটশত টাকা খরচ হইয়া গেল। তখন দেখিলাম যে, আরও হাজার টাকা খরচ না করিলে কিছুই হইবে না। সে হাজার টাকা কোথায় পাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ – শূন্যপথে লোহার সিন্দুক

আমাদের গ্রাম হইতে সাত ক্রোশ দূরে কচপুরের স্বরূপ সরকেলের সহিত আমার আলাপ পরিচয় ছিল। কাপড়ের দোকানে যখন কাজ করিতাম, তখন তিনি আমাদের খরিদ্দার ছিলেন। কাপড়ের দাম লইয়া তিনি বড় হেঁচড়া-হিঁচড়ি কচলা-কচলি করিতেন না। তিন সত্য করিয়া ধর্মের দোহাই দিয়া আমি তাহাকে বলিতাম যে, 'আপনার নিকট কখনও আমি এক আনার অধিক লাভ করিব না।' কিন্তু ফলে তাঁহাকে বিলক্ষণ ঠকাইতাম। আমি ব্যবসাদারের চাকর ছিলাম। দোকানদারের রীতি এই। আলাপী লোকেরা আমাদিগকে বিশ্বাস করে, আলাপী লোককে ঠকাইতে দোকানদারের বিলক্ষণ সুবিধা হয়। বড়বাজারে বসিয়া প্রতিদিন হাজার হাজার মিথ্যা কথা বলিতাম; শত শত লোককে আমরা ঠকাইতাম। না ঠকাইলে আমাদের কাজ চলে না। এই সূত্রে সরকেল মহাশয়ের সহিত আলাপ-পরিচয় হইয়াছিল। সরকেল মহাশয়ের একটু । জমিদারী আছে, তাহা ব্যতীত তিনি তেজারতি করেন। আমি ভাবিলাম যে, তাঁহার নিকট হইতে এক হাজার টাকা ঋণ-গ্রহণ করিয়া আমি আমার আবাদের পতিত ভূমি উঠিত করিব।

এইরূপ মনে করিয়া আমি সরকেল মহাশয়ের ভবনে গমন করিলাম। আবাদ বাঁধা রাখিয়া তাঁহার নিকট এক হাজার টাকা ঋণ চাহিলাম। তিনি বলিলেন যে, 'আবাদ না দেখিয়া টাকা দিতে পারি না।' একজন গোমস্তাকে আমার আবাদ দেখিতে পাঠাইলেন। সাতদিন পরে পুনরায় আমাকে যাইতে বলিলেন। এই সময় আমি দেখিলাম যে, সেই গ্রামে দুইজন সন্ন্যাসী আসিয়াছেন। সরকেল মহাশয়ের বাড়ীর বাহিরে তাঁহারা আড্ডা গাড়িয়াছেন। তাঁহাদের সহিত তিনটি ঘোড়া ও বৃহৎ এক প্রস্তরনির্মিত কালীর প্রতিমা আছে। দিনের মধ্যে তিনবার শঙ্খ ও শিঙ্গা বাজাইয়া তাঁহারা দেবীর পূজা করেন। সমস্ত দিন অনেক লোক আসিয়া প্রতিমা দর্শন করে। খুব ধুম। যে পর্যন্ত সন্ন্যাসী মহাশয়েরা এই গ্রামে আসিয়াছেন, সেই পর্যন্ত সরকেল মহাশয় তাঁহাদের সমুদয় ব্যয় নির্বাহ করিতেছেন। ইহার অনেক বৎসর পরে আমি নিজে সন্ন্যাসী-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে তখন যদি কিছু অভিজ্ঞতা থাকিত, তাহা হইলে সরকেল মহাশয়কে সাবধান করিতাম।

সাতদিন পরে পুনরায় আমি সরকেল মহাশয়ের বাটী গমন করিলাম। সন্ধ্যাবেলা পৌঁছিলাম। সেজন্য টাকা-কড়ি সম্বন্ধে সে রাত্রি কোন কথাবার্তা হইল না। সরকেল মহাশয়ের দুই মহল কোঠাবাড়ী। পূর্বদিকে অন্তঃপুর, পশ্চিমদিকে সদরবাটী। সদরবাটীর

উত্তর দিকে পূজা দালান। আহারাদি করিয়া আমি পূজার দালানে শয়ন করিলাম, পথশ্রমে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম। রাত্রি বোধ হয় তখন একটা এমন সময় ভিতরবাড়ীতে দুম্ দুম্ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল। আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। ডাকাত পড়িয়াছে মনে করিয়া আমি উঠিয়া বসিলাম। কিন্তু লোকের সাড়া-শব্দ কিছুই পাইলাম না। শব্দটাও ডাকাতপড়া শব্দের ন্যায় নহে। আমার বোধ হইল, যেন একটা ভারী বস্তু এক সিঁড়ি হইতে অপর সিঁড়িতে সবলে লাফাইয়া উপরতালা হইতে নীচের তলায় নামিতেছে। প্রথম মনে করিলাম যে, সরকেল মহাশয় বুঝি কোন বস্তু এই প্রকারে উপর হইতে নীচে আনিতেছেন। রথের সময় পুরুষোত্তমে জগন্নাথের কোমরে দড়ি বাঁধিয়া উড়ে পাণ্ডারা যেরূপ মন্দিরের এক পৈঠা হইতে অপর পৈঠায় নামায়, সরকেল মহাশয় বুঝি সেইরূপ কোন ভারী বস্তু নামাইতেছেন।

কিছুক্ষণ পরে বাড়ীর ভিতর কোলাহল পড়িয়া গেল। সরকেল মহাশয় চীৎকার করিয়া বলিলেন যে, টাকাকড়ি পূর্ণ তাঁহার লোহার সিন্দুক কে লইয়া যাইতেছে। তাহার পর স্ত্রীলোকেরা চীৎকার করিয়া বলিল যে, ভূতে লোহার সিন্দুক লইয়া যাইতেছে। আমি স্বচক্ষে দেখি নাই, কিন্তু পরে শুনিলাম যে, সিন্দুক আপনা আপনি সিঁড়ির এক পৈঠা হইতে অপর পৈঠায় নামিতেছিল। লোহার সিন্দুক যখন উপর হইতে নীচে নামিতেছিল, তখন সরকেল মহাশয় একবার তাহার আংটা ধরিয়াছিলেন। পরমুহূর্তে পায়ের উপর লোহার সিন্দুক পড়িয়া তাঁহার পা ছেঁচিয়া গিয়াছিল। তখন সরকেল মহাশয় অজ্ঞান হইয়া মাটীতে পড়িয়া রহিলেন। সিন্দুক নীচে নামিয়া ভিতরবাড়ীর দরজায় সবলে দুম দুম শব্দে আঘাত করিল। ভিতরবাড়ীর দরজা ভাঙ্গিয়া গেল। সিন্দুক সদরবাড়ীর উঠানে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি দেখিলাম যে, মাটী হইতে চারি-পাঁচ হাত উপরে শূন্যপথে সিন্দুক আপনা আপনি সদরদ্বার অভিমুখে গমন করিতেছে। তাড়াতাড়ি দালান হইতে নামিয়া আমি একটা আংটা ধরিয়া টানিতে লাগিলাম। সেই সময়ে সরকেল মহাশয়ের দারোয়ান রামগোপাল সিংও আসিয়া সিন্দুকের অপর পার্শ্বের আংটা ধরিয়া ফেলিল। সিন্দুক তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইয়া দারোয়ানের পা ছেঁচিয়া দিল। সে মাটীতে পড়িয়া, 'জান গিয়া জান গিয়া' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। ভাগ্যে আমার পায়ে পড়ে নাই। আমার পায়ে পড়িলে আমি মারা যাইতাম। এ নিশ্চয়ই ভৌতিক ব্যাপার, এইরূপ বুঝিয়া আমি আর সিন্দুক ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলাম না।

সদর দরজায় উপস্থিত হইয়া সিন্দুক গুরুভাবে তাহাতে আঘাত করিতে লাগিল। তিন ঘায়ে সদর দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। সদরদ্বার ভাঙ্গিয়া সিন্দুক শূন্যপথে গ্রাম পার হইয়া মাঠের দিকে যাইতে লাগিল। গভীর রাত্রিতে ভয়ানক শব্দ শুনিয়া গ্রামের লোক মনে করিল যে, সরকেল মহাশয়ের বাড়ীতে ডাকাত পড়িয়াছে। লাঠিসোটা লইয়া প্রতিবেশিগণ দৌড়িয়া আসিল, কিন্তু তখন সিন্দুক গ্রামের প্রান্তভাগে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। এই সময় আর একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। সরকেল মহাশয়ের গৃহে ও নিকটস্থ প্রতিবেশীদিগের গৃহে

হাতা, বেড়ি, কড়া, দা, কুড়ুল, ছুরি, কাঁচি যাহা কিছু লোহার দ্রব্য ছিল, সমুদয় বাহির হইয়া সন্ সন্ শব্দে শূন্যপথে সিন্দুকের পশ্চাৎ ধাবিত হইল। তাহার পর যাহা হইল, তাহা বলিলে তোমরা হয় তো বিশ্বাস করিবে না, অতএব চুপ করিয়া থাকাই ভাল।

লম্বোদর বলিলেন,—'বিশ্বাস করি না করি বলই না ছাই।'

ডমরুধর বলিলেন,—'বাঘের ছালের ভিতর প্রবেশ করিয়া যখন তোমাদের সম্মুখে লম্ফঝম্ফ করিয়াছিলাম, তখন তো বিশ্বাস করিয়াছিলে। তখন পুকুরে গিয়া কেলে হাঁড়ি মাথায় দিয়া সমস্ত রাত্রি বসিয়াছিলে।'

লম্বোদর উত্তর করিলেন,—'বাঘ দেখি নাই। বাঘ বাঘ বলিয়া একটা গোল পড়িয়াছিল, তাহা শুনিয়াই গাড়ী হইতে লাফাইয়া পলায়ন করিয়াছিলাম।'

শঙ্কর ঘোষ বলিলেন,—'না, না,—বিশ্বাস করিব না কেন। তাহার পর কি হইল বল।

উপস্থিত অন্যান্য ব্যক্তিগণও অনেক সাধ্য-সাধনা করিলেন। তখন ডমরুধর পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন।

আমার কোমরে তখন বড় একথোলো চাবি থাকিত। কিন্তু তখন কেবল আমার দুইটি বাক্স ছিল। লোকে মনে করিবে যে, ইঁহার অনেক টাকা আছে, টাকা রাখিতে স্থান হয় না, তাই অনেক বাক্স করিতে হইয়াছে, ঐ চাবিগুলি সেই সব বাক্সের। দেখ লম্বোদর! সত্য সত্য লোকের টাকা না থাকুক, একটা জনরব উঠিলেই হইল যে, অমুকের অনেক টাকা আছে। কাহাকেও একটি পয়সা দিতে হয় না। মুখবন্ধ গুড়ের কলসীর কাছে কত মাছি থাকে। তাহারা একফোঁটাও গুড় খাইতে পায় না, তথাপি আশেপাশে ভ্যান ভ্যান করে? সেইরূপ যদি লোকে শুনিতে পায় যে, অমুকের অনেক টাকা আছে, তাহা হইলে দেশশুদ্ধ লোক তাহার পাশে পাইলাম, তাহা কি? পাশে আসিয়া ভ্যান ভ্যান করে, সেই হাই তুলিলে তুড়ি দেয়। বিশেষতঃ আমার হাই। আমার হাই তোলা দেখিলে মানুষের প্রাণ শীতল হয়। হাই তুলিয়া একবার সকলকে দেখাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ – সন্ন্যাসীর কালীঠাকুর

সকলে মনে করিবে যে, আমার অনেক টাকা আছে, সেইজন্য বৃহৎ চাবির থোলো সর্বদা আমি কোমরে পরিতাম। চারি-পাঁচটি ঘুনসী একত্র পাকাইয়া মোটা দড়ির ন্যায় করিয়া, চাবির থোলো তাহাতে বাঁধিয়া আমি কোমরে পরিয়াছিলাম।

যখন লোকের হাতা, বেড়ি, খন্তা, কুড়ুল সন্ সন্ শব্দে আইরণচেষ্টের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গেল, তখন আমার চাবির থোলোতে টান ধরিল। সহজ অবস্থায় চাবির থোলো ঝুলিয়া থাকে, এখন সোজা সটান হইয়া লোহার সিন্দুকের পশ্চাতে যাইবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিল। আমার পশ্চাৎদিকের কোমরের মাংসে ঘুনসি বসিয়া গেল, আমার ঘোর যাতনা হইল, আমি ভাবিলাম যে কোমর পর্যন্ত কাটিয়া আমার শরীর বা দুইখানা হইয়া যায়। একটু আলগা করিবার নিমিত্ত আমি চাবির থোলোটি ধরিতে যাইলাম। যেই ছুঁইয়াছি,

আর আমার হাতে যেন হাজার সূচ ফুটিয়া গেল। চাবি হইতে আমি হাত ছাড়াইয়া লইতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তাহা পারিলাম না। চাবি আমাকে মাঠের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। 'আমার প্রাণ বাঁচাও, আমার প্রাণ বাঁচাও বলিয়া গ্রামের লোককে ডাকিতে লাগিলাম, কিন্তু এ 'ভূতের কাণ্ড' এইরূপ মনে করিয়া সকলে পলায়ন করিল, আপন ঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

চাবির থোলো আমাকে মাঠের দিকে লইয়া চলিল। মাঠে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, আগে অনেক দূরে তিনটি ঘোড়া যাইতেছে। জ্যোৎস্না রাত্রি, সেজন্য অনেকটা স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। দুইটা ঘোড়ার উপর দুইজন সন্ন্যাসী চড়িয়াছে, তৃতীয় ঘোড়ার উপর সেই প্রস্তরের কালীমূর্তি ও পূজার আসবাব বোঝাই আছে। তাহার পশ্চাতে প্রায় পাঁচশত হাত দূরে মাটী হইতে চারি-পাঁচ হাত উপরে শূন্যপথে লোহার সিন্দুক যাইতেছে। সিন্দুক হইতে প্রায় দুইশত হাত পশ্চাতে হাতা, বেড়ি, কড়া, খন্তা, দা, কুড়ুল লৌহনির্মিত দ্রব্যসমূহ সেইরূপ শূন্যপথে যাইতেছে। তাহার প্রায় দুইশত হাত দূরে চাবির থোলো আমাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। কাণ্ডখানা কি, তখন আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই। তখন আমার প্রাণ লইয়া টানাটানি, কোমর কাটিয়া শরীরটি দুইখানা হইবার উপক্রম হইয়াছিল। ভাবিবার চিন্তিবার তখন সময় ছিল না।

মাঠের উপর দিয়া প্রায় এক ক্রোশ পথ এইভাবে আমাকে টানিয়া লইয়া চলিল। তাহার পর সহসা দুম করিয়া শব্দ হইল। চাহিয়া দেখিলাম যে দূরে সিন্দুকটি মাটীতে পড়িয়াছে, তাহার শব্দ। আরও নিরীক্ষণ করিলাম যে, সিন্দুকের অগ্রে ঘোড়া তিনটি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, সন্ন্যাসী দুইজন ঘোড়ার পিঠ হইতে নামিয়াছে, আর তৃতীয় ঘোড়া হইতে কালীর প্রতিমাটিও নামাইয়া নীচে মাটীর উপর সিংহাসনে রাখিয়াছে।

সিন্দুকটি যেই মাটীতে পড়িল, আর তাহার পরক্ষণেই হাতা, বেড়ি, খন্তা, কুড়ুল প্রভৃতি ঝুপঝাপ ঠসঠাস করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। তাহার পরক্ষণেই আমার চাবি পূর্বের ন্যায় কোমরে ঝুলিয়া পড়িল। কোমরে ঘুনসির টান আর রহিল না। তখন আমার ধড়ে প্রাণ আসিল, তখন যথানিয়মে নিঃশ্বাস ফেলিয়া আমি সুস্থির হইলাম। সেই স্থানে আমি প্রায় এক ঘণ্টা পড়িয়া রহিলাম। এক ঘণ্টা পরে যখন আমি পুনরায় চাহিয়া দেখিলাম, তখন দেখিলাম যে, দূরে সে ঘোড়াও নাই, সে সন্ন্যাসীও নাই; অনেকক্ষণ পরে অতি সাবধানে, অতি ধীরে ধীরে, অতি ভয়ে ভয়ে আমি সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলাম; দেখিলাম যে, সন্ন্যাসী দুইজন লোহার সিন্দুকটি কোনরূপে ভাঙ্গিয়াছে অথবা খুলিয়াছে। তাহার ভিতর টাকাকড়ি, গহনা-পত্র যাহা কিছু ছিল সে সমুদয় লইয়া গিয়াছে। চারিদিকে কাগজ-পত্র ছড়াছড়ি হইয়া আছে। দুই চারিখানি কাগজে স্ট্যাম্প দেখিয়া বুঝিলাম যে, সে সব দলিলপত্র। তাহাতে আমি হাত দিলাম না। অন্য একতাড়া কাগজ তুলিয়া দেখিলাম যে, সে কোম্পানীর কাগজ, তাহা আমি ফেলিয়া দিলাম। আর একতাড়া কাগজ, লম্বোদর! সেদিন তোমাদিগকে আমি বলিয়াছিলাম যে, আমি ভাগ্যবান পুরুষ। আজ তাহার প্রত্যক্ষ

প্রমাণ দেখ। কাগজ তাড়াটি একটু খুলিয়া দেখিলাম যে, সেসব নোট! তাহার পর দৌড়িয়া বেলা নয়টার সময় বাড়ীতে পৌঁছিয়া, তবে হাঁপ ছাড়িলাম।

লম্বোদর বলিলেন,—'এ সমুদয় তোমার আজগুবি গল্প। এ অনেক দিনের কথা, কিন্তু আমরা সেই সময় শুনিয়াছিলাম যে, সরকেল মহাশয়ের বাড়িতে যথার্থই চুরি হইয়াছিল এবং সে চোরগণ তোমার অপরিচিত লোক ছিল না।'

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—'সমুদয় মিথ্যা কথা, হিংসায় লোক কি না বলে।'

সপ্তম পরিচ্ছেদ – চুম্বকের সার

ডমরুধর বলিতে লাগিলেন,—'বাড়ীতে আসিয়া নোটগুলি গণিয়া দেখিলাম যে, দুইশত দশ টাকার নোট, মোট দুই হাজার টাকা। আর ঋণের প্রয়োজন কি? সরকেল মহাশয়কে আমি এক পত্র লিখিলাম যে,—'সেদিন আপনার বাড়ীতে গিয়া ভূতের হাতে প্রাণ হারাইতে বসিয়াছিলাম। আপনার টাকার আমার প্রয়োজন নাই।'

তাহার পর সেই টাকা দিয়া আমি সমুদয় আবাদটি উঠিত করিলাম। আমি ছাইমুঠা ধরিলে সোনা-মুঠা হইয়া যায়। সে অঞ্চলে এখন অনেক লোকের আবাদ হইয়াছে। বহুদূর পর্যন্ত এখন লোকের বাস হইয়াছে। নদীতে খিযা বসিয়াছে, মাঝে মাঝে হাট বসিয়াছে। গ্রীষ্মকালে কোন কোন স্থানে বরফের কুলফি বিক্রয় হয়। শীতকালে হিন্দুস্থানীরা ফুলুরি ফেরি করিয়া বেড়ায়। যে সাঁওতালগণ মশা মারিতে আমার সহায়তা করিয়াছিল, তাহাদিগকে আমি জমি দিয়াছি, তাহারা আমার প্রজা হইয়াছে। তাহাদিগের দেখাদেখি আরও অনেক সাঁওতাল নিকটস্থ আবাদসমূহে বাস করিতেছে।

এখন আমার কিরূপ সম্পত্তি হইয়াছে, কিরূপ জনসাধারণের নিকট আমি গণ্যমান্য হইয়াছি তাহা তোমরা অবগত আছ। শ্বশুর প্রহ্লাদবাবু সম্বন্ধে আমি যে ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়াছিলাম, তাহা পূর্ণ হইয়াছে। মালতীকে আপনা হইতে তিনি পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি নিজে তাঁহার পুত্রগণ, তাঁহার ভগিনী কতবার যে আমার বাড়ীতে আসিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা নাই। মালতী জীবিত নাই। এখন অবশ্য তাঁহাদের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই। শুনিয়াছি যে, এখন সংসারে তাঁহাদের আর কেহ নাই। দেশে গিয়া ম্যালেরিয়া জ্বরে সে সংসার মরিয়া-হাজিয়া গিয়াছে।

লম্বোদর বলিলেন,—'অনেক কথা তো শুনিলাম। তুমি বলিলে যে, সরকেল মহাশয়ের বাড়ী চুরি হয় নাই, আর সে চোরগণকে তুমি দ্বার খুলিয়া দাও নাই। তবে সন্ন্যাসী দুইজন কি করিয়াছিল যে, লোহার সিন্দুক ও অন্যান্য লোহালক্কড়ে টান ধরিয়াছিল?'

ডমরুধর উত্তর করিলেন যে,—'আমি যখন কাপড়ের দোকানে কাজ করিতাম, তখন কোন কোন দিন সন্ধ্যার পর সে স্থানে পুঁথি পড়া হইত। মহাভারত রামায়ণের পর সে একজন আরব্য উপন্যাস পাঠ করিয়াছিলেন। তাহাতে এক রাজপুত্রের গল্প শুনিয়াছিলাম। জাহাজে চড়িয়া সমুদ্রপথে তিনি দেশ-বিদেশ পরিদর্শন করিয়াছিলেন। অবশেষে ঝড়ে

তাড়িত হইয়া তাঁহার জাহাজ এক কৃষ্ণবর্ণের পর্বতের সমীপে উপস্থিত হইয়াছিল। জাহাজের যত পেরেক ছিল, সব খুলিয়া সেই পর্বতে গিয়া লাগিল। জাহাজ জলমগ্ন হইল। আমার বোধ হয় সন্ন্যাসীদের যে বৃহৎ কালীমূর্তি ছিল, তাহা চুম্বক পাথরে গঠিত। কিন্তু সে সামান্য চুম্বক পাথর নহে। চোলাই করা চুম্বক পাথরের সার। সিংহাসনটি এরূপ পদার্থে গঠিত, যাহা ভেদ করিয়া চুম্বক প্রস্তরের আকর্ষণশক্তি দূরে যাইতে পারে না। প্রথম কয়দিন সন্ন্যাসী দুইজন দেবীকে সেই সিংহাসনে বসাইয়া পূজা করিয়াছিল। সে নিমিত্ত সে কয়দিন লৌহদ্রব্যে টান ধরে নাই। শেষদিন গভীর রাত্রিতে তাহারা দেবীকে সিংহাসন হইতে নিম্নে রাখিয়াছিল, আর সেই সময় নিকটস্থ লৌহনির্মিত দ্রব্য আকৃষ্ট হইয়াছিল। সে রাত্রিতে প্রথম আমি দেখিয়াছিলাম যে, তৃতীয় ঘোড়ার উপর বলদের ছালার ন্যায় তাহারা দুইদিকে দুই প্রকার বোঝা রাখিয়াছিল। বোধ হয়, একদিকে প্রতিমা, অপরদিকে সিংহাসন ও পূজার সামগ্রী রাখিয়াছিল। সিংহাসন হইতে মূর্তি পৃথক ছিল সেজন্য তখনও লোহার দ্রব্য টান ছিল; তাহার পর মাঠে প্রতিমার আকর্ষণশক্তি লোপ হইয়াছিল। তাহার পর সিংহাসনের উপর মূর্তি রাখিয়া ঘোড়ার উপর সেইভাবে বোঝাই দিয়া তাহারা পলায়ন করিয়াছিল। আমার বোধ হয়, লৌহদ্রব্যসমূহ এই কারণে শূন্যপথে ভ্রমণ করিয়াছিল।'

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তুমি যে গল্পটি করিলে, উহার কোন প্রমাণ আছে?'

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—'প্রমাণ নাই? নিশ্চয় আছে। চাবির থোলো এখনও আমার ঘরে আছে। বল তো এখনি আনিয়া দেখাই।'

অষ্টম পরিচ্ছেদ – কুম্ভীর-বিভ্রাট

শঙ্কর ঘোষ জিজ্ঞাসা করিলেন,—'শুনিয়াছি যে সুন্দরবনে নদী-নালায় অনেক কুমীর আছে। তোমার আবাদে কুমীর কিরূপ?'

ডমরুধর বলিলেন,—কুমীর! আমার আবাদের কাছে যে নদী আছে, কুমীরে তাহা পরিপূর্ণ। খেজুর গাছের মত নদীতে তাহারা ভাসিয়া বেড়ায়, অথবা কিনারায় উঠিয়া পালে পালে তাহারা রৌদ্র পোহায়। গরুটা, মানুষটা, ভেড়াটা, ছাগলটা, বাগে পাইলেই লইয়া যায়। কিন্তু এ সব কুমীরকে আমরা গ্রাহ্য করি না। একবার আমার আবাদের নিকট এক বিষম কুমীরের আবির্ভাব হইয়াছিল। গন্ধমাদন পর্বতে কালনেমির পুকুরে যে কুম্ভীর হনুমানকে ধরিয়াছিল, ইহা তাহা অপেক্ষাও ভয়ানক, গঙ্গাদেবী যে মকরের পীঠে বসিয়া বায়ু সেবন করেন, সে মকরকে এ কুমীর একগালে খাইতে পারে! পর্বত প্রমাণ যে গজ সেকালে বহুকাল ধরিয়া কচ্ছপের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, সে-কচ্ছপকে এ কুমীর নস্য করিতে পারে। ইহার দেহ বৃহৎ, তালগাছের ন্যায় বড়, ইহার উদর এই দালানটির মত। অন্যান্য কুমীর জীবজন্তুকে ছিঁড়িয়া ভক্ষণ করে। কিন্তু এ কুমীরটা আস্ত গরু, আস্ত মহিষ গিলিয়া ফেলিত। রাত্রিতে সে লোকের ঘরে ও গোয়ালে সিঁদ দিয়া মানুষ ও গরু-বাছুর লইয়া যাইত। লাঙ্গুলে জল আনিয়া দেওয়াল ভিজাইয়া গর্ত্ত করিত। ইহার জ্বালায় নিকটস্থ

আবাদের লোক অস্থির হইয়া পড়িল। প্রজাগণ পাছে আবাদ ছাড়িয়া পলায়ন করে, আমাদের সেই ভয় হইল, তাহার পর লাঙ্গুলের আঘাতে নৌকা ডুবাইয়া আরোহীদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিল। সে নিমিত্ত এ পথ দিয়া নৌকার যাতায়াত অনেক পরিমাণে বন্ধ হইয়া গেল।

এই ভয়ানক কুম্ভীরের হাত হইতে কিরূপে নিষ্কৃতি পাই এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সময় আমার আবাদের নিকট একখানি নৌকা ডুবাইয়া তাহার আরোহীদিগকে একে একে আমাদের সমক্ষে সে গিলিয়া ফেলিল। এই নৌকায় এক ভদ্রলোক কলিকাতা হইতে সপরিবারে পূর্বদেশে যাইতেছিলেন। নদীর তীরে দাঁড়াইয়া আমরা দেখিলাম যে, তাঁহার গৃহিণী সর্বাঙ্গ বহুমূল্য অলঙ্কারে ভূষিত ছিল। তোমরা জান যে, কুমীরের পেটে মাংস হজম হয়, গহনা পরিপাক হয় না। কুমীর যখন সেই স্ত্রীলোককে গিলিয়া ফেলিল, তখন আমার মনে এই চিন্তা উদয় হইল,—চিরকাল আমি কপালে পুরুষ; যদি এই কুমীরটাকে আমি মারিতে পারি, তাহা হইলে ইহার পেট চিরিয়া এই গহনাগুলি বাহির করিব, অন্ততঃ পাঁচ-ছয় হাজার টাকা আমার লাভ হইবে।

এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি কলিকাতায় গমন করিলাম। বড় একটি জাহাজের নঙ্গর কিনিয়া উকো ঘষিয়া তাহাতে ধার করিলাম, তাহার পর যে কাছিতে মানোয়ারি জাহাজ বাঁধা থাকে সেইরূপ এক কাছি ক্রয় করিলাম। এইরূপ আয়োজন করিয়া আমি আবাদে ফিরিয়া আসিলাম। আবাদে আসিয়া শুনিলাম যে, কুমীর আর একটা মানুষ খাইয়াছে। চারিদিন পূর্বে এক সাঁতালনী এককুড়ি বেগুন মাথায় লইয়া হাটে বেচিতে যাইতেছিল সে যেই নদীর ধারে গিয়াছে, আর কুমীর তাহাকে ধরিয়া বেগুনের ঝুড়ি সহিত আস্ত গিলিয়া ফেলিয়াছে, তাহাতে সাঁওতাল প্রজাগণ ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে; বলিতেছে যে, আবাদ ছাড়িয়া তাহারা দেশে চলিয়া যাইবে।

আবাদে আসিয়া নঙ্গরটিকে আমি বঁড়শী করিলাম তাহাতে জাহাজের কাছি বাঁধিয়া দিলাম, মাছ ধরিবার জন্য লোকে যে হাতসূতা ব্যবহার করে, বৃহৎ পরিমাণে এও সেইরূপ হাত-সূতার ন্যায় হইল। নঙ্গরের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগে এক মহিষের বাছুর গাঁথিয়া নদীর জলের নিকট বাঁধিয়া দিলাম। কাছির অন্যদিকে একগাছে পাক দিয়া রাখিলাম, তাহার পর পঞ্চাশ জন সবল লোককে নিকটে লুক্কায়িত রাখিলাম। বেলা তিনটার সময় আমাদের এই সমুদয় আয়োজন সমাপ্ত হইল।

বঁড়শীতে মহিষের বাছুরকে বিঁধিয়া দিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু তাহার প্রাণ আমরা একেবারে বধ করি নাই। নদীর ধারে দাঁড়াইয়া সে গাঁ গাঁ শব্দে ডাকিতে লাগিল, তাহার ডাক্ শুনিয়া সন্ধ্যার ঠিক পূর্বে সেই প্রকাণ্ড কুমীর আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার লেজের ঝাপটে পর্বতপ্রমাণ এক ঢেউ উঠিল, সেই ঢেউয়ে বাছুরটি ডুবিয়া গেল তখন আর আমরা কিছুই দেখিতে পাইলাম না, পরক্ষণেই কাছিতে টান পড়িল। তখন আমরা বুঝিলাম যে, নঙ্গরবিদ্ধ বাছুরকে কুমীর গিলিয়াছে, বঁড়শীর ন্যায় নঙ্গর কুমীরের মুখে বিঁধিয়া গিয়াছে।

তাড়াতাড়ি সেই পঞ্চাশ জন লোক আসিয়া দড়ি ধরিয়া টানিতে লাগিল। ভাগ্যে গাছে পাক দিয়া রাখিয়াছিলাম, তা না হইলে কুমীরের বলে এই পঞ্চাশ জন লোককে নদীতে গিয়া পড়িতে হইত। আমরা সেই রাক্ষস কুমীরকে বঁড়শীতে গাঁথিয়াছি ঐ কথা শুনিয়া চারিদিকের আবাদ হইতে অনেক লোক দৌড়িয়া আসিল। প্রায় পাঁচশত লোক সেই রশি ধরিয়া টানিতে লাগিল। দারুণ আসুরিক বলে কুমীর সেই পাঁচশত লোকের সহিত ঘোর সংগ্রাম করিতে লাগিল। কখন আমাদের ভয় হইল যে, তাহার বিপুল বলে নোঙ্গর ভাঙ্গিয়া যায়, কখন ভয় হইল যে, তাহার জাহাজের দড়া বা ছিঁড়িয়া যায়। কখন ভয় হইল, গাছ উৎপাটিত হইয়া নদীতে গিয়া পড়ে। নিশ্চয় একটা বিভ্রাট ঘটিত, যদি না সাঁওতালগণ কুমীরের মস্তকে ক্রমাগত তীরবর্ষণ করিত, যদি না নিকটস্থ দুইটি আবাদের লোক বন্দুক আনিয়া কুমীরের মাথায় গুলী মারিত। তীর ও গুলী খাইয়া কুমীর মাঝে মাঝে জলমগ্ন হইতে লাগিল। কিন্তু নিঃশ্বাস লইবার জন্য পুনরায় তাহাকে ভাসিয়া উঠিতে হইল। সেই সময় লোক তীর ও গুলীবর্ষণ করিতে লাগিল। কুমীরের রক্তে নদীর জল বহুদূর পর্যন্ত লোহিত বর্ণে রঞ্জিত হইয়া গেল। সমস্ত রাত্রি কুমীরের সহিত আমাদের এইরূপ যুদ্ধ চলিল। প্রাতঃকালে কুম্ভীর হীনবল হইয়া পড়িল। বেলা নয়টার সময় তাহার মৃতদেহ জলে ডুবিয়া গেল। তখন অতি কষ্টে তাহাকে আমরা টানিয়া উপরে তুলিলাম।

বড় বড় ছোরা বড় বড় কাস্তে আনিয়া তাহার পেট চিরিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু সে রাক্ষস কুমীরের পেট অতি কঠিন ছিল। আমাদের সমুদয় অস্ত্র ভাঙ্গিয়া গেল। অবশেষে করাত আনাইয়া করাতের দ্বারা তাহার উদর কাটাইলাম। কিন্তু পেট চিরিয়া তাহার পেটের ভিতর যাহা দেখিলাম, তাহা দেখিয়াই আমার চক্ষুস্থির।

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিল,—'কি দেখিলে?'

শঙ্কর ঘোষ জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কি দেখিলে?'

অন্যান্য শ্রোতৃগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কি দেখিলে?'

ডমরুধর বলিলেন,—'বলিব কি ভাই, আর দুঃখের কথা, কুমীরের পেটের ভিতর দেখি না যে সেই সাঁওতাল মাগী, চারিদিন পূর্বে কুমীর যাহাকে আস্ত ভক্ষণ করিয়াছিল, সেই মাগী পূর্বদেশীয় সেই ভদ্রমহিলার সমুদয় গহনাগুলি আপনার সর্বাঙ্গে পরিয়াছে, তাহার পর নিজের বেগুনের ঝুড়িটি সে উপুড় করিয়াছে, সেই বেগুনগুলি সম্মুখে ডাঁই করিয়া রাখিয়াছে। ঝুড়ির উপর বসিয়া মাগী বেগুন বেচিতেছে!'

শঙ্কর ঘোষ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কুমীরের পেটের ভিতর ঝুড়ির উপর বসিয়া সে বেগুন বেচিতেছিল?'

ডমরুধর বলিলেন,—'হাঁ ভাই! কুমীরের পেটের ভিতর সেই ঝুড়ির উপর বসিয়া মাগী বেগুন বেচিতেছিল।'

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কাহাকে সে বেগুন বেচিতেছিল? কুমীরের পেটের ভিতর সে খরিদ্দার পাইল কোথা?

বিরক্ত হইয়া ডমরুধর বলিলেন,—'তোমার এক কথা! কাহাকে সে বেগুন বেচিতেছিল, সে খোঁজ করিবার আমার সময় ছিল না। সমুদয় গহনাগুলি সে নিজের গায়ে পরিয়াছিল, তাহা দেখিয়াই আমার হাড় জ্বলিয়া গেল। আমি বলিলাম,—'মাগী! ও গহনা আমার। অনেক টাকা খরচ করিয়া আমি কুমীর ধরিয়াছি, ও গহনা খুলিয়া দে।' কেঁউ মেউ করিয়া মাগী আমার সহিত ঝগড়া করিতে লাগিল। তাহার পর তাহার পুত্রগণ ও তাহার জাতি ভাইগণ কাঁড়বাঁশ ও লাঠিসোটা লইয়া আমাকে মারিতে দৌড়িল। আমার প্রজাগণ কেহই আমার পক্ষ হইল না। সুতরাং আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে হইল। সাঁওতালগণ সে মাগীকে ঘরে লইয়া গেল। দিনকয়েক শূকর মারিয়া ও মদ খাইয়া তাহারা আমোদ-প্রমোদ করিল। পূর্বদেশীয় সে ভদ্রমহিলার একখানি গহনাও আমি পাইলাম না। মনে মনে ভাবিলাম যে, কপালে পুরুষের ভাগ্য সকল সময় প্রসন্ন হয় না?'

লম্বোদর বলিলেন,—'এত আজগুবি গল্প তুমি কোথায় পাও বল দেখি?'

ডমরুধর বলিলেন,—'এতক্ষণ হাঁ করিয়া এক মনে এক ধ্যানে গল্পটি শুনিতেছিলে। যেই হইয়া গেল, তাই এখন বলিতেছ যে, আজগুবি গল্প। কলির ধর্ম বটে!'

শঙ্কর ঘোষ জিজ্ঞাসা করিলেন,—'এ কুমীরের গল্প যে সত্য, তাহার প্রমাণ আছে?'

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—'প্রমাণ? নিশ্চয় প্রমাণ আছে। কোমরের ব্যাথার জন্য এই দেখ সেই কুমীরের দাঁত আমি পরিয়া আছি।'

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—'সে কুমীর যদি তালগাছ অপেক্ষা বৃহৎ ছিল, তবে তাঁহার দাঁত এত ছোট কেন? ঠিক অন্য কুমীরের দাঁতের মত কেন?'

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—'অনেক মানুষ খাইয়া সে কুমীরের দাঁত ক্ষয় হইয়া গিয়াছিল।'

তৃতীয় গল্প

প্রথম পরিচ্ছেদ – নদীর ক্রোধ

ডমরুধরের পূজার দালান। প্রতিমা প্রস্তুত হইয়াছে। প্রতিমার সম্মুখে ডমরুধর, তাঁহার পুরোহিত ও বন্ধুবান্ধব বসিয়াছেন।

ডমরুধর বলিলেন,—'কলিকাতায় একবার এক খোলার ঘরের আগড়ের উপর একখানি কাগজ দেখিলাম। তাহাতে লেখা ছিল—ভাগ্যগণনা এক আনা।'

গণৎকারের নিকট আমি গমন করিলাম। অনেক কচলা-কচলি করিয়া শেষে এক পয়সায় রফা হইল। দৈবজ্ঞ হাত দেখিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় আমার একবার হাই উঠিল। তোমরা আমার হাই অনেকবার দেখিয়াছ।

প্রথম হইতেই আমার রূপ দেখিয়া গণৎকার মোহিত হইয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহার সহিত যখন দর কসাকসি করি, তখন তাঁহার মন আরও প্রফুল্ল হইয়াছিল। এখন আমার হাই দেখিয়া তিনি একেবারে আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

অধিক আর গণিতে-গাঁথিতে হইল না। হাতটি ধরিয়াই তিনি বলিলেন,—'মহাশয় কার্তিকেয়, যাঁহাকে ষড়ানন বলে, মা দুর্গার কনিষ্ঠ পুত্র! অবতার হইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।'-আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'আমার প্রতি কি কোনরূপ অভিশাপ হইয়াছিল?

দৈবজ্ঞ উত্তর করিলেন,—'না, তাহা নহে। বিবাহ করিবার নিমিত্ত একদিন আপনি মায়ের নিকট আব্দার করিয়াছিলেন। ভগবতী বলিলেন,—বাচ্চা, এ দেবলোকে তোমাকে কেহ কন্যা প্রদান করিবে না। যদি বিবাহ করিতে সাধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে পৃথিবীতে গিয়া অবতীর্ণ হও। —দৈবজ্ঞ আরও বলিলেন,—'পৃথিবীতে আপনি আসিয়াছেন, কিন্তু একটু সাবধানে থাকিবেন। মা দশভূজা ভালবাসেন, সেজন্য আপনার প্রতি নন্দীর একটু ঈর্ষা আছে। ছল পাইলে সে আপনাকে দুঃখ দিবে।'

দেখ লম্বোদর, ঐ যে ময়ূরের উপর যিনি বসিয়া আছেন, উনি আর কেহ নহেন, উনি আমি স্বয়ং। অবতার হইলে দেবতারা আত্মবিস্মৃত হইয়া থাকেন, আমিও সেই জন্য আত্মবিস্মৃতি হইয়া আছি। আর তোমরাও আমার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিতেছ না।

লম্বোদর বলিলেন,—'হাঁ, কার্তিকের মত তোমার রূপ বটে!'

ডমরুধর বলিলেন,—'ঠাট্টা কর, আর যাই কর। গণৎকার যাহা বলিয়াছে, তাহা ঠিক। নন্দীর কোপে পড়িয়া কয়মাস যে আমি ঘোরতর কষ্ট পাইয়াছিলাম, তাহা তো আর মিথ্যা নহে?' —লম্বোদর বলিলেন,—'আবার বুঝি একটা আজগুবি গল্প হইবে?'

ডমরুধর রাগিয়া বলিলেন,—'তোমার যদি শুনতে ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে কানে আঙ্গুল দিয়া থাক।'

তাহার পর পাঁচজনের অনুরোধে ডমরুধর এইরূপে গল্পটি বলিতে লাগিলেন,—

গত বৎসর নবমী পূজার দিন। রাত্রি শেষ হইয়াছে। বাহির বাড়ীতে কিরূপ একটা খুটখাট শব্দ হইতে লাগিল। দু'পয়সা আমার সঙ্গতি আছে। কাজেই আমাকে সর্বদা সতর্ক ও শঙ্কিত থাকিতে হয়। আমি ধীরে ধীরে বাহিবে আসিয়া দেখি যে দালানের প্রতিমার সম্মুখে একটা বিকটাকার মর্দ পূজার দ্রব্যাদি লইয়া গাঁঠরি বাঁধিতেছে। পূজার সমুদয় উপকরণ যাহা তখন দালানে ছিল, মায় বেশ্যাবাড়ীর মৃত্রিকাটুকু পর্যন্ত, সমস্ত দ্রব্য সে বাঁধিয়া লইতেছে। তাহার নিকটে একটা ত্রিশূল পড়িয়া ছিল। বুঁচকি বাঁধিয়া ত্রিশূলের আগায় আটকাইয়া সে কাঁধে তুলিবার উপক্রম করিল।

রাগে আমার সর্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। পূর্বেই বলিয়াছি যে, অবতার হইলে দেবতাদের আত্মবিস্মৃতি হয়। আমি যে ভগবতীর পুত্র কার্ত্তিক, রাগের ধমকে সে কথা একেবারে ভুলিয়া যাইলাম। সেই লোকটাকে গালি দিয়া আমি বলিলাম,—'বদমায়েস চোর! পূজার দ্রব্য চুরি করিতেছিস।'

সে লোকটা একবার আমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। পোঁটলার একদিক ধরিয়া আমি টানিতে লাগিলাম। ঈষৎ হাসিয়া পোঁটলার অপর দিক ধরিয়া সে টানিতে লাগিল। আমি তাহাকে বলিলাম,—'পোঁটলা ছাড়িয়া দে।' সে উত্তর করিল,—'দিয়া নিলে কি হয়

তা জান? কালীঘাটের কুকুর হয়।' আমি বলিলাম,—'কবে তোকে এসব জিনিস আমি দিয়াছি?' —দুইজনে বিষম টানাটানি চলিতে লাগিল। কিন্তু তাহার বল অধিক, তাহার সহিত আমি পারিলাম না। অবশেষে হতাশ হইয়া তাহার হাতে এক কামড় মারিলাম।

সে লোকটি বলিল,—'ছি তোমার এখনও দুষ্টুমি যায় নাই। দেবতারা পৃথিবীতে আসিয়া পুনরায় ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করেন না। ইন্দ্র শূকর হইয়া ছানা-পোনা লইয়া সুখে কালযাপন করিতেছিলেন। অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া পুনরায় তাঁহাকে স্বর্গে লইয়া যাইতে হইয়াছিল। রামচন্দ্রকে অনেক কৌশল করিয়া বৈকুণ্ঠে লইয়া যাইতে হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের পুত্র-পৌত্রদিগের পদভরে মেদিনী টলটলায়মান হইয়াছিল আমার বাবাঠাকুরও অতিকষ্টে কোঁচিনীদিগের ক্ষেত্রে জলসেচন করিয়াছিলেন। সেজন্য কোঁচিনী ছুঁড়িয়া টিটকারি দিয়া বলিয়াছিল,—

দুই শরা জল ছেঁচিয়া কোমরে দিলে হাত।
এমনি করিয়া খাবে তুমি কোঁচিনী পাড়ার ভাত?'

কৈলাসে মা আমার কাঁদিয়া কাটিয়া কুরুক্ষেত্র করিয়াছিলেন। অনেক কষ্টে বাবাকে আমরা পুনরায় স্বস্থানে লইয়া গিয়াছিলাম। দাদাঠাকুর, তোমাকেও একটু কষ্ট দিতে হইবে তবে তোমার বিবাহের সাধ মিটিবে। সেজন্য আমি তোমাকে অভিশাপ দিতেছি,—ছয় মাস কাল তুমি সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হইয়া থাকিবে। ছয় মাস কাল তুমি নানা বিপদে পতিত হইবে। তুমি যে ফোকলা মুখে আমার হাতে কামড় মারিলে, সেইরূপ আর একজনের হাতে কামড় মারিয়া তোমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ – টাকে ঠোকর

এই মুহূর্ত হইতে আমি সম্পূর্ণভাবে আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িলাম। যে বুদ্ধির দ্বারা অসুরদিগকে জয় করিয়া দেবগণকে নির্ভর করিয়াছিলাম, সেই দেব-বুদ্ধি আমার লোপ হইয়া গেল। আমি ঠিক মনুষ্যের মত নিমেষপূর্ণ নয়নে চারিদিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম। যাহা দেখিলাম তাহা দেখিয়া আমি হতভম্ব হইয়া পড়িলাম।

লম্বোদর প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কি দেখিলে?'

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—'বলিব কি ভাই আর আশ্চর্য কথা! আমি দেখিলাম যে স্বয়ং মহাদেব গণেশের হাত ধরিয়া প্রতিমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার স্কন্ধে কিন্তু কার্তিক নাই। কি করিয়া শিব কার্তিককে লইবেন? ডমরুরূপে এইমাত্র কার্তিক নন্দীর সহিত পোঁটলা কাড়াকাড়ি করিতেছিলেন। পশ্চাতে দেবী ছলছল নয়নে দণ্ডায়মানা আছেন। উঠানে সজ্জিত দোলা রহিয়াছে। উড়ে ভূতগণ দোলার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিতেছে—নন্দী কোঁঠী, গলা, দের হউচি ঠিকে জলদি কর। ইত্যাদি।

দেবী মহাদেবের কানে চুপি চুপি কি বলিলেন। কি বলিলেন, তখন আমি বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু বোধ হয় পৃথিবীতে আমাকে আরও অনেক দিন রাখিয়া শিক্ষা দিতে তাঁহারা

পরামর্শ করিলেন। দুরন্ত বালককে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাতা-পিতাকে কঠিন হইতে হয়।

আমি এখন সকল কথা বুঝিলাম, গত বৎসর নবমী পূজার দিন ৫৮ দণ্ড নবমী ছিল। দুই দণ্ড রাত্রি থাকিতে দশমী পড়িয়াছিল; সেই শুভক্ষণে মা কৈলাস পর্বতে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। গত বৎসর মা দোলায় গমন করিয়াছিলেন। সেজন্য মহামারী হইয়াছিল। উঠানে দোলা রাখিয়া উড়ে বেহারা ভূতগণ সেই জন্য কিচির-মিচির করিতেছিল।

প্রথম আমি নন্দীদাদার পায়ে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। তখন অবশ্য নন্দীদাদা বলিল তাঁহাকে সম্বোধন করি নাই। তিনি বলিলেন,—'একথাবা থুতু তুমি আমার হাতে দিয়াছ, তোমার সহিত কথা কহিতে ইচ্ছা হয় না।'

তাহার পর শিবের পায়ে পড়িয়া আমি স্তব করিতে লাগিলাম। সন্তুষ্ট হইয়া শিব বলিলেন,—'নন্দীর শাপ আমি মোচন করিতে পারি না। অন্য বর প্রার্থনা কর।'

কি বর প্রার্থনা করিব, তখন আমি খুঁজিয়া পাইলাম না। আমি বলিলাম,—'ভগবান। যদি বর দিবেন, তাহা হইলে আপনার একটি ভূত আমাকে প্রদান করুন।'

হাসিয়া শিব বলিলেন,—'ছোটখাটো ভাল মানুষ একটি ভূত আমি তোমার নিকট পাঠাইয়া দিব। কিন্তু তাহাকে তুমি অধিক দিন রাখিতে পারবে না।'

তাহার পর দেবীর পাদপদ্মে পড়িয়া আমি স্তবস্তুতি করিতে লাগিলাম। সন্তুষ্ট হইয়া দেবী বলিলেন,—'ডমরুধর! তুমি আমার পরম ভক্ত। সেজন্য সশরীরে তোমার পূজা গ্রহণ করিতে আমরা আসিয়াছিলাম। এ বঙ্গদেশে সহস্র সহস্র লোক আমার পূজা করে। কিন্তু তাহাদের অনেকে মুর্গি ভক্ষণ করে। সেজন্য তাহাদের পূজা আমি গ্রহণ করি না। তোমার মাথার মাঝখানে যদি টাক না থাকিত, তাহা হইলে তুমি টিকি রাখিতে। দেখ, আগামী বৎসরে তুমি অতি সংক্ষেপে আমার পূজা করিবে। এত দ্রব্যাদি দিলে নন্দী বহিয়া লইয়া যাইতে পারে না। এক্ষণে বর প্রার্থনা কর।'

পুনরায় আমি ফাঁপরে পড়িলাম। কি চাহিঁব, তাহা খুঁজিয়া ঠিক করিতে পারিলাম না। অবশেষে আমি বলিলাম,—'মা! সুন্দরবনে আমার আবাদে মৃগনাভি হরিণের চাষ করিবার নিমিত্ত স্বদেশী কোম্পানী খুলিব মনে করিতেছি। ভেড়ার পালের ন্যায় বাঙ্গালার লোক যেন টাকা প্রদান করে, আমি এই বর প্রার্থনা করি।

দেবী বলিলেন,—'কৈলাস পর্বতের নিকট তুষারাবৃত হিমাচলে কুস্তুরী হরিণ বাস করে। সুন্দরবনে সে হরিণ জীবিত থাকিবে কেন?'

আমি বলিলাম,—'যে আজ সম্ভব, যে কাজে লাভ হইতে পারে, সে কাজে বাঙ্গালী বড় হস্তক্ষেপ করে না। উদ্ভট বিষয়েই বাঙ্গালী টাকা প্রদান করে।'

দেবীর সহিত এইরূপ কথাবার্তা হইতেছে, এমন সময় নন্দী তাহার দক্ষিণ হস্তের আঙ্গুলের উল্টা পিঠের গাঁট দিয়া আমার মাথায় টাকের উপর তিনটি ঠোকর মারিল। সেই ঠোকরের আঘাতে আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম।

ডমরুধরের দালানে চতুর্ভুজ নামক এক ব্রাহ্মণ যুবক বসিয়া গল্প শুনিতেছিলেন। লম্বোদর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—'আচ্ছা চতুর্ভুজ! তুমি তো বি-এ পাস করিয়াছ, অনেক লেখাপড়া শিখিয়াছ। ডমরুধর শিব ও দুর্গার স্তবের কথা বলিলেন, তুমি একটা স্তোত্র বল দেখি, শুনি।'

চতুর্ভুজ তৎক্ষণাৎ বলিলেন,—'শিব-দুর্গার স্তোত্র এই, ওঁ অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা। ওঁ প্রাণায় স্বাহা। ওঁ অপানায় স্বাহা। ওঁ অপনায় স্বাহা।

পুরোহিত হাসিয়া বলিলেন,—'ওঁ স্তোত্র নহে।'

তাহার পর তিনি অস্পষ্টস্বরে বলিতে লাগিলেন,—'প্রভুমীশরনীশমশেষগুণং, গুণহীনমহীশ-গরাভরণম্ রণনির্জ্জিতদুর্জ্জয়দৈত্যপুরং, প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম্।।' ইত্যাদি। পুনরায়—

'নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে, নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে। নমস্তে জগদ্বন্দ্যপদারবিন্দে, নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে।।' ইত্যাদি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ – ঘরে গৌতম বাহিরে গৌতম

ডমরুধর বলিতে লাগিলেন,—'কিছুক্ষণ পরে আমার চৈতন্য হইল। আমি উঠিয়া বসিলাম। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম যে, মহাদেব নাই, দুর্গা নাই, নন্দী নাই, দোলা নাই, সে স্থানে কেহই নাই। কিন্তু আশ্চর্য! আছে কেবল আর একটি 'আমি'। সেই টাক, সেই পাকা চুল, সেই কৃষ্ণবর্ণ, সেই নাক, সেই মুখ, ফলকথা—হুবহু সেই আমি। প্রতিমার একপার্শ্বে একটি আমি বসিয়া আছি। কোন আমিটি প্রকৃত আমি, তাহা আমি ঠিক করিতে পারিলাম না। একদিকের আমি অন্য দিকের আমিকে জিজ্ঞাসা করিল,—'মহাশয়ের নাম কি?' সে উত্তর করিল,—'ডমরুধর।' পুনরায় অপর আমি এদিকের আমিকে সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। সেও এইরূপ উত্তর করিল, ফলকথা, এ আমিও যা করে ও যা বলে, ও আমিও তাই করে ও তাই বলে।

তখন আমার সকল কথা হৃদয়ঙ্গম হইল। সেবার সন্ন্যাসী-সঙ্কটে আমার লিঙ্গশরীর বাহির হইয়া যমালয়ে গিয়াছিল। শুনিয়াছি যে, আমাদের শরীর অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ প্রভৃতি কয়েকটি কোষ দ্বারা গঠিত। একবার লিঙ্গশরীর বাহির হইয়াছিল বলিয়া কোষগুলির বাঁধন কিছু আলগা হইয়া গিয়াছিল। সেজন্য দুই একটি কোষ বাহির হইয়া আর একটি ডমরুধরের সৃষ্টি হইয়াছে। এখন উপায় কি? লোকে একটা আমির ভাত-কাপড় যোগাইতে পারে না। তা যোগাইবার যেন আমার সঙ্গতি আছে, কিন্তু একটা আমির পেট কামড়াইলে লোক ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে। একসঙ্গে দুইটা আমির পেট যদি কামড়ায়, তখন আমি কি করিব?

একটা আমি অপরটাকে বলিল,—'তুই চলিয়া যা, আমি প্রকৃত ডমরুধর, তুই জাল ডমরুধর।' অপরটাও সেই সেই কথা বলিল। দুই আমিতে ঘোরতর কলহ উপস্থিত হইল। ক্রমে হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইল। এমন সময় প্রভাত হইল। প্রভাত হইবামাত্র আমি

একটা হইয়া যাইলাম। তখন আমার ধড়ে প্রাণ আসিল।

পাছে পুনরায় দুইটা হইয়া যায়, সেই দুশ্চিন্তায় সমস্ত দিন আমি মগ্ন রহিলাম। বিজয়াদশমীর পূজার পর পুরোহিত ঠাকুর যখন আমাকে মন্ত্র পড়াইলেন,—আয়ুর্দ্দেহি যশো দেহি ভাগ্য ভগবতি দেহি মে,—তখন আমার সুবল ঘোষের কথা মনে পড়িল। দুর্গোৎসব করিয়া, ভক্তিতে গদ্গদ হইয়া সুবল নিজেই ঠাকুরের সামনে প্রাণপণ যতনে শঙ্খ বাজাইলেন। শঙ্খ বাজাইতে গিয়া সুবলের গোলগোল বাহির হইয়া পড়িল। সেজন্য দশমীর দিন সুবল অন্য বর প্রার্থনা না করিয়া, হাতযোড় করিয়া ঠাকুরকে বলিলেন,—

'ধন চাই না মা, যশ নাই না মা,
চাই না পুত্তুর বর।
শঙ্খ বাজাতে গিয়া বেরিয়েছে গোলগোল
তাই রক্ষা কর।।'

প্রতিমা বিসর্জন হইয়া গেল। সন্ধ্যার সময় আমি এক সহস্র দুর্গানাম লিখিলাম। পাড়ার ছেলেরা আমাকে নমস্কার করিয়া গেল। আহারাদি করিয়া যথাসময়ে দোতালায় আমার ঘরে গিয়া শয়ন করিলাম। সিদ্ধি খাইয়া শরীর একটু গরম হইয়াছিল। সেজন্য আমার নিদ্রা হইল না। বিছানা হইতে উঠিয়া জানালার ধারে দাঁড়াইলাম। জ্যোৎস্না রাত্রি। বাড়ীর বাহিরে বাগানে আমার জানালার নীচে ও কে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে? সেই আর একটা আমি। হাত নাড়িয়া তাহাকে আমি বলিলাম,—'যা চলিয়া যা!' নীচের আমিও উপরের আমিকে সেই কথা বলিল। উপরের আমি নীচে নামিলাম। খিড়কিদ্বার খুলিয়া আমি বাইরে যাইলাম। ও মা! দেখি না নীচের আমিটা উপরে গিয়া ঠিক আমার ঘরের জানালার ধারে দাঁড়াইয়া আছে। এ আমিটা একবার উপরে, একবার নীচে, ও আমিটা একবার উপরে, একবার নীচে, কতবার যে এইরূপ হইল, তাহা বলিতে পারি না। তৃতীয় পক্ষে এলোকেশীর সহিত আমার কি প্রকারে বিবাহ হইয়াছিল, গত বৎসর সে কথা তোমাদের নিকট বলিয়াছি। আমি এলাকেশীকে জাগাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—'এইমাত্র আমি যখন নীচে গিয়াছিলাম, তখন তোমার ঘরে আর একটা কে আসিয়াছিল।' এলাকেশী বলিল,—'মুখপোড়া, বুড়ো ডেকরা! এখনি ঝাঁটাপেটা করিব।' এলোকেশীর স্বভাবটা উগ্র। তাহাতে তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী।

জানালা বন্ধ করিয়া আমি পুনরায় শয়ন করিলাম। পরদিন রাত্রিতেও সেইরূপ হইল। প্রতি রাত্রিতে সেইরূপ উপরে একটা, নীচে একটা, দুইটা আমির উপদ্রব হইল। আমি ভাবিলাম যে, প্রতি রাত্রিতে আমার 'ঘরে গৌতম বাহিরে গৌতম' হইতে লাগিল, এ ভাল কথা নহে! —চতুর্ভুজ বলিলেন,—'এবার আমাকে ঠকাইতে পারিবে না। আমি জানি—

'অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দাদরী তথা।
পঞ্চকন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম্।।'

পুরোহিত বলিলেন,—'সকল প্রাণীর সৌন্দর্য লইয়া ব্রহ্মা অহল্যাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।,— 'যস্যা ন বিদ্যতে হল্যং তেনাহল্যেতি বিশ্রুতা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ – কার্তিকের কাঁধে বাঘ

ডমরুধর বলিতে লাগিলেন,—দুইটা আমির উপদ্রবে আমি জ্বালানতন হইলাম। দিনকতক সুন্দরবনে আমার আবাদে গিয়া বাস করি, এইরূপ মনন করিয়া আমি সুন্দরবনে আবাদে গমন করিলাম। এই সময় সেই স্থানে এক বাঘের উপদ্রব হইয়াছিল। গরু বাছুর মানুষ খাইয়া সকলকে বড় জ্বালাতন করিয়াছিল। মন্ত্রবলে বাঘের মুখ বন্ধ করিবার নিমিত্ত একদিন বৈকালবেলা আমি এক ফকিরের কাছে গমন করিতেছিলাম। পথে নানা স্থানে শুষ্ক ঘাস ও বৃক্ষপত্র পড়িয়াছিল। একস্থানে শুষ্কপত্রের ভিতর ছিদ্রের ন্যায় কি একটা দেখিতে পাইলাম। নিকটে যাইবামাত্র হুস করিয়া আমি এক গভীর গর্তের ভিতর পড়িয়া যাইলাম। সর্বনাশ! দেখি না, সেই গর্তের ভিতর প্রকাণ্ড এক কেঁদো বাঘ রহিয়াছে। মুহূর্ত মধ্যে সকল কথা আমি বুঝিতে পারিলাম। বাঘ ধরিবার নিমিত্ত ধাঙ্গড় রেওতগণ গভীর গর্ত করিয়া তাহার উপর পাতানাতা চাপা দিয়া রাখিয়াছিল। বাঘ সেই গর্তে পড়িয়া গিয়াছিল। আর উঠিতে পারিতেছিল না। আমিও সেই গর্তে পড়িয়া যাইলাম।

গর্তে পড়িয়া ব্যাঘ্রের বিকট বদন দর্শন করিয়া আমার আত্মাপুরুষ শুকাইয়া গেল। আমি মনে করিলাম যে, ক্ষুধার্ত বাঘ এইবার আমাকে ছিঁড়িয়া খাইবে। প্রাণ ভরিয়া আমি মাকে ডাকিতে লাগিলাম। করাতি কলে ইঁদুর পড়িলে যেরূপ ছট্‌ফট্‌ করে, প্রাণভয়ে গর্তের ভিতর আমি সেইরূপ ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলাম। বলিব কি ভাই, আমার উপর মা দুর্গার কৃপা! এক আশ্চর্য উপায়ে তিনি আমাকে রক্ষা করিলেন। আমি যেরূপ ফাঁদে পড়িয়াছিলাম, ব্যাঘ্রও সেইরূপ ফাঁদে পডিয়াছিল। ফাঁদে পড়িয়া আমার যেরূপ ভয় হইয়াছিল, তাহারও সেইরূপ ভয় হইয়াছিল। আমাকে ভক্ষণ না করিয়া, এক লম্ফ দিয়া সে আমার কাঁধের উপর উঠিল। আমার কাঁধে চড়িয়া যখন সে কতকটা উচ্চ হইল, তখন আর এক্লাফে সে গর্তের উপর উঠিল। তাহার পর বনে পলায়ন করিল।

সন্ধ্যার পর ধাঙ্গড়েরা আসিয়া গর্তের ভিতর হইতে আমাকে উঠাইল। তাহাদের সঙ্গে আমি বাসায় গমন করিলাম। আমি তখনও বাহিরে, কিন্তু দূর হইতে দেখিলাম যে, আর একটা 'আমি' বাসার ভিতর গেঁট হইয়া বসিয়া আছি। আবার বাহিরে একটা আমি, ভিতরে একটা আমি। আবার 'ঘরে গৌতম বাহিরে গৌতম।'

বনবাসী হইয়াও আমি সে উৎপাৎ হইতে নিষ্কৃতি করিতে পারিলাম না। তবে আর এ স্থানে থাকিয়া কি হইবে? তাহা ছাড়া আর একটা 'আমি' সহসা যদি এই বনে আসিতে পারে, তাহা হইলে সে আমার গৃহেও থাকিতে পারে। সে স্থানে সে 'আমিটা' কি করিতেছি না করিতেছি, তাহার ঠিক কি? সেজন্য বাড়ী ফিরিয়া যাইতে আমি মানস করিলাম।

'সুন্দরবন হইতে আমাদের বাড়ী আসিতে হইলে অনেক দূর নৌকায় আসিতে হয়, তাহার পর সাল্‌তি লাগে, সে স্থান হইতে আমাদের গ্রাম পাঁচ ক্রোশ। সন্ধ্যার সময় সেই স্থানে আসিয়া আমার সাল্‌তি লাগিল। বাকী পাঁচ ক্রোশ পথ আমি হাঁটিয়া চলিলাম। ভেড়িতে একজনেরা মাছ ধরিতেছিল। তাঁহাদের নিকট হইতে একটি ভেটকি মাছ চাহিয়া

লইলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ – ছোটখাটো ভালমানুষ ভূত

ভেটকি মাছটা হাতে লইয়া আমি পথ চলিতে লাগিলাম। সকলেই জানে যে, মাছ দেখিলে ভূতের লোভ হয়। দুই ক্রোশ পথ গিয়াছি, রাত্রি প্রায় একপ্রহর হইয়াছে। এমন সময় একটি ভূত আমার সঙ্গ লইল। 'দেঁনা, দেঁনা,' 'মাছ দেঁনা' বলিয়া আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিল। বলা বাহুল্য যে, আমার বিলক্ষণ ভয় হইল। কিন্তু ভূতকে মাছ দিলে আর রক্ষা নাই। তৎক্ষণাৎ সে মানুষের প্রাণবধ করে। সেজন্য তাহার কথা আমি শুনিলাম না, তাহাকে আমি মাছ দিলাম না। কিছুদূর গিয়াছি, এমন সময় আর একটা ভূত আসিয়া জুটিল। একটা আমার ডানদিকে, আর একটা আমার বামদিকে, আমার দুইপাশে দুইটা ভূত, হাত পাতিয়া 'দেঁনা, দেঁনা' বলিতে বলিতে আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কিন্তু কিছুতেই তাহাদিগকে আমি মাছ দিলাম না। অবশেষে তাহারা আর লোভ সামলাইতে পারিল না। মাছের মাথার দিক্ কান্‌কোতে হাত দিয়া আমি ধরিয়াছিলাম, মাছের অপর দিক্ তাহারা খপ্ করিয়া ধরিয়া ফেলিল। অপর দিক্ ধরিয়া তাহারা মাছটি আমার হাত হইতে কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করিল। আমি মাছের কান্‌কো ধরিয়া, তাহারা মাছের লেজার দিক্ ধরিয়া; সেই মাঠের মাঝখানে ঘোরতর টানাটানি হইতে লাগিল। কিন্তু আমি একা, ভূত হইল দুইজন। দুইজনের সঙ্গে আমি কতক্ষণ টানাটানি করিতে পারি? ক্রমে আমি শ্রান্ত হইয়া পড়িলাম। তখন নিরূপায় হইয়া একটা ভূতের হাতে আমি কামড় মারিলাম। বলিব কি হে, ভূতের হাতের কথা। ঠিক যেন কাঠের উপর কামড় মারিলাম। তাহার পর দুর্গন্ধ। সেইরূপ দুর্গন্ধ মানুষের নাকে কখনও প্রবেশ করে নাই।

আমার দাঁত নাই সত্য, কিন্তু সেই ফোকলা মুখের এক কামড়েই ভূত দুইটি পলায়ন করিল। তখন আমার মুখে দুর্গন্ধ! দুর্গন্ধে আমি ক্রমাগত উদ্গার করিতে লাগিলাম। সেইখানে বসিয়া ন্যাকার ন্যাকার ন্যাকার! মনে হইল পেটের নাড়িভুঁড়ি বুঝি বাহির হইয়া গেল। নিশ্চয় বুঝিলাম যে, এইবার আমার আসন্নকাল উপস্থিত হইয়াছে। আমি সেই স্থানে চক্ষু বুজিয়া শুইয়া পড়িলাম ও নন্দীর অভিশাপের কথা ভাবিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে কে যেন আমার মাথায় ও মুখে জল দিতেছে এইরূপ বোধ হইল। তাহাতে শরীর কিঞ্চিৎ সুস্থ হইল। চক্ষু চাহিয়া দেখিলাম,—কি আশ্চর্য্য, এ আবার কি? দেখিলাম যে, ছোটখাটো একটি নূতন ভূত আসিয়া সেবাশুশ্রূষা করিতেছে। আমি উঠিয়া বসিলাম। তৎক্ষণাৎ ভূতটি কিছুদূরে পলায়ন করিল। আমার মাছটি সে চুরি করে নাই। মাছটি সেই স্থানে পড়িয়া ছিল। মাছটি লইয়া ধীরে ধীরে আমি আমাদের গ্রাম অভিমুখে আসিতে লাগিলাম।

নূতন ভূতটি দূরে দূরে আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিল। সে আমার নিকট হইতে মাছ চাহিল না। কোন কথাই বলিল না। দেখিলাম, সে অতি ভালমানুষ ভূত। আর দেখিলাম যে, অতি ভীত স্বভাবের ভূত। একবার আমি ডাকিলাম, আর অমনি সে ভয়ে দূরে পলায়ন করিল। একবার আমি হাঁচিলাম, আর অমনি সে পলায়ন করিল। একবার

একখানি গ্রামে কুকুর ডাকিয়া উঠিল, অমনি সে গ্রাম হইতে অনেক দূরে গিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সে একেবারে আমাকে ছাড়িয়া গেল না। ভয় পাইয়া একবার পলায়ন করে, তাহার পর পুনরায় আসিয়া উপস্থিত হয়। এরূপ ভীরু স্বভাবের ভূত কখনও দেখি নাই। তখন আমি বুঝিলাম, মহাদেব যে আমাকে একটি ছোটখাটো ভালমানুষ ভূত দিবেন বলিয়াছিলেন, এটি সেই ভূত।

অবশেষে আমি তাহাকে বলিলাম,—'দেখ ভালমানুষ ভূত! তুমি আমার উপকার করিয়াছ, তুমি আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছ। আমার সহিত তুমি চল, দুইখানা ভাজামাছ তোমাকে আমি প্রদান করিব।

ঘরে গিয়া এলোকেশীকে আমি মাছটি দিলাম। রান্নাঘরে এলোকেশী মাছ ভাজিতে লাগিল। কতকগুলি মাছ যেই ভাজা হইয়াছে, আর রান্নাঘরের ঘুলঘুলি দিয়া ভূতটি হাত বাড়াইল। তাহার হাতে চারিখানি মাছ দিলাম, আর তাহাকে আমি বলিলাম,—'পুনরায় কাল এস, তোমাকে ভালমাছ দিব।'

পরদিন বৈকালবেলা খুদিরাম মণ্ডলের পুষ্করিণীতে চুপি চুপি হাতসূতা ফেলিয়া একটি রুইমাছ ধরিলাম! সন্ধ্যার সময় মাছটি আনিয়া এলোকেশীকে দিলাম। বলা বাহুল্য যে, আমি নিজের পুকুরের মাছ খরচ করি না, তাহা আমি বিক্রয় করি। সন্ধ্যার পর এলোকেশী যখন মাছ ভাজিতেছিল, তখন আমি রান্নাঘরে গমন করিলাম। আমার সাড়া পাইয়া ভূতটি ঘুলঘুলি দিয়া হাত বাড়াইল। তাহার হাতে আমি মাছ দিলাম। এইরূপে প্রতিদিন খুদিরামের পুকুর হইতে গোপনে মাছ ধরিয়া ভূতটিকে আমি খাইতে দিতে লাগিলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ – এলোকেশীর রূপমাধুরী

একদিন এলোকেশী সহসা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,—'মাছ ভাজিবার সময়, প্রতিদিন তুমি রান্নাঘরে এস কেন? দিনের বেলা না আনিয়া প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় পুকুর হইতে তুমি মাছ লইয়া এস কেন? ঘুলঘুলির নিকট গিয়া কাহার সহিত তুমি চুপি চুপি কথাবার্তা কর? দুর্লভীকে মাছ দাও বুঝি?'

দুর্লভী বাগ্দিনীকে তোমরা সকলেই জান। হাসিতে হাসিতে একদিন দুই একটা তামাসা করিয়াছিলাম। আমি এমন কার্তিক পুরুষ! সেজন্য আমার স্ত্রীর মনে সর্বদা সন্দেহ।

আমি বলিলাম,—'এলোকেশী! ও দুর্লভী নয়। আবাদ হইতে এবার আমি একটি ভূত আনিয়াছি। আমি মনে করিয়াছি যে, ভূতটি ভালরূপে পোষ মানিলে উহাকে কলিকাতায় লইয়া যাইব। যাহারা ঘোড়ার নাচ করে, তাহাদিগের নিকট ভূতটিকে বিক্রয় করিব। অনেক টাকা পাইব। কিন্তু এ ভূতটি ভীরু ভূত। তুমি ঘুলঘুলির নিকট যাইও না। তোমার চেহারা দেখিলে সে ভয়ে পলাইবে।' গত বৎসর সন্ন্যাসী-সঙ্কটের গল্প বলিবার সময় আমি এলোকেশীর রূপের পরিচয় দিয়াছিলাম। আমার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে তাই, তা না হ'লে এলোকেশীকে দেখিলে ভীমসেনও বোধ হয় আতঙ্কে পলায়ন করেন।

এলোকেশীর মুখ হাঁড়ি হইল। মাছ ভাজিতে লাগিল, আর গজর গজর করিয়া বলিতে লাগিল,—'আমার রূপ দেখিলে ভূত ভয়ে পলাইবে! আমার রূপ দেখিলে ভূত পলাইবে! বটে!'

পরদিন সন্ধ্যার সময় নবাই ঘোষের পুষ্করিণী হইতে বড় একটা মিরগেল মাছ ধরিয়া আমি এলোকেশীকে দিলাম। এলোকেশী সেই মাছ যখন ভাজিতেছিল, সেই সময় যথারীতি আমি রান্নাঘরে গমন করিলাম। ভূতটি যথারীতি ঘুলঘুলি পথে হাত বাড়াইল। মাছ লইয়া যেমন তাহাকে আমি দিতেছি, এমন সময় আমার পশ্চাতে গিয়া এলোকেশী বলিয়া উঠিল,—দুর্লভি! হারামজাদি! তোর আস্পর্ধা তো কম নয়!'

ভূতটি একবার মাত্র এলোকেশীর মুখপানে চাহিয়া দেখিল। এলোকেশীর সেই অদ্ভুত মুখশ্রী দেখিয়া আতঙ্কে রুদ্ধশ্বাসে সে স্থান হইতে সে পলায়ন করিল।

'করিলে কি! করিলে কি!' এই কথা বলিতে বলিতে তৎক্ষণাৎ আমি ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম, তৎক্ষণাৎ বাটীর ভিতর হইতে বাহির হইলাম, তৎক্ষণাৎ বাগানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। মনে করিলাম, বুঝাইয়া-সুঝাইয়া ভূতটিকে ফিরাইয়া আনিব। বাগানে গিয়া দেখিলাম যে, ভূতটি অতি দ্রুতবেগে আমার বাগানের ঈষাণ কোণের দিকে দৌড়িয়া যাইতেছে। সেই স্থানে খেজুর গাছের ন্যায় অপূর্ব গাছ ছিল। সে গাছটিতে আমি রস কাটিতে দিতাম না, সে গাছটিকে স্বতন্ত্র ভাবে আমি ঘিরিয়া রাখিতাম। প্রাণভরে ভূতটি সেই গাছটির উপর উঠিল। আর আমি ভাবিলাম,—যাঃ! এইবার ভূতটির প্রাণ বিনষ্ট হইল। আমার সখের ভূত এইবার মারা গেল। মহাদেব হয় তো আমার উপর রাগ করিবেন।

বিস্ময়ে পুরোহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—'ভূতের প্রাণ বিনষ্ট হইবে? খেজুর গাছে উঠিয়া ভূত মারা পড়িবে! ভূত মারা পড়িবে। ভূত কি কখন মারা যায়?'

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—'পুরোহিতমহাশয় আপনি সাদাসিদে লোক, আপনি এ সব কথা বুঝিতে পারিবেন না। এ সামান্য খেজুর গাছ নহে। একবার একজন ধাঙ্গড়ের সঙ্গে আমি সুন্দরবনের ভিতর বেড়াইতে ছিলাম। এ স্থানে এক গাছের নিম্নে স্তূপীকৃত হাড় পড়িয়াছিল। প্রথম মনে করিলাম—মানুষের অস্থি, ব্যাঘ্রগণ বোধ হয় মানুষ ধরিয়া এই স্থানে আনিয়া ভক্ষণ করে। কিন্তু তাহার পর আরও নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, সে সব বানরের হাড়। গাছটি দেখিলাম যে, হেঁতালও নহে, খেজুরও নহে, খেজুরের ন্যায় এক প্রকার বৃক্ষ। কিন্তু খেজুর গাছের পাতাগুলি যেমন উচ্চ হইয়া থাকে, ইহার পাতা সেরূপ ছিল না, ইহার যাবতীয় কাঁচা পাতা নিম্নমুখ হইয়া গাছের গায়ে লাগিয়াছিল। সেই ফল পাড়িতে ধাঙ্গড়কে আমি গাছের উপর উঠিতে বলিলাম। ধাঙ্গড় গাছে উঠিল; পাতার ভিতর দিয়া যেই গাছের মাথার নিকট উঠিয়াছে, আর পাতাগুলি তৎক্ষণাৎ সোজা হইয়া তাহাকে ঢাকিয়া ফেলিল। সেই সময় ধাঙ্গড়ও প্রাণ গেল প্রাণ গেল বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। তাহার পর ধাঙ্গড়ের চর্মাবৃত ভগ্ন হাড়গুলি নীচে পড়িতে লাগিল। তাহার

পাতাগুলি পুনরায় নিম্ন হইয়া গাছের গায়ে আসিয়া লাগিল। এই ভয়ানক ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম, তাহার পর নিকটে গিয়া দেখিলাম যে, এই ভয়াবহ বৃক্ষ ধাঙ্গড়ের রক্ত-মাংস মায় হাড়ের রস পর্যন্ত চুষিয়া খাইয়াছে।'

চতুর্ভুজ বলিলেন,—'পুস্তকে পড়িয়াছি যে, কয়েক প্রকার উদ্ভিদ আছে, তাহারা পোকা-মাকড় ধরিয়া ভক্ষণ করে। কিন্তু জীব-জন্তু ধরিয়া খায়, বানর ধরিয়া খায়, মানুষ ধরিয়া খায়, এরূপ বৃক্ষের কথা কখন শুনি নাই।

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—'আমি তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তলায় অনেকগুলি সে গাছের বীজ পড়িয়াছিল। আমি গুটিকতক বীজ আনিয়া আমার বাগানের এককোণে পুঁতিয়াছিলাম। তাহা হইতে একটি গাছ হইয়াছিল। সে গাছ আমি সর্বদা ঘিরিয়া রাখিলাম, তাহাকেও তাহার নিকটে যাইতে দিতাম না। ভূত যখন সেই গাছের উপর গিয়া উঠিল, তখন আমি তার প্রাণের আশা ছাড়িয়া দিলাম।'

ক্রমে যাহা ভয় করিয়াছিলাম, তাহাই ঘটিল। যেই ভূত গাছের মাথার নিকট গিয়া উঠিল, আর সেই পাতাগুলি সোজা উচ্চ হইয়া দাঁড়াইল, ভূতের সর্ব শরীর ঢাকিয়া ফেলিল, ভূতের কৃষ্ণবর্ণ রক্ত গাছের গা দিয়া দরদর ধারায় বহিয়া পড়িল। অবশেষে ভূতের খোসানি নিম্নে পতিত হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ – মা তুমি কে

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—'ভূতের খোলা! সে কিরূপ?'

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—'ভূতের অস্থি-মাংস-রক্ত সমুদয় এই ভয়ঙ্কর গাছ চুষিয়া খাইয়াছিল। ছারপোকার খোসা দেখিয়াছ? মটর-মুসুরির খোসা দেখিয়াছ? ভূতের খোসাও সেইরূপ। তবে অনেক বড়। যাহা হউক, পরদিন এই দুরন্ত গাছটিকে আমি কাটিয়া ফেলিলাম, তা না হইলে তোমাদিগকে আমি দেখাইতে পারিতাম।

সে রাত্রে এলোকেশীর সহিত আমার তুমুল ঝগড়া হইল। আমি বলিলাম যে,—'দুর্লভী দুর্লভী করিয়া তুমি পাগল হইয়াছ। এমন সুন্দর ভূতটিকে তুমি তাড়াইলে, ভূতঘ্ন পাপে তুমি কলুষিত হইলে, আমার টাকা তুমি লোকসান করিলেন।'

এইরূপ ঝগড়া হইতেছে, এমন সময় একবার জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইলাম, দেখিলাম যে, দ্বিতীয় আমি যথারীতি বাগানে দাঁড়াইয়া আছি, তাহাকে দেখাইয়া আমি এলোকেশীকে গঞ্জনা দিবার নিমিত্ত বলিলাম,—'তুমি দুর্লভী দুর্লভী বল, দেখ দেখি ঐ নীচেতে কে? তোমারও যে—ঘরে গৌতম বাহিরে গৌতম।'

এই কথা বলিবামাত্র এলোকেশীর সর্ব শরীর রাগে জ্বলিয়া উঠিল। নিকটে এক মুড়া ঝাড়ু পড়িয়াছিল। তাহা লইয়া এলোকেশী আমাকে সবলে প্রহার করিতে লাগিল। আমার সর্বশরীরে যেন বিষের জ্বালা ধরিল। গায়ে খেঙ্গরা কাটি ফুটিয়া যাইতে লাগিল।' 'আর নয়, আর নয়' বলিয়া আমি যত চীৎকার করি, এলোকেশী ততই আমাকে প্রহার করে। মাথার টাক হইতে পায়ের নখ পর্যন্ত প্রহারের চোটে ক্ষতবিক্ষত হইল। কিন্তু এই দুঃখের

সময় এক সুখের বিষয় হইল। জানালা দিয়া একবার নীচের দিকে চাহিয়া দেখিলাম যে, সেই বাগানের আমিও ঝাঁটার আঘাতে ব্যথিত হইয়া গায়ে হাত বুলাইতেছি। তাহার পর দেখি না যে, দুই আমি একসঙ্গে ঘরের ভিতর রহিয়াছি। তাহার পর দেখি না যে, একটি আমি আরব্য উপন্যাসের দৈত্যের ন্যায় ধোঁয়ার মত হইয়া গেল। তাহার পর সেই ধূমটি সোঁৎ করিয়া আমার নাকের ভিতর প্রবেশ করিল। এতদিন আমি দুইখানা হইয়াছিলাম। আজ এলোকেশীর ঝাঁটার আঘাতে পুনরায় আমি একখানা হইলাম।

এলোকেশীর এই অমানুষিক কাজ দেখিয়া আমি ঘোরতর বিস্মিত হইলাম। প্রহারের জ্বালা আমি ভুলিয়া যাইলাম। গলায় কাপড় দিয়া যোড়হাতে এলোকেশীর পায়ে পড়িয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'মা, তুমি কে বল?'

অষ্টম পরিচ্ছেদ – অজা-যুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে বাহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া

আমার এইরূপ বিনয়বাক্যে এলোকেশী কিছুমাত্র সন্তুষ্ট হইল না। দ্বিগুণভাবে পুনরায় প্রহার আরম্ভ করিল। এই প্রহারে আর একটি আমার উপকার হইল। নন্দীর অভিশাপ মোচন হইয়া গেল। আমার আত্মবিস্মৃতি কিয়ৎপরিমাণে ঘুচিয়া গেল। আমি কে, তখন বুঝিতে পারিলাম। যোড়হাতে তখন আমি মা দুর্গাকে ডাকিতে লাগিলাম।—'মা? আমি অপরাধ করিয়াছি। বিবাহের সাধ আমার মিটিয়া গিয়াছে। আর ঝাঁটা-পেটা সইতে পারি না। আমাকে কৈলাস পর্বতে লইয়া চল। সেস্থানে চিরকাল আমি আইবুড়ো হইয়া থাকিব। চামুণ্ডা রূপিণী এলোকেশীর সহিত আর আমি সংসারধর্ম করিতে চাই না।'

মা কোন উত্তর দিলেন না। আমি শুনিয়াছিলাম যে, শৈশবকালে কৃত্তিকা প্রভৃতি ছয়টি নক্ষত্র আমাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। এখন আমি তাঁহাদিগকে ডাকিতে লাগিলাম। আমি বলিলাম,—'জননীগণ! যখন নিঃসহায় অবস্থায় শরবনে আমি পড়িয়াছিলাম, তখন তোমরা আমাকে রক্ষা করিয়াছিলে। ছয় জনের স্তন্যপান করিবার নিমিত্ত ছয়টি মুখ আমি বাহির করিয়াছিলাম। দুর্দান্ত এলোকেশীর খেঙরার প্রহার আর আমি সহ্য করিতে পারি না। আমার শরীর জরজর হইয়া গেল। তোমরা আমাকে রক্ষা কর।'

আশ্চর্যের কথা বলিব কি ভাই, তৎক্ষণাৎ আকাশবাণী হইল,—'পৃথিবীতে তোমার আরও একশত বৎসর পরমায়ু আছে। বৎস! সুখে এই স্থানে এখন থাক। আরও একশত বৎসর এলোকেশীকে লইয়া ঘরকন্যা কর। তাহার পর কৈলাসে গমন করিও।'

এলাকেশী এই সময় ক্লান্ত হইয়া পড়িল। আর তাহার হাত চলিল না। সেজন্য সে যাত্রা আমার প্রাণ বাঁচিয়া গেল। দেখ লম্বোদর ভায়া! মা দুর্গা বলিয়াছিলেন, তাহা তোমার মনে আছে তো? অতি সংক্ষেপে তিনি আমাকে পূজা করিতে বলিয়াছেন। এ বৎসর পূজার কোন উপকরণ আমি ক্রয় করিব না। গণেশের ইন্দুরের কাপড়টুকু পর্যন্ত দিব না। সমুদয় গঙ্গাজল দিয়া সারিব। মায়ের আজ্ঞা! তাহা ব্যতীত আমাদের এই ঘোষেদের কাটিগঙ্গার জল অতি পবিত্র। তাহা অপেক্ষা বহুমূল্য পদার্থ পৃথিবীতে আর কি আছে?

পুরোহিত বলিলেন,—'তোমার পূজা তাহা হইলে এ বৎসর ঋষিশ্রাদ্ধের ন্যায় হইবে।'

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—'ঋষিশ্রাদ্ধ কিরূপ?'

পুরোহিত উত্তর করিলেন,—'অজাযুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে প্রভাতে মেঘডম্বরে। দপত্যোঃ কলহে চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া।' দুইটা ছাগলে বিবাদ হইলে যখন তারা আরক্ত নয়নে শৃঙ্গ তুলিয়া দণ্ডায়মান হয়, তখন বোধ হয়, এবার বুঝি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রসাতলে যাইবে। কিন্তু শেষে কেবলমাত্র একটি ঠুস্। ঋষিদিগের শ্রাদ্ধে বিশ জন ব্রাহ্মণে ক্রমাগত কলার খোলা কাটিতে থাকেন। মনে হয়, কত ধুমধাম না হইবে। কিন্তু ঐ খোলা কাটাই সার। এ দুর্গোৎসবেও দেখিতেছি, কেবল প্রতিমা, ঢোল ও গঙ্গাজল।'

ডমরুধর বলিলেন,—'মায়ের আজ্ঞা! ভাল মনে করিয়া দিয়াছেন। আমি আমার আবাদের দুইজন ধাঙ্গড়কে তাহাদের সেই চেপটা মাদল আনিয়া পূজার সময় বাজাইতে বলিয়াছি। তাহাদিগকে কিছু দিতে হইবে না। দুইবেলা দুইমুঠা ভাত দিলেই হইবে। পূজার কয়দিন আমার বাড়ীতে রান্না হইবে না। পূজার কয়দিন লোকের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইয়া আমরা চালাইব। লম্বোদর ভায়া! তুমি সেই কয়দিন আমার ধাঙ্গড় দুইজনকে দুইটি করিয়া ভাত দিও। বুঝিয়াছ তো?'

লম্বোদর উত্তর করিলেন,—'বিলক্ষণ বুঝিয়াছি, কিন্তু এ পূজা তোমার না করিলে কি নয়?' মুখ কুঞ্চিত করিয়া নাকিসুরে ডমরুধর উত্তর করিলেন,—'তুমি তো বলিলে। কিন্তু পূজা না করি, তাহা হইলে লোকের কাছ হইতে প্রণামীটি কি করিয়া আদায় করি? পুরোহিত আতি মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন,—

'কার্ত্তিকেয়ং নমস্যামি গৌরীপুত্রং সুতপ্রদম্।
ষড়াননং মহাভাগং দৈত্যদর্পনিসূদনম্।।

চতুর্থ গল্প

প্রথম পরিচ্ছেদ – ডমরুধরের শব-সাধনা

ডমরুধরের পূজার দালান। প্রস্তুত। পঞ্চমীর দিন। পূর্বের মতই প্রতিমার পার্শ্বে বসিয়া ডমরুধর বন্ধুবর্গের সহিত গল্পগাছা করিতেছেন।

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তোমার প্রতিমায় এ বৎসর ব্যাঘ্র উচ্চ কেন? কার্তিকের ওরূপ বেশ কেন?'

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—'ও কথা আর কেন বল ভাই। যে বিপদে পড়িয়াছিলাম, তা আমিই জানি।' সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কি হইয়াছিল?'

লম্বোদর বলিলেন,—'আবার বুঝি একটা আজগুবি গল্পের সূচনা হইতেছে!'

ডমরুধর বলিলেন,—'তোমাদের শুনিয়া কাজ কি! আমি বলিতে চাই না।'

সকলের কৌতূহল জন্মিল। বলিবার নিমিত্ত সকলে সাধ্য-সাধনা করিতে লাগিলেন। অনেক সাধ্য-সাধনার পর ডমরুধর বলিতে আরম্ভ করিলেন।

সন্ন্যাসী-হাঙ্গামায় আমার সূক্ষ্ম শরীর আকাশে ভ্রমণ করিয়াছিল। অবশেষে যমালয়ে গিয়া প্রথমে মান্য পরে অমান্য হইয়াছিল। সে গল্প পূর্বে আমি বলিয়াছি। সেই অবধি সশরীরে আকাশ-ভ্রমণ করিতে আমার সাধ হইয়াছিল।

যতদূর চলে, মায়ের পূজা আমি গঙ্গাজল দিয়া সারি। গঙ্গাজলে মা যত পরিতোষ লাভ করেন, এমন আর কিছুতেই নয়। বিশেষতঃ আমাদের কাটিগঙ্গার জল। কিন্তু পূজার জন্য প্রজাদের নিকট হইতে আমি ঘৃত, মধু, পাঁঠা প্রভৃতি আদায় করি। তাহা আনিবার নিমিত্ত এই আশ্বিন মাসে আমি সুন্দরবনে আমার আবাদে গিয়াছিলাম।

একদিন বাসায় বসিয়া আছি, এমন সময় দুইজন ফকির পীর গোঁরাচাঁদের গান করিতে আসিল। গান গাহিয়া বার্ষিক চাহিল। আমার কাছারি হইতে পূজার সময় তাঁহারা চারি আনা বার্ষিক পায়। এবার সে বার্ষিক আমি বন্ধ করিয়া দিলাম। প্রথম তাহারা অনেক মিনতি করিল। শেষে যখন দেখিল যে, তাহাদের বচনে আমি ভিজিবার ছেলে নই, তখন আমাকে অভিশাপ দিয়া গেল,—পীর গোরাচাঁদের ব্যাঘ্র তোমাকে গ্রাস করুক।'

শুনিলাম যে, পীর গোরাচাঁদ এক সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। প্রকাণ্ড এক ব্যাঘ্র চড়িয়া সুন্দরবন অঞ্চলে তিনি ভ্রমণ করিতেন। তাঁহার অনেক ধন ছিল। যাহাকে তিনি যাহা বলিতেন, তাহাই ফলিত।

আমি মনে মনে ভাবিলাম যে, সিদ্ধ হওয়া ব্যবসাটি তবে মন্দ নহে। আমিও সিদ্ধ হইব। আমি ডমরুধর; আমার অসাধ্য কি আছে?

সিদ্ধ হইবার সহজ উপায় সকলের নিকট জানিয়া লইলাম। তাহারা বলিল, গভীর রাত্রিতে শ্বশানে গিয়া মড়ার পিঠে বসিয়া জপ করিতে হয়। বাঘ ভাল্লুক ভূত প্রেত আসিয়া ভয় প্রদর্শন করে। ভয় করিলেই বিপদ, না ভয় করিলে দেবী স্বয়ং আসিয়া বর প্রদান করেন। ভূত প্রেতদিগের নিমিত্ত সঙ্গে মদ ও মুড়ি-কড়াই ভাজা লইয়া যাইতে হয়।

আমি ভাবিলাম, এ তো সহজ কথা। মড়াকে আমার ভয় কি? মড়া আমি গুলিয়া খাইতে পারি। বাঘকেও আমার ভয় নাই। মন্ত্রবলে আমি বাঘের মুখ বন্ধ করিয়া দিতে পারি। ভূতকে আমার ভয় নাই। মাছ লইয়া ভূতের সঙ্গে সঙ্গে একবার কাড়াকাড়ি করিয়াছিলাম। শেষে ভূতের হাতে কামড় মারিয়াছিলাম। আমার দাঁত নাই, তাই, দাঁত থাকিলে ভূতের হাতে এখনও ঘা থাকিত। তাহার পর একটি ভূত পুষিয়াছিলাম। এলোকেশী যদি সব পণ্ড না করিত, তাহা হইলে পোষা ভূতটি এখনও আমার কাছে থাকিত।

দুই চারি দিন পরে সেস্থানে একটি লোক মরিয়া গেল। সে মজুরি করিতে আসিয়াছিল; আপনার লোক কেহ ছিল না। তাহার মৃতদেহ লোকে গাঙে ফেলিয়া দিল। কুম্ভীরে খাইতে না খাইতে আমি মড়াটিকে টানিয়া উপরে তুলিলাম। তাহার পর যে স্থানে লোকে মড়া পোড়ায়, সেই স্থানে রাখিয়া আসিলাম। এক বোতল মদ ও কিছু মুড়ি-কড়াইভাজা সংগ্রহ করিলাম।

গভীর রাত্রিতে একাকী শ্মশানে গমন করিলাম। মড়াটির মুখে মদ ও মুড়ি কড়াইভাজা দিলাম। কুড় কুড় করিয়া খাইতে লাগিল। তাহাকে উপুড় করিয়া পিঠে বসিয়া আমি কঠোর তপ আরম্ভ করিলাম। তোমাদের ও সব জপের মন্ত্র আমি জানি না। হিড়িং বিড়িং আমি মানি না। কেবল দেবীর পাদপদ্ম আমি ধ্যান করিতে লাগিলাম।

প্রথম আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল। অবিরত বিদ্যুতের ঝলকে পৃথিবী ঝলসিত হইতে লাগিল, ঘন ঘন বজ্রনিনাদে পৃথিবী কম্পিত হইল। আমি ভীত হইলাম না। চক্ষু বুজিয়া মায়ের পাদপদ্ম ধ্যান করিতে লাগিলাম।

তাহার পর বন্য মহিষ আসিল। আমার সম্মুখে লম্ফঝম্ফ করিতে লাগিল। শৃঙ্গাঘাতে পৃথিবী বিদীর্ণ করিল। আমি ভয় করিলাম না। চক্ষু মুদিত করিয়া মায়ের পাদপদ্ম ধ্যান করিতে লাগিলাম।

ব্যাঘ্র আসিল। তাহার গভীর গর্জনে বনে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। আমি চক্ষু চাহিলাম না। এক মনে দেবীর পাদপদ্ম ধ্যান করিতে লাগিলাম।

ভূত প্রেত দানা দৈত্য আসিল। আমার সম্মুখে নাচিতে লাগিল। খিল্ খিল্ হাসিতে চারিদিক পূর্ণ করিলাম। আমি ভয় পাইলাম না, চক্ষু চাহিলাম না, কেবল বলিলাম,—'ঐ মদ মুড়ি-কড়াইভাজা আছে। খাও, খাইয়া ঘরে যাও।' তাহার পর পুনরায় ধ্যানে মগ্ন হইলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ – ডমরুধরের সিদ্ধিলাভ

এইরূপ কত যে বিভীষিকা হইল, সে কথা তোমাদিগকে কি আর বলিব! অবশেষে আমার পরলোকগতা মাতা আসিলেন। তিনি বলিলেন,—'বাছা' ডমরুধর! অনেক তপ করিয়াছ, আর কাজ নাই, এখন ঘরে চল, এখানে বসিয়া থাকিলে অসুখ করিবে।' আমি কোন উত্তর করিলাম না।

তাহার পর আমার স্ত্রী এলোকেশী আসিলেন। তিনি বলিলেন,—'ঘরে চল্। না গেলে এখনি কান ধরিয়া লইয়া যাইব।' তোমরা সকলেই জান যে, এলোকেশীকে আমি যমের মত ভয় করি। তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া প্রথম আমার হৃৎকম্প হইয়াছিল। কিন্তু আমার স্মরণ হইল যে, এ সব মিথ্যা। তখন আমি পুনরায় ধ্যানে প্রবৃত্ত হইলাম।

আমার সে কঠোর তপ কেহ কিছুতেই ভঙ্গ করিতে পারিল না, তখন মা দুর্গা স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মা বলিলেন,—'ডমরুধর! তোমার কঠোর তপস্যায় আমি সন্তোষ লাভ করিয়াছি। এক্ষণে বর প্রার্থনা কর।'

আমি চক্ষু চাহিয়া দেখিলাম যে, ঠিক যেমন এই প্রতিমা, দেবী সেই বেশে আমার নিকট আগমন করিয়াছেন। মা দশভুজা, দক্ষিণে গণেশ ও লক্ষ্মী, বামে সরস্বতী ও কার্ত্তিক, নিম্নে সিংহ ও অসুর।

মায়ের সেই উজ্জ্বল রূপ দেখিয়া আমি হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলাম। চারিদিক আঁধার দেখিতে লাগিলাম। মনের উপরও যেন ছানি পড়িয়া গেল। কি বর চাহিব, তাহা খুঁজিয়া

পাইলাম না। আমার দূরদৃষ্ট! তা না হইলে কাছে লক্ষ্মী ছিলেন। যদি ধন চাহিতাম, এত ধন তিনি দিতেন যে, রাখিতে ঘরে স্থান হইত না। কাছে সরস্বতী ছিলেন, যদি বিদ্যা চাহিতাম, তাহা হইলে আমিও একটা বি-এ, এম-এ পাস করা ফোচকে ছোঁড়া হইতে পারিতাম। —কিন্তু সে জ্ঞান আমার হইল না। কার্ত্তিকের ময়ুরটি দেখিয়া আকাশ-ভ্রমণের সাধ আমার মনে উদয় হইল। আমি বলিলাম,—'যদি বর দিবেই, তবে কার্ত্তিকের ময়ুরটি আমাকে প্রদান কর। উহার পিঠে চড়িয়া আমি আকাশ-ভ্রমণ করিব!'

দেবী বলিলেন,—'ছি বাছা, ও কথা বলিও না। কার্ত্তিক ছেলেমানুষ। তাহার ময়ুরটি দিলে সে কাঁদিবে।' —আমি উত্তর করিলাম,—'অন্য বর চাই না মা! নিদেন সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত একদিনের জন্য ময়ুরটিকে দাও, মা! তাহার পিঠে চড়িয়া সমস্ত দিন আকাশ-ভ্রমণ করিয়া সন্ধ্যাবেলা তোমাদের ময়ুর তোমাদিগকে ফিরাইয়া দিব। যদি না দাও তবে পুনরায় আমি এই তপে বসিলাম।' —দেবীর ভয় হইল। তিনি বলিলেন,—'না বাছা! আর তপস্যা করিও না। তোমার তপে পৃথিবী তাপিত হইয়াছে। আর তপ করিলে মহাপ্রলয়ের অনল উত্থিত হইয়া সমস্ত জগৎ ভস্ম হইয়া যাইবে।'

এই কথা বলিয়া কার্ত্তিকের সহিত দেবী চুপি চুপি কি পরামর্শ করিলেন। তাহার পর তিনি বলিলেন,—'আচ্ছা বাছা, একদিনের জন্য কার্ত্তিক তোমাকে ময়ুরটি প্রদান করিবে। আমার সিংহের একটি বাচ্চা দিয়া কার্ত্তিককে আমি ভুলাইয়া রাখিব। কিন্তু ডমরুধর! সন্ধ্যা হইলেই ময়ূরকে তুমি ছাড়িয়া দিবে। না ছাড়িয়া দিলে, সে তোমাকে লবণ, ইক্ষুরস, সুরা, ঘৃত, ক্ষীর, দধিসমুদ্র পারে স্বাদুসমুদ্রে লইয়া ফেলিবে। সে সমুদ্রে তুমি হাবুডুবু খাইয়া মরিবে।' —এইরূপ সাবধান করিয়া দেবী আমাকে ময়ূরটি প্রদান করিলেন। কার্ত্তিককে সিংহশাবক দিলেন। সিংহের বাচ্চাটি কোলে লইয়া কার্ত্তিক কৈলাসে গমন করিলেন। প্রতিমার যেরূপ গঠিত হয়, কার্ত্তিকের ময়ূর প্রকৃত সেরূপ নহে। সে ময়ূর কিরূপ, খড়ি দিয়া এই শানের উপর আমি তোমাদিগকে আঁকিয়া দেখাই।

ময়ূরের ছবি দেখিতে সকলে তাঁহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন। ছবি দেখিয়া লম্বোদর একটু হাসিলেন,—কুপিত হইয়া ডমরুধর বলিলেন,—'হাসিও না। এ তোমাদের পৃথিবীর ক্যাঁক্-কেঁকে প্যাকম-ধরা ময়ূর নহে। এ আসল কার্ত্তিকের কেলাসি ময়ূর।

তাহার পর ডমরুধর পুনরায় গল্প আরম্ভ করিলেন,—গণেশ, লক্ষ্মী, দুর্গা ও সরস্বতী। প্রণাম করিয়া আমি ময়ূরের পিঠে চড়িয়া বসিলাম। তাহাকে আকাশের দিকে চালাইতে চেষ্টা করিলাম। ময়ূর উপরে উঠিল না। তখন দেবী হাসিয়া বলিলেন,—'মন্ত্র না পড়িলে নরলোককে লইয়া ময়ূর উপরে উঠিবে না। শূন্যে আরোহণ করিবার সময় তুমি এই মন্ত্রটি পাঠ করিবে,— 'জয় কৈলাসবাসিনী মহেশগৃহিণী গণেশজননী।'

তাহার পর সন্ধ্যাবেলা তোমার বাসার উপরে আসিয়া এই মন্ত্রটি বলিবে।—জয় কৈলাসবাসিনী ত্র্যম্বকগৃহিণী ষড়াননজননী।'

দ্বিতীয় মন্ত্রটি অতি সাবধানে স্মরণ করিয়া রাখিবে। বাসার উপর আসিয়া এই মন্ত্রপাঠ

না করিলে ময়ূর তোমাকে সপ্তদ্বীপ সাত সমুদ্র তের নদী পারে লোকালোক পর্বতের ওধারে সূর্য্যের অগম্য তিমিরপূর্ণ গভীর গহ্বরে ফেলিয়া চলিয়া যাইবে।'

আমি বলিলাম,—'মন্ত্রটি অতি সহজ। কেন মনে করিয়া রাখিতে পারিব না? তবে দ্বিতীয় মন্ত্রে ঐ গুম্বজগৃহিণী কথাটা কিছু কঠিন।'

দেবী হাসিয়া বলিলেন,—গুম্বজগৃহিণী নহে, ত্র্যম্বকগৃহিণী।

আমি বলিলাম,—'এইবার আমি ভাল করিয়া স্মরণ রাখিব, গুম্বজ নহে ত্র্যম্বক।'

দেখ লম্বোদর, এই স্থানে তোমাদের একটা কথা আমি বলিয়া রাখি। প্রতিমার এই যে কার্ত্তিক সকলে করে, এ-কেলে কার্ত্তিক নহে এ সে-কেলে কার্ত্তিক। লম্বা কোঁচা গুঁফো ধেড়ে কার্ত্তিক কি বাপু! এই কি তোমাদের ভক্তি! ছি! এখনকার কার্ত্তিক ছেলে-মানুষ। মোজা ইজের কোট টুপি পরা। সিংহশাবক কোলে কার্ত্তিককে আমি এইরূপ দেখিয়াছিলাম। প্রতিমারও তাই করিয়াছি।

প্রতিমা সহিত দেবী অন্তর্ধান হইলেন। আমি প্রথম মন্ত্রটি পাঠ করিলাম,—

'জয় কৈলাসবাসিনী মহেশগৃহিণী গণেশজননী।'

তৃতীয় পরিচ্ছেদ – পিং মহাশয়

ময়ূর তৎক্ষণাৎ উপরে উঠিল। অনেক—অনেক উপরে উঠিল। রেলগাড়ী বা কি? তড়িদ্‌গতি বা কি? তাহা অপেক্ষা দ্রুতবেগে শূন্যপথে চলিতে লাগিল। চন্দ্রলোক সূর্য্যলোক ধ্রুবলোক পার হইয়া গেল। কোটি কোটি যোজন পরে শেষে আমি পিংয়ের আকাশে গিয়া উপস্থিত হইলাম। —লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—পিং সে কি?'

ডমরুধর উত্তর করিলেন, পিং কি? পিং এইরূপ—বলিয়া পিং-এর চিত্র অঙ্কিত করিয়া দেখাইলাম। লম্বোদর বলিলেন,—'তা যেন দেখিলাম! কিন্তু পিং কে?'

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—কি গেরো! পিং কে, তা আমি কি করিয়া জানিব? পিং আমার জাতি নয়, জ্ঞাতি নয় যে, তাহার পরিচয় আমি তোমাকে দিব। প্রাণ গেলেও আমি মিথ্যাকথা বলিব না। আমার সে স্বভাব নয়।

ছোট একখণ্ড কালো মেঘের উপর পিং বসিয়াছিলেন। আমি তাঁহার নিকট গমন করিলাম। দেখ লম্বোদর! তোমরা আমাকে কালো কুৎসিত কদাকার বলিয়া উপহাস কর। কিন্তু পিং আমার রূপের মর্যাদা জানেন। আমাকে দেখিবামাত্র পিং কি বলিলেন শুন।

পিং বলিলেন,—'আহা, মহাশয়ের কি রূপ! ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, তাহার ভিতর হইতে খড়ি মাটীর আভা বাহির হইতেছে। তাহা দেখিয়া আমার উস্কোখুস্কো পালক-আবৃত কাক ভূষণ্ডীকে মনে হইল। বহুকালের প্রাচীন ছেৎলাপড়া বাঁশের ঝোড়ার ন্যায় মহাশয়ের অস্থি-পিঞ্জর দেখা যাইতেছে। দধিপুচ্ছ শৃগালের পর্বত-গহ্বরের ন্যায় আপনার দন্তশূন্য মুখগহ্বর। তাহার দুই ধারে কি দুইটি কাক বসিয়াছিল? ঐ যে ঠোঁটের দুই কোণে শুভ্রবর্ণের কি রহিয়াছে? আপনার টোল-পড়া গাল দুইটি দেখিয়া হনুমানের চড়-প্রহারিত রাবণ মাতুল কালনেমির গণ্ডদেশ আমার স্মরণ হইল। পক্বচুল পরিবেষ্টিত মস্তকের মধ্যস্থিত বিস্তৃত টাক

দেখিয়া আমার মনে হইল, বিধাতা বুঝি পূর্ণচন্দ্রটিকে বসাইয়া তাহার চারিদিকে শুভ্রবর্ণের মেঘ গাঁথিয়া দিয়াছেন। ফলকথা, মহাশয়কে যখন দূরে দেখিলাম, তখন মনে করিলাম যে, ময়ূরে চড়িয়া টাক-চুড়ামণি কেলে-কার্ত্তিক জগৎ আঁধার করিয়া আসিতেছেন।'

পিঙের সুমিষ্ট স্তবে প্রীতিলাভ করিয়া আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিলাম,—'আমি আকাশে ভ্রমণ করিতে আসিয়াছি। ইহার পর দেখিবার আর কি আছে?'

পিং উত্তর করিলেন,—'সমুদ্রকুলে বালুকারেণুর ন্যায় ইহার পর আরও কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড আছে। কিন্তু ব্রহ্মার কোন অণ্ডই আপনার দেখিবার উপযুক্ত নহে। যাবতীয় ব্রহ্মাণ্ডের ওপারে আপনি গিয়া অশ্বাণ্ড দর্শন করুন।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'অশ্বাণ্ড! সে কিরূপ? সে কোথায়?'

পিং উত্তর করিলেন,—'অল্পদিন হইল ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের নিকট গিয়া যম আবেদন করিলেন যে—বঙ্গদেশের বিটলে কপট স্বদেশ ভক্তগণ শীঘ্রই প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইবে। তাহাদের প্রেতকে আমার আলয়ে আমি স্থান দিতে পারিব না। তাহাদের কুহকে পড়িলে আমি উৎসন্ন যাইব। ছেলেখেকো বক্তারাও শীঘ্র প্রেত হবে। তাহাদিগকে আমি স্থান দিব না। আমার ছেলেগুলি তাহা হইলে গোল্লায় যাইবে। স্বদেশী প্রবঞ্চকদিগের প্রেতকেও আমি স্থান দিতে পারিব না। আমার আলয়ে আসিয়া তাহারা হয়তো কোম্পানী খুলিয়া বসিবে। তখন যমনীকে হাতের খাড়ু বেচিয়া শেয়ার কিনিতে হইবে। তাহার মহাপ্রভুরা এককড়া কাণাকড়িও উপুড় হস্ত করিবেন না। আপনারা ইহার ব্যবস্থা করুন। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ইন্দ্রের ঘোড়া উচ্চৈঃশ্রবাকে এক ডিম্ব প্রসব করিতে বলিলেন। বিশ্বসংসারের ওপারে এই অণ্ড আছে। ইহাতে বিটলে স্বদেশভক্ত ছেলেখেকো বক্তা ও স্বদেশী প্রবঞ্চকগণের প্রেত বাস করে। মহাশয় গিয়া অশ্বাণ্ড দর্শন করুন।'

পিং আরও বলিলেন যে, অশ্বাণ্ডের দ্বারে এক প্রহরী আছে। প্রহরী যে কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিবে ও তাহার উত্তরে কি বলিতে হইবে, পিং আমাকে শিখাইয়া দিলেন।

পিঙের নিকট হইতে বিদায় লইয়া পুনরায় আমি শূন্যপথে চলিতে লাগিলাম। সমুদ্রকুলে বালুকারেণুর ন্যায় কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড পার হইয়া যাইলাম। অবশেষে বিশ্ব-সংসারে ওপারে দূর হইতে অশ্বাণ্ড দেখিতে পাইলাম। পরে নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম যে দ্বারে ভীষণ মূর্ত্তি প্রহরী বসিয়া আছে।

চীৎকার করিয়া প্রহরী আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,—'হু কামস দায়?' (Who comes there?) —আমি উত্তর করিলাম,—'ফ্রেণ্ড।' (friend) প্রহরী বলিল,—'পাস ফ্রেণ্ড, অল ওয়েল' (Pass friend well)

এই বলিয়া প্রহরী দ্বার ছাড়িয়া দিল। অশ্বাণ্ডের ভিতর আমি প্রবেশ করিলাম। আমি দেখিলাম যে, ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় অশ্বাণ্ড ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম দিয়া গঠিত নহে। ইহা সম্পূর্ণ অন্ধকার দিয়া নির্মিত। — দূর দূর বহু দূর গিয়া বিটলে স্বদেশ ভক্তদিগের দেশে গিয়া উপস্থিত হইলাম। এই প্রেতদিগের রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত এক প্রহরী নিযুক্ত আছে। প্রহরী

তাহাদিগকে বৃহৎ অট্টালিকার ভিতর বন্ধ করিয়া রাখে। আমাকে দেখাইবার নিমিত্ত তাহাদিগকে সে বাহির করিল।

পৃথিবীতে ইহাদের শরীর নুদুর-নাদুর থাকে। এখানে ইহাদের এইরূপ মূর্ত্তি হইয়াছে। বঙ্গদেশের ইহারা সর্বনাশ করিয়াছে। শত শত বাঙ্গালী যুবকের অন্নলাভের পথ রোধ করিয়াছে। সাধারণের টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে। প্রহরী আমাকে বলিল,—'সত্বর এ স্থান হইতে প্রস্থান করুন। আপনার যে এমন অপূর্ব রূপ, ইহাদের বাতাস লাগিলে সে সব মাটি হইয়া যাইবে। আপনাকে আরও এক বিষয়ে সাবধান করি। কিছুদূরে আপনি ছেলেখেকো বক্তাদিগের প্রেতগণকে দেখিতে পাইবেন। তাহাদের বক্তৃতা যেন আপনার কর্ণকুহরে প্রবেশ না করে। গো অশ্ব মেষ মহিষ খর শূকর বিড়াল কুকুর ইন্দুর বাঁদরের মৃত পচিত দেহ উদ্ভুত চর্বি-সম্ভূত, অবিকৃত বিশুদ্ধ, পবিত্র, পুষ রূপে বিভূষিত গলিত মড়াগন্ধে আমোদিত, ময়রা মহলে সমাদৃত সর্বত্র প্রচলিত ঘৃত সদৃশ আপনার হৃদয় কোমল। তাহাদের বক্তৃতা-উত্তাপে আপনার হৃদয় গলিয়া যাইবে। তখন আপনি যা নয়—তাই করিয়া বসিবেন।

সভয়ে এ স্থান হইতে আমি পলায়ন করিলাম। দূরে কোটি কোটি যোজন দূরে আমি এক ছেলেখেকো বক্তা দেখিতে পাইলাম। একাকী দাঁড়াইয়া ইনি বক্তৃতা করিতেছিলেন।

বক্তা তাকালে ইনি অনেক অপোগণ্ড শিশুর ইহকাল-পরকাল ভক্ষণ করিয়াছিলেন। অনেক সংসারে ছারেখারে দিয়াছিলেন। কানে আঙ্গুল দিয়া ইহার নিকট আমি গমন করিলাম। ইহার অপর কেহ শ্রোতা ছিল না। কিন্তু একখণ্ড অন্ধকারের উপর দাঁড়াইয়া রাত্রিদিন ইনি বক্তৃতা করেন। শুনলাম যে পাতালে অসুরদিগের কানের পোকা হইলে, তাহারা ইঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিতে আগমন করে। পাঁচ মিনিট কাল ইঁহার বক্তৃতা তাহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলেই কানের পোকা ধড়-ফড় করিয়া বাহির হইয়া যায়।

এ স্থান হইতে বিদায় হইয়া আরও কোটি কোটি যোজন দূরে স্বদেশী প্রবঞ্চকদিগের দেশে উপস্থিত হইলাম। অনেকগুলো এই জাতীয় প্রেত দর্শন করিলাম। তাঁহাদের একজন পৃথিবীতে থাকিতে অনেক ব্যবসা করিয়াছিলেন, অনেক কোম্পানী খুলিয়াছিলেন, অনেক লোকের টাকা ফাঁকি দিয়াছিলেন। অবশেষে এক বীমা-অফিস খুলিয়া মুটে-মজুরের টাকাও উদরস্থ করিয়াছিলেন। অনেকগুলি হাত ও পা বাহির করিয়া এই মহাপ্রভু এক্ষণে আমাকে ধরিতে আসিলেন।

ইহার বীমা অফিসে আমি অর্থ প্রদান করি,—সেই ইচ্ছায় তিনি আমাকে ধরিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু এ সব কার্যে আমিও একজন ঘুণ। আমি ধরা দিলাম না। সত্বর সে স্থান হইতে পলায়ন করিলাম।

বেলা তখন প্রায় তিনটা বাজিয়াছিল। সন্ধ্যার পূর্বে আমার বাসায় পৌঁছতে হইবে। তা না হইলে ময়ূর আমাকে সপ্তদ্বীপের ওপারে স্বাদুসমুদ্রে নিক্ষেপ করিবে। সেজন্য পৃথিবীর দিকে ময়ূরকে আমি পরিচালিত করিলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ — জিলেট জিলেকি সিলেমেল

নিম্নদিকে নামিতে-নামিতে আমি ভাবিতে লাগিলাম, আমিও দুই তিনবার স্বদেশভক্ত হইয়া সভা করিয়াছিলাম, বক্তৃতা করিয়াছিলাম, স্বদেশের হিতের নিমিত্ত চাঁদা সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহার পর চাঁদার টাকাগুলি নিজে হাম্ করিয়াছিলাম। সন্ন্যাসী বিভ্রাটের পর আমিও এক স্বদেশী কোম্পানী খুলিয়া অনেক হাঁড়ী বালতি গরীব কেরাণীর মস্তকে হস্ত বুলাইয়াছিলাম। তবে প্রেত হইয়া আমাকেও ঐ অশ্বাণ্ডে গমন করিতে হইবে? কিন্তু তাহার পর আমার স্মরণ হইল যে, যম অবগত আছেন, আমি মুরগী খাই না, একাদশীর দিন পুঁইশাক ভক্ষণ করি না। সুতরাং সেই পুণ্যবলে অনায়াসে আমি সত্য-লোক, ব্রহ্মালোক— যেখানে ইচ্ছা সেইখানে গিয়া বাস করিতে পারিব। যদি ধর্ম শিখিতে চায় তো টিকিদারেরা আমার কাছে আসুক।

হু হু শব্দে ময়ূর পৃথিবীর দিকে ধাবিত হইল। অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র পার হইয়া আমি ক্রমাগত নিম্নে নামিতে লাগিলাম। অবশেষে সূর্যমণ্ডল পার হইলাম। সে স্থান হইতে পৃথিবী দেখিলাম,—অতি ক্ষুত্র এক নক্ষত্রের ন্যায় ঝিক্‌মিক করিতেছে। ময়ূরের দুই পার্শ্বে আমার দুইটি পা ঝুলিতেছিল। হঠাৎ কোথা হইতে কি একটা আসিয়া আমার বাম পায়ে কামড় মারিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দিল। চকিত হইয়া আমি সেই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম! দেখিলাম যে, অতি বিরক্তিসূচক মুখভঙ্গিমা করিয়া চাকার ন্যায় কি একটা গড়াইয়া গেল।

আমি ভাবিতে লাগিলাম, চাকার ন্যায় ওটা কি? আমার পায়ে কামড় মারিল কেন? অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া শেষে বুঝিতে পারিলাম। আমার রূপে জগৎ আলো করিয়া শূন্যপথে আমি আসিতেছিলাম. চাকার ন্যায় ওটা রাহু। আমাকে পূর্ণিমার চন্দ্র মনে করিয়া সে আমাকে গ্রহণ লাগাইতে আসিয়াছিল। পূর্ণিমার পর প্রতিপদে চন্দ্রগ্রহণ হয়। কিন্তু আমার রূপে মুগ্ধ হইয়া সে লোভ সংবরণ করিতে পারে নাই। তারপর আমি যে পূর্ণচন্দ্র—তার আর প্রতিপদ হয় না। যাই হউক, হতজ্ঞান হইয়া সে আগে থাকিতে আমাকে গিলিতে আসিয়াছিল। ভাগ্যে আমার গায়ে মাংস নাই, কেবল হাড়, তাই সে কামড় বসাইতে পারিল না। মুখ সিঁটকে চলিয়া গেল। রাহুর দুই চারিটি দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল কি না তা বলিতে পারি না। আমার শরীর যদি সুস্বাদু হইত, তাহা হইলে আমার গ্রহণটি সর্বগ্রাস হইত। সাপ যেরূপ আস্তে আস্তে ভেককে ভক্ষণ করে, রাহুও সেইরূপ ক্রমে ক্রমে আমাকে পেটস্থ করিত। চন্দ্র-সূর্যের ন্যায় আমার আর মুক্তি হইত না। চিরকাল আমাকে রাহুর—সর্বনাশ! রাহুর পেট নাই! আমাকে সর্বগ্রাস করিয়া সে গালের ভিতর এক কষে রাখিত কি কোথায় রাখিত, জানি না। কিন্তু লম্বোদর! তোমরা আর আমাকে দেখিতে পাইতে না। —লম্বোদর বলিলেন,—'ইস, তাই তো।'

সকলে বলিলেন,—'ইস, তাই তো।'

ময়ূর এই ঘটনার পর নক্ষত্রবেগে পৃথিবীর দিকে ধাবিত হইল। সন্ধ্যা হয় হয়, এমন

সময় আমি সমুদ্রের উপর আসিয়া উপস্থিত হইলাম। অল্পক্ষণের মধ্যে সুন্দরবনের উপর আসিলাম। ময়ূর আমার বাসার দিকে ধাবিত হইল। তখনও ভূমি হইতে প্রায় একক্রোশ উচ্চে শূন্যপথে ময়ূর উড়িতেছিল। আমি ভাবিলাম, এস্থান হইতে আমার বাসা প্রায় আর দুই ক্রোশ আছে, বাসার ঠিক উপরে যাইলেই সেই দ্বিতীয় মন্ত্রটি পড়িব। তখন ময়ূর আমাকে ধীরে ধীরে আমার বাসায় নামাইয়া দিবে।

কিন্তু সে দ্বিতীয় মন্ত্রটি কি? সর্বনাশ! আমি সে মন্ত্রটি ভুলিয়া গিয়াছি। মন্ত্রটি মনে করিতে না পারিলে ময়ূরে আমাকে সাত সমুদ্র তের নদী পারে লইয়া লোকালোক পর্বতের ওপারে অন্ধকার গহ্বরে ফেলিয়া স্বস্থানে চলিয়া যাইবে। তাহা ভাবিয়া আমার প্রাণ আকুল হইল। মন্ত্রটি কি? গম্বুজ? না, তা নয়! জলটুঙ্গী? না, তা নয়, ঝাপড়দা-মাকড়দা? না, তাও নয়। তবে কি? এ কথা নয় সে কথা, নয় এ কথা—ক্রমাগত ভাবিয়া মন্ত্রটি স্মরণ করিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু তাহার একটি বর্ণও আমার মনে উদয় হইল না। এমন কি, হতভম্ব হইয়া আমি দুর্গা নামটি পর্যন্ত মনে করিতে পারিলাম না। আমি ভাবিলাম যে, যাঃ ডমরুধর! এইবার তোমার সব লীলাখেলা ফুরাইল। যাহা হউক, অনেক চিন্তা করিয়া অবশেষে আমার মনে হইল মন্ত্রটিতে জ আছে, ল আছে আর ক আছে। তাহার পব সেই অক্ষর কীটি যোড়তোড় করিয়া স্থির করিলাম যে, মন্ত্রটি বোধ হয় এইরূপ হইবে,— জিলেট জিলেকি সিলেমেল কিলেকিট কিলেকিণ।

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কি?'

ডমরুধর পুনরায় বলিলেন,—জিলেন জিলেকি সিলেকেল কিলেকিট কিলেকিশ।

লম্বোদর বলিলেন,—'এতও তুমি জান। এ কোন ভাষা?'

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—'তা জানি না ভাই, এ ভিন্ন আর কিছু তখন মনে হইল না।

মন্ত্রটি এইরূপ ঠিক করিয়া আমি ভাবিলাম, একবার পরীক্ষা করিয়া দেখি; উচ্চৈঃস্বরে আমি বলিলাম,—জিলেট জিলেকি সিলেমেল কিলেকিট কিলেকিশ।

সেই কিচ-মচ শব্দ শুনিয়া ময়ূর ভাবিল,—কৈলাস পর্বতে ভূত-প্রেত-দানা-দৈত্যের সহিত আমার বাস। অনেক তন্ত্র মন্ত্র শুনিয়াছি। এরূপ বিদঘুটে কখনও শুনি নাই। এ লোকটার ভাবগতিক ভাল নহে। বাসায় লইয়া গিয়া আমাকে হয়তো এইরূপ ভীষণ পালকহর্ষণ মন্ত্রবলে খাঁচায় পুরিয়া বন্ধ করিয়া রাখিবে। আগে থাকিতে সাবধান হওয়া ভাল।' এইরূপ ভাবিয়া গাঝাড়া দিয়া ময়ূর আমাকে শূন্য দেশে ফেলিয়া দিল। তাহার পর শোঁ শোঁ করিয়া কৈলাস পর্বতের দিকে উড়িয়া গেল। আমি তখন ভূমি হইতে প্রায় একক্রোশ উচ্চে আজকাল উড়োকল হইতে মানুষ যেমন পড়ে, আমিও সেইরূপ হু হু শব্দে শিশার ন্যায় নীচে পড়িতে লাগিলাম। হু হু, হু হু, হু হু, কানে আমার বাতাস লাগিতে লাগিল। আমি ভাবিলাম যে, এইবার আমার দফা রফা হইল। হু হু হু হু শব্দে পড়িতে লাগিলাম, অবশেষে খপ করিয়া কাদার ন্যায় কি একটা কোমল বস্তুর উপর পড়িলাম।

কোমল বস্তুর উপর পড়িলাম, সেজন্য আমার অস্থি মাংস চূর্ণ হইয়া গেল না, সেজন্য

আমার প্রাণ বিনষ্ট হইল না। যখন আমার হৃদয়ের ধড়ফড়ানি কিছু স্থির হইল, তখন আমি এদিক্-ওদিক্ চাহিয়া দেখিলাম, তাহাতে আমার চক্ষুস্থির হইল। আমি দেখিলাম যে, পর্বতপ্রমাণ প্রকাণ্ড এক ব্যাঘ্রের মুখগহ্বরে আমি পতিত হইয়াছি। ব্যাঘ্রটি বৃদ্ধ হইয়াছিল। সেজন্য তাহার দন্ত ছিল না। দাঁত থাকিলে শূলসদৃশ দন্তে বিদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ আমার মৃত্যু হইত। আমার সকল কথা মনে হইল। পীর গোরাচাঁদের ফকীরদিগের অভিশাপে আমি পড়িয়াছি। এ সেই পীর গোরাচাঁদের ব্যাঘ্র। যে বাঘ চড়িয়া তিনি দেশভ্রমণ করিতেন। তোমার যে-সে ব্যাঘ্র নহে। এ রয়েল টাইগারের বাবা! এ মহারাজ ব্যাঘ্র।

লোকে বলে যে ঘুমন্ত সিংহ হাঁ করিয়া থাকিলে, তাহার মুখে মৃগ প্রবেশ করে না। সে ঠিক কথা নহে। রাজসাপ নামে একপ্রকার সর্প আছে। সে সাপ হাঁ করিয়া থাকিলে তাহার মুখে অন্যান্য সাপ প্রবেশ করে। এ বৃদ্ধ ব্যাঘ্র তাহাই করে। আকাশ-পাতাল জুড়িয়া হাঁ করিয়া থাকে। আর ইহার মুখে মৃগ প্রবেশ করে। আমি বসিয়া থাকিতে থাকিতে একটা বন্য মহিষ, চারিটা হরিণ ও দুইটা বরাহ ইহার মুখের ভিতর প্রবেশ করিল। তখন ব্যাঘ্র একেবারে কোঁৎ করিয়া আমাদের সকলকে গিলিয়া ফেলিল।

ব্যাঘ্রের পেটের ভিতর ঘোর অন্ধকার। আমি বিরস বদনে তাহার এককোণে গিয়া বসিলাম। বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম—'এখন করি কি? আর রক্ষা নাই। এখনি হজম হইয়া যাইব। আমার চিহ্নমাত্র থাকিবে না। দুই চারিদিন পরে একছটাক মল হইয়া বাহির হইব।

নিতান্ত সঙ্কটে পড়িলে মানুষের অনেক বুদ্ধি জোগায়। একবার কোন ডাক্তারের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, জীবের উদর হইতে একপ্রকার অম্লরস বাহির হয়; তাহাতেই পরিপাক পায়। তোমরা জান যে, আমার অম্বলের রোগ আছে, আর সেজন্য আমি সর্বদা কাঁচা সোডা ব্যবহার করি। ভাগ্যক্রমে আমার পকেটে কাগজে মোড়া খানিকটা সোডা ছিল, সেই সোডা উত্তমরূপে আমি গায়ে মাখিয়া বসিয়া রহিলাম। ব্যাঘ্রের পেট হইতে অম্লরস বাহির হইয়া মহিষ, হরিণ, শূকর সব গলিয়া পরিপাক হইয়া গেল, কিন্তু সোডার প্রভাবে আমার শরীর গলিয়া গেল না, আপাততঃ আমার প্রাণ বাঁচিয়া গেল।

তা যেন হইল। কিন্তু সে আর কয়দিন? ব্যাঘ্রের উদর হইতে বাহির না হইতে পারিলে মৃত্যু নিশ্চয়, আজ হউক, কাল হউক, মৃত্যু নিশ্চয়। কিন্তু কি করিয়া বাহির হইব? মা দুর্গার নাম এখন আমার মনে হইল। একান্ত মনে তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলাম। পীর গোরাচাঁদকে অনেক সিন্নি মানিলাম। মা ভগবতীর ও পীর সাহেবের আমার প্রতি কৃপা হইল। বাঘের পেটের ভিতর এককোণে বসিয়া গালে হাত দিয়া ভাবিতেছি, এমন সময় হঠাৎ কে যেন আমাকে বলিয়া দিল,—তোমার পকেটে কাগজ ও পেনসিল রহিয়াছে, আমাদের কর্মচারীকে পত্র লেখ না কেন?

আমার তখন ভরসা হইল। পকেট হইতে কাগজ পেনসিল বাহির করিয়া আমি আমার কর্মচারীকে এইরূপ এক চিঠি লিখিলাম,—পীর গোরাচাঁদের কোপে আমি পড়িয়াছি। তাঁহার ব্যাঘ্রের উদরে আমি আছি। যদি কোনরূপে আমাকে উদ্ধার করিতে পার তাহার

চেষ্টা কর।'

আমার কর্মচারী বুদ্ধিমান লোক। আমার চিঠি পাইবামাত্র সেই জোয়ারের পথে যে স্থানে ডাক্তারখানা আছে, সে স্থানে চলিয়া গেল। ডাক্তারের সহিত পরামর্শ করিয়া, যাহাতে কাজ হয়, এরূপ ঔষধ এক সের ক্রয় করিল। ইংরেজীতে ইহাকে টারটার এমিটিক বলে। আবাদে ফিরিয়া সেই ঔষধ কাপড়ে রাখিয়া এক ছাগলের গলায় বাঁধিয়া দিল। তাহার পর যে স্থানে পীর গোরাচাঁদের ব্যাঘ্র বাস করে, সেই স্থানে ছাগল ছাড়িয়া দিল। বলা বাহুল্য যে, ভ্যা ভ্যা করিতে করিতে ছাগল আপনা আপনি ব্যাঘ্রের উদরে প্রবেশ করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ — ধাঙ্গড়ের ঘরে কন্দর্প পুরুষ

প্রায় দুই ঘণ্টা পরে ঔষধের ক্রিয়া আরম্ভ হইল। প্রথম ব্যাঘ্রের পেট কামড়াইতে লাগিল। পেটের কামড়ে ব্যাঘ্র অস্থির হইয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। মাটিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল। বৃদ্ধ হইলে কি হয়, পেটের কামড়ে সহস্র যুবা ব্যাঘ্রের বলে সে এখন লম্ফ ঝম্ফ করিতে লাগিল। ব্যথা যখন কিছুতেই নিবৃত্ত হইল না, তখন যে দিকে তাহার দুই চক্ষু গেল, সেই দিকে ঘোড়া-দৌড়ের অন্ধবেগে সে ছুটিয়া চলিল। ছোট ছোট গ্যাং লাফ দিয়া ও বড় বড় গাং সাঁতার দিয়া পার হইতে লাগিল ক্রমাগত দৌড়িতে লাগিল। হাঁ করিয়া দৌড়িতেছিল, সেজন্য পেটের ভিতর বসিয়া আমি কতক কতক দেখিতে পাইতেছিলাম। বন পার হইল, নদী নালা খাল বিল অনেক পার হইয়া গেল। পেটের কামড়ে সমস্ত রাত্রি দৌড়িল, সমস্ত দিন দৌড়িল, পুনরায় আর এক রাত্রি দৌড়িল। সুন্দরবনের এলাকা পার হইয়া গ্রামসমূহের নিকট মাঠ দিয়া ধাবিত হইল। অবশেষে দ্বিতীয় দিনের বেলা তিনটার সময় বমন করিতে আরম্ভ করিল। শৈশবকালে মাংস-অন্নপ্রাশনের সময় হইতে যত মহিষ হরিণ শূকর প্রভৃতি খাইয়াছিল, তাহাদের হাড়গোড় সমুদয় বমন করিয়া ফেলিল। উদ্‌গারের সহিত আমাকে সে বাহির করিয়া ফেলিল।

কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া আমার দিকে সে দুই একবার কট্‌মট্ করিয়া চাহিল। মনে মনে ভাবিল,—'এ লোকটাকে গিলিয়া ভাল কুকর্ম করিয়াছিলাম। যেমন রূপ—তেমনি গুণ, না আছে রস না আছে কষ! কালো চামড়া মোড়া কেবল খানকতক হাড়। এর চেয়ে যদি দশ মণ পাথুরে কয়লা গিলিতাম, তাহা হইলে কাজ হইত।'

এই প্রকার চিন্তা করিয়া ব্যাঘ্র দ্রুতবেগে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল। পশু! সে আমার রূপের মহিমা কি বুঝিবে?

লম্বোদর বলিলেন,—'তা সব হইল। কিন্তু একটা কথা তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করি। ব্যাঘ্রের পেটের ভিতর হইতে তোমার কর্মচারীর নিকট সে চিঠি তুমি কি করিয়া পাঠাইলে?

কিয়ৎক্ষণের জন্য নীরব থাকিয়া ডমরুধর উত্তর করিলেন,—'দেখ লম্বোদর! সকল কথার খোঁচ ধরিও না। এইমাত্র তোমাকে আমি বলিতে পারি যে, বাঘের পেটের ভিতর ডাকঘর নাই, সে স্থানে টিকিট বিক্রয় হয় না, সে স্থানে মনি-অর্ডার হয় না। তিরিক্ষি

মেজাজ ডাকবাবু সেখানে বসিয়া নাই।' পত্র প্রেরণের সমস্যা এইরূপে হেলায় মীমাংসা করিয়া ডমরুধর পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—বাঘের পেটে কয়দিন আমার উদরে অন্নজল যায় নাই। আমি অতিশয় দুর্বল হইয়াছিলাম। ব্যাঘ্র চলিয়া গেলে কিছুক্ষণের নিমিত্ত সেই স্থানে নির্জীব হইয়া পড়িয়া রহিলাম। তাহার পর আস্তে আস্তে উঠিয়া এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিলাম। নিকটে একখানি গ্রাম দেখিয়া তাহার ভিতর প্রবেশ করিলাম। গ্রামখানি ছোট, কেবল ইতরলোকের বাস। গ্রামবাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলাম যে, সে স্থান হইতে আমার আবাদ দূর, কেহ তাহার নামও জানে না। বরং আমার গ্রাম নিকট, সাত-আট ক্রোশ মাত্র। তপস্যা করিতে যখন আমি বনে গমন করি, তখন টাকা-কড়ি সঙ্গে লইয়া যাই নাই। সে নিমিত্ত নৌকা অথবা শালতি ভাড়া করিতে পারিলাম না। পদব্রজেই আমার গ্রাম অভিমুখে আমি চলিলাম।

আকাশভ্রমণে, অনাহারে, নানারূপ ভাবনা-চিন্তায় আমার পা আর উঠে না। তাহার পর বর্ষার শেষ। নদী-নালা জলে ও মাঠ-ঘাট কাদাকিচায় পরিপূর্ণ। বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। যাইতে যাইতে এক মাঠের মাঝখানে সন্ধ্যা হইয়া গেল। এখন কোথায় যাই। আর একটু আগে গিয়া মাঠের মাঝখানে নারিকেলপাতায় আচ্ছাদিত সামান্য একখানি চালা দেখিতে পাইলাম। সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। জনমানবকে সে নালায় দেখিতে পাইলাম না। প্রাঙ্গণে শসা গাছের এক মাচা ছিল। অনেকগুলি দুধে-শসা তাহা হইতে ঝুলিতেছিল। পেট ভরিয়া আমি সেই শসার আঁতি খাইলাম। কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া আমি চালার ভিতর প্রবেশ করিলাম। গোটাকতক মেটে হাঁড়ী ভিন্ন তাহার ভিতর আর কিছু দেখিতে পাইলাম না। চালার একপার্শ্বে ছেঁচা বাঁশ দিয়া গঠিত একটি তক্তপোষের মত ছিল। তাহার উপরে একটা ছেঁচা মাদুর ও ময়লা বালিশ ছিল। ঘোর ক্লান্তিতে কাতর হইয়া আমি তাহার উপর শুইয়া পড়িলাম।

সন্ধ্যা হইল। অন্ধকার হইল। সেই সময় কে একজন চালার ভিতর প্রবেশ করিল। দিয়াশলাই জ্বালাইয়া একটা কেরোসিনের ডিবে প্রজ্জ্বলিত করিল। তখন আমি দেখিলাম যে, সে একটা কালো স্ত্রীলোক। তাহার হাতে শাঁখা আছে, পায়ে প্রায় পাঁচ সের ওজনের বাঁকমল আছে। মাঝে মাঝে এ অঞ্চলে অনেক ধাঙ্গড় মজুরি করিতে আসে। আমি বুঝিলাম যে, স্ত্রীলোকটা ধাঙ্গড়ানী। প্রথম আমি একটু গলার সাড়া দিলাম। সে আমায় দিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার পর আমি উঠিয়া বসিলাম। তাহাকে বলিলাম যে,—বাঘের মুখ হইতে আমি অতি কষ্টে বাঁচিয়া সে স্থানে আসিয়াছি। আর পথ চলিতে পারি না। রাত্রিযাপনের নিমিত্ত তাহারা যদি একটু স্থান প্রদান করে, তাহা হইলে আমার বড় উপকার হয়।

সাধে কি এলোকেশীর মনে সর্বদা আমার প্রতি সন্দেহ! আমার গায়ের বর্ণটি কৃষ্ণঠাকুরের চেয়ে কালো। বাঘ মিথ্যাকথা বলে নাই—শরীরের ভিতর কেবল খানকতক হাড়। মাথার মাঝখানে কিন্তু এমন চকচকে টাক আর কার আছে? প্রকাণ্ড টাক। টাকের চারিদিকে পাকা চুল, মুখের দুই পার্শ্বে সাদা ফেকো। দাঁত একটিও নাই। তথাপি আমার

কিরূপ একটা শ্রীছাঁদ আছে, কিরূপ একটা লাবণ্য আছে যে, তাতে রাহুল ও ভুল হয়। আর মাগীগুলোও আমার গায়ে যেন ঢলিয়া পড়ে। অবাক হইয়া ধাঙ্গড় মাগী আমার টাক পানে চায়, আর মুচকে মুচকে হাসে। শেষে সে কেবল দুইটি কথা বলিল,—'মাঝি আসুক। তোমাদের যেমন 'বাবু' ইহাদের সেইরূপ সম্মানসূচক উপাধি 'মাঝি!'

কিছুক্ষণ পরে একটা হোঁৎকা মিনসে চালার ভিতর প্রবেশ করিল। তোমরা আমাকে কালো বল, কিন্তু তার রঙের তুলনায় আমি তো ফিট্ গৌরবর্ণ। সে আসিয়া যেই আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিল, আর বামহাতে আমার মাথা নোওয়াই দক্ষিণ হাতে আমার পিঠে বজ্রসম দুইটা কিল বসাইয়া দিল। গন্ধ পাইয়া আমি বুঝিলাম যে, ধাঙ্গড় মদ খাইয়াছিল।

তাহার পর বলিল,—'এতদিন পরে বেটাকে আজ ধরিয়াছি। ফাঁক পাইলেই আসে যায়, ধরিতে আর পারি না। আজ বেটাকে ধরিয়াছি ইয়ারকি দিতে জায়গা পাও না আমার ঘরে ইয়ারকি। হাড় গুঁড়া করিয়া ঐখানে আজ পুঁতিব!'

এই কথা বলিয়া সে পুনরায় আর দুইটা কিল মারিল।

আমি বলিলাম,—'আমি বিদেশী লোক। তোমার ঘরে আমি কখনও আসি নাই। আজ বিপদে পড়িয়া এ স্থানে আসিয়াছি।'

ধাঙ্গড় বলিল,—'বিদেশী লোক! গ্রীষ্মকালে মোড়লদের পুকুরে ফেটিজালে মাছ ধরিতেছিলে? মাঝিনীকে কে একরাশি চুনোমাছ দিয়াছিল? কেন দিয়াছিলে, কি আমি বুঝিতে পারি নাই?'

এই কথা বলিয়া আবার দুইটা কিল মারিল।

আমি বলিলাম,—আমি কখনও ফেটিজালে মাছ ধরি নাই। আমি ভদ্রলোক। মিছামিছি বিনা দোষে আমাকে মার কেন?

ধাঙ্গড় বলিল,—'ভদ্রলোক! ভদ্রলোকের ঐ রকম টাক হয়! ভদ্রলোকের ঐ রকম কিম্ভূত কিমাকার চেহারা হয়। আর মাঝিনীর পসন্দ; আমাকে পসন্দ হয় না, তোকে পসন্দ।'

এই কথা বলিযা সে পুনরায় আরও দুইটা কিল মারিল।'

আমি দেখিলাম যে, কথা কহিলেই দুইটা করিয়া কিল খাইতে হয়। তাহার পর, দারুণ প্রহার বরং সহ্য হয় কিন্তু সে যে আমাকে কুৎসিত বলিল, সে কথা আমার প্রাণে সহ্য হইল না। আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

কিন্তু নীরব থাকিয়াও নিস্তার পাইলাম না। সে আমাকে উত্তমমধ্যম অধম বিলক্ষণ প্রহার করিল; তাহার পর আমার কাপড়-চোপড় কাড়িয়া লইয়া উলঙ্গ করিয়া গলা টিপিয়া সে স্থান হইতে বাহির করিয়া দিল। কেবলমাত্র প্রাণে সে আমাকে মারিল না। আমি উঠিতে পড়িতে উঠিতে পড়িতে মাঠের আল দিয়া চলিলাম। অতি ক্লেশে বহুদূর একখানি গ্রামের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম। এক তো রাত্রি হইয়াছে, তাহার পর উলঙ্গ, এ অবস্থায় সে গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিলাম না। মনে করিলাম যে প্রাতঃকালে কাহারাও নিকট হইতে

একখানি ছেঁড়া-খোঁড়া গামছা চাহিয়া লইব। সেইখানি পরিয়া আপনার গ্রামে যাইব।

নিকটে একটি বাগান দেখিতে পাইলাম। নারিকেল গাছ-বেষ্টিত শান-বাঁধা ঘাট-বিশিষ্ট তাহার ভিতর একটি পুষ্করিণী ছিল। দারুণ প্রহারে শরীর আমার বিষম কোনা হইয়াছিল। ঘাটের চাতালে আমি শয়ন করিলাম। ঘোর ক্লেশে নিদারুণ প্রহারে শরীর আর আমার কিছু ছিল না। অল্পক্ষণ পরেই আমি নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম। এখন রাত্রি অবসান হইয়াছিল তাহা আমি জানিতে পারি নাই। সহসা 'ভূত! ভূত!' চীৎকার শুনিয়া আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। আমি চাহিয়া দেখিলাম যে, প্রাতঃকাল হইয়াছে; সূর্য্য উদয় হইয়াছে? অন্যদিকে চাহিয়া দেখিলাম যে, জনকয়েক স্ত্রীলোক সেই পুষ্করিণীতে জল লইতে আসিয়াছিল। সেই উলঙ্গ অবস্থায় আমাকে দেখিয়া 'ভূত! ভূত!' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে পলায়ন করিতেছে। তাহাদের কোমর হইতে কলসী পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। কিছুদূর মাঠ হইতে কয়েক জন পুরুষমানুষ 'কি হইয়াছে, কি হইয়াছে' বলিয়া দৌড়িয়া আসিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ — ডমরুধরের মেষের পোষাক

আমি ভাবিলাম, আবার বা প্রহার খাইতে হয়। সেই ভয়ে আমি রুদ্ধশ্বাসে দৌড়িলাম। 'ঐ যাইতেছে, ঐ যাইতেছে' বলিয়া কেহ কেহ আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। কিছুদূরে গিয়া আমি আর দৌড়িতে পারিলাম না। এক স্থানে নিবিড় ভেরাণ্ডার বেড়া ছিল। তাহার ভিতর প্রবেশ করিয়া আমি লুক্কায়িত রহিলাম। আমায় আর দেখিতে না পাইয়া তাহারা ফিরিয়া গেল। যাইতে যাইতে একজন বলিল,—'ভূত কি কখন ধরা যায়? ভূত হাওয়া। এতক্ষণ কোন কালে বাতাসের সহিত মিশিয়া গিয়াছে।'

বেড়ার পার্শ্বে আমি বসিয়া হাঁপাইতেছিলাম; কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিলাম। এদিক্ ওদিক চাহিয়া দেখিলাম যে, বেড়ার বাহিরে ছোট একটি তাঁবু রহিয়াছে। তাহার ভিতরে ও বাহিরে জন দুই পুরুষ ও ঘাগরা-পরা তিনজন স্ত্রীলোক রহিয়াছে! নিকটে চার পাঁচটি বালক-বালিকা খেলা করিতেছে। একটু দূরে সম্মুখের পা বাঁধা কটা টাটু ঘোড়া চরিতেছে। যাহাদিগকে বেদিয়া বা হা-ঘোরে কঞ্জড় বলে, আমি বুঝিলাম যে, ইহারা সেই জাতি। ইহাদের ঘর-দ্বার নাই। আজ এখানে কাল সেখানে গিয়া ইহারা জীবনযাপন করে। ভিক্ষা করিয়া চুরি করিয়া অথবা জরী বটি বেচিয়া ইহারা দিনপাত করে। ইহারা খোটা কথা বলে। বাজারে তুমি একশত টাকায়ও রামচন্দ্রি অথবা আকবরি মোহর কিনিতে পাইবে না। কিন্তু ইহাদের নিকট দুই তিন টাকায় পাওয়া যায়। সে মোহর পূজা করিলে ঘরে মা লক্ষ্মী আচলা-অটলা বিরাজ করেন। স্ত্রীলোকে রন্ধন করিতেছিল। বেলা দশটার সময়ে সকলে আহার করিয়া গ্রাম অভিমুখে চলিয়া গেল। ঘরে কেবল এক বুড়ি রহিল। বাহিরে বসিয়া বুড়ি আপনার মনে চুবড়ী বুনিতে লাগিল। যাইবার পূর্বে এক স্ত্রীলোক তাহার কন্যার ছোট একটি সালুর ঘাঘরা শুষ্ক হইবার নিমিত্ত আমার নিকটে ভেরাণ্ডা গাছে ঝুলাইয়া দিল।

সকলে চলিয়া গেলে সেই ঘাগরার দিকে আমার দৃষ্টি পড়িল। খুপ করিয়া ঘাগরাটি

বেড়ার ভিতর টানিয়া লইলাম। ঘাগরাটি চুরি করিয়া আমি পরিধান করিলাম। আমার হাঁটু পর্যন্ত হইল। তাহার পর অন্যদিক দিয়া চুপে চুপে বেড়ার ভিতর হইতে বাহির হইয়া আমি পলায়ন করিলাম। আমার গ্রাম কোন দিকে, দিনের বেলা এখন অনেকটা বুঝিয়াছিলাম। হন্ হন্ করিয়া সেই দিকে চলিতে লাগিলাম। কিন্তু শরীর দুর্বল, তাহার উপর প্রহারের বেদনা; অধিক দ্রুতবেগে যাইতে পারিলাম না। লাল ঘাগরা পরিয়া আমাকে মন্দ দেখায় নাই। যাহার শ্রী আছে, সে যা পরিধান করুক না কেন তাহাতেই তাকে ভাল দেখায়। যাহারা বাঁদর খেলায়, তাহাদের সহিত যেরূপ লাল ঘাগরা পরা একটা বাঁদরের মেম থাকে, আমাকেও সেইরূপ মেমের মত দেখাইল। আমার গায়ের রং একটু কালো, কেবল এই প্রভেদ। আমাকে ভাল দেখাইলে কি হয়, এরূপ মেম সাজিয়া পাঁচজনের সম্মুখে বাহির হইতে লজ্জা করে। সে জন্য আমি কোন গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিলাম না। সেজন্য লোক দেখিলে তাহাদিগকে দূরে রাখিয়া আমি পথ চলিতে লাগিলাম। এই কারণে ক্রমে পৌঁছিতে আমার অনেক বিলম্ব হইল। বেলা প্রায় পাঁচটার সময় আমাদের গ্রামের নিকট মাঠে আসিয়া আমি উপস্থিত হইলাম।

আমি ভাবিলাম এ বেশে দিনের বেলা গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিব না। পাঁচজনে দেখিলে হাসিবে। দুর্লভী বাগ্দিনীতে তোমরা সকলেই জান। মন্দ নয়—না? যাহার জন্য ও বৎসর গৃহিণী আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন? তাহার মেটে ঘরটি গ্রামের শেষে এককোণে। আমি মনে করিলাম কিছুক্ষণ তাহার ঘরে গিয়া বসিয়া থাকি। তাহার পর সন্ধ্যার সময় গা-ঢাকা অন্ধকার হইলে আস্তে আস্তে বাটী যাইব, এইরূপ মনে করিয়া চুপে চুপে তাহার ঘরে আমি প্রবেশ করিলাম, প্রথম সে আঁউমাউ করিয়া উঠিল। আমি তাহাকে বলিলাম,—'ভয় নাই! চুপ কর, বড় বিপদে পড়িয়া তোর ঘরে আসিয়াছি। গোল করিসনে। পূজার সময় তোকে একখানা কাপড় দিব।'

আমি ভাবিয়াছিলাম, কেহ আমাকে দেখিতে পায় নাই; কিন্তু তা নয়। পরীক্ষিৎ ঘোষের কেষ্টা নামে সেই দুষ্ট এঁচোড় পাকা ছেলেটা আমাকে দেখিতে পাইয়াছিল। পরীক্ষিৎ ঘোষ আমার নিকট হইতে দশ টাকা ধার লইয়াছিল। দেড়শত টাকা সুদ দিয়াছিল তাহার পর যখন সে আসল পরিশোধ করিল, তখন তাহাকে হাতে রাখিবার নিমিত্ত খতখানি ফিরিয়া দিলাম না। তাহার বিপক্ষে আদালতে একবার মিথ্যা সাক্ষ্যও দিয়াছিলাম। মোকদ্দামায় মিথ্যা বলিতে দোষ নাই। সেই অবধি আমার উপর তাহার আক্রোশ। তাহার ছেলেটাও পথে-ঘাটে আমাকে দেখিতে পাইলে দূর হইতে ক্ষেপায়, সে বলে—'টাকচাঁদ, টাক-বাহাদুর, টাক টাক টাকেশ্বর—ডুরু ডুরু ডুরু।' ডুরু ডুরু মানে ডমরু। আমার নামটা ছোড়া সংক্ষেপ করিয়াছে।

পরীক্ষিৎ ঘোষের কাছে তাহার ছেলের দৌরাত্মের বিষয় একবার আমি নালিশ করিয়াছিলাম। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,—'কেষ্টা কি আপনার দিকে চাহিয়া ও সব কথা বলে?

ছোঁড়া কি করে, মনে মনে চিন্তা করিয়া আমি উত্তর করিলাম,—'না। সে আমার দিকে চাহিয়া বলে, কখনও বা গাছপালার দিকে চাহিয়া বলে, কখন বা আকাশপানে দুইটা পা করিয়া মাটীর দিকে মুখ করিয়া দুই হাতের উপর ভর দিয়া চলিতে চলিতে ঐ সব কথা বলে।'

পরীক্ষিৎ ঘোষ বলিল,—'তবে?'

সে 'তবে'র আমি আর উত্তর দিতে পারিলাম না।

কেষ্টা তাড়াতাড়ি গিয়া আপনার বাপকে সংবাদ দিল। আমি তা জানিতাম না। পরীক্ষিৎ ঘোষ আসিয়া দুর্লভীর ঘরের দ্বারে শিকল দিয়া দিল দুর্লভীকে আর আমাকে ঘরের ভিতর বন্ধ করিয়া রাখিল। তাহার পর পাড়ার লোককে সংবাদ দিল। দুর্লভীর ঘরে আমাকে দেখিবার নিমিত্ত মেয়ে-পুরুষ ছেলে বুড়ো সুদ্ধ লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল।

জাহ্নবী সাঁই বলিলেন,—'আমিও দেখিতে গিয়াছিলাম।' – গণপতি ভড় বলিলেন,—'আমিও গিয়াছিলাম!' – পুঁটীরাম চাকী বলিলেন,—'আমিও গিয়াছিলাম।'

লম্বোদর বলিলেন,—'আমি তখন বাড়ী ছিলাম না। বাড়ী থাকিলে আমিও যাইতাম।'

ক্রুদ্ধ হইয়া ডমরুধর বলিলেন,—'যাইতে বই কি। তুমি না গেলে কি চলে?'

দুর্লভীর ঘরের সম্মুখ দিকে দুইপার্শ্বে দুইটি ছোট ছোট জানালা আছে। ঘরের পশ্চাৎ দিকের প্রাচীরেও সেইরূপ ছোট জানালা আছে। সম্মুখ দিকের দুইটি জানালা দিয়া লোক সব উঁকি মারিয়া আমাকে দেখিতে লাগিল। সে দুইটি জানালায় ভিড় করিয়া লোকে ঠেলাঠেলি করিতে লাগিল। কেষ্টার বন্ধু জন পাঁচ ছয় ছোঁড়া চালে উঠিয়া খড় ফাঁক করিয়া উপর হইতে উঁকি মারিয়া আমাকে দেখিতে লাগিল। পশ্চাৎ দিকের জানালাটা কিছু উচ্চ ছিল। মাটীতে দাঁড়াইয়া তাহা দিয়া দেখিতে পারা যায় না। কেষ্টা ছোঁড়ার একবার বয়মায়েসি শুন। কোথা হইতে একটা টুল চাহিয়া আনিল। লোককে সেই টুলের উপর দাঁড় করাইয়া ঘরের ভিতর আমাকে ও দুর্লভীকে দেখাইতে লাগিল।

পুঁটিরাম চাকী বলিলেন,—'অমনি দেখায় নি। এক পয়সা করিয়া টুলের ভাড়া লইয়াছিল। দেখিতে আমার একটু বিলম্ব হইয়াছিল বলিয়া আমার নিকট হইতে সে চারি পয়সা লইয়াছিল।

আধকড়ি ঢাক বলিলেন,—'চারি পয়সা! আমাকে সাত পয়সা দিতে হইয়াছিল।'

ডমরুধর মুখ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন,– 'কি দেখিবার জন্য পয়সা খরচ করিয়াছিলেন? আমাকে কি তোমরা কখনও দেখ নাই? আমি কি আলিপুরের বাগানের সিঙ্গি না বাঘ না কি, যে আমাকে দেখিবার জন্য তোমাদের এত হুড়াহুড়ি?'

সপ্তম পরিচ্ছেদ – এলোকেশী মুড়ো খেঙরা

দেখিতে দেখিতে কে একজন বলিয়া বসিল,—'এলোকেশী ঠাকুরাণীকে সংবাদ দাও। তিনি আসিয়া কর্ত্তাটিকে একবার দেখুন।'

তখন আমার হৃৎকম্প হইল। একে তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী। তাহার উগ্রচণ্ডা—সর্বদা রণমূর্ত্তি। আবার তাহার উপর আমি এক কন্দর্প পুরুষ। সর্বদাই এলোকেশীর সন্দেহ। এ অবস্থায় আমাকে দেখিলে এলোকেশীর যে আমার কি হাল করিবেন, তা ভাবিয়া আকুল হইলাম। —সেই হতভাগা ছোঁড়া কেষ্টা বলিতে না-বলিতে আমার বাড়ীতে সংবাদ দিল। এলোকেশীর গায়ের রং আমা অপেক্ষা কালো। রাগে এখন তাঁহার মুখটি অনেক দিনের ভূষোপড়া ধানসিদ্ধ হাঁড়ীর ন্যায় হইল। ভীম যেরূপ ঘণ্টাওয়ালা লোহার গদা লইয়া দ্বৈপায়ন হ্রদের ধারে দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন, এলোকেশীরও সেই রূপ মুড়ো খেঙরা লইয়া দুর্লভীর ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এলোকেশীকে দেখিয়া লোকে পথ ছাড়িয়া দিল। দ্বারের শিকল খুলিয়া তিনি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন! তাহার পর—বলিব কি ভাই, আর দুঃখের কথা। 'পোড়ার মুখো বুড়ো ডেকরা! রঃ! আজি তোর ভূত ছাড়াইব'—এই কথা বলিয়া আমার মাথার টাক হইতে পায়ের আঙ্গুল পর্যন্ত সেই মুড়ো খেঙরা দিয়া ঝাড়াইতে লাগিলেন। এলোকেশীর নব্য বয়স; ধাঙ্গড়ের কিল বা কি? এলোকেশীর এক এক ঘা খেঙরা ভীমের গদার ন্যায় আমার গায়ে পড়িতে লাগিল। আমি যত বলি—আর নয়! আর নয়! যথেষ্ট হইয়াছে,—ততই খেঙরার প্রহারে আমার পিঠ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। মাথার টাকে ও পিঠে সেই মুড়ো খেঙরার অনেক কাঠি ফুটিয়া গেল।

কেষ্টাকে মন্দ বলি, কিন্তু এই দুঃসময়ে আমার বন্ধু হইল। আমার নাকাল দেখিয়া আমোদে আটখানা হইয়া সে ও তাহার সঙ্গিগণ হাততালি দিয়া নাচিতে নাচিতে বলিতে লাগিল,—'ট্যাক-চাঁদ, টাক-বাহাদুর, টাক টাক টাকেশ্বর ডুরু ডুরু ডুরু।'

তখন এলোকেশী আমাকে ছাড়িয়া—'তবে রে আঁটকুড়ীর বেটারা।' বলিয়া তাহাদের মারিতে দৌড়িলেন। আমি অব্যাহতি পাইলাম, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে নয়। দুর্লভী তখন আপনার খেঙরা লইয়া আমাকে বলিল,—'তুই যেমন ঠাকুর তোর তেমনি করিয়াছেন। আমার মন ভুলাইতে রাঙা ঘাঙরা পড়িয়া সাজ-গোজ করিয়া আসা হইয়াছে; এখন আমি একবার ঝাড়াই।' এইকথা বলিয়া সেও ঘা-কত আমার পিঠে বসাইয়া দিল।

কত কিল কত খেঙরা আর সহ্য করিব। আমার পিঠ তো আর পাথরের নয়। আমি সে স্থান হইতে পলায়ন করিলাম। দুর্লভীর ঘর হইতে যখন বাহির হই তখন এলোকেশী বলিলেন,—'এখনও হইয়াছে কি। চল ঘরে চল। আজ তোর আমি হাড়ীর হাল করিব। খেঙরার চোটে তোর ভূত ছাড়াইব।'

সেই ভয়ে আমি বাড়ী যাইলাম না। আমার খিড়কির বাগানে একগাছে ঠেস দিয়া বিরস বদনে বসিয়া রহিলাম। বসিয়া বসিয়া মা ভগবতীকে ডাকিতে লাগিলাম। আমি বলিলাম,—'মা! আমি তোমার ভক্ত, দুর্গোৎসব আসিতেছে মা! আমি তোমার পূজা তুমি দেখিয়াছ, আমার দালানে তোমার প্রতিমা গড়া হইতেছে। তবে কেন মা

সন্ধ্যা হইল, ক্রমে রাত্রি হইল। বাড়ী যাইতে আমার সাহস হইল না, গাছে ঠেস দিয়া বসিয়া রহিলাম মাঝে মাঝে একটু একটু তন্দ্রা আসে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ ভাঙ্গিয়া যায়! স্বপ্ন দেখি যে, এলোকেশী বুঝি শূর্পণখার বেশ ধরিয়া আমার নাক কাটিতে আসিতেছেন। অথবা তাড়কা রাক্ষসী হইয়া আমাকে চর্বণ করিতেছেন। প্রহারে শরীর জ্বর জ্বর হইয়াছিল। শেষ রাত্রিতে আর বসিয়া থাকিতে পারিলান না। ভিজা মাটীর উপরেই শুইয়া পড়িলাম। একটু নিদ্রা আসিয়াছে, এমন সময় কে যেন আমাকে ডাকিলেন,—'ডমরুধর! বাছা ডমরুধর!'

অষ্টম পরিচ্ছেদ — অমৃত কুণ্ডের জল

চমকিত হইয়া আমি উঠিয়া বসিলাম। চক্ষু মুছিতে দেখিলাম যে,—স্বয়ং মা দুর্গা একখানি চৌকীর উপর আমার সম্মুখে বসিয়া আছেন। এ তোমার দশ-হেতে হরিতাল রঙে গর্জন তৈলে ব্যাড়বেড়ে রাঙতা-পরা দুর্গা নয়। এ কৈলাস পর্বতের আসল মা দুর্গা; সুন্দর পরিচ্ছদে ও বহুমূল্য রত্ন-আভরণে ভূষিত করিয়া কুবের ইহাকে আমার নিকট পাঠাইয়াছেন।

জোড়হাতে মায়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমি স্তবস্তুতি করিতে লাগিলাম। মা বলিলেন,—'ডমরুধর! তুমি অপরাধ করিয়াছ। যে মন্ত্র তোমাকে আমি শিক্ষা দিয়াছিলাম, তাহা ভুলিয়া ও কি উদ্ভট সব কথা বলিয়াছিলে? 'জিলেট জিলেকি সিলেমেল্ কিলেকিট কিলেকিশ' কি বাছা? এরূপ মন্ত্র বেদে কোরানে বাইবেলে কোন স্থানে আমি দেখি নাই। পিড়িং পিড়িং দুম বলিলেও একদিক কথা থাকিত। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তোমার এত দুর্গতি হইয়াছে। যাহা হউক, তোমাকে আমি ক্ষমা করিয়াছি। এক্ষণে হাঁ কর।'

আমি হাঁ করিলাম! দেবী আমার মুখে একটু অমৃত কুণ্ডের জল ঢালিয়া দিলেন। তাহাতে আমার সর্বশরীরের ব্যথা দূর হইল। যেন নূতন জীবন নূতন শরীর আমি প্রাপ্ত হইলাম। তাহার পর মা আমাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন,—'যাও বাছা। এখন ঘরে যাও। এলোকেশী আর তোমাকে কিছু বলিবে না।'এই কথা বলিয়া মা অন্তর্ধান হইলেন। আমি বাড়ী আসিলাম। মায়ের বরে এলোকেশীর প্রসন্ন বদন দেখিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলাম। —ডমরুধারীর গল্প শুনিয়া সকলে চমৎকৃত হইলেন। পুরোহিত বলিলেন,—'ধন্য ডমরুধর! তুমি ধন্য!'গণপতি ভড় বলিলেন,—'ডমরুকি বিপদেই না পড়িয়াছিলেন।' পুঁটিরাম চাকী বলিলেন,—'কেবল পুণ্যবলে ডমরুধর রক্ষা পাইয়াছেন।'

আধকড়ি ঢাক বলিলেন,—'চমৎকার গল্প।' লম্বোদর বলিলেন,—'অতি চমৎকার! বন্ধুদিগের পুস্তক সমালোচনা করিবার সময় কোন লোক লেখক যেরূপ প্রেমে মজিয়া রসে ভিজিয়া ভাবে গেঁজিয়া বলেন,—মরি মরি। আহা মরি। এও সেই আহা মরি।'রক্ত কটাক্ষে ডমরুধর একবার লম্বোদরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। কিন্তু কোন উত্তর করিলেন না।

অবশেষে ডমরুধর বলিলেন,—'পীর গোরাচাঁদের ব্যাঘ্রের উদরে যখন ছিলাম, তখন মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম যে, এ বিপদ হইতে মা যদি আমাকে পরিত্রাণ করেন, তাহা

হইলে মাকে আমি ব্যাঘ্রবাহিনীরূপে পূজা করিব। আমার আদেশে সেই জন্য কারিগর সিংহ স্থানে ব্যাঘ্র গড়িয়াছে। —লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তুমি যে গল্পটি করিলে, কি করিয়া জানিব যে, তাহা সত্য?'

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—'এই আমার পায়ে এখনও রাহুর কামড়ের দাগ রহিয়াছে।' সত্য সত্যই ডমরুধরের পায়ে একটা দাগ আছে, তা দেখিয়া সকলে অবাক!

তখন লম্বোদর বলিলেন,—জিলেট জিলোক সিলেমেল কিলেকিট কিলেকিশ।

পঞ্চম গল্প

প্রথম পরিচ্ছেদ — স্বদেশী-কোম্পানী

ডমরুধরের প্রথম উপাখ্যানে চিত্রগুপ্ত, যম, যমনী, পুঁইশাক, এলোকেশী, এলোকেশীর মাতা প্রভৃতির বিষয় বর্ণিত হইয়াছিল। এলোকেশী ডমরুধরের তৃতীয় পক্ষের পত্নী। সেই উপাখ্যান পাঠের ফল এইরূপ,—

'ডমরুচরিত পড় রে ভাই ক'রে একান্ত ভক্তি।
ইহকালে পাবে সুখ পরকালে মুক্তি।।
চিত্রগুপ্তের গলায় দড়ি যমনী বাজায় শাঁক।
পুঁইশাকের নামে যমের সিঁটকে উঠলো নাক।।
ঝক মক করে সোনার গহনা এলোকেশীব গায়!
আড়নয়নে শাশুড়ী ঠাকরুন পিটির পিটির চায়।।
পয়সা দিয়া ডমরুচরিত কিনে রাখ ঘরে।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ পাবে ইহার বরে।।'

বর্তমান ডমরু উপাখ্যানের ফলও সেইরূপ, বরং অধিক।

প্রতিবৎসর পূজার সময় ডমরুধর বন্ধুবান্ধবের সহিত নানারূপ গল্প করেন। পঞ্চমীর দিন বৈকালে তাঁহার পূজার দালানে লম্বোদর, গজানন, হলধর প্রভৃতি বন্ধুবান্ধবের সহিত প্রতিমার নিকট তিনি বসিয়া আছেন। ডমরুধরের মুখের দিকে চাহিয়া লম্বোদর বলিলেন,—'একবার পুনরায় স্বদেশী কোম্পানী খুলিয়া তুমি অনেকগুলি টাকা উপার্জন করিয়াছ।'

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—'হাঁ ভাই! স্বদেশী কোম্পানী বৃথা যায় না। কিছু না কিছু দিয়া যায়। কিন্তু ভাই, সম্প্রতি আমি এক ঘোর বিপদে পড়িয়াছিলাম। সে বিপদ হইতে মা দুর্গা আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। আমার প্রতি মায়ের অসীম কৃপা। বলিতে গেলে আমি মা দুর্গার বরপুত্র।' —লম্বোদর বলিলেন,—'সে-বার স্বদেশী কোম্পানী খুলিয়া তুমি অনেক বাড়ী ভুঁড়ি গরীব দুঃখীর টাকা হাম করিয়াছিলে। একবার মোকদ্দমা হইয়াছিল জানি। কি হইয়াছিল বল দেখি!'

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—'মোকদ্দমা স্বদেশী কোম্পানীর প্রধান অঙ্গ। স্বদেশী

কোম্পানী খুলিলে সকলকেই মামলা-মোকদ্দমা করিতে হয়। যাহা হউক, এখন সব চুকিয়া গিয়াছে। এই নূতন স্বদেশী কোম্পানীর বৃত্তান্ত এখন আমি তোমাদিগকে বলিতে পারি, শুন।'

ডমরুধর এইরূপ বলিতে লাগিলেন,—

গত বৎসর পূজার পর একদিন বেলা দশটার সময় আমি বাহিরে বসিয়া আছি, এমন সময় ব্যাগ হাতে করিয়া এক ছোকরা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার বয়স চব্বিশ কি পঁচিশ বৎসর। রং অল্প গৌরবর্ণ। কালো গোঁপ আছে। দেখিতে সুশ্রী। ভদ্রলোকের ছেলে বলিয়া বোধ হইল।

ব্যাগ হইতে চারিটি শিশি সে বাহির করিয়া বলিল,—'এইটি ম্যালেরিয়া জ্বরের আরক, এইটি অজীর্ণ বোগের ঔষধ, এইটি বহুমূত্র রোগের ব্রহ্মাস্ত্র; আর এইটি মুখে মাখিলে রং ফরসা হয়। প্রতি শিশির মূল্য একটাকা আমাকে প্রদান করুন।'

আমি বলিলাম,—ঔষধে আমার প্রয়োজন নাই। তুমি বোকা লোকদিগের নিকট গমন কর। তোমার একটিও ঔষধ আমি ক্রয় করিব না।

আমার কথা শুনিয়া সে চলিয়া গেল না। অতি সুমিষ্ট স্বরে সে ঔষধের গুণ ব্যাখ্যা করিতে লাগিল। সে বলিল,—'আমি তিনটা পাস দিয়াছি। যে বিদ্যা শিখিলে নানা পদার্থ মিশাইয়া উত্তম উত্তম নূতন বস্তু প্রস্তুত করিতে পারা যায়, আমি সেই বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছি। সেই বিদ্যাবলে আমি এইসব ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছি! ইহাদের গুণ অলৌকিক। দিন কয়েক ব্যবহার করিলেই আপনার শরীরে কান্তি ফুটিয়া পড়িবে। আপনি নব-যৌবন প্রাপ্ত হইবেন।'

উত্তর করিলাম,—'আমার ম্যালেরিয়া জ্বর নাই, অজীর্ণ ও বহুমূত্র রোগ নাই। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, রং ফরসা হইবার সাধ নাই। তাহা ব্যতীত আমি বৃথা একটি পয়সাও খরচ করি না। তোমার ঔষধ আমি ক্রয় করিব না।'

আমাদের দুইজনে এইরূপ তর্ক-বিতর্ক হইতে লাগিল। কিন্তু সে ছোকরা নাছোড়বন্দা। এমনি সুমিষ্ট ভাষায় সে বক্তৃতা করিতে লাগিল যে, ক্রমে আমার মন ভিজিয়া আসিল। অবশেষে সে বলিল,—'আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন সত্য, কিন্তু মন আপনার বৃদ্ধ হয় নাই। মনটি আপনার নবযৌবনে ঢল ঢল করিতেছে। আর কোন ঔষধ লউন আর নাই লউন, আপনাকে এই রং ফরসা হইবার ঔষধটি লইতে হইবে। দিনকতক মুখে মাখিয়া দেখুন। আপনি ফুট গৌরবর্ণ হইয়া পড়িবেন। সুন্দর সুকুমার কুড়ি বৎসরের যুবক হইবেন।'

ছোটবেলা হইতে ফরসা হইবার আমার সাধ ছিল। অনেক সাবাং মাখিয়াছিলাম। কিছুতে কিছু হয় নাই। মনে মনে ভাবিলাম,—'এই ঔষধটা পরীক্ষা করিয়া দেখি না কেন? যদি আমার রং ফরসা হয়, তাহা দুর্লভী বাগদিনী আমার রূপ দেখিয়া মোহিত হইবে।'

শিশির মূল্য একটাকা কিন্তু সে আমাকে আট আনায় দিল। মূল্য লইয়া সে কিছুদূর গিয়াছে' এমন সময় আমার মনে এইরূপ চিন্তার উদয় হইল। —'আমি ডমরুধর! সুমিষ্ট

বক্তৃতা করিয়া আমাকে ঠকাইয়া এ আট আনা লইয়া গেল। এ সামান্য ছোকরা নয়। ইহা দ্বারা কি কোনরূপ কাজ করিতে পারা যায় না?'

এইরূপ ভাবিয়া আমি তাহাকে ডাকিলাম। আদর করিয়া আমার নিকট বসাইলাম। আমি বলিলাম,—'বাপু! তোমার নাম কি?'

সে উত্তর করিল,—'আমার নাম শঙ্কর ঘোষ।'

তাহার বাড়ী কোথায়, সে কি কাজ করে, প্রভৃতি তাহার পরিচয় গ্রহণ করিলাম,—'তুমি তিনটা পাস দিয়াছ। পাঁচ দ্রব্য মিশাইয়া নূতন বস্তু প্রস্তুত করিতে পার। ঔষধ বেচিয়া কি হইবে? কোন একটা লাভের বস্তু প্রস্তুত করিতে পার না?'

কিছুক্ষণ নীরবে সে চিন্তা করিয়া আমাকে বলিল,—'কল্য আসিয়া আপনার এ কথার উত্তর দিব।'

পরদিন সে ধবধবে চিক্কণ কাগজ আনিয়া আমাকে দেখাইল। সে বলিল,—'এঁটেল মাটী হইতে আমি এই কাগজ প্রস্তুত করিয়াছি। এক টাকার এঁটেল মাটী হইতে দশ দশ টাকার কাগজ হইবে। নয় টাকা লাভ থাকিবে। প্রথম প্রথম যাহা অল্প খরচ হইবে, তাহা যদি আপনি প্রদান করেন তাহা হইলে আমরা এক স্বদেশী কোম্পানী খুলিব। লাভ অর্ধেক আপনার অর্ধেক আমার।'

এঁটেল মাটী ও কাগজ দেখিয়া আমি মনে মনে একটু হাসলাম। স্বদেশী কোম্পানী সম্বন্ধে আমার একটু অভিজ্ঞতা আছে। ভাবিলাম যে এ কাজ হালাগুলো বাঙ্গালীর উপযুক্ত বটে। তাহার প্রস্তাবে আমি সম্মত হইলাম।

চারি পাঁচ দিন পরে আমরা দুইজনে কলিকাতা গমন করিলাম। ভালরূপ একটা স্বদেশী কোম্পানী খুলিতে হইলে দুই-চারিজন বড়লোকের নাম আবশ্যক। আমরা তাহার যোগাড় করিলাম। একটি মিটিং হইল। এঁটেল মাটি ও কাগজের নমুনা দেখিয়া বড়লোকেরা ঘোরতর আশ্চর্য হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেবল একজন বলিলেন,—'এঁটেল মাটী দিয়া কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে, তাহা আমি জানিতাম না। আমি মনে করিতাম যে, খড়িমাটী দিয়া কাগজ প্রস্তুত হয়।'

শঙ্কর ঘোষ উত্তর করিলেন—'খড়িমাটী দিয়া হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে খরচ অধিক পড়ে।'

কাগজ সম্বন্ধে ইঁহার এইরূপ গভীর জ্ঞান দেখিয়া অন্য সকলে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

সেই যাঁহারা ইংরেজীতে বক্তৃতা করেন, যাঁহাদের বক্তৃতা শুনিয়া স্কুল-কলেজের ছোঁড়াগুলো আনন্দে হাততালি দিয়া গগন ফাটাইয়া দেয়, আমরা সেইরূপ দুইজন বক্তার যোগাড় করিয়াছিলাম। তাঁহারা ইজের দিয়া কোমর আঁটিয়া রাখেন। তাঁহাদের একজন বক্তৃতা করিলেন—

আমাদের কোম্পানীর নাম হইল,—'গ্র্যাণ্ড স্বদেশী কোম্পানী লিমিটেড।' কয়েকজন

বড়লোক ও উগ্র বক্তা ডাইরেক্টর বা পরিচালক হইলেন। কারণ, এই সকল বড়লোক ও বক্তারা সকল প্রকার কারুকার্য ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে ধুরন্ধর। ইঁহারা নাম জানেন না, এমন বিষয় নাই। শঙ্কর ঘোষ ইংরাজী ও বাঙ্গলায় কোম্পানীর বিবরণ প্রদান করিয়া কাগজ ছাপাইলেন ও সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রচার করিলেন। বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল, যে ব্যক্তি একশত টাকার শেয়ার বা অংশ কিনিবে, প্রতিমাসে লাভস্বরূপ তাহাকে পঁচিশ টাকা প্রদান করা হইবে।

দেশে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। সকলে বলিতে লাগিল যে, আর আমাদের ভাবনা নাই। যখন এঁটেল মাটী হইতে কাগজ প্রস্তুত হইবে, তখন বালী হইতে কাপড় হইবে। বিদেশ হইতে কোন দ্রব্য আর আমাদিগকে আমদানি করিতে হইবে না। দেশ টাকায় পূর্ণ হইয়া যাইবে। এই কথা বলিয়া কলিকাতায় বাঙ্গালীরা একদিন সন্ধ্যাবেলা আপন আপন ঘর আলোকমালায় আলোকিত করিল।

প্রথম প্রথম শত শত লোক শেয়ার কিনিতে লাগিল। হুড় হুড় করিয়া টাকা আসিতে লাগিল। আমি কোষাধ্যক্ষ ছিলাম। টাকা সব আমার কাছে আসিতে লাগিল।

কয়েক মাস গত হইয়া গেল। এঁটেল মাটী দিয়া শঙ্কর ঘোষ একখানিও কাগজ প্রস্তুত করিলেন না। মাসে যে পঁচিশ টাকা লাভ দিবার কথা ছিল, তাহার একটি পয়সাও কেহ পাইল না। আসল টাকার মুখও কেহ দেখিতে পাইল না। জনকয়েক আমাদের নামে নালিশ করিল। শঙ্কর ঘোষ চমৎকার এক হিসাবের বহি প্রস্তুত করিয়া কাছারিতে দাখিল করিলেন। লাভ দূরে থাকুক, হিসাবে লোকসান প্রদর্শিত হইল। কোম্পানী 'লিমিটেড' ছিল। মোকদ্দমা ফাঁস হইয়া গেল। আমাদের কাহারও গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগিল না।

অনেকগুলি টাকা লোকে দিয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, সে টাকাগুলি সমুদয় আমি লইলাম। শঙ্কর ঘোষ ভাগ চাহিল। আমি তাহাকে বুঝাইয়া বলিলাম,—'হিসাবের বহি তুমি নিজে হাতে প্রস্তুত করিয়াছ। তাহাতে তুমি লিখিয়াছ যে, লোকসান হইয়াছে। কোম্পানী ফেল হইয়া গিয়াছে। টাকা আর কোথা হইতে আসিবে। বরং যাহা লোকসান হইয়াছে, তাহা আমাকে দিয়া যাও।'

আমার কথা শুনিয়া শঙ্কর ঘোষ ঘোরতর রাগান্বিত হইল। 'তুমি আমাকে ফাঁকি দিলে; তোমাকে আমি দেখিয়া লইব,'—আমাকে এইরূপ ভয় দেখাইয়া সে চলিয়া গেল। আমার দ্বিতীয় কোম্পানীর বৃত্তান্ত এই।

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তুমি বলিলে যে সম্প্রতি বড় বিপদে পড়িয়াছিলে। আমরা পাড়ায় থাকি। কোন বিপদের কথা আমরা তো শুনি নাই।'

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—'সে বিপদের কথা আজ পর্যন্ত আমি কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই। আজ তাহা তোমাদিগকে বলিতেছি শুন।'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ – ভিকু ডাক্তার

ডমরুধর বলিতে লাগিলেন,—"ফাঁকতালে অনেকগুলি টাকা লাভ করিয়া মন আমার প্রফুল্ল হইল। শরীরটি নাদুস-নুদুস নধর হইয়া উঠিল। আমি মনে করিলাম দুর্লভীকে দেখাইয়া আসি। সেবার এই বাগ্‌দিনী সম্বন্ধে কি হইয়াছিল, তাহা তোমাদিগকে বলিয়াছি। সুন্দরবনের আবাদ হইতে আমি বাটী ফিরিয়া আসিতেছিলাম। পথে এক বেটা সাঁওতাল আমার কাপড় কাড়িয়া লইয়া আমাকে উলঙ্গ করিয়া ছাড়িয়া দিল। কোন স্থানে একদল বেদিয়া তাঁবু ফেলিয়াছিল। তাহাদের ছোট একটি লাল ঘাঘরা বেড়ায় শুকাইতেছিল। সেই ঘাঘরা চুরি করিয়া আমি পরিধান করিলাম। আমি মনে করিলাম যে, সন্ধ্যা পর্যন্ত দুর্লভীর ঘরে লুকাইয়া থাকি। তাহার ঘরে যেই প্রবেশ করিয়াছি, আর কেষ্টা ছোঁড়ার বাপ আসিয়া দ্বারে শিকল দিয়া দিল। কেষ্টা গ্রামের লোককে ডাকিয়া আনিয়া, আমাকে দেখাইল। 'রাঙা ঘাঘরা পরিয়া পোড়ার মুখো ডেকরা বুড়ো আমার মন ভুলাইতে আসিয়াছে,'—এইরূপ গালি দিয়া দুর্লভী আমাকে অনেক ভর্ৎসনা করিল। তাহার পর এলোকেশী আসিয়া আমাকে ঝাঁটার দ্বারা প্রহার করিলেন। এ সব কথা তোমাদিগকে আমি পূর্বে বলিয়াছি।

সেই অবধি দুর্লভী আমার সহিত কথা কয় না। পথে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়। যখন কন্দর্প পুরুষের ন্যায় আমার নাদুস-নুদুস নধর শরীর হইল, তখন আমি মনে করিলাম যে, চুপি চুপি দুর্লভীকে আনি,—যেন এলোকেশী জানিতে না পারেন।

দুর্লভীর ঘরে গিয়া দেখিলাম যে, সে কয়দিন জ্বরে পড়িয়া আছে। তাহার বোনঝির নাম চঞ্চলা। পাঁচ ক্রোশ দূরে ঝিঝিরডাঙ্গা নামক গ্রামে তাদের বাস। সে বিধবা। বয়স প্রায় ত্রিশ। রং কালো বটে, কিন্তু দেখিতে মন্দ নহে। আমি মনে করিলাম,—ইহার সহিত ভাব করিতে হইবে। তাহা করিলে দুর্লভীর হিংসা হইবে। আমার উপর আর তাহার রাগ থাকিবে না। —রং ফরসা হইবার জন্য শঙ্কর ঘোষ আমাকে যে ঔষধ বিক্রয় করিয়াছিল. তাহা আমি ব্যবহার করি নাই। সেই ঔষধ দুর্লভীকে আমি খাইতে দিলাম। তাহা খাইয়া দুর্লভীর পেট চাড়িয়া দিল, দুর্লভী মৃতপ্রায় হইল। গ্রামের সকলে আমাকে ছি ছি করিতে লাগিল। পুলিশে সংবাদ দিবে বলিয়া কেষ্টর বাপ আমাকে ভয় দেখাইল।

চঞ্চলা বলিল যে, তাহাদের গ্রামে ভিক্ষু ডাক্তার নামক এক ভাল চিকিৎসক আছেন, তাঁহাকে আনিলে তাঁহার মাসী ভাল হইবে। আমার ঔষধ খাইয়া দুর্লভীর প্রাণ যাইতে বসিয়াছে, সেজন্য ভয়ে আমি খরচ দিতে সম্মত হইলাম। ব্যাগ হাতে করিয়া পাঁচ ক্রোশ দূরে ঝিঝিরডাঙ্গা হইতে ভিক্ষু ডাক্তার পদব্রজে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রদান করেন।

· শুনিলাম যে ভিকু কলিকাতায় কোন ডাক্তারখানায় ছয় মাস কম্পাউণ্ডারি করিয়াছিলেন। একবার কোন রোগীকে কৃমির ঔষধের পরিবর্তে কুচিলা বিষ প্রদান করিয়াছিলেন। রোগীর তাহাতে মৃত্যু হইয়াছিল। সেজন্য ভিকুর ছয় মাস কারাবাস হইয়াছিল। এইরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া ভিকু এখন স্বগ্রামে আসিয়া ডাক্তার হইয়াছেন।

ভিকুর বয়স চল্লিশের অধিক। শরীর কাহিল। রং ময়লা, তবে কালো নহে। সচরাচর হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের বিশেষতঃ হাতুড়েদের যেরূপ হয়, ভিকুর মুখ দিয়াও সেইরূপ চড়চড় করিয়া কথার যেন খৈই ফুটিতে থাকে। দুর্লভীকে দেখিয়া ভিকু বলিলেন,—'কোন ভয় নাই, সরিষাপ্রমাণ এক বড়িতে ইহাকে আমি ভাল করিব। এ বা কি করিব! আমি কত অসাধ্য রোগ ভাল করিয়াছি। কত মরা মানুষকে জীবন প্রদান করিয়াছি।'

এইরূপ ভূমিকা করিয়া ভিকু নিজের বিদ্যার পরিচয় দিতে আরম্ভ করিলেন। ভিকু বলিলেন,—'নেহালা গ্রামের ত্রিলোচন সরকেলের পেট ক্রমে ক্রমে ফুলিতে লাগিল; পেট ফুলিয়া ক্রমে জালার মত হইল। কত ডাক্তার কত বৈদ্য আসিল। কেহ বলিল উদরী, কেহ বলিল টিউমার। কত ঔষধ তিনি খাইলেন। কিছুতে কিছু হইল না। অবশেষে তাঁহার লোকেরা আমাকে লইয়া গেল। আমি অনেকক্ষণ ধরিয়া বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া তাঁহার পেটটি দেখিলাম। অবশেষে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কবিলাম, তোমাদের ঘরে মাছ ধরিবার সূতা বঁড়শী আছে? বঁড়শীতে হোমিওপ্যাথিক গুলির টোপ করিয়া সূতার সহিত রোগীকে গিলিতে বলিলাম। মুখের বাহিরে সূতাটির অপর দিক ধবিয়া আমি একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। সূতা যেই একটু নড়িয়া উঠিল, আর সেই সময় আমি টান মারিলাম। বলিব কি মহাশয়! ধামার মত প্রকাণ্ড একটা কচ্ছপ তাঁহাব পেট হইতে আমি বাহির করিলাম! জলের সহিত সামান্য শিশু-কচ্ছপ সরকেলমহাশয় ভক্ষণ কবিয়াছিলেন। উদরে সেই কচ্ছপ ক্রমে বড় হইয়া তাঁহাব জীবন সংশয় কবিযাছিল। আমার চিকিৎসায় তিনি সুস্থ হইলেন।

আর একবার রাত্রি দুপ্রহরেব সময় আমি ঝিল গ্রামের শ্মশানঘাটের নিকট দিয়া যাইতেছিলাম। দেখিলাম যে, সে স্থানে কয়েকটি ভূত কেহ দাঁড়াইযা কেহ বসিয়া কমিটি করিতেছে। আমি একটু দূরে বসিয়া ব্যাগ হইতে হোমিওপ্যাথিক পুস্তক বাহির কবিলাম। দিয়াশলাই জ্বালিয়া তাহাব আলোকে ভূতেব ঔষধ দেখিলাম। তাহার পর যেই ঔষধের শিশি বাহির করিয়াছি, আর তাহার গন্ধ পাইয়াই ভূতেরা রুদ্ধশ্বাসে পলায়ন কবিল। একটু বিলম্ব করিলে আমার ঔষধের গুণে তাহারা ভস্ম হইয়া যাইত। ভূতের ছাই হিষ্টিরিয়া রোগের চমৎকার ঔষধ আমি প্রস্তুত করিতে পারিতাম।'

ভিকু ডাক্তার আরও বলিলেন যে,—'ভূতগণ যখন পলায়ন করিল, তখন আমি সেই স্থানে গিয়া দেখিলাম যে, তাহারা এক মড়া ভক্ষণ করিতেছিল। মড়ার হাত-পা সর্ব শরীর তাহারা খাইয়া ফেলিয়াছিল, কেবল মুখটি অবশিষ্ট ছিল। আমি তৎক্ষণাৎ দুইটি হোমিওপ্যাথিক ঔষধের গুলি বাহির করিয়া তাহার মুখে দিলাম। মুখে গুলি দিবামাত্র সে চাহিয়া দেখিল, তাহার পর আশ্চর্য কথা কি বলিব মহাশয়! আমার ঔষধের গুণে তাহার শরীর গজাইতে লাগিল। প্রথম গলা হইল, তাহার পর বক্ষঃস্থল হইল, তাহার পর উদর হইল, তাহার পর হাত-পা হইল। সে উঠিয়া বসিল। তখন আমি বুঝিলাম যে, সে হিন্দুস্তানী, বাঙ্গালী নহে। সে বাত্রি আমি তাহাকে আমার বাটিতে লইয়া যাইলাম। পরদিন

সে আপনার দেশে চলিয়া গেল। এখানে থাকিলে আপনাদিগকে দেখাইতাম। হোমিওপ্যাথিক ঔষধের গুণ আছে বটে, কিন্তু ঠিক ঔষধটি ধরা বড় কঠিন। অনেক দেখিয়া-শুনিয়া আমার বিষয়ে জ্ঞান হইয়াছে। রোগীর চেহারা দেখিলেই আমি ঠিক ঔষধ করিতে পারি। আমার হাতে একটিও রোগী মারা পড়ে না। সেজন্য কলিকাতার হোমরা-চোমরা ডাক্তারগণ, যাঁহারা ষোলো টাকা বত্রিশ টাকা ভিজিট গ্রহণ করেন তাঁহারা যখন হালে পানি পান না, তখন তাঁহারা বলেন, ঝিঁঝিরডাঙ্গার ভিকু ডাক্তারকে লইয়া এস, তিনি নাই হইলে এ রোগের ঔষধ কেহ ঠিক করিতে পারিবে না। সেজন্য মাঝে মাঝে আমাকে কলিকাতায় যাইতে হয়।

ভিকু পুনরায় বলিলেন,—'আমি আর একটি চমৎকার ঔষধ বাহির করিয়াছি। যে ঔষধে প্রজাপতি দক্ষের গলায় ছাগলের মুণ্ড জোড়া লাগিয়াছিল, ইহা সেই ঔষধ। হাত-পা এমন কি মানুষের মাথা কাটিয়া দুইখানা হইয়া গেলেও, আমি এক বড়িতে পুনরায় জুড়িয়া দিতে পারি।'

ভিকু নানারূপ গল্প করিলেন। অবাক হইয়া সকলে তাঁহারা গল্প শুনিতে লাগিল। সকলে মনে করিল যে, ইঁহার তুল্য বিচক্ষণ ডাক্তার জগতে নাই।

দুর্লভীর চিকিৎসার জন্য আমি তাঁহাকে এক টাকা দিতে চাহিলাম। কিন্তু প্রথমে কিছুতেই তাহা লইবেন না। তিনি বলিলেন,—'আমি পাঁচ ক্রোশ পথ হইতে আসিয়াছি। চারি টাকা লইব।'

অনেক কচলাকচলির পর আমি বলিলাম যে,—'আপাততঃ আপনি এক টাকা লউন, রোগী ভাল হইলে পরে আর তিন টাকা দিব।'

এ প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তিনি এক টাকা লইয়া প্রস্থান করিলেন। দুর্লভী ভাল হইল। কিন্তু তাহার পর ডাক্তারকে ঘোড়ার ডিম! রোগ ভাল হইলে অনেকেই ডাক্তার বৈদ্যকে কলা দেখায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ — চঞ্চলার গাই গরু

দুর্লভী ভাল হইলে চঞ্চলা আপনার গ্রামে চলিয়া গেল। কিন্তু চঞ্চলার সহিত সদ্ভাব করিতে আমার বাসনা হইয়াছিল। তাহাদের গ্রাম অনেক দূর। সর্বদা আমি যাইতে পারিতাম না। কেবল মাঝে মাঝে যাইতাম। সেই গ্রামের পাশ দিয়া বড় রাস্তা গিয়াছে। তাহার উপর দিয়া গরুর গাড়ী সর্বদা যায়। দুই চারিটা পয়সা দিয়া তাহার উপর বসিয়া কখন কখন কতক দূর যাইতাম। ফিরতি ঘোড়ার গাড়ীতেও দুই একবার গিয়াছিলাম। এ পথে দুই তিনবার মোটর গাড়ী দেখিয়াছিলাম। স্বদেশী কোম্পানী স্থাপনের সময় বড়লোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত শঙ্কর ঘোষ মোটর গাড়ি ভাড়া করিয়াছিলেন। সেই সময় আমি মোটর গাড়ি চড়িয়াছিলাম। কিন্তু অতি বেগে গমন করে। আমার ভয় হইয়াছিল। মোটর গাড়ি টানিবার নিমিত্ত ঘোড়া থাকে না। তবে ইহার ভিতর কোনরূপ বিলাতী জন্তু জানোয়ার থাকে কি না, তাহা আমি জানি না।

মাঝে মাঝে চঞ্চলাদের গ্রামে গিয়া তাহাদের দাওয়ার আমি বসিতাম। চঞ্চলার মা নাই, কেবল বাপ আছে। তাহার নাম সহদেব বাগ্দী! সহদেব মজুরি করে। চঞ্চলার একটি গাই গরু আছে। তাহার দুধ সে বিক্রয় করে।

চঞ্চলার দাওয়াতে বসিয়া আমি গল্প-গাছা করিতাম। কখন কখন দুই একটা রসের কথাও বলিতাম। তখন হাসিয়া সে লুটিপুটি হইত। পাড়ার মাগীদের সে ডাকিয়া আনিত। আমার দিকে চক্ষু ঠারিয়া সকলে লুটিপুটি হইত। আমাকে দেখিয়া লোকের আনন্দ হয়। আমার রূপ দেখিয়া তাহার মন ভুলিয়া যায়। মাগীগুলা আমার গায়ে যেন ঢলিয়া পড়ে।

চঞ্চলাকে দশ পয়সা দিয়া একখানি গামছা কিনিয়া দিলাম। গামছা পাইয়া তাহার আহ্লাদ হইয়াছিল, আমি মনে ভাবিলাম,—'দুর্লভী একবার এই কথা শুনিলে হয়। তাহা হইলে সে আর মুখ হাঁড়ী করিয়া থাকিবে না। লম্বোদর। এইবার ভাই সেই ঘোর দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। এইবার সেই গ্রামে আমাকে প্রায় একমাস কয়েদ থাকিতে হইয়াছিল।

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—'সে কবে?'

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—'আজ পঞ্চমী, ইহার তিনটা পঞ্চমী আগে, প্রায় দুই মাসের কথা।' —লম্বোদর বলিলেন,—'সে কি করিয়া হইবে। তুমি বলিতেছ যে দুই মাস পূর্বে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। তাহার পর এক মাস তুমি সেই গ্রামে কয়েদ হইয়াছিলে। কিন্তু গত ছয় মাস ধরিয়া তুমি কোন স্থানে গমন কর নাই। এই ছয়মাস প্রতিদিন তোমাকে আমরা দেখিয়াছি।

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—'সকলই জগদম্বার মায়া! তাঁহার মায়াতে তোমরা আচ্ছন্ন হইয়াছিলে।' — লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—'দুর্ঘটনাটা কি?'

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—'তাহা বলিতেছি শুন।'

* * *

প্রায় দুই মাসের কথা হইল। একদিন রাত্রিতে আমি ঘরে শুইয়াছিলাম। শেষ রাত্রিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। আর নিদ্রা হইল না। এ-পাশ ও-পাশ করিতে লাগিলাম। চঞ্চলার জন্য একখানি নয়হাতি কাপড় কিনিয়াছিলাম। মনে করিলাম, বিছানায় বৃথা পড়িয়া থাকিব না। কাপড়খানি তাহাকে দিয়া আসি। এলোকেশীর ভয়ে কাপড়খানি একস্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম। কাপড়খানি লইয়া চঞ্চলাদের গ্রাম অভিমুখে আমি হাঁটিয়া চলিলাম। যাইতে যাইতে সকাল হইয়া গেল। সূর্য্যোদয়ের পরে বড় রাস্তায় গিয়া উঠিলাম। বেলা প্রায় নয়টার সময় চঞ্চলাদের গ্রামের নিকট উপস্থিত হইলাম। চঞ্চলার পিতা সহদেবের সহিত বড় রাস্তায় সাক্ষাৎ হইল। চঞ্চলার গাই গরুর দড়ি ধরিয়া বড় রাস্তার উপর দিয়া সে তাহাকে মাঠে লইয়া যাইতেছিল। তাহার সহিত কথা কহিতে কহিতে আমি কিছুদূর চলিলাম, অন্যমনস্ক হইয়া আমরা যে দুইজন যাইতেছি, পশ্চাতে যে ভোঁ ভোঁ শব্দ হইয়াছিল, তাহার কিছুই শুনিতে পাই নাই। সহসা পশ্চাৎ হইতে এক মোটর গাড়ি আমার উপর আসিয়া পড়িল। গাড়ির চাকায় আমার কোমর পর্যন্ত কাটিয়া দুইখানা হইয়া গেল।

আমার দুইটা কাটা-পা গাড়ির চাকায় কিরূপে আটকাইয়া গেল। কোমর হইতে আমার পা দুইটি লইয়া মোটর গাড়ি অতি দ্রুতবেগে পলায়ন করিল।

লম্বোদর প্রভৃতি সকলে শিহরিয়া উঠিলেন। সকলে বলিয়া উঠিলেন,—'বল কি হে? সত্য?' — ডমরুধর উত্তর করিলেন,—'হাঁ ভাই, সত্য।'

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তাহার পর?'

ডমরুধর বলিলেন,—'রাস্তায় ধূলায় আমার ধড়টি পড়িয়া কাটা ছাগলের ন্যায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। তখনও আমার প্রাণ বাহির হইয়া যায় নাই। তখনও সম্পূর্ণ আমি জ্ঞানহারা হই নাই। আমি এ-দিক ও-দিক চাহিয়া দেখিলাম। দেখিলাম যে, সহদেব বাগ্দী হতভম্ভ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। বোধ হয় যে, তাহাকে আঘাত লাগে নাই। সে চঞ্চলার গরুর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। গরুটিও পথে পড়িয়াছিল। গাড়ীর আর একটি চাকায় তাহারও কোমর পর্যন্ত কাটিয়া দুইখানা হইয়া গিয়াছিল। তাহার কোমর ও পা কিন্তু গাড়ীর চাকায় লাগিয়া যায় নাই। একদিকে গরুর ধড় ও অপরদিকে তাহার কোমর ও পা রাস্তার উপর পড়িয়াছিল। বিষণ্ণ বদনে সহদেব তাহাই দেখিতেছিল।

সেই পথ দিয়া ভিকু ডাক্তার ব্যাগ হাতে লইয়া চিকিৎসা করিতে যাইতেছিলেন। তিনি দৌড়িয়া আসিলেন। এ-দিক ও-দিক চাহিয়া কোমর ও পা দেখিতে পাইলেন না। তখন সেই গরুর কোমর ও পা আমার শরীরে তিনি জুড়িয়া দিলেন। তাঁহার ব্যাগ খুলিয়া দুইটি হোমিওপ্যাথিক ঔষধের গুলি আমার মুখে দিলেন। ঔষধের গুণে সেই গরুর কোমর ও পা আমার শরীরে জুড়িয়া গেল। তাহার পর আর দুইটি বড়ি তিনি আমার মুখে দিলেন। তাহা দেখিয়া আমি শরীরে বল পাইলাম। কিন্তু মানুষের মত গরুর দুই পায়ে আমি সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিলাম না। গরুর দুই পা আমার দুই হাত মাটীতে পাতিয়া পাতিয়া চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় আমাকে দাঁড়াইতে হইল।

ইতিমধ্যে সে স্থানে অনেক লোক একত্র হইয়াছিল। এই অবস্থায় সকলে আমাকে গ্রামের ভিতর লইয়া গেল। সে স্থানে গিয়া ভিকু ডাক্তার বলিলেন,—'ডমরুবাবু তুমি আমার পাওনা টাকা দাও নাই। আমাকে ফাঁকি দিয়াছিলে। কিন্তু এখন তোমার এই শরীরটি আমার হইল। গরুর কোমর তোমার শরীরে যদি আমি জুড়িয়া না দিতাম, তাহা হইলে এতক্ষণ কোন কালে তুমি মরিয়া যাইতে। দুইদিন পরে তোমার ধড়টি পচিয়া যাইত, অথবা পুড়িয়া ছাই হইত। অতএব তোমার এই শরীর এখন আমার। আমার চাষ আছে। যতদিন বাঁচিবে, ততদিন আমার ক্ষেতে তোমায় কাজ করিতে হইবে।'

এই কথা বলিয়া আমার গলায় গরুর দড়ি দিয়া তিনি টানিতে লাগিলেন।

'চঞ্চলার পিতা সহদেব তাঁহার হাত হইতে দড়ি কাড়িয়া লইল। সে বলিল,—'ভাল রে ভাল! ইনি তোমার? সে কিরূপ কথা? ইঁহার আধখানা চঞ্চলার গাই। এখনও ইঁহার দুধ হইবে। আমরা ইঁহাকে ছাড়িয়া দিব না।'

আমাকে লইয়া দুইজনে বিবাদ বাধিয়া গেল। এ বলে ইনি আমার প্রাপ্য, ও বলে

আমার প্রাপ্য। ক্রমে হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইল। অবশেষে গ্রামের লোক সমস্যার এইরূপ মীমাংসা করিয়া দিল। দিনের বেলা আমাকে ভিকু ডাক্তারের কাছে থাকিতে হইবে। সমস্ত দিন তিনি আমাকে খাটাইয়া লইবেন। রাত্রিকালে আমি চঞ্চলার গোয়ালে বাঁধা থাকিব। প্রাতঃকালে চঞ্চলা আমার দুধ দুহিয়া ভিকু ডাক্তারের বাড়ীতে আমাকে পাঠাইয়া দিবে। একবেলা ভিকু ডাক্তার আমাকে খাইতে দিবেন, অন্য বেলা সহদেব বাগ্দী আমাকে খাইতে দিবে।

প্রথম দিন আর আমাকে কোন কাজ করিতে হয় নাই। সেদিন চঞ্চলার গোয়ালে খোঁটায় আমি বাঁধা রহিলাম, পাছে হাত দিয়া দড়ি খুলিয়া আমি পলায়ন করি, সেজন্য হাত দুইটিও তাহারা বাঁধিয়া রাখিল। ইহার পর প্রতি রাত্রিতে তাহারা এইভাবে আমাকে বাঁধিয়া রাখিত, সন্ধ্যাবেলা চঞ্চলা আমাকে দুইটি মুড়ি খাইতে দিল। যতদিন ইহাদের নিকট ছিলাম, ততদিন দুইবেলা দুইটি মুড়ি আমার আহার ছিল। একবেলা ভিকু ডাক্তার দিত, অন্যবেলা চঞ্চলা দিত। আমার দাঁত নাই, মুড়ি চিবাইতে পারিতাম না। প্রাণধারণের নিমিত্ত কোনরূপে গিলিয়া ফেলিতাম।

পরদিন প্রাতঃকালে চঞ্চলা আমার দুধ দোহন করিল। প্রায় দুই সের দুধ হইল। তাহার পর সে বাছুর ছাড়িয়া দিল, বাছুর আমার দুধ খাইতে লাগিল ও মাঝে মাঝে বাছুর আমার পেটে মাথার গুঁতো মারিতে লাগিল। তাহার গুঁতোতে আমি অস্থির হইয়া পড়িলাম। ভাগ্যক্রমে এই সময় ভিকু ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন,—'ডমরুবাবুর ঐ পেট এখন আমার। পেট আমার ভাগে পড়িয়াছে। পেটে আমি বাছুরকে মারিতে দিব না। তাহার ঢুঁতে, যদি ডমরুবাবুর নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়িয়া যায়, তাহা হইলে তোমাদের নামে নালিশ করিব।' সেইদিন হইতে চঞ্চলা বাছুরের দড়ি টানিয়া রাখিত। বাছুর আমার পেটে আর গুঁতো মারিতে পারিত না।

দুধ দোহন হইলে ভিকু ডাক্তার আমাকে তাঁহার ক্ষেতে লইয়া গেলেন। কৃষককে বলিলেন যে,—'একটা গরুর সহিত ইহাকে লাঙ্গলে জুড়িয়া দাও।'

কৃষক তাহাই করিল। মানুষের হাত কোমল তাহাতে ক্ষুর নাই। কিন্তু এখন আমাকে দুইটি হাত মাটিতে পাতিয়া গরুর ন্যায় চরিতে হইয়াছিল। আমার হাতে কাঁটা খোঁচা ফুটিয়া যাইতে লাগিল। ঘোরতর কষ্টে আমার চক্ষু দুইটি জলে ভাসিয়া গেল। আমি ভাবিলাম যে, আমার নাদুস-নুদুস নধর শরীরটি এইবার মাটি হইয়া গেল।

আমার সঙ্গে বলদের সহিত সমানভাবে আমি ক্ষেতের উপর লাঙ্গল কাঁধে করিয়া চলিতে পারিতেছিলাম না, সেজন্য কৃষক আমার লাঙ্গুলে সবলে মোচড় দিতে লাগিল। এমন সময় সহদেব সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সহদেব বলিল,—'ও কি। তুমি উহার লেজ মলিতে পারিবে না। লেজ তোমাদের নহে, লেজ আমাদের ভাগে পড়িয়াছে।

কৃষক আর আমার লাঙ্গুল মর্দন করিল না বটে, কিন্তু আমার পিঠে ছড়ি মারিতে লাগিল। ফলকথা, আমার দুঃখের আর সীমা রহিল না। সন্ধ্যাবেলা ভিকু ডাক্তার আমাকে

চঞ্চলার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন। চঞ্চলা আমাকে তাহার গোয়ালে বাঁধিয়া রাখিল। পরদিন প্রাতঃকালে আমার দুধ দুহিয়া পুনরায় আমাকে ভিকু ডাক্তারের নিকট পাঠাইয়া দিল। পুনরায় আমাকে লাঙ্গল ঘাড়ে করিয়া ক্ষেত চষিত হইল।

প্রতিদিন এইরূপ হইতে লাগিল। মনের দুঃখে রাত্রিদিন আমি কাঁদিতেছিলাম। ভাবিতেছিলাম যে, হায় হায়! স্বদেশী কোম্পানী খুলিয়া দেশের লোকের মাথায় হাত বুলাইয়া যে টাকা উপার্জন করিলাম, সে সব বৃথা হইল। এলোকেশী অথবা তোমার বন্ধু-বান্ধব কেহ আমার কোন সন্ধান লইল না সেজন্য আমার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

লম্বোদর বলিলেন,—'আজ ছয়মাস প্রতিদিন দুইবেলা তোমাকে দেখিতেছি। তোমার আবার সন্ধান কি লইব? কিন্তু তুমি কি বলিতেছ যে, সে সব জগদম্বার মায়া। তবে আমরা আর কি বলিব?'

ডমরুধর পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—'দিন দিন আমি দুর্বল হইয়া পড়িতে লাগিলাম। আমার সে নাদুন-নুদুস নধর শরীর শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেল। অস্থি-চর্মসার হইয়া যাইলাম। ভালরূপ লাঙ্গলও টানিতে পারি না, দুধও দিতে পারি না। প্রায় একমাস কাটিয়া গেল। একদিন প্রাতঃকালে চঞ্চলা আমাকে যথারীতি দুহিতে আসিল। কিছুমাত্র দুধ হইল না। পিতাকে গিয়া সে সেই কথা জানাইল। সহদেব বলিল যে,—'কাল প্রাতঃকালে আমি নিজে দুহিয়া দেখিব।' পরদিন প্রাতঃকালে সে নিজে আমাকে দুহিতে আসিল। একফোঁটাও দুধ বাহির হইল না। তখন সে বিড় বিড় করিয়া আপনা-আপনি বলিল,—পুনরায় বাছুর না হইলে দুধ হইবে না, তাহার যোগাড় করিতে হইবে।'

এই কথা শুনিয়া আমার প্রাণ উড়িয়া গেল। একে লাঙ্গল টানিয়া প্রাণ আমার ওষ্ঠাগত হইয়াছিল। তাহার উপর আবার বাছুরের যোগাড়।

সে রাত্রি আমার নিদ্রা হইল না। ক্রমাগত আমি মা দুর্গাকে ডাকিতে লাগিলাম। আমি বলিলাম,—মা! চিরকাল তুমি আমাকে নানা বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছ। সন্ন্যাসীর হাত হইতে, বাঘের মুখ হইতে তুমি আমাকে উদ্ধার করিয়াছ। এখন কেন মা! তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছ?'

এই স্তব-স্তুতি মিনতি করিয়া আমি কাঁদিতে লাগিলাম। সহসা কে যেন আমার পিঠে চাপড় মারিয়া বলিল,—'ভয় নাই বাছা, ভয় নাই! শীঘ্রই তোমাকে আমি এ বিপদ হইতে পরিত্রাণ করিব। গত বৎসর তোমার পূজায় কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইয়াছিল। সেই পাপের জন্য তোমাকে কষ্ট দিলাম।

মা যাহা বলিলেন, তাহাই করিবেন। পরদিন প্রত্যূষে শঙ্কর ঘোষ আসিয়া বলিল,—'তুমি আমাকে টাকা ফাঁকি দিয়াছ। চল, তোমাকে আমি পুলিশে দিব।'

এই বলিয়া সে আমার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া টানিতে লাগিল। সে সংবাদ পাইয়া ভিকু ডাক্তার দৌড়িয়া আসিলেন,—তিনি বলিলেন,—'ষড়টি আমি রক্ষা করিয়াছি। এ ষড় আমার সম্পত্তি।

এই কথা বলিয়া তিনি আমার বাম হাত ধরিয়া টানিতে লাগিলেন। গোলমাল শুনিয়া চঞ্চলা সে স্থানে দৌড়িয়া আসিল। সে বলিল,—'ইহার নীচের দিকটা আমার। আমার গাইগরু।'

এই বলিয়া সে আমার পশ্চাৎ দিকের দক্ষিণ পায়ের খুর ধরিয়া টানিতে লাগিল। এমন সময় 'হু হু' পালকির শব্দ হইল। আমি ও অপর সকলে সেইদিকে চাহিয়া রহিলাম। এলোকেশী ঠাকুরাণী উগ্রমূর্তি ধারণ করিয়া পালকি হইতে নামিলেন। আমার নিকট আসিয়া তিনি বলিলেন,—'ইনি আমার স্বামী। তোমরা ছাড়িয়া দাও। ইহাকে আমি বাড়ী লইয়া যাইব। বাড়ী গিয়া ঝাঁটা-পেটা করিয়া ইঁহার ভূত ছাড়াইব।'

এই কথা বলিয়া তিনি আমার পশ্চাৎ দিকের বাম পায়ের খুর ধরিয়া টানিতে লাগিলেন। আপন আপন দিক কেহই ছাড়িয়া দিল না। একদিকে শঙ্কর ঘোষ ও ভিকু ডাক্তার আমার দুই হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল। অপর দিকে চঞ্চলা ও এলোকেশী দুই খুর ধরিয়া টানিতে লাগিল। তাহাদের টানাটানিতে আমার প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইল। 'ছাড়িয়া দাও' বলিয়া আমি চীৎকার করিতে লাগিলাম, কিন্তু কেহই ছাড়িল না।

অবশেষে তাহাদের টানাটানিতে আমার শরীর হইতে ফস্ করিয়া চঞ্চলার গাইগরুর কোমর ও পা খসিয়া পৃথক হইয়া গেল। আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম।

* * *

কতক্ষণ অজ্ঞান হইয়াছিলাম, তাহা জানি না; যখন আমার জ্ঞান হইল, তখন আমি চক্ষু চাহিয়া দেখিলাম যে, আমি আমার ঘরে শয়ন করিয়া আছি। আমি উঠিয়া বসিলাম। পায়ের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। দেখিলাম যে, মানুষের দুইটি পা, গরুর পা নহে। তাহাতে লেজ নাই, খুর নাই, কেবল মানুষের পায়ের পাতা। ফলকথা, আমার পা। শরীর দিকে চাহিয়া দেখিলাম। দেখিলাম যে, আমার নাদুস-নুদুস নধর শরীর যেরূপ ছিল, সেইরূপ রহিয়াছে। শুষ্ক হইয়া যায় নাই। ঘরের ভিতর শঙ্কর ঘোষ অথবা ভিকু ডাক্তার অথবা চঞ্চলা, কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। কেবল দেখিলাম যে, এলোকেশী বাক্স খুলিয়া কাপড় বাহির করিতেছিলেন।

আমি জাগরিত হইয়াছি দেখিয়া এলোকেশী বলিলেন,—"কাল রাত্রিতে বিড় বিড় করিয়া ওরূপ বকিতেছিলে কেন? চঞ্চলা কে?'

আমি কোন উত্তর করিলাম না। মনে মনে ভাবিলাম যে,—সকলই জগদম্বার মায়া। সমুদয় মায়ের লীলা।

ষষ্ঠ গল্প

প্রথম পরিচ্ছেদ — সাহেবের কাজ

ডমরুধরের বাস কলিকাতার দক্ষিণে, যেস্থানে অনেক কাটি গঙ্গা আছে। প্রথম অবস্থায় ইনি দরিদ্র ছিলেন। নানা উপায় অবলম্বন করিয়া এক্ষণে ধনবান হইয়াছেন। এলোকেশী ইঁহার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী। ডমরুধর বৃদ্ধ, সুপুরুষ নহেন। তথাপি এলোকেশীর সর্বদাই

সন্দেহ। গত বৎসর দুর্লভী বাগদিনী ডমরুধরকে ঝাঁটাপেটা করিয়াছিল। সেই উপলক্ষ্যে এলোকেশীও তাঁহাকে উত্তম-মধ্যম দিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্বে ডমরুধর সন্ন্যাসি-বিভ্রাটে পড়িয়াছিলেন। সেই অবধি ইনি দুর্গোৎসব করেন। সুন্দরবনে ডমরুধরের আবাদ আছে। প্রজাদিগের নিকট হইতে চাউল, ঘৃত, মধু, মৎস প্রভৃতি আদায় করেন। প্রতিমাটি গড়া হয়, কিন্তু পূজার উপকরণ,—'প্রায় সমস্তই কাটিগঙ্গার জল। আজ পূজার পঞ্চমীর দিন, দালানে প্রতিমার পার্শ্বে বন্ধুগণের সহিত বসিয়া ডমরুধর গল্প-গাছা করিতেছেন।

লম্বোদর বলিলেন,—'এবার তুমি মরিয়া বাঁচিয়াছ, যে ভয়ানক রোগ হইয়াছিল, তাহাতে পূজার সময় তোমার গল্প যে আবার শুনিব, সে আশা আমরা করি নাই।

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—'হাঁ ভাই! এবার আমি মরিয়া বাঁচিয়াছি। মা দুর্গার আমি বরপুত্র। সেবার সন্ন্যাসি বিভ্রাট হইতে তিনি আমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার কৃপায় গত বৎসর বাঘের মুখ হইতে আমি বাঁচিয়াছিলাম। এবার উৎকট রোগ হইতে তিনি আমাকে মুক্ত করিয়াছেন। সমুদয় দুর্ঘটনা নষ্টচন্দ্র দেখিয়া ঘটিয়াছিল।

আধকড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন,—'নষ্টচন্দ্র দেখিয়া কি হইয়াছিল?'

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—'সে কথা এতদিন আমি প্রকাশ করি নাই। কি হইয়াছিল তাহা শুন। একবার আমি নষ্টচন্দ্র দেখিয়াছিলাম। নষ্টচন্দ্র দেখিলে চুরি করিতে হয়। মনে করিলাম যে, দুর্লভীর উঠানে যে শসা গাছের মাচা আছে, তাহা হইতে শসা চুরি করিয়া আনি। বাহিরে যাহাই বলুক, কিন্তু দুর্লভীর মনটা আমার উপর আছে। শসা চুরি করিতে গিয়া যদি ধরা পড়ি, এলোকেশী যদি কিছু বলেন, তাহা হইলে আমি বলিব যে, নষ্টচন্দ্র দেখিয়া চুরি না করিলে কলঙ্ক হয়।

চুপে চুপে আমি শসা চুরি করিতে যাইলাম। কিন্তু দূর হইতে দেখিলাম যে, দুর্লভী কেরোসিনের ডিবে জ্বালাইয়া ঠেঙা হাতে করিয়া দাওয়াতে বসিয়া আছে। তাহার উগ্রমূর্তি দেখিয়া আর অগ্রসর হইতে আমি সাহস করিলাম না।

সে রাত্রিতে আমার চুরি করা হইল না। মনে করিলাম যে, আজ রাত্রিতে না হউক, তিনদিনের মধ্যে কিছু চুরি করিলেই নষ্টচন্দ্রের দোষ কাটিয়া যাইবে। কোথায় কি চুরি করি, রাত্রিতে শুইয়া শুইয়া তাহা ভাবিতে লাগিলাম। দুর্লভীর বাড়ীর পার্শ্বে গদাই ঘোষের পুষ্করিণী আছে। তাহাতে অনেক মাছ আছে। গদাই ঘোষ দুর্লভীর জিম্মায় পুষ্করিণী রাখিয়াছে। মনে করিলাম যে, কাল বৈকালবেলা ছিপ ফেলিয়া সেই পুষ্করিণী হইতে মাছ চুরি করিব।

সুন্দরবনে আমার আবাদের নিকট একবার জনকয়েক সাহেব শিকার করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা একটি টুপি ফেলিয়া গিয়াছিলেন। টুপিটি কুড়াইয়া আমি বাড়ী আনিয়াছিলাম। পরদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্বে সেই টুপিটি বগলে লইয়া ছিপ হাতে করিয়া আমি গদাই ঘোষের পুষ্করিণীর পাড়ে উপস্থিত হইলাম; যে ধার দিয়া লোক যাতায়াত করে, তাহার বিপরীত দিকে এককোণ বনে পূর্ণ ছিল। ঝোপের ভিতর গিয়া আমি

সাহেবদের সেই কালো রঙের ধুচুনির মত লম্বা টুপিটি মাথায় দিলাম। আজকালের বাবুদের মত গায়ে আমি জামা পরি না। কোমরে কেবল ধুতি ছিল। আমি ভাবিলাম যে, আমাকে কেহ চিনিতে পারিবে না। সকলে মনে করিবে সে সাহেব মাছ ধরিতে আসিয়াছে। সাহেব দেখিলে কেহ কিছু বলিবে না।

নিকটের জল—নাল-ফুল ও কলমি শাকের গাছে পূর্ণ ছিল। কেবল এক স্থানে একটু ফাঁক ছিল। ময়দার টোপ গাঁথিয়া আমি সেই পরিষ্কার স্থানে ছিপ ফেলিলাম। কিছুক্ষণ পর বোধ হইল যেন মাছে ঠোকরাইল। আমি টান মারিলাম। বঁড়শি জলের ভিতর নাল গাছে লাগিয়া গেল। অনেক টানাটানি করিলাম, অনেক চেষ্টা করিলাম, কিছুতেই খুলিতে পারিলাম না।

তখন বুঝিলাম যে, জলে নামিয়া না খুলিলে আর উপায় নাই। কিন্তু কাপড় ভিজিয়া যাইবে, জলে কি করিয়া নামি। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম—কেউ কোথাও নাই। কাপড় খুলিয়া উলঙ্গ হইয়া জলে নামিলাম। একবুক জল হইল। অতি কষ্টে নাল গাছের ডাঁটো হইতে বঁড়শি খুলিয়া উপরে উঠিয়া কাপড় পরিতে যাই—সর্বনাশ! যে স্থানে কাপড় রাখিয়া গিয়াছিলাম সে স্থানে কাপড় নাই। বনের ভিতর চারিদিকে অনেক খুঁজিলাম, কাপড় দেখিতে পাইলাম না।

তখনও সম্পূর্ণ সন্ধ্যা হয় নাই। সে উলঙ্গ অবস্থায় আমি বাটী ফিরিয়া যাইতে পারি না। কি করিব। চার করিয়া পুনরায় ছিপ ফেলিলাম। মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম যে, এ সেই কেষ্টা ছোঁড়ার কর্ম, সে আমার টাকের বর্ণনা করিয়া আমাকে ক্ষেপায়। সে দূর হইতে আমাকে বলে—টাক-চাঁদ, টাক বাহাদুর, টাক টাক টাকেশ্বর।

কেষ্টা ছোঁড়ার অগম্য স্থান নাই। যখন জলে নামিয়া পিছন ফিরিয়া এক মনে আমি বঁড়শি খুলিতেছিলাম, সেই সময় সে আমার কাপড় লইয়া গিয়াছে। কেবল তাহা নহে। সে দুর্লভীকে গিয়া সংবাদ দিয়াছিল। কারণ, অল্পক্ষণ পরেই দুর্লভী ও হিরী বাগদিনী আসিয়া পুষ্করিণীর অপর পাড়ে দাঁড়াইল।

কিছুক্ষণ একদৃষ্টে আমার দিকে চাহিয়া দুর্লভী বলিল,—"একটা সাহেব!"

হিরী বাগদিনী বলিল,—"সাহেবটার গায়ের রং কালো মিশমিশে। যাহারা পাখী মারিতে আসে, সেই সাহেব।" —দুর্লভী বলিল,—"তা নয়। ওটা নেঙটা গোরা।"

হিরী বলিল,—"সর্বনাশ! নেঙটা গোরা। তবে আমি পলাই; যাকে বলে ব্রাণ্ডি, তাই উহারা খায়।" —দুর্লভী বলিল,—"চল গদাই ঘোষকে গিয়া বলি।"

আমি ভাবিলাম,—"ঘোর বিপদ হইল। সমস্ত গ্রামের লোককে সঙ্গে লইয়া গদাই ঘোষ হয়তো এখনি আসিয়া উপস্থিত হইবে। আমি সম্পূর্ণ উলঙ্গ, 'মাথায় কেবল এক সাহেবি টুপি। এ অবস্তায় সকলে হয় তো আমাকে 'এলোকেশীর নিকট ধরিয়া লইয়া যাইবে। সাহেবের পোষাক পরিয়া দুর্লভীর নিকট আমি গিয়াছিলাম, তাহা শুনিলে এলোকেশী আর রক্ষা রাখিবেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ – নারিকেলের বোরা

ছিপগাছটা আমি ফেলিয়া দিলাম। প্রথম বনের ভিতর দিয়া, তাহার পর পুকরপাড়ের নীচে দিয়া দুর্লভীর ঘরের পশ্চাৎদিকে উপস্থিত হইলাম। ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম যে, তাহারা ঘরে কেহ নাই। দ্বারটি কেবল ভেজানো আছে। চুপ করিয়া আমি তাহার ঘরে প্রবেশ করিলাম। ঘরের ভিতর অন্ধকার। চারিদিক চাহিয়া দেখিলাম। একখানি কাপড় কি একখানি গামছা দেখিতে পাইলাম না। কি করি টুপি মাথায় দিয়া উলঙ্গ অবস্থায় ঘরের এককোণে বসিয়া রহিলাম। মনে করিলাম যে একটু অন্ধকার হইলে পলায়ন করিব। আর যদি দুর্লভী দেখিতে পায়, তাহা হইলে আমার সাহেবের পোষাক দেখিয়া তাহার মনে আনন্দ হইবে।

ওদিকে যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই হইল। গদাই ঘোষ গ্রামের চৌকিদার ও অন্যান্য লোক লইয়া পুষ্করিণীর ধারে উপস্থিত হইল। মহা গোল পড়িয়া গেল। ঘরের ভিতর বসিয়া আমি তাহা শুনিতে পাইলাম। ভয়ে সর্বশরীর আমার কাঁপিতে লাগিল। পুকুরের সেই কোণে বনের ভিতর তাহারা অনেক অনুসন্ধান করিল। ছিপ দেখিতে পাইল। কিন্তু সাহেবকে তাহারা দেখিতে পাইল না। হতাশ হইয়া সকলে বাড়ী ফিরিয়া গেল। তখন দুর্লভী আসিয়া আপনার দাওয়ায় পিঁড়িতে বসিল।

এমনসময় রসকের মা আসিয়া বলিল,—'দুর্লভী। আমাকে শসা দিবি বলিয়াছিলি, কৈ দে।' —দুর্লভী বলিল,—"শসা তুলিয়া রাখিয়াছি। ঘরের বাম কোণে ডালায় আছে, গিয়া লও।"

আমি ঘরের বাম কোণে বসিয়াছিলাম। আমার ভয় হইল। কোণের দিকে আরও ঘেঁসিয়া বসিলাম। রসকের মা ঘরের ভিতর আসিয়া কোণের কাছে অন্ধকারে হাতবাড়াইতে লাগিল। সহসা ঝনাৎ করিয়া কি একটা শব্দ হইল। সে চীৎকার করিয়া উঠিল, বাম হাত আমার দিকে বাড়াইয়া দিল। আমার গায়ে তাহাব হাত ঠেকিয়া গেল।

সে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, ঘরের ভিতর একটা ভূত বসিয়া আছে। সে আমার হাতে কামড় মারিয়াছে। আমার আঙ্গুলগুলা চিবাইতেছে। এখন আমার সর্বশরীর খাইয়া ফেলিবে।

পরে শুনিলাম, ঘরে যে দুর্লভীর করাতে ইঁদুরকল পাতিয়া রাখিয়াছিল, রসকের মায়ের হাত তাহাতে পড়িয়া গিয়াছিল। কি হইয়াছে, কি হইয়াছে বলিয়া দুর্লভী দৌড়িয়া আসিল। দ্বারের নিকট তাহাকে ঠেলিয়া আমি ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। তখন দুর্লভী আমাকে দেখিতে পাইল। কিন্তু চিনিতে পারিল না। সে চীৎকার করিয়া বলিল,—"ভূত নহে ভূত নহে, এ সেই নেঙটা গোরা; আমার ঘরের ভিতর বসিয়াছিল।"

তাহার চীৎকার শুনিয়া চারিদিক হইতে লোক ছুটিয়া আসিতে লাগিল। আমি আর বাটী পলাইতে অবসর পাইলাম না। কিছু আগে পথের বামদিকে বিন্দু ব্রাহ্মণীর ঘর। বিন্দু ব্রাহ্মণী তখন গোয়ালে বসিয়া ঘুঁটে ধরাইয়া ধোঁয়া করিতেছিল। তাহার সেই একখানি মেটে

ঘরের দ্বার খোলা ছিল। তাড়াতাড়ি আমি সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলাম।

ঘরের ভিতর মিটমিট করিয়া এক কেরোসিনের ডিবে জ্বলিতেছিল। বিন্দু ব্রাহ্মণীর কেহ নাই। একলা সে সেই ঘরে বাস করে। তাহার অনেকগুলি নারিকেল, আম, কাঁঠাল ও আতা গাছ আছে। তাহার ফল বেচিয়া সে দিনপাত করে।

আমি দেখিলাম যে, ঘরের এককোণে অনেকগুলি নারিকেল স্তূপাকার হইয়া আছে। তাহার পার্শ্বে পাঁচ বোরা বা গুণের থলি নারিকেল পূর্ণ করিয়া তাহাদের মুখ বন্ধ করিয়া বিন্দু সারি সারি উচ্চভাবে বসাইয়া রাখিয়াছে।

ইতিমধ্যে বাহিরে গোল পড়িয়া গেল। সকলে বলিল, নেঙটা গোরা এইদিকে আসিয়াছে। এস, বিন্দুর ঘরের ভিতর দেখি। হয় তো এই ঘরের ভিতর সে বসিয়া আছে। আমি তখন মা দুর্গাকে ডাকিতে লাগিলাম। আমি বলিলাম যে,—'মা! নষ্টচন্দ্র দেখিলে লোককে কি এত সাজা দিতে হয়? প্রতি বৎসর আমি তোমার পূজা করি, এ বিপদ হইতে তুমি আমাকে রক্ষা কর।'

তোমাদিগকে আমি বার বার বলিয়াছি যে, আমার উপর মায়ের অপার কৃপা। মা তৎক্ষণাৎ আমার মনে বুদ্ধি দিলেন। নিকটে একটি খালি বোরা পড়িয়াছিল। সেই বোরার মুখে আমি আমার মাথা গলাইয়া দিলাম, তাহার পর টানিয়া আমার সর্ব শরীর পা পর্যন্ত তাহা দিয়া ঢাকিয়া ফেলিলাম! অবশেষে নারিকেলপূর্ণ থলির ন্যায় অপর, পাঁচটি বোরার পার্শ্বে আমিও বসিয়া রহিলাম। তিন চারিজন গ্রামবাসী ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। এদিকে-ওদিকে চাহিয়া দেখিল যে, নেঙটা গোরা ঘরের ভিতর নাই। কেবল ছয়টি নারিকেলপূর্ণ থলি সারি সারি বসিয়া আছে।

ঘরের ভিতর নেঙটা গোরা দেখিতে না পাইয়া সকলের ভয় হইল। একজন বলিল,—'তাহাকে এই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে আমি নিশ্চয় দেখিয়াছি। তবে এখন কোথায় গেল? এ নেঙটা গোরা নহে; এই বর্ষাকালে জল-কাদায় নেঙটা গোরা কোথা হইতে আসিবে? তাহার পর নেঙটা গোরা এত মিশমিশে কালো হয় না। এ নেঙটা গোরা নহে, এ নেঙটা ভূত।'

তৃতীয় পরিচ্ছেদ — বলাই চিন্তির বিবরণ

ভূতের কথা শুনিয়া সকলে ভয়ে আপন আপন গৃহে চলিয়া গেল। বিন্দু আপনার দাওয়াতে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। সে বলিল যে, কি কপাল করিয়া যে পৃথিবীতে আসিয়াছিলাম, তাহা বলিতে পারি না। আজ রাত্রিতে ভূতে আমাকে খাইয়া ফেলিবে। যাহা হউক, এমন সময় একখানি গরুর গাড়ী লইয়া বলাই চিন্তি বিন্দুর গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। বলাই জাতিতে সদগোপ। আমাদের গ্রাম হইতে আধক্রোশ মাঠ পরে আমডাঙ্গায় তাহার বাস। বিন্দুর ফল-পাকড় সে হাটে বিক্রয় করে।

বলাই বলিল,—"মা ঠাকুরাণি! গাড়ী লইয়া আমি নিশ্চিন্তপুর গিয়াছিলাম। বাড়ী

ফিরিয়া যাইতেছি। নারিকেল দিবে বলিয়াছিলে, কই দাও। আজ আমার বাড়ীতে রাখিয়া দিব। কাল ভোরে হাটে লইয়া যাইব।'

বিন্দু বলিল,—"ঘরের ভিতর বোরা করিয়া আমি একশত নারিকেল রাখিয়াছি। আজ তাহা লইয়া যাও। বাকী পরে দিব।"

আমি সম্মুখেই বসিয়াছিলাম আমার থলিটি সে প্রথম তুলিয়া লইল। পা দুইটি আমি থলির ভিতর গুটাইয়া লইলাম। 'সব ঝুনো', একবার বোঁটা দেখে, এই কথা বলিয়া সে আমাকে গাড়ীর সম্মুখভাগে বসাইয়া দিল। তাহার পর আর পাঁচটি নারিকেলের থলি আনিয়া আমার পশ্চাতে উচ্চভাবেই বসাইয়া দিল।

নারিকেল লইয়া বলাই গাড়ী হাঁকাইয়া দিল। বাড়ী যাইতেছে, সেজন্য গরু দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল। গ্রাম পার হইয়া মাঠে গিয়া উপস্থিত হইল। গাড়ীর ভিতর বসিয়া থলির ভিতর যে স্থানে আমার চক্ষু দুইটি ছিল, সেই দুইটি স্থানে আঙ্গুল দিয়া আমি অল্প ফাঁক করিয়া লইলাম। তাহার পর থলির ভিতর হইতে আমি আমার হাত দুইটি বাহির করিতে চেষ্টা করিলাম। এমন সময় আমার মাথা দিয়া বলাইয়ের পিঠে ঢু লাগিয়া গেল। বলাই আপনা-আপনি বলিল,—'সম্মুখের থলিটা নড়িতেছে। এখনি পড়িয়া যাইবে। ভাল করিয়া রাখি।'

এই কথা বলিয়া সে গাড়ী থামাইল ও বাম পার্শ্বে নামিয়া পড়িল। সেই অবসরে আমিও দক্ষিণ পাশ দিয়া নামিয়া পড়িলাম। বলাই ভাবিল যে, থলিটা পড়িয়া গেল। গরুর সম্মুখ দিয়া ঘুরিয়া সে আমাকে তুলিতে আসিল। তাহার পর সে যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার আত্মা-পুরুষ শুকাইয়া গেল। নিশ্চয় সে মনে মনে ভাবিয়াছিল যে—এতকাল নারিকেল বেচিতেছি, নারিকেলপূর্ণ বোরার ভিতর হইতে কালো কালো দুইটা পা বাহির হইতে কখনও দেখি নাই। সেই কালো কালো পা দুইটা দিয়া নারিকেলের বোরা যে ছুটিয়া পালায়, তাহাও কখনও দেখি নাই।

কিছুকাল সে সেই পা-ওয়ালা বোরার দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। তাহার পর "বাপু" এইরূপ শব্দ করিয়া মাঠের মাঝখানে গাড়ী ফেলিয়া অ-পথ দিয়া ক্ষেতের আলি দিয়া পুনরায় আমাদের গ্রামের দিকে দৌড়িল। কিন্তু সে যে আমার ভয়ে সোজা পথ দিয়া আসিতে সাহস করে নাই, তখন তাহা আমি জানিতাম না। পাছে সে আসিয়া আমাকে ধরে, সেজন্য শরীর হইতে বোরা খুলিবার নিমিত্ত, আমি আর দাঁড়াইলাম না। গুণে আবদ্ধ শরীরেই যথাসাধ্য দ্রুতবেগে সোজাপথে আমি গ্রাম অভিমুখে দৌড়িলাম।

গ্রামে প্রবেশ করিলাম। ক্রমে নেকো পালের দোকানের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। গুণের ঈষৎ ফাঁক দিয়া দেখিলাম যে, তাহার দোকান খোলা রহিয়াছে, দোকানে আলো জ্বলিতেছে। অনেকগুলি লোকের কথাবার্তা আমার কানে প্রবেশ করিল। দেখিলাম যে, দোকানের সম্মুখে একখানি খালি পাল্কি রহিয়াছে। এমন সময় একজন মানুষের সহিত আমার ধাক্কা লাগিয়া গেল। সেও পড়িয়া গেল, আমিও পড়িয়া যাইলাম। তাড়াতাড়ি আমি

উঠিয়া দাঁড়াইলাম। সেও উঠিয়া পাছে চীৎকার করে, সেজন্য পথের দক্ষিণ পার্শ্বে একটা বনে গিয়া আমি প্রবেশ করিলাম। বন দিয়া আরও কিছুদূর গিয়া মেনী গোয়ালা-ছুঁড়ীর ঘরের পার্শ্বে গিয়া উপস্থিত হই। শরীর হইতে গুণটা খুলিয়া কোমরে জড়াইলাম। গুণ হইতে একটু সূতা বাহির করিয়া কোমরে বাঁধিলাম। এখনও আমার মাথায় সেই সাহেবী টুপী.ছিল। তাহার পর হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া চারিদিক আমি দেখিতে লাগিলাম।

টুপিটি এখন আমি ফেলিয়া দিলাম। তাহার পর দেখিলাম যে, নেকোর দোকানের সম্মুখে সে পাল্কি নাই। কিন্তু সে স্থানে অনেকগুলি লোক একত্র হইয়াছে। তাহারা সকলেই বলাই চিন্তির বিবরণ শুনিতেছে। বলাই বলিতেছে,—"বিন্দু ঠাকুরাণীর নারিকেলের বোরার ভিতর ভূত ছিল। ভূত লইয়া আমি গাড়ীতে বসিয়াছিলাম। মাঠের মাঝখানে সে আমার ঘাড় ভাঙ্গিয়া রক্ত খাইবার উপক্রম করিয়াছিল। অতি কষ্টে আমার প্রাণরক্ষা হইয়াছিল।' এমন সময় কেষ্টা ছোঁড়া সেই স্থানে আসিয়া সকলকে জিজ্ঞাসা করিল,—"আমার ঠাকুরমা কোথায়? অনেকক্ষণ হইল তেল লইতে আমার ঠাকুরমা দোকানে আসিয়াছিলেন। আমার ঠাকুরমা কোথায়?'

কিছুদিন পূর্বে কেষ্টা আমার বাগানে বাতাবি লেবু চুরি করিয়াছিল। সেজন্য তাহাকে পুলিশে দিতে আমি উদ্যত হইয়াছিলাম। অনেক মিনতি করিলে তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু বলিয়া দিয়াছিলাম যে, পুনরায় যদি সে আমার কোন বস্তু চুরি করে, অথবা আমাকে ক্ষেপায়. তাহা হইলে তাহার নামে আমি নালিশ করিব। আজ আমার কাপড় লইয়া সে কোথায় ফেলিয়া দিয়াছিল। পাছে আমি নালিশ করি, সেই ভয়ে সে কাহারও নিকট আমার নাম করে নাই। 'ঐ পুকুরে কে মাছ ধরিতেছে' দুর্লভীকে কেবল এই কথা বলিয়া সে সরিয়া পড়িয়াছিল।

এখন কেষ্টার ঠাকুরমা কোথায় গেল? কেষ্টার বাপ ও প্রতিবেশিগণ লণ্ঠন লইয়া চারিদিকে অনুসন্ধান করিতে লাগিল, ক্রমে হৈ হৈ পড়িয়া গেল। সকলে বলিল যে, নেঙটা ভূত কেষ্টার ঠাকুরমাকে লইয়া গিয়াছে। গোল শুনিয়া মেনী গোয়ালা-ছুঁড়ী ঘর হইতে বাহির হইল। মেনীর বয়স দশ বৎসর। ছয় বৎসর বয়স্ক একটি ভাই ব্যতীত সংসারে তাহার আর কেহ নাই। কয় বৎসর হইল, তাহাদের বাপ ও মা মরিয়া গিয়াছে। তাহাদের মাসী কলিকাতায় এক ব্যবুর বাড়ীতে চাকরাণী ছিল। মাসী ইহাদিগকে টাকা দিত। মাসীও এখন মরিয়া গিয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ – মেনী ও ভিলে

মেনীর ছয় বৎসর বয়স্ক ভাইয়ের নাম ভিলে। ভিলের হাত ধরিয়া মেনী ঘর হইতে বাহির হইল। পথের ধারে গিয়া দাঁড়াইল। আমি যে বনের ভিতর বসিয়াছিলাম, কেষ্টার ঠাকুরমাকে অনুসন্ধান করিতে পাছে লোকে সেই স্থানে আসে, সেই ভয়ে মেনীর ঘর খালি পাইয়া আমি তাহার ভিতর প্রবেশ করিলাম। মনে করিলাম যে, গোলটা একটু মিটিলে

মেনী ও তাহার ভাই নিদ্রিত হইলে আস্তে আস্তে আমি ঘরে ফিরিয়া যাইব; গুণ পরিয়া বাহির হইলে লোকে আমাকে সন্দেহ করিবে।

ভিলের হাত ধরিয়া মেনী পথের ধারে গিয়া দাঁড়াইল। সুগন্ধী গোয়ালিনী ও অন্যান্য লোক পথ দিয়া যাইতেছিল। মেনী জিজ্ঞাসা করিল,—"গন্ধী মাসি! কি হইয়াছে? চারিদিকে এত গোল কেন?"

সুগন্ধী উত্তর করিল,—"আর বাছা, বলিব কি, সর্বনাশ হইয়াছে। কোথা হইতে একটা নেঙটা গোরা ভূত আসিয়াছে। বলাই চিন্তিকে সে খাইতে গিয়াছিল। তাহাকে খাইতে না পাইয়া কেষ্টার ঠাকুরমাকে লইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমি বলি যে, সে কেষ্টার ঠাকুরমাকে খাইবে না। সেটা গোরা ভূত, কেষ্টার ঠাকুরমাকে মেম করিবে, সেই জন্য তাহাকে লইয়া গিয়াছে।"

ভূতের নাম শুনিয়া মেনী তাড়াতাড়ি ভাইকে লইয়া ঘরে আসিল ও ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া দুইজনে শয়ন করিল। আমি ঘরের এককোণে বসিয়া রহিলাম। ভিলে বলিল,—'দিদি! রায়েদের বাড়ী হইতে আর ভাত আন না কেন? কাল কেবল একটা তাল খাইয়া আমরা ছিলাম। আমাকে সমস্ত দিয়াছিলে, তুমি কেবল একটুখানি খাইয়াছিলে। আজ আমরা কিছুই খাই নাই। রায়েদের বাড়ী হইতে কবে ভাত আনিবে?'

মেনী কেনারাম রায়ের শিশু-পুত্রকে লইত, তাঁহারা দুইবেলা দুইটি ভাত দিতেন। বাড়ীতে আনিয়া সেই ভাত ভাই-ভগিনীতে ভাগ করিয়া খাইত। আজ দুইদিন হইল রায়ের শিশুপুত্র এক সোঁ-পোকা ধরিয়াছিল, মেনী তাহা দেখে নাই, সেজন্য মেনীকে তাঁহারা ছাড়াইয়া দিয়াছেন।

মেনী উত্তর করিল,—'রায়েদের খোকা সোঁ-পোকা ধরিয়াছিল। সেজন্য তাঁহারা আর আমাকে ভাত দিবেন না।' —ভিলে বলিল,—'তবে দিদি আমাদের কি হবে? ভাত কোথা হইতে আসিবে? ক্ষুধায় আমার পেট জ্বলিয়া যাইতেছে।'

মেনী উত্তর করিল,—'দেখ ভিলু! পাড়ার লোকের নিকট হইতে কাল তোমাকে দুইটি ভাত আনিয়া দিতে পারি। কিন্তু চাউলের দাম বাড়িয়াছে, রোজ রোজ লোকে দিবে কেন? আমাদের দশা কি হইবে, তাহাই ভাবিতেছি!'

ভিলে বলিল,—'তবে দিদি কি হবে, ভাত না খাইয়া আর আমি থাকিতে পারি না। আজ সমস্ত দিন কিছু খাই নাই, আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে। ক্ষুথায় আমার পেট জ্বলিয়া যাইতেছে।'

মেনী বলিল,—'আর বৎসর ভড়েদের বাড়ী দুর্গা ঠাকুর দেখিয়াছিলে! সেই দশ হাত আর কত রাঙতা? ভড়েরা তোমাকে মুড়কি ও নারিকেল নাড়ু দিয়াছিল? পূজা হইয়া গেল বোসেদের গঙ্গার ভিতর আছেন। কাল যদি তোমাকে দুইটি ভাত দিতে না পারি, তাহা হইলে আমরা দুইজনে বোসেদের গঙ্গায় যাইব। তোমাকে কোলে লইয়া আমি জলে ঝাঁপ দিব; জলের ভিতর মা দুর্গা আছেন; তাঁহার কাছে আমরা যাইব। তিনি আমাদিগকে অনেক

ভাত দিবেন, আমাদের সকল দুঃখ ঘুচাইবেন।'

ঘরের কোণে বসিয়া ভাই-ভগিনীর কথোপকথন আমি শুনিতেছিলাম। অল্পক্ষণ পরেই দুইজনে ঘুমাইয়া পড়িল। ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া আমি গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম। রাত্রি তখন কেবল নয়টা হইয়াছিল, আমার বাড়ীর দ্বার বন্ধ হয় নাই। চুপি চুপি ঘরের ভিতর গিয়া গুণ ফেলিয়া কাপড় পড়িলাম। তাহার পর এলোকেশীর মুখে শুনিলাম যে, কেষ্টার ঠাকুরমাকে লোকে তখনও খুঁজিয়া পায় নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ — ডমরুধরের হীরক লাভ

মেনী গোয়ালা-ছুঁড়ীর ঘর ঠিক আমার বাগানের পাশে। ঐ স্থানটিতে আমার বাগানে একটু খোঁচ হইয়া আছে। মেনী ও তাহার ভাই মরিয়া গেলে ঐ ভূমিটুকু আমি লইব। তাহা হইলে আমার বাগানের খোঁচটি ঘুচিয়া যাইবে। তাহারা সত্য সত্যই বোসেদের গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া মরিবে কি না, তাহা জানিবার নিমিত্ত পরদিন প্রাতঃকালে বেলা দশটার সময় আমি ঘর হইতে বাহির হইলাম। পথে দেখিলাম যে, কেষ্টাদের বাড়ীতে হু হু করিয়া একখানা পাল্কী আসিয়া লাগিল, পাল্কীর ভিতর হইতে কেষ্টার ঠাকুরমা বুড়ী বাহির হইল; তাহার পর লাঠি ধরিয়া ঠুক ঠুক করিয়া গৃহে প্রবেশ করিল।

বুড়ী কোথায় গিয়াছিল ও কোথা হইতে আসিল, তাহা জানিবার নিমিত্ত আমি সে স্থানে যাইলাম। শুনিলাম যে গোবর্দ্ধনপুর হইতে একজনদের বৌ লইয়া একখানা পাল্কী নিশ্চিন্তপুর গিয়াছিল। বৌ রাখিয়া খালি পাল্কী সন্ধ্যার পর ফিরিয়া নেকোর দোকানে পাল্কী রাখিয়া বেহারাগণ তামাক খাইতেছিল। সেই সময় কেষ্টার ঠাকুরমা তেল লইতে দোকানে আসিতেছিল। বোরার ভিতরে থাকিয়া যে নেঙটা ভূতটা বলাই চিন্তিকে খাইতে গিয়াছিল, সেই ভূতটা আসিয়া কেষ্টার ঠাকুমাকে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিল। কিন্তু দোকানে অনেক লোক দেখিয়া কেষ্টার ঠাকুরমাকে লইঁয়া যাইতে পারিল না। তৎক্ষণাৎ সে বাতাসে মিশিয়া গেল। কেষ্টার ঠাকুরমা উঠিয়া ঘোরতর ভয়বিহ্বল হইয়া, সম্মুখে একখানা পাল্কী ও তাহার দ্বার খোলা দেখিয়া তাহার ভিতর প্রবেশ করিল। তাহার পর দ্বার বন্ধ করিয়া পাল্কীর ভিতর সে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। বেহারাগণ তাহা জানিতে পারে নাই। বলাই চিন্তির নিকট ভূতের গল্প শুনিয়া তাড়াতাড়ি পাল্কী তুলিয়া তাহারা চলিয়া গেল। রাত্রি দুই প্রহরের সময় তাহারা গোবর্দ্ধনপুর পৌঁছিল। সেই স্থানে গিয়া পাল্কীর ভিতর বুড়ীকে দেখিতে পাইল। কিন্তু ভূতের ভয়ে সে রাত্রিতে বুড়ীকে ফিরিয়া আনিতে পারিল না। কারণ, এ সামান্য ভূত নহে, এ নেঙটা গোরা ভূত! আজ প্রাতঃকালে বুড়ীকে বাড়ী ফিরিয়া আনিল। আমি ভাবিলাম যে, সামান্য একটা সাহেবের টুপি পরিয়াছিলাম, তাহাতে কি কাণ্ড না হইল। এ সব নষ্টচন্দ্রের খেলা!

গোয়ালা-ছুঁড়ী মেনীর বাড়ী গিয়া দেখিলাম যে, যাহারা শিশি বোতল ক্রয় করে, সেইরূপ একটা লোক সে স্থানে বসিয়া আছে। ঘরের ভিতর হইতে একটা বোতল ও

একটা শিশি আনিয়া মেনী তাহাকে দেখাইতেছে। শিশির ভিতর ছোট একখণ্ড কাচের ন্যায় কি ছিল। ভিলে তাহা বাহির করিয়া খেলা করিতে লাগিল। আমি দেখিলাম যে, সেই ক্ষুদ্র কাচটাতে পল কাটা আছে, আর সেই পল হইতে নানা বর্ণের আভা বাহির হইতেছে। আমি ভাবিলাম যে এরূপ কাচ ইহাদের ঘরে কোথা হইতে আসিল, যে স্থান হইতে আসুক, এ সামান্য কাচ নহে। বোতল ও শিশির লোকটা মেনীকে চারিটি পয়সা দিল। ভিলের নিকট হইতে আমি কাচখণ্ড চাহিলাম। ভিলে দিতে সম্মত হইল না। দুই পয়সা দিয়া তাহা আমি কিনিতে চাহিলাম। তখন মেনী বলিল,—'দাও, দাদা, দাও। কাচটুকু লইয়া তুমি কি করিবে? ডমরুবাবু দুই পয়সা দিলে আমাদের ছয় পয়সা হইবে। ছয় পয়সার চাউল কিনিলে দুইদিন তোমাকে পেট ভরিয়া ভাত দিতে পারিব।'

ভিলে বলিল,—'বড় ক্ষুধা পাইয়াছে। আমি কলাপাতা কাটিয়া আনি?'

মেনী বলিল,—'না ভাই, এখন নয়। রও, আগে নেকোর দোকান হইতে চাউল কিনিয়া আনি, ভাত রাঁধি তখন কলাপাতা কাটিয়া আনিও।'

শিশি বোতল লইয়া লোকটা চলিয়া গেল। কাচখণ্ড লইয়া আমিও বাটী আসিলাম। মনে করিলাম, কখনই কাচ নহে। এবার কলিকাতা গিয়া কোন জহুরীকে দেখাইব।

কিন্তু সেই বৈকালবেলা আমি বিষম গোলযোগে পড়িলাম। কলিকাতা হইতে একটি লোক আসিয়াছিল। সে কেষ্টার বাপ, গ্রামের চৌকিদার, শিশি-বোতল ক্রেতা; মেনী ভিলে ও অন্যান্য গ্রামবাসীকে সঙ্গে করিয়া আমার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। কলিকাতার সেই লোকটা বলিল,—আমি যোগেশবাবুর সরকার। আমার বাবুর বাড়ীতে এই বালিকার মাসী চাকরাণী ছিল। যোগেশবাবুর স্ত্রী ঘোরতর পীড়িতা হইয়াছেন। ইহার মাসী তাঁহার অনেক সেবা করিয়াছিল। যোগেশবাবুর স্ত্রীর কানে দুইটি হীরার টপ ছিল। কিছুদিন পূর্বে একটি টপ হারাইয়া গিয়াছিল। ভালরূপ জোড়া মিলাইতে না পারিয়া অপর টপটি তাঁহার বাক্সতে তিনি ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন। পুরস্কার স্বরূপ ইহার মাসীকে তিনি সেই টপটি দিয়াছিলেন। তাহার সোনাটুকু ইহার মাসী বোধ হয় বেচিয়া ফেলিয়াছিল। কাচ মনে করিয়া হীরকখণ্ড শিশির ভিতর ফেলিয়া রাখিয়াছিল। তাহার মূল্য চারিশত টাকা। আপনি দুই পয়সায় তাহা ফাঁকি দিয়া লইয়াছেন। যে টপটি হারাইয়া গিয়াছিল, এক্ষণে তাহা মিলিয়াছে। সেজন্য জোড়া মিলাইবার নিমিত্ত এই বালিকা ও তাহার ভ্রাতাকে চারিশত টাকা দিয়া হীরকখণ্ড লইতে বাবু আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। হীরকখণ্ড আপনি আমাকে প্রদান করুন।'

পয়সা দিয়া কিনিয়াছি, কেন আমি দিব, এইরূপ বলিয়া প্রথম আমি দিতে সম্মত হই নাই। কিন্তু পরে বুঝিলাম যে, যোগেশবাবু আমাকে সহজে ছাড়িবেন না। চিরকাল মামলা মোকদ্দমা করিয়া আসিতেছি। মামলা মোকদ্দমা আমি বিলক্ষণ জানি। আমি বুঝিলাম যে, মোকদ্দমা হইলে হীরা আমি রাখিতে পারিব না, চাই কি আমার সাজা হইলেও হইতে পারে। ফলকথা, হীরা আমাকে ফিরিয়া দিতে হইল। যোগেশবাবু হীরার মূল্য চারিশত টাকা

মেনী ও ভিলের নামে একস্থানে জমা রাখিয়াছেন। এক্ষণে প্রতি মাসে তিনি তাহাদিগকে পাঁচ টাকা করিয়া দিতেছেন।

হীরকও গেল, বাগানের খোঁচটিও ভাঙ্গিল না। মনে আমার ঘোরতর দুঃখ হইল। মা দুর্গাকে ভর্ৎসনা করিয়া আমি বলিতে লাগিলাম,—'মা! কেন আমার এরূপ হরিষে বিষাদ করিলে? চারিশত টাকা আমার হাতে দিয়া কেন আবার কাড়িয়া লইলে? এবার হইতে আর মা, তোমার আমি পূজা করিব না।'

পূজা করিব না শুনিয়া মা দুর্গার বোধহয় রাগ হইল। আমাকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত পরদিন তিনি জরাসুরকে প্রেরণ করিলেন। কম্প দিয়া আমার জ্বর আসিল। একদিন গেল, দুই দিন গেল, জ্বর ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। তিন দিনে আমি বেচু ভুএগ্গাকে ডাকিতে পাঠাইলাম। বেচু জাতিতে কৈবর্ত্ত। প্রথম সে চাষ করিত, এখন কবিরাজ হইয়াছে। চারি পাঁচখানা গ্রামে বেচুর বিলক্ষণ পসার হইয়াছে। আমার হাত দেখিয়া বেচু শ্লোক পড়িয়া বলিল,—

'কম্প দিয়া জ্বর আসে কম্প দেয় নাড়ী।
ধড় ফড় ক'রে রোগী যায় যম-বাড়ী।।

ইহাকে বিষ-বড়ি দিতে হইবে।'

এলোকেশী নিকটে ছিলেন। তিনি বলিলেন,—'সে কি! তিন দিনের জ্বরে বিষ-বড়ি?'

বেচু বলিল,—এ সামান্য বিষ-বড়ি নয়। এ নূতন ঔষধ সম্প্রতি আমি নিজে মনগড়া করিয়া প্রস্তুত করিয়াছি। ইহাতে কোন দোষ নাই। ইহার গুণ অনেক। এই দেখ, আমি নিজে আস্ত দুইটা খাইয়া ফেলি।'

এই কথা বলিয়া বেচু নিজে দুইটা বড়ি গিলিয়া ফেলিল। তাহার পর মধুর সহিত খলে মাড়িয়া আমাকে ক'টা বড়ি খাইতে দিল।

বেচু চলিয়া গেল। তিন ঘণ্টা পবে তাহার ঔষধের গুণ প্রকাশিত হইল। আমার চক্ষু দুইটি লাল হইয়া উঠিল। বুক ধড়ফড় করিতে লাগিল। শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল। প্রাণ যায় আর কি! এলোকেশীর মেজাজটা কড়া বটে, কিন্তু শরীরে অনেক গুণ আছে। মাটীতে পড়িয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন।

ডমরুধরের বন্ধু আধকড়ি বলিলেন,—'হাঁ, সেই সময় আমি তোমার বাড়ীতে আসিয়াছিলাম। তোমার সেই অবস্থা দেখিয়া তাড়াতাড়ি আমি বেচু ভুএগ্গাকে ডাকিতে যাইলাম। বেচু ঘরে ছিল না। খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিলাম যে, সে এক পানা-পুকুরের জলে গা ডুবাইয়া বসিয়া আছে। তাহার চক্ষু দুইটি জবাফুলের ন্যায় হইয়াছে। পানা-পুকুরের পচা পাঁক তুলিয়া মাথায় দিতেছে! আমি বলিলাম,—'বেচু! করিয়াছ কি? ডমরুধরকে তুমি কি ঔষধ দিয়াছ? তোমার ঔষধ খাইয়া ডমরুধর মারা পড়িতে বসিয়াছে।' মাথায় কাদা দিতে দিতে বাজখাঁই স্বরে বেচু উত্তর করিল,—'বড়ি খাইয়া আমিই বা কোন ভাল আছি।' আমি বুঝিলাম যে সে অবস্থায় তাহাকে আর কোন কথা বলা বৃথা। পুনরায় তোমার বাটীতে

আনিয়া মাথায় অনেক জল দিয়া সে যাত্রা তোমার প্রাণ আমরা রক্ষা করিলাম।'

ডমরুধর বলিলেন,—'বেচুর ঔষধ হইতে প্রাণ রক্ষা হইল বটে কিন্তু জ্বর আমার গেল না। পীড়া কঠিন হইয়া উঠিল। তোমরা সকলেই আমাকে দেখিতে আসিতে। তোমরা সকলেই মনে করিয়াছিলে যে, সে যাত্রা আমি আর রক্ষা পাইব না। একদিন রাঘব ও নকুল ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। বিছানার দুইপার্শ্বে দুইজনে বসিয়া আমাকে অনেক আশ্বাস ও ভরসা দিতে লাগিলেন।

রাঘব বলিলেন,—দেখুন ভট্টাচার্য্য মহাশয়, অঙ্গদ মজুমদারকে আপনি জানিতেন? তাহার শরীরটি ঠিক ডমরুধরের মত ছিল। এইরূপ কাটি কাটি হাত, এইরূপ কাটি কাটি পা, শরীরে চর্বি একটুও ছিল না। তাহার পীড়াটিও ঠিক এইরূপ হইয়াছিল। চিতার উপর তাহাকে শোয়াইয়া যখন আমরা আগুন দিলাম, তখন সেই আগুনের তাতে তাহার শরীরটি শট্‌কে উঠিল। ধনুকের মত হইয়া তাহার মাজাটা চিতার উপর উঠিয়া পড়িল। কাঠ সব পুড়িয়া গেল। কিন্তু অঙ্গ পুড়িল না।

তাহাকে আমরা জলে ফেলিয়া দিলাম। কিন্তু আমরা স্নান করিয়া উঠিতে না উঠিতে, পাঁচ ছয়টা কুকুর ও শৃগাল আসিয়া জলে ঝাঁপাঝাঁপি করিয়া তাহাকে খাইয়া ফেলিল। ডমরুবাবু তোমার শরীরটিও ঠিক সেইরূপ। কিন্তু তোমার ভয় নাই। আমরা অধিক কাঠ দিয়া দেখিব। তবে নিতান্তই যদি তুমি পুড়িয়া না যাও, তাহা হইলে কাজেই তোমাকে আধপোড়া করিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে।

নকুল ভট্টাচার্য আমাকে বলিলেন,—'তোমার পুরোহিতের বাড়ী এ স্থান হইতে দুই ক্রোশ। মন্ত্র পড়াইতে রাত্রিতে যদি আমাকে ঘাটে যাইতে হয়, তাহা হইলে শ্রাদ্ধ আমাকে দিয়া করাইতে হইবে। নিজের পুরোহিতকে দিয়া করাইতে পারিবে না। তুমি সে কথা বাড়ীতে বলিয়া রাখ। মৃত্যু হইয়া গেলে আর কথা বলিতে পারিবে না,—

মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর।
অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।'

এলোকেশী পাশের ঘরে বসিয়া এইসব কথা শুনিতেছিলেন। সহসা খেঙরা হস্তে উগ্রচণ্ডীর ন্যায় রণমূর্তিতে আসিয়া সপ্‌ পরিয়া এক ঘা নকুলের পিঠে বসাইয়া দিলেন। তাহার পর আর এক ঘা রাঘবের মাথায়। ঘর হইতে দুইজনে পলাইলেন। এলোকেশী তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া আরও দুই চারি ঘা বসাইয়া দিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ — ডমরুধরের বুকে প্যাঁচ

ঈষৎ হাস্য করিয়া আমি বলিলাম,—'এলোকেশী! তুমি যাহা করিলে, তাহাতে আমার অর্ধেক রোগ ভাল হইয়া গেল। আর আমাকে কোনরূপ ঔষধ খাইতে হইবে না।' এলোকেশী সে কথা শুনিলেন না। পরদিন গোবর্ধনপুরে তিনি ডাক্তার আনিতে পাঠাইলেন।

ডাক্তার আসিয়া আমার নাড়ী দেখিলেন, জিহ্বা দেখিলেন, পেট টিপিয়া দেখিলেন। বুকের উপর বামহস্ত রাখিয়া দক্ষিণ হস্তের আঙ্গুলির ডগা দিয়া ঠাকুঠুকি করিলেন। তাহার পর আমার বুকে চোঙ বসাইলেন। চোঙের অন্যদিকে কান দিয়া তিনি বলিলেন,—'এখানে একটা প্যাঁচ আছে।' এইরূপ তিন চারিটা প্যাঁচের কথা বলিলেন। প্যাঁচ আছে শুনিয়া আমার মনে ভরসা হইল। আমি ভাবিলাম যে, আমার যখন এতগুলি প্যাঁচ আছে, তখন আমি মরিব না, বহুকাল আমি বাঁচিব।

ডাক্তার তাহার পর পুলটিস ও ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। খাইবার নিমিত্ত আমাকে সাবু দিতে বলিলেন। সাবুর নাম শুনিয়া আমার সর্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। আমি বলিলাম,— 'কি! সাবুদানা? বিলাতি জিনিষ। তাহা কখনই খাইব না। চিরকাল আমি পরম নিষ্ঠাবান হিন্দু। অখাদ্য খাইয়া আমি অধর্ম করিতে পারিব না। ডাক্তারবাবু! আপনি বোধ হয় জানেন না যে, কয়েক বৎসর পূর্বে সন্ন্যাসী-বিভ্রাটে পড়িয়া আমার সূক্ষ্ম শরীর যমের বাড়ী গিয়াছিল। যখন আমার বিচার হয়, তখন আমি যমকে বলিয়াছিলাম যে, একাদশীর দিন কখন আমি পুঁইশাক ভক্ষণ করি নাই। যম সেই কথা শুনিয়া প্রসন্নবদনে হর্ষোৎফুল্ল লোচনে পুলকিত মনে বলিলেন,—'সাধু সাধু সাধু! এই মহাত্মা একাদশীর দিন পুঁইশাক ভক্ষণ করেন না। ইঁহার পদার্পণে আজ আমার যমপুরী পবিত্র হইল। শীঘ্র তোমরা যমনীকে শঙ্খ বাজাইতে বল। যমকন্যাগণকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে বল। বিশ্বকর্মাকে ডাকিয়া আন। ভুঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ সত্যলোক পারে ধ্রুবলোকের উপরে এই মহাত্মার জন্য মন্দাকিনী কলকলিত, পারিজাত-পরিশোভিত, কোকিল-কুহরিত, ভ্রমর-গুঞ্জরিত, অপ্সরা পদ-নূপুর ঝুঞ্ঝনিত, হীরা-মাণিক-খচিত, নূতন এক স্বর্গ নির্মাণ করিতে বল। শুনিলেন ডাক্তারবাবু! খাদ্যাখাদ্যের বিচার করিলে কত ফল হয়? আমি আশ্চর্য হই যে, টিকিনাড়ারা এখানে-ওখানে যায় কেন, ধর্মকথা শিখিতে আমার কাছে আসে না কেন?'

আমি পুনরায় বলিলাম,—'ডাক্তারবাবু! বুকে আমি তোমারও জগদ্দল পাথর মসৃনের পুলটিস চাপাইব না, তোমার ঔষধও আমি খাইব না। কেবল আমি মা দুর্গাকে ডাকিব, আর আমাদের কাটিগঙ্গার জল খাইব। আমাদের কাটিগঙ্গার জল মকরধ্বজের বাবা।'

আমি কাহারও কথা শুনিলাম না। সেইদিন হইতে আমি কেবল কাটিগঙ্গার জল খাইতে লাগিলাম। সেই রাত্রিতে মা দুর্গা শিয়রে বসিয়া আমার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন,—'ডমরুধর! বাছা! তুমি আমার বরপুত্র। কেন তুমি বলিয়াছিলে যে, আর আমার পূজা করিবে না? সেই জন্য তোমাকে এই রোগ দিয়াছি। কিন্তু ভয় নাই, তোমাকে রোগ হইতে মুক্ত করিলাম। তাহার পর আরও একটুও নূতন বুদ্ধি তোমাকে আমি দিলাম। এই বুদ্ধিটুকু তুমি খেলাইবে। তাহা হইলে হীরাখণ্ড হাতছাড়া হইয়া তোমার যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহার দশগুণ তোমার লাভ হইবে। কিন্তু বাছা, তোমার পূজায় আমি যে তৃপ্তিলাভ করি, বঙ্গদেশে কাহারও পূজায় সেরূপ তৃপ্তিলাভ করি না।'

সপ্তম পরিচ্ছেদ — ডমরুধরের নূতন বুদ্ধি

সেই দিন হইতে আমার রোগ দূর হইয়া গেল। জ্বর গেল। দিন দিন শরীরে বল পাইতে লাগিলাম। রোগের পর আমার যেন নূতন শরীর হইল। এখন মা যে নূতন বুদ্ধিটুকু আমাকে দিয়াছেন, তাহা খেলাইয়া হীরকের দশগুণ টাকা আদায় করিতে আমি চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

একদিন বসিয়া বুদ্ধি খেলাইতেছি এমন সময় আমার মনে কোন বিষয় উদয় হইল। আমি একটু হাসিয়া ফেলিলাম। এলোকেশী জিজ্ঞাসা করিলেন,—'হাসিতেছ কেন? আমি বলিলাম,—'চুপ কর। বুদ্ধি পাকিয়া আসিতেছে।'

খুলনা জেলায় বাঘেরহাটের নিকট নীলামে আমি এক মহল কিনিয়াছিলাম। তাহা লইয়া আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া ত্রিশঙ্কুবাবুর সহিত মোকদ্দমা চলিতেছিল। অন্য বিষয়ে আমি টাকা খরচ করি না বটে, কিন্তু মোকদ্দমার জন্য টাকা খরচ করিতে কখনও কাতর হই না। এক একটা দলিল জাল করাইতে আমি পাঁচশত টাকা ব্যয় করি। এক এক জন মিথ্যা সাক্ষীকে আমি পাঁচ হইতে দশ টাকা দিয়া বশ করি। মিথ্যা মোকদ্দমা আমি যেমন সাজাইতে পারি, মিথ্যা সাক্ষীদিগকে আমি যেমন শিখাইতে পারি, এমন আর কেহ পারে না। আদালতে হলফ করিয়া আমি নিজে যখন মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করি, তখন কোন উকীল জেরা করিয়া আমাকে ঠকাইতে পারে না। ত্রিশঙ্কুবাবু আমার সহিত পারিবেন কেন? দুটো আদালতে তিনি হারিয়া গিয়াছিলেন।

মহলের একস্থানে বনের ভিতর প্রাচীন ইটে গাঁথা একটি প্রাচীর ও শানের চাতাল ছিল। সেই চাতালের কথা আমার মনে পড়িল। আমি কলিকাতায় যাইলাম। কোন লোককে টাকা দিয়া একখানি তামার পাতে সে কালের বাঙ্গালা ভাষায় অনেকগুলি কথা ক্ষোদিত করাইলাম। তাহা লইয়া ঘিটটু ধাঙ্গড়ের সহিত আমি বাঘেরহাট মহলে গমন করিলাম। ঘিটটুকে সেই চাতালের উপর সপরিবারে বাস করিতে বলিলাম! গাছের ডালপালা দিয়া তাহার উপর সে এক ঝুপড়ি প্রস্তুত করিল। ত্রিশঙ্কুবাবু বন্দুক লইয়া একটি কুকুরের সহিত প্রায় প্রতিদিন প্রাতঃকালে সেই পথ দিয়া গমন করেন। আমি টোপ ফেলিলাম। ত্রিশঙ্কুবাবু এখন কি করেন, তাহা দেখিবার নিমিত্ত আমি খুলনায় আসিয়া বাসা ভাড়া করিয়া বসিয়া রহিলাম।

একদিন প্রাতঃকালে ত্রিশঙ্কুবাবু মহলের নিকট সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি দেখিলেন যে, ঘিটটু ধাঙ্গড়ের বৃদ্ধ মাতা ছোট একখানি তামার পাত মাজিয়া পরিষ্কার করিতেছে। ত্রিশঙ্কুবাবু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তোর হাতে ওটা কি?'

বৃদ্ধা উত্তর করিল,—'জানি না বাবু কি! উনুন করিবার নিমিত্ত চাতালের শান খুঁড়িতে খুঁড়িতে এইটা আমি পাইয়াছি।'

ত্রিশঙ্কুবাবু হাতে করিয়া দেখিলেন। পুরাতন বাঙ্গালা ভাষায় তাহাতে যে কথাগুলি লেখা ছিল তাহার একটু দেখিয়াই তিনি চমকিত হইলেন। এক টাকা দিয়া তামার পাতটি

বৃদ্ধের নিকট হইতে তিনি কিনিয়া লইলেন। তাহার পরদিন খুলনার বাসায় তিনি আমার নিকট আসিয়া বলিলেন,—'ডমরুধরবাবু সামান্য ঐ মহলটা লইয়া মিছিমিছি আর মোকদ্দমা কেন? আপনারও টাকা খরচ হইতেছে, আমারও টাকা খরচ হইতেছে। দুইশত টাকায় আপনি মহলটি কিনিয়াছেন, পাঁচশত টাকায় মহলটি আমাকে ছাড়িয়া দিন।'

আমি উত্তর করিলাম,—'মহলটির জন্য আমাকে অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছে। আমি উহা ছাড়িব না।'

ত্রিশঙ্কুবাবু মূল্য বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। হাজার, দুই হাজার, তিন হাজার, চারি হাজার পর্যন্ত উঠিলেন। তথাপি আমি সম্মত হইলাম না। চারি হাজার পর্যন্ত উঠিয়া তিনি বলিলেন,—'আর আমি পারি না। আর আমার ক্ষমতা নাই।'

অবশেষে সাড়ে চারি হাজার টাকায় আমি তাঁহাকে মহলটি বিক্রয় করিলাম। ধাঙ্গড়দিগকে লইয়া আমি গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলাম। পরে শুনিলাম যে, ত্রিশঙ্কুবাবু প্রায় বিশহাত গভীর করিয়া সেই চাতাল ও নিকটবর্তী স্থান খুঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহার পরিশ্রম বৃথা হইয়াছিল। মাটীর ভিতর হইতে একটি পয়সাও বাহির হয় নাই।

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কেন? কি পাইবেন তিনি আশা করিয়াছিলেন?'

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—'পুরাতন বাঙ্গলা ভাষায় সেই তাম্রফলকে লেখা ছিল—

বিসমিল্লা। আমি মহম্মদ তাহির প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ ছিলাম। এক্ষণে পীরখাঞ্জে আলি সাহেব হইয়া মুসলমান হইয়াছি। আমার পুত্রগণ ব্রাহ্মণ আছে। তাহাদের বংশধরগণের ভরণপোষণের নিমিত্ত এই চাতালের দশহাত নিচে আমি এক লক্ষ রৌপ্য-মুদ্রা পুঁতিয়া রাখিলাম। এই অর্থ জিন্দাগাজী সাহেবের আশ্রয়ে রাখিলাম। যখন আমার বংশধরগণ নিতান্ত দরিদ্র হইবে, তখন তিনি এই অর্থ তাহাদিগকে প্রদান করিবেন। ইতি ১৫ই জিলহিজ্জা ৮৬২ হিজরি।' ঐ তাম্রপত্র আমি লেখাইয়া আনিয়াছিলাম। ত্রিশঙ্কুবাবুকে দেখাইবার নিমিত্ত আমি ধাঙ্গড় বুড়ীকে দিয়াছিলাম। মায়ের কৃপায় বুদ্ধি খেলাইয়া হীরার দশগুণ মূল্য আমি লাভ করিলাম।

লম্বোদর বলিলেন,—'ভাদ্র মাসে ভূত বলিয়া গ্রামে একটা গোল উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু তুমি যে তার গোঁসাই, তাহা জানিতাম না।'

সকলে বলিল,—'ধন্য ডমরুধর, ধন্য তুমি।'

ডমরুধর বলিলেন,—'তাই তোমাদের সকলকেই আমি বলি, মা দুর্গাকে তোমরা ভক্তি কর। মা দুর্গা তোমাদিগকে ধন দিবেন, মান দিবেন আর হাওয়াখোর বাবুদের আমি বলি যে, মায়ের পূজা ছাড়িয়া বিদেশে তোমরা হাওয়া খাইতে যাইও না। ঘরে থাকিয়া ভক্তিভাবে মায়ের পূজা কর। যত হাওয়া চাও, মা তোমাদিগকে দিবেন। ঘরে বসিয়া স্বচ্ছন্দে পেট ভরিয়া হাওয়া খাইতে পারিবে।'

সপ্তম গল্প

প্রথম পরিচ্ছেদ — ভিলেট মন্ত্র

পূজার পঞ্চমীর দিন ডমরুর যথারীতি বন্ধু-বান্ধবের সহিত প্রতিমার সম্মুখে বসিয়া আছেন। হাঁ করিয়া তিনি বলিলেন,—'তোমরা একবার আমার মুখের ভিতরটা ভাল করিয়া দেখ।' সকলে দেখিলেন। লম্বোদর বলিলেন,—'তোমার মুখের ভিতর কি আছে? কিছুই নাই। ফোকলা মুখ। তিমির গিরিগহ্বরের ন্যায়। ডমরু উত্তর করিলেন,—'তোমাদের পাপ চক্ষু তৈলপেষী বলদের ঠুলি দ্বারা আবৃত। তোমরা দেখিবে কেবল অন্ধকার।'

গজানন জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তবে তোমার মুখের ভিতর কি আছে?

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—'আমার জিহ্বা ও কণ্ঠে সরস্বতী দেবী অধিষ্ঠিতা আছেন। পূর্বে বলিয়াছি যে, আমি মা দুর্গার বরপুত্র। তাহার পর তাঁহার সঙ্গে যে দেবতাগুলি আগমন করেন, একে একে সকলের আরাধনা করিয়া আমি সিদ্ধিলাভ করিয়াছি। কার্তিকের বরে আমার কন্দর্পের ন্যায় হইয়াছে। মা সরস্বতীর বরে আমি এত বড় বিদ্বান হইয়াছি। মেঘনাদবধ কে লিখিয়াছে জান?'

লম্বোদর উত্তর করিলেন,—'কেন? মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

ডমরুধর বলিলেন,—'হাঁ, সকলের তাই বিশ্বাস। কিন্তু কলিকাতায় যখন আমি চাকরি করিতাম, তখন সন্ধ্যার পর সাহেবী পোষাক পরিয়া কে আমার নিকট আসিত? দুই ঘণ্টাকাল আমি যাহা বলিতাম, কে তাহা লিখিয়া লইত? সে লোকটি অপর কেহ নয়। সে লোকটি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। মেঘনাদবধ কাব্য আগাগোড়া আমার দ্বারা রচিত। মাইকেল আমাকে অধিক টাকা দিতে পারিতেন না। টাকা দিতেন বঙ্কিম। কোনদিন পাঁচ, কোনদিন দশ। যেদিন দুর্গেশনন্দিনী শেষ করিয়া তাঁহার হাতে দিলাম, সেদিন তিনি আমাকে একেবারে এতশত টাকা দিয়াছিলেন। অন্যান্য পুস্তকের জন্যও তিনি আমাকে অনেক টাকা দিয়াছিলেন। মাইকেল ও বঙ্কিম অনেক কাকুতি-মিনতি করিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন যে,—মহাশয়! আপনি যে আমাদের পুস্তক লিখিয়া দিয়াছেন, আমরা বাঁচিয়া থাকিতে সে কথা প্রকাশ করিবেন না।' সেই জন্য এতদিন চুপ করিয়াছিলাম। আর দেখ, এখন যত বড় বড় গ্রন্থকার জীবিত আছেন, অন্ততঃ সাধারণে যাঁহাদিগকে গ্রন্থকার বলিয়া জানে, তাঁহাদের সমুদয় পুস্তকের প্রণেতা এই শর্মা। হাসি পায়। নাম করিব না। নাম করিলে, তাঁহাদের মান-সম্ভ্রম একেবারে যাইবে। অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া নাম করিতে তাঁহারা আমাকে মানা করিয়াছেন। সেই জন্য চুপ করিয়া আছি। কিন্তু তাঁহারা যে গ্রন্থকার বলিয়া লোকের নিকট পরিচয় দেন, তাই আমার হাসি পায়।

এই দেখ, আজকাল হোমরুল বলিয়া একটা হুজুগ পড়িয়াছে! সেই সম্বন্ধে বক্তৃত করিতেছেন। ইহা অপেক্ষা আমি শতগুণ বক্তৃতা করিতে পারি। আমার বক্তৃতা লোবে নানারূপ মুখভঙ্গী করিয়া অবাক হইয়া শ্রবণ করে।

আমার প্রতি মা স্বরস্বতীর সামান্য কৃপা নহে। সে বৎসর কার্তিকের ময়ূরে চড়িয়া আ

যখন আকাশ ভ্রমণে গিয়াছিলাম, তখন মায়ের কৃপায় আমার মুখ দিয়া মহামন্ত্র বাহির হইয়াছিল। এ তোমার হিড়িং বিড়িং মন্ত্র নহে। জিলেট মন্ত্র। আসল বীজমন্ত্র। এ মন্ত্রের যে কি অদ্ভুত শক্তি, এতদিন তাহা আমি জানিতাম না? এইবার জানিতে পারিয়াছি। এই মন্ত্রের প্রভাবে আমি শুক্লাম্বর ঢাককে ঘোর বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছি। প্রেতযোনি-প্রাপ্ত তাঁহার কন্যাকে উদ্ধার করিয়াছি। সমুদ্রযাত্রাজনিত পাপ হইতে তাঁহার জামাতাকে পরিত্রাণ করিয়াছি।

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—'শুক্লাম্বর ঢামমহাশয়ের কি হইয়াছিল?'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ – ঢাকমহাশয়

ডমরুধর বলিলেন,—'শুক্লাম্বর ঢাকমহাশয় গুরুগিরি করেন। তাঁর অনেক শিষ্য আছে। গুরুগিরি করিয়া তাঁহার বিলক্ষণ দুপয়সা উপার্জন হয়। দোতলা কোঠা বাড়ীতে তিনি বাস করেন। মোকদ্দমা-মামলা সম্বন্ধে তাঁহার যেরূপ বুৎপত্তি, এরূপ ব্যুৎপত্তি প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। নানা বিষয়ে ঢাকমহাশয় আমার সহায়তা করেন। তিনি আমার পরম বন্ধু। ঢাকমহাশয় অতি নিষ্ঠাবান পুরুষ। পূজা-আহ্নিক জপ-তপে তিনি অনেক সময় অতিবাহিত করেন। সেজন্য তাঁহার প্রতি আমার অগাধ ভক্তি। আজকাল ব্রাহ্মণেরা ত্রিসন্ধ্যা করে না। টিকিনাড়ারা সে উপদেশ কাহাকেও প্রদান করে না। কিন্তু ঢাকমহাশয় সে প্রকৃতি লোক নহেন। কাহাকেও চা বা বরফ খাইতে দেখিলে তিনি আগুনের ন্যায় জ্বলিয়া উঠেন। সন্ধ্যা-আহ্নিকে যাহাতে লোকের প্রবৃত্তি হয়, সে বিষয়ে তিনি চেষ্টা করেন।

গত বৈশাখ মাসে একদিন ঢাকমহাশয় আমাকে ডাকিতে পাঠাইলেন। সূর্য অগ্নিবৃষ্টি করিতেছেন। রৌদ্রে পুড়িয়া যাইতেছে। আমি তাঁহার বাড়ী গমন করিলাম। ঘোরপিপাসায় কাতর হইয়া আমি কোঁৎ কোঁৎ করিয়া একঘটি জল খাইয়া ফেলিলাম। কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে ঢাকমহাশয় আমাকে বলিলেন যে, তাঁহার কন্যা কুন্তলার প্রখর জ্বর হইয়াছে। কুন্তলার বয়স নয় বৎসর। আট বৎসর বয়সে ঢাকমহাশয় তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন। বিবাহের দুই মাস পরেই সে বিধবা হইয়াছিল। দোতলার উপর যে ঘরে কুন্তলা শুইয়াছিল, ঢাকমহাশয়ের সহিত আমি সেই ঘরে গমন করিলাম।

জ্বরে কুন্তলার কাঠ ফাটিতেছে। আগুনের ন্যায় শরীরের উত্তাপ হইয়াছে। ক্রমাগত এ-পাশ ও-পাশ করিতেছে। মা একটু জল দাও, মা একটু জল দাও, ক্রমাগত এই কথা বলিতেছে। মা! পিপাসায় আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। একটু জল দাও মা! একটুখানি দাও। কেবল মুখটি ভিজাইয়া দাও। একটু জল না খাইয়া আর থাকিতে পারি না। জল, জল, জল।

বিরস বদনে মা নিকটে বসিয়া আছেন। মাঝে মাঝে বাতাস করিতেছেন। মাঝে মাঝে চক্ষুর জল মুছিতেছেন।

ঢাকমহাশয় আমাকে চুপি চুপি বলিলেন,—'আজ একাদশী। বিধবা। সেইজন্য জল দিতে বারণ করিয়াছি। কিন্তু জল দিতে আমার গৃহিণীর ইচ্ছা। এখন করি কি? সেইজন্য তোমাকে ডাকিতে পাঠাইয়াছিলাম।"

নীচে গিয়া আমি বলিলাম,—"বাপ রে! জল কি দিতে পারা যায়? ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা। একাদশীর দিন জল খাইতে দিলে তাহার ধর্মটি একেবারে লোপ হইয়া যাইবে।"

ঢাকমহাশয় তাহাই করিলেন। কন্যাকে জল দিলেন না। রাত্রিতে কন্যা পাছে নিজে জল চুরি করিয়া খায়, অথবা তাহার কষ্ট দেখিয়া মাতা, ভগিনী কি অপর কেহ পাছে তাহাকে জল প্রদান করে, সেজন্য সন্ধ্যার সময় কুন্তলাকে তিনি নীচের তালার এক ঘরে বন্ধ করিয়া চাবি দিয়া দিলেন। সমস্ত রাত্রি পীড়িতা কন্যা একেলা সেই ঘরে রহিল। ধর্ম রক্ষা সম্বন্ধে ঢাকমহাশয়ের এমনি দৃঢ়পণ।

প্রাতঃকালে যখন তিনি ঘরের চাবি খুলিলেন, তখন সকলে দেখিল যে, বালিকা পিপাসায় হতজ্ঞান হইয়া ঘরের ভিজা মেঝের একধার হইতে অপর ধার পর্যন্ত সমস্ত রাত্রি বার বার চাটিয়াছে। অবশেষে অজ্ঞান হইয়া ঘরের এককোণে পড়িয়া আছে। মাতা তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। কিন্তু তাহার মাথাটি লুটিয়া পড়িল। সেদিন দ্বাদশী। মাতা তাহার মুখে জল দিলেন, কিন্তু সে গিলিতে পারিল না। দুই কশ দিয়া জল বাহিরে আসিয়া পড়িল। সে আর কথা কহিল না। শেষকালে একবারমাত্র বলিল,—"জল—জল।" এই কথা বলিয়া সে প্রাণত্যাগ করিল।

এই ঘটনার কথা যখন চারিদিকে প্রচারিত হইল, তখন দেশশুদ্ধ লোক ঢাকমহাশয়কে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। সকলে বলিল,—কি দৃঢ় মন! কি ধর্মের প্রতি আস্থা এরূপ পুণ্যবান লোক কলিকালে হয় না। তাঁহার প্রতি লোকের এত ভক্তি হইল যে, এক মাসের মধ্যে তাঁহার এক শতের অধিক নূতন শিষ্য হইল।

কন্যার মৃত্যুতে ঢাকমহাশয়ের আনন্দ হইল। তিনি বলিলেন, বিধবা হইয়া চিরজীবন দুঃখে যাপন করা অপেক্ষা মরাই ভাল। কিন্তু মৃতকন্যা তাঁহাকে অধিক দিন আনন্দভোগ করিতে দিল না। একদিন রাত্রি দুই প্রহরের সময় সহসা 'জল, জল। হা জল! হা জল!" এইরূপ ভীষণ চীৎকার করিয়া সে বাড়ীর চারিদিকে ছট্‌ফট্ করিয়া বেড়াইল। সকলের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সকলে ঘোর ভয়ে ভীত হইল। ইহার চারিদিন পরে ঢাকমহাশয়ের পুত্রটি মরিয়া গেল। এইবার ঢাকমহাশয় শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। পনের দিন পরে আবার কুন্তলার ভূত সেইরূপ জল জল করিয়া চীৎকার করিল। এবার মাতঙ্গিনী নামক দাসীর মৃত্যু হইল।

ফলকথা, যখনই কুন্তলার ভূত চীৎকার করিত, তখনই বাড়ীর একটা না একটা লোক মরিতে লাগিল। দাসীর মৃত্যুর পর ঢাকমহাশয় গয়াতে পিণ্ড দিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। কারণ, কিছুদিন পরে পুনরায় যখন চীৎকার হইল, যখন ঢাকমহাশয়ের ছট্টু নামক চাকর মরিয়া গেল। বিধবা হইয়া একাদশীর

দিন ভিজা মেঝে চাটা পাপটি সামান্য নহে। গয়াতে হাজার পিণ্ড দিলেও ইহা ক্ষয় হয় না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ – মোল্লা জামাতা

কুন্তলাকে কি উপায়ে উদ্ধার করা যায়, সেই সম্বন্ধে ঢাকমহাশয় আমার সহিত অনেক পরামর্শ করিলেন। কিন্তু আমি তাঁহাকে কিছু বলিতে পারিলাম না।

ঢাকমহাশয়ের এক বালক দৌহিত্র আছে। তাহার নাম ভুলু। ভুলু ঢাকমহাশয়ের প্রাণস্বরূপ। এক মুহূর্ত তাহাকে চক্ষুর আড় করিয়া ঢাকমহাশয় থাকিতে পারেন না; বিশেষতঃ পুত্রহীন হইয়া তাঁহার যত স্নেহ মমতা ভুলুর উপর পড়িয়াছিল। পাছে কুন্তলার চীৎকারে ভুলুর কোন অনিষ্ঠ হয় সেজন্য ঢাকমহাশয় ঘোরতর ভীত হইলেন।

বিপদের উপর বিপদ। ঢাকমহাশয়ের জামাতা, ভুলুর পিতা, যাহার নাম কেশব, বোগদাদে গিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত ঢাকমহাশয়ের সদ্ভাব ছিল না। ঢাকমহাশয় আশা করিয়াছিলেন যে, তিনি লড়াইয়ে মারা পড়িবেন। ভুলু ও ভুলুর মাতা চিরকাল তাঁহার নিকট থাকিবে। ভুলুর মাতার নাম কালিকা। বাল্যকাল হইতে তাহাকে আমি কোলে-পিঠে করিয়াছি। কন্যার ন্যায় তাহাকে আমি স্নেহ করি। এত চুল কখন আমি কাহারও দেখি নাই। কিছুদিন পূর্বে দোতলার ঘরে জানালার ধারে সে চুল এলো করিয়া বসিয়াছিল। সে যে কি অপূর্ব শোভা হইয়াছিল, তাহা তোমাদিগকে আর কি বলিব।

ঢাকমহাশয়ের জামাতা, কালিকা দেবীর স্বামী। ভুলুর পিতা কেশব লড়াইয়ে মারা যান নাই। তিনি দেশে ফিরিয়া আসিলেন। দেশে আসিয়া তিনি কালিকা ও ভুলুকে লইতে পাঠাইলেন। ঢাকমহাশয়ের মাথায় ঠিক যে- বজ্রাঘাত হইল। তিনি বলিলেন,—'কিছুতেই আমি আমার কন্যাকে ও দৌহিত্রকে তাহার বাড়ী পাঠাইব না। সে সমুদ্র পার হইয়া বিদেশে গমন করিয়াছে। তাহার জাতি গিয়াছে।"

কিন্তু ঢাকমহাশয়ের কয়েকজন শিষ্য যাহারা বি-এ, এম-এ পাশ করিয়াছে, তাহারা বলিল যে,—"মহাশয়! এমন কাজ করিবেন না। আপনার জামাতা রাজকার্য্যে বিদেশে গমন করিয়াছিলেন। মহাসংগ্রামে পৃথিবী টলমল করিতেছে। জর্মণদিগকে যদি সম্পূর্ণ পরাজিত করা না যায়, তাহা হইল ভবিষ্যতে পৃথিবীর ঘোর অনিষ্ট ঘটিবে। আমাদেরও সর্বনাশ হইবে। ইংরেজের প্রতাপে আমরা সুখে নিষ্কাপদে বাস করিতেছি। আমাদের প্রাণপণে ইংরেজের সাহায্য করা উচিত। আপনি যাহা মনস্থ করিয়াছেন, তাহা করিলে রাজার বিরুদ্ধে কাজ করা হইবে। এমন কাজ কখন করিবেন না।"

এইরূপ কথা শুনিয়া ঢাকমহাশয় আমাকে ডাকিতে পাঠালেন। আমি গিয়া বলিলাম,—'ইংরেজ প্রজার ধর্মে হস্তক্ষেপ করিবেন না। সাগর অতি ভয়ানক বস্তু। জগন্নাথে গিয়া আমি দেখিয়াছি তিনটা ঢেউ খাইয়া আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছিল। সে সাগর-পারে কেহ যাইলে হিন্দুধর্মের গ্রন্থটি পর্যন্ত তাহার গায়ে থাকে না।

আমি পুনরায় বলিলাম,—"আর দেখুন, ঢাকমহাশয়! বিলাতে গেলে বরং নিষ্কৃতি আছে। বিলাত গেলে সাহেব হয়, সাহেবি পোষাক পরে, সাহেবি খানা খায়। তা এখন বিলাত না গিয়াও লোকে এই কাজ করিতেছে। কিন্তু বোগদাদে গমন করিলে লোকে মোল্লা হয়। মোল্লা হইয়া পীরের গান করে। বলে,—

হুঁকো বন্দিলাম, কল্‌কে বন্দিলাম, আর বন্দিলাম টিকে।
আর তালগাছে বন্দিলাম প্রভু চামচিকে।'

তাহার পর সে আরব্য উপন্যাসের দেশ। জিন, দৈত্য, ও দানবীতে পরিপূর্ণ। গুজব এই যে, আপনার জামাতা একটা দৈত্য সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে। অতএব এরূপ লোকের সহিত কোন সংস্রব রাখিবেন না। তাহার বাড়ীতে আপনার কন্যাকে পাঠাইবেন না।" ঢাকমহাশয় তাহাই স্থির করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ – সন্দেশের হাঁড়ি

কিন্তু ঢাকমহাশয়ের কন্যা কালিকা তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি শ্বশুরবাড়ী যাইবার নিমিত্ত মাতার নিকট কাঁদিতে লাগিলেন। স্বামীর নিকট তাঁহাকে পাঠাইবার নিমিত্ত মাতা ঢাকমহাশয়কে অনেক অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ঢাকমহাশয় কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন যে,—সে পতিত পাপিষ্ঠ সমুদ্রপ্রত্যাগত নরাধমের নিকট পাঠাইয়া আমি কন্যার ইহকাল পরকাল নষ্ট করিতে পারি না। হতাশ হইয়া কালিকা স্বামীকে পত্র লিখিলেন। পত্র পাইয়া একদিন সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্বে কেশব আসিয়া ঢাকমহাশয়ের খিড়কির নিকট এক বন্য জামতলার স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। জামতলায় অল্প বন ছিল। সেই বনের আড়ালে দাঁড়াইয়া দুইজনে কথাবার্তা করিতে লাগিলেন। বনা জামগাছ। অসময়ে ইহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলা জাম হইয়াছিল। এখন কেষ্টা ছোঁড়া জাম গাছে উঠিয়া জাম খাইতেছিল। কেশব ও কালিকা তাহাকে দেখেন নাই। পতি-পত্নীর সকল কথা কেষ্টা শুনিতে পায় নাই। তবে, বুধবার সন্ধ্যায় সময়, ইত্যাদি গোটা কতক কথা কেবল শুনিয়াছিল। যখন স্ত্রী-পুরুষের পরামর্শ শেষ হইবার উপক্রম হইল, তখন গাছ হইতে কেষ্টা বলিয়া উঠিল,—"ঢাকমহাশয়কে বলিয়া দিব।"

দুইজনেই চমকিত হইলেন। একটু স্তব্ধ থাকিয়া তাহাকে বলিলেন,—"না, দাদা! তা কি বলিতে আছে? লক্ষ্মী দাদা! কাহাকেও কিছু বলিও না।"

কেশবকে লক্ষ্য করিয়া কেষ্টা জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি ইংরেজি জান?"

কেশব উত্তর করিলেন,—"হাঁ, একটু আধটু জানি। বি-এ পাশ করিয়াছি।"

কেষ্টা বলিল,—"শীঘ্রই আমাদের পূজার ছুটী হইবে। 'পূজার সময় তুমি কি করিয়াছ' এই মর্ম্মে মাস্টার আমাদিগকে একটা প্রবন্ধ লিখিতে দিবেন। আমার এত কাজ যে, আমি লিখিতে অবসর পাইব না। তুমি যদি আমাকে লিখিয়া দাও, তাহা হইলে আমি বলিয়া দিব না।"

কেশব স্বীকার করিলেন। কেষ্টা তাহাকে তিন সত্য করিতে বলিল। কালিকাকেও সত্য

করিতে হইল। তখন কেষ্টা গাছ হইতে নামিয়া চলিয়া গেল। কেশবও আপনার গ্রামে চলিয়া গেলেন।

'বুধবার সন্ধ্যার সময়' এইরূপ দুই একটি কথা কেষ্টা সেদিন শুনিতে পাইয়াছিল। বুধবার সন্ধ্যাবেলায় কেষ্টা ভাবিল,—যাই, গিয়া দেখি, আজ তাহারা কি করে। এইরূপ মনে করিয়া সে সেই জামগাছে উঠিয়া বসিয়া রহিল। সন্ধ্যার পূর্বে সে দেখিল যে, কালিকা শরা-ঢাকা এক নূতন হাঁড়ী লইয়া ঘর হইতে চুপি চুপি বাহির হইলেন। জামতলার বনের ভিতর হাঁড়ীটি লুকাইয়া রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। কালিকা চলিয়া গেলে, কেষ্টা গাছ হইতে নামিল ও দেখিল যে, হাঁড়ীর মুখে শরাখানি কালিকা ময়দা দিয়া আঁটিয়া দিয়াছেন। কিন্তু ময়দা কাঁচা ছিল না। শরা একটু উঠাইয়া কেষ্টা দেখিল যে, হাঁড়ীটি সন্দেশে পরিপূর্ণ। কেশববাবু আসিয়া কালিকা দিদির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। সেই কথা ঢাকমহাশয়কে বলিয়া দিব না, আমি এই অঙ্গীকার করিয়াছি। সন্দেশ খাইব না,—আমি এরূপ অঙ্গীকার করি নাই। অতএব আমি এই সন্দেশগুলি খাইব। এইরূপ মনে করিয়া কেষ্টা সন্দেশের হাঁড়ী লইয়া বন হইতে বাহির হইল। পথে দাঁড়াইয়া সে দেখিল যে, সম্মুখ দিকে দুইজন গ্রামের লোক আসিতেছে। পরবর্তী কে চাহিয়া দেখিল যে, প্রেম চাকি ধান বোঝাই গরুর গাড়ী লইয়া আসিতেছে। কেষ্টা ভাবিল যে, উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে দিই, তা না করিলে আমি ধরা পড়িব। এইরূপ মনে করিয়া সে সন্দেশের হাঁড়ীটি গাড়ীওয়ালাকে দিয়া বলিল,—"প্রেমখুড়ো! কালিকা দিদি আমাকে সন্দেশ দিয়াছেন। আমি একলা খাইব না। তোমাতে আমাতে দুইজনে খাইব। তুমি ঘোষেদের গঙ্গার ঘাটে গিয়া গাড়ী রাখ। একটু পরে আমি যাইতেছি।" (কলিকাতার দক্ষিণে এই সমুদয় ঘটনা ঘটিয়াছিল। এ স্থানে প্রাচীন গঙ্গার গর্ভ লোকে ভাগ করিয়া লইয়াছে। এই ঘোষেদের গঙ্গা, বসুদের গঙ্গা ইত্যাদি) প্রেমচাকি সন্দেশের হাঁড়ী লইয়া গঙ্গার ঘাটে চলিল। কেষ্টাও অন্য পথ দিয়া সেই দিকে চলিল। প্রেমচাকি ঘাটে উপস্থিত হইয়া হাঁড়ীটি একটু খুলিয়া দেখিল যে, সন্দেশে পরিপূর্ণ। সে ভাবিল যে, আমার ছেলেদের জন্য সন্দেশ লইয়া যাইব! কেষ্টাকে ভাগ দিব না। কিন্তু এই সময় দেখিল যে, দূরে কেষ্টা আসিতেছে। অড়াতাড়ি হাঁড়ীটির মুখ পুনরায় বন্ধ করিল। গাড়ী হইতে একটি ঝুড়ি লইয়া হাঁড়ীটি ঝুড়ি চাপা দিয়া তাহার উপর সে বসিয়া রহিল। কেষ্টা আসিয়া সন্দেশের ভাগ চাহিল, আমি সব সন্দেশ খাইয়া ফেলিয়াছি।" দুইজনে ঝগড়া বাঁধিয়া গেল। এমন সময় কেষ্টা দেখিল যে দূরে গজরাজ আসিতেছে। তাহাকে দেখিয়া কেষ্টা সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

এদিকে কালিকার মন সুস্থির নাই। জামতলায় সন্দেশের হাঁড়ী ঠিক আছে কি না, তাহা দেখিবার নিমিত্ত তিনি আর একবার বনের ভিতর গমন করিলেন। সে স্থানে গিয়া দেখিলেন যে, বনের ভিতর সন্দেশের হাঁড়ী নাই। কালিকা কাঁদিয়া উঠিলেন। আমার হাঁড়ী কে লইয়া গিয়াছে, এই বলিয়া ক্রমাগত কাঁদিতে লাগিলেন।

সেদিন বৈকালবেলা আমি ঢাকমহাশয়ের বাড়ী গিয়াছিলাম। ঢাকমহাশয় বলিয়াছিলেন

যে, আমি নানা বিপদে পড়িতেছি। মা দুর্গা আমাকে রক্ষা করিতেছেন না, অতএব আর আমি দুর্গার পূজা করিব না। কথা শুনিয়া আমি থাকিতে পারিলাম না। আমি তাঁহাকে বুঝাইতে যাইলাম। আমি বলিলাম যে, মা দুর্গা পরম দয়াময়ী। যাহা হইবার, তাহা হইয়া গিয়াছে। ভক্তিভাবে ঘটা করিয়া দুর্গোৎসব করুন। তাহা হইলে আমাকেও যেরূপ তিনি নানা বিপদ হইতে রক্ষা করেন, আপনাকেও তিনি সেইরূপ নানা বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন।

কিন্তু প্রথম তিনি আমার কথায় কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তাহার পর যখন আমি বলিলাম যে, পূজা বন্ধ করিলে, শিষ্য-সেবক যে বার্ষিক প্রদান করে, তাহার কি হইবে? তখন কি হইবে? তখন তিনি পূজা করিতে সম্মত হইলেন। —আমাদের দুইজনে এইরূপ কথাবার্তা হইতেছে, এমন সময় কালিকার কান্নার শব্দ আমাদের কানে প্রবেশ করিল। আমরা সেই স্থানে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—'কি হইয়াছে?'

কালিকা উত্তর করিলেন যে,—'আমার সন্দেশের হাঁড়ী কে লইয়া গিয়াছে।'

আমি বলিলাম,—'গোটা কত সন্দেশের জন্য এত কান্না কেন? ঢাকমহাশয় তোমাকে অনেক সন্দেশ কিনিয়া দিবেন।'

পঞ্চম পরিচ্ছেদ – উড়ুখ্‌খু হাঁড়ী

ক্রমে সকল কথা প্রকাশ পাইল। পিতার অগোচরে কালিকা ঘর হইতে পলায়ন করিবেন, স্বামীর সহিত এইরূপ পরামর্শ করিয়াছিলেন। বুধবার সন্ধ্যাবেলা কেশব ঘোড়ার গাড়ীতে কাটিগঙ্গার ঘাটের নিকট লুক্কায়িত থাকিবেন। একটু অন্ধকার হইলে কালিকা ভুলুকে লইয়া সেই স্থানে গমন করিবেন। তাহার পর ঘোড়ার গাড়ীতে রেলস্টেশন যাইবেন। সে স্থান হইতে রেলগাড়ীতে কেশব স্ত্রী-পুত্র লইয়া আপনার গ্রামে গমন করিবেন? বাক্স লইয়া গেলে পাছে কেহ জানিতে পারে, সেজন্য কালিকা আপনার গহনাগুলি হাঁড়ীতে রাখিয়া তাহার উপর সন্দেশ চাপা দিয়া বনে রাখিয়াছিলেন। যাইবার সময় লইয়া যাইবেন, এইরূপ মানস করিয়াছিলেন।

যখন এইসব কথা প্রকাশ হইল, তখন একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। কে সে হাঁড়ী লইয়া গেল, তাহার অনুসন্ধান হইতে লাগিল। দুইজন গ্রামের লোক বলিল যে, সন্ধ্যার সময় তাহারা জামগাছের নিকট দিয়া যাইতেছিল। প্রেমা চাকি গরুর গাড়ী লইয়া সেই পথ দিয়া আসিতেছিল। কেষ্টা তাহাকে একটা হাঁড়ী দিল। ইহা তাহারা দেখিয়াছে।

তৎক্ষণাৎ একজন লোক প্রেম চাকির বাড়ীতে দৌড়িল। আর একজন লোক কেষ্টার বাড়ীতে গেল। আমার চাকর গজরাজকে আমি গঙ্গার ঘাটে পাঠাইলাম। আমি তাহাকে আদেশ করিলাম যে,—'সেস্থানে যদি তুমি প্রেমা চাকিকে দেখিতে পাও, তাহা হইলে গাড়ীশুদ্ধ তাহাকে ধরিয়া আনিবে।'

গজরাজ তাহাই করিল। প্রেম চাকির গাড়ী আমরা অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম। হাঁড়ী

পাইলাম না। কিন্তু যখন সে শুনিল যে, হাঁড়ীতে কেবল সন্দেশ ছিল না, তাহার ভিতর অনেক গহনা ছিল, তখন সে বলিল যে, যেস্থানে সে গাড়ী রাখিয়াছিল, তাহার নিম্নে ভূমিতে ঝুড়িচাপা সেই হাঁড়ী আছে। তখন আমরা সকলেই গঙ্গার ঘাটের দিকে দৌড়িলাম।

একদিকে সন্ধ্যার সময় কেশব রেলষ্টেশন হইতে ঘোড়ার গাড়ী করিয়া কাটিগঙ্গার ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একটু দূরে ঘোড়ার গাড়ী রাখিয়া তিনি ঘাটের নিকট গমন করিলেন। তখনও সে স্থানে কালিকা ও ভুলু আসে নাই। কিন্তু দেখিলেন যে, একটা ঝুড়ি উপুড় হইয়া রহিয়াছে। ঝুড়িটি তুলিয়া দেখিলেন যে, নিম্ন একটি হাঁড়ী রহিয়াছে। হাঁড়ির ভিতর সন্দেশ। কেশব মনে করিলেন যে, গাড়ীতে ভুলু খাইবে, সেই জন্য কালিকা এই সন্দেশগুলি কাহারও হাতে গোপনে পাঠাইয়া দিয়াছেন। হাঁড়ীটা কোলে লইয়া তিনি কালিকা ও ভুলুর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

অল্পক্ষণ পরে কেশব দেখিলেন যে, কিছুদূরে অনেক লোক ঘাটের দিকে আসিতেছে। ব্যাপারটা কি জানিবার নিমিত্ত তিনি অন্য পথে দ্রুতবেগে ঢাকমহাশয়ের বাড়ীর দিকে গমন করিলেন। সে স্থানে উপস্থিত হইয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। গোয়ালের কোণে হাঁড়ীটি রাখিয়া তিনি গোয়ালের পশ্চাতে লুকাইয়া রহিলেন।

সকলে গঙ্গার ঘাটে গিয়া গাড়ি দেখিতে পাইল। কিন্তু ঝুড়ি তুলিয়া দেখিল যে তাহার নিম্নে হাঁড়ী নাই। হতাশ হইয়া সকলে ঢাকমহাশয়ের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল। ক্রমে বিলক্ষণ একটা জনতা হইয়াছিল। কালিকাও সকলের সঙ্গে ঘাটে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিবার সময় তিনি একটু পশ্চাতে পাড়িয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া কেশব লুক্কায়িত স্থান হইতে বাহির হইয়া গোলমালের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কালিকা মুখে সকল বিবরণ শ্রবণ করিয়া তিনি বলিলেন,—"কেন! হাঁড়ী আমি লইয়া আসিয়াছি। গোয়ালের কোণে তাহা আমি রাখিয়া দিয়াছি।

আহ্লাদিত হইয়া কালিকা মাতা-পিতার সঙ্গে গোয়ালে প্রবেশ করিলেন। আঁতিপাতি করিয়া গোয়ালের সকল কোণ, গোয়ালের সকল স্থান অন্বেষণ করিলেন। কিন্তু হাঁড়ী পাইলেন না। —কালিকা পুনরায় কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। তখন বিন্দি নামক ঢাকমহাশয়ের ঝি বলিল যে,—'সে প্রতিদিন সকলের পাতের খাবার কুড়াইয়া তাহার বোনঝির নিমিত্ত গোয়ালের কোণে রাখিয়া দেয়। সন্ধ্যাবেলা তাহার বোনঝি লইয়া যায়। সে হয়তো হাঁড়ী লইয়া গিয়াছে।

বিন্দির বোন্‌ঝিকে খুঁজিতে লোক দৌড়িল। সে অধিক দূর যায় নাই। হাঁড়ী সহিত সকলে তাহাকে ধরিয়া আনিল। ব্যস্ত হইয়া কালিকা হাঁড়ী খুলিয়া দেখিলেন। হরি হরি! তিনি দেখিলেন যে, সন্দেশের নিম্নে তিনি যে ভাবে গহনাগুলি সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন, সেইরূপ আছে। হাঁড়ী লইয়া আনন্দে তিনি মাতা ও ভুলোর সহিত দোতলায় আপনার ঘরে গমন করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
আরব্য উপন্যাসের জিন

কেশব আর লুক্কায়িত হন নাই। ভিড়ের অন্য লোকের সহিত দাঁড়াইয়া তিনি সমুদয় ঘটনা দেখিতেছিলেন। ঢাকমহাশয়ের দৃষ্টি তাঁহার উপর পড়িল। ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া তিনি তাঁহাকে গাল দিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন,—'দূর হঃ, দূর হঃ! বোগদাদি মোল্লা আসিয়া আজ আমার হিন্দুধর্ম নষ্ট করিল।' এইরূপ বলিতে বলিতে তাঁহার রাগ দাবানলের ন্যায় আরও জ্বলিয়া উঠিল। কেশবকে তিনি একপাটি জুতা ছুড়িয়া মারিলেন।

কেশব ধীরে ধীরে বলিলেন,—'আপনি আমার পিতৃস্থানীয় গুরুজন। আমি প্রত্যুত্তর করিব না। চারিদিন পরে আপনার কন্যাকে ও আমার পুত্রকে আমি লইতে পাঠাইব, পাঠইয়া দিবেন। না পাঠাইলে আপনাকে অনুতাপ করিতে হইবে।'

এই কথা বলিয়া কেশব চলিয়া গেলেন। কেশব তখনও বাড়ীর বাহির হন নাই। এমন সময় ঢাকমহাশয়ের সম্মুখে মাথায় পাগড়ী, বুক পর্যন্ত দাড়ি, ইজের পরা প্রকাণ্ড এক জিন আসিয়া দাঁড়াইল। জিন ঠিক দৈত্য নহে। আমাদের দেশে যেরূপ যক্ষ রক্ষ অপ্সর কিন্নর গন্ধর্ব আছে, বোগদাদ অঞ্চলে সেইরূপ জিন নামক এক প্রকার ভৌতিক বায়বীয় জীব আছে। জিনকে দেখিয়া সকলে ভয়ে রুদ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। কেবল আমি ডমরুধর ভয় পাইলাম না। অনেক ভূত-প্রেতের সহিত আমি কারবার করিয়াছি। ঢাকমহাশয়ের নিকট গট্ হইয়া বসিয়া রহিলাম।

জিনটির কথা আমি এইরূপ শুনিলাম। একদিন কেশব ছিপ ফেলিয়া তাইগ্রিস নদীতে মাছ ধরিতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহার বঁড়শীতে কি লাগিয়া গেল। সাবধানে উপরে তুলিয়া দেখিলেন যে, তাহা এক তাম্র-নির্মিত হাঁড়ী। তামার ঢাকনা দ্বারা হাঁড়ীর মুখ বন্ধ। সেই ঢাকনের উপর হিজিবিজি লেখা আছে ও তাহার উপর সিলমোহর আছে। হাঁড়ীর ভাব দেখিয়া তাঁহার আরব্য উপন্যাসে বর্ণিত ধীবরের কথা স্মরণ হইল। তিনি ভাবিলেন যে, ঢাকনা খুলিলে হয় তো হাঁড়ীর ভিতর হইতে প্রথম ধূম বাহির হইবে। তাহার পর সেই ধূম জিনের আকার ধারণ করিবে, তাহার পর জিন আমাকে বধ করিতে চাহিবে। এই ভয়ে তিনি তিনদিন হাঁড়ীর ঢাকনা খুলিলেন না। ইচ্ছা তাঁহার মনে অতিশয় প্রবল হইল। ছুরি দিয়া অতিকষ্টে তিনি ঢাকন খুলিলেন। তাহার পর যে ভয় করিয়াছিলেন, তাহাই হইল। হাঁড়ী হইতে প্রথম ধূম বাহির হইল; ধূম গাঢ় হইয়া প্রকাণ্ড জিনে পরিণত হইল। কেশব ঘোরতর ভীত হইল। কিন্তু জিন তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—'আলাদিন কোথায়? প্রদীপের সে জিন কোথায়। আলাদিনের নিমিত্ত মুণিমুক্তাখচিত অট্টালিকা প্রস্তুত করিতে প্রদীপের জিন আমাকে নিযুক্ত করিয়াছিল। মজুরি হিসাবে তাহার নিকট আমার এক সহস্র দিনার বা টাকা পাওনা আছে। সেই কথা লইয়া তাহার সহিত আমার বিবাদ হইয়াছিল। সেজন্য প্রদীপের জিন আমাকে তামার হাঁড়ীতে বন্ধ করিয়া

সিলমোহর করিয়া তাইগ্রিস নদীতে নিক্ষেপ করিয়াছিল। এখন তাহার নিকট হইতে আমি আমার টাকা আদায় করিব।' কেশব বলিলেন,—'আমি বিদেশী লোক। আরব্য উপন্যাসের সে আলাদিন কোথায়, তাঁহার সে প্রদীপের জিন কোথায়, তাহা আমি জানি না।'

জিন বলিল,—"আমি আলাদিনকে ও প্রদীপের জিনকে খুঁজিয়া বাহির করিব। কিন্তু প্রথম আমি তোমার উপকার করিব। কারণ, তুমি আমাকে জল হইতে তুলিয়াছ; হাঁড়ি হইতে বাহির করিয়াছ। তোমার সহিত তোমার দেশে আমি যাইব। নানা বিপদ হইতে তোমাকে আমি রক্ষা করিব। তাহার পর তোমাকে লইয়া এ দেশে পুনরায় ফিরিয়া আসিব। সেই হাজার দিনার আদায় করিয়া তোমাকে আমি দিব।' কেশবের সহিত জিন সেই জন্য বঙ্গদেশে আসিয়াছে।

জিন ঢাকমহাশয়ের দিকে ভয়ঙ্কর কোপদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তাহার চক্ষু দুইটি হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বৃষ্টি হইতে লাগিল। অবশেষে সে বলিল,—'নরাধম কাফের! তুই আমার বন্ধুকে অপমান করিয়াছিস। একচক্ষু কাণা দামড়া গরুর আকৃতি ধারণ কর।' তৎক্ষণাৎ ঢাকমহাশয় একচক্ষুহীন দামড়া গরু হইয়া গেলেন। সেই মুহূর্তে জিন অদৃশ্য হইয়া গেল।

ঘোর বিপদ দেখিয়া আমি দৌড়িয়া গিয়া পথে কেশবকে ধরিলাম। দুর্ঘটনার বিবরণ শুনিয়া তিনি বলিলেন,—"শ্বশুরমহাশয়কে পুনরায় মানুষ করি, সে ক্ষমতা আমার নাই। জিন কেবল মাঝে মাঝে আমার নিকট আগমন করে। পুনরায় কবে আসিবে, তাহা জানি না। এইবার যেদিন আসিবে, তাহার হাতে-পায়ে ধরিয়া শ্বশুরমহাশয়কে ভাল করিতে চেষ্টা করিব।

এই কথা বলিয়া কেশব আপনার গৃহে চলিয়া গেলেন। এ স্থানে ঢাকমহাশয়ের বাড়ীতে কান্নাকাটি পড়িয়া গেল। কালিকা কাঁদিতে লাগিলেন, সকলেই কাঁদিতে লাগিল। ঢাকমহাশয় হাঁ করিয়া দেখাইলেন যে, তাঁহার মুখ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। আমি একহাঁড়ী ভাতের ফেন আনিয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিলাম। ঢাকমহাশয় চোঁ চোঁ করিয়া তাহা খাইয়া ফেলিলেন। তাহা খাইয়া তাঁহার শরীর কিঞ্চিৎ সুস্থ হইল। আমরা তাঁহাকে ঘরের ভিতর লইয়া যাইতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু তিনি পৈঠা উঠিতে সম্মত হইলেন না। অগত্যা তাঁহাকে গোয়ালে লইয়া যাইতে হইল। তাঁহার মুখের ভঙ্গী দেখিয়া আমি বুঝিলাম যে, তিনি আর সকলকে বলিয়া যাইতে বলিতেছেন। তাঁহার চক্ষু দিয়া দর দর ধারায় অশ্রুপাত হইতে লাগিল। আমি তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলাম,—'কিছু ভয় নাই, শীঘ্রই পুনরায় আপনি মনুষ্য-শরীর পাইবেন। আর যতদিন না পুনরায় আপনার মনুষ্য-শরীর হয়, ততদিন আপনাকে আমি ছাড়িয়া যাইব না।"

রাত্রি নয়টার সময় আমি নিজহাতে খড় কাটিয়া তাঁহাকে জাব দিলাম। তাহার পর গোয়ালের দেয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া আমি ক্রমাগত মা দুর্গাকে ডাকিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম যে,—"মা! তুমি আমাকে নানা বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছ। আমার বন্ধুকে তুমি

এ বিপদ হইতে রক্ষা কর। ইনি পূজা করিবেন না বলিয়াছেন। কিন্তু মা! ভাবিও না; যাহাতে ইনি এ বৎসর ঘটা করিয়া তোমার পূজা করেন, আমি সে ব্যবস্থা করিব।'

সপ্তম পরিচ্ছেদ — আবার এলোকেশী

মা দয়াময়ী। মা আমার কান্না শুনিলেন। রাত্রি তিনটার সময় গোয়ালে অন্ধকারে বসিয়া আমি একটু চক্ষু বুজিয়াছি, এমন সময় মা আমাকে দর্শন দিলেন।

মা বলিলেন,—"ডমরুধর! তুমি আমার বরপুত্র, কিছু ভয় নাই। সরস্বতীর কৃপায় তোমার মুখ হইতে জিলেট মন্ত্র বাহির হইয়াছিল, সেই মহামন্ত্রের প্রভাবে তুমি ঢাকের পশুত্ব মোচন কর। কুন্তলাকে উদ্ধার কর, কেশবকে সমুদ্রযাত্রাজনিত পাপ হইতে মুক্ত কর। সমুদ্রযাত্রা তো সামান্য কথা। জিলেট মন্ত্র প্রভাবে মানুষের সকল পাপ দূর হয়। এই মহামন্ত্রের মহিমা অপার। জিলেট জিলেকি সিলেমেল কিলেকিট কিলেকিশ।'

এইরূপ উপদেশ দিয়া মা অন্তর্ধান হইলেন। প্রাতঃকালে উঠিয়া আমি প্রথমে স্নান করিলাম, শুচি হইয়া গোয়ালে প্রবেশ করিয়া একচক্ষুহীন দামড়া গরুর অর্থাৎ ঢাকমহাশয়ের গায়ে হাত বুলাইয়া আমি জিলেট মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলাম।

জিলেট জিলেকি সিলেমেল কিলেকিট কিলেকিশ,—সাতবার এই মহামন্ত্র পাঠ করিতেই ঢাকমহাশয়ের দামড়া রূপ ঘুচিয়া পুনরায় মনুষ্যরূপ হইল।

তাহার পর জিলেট মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে আমি ঢাকমহাশয়ের বাড়ী তিনবার প্রদক্ষিণ করিলাম। তৎক্ষণাৎ আকাশ হইতে পুষ্পক বথ নামিযা আসিল। সেই রথে চড়িয়া কুন্তলা স্বর্গে গমন করিলেন। জিলেট মন্ত্রের এমনি প্রভাব।

জিলেট জিলেকি সিলেমেল কিলেকিশ।

ঢাকমহাশয়ের পুনরায় মা দুর্গার প্রতি অসীম ভক্তি হইল। তিনি প্রতিমা গঠনের নিমিত্ত আদেশ করিলেন ও মহাসমারোহে পূজার আয়োজন করিতে লাগিলেন। জিলেট জিলেকি সিলেমেল কিলেকিট কিলেকিশ।

জামাতা কেশবকে তিনি ডাকিতে পাঠাইলেন। জিলেট মন্ত্রে তাঁহার গায়ে হাত বুলাইয়া আমি তাঁহাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিলাম। শ্বশুর-জামাতায় অক্ষুণ্ণ অপরিসীম স্নেহ-মমতা ও সদ্ভাব হইল। জিলেট জিলেকি সিলেমেল কিলেকিট কিলেকিশ।

দুই চারিদিন পরে জিন আসিয়া উপস্থিত হইল। সে বলিল,—এই যে ডমরুমহাশয়, মনুষ্য মধ্যে ইনি রত্নবিশেষ। ইনি জিলেট মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই মহামন্ত্রবলে ইনি না পারেন, এমন কাজ নাই। আজ রাত্রিতে ইহাকে আমি শাহারজাদি দিনারজাদি নাচ দেখাইব। পুস্তকে লেখা আছে যে, শাহারজাদি গল্প বলিয়া বাদশাহকে বশ করিয়াছিলেন। সে মিথ্যা কথা। দুই ভগিনীর নাচ দেখিয়া বাদশাহ বশ হইয়াছিলেন।

সেই রাত্রে আমি পুনরায় ঢাকমহাশয়ের বাড়ী গমন করিলাম। রাত্রি নয়টার সময়

দুইজন পরমা সুন্দরী রমণীর সহিত জিন আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই দুইটি রমণী আমাদের সম্মুখে নানা ভাব-ভঙ্গী করিয়া নাচিতে লাগিল। কেবল ঢাকমহাশয়, কেশব ও আমি সে নাচ দেখিয়াছিলাম। রমণী দুইটির অপূর্ব সৌন্দর্য্য ও অদ্ভুত নাচ দেখিয়া আমার মুণ্ড ঘুরিয়া গেল। দুর্লভী বাগদিনীকে আমি ভুলিয়া যাইলাম।

নাচ সমাপ্ত হইলে জিন বলিল,—'আজ রাত্রিতেই আমরা বোগদাদে গমন করিব। ডমরুমহাশয় ও কেশবকে সঙ্গে লইয়া যাইব। বায়ুরূপে উড়িয়া মুহূর্ত মধ্যে আমরা সে স্থানে পৌঁছিব। সে স্থানে গিয়া ডমরুমহাশয়ের সহিত শাহারজাদির নিকা দিব ও দিনারজাদির সহিত কেশবের বিবাহ দিব।" সে প্রস্তাবে আমি সম্মত হইলাম। কিন্তু আমি বলিলাম যে, এলোকেশীর মত না লইয়া আমি যাইতে পারিব না। কারণ, তাঁহাকে যদি না বলিয়া যাই, তাহা হইলে পৃথিবী খুঁজিয়া তিনি আমাকে বাহিব করিবেন। আর মাথার টাক হইতে পায়ের অঙ্গুলি পর্যন্ত তিনি আমাকে ঝাঁটা পেটা করিবেন।

জিন এলোকেশীকে ডাকিতে পাঠাইল। ঝাঁটা হাতে করিয়া নিবিড় তিমির দ্বারা গঠিত শরীরে জবাকুসুমসম লোহিত লোচনে এলোকেশী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই জিনের মুখ শুষ্ক হইয়া গেল। তাহার পর শাহারজাদির সহিত আমার নিকার প্রস্তাব শুনিয়া যখন এলোকেশী জিনকে ঝাঁটা পেটা কবিতে দৌড়িলেন তখন জিন, শাহারজাদি ও দিনারজাদির শবীর গলিয়া ধূমে পরিণত হইল। ধূম বাতাসে মিশিয়া গেল। সেইদিন হইতে তাহারা কোথায় যে পলায়ন করিল, তাহা কেহ জানে না। কেশবের নিকট জিন আর আসে না।

যাহা হউক, ঢাকমহাশয় এ বৎসর ঘোর ঘটা করিয়া দুর্গোৎসব করিলেন।

লম্বোদর বলিলেন,—'আচ্ছা আজগুবি গল্প তুমি বানাইতে পার।'

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—সকলই মহামায়ার মায়া।

জিলেট জিলেকি সিলেমেল কিলেকিট কিলেকিশ। বাঙ্গাল নিধিরাম

—o—

বাঙ্গাল-নিধিরাম

প্রথম অধ্যায় – পীড়িত পথিক

নিধিরাম দেবশর্মার বাটী পূর্বদেশে। নিধিরাম মহাকুলীন। কিন্তু বিবাহ করা তাঁহার ব্যবসায় নয়। একটির অধিক তিনি বিবাহ করেন নাই, বিবাহ করিয়া টাকা লন নাই। নিধিরামের পৈতৃক যৎকিঞ্চিৎ ভূমি সম্পত্তি ছিল। সন্তান সন্ততি হয় নাই। সেই ভূমি হইতেই ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর কোনওরূপে দিনপাত হইত।

যখন নিধিরামের বয়স প্রায় ৪৫ বৎসর, তখন তাঁহার গৃহ শূন্য হইল। ব্রাহ্মণীর শোকে

তিনি অধীর হইয়া পড়িলেন। কিন্তু, কি করিবেন? সকলই ভগবানের ইচ্ছা, পুনরায় বিবাহ করিতে অনেকেই তাঁহাকে অনুরোধ করিল। নিধিরাম সে কথা শুনিলেন না। বাকি কয়টা দিন ভগবানের আরাধনা করিয়া কাটাইবেন, মনে মনে এইরূপ স্থির করিলেন।

এইরূপে কিছুদিন কাটিয়া গেল। একবার তাঁহার গঙ্গাস্নান করিবার ইচ্ছা হইল। একাকী তিনি বাটী হইতে বাহির হইলেন, একাকী চণ্ডীপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাসা লইয়া প্রাতে গঙ্গাস্নান, সন্ধ্যায় গঙ্গাদর্শন করিতে লাগিলেন। এক দিন রাত্রিতে হঠাৎ তিনি বিসূচিকা রোগগ্রস্ত হইলেন। আসন্নকাল উপস্থিত জানিয়া মার বক্ষে প্রাণ সমর্পণ করিবার অভিলাষে আস্তে আস্তে বুকে হাঁটিয়া তিনি গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। বালুকাময় তটে পড়িয়া ছট্ ফট্ করিতে লাগিলেন।

প্রাতঃকাল হইল। বেলা দশটা বাজিল। প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণে জগৎ ক্রমে অগ্নিময় হইতে লাগিল। নিধিরামের প্রাণ তবুও বাহির হয় না। উঠিবার শক্তি নাই, নড়িবার শক্তি নাই। কণ্ঠাগত প্রাণ, কিন্তু সে সামান্য প্রাণটুক শরীর হইতে বাহির হইতে চায় না। তাঁহার জ্ঞান ছিল। ‘‘শীঘ্র লও মা! ধীরে ধীরে মাকে ডাকিতে লাগিলেন।

দুইজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ গঙ্গাস্নান করিয়া সেই দিক্ দিয়া যাইতেছিলেন;—‘‘মহাশয়! পিপাসায় আমার ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে। কৃপা করিয়া যদি আমার মুখে একটু জল দেন, তাহা হইলে এই আসন্ন কালে কিঞ্চিৎ শান্তি লাভ করি।’

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন,—‘মহাশয়ের নিবাস?’

নিধিরাম বলিলেন,—আমার নাম নিধিরাম দেবশর্ম্মা। কিন্তু মহাশয়! আমার কথা কহিবার শক্তি নাই। তৃষ্ণায় আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। আমি এক্ষণে পরিচয় দিতে পারি না। মুখে যদি একটু জল দেন, তাহা হইলে বড় উপকার হয়।’

পুনরায় সেই ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—‘‘আপনার ব্যাতোন?’

নিধিরাম বলিলেন,—‘‘আমি চাকরি করি না। আমার বেতন নাই। যান, আপনারা বাড়ী যান। আমার জলে কাজ নাই।’

ব্রাহ্মণ, আপনার সঙ্গী অপর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে বলিলেন,—‘‘চল, হে, এককড়ি! চল বাড়ী যাই, বেলা হইল, রৌদ্রে এখানে দাঁড়াইয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই।’

এককড়ি কোনও উত্তর না করিয়া গঙ্গার জলে নামিয়া, এক কোশা জল লইলেন। নিধিরামের নিকট আসিয়া তাঁহার হাত মুখ ধোয়াইতে লাগিলেন।

এককড়ির সঙ্গী বলিলেন,—‘‘ছি! এই বিদেশী ঘাটের মড়াকে ছুঁইয়া ফেলিলে তোমাকে পুনরায় স্নান করিতে হইবে। আমি বাটী চলিলাম।’ এই বলিয়া এককড়ির সঙ্গী সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

এককড়ি নিধিরামকে উত্তমরূপে ধোয়াইয়া মুছাইয়া জলপান করাইলেন। তাহার পর নিধিরামের নাড়ী দেখিলেন। অবশেষে তিনি বলিলেন,—‘মহাশয়! আমি চিকিৎসা-শাস্ত্র কিঞ্চিৎ অবগত আছি। আপনার নাড়ী নাই সত্য; শরীর শীতল হইয়াছে সত্য। কিন্তু বোধ

হয়, নাড়ী শীঘ্রই গছিবে, শরীর শীঘ্রই উষ্ণ হইবে। এ যাত্রা আপনি রক্ষা পাইবেন।'

নিধিরাম বলিলেন,—'রক্ষা পাইতে আমার কিছুমাত্র সাধ নাই। জীবনে আমার সুখ নাই। আজ মা'র তীরে দেহ ত্যাগ করিব, ইহার চেয়ে আর সৌভাগ্য কি আছে?'

বৃদ্ধ এককড়ি সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। দুই চারি জন প্রতিবেশীর সহায়তায় নিধিরামকে আপনার বাড়ী লইয়া যাইলেন। যথাবিধি তাঁহার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন।

এককড়ির বাড়ীতে কেবল স্ত্রী, একটি কন্যা ও একটি শিশুপুত্র। এককড়ি সদবংশ জাত কুলীন ব্রাহ্মণ, কিন্তু দরিদ্র। কন্যার বিবাহ দিতে টাকা লাগে, সে জন্য আজ পর্যন্ত কন্যার বিবাহ দিতে পারেন নাই। দেখিতে দেখিতে কন্যাটির বয়স ষোল বৎসর হইয়া পড়িল। তাঁহাদিগের ঘরে কন্যা বড় হইলে বিশেষ কোনও ক্ষতি নাই। তা বলিয়া কন্যার বিবাহ বিষয়ে এককড়ি নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। কুলমর্যাদায় আপনার সমান অনেকের নিকট গিয়া তিনি কত মিনতি করিয়াছিলেন, কিন্তু সকলেই এত টাকা চাহিয়াছিলেন যে, এককড়ির ভিটা-মাটি বিক্রয় করিলেও সে টাকা হবে না। এককড়ির কন্যার নাম হিরন্ময়ী। হিরন্ময়ী পরমা-সুন্দরী। কিন্তু কুলীনের ঘরে সৌন্দর্য্যের গৌরব নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায় – বদরুদ্দিনের বেটা গবীরুদ্দিন

নিধিরামকে ঘরে আনিয়া এককড়ি সপরিবারে তাঁহার চিকিৎসা ও সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে তাঁহার পীড়া উপশম হইয়া আসিল। কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে, এককড়ি তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। পরিচয় পাইয়া তখন বুঝিলেন যে, নিধিরাম উচ্চশ্রেণীর স্বভাব কুলীন। এককড়ি মনে করিলেন,—"বিধাতা এইবার বুঝি আমার প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়াছেন! এরূপ পাত্রে কন্যা দান করিতে পারিলে, পিতৃকুলের মুখ উজ্জ্বল হইবে।'

নিধিরাম ক্রমে আরোগ্য লাভ করিলেন। সুস্থ হইয়া তিনি এককড়ির নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। বলিলেন,—'মহাশয়! যদিও এ প্রাণ আমার অতি তুচ্ছ পদার্থ, তথাপি আপনার দয়া-মায়া কখনও ভুলিতে পারিব না, আপনার ধার কখনও শুধিতে পারিব না। আমার এমন কিছু নাই, যাহা দিয়া আপনার ঋণ পরিশোধ করিতে পারি। এক্ষণে আপনি অনুমতি করুন, আমি বিদায় হই।'

এককড়ি বলিলেন,—'প্রাণরক্ষা করি, এমন ক্ষমতা আমার কোথায়! সমুদয় ঈশ্বরের হাত। আপনার আয়ু ছিল আপনি রক্ষা পাইলেন: আমি আপনার কিছুই করিতে পারি নাই। দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আমি কোথায় কি পাইব? তবে, যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে একটি ভিক্ষা আপনার নিকট আমি প্রার্থনা করি।'

নিধিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কি মহাশয়? আজ্ঞা করুন। ক্ষমতা থাকিলে অবশ্য আপনার আজ্ঞা পালন করিব।'

এককড়ি বলিলেন,—'ক্ষমতা আপনার সম্পূর্ণ আছে। মনে করিলেই আপনি করিতে

পারেন। সত্য করুন যে, আপনি করিবেন, তাহা হইলেই বলি।'

নিধিরাম বলিলেন,—'ক্ষমতা থাকিলে নিশ্চয় আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিব।'

এককড়ি বলিলেন,—'আমি কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র কুলীন ব্রাহ্মণ। টাকার অভাবে কন্যার বিবাহ দিতে পারি নাই। আপনি মহাকুলীন, স্বমেল, স্বভাব। আপনাতে কন্যা অর্পণ করিলে আমার কুল রক্ষা হয়, পিতৃপুরুষদিগের মুখ উজ্জ্বল হয়। আপনি আমাকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করুন, আপনার নিকট আমার এই ভিক্ষা।'

নিধিরাম স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। হিরন্ময়ীর রূপে গুণে তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। হিরন্ময়ীকে দেখিয়া পর্যন্ত তাঁহার চিত্ত বিচলিত হইয়াছিল। তবে অধিক বয়স হইয়াছে। এ বয়সে এরূপ লাবণ্যবতী বালিকাকে বিবাহ করা উচিত নয় বলিয়া হিরন্ময়ীর চিন্তা মন হইতে দূর করিতে সর্বদাই চেষ্টা তিনি করিতেছিলেন। সেইজন্যই পীড়া হইতে উঠিয়া সম্পূর্ণভাবে পূর্বরূপ বল পাইতে না পাইতে, এ স্থান হইতে পলাইতেছিলেন। সংসার একেবারে পরিত্যাগ করিয়া দেশ-পর্যটন, তীর্থদর্শন প্রভৃতি ধর্মকর্মে অবশিষ্ট জীবনযাপন করিবেন এইরূপ মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

নিধিরাম বলিলেন,—'মহাশয়! আমার বয়স হইয়াছে। পুনরায় বিবাহ করিবার বয়স নাই। বিশেষতঃ আপনার কন্যা হিরন্ময়ী পরম রূপবতী কিছুতেই আমি তাহার উপযুক্ত নই। আর সংসার করিব না, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছি। অতএব এ অনুরোধটি আমাকে করিবেন না। আমাকে ক্ষমা করুন।'

এককড়ি বলিলেন,—'আপনি এই মাত্র সত্য করিলেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার না করিলে আপনি সত্যে পতিত হইবেন। আপনার বিবাহ করিবার বয়স যায় নাই। আপনার মত পাত্র পাইলে হিরন্ময়ীকে ভাগ্যবতী বলিয়া জানিব। সত্যভ্রষ্ট হইবেন না।'

নিধিরাম বলিলেন,—'আপনি আমাকে ঘোর বিপদে ফেলিলেন। হিরন্ময়ী রূপবতী, আমি কিছুতেই তাহার উপযুক্ত পতি নই। আমাকে ক্ষমা করুন।'

এককড়ি বলিলেন,—'আপনার আর বিপদ কি? বিপদ আমার। কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া আজ কয় বৎসর আমি লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছি। কিন্তু আমার টাকা নাই। বিনা টাকায় কেহ বিবাহ করিবেন না। সম্প্রতি আমি জয়দেবপুরে গিয়াছিলাম। সেখানকার জমিদার আমাদের ঘর। তিনি এই গ্রামে বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্র নবীন যেমন কুলে শীলে, সেইরূপ রূপে গুণে সুপাত্র। সে মাতুলালয়ে আসিয়াছিল। গৃহিণীর বড় সাধ হইল যে, তাহাকে জামাতা করেন। আমি তাহার পিতার নিকট গিয়া হাতে পৈতা জড়াইয়া কত কাঁদিলাম। তিনি তিন হাজার টাকা চাহিলেন! তিন হাজার টাকা কোনও পুরুষে কখনও চক্ষে দেখি নাই। যেমন উচ্চ আশা করিয়াছিলাম সেইরূপ ফল পাইয়া আস্তে আস্তে ফিরিয়া আসিলাম।

এককড়ি পুনরায় বলিলেন,—'তাহার পর আবার বিপদের উপর বিপদ। এই গ্রামে

বদরুদ্দিন সেখ বলিয়া একজন ডাক্তার আছেন। এখন আর তিনি বদরুদ্দিন নাই। চিকিৎসা করিয়া তিনি অনেক অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন। ক্রমে জমিদারি কিনিলেন, এই স্থানে ইমারত বাড়ী করিলেন ও টাকার মানুষ! যখন তাঁহার অনেক টাকা হইল, তখন তিনি 'বদরুদ্দিন সেখ' নাম ছাড়িয়া 'বৈদ্যনাথ সেন' নাম লইলেন। টাকা হইলে কি না হয়? ব্রাহ্মণ কায়স্থ সকলেই তাঁহাকে লইয়া চলিতে লাগিল। কিছুদিন পরে এক গাছা সূতা তিনি পরিলেন। প্রথম প্রথম সূতাগাছটি কোমরে রাখিতেন, নাভির উপরে তুলিতেন না। ক্রমে আস্তে আস্তে সূতাগাছটি কাঁধের উপর তুলিলেন। তখন সেটি যজ্ঞোপবীত হইয়া দাঁড়াইল। সেই সময় তিনি 'সেন' ছাড়িয়া 'শর্মা' উপাধি গ্রহণ করিলেন। আজকাল তিনি 'দেবশর্মা' হইয়াছেন। এখন তাঁহার নাম বৈদ্যনাথ দেবশর্মা। তাঁহার পুত্র গবীরুদ্দিন এখন গোবিন্দচন্দ্র দেবশর্ম্মা হইয়াছেন। বেশ বলিয়া গিয়াছেন। কোনও উৎপাত না। গোপীকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তীর কন্যার সহিত গোবিন্দচন্দ্রের বিবাহ হয়। সেই উপলক্ষ্যে দেশদেশান্তর হইতে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত জমা হইয়াছিলেন। এক এক ঘড়া আর দশ দশ টাকা হইতে এক শত টাকা নগদ দিয়া পণ্ডিত সমাজকে বিদায় করিয়াছিলেন। চারিদিকে একেবারে ধন্য ধন্য পড়িয়া গিয়াছিল। গোবিন্দচন্দ্রের সম্প্রতি গৃহশূন্য হইয়াছে। হিরন্ময়ীর রূপের কথা শুনিয়া হিরন্ময়ীকে বিবাহ করিবেন এই তাঁহার একান্ত ইচ্ছা। হিরন্ময়ীর সহিত বিবাহ না দিলে তিনি আত্মহত্যা হইয়া মরিবেন, বাপ-মার নিকট এই কথা বলিয়াছিলেন। আমি বৈদ্যনাথ দেবশর্মার ৫০০ টাকা ধারি। তিনি আমার নামে ডিক্রি করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি আমাকে ডাকাইয়া প্রথম নানা প্রলোভন দেখাইলেন। অনেক টাকা দিবেন, অনেক গহনা দিবেন, কত কি বলিলেন। আমি যখন তাঁহার কথায় স্বীকৃত হইলাম না, তখন নানারূপ ভয় দেখাইলেন। আমাকে জেলে দিবেন, বৃদ্ধ বয়সে কয়েদখানায় পাঠাইবেন, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। আজ যেন তিনি কে? না হিন্দু, না মুসলমান না ব্রাহ্মণ, না কায়স্থ। প্রাণ থাকিতে তাঁর ঘরে আমি কি করিয়া কন্যা দিই? এখন বুঝিয়া দেখুন, কিরূপ বিপদে পড়িয়াছি। আপনি যদি উদ্ধার করেন, তবেই হয়।'

ব্রাহ্মণের বিপদের কথা শুনিয়া নিধিরাম অনেকক্ষণ মৌন থাকিয়া অবশেষে বলিলেন; ''আচ্ছা মহাশয়! কাল আপনাকে আমি এ কথার উত্তর দিব।'

তৃতীয় অধ্যায় — এ কালের মেয়ে

এককড়ি দরিদ্র ব্রাহ্মণ। মেটে অন্দর মহল সদর-বাড়ী সব এক। এককড়ির পরিবারবর্গ সকলেই নিধিরামের পীড়িতাবস্থায় সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। হিরন্ময়ী তাঁহার সহিত কথা কহিতেন। সেইদিন একটু অবসর পাইয়া নিধিরাম হিরন্ময়ীকে বলিলেন,—'হিরন্ময়ী! তোমাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত তোমার পিতা আমাকে অনুরোধ করিতেছেন। তুমি এক্ষণে বালিকা নও। আমি যাহা বলি, তাহা তুমি বুঝিতে পারিবে। আমার বয়স হইয়াছে। আমাকে বিবাহ করিলে তুমি সুখী হইবে না। বৃদ্ধ স্বামী হইয়াছে বলিয়া চিরকাল তুমি দুঃখ

করিবে। আমার সেই বড় ভয় হইতেছে। কি করিব বল দেখি?'

হিরন্ময়ী ঘাড় হেঁট করিয়া রহিলেন, চুপ করিয়া রহিলেন; একটিও কথা কহিলেন না।

নিধিরাম পুনরায় বলিলেন,—'কি করি বল না? তুমি যাহা বলিবে, তাহাই হইবে। তুমি কিছু না বলিলে কাল আমি এখান হইতে চলিয়া যাইব।'

হিরন্ময়ী কাঁদিতে লাগিলেন।

নিধিরাম বলিলেন,—'কাঁদিও না, কান্না কিসের? বৃদ্ধ স্বামী হইবে বলিয়া কাঁদিতেছ? তা, আমি তোমার বাপকে বুঝাইয়া বলিব। আমার সহিত তোমার বিবাহ দিবার কথা আর তিনি উত্থাপন করিবেন না।'

হিরন্ময়ী আস্তে আস্তে বলিলেন,—'আপনি বৃদ্ধ বলিয়া আমি কাঁদি নাই, আপনি চলিয়া যাইবেন, তাই কাঁদিতেছি। আপনি তো বৃদ্ধ নন, 'বৃদ্ধ, বৃদ্ধ' কেন বলিতেছেন?

নিধিরাম বলিলেন,—'তবে আমাকে বিবাহ করিতে তোমার অমত নাই। তুমি সুখী হইবে? তুমি আমাকে ভক্তি করিবে? তুমি আমাকে ভালবাসিবে?'

হিরন্ময়ী আস্তে আস্তে বলিলেন,—'নিশ্চয়।'

নিধিরাম বলিলেন,—'সত্য?" –হিরন্ময়ী বলিলেন,—'সত্য।'

নিধিরাম বলিলেন,—'ঠিক?' –হিরন্ময়ী বলিলেন,—'ঠিক।'

নিধিরাম বলিলেন,—'দেখ, দুই দিন পরে আমার চুল পাকিয়া যাইবে, দাঁত পড়িয়া যাইবে, আমি কদাকার বৃদ্ধ হইয়া যাইব। তখন তো তুমি আমাকে ঘৃণা করিবে না? তখনও তো ভক্তি করিবে ভালবাসিবে?' –হিরন্ময়ী বলিলেন,—'নিশ্চয়। আপনি বৃদ্ধ হইবেন, আর আমি কি চিরকাল এইরূপ থাকিব?'

নিধিরাম বলিলেন, 'দেখ হিরন্ময়ী! তোমাকে দেখিয়াই আমি তোমার রূপে মোহিত হইয়াছিলাম। এরূপ বয়সে তোমার মত সুরূপা বালিকাকে বিবাহ করা উচিত নয় বলিয়া আমি এ স্থান হইতে এত সত্বর প্রস্থান করিতেছিলাম। তোমাকে বড় ভালবাসি। এ বয়সে আমাদের মনে যে কোনও ভাব অঙ্কিত হইয়া যায়, তাহা আর মুছিয়া ফেলিবার যো নাই। কিন্তু তোমাদের চিত্ত এখন অন্যরূপ। তোমাদের চিত্ত এখন চঞ্চল। আজ তোমাদের মন একরূপ, কা'ল অন্যরূপ। আমার সেই বড় ভয়।'

হিরন্ময়ী বলিলেন,—'দেখুন মহাশয়! আমি এক্ষণে আর বালিকা নাই। সকল কথা আমি বুঝিতে পারি। মনে মনে আপনাকে পতি বলিয়া ভাবিয়াছি। আপনি আমাকে বিবাহ করেন সে নিমিত্ত দেবতাদিগকে কত ডাকিয়াছি। চন্দ্র সূর্য্যকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, আপনি আমার পতি। চিরকাল আপনার দাসী হইয়া থাকিব। আমি কুলটা নই যে, দুই দিন পরে আমার মনের পরিবর্তন হইবে। বৃদ্ধ হউন আতুর হউন, যাহা হউন, দেবতাদিগকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, আপনার পদে এরূপ যেরূপ আমার মতি রহিয়াছে চিরকাল সেইরূপ থাকিবে।'

এই বলিয়া হিরন্ময়ী সে স্থান হইতে চলিয়া যাইলেন। নিধিরাম সেইদিক পানে এক দৃষ্টে

চাহিয়া রহিলেন। মনে মনে করিলেন,—'ভাল গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়াছিলাম। খুব ফাঁদে পড়িলাম। এ বয়সে আবার এরূপ মন কেন? হিরন্ময়ীতে প্রাণ আমার একবারে জড়িত হইয়া গিয়াছে। হিরন্ময়ী বিনা জীবন বৃথা। পুস্তকে যে ভালবাসার কথা বলে, তাই এই। ভালবাসার কথা শুনিলে পূর্বে হাসিয়া উড়াইয়া দিতাম, মনে করিতাম, সে আবার কি? বুড়ো বয়সে আচ্ছা আমাকে ধেড়ে রোগে ধরিল!'

নিধিরামের সহিত হিরন্ময়ীব বিবাহ স্থিব হইল। পাড়া-প্রতিবাসী সকলে জানিল। বদরুদ্দিন সেখ অর্থাৎ বৈদ্যনাথ দেবশর্মাও এ কথা শুনিলেন। চুপি চুপি তিনি ডিক্রিখানি জাবি কবিলেন। এককড়ির নামে ওয়ারেণ্ট বাহির করিলেন। বিবাহের একদিন থাকিতে তাঁহাকে ধরাইয়া রামনগরের জেলখানায় পাঠাইয়া দিলেন।

এককড়ির ঘরে কান্নাকাটি পড়িল। হিরন্ময়ী ও তাঁহার মাতা মাটীতে পডিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। 'বৃদ্ধ বয়সে জেলখানায় গিয়া বাবা আব বাঁচিবেন না,'' এই কথা বলিয়া হিবন্ময়ী ঘোরতর বিলাপ কবিতে লাগিলেন।

নিধিরাম বলিলেন,—''হিরন্ময়ী! কাঁদিও না। আমি দেশে যাই। সেখানে আমার যাহা কিছু ভূমি সম্পত্তি আছে, তাহা বেচিলে পাঁচ শত টাকার অধিক হইবে, তাহা আনিয়া তোমার পিতাকে আমি উদ্ধার কবিব।''

এইরূপ অনেক বুঝাইয়া, অনেক প্রবোধ দিয়া, নিধিরাম বাড়ী হইতে বাহির হইলেন। প্রথম রামনগর যাইয়া জেলখানায় এককড়ির যাহাতে কোনও ক্লেশ না হয়, এইরূপ উপায় করিয়া আপনার দেশাভিমুখে চলিলেন। দেশে উপস্থিত হইয়া আপনার সমুদয় ভূমি সম্পত্তি ৭০০ টাকায় বিক্রয় করিলেন। ৬০০ টাকার নোট একটি টিনের চোঙ্গের ভিতর রাখিয়া ও এক শত টাকা নজর গেঁজেতে করিয়া আপনার কোমরে বাঁধিলেন। একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া পুনরায় চণ্ডীপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায় — তুমুল ঝড়

নিধিরাম নৌকা করিয়া আসিতেছেন, এমন সময় একদিন অতিশয় দুর্যোগ আরম্ভ হইল। সমস্ত দিন পূর্ব-বাতাস চলিতে লাগিল, টিপটিপ করিয়া জল পড়িতে লাগিল, নদীতে ঘোরতর তরঙ্গ উঠিল। অতি ক্লেশে মাঝিরা নৌকা চালাইতে লাগিল। ঝড় ও তুফান ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। আর অগ্রসর হইতে না পারিয়া মাঝিরা এক স্থানে নৌকা লাগাইল। সে স্থানে তিনখানি বড় নৌকা বাঁধা ছিল। ক্রমে সন্ধ্যা হইল, বায়ু ও ঢেউ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। একখানি চাদর মুড়ি দিয়া নিধিরাম নৌকার ভিতর শুইয়া হিরন্ময়ীর রূপ মনে মনে ধ্যান করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরেই তিনি নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। কতক্ষণ নিদ্রিত ছিলেন, তাহা ঠিক বলিতে পারেন না। হঠাৎ তিনি জাগরিত হইলেন। জাগরিত হইয়া দেখিলেন যে, তুমুল ঝড় উঠিয়াছে। নিবিড় অন্ধকার, কোলের মানুষ দেখা যায় না। ঝড় ও তরঙ্গের শব্দে কানে তালা লাগে। দুইয়ের ভিতর হইতে যেই একটু মুখ

বাহির করিয়াছেন, আর অমনি [illegible] তাঁহার মুখে লাগিল। বারিকণাগুলি যেন সূচের মত তাঁহার মুখে বিঁধিয়া যাইল। মাঝিরা বলিল, "মহাশয়! এরূপ ঝড়-তুফান তো কখন দেখি নাই। বাতাস এখন উত্তুরে হইয়াছে, আমরা নদীর উত্তর ধারে রহিয়াছি। নৌকা রাখা ভার হইয়াছে।"

নিধিরাম একবার ভাবিলেন,—"নৌকা হইতে উঠিয়া গ্রামে গিয়া আশ্রয় লই।" কিন্তু দিনের বেলা তিনি দেখিয়াছিলেন যে, নদীর উপরেই প্রায় এক ক্রোশ মাঠ, তাহার পর গ্রাম; সে অন্ধকারে, সে প্রবল ঝড়ে, সে জলের ঝাপটে, এক ক্রোশ মাঠ পার হইয়া গ্রামে যায় কার সাধ্য? তাই তিনি নৌকাতেই বসিয়া রহিলেন? ঝড়ের বেগে পটপট করিয়া নৌকার কাছি ছিঁড়িতে লাগিল, কাছি ছিঁড়িয়া নৌকা পাছে নদীর মাঝখানে চলিয়া যায়। যতবার কাছি ছিঁড়িয়া যায়, মাঝিরা ততবার কাছি বাঁধিয়া দেয়, যতবার লগি উঠিয়া পড়ে, মাঝিরা ততবার পুনরায় পুঁতিয়া দেয়। নিধিরামও মাঝিদিগের বিশেষ সহায়তা করিতে লাগিলেন। বড় নৌকাগুলির কাছি ছিঁড়িয়া একে একে নদীমধ্যে চলিয়া গেল। অন্ধকারে ভালরূপ কিছু দেখিবার যো ছিল না। ঝড়ের শব্দেব মাঝখানে একটু মনুষ্য-কোলাহল শব্দ পান, চাহিয়া দেখেন যে, নক্ষত্রবেগে বড় নৌকার আলোটি মাঝখানের দিকে যাইতেছে। মুহূর্তমধ্যে নৌকার লণ্ঠনের আলোটি নিবিয়া যায়। মাঝিরা বলে,—'মহাশয়, ঐ একখানি নৌকা ডুবিয়া গেল।' এইরূপে একে একে দুইখানি বড় নৌকা নদীর মাঝখানে গিয়া ডুবিযা গেল। কেবল একখানি বড় নৌকা রহিল। নদীর উচ্চ পাড়ের নীচে নিধিরামের নৌকা ছিল। তাঁহার নৌকাখানি ছোট, সে জন্য ঝড়ের প্রবল বেগ সম্পূর্ণভাবে তাঁহাব নৌকায় লাগিতেছিল না। তাঁহার নৌকাখানি হয় বাঁচিয়া যাইবে, নিধিরামের এই একটু ভরসা ছিল।

কিন্তু সে ভরসা মিথ্যা হইল। অবশিষ্ট বড় নৌকাখানি কাছি ছিঁড়িয়া, তাহার নৌকার উপর আসিয়া পড়িল। তাঁহার নৌকার হালটি উচ্চ ভাবে ছিল। বড় নৌকার লোকেরা সেই হালটি ধরিয়া ফেলিল। নিধিরামের নৌকার সমস্ত কাছিগুলি তৎক্ষণাৎ ছিঁড়িয়া গেল। দুখানি নৌকাই তীরের মত নদীর মাঝখানে দৌড়িল। অল্পক্ষণের মধ্যেই দুইখানি নৌকা ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল। নিধিরামের নৌকাখানিও জলমগ্ন হইল। নিধিরাম নদীর মাঝখানে ভাসিতে লাগিলেন। সাঁতার তিনি উত্তম রূপ জানিতেন। কিন্তু পর্বতপ্রমাণ ঢেউ, ঘোর অন্ধকার, দিকের ঠিক নাই। কাহার সাধ্য সাঁতার দেয়, আর সাঁতার দিয়াই বা কোন্ দিকে যাইবেন? অল্প হাত-পা নাড়িয়া তিনি কেবল ভাসিয়া থাকিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভাসিয়া থাকাও দুঃসাধ্য কথা। পর্বতসদৃশ তরঙ্গরাশি তৃণবৎ তাঁহাকে তুলিতে ফেলিতে লাগিল। ঢেউয়ের আঘাতে তাঁহার শরীর চূর্ণ-বিচূর্ণ হইতে লাগিল। একবার তরঙ্গের শিখরদেশে উঠিয়া যখন তিনি পুনরায় নামিতে থাকেন, সেই সময় ঢেউয়ের মাথাটি ভাঙ্গিয়া যায় ও জলের ঝাপ্টা তাঁহার নাকে-মুখে প্রবেশ করিয়া শ্বাসরোধের উপক্রম হয়। ক্রমে তাঁহার হাত-পা অবশ হইয়া পড়িতে লাগিল আসন্নকাল উপস্থিত জানিয়া নিধিরাম ভগবানকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। "হা, হিরন্ময়ী! তোমার পিতাকে

উদ্ধার করিতে পারিলাম না, তোমার সে মধুমাখা মুখখানি আর দেখিতে পাইলাম না। হে করুণাময় জগদীশ্বর! তুমি আমার হিরন্ময়ীকে সুখী করিও'' আসন্নকালে নিধিরাম মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

হাত-পা নাড়িতে না পারিয়া নিধিরাম জলে ডুবিলেন। প্রাণের মায়া সহসা কেহ ছাড়িতে পারে না। জলে ডুবিয়াই পুনরায় একটু হাত-পা নাড়িতে চেষ্টা করিলেন। তাহাতে আর একবার উপরে ভাসিয়া উঠিলেন। কিন্তু আর বল নাই। শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ঘোর কাল-নিদ্রা তাঁহাকে ক্রমে ঘিরিতেছে। পুনরায় ডুবিলেন। ডুবিতে না ডুবিতে তাঁহার পায়ে কি ঠেকিল। অমনি তাঁহার একটু চমক হইল। পায়ে যে দ্রব্য ঠেকিল, তাহা তিনি ধরিলেন, একটু বল প্রকাশ করিযা পুনরায় উপবে ভাসিয়া উঠিলেন। মনকে প্রবোধ দিয়া নিদ্রাবেশ দূর করিলেন। পুনরায় তাঁহাব চেতনা হইল। জীবনের আশা হইল, তাহাতে শরীরে কিঞ্চিৎ শক্তিবও সঞ্চাব হইল। দেখিলেন যে, একগাছি কাছি তাঁহার পায়ে ঠেকিয়াছিল। টানিয়া দেখিলেন যে, সেই কাছি অতি দূরে কিছুতে বাঁধা আছে। নিধিরাম ভাবিলেন, কাছির অপর দিক হয় জলমগ্ন নৌকায় বাঁধা আছে, না হয় নদীর কিনারায় খোঁটায় বাধা আছে। বায়ুব প্রবলবেগে কাছি ডুবিযা যায নাই। সরলভাবে ভাসিতেছিল। তিনি সেই কাছিটি ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পর্বতকাল তবঙ্গের ভিতর দিয়া অগ্রসর হওয়া সহজ কথা নহে। যাহা হউক, অতি কষ্টে কিছু দূব গিয়া তিনি মাটী পাইলেন। ক্রমে কোমর জলে গিয়া দাঁড়াইলেন। তখনও ঢেউ তাঁহার মাথার উপর দিয়া যাইতেছিল! ক্রমে কিনারায় গিয়া উঠিয়া দেখিলেন যে, কাছিগাছাটি একটা খোঁটায় বাঁধা আছে। শরীর একবারে অবশ হইয়া পড়িয়াছিল। সেই খোঁটাটি ঠেশ দিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া বহিলেন। উপর হইতে চারিদিকে পাড ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। নিধিরাম ভাবিলেন,—এত কষ্টে যদি প্রাণ রক্ষা হইল, শেষে কি আবার মাটী-চাপা পড়িয়া মরিব না কি।

নিধিবাম দাঁড়াইলেন। অনেক পরিশ্রম করিয়া পাড়ের উপর গিয়া উঠিলেন। পাড়ের উপর দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতে বাতাসে তাঁহাকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। ঘোর অন্ধকার! কোন্‌দিকে লইয়া যাইতে লাগিল, তাহা তিনি বলিতে পারেন না। মনে করিলেন যে, 'যদি একটি গাছ পাই তো ধরিয়া বসিয়া থাকি; তাহার পর সকাল হইলে গ্রাম অনুসন্ধান করিব।' একবার একটি গাছ পাইলেন, কিন্তু সেটি চারা বাবলা গাছ। আগ্রহের সহিত ধরিতে গিয়া, তাঁহার সমস্ত হাতে কাঁটা ফুটিয়া গেল। বাতাসে পুনরায় তাঁহাকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। একবার তাঁহাকে পাড় হইতে নদীর ভিতর ফেলিয়া দিল। অতি কষ্টে পুনরায় তিনি উপরে উঠিলেন। পুনরায় বাতাসে তাঁহাকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে লাগিল, পাছে পুনরায় নদীর ভিতর ফেলিয়া দেয়, এই ভয়ে তিনি বুকে হাঁটিয়া যাইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে একটি ঝোপের নিকট উপস্থিত হইলেন। ঝোপের ভিতর প্রবেশ করিবার মানসে যেই অগ্রসর হইয়াছেন আর অমনি ফোঁস করিয়া একটি শব্দ হইল। নিধিরাম ভাবিলেন,—'মন্দ কথা নয়! সর্পাঘাতটিই বা বাকি থাকে কেন?' অপর দিকে

গিয়া একটি গাছ পাইলেন। গাছটি ধরিয়া বসিলেন। অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিয়া মনে মনে ভাবিলেন,—'চারিদিক জলে ডুবিয়া গিয়াছে। এই স্থানটি উচ্চ। এখানে অনেক সাপ আসিয়া আশ্রয় লইয়া থাকিবে। মাটীতে এরূপ ভাবে বসিয়া থাকা ভাল নয়। গাছের উপর বসিয়া থাকি। আস্তে আস্তে গাছে উঠিয়া একটু খুব বড় ডালের উপর বসিয়া শীতে কাঁপিতে লাগিলেন। ক্রমে ঝড় থামিল, বৃষ্টি থামিল, দুই একটি নক্ষত্র দেখা দিল, অন্ধকারের ঘোর নিবিড়তা অনেকটা ঘুচিল। কিন্তু এখনও আর কত রাত্রি আছে, নিধিরাম তাহা বুঝিতে পারিলেন না। প্রাতঃকালের প্রতীক্ষায় তিনি গাছের উপর বসিয়া রহিলেন।

পঞ্চম অধ্যায় – ঐ গাছে

সন্ধ্যার সময় কতকগুলি ব্রাহ্মণ এই স্থানে মড়া পোড়াইতে আসিয়াছিলেন। সে দিনকার ঘোর দুর্যোগে তাঁহাদিগের কাপড় ভিজিয়া গিয়াছিল। কাঠ, পাতা, সমস্ত ভিজিয়া গিয়াছিল। তাঁহারা চিতা সাজাইলেন। মড়াটি চিতার উপরে রাখিলেন, কিন্তু আগুন কিছুতেই ধরাইতে পারিলেন না। সেই ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কর্তা ব্যক্তি ছিলেন—উদ্ভব দাদা। মড়াটি না পোড়াইয়া জলে ফেলিয়া দিবার নিমিত্ত উদ্ভব দাদা প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু আর সকলে সে কথায় সম্মত হইলেন না। অবশেষে উদ্ভব দাদা বলিলেন,—'তা যদি না করিবে, তবে চল, এই গ্রাম হইতে শুষ্ক কাঠ, পাতা ও পাঁকাটি লইয়া আসি। আর অমনি একটু মদ খাইয়া আসি। বৃষ্টিতে ঠিক যেন ভিজা বিড়াল হইয়া গিয়াছে। হাড়ের ভিতর পর্যন্ত একবাক্য হইয়া সম্মত হইলেন। মড়াটি চিতার উপর পড়িয়া রহিল, কাছে কেহ রহিল না। এক ক্রোশ মাঠ পার হইয়া সকলে গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলেন। শুঁড়ির দোকানে বসিয়া মনের সুখে মদ খাইতে লাগিলেন। তাহার পর, ক্রমে সেই তুমুল ঝড় উঠিল। তখন আর ঘরের বাহিরে যায় কার সাধ্য! সকলকে বসিয়া বসিয়া একটু মদ খাইতে হইল। রাত্রি প্রায় দুইটার সময় ঝড় থামিল। তখন লোকের গোয়াল হইতে পাঁকাটি ও পাতা চুরি করিয়া উদ্ভব দাদার দল পুনরায় শ্মশান অভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাস্তায় টলিতে টলিতে কেহ গান করিতে লাগিলেন, কেহ বাজে বকিতে লাগিলেন। বক্তা সকলেই, শ্রোতা কেহই নয়।

একজন বলিলেন,—'উদ্ভব দাদার মদটুকু খাওয়া আছে, আমার টিকিটিও রাখা আছে।'

উদ্ভব দাদা উত্তর করিলেন,—'ওহে, তোমাদের টিকি না রাখিলে চলে, আমার চলে না। বংশজ ব্রাহ্মণ, বিয়ে হয় নাই। কাওরাণীর ঘরে থাকি, দেখা সাক্ষাৎ কাওরাণীর ভাত খাই। কেহ কিছু গোল তুলিলে অমনি টিকিটি খাড়া করিয়া ধরি। বলি, 'এই দেখ, বাবা, টিকি আছে।' অমনি সবাই চুপ, আর কথাটি কবার যো থাকে না।'

আর একজন বলিলেন,—'কেন? ফোঁটা কটিলে তো হয়? রামেশ্বর খুড়োর মত ফোঁটা দেখালেই তো চলে?'

উদ্ভব দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন,—'রামেশ্বর খুড়ো কি করিয়াছিলেন?'

লোকটি বলিল,—'রামেশ্বর খুড়োর নাতনীর বিবাহের কথা হইতেছিল। পাত্র পক্ষীয়

লোকেরা দেখিতে আসিবেন। রামেশ্বর খুড়োর ছেলে কিনু বলিল,—'বাবা! আর মদ খাইও না। বাড়ীতে আজ দুই জন ভদ্রলোক আসিবে, একটা দিন নাই খাইলে?'

"রামেশ্বর খুড়ো বলিলেন,—'রাম রাম! আজ কি মদ খাইতে পারি? যাই, সকাল সকাল স্নান করিয়া আসি। তুমি জলখাবার আর রান্নাবান্নার যোগাড় করিয়া দাও।' এই বলিয়া রামেশ্বর খুড়ো স্নান করিতে গেলেন। স্নান-টান কিছুই নয়, আস্তে আস্তে গিয়া শুঁড়ির বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। সেই স্থানে দুই প্রহর পর্যন্ত বসিয়া মদ খাইতে লাগিলেন। এ দিকে নাতিনীকে দেখিতে ঘরে সেই ভদ্রলোকেরা আসিয়াছেন। 'কর্ত্তা কোথায়' বলিয়া কিনুকে তাঁহারা বার বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। 'স্নান করিতে গিয়াছেন, এখনি আসিবেন' এইরূপ বলিয়া কিনু তাঁহাদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন। দুই প্রহর হইয়া গেল, রান্না প্রস্তুত, তবুও কর্ত্তার দেখা নাই। যা হইয়াছে, কিনু তাহা বুঝিলেন। বাড়ী আসিয়া পাছে ভদ্রলোকদিগের সমক্ষে ঢলাঢলি করেন, সে জন্য পিতাকে সাবধান করিবার নিমিত্ত কিনু শুঁড়ির বাড়ীর দিকে চলিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ পিতার সহিত পথে সাক্ষাৎ হইল। বগলে এক বোতল মদ লইয়া টলিতে টলিতে আসিতেছেন। কিনু বলিলেন,—'বাবা! তোমার কি মান অপমানের ভয় একেবারেই গিয়াছে? তোমাতে আর কি কোনও পদার্থই নাই? এই বৃদ্ধ বয়সে তোমার কি জ্ঞানগোচর একেবারেই গিয়াছে?' রামেশ্বর খুড়ো বলিলেন,—'কেন বাবা! হইয়াছে কি! এত রাগ কেন?' কিনু উত্তর করিলেন,—'হইয়াছে কি? বগলে ও কি!' রামেশ্বর খুড়ো বলিলেন,—'বগলে এ কি! বটে! আর কপালে এ কি? এটি দেখিলে আর ওটি বুঝি দেখিলে না।' রামেশ্বর খুড়ো শুঁড়ির বাড়ী হইতে বাহির হইয়া, পানাপুকুর হইতে একটু কাদা লইয়া কপালে একটি ফোঁটা কাটিয়াছিলেন। ছেলেকে সেই ফোঁটাটি দেখাইলেন। টিকি না রাখিয়া ফোঁটা কাটিলেও চলে, না চলে এমন নয়।

আর একজন বলিলেন,—"মড়াটা আশটা যারা পোড়ায়, টিকি রাখা তাদের পক্ষে ভাল নয়। একবার একটা মড়া দানো পাইয়া একজনের টিকি ধরিয়াছিল। আর একটু হইলেই তাহার ঘাড়টি ভাঙ্গিয়া দিত। ভাগ্যে তাহার কোমরে একখানি কাস্তে ছিল, চট্ করিয়া সে কাস্তেখানি বাহির করিয়া টিকিটি কাটিয়া ফেলিল, তাই তার প্রাণ বাঁচিল।"

আর একজন বলিলেন,—"ভাই! আমাদের মড়া যদি দানো পাইয়া থাকে? যদি গিয়া দেখি, চুলির উপর মদ্দারাম গট্ হইয়া বসিয়া আছেন? তাহা হইলে কি হইবে?'

সকলের মুখ শুকাইয়া গেল। তাই তো! বড় ভয়ের কথা বটে।

মড়াটি দানো পাইয়া থাকুক, আর নাই থাকুক, কিন্তু চিতার উপর নাই। বোধ হয়, শৃগালে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল। যাহা হউক, উদ্ভব দাদা প্রভৃতি সকলে আসিয়া দেখিলেন যে, চিতাটি খালি পড়িয়া রহিয়াছে। চারিদিকে তাঁহারা মড়া খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। নিকটে একটি ঝোপ দেখিতে পাইয়া, এক জন সেই ঝোপের ভিতর প্রবেশ করিলেন। গাছপানে চাহিয়াই তিনি "আঁ আঁ" করিতে করিতে বাহিরে আসিয়া ধড়াশ করিয়া পড়িলেন। "কি হইয়াছে? কি হইয়াছে" বলিয়া আর সকলে তাঁহার নিকট দৌড়িয়া

আসিলেন। পড়িয়া পড়িয়া সে লোকটি "গোঁ গোঁ করিতে লাগিলেন, কোনও উত্তর করিতে পারিলেন না। মুখে হাতে জল দিয়া সকলে তাঁহাকে চেতন করিলেন, তিনি বলিলেন,—'ঐ গাছে!' সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'গাছে কি? গাছে কি দেখিয়াছ?' কিন্তু সে লোকটি আর কিছুই বলিতে পারেন না। 'ঐ গাছে!' এই কথা বলিয়াই পুনরায় গোঁ গোঁ করিতে থাকেন। তখন সকলে উদ্ভব দাদাকে বলিলেন,—'উদ্ভব দাদা! তুমি গিয়া দেখিয়া এস, গাছে কি আছে।' উদ্ভব দাদা উত্তর করিলেন,—'তোমরা যাও না কেন? মড়া পোড়াইতে আসিয়াছি, তা বলিয়া নিজের কাঁচা মাথাটি বাড়াইয়া দিতে পারি না।' এ বলে তুমি যাও; ও বলে তুমি যাও; কিন্তু যাইতে কাহারও সাহস হয় না। অবশেষে সকলে একসঙ্গে গাছের নিকট যাইলেন। অন্ধকারে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না, তথাপি সকলে জানিতে পারিলেন যে, গাছের ডালে একটি মানুষের মত কি বসিয়া রহিয়াছে। সকলে নিশ্চয় বুঝিলেন যে, তাঁহাদের মড়াটি দানো পাইয়া গাছে বসিয়া আছে। গাছ হইতে লাফ দিয়া এখনও খাইতে কি ঘাড় ভাঙ্গিতে আসিল না, সে জন্য সকলের মনে অনেকটা সাহস হইল। দানো পাইলে যেরূপ প্রতিকার করিতে হয়, তখন সকলে সেইরূপ করিতে আরম্ভ করিলেন। দা, কোদাল, কুঠারি যাহার হাতে যা ছিল, সেই সকল ছুঁড়িয়া মারিতে লাগিলেন। গাছে নিধিরাম বসিয়া ছিলেন। গাছে বসিয়া তাঁহাদের কথাবার্তা তিনি কতক কতক শুনিয়াছিলেন।

নিধিরাম বলিলেন,—'মহাশয়গণ! আমাকে মারিবেন না। আমি আপনাদের মড়া নই। আমি পথিক ব্রাহ্মণ, আজ রাত্রির ঝড়ে আমার নৌকা ডুবিয়া গিয়াছে। অতি কষ্টে আমার প্রাণ বাঁচিয়াছে। প্রাতঃকালের প্রতীক্ষায় আমি এই গাছে বসিয়া আছি।'

সকলে বলিলেন,—'আমাদের মড়া নয়, তবে শালা তুই কাদের মড়া? দানো পাইয়া মনের সুখে গাছে বসিয়া আছেন, আবার বলেন কি না,—'আমি তোমাদের মড়া নই, আমি পথিক ব্রাহ্মণ!' নামিয়া আয়, শালা, শীঘ্র নামিয়া আয়!'

নিধিরাম আস্তে আস্তে গাছ হইতে নামিয়া আসিলেন। যদিও অন্ধকার, তথাপি উদ্ভব দাদা প্রভৃতি সকলে দেখিলেন যে, লোকটি প্রকৃতই তাঁহাদের মড়া নয়। সকলে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। সঙ্গে যে বোতল আনিয়াছিলেন, সকলে তাহা হইতে এক আধ ঢোক মদ খাইলেন। পুনরায় মদ খাইয়া বুদ্ধি যখন উত্তমরূপে পাকিয়া উঠিল, তখন উদ্ভব দাদা বলিলেন,—'তা তুমি আমাদের মড়া হও আর নাই হও, তোমাকে আমরা পোড়াইতে বাধ্য হইতেছি। কারণ, আমাদের নিজের মড়া কোথায় গিয়াছে, তাহার ঠিক নাই।'

নিধিরাম বলিলেন,—'সে কি মহাশয়! আমি জীয়ন্ত মানুষ, আমাকে পোড়াইবার কথা কি বলেন! তামাসা করিতেছেন বুঝি?'

উদ্ভব দাদা উত্তর করিলেন,—'তুমি আমার শালাসম্বন্ধী কিছুই নও যে তোমার সহিত তামাসা করিব! আমরা মড়া পোড়াইতে আসিয়াছি। শুধু হাতে কি করিয়া ঘরে ফিরিয়া যাই? তুমিই বুঝিয়া দেখ, সেটা কি ভাল কাজ হয়? অবুঝের মত কথা বলিও না। চল,

ভাল-মানুষের মত পুড়িবে চল। গণ্ডগোল করিও না। চল যাদু, পুড়িবে চল।'

নিধিরাম প্রথমে তামাসা মনে করিয়াছিলেন। অবশেষে বুঝিলেন যে, মাতালেরা সত্যসত্যই তাঁহাকে পোড়াইবে। তিনি অনেক অনুনয় বিনয় কবিলেন। পলাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। মাতালেরা বলপূর্বক তাঁহাকে ধরিয়া চিতায় শয়ন করাইল, চিতার সহিত বাঁধিয়া দিল, নিম্নে পাতা ও পাঁকাটি দিয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিল। —প্রাণে একেবারে হতাশ হইয়া, নিধিরাম বলিলেন,—"যদি আমি তোমাদের মড়াই হইলাম, তবে আমাকে স্নান করাইয়া তাহার পর পোড়াও। সকলেই জানে যে মড়াকে স্নান করাইয়া তাহার পর পোড়াইতে হয়।"সকলে বলিলেন,—'হাঁ! এ কথা সত্য বটে। মড়াকে স্নান কবাইয়া পোড়াইতে হয়।"

আগুন নিবাইয়া নিধিরামকে চিতা হইতে তাঁহারা উঠাইলেন ও দুইজনে দুই হাত ধরিয়া তাঁহাকে স্নান করাইতে যাইলেন।

নদীতে উপস্থিত হইয়া নিধিরাম বলিলেন,—"একবার ছাড়িয়া দাও, একটি ডুব দিই।"

নিধিরাম ডুব দিলেন, কিন্তু আর উঠিলেন না। "মড়া পলাইল," বলিয়া সকলে গোল কবিয়া উঠিলেন। কিন্তু অন্ধকারে নিধিবামের সন্ধান তাঁহাবা আর পাইলেন না। নিধিরাম নদীর স্রোতে ভাসিয়া চলিলেন। অনেক দূরে তিনি পুনরায় নদীর তীরে গিয়া উঠিলেন। কিন্তু সমস্ত রাত্রি জলে ভিজিয়া ও নানারূপ কষ্ট পাইয়া নিধিরামের শরীর একেবারে অবশ হইয়া গিয়াছিল। উপরে উঠিয়া তিনি অধিক দূর যাইতে পারিলেন না। তাঁহাব ঘোরতর কম্প উপস্থিত হইল। সেই মাঠের উপর শুইয়া পড়িলেন। শয়ন করিতে না করিতে অজ্ঞান হইয়া যাইলেন।

নদীব উপর প্রায় এক ক্রোশ মাঠ। মাঠের পর একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। গ্রামখানিতে কেবল চণ্ডাল ও মুসলমানের বাস। রাত্রিতে ঝড় হইয়াছিল। অনেক নৌকা ডুবিয়া থাকিলে জলমগ্ন নৌকার দ্রব্যাদি পাইবে, এই আশায় প্রাতঃকাল হইতে না হইতে গ্রামের লোক নদীর ধারে আসিয়াছিল। চণ্ডালেরা মৃতপ্রায় ভুতলশায়ী নিধিরামকে দেখিতে পাইল। তখনও তাঁহার দেহে প্রাণ ছিল। কোমরে তাঁহার টাকা আছে দেখিয়া কাহারও কাহারও লোভ হইল। তাহার নির্জীব দেহটি নদীতে ফেলিয়া দিয়া টাকাগুলি লইবার নিমিত্ত কেহ কেহ পরামর্শ করিল। কিন্তু সেই চণ্ডালদিগের মধ্যে দুই একজন বৃদ্ধ ছিল। নিধিরামকে ব্রাহ্মণ দেখিয়া, তাহারা এ প্রস্তাবে সম্মত হইল না; নিধিরামকে তাহারা বাটী লইয়া যাইল। অগ্নির উত্তাপ দিয়া ও নানারূপ সেবা করিয়া তাহারা নিধিরামকে কিঞ্চিৎ সুস্থ করিল বটে, কিন্তু তাঁহার চেতন হইতে না হইতে জ্বর-বিকার উপস্থিত হইল। অনেক দিন তিনি এই চণ্ডালের গৃহে অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া রহিলেন। সম্পূর্ণভাবে আরোগ্যলাভ করিতে প্রায় এক মাস অতীত হইয়া গেল। আরোগ্য লাভ করিলে, চণ্ডালেরা তাঁহাকে একখানি নৌকা করিয়া দিল। সেই নৌকা করিয়া নিধিরাম পুনরায় রামনগর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায় — আড় কাটায়

নিধিরামের নিকট অনেক টাকা আছে, নৌকার মাঝিরা কেহ কেহ এ কথা শুনিয়াছিল। এক দিন রাত্রিকালে নৌকার তলদেশে ছিদ্র করিয়া তাহারা নৌকাখানি ডুবাইবার উপক্রম করিল। শরীরে জল লাগিতেই নিধিরামের সহসা নিদ্রাভঙ্গ হইল। নৌকাখানি সম্পূর্ণভাবে ডুবিতে না ডুবিতে তিনি জলে ঝাঁপ দিলেন। দাঁড়ি মাঝিরাও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে জলে পড়িয়া তাঁহাকে ধরিল।

কেহ হাত কেহ পা ধরিয়া জলে ডুবাইয়া তাঁহার প্রাণবধ করিতে চেষ্টা করিল। বাঁচিবার নিমিত্ত সেই অন্ধকার রাত্রিতে জলের মাঝখানে নিধিরাম মাঝিদের সঙ্গে ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু তিনি একলা, মাঝিরা চারিজন, কতকক্ষণ আর তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবেন? বার বার তাঁহাকে জলে ডুবাইয়া ক্রমে নির্জীব করিয়া ফেলিল। আর অল্পক্ষণ পরেই মাঝিরা তাঁহার প্রাণবধ করিত, কিন্তু এই সময়ে কোথা হইতে একটি কুমির আসিয়া নিধিরামের কোমর ধরিল ও লেজের আঘাতে দুইজন মাঝির প্রাণবধ করিল। নিধিরামকে কুমীরে লইয়া চলিল। একবার ডুবাইয়া পুনরায় যখন কুমীর জলের উপর ভাসিল, তখনও নিধিরামের শরীরে প্রাণ ছিল। নিধিরামকে মুখে করিয়া কুমীর পুনরায় ডুবিল ও অল্পক্ষণ পরে নদীর তীরে গিয়া উপস্থিত হইল। সেই স্থানে নলের বন ছিল। নিধিরাম এক্ষণে মৃতপ্রায় হইয়া ছিলেন, কিন্তু তথাপি জ্ঞান ছিল। কুমীর তাঁহার কোমর ছাড়িয়া পা ধরিল। মাটীর ভিতর তাঁহার মুখ পুতিয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। এই সময়ে নিধিরাম কুমীরের দুইটি উজ্জ্বল চক্ষু দেখিতে পাইলেন। কুমীরের চক্ষুতে অঙ্গুলি দিয়া অনেকের প্রাণরক্ষা হইয়াছে, তাঁহার সেই কথা মনে পড়িল। কুমীরের দুইটি চক্ষুতে তিনি দুইটি অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। যাতনায় কুমীর তাঁহাকে ছাড়িয়া জলে গিয়া পড়িল। কুমীরের কামড়ে নিধিরামের শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল। তথাপি প্রাণের দায়ে কোনও রূপে তিনি নল-বন পার হইয়া নদীর উপর গিয়া উঠিলেন। আর অধিক দূর যাইতে পারিলেন না। সেই স্থানে বসিয়া আপনার দূরদৃষ্টের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন যে,—"হা ভাগবান! আমার কপালে তুমি এত লিখিয়াছিলে? কিন্তু হিরন্ময়ী! তোমার মত দুর্লভ রত্ন কি অনায়াসে লাভ হয়? তোমার পিতার জন্য যে আমি এই নিদারুণ ক্লেশ পাইতেছি, তাহাতে আমার কিছুমাত্র দুঃখ নাই,— তাহাতে আমার সুখ। এখন, একবার তোমার পিতাকে উদ্ধার করিতে পারিলে হয়!"

নদীর উপর যে স্থানে নিধিরাম বসিয়াছিলেন, সে স্থানটি জন-শূন্য প্রান্তর। নিকটে মনুষ্যের বসবাস নাই। উপরে কেবল একটি ভগ্ন কালীর মন্দির ছিল। নিকটস্থ গ্রামসমূহ হইতে লোক আসিয়া কালে-ভদ্রে এই কালীর পূজা দিয়া থাকে। উপরে মন্দির আছে, কি, কি আছে, নিধিরাম তাহার কিছুই জানেন না। রাত্রিকাল, অন্ধকার, কি করিয়া তিনি জানিবেন? এক দল ডাকাত এই রাত্রিতে কোথায় ডাকাতি করিতে যাইতেছিল। কালীর পূজা দিয়া তবে তাহারা ডাকাতি করিতে যাইবে। মহা সমারোহে এই স্থানে কালীর পূজা

হইতেছিল। যেখানে নিধিরাম বসিয়া আছেন, সেই স্থানে দুই জন ডাকাত বলি দিবার নিমিত্ত পাঁঠা স্নান করাইতে আনিল। নিধিরামকে তাহারা দেখিতে পাইয়া ধরিল। তাহারা বলিল,—"ভাই! মা'র কি কৃপা! মা আজ আমাদের মানুষপাঠা মিলাইয়া দিলেন। এখন বলি, হাঁ, মা কালী জাগ্রত বটে! অনেক কাল পরে মা'র আজ নরবলি খাইতে সাধ হইয়াছে। আজ আমাদের অনেক টাকা মিলিবে। নিধিরাম তাহাদিগের নিকট হাতযোড় করিয়া কত মিনতি করিলেন, কিন্তু তাহারা কিছুতেই ছাড়িল না। তাঁহাকে ধরিয়া তাহারা মন্দিরের সম্মুখে দলের মাঝখানে লইয়া গেল। ডাকাদের দলে আর আনন্দের পরিসীমা নাই। মা নিজে আজ নরবলির যোগাড় করিয়াছেন। প্রাণরক্ষার নিমিত্ত নিধিরাম কত কি বলিলেন, কিন্তু কেহ তাঁহাব কথায় কর্ণপাতও করিল না। ডাকাতদিগের পুরোহিত যথারীতি নিধিরামকে উৎসর্গ কবিলেন। ডাকাতেরা তাঁহাকে ধরিয়া খর্পরে শোয়াইল! কেহ পায়ের দিক্ ধরিল, কেহ মাথার দিক ধরিল। ডাকাতদিগের সদার নিজে কোপ মাবিবার নিমিত্ত খাঁড়া তুলিলেন। নিধিবাম বলপূর্ব্বক খর্পর হইতে মাথা সরাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, আর বলিলেন—"পাপিষ্ঠ নরাধমেরা! ব্রহ্মহত্যায় তোদের ভয় নাই?" কণ্ঠস্বর শুনিয়া ও মশালেব আলোকে নিধিরামের মুখ দেখিয়া, ডাকাতদিগের সর্দার খাঁড়া নামাইল। সর্দার বলিল,—'ইহাব সর্ব শরীর ক্ষতবিক্ষত, সর্ব শরীর হইতে ইহার রক্তধারা পড়িতেছে। মা'র নিকট এরূপ বলি কিছুতেই দেওয়া যাইতে পাবে না। ইহাকে ছাড়িয়া দাও।' বিরস বদনে ডাকাতেরা নিধিরামকে ছাড়িয়া দিল। নিধিরাম উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সর্দার বলিল,—"ব্রাহ্মণ! তোমার খুব পরমায়ু! এস, তোমাকে গ্রামে যাইবার পথ দেখাইয়া দিই।" একটু দূরে গিয়া উপস্থিত হইলে সর্দার বলিল,—"আমি কে জান? আমি উদ্ভব দাদা। মদ খাইয়া সে দিন তোমার প্রাণবধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। ভাগ্যক্রমে সে দিন তুমি রক্ষা পাইয়াছিলে। আজ সাদা চক্ষে তোমার মাথা কাটিতে আমার প্রবৃত্তি হইল না। যাও; কিন্তু অন্ধকার রাত্রি, মাঠেব পথ তুমি দেখিতে পাইবে না। কোনও গাছতলায় পড়িয়া রাত্রিযাপন কর। প্রাতঃকাল হইলে যেখানে ইচ্ছা যাইও।"

সকাল হইলে নিধিরাম অতিকষ্টে নিকটস্থ একটি গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কুমীরের কামড়ে সর্বশরীর তাঁহার ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল। পথ চলিবার তাহার শক্তি ছিল না। এই গ্রামে এক সদগোপের বাড়ী গিয়া আশ্রয় লইলেন। সেই স্থানে থাকিয়া যথাবিধি আপনার চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। আরোগ্য-লাভ করিয়া পুনর্বার রামনগর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথ চলিতে চলিতে বহুদূর চলিয়া যাইলেন। ক্রমে রামনগরের নিকটবর্তী হইতে লাগিলেন। একদিন সন্ধ্যাবেলা কোথাও বাসা না পাইয়া, তিনি একটি ব্রাহ্মণের বাড়ীতে অতিথি হইলেন। ব্রাহ্মণের দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ সাত বেটা। মকর্দ্দমা-মামলা, দাঙ্গা, হাঙ্গামা, চুরি, ডাকাতি, সকল বিষয়ে তাহারা পরিপক্ক। কর্তাটি মকর্দমা করিতে রামনগর গিয়াছিলেন। পুত্রেরা নিধিরামকে চণ্ডীমণ্ডপে স্থান দিয়া আহারাদির সমুদয় আয়োজন করিয়া দিলেন। আহারাদি করিয়া নিধিরাম শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময়ে

পাশের একটি দ্বার দিয়া দুইটি বালক উঁকি মারিল! তাহারা দুই জনে বলাবলি করিতে লাগিল,—"ভাই! এই বামুনের কাছে অনেক টাকা আছে। আজ রাত্রিতে বাবা, কাকা, সকলে মিলিয়া ইহাকে মারিয়া ফেলিবেন। ইহার পলাইবার যো নাই। চারিদিকে তাহারা পাহারা দিয়া আছেন। কি করিয়া মানুষ মারে, কখনও তাহা দেখি নাই। আয় ভাই, এক কর্ম করি। আরও রাত্রি হইলে চুপি চুপি বাটির ভিতর হইতে আসিয়া ঐ খড়ের গাদার ভিতর লুকাইয়া থাকিব। উহার ভিতর হইতে মানুষ মারা দেখিব।" নিধিরাম শুইয়া সকল কথা শুনিলেন। প্রাণরক্ষার নিমিত্ত কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারেন না। চিন্তা করিয়া তিনি কোনওরূপে চণ্ডীমণ্ডপের আড়কাটার উপর উঠিয়া বসিয়া রহিলেন। রাত্রি যখন দুই প্রহর হইল, বাড়ীর কর্তাটি রামনগর হইতে ফিরিয়া আসিলেন। চণ্ডীমণ্ডপে মাদুর ও বালিশ রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন। মনে করিলেন, "রাত্রি অধিক হইয়াছে, কাহাকেও আর ডাকাডাকি করিব না। এইখানেই শুইয়া থাকি।" চাদর মুড়ি দিয়া নিধিরামের বিছানায় বাড়ীর কর্তাটি শুইয়া রহিলেন। ঘোর রাত্রিতে ব্রাহ্মণের পুত্রেরা লাঠি বল্লাম প্রভৃতি লইয়া চণ্ডীমণ্ডপের নিকট উপস্থিত হইল। দুই জন আস্তে আস্তে চণ্ডীমণ্ডপের উপর উঠিয়া তাহাদের নিদ্রিত পিতার মাথায় সবলে এক মুগুর মারিল। মস্তক একেবারে চূর্ণ হইয়া ব্রাহ্মণের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইল। তাহার পর তাহারা ব্রাহ্মণের কোমরে হাত দিয়া টাকা অন্বেষণ করিতে লাগিল। কিন্তু টাকা পাইল না। ভাল করিয়া খুঁজিবার নিমিত্ত প্রদীপ আনিল। প্রদীপ আনিয়া দেখে না, পিতাকে হত্যা করিয়াছে! শোকে, ভয়ে, ক্রোধে সকলে আকুল হইয়া পড়িল! পথিক ব্রাহ্মণ কোথায় গেল? এই স্থানেই অবশ্য কোথায় লুকাইয়া আছে! এইরূপ চিন্তা করিয়া তাহারা প্রথমেই খড়ের গাদার চারিদিক হইতে বল্লমের খোঁচা মারিতে লাগিল। খড়েব গাদার ভিতর হইতে বালক দুইটি ভয়ে "আঁ আঁ" করিয়া উঠিল, আর কিছুই বলিতে পারিল না। কিন্তু অধিক আর বলিতে হইলও না, সেই মুহূর্তেই বল্লমের আঘাতে তাহারা প্রাণ হারাইল। খড়ের গাদার ভিতর হইতে বালক দুইটির মৃতদেহ বাহির করিয়া সকলে জানিতে পারিল যে, কি সর্বনাশই হইয়াছে! তাহারা মনে করিল যে, বিধাতা আজ তাহাদের প্রতি নিতান্ত বিমুখ হইয়াছেন। প্রতিবাসীদিগের ভয়ে অধিক আর গোলমাল করিতে পারিল না। তিনটি মৃতদেহ লইয়া খিড়কির বাগানে পুতিতে যাইল।

নিধিরাম আড়কাটার উপর বসিয়া এই সমুদয় ঘটনা দেখিতেছিলেন। এই লোমহর্ষণ ব্যাপার দেখিয়া ভয়ে তাঁহার শরীর কাঁপিতে ছিল। যখন তাহারা মৃতদেহ লইয়া খিড়কির বাগানের দিকে যাইল, তখন আস্তে আস্তে তিনি আড়কাটা হইতে নামিলেন, নামিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে রামনগরের দিকে দৌড়াইলেন। তাহার পরদিন রামনগরে উপস্থিত হইয়া, প্রথমেই এককড়িকে কারাগার হইতে মুক্ত করিলেন। কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া এককড়ি তাঁহাকে অগণ্য আশীর্বাদ করিলেন। নিধিরাম বলিলেন,—'মহাশয়! আপনি আজ বাড়ী গমন করুন। আপনার নিমিত্ত বাড়ীতে সকলেই চিন্তিত আছেন। আমার এখানে বিশেষ কোনও কাজ আছে। দুই চারি দিন পরে আমিও চণ্ডীপুরে গিয়া উপস্থিত হইব।' এককড়ি

কি করিবেন। একেলা বাটী গমন করিলেন।

সপ্তম অধ্যায় — অদৃষ্টের লেখা

নিধিরাম থানায় গিয়া গত রাত্রির সমুদয় ঘটনা পুলিশের নিকট জানাইলেন। সাতভায়েরা বদমায়েশ বলিয়া পুলিশের নিকট বিশেষরূপ পরিচিত। নিধিরামকে সঙ্গে লইয়া পুলিশের লোকে সাতভায়েদের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল। খিড়কির বাগান খুঁড়িয়া তিনটি মৃতদেহ পাইল। সাত ভাইসকলকে বাঁধিয়া রামনগরে চালান করিল। পুলিশের নিকট নিধিরামকে চারদিন থাকিতে হইল। তাহার পর তিনি পুনরায় চণ্ডীপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সমস্ত দিন পথ চলিয়া সন্ধ্যার সময় তিনি চণ্ডীপুরের নিকট একটি মাঠে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সে স্থান হইতে এককড়ির বাড়ী অধিক দূর নয়, প্রায় এক পোয়া পথ। হন্ হন্ করিয়া মাঠটুকু পার হইতেছেন, এমন সময় স্ত্রীলোকের কাতরস্বর তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। 'ওগো, কে যাও গো! আমাকে রক্ষা কর।' এই কযটি কথা শুনিতে পাইলেন। তাহার পর গোঁ গোঁ শব্দ হইতে লাগিল। যেন কেহ কাপড় দিয়া স্ত্রীলোকটির মুখ বন্ধ করিয়া দিল। নিধিরাম সেই দিক পানে দৌড়িলেন! নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, চারিজন লোক একটি শায়িতা স্ত্রীলোককে কাঁধে করিয়া বলপূর্বক লইয়া যাইতেছে ও একজন কাপড দিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া বাখিয়াছে। নিধিরাম বলিলেন,—'এ কি? কে তোমরা?' তাহাদের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল,—'সেই বাঙ্গাল শালা রে! বেটা হিরন্ময়ীকে বে করিবেন! বামন হইয়া চাঁদে হাত! মার বেটাকে।

যখন এককড়ি বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন, তখন বদরুদ্দিন অর্থাৎ বৈদ্যনাথ দেবশর্মার ঘরে বড়ই ভাবনা উপস্থিত হইল। বৈদ্যনাথ মনে করিয়াছিলেন যে, অধিক দিন কারাগারে কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া এককড়ি হিরন্ময়ীর সহিত তাঁহার পুত্র গবীরুদ্দিন অর্থাৎ গোবিন্দচন্দ্রের বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইবেন। কিন্তু তাহা হইল না। হতাশ হইয়া গোবিন্দ একেবারে পাগল হইয়া উঠিলেন! বলপূর্বক হিরন্ময়ীকে লইয়া বিবাহ করিবেন, তিনি এইরূপ সঙ্কল্প করিলেন। টাকা দিয়া চারিজন ইতর লোককে বশ করিলেন। পাঁচজনে হিরন্ময়ীকে ধরিবার নিমিত্ত সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। দৈব্যক্রমে আজ হিরন্ময়ী সন্ধ্যার পর একটু বাড়ীর বাহিরে আসিয়াছিলেন। সেই অবসরে পাষণ্ডেরা তাঁহাকে ধরিল ও মুখে কাপড় দিয়া মাঠের দিকে লইয়া চলিল। বাটীর লোক কি গ্রামের লোক কেহই ইহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারিলেন না। মাঠের মাঝখানে উপস্থিত হইলে, দৈব্যক্রমে হিরন্ময়ীর মুখের কাপড় একটু আলগা হইয়া গিয়াছিল। তাই তিনি একবার চীৎকার করিতে পারিয়াছিলেন। দৈব্যক্রমে সেই সময় নিধিরামও মাঠ দিয়া যাইতেছিলেন।

গোবিন্দের কথা শুনিয়া নিধিরাম বুঝিলেন যে, তাহারা হিরন্ময়ীকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে। নিমেষের মধ্যে তিনি এক ঘা লাঠি মারিয়া দুইটি লোককে ভূতলশায়ী করিলেন। বাকি তিনজন হিরন্ময়ীকে ছাড়িয়া নিধিরামের উপর লাঠি-বর্ষণ করিতে লাগিল। 'কে কোথায় আছ গো!' এই বলিয়া হিরন্ময়ী চীৎকার করিতে লাগিলেন। দূর হইতে কে শব্দ

করিল,—'যাই, যাই, ভয় নাই।' এইরূপ শব্দ শুনিয়া গোবিন্দ ও তাহার সঙ্গিগণ পলাইল। নিধিরামের লাঠিতে যে দুইজন প্রথমেই মাটীতে পড়িয়া গিয়াছিল, তাহারাও পলাইল।

গোবিন্দ ও তাহার সঙ্গিগণ যখন পলাইয়া গেল, তখন হিরন্ময়ী দেখিলেন যে, নিধিরাম মাটীতে পড়িয়া রহিয়াছেন। তাড়াতাড়ি হিরন্ময়ী গিয়া তাঁহার মাথাটি তুলিয়া ধরিলেন। দেখিলেন, তাঁহার জ্ঞান নাই, সর্বশরীর রক্তে প্লাবিত হইতেছে। কাঁদিতে কাঁদিতে হিরন্ময়ী তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে দূর হইতে যে লোকটি সাড়া দিয়াছিলেন, উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে দৌড়িতে আসিয়া সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন। তিনি অতি সুন্দর যুবা পুরুষ। আর কেহ নয়, জয়দেবপুরের ধনবান্ কুলীনের ছেলে নবীন, যাঁহারা মাতুলাশ্রম চণ্ডীপুরে, যাঁহার সহিত হিরন্ময়ীর বিবাহের কথা হইযাছিল। নবীন আসিয়া উপস্থিত হইলে, হিরন্ময়ী কাঁদিতে কাঁদিতে দুই চারি কথায় তাঁহাকে ঘটনার বিষয় বলিলেন। নিধিরামের নাকে মুখে বুকে হাত দিয়া নবীন বলিলেন,—'বোধহয়, ইনি এখনও জীবিত আছেন। কিন্তু অতি শীঘ্র ইহাকে গ্রামে লইয়া যাইতে হইবে। আমরা দুইজনে এত পথ লইয়া যাইতে পারিব না। রও, আমি লোক ডাকি।' এই বলিয়া নবীন চীৎকার করিয়া লোক ডাকিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যাবেলা হিরন্ময়ী বাহিরে গিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পর ক্রমে অন্ধকার হইয়া আসিল, তথাপি হিরন্ময়ী ফিরিয়া আসিলেন না। এককড়ি ও তাঁহার গৃহিণী প্রথমে বাড়ীর আশে পাশে খুঁজিয়া দেখিলেন, কিন্তু তাহাকে পাইলেন না। কত ডাকিলেন, কিন্তু কোনও উত্তর পাইলেন না। মহাভাবনা উপস্থিত হইল। প্রতিবাসীগণ চারিদিকে হিরন্ময়ীকে খুঁজিতে দৌড়িল। যাহারা মাঠের দিকে খুঁজিতে আসিয়াছিল, তাহারা নবীনের চীৎকার শব্দ শুনিতে পাইল। যে স্থানে ভূতলশায়ী নিধিরামকে লইয়া হিরন্ময়ী ও নবীন ছিলেন, সেই স্থানে আসিয়া তাহারা উপস্থিত হইল। ঘটনার বিষয় সকলে অবগত হইয়া ধরাধরি করিয়া মুমূর্ষু নিধিরামকে এককড়ির বাড়ীতে লইয়া গেল। প্রদীপ আনিয়া সকলে দেখিল যে, নিধিরামের আর কিছু বাকী নাই। বক্ষঃস্থলে প্রাণটুকু কেবল অল্পমাত্র ধুক্ ধুক্ করিতেছে। মস্তক দুই চারি স্থানে ফাটিয়া গিয়াছে, একটি চক্ষু বাহির হইয়া পড়িয়াছে, নাসিকা একেবারে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, দুই পাটি দন্ত একেবারে গিয়াছে। রক্তে রক্ত! নিধিরামের সেই সুন্দর, গৌরবান্বিত মুখখানি একেবারে পিণ্ডাকার হইয়া গিয়াছে। মানুষের মুখ বলিয়া আর চিনিতে পারা যায় না।

এককড়ির ঘরে সে রাত্রিতে কান্নাকাটি পড়িয়া গেল। যাহা হউক, যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। নিধিরামকে বাঁচাইবার নিমিত্ত আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সকলে যত্নবান হইলেন। সে রাত্রিতে নিধিরামের মৃত্যু হইল না। তাহার পরদিনও হইল না। তিনদিনের দিনও মৃত্যু হইল না। একটু যেন আশা হইল। কিন্তু জ্ঞান নাই, গোচর নাই, কিছু নাই। কেবল নিশ্বাসটি পড়িতেছে এইমাত্র।

হিরন্ময়ী নিধিরামের সেবা করিতে লাগিলেন। হিরন্ময়ী সর্বদা অচেতন নিধিরামের নিকট বসিয়া থাকেন। নবীন প্রতিদিন নিধিরামকে দেখিতে আসেন। নিধিরামের নিকট

অনেকক্ষণ ধরিয়া বসিয়া থাকেন। একদিন নবীন বলিলেন,—'হিরন্ময়ী আমি শুনিয়াছি, তোমার সহিত আমার বিবাহের কথা হইয়াছিল। আমার পিতা অনেক টাকা চাহিয়াছিলেন, তাই হয় নাই। তখন যদি জানিতাম যে, তোমার কি অপূর্ব রূপ, তুমি কি অমূল্য রত্ন, তাহা হইলে বাবাকে কি অমত করিতে দিতাম? মা-বাপের আমি একমাত্র সন্তান। আমাদের টাকা-কড়ির অভাব নাই। মায়ের নিকট কাঁদিয়া কাটিয়া যেমন করিয়া হউক, পিতাকে সম্মত করাইতাম। বড়ই দুরদৃষ্ট, হিরন্ময়ী! যে তোমার সহিত আমার বিবাহ হইল না।' হিবন্ময়ী উত্তর করিলেন,—মহাশয়! আমাকে ওরূপ কথা বলিবেন না।'

হিরন্ময়ী একথা বলিলেন বটে, কিন্তু সেইদিন হইতে তাঁহার চিত্ত একটু চঞ্চল হইল। একদিকে দরিদ্র, অর্দ্ধ বৃদ্ধ, একচক্ষুহীন, নাসিকাহীন, দন্তহীন, কিম্ভূত কদাকার ভয়াবহ নিধির'মের পিণ্ডাকাব মুখ, অপর দিকে ধন-সম্পত্তিবিশিষ্ট, নবযৌবনসম্পন্ন, রূপবান্ নবীনেব মুখ। নিধিরাম না বাঁচেন, হিরন্ময়ীর একটু ইচ্ছা হইল। সেইদিন হইতে নিধিবামের সেবার একটু কমও পড়িল।

তাহার পরদিন নবীন পুনরায় সেই কথা বলিলেন। সে দিন হিরন্ময়ী আর তাঁহাকে বকিলেন না। পরদিন নবীন পুনরায় সেই ভাবের কথা বলিলেন। হিবন্ময়ী ঘাড় হেঁট করিয়া শুনিতে লাগিলেন। চক্ষু দিয়া তাঁহার ফোঁটায় ফোঁটায় জল পড়িতে লাগিল। হিরন্ময়ী অবশেষে উত্তর করিলেন,—'আমাকে এত সব কথা বলা বৃথা। আমি স্ত্রীলোক, আমার কি হাত আছে? আমার পিতা মাতা আছেন, কিছু বলিতে হয়, তাঁহাদিগকে বলুন।' দুই দিন নবীন আর আসিলেন না। তাঁহাকে না দেখিয়া হিরন্ময়ীর প্রাণ উদাস হইল। দুই দিন পরে আসিয়া হিরন্ময়ীকে বলিলেন,—'আমি বাড়ী গিযাছিলাম। তোমার সহিত বিবাহ-বিষয়ে আমার পিতা-মাতাকে সম্মত করিয়াছি। কিন্তু তোমার পিতা কিছুতেই সম্মত হইতেছেন না। তিনি বলিলেন,—'নিধিরামকে কন্যা সমর্পণ করিয়াছি। নিধিরাম যদি এ যাত্রা রক্ষা না পান, তাহা হইলে জানিব, আমার কন্যা বিধবা হইয়াছে। বিধবা হইয়া কন্যা আম'র ঘরে থাকিবে!' নবীন বিলাপ করিতে লাগিলেন, হিরন্ময়ীও কাঁদিতে লাগিলেন।

যাহার পরমায়ু আছে, তাহাকে কে মারিতে পারে? নিধিরামের ক্রমে জ্ঞান হইল, নিধিরাম ক্রমে সুস্থ হইতে লাগিলেন। প্রায় একমাস পরে নিধিরাম উঠিয়া বসিতে পারিলেন। আরও কিছু দিন পরে তিনি একটু-আধটু চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে সমর্থ হইলেন! নিধিরামের প্রাণ বাঁচিল বটে, কিন্তু তাঁহার রূপ দেখিলে আর জ্ঞান থাকে না। মাথায় ও মুখের চারিদিকে সেলাই করার মত দাগ। একটি চক্ষুতে ঢেলা বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। নাসিকাটি বিলুপ্তপ্রায়। দন্ত একটিও ছিল না। এরূপ কিম্ভূত কদাকার রূপ কেহ কখনও দেখে নাই। দেখিলে ভয় হয়। 'ইনি আমার পতি হইবেন! এই কথা ভাবিয়া হিরন্ময়ীয় প্রাণ শিহরিয়া উঠিল।

যে দিন হইতে নিধিরাম চেতন হইলেন, সেই দিন হইতে নবীন আর হিরন্ময়ীর সহিত মনের কথা বলিতে পারিলেন না। নিধিরাম যখন একটু-আধটু বেড়াইতে সমর্থ হইলেন,

তখন একদিন সুযোগ পাইয়া নবীন হিরন্ময়ীকে বলিলেন,—'হিরন্ময়ী! পৃথিবীতে আর আমাদের কোনও আশা-ভরসা নাই। তোমার নিকট দুইটা মনের কথা বলি, এরূপ অবসর আর পাইব না। আজ সন্ধ্যার পর যদি তুমি তোমাদের বাটীর পশ্চাতে অশ্বত্থতলায় একবার আসিতে পার, তাহা হইলে দুইটি মনের কথা বলিয়া তোমার নিকট হইতে চির বিদায় হই।

হিরন্ময়ী কোনও উত্তর করিলেন না। 'যাইব কি না যাইব' সমস্ত দিন এই কথা ভাবিতে লাগিলেন। যাওয়া উচিত নয়, তাহা তিনি নিশ্চয় বুঝিলেন। কিন্তু পুনরায় ভাবিলেন,— 'যাই না কেন? একবার গিয়া চির বিদায় হইয়া আসি না কেন? তাহাতে আর দোষ কি।'

অষ্টম অধ্যায় – সব ফুরাইল

এককড়ির বাটীর পিছনে অশ্বত্থ গাছ ছিল। অশ্বত্থ গাছের তলদেশ গোল করিয়া চারিদিক সান বাঁধানো ছিল। সন্ধ্যার সময় হিরন্ময়ী নবীনের সহিত সেই অশ্বত্থতলায় সাক্ষাৎ করিলেন। দুইজনে কত কি বলিলেন,—'আমি সংসার পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া পথে পথে বেড়াইব।' হিরন্ময়ী বলিলেন,—'বৃদ্ধের কদাকার মুখ মনে করিতে গেলে আর জ্ঞান থাকে না, ভয়ে সর্বশরীর শিহরিয়া উঠে।'

দৈবের ঘটনা! সেইদিন সন্ধ্যাবেলা নিধিরাম আসিয়া এই অশ্বত্থতলায় সানের উপর বসিয়াছিলেন। যে দিকে নিধিরাম বসিয়াছিলেন, তাহার বিপরীত দিকে বলিয়া হিরন্ময়ী ও নবীনের কথাবার্তা হইতেছিল। হিরন্ময়ী ও নবীন নিধিরামকে দেখিতে পান নাই, কিন্তু নিধিরাম তাঁহাদিগের সকল কথা বসিয়া বসিয়া শুনিতেছিলেন। যখন হিরন্ময়ী ও নবীন ঘোরতোর খেদ, ঘোরতর কান্না-কাট্না করিতে লাগিলেন, তখন নিধিরাম আর থাকিতে পারিলেন না। নিধিরাম বলিলেন,—'নবীন বাবু! তুমি বাড়ী যাও। কাল তোমার মাতুলের সহিত আমি সাক্ষাৎ করিব। হতাশ হইও না, আমি নরাধম নই।' নবীন চমকিত হইলেন। নিধিরামের গুরুগম্ভীর বাক্যে লজ্জিত হইয়া অধোবদনে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

নবীন চলিয়া যাইলে, নিধিরাম হিরন্ময়ীকে বলিলেন,—'হিরন্ময়ী! তোমার মনে এই ছিল? আমি কুরূপ কদাকার হইয়াছি সত্য! কিন্তু মন তো আমার সেই আছে। জীবন মন তো আমার হিরন্ময়ীতে জড়িত হইয়া রহিয়াছে। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, হিরন্ময়ী! এ বয়সে মনে কোনও একটা বিষয় অঙ্কিত হইয়া যাইলে তাহার আর মুছিয়া ফেলিবার যো নাই। তোমার জন্য আমি অনেক কষ্ট পাইয়াছি! হিরন্ময়ী! সে কথা তুমি কিছুই জান না। হিরন্ময়ী! কিন্তু সে কষ্ট কিছুই নয়। আজ আমার মনে তুমি যে শেল মারিলে, তাহার কাছে সে কষ্ট কি ছার! সকলই অদৃষ্টের দোষ। যাও, হিরন্ময়ী ঘরে যাও। নিধিরাম কুরূপ, কদাকার বাঙ্গাল বটে, কিন্তু অভদ্র নয়। তুমি যাহাতে সুখী হও, তাহা আমি করিব।'

তাহার পরদিন নিধিরাম নবীনের মাতুলের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নবীনের পিতা মাতা হিরন্ময়ীর সহিত বিবাহে সম্মত আছেন, তাহা জানিতে পারিলেন। নিধিরাম বলিলেন,—'আপনারা অধিক আড়ম্বর করিবেন না। কেবল বর, পুরোহিত ও নাপিত

লইয়া আসিবেন। এই মাসেই হিরন্ময়ীর সহিত নবীনের বিবাহ হইবে। আমি যেমন করিয়া পারি, হিরন্ময়ীর পিতাকে সম্মত করিব। নবীনের মাতুল এ কথায় সম্মত হইলেন।

তাহার পর নিধিরাম এককড়িকে বলিলেন,—'মহাশয়! আমার এই বিকট মূর্তি দেখিয়া ভূত পর্যন্ত ভয়ে পলায়। নিজের মুখ নিজে দেখিয়া আমি ভয় পাই। আমি হিরন্ময়ীকে কখনই বিবাহ করিব না, ইহা আমার একান্ত প্রতিজ্ঞা জানিবেন। হিরন্ময়ীর সহিত নবীনের বিবাহ হইবে, সব স্থির হইয়াছে। এখন আপনি অনুমতি করিলেই হয়।'

এককড়ি কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন,—'আমার কন্যা কুলটা নহে। কন্যা আমার আপনার পত্নী। অন্যমত করিলে আমি ধর্মে পতিত হইব, কন্যাও ধর্মে পতিত হইবে। এ কাজ করিতে আমি কিছুতেই পারিব না।'

নিধিরাম এককড়িকে ক্রমাগত জপাইতে লাগিলেন। কত বলিলেন, কত বুঝাইলেন, কিন্তু এককড়ি কিছুতেই সম্মত হইলেন না। অবশেষে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া এককড়ি বলিলেন,—'তুমি ও গৃহিণী যাহা জান, কর; আমি বাটী হইতে চলিলাম। এ পাপে আমি লিপ্ত থাকিব না।' এই বলিয়া এককড়ি বাটী হইতে প্রস্থান করিলেন।

নিধিরামের হাতে যা অবশিষ্ট টাকা ছিল, তাহা দিয়া বিবাহের সমুদয় আয়োজন করিলেন। বিবাহের দিন উপস্থিত হইল। এক জন জ্ঞাতি ডাকিয়া নিধিরাম কন্যা উৎসর্গ করাইলেন। নবীনের সহিত হিরন্ময়ীর বিবাহকার্য সমাধা হইল।

অনেক অনুসন্ধান করিয়া, নিধিরাম তাহার পরদিন এককড়িকে বাহির করিলেন। নিকটস্থ একটি গ্রামে, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, শোকে দুঃখে আকুল হইয়া তিনি পড়িয়াছিলেন।

নিধিরাম বলিলেন,—'মহাশয়! কার্য শেষ হইয়া গিয়াছে। কন্যা লইয়া আপনার জামাতা নবীন, আজ নিজ গ্রামে গমন করিবেন,—কন্যা বিদায় করিবেন চলুন।

এককড়ি উত্তর করিলেন,—'নিধিরাম! তোমা হেন দেব-পুরুষকে যে জামাতা করিতে পারিলাম না, পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিতে পারিলাম না, সে দুঃখ বড় রহিল। বৃদ্ধ হইয়াছি, অধিক দিন আর বাঁচিব না, কিন্তু এই মনের কালি আর কখনও ঘুচিবে না। চল যাই, চিরদিনের নিমিত্ত হিরন্ময়ীকে বিদায় করি। কি জন্য তুমি তাহাকে বিবাহ করিলে না, তাহা জানি না। কিন্তু আর আমি কখনও তাহার মুখ দেখিব না।'

দশ ক্রোশ দূর, জয়দেবপুর যাইবেন বলিয়া, নবীন নৌকা ভাড়া করিলেন। হিরন্ময়ীকে লইয়া উঠিলেন। তাঁহাদিগকে বিদায় করিবার নিমিত্ত এককড়ি ও নিধিরাম গঙ্গার ঘাট পর্যন্ত আসিয়াছিলেন। নৌকা ছাড়িয়া দিল।

নিধিরাম এককড়িকে বলিলেন,—'মহাশয়! আমার বুকের ভিতর কিরূপ করিতেছে। মা'র সুশীতল পবিত্র নীরে শরীরের কিয়দংশ কিছুকালের নিমিত্ত নিমগ্ন করিয়া রাখি, তাহা হইলে বোধ হয় শরীর সুস্থ হইবে। আপনি আমার নিকটে বসুন, আপনার কোলে মাথা রাখিয়া একটু বিশ্রাম করি।'

এককড়ি জলের নিকট গঙ্গাতীরে বসিলেন। নিধিরাম প্রথম তাঁহার চরণ-ধূলি লইয়া আপনার মস্তকে রাখিলেন। তাহার পর আপনার কণ্ঠদেশ পর্যন্ত গঙ্গাজলে নিমগ্ন করিলেন। এককড়ির বক্ষঃস্থলে মাথা রাখিয়া অর্ধশায়িতভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। হাতে পৈতা জড়াইয়া জপ করিতে লাগিলেন। ওঁ গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম: ওঁ রামঃ। হরে হরে রাম রাম, রাম রাম হরে হরে। ওঁ গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম, ওঁ রামঃ।

হিরন্ময়ী মৃদুমধুর ভাষে নবীনকে বলিলেন,—'বাঙ্গাল কি করিতেছে দেখ! ঠাট করিয়া আবার বাবার কোলে শোয়া হইয়াছে।'

নিধিরাম সেই নৌকা পানে একদৃষ্টে অনিমিষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। এককড়ি দেখিলেন যে, নৌকাখানি যতই দূরে যাইতে লাগিল, আর নিধিরামের শরীর ততই অবশ, অবসন্ন, গুরু হইতে লাগিল। মোড় ফিরিয়া যেই নৌকাখানি অদৃশ্য হইল, আর নিধিরামের প্রাণ-বিয়োগ হইল।

ওঁ গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম, ওঁ রামঃ।
হরে হরে রাম রাম,
রাম রাম হরে হরে।
ওঁ গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম। ওঁ রামঃ।

—o—

বীরবালা

[পাঠক, গল্পটি বুঝিয়া পড়িবেন]

প্রথম অধ্যায় — বীর হনুমান

গল্পটি এ দেশের নয়,—পশ্চিমের, বাঙ্গালীর নয়, হিন্দুস্থানীর। ব্রাহ্মণ কায়েতের নয়,—রাজপুতের। দেবীসিংহ, জাতিতে রাজপুত; নিবাস অযোধ্যায়; বয়স ২০ বৎসর; দেখিতে সুন্দর। শিশুবেলাই দেবীসিংহের পিতা-মাতার মৃত্যু হয়। সংসারে তাঁহার আর কেহ নাই, কেবল বৃদ্ধা পিতামহী। তিনিই দেবীসিংহকে প্রতিপালন করিয়াছেন।

পিতামহী বলিলেন,—"দেবী! সকাল সকাল আহার করিয়া সরযূর ঘাটে গিয়া বসিয়া থাক। নৌকা করিয়া তাঁহারা আসিবেন। বরাবর তাঁহাদিগকে বাটী লইয়া আসিবে। পাণ্ডাদিগের বাড়ীতে বাসা করিতে দিবে না।"

দেবীসিংহের যখন এগার বৎসর বয়স, তখন পাঁচ বৎসরের একটি বালিকার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার শ্বশুর-বাড়ী অনেক দূর। বিবাহের পর আর তিনি শ্বশুরবাড়ী যান নাই? শ্বশুর-শাশুড়ীকে তাঁহার মনে পড়ে না। শুভদৃষ্টির পর স্ত্রীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। আজ দেবীসিংহের শ্বশুর সপরিবারে অযোধ্যায় তীর্থ করিতে

আসিতেছেন। আজ সরযূর ঘাটে আসিয়া পৌঁছিবেন। তাই পিতামহী বলিলেন,—"দেবী! সকাল সকাল আহার করিয়া ঘাটে গিয়া বসিয়া থাক। তোমার শ্বশুর-শাশুড়ীকে আমাদের বাটী লইয়া আইস। আজ আমার বড় আনন্দের দিন। দেবী! আজ আমি পুত্র বধূর মুখ দেখিয়া জন্ম সার্থক করিব।"

সরযূর ঘাটে গিয়া দেবী বসিয়া রহিলেন। অশ্বত্থ বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় বসিয়া দেবী ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার শ্বশুর কিরূপ? তাঁহার নাম কি? তাঁহার স্ত্রী এখন কত বড় হইয়াছে। দেখিতে কিরূপ? নাম কি?" এইরূপ শ্বশুরবাড়ী সম্বন্ধে নানা কথা দেবী ভাবিতে লাগিলেন। দিন অতীত হইল, সন্ধ্যা হইল, তবুও তাঁহারা আসিলেন না। দেবী মনে করিলেন,—"আজ বুঝি তাঁহারা আর আসিলেন না। যাই হউক, রাত্রি নয়টা পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া দেখি, তাহার পর বাটী ফিরিয়া যাইব।"

অশ্বত্থমূলে ঠেশ দিয়া দেবীসিংহ বসিলেন,—বসিয়া পুনরায় শ্বশুরবাড়ীর কথা ভাবিতে লাগিলেন। সরযূকূল এখন জনমানবশূন্য; নীরব। রাখালগণ গরু-মহিষের পাল লইয়া ঘরে গিয়াছে। পলাশ-কেশর-রঞ্জিত পীত-বসনা অঙ্গনাগণ এখন আর সরযুর ঘাটে নাই। পাণ্ডাদিগের কোলাহল-ধ্বনি একেবারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সরযূর জল কুলকুল শব্দে বহিয়া যাইতেছে। নক্ষত্ররাশি সরযূর ঈষৎ তরঙ্গ-হিল্লোলে নাচিতেছে। দেবী তাই দেখিতেছেন, তাই শুনিতেছেন, আর শ্বশুরবাড়ীর কথা মনে মনে ভাবিতেছেন। এমন সময় কি হইল?—না,—ভয়ানক "উপ" করিয়া এক প্রকাণ্ড হনুমান অশ্বত্থ গাছ হইতে লাফ দিয়া দেবীসিংহের সম্মুখে পড়িল। পাছে কামড়াইয়া দেয়, সেই ভয়ে দেবীসিংহ পলাইবার উদ্যোগ করিলেন। পলাইতে না পলাইতে বীর হনুমান তাঁহাকে বলিলেন,—"আমার গাছতলা তুমি অপবিত্র করিলে কেন? তোমার কি কৃস্তানি মতলব?"

দেবীসিংহ উত্তর করিলেন,—"আজ্ঞা, না মহাশয়! কৃস্তানি মতলব কেন হইবে? এই দেখুন, আমার মাথায় শিখা রহিয়াছে!' বীর হনুমান বলিল,—"কৈ দেখি?'

দেবীসিংহ বীর হনুমানের দিকে মস্তক অধনত করিলেন। টিকির মর্যাদা-রক্ষক বীর হনুমান বাম হাত দিয়া টিকিটি ধরিলেন; ধরিয়া, একবার এদিক একবার ওদিক করিয়া টান মারিতে লাগিলেন, আর বলিতে লাগিলেন,—"বেশ টিকিটি; বাঃ দিব্য টিকিটি!'

কিন্তু টিকিটি ভাল হইলে কি হইবে, দেবীসিংহের এদিকে প্রাণ বাহির হইতে লাগিল, মুণ্ডটি ছিঁড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল, দেবীসিংহের চক্ষে জল আসিল। টিকির টানে একবার তাঁহার ঘাড়টি খুট করিয়া উঠিল। ঘাড়টি যেই খুট করিল, আর দেবীসিংহ জ্ঞান হারাইলেন। তাহার পর কি হইল, তিনি কিছুই জানেন না।

যখন পুনরায় জ্ঞান হইল, তখন দেবীসিংহ দেখিলেন যে, মাটীতে পড়িয়া রহিয়াছেন। একটি স্ত্রীলোকের কোলে তাঁহার মাথা রহিয়াছে। স্ত্রীলোকটি কাঁদিতেছেন, সেই চক্ষু-জলের দুই এক ফোঁটা তাঁহার গায়ে পড়িতেছে। আশে-পাশে অনেকগুলি পুরুষ-মানুষ, মেয়ে-মানুষ, বালক-বালিকা—সব দাঁড়াইয়া আছে। সকলেই অপরিচিত। দেবীসিংহ যেই চক্ষু

চাহিলেন, আর চারিদিকে আনন্দধ্বনি হইল। সকলে বলিল,—"আর কোনও ভয় নাই। ধর্মদত্ত এইবার প্রাণ পাইল। ধর্মের মা! আর কাঁদিও না, আর কোনও ভয় নাই। বাছাকে লইয়া এখন ঘরে যাও।"

যে স্ত্রীলোকটির কোলে তাঁহার মাথা ছিল, তিনি অতি স্নেহের সহিত দেবীসিংহের গায়ে হাত দিয়া বলিলেন,—"ধর্মদত্ত! বাবা আমার! এখন একটু কি ভাল হইয়াছে?"

দেবীসিংহ উত্তর করিলেন,—"তুমি কে? আমি তো তোমাকে চিনি না! আমার নাম তো ধর্মদত্ত নয়। আমার নাম যে দেবীসিংহ!' স্ত্রীলোকটি কাতরস্বরে বলিলেন,—'কৈ গা। আমার ধর্মের তো এখনও জ্ঞান হয় নাই! আমার ধর্ম তো কৈ এখনও ভাল হয় নাই। সে কি বাবা ধর্ম! দশমাস দশ দিন তোমাকে গর্ভে ধরিলাম, আজ এগার বৎসর ধরিয়া প্রতিপালন করিলাম, আমাকে তুমি চিনিতে পার না?'

সকলে বলিলেন,—"ধর্মের মা! ভাবিও না, জলে ডুবিয়া যাইলে ওরূপ হয়। এখনি জ্ঞান হইবে, সকল কথা মনে পড়িবে। ধর্মদত্ত! ঐ দেখ, তোমার পিতা ভারত সিংহ বিষণ্ণ মনে বসিয়া আছেন। ঐ দেখ, রামসেবক, যিনি তোমাকে নদীর জল হইতে তুলিয়াছেন! এই দেখ, তোমার খেলাইবার সঙ্গী প্রতাপ ও মহাবীর। আর এই দেখ, বীরবালা, যে খেলা করিতে করিতে নদীর জলে পড়িয়া গিয়াছিল। যাহাকে বাঁচাইবার নিমিত্ত তুমি জলে ঝাঁপ দিয়াছিলে। কিনারার দিকে যাহাকে ঠেলিয়া দিয়া, তুমি নিজে গভীর জলে ডুবিয়া গিয়াছিলে। ভাগ্যক্রমে মহাবীর, প্রতাপ প্রভৃতি বালকেরা চীৎকার করিয়া উঠিল। ভাগ্যক্রমে রামসেবক সেই পথ দিয়া যাইতেছিল। তাই তো বাছার প্রাণরক্ষা হইল! তা না হইলে ভারত সিংহের আজ কি সর্বনাশই হইত! ধর্মদত্ত! এই দেখ, বীরবালা। বীরবালাকে চিনিতে পার?"

দেবীসিংহ বীরবালার পানে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন,—বীরবালা একটি পাঁচ বৎসরের সুরূপা বালিকা। নিজের শরীর পানে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন,—বসন আর্দ্র, হাত-পা গুলি ছোট ছোট,— দশ এগার বৎসরেব বালকের যেরূপ হয়, সেইরূপ। পিতা ভারত সিংহকে দেখিলেন, সজল-নয়না মাতাকে দেখিলেন। সমবয়স্ক মহাবীর, প্রতাপ প্রভৃতিকে দেখিলেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ক্রমে তাঁহার মনে বিশ্বাস হইল যে, তিনি দেবীসিংহ নন, তিনি ধর্মদত্ত। তিনি বিংশতি বৎসরের যুবক নন, তিনি একাদশ বর্ষীয় বালক। স্বপ্নে আপনাকে দেবীসিংহ মনে করিয়াছিলেন, স্বপ্নে তিনি বীর হনুমানকে দেখিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় – অমাবস্যা বাবাজী

কিঞ্চিৎ সুস্থ হইতে ধর্মদত্তকে লইয়া সকলে বাড়ী যাইলেন। তাঁহার পিতা ভারত সিংহ বলিলেন,—"ধর্মদত্ত! সৌভাগ্যক্রমে আজ তোমার প্রাণরক্ষা হইয়াছে। বাবাজীকে গিয়া প্রণিপাত কর।"

বাবাজী সন্ন্যাসী। নাম অমাবস্যা বাবাজী। বাবাজী দীর্ঘদন্ত, লোহিতলোচন, ঘোর কৃষ্ণকায বলিয়াই বোধ হয়, তাঁহার নাম অমাবস্যা বাবাজী হইয়া থাকিবে। ইনি অতি সাধু পুরুষ। কেবল দুগ্ধ খাইয়া প্রাণ ধারণ করেন। তাই ভারত সিংহ ইঁহাকে অতি ভক্তি করেন। চিমটা হাতে দেশে দেশে তীর্থ পর্যটন করিতে দেন না। নিজ ঘরে রাখিয়া ভারত সিংহ ইঁহাকে যথাবিধি পূজা করেন। সতত ইঁহার আজ্ঞাধীন হইয়া থাকেন। ভারত সিংহের ঘরে অমাবস্যা বাবাজী সর্বেসর্বা, যা করেন তাই হয়।

ধর্মদত্ত গিয়া বাবাজীকে প্রণাম করিলেন, পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিলেন। কোনও কথা না বলিয়া বাবাজী ধর্মদত্তকে চিমটা দ্বারা সবলে প্রহার করিলেন। আর বলিলেন,—ধর্মদত্ত! দিন দিন তুই অতি মূর্খ ও অতি নির্বোধ হইতেছিস! শাস্ত্রে আছে,—"চাচা, আপনা বাঁচা।" তাই প্রতিবাসীর গৃহে ডাকাত পড়িলে সেকালের লোকে আপনার আপনার ঘরে দোহারা তেহারা খিল ও হুড়কো দিয়া বসিয়া থাকিত, কেহ বাহির হইত না। আজকালের ছেলেরা সব হইল কি? পরের জন্য প্রাণসমর্পণ। পাঁচ বৎসরের একটা মেয়ে বাঁচাইতে জলে ঝাঁপ! এ সকলই কলির মাহাত্ম্য!"

চিমটার প্রহারে ধর্মদত্ত চীৎকার করিযা কাঁদিয়া উঠিলেন। সজলনয়নে পিতার মুখপানে চাহিলেন। ভারত সিংহ কিছুই বলিলেন না। মাতা আসিয়া ধর্মদত্তকে বাটীর ভিতর লইয়া যাইলেন। মাতা বলিলেন,—"বাছা, ধর্ম! চুপ কর, আর কাঁদিও না। কালা-মুখ সন্ন্যাসী এখান হইতে যাযও না, মরেও না! কি গুণে যে কর্তাকে এত বশীভূত করিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারি না। উহার কু পরামর্শে কর্তাটি দিন দিন যেন জন্তু হইতেছেন। কালা-মুখ আমার সোনার সংসার ছারখার করিল।"

কিছুদিন পরে, বীরবালার পিতা, জবরদস্ত-সিংহ আসিয়া ভারত সিংহের নিকট প্রস্তাব করিলেন,—"মহাশয়! ধর্মদত্ত আমার কন্যার প্রাণরক্ষা করিয়াছে। যদি অনুমতি হয় তো বীলবালাকে ধর্মদত্তের হস্তে সমর্পণ করি। বীরবালা,—ধীর, লজ্জাশীলা ও পরমাসুন্দরী।"

এ কথায় সকলে সম্মত হইলেন। ধর্মদত্তের সহিত বীরবালার বিবাহ হইল। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর গত হইতে লাগিল। এদিকে ভারত সিংহের ঘরে ধর্মদত্ত বাড়িতে লাগিলেন, ওদিকে জবরদস্ত সিংহের গৃহে বীরবালা বাড়িতে লাগিলেন। ধর্মদত্ত ও ধর্মদত্তের মাতা কিন্তু বড়ই অসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। ভারত সিংহের গৃহে অমাবস্যা বাবাজীর এখন একাধিপত্য। ধর্মদত্তকে তিনি দুটি চক্ষু পাড়িয়া দেখিতে পারেন না। বিনা দোষে সর্বদাই তাঁহাকে প্রহার করেন। টাকাকড়ি বিষয়-বিভব, সমুদয় এখন অমাবস্যা বাবাজীর হাতে। ধর্মদত্তের মাতাকেও তিনি আহার-পরিচ্ছদের ক্লেশ দিতে লাগিলেন। ক্রমে ভারত সিংহ নির্জীব জড় পদার্থ প্রায় জবু-থবু হইয়া পড়িলেন।

এইরূপে সাত আট বৎসর কাটিয়া গেল। এক দিন অমাবস্যা বাবাজী ধর্মদত্তকে চিমটার দ্বারা অতিশয় প্রহার করিলেন। ধর্মদত্তের শরীরে শতধারা হইয়া রক্ত পড়িতে লাগিল।

সেইদিন বিনয় করিয়া ধর্মদত্ত বাবাজীকে বলিলেন,—"মহাশয়। দেখুন, আমি আর এখন বালক নই,' এক্ষণে বড় হইয়াছি। আমাকে বিনা দোষে প্রহার করা আর ভাল দেখায় না। আমাকে আর মারিবেন না। স্মরণ রাখিবেন যে, খরতর ক্ষত্রিয়-শোণিত আমার শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইতেছে।"

বাবাজী পরিহাস করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। কিছুদিন পরে পুনরায় তিনি ধর্মদত্তকে প্রহার করিলেন। ধর্মদত্ত সে দিন আর ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিলেন না। বাবাজীর গলা টিপিয়া ধরিলেন। সবল ক্ষত্রিয় যুবার সহিত শীর্ণকায় বাবাজী পারিবেন কেন? শ্বাসরোধ হইয়া বাবাজী মৃতপ্রায় হইলেন। কেবল প্রাণটি থাকিতে থাকিতে ধর্মদত্ত তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন। রাগদ্বেষে পরিপূর্ণ হইয়া বাবাজী বলিলেন,—'ভাল! দেখিয়া লইব! অমাবস্যা বাবাজীর গায়ে হাত তুলিয়া কে বাঁচিতে পারে, এ কথা আমি দেখিয়া লইব।"

অল্পদিন পরে ভারত সিংহের একটি কন্যা হইল। সূতিকা-ঘরে সমাগতা প্রতিবাসীগণ নবপ্রসূতা কন্যাটির অলৌকিক রূপ-লাবণ্য দেখিয়া আশ্চর্য জ্ঞান করিলেন। কন্যার রূপে সূতিকাঘর প্রভাময় হইল। সকলে একবাক্য হইয়া বলিলেন,—'ধর্মের মা! তোমার কন্যাটির কি অদ্ভুত রূপ হইয়াছে! দিদি, আঁতুড়-ঘরে এরূপ রূপ তো কখনও দেখি নাই! কন্যাটির নাম কমলা রাখ।' সকলে মিলিয়া কন্যাটির নাম কমলা রাখিলেন।

ভারত সিংহের কন্যা হইয়াছে শুনিয়া অমাবস্যা বাবাজীর রাগ হইল। ভারত সিংহকে তিনি বলিলেন,—"মহাশয়! আপনার বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়কূলে কন্যা কখনও জীবিত থাকে নাই। আপনার পূর্বপুরুষদিগাকে শ্বশুর বলিয়া কেহ সম্বোধন করেন নাই। ইংরাজের দৌরাত্ম্যে আজ ক্ষত্রিয়কূল কলঙ্কিত হইতেছে সত্য, কিন্তু আমি আপনার গৃহে থাকিতে আপনার কূল কলঙ্কিত হইতে দিব না। এক্ষণে যেরূপ অনুমিত হয়।" ভারত সিংহ এক্ষণে জড় পদার্থ। জ্ঞানগোচর কিছুই নাই। তিনি বলিলেন,—"যা ভাল বিবেচনা করেন, তাহাই করুন।"

অমাবস্যা বাবাজী সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। নীচ জাতি ধাত্রীকে অর্থ দ্বারা বশ করিলেন। একদিন ঘোর নিশীথে, ধর্মের মাতাকে নিদ্রিত পাইয়া ধাত্রীর যোগে বাবাজী কমলাকে চুরি করিলেন। পূর্বপ্রচলিত প্রথা অনুসারে কন্যাটিকে মৃত্তিকা পাত্রে রাখিলেন। সেই হাঁড়িতে একটু গুড় ও একটুখানি তুলা রাখিয়া সরা চাপা দিলেন। গ্রামের বাহিরে জনশূন্য মাঠের মাঝে লইয়া হাঁড়িটিকে পুঁতিয়া ফেলিলেন। গর্ত খুঁড়িবার সময় ও হাঁড়ি পুঁতিবার সময় বাবাজী বার বার এই মন্ত্রটি পাঠ করিতে লাগিলেন,—

কমলা তুমি হও দূর। যাও শীঘ্র যমপুর।
খাও গুড় কাটো সূত। তোমায় চাই না—চাই পুত।।

রাজপুতদিগের মনে বিশ্বাস এই যে, নবপ্রসূতা কন্যাকে সংহার করিলেন, সেই কন্যাই বারবার আসিয়া গৃহে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু এইরূপ প্রণালীতে মন্ত্রপাঠ করিয়া জীবিত কন্যাকে মৃত্তিকাসাৎ করিলে পুনরায় আর সে আসিয়া জন্মগ্রহণ করে না।

মাতা জাগরিত হইয়া শিশুটিকে দেখিতে পাইলেন না। সূতিকাঘরে হাহাকার পড়িয়া

গেল। কত কাঁদিলেন, কত কাটিলেন। মনে করিলেন,—তাঁহার অসাবধানতাবশতঃ কন্যাকে শৃগালে লইয়া গিয়াছে।

অমবস্যা বাবাজী গোপনভাবে পুলিসের নিকট পত্র পাঠাইলেন। তাহাতে ধর্ম্মদত্তের প্রতি ভগিনীবধের দোষারোপ করিলেন। পুলিসের দ্বাবা তদন্তের সময় অমাবস্যা বাবাজী প্রকাশ্যভাবে সাক্ষ্য প্রদান করিলেন। ধর্মদত্ত রাত্রিকালে হাঁড়ির ভিতর করিয়া শিশুটিকে কোথায় লইয়া যাইতেছে।, তাহা তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, এইরূপ ভাবে সাক্ষ্য প্রদান করিলেন। ধাত্রীও সেইভাবে সাক্ষ্য দিল; প্রতিবাসী রামসেবক বলিলেন যে, রাজপুতেরা কিরূপে আপনাদিগের কন্যা বধ করিত, একথা ধর্মদত্ত তাঁহাকে কিছুদিন পূর্বে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। রামসেবক মিথ্যা বলেন নাই, কৌতূহলবশতঃ ধর্মদত্ত সত্য সত্যই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। মোকদ্দমা উপস্থিত হইল। পুত্রকে বাঁচাইবার জন্য ভারত সিংহ কিছুমাত্র যত্ন করিলেন না; একটি পয়সাও খরচ করিলেন না। ধরাশায়িনী শোকাকুলা পত্নীর অবিরত অশ্রু ধারায় তাঁহার মন ঈষৎমাত্রও ভিজিল না। অমাবস্যা বাবাজী যে তাঁহার ঘোর সর্বনাশ করিতেছে, সে জ্ঞান তাঁহার হইল না। বীরবালার পিতা অনেক অর্থব্যয় করিলেন, সুচতুর উকীল নিযুক্ত করিয়া জামাতার রক্ষাব নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সামান্য বালিকা হইয়াও কুলের কুলবধূ হইয়াও, এই বিপদের সময় স্বামীরক্ষার নিমিত্ত, বীরবালা উকীলের বাড়ী, সাক্ষীদিগের বাডী, কত লোকের বাড়ী কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ধর্মদত্তের উকীল আসিয়া ভাবত সিংহকে বুঝাইতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন—'ধর্মদত্ত যে ভগিনীকে বধ কবে নাই, তাহা নিশ্চয়। অমাবস্যা বাবাজীর কুটিলতা ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। প্রকৃত ঘটনা কি মহাশয়ের বোধ হয় অবিদিত নাই। অতএব সকল কথা প্রকাশ করিয়া, পুত্রের প্রাণরক্ষা করুন।' ভারত সিংহ, না রাম না গঙ্গা,—কোনও উত্তর করিলেন না। জড়ের ন্যায় চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

জবরদস্তসিংহের সমুদয় চেষ্টা বিফল হইল। ধর্মদত্তের মাতা, পুত্রের হিত-কামনায় দেবাতাদিগকে রাত্রি দিন ডাকিতেছেন। দেবতারা তাঁহার প্রার্থনা শুনিলেন। বীরবালার কান্নায় দয়ার্দ্রচিত ব্যক্তিদিগের হৃদয় বিদীর্ণ হইল বটে, কিন্তু তাহার স্বামী অব্যাহতি পাইলেন না। যাবজ্জীবনের নিমিত্ত ধর্ম দ্বীপান্তরিত হইলেন!!

তৃতীয় অধ্যায় – ঘোমটাবতী

জামাতা-শোকে জবরদস্ত সিংহ অতিশয় কাতর হইলেন। ক্রোধে সর্বশরীর তাঁহার কাঁপিতে লাগিল। অমাবস্যা বাবাজীব যথোচিত দণ্ড করিয়া অবশেষে তাহার প্রাণবধ করিবেন, মনে মনে এই সঙ্কল্প করিলেন। বিষণ্ণ-বদনে, অশ্রুনয়না মলিন-বসনা বালিকা কন্যাকে লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। রাত্রি হইয়াছে, চারিদিকে ঘোর অন্ধকার। মাটীতে পড়িয়া বীরবালা অবিরত কাঁদিতেছেন। বেড়াইতে বেড়াইতে ঘোমটাবতী বলিয়া একটি উপদেবতা সেই স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ∙সীরবালাকে শিশুকাল হইতে তিনি

দেখিয়া আসিতেছেন। বীরবালাকে আজ দুঃখসাগরে নিমগ্না দেখিয়া তাঁহার দয়া হইল। ঘোর-রজনীতে বীরবালা মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতেছেন, ঘোমটাবতী সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বীরবালাকে হাতছানি দিয়া ডাকিলেন। এরূপ সময়ে বীরবালার আর ভয় কি? তিনি উঠিলেন। ঘোমটাবতী যে দিকে যাইতে লাগিলেন, সেই দিকে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। গ্রাম পার হইয়া, দুই জনে মাঠের মাঝে উপস্থিত হইলেন। হাত বাড়াইয়া ঘোমটাবতী একটি স্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন।

তাহার পর ঘোমটাবতী অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। বীরবালা দেখিলেন যে, সেই নির্দিষ্ট স্থানের মৃত্তিকা কোমল, যেন অল্প দিবস পূর্বে সে স্থান কেহ খনন করিয়াছিল। হাত দিয়া বীরবালা সেই স্থানের মাটী খুঁড়িতে লাগিলেন। খুঁড়িতে খুঁড়িতে একটি হাঁড়ি বাহির হইল। হাঁড়িটি তুলিয়া মুখের সরাখানি খুলিয়া দেখিলেন যে, তাহার ভিতর একটু গুড় একটুখানি কার্পাস ও একখানি কাগজ রহিয়াছে। সেইগুলি বাটী লইযা আসিলেন ও আপনার পিতাকে দেখাইলেন। জবরদস্তসিংহ দেখিলেন যে, সেই কাগজখানিতে এইরূপ লেখা রহিয়াছে,—'আমার নাম শাহ সুলতান, নিবাস বোগদাদ। ভারতবর্ষ হইতে দেশে প্রত্যাগমন করিতেছি। লোকজন লইয়া তাবু খাটাইয়া এই মাঠে আমি রাত্রিযাপন করিতেছিলাম। রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে নিকটে ঐ ঝোপের ভিতর বসিয়াছিলাম। সেই সময় কৃষ্ণকায় এক ব্যক্তি একটি হাঁড়ি লইয়া মাঠে আসিল। হাঁড়ির ভিতর হইতে শিশুর ক্রন্দন ধ্বনি শুনিতে পাইলাম। মন্ত্র পড়িতে পড়িতে সেই ব্যক্তি হাঁড়িটি পুঁতিল। সেই মন্ত্র শুনিয়া বুঝিলাম যে, শিশুটি রাজপুত-কন্যা, নাম কমলা। কৃষ্ণকায় ব্যক্তি চলিয়া যাইলে, আমি তৎক্ষণাৎ মাটী খুঁড়িয়া তুলিলাম। শিশুটি জীবিত রহিয়াছে দেখিলাম। আমি নিঃসন্তান। কমলাকে আমি আপনার দেশে লইযা চলিলাম।' বীরবালার পিতা ও বীরবালা সেই কাগজখানি ও হাঁড়িটি উকীল ও বিচারকর্তাকে দেখাইলেন। কিন্তু কোনও ফল হইল না! সকলে বলিল,—'তুমি যে নিজে এই কাগজখানি প্রস্তুত কব নাই, তাহার প্রমাণ কি?'

বীরবালা ও তাঁহার পিতা পুনরায় বিষণ্ণচিত্তে বাটী ফিরিয়া আসিলেন। সেই রাত্রিতে বীরবালা গোপনে পুরুষের পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন। পাগড়ীর ভিতর আপনার দীর্ঘ কেশ লুকাইলেন। সেই রাত্রিতেই অতি গোপনভাবে বাটী পরিত্যাগ করিলেন। পিতার প্রবোধের নিমিত্ত একখানি কাগজে এই লিখিয়া যাইলেন,—'পিতা! আমি কমলার অন্বেষণে চলিলাম। বোগদাদ নগরে চলিলাম। কমলাকে আনিয়া নিশ্চয় স্বামীকে উদ্ধার কবিব। স্বামীপদ ধ্যান করিয়া আমি যাইতেছি। নিশ্চয় কৃতকার্য হইব। আপনি চিন্তিত হইবেন না।'

বীরবালা চলিলেন। দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা বৈ তো নয়? পথ-ঘাটের কথা তিনি কি জানেন? লোকের মুখে শুনিলেন যে, বোগদাদ অনেক দূর, পশ্চিমদিকে। বীরবালা সেই পশ্চিমদিকে চলিলেন। একদিনে অধিক পথ যাইবেন—এরূপ ক্ষমতা কোথায়? অল্প অল্প করিয়া প্রতিদিন পথ হাঁটিতে লাগিলেন। নানা ক্লেশ পাইয়া, নানা বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, অবশেষে ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে গিয়া উপস্থিত হইলেন। একদিন এক স্থানে একটি

মেলা হইতেছে, বীরবালা তাহা দেখিতে পাইলেন। বীরবালা সেই মেলার ভিতর প্রবেশ করিলেন। সে স্থানে নানাদেশ হইতে বহুসংখ্যক লোকের সমাগম হইয়াছিল। ভারতের নানা স্থান হইতে শত শত সাধুগণও আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বীরবালা দেখিলেন যে, একজন সাধু, সিদ্ধি বাটিয়া সকলকে বিতরণ করিতেছেন। যে চাহিতেছে তাহাকেই তিনি সিদ্ধি ও মিষ্টি দিতেছেন। সহসা সকলের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। সকলের সন্দেহ হইল যে, সাধু হিন্দু নন, মুসলমান। এইরূপ মনে করিয়া লোকে তাঁহার উপর ঢিল ও পাথর বর্ষণ করিতে লাগিল। সাধুর একটি কুকুর ছিল। কুকুরটি নিকটে শুইয়াছিল। ক্রোধে অপর কাহাকে কিছু না বলিয়া, সাধু দুই হাতে কুকুরটির পা ধরিযা তুলিলেন, নিকটস্থ একখানি পাথরের উপর আছাড় মারিলেন। কুকুরের মাথাটি ফাটিয়া গেল, চারিদিকে মস্তিষ্ক ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল, কুকুরটি তৎক্ষণাৎ মরিয়া গেল। কুকুরের মৃতদেহ ফেলিয়া দিয়া সাধু সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। কিঞ্চিৎ দূরে গিযা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া শিষ দিতে লাগিলেন। সেই শিষ শুনিয়া মৃত কুকুরটি তৎক্ষণাৎ বাঁচিয়া উঠিল, দৌড়িয়া সাধুর নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। এই আশ্চর্য ব্যাপার দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন, সকলেই তখন সাধুব প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মেলাস্থান পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতবেগে সাধু অরণ্যময় নির্জন পর্বতের দিকে চলিলেন। বীববালাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। বার বার হাত নাড়িয়া সাধু তাঁহাকে ফিরিযা যাইবার নিমিত্ত আদেশ কবিলেন। বীরবালা তাহা শুনিলেন না, বীরবালা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। অবশেষে ক্রুদ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছ কেন? আমাকে এরূপ বিরক্ত করিতেছ কেন?' বীরবালা তাঁহাকে আপনার দুঃখের কথা সমুদয় বলিলেন। সাধুর দয়া হইল। বৃক্ষপত্রে একখানি কবজ লিখিয়া বীরবালাকে দিলেন, ও বলিলেন,—'এই কবজখানি বামহাতে ধরিয়া যেখানে ইচ্ছা করিবে, সেই দণ্ডে সেইখানে উড়িয়া যাইতে পারিবে। ইহার সহায়তায তুমি বোগদাদ গমন কর। সে স্থান হইতে কমলাকে আনিয়া পতির উদ্ধারসাধন কর। আর আমার সঙ্গে আসিও না। কিন্তু দেখিও, কবজখানি যেন ছিঁড়িয়া না যায়। তাহা হইলে ফল হইবে না।'

চতুর্থ অধ্যায় – সবুজ ভূত

কবজ পাইয়া বীরবালাব মনে আনন্দ হইল। অনায়াসে এখন বোগদাদ যাইতে পারিবেন, শাহ সুলতানের অনুসন্ধান হইবে। কমলাকে পাইবেন, পতির উদ্ধার হইবে, তাঁহার মনে এখন ভরসা হইল। বীরবালা মনে করিলেন,—'আচ্ছা দেখি দেখি, সত্য সত্যই কবজের এইরূপ গুণ আছে কি না? প্রথমে বোগদাদ না গিয়া অন্য কোনও স্থানে যাইবার বাসনা করি। কবজের পরীক্ষা করি। দেখি সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হই কি না।'

এইরূপ ভাবিয়া তিনি কবজখানি বামহাতের ভিতর করিলেন, আর মনন করিলেন—'আমি পৃথিবীর মুড়োতে যাইব।' মনে করিতে না করিতে বীরবালা শূন্যপথে দ্রুতবেগে

উড়িয়া চলিলেন। নিমিষের মধ্যে পৃথিবীর প্রান্তভাগে উপস্থিত হইলেন। বীরবালা দেখিলেন যে, অতি উচ্চ প্রাচীর দ্বারা আমাদের এই পৃথিবীটি চারিদিকে বেষ্টিত। আকাশ ভেদ করিয়া সেই প্রাচীর রহিয়াছে। বীরবালা ভাবিলেন যে, তবে এই প্রাচীর হইল পৃথিবীর শেষ, ইহার ও-দিকে আর পৃথিবী নাই। প্রাচীরের ও-ধারে কি আছে? সেটি দেখিতে হইবে। প্রাচীরের গায়ে গোল গোল ছোট ছোট ছিদ্র দেখিতে পাইলেন। সেই ছিদ্র দিয়া বীরবালা উঁকি মারিলেন। সর্বনাশ! প্রাচীরের ও-ধারে পৃথিবীর ও-পারে কোটি কোটি খর্বকায় ভূত। প্রাচীর ধরিয়া ক্রমাগত তাহারা ঠেলিতেছে; ইচ্ছা,—প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পৃথিবীতে প্রবেশ করে। পৃথিবীতে আসিয়া পৃথিবী একবারে রসাতলে দিবে, এই তাহাদের বাসনা। কোটি কোটি খর্বকায় ভূতগণ একবার যদি প্রাচীর পার হইতে পারে, তাহা হইলে পৃথিবীর আর রক্ষা নাই। মনুষ্যকূল ধ্বংস করিয়া পৃথিবী তাহারা অধিকার করিবে। তাহাদের ভয়াবহ মূর্তি দেখিয়া বীরবালার প্রাণে ভয় হইল।

ছিদ্র দিয়া তাহারাও সেই সময়ে বীরবালাকে দেখিতে পাইল। ছিদ্র দিয়া হাত বাড়াইয়া তাহারা বীরবালার হাত ধরিল। কবজখানি কাড়িয়া লইবে, এই তাহাদের বাসনা। অতি কষ্টে বীরবালা হাত ছাড়াইয়া লইলেন। কিন্তু ঘোর বিপদের কথা! টানাটানিতে কবজখানি ছিঁড়িয়া গেল!

বোগদাদে না গিয়া পৃথিবীর প্রান্তভাগে মিছামিছি আসিয়া কবজখানি হারাইলেন। সে নিমিত্ত বীরবালা আপনাকে কত তিরস্কার করিলেন। কিন্তু কি করিবেন! আর উপায় নাই। পৃথিবীর প্রান্তভাগ হইতে পুনরায় পথ চলিতে লাগিলেন। পৃথিবীর আগা কি এখানে? পথ আর ফুরায় না। পাঁচ বৎসর পর্যন্ত বীরবালা এইরূপ পথ চলিলেন। তথাপি লোকালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারিলেন না। একদিন এক পাহাড়ের নিকট বীরবালা একটি সবুজ বর্ণের বৃদ্ধাকে দেখিতে পাইলেন। বৃদ্ধা গাছতলায় বসিয়া রৌদ্র পোহাইতেছিল ও চরকা কাটিতেছিল। বীরবালাকে দেখিয়া সে অমনি তাড়াতাড়ি চরকা ফেলিয়া উঠিল, আর আকাশপানে পা করিয়া বীরবালার চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। বীরবালা যে দিকে যান, আর আকাশপানে পা করিয়া বুড়ীও সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। এইরূপে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, অবশেষে বীরবালাকে বুড়ী যেই একটি ঘরের ভিতর প্রবেশ করাইল, আর সব দ্বার বন্ধ হইয়া গেল। বীরবালার বড় ভয় হইল। দ্বার ঠেলিতে লাগিলেন, কিছুতেই খুলিতে পারিলেন না। সবুজ বুড়ী আপনার আত্মীয়স্বজনকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিল। সবুজ বুড়ীর বাটীতে কোলাহল পড়িয়া গেল। ঘরের ভিতর বসিয়া বসিয়া বীরবালা তাহাদের সকল কথা শুনিতে পাইলেন। এই পৌষপার্বণে তাঁহারা বীরবালাকে কাটিয়া কুটিয়া পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া খাইবে, সবুজ ভূতেরা এই পরামর্শ করিতে লাগিল। চারিদিকে চাউল কুটিবার ধূম পড়িয়া গেল। ডাল বাটা হইতে লাগিল। অবশেষে বীরবালাকে কুটিবার সময় উপস্থিত হইল। অন্য ভূতদিগের মত সবুজ ভূতেরা আচার-বিহীন নয়। ইহারা বৃথা মাংস ভক্ষণ করে না; ঠাকুরদের নিবেদন করিয়া বীরবালার বলিদান হইবে। তাহার পর বীরবালার দেহকে

কাটিয়া কুটিয়া পিষ্টক প্রস্তুত করিবে। দুই চারিজন সবুজ ভূতে বীরবালাকে ধরিয়া স্নান করাইল। পাহাড়ের মাথায় দেবতার মন্দিরে গিয়া পূজা দিল। যথাবিধি বীরবালাকে উৎসর্গ করিল। বলিদান দিবার নিমিত্ত বীরবালাকে পাহাড়ের ধারে লইয়া গেল। একদিকে পাহাড়, অপরদিকে অতল গিরিগহ্বর। কোপ মারিবার নিমিত্ত কামার ভূত খাঁড়া তুলিল। বীরবালা ভাবিলেন, 'মরিলাম তো। মরিতে তো আর বাকী নাই। কিন্তু আমার মাংস লইয়া সবুজ ভূতেরা যে পিঠে করিয়া খাইবে, তাহা দিব না। এই মনে করিয়া তিনি পর্বতের শিখর দেশ হইতে ঝাঁপ দিলেন। শূন্যপথে বীরবালা পাহাড়ের তলদেশে পড়িতে লাগিলেন।

পাহাড়ের গায়ে একখানি পাথরের উপর সবুজ ভূতদিগের একটি ছেলে বসিয়াছিল। ভাল কাপড় চোপড় পরিয়া সবুজ বুড়ীর বাড়ীতে সে নিমন্ত্রণ খাইতে আসিয়াছিল। সবুজ বুড়ীর বাড়ীতে আজ মানুষের পিঠে হইবে, পৌষপার্বণের দিনে পেট ভবিয়া মানুষের পিঠে খাইবে। তাই মনের আনন্দে ভূতের ছেলেটি পায়ের উপর পা দিয়া পাথরের উপর বসিয়া আছে। পড়িবি তো পড়, বীরবালা গিয়া তাহার ঘাড়ে পড়িলেন। অকস্মাৎ কি আসিয়া আকাশ হইতে ঘাড়ে পড়িল, সে জন্য ভূত-বালক চমকিয়া উঠিল। তাহার বড় ভয় হইল। নিমন্ত্রণ খাওয়া ঘুচিয়া গেল। পলাইবার নিমিত্ত সে আকাশে উড়িল। দৃঢ়রূপে বীরবালা তাহার গলা জড়াইয়া ধরিলেন। আকাশে উড়িতে উড়িতে ভূত-বালক ক্রমাগত গা-ঝাড়া দিতে লাগিল, কিন্তু বীরবালা তাহাকে কিছুতেই ছাড়িলেন না, বীরবালাকে সে কিছুতেই ফেলিয়া দিতে পারিল না। উড়িতে উড়িতে ভূত-বালক গিয়া মহাসমুদ্রের উপর উপস্থিত হইল। উড়িয়া উড়িয়া তাহার ক্লান্তি বোধ হইল। সমুদ্রের উপর একখানি জাহাজ যাইতেছে, সে দেখিতে পাইল। সেই জাহাজের মাস্তুলের উপর ভূত-বালক গিয়া বসিল। এই সময় বীরবালা তাহার গলা ছাড়িয়া দিলেন, আর হাত দিয়া মাস্তুলের দড়ি ধরিলেন। ছাড়ান পাইয়া ভূত-বালক তৎক্ষণাৎ উড়িয়া পলাইল।

মাস্তুল হইতে বীরবালা নামিয়া জাহাজের উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন। জাহাজের লোকে তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। সকলে আশ্চর্য হইল যে, এই অকুল সমুদ্রের মাঝখানে জাহাজের উপর মানুষ কোথা হইতে আসিল। আকাশ হইতে পড়িল না কি? যাহা হউক, বীরবালা সেই জাহাজে রহিলেন। অল্প দিন পরে প্রবল ঝড় উঠিল, পর্বতপ্রমাণ তরঙ্গ দ্বারা মহাসমুদ্র আলোড়িত হইতে লাগিল; জাহাজ ডুবিয়া যাইবার উপক্রম হইল। জাহাজের লোকে মনে করিল, বীরবালার আগমনেই তাহাদের এই বিপদ ঘটিতেছে, এ মনুষ্য নয়। ভূত কি ডাইন হইবে। আকাশ হইতে মানুষ আবার কবে কোথায়, জাহাজের উপর পড়ে? এই মনে করিয়া রাত্রিকালে তাহারা বীরবালাকে সমুদ্র-জলে ফেলিয়া দিল। তরঙ্গ দ্বারা তাড়িত হইয়া ভাসিতে ভাসিতে বীরবালা চলিলেন। অল্পকালের মধ্যেই তিনি জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন। যখন জ্ঞান হইল, তখন তিনি দেখিতে পাইলেন যে, সমুদ্র কুলে বালির উপর পড়িয়া আছেন। আস্তে আস্তে উঠিলেন, উঠিয়া চলিতে লাগিলেন। চারিদিকে বালুকাপ্রান্তর, ধূ ধূ করিতেছে, তাহার সীমা নাই, অন্ত নাই। যাইতে যাইতে একটি মনুষ্যের

সহিত সাক্ষাৎ হইল। উটে করিয়া মনুষ্যটি আসিতেছিল। বীরবালাকে ধরিয়া সে আপনার নিকট উটের পৃষ্ঠে বসাইল, উট চালাইয়া দিল। সাত দিন সাত রাত্রি বীরবালা সেই মানুষের সহিত উটের পৃষ্ঠে যাইলেন। অবশেষে তাঁহারা একটি নগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই মনুষ্য বীরবালাকে লইয়া একজন অর্থবান ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করিল। ক্রেতার নাম ইব্রাহিম। বীরবালা এক্ষণে জানিতে পারিলেন যে, তিনি আরবদেশে মক্কা নগরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

মক্কা নগরে ইব্রাহিমের ঘরে বীরবালা বাস করিতে লাগিলেন। সুন্দর শান্ত-প্রকৃতি বালক দেখিয়া ইব্রাহিম বীরবালাকে স্নেহ করিতে লাগিলেন। ইব্রাহিমের স্ত্রীও তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতে লাগিলেন। কিছুদিন থাকিতে থাকিতে বীরবালা একদিন ইব্রাহিমের বিবিকে আপনার সমুদয় বৃত্তান্ত বলিলেন। তখন ইব্রাহিমের স্ত্রী বুঝিতে পারিলেন যে, বীরবালা বালক নন—বালিকা। স্বামীকে তিনি সকল কথা বলিলেন। স্ত্রী-পুরুষে বীববালার দুঃখে অতিশয় দুঃখিত হইলেন। দয়া করিয়া তাঁহারা বীরবালাকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিলেন ও অর্থ দিয়া বণিকদিগের সহিত বোগদাদে প্রেরণ করিলেন।

পঞ্চম অধ্যায় – সাহেব ভূত

বীরবালা বোগদাদে উপস্থিত হইয়া শাহ সুলতানের বাটী অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। শাহ সুলতান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, অনায়াসেই তাঁহার তত্ত্ব পাইলেন। বীরবালা শুনিলেন যে, আজ এক বৎসর শাল সুলতান মরিয়া গিয়াছেন। তিনি বিপুল ধন রাখিয়া গিয়াছিলেন। পাঁচ বৎসরের একটি শিশুকন্যাকে সেই বিষয়ের অধিকারিণী করিয়া যান। কিন্তু তাঁহাব ভ্রাতুষ্পুত্র ফরাগৎ হোসেন, কন্যাটিকে তাড়াইয়া দিয়া সমুদয় বিষয় আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। তাহার পর নানারূপ দুষ্ক্রিয়া দ্বারা অল্পদিনে সমুদয় বিষয় তিনি নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। পথের ভিখারী হইয়া অবশেষে একটি সাহেবের বাড়ীতে চাকরী করিতেছেন। এই সকল কথা শুনিয়া বীরবালার নিশ্চয় প্রতীতি হইল যে, শিশুটি আর কেহ নয়। কমলা—এক্ষণে তিনি সেই শিশুটির অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অনেক সন্ধান করিয়া অনেক ক্লেশে, শেষে জানিতে পারিলেন যে, শাহ সুলতানের বাটী হইতে বিদূরিত হইয়া শিশুটি অনেক দিনের নিমিত্ত পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতেছিল। একদিন গাছতলায় বসিয়া কাঁদিতেছিল, এমন সময় সেই পথ দিয়া একটি ইংরেজ বণিক ও তাঁহার স্ত্রী যাইতেছিলেন। নিরাশ্রয় শিশুটিকে দেখিয়া তাঁহাদের দয়া হইল। আদর করিয়া তাহাকে বাটী লইয়া যাইলেন। সেই অবধি ইংরেজ বণিকের ঘরে শিশুটি বাস করিতেছিল। ইংরেজ বণিকের সহসা সৌভাগ্যের উদয় হইল। সহসা তিনি বিপুল অর্থলাভ করিয়া স্বদেশে গমন করিলেন। শিশুটি তাঁহাদের সঙ্গেই রহিল!

এই কথা শুনিয়া বীরবালা হতাশ হইয়া পড়িলেন। বোগদাদে আসিয়াও কমলাকে পাইলেন না। কি করিবেন? এক্ষণে বিলাত যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। আবার পথ

চলিতে আরম্ভ করিলেন। বহুদিন পরে ভূমধ্যসাগর কূলে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কি করিয়া বিলাত যাইবেন, বিষণ্ণ বদনে সেইখানে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। নিজের দূরদৃষ্ট ভাবিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। নিঃশ্বাসটি যেই ফেলিয়াছেন, আর কাতরস্বরে চীৎকার করিয়া নিকটে কে কাঁদিয়া উঠিল। চমকিত হইয়া বীববালা চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখে একটি সাহেব-ভূত সাহেব-ভূত কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—'ওগো তুমি আমার সহিত এরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার কেন করিলে? জোর নিঃশ্বাস ফেলিলে কেন? এই দেখ, আমার শরীরের যোড় সব খুলিয়া গেল।'

বীরবালা দেখিলেন, সত্য সত্যই সাহেবভূতের শরীরের যোড় সব খুলিয়া যাইতেছে। হাত, পা, নাক, কান খসিয়া পড়িতেছে।

সভয়ে বীরবালা বলিলেন,—"মহাশয়! আপনি যে এখানে বসিয়াছিলেন, তাহা জানিতাম না! আপনার শরীরের যোড় যে এত ভঙ্গুর, তাহাও জানিতাম না। তাহা যদি জানিতাম, তাহা হইলে ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ফেলিতাম।'

সাহেব-ভূত পুনরায় বলিলেন,—"আমার আঙ্গুল খসিয়া গেল, এখন আঙটি পরিব কোথায়? হাত খসিয়া গেল, বালা পরিব কোথায়? পা খসিয়া গেল, মল পরিব কোথায়? নাক খসিয়া গেল, নোলক পরিব কোথায? কান খসিয়া গেল মাকড়ি পরিব কোথায়?'

সাহেব-ভূতের দুঃখে বীরবালা দুঃখিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাশয়! ইহার কি কোনও উপায় নাই?' ভূত বলিলেন,—"যদি তুমি কাদা দিয়া আমার হাত পা ভাল করিয়া জুডিয়া দিতে পার, তাহা হইলে আমি ভাল হই।" বীববালা তাহাই করিলেন। সুস্থ হইয়া সাহেব-ভূত বীববালার সমুদয় বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা কবিলেন। সকল কথা পবিচয় দিয়া বীরবালা সাহেব ভূতকে বিলাত যাইবার উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন! সাহেব ভূত বলিলেন,—"তার ভাবনা কি? আমি এইক্ষণেই তোমাকে টেলিগ্রাফে বিলাত পাঠাইয়া দিতেছি। জন সাহেব কমলাকে বিলাত লইয়া গিয়াছেন, রঙ্গিণী মেমের নিকট তোমাকে আমি পাঠাইব। আমি জীবিত থাকিতে রঙ্গিণী আমার স্ত্রী ছিলেন। জন-সাহেবের মেমের সহিত রঙ্গিণীর ভাব আছে।" এই বলিয়া সাহেব-ভূত সমুদ্রের বালি দিয়া বড় একটি টেলিগ্রাফের তার প্রস্তুত করিলেন। বীরবালাকে তাহার ভিতর প্রবেশ করিতে বলিলেন।

বীরবালা তাহার ভিতর প্রবেশ করিলে সাহেব-ভূত তারের বাঁটটি টক্ টক্ টক্ টক্ করিয়া নাড়িলেন, আর সেই মুহূর্তেই বীরবালা বিলাতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। একেবারে রঙ্গিণীর ঘরের ভিতর গিয়া পৌঁছিলেন। আরসির নিকট দাঁড়াইয়া রঙ্গিণী তখন বেশভূষা করিতেছিলেন, মুখে পাউডার মাখিতেছিলেন। সহসা বীরবালাকে ঘরের ভিতর আসিতে দেখিয়া তিনি চমকিত হইলেন।

রঙ্গিনীর নিকট বীরবালা সকল পরিচয় দিলেন। বীরবালা তাঁহার নিকট দুই এক দিন বাস করিলেন। তাহার পর রঙ্গিণী তাঁহাকে জন সাহেবেব নিকট লইয়া যাইলেন। জন সাহেব বলিলেন যে, বোগদাদ হইতে কমলাকে তিনি বিলাতে আনিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু

এখানে আনিয়া কন্যাটিকে বিজয়ার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। বিজয়া অতি সম্ভ্রান্ত মহিলা, অতি দয়াময়ী, অতি পবিত্র-প্রাণা। শিশুটিকে তিনি নিজের কন্যার ন্যায়, অতি যত্নে প্রতিপালন করিতেছেন। এই কথা শুনিয়া বীরবালা বিজয়ার নিকট গমন করিলেন। কমলাকে দেশে লইয়া যাইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। অতি মধুর ভাষে বিজয়া বলিলেন,—'কমলা আমার প্রাণস্বরূপ। কমলাকে আমি কিছুতেই দিতে পারিব না।'' ভূমে জানু পাতিয়া, যোড় হস্তে বীরবালা স্তুতি-মিনতি করিতে লাগিলেন, বীরবালা বলিলেন—''মহোদয়া! দয়াময়ী! দয়াময়ী বলিয়া সকলে আপনাকে জানে। আপনার প্রভাবে শৃঙ্খল বদ্ধ লক্ষ লক্ষ দাস, দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়াছে। আপনি পবিত্রতাময়ী। আপনার পবিত্রতা আদর্শস্থল হইয়া ঘরে ঘরে আজ পবিত্রতার আবির্ভাব করিয়াছে। আমার পতিধর্মের প্রতি আপনি কৃপা করুন। ভারত সিংহ বৃদ্ধ বুদ্ধিহীন হইয়াছেন। তাঁহার সংসার আজ শ্মশানভূমি হইয়াছে। কমলাকে প্রদান করুন। ধর্মকে আমি পুনরায় দেশে আনয়ন করি। ভারত সিংহের অন্ধকার সংসার পুনরায় আলোকিত হউক।'

এইরূপ স্তুতি-বিনতি শুনিয়া বিজয়ার মনে দয়া হইল, ভারত সিংহের দুর্দশা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন। বীরবালার হস্তে কমলাকে সমর্পণ করিলেন। বীরবালা তাঁহার কেহ হন, তাহা শুনিয়া কমলার আর আহ্লাদের অবধি রহিল না। মাতা, পিতা, ভাই, বন্ধু সকলের মুখ দেখিবেন, সে জন্য কমলার মনে অপার আনন্দের উদয় হইল। বীরবালার গলা ধরিয়া কমলা কত কাঁদিলেন, কত হাসিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায় – পোষড়ার পিঠে

কমলাকে লইয়া বীরবালা দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। নিকটস্থ নগরে থাকিয়া পিতাকে সংবাদ দিলেন। জবরদস্ত সিংহ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। কন্যাকে পাইয়া কমলাকে দেখিয়া জবরদস্ত সিংহের আর সুখের পরিসীমা রহিল না। কমলাকে দেখাইয়া যথাবিধি উপায় করিয়া, ধর্মদত্তকে কারাবাস হইতে মুক্ত করিলেন। অবশেষে ধর্মদত্ত, বীরবালা ও কমলাকে সঙ্গে লইয়া তিনি ভারত সিংহের ভবনে উপস্থিত হইলেন। জবরদস্ত সিংহ, বীরবালার পুনরাগমন, কমলা-লাভ, ধর্মের মুক্তি, এতদিন সকল কথা গোপন রাখিয়াছিলেন। আজ সকলকে লইয়া সহসা ভারত সিংহের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। পুত্র, কন্যা ও পুত্রবধূ দেখিয়া ধর্মের মাতা স্বর্গ যেন হাত বাড়াইয়া পাইলেন। অমাবস্যা বাবাজীর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। তিনি ভারত সিংহকে বলিলেন,—'আপনার এ পুত্র, কন্যা ও পুত্রবধূকে কিছুতেই ঘরে লওয়া হইবে না।'' এই কথা শুনিয়া জবরদস্ত সিংহ আর ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিলেন না। বাবাজীর চিমটাটি সেই স্থানে পড়িয়া ছিল। চিমটার অগ্রভাগ অগ্নির ভিতর ছিল। অগ্নির উত্তাপে চিমটার অর্দ্ধাংশ ঘোর রক্তবর্ণ হইয়াছিল। জবরদস্ত সিংহ সেই চিমটাটি তুলিয়া লইয়া, তাহার অগ্রভাগ দ্বারা অমাবস্যা বাবাজীর নাক ধরিলেন। বাবাজীর নাসিকা পড় পড় শব্দে পুড়িতে লাগিল। তাহা হইতে দারুণ দুর্গন্ধময়

ধূম নির্গত হইতে লাগিল। যন্ত্রণায় বাবাজী চীৎকার করিতে লাগিলেন। আর যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া, বাবাজী আপনার পৃষ্ঠে পক্ষীর মত পাখা বাহির করিলেন। অবশেষে জানালা দিয়া উড়িয়া পলাইলেন।

সকলে আশ্চর্য হইলেন। সকলে তখন বুঝিলেন যে, অমাবস্যা বাবাজী মনুষ্য নন। অমাবস্যা বাবাজী যেই উড়িয়া যাইলেন, আর ভারত সিংহ যেন চমকিত হইয়া ঘোর নিদ্রা হইতে জাগরিত হইলেন। নির্বাণ-প্রায় তাঁহার চক্ষু দুইটিতে পুনরায় আলোকের সঞ্চার হইল, তাঁহার মুখ প্রভাময় হইল। সহসা ভারতসিংহের যেন পুনরায় নবযৌবনের উদয় হইল! ধর্মদত্ত, বীরবালা ও কমলাকে তিনি সাদরে কোলে করিলেন। মোহবশতঃ অন্ধ হইয়া স্ত্রী-পুত্রকে নানারূপ ক্লেশ দিয়াছিলেন, দেবদুর্লভ ধর্ম হেন পুত্র ও কমলা হেন কন্যারত্নকে তিনি বিসর্জন দিয়াছিলেন, সে জন্য ভারতসিংহ এক্ষণে মনোদুঃখে অতিশয় কাতর হইলেন, আকুল হইয়া মনের বেদনায় তিনি কাঁদিতে লাগিলেন।

সেইদিন সন্ধ্যাবেলা বীরবালা ভাবিলেন,—"যদি ঘোমটাবতীকে দেখিতে পাই, তো তাঁহার চরণে একবার প্রণাম করি; তিনি আমার বড় উপকার করিয়াছেন।' এইরূপ ভাবিয়া বীরবালা একাকিনী মাঠের দিকে চলিলেন। কমলা যে স্থানে মাটিতে প্রোথিত হইয়াছিলেন, বীরবালা সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বৃক্ষতলে ঘোমটাবতী বসিয়া রহিয়াছেন। বীরবালা দেখিতে পাইলেন। করযোড়ে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'মাতঃ! আপনি কে বলুন! কোনওরূপ উত্তর না দিয়া ঈষৎ হাসিয়া ঘোমটাবতী ঘোমটা খুলিলেন। বিদ্যুৎ প্রায় তাঁহার রূপের ছটায় জগৎ আলোকিত করিল। বিশ্বসংসার শান্তিসুধায় সিক্ত হইল। আকাশের দ্বার উন্মুক্ত হইল। অপ্সরাগণ স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল। অপ্সরা বালকগণ মধুরতানে বীরবালার সাহস, বিক্রম ও পতিভক্তির গুণগান করিতে লাগিল। অপ্সরাবালিকাগণ বীরবালার বেশভূষা করিতে লাগিল।

বীরবালাকে মাঠের দিকে যাইতে ধর্মদত্ত দেখিয়াছিলেন। বীরবালার প্রত্যাগমনে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া তাঁহার ভাবনা হইল। বীরবালার অনুসন্ধানে তিনিও মাঠের দিকে চলিলেন। মাঠের মাঝখানে সেই অপূর্ব দৃশ্য দেখিয়া ধর্মদত্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। বীরবালা বসিয়া আছেন। অপ্সরাবালক-বালিকাগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। কেহ তাঁহার চুল বাঁধিয়া দিতেছে, কেহ তাঁহার সুকোমল শরীর সুগন্ধ দ্বারা সিক্ত করিতেছে। আকাশ পানে চাহিয়া দেখিলেন যে, আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে। ভাল করিয়া দেখিবার নিমিত্ত ধর্মদত্ত আকাশের দিকে মস্তক আরও উন্নত করিলেন। সবলে মাথাটি যেই তিনি তুলিলেন, আর তাঁহার ঘাড়টি খুট করিয়া উঠিল।

ঘাড়টি যেই খুট করিয়া উঠিল, আর সেই অপূর্ব দৃশ্য তাঁহার নয়নপথ হইতে অন্তর্হিত হইল, দেখিলেন যে, তিনি সরযূকূলে অশ্বত্থমূলে ঠেশ দিয়া বসিয়া আছেন। আপনার শরীরের পানে চাহিয়া দেখিলেন; দেখিলেন যে, সে শরীর ধর্মদত্তের শরীর নয়, আর কার শরীর। 'আমি কে?' এই কথা লইয়া তাঁহার মনে ঘোরতর সংশয় উপস্থিত হইল। ক্রমে

ক্রমে তাঁহার সকল কথা মনে পড়িল। তিনি অযোধ্যানিবাসী দেবী সিংহ। স্বপ্নে তিনি আপনাকে ধর্ম্মদত্ত মনে করিয়াছিলেন, আর এই সমস্ত অদ্ভুত রহস্য প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাকে স্বপ্নই বা কি করিয়া বলি। ক্ষণকালের নিমিত্তও তিনি তো নিদ্রা যান নাই। কেবল একবার মাত্র তাঁহার ঢুল আসিয়াছিল। সম্মুখ দিকে তাঁহার মাথাটি একবার ঢুলিয়া পড়িয়াছিল, আর সেই সময় তাঁহার ঘাড়টি একটু খুট করিয়াছিল। সেই মুহূর্তেই তিনি মাথাটি সোজা করিয়া লইলেন, আর একবার খুট করিল। এ কতটুকু সময়? কিন্তু এই ক্ষণকালের মধ্যেই তিনি এত কাণ্ড দেখিলেন, এত কাণ্ড শুনিলেন, এত কাণ্ড করিলেন। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! স্বপ্ন হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু বীরবালা যে স্বপ্ন, প্রকৃত দেবীরূপিণী নারী নন, সে কথা ভাবিয়া দেবীসিংহের মন বড় কাতর হইল। 'যদি বীরবালাকে আর দেখিতে পাইব না, তবে এ জাগরণে প্রয়োজন কি? চির-নিদ্রায় কেন আমি অভিভূত হইয়া থাকিলাম না?'

দেবীসিংহ অতি কাতর হইয়া বৃক্ষের দিকে চাহিলেন! দেখিলেন যে, বৃক্ষ ডালে একটি হনুমান বসিয়া রহিয়াছে। সেইক্ষণেই চতুর্দশ বর্ষীয়া একটি পরমাসুন্দরী বালিকা আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—'মহাশয়। অযোধ্যা কি এই পথ দিয়া যাইতে হয়?' সে কণ্ঠস্বর, সে রূপ, দেবীসিংহের হৃদয়ে অঙ্কিত আছে, কখনও আর ভুলিবার নহে। চকিত হইয়া দেবীসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কে ও, বীরবালা?'

বালিকাটি উত্তর করিল,—'আজ্ঞা, হাঁ! আমার নাম বীরবালা বটে! আপনি আমার নাম কি করিয়া জানিলেন?'

এই কথা বলিতে বলিতে বালিকাটির পিতা এবং তদীয় পরিবারবর্গ সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরিচয় পাইয়া দেবীসিংহ জানিতে পারিলেন যে, তাঁহারাই তাঁহার শ্বশুর ও শ্বশুরবাড়ীর লোক, বালিকাটি তাঁহার স্ত্রী। আর দেখ আশ্চর্যের কথা কি বলিব। এই যে বালিকা বীরবালা তাঁহার স্ত্রী 'ইনি যেন সেই বীরবালা' সেই স্বপ্নের বীরবালা। অদ্ভুত মানিয়া দেবীসিংহ গাছ পানে পুনরায় চাহিয়া দেখিলেন। গাছের উপর বীর হনুমান বসিয়া হাসিতেছেন। দেবীসিংহ তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। সাদরে শ্বশুর ও তাঁহার পরিবারবর্গকে দেবীসিংহ বাটী লইয়া যাইলেন। বীরবালার রূপে, বীরবালার গুণে, দেবীসিংহের পিতামহীও আত্মীয়-স্বজন প্রতিবাসিগণ মুগ্ধ হইলেন। পৌষপার্বণের সময় গৃহে কুটুম্বেরা সমাগত হইয়াছেন। পিতামহী কত চাউল কুটিলেন, কত ডাউল বাটিলেন, কত নারিকেল কুরিলেন। নানাবিধ পিষ্টক করিয়া কুটুম্বদিগকে আহার করিতে দিলেন। এই বীরবালার গল্পটি যাঁহারা মনোযোগ দিয়া পাঠ করেন, চিরদিন তাঁহাদের ঘরে পৌষপার্বণের আনন্দ বিরাজ করে, তাঁহাদের গৃহ ধনধান্যে পরিপূর্ণ হয়।

লুল্লু

প্রথম অধ্যায় - চুরি

'লে লুল্লু' , আমীর সেখের মুখ দিয়া যখন এই কথা দুইটি নির্গত হইল, তখন তিনি জানিতেন না, ইহাতে কি আপত্তি ঘটিবে। কথা দুইটি আমীরের অদৃষ্টে বজ্রাঘাতরূপে পতিত হইল। আমীরের বাটী দিল্লী সহরে, আমীর জাতিতে মুসলমান। একদিন অন্ধকার রাত্রিতে আমীরের বিবি একেলা বাহিরে গিয়াছিলেন। পরিহাস করিয়া, স্ত্রীকে ভয় দেখাইবার নিমিত্ত আমীর ভিতর হইতে বলিলেন,—'লে লুল্লু।' অর্থাৎ কি না, 'লুল্লু! তুই আমার স্ত্রীকে ধরিয়া লইয়া যা।' লুল্লু, কোনও দুরন্ত বাঘেরও নাম নয়, কিংবা ছুরিধারী কানকাটারও নাম নয়। 'লুল্লু একটি বাজে কথা, ইহার কোন মানে নাই, অভিধানে ইহা দেখিতে পাওয়া যায় না, পরিহাস করিয়া আমীর কেবল কথাটি যোড়-তাড় করিয়া বলিয়াছিলেন।

কিন্তু যখন বিপত্তি ঘটে, তখন কোথা হইতে যেন উড়িয়া আসে। আশ্চর্য্যের কথা এই, লুল্লু একটি ভূতের নাম ছিল। আবার, দৈবের কথা শুন, লুল্লু সেই রাত্রিতে, সেই মুহূর্তে, আমীরের বাটীর ছাদের আলিশার উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়াছিল। হঠাৎ কে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিল। সে চমকিয়া উঠিল শুনিল,—কে তাহাকে কি লইতে বলিতেছে; চাহিয়া দেখিল সম্মুখে এক পরমা সুন্দরী নারী। তাহাকেই লইয়া যাইবার নিমিত্ত লুল্লুকে অনুরোধ করা হইতেছে। এরূপ সামগ্রী পাইলে দেবতারাও তদ্দণ্ডে নিকা করিয়া ফেলেন, তা ভূতের কথা ছাড়িয়া দিন্। চকিতের ন্যায়, দুর্ভাগা রমণীকে লুল্লু আকাশপথে কোথায় যে উড়াইয়া লইয়া গেল, তার আর ঠিক নাই।

আমীর, ঘরের ভিতর থাকিয়া মনে করিতেছিলেন, স্ত্রী এই আসে। এই আসে, এই আসে করিয়া অনেকক্ষণ হইয়া গেল, তবুও তাঁহার স্ত্রী ফিরিয়া আসিলেন না। তখন তাহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল; তখন তিনি স্ত্রীকে ডাকিলেন, কিন্তু সাড়া-শব্দ কিছুই পাইলেন না। বাহিরে নিবিড় অন্ধকার নিঃশব্দ। বাহিরে আসিয়া, এখানে ওখানে চারিদিকে স্ত্রীকে খুঁজিলেন, কোথাও দেখিতে পাইলেন না। তবুও মনে এই আশা হইল, স্ত্রী বুঝি তামাসা করিয়া কোথাও লুকাইয়া আছে। তাই, পুনরায় আতি-পাতি করিয়া সমস্ত বাড়ী অনুসন্ধান করিলেন, বাড়ীর ভিতর স্ত্রীর নামগন্ধও নাই। আবার আশ্চর্য্যের কথা এই যে, বাড়ীর দ্বার বন্ধ। সন্ধ্যাকালে নিজে তিনি যেরূপ বন্ধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ বন্ধই রহিয়াছে। তবে তাঁহার স্ত্রী কোথায় যাইলেন? পতিব্রতা সতী সাধ্বী আমীর-রমণী বাড়ীর বাহিরে কখনই পদার্পণ করিবেন না। আর যদিও তাঁহার এরূপ কুমতি হয়, তাহা হইলে দ্বার তো আর ফুড়িয়া যাইতে পারেন না। দারুণ কাতর হইয়া আমীর এই সব চিন্তা করিতে লাগিলেন। আমীরের চক্ষু হইতে বুক বাহিয়া অবিরত জল পড়িতে লাগিল। প্রিয়তমা গৃহলক্ষ্মীকে গৃহে

না দেখিয়া গৃহ শূন্য, জগৎ শূন্য, হৃদয় শূন্য,—আমীর সবই শূন্য দেখিতে লাগিলেন। কেবল শূন্য নয়, গ্রীষ্মকালের আতপতাপিত বালুকাময় মরুভূমির ন্যায় ধূ ধূ করিয়া হৃদয় তাঁহার জ্বলিতে লাগিল। 'আমি আমার নারী রত্নকে আপন হাতেই বিলাইয়া দিলাম। আমার কথা মত তাহাকে জিনেই লইয়া গেল, কি ভূতেই লইয়া গেল, কি স্বয়ং শয়তান আসিয়া লইয়া গেল, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। হায়! হায়! কি হইল!' এইরূপে আমীর নানাপ্রকার খেদ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অবশেষে চক্ষু মুছিয়া, দ্বার খুলিয়া পাড়া প্রতিবাসীকে ডাকিলেন। পাড়া-প্রতিবাসীরা সকলে দৌড়িয়া আসিল সকলেই পুনরায় তন্ন তন্ন করিয়া আমীরের বাটী অন্বেষণ করিল। আমীরের বাটী দেখিবার পর, পাড়ার এ-ঘরে ও-ঘরে যথাবিধি অন্বেষণ হইল। গলি-ঘুঁজি সকল স্থানই দেখা হইল। খুঁজিতে আর কোথাও বাকী রহিল না, কিন্তু আমীরের স্ত্রীকে কেহই খুঁজিয়া পাইলেন না। প্রতিবাসীরা ক্রমে কানাকানি করিতে আরম্ভ করিল, নিশ্চয় আমীরের বিবি কোনও পুরুষের সঙ্গে বাহির হইয়া গিয়াছে। এরূপ সুন্দরী নব-যৌবনা রমণী আফিমচীর ঘরে কত দিন থাকিতে পারে? আমীর একটু একটু পাকা আফিম খাইতেন, তাঁহার এই দোষ। এক তো স্ত্রী গেল, তারপর যখন এই কলঙ্কের কথা আমীরের কানে উঠিল, আফিমচী হউন, তখন তাঁহার হৃদয়ে বড়ই ব্যথা লাগিল। তিনি ভাবিলেন,—দূর হউক, এ সংসারে আর থাকিব না, লোকের কাছে আর মুখ দেখাইব না, ফকিরী লইয়া দেশে দেশে বেড়াইব, যদি সে প্রিয়তমা লায়লারূপী সাধ্বীকে পুনরায় পাই, তবেই দেশে ফিরিয়া আসিব, না হইলে মজনুর মত এ ছার জীবন একান্তই বিসর্জন দিব।'

এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া, ফকিরের বেশে আমীর ঘর হইতে বাহির হইলেন। সঙ্গে কিছুই লইলেন না;—লইলেন কেবল একটি টিনের কৌটা, একটি বাঁশের নল, আর একটি লোহার টেকো। আমীর কিছু সৌখীন পুরুষ ছিলেন। টিনের কৌটার ঢাকনের উপর কাচ দেওয়া ছিল, আরসির মত তাহাতে মুখ দেখা যাইত। পান খাইয়া আমীর তাহাতে কখন কখন মুখ দেখিতেন, ঠোঁট লাল হইল কি না। বাঁশের নলটি তাঁহার বড়ই সাধের জিনিস ছিল। এক সাহেবের সঙ্গে খানসামা হইয়া একবার তিনি পাহাড়ে গিয়াছিলেন, সেইখানে এই সখের জিনিসটি ক্রয় করেন। ইহার গায়ে হিজি-বিজি কালো কালো অনেক দাগ ছিল। আমীর মনে করিতেন, নলের সেগুলি অলঙ্কার নহে, সেগুলি অক্ষর,—চীনাভাষার অক্ষর। তাহাতে লেখা ছিল,—'চীনদেশীয় মহাপ্রাচীরের সন্নিকট লিংটি সহরের মোপিঙ নামক কারিগরের দ্বারা এই নলটি প্রস্তুত হইয়াছে। নল-নির্মাণ কাজে মোপিঙ অদ্বিতীয় কারিগর, জগৎ জুড়িয়া তাঁহার সুখ্যাতি মূল্য চার আনা। যাঁহার নলের আবশ্যক হইবে, তিনি তাঁহারই নিকট হইতে যেন ক্রয় করেন, বাজে মেকরদিগের কাছে গিয়া যেন বৃথা অর্থনষ্ট না করেন। মোপিঙের নল ক্রয় করিয়া যদি কাহারও মনোনীত না হয়, তাহা হইলে নল ফিরাইয়া দিলে, মোপিঙ তৎক্ষণাৎ মূল্য ফিরাইয়া দিবেন।' যাহা হউক, আমীর যে নলটি কিনিয়াছিলেন, মনের মত হইয়াছিল তাই রক্ষা। না হইলে, মূল্য ফেরত লইতে হইত।

যুধিষ্ঠির যে পথ দিয়া স্বর্গে গিয়াছিলেন, সেই তুষারময় হিমগিরি অতিক্রম করিয়া, তিব্বতের পর্বতময় উপত্যকা পার হইয়া, তাতারের সহস্র ক্রোশ মরুভূমি চলিয়া চীনের উত্তর সীমায় লিংটিং সহরে আমীরকে যাইতে হইত, সেখানে যাইলে তবে মোপিঙের সহিত সাক্ষাৎ হইত, মোপিঙ সিকিটি ফিরাইয়া দিতেন। তাই বলি, ধর্মে রক্ষা করিয়াছে যে, নলটি আমীরের মনোনীত হইয়াছিল যে, প্রতিদিন ইহাতে অতি যত্নে আমীর তৈল মাখাইতেন। তেল খাইয়া খাইয়া পাকিয়া, ইহা ঈষৎ রক্তিমবর্ণ হইয়াছিল। কৌটার ভিতর বড়ই সাধের ধন, আমীরের প্রস্তুত করা আফিম থাকিত, ইতর ভাষায় যাহাকে লোকে চণ্ডু বলে, বাঁশের নলটি দিয়া চণ্ডুর ধূম পান করিতেন। টেকো দ্বারা কৌটা হইতে আফিম তুলিয়া নলের আগায় রাখিতেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় – রোজা

এই সকল সরঞ্জাম লইয়া আমীর গৃহ হইতে বাহির হইলেন। দিল্লী পার হইলেন, কত নদ-নদী গ্রাম প্রান্তর অতিক্রম করিলেন। দিনের বেলায় ভিক্ষা করিয়া খান, সন্ধ্যা হইলে, গাছতলায় হউক, কি মাঠে হউক, পড়িয়া থাকেন। খোদা খোদা করিয়া কোনমতে রাত্রি কাটান। এইরূপে কতদিন অতিবাহিত হইয়া গেল। স্ত্রীকে পুনরায় পাইবার আশা আমীরের মন হইতে ক্রমেই অন্তর্হিত হইতে লাগিল। হয় ফকিরী করিয়া সমস্ত জীবন কাটাইতে হইবে, না হয় একটা বুড়োহাবড়া নিকা করিয়া পুনরায় ঘরকন্না করিতে হইবে, এই ভাবিয়া শোকে তিনি নিতান্তই আকুল হইয়া পড়িলেন। একদিন তিনি একটি গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে একজনদের বাটীর সম্মুখে অনেকগুলি লোক বসিয়া আছে দেখিলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, সে গ্রামটি পশ্চিমে চক্রবেড়বিশেষ। যেখানে লোক বসিয়াছিল, সেটা জানের বাড়ী। গৃহস্বামী একজন প্রসিদ্ধ গণৎকার! ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সকলই প্রত্যক্ষ দেখিতে পান। সংসারে তাঁহার কাছে কিছুই গুপ্ত নাই। অদৃষ্টের লিখন তিনি জলের মত পড়িতে পারেন। সামুদ্রিকে হনুমানের চেয়ে ব্যুৎপত্তি। ললাটে কি হাতে, যে ভাষার বিধাতা কেন আঁচড়-পিচড় পাড়িয়া থাকুন না,—ইংরেজীতে হউক, কি ফরাসীতে হউক, দেবভাষায় হউক, কি দানব ভাষায় হউক,—সকলই তিনি অবাধে পড়িতে পারেন। চুরি-জুয়াচুরি সকলই বলিয়া দিতে পারেন। অবোধ গবর্ণমেণ্ট যদিও তাঁহাকে একটিও পয়সা, কি একটিও টাইটেল দেন নাই সত্য, দূর-দূরান্তর হইতে তাঁহার নিকট লোক আসিয়া থাকে। পাঁচটি পয়সা আর পাঁচ ছটাক আটা দিয়া ভূত ভবিষ্যৎ গণাইয়া লয়। আমীর বলিলেন,—"আমিও জানের বাড়ী যাই, ইনশাল্লাতালা। কে আমার বিবিকে লইয়া গিয়াছে, সে গণিয়া দিবে।" আমীর গিয়া জানের বাটীর সম্মুখে বসিলেন। অন্যান্য লোকের গণা গাঁথা হইয়া যাইলে অতি বিনীতভাবে গণৎকারের নিকট তিনি আপনার দুঃখের কথা আগাগোড়া বলিলেন। গণৎকার ক্ষণকালের নিমিত্ত গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। অবশেষে চারিখানা খার্পরা হাতে লইলেন। মন্ত্র পড়িয়া সেই চারিখানি খার্পরায় ফুঁ দিতে লাগিলেন।

যখন মন্ত্র পড়া আর ফুঁ দেওয়া হইয়া গেল, তখন একখানি উত্তর দিকে একখানি দক্ষিণে, একখানি পূর্বদিকে, আর একখানি পশ্চিমে ছুঁড়িয়া ফেলিলেন।

তারপর কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন,—'ফকিরজী। আপনার স্ত্রীকে ভূতে লইয়া গিয়াছে; কিন্তু করিব কি! আমি ভূতের রোজা নই। ভূতের উপর আমার কিছুমাত্র অধিকার নাই। যদি থাকিত, তাহা হইলে এতক্ষণ কোন্‌কালে আপনার স্ত্রীকে আনিয়া দিতাম। তবে আপনাকে সন্ধান বলিয়া দিলাম। আপনি এক্ষণে একটি ভাল রোজার অনুসন্ধান করুন। ভাল রোজা পাইলে নিশ্চয় আপনার স্ত্রীকে ভূতের হাত হইতে উদ্ধার করিতে পারিবেন।' এইরূপ আশ্বাস পাইয়া আমীরের মন কথঞ্চিৎ সুস্থ হইল। তাঁহার স্ত্রী যে কোনও দুষ্ট লম্পটের কুহকে পড়িয়া ঘর হইতে বাহির হয় নাই, এ দুঃখের সময় তাহাও শান্তির কারণ হইল।

এখন রোজা চাই। কিন্তু ইংরেজের প্রভাবে আমাদের সকল ব্যবসাই একরূপ লোপ পাইয়াছে। অন্য ব্যবসার কথা দূরে থাকুক, ভূতদিগের ভূতে পাওয়া ব্যবসাটি পর্যন্ত লোপ হইয়া গিয়াছে। এই হতভাগা দেশের লোকগুলো এমনই ইংরেজিভাবাপন্ন হইয়াছে যে, কাহাকেও ভূতে পাইলে কি ডাইনে খাইলে, বলে কিনা হিষ্টিরিয়া হইয়াছে। এ কথায় রক্তমাংসের শরীরে রাগ হয়, ভূতদেহে তো রাগ হইবেই। তাই ঘৃণায় ভূতকুল একবাক্য হইয়া বলিল,—'দূর হউক, আর কাহাকেও পাইব না। ডাইনীকুল একবাক্য হইয়া বলিল,—'দূর হউক, আর কাহাকেও খাইব না।' ভারতের ভূতকুল ও ডাইনীকুল আজ তাই মৌনী ও ম্রিয়মান। শ্মশান-মশান আজ তাই নীরব! রাত্রি দুই প্রহরের সময়, জনশূন্য মাঠের মাঝখানে, আকাশ পানে পা তুলিয়া জিহ্বা লকলক্ করিয়া, চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেকালে ডাইনীরা যে চাতর করিত, আজ আর সে চাতর নাই। মরি! মরি! ভারতের সকল গৌরবই একে একে লোপ হইল! এ অবস্থায় আর রোজার ব্যবসা কি করিয়া চলিবে? তাহাও এক প্রকার লোপ হইয়াছে। নানা স্থানে কত শত গঙ্গা ময়রার ঘরে আজ অন্ন নাই। পায়ের উপর পা দিয়া, সোনা দানা পরিয়া যাহার সুখে স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইত, আজ তাহারা পথের ভিখারী।

আমীর দেখিলেন ভাল রোজা পাওয়া বড় সহজ কথা নয়। আমীর কিন্তু হতাশ হইবার ছেলে ছিলেন না। মনে করিলেন যে,—'যদি আমাকে পৃথিবী উলট-পালট করিয়া ফেলিতে হয়, তাহাও আমি করিব, যেখানে পাই সেইখান থেকে ভাল রোজা নিশ্চয় বাহির করিব।' এই বলিয়া তিনি পুনরায় দেশপর্যটনে প্রবৃত্ত হইলেন। যেখানে যান, সেইখানেই সকলকে জিজ্ঞাসা করেন,—'হাঁগা! তোমাদের এখানে ভাল ভূতের রোজা আছে?' ছোট-খাট অনেক রোজার সঙ্গে দেখাও হইল। অনেক মুসলমান আসিল, যাঁহারা তাবিজ লিখিয়া ভূত-প্রেত দানা দৈত্যকে দুর করেন, তাঁহাদেরও সহিত সাক্ষাৎ হইল। কিন্তু মনের মত কাহাকেও পাইলেন না, বুক ফুলিয়া কেহই বলিতে পারিল না যে,—'ভূত মারিয়া আমি তোমার স্ত্রীকে আনিয়া দিব।' অবশেষে অনেক পথ অনেক দূর যাইয়া আমীর একটি গ্রামে

গিয়া পৌঁছিলেন। সেই গ্রামে প্রথমেই একটি বৃদ্ধার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। আমীর যথারীতি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'হাঁগা! তোমাদের এখানে ভাল রোজা আছে?' বৃদ্ধা উত্তর করিল,—'হাঁ বাছা আছে। আমাদের গ্রামের মহাজনের কন্যাকে সম্প্রতি একটি দুর্দান্ত ভূতে পাইয়াছিল। মহাজনের টাকার আর অবধি নাই। সে যে কত ডাক্তার, কত বৈদ্য, কত হেকিম, কত রোজা আনিয়াছিল, তাহার আর কি বলিব, দু পা দিয়া জড় করিয়াছিল। কিন্তু কিছুতেই কিছুই হয় নাই, কেহই সে ভূত ছাড়াইতে পারে নাই। অবশেষে এই গ্রামের একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ একটি মন্ত্র পড়িয়াই তাকে আরোগ্য করেন। ব্রাহ্মণ পূর্বে খাইতে পাইত না, ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর উদরে অন্ন ছিল না, অঙ্গে বস্ত্র ছিল না, এখন অন্ন-বস্ত্রের কথা দূরে থাকুক, দ্বারে হাতী ঘোড়া উট বাঁধা।'

তৃতীয় অধ্যায় – তাঁতি

বলা বাহুল্য, আমীর এই কথা শুনিয়া অবিলম্বে ব্রাহ্মণের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, ঝুঁকে সেলাম করিয়া, তাঁহাকে আদ্যোপান্ত আপনার দুঃখের কাহিনী বলিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—'দেখ ভূতে পাইলে আমি ছাড়াইতে পারি। ভূতে যদি কাহাকেও একবারে উড়াইয়া লইয়া যায়, তাহার আমি কি করিতে পারি? পাহাড়ে লইয়া গিয়াছে, কি সমুদ্রের ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছে, তাহা আমি কি করিয়া জানিব? ফকির সাহেব। তোমার স্ত্রীকে আনিয়া দেওয়া আমার সাধ্যাতীত।' এই কথা শুনিয়া আমীর মাথা হেঁট করিয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন, চক্ষু দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। দুর্বাসা মুনির জাতি যেমন কঠিন তেমনি কোমল! সেই জলেই ব্রাহ্মণের মন ভিজিয়া একেবারে গলিয়া গেল। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—'শুন ফকিরজী! তোমাকে মনের কথা বলি,—প্রকাশ করিও না। তাহা হইলে রোজা বলিয়া আমার যা কিছু মান-সম্ভ্রম-প্রতিপত্তি হইয়াছে, সকলই যাইবে। তোমাকে সত্য করিয়া বলিতেছি, আমি প্রকৃত রোজা নই, ভূত ছাড়াইবার একটি মন্ত্রও জানি না! এমনকি গায়ত্রী পর্যন্ত জানি না, আর লেখাপড়া বিষয়ে, ক খ পর্যন্ত শিখি নাই। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, আমি একজন পরম নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। চৌকায় বসিয়া খাই। আজকালের ইংরেজী-পড়া বাবু ভায়াদিগের মত নই।' আমীর বলিলেন,—'সে কি মহাশয়! তবে আপনি মহাজন-কন্যার ভূত ছাড়াইলেন কি করিয়া?' ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন,—'সে কথা তোমাকে আদ্যোপান্ত সমস্ত বলিতেছি। প্রকাশ করিও না, তাহা হইলে আমার বড়ই মন্দ হইবে।' আমীর বলিলেন,—'আল্লার কসম্, আমার মুখ দিয়া এ কথা কখনই বাহির হইবে না।'

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—'এই গ্রামে একটি তাঁতি বাস করে তাঁতি তাঁত বুনিয়া খায়, কোন ল্যাঠাই ছিল না। একদিন কি মতি হইল, সে তাঁত বুনিতে বুনিতে একটু গুন্ গুন্ স্বরে গান করিল। নিজের কানে সুরটি বড়ই সুমধুর বলিয়া লাগিল। পুনর্বার আস্তে আস্তে গাইয়া দেখিল, বড়ই মিষ্ট বটে! তাঁতি মনে মনে ভাবিল,—'আমি একজন প্রকৃত গাইয়ে। এ গুণটি

এতদিন প্রচ্ছন্ন অবস্থায় বৃথা নষ্ট হইতেছিল। জগতের দশাই এই, তা না হইলে হীরামণি মুক্ত উপরে চক্‌মক্ না করিয়া, মাটি কি জলের ভিতর কেন বৃথা পড়িয়া থাকিবে? যাহা হউক, এখন হইতে গান গাইয়া আমি জগৎ মুগ্ধ করিব, মধুর তানে অবিরত জগতের কর্ণকুহরে সুধা ঢালিয়া দিব। আপাততঃ প্রতিবাসীদিগকে আমার গুণের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিই।' এই বলিয়া তাঁতি ক্রমে গলা ছাড়িয়া গান আরম্ভ করিল। একদিন যায়, দুই দিন যায়, গ্রামবাসীরা শহব্যস্ত। দুই চারি দিন পরে গ্রামের লোক অস্থির হইয়া পড়িল। প্রাণ লইয়া সকলের টানাটানি। সুতরাং আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলে গিয়া তাঁতির দ্বারে উপস্থিত। তাঁতিকে ডাকিয়া বলিল,—'বাপু হে! পুরুষ-পুরুষানুক্রমে বহুদিন ধরিয়া আমরা এই গ্রামে বাস করিতেছি। তোমার গানের প্রভাবে আর আমরা এখানে তিষ্ঠিতে পারি না। বল তো ঘর-দ্বার ছাড়িয়া উঠিয়া যাই, আর না হয় চুপ কর, গানে ক্ষান্ত দাও।' তাঁতি বলিল,—'না মহাশয়! সে কি কথা? গ্রাম হইতে উঠিয়া যাইবেন কেন? সুরবোধ নাই বলিয়া যদি আমার গান আপনাদিগের কানে ভাল না লাগে, তাহা হইলে আপনাদিগকে আর বিরক্ত করিতে চাহি না। আজ হইতে মাঠে বসিয়া আমি গান করিব। যাহার বোধাবোধ আছে, তিনি মাঠে গিয়া আমার গান শুনিবেন, আর পারিতোষিকস্বরূপ আমি তাঁহাকে কড়ি দিব।' এইরূপ আশ্বস্ত হইয়া গ্রামের লোক যে যাহার ঘরে যাইল। তাঁতি গিয়া মাঠের মাঝখানে এক অশ্বত্থ গাছের নীচে তাঁত খাটাইল। সেখানে বসিয়া মনের সুখে গান করিতে লাগিল। তবে খেদের বিষয় এই, শুনিতে কেহ যায় না, জনপ্রাণী সে দিক মাড়ায় না। কাক-পক্ষী সেদিকে ভুলিয়াও উড়িয়া যায় না।

ব্রাহ্মণ বলিতেছেন,—'ফকিরজী! আমি বড়ই দরিদ্র ছিলাম। এ গ্রামের ভিতর আমার মত দীনদুঃখী আর কেহ ছিল না। গৃহিণী ও আমি যে কত উপবাস করিয়াছি তাহা বলিতে পারি না। নিজের যাহা হউক, ব্রাহ্মণীর শীর্ণ দেহ, মলিন মুখ দেখিয়া সততই আমার প্রাণ কাঁদিত। কি করিব, কোনও উপায় ছিল না, মনের আগুন মনেই নিবাইতাম, চক্ষের জল চক্ষেই শুকাইতাম। ব্রাহ্মণী একদিন আমাকে বলিলেন,—'আজ ঘরে আটা নাই। তাঁতি বলিয়াছে, তাহার গান শুনিলে একপণ কড়ি দিবে। যাও না, একটুখানি কেন শুনিয়া এস না? এক পণ কড়ি পাইলে ঘরে অন্ন হইবে, দুইজন খাইয়া বাঁচিব।' আমি বলিলাম,—'দেখ ব্রাহ্মণী। ও কথাটি আমাকে বলিও না। শুলে যাইতে বল, তা যাইতে পারি, আগুনে পুড়িয়া মরিতে বলিলেও মরিতে পারি, কিন্তু তাঁতির গান আমাকে শুনিতে বলিও না, তিলেকের নিমিত্তও সে দগ্ধানি আমি কিন্তু সহ্য করিতে পারিব না।' এই কথা লইয়া ব্রাহ্মণীর সঙ্গে আমার ক্রমে কিঞ্চিৎ বচসা হইল। ব্রাহ্মণী আমাকে ঘর হইতে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিলেন। বলিলেন,—'যাও, একটুখানি তাঁতির গান শুনিয়া এক পণ কড়ি লইয়া আইস।' পথে বাহির হইয়া আমি মনে মনে ভাবিলাম, কি করিব! তাঁতির গান কি করিয়া শুনি? অথচ কড়ি না লইয়া আসিলে ব্রাহ্মণী আর রক্ষা রাখিবেন না। তাঁতির গান শুনার চেয়ে মরা ভাল। এ ছার জীবনে আর কাজ নাই। গলায় দড়ি দিয়াই মরি। এইরূপ মনে মনে

স্থির করিয়া একজনদের বাটী হইতে এক গাছি দড়ি চাহিয়া লইলাম। এ মাঠে তাঁতি গান করিতেছে, অন্যদিকে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে, আর একটি মাঠে গিয়া আর একটি অশ্বত্থগাছে দড়িটি খাটাইলাম, ফাঁসটি ঠিক করিয়া লইলাম। গলায় দিই আর কি, এমন সময় সেই গাছের ভিতর হইতে একটি ভূত বাহির হইল। ভূত আমাকে বলিল,—'ওরে বামুন, তুই করিতেছিস্ কি?' আমি আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা তাহার নিকট বর্ণনা করিলাম। ভূত বলিল,—'আর ভাই! ও কথা বলিসনে। যে গাছের তলায় এখন তাঁতি গান করিতেছে, যুগ-যুগান্ত হইতে ঐ গাছে আমি বাস করিতেছিলাম। গাছটি আমার বড়ই প্রিয় ছিল। কিন্তু হইলে হইবে কি, যে দিন হইতে তাঁতি উহার তলায় গান আরম্ভ করিল, সেই দিন হইতেই আমাকে ও-গাছ ও-মাঠ ছাড়িয়া পালাইতে হইল। দেখিতেছি, দুইজনেই আমরা বিপদে বিপন্ন। তা তোর ভাবনা নাই, তুই বাড়ী ফিরিয়া যা। তোদের গ্রামের মহাজনের কন্যাকে আমি গিয়া পাইব। কিছুতেই ছাড়িব না, কেবল তুই গিয়া যখন আমার কানে কানে বলবি যে, আমি সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ আসিয়াছি, তখনই আমি ছাড়িয়া দিব। মহাজনের অনেক টাকা আছে, আর সেই একমাত্র কন্যা। অনেক ধনদৌলত দিয়া তোকে বিদায় করিবে, তোর দুঃখ ঘুচিবে।' ব্রাহ্মণ বলিলেন,—'সেখজী! শুনিলে তো। আমি রোজা নই, আমি মন্ত্রতন্ত্র কিছুই জানি না। দৈবক্রমে আমার একটি ভূতের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহা হইতেই আমার এই যা কিছু বল। মহাজনের কন্যার ভূত ছাড়িলে চারিদিকে আমার নাম বাহির হইল যে আমার মত রোজা আর পৃথিবীতে নাই। ভূতে পাইলে সকলে আমাকে লইয়া যায়। আমাকে আর কিছু করিতে হয় না, কেবল আমি রোগীর কানে কানে গিয়া বলি,—'শীঘ্র ছাড়িয়া যাইবে তো যাও, না হইলে তাঁতির গান দিব। তাঁতির নামে সকল ভূতই জড়-সড়, পালাইতে পথ পায় না।'

চতুর্থ অধ্যায় – উদ্যোগ

আমীর বলিলেন,—'মহাশয়! তাহাই যদি সত্য, তবে চলুন না কেন? আপনার সেই ভূতটিকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি, তিনি যদি অনুগ্রহ করিয়া, আমার স্ত্রীকে উদ্ধার করিয়া দেন? কারণ ভূতে ভূতে অবশ্যই আলাপ পরিচয় আছে, নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণে, শাদি বিয়াতে অবশ্যই সাক্ষাৎ হইয়া থাকিবে। আমার স্ত্রীকে যে ভূতে লইয়া গিয়াছে, তাহাকে যদি তিনি দুটো কথা বলিয়া দেন, তাহা হইলে আমার অনেক উপকার হইতে পারে। না হয়, স্ত্রীকে কি করিয়া পাই, তাহার একটা না-একটা উপায়ও তিনি বলিয়া দিতে পারেন।' ব্রাহ্মণ বলিলেন,—'এ পরামর্শ মন্দ নয়, তোমার দুঃখ দেখিয়া আমি বড়ই কাতর হইয়াছি, আচ্ছা চল যাই, দেখি কি হয়।' ব্রাহ্মণ দুর্গা বলিয়া, আমীর বিস্মিল্লা বলিয়া, যাত্রা করিলেন। ক্রমে তাঁহারা যে মাঠে ভূত থাকে, সেই মাঠে গিয়া উপস্থিত হইলেন। যে গাছে ভূত থাকে, সেই গাছতলায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে দাঁড়াইয়া গাছের দিকে চাহিয়া উর্দ্ধমুখে দুই জনে স্তুতি-মিনতি করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—'হে ভূত! আশ্রিত সেই দরিদ্র

ব্রাহ্মণ আজ পুনরায় তোমার নিকট আসিয়াছে। তোমার কৃপায় তাহার প্রাণ রক্ষা হইয়াছে। তোমার কৃপায় তাহার দরিদ্রতা মোচন হইয়াছে। পৃথিবীতে যত ভূত আছে, সকল ভূতের তুমি শ্রেষ্ঠ। ভূতের তুমি রাজা। কৃপা করিয়া দেখা দাও, আর একবার আবির্ভাব হও।' মুসলমান বলিল, 'ভূত সাহেব! হুজুরের নাম শুনিয়া কদম-বোসী করিতে এখানে আসিয়াছি। আমার মনস্কামনা সিদ্ধ করুন। হুজুরের এই গাছতলায় কাঁচা পাকা সিন্নি চড়াইব।' এই প্রকারে নানারূপ স্তব করিতে করিতে গাছটি দুলিতে লাগিল, ডালাপালা সমুদয় মড় মড় করিতে লাগিল। তারপর গাছের ডগায়, এক স্থানে সহসা অন্ধকারের আবির্ভাব হইল। দিন দুই প্রহরে, চারিদিকে সূর্যের কিরণ, আর সকল স্থানেই আলো, কেবল সেই স্থানটুকুতেই অন্ধকাররাশি জমিয়া গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে লাগিল। অবশেষে তাহা এক ভীষণ প্রকাণ্ড নরমূর্তিতে পরিণত হইল। নরমূর্তি ধরিয়া ভূত গাছ হইতে নামিয়া আসিল, বৃক্ষের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

এখানে এখন একটি নূতন কথা উঠিল! বিজ্ঞানবেত্তারা—বিশেষতঃ ভূত-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা—এ বিষয়টি অনুধাবন করিয়া দেখিবেন। এখানে স্থির হইল এই, যেমন জল জমিয়া বরফ হয়, অন্ধকার জমিয়া তেমনি ভূত হয়। জল জমাইয়া বরফ করিবার কল আছে, অন্ধকার জমাইয়া ভূত করিবার কল কি সাহেবেরা করিতে পারেন না? অন্ধকার অভাব নাই। নিশাকালে বাহিরে তো অল্প স্বল্প অন্ধকার থাকেই। তারপর মানুষের মনের ভিতর যে কত অন্ধকার আছে, তাহার সীমা নাই, অন্ত নাই। কোদাল দিয়া কাটিয়া কাটিয়া ঝুড়ি পুরিয়া এই অন্ধকার কলে ফেলিলেই প্রচুর প্ররিমাণে ভূত প্রস্তুত হইতে পারিবে। তাহা হইলে ভূত খুব শস্তা হয়। এক পয়সা, দুই পয়সা, বড় জোর চারি পয়সা করিয়া ভূতের সের হয়। শস্তা হইলে গরীব-দুঃখী সকলেই যার যেমন ক্ষমতা ভূত কিনিতে পারে।

গাছের পাশে দাঁড়াইয়া, কিছু রাগতভাবে ভূত বলিল,—'বামুন! আজ আবার কেন আসিয়াছিস? তোর মত বিট্‌লে বামুন আমার অবধ্য নয়। ইচ্ছা হইলে এখনি তোর ঘাড় মুচড়াইয়া দিতে পারি। আমার অবধ্য, সেই ইংরেজী-পডা বাবুলোক। তাঁহাদের ভয়ও করি, ভক্তিও করি! ভয় করি, পাছে মহাপ্রভুরা গায়ে টলিয়া পড়েন, কি বমন করিয়া দেন। ভক্তি করি, কেন না, এটা সেটা খাইয়া তাঁহাদের মনের কোঁচগু ঘুচিয়া যায়, মন সরল হইয়া যায়, এই মর্ত্যলোকেই তাঁহারা সদাশিবত্ব প্রাপ্ত হন, অন্য লোকের মত তাঁহাদের মন জিলেপির পাক- বিশিষ্ট নয়।' ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'প্রভু! আমি নিজের জন্য আপনার নিকট ভিক্ষা করিতে আসি নাই। আপনার প্রসাদে আমার আর কিছুরই অভাব নাই। এই লোকটি নিদারুণ সন্তাপিত হইয়াছে, ইহার নিমিত্তই আমি আপনার নিকট আসিয়াছি।'

এই কথায় ভূতের রাগ কিছু পড়িয়া আসিল। সে জিজ্ঞাসা করিল,—'সঙ্গে তোমার ও লোকটি কে?' ব্রাহ্মণ তখন আমীরের সকল কথাই ভূতকে শুনাইলেন! শুনাইয়া বলিলেন,—'মহাশয়! আপনাকে ইহার একটা উপায় করিতে হইবে, না করিলে এ লোকটি প্রাণে মরিবে। আপনি দয়ার্দ্রচিত্ত, আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন, ইহারও প্রাণ রক্ষা

করুন।' ভূত বলিল,—'ইহার স্ত্রীকে নিশ্চয় লুল্লু লইয়া গিয়াছে। লুল্লু সবে নূতন ভূতগিরি পাইয়াছে, ভূতগিরিতে তাহার নব অনুরাগ, সে বড়ই দুরন্ত।' ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—'নূতন ভূতগিরি পাইয়াছে? মহাশয়! সে কি প্রকার কথা?' ভূত হাসিয়া বলিল,—'এ কথা তোমরা কিছুই জান না। লোকে বলে, অমুক মানুষ মরিয়া ভূত হইয়াছে। ঠিক সেটি সত্য নয়। মানুষ নিজে মরিয়া নিজের ভূত হয় না। মানুষ মরিলে আমরা কেহ গিয়া তাহার ভূতগিরি করি। লক্ষ লক্ষ ভূত পৃথিবীতে অবস্থিতি করিতেছে। কেহ বা ভূতগিরি করিবার কর্ম পাইয়াছে, কেহ বা ভূতগিরি করিবার উমেদারি করিতেছে, আবার কেহ বা বেকার বসিয়া আছে। আমাদের যিনি কর্তা, তিনিই ভূতদিগকে এই কার্যে নিযুক্ত করেন। ভূতকে তিনি বলেন,—'যাও অমুক মানুষের সঙ্গে সঙ্গে থাক, সে মরিলে তাহার ভূত হইও, তাহার ভূতগিরি তোমাকে দিলাম।' সেইদিন হইতে ভূতটি মানুষের সঙ্গে সঙ্গে থাকে। মানুষের মাথাটি ধরিলে তাহার আর আনন্দের পরিসীমা থাকে না; কেন না, মরিলেই তাহার ভূতগিরি করিতে পাইবে। এরূপ যে ঘটনা হয়, সে কেবল তোমাদের নিজ দোষে। দেশীয় সংবাদপত্র সকল তোমাদিগকে কত সুশিক্ষা দিয়া থাকে, যদি কায়মনচিত্তে পালন করিতে, তাহা হইলে তোমাদের এ দুর্দশা হইত না। এই দেখ, দেশ একেবারে নির্ধন হইয়া যাইতেছে, বিলাতী কাপড়ের দ্বারা বিদেশীয়েরা ধন লুটিতেছে! ভাল, কাপড় না পরিলেই তো হয়? যদি কাপড় না পর, তাহা হইলে তো আর তোমাদিগের ধন কেহ লুটিতে পারে না। রেল করিয়া বিদেশীয়েরা ধন লইয়া যাইতেছে। ভাল, রেলে না চড়িলেই তো হয়, পায়ে হাঁটিয়া কেন কাশী-বৃন্দাবন যাও না! তা যদি কর, তাহা হইলে বিদেশীয়েরা তোমাদিগের দেশে রেল করিতে কখনই আসিবে না, দেশের ধন দেশেই রহিয়া যাইবে। সেইরূপ আমরা তোমাদিগের ভূতগিরি করি। আমরা তোমাদিগের ভূতগিরি করিবার উমেদারিতে থাকি। ভাল, তোমরা যদি মরা ছাড়িয়া দাও, তাহা হইলে তো কেহ তোমাদের ভূতগিরি করিতে আসে না? তাই বলি, না মরিলেই তো সকল কথা ফুরাইয়া যায়। নিজে তোমরা মরিবে, আর যত দোষ আমাদের? অপরাধের মধ্যে এই যে, আমরা তোমাদিগের ভূতগিরি করি।

'যাহা হউক, লুল্লু বহুদিন হইল, ভূতগিরি করিবার জন্য দরখাস্ত করিয়াছিল। তাহার কপালে ভাল ভূতগিরি কোথাও জুটে নাই। অবশেষে কর্তা তাহাকে দুখিরাম চণ্ডালের ভূতগিরির উমেদারিতে নিযুক্ত করেন। দুখিরাম যদিও বৃদ্ধ হইয়াছিল, তথাপি তাহার শক্তি সামর্থ্য বিলক্ষণ ছিল। কিছুতেই মরিতে চায় না। বৃদ্ধের কুব্যবহারে লুল্লু বড়ই বিরক্ত হইয়াছিল। আজ অল্পদিন হইল, দুখিরামের মৃত্যু হইয়াছে, লুল্লু তাঁহার ভূতগিরি পাইয়াছে। লুল্লু একটি সভ্য ভব্য নব্য ভূত। সে যে এতদিন পরে এখন মনের সাধে ভূতগিরি করিতেছে, তোমাদের মুখে এ কথা শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম।' ব্রাহ্মণ বলিলেন,—'সে কি কথা মহাশয়? দুরাচার লুল্লুর কার্যে আপনি সন্তুষ্ট। আমরা যে, আপনার নিকট তাহার নামে অভিযোগ করিতে আসিয়াছি। ইহার স্ত্রীকে আপনি উদ্ধার করিয়া দিবেন, সেই প্রার্থনায় যে, আপনার কাছে আসিয়াছি।' এইরূপে অনেক বাদানুবাদের পর ভূত বলিল,—

'দেখ, আমি এক্ষণে বৈরাগ্য-ধর্ম অবলম্বন করিয়াছি, সংসারের বাদবিসংবাদ, ভালমন্দ কিছুতেই থাকি না। আমি জানি না লুল্লু এখন ইহার স্ত্রীকে কোথায় রাখিয়াছে। অন্বেষণ করি, এরূপ অবকাশ আমার নাই। তোমরা এক কাজ কর; এখান হইতে দশ ক্রোশ দূরে মাঠের মাঝখানে একটি পুরাতন কুপ আছে, সে কুপে এখন জল নাই। তাহার ভিতর ঘ্যাঘোঁ বলিয়া একটি ভূত বাস করে। ঘ্যাঘোঁ সকল সংবাদ রাখিয়া থাকে। ভূতদিগের মধ্যে সে একরূপ গেজেট। তোমরা তাহার নিকট যাও, সে সকল সন্ধান বলিয়া দিবে। তবে কথা এই, আজ কিছুদিন হইল, ঘ্যাঘোঁ মনোদুঃখে জ্বর জ্বর হইয়াছে। মনের খেদে বিরলে সে কুপের ভিতর বসিয়া আছে। কথা কহে না, ডাকিলে উত্তর দেয় না, তাহার দেখা পাওয়া ভার! চেষ্টা করিয়া দেখ।'

পঞ্চম অধ্যায় – ঘ্যাঘোঁ

ব্রাহ্মণ এবং আমীর, আর করেন কি? দুই জনে ঘ্যাঘোঁর অনুসন্ধানে চলিলেন। যাইতে যাইতে সেই মাঠে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কুপের ধারে গিয়া ঘ্যাঘোঁকে ডাকিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ ডাকিলেন,—'ঘ্যাঘোঁ মহারাজ! ঘ্যাঘোঁ বাবু! ঘরে আছেন?' মুসলমান ডাকিলেন,—'ঘ্যাঘোঁ সাহেব! বাড়ী আছেন?' ডাকিয়া ডাকিয়া দুইজনেরই গলা ভাঙ্গিয়া গেল, তবুও ঘ্যাঘোঁ কুপ হইতে বাহির হইল না, উত্তর পর্যন্ত দিল না। দুইজনে তখন ভাবিলেন, এ তো বড়ই বিপদ! এর আবার উপায় কি করা যায়। ব্রাহ্মণ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন,—'চল, আমরা তাঁতির কাছে যাই!' বিরস-বদনে দুইজনে ফিরিলেন। পুনরায় গ্রামে আসিয়া দুইজনে তাঁতির নিকট যাইলেন। ব্রাহ্মণ তাঁতিকে বলিলেন,—'ভায়া! তোমাকে একটি উপকার করিতে হইবে। ঘ্যাঘোঁ নামে একটি ভূত আছে। সে আমার পরম বন্ধু। তাহার কানের ভিতর অতিশয় পোকা হইয়াছে, সে পোকা কিছুতেই বাহির হইতেছে না। দারুণ ক্লেশে ঘ্যাঘোঁ এখন একটি কুপের ভিতর আশ্রয় লইয়াছে। আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, তাহারই ভিতর অবস্থিতি করিতেছে। ডাকিলে উত্তর দেয় না, বাহিরেও আসে না। মনুষ্যের কানে পোকা হইলে অনেক মালোয়াতের গানে বাহির হইতে পারে, কিন্তু ভূতের কানের পোকা তোমার গান ভিন্ন কিছুতেই বাহির হইবে না। অতএব যদি তুমি একবার সেই কুপের ধারে বসিয়া একটু গান কর, তাহা হইলে বড়ই উপকৃত হইব।' এ পর্যন্ত ইচ্ছাসত্বে কেহ তাঁতির গান শুনে নাই। আজ তাহাকে গান গাওয়াইবার জন্য লোকে উৎসুক। এ অহঙ্কার রাখিবার কি আর স্থান আছে? আহ্লাদে আটখানা হইয়া তাঁতি বলিল,—'আমি এইক্ষণেই যাইতেছি। কাপড় পরিয়া আসি।' তাঁতি কাপড় পরিয়া তৎক্ষণাৎ ঘর হইতে বাহির হইল। তিন জনে পুনরায় সেই কুপাভিমুখে চলিলেন। কুপের ধারে পৌঁছিয়া, তাঁতি আসন করিয়া গান আরম্ভ করিলেন; ব্রাহ্মণ ও আমীর কানে অঙ্গুলি দিয়া কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া দাঁড়াইলেন। যখন তাঁতির গান কুপের ভিতর গিয়া প্রবেশ করিল, তখন ঘ্যাঘোঁ ভাবিল,—'মনের খেদে জ্বর-জ্বর হইয়া বিরলে কুপের

ভিতর বসিয়া আছি, এখানে আজ আবার এ কি ভীষণ ব্যাপার! সে কালে কবির চিতেন শুনিয়াও প্রাণ ধরিতে পারিয়াছিলাম, তাহাতেও প্রাণ বাহির হয় নাই; আজ যে দেখিতেছি, মহাপ্রাণী ধড়ফড় করিয়া বাহির হয়।' ঘ্যাঘোঁ তবুও কিন্তু সহজে কুপ হইতে বাহির হয় নাই। যখন দেখিল, তাঁতির গানে নিতান্তই প্রাণ বাহির হইয়া যায়, তখন করে কি? কাজেই বাহির হইতে হইল। হামাগুড়ি দিয়া কুপ হইতে বাহির হইল। ঘ্যাঘোঁ বেঁটে-খেঁটে, হাড়-ওঠা বুড়ো-সুড়ো ভূত। মনের খেদে দেহ তার এতই জ্বর-জ্বর হইয়াছিল যে, তাহার চক্ষু, মুখ, নাসিকা হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল।

কুপ হইতে বাহির হইয়া ভূত একদিকে উর্ধশ্বাসে পলাইবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে ব্রাহ্মণ ও আমীর আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। ব্রাহ্মণ তাহাকে বলিলেন,—'ঘ্যাঘোঁ, তুমি পলাইও না, তোমার ভয় নাই, ঐ দেখ তাঁতি ভায়া চুপ করিয়াছে। আর পলাইবে বা কোথা? যেখানে যাইবে, সেইখানে গিয়া তাঁতি ভায়া গান জুড়িয়া দিবেন। তার চেয়ে, তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্য সত্য উত্তর দাও, আমরা তাঁতি ভায়াকে লইয়া ঘরে ফিরিয়া যাই। ঘ্যাঘোঁ ব্রাহ্মণের মুখপানে চাহিল, তাঁতির মুখপানে চাহিল। দেখিল, গলা পরিষ্কার করিয়া তাঁতি আর একটি গান আরম্ভ করিবার উদ্যোগ করিতেছে। তাহা দেখিয়াই ঘ্যাঘোঁর আত্মা-পুরুষ শুকাইয়া যাইল। সে বলিল,—'আচ্ছা কি বলিবে বল, কি জিজ্ঞাসা করিবে? ব্রাহ্মণ বলিল,—'লুল্লু নামক তোমাদের যে ভূত আছে, সে এই আমীরের স্ত্রীকে লইয়া গিয়াছে। কোথায় রাখিয়াছে, তুমি বলিতে পার? আর কি করিয়াই বা তাহার উদ্ধার হয়?' ঘ্যাঘোঁ বলিল, 'অনেক দিন ধরিয়া ঘোর দুঃখে জ্বর-জ্বর হইয়া আমি এই কুপের ভিতর বসিয়া আছি। সংসারের সংবাদ বড় কিছু রাখি নাই। তবে তাঁতির গান যদি আর না শুনাও, তাহা হইলে অনুসন্ধান করিয়া বলিতে পারি।

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—'অনুসন্ধান করিতে যাই বলিয়া তুমি পালাইয়া যাইবে, শেষে আর তোমার দেখা পাইব না। আমরা তেমন বোকা নই যে, তোমাকে ছাড়িয়া দিব।' ঘ্যাঘোঁ উত্তর করিল,—'পালাইয়া আর কোথায় যাইব? যেখানে যাইব, সেইখানে গিয়া তোমার তাঁতির গান জুড়িয়া দিবে। তাছাড়া আমীরের স্ত্রী কোথায়, অনুসন্ধান না করিয়াই বা আমি কি করিয়া বলি?' ব্রাহ্মণ বলিলেন,—'সত্য কর যে, শীঘ্র ফিরিয়া আসিবে?' ঘ্যাঘোঁ বলিল,—'আমি সত্য বলিতেছি, শীঘ্র ফিরিয়া আসিব।' তখন ব্রাহ্মণ বলিলেন,—'আচ্ছা, তবে যাও, শীঘ্র আসিও, আমরা এখানে বসিয়া রহিলাম।' ঘ্যাঘোঁ বলিলেন,—'রও, আমি আমার বড় নাগড়া জুতা জোড়াটি পায়ে দিয়া আসি। সে জুতাটি পায়ে দিলে আমি বাতাসের উপর উত্তম চলিতে পারি। মুহূর্তের মধ্যে সমুদয় ভারতভূমি ভ্রমণ করিতে পারি।' এই বলিয়া ঘ্যাঘোঁ পুনরায় কুপের ভিতর যাইল, নাগড়া জুতা পায়ে দিয়া বাহিরে আসিল, বাতাসের উপর উঠিয়া হন্ হন্ করিয়া দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল; শীঘ্রই অদৃশ্য হইয়া গেল। ব্রাহ্মণ, আমীর ও তাঁতি সেইখানে বসিয়া রহিলেন। ঘ্যাঘোঁ ফিরিয়া আসে কি না, এই কথা লইয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন। সকলেই একদৃষ্টে আকাশপানে চাহিয়া

রহিলেন। 'কখন্ আসে—কখন্ আসে' এই মনে মনে করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে আমীর বলিয়া উঠিলেন—'ঐ আসিতেছে, ঐ যেন উত্তর দিকে কালো দাগটির মত কি দেখা যাইতেছে।' নিকটবর্তী হইলে সকলেই বলিয়া উঠিলেন—'ঘ্যাঁঘোঁ বটে, নাগরা জুতা পরিয়া ঘ্যাঁঘোঁ আসিতেছে।' ঘ্যাঁঘোঁ নিকটে আসিলে সকলেই তাহার মহা সমাদর করিলেন। সকলেই বলিলেন,—'ঘ্যাঁঘোঁ! তুমি সত্যবাদী বটে! মনোদুঃখে জ্বর-জ্বর হইয়াও তুমি আপনার সত্য রক্ষা করিয়াছ। এখন বল, সংবাদ মঙ্গল তো?' ঘ্যাঁঘোঁ বলিল,—'সু-সমাচার বটে, আমীরের স্ত্রীর আমি সন্ধান পাইয়াছি।' সকলে বলিলেন,—'তবে শীঘ্র বল, আমীরের স্ত্রী এক্ষণে কোথায়? সে ভাল আছে তো?'

ঘ্যাঁঘোঁ বলিল,—'হিমলায়-প্রদেশে ভীততাল নামক একটি হ্রদ আছে। হ্রদের ভিতর পাহাড়ের গায় লুল্লু একটি ঘর খুলিয়াছে। জলে ডুব দিয়া তবে সে ঘরের ভিতর যাইতে পারা যায়, অন্য পথ নাই। তাহার ভিতর লুল্লু আমীরের স্ত্রীকে লুকাইয়া রাখিয়াছে। সেই 'সে' বিহনে অশোকবনে সীতা যেরূপ কাঁদিয়াছিলেন, সেই ঘরের ভিতর একাকিনী বসিয়া আমীরের রমণীও সেইরূপ কাঁদিতেছেন, তা বলিতে পারি না। লুল্লু আমাদের একটি সভ্য ভব্য নব্য ভূত। সে লইয়া গিয়াছে, তার আবার কান্না কি? লুল্লু তাহাকে এক বৎসরকাল সময় দিয়াছে। এক বৎসরের মধ্যে যদি শান্ত হইয়া তাহাকে নিকা না করে, তাহা হইলে তাহাকে মারিয়া ফেলিবে। কথা এই, মনুষ্যের সাধ্য নাই যে, হ্রদের ভিতর প্রবেশ করে, প্রবেশ করিয়া লুল্লুর ঘরের ভিতরে যায়। আমরা ভূত হইয়া ভূতের বিপক্ষতা করিতে পারি না; তাহা হইলে ভূত সমাজে আর মুখ দেখাইবার যো থাকিবে না। তবে এই মাত্র বলিয়া দিতে পারি যে, যদি তোমরা একটি হৃষ্ট-পুষ্ট ভূত ধরিয়া তাহার তেল বাহির করিতে পার, আর যদি সেই তেল মাখিয়া জলে প্রবেশ কর, তাহা হইলে লুল্লুর ঘরে পৌঁছিতে পারিবে। তারপর কৌশল করিয়া আমীরের স্ত্রীকে উদ্ধার করিও। তা বলিয়া যেন আমাকে ধরিয়া তেল বাহির করিও না। মনের খেদে জ্বর-জ্বর আছিই, তার উপর আবার তাঁতির গান শুনিয়া আমার শরীর আর শরীর নাই, একবিন্দুও তেল বাহির হইবে না। তবে এক কাজ কর, এই মাঠের প্রান্তভাগে একটি গাছ আছে। সেই গাছে গোঁগোঁ নামে একটি গলায়-দড়ি ভূত বাস করে। নিকটে গ্রামের লোককে গলায় দড়ি দিয়া মরিতে সে প্রবৃত্তি দিয়া থাকে। যে কেহ তাহার প্রলোভনে পতিত হয়, সে এই গাছে আসিয়া গলায় দড়ি দিয়া মরে। শীঘ্র শীঘ্র মৃত্যু হইবে বলিয়া, এই ভূত তখন তাহাদের পা ধরিয়া ঝুলিয়া পড়ে। তোমরা যদি এই ভূতটিকে ধরিয়া তেল বাহির কর, তাহা হইলে আমি বড়ই সন্তোষ লাভ করি। কারণ, সে দুরাচার আমার পরম শত্রু। আমার যেখানে বিবাহের সম্বন্ধ হয়, সে গিয়া ভেংচী দিয়া আসে। পেতিনী, শঙ্খচুর্ণী, চুড়েল প্রভৃতি নানাপ্রকার ভূতিনীদিগের সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল। দুই এক স্থানে কন্যাও দেখিতে গিয়াছিলাম, কন্যা দেখিয়া মনও মোহিত হইয়াছে, কিন্তু এই দুরাচার গিয়া কন্যার পিতামাতার কাছে আমার নানারূপ কুৎসা করে। সে জন্য—দুঃখের কথা বলিব কি! ভূতগিরি করিতে করিতে বুড়া হইয়া যাইলাম, আজ

পর্যন্ত আমার বিবাহ হয় নাই। সংসারে আমি আধখানা হইয়া আছি, পুরা ঘ্যাঘোঁ হইতে পারিলাম না। আর কত লোক দশটা কুড়িটা বিবাহ করিয়া ষোল আনার চেয়ে বেশী হইয়া পড়ে। সে যাহা হউক, মনুষ্যের দ্বারা ভূত ধরা কিছু সহজ কথা নয়। সে কালের মত এখন আর রোজা নাই যে, ভূত ধরিয়া পাল্কির বেহারা করিবে, কি গাড়ীতে যুড়িয়া দিবে। কৌশল করিয়া ধরিও।

'বিবাহের কথা মনে করিয়া আমার প্রাণ এখন বড়ই হু হু করিতেছে। একটি পরমরূপবতী ভূতিনীর সঙ্গে আমার বিবাহের কথা হইয়াছিল। তাহার রূপের কথা আর বলিব কি? তাহার নাকটি দেখিয়াই আমার মন একেবারে মুগ্ধ হইয়াছিল। ও হো নাকেশ্বরী! তোমাকে না দেখিয়া প্রাণ যে আর ধরিতে পারি না! একবার তোমার ছবিখানি দেখিয়া প্রাণ শান্ত করি। আমিও দেখি, তোমরাও দেখ, দেখিয়া চক্ষু জুড়াও।'

ষষ্ঠ অধ্যায় – ভূতের তেল

নাকেশ্বরীর ছবি দেখিয়া ঘ্যাঘোঁর প্রাণ কিঞ্চিৎ শান্ত হইল; সে একে একে সকলের করমর্দন করিয়া প্রস্থান করিল! তখন আমীর,—ব্রাহ্মণ ও তাঁতিকে বলিলেন,—আপনাদিগকে আমি অনেক কষ্ট দিয়াছি। ঘর-সংসার ছাড়িয়া আপনারা আমার সঙ্গে ঘুরিতেছেন। আর আপনাদিগকে আমি ক্লেশ দিতে ইচ্ছা করি না। আপনারা বাটী ফিরিয়া যান, আমার কপালে যাহা আছে, তাহা হইবে। কিন্তু ব্রাহ্মণ ও তাঁতি কিছুতেই আমীরকে একলা ফেলিয়া যাইতে চাহিলেন না। আমীরের অনেক অনুনয় বিনয়ে শেষে স্বীকৃত হইয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া, বিরস বদনে দুইজনে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইহারা চলিয়া গেলে ঘ্যাঘোঁর কুপের ধারে বসিয়া আমীর অনেকক্ষণ কাঁদিতে লাগিলেন। তারপর মনকে প্রবোধ দিয়া ভাবিলেন,—'কাঁদিলে কি হইবে? এখন ভূত ধরিবার উপায় চিন্তা করি, তবে তো স্ত্রীর উদ্ধার হইবে।' অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া আমীর মাথা হইতে পাগড়ীটি খুলিলেন। পাগড়ীটি উত্তমরূপে পাকাইলেন, আর তাহার এক পাশে একটি ফাঁস করিলেন। এইরূপে সুসজ্জ হইয়া, যে আমগাছে গোঁগোঁ নামক গলায়-দড়ি ভূত থাকে, সেই দিকে চলিলেন। গাছের নিকট উপস্থিত হইয়া গাছের উপর উঠিতে লাগিলেন। অনেক দূর উঠিয়া গাছের ডালে পাগড়ীর অপর পার্শ্ব বাঁধিয়া ফাঁসটি গলায় দিতে উদ্যত হইলেন। ফাঁসটি গলায় দেন আর কি, এমন সময় চাহিয়া দেখেন যে, সেই গলায়-দড়ি ভূত সহাস্যবদনে তাঁহার সম্মুখে আর একটি ডালে বসিয়া রহিয়াছে।

ভূত বলিল,—'নে নে, শীঘ্র শীঘ্র গলায় ফাঁস পরিয়া ঝুলিয়া পড়, নীচে হইতে আমিও সেই সময় তোর পা ধরিয়া টানিব এখন, তা হইলে সত্বর তোর মৃত্যু হইবে, তাহা হইলে আমার বেকার নাতিজামাই তোর ভূতগিরি করিতে পাইবে।' আমীর কোন কথা না কহিয়া আস্তে আস্তে জেব হইতে আফিমের কৌটাটি বাহির করিলেন। কৌটাটির ঢাকনা ভূতের সম্মুখে ধরিলেন। ভূত তাহাতে উঁকি ঝুঁকি মারিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—'ওর ভিতর ও—

কে?' আমীর বলিলেন,—'একটি ভূত। গোঁগোঁ বলিল, 'ভূত! কৈ, ভাল করিয়া দেখি।' খুব ভাল করিয়া দেখিয়া গোঁগোঁর নিশ্চয় বিশ্বাস হইল যে, ভূত বটে। সে জিজ্ঞাসা করিলে,—'উহার ভিতর দুই ভূত ধরিয়া রাখিয়াছিস কেন?' আমীর বলিলেন,—'আমি একখানি খবরের কাগজ খুলিবার বাসনা করিয়াছি; সম্পাদক ও সহকারী-সম্পাদকের প্রয়োজন। ডিবের ভিতর যে ভূতটি ধরিয়া রাখিয়াছি, তাহাকে সহকারী-সম্পাদক করিব। আর তোকে মনে করিয়াছি, সম্পাদক করিব।' গোঁগোঁ বলিল,—'আমি যে লেখাপড়া জানি না।' আমীর বলিলেন,—'পাগল আর কি! লেখাপড়া জানার আবশ্যক কি? গালি দিতে জানিস তো?' গোঁগোঁ বলিল, 'ভূতদিগের মধ্যে যে সকল গালি প্রচলিত আছে, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি।' আমীর বলিলেন,—'তবে আর কি! আবার চাই কি? এতদিন লোকে মানুষ ধরিয়া সম্পাদক করিতেছিল, কিন্তু মানুষের যা কিছু গালি জানে, মায় অশ্লীল ভাষা পর্যন্ত, সব খরচ হইয়া গিয়াছে; সব বাসি হইয়া গিয়াছে। এখন দেশশুদ্ধ লোককে ভূতের গালি দিব। আমার অনেক পয়সা হইবে।' ভূত বলিল,—'তবে কি তুমি গলায় দড়ি দিয়া মরিবে না? ঐ যে পাগড়ী? ঐ যে ফাঁস?' আমীর বলিলেন,—'আমি তো আর ক্ষেপি নি যে, গলায় দড়ি দিয়া মরিব। পাগড়ী আর ফাঁস হইতেছে টোপ, ওরে বেটা! তোরে ধরিবার জন্য টোপ। যদি এ ফন্দি না করিতাম, তাহা হইলে তুই কি গাছের ভিতর হইতে বাহির হইতিস্? এখন চল, ইহার ভিতর প্রবেশ কর।' এই বলিয়া আমীর তাহাকে চণ্ডুর নলটি দেখাইলেন। ভূত জিজ্ঞাসা করিল, 'ও আবার কি?' আমীর বলিলেন, 'ইহার মান বাঘু, নে, শীঘ্র ইহার ভিতর প্রবেশ কর্।' ভূত ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া আমীর টেকোটি বাহির করিয়া 'বলিলেন,—দেখিতেছে?' ভূত জিজ্ঞাসা করিল,—'ও আবার কি?' আমীর বলিলেন,—'এর নাম আটখিল্লে। সাধু ভাষায় ইহাকে থক্ বলে। নলের ভিতরে যদি না প্রবেশ করিস, তাহা হইলে ইহা দিয়া তোর চক্ষু উপাড়িয়া লইব।' বাস্তবিক থক্‌টি তখন যেরূপ চক্ চক্ করিতে লাগিল, তাহাতে বোধ হইল যেন সে আজন্মকাল ভূতের চক্ষু তুলিয়া আসিতেছে, যেন ভূতের চক্ষু না তুলিয়া থক্ কখনও জলগ্রহণ করে না। আর যেন আমীর যদি নাও উপড়ান্ তো থক্ নিজে গিয়া সেই মুহূর্তে ভূতের চক্ষু তুলিয়া ফেলিবে। টেকোর এই প্রকট মূর্তি দেখিয়া ভূত বড়ই ভয় পাইল, ভয়ে তাহার সর্বশরীর থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। মনে করিল,—'কাজ নাই বাপু! পরের চাকর হইয়া, এডিটারি করিয়া না হয় খাইব, তা বলিয়া অন্ধ হইয়া থাকিতে পারিব না।' এই ভাবিয়া সে আপনার কলেবর হ্রাস করিল, আর সুড়সুড় করিয়া নলের ভিতর প্রবেশ করিল। নলের ছিদ্রে ভাল করিয়া সোলা আঁটিয়া দিয়া, আমীর গাছ হইতে নামিয়া আসিলেন।

আমীরের মনে এখন কিঞ্চিৎ স্ফূর্তির উদয় হইল। শিস দিতে দিতে তিনি গ্রামাভিমুখে চলিলেন, গ্রামে উপস্থিত হইয়া লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তোমাদের এ গ্রামে কলুর বাড়ী আছে?' লোকে বলিল, 'হাঁ আছে।' কলুর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া আমীর কলুকে বলিলেন,—'কলু ভায়া। আমার একটি বিশেষ উপকার করিতে হইবে। এই বাঁশের নলটির

ভিতর আমি একটি ভূত ধরিয়া আনিয়াছি, যদি অনুগ্রহ করিয়া সেই ভূতটিকে ঘানিতে মাড়িয়া তেল বাহির করিয়া দেন, তাহা হইলে আমার বড়ই উপকার হয়।' কলু বলিল,—'তার আটক কি! এখনই দিব। তিল, সরিষা, তিসি, পোস্ত, কত কি পিষিয়া তেল বাহির করিলাম, আজ একটু ভূতের তেল বাহির করিয়া দিব, সে আর কি বড় কথা। কৈ, লইয়া এস' দুই জনে ঘানিগাছের কাছে গেলেন। আমীর নল হইতে ভূতটিকে আস্তে আস্তে বাহির করিয়া ঘানিগাছের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিলেন। কলু তৎক্ষণাৎ ঘানি চালাইয়া দিলেন। কলুর বলদ মৃদুমন্দ গতিতে ঘুরিতে লাগিল। ভূতের হাড় মড় মড় করিয়া ভাঙ্গিতে লাগিল। ভূত,—'ত্রাহি মধুসূদন! ত্রাহি মধুসূদন!' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। আর বলিতে লাগিল,—'এই বুঝি তোমার এডিটারির পদ? এই বুঝি খবরের কাগজের সম্পাদকতা করা?' আমীর হাসিয়া বলিলেন,—'জান না ভায়া! সম্পাদক হইতে আমি এইরূপেই প্রবন্ধ বাহির করিয়া থাকি। কেমন! উত্তম উত্তম গালি, ভাল ভাল প্রবন্ধ, এখন মনে উদয় হইতেছে তো? গোঁগোঁ ভায়া! সেকালের হরিণের গল্পটাও কি ছাই শুন নাই? যাহাতে কথা আছে,—'ওহে ভাই শহধর! আগে এ দায়ে ত তর, তারপর কাজ কাম কর আর না কর।' ঘানি হইতে ক্রমে টপ, টপ, করিয়া জেল পড়িতে লাগিল। প্রায় এক শিশি তেল প্রস্তুত হইল। যখন ভূতের দেহ একবারে তেলশূন্য শুষ্ক হইয়া গেল, তখন বলদ থামিল, ঘানিগাছ আর ঘুরিল না। আমীর সেই ছোবড়ারূপ ভূতকে বাহির করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। বলা বাহুল্য যে, ভূত না হইয়া যদি মানুষ হইত, তাহা হইলে কোনকালে মরিয়া যাইত।

সপ্তম অধ্যায় – উদ্দেশ্য

তেলের শিশিটি পকেটে লইয়া আমীর পুনর্বার চলিলেন। যাইতে যাইতে কত পথ চলিয়া অবশেষে হিমালয়ের তলভাগে গিয়া উপস্থিত হইলেন। হিমালয়ের উপর উঠিয়া কত চড়াই উতরাইয়ের পর ভীমতাল দেখিতে পাইলেন। ভীমতালের চারিদিকে ঘুরিয়া ঘ্যাঁঘোঁ যেরূপ নির্দেশ করিয়া দিয়াছিল, সেই স্থানটিতে গিয়া বসিলেন। জানিলেন, এই স্থানটিতে ডুব মারিতে হইবে, ইহার নীচেতেই লুল্লুর ঘর। সেই স্থানে বসিয়া, শিশিটি বাহির করিয়া উত্তমরূপে সর্বশরীরে ভূতের তেল মর্দ্দন করিলেন। তেল মাখিয়া তাঁহার শরীরে যে কেবল আসুরিক বল হইল তাহা নহে দেহ এত লঘু হইল, যেন তিনি পাখীর মত উড়িতে পারেন। তেল মাখা হইলে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, আর 'বিসমিল্লা' বলিয়া জলে ঝাঁপ দিলেন। জলে ডুব মারিয়া ক্রমেই নীচে যাইতে লাগিলেন। পাতাল পর্যন্ত তত দূর যাইতে হয় নাই, কিন্তু অনেক, অনেক দূর গিয়া পাহাড়ের গায়ে একটি ছিদ্র দেখিতে পাইলেন। সেই ছিদ্রের ভিতর প্রবেশ করিতেই একেবারে শুষ্ক ভূমিতে পদার্পণ করিলেন। সেখানে আলোর অভাব ছিল না। উত্তম দিনের আলো ছিল। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া বাসস্থানের মত পাহাড়ের গায়ে অনেকগুলি গর্ত দেখিতে পাইলেন, কিন্তু কি মনুষ্য, কি ভূত কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। মনে মনে ভাবিলেন,—'এখনও দিন রহিয়াছে, এত প্রকাশ্যভাবে

এখানে বিচরণ করা ভাল নয়। রাত্রি হইলে সকল সন্ধান লইব।' এই মনে করিয়া একটি ছোট গর্তে লুকাইয়া রহিলেন।

জলে ডুব দিয়া যে শুষ্ক ঘরের ভিতর প্রবেশ করা যায়, এ কথা শুনিয়া কেহ যেন অবাক হইলেন না। লোকে পাছে ভাবেন যে, আমি যাহা লিখিতেছি, তাহা অলীক গল্পকথা, সেজন্য আমাকে ঐতিহাসিক প্রমাণ দিতে হইল। আকবরের সময় একজন লাহোরে এরূপ একটি ঘর নির্মাণ করিয়াছিল যে, নিকটস্থ একটি জলাশয়ের জলে ডুব না দিয়া সে ঘরে যাইবার আর অন্য পথ ছিল না। আগ্রাতে জাহাঙ্গীর বাদশাহও এইরূপ একটি ঘর দেখিয়াছিলেন। ওয়াকিয়াত ই-জাহাঙ্গীরি নামক পুস্তকে জাহাঙ্গীর লিখিয়াছেন,—'আমার পিতার সময় লাহোর নগরে যেরূপ একটি জল-গৃহ নির্মিত হইয়াছিল, সেইরূপ একটি জল-গৃহ দেখিতে রবিবার দিন হাকিম আলির বাটিতে গিয়াছিলাম। আমার সহিত কতকগুলি পরিষদও ছিল, তাহারা এরূপ গৃহ কখনও দেখে নাই। জলাশয়টি দীর্ঘে প্রস্থে প্রায় ছয় গজ, ইহার পাশে একটি কামরা, যাহাতে উত্তমরূপ আলো ছিল, এবং যাহার ভিতর যাইতে হইলে এই জলের ভিতর দিয়া ভিন্ন অন্য পথ ছিল না! কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই কামরায় একবিন্দুও জল প্রবেশ করিতে পারে না। কামরায় দশ বার জন লোক বসিতে পারে! ইহার ভিতর হাকিম আমাকে টাকা ও বহুমূল্য দ্রব্যাদি উপঢৌকন দিলেন। কামরা দেখিয়া আমি বাটী ফিরিয়া আসিলাম। হাকিমকে পুরস্কারস্বরূপ দুহাজারীর পদে নিযুক্ত করিলাম।' এক্ষণে ইতিহাস দ্বারাও গল্পটি সত্য বলিয়া প্রমাণ হইল। পৃথিবীতে যে কত অদ্ভুত বিষয় আছে, তাহা শুনিলে অবাক হইতে হয়।

আমীর পাহাড়ের গর্তে লুকাইয়া রহিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইল, যখন কতক রাত্রি গত হইয়া গেল, তখন সেই গিরিগহ্বরে সহসা তুমুল ঝড় উঠিল। কিয়ৎক্ষণ পরে জলের ভিতরও ভয়ানক শব্দ হইতে লাগিল। আমীর কান পাতিয়া শুনিলেন, কে যেন জল ফুঁড়িয়া উপরে যাইতেছে। ভাবিলেন,—'রাত্রি হইয়াছে, এইবার ভূত বুঝি চরিতে যাইতেছে।' যখন পুনরায় সে স্থান নিঃশব্দ হইল, তখন আমীর আস্তে আস্তে গর্ত হইতে বাহির হইলেন। অতি সাবধানে, এ ঘর সে ঘর, সে গর্ত খুঁজিতে লাগিলেন। খুঁজিতে খুঁজিতে অতি দূরে একটি সামান্য আলো তাঁহার নয়ন-গোচর হইল। সেইদিক পানে গিয়া দেখিলেন, অপেক্ষাকৃত এক বৃহৎ ঘরের ভিতর একটি প্রদীপ মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। সেই প্রদীপের কাছে গালে হাত দিয়া, মস্তক অবনত করিয়া, এক মলিন-বসনা বিরস-বদনা ললনা বসিয়া রহিয়াছেন। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া আমীর চিনিতে পারিলেন যে, এই রমণী তাঁহারই স্ত্রী। স্ত্রীকে দেখিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে যেন হাতুড়ির ঘা পড়িতে লাগিল। এমনি হৃদয়ে আবেগ উপস্থিত হইল যে, মনে করিলেন, এখনি দৌড়িয়া গিয়া ধরি, আর বলি,—'প্রিয়তমে! জানি! আর ভয় নাই, আমি আসিয়াছি, আমি তোমার আমীর আসিয়াছি।' কিন্তু আপনাকে সংবরণ করিলেন, মনে করিলেন,—'ভয় নাই কিসে? এখনও তো আমরা ভূতের হাতে! এখনও তো স্ত্রীকে উদ্ধার করিতে পারি নাই! স্ত্রীর দেখিতেছি, শীর্ণ দেহ, মলিন মুখ। বোধ

হয়, আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছে। একেবারে দেখা দেওয়া হইবে না। আমি যে এখানে আসিয়াছি, ক্রমে জানিতে দিব।' এই ভাবিয়া কিছুক্ষণের নিমিত্ত আমীর একটু অন্তরালে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমীর-রমণী কাঁদিতেছিলেন। অবিরল ধারায় অশ্রুস্রোত তাঁহার নয়নযুগল হইতে বহিতেছিল। মাঝে মাঝে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে ছিলেন, এক একবার চক্ষু মুছিতেছিলেন, কখনও কখনও অপরিস্ফুট ভাষায় খেদোক্তিও করিতেছিলেন। বলিতেছিলেন,—'হায়! আমার দশা কি হইল! শয়তানের হাতে পড়িয়া আমার জাতিকুল সকলি মজিতে বসিল। ধর্ম বিনা স্ত্রীলোকের আর পৃথিবীতে আছে কি? ভূতই হউক আর শয়তানই হউক, এ ধর্ম আমি তাহাকে কখনই বিনাশ করিতে দিব না। সে দুর্বৃত্ত অঙ্গীকার করিয়াছে, এক বৎসর কাল আমাকে কিছু বলিবে না। এই এক বৎসরের মধ্যে দুর্বলের বল, নিঃসহায়ের সহায়, ঈশ্বর কি আমায় পাপিষ্ঠের হাত হইতে মুক্ত করিবেন না? আমীর! আমীর। একবার আসিয়া দেখ, আমার কি দশা হইয়াছে।' আমীর আস্তে আস্তে বলিলেন,—'ভয় নাই, ঈশ্বর তোমার প্রতি কৃপা করিয়াছেন, আমি আসিয়াছি।' আমীর রমণী চমকিত হইয়া মুখ তুলিলেন। চক্ষুদ্বয় তখন তাঁহার জলে প্লাবিত ছিল, কিছুই দেখিতে পাইলেন না। ভাবিলেন, মনের ভ্রান্তিবশতই তিনি এরূপ শব্দ শুনিলেন। তবুও মনে একটু আশার সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু সহসা চক্ষু মুছিতে সাহস করিতেছিলেন না; পাছে সত্য সত্যই ভ্রান্তি হইয়া পড়ে, পাছে সে আশাকণাটুকুও উড়িয়া যায়। আমীর কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেন, বলিলেন,—'চাহিয়া দেখ! সত্য সত্যই আমি আসিয়াছি। ভয় নাই, ঈশ্বরের কৃপায় নিশ্চয় এ ঘোর বিপদ হইতে আমরা মুক্ত হইব।' এই বলিয়া একেবারে স্ত্রীর নিকটে গিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিলেন স্ত্রীও তাঁহার গলা ধরিলেন: এইভাবে বসিয়া দুইজনে অনেকক্ষণ নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন।

তাহার পর আমীর চক্ষু মুছিয়া বলিলেন,—'আর কাঁদিও না। এখন এখানকার সকল কথা আমাকে বল। প্রথম আমাকে বল, ভূত তোমাকে কি করিয়া ধরিয়া আনিল। আমীর রমণী বলিলেন,—'তাহার আমি কিছুই জানি না। ঘরের ভিতর হইতে যেই বাহিরে আসিয়া পা দিলাম, তুমি কি ভিতর হইতে বলিলে, শুনিতে পাইলাম। তার পর যেন একটা ঝড় আসিয়া আমাকে একেবারে ভূমি হইতে উঠাইয়া লইল, একেবারে শূন্যে তুলিয়া ফেলিল, একেবারে উড়াইয়া লইয়া চলিল। আমি অজ্ঞান সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িলাম। কতক্ষণ অজ্ঞান ছিলাম, বলিতে পারি না। যখন প্রভাত হইল, চক্ষু মেলিয়া দেখি, দিন হইয়াছে। সম্মুখে এক বিকটমূর্তি বিষমদেহ নরাকার রাক্ষস। তাহাকে দেখিয়া পুনর্বার অজ্ঞান হইয়া যাইলাম। তারপর পুনরায় যখন জ্ঞান হইল, তখন দেখিলাম, রাত্রি হইয়াছে, ঘরে আর কেহ নাই, একেলা পড়িয়া আছি। এই প্রদীপটি মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতে, নানারূপ আহারীয় দ্রব্য ঘরে রহিয়াছে? আমি কিন্তু কিছুই খাইলাম না। মনে করিলাম, অনাহারে প্রাণত্যাগ করিব। তাহার পরদিবস প্রাতঃকালে সেই বিকটমূর্তি আবার আমার কাছে আসিল। এবার আমি তাহাকে দেখিয়া অজ্ঞান হই নাই। বড়ই ভয় হইয়াছিল সত্য, অজ্ঞান

হইবার উপক্রমও হইয়াছিল সত্য, কিন্তু সাহস করিয়া বুক বাঁধিলাম। মনে করিলাম, শুনিতে হইবে সে কে, আর কেনই বা আমাকে এখানে লইয়া আসিয়াছে। সেই বিকটমূর্তি আমার নিকট আসিয়া বলিল,—'সুন্দরি! এক্ষণে আর তুমি আমীরের রমণী নও, এক্ষণে তুমি আমার গৃহিণী। তোমার স্বামী নিজে তোমায় আমাকে দান করিয়াছে। এখন আমার এই সমুদয় ঘরকন্না তোমার! অনুমতি হইলেই এইক্ষণেই আমাদের কাজিকে ডাকিয়া আনি, তিনি আমার সহিত তোমার নিকা দিয়া দিবেন।' সাহসের উপর ভর করিয়া আমি বলিলাম,—'তুমি কে? স্বামী আমায় তোমাকে কি করিয়া দিলেন?' সে বলিল,—'আমি ভূত। আমার নাম লুল্লু। আমি সামান্য ভূত। আর এই ধনসম্পত্তি, এই গিরিগহ্বর আমার; আমি দুখিরাম চণ্ডালের ভূতগিরি করিতেছি। ভূত-সমাজে আমি অতি প্রবল, পরাক্রান্ত বলিয়া পরিচিত, আমার মান মর্যাদা রাখিতে আর স্থান নাই।' আমি বলিলাম,—'স্বামী আমায় তোমাকে দিয়াছেন, এ কথা একেবারেই মিথ্যা। তারপর মানবী হইয়া ভূতের রমণী কবে কে হইয়াছে? দেখ, আমরা খোদা-পরস্ত মুসলমান, ভূতপরস্তদিগের মত শয়তানের শাগরেদ নই। আমার প্রতি অত্যাচার করিলে খোদা তোমাকে দণ্ড করিবেন।'

"এইরূপ প্রতিদিন ভূতের সহিত বাদানুবাদ হয়। ভূত কিন্তু আমার গায়ে হাত দিতে সাহস করে নাই। প্রথম কয়েক দিন আমি আহার-নিদ্রা একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। তারপর যখন দেখিলাম যে, আপাততঃ ভূত আমার প্রতি বিশেষ কোনরূপ অত্যাচার করিতে সাহস করিতেছে না, তখন আহার করিতে লাগিলাম। মনে ভাবিলাম, ভূত শাসন করিবার নিমিত্ত নানারূপ তাবিজ আছে। আনিলদিগের নিকট হইতে তাহা আনিয়া নিশ্চয় তুমি আমায় উদ্ধার করিবে! ভূত প্রতিদিন আসে আর বলে,—কেমন, আজ কাজি আনি? প্রতিদিন দেখিয়া দেখিয়া, এখন তাহাকে দেখিলে আর আমায় বড় ভয় হয় না, পূর্বেকার চেয়ে মনে সাহসও অনেক হইয়াছে। নিকা করিবার কথা বলিলেন, এখন তাহাকে একপ্রকার দূর দূর করিয়া দিই। একদিন কিন্তু সে ভয়ানক রাগিয়া গেল। শরীর ফুলিয়া দ্বিগুণ হইল, ভূত না হইলে হয়তো ফাটিয়া মরিয়া যাইত। সমুদয় শরীর হইতে অগ্নিকণা বাহির হইতে লাগিল। রাগে নিজের হাতটি খুলিয়া লইল, অপর হাত দিয়া ভোঁ ভোঁ করিয়া ঘুরাইতে লাগিল। পা দুইটা খুলিয়া লইল আর সেইরূপ ঘুরাইল। দুইটি হাত, দুইটি পা ঘুরান হইলে চক্ষু-কোটর হইতে চক্ষু দুইটি বাহির করিয়া লইল, আর যেরূপ লোকে ভাঁটা লুফিয়া থাকে, সেইরূপ দুই হাতে লুফিতে লাগিল। তারপর সমস্ত মুণ্ডটি খুলিয়া লইল, হাতে লইয়া বলিল, 'সুন্দরি! যদি তুমি আমাকে বিবাহ না কর, তাহা হইলে তোমার সাক্ষাতে আমি এই আপনার মুণ্ডটি আপনি চিবাইয়া খাইব।' কি করিয়া নিজের মুণ্ড নিজে খাইবে, তাহা কিন্তু আমি বুঝিতে পারিলাম না। সে যাহা হউক, আমি বলিলাম,—'তুমি নিজের মুণ্ড নিজেই খাও, আর পরেই খা'ক, আমি কেন ভূতকে বিবাহ করিতে যাইব? ভাল চাও তো আমাকে ঘরে রাখিয়া এস।' তখন সে বলিল,—'আচ্ছা! আজ আমি তোমাকে কিছু বলিলাম না। আজ হইতে এক বৎসর কাল তোমাকে কিছু বলিব

না। এক বৎসর পরে আমাকে নিকা কর ভালই, না কর তোমাকে প্রাণে মারিয়া ফেলিব। তোমার স্বামী তোমায় আমাকে দিয়াছে, আমি তোমাকে লইয়া যাহা ইচ্ছা করিব। মনে করিও না আর কখনও তোমার স্বামীকে তোমায় ফিরিয়া দিব। সেইদিন হইতে আর আমাকে বিরক্ত করে না। রাত্রি হইলে চরিতে যায়, সকাল হইলে বাড়ী আসে, পরে ঐ বড় গর্তটিতে শুইয়া সমস্ত দিন নিদ্রা যায়। মেঘ গর্জনের ন্যায় নাক ডাকার শব্দ শুনিতে পাই, আমার কাছে বড় আসে না। কেবল তিন চার দিন অন্তর একবার আসিয়া আহারীয় সামগ্রী দিয়া যায়, আর জিজ্ঞাসা করে,—'কেমন, এখন তোমার মন শান্ত হইয়াছে ত? কাজি আনিব কি?' গতবার আসিয়া বলিল,—'দেখ, এখন আমি সাবাং মাখিতে আরম্ভ করিয়াছি। রোজ সাবাং মাখি। রং অনেক ফরসা হইয়া আসিয়াছে। আর কিছু দিন পরে লোকে আমাকে আর চিনিতে পারিবে না। যেখানে যাইব, সকলে বলিবে, 'লুল্লু নয়, এ সাহেব ভূত। কোন লর্ডের ছেলে হইবে। তখন তুমি আবার আমাকে বিবাহ না করিয়া থাকিতে পারিবে না। তখন তুমি বলিবে 'আমার লুল্লু কই? আমার লুল্লু কোথা গেল? তখন তুমি বলিবে, আর বিলম্ব সহে না, শীঘ্র কাজি ডাক, শীঘ্র আমাকে নিকা কর।' কিন্তু তা আমি করিব না। তখন আমি নলপতঃ করিব। নিকা করিবার জন্য তুমি আমার সাধ্যসাধনা করিবে, তা দেখিয়া আমি বড়ই সন্তোষ লাভ করিব। মনে করিব, এ আমাকে বড়ই ভালবাসে, আমি ইহার জীবনসর্বস্ব। সকল ভূতেই বলে যে লুল্লু সভ্য ভব্য নব্য ভূত। আমি আর আমার গেঁটে দাদা, দুইজনেই সভ্য ভব্য নব্য। দেখিতে পাও তো, ভোর না হইলে কখনও বাড়ী আসি না। যাই, এখন সাবাং মাখিগে।' এই কথা বলিয়া সে চলিয়া গিয়াছে। দু-একদিনের মধ্যে আবার বোধহয় আসিবে।'

আমীর জিজ্ঞাসা করিলেন,—'ইহা কি ভূতের মেস্ না মুফলিসের বাড়ী? অর্থাৎ কিনা, এখানে অপরাপর ভূত থাকে, না লুল্লু একেলা থাকে?' আমীর-রমণী বলিলেন যে,— 'এখানে লুল্লু ভিন্ন আর কোন ভূতকে দেখি নাই! লুল্লু একেলা থাকে, এই আমার বিশ্বাস।' আমীর বলিলেন,—'এখন সকল কথা বুঝিলাম, ঈশ্বর আমাদের প্রতি কৃপা করিবেন। কিন্তু কিরূপে যে বিপদ হইতে উদ্ধার হইব, তাহা জানি না। আপাতত আমার বড়ই ক্ষুধা পাইয়াছে। যদি কিছু খাবার থাকে তাহা হইলে আমাকে দাও।' আমীর-রমণী বলিলেন,— 'খাবরের এখানে কিছুমাত্র অভাব নাই। ভূত প্রচুর পরিমাণে সে সকল আনিয়া দেয়।' এই বলিয়া তিনি পোলাও, কালিয়া, কুর্মা, কোপ্তা, কাবাব, কারি আনিয়া স্বামীকে উত্তমরূপে আহার করাইলেন।

অষ্টম অধ্যায় – চণ্ডু-মাহাত্ম্য

আহারান্তে বিছানায় শুইয়া আমীর নল দ্বারা চণ্ডুধূম পান করিতে লাগিলেন, আর ভাবিতে লাগিলেন,—'কি করিয়া স্ত্রীকে ভূতের হাত হইতে উদ্ধার করি।' ধূমপান করিতে করিতে স্ত্রীকে বলিলেন,—'এ বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার নিমিত্ত আমি এক উপায় স্থির

করিয়াছি তুমি কি বল? লুল্লু সভ্য ভব্য নব্য ভূত। ভূতের তেল মাখিয়া যদিচ আমার শরীরে ভূতের বল হইয়াছে, তথাপি তাহার সহিত বোধ হয় সম্মুখ-সংগ্রামে আমি জয়লাভ করিতে পারিব না। বিশেষতঃ, ঘ্যাঘোঁ আমাকে বলিয়া দিয়াছে,—'কৌশল করিয়া স্ত্রীর উদ্ধার করিও।' সে জন্য তুমি একটি কাজ কর। অল্প অল্প লুল্লুকে প্রশ্রয় দাও। দিনকতকাল তাহাকে চণ্ডুর ধূম্রপান করাও! তারপর কি হয় বুঝা যাইবে। গোকুলের বাঁকা কালাচাঁদের সহিত পরিণয় করিলে রক্ষা আছে, কিন্তু আফিম-কালাচাঁদের সহিত প্রেম করিলে আর রক্ষা নাই। চণ্ডুর পরিণয়ে তুমি তাহাকে আবদ্ধ কর। আমার সমুদয় সরঞ্জাম তোমার নিকট রাখিয়া যাইব। দিনকতকাল কাঁচা আফিম খাইয়া না হয়, কষ্টেশ্রেষ্ঠে কাল কাটাইব।' আমীর-রমণী বলিলেন,—'এ পরামর্শ মন্দ নয়।'

এইরূপ কথোপকথনে নিশা অবসান প্রায় হইল। তখন আমীর রমণী বলিলেন,—'আর তুমি এখানে থাকিও না। ভূতের আসিবার সময় হইয়াছে! ভূত চরিতে গেলে, কাল আবার রাত্রিতে আসিও। চণ্ডুর আসবাব রাখিয়া যাও। দেখি কি করিতে পারি। কিছু খাবার দাবার সঙ্গে লইয়া যাও, দিনের বেলায় খাইবে।' আমীর, স্ত্রীর নিকট বিদায় লইয়া পুনরায় সেই গর্তে গিয়া লুকাইয়া রহিলেন।

প্রাতঃকাল হইতে হইতে ভূত বাটী ফিরিয়া আসিয়াই, প্রথমে আপনার গর্তে গিয়া শুইল। ঘোরতর নাক ডাকাইয়া অনেকক্ষণ নিদ্রা যাইল। তারপর উঠিয়া হ্রদের জলে স্নান করিতে যাইল। পাথর দিয়া, ঝামা দিয়া, বালি দিয়া, সাবাং দিয়া উত্তমরূপে গা মাজিল। শরীরের নানাস্থানে রক্ত ফুটিয়া পড়িতে লাগিল। আপনা আপনি বলিল,—'ক্রমে এইবার দুধে-আলতার রং হইয়া আসিতেছে?' তারপর সাজগোজ করিয়া আমীর-রমণীর নিকট গমন করিল। বলিল,—'কি সুন্দরি! দেখিতেছ? দিন দিন কি হইতেছি? দুধে আল্‌তার রং!' আমীর-রমণী বলিলেন,—'তাই তো! তোমাকে যে আর চেনা যায় না।' ভূত বলিল,—'পাথর, ঝামা, বালি, সাবাং!' আমীর-রমণী বলিলেন,—'সত্য সত্যই তুমি সভ্য ভব্য নব্য ভূত।' ভূত বলিল,—'তবে কাজি ডাকি?' আমীর-রমণী বলিলেন,—'কাজি ডাকায় আমার কিছু আপত্তি নাই, তবে কি না জান, তুমি হইলে ভূত, আমি হইলাম মানুষ, দুই জনে মিলিবে কি করিয়া তাই ভাবিতেছি। মানুষের মত একটু আধটু যদি তোমার ব্যবহার দেখি, তাহা হইলে বুঝি, হাঁ, দুইজনে পরিণয় হইতে পারিবে। এই দেখ, এত খাদ্যদ্রব্য তুমি আমাকে আনিয়া দাও, নিজে কিন্তু একদিনের জনেও একটু খুঁটিয়া মুখে দাও না। কি খাও, কি না খাও, তাহাও জানি না। সাপ খাও, কি ব্যাং খাও,—কিছুই বলিতে পারি না। হয় তো কোনদিন পচা মড়া খাইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইবে। মুখের গন্ধে আমার প্রাণ বাহির হইবে। তারপর দেখ, মানুষে পান খায়, তামাক খায়, গ্যাঁজা খায়, আরও কত কি খায়। আহা! আমার স্বামী আমীর কেমন চণ্ডু খাইতেন! কাছে বসিয়া মনের সাধে কেমন তাঁহাকে আমি চণ্ডু খাওয়াইতাম। যখন চণ্ডুর ধূম আমার নাকে প্রবেশ করিত, তখন কেমন আমি স্বর্গসুখ লাভ করিতাম। তাঁহার চণ্ডুর আসবাবগুলি আমি আমার কাঁধের ঝুলি করিয়া

রাখিয়াছিলাম। শয়নে উপবেশনে সর্বদাই আমার নিকট রাখিতাম। আহা! আজ পর্যন্ত সেই ঝুলিটি আমার কাঁধেই রহিয়াছে।' ভূত বলিল,—'বটে! তা. আমিও চণ্ডু খাইব, নিয়ে এস, এখনি খাইব।' আমীর-রমণী বলিলেন,—তাহা যদি করিতে পার তো বড় ভালই হয়। ভূত-ভূতিনীদিগের কাছে তুমি সভ্য ভব্য নব্য ভূত বটে, কিন্তু আমাদের নাকে তোমাদের গায়ের একটু গন্ধ লাগে, একটু বোট্‌কা বোট্‌কা গন্ধ। রীতিমত চণ্ডুটি খাওয়া অভ্যাস করিতে পারিলে, আর তোমার গায়ে সে গন্ধ থাকিবে না, মানুষেণ গন্ধ হইবে। ভূত বলিল,—'তা দাও, খাইব।' আমীর রমণী বলিলেন,—'কাঁচা আফিম হউক, কি গুলি হউক, কি চণ্ডু হউক, অল্প অল্প করিয়া খাইতে অভ্যাস করিতে হয়। একেবারে অধিক খাইলে অসুখ করে। তোমার অসুখ করিলে প্রাণে আমি বড়ই ব্যাথা পাইব। কারণ, তোমার প্রতি এখন আমার নব অনুরাগ বই তো নয়? যাহা হউক, চণ্ডু শুইয়া খাইতে হয়। মূর্খ লোকের বিশ্বাস এই যে, চণ্ডু একবার টানিলেই অচেতন হইয়া পড়ে বলিয়া, সকলে ইহা শুইয়া খায়। তাহা নহে শুইয়া খাইতে বাগ হয় বলিয়া খায়।' এই বলিয়া আমীর-রমণী চণ্ডুর আসবাব বাহির করিয়া দিলেন। প্রদীপের নিকট ঘরের এক পার্শ্বে মাটীতে শুইয়া তাহাকে ধূমপান করিতে বলিলেন, কি করিয়া খাইতে হয়, তাহাও বলিয়া দিলেন। সে অল্প অল্প ধূমপান করিলে, আমীর-রমণী বলিলেন,—'এখন আর নয়, চরিতে যাইবার পূর্বে পুনরায় ও-বেলা আসিয়া খাইও কিছু কি টের পাইতেছ?' ভূত বলিল,—'আর কিছু টের পাইতেছি না কেবল গা চুলকাইতেছে, আর একটু বমী বমী করিতেছে।' আমীর-রমণী বলিল,—'ঐটুকুই এর আয়েস, একেই নেশা বলে।' ভূত তখন চলিয়া গেল। পুনরায় সন্ধ্যাবেলা আসিয়া আর একবার চণ্ডু খাইল। রাত্রি হইলে যথানিয়মে চরিতে যাইল। তখন আমীর আসিয়া স্ত্রীর সহিত মিলিত হইলেন।

নবম অধ্যায় – উদ্ধার

ভূতের চণ্ডু খাওয়ার বিবরণ স্ত্রীর নিকট আদ্যোপ্রান্ত শুনিয়া আমীর বড়ই আনন্দ লাভ করিলেন। পূর্বেকার মত কথোপকথনে। দুইজনে একত্রে রাত্রি কাটাইলেন। প্রভাত না হইতে হইতে আপনার গর্তে ফিরিয়া গেলেন এইরূপ কিছুদিন চলিতে লাগিল। ভূত দিনে দুইবেলা আসিয়া চণ্ডু খায়। আমীর রাত্রিতে স্ত্রীর নিকট থাকেন। আমীর যখন দেখিলেন, চণ্ডুপানে ভূতের বিলক্ষণ অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, আর ছাড়িবার যো নাই, তখন তিনি একদিন স্ত্রীকে বলিলেন,—'কাল তুমি ভূতকে আর চণ্ডু দিও না বলিও চণ্ডু ফুরাইয়া গিয়াছে, মনুষ্যলয় হইতে চণ্ডু আনিতে বলিবে।' তার পরদিন প্রাতঃকালে যখন ভূত চণ্ডু খাইতে আসিল, আমীর-রমণী তাহাকে বলিলেন,—'দেখ, সঙ্গে করিয়া যাহা কিছু চণ্ডু আনিয়াছিলাম সমস্ত ফুরাইয়া গিয়াছে, আজ তোমাকে খাইতে দিই এমন আর নাই, তুমি লোকালয় হইতে চণ্ডু লইয়া আইস।' এই কথা শুনিয়া ভূতের মন বড়ই উদাস হইয়া পড়িল। কিন্তু তখনও সে জানিতে পারে নাই, কি সর্বনাশের কথা সে শুনিল। বিরসবদনে

আপনার ঘরে ফিরিয়া গেল। যত বেলা হইতে লাগিল, শরীরে ও মনে ততই ক্লেশ হইতে লাগিল। প্রথম আকর্ণ পুরিয়া হাই উঠিতে লাগিল, তারপর চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল, গা-ভাঙ্গিতে লাগিল। সর্ব্বশরীর ঘোর বেদনা হইল, প্রাণ আই-ঢাই করিতে লাগিল। সেদিন আর নিদ্রা হইল না। বৈকাল বেলা খালি নলটি লইয়া প্রদীপের শীসের কাছে ধরিয়া একবার টানিল। কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র ক্লেশ দূর হইল না। একান্তমনে সন্ধ্যার প্রতীক্ষা করিয়া রহিল, কখন সন্ধ্যা হইবে যে, লোকালয়ে যাইয়া চণ্ডু আনিয়া প্রাণ রক্ষা করিবে। সেদিন যেই সন্ধ্যা হইল, অমনি ভূত ঘর হইতে বাহির হইল। ডাঁমতালের জল ভেদ করিয়া উপরে উঠিল। উপরে গিয়া আর সব চিন্তা ছাড়িয়া, কেবল চণ্ডুর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। এ-গ্রাম সে-গ্রাম, এ-নগর, সে-নগর, এ-দেশ, সে-দেশ, সমস্ত ভারতভূমি ঘুরিল, চণ্ডু কোথাও পাইল না। আবকারির এমনই কড়া নিয়ম যে, সন্ধ্যা না হইতেই সকল দোকান বন্ধ হইয়া যায়। এদিকে চণ্ডু বিনা প্রাণ বাহির হয়। উদরেরও বিলক্ষণ গোলযোগ উপস্থিত হইল। শরীর আর বয় না, আর উড়িতে বা চলিতে পারে না। তখন ভাবিল,—বৃথা আর ঘুরিয়া কি হইবে? মরি তো ঘরে গিয়া মরি, প্রিয়তমার মুখ দেখিতে দেখিতে মরিব! তাহাকে বলিব, দেখ তোমার প্রেমের ভিখারী হইয়া আমি এই প্রাণ বিসর্জন করিলাম।' হয়ত আমাকে বাঁচাইবার জন্য ইহার একটা উপায়ও করিতে পারে অতিশয় ম্রিয়মাণ হইয়া, ঘোরতর যাতনায় ব্যথিত হইয়া, ভূত সেদিন সকাল সকাল বাটী ফিরিয়া আসিল। আমীর জানিতেন, কি ঘটনা ঘটিবে, তাই তিনিও সে দিন স্ত্রীর নিকট হইতে সকাল সকাল বিদায় লইয়া আপনার ঘরে গিযাছিলেন। ভূত কিন্তু আপনার ঘরে আসিয়াই সেইখানে শুইয়া পড়িল। শরীর এতই বিকল হইয়াছিল যে, সেখান হইতে নড়িতে আর তাহার প্রবৃত্তি হইল না। সেইখানে পড়িয়া ক্রমাগত উঃ আঃ করিতে লাগিল। ক্রমে শরীর হিমাঙ্গ হইয়া গেল। সমুদয় গ্রন্থি শিথিল হইতে লাগিল, লিগেমেণ্ট সমস্ত আলগা হইল, শরীরের জয়েন সব একেবারে খুলিয়া গেল, হাড়ের সন্ধি সমুদয় একে একে খসিয়া গেল, যাবতীয় অস্থি পৃথক পৃথক হইয়া পড়িল। উত্থানশক্তি-রহিত। ঘোর বেদনায়, ঘোর যাতনায় লুল্লু পড়িয়া রহিল। প্রভাত হইলে, হাসিতে হাসিতে হাত ধরাধরি করিয়া, আমীর-রমণী আসিযা সেইখানে উপস্থিত হইলেন। আমীর বলিলেন,—'কি হে বাপু! সভ্য ভব্য নব্য ভূত! পুরাতন কথাটি কি কখনও শুন নাই?'—'থোড়া থোড়া করকে খাও-মুঝে, ময় লগুঁ কড়ুয়া। আর জরু বেচো, গরু বেচো, মুঝকো লাও ভেড়ুয়া।'

ইহার অর্থ এই, আফিম বলিতেছেন, 'অল্প অল্প করিয়া আমাকে প্রথম খাওস কেন না, আমি তিত লাগি। এখন ভেড়ুয়া। স্ত্রী বিক্রয় কর, কি গরু বিক্রয় কর, বিক্রয় করিয়া যেখান হইতে পাও আমাকে লইয়া আইস।' ভূত চিঁ চিঁ করিয়া বলিল, 'এ বিপদের সময় মুখনাড়া দিচ্ছিস তুই আবার কে?' আমীর বলিলেন,—'আমি আমীর, এই রমণীর স্বামী, যাহাকে তুই নিদারুণ ক্লেশ দিয়াছিস; তাই আজ তোর যাতনা দেখিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিতেছি।' ভূত বলিল,—'তোমার জরু তুমি ফিরিয়া লও, অমন জরুতে আমার কাজ

নাই বাবা! ওতো জরু নয়! সুখে সচ্ছন্দে ভূতগিরি করিতেছিলাম, এ কি বাপু! ভূতের আবার চণ্ডু খাওয়া কি? ঐতো আমাকে মজাইল। এখন তোমার কাছে যদি আফিম কি চণ্ডু থাকে তা দিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর। ধড়ে প্রাণ আসিলে তোমার স্ত্রীকে এবং তোমাকে ঘরে লইয়া যাইব। কেবল ঘরে রাখিয়া আসিব না, এখন দেখিতেছি আমাকে চিরকাল তোমার গোলামি করিতে হইবে। চণ্ডু না পাইলে তো আর বাঁচিব না সুতরাং চণ্ডুর জন্য তোমার গোলামি করিতে হইবে! দুইবেলা চণ্ডু দিও, যা বলিবে তা করিব, তোমার সংসারে ভূতের মত খাটিব।' আফিমের মহিমা আমীর ভালরূপেই জানিতেন! তিনি বুঝিলেন লুল্লু যাহা বলিতেছে তাহা প্রকৃত কথা, প্রতারণা ইহাতে কিছুই নাই। পকেট হইতে বাহির করিয়া প্রথমে তাহাকে একটু কাঁচা আফিম খাইতে দিলেন। ইহাতে ভূতের শরীর কিঞ্চিৎ সুস্থ হইল শরীরের অস্থি সমুদয় পুনরায় যে যাহার স্থানে গিয়া জোড়া লাগিল। তখন সে উঠিয়া বসিল। তারপর আমীর তাহাকে চণ্ডুপান করিতে দিলেন। তাহাতে তাহার দেহে পুনরায় প্রাণ সঞ্চার হইল, শরীর স্বচ্ছন্দতা লাভ করিল! লুল্লু তখন আমীরের পদতলে পড়িয়া বলিল,—'মহাশয়। আপনার নিকট আমি ঘোর অপরাধে অপরাধী, বড়ই দোষ করিয়াছি। কৃপা করিয়া আমার অপরাধ মার্জনা করুন।' বড়ই নিদারুণ ক্লেশ হইতে আপনি আমাকে মুক্ত করিলেন। আপনার ঋণ কখনই পরিশোধ করিতে পারিব না। চিরকাল দাসানুদাস হইয়া আপনার এবং এই বিবিজীর সেবা করিব। এখন সকাল সকাল আহারাদি করিয়া লউন। আজই রাত্রিতে আপনাদিগকে ঘরে লইয়া যাইব।' আমীর ও আমীরের রমণী তখন সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন।

সন্ধ্যার পর ভূত আসিয়া দ্বারে উপস্থিত হইল। দুইজনে লুল্লুর পিঠে বসিলেন। জল হইতে বাহির হইয়া লুল্লু আকাশ-পথে উঠিল। তড়িৎবেগে আকাশ-পথে চলিতে লাগিল। প্রায় রাত্রি দুই প্রহরের সময় সকলে দিল্লী নগরে আসিয়া পৌঁছিলেন। আমীরের ছাদে গিয়া ভূত ইঁহাদিগকে নামাইয়া দিল। আমীর ফকির-বেশে গৃহত্যাগ করিবার সময় ঘরে চাবি দিয়া গিয়াছিলেন। চাবি খুলিয়া স্ত্রী-পুরুষে ঘরে প্রবেশ করিলেন। লুল্লুর জন্য একটি ঘর নির্দেশ করিয়া বলিলেন, লুল্লু! এই ঘরটি তোমার, তুমি এই ঘরে থাকিবে। আফিম কি চণ্ডু যাহা চাহিবে, তাহাই তোমাকে দিব।' লুল্লু বলিল,—'হাঁ, জনমে আপনাদিগকে ছাড়িয়া কোথাও যাইব না। ছাড়িবার যোও নাই।' পরদিন প্রাতঃকালে আমীর প্রতিবাসীদিগকে ডাকিয়া আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা তাঁহাদিগকে শুনাইলেন। আমীর বাটী ফিরিয়া আসিয়াছেন দেখিয়া সকলে সুখী হইলেন।

দশম অধ্যায়

লুচি

যে যার ঘরে ফিরিয়া যাইলে, লুল্লু ও আমীর দুইজনে এক সঙ্গে শুইয়া মনের সুখে অনেকক্ষণ ধরিয়া চণ্ডু পান করিলেন। এইরূপে ভূতে মানুষে ক্রমে বড়ই ভাব হইল। একদিন চণ্ডু খাইতে খাইতে আমীর বলিলেন,—'হে লুল্লু! হে চণ্ডুসেবক-কুল-তিলক!

আমার বড় সাধ হইতেছে যে, পুনরায় বন্ধুদিগের সহিত একবার সাক্ষাৎ করি,—যাঁহারা স্ত্রী-উদ্ধার বিষয়ে আমার বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। তখন তুমি আমার শত্রু ছিলে, এখন কিরূপ প্রাণের মিত্র হইয়াছ, তাহাও তাঁহারা একবার আসিয়া দেখুন। প্রথম হইতেছেন সেই জানু, যিনি বলিয়া দিয়াছিলেন যে, তুমি আমার স্ত্রীকে লইয়া গিয়াছ। তারপর সেই ব্রাহ্মণ, যাঁহার মত রোজা এ ধরাধামে কখনও হয় নাই, হবে না। তারপর আমাদের তাঁতি-ভায়া, যাঁর মত সঙ্গীতবিদ্যা বিশারদ পৃথিবীতে হয় নাই, হবে না। তারপর সেই কলুর পো, যাঁর মত তৈলনিষ্পীড়ক জগতে হয় নাই, হবে না। আর যদি ভূতদিগকে আনিতে পার, তাহা হইলে ত বড়ই সন্তুষ্ট হই। সেই ভূততত্ত্ববিৎ মহাপণ্ডিত ব্রাহ্মণের ভূত, সেই অমানুষিক অভৌতিক প্রেমিক ঘ্যাঘোঁ, আর সেই ভাবি সম্পাদক তৈলপ্রদায়ক গোঁগোঁ! তোমার গেঁটে দাদার সহিত আলাপ পরিচয় করিতেও আমার বড়ই ইচ্ছা। আর একটি কথা—আহা! ঘ্যাঘোঁর বিবাহ হয় নাই, তাহার সেই নাকেশ্বরীকে আনিযা যদি দুইজনে মিলন করিয়া দিতে পার, তাহা হইলে বড সন্তুষ্ট হই। 'লুল্লু বলিল,—'আপনার সমুদয় আদেশ পালন করিতে আমি সমর্থ। আমি এই রাত্রিতেই সকলকে এখানে আনিতেছি। সন্ধ্যার সময় ভূত ঘর হইতে বাহির হইল। রাত্রি এক প্রহরের মধ্যে জান্, ব্রাহ্মণ, তাঁতি ও কলুকে লইয়া ফিবিয়া আসিল। আমীর সকলকে যথাবিধি অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি আপনার বিবিকে পাইয়াছেন শুনিয়া সকলে পরম সুখী হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে লুল্লু পুনর্বার আকাশপথে যাত্রা করিয়া ব্রাহ্মণের ভূত, ঘ্যাঘোঁ, গোঁগোঁ ও সভ্য ভব্য নব্য গেঁটে দাদাকে লইয়া আসিল। ঘ্যাঘোর মনোহর নাক-ধারিণী বিশ্বমোহিনী সেই ভূতিনীকেও আনিয়া দিল। ভূতিনী অন্তঃপুরে আমীর পত্নীর নিকট গমন করিলেন। পুরুষমানুষ ও পুরুষ ভূত সকলে বহির্বাটীতে উপবেশন করিলেন। পরস্পরে আলাপ পরিচয় হইলে, আমীর অনুনয়-বিনয় করিয়া সকলকে বলিলেন,—'মহোদয়গণ! আজ রাত্রিতে আমার এ গরীবখানাতে পদার্পণ করিয়া আপনারা বড়ই অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। এক্ষণে আমার মনে একটি বাসনা বডই প্রবল হইয়াছে, আপনারা তাহা করুন। বড় ইচ্ছা, নাকেশ্বরীর সহিত ঘ্যাঘোঁর বিবাহকার্য্য আজ রাত্রিতেই সমাধা করি। গোঁগোঁ যে ঘ্যাঘোঁর নামে মিথ্যা কুৎসা করিয়াছিল, তাহা আমার পত্নী, নাকেশ্বরীর মাসীকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। গোগোঁও এ কথা এখন স্বীকার করিতেছে। নাকেশ্বরীর মাসী বিবাহে সম্মতিদান করিয়াছেন, এখন আপনাদিগের কি মত?' সকলেই একবাক্য হইয়া বলিলেন,—'তথাস্তু, শুভকার্য্যে বিলম্বে প্রয়োজন নাই।' তখন আমীর,—লুল্লু প্রভৃতি ভূতদিগকে পৃথিবীর সমস্ত ভূত নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে বলিলেন। কিন্তু উপস্থিত ভূতগণ সকলেই মৌন হইয়া রহিল। আমীর আদেশ পালনে কেহই তৎপর হইল না। আমীর জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আমি কি তোমাদিগকে কোন দুঃসাধ্য কার্য্য করিতে অনুরোধ করিয়াছি? পৃথিবীর সমস্ত ভূত নিমন্ত্রণ করা কি তোমাদের অভিপ্রেত নয়? লুল্লু উত্তর করিল,—'মহাশয়! আপনি যেরূপ সদাশয় লোক, তাহাতে আপনার সমস্ত আদেশই

আমাদের শিরোধার্য্য। তবে কি না, আমরা ভারতীয় ভূত, ভারতের বাহিবে আমরা যাইতে পারি না। সমুদ্রের অপর পারে পদক্ষেপ করিলে আমরা জাতিকুল-ভ্রষ্ট হইব। আমাদের ধর্ম কিঞ্চিৎ কাঁচা। যেরূপ অপক্ক মৃত্তিকাভাণ্ড জলস্পর্শে গলিয়া যায়, সেইরূপ সমুদ্রপারের বায়ু লাগিলেই আমাদের ধর্ম ফস্ করিয়া গলিয়া যায়, তাহার আর চিহ্নমাত্র থাকে না, ধর্মের গন্ধটি পর্যন্ত আমাদের গায়ে লাগিয়া থাকে না। কেবল তাহা নহে, পরে আমাদের বাতাস যাঁহার গায়ে লাগিবে, দেবতা হউন কি ভূত হউন, নর হউন, কি বানর হউন, তিনিও জাতিভ্রষ্ট হইবেন? যার পক্ষে যেরূপ ব্যবস্থা,—দিবারাত্রি তাঁহাদিগকে পঞ্চামৃত খাইতে হইবে, কিম্বা কল্মা পড়িতে হইবে, তবে তাঁহাদের ধর্মটা টায়টোয়ে বজায় থাকিবে। আপনাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলাম, এখন যেরূপ অনুমতি হয়।' আমীর বলিলেন,—'তবে আর তত আড়ম্বরের আবশ্যক নাই। ভারতীয় ভূত-সমাজকেই কেবল নিমন্ত্রণ কর।'

নানাবিধ চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় পান-ভাজনের সামগ্রীরও আয়োজন হইল। মুহূর্তের মধ্যে ভূতেরা অনেক লুচি, অনেক সন্দেশ, অনেক দধি জমা করিয়া ফেলিল। নগরবাসী অনেক লোককে আমীর সেই রাত্রিতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগত সমাগত হইলে, আহারীয় দ্রব্যসামগ্রী সমুদয় আয়োজন হইলে, মহাসমারোহে নাকেশ্বরীর সহিত ঘ্যাঘোঁর বিবাহকার্য্য সমাধা হইল। আমীর নিজে কন্যাদান করিলেন, ব্রাহ্মণটি পুরোহিত হইলেন। বিবাহের মন্ত্র তিনি জানিতেন না সত্য, কিন্তু একটা দীর্ঘ ফোঁটা কাটিয়া ওঁ আং করিয়া কোন রকমে সে রাত্রির কার্য্য সারিলেন। পূর্ণযৌবনী ভূতকামিনী ঘ্যাঘোঁ পত্নীর রূপমাধুরী দেখিয়া সকলেরই মন বিমোহিত হইল। একমনে অনিমিষনয়নে সকলে সেই রূপ দেখিতে লাগিলেন। যিনি যত দেখেন, দেখিয়া পিপাসা হৃদয়ে তাঁহার ততই প্রজ্জ্বলিত হইল। বরকে সকলে বলিলেন,—'ঘ্যাঘোঁ! তুমি অতি ভাগ্যবান পুরুষ যে এরূপ অমূল্য কন্যারত্নকে লাভ করিলে।' ঘ্যাঘোঁ চক্ষু ঠারিয়া ঈষৎ হাসিলেন। বর কি না? অধিক কথা ত আর কহিতে পারেন না? তবে সেই ঠার, সেই হাসির অর্থ এই—'আমি পূর্বেই না বলিয়াছিলাম, ওরূপ দেখিয়া কার প্রাণ সুস্থির থাকিতে পারে?' নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের আহারাদি-ক্রিয়াও উত্তমরূপে সমাধা হইল। যিনি যত পারিলেন, লুচি ও সন্দেশ তুলিলেন, ও পুঁটুলি বাঁধিয়া ঘরে লইয়া গেলেন। সভাস্থলেই বাসর-ঘর হইল। বাসর-ঘরে গান গাইবার নিমিত্ত সকলে একবাক্য হইয়া তাঁতিকে অনুরোধ করিলেন। পুলকে পুলকিত হইয়া, সহস্র সহস্র শ্রোতার সম্মুখে তাঁতি সেই রাত্রিতে মনের সুখে গান করিলেন। শ্রোতারা একদৃষ্টে তাঁহার মুখভঙ্গিমা দেখিয়াই আনন্দলাভ করিলেন। গানের কণামাত্র কাহারও কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল না। আমীরের অনুরোধে দিল্লীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সে রাত্রিতে সাবধান হইয়াছিলেন। তুলা দিয়া সকলেই কান একেবারে বন্ধ করিয়াছিলেন। সে রাত্রিতে নৃত্যেরও অভাব হয় নাই, ভূত ভূতিনীরা দলে দলে কতই যে নাচিল, তা আর কি বলিব। প্রভাত হইবার কিঞ্চিৎ পূর্বে মজলিস ভাঙ্গিল। তখন লুল্লু—জান্, ব্রাহ্মণ, তাঁতি ও কল্লুকে ঘরে রাখিয়া আসিলেন। নগরবাসীরা যে যাহার ঘরে চলিয়া গেলেন।

একাদশ অধ্যায় - লেখকদল সাবধান

ভূত ও ভূতিনী সকল বিদায় হইবার পূর্বে, আমীরকে তাহারা বলিল,—মহাশয়! আপনার সদাচারে আমরা বড়ই প্রীতিলাভ করিয়াছি। যদি কোন বিষয়ে আপনার উপকার করিতে পারি তো বলুন, আমরা বড়ই সুখী হইব। আমীর বলিলেন,—'আমার উপকার করিতে যদি নিতান্তই ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলেন তোমাদের বাসনা আমি পূর্ণ করিব। এখান হইতে চারি ক্রোশ দূরে যমুনার কূলে আমার অনেক ভূমি ছিল; তাহার আয় হইতে পুরুষ-পুরুষানুক্রমে আমাদিগের রাজার হালে চলিত। সেই ভূমি এক্ষণে যমুনার জলপ্লাবনে একেবারে বালুকাময় হইয়া গিয়াছে। তাহা হইতে তোমরা যদি বালুকা সব তুলিয়া ফেলিতে পার, তাহা হইলে আমার বিশেষ উপকার হয়।' ভূতেরা বলিল,—'যে আজ্ঞে, আমরা এইক্ষণেই করিতেছি। এই বলিয়া যত ভূত সেই মুহূর্তে ভূমির নিকট যাইল এবং অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই সমুদয় বালি উঠাইয়া ফেলিল। ভূমি পূর্বের মত উর্বর ও ফলশালী হইল। তখন তাহারা আমীরের বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া বিদায় লইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। আমীর কিন্তু গোঁগোঁকে যাইতে নিষেধ করিলেন। তাহাকে বলিলেন,—'গোঁগোঁ! তুমি যাইও না। তোমার অস্থি মজ্জা সমুদয় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে, তোমার শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আফিম আর দুধ, এই দুই বস্তু নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে তোমার শরীর পুনর্গঠিত হইতে পারে। যেহেতু আফিম অতি অপূর্ব পদার্থ, ইহা সেবন করিলে মানুষ যে বয়সে খায়, সেই বয়সেই চিরকাল থাকে, শরীরের কোষ সমুদয় ধ্বংস হয় না, ম্যালেরিয়া বিষয়-জনিত জ্বর ইহার নিকটে আসে না। কি মনুষ্যের, কি ভূতের, ইহা সেবন কবিলে পরমায়ু বৃদ্ধি হয়। অতএব তুমি লুল্লুর নিকট অবস্থিতি কর। চণ্ডুপান করিতে অভ্যাস কর।' গোঁগোঁ তাহাই স্বীকার করিল। এইরূপে আমীর স্ত্রীকে লইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করিতে লাগিলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই লুল্লু গণ্যমান্য সকলের নিকট প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। একটু আধটু যাঁহারা নেশা করিতেন, সকলেই তাঁহার প্রেমে মুগ্ধ হইলেন। স্ত্রীলোক দেখিলে তিনি 'মা' বলিয়া ভিন্ন কথা কহিতেন না। চণ্ডুর মোহিনী শক্তি প্রভাবে তাঁহার বিকৃত আকার ক্রমে সুকৃতি হইয়া উঠিল। নব্য না হউন, সত্য সত্যই তিনি একজন সভ্য ভব্য ভূত হইলেন। চণ্ডুর সহিত দুধ-ঘি খাইয়া তাঁহার রং যথার্থই ফরসা হইয়া উঠিল। তবে তাঁহার দোষ এই, নেশাখোর ভিন্ন অপরের সহিত তিনি বাক্যালাপ করিতেন না। যাহা হউক, এত পোষ মানিয়াছিলেন যে, আমীর-রমণী তাঁহাকে দেখিয়া আর কিছুমাত্র লজ্জা বা ভয় করিতেন না। আমীরের অবস্থা ভাল হইলেও লুল্লু তাঁহাকে গাড়ী করিতে দেন নাই। তাঁহার যখন যাইবার আবশ্যক হইত, তিনি পিঠে লইয়া যাইতেন। তাহার পিঠে চড়িয়া আমীর-রমণী কতবার বাপের বাড়ী গিয়াছিলেন। লুল্লুকে সর্বদা এখানে সেখানে যাইতে হইত বলিয়া তিনি স্বর্ণকারের দ্বারা দুইখানি পাখা গড়াইয়া লইয়াছিলেন। কোথাও যাইতে হইলে ঐ দুইখানি পাখা পরিয়া উড়িয়া যাইতেন, তাহাতে তাহাকে দেখাইত ভাল, আর তাহা পরিয়া

অনেক দূর যাইলেও শ্রম হইত না। একবার সমুদ্র দেখিতে আমীর-রমণীর বড়ই সাধ হইয়াছিল। লুল্লু এ কথা শুনিয়া বলিলেন,—'তার ভাবনা কি? আমার পিঠে চড়। আমার মাথাটি ভাল করিয়া ধর, আমি সমুদ্র দেখাইয়া আনিতেছি।' এই প্রকারে তিনি আমীর-রমণীকে সমুদ্র দেখাইয়া আনিলেন।

কিছুদিন পর গোঁগাঁর শরীর পুনরায় সবল হইলে, আমীর তাহাকে বলিলেন,—'গোঁগাঁ! আমি তোমার কাছে যাহা স্বীকার করিয়াছি, তাহা করিব। একখানি খবরের কাগজ খুলিব, তাহার সম্পাদক হইবে তুমি।' যথাসময়ে আমীর একখানি সংবাদপত্র বাহির করিলেন। একে ভূত সম্পাদক, তাতে আবার চণ্ডুখোর ভূত,—গুলি চৌদ্দ-পুরুষ। সে সংবাদপত্রের সুখ্যাতি রাখিতে পৃথিবীতে আর স্থান রহিল না। সংবাদপত্রখানি উত্তমরূপে চলিতে লাগিল, তাহা হইতেও আমীরের বিলক্ষণ দুই পয়সা লাভ হইল।

গোঁগাঁ যে কেবল আপনার সংবাদপত্রটি লিখিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, তাহা নহে। সকল সংবাদপত্র অফিসেই তার অদৃশ্যভাবে যাতায়াত আছে। অন্যান্য কাগজের লেখকেরা যখন প্রবন্ধ লিখিতে বসেন, তখন ইচ্ছা হইলে কখনও কখনও গোঁগাঁ তাঁহাদিগের ঘাড়ে চাপেন। ভূতগ্রস্ত হইয়া লেখকরা কত কি যে লিখিয়া ফেলেন, তাহার কথা আর কি বলিব! তাই বলি, লেখক দল! সাবধান!

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

দ্বিতীয় খণ্ড

নয়নচাঁদের ব্যবসা

প্রথম পর্ব

নয়ন-চাঁদের বাড়ী ফরাশ-ডাঙ্গা। নয়নচাঁদ গুলি খাইয়া থাকেন।

এক দিন সন্ধ্যাবেলা, নয়ন, লম্বোদর, গগন প্রভৃতি বন্ধুগণ আড্ডায় বসিয়া নিত্যক্রিয়ায় ব্যস্ত ছিলেন। ক্রিয়াটির গুণ এই যে, মাঝে মাঝে মজার কথা চাই। তাহা না হইলে, প্রাণে ততটা আয়স হয় না।

তাই, লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"নয়ন ! আজকাল তোমার কিছু সুখ সাওয়াল দেখিতেছি। চিনির জলে আর সে তোমার ষোলা নাই। এখন সন্দেশটুকু রসগোল্লাটুকু এ না হইলে আর তোমার চাট হয় না। মুখে একটু তোমার কান্তি বাহির হইয়াছে, শরীরে লাবণ্য দেখা দিয়াছে গায়ে তোমার তেলা মারিয়াছে। যকের টাকা পাইয়াছ না কি?"

আর সকলেও বলিয়া উঠিলেন,—"সত্য হে! ব্যাপারখানা কি বল দেখি নয়ান! গুলিখোর বলিয়া তোমাকে আর চেনা যায় না। স্বয়ং মা লক্ষ্মীকে বাঁটিয়া যেন তুমি মুখে মাখিয়াছ। নয়ান! কিসে তোমার কপাল ফিরিল, তা বল।"

নয়ন অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। বিশেষ চিন্তা করিয়া, অবশেষে, বাজখাঁই সবরে বলিলেন—"আড্ডাধারী মহাশয়! ইঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করুন, ইঁহারা হিন্দু কি মুসলমান?"

গগন বলিলেন,—"ধান ভানিতে শিবের গীত। কোথাকার কথা কোথা! মুসলমান কেন আমরা হইতে যাইলাম? কবে তুমি কারে কাছা খুলিয়া নামাজ করিতে দেখিয়াছ যে, ফট্ করিয়া এমন কথা জিজ্ঞাসা করিলে? নয়ান! আজ তুমি আর অধিক ছিটে টানিও না, তোমার হেড্ খারাপ হইয়া গিয়াছে।"

নয়ন উত্তর করিলেন,—চট কেন ছাই। কথাটা যখন বলিলাম, তখন অবশ্য তাহার মানে আছে। তোমরা জিজ্ঞাসা করিলে যে আমার সংসার সচ্ছল কিসে হইল? যদি সব কথা খুলিয়া বলি, হয় তো তোমরা হাসিয়া উঠিবে। তার চেয়ে না বলা ভাল। আজকাল আমার হইল ধর্ম্মগত প্রাণ। বন্ধু হইলে কি হয়? তোদের মতি-গতি অন্যরূপ। কিসে আমার দু'পয়সা হইল, তা আমি তোমাদিগকে বলিতে চাই না! আর তোমরাও জিজ্ঞাসা করিও না।"

নয়নের কথায় সকলের ঘোরতর কুতুহল জন্মিল। বলিবার জন্য নয়নকে সকলে বার বার অনুরোধ করিলেন। নয়ন কিছুতেই বলেন না। অবশেষে স্বয়ং আড্ডাধারী মহাশয় আসিয়া অনুরোধ করিলে, নয়ন বলিতে লাগিলেন।

নয়ন বলিলেন,—"আমি বলি। কিন্তু যাহা বলিব তাহা শুনিয়া যদি হাসো, কি ঠাট্টা বিদ্রূপ কর, তাহা হইলে জানিব যে, তোমরা বন্ধু নও, তোমরা মুসলমান, নাস্তিক, শাক্ত,

কৃষ্টান, বৈষ্ণব, ব্রহ্মজ্ঞানী,—আর কি নাম করিতে বাকী রহিল, আড্ডাধারী মহাশয়?"

আড্ডাধারী মহাশয় হাসিয়া বলিলেন,—"আর কি বাকী আছে? বাকী আর কিছুই নাই। সে যে ব্রাহ্মণ দেবতা বলিয়াছিলেন,—'ওরে আঁটকুড়োর বেটারা। যদি সতর পর্য্যন্ত বলিলি, তবে আর অঠারোর বাকী কি রাখিলি? ছেলেরা কেবল সতর পর্য্যন্ত বলিয়াছিল, তা নয়ান। তুমি সতর ছাড়িয়া উনিশ পর্য্যন্ত উঠিয়াছ। বাকী আর কিছু রাখ নাই। হিন্দু, ব্রহ্মজ্ঞানী, কৃষ্টান যা কিছু আছে সব বলিয়াছ।" —লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ব্রাহ্মণ কারে গালি দিয়াছিল, আর এ সতর, আঠারোর মানে কি?"

আড্ডাধারী মহাশয় উত্তর করিলেন,—"এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি আঠারো বলিলে খেপিতেন। দেখা পাইলেই ছেলেরা তাই তাঁকে আঠারো বলিয়া খেপাইত। গালি তো যা মুখে আসিত তা দিতেন, তা ছাড়া ইট, পাটকেল, যাহা কিছু সম্মুখে পাইতেন, তাহা ছুঁড়িয়া সেই ব্রাহ্মণ দেবতা ছেলেদের মারিতেন। এক দিন এক পুষ্করিণীতে ব্রাহ্মণ স্নান করিতেছিলেন। কতকগুলি ছেলেও সেই পুকুরে স্নান কবিতেছিল। ব্রাহ্মণকে দেখিয়া আঠারো বলিবার নিমিত্ত ছেলেদের মুখ চুলকাইয়া উঠিল। কিন্তু ভয়! ছেলের গন্ধ পাইয়াই বাগে ব্রাহ্মণের গা ঘশ ঘশ করিতেছিল, জবা ফুলের মত চক্ষু করিয়া মাঝে মাঝে তিনি কট্‌মট করিয়া ছেলেদের পানে চাহিতেছিলেন। একবার আঠারো বলিলে হয়! মনে মনে ভাবটা তাঁর এইরূপ। বড়ই বিপদ! আঠারো না বলিলেও নয়, ওদিকে ব্রাহ্মণের এইরূপ উগ্রশর্ম্মা মূর্ত্তি। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া একজন বালক হঠাৎ বলিয়া উঠিল,—'ভাই! এ পুকুবপাড়ে কয়টা তাল গাছ আছে? এই কথা বলিতেই অপর সব বালকেরা গুণিতে আরম্ভ করিল—এক, দুই, ৩। ৪। ৫। ৬। ৭। ৮। ৯। ১০। ১১। ১২। ১৩। ১৪। ১৫। ১৬। ১৭।—এতক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করিয়া শুনিতেছিলেন। ছেলেরা যেই সতর বলিল, আর ব্রাহ্মণ একেবারে রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন। একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন—'তবে রে আঁটকুড়োর বেটারা! আর বাকী রইলো কি? যদি সতর পর্য্যন্ত বলিলি তবে আর আঠাবোর বাকী রাখিলি কি? এই বলিয়া নানারূপ গালি দিযা ব্রাহ্মণ ছেলেদের মারিতে দৌড়িলেন। ছেলেরা পুষ্করিণী হইতে উঠিয়া যে যে দিকে পাইল ছুটিয়া পলাইল। তাই বলিতেছি নয়ান! তুমি আমাদিগকে কৃষ্টান বলিলে, মায় ব্রহ্মজ্ঞানী পর্যন্ত বলিলে। বাকী আর কি রহিল? আঠারো ছাড়িয়া উনিশ বিশ পর্য্যন্ত হইয়া গেল।"

নয়ন কিছু অপ্রতিভ হইলেন। নয়নের মন কিছু নরম হইল। নয়ন বলিলেন— না, না, তোমাদের আমি ও সব কথা বলি নাই। শাক্ত, বৈষ্ণব, ব্রহ্মজ্ঞানী, কৃষ্টান কি তোমাদের আমি বলিতে পারি?। আমি বলিয়াছি যে, যে আমার কথা বিশ্বাস না করিবে সে তাই।"

দ্বিতীয় পর্ব— কপাৎ

নয়ন বলিলেন,—"মনের মিল থাকে, তবে বলি ইয়ার। তোমরা হিন্দু হও, আমিও তাই। মুসলমান হও, আমিও তাই। তোমরা যে ঠাকুরগুলি মানিবে, আমিও সেগুলিকে মানিব, আমিও যে ঠাকুরগুলিকে মানিব তোমাদেরও সেগুলিকে মানিতে হইবে। তা না

হইলে মনের মিল রহিল কোথায়।”

সকলেই বলিলেন—ঠিক! ঠিক! নয়ন বলিতেছে ভাল। আমাদেরও ঐ মত।”

নয়ন বলিলেন,—“আমি হক্ কথা বলিব। আজ আমার অবস্থা এতটা ফিরিয়াছে বলিয়া, পুরাতন বন্ধুদের আমি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিব না, তবে দেশের যেরূপ হাওয়া পড়িয়াছে, তাতে সেকালের মত আর হাবড় হাটি ব্রহ্মজ্ঞান তেত্রিশ কোটী দেবতার পায় তেল দিলে চলিবে না—উহারই মধ্যে দুই চারটি মাতালো মাতালো দেবতা বাছিয়া লইতে হইবে। পূজা দিতে হয় সেই দুই চারটি দেবতার দাও। আর সব দেবতারা মুখ হাড়ি করিয়া থাকেন, থাকুন! ঘরের ভাত বেশী করিয়া খাবেন।”

সকলেই বলিলেন,—“ঠিক! ঠিক! ঠিক কথা! হাবড়া তাবড় তেত্রিশ কোটীর চাল-কলা যোগায় কে হে, বাপু! পূজা না পাইয়া মুখ হাঁড়ি করিয়া বসিয়া থাক্, থাক্! বেচারি গুলিখোরদের যে পুঁটি মাছের প্রাণ, সে-টি তো বুঝিতে হবে? উহার মধ্যে দু-একটি বাছিয়া লও, লইয়া বাকী সব না-মঞ্জুর করিয়া দাও।”

নয়ন বলিলেন,—‘আমারও ঠিক ঐ মত। ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি দুইটি দেবতা বাহির করিয়াছি, এক হইলেন কাটিগঙ্গা, আর এক হইলেন ফণী মনসা, বাকী সব না-মঞ্জুর।

সকলেই একবাক্য হইয়া সায় দিলেন। সকলেই স্বীকার করিলেন যে এই দুইটি দেবতাই অতি চমৎকার দেবতা। আর সমুদয় দেবতাকে না-মঞ্জুর করিয়া মাটীতে মাথা ঠুকিয়া এই দুইটি দেবতাকে সকলে প্রণাম করিতে লাগিলেন। মাটীতে মাথা ঠুকিতে ঠুকিতে সকলে বলিলেন,—“হে মা কাটিগঙ্গা! হে বাবা ফণী মনসা! তোমাদের পায়ে গড়। ওঁ নমঃ। ওঁ নমঃ । ওঁ নমঃ।”

নয়ন পুনরায় বলিলেন—“কিন্তু এখনও আসল দেবতাটির কথা বলা হয় নাই। শেষে বলিব, তাই মনে করিয়া সেটি বাকী রাখিয়াছি। সে দেবতাটি, মা শীতলা। তাঁরই বরে আমার সুখ সম্পত্তি আর আমার ঐশ্বর্য্য। সাবধান! কাঁচা-খাওয়া দেবতা!”

সকলেই বলিলেন,—“সাবধান! কাঁচা খাওয়া দেবতা!”

নয়ন বলিলেন,—“এ বাপু ঘেঁটু নয়, পেচো নয় তোমার মানিকপীর নয়! এ মা শীতলা! ইংরেজী খবরের কাগজে পর্য্যন্ত মার নাম বাহির হইয়াছে। মার বরে আমার সব।”

শীতলার নাম শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত। ভয়ে সকলের প্রাণ আড়ষ্ট হইয়া উঠিল আর একটু আগে তেত্রিশ কোটী দেবতা না-মঞ্জুর হইয়া গিয়াছিল। আড়াল হইতে পাছে শীতলা সে কথাটি শুনিয়া থাকেন এই ভয়ে সকলের মনে ঘোরতর আতঙ্ক উপস্থিত হইল।

উপস্থিত সভ্যদিগের মধ্যে গগন একটু সাহসী পুরুষ ছিলেন। অতি সাহসে ভর করিয়া গগন জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি করিয়া হইল, ভাই” তুমি আট পয়সার চিনি জলে সোলা ফেলিয়া সেই সোলাটি চুষিয়া চা'ট করিতে। তা ঘুচিয়া আজ তোমার সন্দেশ রসগোল্লা কি করিয়া হইল, ভাই?”

নয়ন বলিলেন—“হাঁ। এখন পথে এস। পূজা মানো তো সব কথা খুলিয়া বলি, তা

না হইলে নয়ন এই চুপ!" এই কথা বলিয়া নয়ন "কপাৎ" করিয়া মুখ বুজিলেন।

যার যেমন ক্ষমতা শীতলার পূজা মানিলেন। নয়ন তখন পুনরায় মুখের চাবি খুলিয়া আপনার কথা আরম্ভ করিলেন।

তৃতীয় পর্ব— এই কিল তো এই কিল!

নয়ন বলিতেছেন—একবার আমার বড়ই দুর্ব্বৎসর পড়িয়াছিল। খাওয়া কোনও দিন হয় কোনও দিন হয় না। ভাগ্যক্রমে এমন সময় কলিকাতায় বসন্তের হিড়িকটি পড়িল। পরে যিনি যা করুন, কিন্তু ফিকিরটি আমিই প্রথমে বাহির করি। জলা হইতে দিব্য একটু এঁটেল মাটী লইয়া আসিলাম। তাই দিয়া চমৎকার একটি শীতলা গড়িলাম। শীতলা গড়া কিছুমাত্র কঠিন নয়। গোল করিয়া মাটীর একটি চাবড়া করিলেই হইল। তাহার উপর উত্তমরূপে সিন্দুর মাখাইলাম, টানাটানা লম্বা লম্বা দুইটি চক্ষু করিলাম, পুরাতন রাঙতা দিয়া শীতলাটি ছোট বড় বসন্তে ছাইয়া ফেলিলাম। শীতলাটি হাতে করিয়া গিন্নীকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় চলিলাম।

সেখানে উপস্থিত হইয়া এক স্থানে শুনিলাম যে একজন শীতলার পাণ্ডা ছিল। বসন্তরোগে তাহার তিনটি ছেলে মরিযা গিয়াছে। রাগ করিয়া লাঠি দিয়া সে তাহার শীতলা ভাঙ্গিয়া দেশে চলিয়া গিয়াছে। সন্ধান করিয়া সে যে খোলার ঘরে থাকিত আমি সেইস্থানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তাহার সেই ঘরটি ভাড়া করিলাম। বাড়ীওয়ালী ও আশে পাশের লোককে বলিলাম যে মা আমাকে স্বপ্ন দিয়াছেন। স্বপ্নে বলিয়াছেন যে, ঐ যে পাণ্ডা ছিল সে ভাল করিয়া মা'র পূজা করিত না। লোকে পূজা দিলে, আগে থাকিতে নৈবিদ্যির মাথার মণ্ডাটি খাইয়া ফেলিত। মা তার উপর কুপিত হইয়া তাহাকে নির্ব্বংশ করিয়াছেন। সেই দুরাচারের পরিবর্ত্তে মা আমাকে সেবাদাস নিযুক্ত করিয়াছেন। তখন চারিদিকে খুব ডামা ডোল, খুব মহামারী, লোক মরিয়া উড়কুড় উঠিয়াছে। ভয়ে লোক কাঁটা হইয়া রহিয়াছে আমাকে পাইয়া সকলের প্রাণটা আশ্বস্ত হইল। সকলেই বলিল যে,—"মা জাগ্রত বটে! একজন পাণ্ডা যাইতে না যাইতে, কোথা হইতে শীতলা হাতে করিয়া আর একটি পাণ্ডা আসিয়া উপস্থিত হইল। আর আমাদের কোনও ভয় নাই।"

পাড়ায় আমার বিলক্ষণ পসার প্রতিপত্তি হইল। পাড়ার পূজাতেই অনায়াসে আমার সব খরচ নির্ব্বাহ হইতে পারিত। কিন্তু অভিপ্রায় আমার তো আর তা নয়! আমার অভিপ্রায় যে, মরসুম্ থাকিতে থাকিতে দু পয়সা রোজকার করিয়া পুনরায় ইয়ার বক্সির কাছে ফিরিয়া আসি। কলিকাতার আড্ডাগুলি সাহেবেরা সব উঠাইয়া দিয়াছেন। সেখানে আমার মন টিকে না তাই শীতলাটি হাতে করিয়া প্রতিদিন ভিক্ষায়ও বাহির হইতাম। তাই কি ছাই শীতলার গান জানি! কিন্তু চিরকাল হইতে আমি দশ-কর্ম্মা, যে কাজে দাও, সেই কাজে আছি, সব কাজে হনহর। নিজেই একটি শীতলার ছড়া বাঁধিলাম, তাহার কতকটা বলি শুন—

"শীতলা বলেন আমি যার ঘরে যাই।

ছেলে বুড়ো আণ্ডা বাচ্ছা টপ্ টপ্ খাই।।
চৌষট্টি হাজার এই বসন্তের দল।
গৃহস্থের ঘরে গিয়া দেয় রসাতল।।
বড় বসন্ত ছোট বসন্ত বসন্তের নাতি।
কারো ঘরে নাহি রাখে বংশে দিতে বাতি।।
ডেকে বলে যত ঐ কাল বসন্তের পাল।
পাঁটা ছাড়া কোরে ছাড়াই লোকের গায়ের ছাল।।
ফাটা বসন্ত বলে আমরা কেও-কেটা নই।
ফেটে মরে মানুষ যেন তপ্ত খোলার খই।।
নেচে নেচে বলে ওই ধসা বসন্ত যত।
মাংস পচা গন্ধে প্রাণ করি ওষ্ঠাগত।।
পাতাল-মুখো বসন্ত বলে নীচে কোরে মুখ।
হাড় মাস খেয়ে আমরা প্রাণে পাই সুখ।।
খুদে বসন্ত বলে তোমরা মিছে কর গোল।
আমর চোটে লোকের গা ফুলে হয় ঢোল।।
হাড়ভাঙ্গা বসন্ত বলে যারে যেথা পাই।
ছেলে বুড়ো সব আমরা কাঁচা ধোরে খাই।।
শীতলা বলেন আমি চা'ল পয়সা চাই।
না দিলে ছেলের মা আর রক্ষা নাই।।
চা'ল পয়সা আনো হবে পূজার বাজার।
বসন্ত ধরিবে নয় তো চোষট্টি হাজার।।"

বলিব কি ভাই আর রোজগারের কথা! ধামা ধামা চা'ল আর গণ্ডা গণ্ডা পয়সা ধামায় যেন পয়সা বৃষ্টি হইতে লাগিল। সে সময় যদি কেহ বলিত যে—"নয়ান হাইকোর্টের জজগিরি খালি হইয়াছে, তুমি জজগিরিটি কর।" আমি তাতেও রাজি হইতাম না। প্রথম দিনের রোজগারটি আনিয়া গিন্নীকে বলিলাম,—"গিন্নি! একবার বাহির হইয়া দেখ দেখি বাপ-ধোন! ব্যাপারখানা কি? বড় যে গুলিখোর বলিয়া মুখঝামটা দাও! গুলিখোর না হইলে এরূপ ফিকির বাহির করে কে, বাপ-ধোন? এরূপ বুদ্ধি যোগায় কার?"

কিন্তু, দেখ লম্বোদর ভায়া! তোমাদের আমি একটি জ্ঞানের কথা বলি। সাদাচোখেদের যে কখনও বিশ্বাস করিবে না, সে কথা বলা বাহুল্য। সাদাচোখেদের মনটি সদাই জিলেপির পাক। সত্য কথা কারে বলে, তারা একেবারে জানে না। প্রমাণ চাও? আচ্ছা প্রমাণও করিয়া দিই। এই দেখ, ছিঁচকে-চোর বলিয়া তাহারা আমাদের মিথ্যা অপবাদ রটায়। আচ্ছা তাহারা তামা, তুলসী, গঙ্গাজল হাতে করিয়া বলুক,—কবে কার ছিঁচকে কোন্ গুলিখোর চুরি করিয়াছে? আড্ডাধারী মহাশয়! আপনিও বলুন,—ছিটের জন্য কবে কোন্ গুলিখোর

আপনার নিকট ছিঁচকে আনিয়াছে? ঘটি চোর বল, বাটি চোর বল, ঘাড় হেঁট করিয়া মানিয়া লই। তোমাদের দুকড়ার ছিটকে কে কবে চুরি করে বাপু? তাই বলি, হে সাদা চোখেগণ! ভুলিয়াও কি তোমরা কখনও সত্যকথা বলিতে শিখিবে না?"

লম্বোদর, গগন প্রভৃতি বলিলেন,—ঠিক বলিয়াছ। সাদা-চোখেদের বিশ্বাস নাই। সাদা চোখেদের ছোঁওয়া মাড়াইলে নাইতে হয়।"

নয়ন বলিলেন,—"আর বিশ্বাস করিও না, এই পেশাদার মাতালদের। মন তাদের সাদা বটে, কিন্তু কখন কি ভাবে থাকে, তার ঠিক নাই। সাত ঘাটের জল এক করিয়া তুমি চারিটি পয়সা যোগাড় করিলে, আড্ডায় আসিয়া সেই চারি পয়সার ছিটে টানিলে, নেশাটি করিয়া তুমি আড্ডা হইতে বাহির হইলে, আর হয় তো কোথা হইতে একটা মাতাল আসিয়া তোমার গায়ের উপর ঢলিযা পড়িল। তোমার নেশাটি চটিয়া গেল। শীতকাল, মেঘ করিয়াছে, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে, ফুর ফুর করিয়া বাতাস হইতেছে। সহজেই নেশাটি বজায় রাখা ভার, তার উপর কোথা হইতে হয়তো একটা মাতাল আসিয়া তোমার গায়ের হড় হড় বমি করিয়া দিল। তোমার নেশাটির দফা একেবারে রফা হইয়া গেল। পেশাদার মাতালেরা এইরূপ লোকের মর্ম্মান্তিক করে। পা'ল-পার্ব্বণে পেট ভরিয়া মদটুকু খাওয়া গেল, অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকা গেল, মৌজ হইল, একথা বুঝি তা নয়! সকাল নাই, সন্ধ্যা নাই, দিন নাই, ক্ষণ নাই, অষ্টপ্রহর তুমি মদ খাইয়া তর্ হইয়া থাকিবে! মেজাজটি গরম করিয়া রাখিবে। ঠাকুর দেবতা লইয়া তোমার বাড়ীতে লোকে গান করিতে আসিবে, আর লাঠি লইয়া তুমি তাদের মারিতে দৌড়িবে। এ কি বাপু! এরে কি ভাল কাজ বলে? না এরে হিন্দুধর্ম্ম বলে? থুঃ! ছি!"

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—'এইরূপ কোনও একটা মাতালের পাল্লায় পড়িয়াছিলে না কি?" নয়ন উত্তর করিলেন,—"হাঁ ভাই! তবে ভাগ্যে আমার শীতলাটি জাগ্রত, হেলা ফেলা গুড়ুক তামাকের শীতলা নয়, তাই সে যাত্রা আমি রক্ষা পাইয়াছিলাম।"

সকলেই অতি আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—ব্যাপারখানা কি বল দেখি?"

নয়ন বলিলেন,—"ভাই! এক দিন প্রাতঃকালে শীতলাটি হাতে করিয়া এক মাতালের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম। জা নি কি ছাই যে, সে মাতালের বাড়ী? তাহা হইলে কি আর যাইতাম? তার বাড়ীতে গিয়া, মন্দিরেটি বাজাইয়া সবে মাত্র আরম্ভ করিয়াছি,— "শীতলা বলেন আমি যার ঘরে যাই—আর মিন্‌সে করিল্ কি জান ভাই! এক না কম্বল মুড়ি দিয়া, 'আঁ আঁ' শব্দ করিতে করিতে, ঘরের ভিতর হইতে বাহিরে দৌড়িয়া আসিল। তার সেই বিকট 'আঁ আঁ' শব্দ শুনিয়াই পেটের পিলে আমার চমকিয়া গেল।

শশব্যস্ত হইয়া প্রাণ লইয়া আমি পলাইবার উদ্যোগ করিলাম। তা ভাই! পলাইতে না পলাইতে বেটা যেন ঠিক কেঁদো বাঘের মত আসিয়া আমার পিঠের উপর পড়িল। তারপর দুঃখের কথা বলিব কি ভাই, এই কিল! এই কিল, তো এই কিল! আর সে কিল তো নয়! এক একটি কিলে মনে হইল যেন পিঠের সব জায়েন খুলিয়া গেল। ভাবিলাম,—

হায় হায়। কেন মরিতে শীতলার ব্যবসা করিতে গিয়াছিলাম? শীতলার ব্যবসা করিতে গিয়া, এমন যে সখের প্রাণটি, সে প্রাণটি আজ হারাইলাম।"

চতুর্থ পর্ব– বসিয়া আছে দুইটি ভূত

যাহা হউক, মনের কিল মারিয়া মিনসে আমার শীতলাটি কাড়িয়া লইল। আমি পলাইলাম। প্রাণটা যে রক্ষা পাইল, তাই ঢের। পথে যাইতে যাইতে, মনে মনে শীতলাকে বলিলাম যে, —"মা! আর তোমার গান করিতে আমি চাইনা, তোমার চা'ল পয়সা আর চাই না। পিঠের হাড়গুলি যে চুরমার হইয়া গিয়াছে, এখন তাই তুমি রক্ষা কর, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া যাই।"

গগন বলিলেন,—"ঈশ! তাই তো। এ যে ঠিক সেই সুবল ঘোষের কথা।"

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সুবলের কি হইয়াছিল?"

গগন বলিলেন, দুধ বেচিয়া সুবলের পিসী কিছু টাকা করিয়াছিলেন! পিসী মরিয়া যাইলে সুবল সেই টাকাগুলি পাইলেন। টাকা পাইয়া সুবল মনে করিলেন যে, দুর্গোৎসবটি করি। ঠাকুরগড়া হইল, পূজার দিন আসিল। সিঙ্গি, চোরা, ময়ূর, গণেশের শুঁড়, এইসব দেখিয়া সুবলের মনে বড় আনন্দ হইল, হাড়ে হাড়ে তাঁর ভক্তি বিঁধিয়া গেল। পূজার কয়দিন স্বয়ং নিজে ক্রমাগত শাঁক বাজাইলেন। প্রাণপণ চিক্কুড়ে শাঁকে ফুঁ দিলেন। কোঁৎ পাড়িয়া শাঁক বাজাইতে বাজাইতে এখন গোগগোলের জ্বালায় অস্থির হইয়া, বিসর্জ্জনের সময় গিয়া ঠাকুরের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। গলায় কাপড় দিয়া, হাত যোড় করিয়া ঠাকুরকে বলিলেন,

ধন চাই না, মা! মান চাই না মা! চাই না পুত্তুর বর।
এখন শঙ্খ বাজাইতে গিয়া গোগ্‌গোল তাই রক্ষা কর।।

নয়নেরও ঠিক তাই হইয়াছিল। চা'ল চাই না মা! পয়সা চাই না মা! এখন এই হাড়গুলি যোড়া লাগাইয়া দাও। কেমন হে নয়ন! ঠিক নয়?"

নয়ন বলিলেন, হাঁ, ভাই, ঠিক তাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা বলিব কি ভাই! পাঁচ সাত দিন পরে আমার নামে এক চিঠি উপস্থিত। মাতালটা আমার ঠিকানা জানিল কি করিয়া? চিঠিতে লেখা ছিল যে, শীঘ্র আসিয়া তোমার শীতলা লইয়া যাইবে। তোমার এ জাগ্রত শীতলা। এ শীতলা লইয়া আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি। তোমার কোন ভয় নাই। শীঘ্র তোমার শীতলা লইয়া যাইবে।

যাই কি না যাই? একথা লইয়া মনে মনে অনেক তোল-পাড় করিতে লাগিলাম। গিন্নী রাগিয়া বলিলেন,—যাও-ই-না ছাই! তোমায় সে কি খাইয়া ফেলিবে?"

আমি বলিলাম,—"তুমি তো বলিলে, যাও-ই না ছাই! কিন্তু সে কিলের স্বাদ তো আর তুমি জান না? মনে করিতে গেলে এখনও আমার আত্মাপুরুষ শুকাইয়া যায়। চুণে-হলুদ [illegible]ডা পড়িয়া গেল, তবু বল, যাও-ই না ছাই। এঁটেল মাটী দিয়া আর প্রাণটি তো আর এঁটেল মাটী দিয়া গড়িতে পারিব না!"

যাহা হউক, অবশেষে যাওয়াই স্থির করিলাম। সন্ধ্যার পর ভয়ে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে প্রাণটি হাতে করিয়া সেই মাতালের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলাম। বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিলাম। ন জনঃ ন মানবঃ। কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। বাহিরের ঘরের দ্বারের নিকটে গিয়া একটু উঁকি মারিয়া দেখিলাম বাপুরে! বলিতে এখনও সর্ব্ব শরীর শিহরিয়া উঠে! বাহিরের ঘরের ভিতর দেখি, না, বসিয়া আছে দুইটি ভূত!

লম্বোদর বলিলেন,—"মাইরি?"

নয়ন বলিলেন,—"মাইরি ভাই! দেখিলাম যে, ঘরের ভিতর বসিয়া আছেন দুইটি ভূত।" —সর্ব্ব শরীর ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। পা যেন পুঁতিয়া গেল! টাকরা পর্য্যন্ত ধূলি মাড়িয়া গেল! পলাইতে পা উঠে না, চেঁচাইতে রা সরে না! অজ্ঞান হতভোম্বা হইয়া আমি সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

দুই জনের মধ্যে যিনি কর্ত্তা-ভূত আমাকে দেখিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মুখ দিয়া তাঁর আগুনের হল্কা বাহির হইতে লাগিল। তিনি আমাকে হাতছানি দিয়া ভিতরে ডাকিলেন। আমাতে কি আর আমি ছিলাম যে ভাবিব চিন্তিব? সুড় সুড় করিয়া ভিতরে যাইলাম। আমাকে বসিতে বলিলেন। আস্তে আস্তে আমি ঘরের এক পাশে বসিলাম।

কর্ত্তা ভূত বলিলেন,—আমাকে চিনিতে পারিলে না। আমি সেই মিস্তির-জা, যে তোমার শীতলা কাড়িয়া লইয়াছিল। তোমার এ শীতলাটি জাগ্রত বটে! কেবল ঐ শীতলাটির জন্য ভূত হইয়া আমাকে আট্‌কে থাকিতে হইয়াছে, তা না হইলে বাস আমার বৈকুণ্ঠে। এখন তোমার শীতলাটি ফিরিয়া লও, যে আমি বৈকুণ্ঠে চলিয়া যাই।"

দ্বিতীয় ভূত বলিলেন,—'আহা! ইহারে তুমি অনেক কিল মারিয়াছ, তাড়াতাড়ি বিদায় করিও না। ইহার শীতলা কেন যে জাগ্রত সে কথাগুলি ইহাকে খুলিয়া বল। লোকের কাছে গিয়া এ গল্প করিবে। তাহা হইলে লোকে আরও ভক্তিভাবে ইহার শীতলাকে পূজা দিবে। ইহার দুপয়সা রোজগার হইবে। পেটে খাইলে পিঠে সয়। পিঠে বিলক্ষণ হইয়াছে, এখন পেটে খাইবার সুবিধা করিয়া দাও।"

কর্ত্তা-ভূত আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেমন হে! সব কথা শুনিতে চাও? কিসে বৈকুণ্ঠটি আমার কানের কাছ দিয়া গিয়াছে, কথা শুনিতে চাও?"

ভূতেদের কথা শুনিয়া আমার মনে অনেকটা সাহস হইয়াছিল, ধড়ে প্রাণের সঞ্চার হইয়াছিল, আমি বলিলাম,—"আজ্ঞে হাঁ শুনিতে চাই বই কি? তবে মহাশয়ের কিলের কথা মনে হইলে আর জ্ঞান থাকে না।"

কর্ত্তা-ভূত হাসিয়া বলিলেন,—"না, না, আর কিল মারিব না। তোমার ঘাড়ও মটকাইয়া দিব না। কেন তোমার শীতলাকে জাগ্রত বলিতেছি, এখন সে সকল কথা শুন।'

আড্ডাধারী মহাশয় ও লম্বোদর গগন প্রভৃতি বলিয়া উঠিলেন,—"নয়ান! তোমার সাহস তো কম নয়! স্বচ্ছন্দে বসিয়া ভূতেদের সঙ্গে তুমি গল্পগাছা করিলে? বুকের পাটা তো তোমার কম নয়?"

নয়ন উত্তর করিলেন,—“বেঁধে মারে সয় ভাল। করি কি? ভূতের খর্পরে গিয়া পড়িয়াছি, পলাইবার তো যো ছিল না, কাজেই কাদায় গুণ ফেলিয়া পড়িয়া থাকিতে হইল। তা না হইলে সদাই ভয় হইতেছিল। কি জানি? ভূতের মরজি! যদি বলিয়া বসে যে তোমার পিঠ দেখিয়া আমাদের হাত সুড় সুড় করিতেছে, এস ভাঙ্গিয়া দিই! তাহা হইলে কি করিতাম! যাহা হউক, সেরূপ কোন বিপদ ঘটে নাই। ভূতগুলি দেখিলাম ভাল-মানুষ ভূত। সেই কর্ত্তা-ভূতের এখন আশ্চর্য্য কাহিনী শুন।”

পঞ্চম পর্ব– কর্ত্তা-ভূত বলিতেছেন!

কর্ত্তা-ভূত বলিতেছেন,—তোমার শীতলাটি কাড়িয়া মনে মনে আমার বড়ই আনন্দ হইল। কারণ এইরূপ কাজে যেরূপ আমার আনন্দ হইত, এমন আর কোনও কাজে নয়। কিন্তু তোমার শীতলাটি জাগ্রত শীতলা, মরা শীতলা নয়। ভাল এঁটেল মাটী, ভাল সিন্দুর ভাল রাঙ্গতা দিয়া গড়া। বেলে মাটী নয়, মেটে সিঁন্দুর নয়, জাল রাঙ্গতা নয়। তাই দুই দিন পরেই আমার বসন্ত হইল। তোমার সেই চৌষট্টি হাজার বসন্তে আমায় ছাইয়া ধরিল। চুলের ডগা পায়ের কোড়ে আঙ্গুলের আগা পর্য্যন্ত তিল রাখিবার স্থান ছিল না। বৈদ্য আসিয়া মহাদেব চূর্ণ ও গৌরচন্দ্রিকা ঘৃতের ব্যবস্থা করিলেন। মহাদেব চূর্ণ খাইতে দিলেন আর গৌরচন্দ্রিকা ঘৃত গায়ে মাখিতে বলিলেন। ঔষধের ব্যবস্থা দেখিয়াই বুঝিলাম যে এবার গতিক বড় ভাল নয়। তিন দিন পরে রাত্রিকালে যমদূতেরা আমাকে লইতে আসিল। চারিটি যমদূত আসিয়াছিল। সব বিকটমূর্ত্তি, দেখিলে প্রাণ শুকাইয়া যায়।

যমদূতেরা আসিয়া আমার মাথায় হাত বুলাইয়া টিকিটি খুঁজিতে লাগিল, ইচ্ছা যে টিকিটি ধরিয়া আমাকে যমপুরে লইয়া যায়! কিন্তু আগে থাকিতে আমি একটি বুদ্ধির কাজ করিয়া রাখিয়া ছিলাম। সেই দিন প্রাতঃকালে, রোগের বে-গতিক দেখিয়া মনে মনে করিলাম যে, পৃথিবীতে আসিয়া আমি কখনও কোনও একটি পূণ্যকর্ম্ম করি নাই। চিরকাল পাপ করিয়াছি। নরহত্যা ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, স্ত্রীহত্যা, চুরি, জাল প্রভৃতি যাঁহা কিছু পাপ কর্ম্ম সকলই করিয়াছি। ভাল কাজ একটিও কখনও করি নাই। এখন তো দেখিতেছি, মৃত্যু উপস্থিত। যমকে গিয়া জবাব দিব কি? তাই মনে করিলাম যে এই অন্তিমকালে একটি পূণ্য কাজ করি। আমি চান্দ্রায়ণটি করিলাম! গোয়ালে আমার একটি এঁড়ে বাছুর ছিল। আমি মিত্তির-জা! আমার গোয়ালের এঁড়ে বাছুর কেমন তা বুঝিয়া লও। এক ফোঁটা দুধ থাকিতে গাইকে আমি কখনও ছাড়ি নাই। মা’র দুধ কারে বলে বাছুরটি তা কখনও চক্ষে দেখে নাই। অন্য খাওয়া দাওয়াও তদ্রুপ। সুতরাং না খাইয়া খাইয়া বাছুরটি অস্থিচর্ম্ম-সার হইয়াছিল। মর-মর হইয়াছিল। সেই এঁড়ে বাছুরটি একজন ব্রাহ্মণকে দান করিলাম। দড়ি ধরিয়া বাছুরটিকে ব্রাহ্মণ লইয়া চলিলেন। আমার বাড়ীর বাহির হইয়াই রাস্তার উপর বাছুর শুইয়া পড়িল, সেইখানেই মরিয়া গেল।

চান্দ্রায়ণ করিতে মাথাটি নেড়া হইয়া ছিলাম। মাথাটি ঠিক্ বোম্বাই ওলের মত হইয়াছিল। যমদূতেরা টিকি ধরিয়া আমাকে যমের বাড়ী লইয়া যাইবেন, তার যো ছিল না।

অন্ধকারে যমদূতেরা আমার মাথায় হাত বুলাইয়া দেখিল যে, টিকি নাই। যমদূতেরা ফাঁফরে পড়িল। কি ধরিয়া আমাকে লইয়া যায়? অবশেষে চিন্তা করিয়া তাহারা আমার হাত ধরিল। গৌরচন্দ্রিকা -ঘৃতে আর বসন্তের রসে আমার গা হড়-হড়ে হইয়াছিল। অনায়াসেই আমি হাতটি ছাড়াইয়া লইলাম। পা ধরিল, হড়াৎ করিয়া পা-টিও ছাড়াইয়া লইলাম। যেখানে ধরে আর আমি পিছলে গিয়া সরিয়া বসি। কখনও তক্তোপোষের উপর, কখনও তক্তোপোষের নীচে, কখনও ঘরের মাঝখানে, কখনও পাশে, এ কোণে, সে কোণে, যমদূতদিগের সঙ্গে সমস্ত রাত্রি অন্ধকারে আমি এইরূপ পেছলা-পিছলি করিতে লাগিলাম। কিন্তু তারা হইল চারি জন, আমি হইলাম একা। কতক্ষণ আর পেছলা-পিছলি করিব? ভোর মাথায় তাহারা হাতে ছাই ও মাটী মাখিয়া আসিল। সুতরাং আর আমি পিছলে যাইতে পারিলাম না। আমাকে বাঁধিয়া ফেলিল।

উত্তমরূপে বাঁধিয়া, যমদূতেরা আমাকে কাঁটাবন দিয়া হিঁচড়ে লইয়া চলিল। আমি পাপী কি না? কাঁটা ফুটিয়া, ছড়িয়া গিয়া, শরীর হইতে আমার দরদর ধারে রক্ত পড়িতে লাগিল। অবশ্য জীয়ন্ত অবস্থা যে শরীরে আমি মিত্তির-জা ছিলাম, সে শরীর নয়। যে শরীর যমালয়ে যায়, সেই শরীর; ঠিক বুড়ো আঙ্গুলের মত। সকাল হইল। প্রাতঃক্রিয়া সমাধা করিবার নিমিত্ত যমদূতেরা একটি পুকুরের সানবাঁধা ঘাটে গিয়া বসিল। একটি যমদূত আমার নিকট পাহারা রহিল, বাকী তিন জন মাঠে ঘাটে যাইল।

আমার নিকট যে যমদূতটি ছিল, সে আমাকে বলিল,—"খুব মজার লোক তো তুমি! এত লোককে আমরা লইয়া যাই,—কিন্তু সমস্ত রাত্তির পেছলা-পিছলি কাহারও সঙ্গে কখনও করিতে হয় না। আচ্ছা, ভাল, তোমাকে আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমার মাথায় তো টিকি দেখিলাম না। টিকি না পাইয়া আমাদের বড়ই অসুবিধা হয়। তা আমাদের অসুবিধা হয় হউক, তাহাতে বড় ক্ষতি নাই।। কিন্তু কথাটা জিজ্ঞাসা করি এই যে, যাদের মাথায় টিকি না থাকে, তাদের সঙ্গে লোকের ঝগড়া হইলে, লোকেরা কি ধরিয়া তাদের দুই গালে দুই থাবড়া মারে?"

আমি উত্তর করিলাম,—চড় খাইতে সুবিধা হইবে বলিয়া কি লোকে মাথায় টিকি রাখে?" —যমদূত জিজ্ঞাসা করিলেন তবে কি জন্যে? আমরা ভাল করিয়া ধরিতে পারিব, সেই জন্যে?"—আমি উত্তর করিলাম,—"তাও নয়। এই যে তারের খবর আছে, সেই টুক্-টুক্ করিয়া শব্দ হয়? টিকি না থাকিলে, মাথা দিয়া সেই তারের খবর বাহির হইয়া যায়। সেই জন্য লোকে মাথায় টিকি রাখে।"

যমদূত বলিলেন,—"ওঃ! বটে। সেই জন্যে? এখন বুঝিলাম।"কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া যমদূত বলিলেন,—"তোমাদের পাড়ার নেই আঁকুড়ে দাদাকে জানিতে ?"

আমি বলিলাম,—'জানিতাম, বই কি, আজ কয় বৎসর তিনি মরিয়া গিয়াছেন শুনিয়াছি, মরিয়া ভূত হইয়াছেন।"

যমদূত বলিলেন, "হাঁ! তিনি ভূত হইয়াছেন। ভগিনীকে যম-যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার

করিবার জন্য তিনি বলিয়াছিলেন, এই পুষ্করিণীটি আমার।"

আমি বলিলাম,—"এ পুষ্করিণী তাঁর কেন হবে? এ পুকুর যে রাঘব গাঙ্গুলির!"

যমদূত বলিলেন,—"হাঁ, এ পুষ্করিণী রাঘব গাঙ্গুলির বটে, তবে নেই-আঁকুড়ে দাদা বলিয়াছিলেন, যে আমার—সে কেবল ভগিনীকে যমের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি হইয়াছিল, বলিলেন?"

যমদূত বলিলেন,—"বলিব না কেন, বলিব! তবে তুমি যে মহিরাবণের বেটা অহিরাবণের মত পেছলা-পিছলি কর! সে জন্য তোমার সহিত কথা কহিতে ইচ্ছা করে না। যাই হউক, শুন।"

ষষ্ঠ পর্ব– নেই-আঁকুড়ে দাদা

যমদূত বলিতেছেন,—নেই আঁকুড়ে দাদার একটি বিধবা ভগিনী ছিলেন। একাদশীর দিন বৈকাল বেলা বাড়ীর নিকট বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, একটি কলাগাছে দিব্য একখানি আগুট পাতা হইয়া রহিয়াছে। মনে মনে মানস করিলেন যে, কা'ল এই আগুট পাতাখানিতে আমি ভাত খাইব। দৈবের কর্ম্ম, সেই রাত্রিতে তাঁর মৃত্যু হইল। বিধবা অতি পুণ্যবতী ছিলেন। সেই জন্য বিষ্ণুদূতেরা তাঁহাকে বৈকুণ্ঠে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আসিল। এদিকে আবার একাদশীর দিন খাবার বাসনা করিয়াছিলেন, সুতরাং আমারও তাঁহাকে লইতে যাইলাম। বিধবাকে লইয়া বিষ্ণুদূতে ও যমদূতে কাড়াকাড়ি উপস্থিত হইল। ক্রমে শ্রাদ্ধ গড়াইল! সেই ঘরের ভিতর সেই রাত্রিতে, বিষ্ণুদূতে আর যমদূতে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া গেল! অবশেষে আমরা জিতিলাম। বিষ্ণুদূতদিগকে তাড়াইয়া দিলাম। যেমন তোমাকে লইয়া যাইতেছি, সেইরূপ বিধবাকেও কাঁটাবন দিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিলাম। যমপুরীতে লইয়া উপস্থিত করিলাম। বিধবার মাথায় ক্রমাগত ডাঙ্গস মারিতে যম হুকুম দিলেন। ডাঙ্গসের প্রহারে জুর-জুর হইয়া বিধবা পরিত্রাহি ডাক ছাড়িতে লাগিল। আর মাঝে মাঝে বলিতে লাগিল যে,—"হায় রে! যদি আমার নেই-আঁকুড়ে দাদা এখানে থাকিত, তাহা হইলে দেখিতাম, কি করিয়া যম এরূপ সাজা দিত?" যমের কানে সেই কথাটি প্রবেশ করিল। যম জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মাগি কি বলিতেছে?" আমরা বলিলাম,—"বিধবা বলিতেছে যে, আমার নেই-আঁকুড়ে দাদা এখানে থাকিত, তাহা হইলে দেখিতাম, যম কি করিয়া আমায় এরূপ সাজা করিত।" যমের রাগ হইল। যম বলিলেন,—নিয়ে আয় তো রে ওর নেই আঁকুড়ে দাদাকে! দেখি কি করিয়া সে আপনার বোন্‌কে বাঁচায়?" নেই আঁকুড়ে দাদাকে আনিতে আমরা দৌড়িলাম। নেই-আঁকুড়ে দাদা ঘরে নিদ্রা যাইতেছিলেন। ভগিনী যে মরিয়াছে, ভগিনীর যে এরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে, তাহার তিনি কিছুই জানিতেন না। আমরা তাঁহাকে উঠাইলাম। আমরা বলিলাম—"চলুন, যম আপনাকে ডাকিতেছেন।" তিন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমার কি সময় হইয়াছে?" আমরা বলিলাম;—"না, আপনার এখনও সময় হয় নাই, এই শরীরেই আপনাকে একবার যমের বাড়ী যাইতে হইবে, একটা মীমাংসা করিয়া আপনি ফিরিয়া

আসিবেন।" নেই আঁকুড়ে দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন,—কথাটা কি? শুনিতে পাই না? যমের বাড়ী গিয়া তাহার ভগিনী কি বলিয়াছিলেন, আমরা সে সব কথা তাঁহাকে খুলিয়া বলিলাম, নেই-আঁকুড়ে দাদা বলিলেন,—"বটে। আচ্ছা, চল যাই।" পথে যাইতে যাইতে নেই-আঁকুড়ে দাদা ক্রমাগত বলিতে বলিতে চলিলেন, "দেখ, এই স্কুলে আমি একটি দেবালয় করিব মানস করিয়াছি।" আবার খানিক দূব গিয়া, "এই স্থলে আমি একটি অতিথিশালা করিব, আমার এই ইচ্ছা।" আবার খানিক দূর গিযা, "সাধারণে জল পান করিবে বলিয়ে এই জলাশয়টি আমি করিয়া দিয়াছি।" এইরূপ স্কুল, কলেজ, ডাক্তারখানা, রাস্তা, ঘাট করিবার কথা আমাদিগকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতে লাগিলেন! যমপুরীতে উপস্থিত হইলাম, যমের সম্মুখে নেই-আঁকুড়ে দাদাকে খাড়া করিয়া দিলাম।

যম বলিলেন,—"নেই আঁকুড়ে শোন, তোব বোন ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা। একাদশীর দিন আঙট পাতে ভাত খাইবার মানস করিয়াছিল। সেই পাপের জন্য আমি তার মাথায় ডাঙ্গস মারিতে হুকুম দিয়াছি। সে বলে, আমার নেই-আঁকুড়ে দাদা থাকিলে যম আমার এরূপ সাজা দিতে পারিত না। তার আস্পর্দ্ধার কথা শুনিযা তোবে আমি এখানে আনিয়াছি। কি করিয়া বোনকে বাঁচাইবি, বঁচা!" নেই-আঁকুড়ে দাদা বলিলেন,—"আমার পুণ্যের অর্দ্ধেক আমি আমার ভগিনীকে দিলাম। সেই পুণ্য লইয়া আমার ভগিনীকে আপনি খালাস দিন।নেইআঁকুড়ের কি পূণ্য আছে দেখিবার নিমিত্ত চিত্রগুপ্তকে আদেশ করিলেন। খাতা-পত্র দেখিয়া চিত্রগুপ্ত বলিলেন যে, নেই-আঁকুড়ের পুণ্য কিছুই নাই। রাগিয়া যম বলিলেন,—"শুনলি তো নেই-আঁকুড়ে, তোর এক ছটাকও পুণ্য নাই! বোনকে তাব আবার ভাগ দিবি কি?" নেই-আঁকুড়ে উত্তর করিলেন, "পুণ্য আছে কি না আছে, আপনার এই যমদূতদিগকে জিজ্ঞাসা করুন!" যম আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরা বলিলাম,—হাঁ মহাশয়! পথে আসিতে আসিতে,এখানে দেবালয় করিবার মানস আছে, এখানে স্কুল করিবার মানস আছে, নেই-আঁকুড়ে এইরূপ নানা কথা বলিয়াছিলেন।" যম আরও রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন—"ভণ্ড! সে সকল কাজ .তা তুই করিস নাই, কেবল মনে মনে মানস করিলে কি হইবে?" নেই-আঁকুড়ে উত্তর করিলেন,—"আমার ভগিনী আঙটপাতে ভাত খাইয়াছিলেন না কেবল মানস করিয়াছিলেন?" যম বলিলেন,—"মানস করিয়াছিল।" নেই-আঁকুড়ে বলিলেন,—"তবে? যম বুঝিলেন যে, কেবল মানস করিলে যদি পাপের শাস্তি দিতে হয়, তাহা হইলে পুণ্যের ফল দিতে হয়। বে-আইনি করিয়া তিনি যে বিধবার মাথায় ডাঙ্গস মারিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, যম এখন তাহা বুঝিলেন। বিধবাকে মুক্ত করিয়া দিবার আদেশ করিলেন। বিষ্ণুদূতেরা আসিয়া বিধবাকে বৈকুণ্ঠে লইয়া গেল। নেই-আঁকুড়ে দাদা আপনার ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। তাহার কিছুদিন পরে নেই-আকুঁড়ের মৃত্যু হইল। তাঁহার গতি হয় নাই। ভূত হইয়া তিনি এখন লোকের উপর উপদ্রব করিতেছেন।

সপ্তম পর্ব— এঁড়ে গরু

কর্ত্তা-ভূত অর্থাৎ মিত্তির-জা বলিতেছেন, যমদূতদিগের কাজ সারা হইল পুনরায় তাহারা আমাকে যমালয় অভিমুখে লইয়া চলিল। অনেকক্ষণ পরে যমপুরীতে গিয়া আমরা উপস্থিত হইলাম। যমদূতেরা যমের সম্মুখে আমাকে খাড়া করিয়া দিল। যম সিংহাসনে বসিয়া আছেন। পাশে খাতা পত্র লইয়া চিত্রগুপ্ত। চারিদিকে শত শত বিকটমূর্ত্তি যমদূত। কাহারও হাতে মুগুর, কাহারও হাতে ডাঙ্গস, কাহারও হাতে সাঁড়াসী। আমার পাপ-পুণ্যের হিসাব দেখিতে যম চিত্রগুপ্তকে আদেশ করিলেন। অনেক খাতা-পত্র উল্টাইয়া চিত্রগুপ্ত বলিলেন, মহাশয়! ইহার পুণ্য তো কিছুই দেখিতে পাই না, সকলই পাপ! অতি উৎকট উৎকট পাপ। ইহার মত মহাপাতকী পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় ছিল না। মরিবার সময় এ যে চান্দ্রায়ণটি করে তাও সব ফাঁকি। যমদূতদিগকে কষ্ট দিবার নিমিত্ত কেবল মাথাটি নেড়া হইয়াছিল। পুণ্য ইহার কিছু মাত্র নাই, কেবল পাপ। তবে এক বিন্দু পুণ্য আছে এই যে, মৃত্যু হইবার পূর্ব্বে এক জন ব্রাহ্মণকে একটি মর-মর এঁড়ে গরু দান করিয়াছিল। কিন্তু বাছুরটি ব্রাহ্মণকে ঘরে লইয়া যাইতে হয় নাই; পথেই শুইল, আর মরিল। মরিয়া সে এঁড়ে বাছুরটি এখন যমপুরীতে আসিয়াছে।

আমাকে সম্বোধন করিয়া যম বলিলেন,—"কেমন হে মিত্তির-জা! চিত্রগুপ্তের মুখে তোমার হিসাব শুনিলে তো! এখন তুমি কি করিতে চাও! তোমার যে রতিমাত্র পুণ্যটুকু আছে আগে তাহার ফল ভোগ লইতে চাও না আগে পাপের ভোগ ভুগিতে চাও?"

আমি উত্তর করিলাম,—'মহাশয়! আপনার এখানে কিরূপ দস্তুর, কিরূপ আইন-কানুন, তা তো আমি জানি না? আমাকে একটু বুঝাইয়া বলুন আমার পুণ্যের ফল কিরূপ হইবে, আর পাপের ভোগই বা কি প্রকার হইবে? তারপর আমি আপনাকে বলিব, আগে আমি কোন্‌টি চাই।"

যম উত্তর করিলেন,—"সমস্ত জীবন তুমি উৎকট উৎকট মহাপাতক করিয়াছ। সে জন্য চিরকাল তোমাকে রৌরব প্রভৃতি নরকে বাস করিতে হইবে। তোমার গলিত দেহে কৃমি প্রভৃতি নানারূপ ভয়াবহ কীট দংশন করিবে, অগ্নিতে তোমাকে পুড়িতে হইবে। অষ্টপ্রহর যমদূতে তোমার মাথায় ডাঙ্গস মারিবে। সাঁড়াসী দিয়া যমদূতে তোমার গায়ের মাংস ছিঁড়িবে বিধিমত তোমার যন্ত্রণা হইবে, যাতনায় তুমি চীৎকার করিবে। চিরকাল তোমাকে এইরূপ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। তবে সেই যে সামান্য একটু নাম মাত্র পুণ্য করিয়াছিলে মরিবার পূর্ব্বে সেই যে মর মর এঁড়ে বাছুরটি ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলে, কেবল মাত্র এক দিনের জন্য সেই পুণ্যটুকুর ফল ভোগ করিতে পাইবে। সেই এঁড়ে গরুটি এখন এখানে আসিয়াছে। এক দিনের জন্য তাহারে তুমি যা আনিয়া দিতে বলিবে, তাহাই সে আনিয়া দিবে; যা করিতে বলিবে, তাহাই সে করিবে। তোমার পুণ্যের ফল এই।"

আমি বলিলাম,—"পুণ্যের ফলটি আমি প্রথমে ভোগ করিয়া লইব। পাপের দণ্ড যাহা হয়, তাহার পর আপনি করিবেন।"

যম আজ্ঞা করিলেন,—"ওরে! মিত্তিরজার সেই এঁড়ে গরুটা আন্‌তো!"

এঁড়ে গরু আনিতে যমদূত সব দৌড়িল। এঁড়ে গরু আনিয়া যমের দরবারে হাজির করিল। আমি দেখিলাম, এখন আর সে অস্থিচর্ম্ম-সার এঁড়ে বাছুর নাই! আমার ঘরে খাবার কষ্ট ছিল যমের ঘরে তো আর সে কষ্ট ছিল না! যমপুরীতে অনেক খোল ভূষি খাইয়া বাছুরটি এখন বিপর্য্যয় এক ষাঁড় হইয়াছিল। লম্বা লম্বা বিপর্য্যয় দুই সিং! দেখিলে ভরিভক্তি উড়িয়া যায়। চক্ষু ঘোর রক্তবর্ণ! রাগে আস্ফালন করিয়া ফোঁশ ফোঁশ করিতেছে। রাগে পা দিয়া মাটী চষিয়া ফেলিতেছে। কারে ঘুঁতাই কারে মারি সদাই এই মন! দুই দিকে দুই দড়ী ধরিয়া চারি যমদূতে টানিয়া রাখিতে পারিতেছে না।

যম বলিলেন,—"মিত্তির-জা! এই তোমার সেই এঁড়ে গরু! তুমি ইহাকে যাহা বলিবে, এই এঁড়ে গরু আজ সমস্ত দিন তাহাই করিবে।

এঁড়ে গরুকে ছাড়িয়া দিবার নিমিত্ত যম আদেশ করিলেন। চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া সিং নীচে করিয়া এঁড়ে গরু আসিয়া আমার নিকট দাঁড়াইল।

আমি জিজ্ঞাস করিলাম—"কেমন হে এঁড়ে গরু! আজ আমি তোমাকে যা বলিব, তাই তুমি করিবে তো?" —এঁড়ে গরু উত্তর করিল,—"আজ্ঞে হাঁ! আজ সমস্ত দিন আপনি যাহা করিতে হুকুম করিবেন, আমি তাহাই করিব।"

আমি বলিলাম,—এঁড়ে গরু! তবে তুমি এক কাজ কর। তোমার একটি সিং যমের নাভিকুণ্ডলে প্রবিষ্ট করিয়া দাও, আর একটি সিং চিত্রগুপ্তের নাভিকুণ্ডলে দিয়া, আজ সমস্ত দিন এই দুই জনকে ঘুরাও সমস্ত দিন দুই জনকে বন্ বন্ করিয়া চরকীর পাক খাওয়াও।"

লম্বোদর গনন, আড্ডাধারী মহাশয়, সকলেই হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সকলেই বলিলেন—"বাহবা! বাহবা মিত্তির-জা! তুমি এক জন লোক বটে! কিন্তু নয়ন, মিত্তির-জা! তোমাকে ঠিক কথা বলেন নাই। নাভিকুণ্ডলে মিত্তির-জা যে সিং দিতে বলিবেন, মিত্তির-জা! তেমন পাত্র নন্। শরীরের অন্যস্থানে সিং দিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু কথাটি ভদ্রসমাজে বলিবার যোগ্য নয়। সেই জন্য বোধ হয় মিত্তির-জা তোমার নিকট আসল কথাটি গোপন করিয়াছিলেন।"

নয়ন উত্তর করিলেন,—আমারও মনে সে সন্দেহটি উপস্থিত হইয়াছিল। কারণ, যখন এই নাভিকুণ্ডলের কথাটি বলেন, তখন মিত্তির-জা ভূতের মুখে ঈষৎ একটি হাসির রেখা দেখা দিয়াছিল। যাহা হউক, মিত্তির-জা ভূত কি বলিতেছেন, তাহা শুন।"

মিত্তির-জা ভূত বলিলেন,—আমার আদেশ পাইয়া এঁড়ে গরু যম ও চিত্রগুপ্তকে তাড়া করিল। ভয়ে দুই জনের প্রাণ উড়িয়া গেল। সিংহাসন হইতে যম লাফাইয়া পড়িলেন। খাতা-পত্র ফেলিয়া চিত্রগুপ্তও লাফাইয়া পড়িলেন। তারপর, এই দৌড়! দৌড়! প্রাণপণ যতনে দৌড়।

কিন্তু দৌড়িয়া যাবেন কোথা? এঁড়ে গরু না-ছোড়-বান্দা! যেখানে দৌড়িয়া পালান, সিং বাগাইয়া সঙ্গে সঙ্গে সেইখানেই আমার এঁড়ে গরু গিয়া উপস্থিত হয়।

অষ্টম পর্ব— মিত্তিরজার পুণ্য

কর্ত্তা-ভূত বলিতেছেন,—যমপুরীর ভিতর কোনও স্থলে পলাইয়া যম ও চিত্রগুপ্ত নিস্তার পাইলেন না। যেখানে তাঁহারা যান, আরক্তঘুর্ণিত নয়নে এঁড়ে গরুও সেই স্থলে গিয়া তাঁহাদিগকে তাড়া করে। যমপুরী ছাড়িয়া উদ্ধশ্বাসে দুই জনে ইন্দ্রের ইন্দ্রলোকে গিয়া উপস্থিত হইলেন, সেখানেও এঁড়ে গরু সঙ্গে সঙ্গে। শিবের শিবলোকে যাইলেন, সেখানেও এঁড়ে গরু! ব্রহ্মার ব্রহ্মালোকে, সেখানেও এঁড়ে গরু! পরিত্রাণ আর কোথাও পান না। অবশেষে হাঁপাইতে হাঁপাইতে দুই জনে বৈকুণ্ঠে গিয়া উপস্থিত। যেখানে নারায়ণ শুইয়া আছেন, আর লক্ষ্মী পা টিপিতেছিলেন, গলদঘর্ম্ম মুমূর্ষুপ্রায় যম ও চিত্রগুপ্ত সেই স্থলে গিয়া উপস্থিত। বৈকুণ্ঠের দ্বারে সুদর্শন চক্র ঘুরিতেছিল। এঁড়ে গরু বৈকুণ্ঠের ভিতর প্রবেশ করিতে পারিল না। সিং পাতিয়া দ্বারে দাঁড়াইল। যম ও চিত্রগুপ্ত বাহির হইলেও তাঁহাদিগকে সিঙে লইয়া ঘুরাইবে।

যম ও চিত্র গুপ্তের দুরবস্থা দেখিয়া, নারায়ণ বিস্ময়াপন্ন হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া নারায়ণকে তাঁহারা আদ্যোপান্ত বিবরণ শুনাইলেন। নারায়ণ বলিলেন,—"এ মানুষটি দেখিতেছি, সাধারণ মনুষ্য নয়। ইহাকে মিষ্ট কথা বলিয়া বশ করিতে হইবে। তা না হইলে, ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব, শিবের শিবত্ব, ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব, আমার নারায়ণত্ব, এ সব কাড়িয়া লইবে । দেশে আমাদিগকে ফকীর হইয়া বেড়াইতে হইবে। চল, আমরা এখন সকলে সেই মানুষটির কাছে যাই।"

যম বলিলেন,—"দ্বারে সেই এঁড়ে গরু দাঁড়াইয়া আছে। বাহির হইলেই আমাদের সে নিগ্রহ করিবে। আপনি গিয়া সেই মিত্তির-জাকে সান্ত্বনা করুন, আমরা এই স্থলে বসিয়া থাকি।"

নারায়ণ বলিলেন,—"তোমাদের ভয় নাই, তোমরা আমার সহিত এস। আমি এঁড়ে গরুকে বুঝাইয়া বলিব, সে তোমাদের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিবে না।"

এইরূপ আশ্বাস পাইয়া যম ও চিত্রগুপ্ত ভয়ে ভয়ে নারায়ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন, নারায়ণ আগে আগে চলিলেন। দ্বারে আসিয়া দেখিলেন যে, এঁড়ে গরু সিং পাতিয়া দাঁড়াইয়া আছে। নারায়ণকে দেখিয়া এঁড়ে গরু বলিল,—"মহাশয়! আপনার বাটীতে যম ও চিত্রগুপ্ত গিয়া আশ্রয় লইয়াছে। শীঘ্র তাহাদিগকে বাহির করিয়া দিন। তাহাদিগকে সিঙে লইয়া আমি ঘুরাইব। মিত্তির-জা আমাকে এই আজ্ঞা করিয়াছেন।"

সুমিষ্টভাবে নারায়ণ বলিলেন,—"এঁড়ে গরু! তুমি ব্যস্ত হইও না। যম ও চিত্রগুপ্ত পলায় নাই। ঐ দেখ, আমার পশ্চাৎ আসিতেছে। তাহাদিগকে সিঙে লইয়া ঘুরাইতে মিত্তির-জা তোমাকে বলিয়াছেন। আচ্ছা মিত্তির-জা যদি যম ও চিত্রগুপ্তকে অব্যাহতি দেন, তাহা হইলে তুমি তাঁর কথা শুনিবে তো?"

এঁড়ে গরু উত্তর করিল,—মিত্তির-জা আমাকে হুকুম দিয়াছেন। মিত্তির-জা যদি পুনরায় বলেন না, ইহাদিগকে সিঙে করিয়া ঘুরাইতে হইবে না, তাহা হইলে তাঁর কথা শুনিব না

কেন? অবশ্য শুনিব।"

নারায়ণ বলিলেন,—"তবে আমার সঙ্গে এস! সকলে চল, মিত্তির-জার কাছে যাই।"

নারায়ণ আগে, তাঁহার পশ্চাতে এঁড়ে গরু, তাহার পশ্চাতে যম ও চিত্রগুপ্ত; এইরূপে সকলে পুনরায় যমপুরীর দিকে চলিলেন। এঁড়ে গরু দুই চারি পা যায়, আর মাঝে মাঝে পশ্চাৎ দিকে চাহিয়া দেখে, পাছে যম ও চিত্রগুপ্ত পলায়।

মিত্তির-জা ভূত বলিলেন,—আমার নিকট হইতে পলাইয়া যম ও চিত্রগুপ্ত কি করিয়াছিলেন কোথায় গিয়াছিলেন, তাহা আমি চক্ষে দেখি নাই। পরে নারায়ণের নিকট যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহাই তোমাকে বলিলাম। জাগ্রত-শীতলার পাণ্ডা! তুমি মনে করিও না যে, আমি—মিত্তির-জা, এতক্ষণ চুপ করিয়াছিলাম। যম যেই সিংহাসন ফেলিয়া পলাইলেন, আর টুপ করিয়া আমি সেই খালি সিংহাসনে গিয়া বসিলাম। সিংহাসনে বসিয়া যমদূতদিগকে হুকুম দিলাম,—"যমপুরীতে যত পাপী আছে, এই মুহূর্তে তোমরা তাদের সকলকে খালাশ কর।"

যমপুরীতে তৎক্ষনাৎ মহা-সমারোহ পড়িয়া গেল। শত শত, সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ, পাপী খালাশ পাইতে লাগিল। দুর্গন্ধ পুতিময় নরক হইতে উঠাইয়া পাপীগণকে স্নান করাইতে লাগিলাম, সুগন্ধ আতর গোলাপ তাহাদিগের দেহে সিঞ্চন করিতে লাগিলাম। অগ্নিময় জ্বলন্ত নরক হইতে উঠাইয়া সুস্নিগ্ধ জলে পাপীদিগের শরীর সুশীতল করিতে লাগিলাম।

শতশত কর্ম্মকার আনিয়া পাপীদিগের হস্ত পদের শৃঙ্খল কাটাইতে লাগিলাম। মর্ম্মভেদী কান্নার ধ্বনি বিলুপ্ত হইয়া যমপুরীতে আজ চারিদিকে আনন্দের কোলাহল পড়িয়া গেল। সহস্র পাপী গলবস্ত্র হইয়া যোড়হাতে আমার সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়াইল। সকলে বলিতে লাগিল,—"ধন্য মিত্তির-জা! শুভক্ষণে আপনার মা আপনাকে গর্ভে ধরিয়াছিলেন। আজ আপনার কৃপায় যমযন্ত্রণা হইতে আমরা রক্ষা পাইলাম। না হইলে, নির্দ্দয় যম আর কতকাল আমাদিগকে পীড়ন করিত, তাহা বলিতে পারি না।"

সম্মুখে দাঁড়াইয়া জোড়হাতে পাপীগণ এইরূপে আমার স্তব-স্তুতি করিতেছে, এমন সময় নারায়ণ, এঁড়ে গরু, যম ও চিত্রগুপ্ত সেই স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নারায়ণকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। ভক্তিভাবে তাঁহার পায়ে গিয়া পড়িলাম।

নারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মিত্তির-জা! এ কি বল দেখি? যমের উপর এত রাগ কেন?" আমি উত্তর করিলাম,—"আজ্ঞে না! যমের উপর আমার আড়ি কি? তবে রসিকতা করিয়া যম বলিলেন, চিরকাল আমাকে নরকভোগ করিতে হইবে, কেবল একটি দিন আমি পুণ্যের ফল ভোগ করিতে পাইব। তাই যা! সে যা হউক, এখন আর আমার পাপ কোথায়? এই সাক্ষাতে দেখুন লক্ষ লক্ষ পাপীদিগকে আমি উদ্ধার করিয়াছি। যে লোক লক্ষ লক্ষ পাপীদিগকে উদ্ধার করে, তার আবার পাপ কোথায়? তারপর,—আমি আপনার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিলাম, যে পাদপদ্ম ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ ধ্যানে পায় না, আজ

সেই শ্রীপাদপদ্ম আমি স্পর্শ করিলাম। তবে আর আমার পাপ কোথায় রহিল?"

নারায়ণ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"না মিত্তির-জা। তোমার আর কিছুমাত্র পাপ নাই, তুমি আমার সঙ্গে বৈকুণ্ঠে চল। এঁড়ে গরুকে মানা করিয়া দাও, যেন যম ও চিত্রগুপ্তের প্রতি সে কোনরূপ অত্যাচার না করে।"

এঁড়ে গরুকে আমি মানা করিয়া দিলাম। এঁড়ে গরু আপনার গোয়ালে চলিয়া গেল। নারায়ণের সঙ্গে আমি বৈকুণ্ঠে চলিলাম। যাইবার পূর্ব্বে যোড়-হস্তে নারায়ণের নিকট একটি প্রার্থনা করিলাম যে, এই পাপীগুলিকে যেন সঙ্গে লইয়া যাইতে পারি। সুপ্রসন্ন হইয়া নারায়ণ অনুমতি করিলেন। সেই লক্ষ লক্ষ পাপীদিগকে সঙ্গে করিয়া নারায়ণের সঙ্গে আমি বৈকুণ্ঠে চলিলাম।

ক্রমে সকলে বৈকুণ্ঠের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলাম। আমাকে দেখিয়া কিন্তু সুদর্শন চক্র ফোঁশ করিয়া উঠিল। আর সকলকে ভিতরে যাইতে দিবে, কেবল আমাকে ভিতরে যাইতে দিবে না। নারায়ণের পায়ে আমি পুনরায় কাঁদিয়া পড়িলাম।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া নারায়ণ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"নয়নচাঁদ বলিয়া এক ব্যক্তির শীতলা কি তুমি কাড়িয়া লইয়াছিলে?"

আমি উত্তর করিলাম,—"হাঁ মহাশয়! মৃত্যুর পূর্ব্বে আমি সে কাজটি করিয়াছিলাম।"

নারায়ণ বলিলেন,—"ঈশ! করিয়াছ কি? সে যে ভারি জাগ্রত শীতলা! এমন কাজও করে! আর সব পাপ আমি ক্ষমা করিতে পারি, কিন্তু সে শীতলা-কাড়া পাপটি আমি ক্ষমা করিতে পারি না। যাও, শীঘ্র ভূত হইয়া তুমি মর্ত্ত্যে ফিরিয়া যাও। নয়ন চাঁদের শীতলাটি ফিরিয়া দাও। আর, সকলকে গিয়া বল, যেন নয়নচাঁদের শীতলাকে সকলে পূজা করে।" কি করিব? কাজেই ভূত হইয়া আমাকে ফিরিয়া আসিতে হইল। এখন তোমার শীতলাটি লইয়া যাও যে, পুনরায় আমি বৈকুণ্ঠে গমন করি। এই বলিয়া মিত্তির-জা ভূত আমার শীতলাটি আমাকে ফিরিয়া দিলেন।

নবম পর্ব– পরিশেষ

আড্ডাধারী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা নয়ন! সেই যে আর একটি ভূত সেখানে বসিয়াছিল, সে ভূতটি কে? তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে?"

নয়ন উত্তর করিলেন,—করিয়াছিলাম! শুনি যে, সেটি নেই-আঁকুড়ে দাদার ভূত। মর্ত্ত্যে আসিবার পূর্ব্বে তাহাকেও উদ্ধার করিবাব নিমিত্ত, মিত্তির-জা নারায়ণের অনুমতি পাইয়াছিলেন।"

সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তাহার পর কি হইল?"

নয়ন বলিলেন,—"শীতলাটি হাতে করিয়া আমি বাহিরে দাঁড়াইলাম। ভূত দুইটি সরু সরু বাঁশের সলার মত লম্বা হইল। তাহার পর হায়ুই-বাজির মত একে একে সোঁ সোঁ করিয়া আকাশে উঠিল। বৈকুণ্ঠে চলিয়া গেল।"

সকলে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তাহার পর তুমি কি করিলে?"

নয়ন বলিলেন,—আমি বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। আগে যদি এক গুণ পসার ছিল, এখন দশ গুণ পসার হইল। কলেজের সেই যারা এম এ পাশ দিয়াছে, সভা করিয়া তাহারা আমার শীতলার বক্তৃতা করিল।

খবরের কাগজে আমরা শীতলার নাম উঠিল। ফিরিঙ্গিরা আসিয়া আমার শীতলার পূজা দিতে আরম্ভ করিল। এক দিন লোক সব হাঁড়ি-চড়ানো বন্ধ করিয়া খই-কলা খাইয়া রহিল। আমার বুজরুকি চারিদিকে খুব জাহির হইল। ক্রমে আমি বসন্তো ডাক্তার হইলাম। টাকা-কড়ি কমে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মরসুমটা কমিয়া গেল।

সাহেবরা গণিয়া বলিয়াছেন যে, আবার পাঁচ বৎসর পরে সেইরূপে হিড়িক পড়িবে। তখন তোমাদের এক একটি শীতলা বানাইয়া দিব। রাত্রি হইয়াছে। আজ আর নয়। এস, একবার সাধের দেবতাগুলিকে নমস্কার করিয়া আপনার আপনার ঘরে যাই।”

সকলে মাটীতে মাথা ঠুকিতে লাগিলেন; আর বলিতে লাগিলেন,—“হে মা কাটি গঙ্গা! হে বাবা ফণী মনসা! তোমাদের পায়ে গড়, ওঁ নমঃ, নমঃ।”

———০———

কঙ্কাবতী

প্রথম ভাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ – প্রাচীন কথা

কঙ্কাবতীকে সকলেই জানেন। ছেলেবেলায় কঙ্কাবতীর কথা সকলেই শুনিয়াছেন।

কঙ্কাবতীর ভাই একটি আঁব আনিয়াছিলেন। আঁবটি ঘরে রাখিয়া সকলকে সাবধান করিয়া, দিলেন,—“আমার আঁবটি যেন কেহ খায় না। যে খাইবে, আমি তাহাকে বিবাহ করিব।”—কঙ্কাবতী সে কথা জানিতেন না। ছেলে মানুষ! অত বুঝিতে পারেন নাই, আঁবটি তিনি খাইয়াছিলেন।

সে জন্য ভাই বলিলেন,—“আমি কঙ্কাবতীকে বিবাহ করিব।”

মাতা পিতা সকলে বুঝাইলেন,—“ভাই হইয়া কি ভগিনীকে বিবাহ করিতে আছে?”

কিন্তু কাহারও কথা শুনিলেন না। তিনি বলিলেন, “কঙ্কাবতী আমার আঁব খাইল কেন? আমি নিশ্চয় কঙ্কাবতীকে বিবাহ করিব।”

কঙ্কাবতীর বড় লজ্জা হইল। মনে বড় ভয় হইল। নিরুপায় হইয়া তিনি একখানি নৌকা গড়িলেন। নৌকাখানিতে বসিয়া খিড়কী পুকুরের মাঝখানে ভাসিয়া যাইলেন। ভাই আর তাঁহাকে বিবাহ করিতে পারিলেন না।

কঙ্কাবতীর গল্প এইরূপে। এ কথা কিন্তু বিশ্বাস হয় না। একটি আঁবের জন্য কেহ কি আপনার ভগিনীকে বিবাহ করিতে চায়? কথা সম্ভব নয়। যাহা সম্ভব তাহা আমি বলিতেছি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ – কুসুমঘাটী

শহর অঞ্চলে নয়, বন্য প্রদেশে, কুসুমঘাটী বলিয়া একখানি গ্রাম আছে। গ্রামখানি বড়, অনেক লোকের বাস। গ্রামের নিকটে মাঠ। সেকালে এই মাঠ দিয়া অনেক লোক যাতায়াত করিত। সুবিধা পাইলে, নিকটস্থ গ্রামসমূহের দুষ্ট লোকেরা পথিকদিগকে মারিয়া ফেলিত ও তাহাদের নিকট হইতে যাহা কিছু টাকা-কড়ি পাইত, তাহা লইত। মাঠের মাঝখানে যে সব পুষ্করিণী আছে, তাহার ভিতর হইতে আজ পর্য্যন্ত মড়ার মাথা বাহির হয়। মানুষ মারিয়া' দুষ্ট লোকেরা এই পুকুরের ভিতর লুকাইয়া রাখিত।

মৃতদেহ গোপন করিবার আর একটি উপায় ছিল। পথিককে মারিয়া, মড়াটি লইয়া, দুষ্ট লোকেরা এ গ্রাম হইতে সে গ্রামে ফেলিয়া আসিত। অপর গ্রামে মড়াটি রাখিয়া, এক প্রকার "কুঃ" শব্দ করিয়া তাহারা চলিয়া যাইত।

সে গ্রামের চৌকিদার সেই "কুঃ" শব্দটি শুনিয়া বুঝিতে পারিত যে, তাহার সীমানায় মড়া পড়িয়াছে। চৌকীদার ভাবিত,—"যদি আমার সীমানায় মড়া পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে, কাল প্রাতঃকালে আমাকে লইয়া টানা-টানি, হইবে।"

এই কথা ভাবিয়া সেও আপনার বন্ধুবর্গের সহায়তায়, মৃত দেহটি অপর গ্রামে রাখিয়া সেইরূপ "কুঃ" শব্দ করিয়া আসিত।

এইরূপে রাতা-রাতি মড়াটি দশ বার ক্রোশ দূরে গিয়া পড়িত। কোথা হইতে লোকটি আসিতেছিল, কে তাহাকে মারিল, অত দূরে আর তাহার কোনও সন্ধান হইত না।

একে বন্য দেশ, তাহাতে আবার এইরূপ শত শত অপঘাত মৃত্যু! সে স্থানে ভূতের অভাব হইতে পারে না। অশ্বত্থ, বট, বেল প্রভৃতি নানা গাছে নানা প্রকার ভূত আছে, সেখানকার লোকের এইরূপ বিশ্বাস। সন্ধ্যা হইলে, ঘরে বসিয়া, লোকে নানারূপ ভূতের গল্প করে, সেই গল্প শুনিয়া বালক বালিকার শরীর শিহরিয়া উঠে।

গ্রামে ডাইনীরও অপ্রতুল নাই। পিতামহী-মাতামহীগণ বালক-বালিকাদিগকে সাবধান করিয়া দেন,—"ডাইনীরা পথে 'কুটা' হইয়া পড়িয়া থাকে, সে তৃণ যেন মাড়াইও না, তাহা হইলে ডাইনীতে খাইবে।"

স্থলে, সেখানকার লোকের এইরূপ পদে পদে বিপদের ভয়। জলেও কম নয়। গ্রামের এক পার্শ্বে একটি নদী আছে। পাহাড় হইতে নামিয়া, "কুল কুল" করিয়া নদীটি সাগরের দিকে বহিয়া যাইতেছে। হাঙ্গর কুম্ভীর নাই সত্য, কিন্তু নদীটি অন্য ভয়ে পরিপূর্ণ। শিকল হাতে "জ'টে-বুড়ি'’ত আছেই, তা ছাড়া নদীর ভিতর জীবন্ত পাথরও অনেক। সুবিধা পাইলে এই পাথর মনুষ্যের বুকে চাপিয়া বসে। নদীর ভিতরও এইরূপ নানা বিপদের ভয়।

কুসুমঘাটীর অনতিদূরে পর্ব্বতশ্রেণী। পাহাড় বনে আবৃত। বনে বাঘ-ভাল্লুক আছে।

বাঘে সর্ব্বদাই লোকের গরু-বাছুর লইয়া যায়। মাঝে মাঝে এক একটি বাঘ মনুষ্য খাইতে শিক্ষা করে। তখন সে বাঘ, মানুষ ভিন্ন আর কিছুই খায় না। লোকে উৎপীড়িত হইয়া নানা কৌশলে সে ব্যাঘ্রটিকে বধ করে।

এক একটি বাঘ কিন্তু এমনি চতুর যে, কেহ তাহাকে মারিতে পারে না। লোকে বলে যে, সে প্রকৃত বাঘ নয়—সে মনুষ্য! বনে এক প্রকার শিকড় আছে, তাহা মাথায় পরিলে মনুষ্য তৎক্ষণাৎ ব্যাঘ্রের রূপ ধরিতে পারে। কাহারও সহিত কাহারও বিবাদ থাকিলে, লোকে সেই শিকড়টি মাথায় পরিয়া বাঘ হয়, বাঘ হইয়া আপনার শত্রুকে বিনাশ করে। তাহার পর আবার শিকড় খুলিয়া মানুষ হয়। কেহ কেহ শিকড় খুলিয়া ফেলিতে পারে না। সে চিরকালই বাঘ থাকিয়া যায়। এই বাঘ লোকের প্রতি ভয়ানয় উপদ্রব করে।

কুসুমঘাটীর লোকের মনে এইরূপ নানা প্রকার বিশ্বাস। কিন্তু আজ কা'ল সকলের মন হইতে এই সব ভয় ক্রমে দূর হইতেছে। এখানকার অনেকে এখন তসরের গুটি ও গালা লইয়া, কলিকাতায় আসিত। কেহ কেহ কলিকাতায় বাসা করিয়া থাকেন। কেহ কেহ অংরজীও পড়িয়াছেন। ভূত ডাইনীর কথা তাঁহারা বিশ্বাস করেন না। ভূতের কথা পাড়িলে, তাঁহারা উপহাস করেন,—"পৃথিবীতে ভূত নাই। আর যদিও থাকে, তো আমাদের তাহারা কি করিতে পারে?" তাঁহাদের দেখা-দেখি আজকালের ছেলে-মেয়েদের প্রাণেও কিছু কিছু সাহসের সঞ্চার হইতেছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ – তনু রায়

শ্রীযুক্ত রামতনু রায় মহাশয়ের বাস কুসুমঘাটী। "রামতনু রায়" বলিয়া কেহ তাঁহাকে ডাকে না, সকলে তাঁহাকে "তনু রায়" বলে। ইনি ব্রাহ্মণ, বয়স হইয়াছে, ব্রাহ্মণের যাহা কিছু কর্ত্তব্য, তাহা ইনি যথাবিধি করিয়া থাকেন। ত্রিসন্ধ্যা করেন, পিতা-পিতামহ-আদির শ্রাদ্ধতপর্ণাদি করেন, দেবগুরুকে ভক্তি করেন, দলাদলি লইযা আন্দোলন করেন। এখনকার লোকে ভাল করিয়া ধর্ম্ম-কর্ম্ম করে না বলিয়া রায় মহাশয়ের মনে বড় রাগ।

তিনি বলেন,—"আজ-কালের ছেলেরা সব নাস্তিক, ইহাদের হাতে জল খাইতে নাই।"

তিনি নিজে সব মানেন, সব করেন। বিশেষতঃ কুলীন ও বংশজের যে রীতিগুলি, সেইগুলির প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভক্তি।

তিনি নিজে বংশজ ব্রাহ্মণ। তাই তিনি বলেন-বিধাতা যখন আমাকে বংশজ করিয়াছেন, তখন বংশজের ধর্ম্মটি আমাকে রক্ষা করিতে হইবে। যদি না করি, তাহা হইলে বিধাতার অপমান করা হইবে, আমার পাপ হইবে, আমাকে নরকে যাইতে হইবে। যদি বল বংশজের ধর্ম্মটি কি? বংশজের ধর্ম্ম এই যে,—"কন্যাদান করিয়া পাত্রের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ ধন গ্রহণ করিবে। বংশজ হইয়া যিনি এ কার্য্য না করেন, তাঁহার ধর্ম্মলোপ হয়, তিনি একেবারেই পতিত হন। শাস্ত্রে এইরূপ লেখা আছে।" শাস্ত্র অনুসারে সকল কাজ করেন দেখিয়া তনু রায়ের প্রতি লোকের বড় ভক্তি। স্ত্রীলোকেরা ব্রত উপলক্ষে ইঁহাকেই প্রথম ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন। সকলে বলেন যে, "রায় মহাশয়ের মত নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ পৃথিবীতে

অতি বিরল।" বিশেষতঃ শুদ্রমহলে ইঁহার খুব প্রতিপত্তি।

তনু রায় অতি উচ্চদরের বংশজ। কেহ কেহ পরিহাস করিয়া বলেন যে,—ইঁহাদের কোনও পুরুষে বিবাহ হয় না। পিতা-পিতামহের বিবাহ হইয়াছিল কি না, তাও সন্দেহ।"

ফল কথা, ইঁহার নিজের বিবাহের সময় কিছু গোলযোগ হইয়াছিল। "পাঁচ শত টাকা পণ দিব" বলিয়া একটি কন্যা স্থির করিলেন। পৈতৃক ভূমি বিক্রয় করিয়া সেই টাকা সংগ্রহ করিলেন। বিবাহের দিন উপস্থিত হইলে, সেই টাকাগুলি লইয়া বিবাহ করিতে যাইলেন। কন্যার পিতা, টাকাগুলি গণিয়া ও বাজাইয়া লইলেন। বিবাহের লগ্ন উপস্থিত হইল, কিন্তু তবুও তিনি কন্যা-সম্প্রদান করিতে তৎপর হইলেন না। কেন বিঁলম্ব করিতেছেন, কেহ বুঝিতে পারে না।

অবশেষে তিনি নিজেই খুলিয়া বলিলেন,—"পাত্রের এত অধিক বয়স হইয়াছে, তাহা আমি বিবেচনা করিতে পারি নাই। সেই জন্য পাঁচ শত টাকায় সম্মত হইয়াছিলাম। এক্ষণে আর এক শত টাকা না পাইলে কন্যাদান করিতে পারি না।"

কন্যা-কর্ত্তার এই কথায় বিষম গোলযোগ উপস্থিতি হইল। সেই লগ্ন অতীত হইয়া গেল, রাত্রি প্রায় অবসান হইল। যখন প্রভাত হয় হয়, তখন পাঁচজনে মধ্যস্থ হইয়া এই মীমাংসা করিয়া দিলেন যে, "রায় মহাশয়কে আর পঞ্চাশটি টাকা দিতে হইবে।" "খত" লিখিয়া তনু রায় আর পঞ্চাশ টাকা ধার করিলেন ও কন্যার পিতাকে তাহা দিয়া বিবাহকার্য্য সমাধা করিলেন। —বাসর-ঘরে গাহিবেন বলিয়া তনু রায় অনেকগুলি গান শিখিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু বৃথা হইল। বাসর হয় নাই, রাত্রি প্রভাত হইয়া গিয়াছিল। এ দুঃখ তনু রায়ের মনে চিরকাল ছিল।

এক্ষণে তনু রায়ের তিনটি কন্যা ও পুত্র-সন্তান। কুল-ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া দুইটি কন্যাকে তিনি সুপাত্রে অর্পণ করিয়াছিলেন। জামাতারা তনু রায়ের সম্মান রাখিয়াছিলেন। কেহ পাঁচ শত, কেহ, হাজার, নগদ গণিয়া দিয়াছিলেন। কাজেই সুপাত্র বলিতে হইবে।

সম্মান কিছু অধিক পাইবেন বলিয়া, রায় মহাশয় কন্যা দুইটিকে বড় করিয়া বিবাহ দিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন,—"অল্প বয়সে বিবাহ দিলে, কন্যা যদি বিধবা হয়, তাহা হইলে সে পাপের দায়ী কে হইবে? কন্যা বড় করিয়া বিবাহ দিবে। কুলীন ও বংশজের তাহাতে কোন দোষ নাই। ইহা শাস্ত্রে লেখা আছে।"

তাই, যখন ফুলশয্যার আইন পাশ হয় তখন তনু রায় বলিলেন,—"পূর্ব্ব হইতেই আমি আইন মানিয়া আসিতেছি। তবে আবার নূতন আইন কেন?" আইনের তিনি ঘোরতর বিরোধী হইলেন; সভা করিলেন, চাঁদা তুলিলেন, চাঁদার টাকাগুলি সব আপনি লইলেন।

তনু রায়ের জামাতা দুইটির বয়স নিতান্ত কচি ছিল না। ছেলে মানুষ বরকে তিনি দুটি চক্ষু পাড়িয়া দেখিতে পারেন না। তাহারা এক শত কি দুই শত টাকায় কাজ সারিতে চায়। তাই একটু বয়স্ক পাত্র দেখিয়া কন্যা দুইটি বিবাহ দিয়াছিলেন। এক জনের বয়স হইয়াছিল

সত্তর আর এক জনের পঁচাত্তর। জামাতাদিগের বয়সের কথায় পাড়ায় মেয়েরা কিছু বলিলে, তনু রায় সকলকে বুঝাইতেন—"ওগো! তোমরা জান না, জামাইয়ের বয়স একটু পাকা হইলে, মেয়ের আদর হয়।" জামাতাদিগের বয়স কিছু অধিক পাকিয়াছিল। কারণ, বিবাহের পর, বৎসর ফিরিতে না ফিরিতে দুইটি কন্যাই বিধবা হয়।

তনু রায় জ্ঞানবান্ লোক। জামাতাদিগের শোকে একেবারে অধীর হন নাই। মনকে তিনি এই বলিয়া প্রবোধ দিয়া থাকেন,—"বিধাতার ভবিতব্য! কে খণ্ডাতে পারে? কতলোক যে বার বৎসরের বালকের সহিত পাঁচ বৎসর বালিকার বিবাহ দেয়, তবে তাহাদের কন্যা বিধবা হয় কেন। যাহা কপালে থাকে তাহাই ঘটে। বিধাতার লেখা কেহ মুছিয়া ফেলিতে পারে না।"

তনু রায়ের পুত্রটি ঠিক বাপের মত। এখন তিনি আর নিতান্ত শিশু নন, পঁচিশ পার হইয়াছেন। লেখা পড়া হয় নাই, তবে পিতার মত শাস্ত্রজ্ঞান আছে। পিতা কন্যাদান করিয়া অর্থসঞ্চয় করিতেছেন, সে জন্য তিনি আনন্দিত, নিরানন্দ নন। কারণ, পিতার তিনিই একমাত্র বংশধর। বিধবা কথাটা আর কে বল? তবে বিধবাদিগের গুণকীর্ত্তন তিনি সর্ব্বদাই করিয়া থাকেন।

তিনি বলেন,—"আমাদের বিধবাবা সাক্ষাৎ সরস্বতী। সদা ধর্ম্মে রত, পরোপকার ইঁহাদের চিরব্রত। কিসে আমি ভাল খাইব, কিসে বাবা ভাল খাইবেন, ভগিনী দুইটির সর্ব্বদাই এই চিন্তা। তিন দিন উপবাস করিয়াও আমাদের জন্য পাঁচ ব্যঞ্জন রন্ধন করেন। ভগিনী দুইটি আমার—অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরীস্তথা। প্রাতঃস্মরণীয়া।"

আজকাল আর সহমরণ প্রথা নাই বলিয়া ইনি মাঝে মাঝে খেদ করেন। কারণ, তাহা থাকিলে ভগিনী দুইটি নিমিষের মধ্যেই স্বর্গে যাইতে পারিতেন। বসিয়া বসিয়া মিছামিছি বাবার অন্নধ্বংস করিতেন না। সাহেবেরা স্বর্গের দ্বারে এরূপ আগড় দিয়া দেন কেন?

তনু রায়ের স্ত্রী কিন্তু অন্য প্রকৃতির লোক। এক একটি কন্যার বিবাহ হয়, আর পাত্রের রূপ দেখিয়া তিনি কান্নাকাটি করেন। তনু রায় তখন তাঁহাকে অনেক ভর্ৎসনা করেন, আর বলেন,—"মনে করিয়া দেখ দেখি তোমার বাপ কি করিয়াছিলেন?" এই রূপ নানা প্রকার খোঁটা দিয়া তবে তাঁহাকে সান্ত্বনা করেন। কন্যাদিগের বিবাহ লইয়া স্ত্রীপুরুষের চির বিবাদ। বিধবা কন্যা দুইটির মুখপানে চাহিয়া সদাই চক্ষের জলে মায়ের বুক ভাসিয়া যায়। মেয়েদের সঙ্গে মাও একপ্রকার একাদশীর দিন কিছুই খান না, তবে স্বামীর অকল্যাণ হইবার ভয়ে, কেবল একটু একটু জল পান করেন। প্রতিদিন পূজা করিয়া একে একে সকল দেবতাদিগের পায়ে তিনি মাথা খুঁড়েন, আর তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা করেন যে,—"হে মা কালি! হে মা দুর্গা! হে ঠাকুর! যেন আমার কঙ্কাবতীর বরটি মনের মত হয়।"

কঙ্কাবতী তনু রায়ের ছোট কন্যা। এখনও নিতান্ত শিশু।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ – খেতু

তনু রায়ের পাড়ায় একটি দুঃখিনী ব্রাহ্মণী বাস করেন। লোকে তাঁহাকে "খেতুর মা

খেতুর মা" বলিয়া ডাকে। খেতুর মা আজ দুঃখিনী বটে, কিন্তু এক সময়ে তাঁহার অবস্থা ভাল ছিল। তাঁহার স্বামী শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লেখা পড়া জানিতেন, কলিকাতায় কৰ্ম্ম করিতেন, দুপয়সা উপাৰ্জ্জন করিতেন।

কিন্তু তিনি অর্থ রাখিতে জানিতেন না। পরদুঃখে তিনি নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িতেন ও যথাসাধ্য পরের দুঃখ মোচন করিতেন। অনেক লোককে অন্ন দিতেন ও অনেকগুলি ছেলের তিনি লেখাপড়ার খরচ দিতেন। এরূপ লোকের হাতে পয়সা থাকে না।

অধিক বয়সে তাঁহার স্ত্রীর একটি পুত্র-সন্তান হয়। ছেলেটির নাম "ক্ষেত্র" রাখেন, সেই জন্য তাঁহার স্ত্রীকে সকলেই "খেতুর মা" বলে।

যখন পুত্র হইল, তখন শিবচন্দ্র মনে করিলেন—"এইবার আমাকে বুঝিয়া খরচ করিতে হইবে। আমার অবৰ্ত্তমানে স্ত্রী-পুত্র যাহাতে অন্নের জন্য লালায়িত না হয়, আমাকে সে বিলি করিতে হইবে।"

মানস হইল বটে, কিন্তু কার্য্যে পরিণত হইল না। পৃথিবী অতি দুঃখময়, এ দুঃখ যিনি নিজ দুঃখ বলিয়া ভাবেন, চিরকাল তাঁহাকে দরিদ্র থাকিতে হয়।

খেতুর যখন চারি বৎসব বয়স, তখন হঠাৎ তাহার পিতার মৃত্যু হইল। স্ত্রী ও শিশু সন্তানটিকে একেবারে পথে দাঁড় করাইয়া গেলেন। খেতুর বাপ অনেকের উপকাব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এখন বড়লোক হইয়াছেন। কিন্তু এই বিপদের সময় কেহই একবার উঁকি মারিলেন না। কেহই একবার জিজ্ঞাসা করিলেন না যে,—"খেতুর মা! তোমার হবিষ্যের সংস্থান আছে কি না?"

এই দুঃখের সময় কেবল রামহরি মুখোপাধ্যায় ইঁহাদের সহায় হইলেন।

রামহরি ইঁহাদের জ্ঞাতি, কিন্তু দূর-সম্পর্ক। খেতুর বাপ, তাঁহার একটি সামান্য চাকরি করিয়া দিয়াছিলেন। দেশে অভিভাবক নাই, সে জন্য কলিকাতায় তাঁহাকে পরিবার লইয়া থাকিতে হইয়াছে। যে কয়টি টাকা পান, তাহাতেই কষ্টে সৃষ্টে দিনপাত করেন।

তিনি কোথায় পাইবেন? তবুও যাহা কিছু পারিলেন, বিধবাকে দিলেন ও চাঁদার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিলেন। খেতুর বাপের খাইয়া যাহারা মানুষ, আজ তাহারা রামহরিকে কতই না ওজর আপত্তি অপমানের কথা বলিয়া দুই এক টাকা চাঁদা দিল। তাহাতেই খেতুর বাপের তিল-কাঞ্চন করিয়া শ্রাদ্ধ হইল। চাঁদার টাকা হইতে যাহা কিছু বাঁচিল, রামহরি তাহা দিয়া খেতুর মা ও খেতুকে দেশে পাঠাইয়া দিলেন।

দেশে পাঠাইয়া দুঃখিনী বিধবাকে তিনি চাউলের দামটি দিতেন; অধিক আর কিছু দিতে পারিতেন না। ব্রাহ্মণী পৈতা কাটিয়া কোনও মতে অকুলান কুলান করিতেন। দেশে বান্ধব কেহই ছিল না। নিরঞ্জন কবিরত্ন কেবল মাত্র ইঁহাদের দেখিতেন শুনিতেন; বিপদে আপদে তিনিই বুক দিয়া পড়িতেন।

খেতুর মা'র এইরূপ কষ্টে দিন কাটিতে লাগিল। ছেলেটি শান্ত সুবোধ, অথচ সাহসী ও বিক্রমশীল হইতে লাগিল। তাহার রূপ-গুণে, স্নেহ-মমতায়, মা সকল দুঃখ ভুলিতেন।

ছেলেটি যখন সাত বৎসরের হইল তখন রামহরি দেশে আসিলেন।

খেতুর মাকে তিনি বলিলেন—"খেতুর এখন লেখা-পড়া শিখিবার সময় হইল, আর ইহাকে এখানে রাখা হইবে না। আমি ইহাকে কলিকাতায় লইয়া যাইতে ইচ্ছা করি। আপনার কি মত?"

খেতুর মা বলিলেন,—"বাপ রে! তা কি কখন হয়? খেতুকে ছাড়িয়া আমি কি করিয়া থাকিব? নিমিষের নিমিত্তও খেতুকে চক্ষুর আড়াল করিয়া আমি জীবিত থাকিতে পারিব না। না বাছা! এ প্রাণ থাকিতে আমি খেতুকে কোথাও পাঠাইতে পারিব না।"

রামহরি বলিলেন,—"দেখুন, এখানে থাকিলে খেতুর লেখাপড়া হইবে না। মথুর চক্রবর্ত্তীর অবস্থা কি ছিল জানেন তো? গাজনের শিবপূজা করিয়া করিয়া অতি কষ্টে সংসার প্রতিপালন করিত। 'গাজুনে বামুন' বলিয়া সকলে তাহাকে ঘৃণা করিত। তাহার ছেলে ষাঁড়েশ্বর আপনার বাসায় দিনকতক রাঁধুনী বামুন থাকে। অল্পবয়স্ক বালক দেখিয়া শিব কাকার দয়া হয়, তিনি তাহাকে স্কুলে দেন। এখন সে উকীল হইয়াছে। এখন সে একজন বড়লোক।"

খেতুর মা উত্তর করিলেন,—"চুপ কর! কলিকাতায় লেখা-পড়া শিখিয়া যদি ষাঁড়েশ্বরের মত হয়, তাহা হইলে আমার খেতুর লেখা-পড়া শিখায় কাজ নাই।"

রামহরি বলিলেন,—"সত্য বটে, ষাঁড়েশ্বর মদ খায়, আর মুসলমান সহিসের হাতে নানারূপ অখাদ্য মাংসও খায়, আবার এ দিকে প্রতিদিন হরি-সঙ্কীর্ত্তন করে। কিন্তু তা বলিয়া কি সকলেই সেইরূপ হয়? পুরুষ মানুষে লেখা-পড়া না শিখিলে কি চলে? পুরুষ মানুষের যেরূপ বাঁচিয়া থাকার প্রার্থনা, বিদ্যাশিক্ষারও সেইরূপ প্রার্থনা।"

খেতুর মা বলিলেন,—"হাঁ সত্য কথা। পুত্রের যেরূপ বাঁচিবার প্রার্থনা, বিদ্যার প্রার্থনাও তাহার চেয়ে অধিক। যে মাতা-পিতা ছেলেকে বিদ্যাশিক্ষা না দেন, সে মাতা-পিতা ছেলের পরম শত্রু। তবে বুঝিয়া দেখ আমার মার প্রাণ; আমি অনাথিনী সহায়হীনা বিধবা; পৃথবীতে আমার কেহ নাই, এই এক রতি ছেলেটিকে লইয়া সংসারে আছি। খেতুকে আমি নিমেষে হারাই। খেলা করিয়া ঘরে আসিতে খেতুর একটু বিলম্ব হইলে, আমি যে কত কি কু ভাবি, তাহা আর কি বলিব? ভাবি, খেতু বুঝি জলে ডুবিল, খেতু বুঝি আগুনে পুড়িল, খেতু গাছ হইতে পড়িয়া গেল, খেতুকে বুঝি পাড়ার ছেলেরা মারিল! খেতু যখন ঘুমায়, রাত্রিতে উঠিয়া উঠিয়া আমি খেতুর নাকে হাত দিয়া দেখি,—খেতুর নিশ্বাস পড়িতেছে কি না? ভাবিয়া দেখ দেখি, এ দুধের বাছাকে দূরে পাঠাইতে মার মহাপ্রাণী কি করে? তাই কাঁদি, তাই বলি—'না'।" পুনরায় খেতুর মা বলিলেন,—"রামহরি! খেতু আমার বড় গুণের ছেলে। কেবল দুই বৎসর পাঠশালা যাইতেছে, ইহার মধ্যেই তালপাতা শেষ করিয়াছে কলাপাতা ধরিয়াছে।" গুরু-মহাশয় বলেন—'খেতু সকলের চেয়ে ভাল ছেলে।'"'আর দেখ রামহরি! খেতু আমার অতি সুবোধ ছেলে। খেতুকে আমি যা করিতে বলি খেতু তাই করে। যেটি মানা করি সেটি আর খেতু করে

না। একদিন দাসেদের মেয়ে আসিয়া বলিল,—'ওগো! তোমার খেতুকে পাড়ার ছেলে বড় মারিতেছে।' আমি উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলাম। দেখিলাম, ছয় জন ছেলে একা খেতুর উপর পড়িয়াছে। খেতুর মনে ভয় নাই, মুখে কান্না নাই। আমি দৌড়িয়া গিয়া খেতুকে কোলে লইলাম। খেতু তখন চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিল,—'মা! আমি উহাদের সাক্ষাতে কাঁদি নাই, পাছে উহারা মনে করে যে, আমি ভয় পাইয়াছি। একা একা আমর সঙ্গে কেহই পারে না। উহারা ছয় জন, আমি একা, তা আমি মারিয়াছি। আবার যখন একা একা পাইব, তখন আমিও ছয়জনকে খুব মারিব। আমি বলিলাম—না বাছা! তা করিতে নাই, প্রতিদিন যদি সকলের সঙ্গে মারামারি করিবে তবে খেলা করিবে কার সঙ্গে?'' খেতু আমর কথা শুনিল। কত দিন সে ছেলেদের খেতু একলা পাইয়াছিল, মনে করিলে খুব মারিতে পারিত; কিন্তু আমি মানা করিয়াছিলাম বলিয়া কাহাকেও সে আর মারে নাই।

''আর এক দিন আমি খেতুকে বলিলাম,—খেতু! তনু রায়ের আঁব গাছে ঢিল মারিও না। তনু রায় খিটখিটে লোক, সে গালি দিবে।' খেতু বলিল,—'মা! ও গাছের আঁব বড় মিষ্ট গো! একটি আঁব পাকিয়া টুক্ টুক্ করিতেছিল। আমার হাতে একটি ঢিল ছিল। তাই মনে করিলাম, দেখি, পড়ে কি না? আমি বলিলাম,—''বাছা ও গাছের আঁব বড় মিষ্ট হইলে কি হইবে, ও গাছটি তো আর আমাদের নয়? পরের গাছে ঢিল মারিলে, যাদের গাছ, তাহারা রাগ করে; যখন আপনা-আপনি তলায় পড়িবে, তখন কুড়াইয়া খাইও, তাহাতে কেহ কিছু বলিবে না'।

''তাহার পর, আর একদিন খেতু আমাকে আসিয়া বলিল,—'মা! জেলেদের গাবগাছে খুব গাঁব পাকিয়াছে। পাড়ার ছেলেরা সকলে গাছে উঠিয়া গাব খাইতেছিল, আমাকে তাহারা বলিল,—খেতু! আয় না ভাই। দূরের গাব যে আমরা পাড়িতে পারি না! তা মা আমি গাছে উঠি নাই। গাব গাছটি তো, মা! আর আমাদের নয়, যে উঠিব? আমি তলায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। ছেলেরা দুটি একটি গাব আমাকে ফেলিয়া দিল। মা! সে গাব কত যে গো মিষ্ট, তাহা আর তোমাকে কি বলিব! তোমার জন্য একটি গাব আনিয়াছি, তুমি বরং, মা! খাইয়া দেখ! আমাদের যদি একটি গাব গাছ থাকিত, তাহা হইলে বেশ হইত।' আমি বলিলাম,—খেতু! বুড়ো মানুষে গাব খায় না, ও গাবটি তুমি খাও। আর পরের গাছে পাকা গাব পাড়িতে কোন দোষ নাই, তার জন্য জেলেরা তোমাকে বকিবে না। কিন্তু গাছের ডগায় গিয়া উঠিও না, সরু ডালে পা দিও না, ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যাইবে।' গাব খাইতে অনুমতি পাইয়া বাছার যে কত আনন্দ হইল, তাহা আর তোমাকে কি বলিব।'

''দেখ, এ গ্রামে একবার এক জন কোথা হইতে সন্দেশ বেচিতে আসিয়াছিল। পাড়ার ছেলেরা তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তাদের বাপ-মা, যার যেরূপ ক্ষমতা, সন্দেশ কিনিয়া আপনার আপনার ছেলের হাতে দিল। মুখ চুণপানা করিয়া আমার খেতু সেইখানে দাঁড়াইল ছিল। তাড়াতাড়ি গিয়া আমি খেতুকে কোলে লইলাম, আমার বুক ফাটিয়া যাইল, চক্ষুর জল রাখিতে পারিলাম না। আঁচলে চক্ষু পুছিতে পুছিতে ছেলে নিয়ে বাটী আসিলাম।

খেতু নীরব, খেতুর মুখে কথা নাই। তার শিশুমনে সে যে কি ভাবিতেছিল, তাহা বলিতে পারি না। কিছুক্ষণ পরে আমার মুখে হাত দিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল,—'মা! তুমি কাঁদ কেন?' আমি বলিলাম,—'বাছা! আমার ঘরে একদিন সন্দেশ ছড়া-ছড়ি যাইত, চাকর-বাকরে পর্য্যন্ত খাইয়া আলিয়া যাইত। আজ যে তোমার হাতে এক পয়সার সন্দেশ কিনিয়া দিতে পারিলাম না, এদুঃখ কি আর রাখিতে স্থান আছে? এমন অভাগিনী মার পেটেও বাছা তুই জন্মেছিল!' সাত বৎসরের শিশুর এবার কথা শুন! খেতু বলিল,—'মা! ও সন্দেশ ভাল নয়। দেখিতে পাও নাই, সব পচা! আর মা! তুমি তো জান? সন্দেশ খাইলে আমার অসুখ করে। সেই যে মা, চৌধুরীদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম, সেখানে সন্দেশ খাইয়াছিলাম, তার পরদিন আমার কত অসুখ করিয়াছিল! সন্দেশ খাইতে নাই, মুড়ি খাইতে আছে। ঘরে যদি মা! মুড়ি থাকে তো দাও আমি খাই।''

খেতুর মার মুখে খেতুর কথা আর ফুরায় না। রামহরির কি নিকট কত যে কি পরিচয় দিলেন, তাহা আর কি বলিব?

অবশেষে রামহরি বলিলেন,—খুড়ী-মা! ভয় করিও না। আমার নিজের ছেলের চেয়েও আমি খেতুর যত্ন করিব। শিব কাকার আমি অনেক খাইয়াছি। তাঁহার অনুগ্রহে আজ পরিবারবর্গকে এক মুঠা অন্ন দিতেছি। আজ তাঁহার ছেলে যে মুর্খ হইয়া থাকিবে, তাহা প্রাণে সহ্য হবে না। খেতু কেমন আছে, কেমন লেখাপড়া করিতেছে, সে বিষয়ে আমি সর্ব্বদা আপনাকে পত্রে লিখিব। আবার, খেতু যখন চিঠি লিখিতে শিখিবে, তখন সে নিজে আপনাকে চিঠি লিখিবে। পূজার সময় ও গ্রীষ্মের ছুটীর সময় খেতুকে দেশে পাঠাইয়া দিব। বৎসরের মধ্যে দুই তিন মাস সে আপনার নিকট থাকিবে। আজ আমি এখন যাই। আজ শুক্রবার। বুধবার ভাল দিন। সেই দিন খেতুকে কলিকাতায় লইয়া যাইব।''

পঞ্চম পরিচ্ছেদ – নিরঞ্জন

তনু রায়ের সহিত নিরঞ্জন কবিরত্নের ভাব নাই। নিরঞ্জন তনু রায়ের প্রতিবেশী।

নিরঞ্জন বলেন,—''রায় মহাশয়! কন্যার বিবাহ দিয়া টাকা লইবেন না, টাকা লইলে ঘোর পাপ হয়।''

তনু রায় তাই নিরঞ্জনকে দেখিতে পারেন না, নিরঞ্জনকে তিনি ঘৃণা করেন। যে দিন তনু রায়ের কন্যার বিবাহ হয়, নিরঞ্জন সেই দিন গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া অপর গ্রামে গমন করেন। তিনি বলেন,—''কন্যা বিক্রয় চক্ষে দেখিলে, কি কর্ণে শুনিলেও পাপ হয়।''

নিরঞ্জন অতি পণ্ডিত লোক! নানা শাস্ত্র তিনি অধ্যয়ন করিয়াছেন। বিদ্যা-শিক্ষার শেষ নাই, তাই রাত্রি দিন তিনি পুঁথি-পুস্তক লইয়া থাকেন। লোকের কাছে আপনার বিদ্যার পরিচয় দিতে ইনি ভালবাসেন না। তাই জগৎ জুড়িয়া ইঁহার নাম হয় নাই। পূর্ব্বে অনেকগুলি ছাত্র ইঁহার নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিত। দিবারাত্রি তাহাদিগকে বিদ্যা-শিক্ষা দিয়া ইনি পরম পরিতোষ লাভ করিতেন। আহার পরিচ্ছদ দিয়া ছাত্রগুলিকে পুত্রের মত প্রতিপালন করিতেন। লোকের বাড়ী নিমন্ত্রণে গিয়া বিদায়ের জন্য ইনি মারামারি করিতেন

না। কারণ, ইঁহার অবস্থা ভাল ছিল। পৈতৃক অনেক ব্রহ্মোত্তরভূমি ছিল।

গ্রামের জমিদার, জনার্দ্দন চৌধুরীর সহিত এই ভূমি লইয়া কিছু গোলমাল হয়। একদিন দুই প্রহরের সময় জমিদার এক জন পেয়াদা পাঠাইয়া দেন।

পেয়াদা আসিয়া নিরঞ্জনকে বলে,—"ঠাকুর! চৌধুরী মহাশয় তোমাকে ডাকিতেছেন, চল।" নিরঞ্জন বলিলেন,—"আমার আহার প্রস্তুত, আমি আহার করিতে যাইতেছি। আহার হইলে জমিদার মহাশয়ের নিকট যাইব। তুমি এক্ষণে যাও।"

পেয়াদা বলিল, "তাহা হইবে না, তোমাকে এইক্ষণেই আমার সহিত যাইতে হইবে।"

নিরঞ্জন বলিলেন,—"বেলা দুই প্রহর অতীত গিয়াছে, ঠাঁই হইয়াছে, ভাত প্রস্তুত, ভাত দুইটি মুখে দিয়া, চল যাইতেছি। কারণ, আমি আহার না করিলে গৃহিণী আহার করিবেন না, ছাত্রগণের আহার হইবে না। সকলেই উপবাসী থাকিবে।"

পেয়াদা বলিলেন,—"তাহা হইবে না, তোমাকে এইক্ষণেই যাইতে হইবে।"

নিরঞ্জন বলিলেন,—"এইক্ষণেই যাইতে হইবে, বটে? আচ্ছা, তবে চল যাই।" পেয়াদার সহিত নিরঞ্জন গিয়া জমিদার বাটীতে উপস্থিত হইলেন।

জনার্দ্দন চৌধুরী বলিলেন,—"কখন্ আপনাকে ডাকিতে পাঠাইয়াছি, আপনার যে আর আসিবার বার হয় না!"

নিরঞ্জন বলিলেন,—"আজ্ঞা হাঁ মহাশয়! আমার একটু বিলম্ব হইয়াছে।

জমিদার বলিলেন,—"বামুনমারীর মাঠে অপনার যে পঞ্চাশ বিঘা ব্রহ্মোত্তর ভূমি আছে, জরিপে তাহা পঞ্চান্ন বিঘা হইয়াছে। আপনার দলিল-পত্র ভাল আছে, সে জন্য সবটুকু ভূমি আমি কাড়িয়া লইতে বাসনা করি না, তবে মাপে যেটুকু অধিক হইয়াছে, সেটুকু আমার প্রাপ্য।" —নিরঞ্জন উত্তর করিলেন,—"আজ্ঞা, হাঁ মহাশয়! দলিল-পত্র আমার ভাল আছে। দেখুন, দেখি; এই কাগজখানি কি না?"

জনার্দ্দন চৌধুরী কাগজখানি হাতে লইয়া বলিলেন,—"হাঁ, এই কাগজখানি বটে, ইহা আমি পূর্ব্বে দেখিয়াছি, এখন আর দেখিবার আবশ্যক নাই।"

এই কথা বলিয়া নিরঞ্জনের হাতে তিনি কাগজখানি ফিরাইয়া দিলেন। নিরঞ্জন কাগজখানি তামাক খাইবার আগুনের মালসায় ফেলিয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে কাগজখানি জ্বলিয়া গেল। —জমিদার বলিলেন,—"হাঁ হাঁ! করেন কি?"

নিরঞ্জন বলিলেন,—"কেবল পাঁচ বিঘা কেন? আজ হইতে আমার সমুদায় ব্রহ্মোত্তর ভূমি আপনার। যিনি জীব দিয়াছেন, নিরঞ্জনকে তিনি আহার দিবেন।"

পাছে ব্রহ্মশাপে পড়েন, সেজন্য জনার্দ্দন চৌধুরীর ভয় হইল। তিনি বলিলেন, "দলিল গিয়াছে গিয়াছে, তাহাতে কোনও ক্ষতি নাই। আপনি ভূমি ভোগ করুন, আপনাকে আমি কিছু বলিব না।"

নিরঞ্জন উত্তর করিলেন—না মহাশয়! জীব যিনি দিয়াছেন, আহার তিনি দিবেন। সেই দীন-বন্ধুকে ধ্যান করিয়া তাঁহার প্রতি জীবন সমর্পণ করিয়া কালাতিপাত করাই ভাল।

বিষয় বৈভব চিন্তায় যদি ধর্ম্মানুষ্ঠানে বিঘ্ন ঘটে, চিত্ত যদি বিচলিত হয়, তাহা হইলে সে বিষয়-বিভব পরিত্যাগ করাই ভাল। আমার ভূমি ছিল বলিয়াই তো আজ দুই প্রহরের সময় আপনার যবন পেয়াদার নিষ্ঠুর বচন আমাকে শুনিতে হইল? সুতরাং সে ভূমিতে আমার আর কাজ নাই। স্পৃহাশূন্য ব্যক্তির নিকট রাজা, ধনী, নির্ধন, সবাই সমান। আপনি বিষয়ী লোক, আপনি আমার কথা বুঝিতে পারিবেন না। বুঝিতে পারিলেও আপনি সংসার-বন্ধনে নিতান্ত আবদ্ধন মরীচিকা-মায়াজালের অনুসরণ আপনাকে করিতেই হইবে। আতপ-তাপিত ভূষিত মরুপ্রান্তর হইতে আপনি মুক্ত হইতে পারিবেন না। এখন আশীর্ব্বাদ করুন, যেন কখনও কখনও কাহারও নিকট কোন বিষয়ের নিমিত্ত নিজের জন্য আমাকে প্রার্থী না হইতে হয়।'' —এই কথা বলিয়া নিরঞ্জন প্রস্থান করিলেন।

নিরঞ্জনের সেই দিন হইতে মন্দ হইল। অতি কষ্টে তিনি দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। ছাত্রগণ একে একে তাঁহাকে ছাড়িয়া গোবর্দ্ধন শিরোমণির চতুষ্পাঠীতে যাইল।

গোবর্দ্ধন শিরোমণি জনার্দ্দন চৌধুরীর সভাপণ্ডিত; অনেকগুলি ছাত্রকে তিনি অন্নদান করেন। বিদ্যাদান করিবার তাঁহার অবকাশ নাই। চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতে সকাল সন্ধ্যা উপস্থিত থাকিতে হয়, তাহা ব্যতীত অধ্যাপকের নিমন্ত্রণে সর্ব্বদা তাঁহাকে নানা স্থানে গমনাগমন করিতে হয়। সুতরাং ছাত্রগণ আপনা-আপনি বিদ্যা শিক্ষা করে।

সে জন্য কিন্তু কেহ দুঃখিত নয়। গোবর্দ্ধন শিরোমণির উপর রাগ হয় না। অভিমানও হয় না। কারণ, তিনি অতি মধুরভাষী, বাক্যসুধা দান করিয়া সকলকেই পরিতুষ্ট করেন। বিশেষতঃ ধনবান লোক পাইলে শ্রাবণের বৃষ্টি ধারায় তিনি বাক্য-সুধা বর্ষণ করিতে থাকেন; তৃষিত চাতকের ন্যায় তাঁহারা সেই সুধা পান করেন।

একদিন জনার্দ্দন চৌধুরীর বাটীতে আসিয়া তনু রায় শাস্ত্রবিচার করিতেছিলেন। নিরঞ্জন, গোবর্দ্ধন প্রভৃতি সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

তনু রায় বলিলেন,—'কন্যাদান করিয়া বংশজ কিঞ্চিৎ সম্মান গ্রহণ করিবে। শাস্ত্রে একেবারেই নিষিদ্ধ।''--গোবর্দ্ধন চুপি চুপি বলিলেন,—''বল না? মহাভারতে আছে।''

তনু রায় তাহা শুনিতে পাইলেন না। ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন—'দাতা-কর্ণে আছে''।

এই কথা শুনিয়া নিরঞ্জন একটু হাসিলেন। নিরঞ্জনের হাসি দেখিয়া তনু রায়ের রাগ হইল। –নিরঞ্জন বলিলেন,—''রায় মহাশয়! কন্যার বিবাহ দিয়া টাকা গ্রহণ করা মহাপাপ। পাপ করিতে ইচ্ছা হয়, করুন; কিন্তু শাস্ত্রের দোষ দিবেন না, শাস্ত্রকে কলঙ্কিত করিবেন না। শাস্ত্র আপনি জানেন না, শাস্ত্র আপনি পড়েন নাই।

তনু রায় আর রাগ সংবরণ করিতে পারিলেন না। নিরঞ্জনের প্রতি নানা কটু কথা প্রয়োগ করিয়া অবশেষে বলিলেন, ''আমি—শাস্ত্র পড়ি নাই? ভাল? কিসের জন্য আমি পরের শাস্ত্র পড়িব? যদি মনে করি তো আমি নিজে কত শাস্ত্র করিতে পারি। যে নিজে শাস্ত্র করিতে পারে সে পরের শাস্ত্র কেন পড়িবে?''

নিরঞ্জনকে এইবার পরাস্ত মানিতে হইল। তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইল যে, যে লোক

নিজে শাস্ত্র প্রণয়ন করিতে পারে, পরের শাস্ত্র তাহার পড়িবার আবশ্যক নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ – বিদায়

যে দিন রামহরির সহিত কথাবার্ত্তা হইল, সে দিন রাত্রিতে মা, খেতুর গায়ে স্নেহের সহিত হাত রাখিয়া বলিলেন,—"খেতু! বাবা! তোমাকে একটি কথা বলি।"

খেতু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি মা?"

মা উত্তর করিলেন,—"বাছা! তোমার রামহরি দাদার সহিত তোমাকে কলিকাতায় যাইতে হইবে।" –খেতু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে কোথায় মা!"

মা বলিলেন,—"তোমার মনে পড়ে না? সেই যে, যেখানে গাড়ী ঘোড়া আছে?"

খেতু বলিলেন—সেই খানে? তুমি সঙ্গে যাবে তো মা?"

মা উত্তর করিলেন,—"না বাছা! আমি যাইব না, আমি এইখানেই থাকিব।"

খেতু বলিলেন,—"তবে মা! আমিও যাইব না!"

মা বলিলেন,—"না গেলে বাছা চলিবে না। আমি মেয়েমানুষ, আমাকে যাইতে নাই। রামহরি দাদার সঙ্গে যাইবে তাতে আর ভয় কি?"

খেতু বলিলেন,—"ভয়! ভয় মা! আমি কিছুতে ভয় করি না। তবে তোমার জন্য আমার মন কেমন করিবে, তাই মা বলিতেছি যে, যাব না।"

মা বলিলেন,—"খেতু! সাধ করিয়া কি তোমাকে আমি কোথাও পাঠাই? কি করি, বাছা? না পাঠালেই নয়, তাই পাঠাতেই চাই। তুমি এখন বড় হইয়াছে, এইবার তোমাকে স্কুলে পড়িতে হইবে। না পড়িলে শুনিলে মূর্খ হয়, মুর্খকে কেহ ভালবাসে না, কেহ আদর করে না, তুমি যদি স্কুলে যাও আর মন দিয়া লেখা পড়া কর, তাহা হইলে সকলেই তোমাকে ভালবাসিবে; আর খেতু! তোমার এই দুঃখিনী মার দুঃখ ঘুচিবে। এই দেখ, আমি আর সরু পৈতা কাটিতে পারি না, চক্ষে দেখতে পাই না। আর কিছুদিন পরে হয় তো মোটা পৈতাও কাটিতে পারিব না। তখন বল, পয়সা কোথায় পাইব? লেখা-পড়া শিখিয়া তুমি টাকা আনিতে পারিলে, আমাকে আর পৈতা কাটিতে হইবে না। আমি তখন সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকিব, পূজা-আচ্চা করিব, আর ঠাকুরদের কাছে বলিব,—খেতু আমার বড় সুছেলে, খেতুকে তোমরা বাঁচাইয়া রাখ।"

খেতু বলিলেন,—"মা! আমি যদি যাই, তুমি কাঁদিবে না?

মা উত্তর করিলেন,—"না বাছা, কাঁদিব না।

খেতু বলিলেন,—"ঐ যে মা! কাঁদিতেছ!"

মা উত্তর করিলেন,—"এখন কান্না পাইতেছে, ইহার পর আর কাঁদিব না। আর খেতু সেখানে তোমাকে বারমাস থাকিতে হইবে না, ছুটী পাইলে তুমি মাঝে মাঝে বাড়ী আসিবে। আমি পথপানে চাহিয়া থাকিব, আগে থাকিতে দত্তদের পুকুর ধারে গিয়া বসিয়া থাকিব, সেইখান হইতে তোমাকে কোলে করিয়া আনিব। মন দিয়া লেখা পড়া করিলে, তুমি আবার আমাকে চিঠি লিখিতে শিখিবে। তুমি আমাকে কত চিঠি লিখিবে আমি সে

চিঠিগুলি তুলিয়া রাখিব, কাহাকেও খুলিতে দিব না, কাহাকেও পড়িতে দিব না। তুমি যখন বাড়ীতে আসিবে, তখন সেই চিঠিগুলি খুলিয়া আমাকে পড়িয়া পড়িয়া শুনাইবে।"

খেতু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা! সেখানে মালা পাওয়া যায়?"

মা বলিলেন,—"মালা কি?" -খেতু বলিলেন,—"সেই যে মা? তুমি এক দিন বলিয়াছিলে যে, রাত্রিতে ঘুম হয় না, যদি একছড়া মালা পাই তো বসিয়া বসিয়া জপ করি।"

মা উত্তর করিলেন—"হ্যাঁ বাছা! মালা সেখানে অনেক পাওয়া যায়।"

খেতু বলিলেন,—"আমি তোমার জন্য, মা! ভাল মালা কিনিয়া আনিব।"

মা উত্তর করিলেন, তাই ভাল! আমার জন্য মালা আনিও।"

মাতা-পুত্রে এইরূপ কথার পর, কলিকাতার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে খেতু নিদ্রিত হইলেন।।—তাহার পরদিন সকালে উঠিয়া খেতু বলিলেন,—মা, এই কয়দিন আমি পাঠশালায় যাইব না, খেলা করিতেও যাইব না, সমস্ত দিন তোমার কাছে থাকিব।"

মা উত্তর করিলেন,—"আচ্ছা, তাই ভাল, তবে তোমার নিরঞ্জন কাকাকে একবার নমস্কার করিতে যাইও।"

খেতু বলিলেন,—"তা যাব। আমি আর একটি কথা বলি। তোমার খাওয়া হইলে, এ কয়দিন আমি তোমার পাতে ভাত খাইব। পাতে ভাত রাখিতে মানা করি, কেন তা জান মা? যাহা তোমার মুখে ভাল লাগে, নিজে না খাইয়া আমার জন্য রাখ। তাই আমি বলি, 'দুপুর বেলা মা! আমার ক্ষুধা পায় না, আমার জন্য পাতে ভাত রাখিও না।' ক্ষুধা, কিন্তু মা! খুব পায়। লোকের গাছতলায় কত কুল, কত বেল পড়িয়া থাকে, স্বচ্ছেন্দে কুড়াইয়া খাই। কিন্তু তোমার ক্ষুধা পাইলে তুমি তো মা, তা খাও না? তাই পাতে ভাত রাখিতে মানা করি, পাছে মা! তোমার পেট না ভরে!"

ব্রাহ্মণী খেতুকে কোলে লইলেন, মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কাঁদিতে লাগিলেন, আর বলিলেন,—"বাবা! এ দুঃখের কান্না নয়! তোমা হেন চাঁদ ছেলে যে গর্ভে ধরিয়াছে, তার আবার দুঃখ কিসের? তোমার সুধামাখা কথা শুনিলে ভয় হয়,—এ হতভাগিনীর কপালে তুমি কি বাঁচিবে?"

সেই দিন আহারাদির পর খেতুর ছেঁড়া খোঁড়া কাপড়গুলি মা সেলাই করিতে বসিলেন।

খেতু বলিলেন,—"মা। আমি ছেঁড়ার দুই ধার এক করিয়া ধরি, তুমি ওদিক্ হইতে সেলাই কর, তাহা হইলে শীঘ্র হইবে। আর মা! যখন সূচে সূতা না থাকিবে, তখন আমি পরাইয়া দিব, তুমি ছিদ্রটি দেখিতে পাও না, সূতো পরাইতে তোমার অনেক বিলম্ব হয়।"

এইরূপে মাতাপুত্রে কথা কহিতে কহিতে কাপড় সেলাই হইতে লাগিল। তাহার পর মা সেইগুলিকে ক্ষারে কাচিয়া পরিষ্কার করিয়া লইলেন। খেতু কলিকাতায় যাইবেন, তাহার আয়োজন এইরূপে হইতে লাগিল। —বৈকালবেলা খেতু নিরঞ্জনের বাটী যাইলেন। নিরঞ্জন ও নিরঞ্জনের স্ত্রীকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইয়া, কলিকাতায় যাইবার কথা তাঁহাদিগকে বলিলেন। রামহরির নিকট নিরঞ্জন পূর্ব্বেই সমস্ত কথা শুনিয়াছিলেন।

এক্ষণে খেতুকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, নানারূপ উপদেশ দিয়া নিরঞ্জন বলিলেন,—"খেতু! সর্ব্বদা সত্য কথা বলিবে, মিথ্যা কখনও বলিও না। নীচতা ও নিষ্ঠুরতা পরিত্যাগ করিবে। জীবে দয়া করিবে। যথাসাধ্য পরোপকার করিবে, ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। সুখ-দুঃখের সকল কথা তোমার রামহরি দাদাকে বলিবে, কোনও কথা তাঁহার নিকট গোপন করিবে না। অনেক বালকের সহিত তোমাকে পড়িতে হইবে, তাহার মধ্যে কেহ দুষ্ট, কেহ শিষ্ট। সুতরাং বালকে বালকে বিবাদ হইবে। অন্যায় করিয়া কাহাকেও মারিও না, দুর্ব্বলকে মারিও না, পাঁচজন পড়িয়া একজনকে মারিও না, দুর্ব্বলকে কেহ মারিতে আসিলে তাহার পক্ষ হইও। দুর্ব্বলের পক্ষ হইয়া যদি মার খাইতে হয় সেও ভাল। প্রতিদিন রাত্রিতে শুইবার সময় মনে করিয়া দেখিবে যে, সেদিন কি সুকার্য কি কুকার্য্য করিয়াছ। যদি কোনও প্রকার কুকার্য্য করিয়া থাক, তো মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিবে, আর এমন কাজ কখনও করিব না।"

এইরূপে খেতু, নিরঞ্জন কাকার নিকট হইতে বিদায়গ্রহণ করিলেন।

মঙ্গলবার রাত্রিতে মাতা-পুত্রের নিদ্রা হইল না। দুই জনে কেবল কথা কহিতে লাগিলেন, কথা আর ফুরায় না। কতবার মা বলিলেন,—"খেতু! ঘুমাও, না ঘুমাইলে অসুখ করিবে।"

খেতু বলিলেন,—"না মা! আজ রাত্রিতে ঘুম হইবে না। আর মা কা'ল রাত্রিতে তো আর তোমার সঙ্গে কথা কহিতে পাব না? কা'ল কতদূর চলিয়া যাব। সে কথা যখন মা! মনে করি, তখন আমার কান্না পায়।" মা বলিলেন,—"পূজার ছুটির আর অধিক দিন নাই, দেখিতে দেখিতে এ কয়মাস কাটিয়া যাইবে। তখন তুমি আবার বাড়ী আসিবে।

প্রাতঃকালে রামহরি আসিলেন। খেতুর মা, খেতুর কপালে দধির ফোঁটা করিয়া দিলেন, চাদরের খুঁটে বিল্বপত্র বাঁধিয়া দিলেন। নীরবে নিঃশব্দে রামহরির হাতের উপর খেতুর হাতটি দিলেন। চক্ষু ফুটিয়া জল আসিতেছিল, অনেক কষ্টে তাহা নিবারণ করিলেন।

অবশেষে ধীরে ধীরে কেবল এই কথাটি বলিলেন,—"দুঃখিনীর ধন তোমাকে দিলাম।"

রামহরি বলিলেন,—"খেতু! মাকে প্রণাম কর।"

খেতু প্রণাম করিলেন, রামহরি নিজেও প্রণাম করিয়া দুইজনে বিদায় হইলেন।

যতক্ষণ দেখা যাইল, ততক্ষণ খেতুর মা অনিমেষ নয়নে সেই পথপানে চাহিয়া রহিলেন। খেতুও মাঝে মাঝে পশ্চাৎদিকে চাহিয়া মাকে দেখিতে লাগিলেন। যখন আর দেখা গেল না, তখন খেতুর মা পথের ধূলায় শুইয়া পড়িলেন। ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া-অবিরল ধারায় চক্ষের জলে সেই ধূলা ভিজাইতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ – কঙ্কাবতী

পথে পড়িয়া খেতুর মা কাঁদিতেছেন, এমন সময় তনু রায়ের স্ত্রী সেইখানে আসিলেন। তাঁহার হাত ধরিয়া তুলিয়া ধীরে ধীরে তিনি বলিলেন,—"দিদি! চুপ কর। চক্ষের জল ফেলিতে নাই। চক্ষের জল ফেলিলে ছেলের অমঙ্গল হয়।"

খেতুর মা উত্তর করিলেন,—"সব জানি বোন্! কিন্তু কি করি? চক্ষের জল যে রাখিতে পারি না, আপনা-আপনি বাহির হইয়া পড়ে। আমি যে আজ পৃথিবী শূন্য দেখিতেছি! কি

করিয়া ঘরে যাই? আজ যে আমার আর কোন কাজ নাই। আজ তো আর খেতু পাঠশালা হইতে কালি ঝুলি মাখিয়া ক্ষুধা ক্ষুধা করিয়া আসিবে না? এতক্ষণ খেতু কতদূর চলিয়া গেল! আহা, বাছার কত না মন কেমন করিতেছে!"

তনু রায়ের স্ত্রী বলিলেন,—"চল দিদি! ঘরে চল। সেইখানে বসিয়া, চল, খেতুর গল্প করি। আহা! খেতু কি গুণের ছেলে! দেশে এমন ছেলে নাই। তোমার কপালে এখন বাঁচিয়া থাকে—তবেই; তা না হইলে সব বৃথা।"

এই বলিয়া তনু রায়ের স্ত্রী খেতুর-মার হাত ধরিয়া ঘরে লইয়া গেলেন। সেখানে অনেক্ষণ ধরিয়া দুইজনে খেতুর গল্প করিলেন।

খেতু খাইয়া গিয়াছিল, তনু রায়ের স্ত্রী সেই বাসনগুলি মাজিলেনও ঘর-দ্বার সব পরিষ্কার করিয়া দিলেন। বেলা হইলে খেতুর মা রাঁধিয়া খাইবেন, সে নিমিত্ত তরকারিগুলি কুটিয়া দিলেন, বাটনাটুকু বাটিয়া দিলেন।

খেতুর মা বলিলেন,—থাক বোন্ থাক! আজ আর আমার খাওয়া দাওয়া! আজ আর আমি কিছু খাইব না।"

তনু রায়ের স্ত্রী বলিলেন,—"না দিদি! উপবাসী কি থাকিতে আছে? খেতুর অকল্যাণ হয়, তা' কি তিনি করিতে পারেন?—"খেতুর অকল্যাণ হইবে।" এই কথাটি বলিলেই খেতুর মা চুপ! যা করিলে খেতুর অকল্যাণ হয়, তা' কি তিনি করিতে পারেন?

তনু রায়ের স্ত্রী পুনরায় বলিলেন,—"এই সব ঠিক করিয়া দিলাম। বেলা হইলে রান্না চড়াইয়া দিও। কাজ-কর্ম্ম সারা হইলে আমি আবার ও বেলা আসিব।"—অপরাহ্নে তনু রায়ের স্ত্রী পুনরায় আসিলেন। কোলের মেয়েটিকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন। —খেতুর মা বলিলেন,—"আহা! কি সুন্দর মেয়েটি বোন্ যেমন মুখ, তেমনি চুল, তেমনি রং।"

তনু রায়ের স্ত্রী বলিলেন,—"হ্যাঁ! সকলেই বলে, এ কন্যাটি তোমার গর্ভের সুন্দর। তা দিদি! এ পোড়া পেটে কেন যে এরা আসে? মেয়ে হইলে ঘরের মানুষটি আহ্লাদে আটখানা হন; কিন্তু আমার মনে হয় যে, আঁতুর ঘরেই মুখে নুন দিয়া মারি। গ্রীষ্মকালে একাদশীর দিন, মেয়ে দুইটির যখন মুখ শুকাইয়া যায়, যখন একটু জলের জন্য বাছাদের প্রাণ টা টা করে, বল দেখি, দিদি! মার প্রাণ তখন কিরূপ হয়? পোড়া নিয়ম! যে এ নিয়ম করিয়াছে, তাহাকে যদি একবার দেখিতে পাই, তো ঝাঁটা পেটা করি। মুখপোড়া যদি একটু জল খাবারও বিধান দিত, তাহা হইলে কিছু বলিতাম না।"

খেতুর মা বলিলেন,—"আর জন্মে যে যেমন করিয়াছে, এ জন্মে সে তার ফল পাইয়াছে; আবার এ জন্মে যে যেরূপ করিবে, ফিরে জন্মে সে তার ফল পাইবে।"

তনু রায়ের স্ত্রী পুনরায় বলিলেন,—"এক একবার মনে হয় যে, যদি বিদ্যাসাগরী মতটা চলে, তো ঠাকুরদের সিন্নি দিই।"

খেতুর মা উত্তর করিলেন,—" চুপ কর বোন্! ছি ছি! ও কথা মুখে আনিও না। বিদ্যাসাগরের কথা শুনিয়া সাহেবরা যদি বলেন যে,'দেশে আর বিধবা থাকিতে পারে না,

সকলকেই বিবাহ করিতে হইবে, ছি ছি! ও মা! কি ঘৃণার কথা! এই বৃদ্ধ বয়সে তাহা হইলে যাব কোথা? কাজেই তখন গলায় দড়ি দিয়া কি জলে ডুবিয়া মরিতে হইবে।"

তনু রায়ের স্ত্রী হাসিয়া বলিলেন,—"দিদি! এতদিন তুমি কলিকাতায় ছিলে, কিন্তু তুমি কিছুই জান না। বিদ্যাসাগর মহাশয় বুড়ো হাবড়া সকলকেই ধরিয়া বিবাহ দিতে চান নাই। অতি অল্প বয়সে যাহারা বিধবা হয়, কেবল সেই বালিকাদিগের বিবাহের কথা তিনি বলিয়াছিলেন। তাও যাহার ইচ্ছা হবে, সে দিবে; যাহার ইচ্ছা না হবে, না দিবে।"

খেতুর মা বলিলেন,—"কি জানি, ভাই। আমি অত শত জানি না।"

তনু রায়ের স্ত্রীর দুইটি বিধবা মেয়ে, তাহাদের দুঃখে তিনি সদাই কাতর। সে জন্য বিধবা বিবাহের কথা পড়িলে তিনি কান দিয়া শুনিতেন। কলিকাতায় বাস করিয়া খেতুর মা যাহা না জানেন, তাহা ইনি জানেন।

তনু রায় পণ্ডিত লোক। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতটি যেই বাহির হইল, আর ইনি লুফিয়া লইলেন। —তিনি বলিলেন,—"বিধবা বিবাহের বিধি যদি শাস্ত্রে আছে, তবে তোমরা মানিবে না কেন! শাস্ত্র অমান্য করা ঘোর পাপের কথা। দুইবার কেন? বিধবাদিগের দশ বার বিবাহ দিলেও কোন দোষ নাই, বরং পূণ্য আছে। কিন্তু এ হতভাগ্য দেশ ঘোর কুসংস্কারে পরিপূর্ণ, এ দেশের আর মঙ্গল নাই।"

তনু রায়ের মত নিষ্ঠাবান্ লোকের মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া প্রথম প্রথম সকলে কিছু আশ্চর্য্য হইয়াছিল। তার পর সকলে ভাবিল,—"আহা! বাপের প্রাণ!, ঘরে দুইটি বিধবা মেয়ে, মনের খেদে উনি এইরূপ কথা বলিতেছেন।" —কেবল নিরঞ্জন বলিলেন,—"হ্যাঁ! বিধবা বিবাহটি প্রচলিত হইলে তনু রায়ের ব্যবসাটি চলে ভাল!"

এই কথা শুনিয়া সকলে নিরঞ্জনকে ছি ছি করিতে লাগিল। সকলে বলিল,—নিরঞ্জনের মনটি হিংসায় পরিপূর্ণ। তা না হইলেই বা ও'র এমন দশা হইবে কেন? যার দুই শত বিঘা ব্রহ্মোত্তর ভূমি ছিল, আজ সে পথের ভিখারী; কোনও দিন অন্ন হয়, কোনও দিন অন্ন হয় না।" —খেতুর মাতে আর তনু রায়ের স্ত্রীতে নানারূপ কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল।

খেতুর মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার এ মেয়েটি বুঝি এক বৎসর হইল?"

তনু রায়ের স্ত্রী উত্তর করিলেন,—"হ্যাঁ! এই এক বৎসর পার হইয়া দুই বৎসরে পড়িবে?"খেতুর মা বলিলেন,—"কঙ্কাবতী! দিব্য নামটি তো? মেয়েটিও যেমন নরম নরম দেখিতে, নামটিও সেইরূপ নরম নরম শুনিতে।"

এইরূপ খেতুর মাতে আর তনু রায়ের স্ত্রীতে ক্রমে ক্রমে বড়ই সদ্ভাব্য হইল। অবসর পাইলে তনু রায়ের স্ত্রী কঙ্কাবতীকে খেতুর মার কাছে ছাড়িয়া যান।

মেয়েটি এখনও হাঁটিতে শিখে নাই; হামাগুড়ি দিয়া চারিদিকে বেড়ায় কখনও বা বসিয়া খেলা করে কখনও বা কিছু ধরিয়া দাঁড়ায়। খেতুর মা আপনার কাজ করেন ও তাহার সহিত দুটি একটি কথা কন্। কথা কহিলে মেয়েটি ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসে, মুখে হাসি ধরে না। মেয়েটি বড় শান্ত, কাঁদিতে একেবারে জানে না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ – বালক-বালিকা

কলিকাতায় গিয়া খেতু ভালরূপে লেখা-পড়া করিতে লাগিলেন। শান্ত শিষ্ট, সুবুদ্ধি। খেতুর নানা গুণ দেখিয়া সকলে তাঁহাকে ভাল বাসিতেন।

রামহরির এক্ষণে কেবল একটি শিশু-পুত্র, তাহার নাম নরহরি। তিন বৎসর পরে একটি কন্যা হয়; তাহার নাম হইল সীতা।

রামহরি ও রামহরির স্ত্রী, খেতুকে আপনাদিগের ছেলের চেয়ে অধিক স্নেহ করিতেন। খেতুর প্রখর বুদ্ধি দেখিয়া স্কুলে সকলেই বিস্মিত হইলেন। খেতু সকল কথা বুঝিতে পারেন, সকল কথা মনে করিয়া রাখিতে পারেন। যখন যে শ্রেণীতে পড়েন, তখন সেই শ্রেণীর সর্ব্বোত্তম বালক—খেতু; খেতুর উপর কেহ উঠিতে পারে না। যখন যে কয়খানি পুস্তক পড়েন তাহার ভিতর হইতে প্রশ্ন করিয়া খেতুকে ঠকানো ভার। এইরূপে খেতু এক শ্রেণী হইতে অপর শ্রেণীতে উঠিতে লাগিলেন।

জল খাইবার নিমিত্ত রামহরি খেতুকে একটি করিয়া পয়সা দিতেন; খেতু কোনও দিন খাইতেন, কোনও দিন খাইতেন না। কি করিয়া রামহরি এই কথা জানিতে পারিলেন।

খেতুকে তিনি একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"খেতু! তুমি জল খাওনা কেন? পয়সা লইয়া কি কর?"

খেতু কিছু অপ্রতিভ হইলেন, একটুখানি চুপ করিয়া উত্তর করিলেন,—"দাদা-মহাশয়! যে দিন বড় ক্ষুধা পায়, যে দিন আর থাকিতে পারি না, সেই দিন জল খাই; যে দিন না খাইয়া থাকিতে পাবি সেই দিন আর খাই না। যা পয়সা বাঁচিয়েছি, তাহা আমার কাছে আছে। যখন মার নিকট হইতে আসি, তখন মাকে বলিয়াছিলাম যে, মা! তোমার জন্য আমি এক ছড়া মালা কিনিয়া আনিব; সেই জন্য এই পয়সা রাখিতেছি।"

যখন এই কথা হইতেছিল, তখন রামহরির নিকট খেতু দাঁড়াইয়া ছিলেন। রামহরি খেতুর মাথায় হাত দিয়া সম্মুখের চুলগুলি পশ্চাৎ দিকে ফিরাইতে লাগিলেন। খেতু বুঝিলেন দাদা রাগ করেন নাই আদর করিতেছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে রামহরি বলিলেন,—"খেতু! যখন মালা কিনিবে আমাকে বলিও, আমি ভাল মালা কিনিয়া দিব।"

পূজার ছুটি নিকট হইল। তখন খেতু বলিলেন,—"দাদা মহাশয়! কৈ, এইবার মালা কিনিয়া দিন?" -রামহরি বলিলেন,—"তোমার কতগুলি পয়সা হইয়াছে, নিয়ে এস, দেখি?"

খেতু পয়সাগুলি আনিয়া দাদার হাতে দিলেন। রামহরি গণিয়া দেখিলেন যে, এক টাকারও অধিক পয়সা হইয়াছে। আট আনা দিয়া রামহরি একছড়া ভাল রুদ্রাক্ষের মালা কিনিয়া, বাকি পয়সাগুলি খেতুকে ফিরাইয়া দিলেন।

খেতু বলিলেন,—"দাদা মহাশয়! আমি এ পয়সা লইয়া আর কি করিব? এ পয়সা আপনি নিন্।" —রামহরি উত্তর করিলেন,—"না খেতু! এ পয়সা আমার নয়, এ পয়সা তোমার, বাড়ী গিয়া মাকে দিও, তোমার মা কত আহ্লাদ করিবেন।"

বাড়ী যাইবার দিন নিকট হইল। এখানে খেতুর মনে, আর সেখানে মার মনে আনন্দ ধরে না। তসর ও গালার ব্যবসায়ীরা সকলে এখন দেশে যাইতেছিলেন। তাঁহাদের সহিত রামহরি খেতুকে পাঠাইয়া দিলেন, আর কবে কোন্ সময়ে দেশে পৌঁছবেন, সে সমাচার আগে থাকিতে খেতুর মাকে লিখিলেন।

দত্তদের পুকুরধারে কেন? খেতুর মা আরও অনেক দূরে গিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। দূর হইতে খেতু মাকে দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে ধরিলেন। খেতুর মা, ছেলেকে বুকে করিয়া স্বর্গসুখ লাভ করিলেন।

খেতু বলিলেন,—"ঐ যা! মা! আমি তোমাকে প্রণাম করিতে ভুলিয়া গিয়াছি।"

মা উত্তর করিলেন,—'থাক্, আর প্রণামে কাজ নাই। অমনি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি, তুমি চিরজীবী হও, তোমার সোনার দোয়াত কলম হ্উক্।"

খেতু বলিলেন,—'মা! আমি মনে করিয়াছিলাম, তুমি দত্তদের পুকুর ধারে থাকিবে, এত দূরে আসিবে, তা' জানিতাম না! —মা বলিলেন—"বাছা! যদি উপায় থাকিত, তো আমি কলিকাতা পর্য্যন্ত যাইতাম। খেতু! তুমি রোগা হইয়া গিয়াছ।"

খেতু উত্তর করিলেন,—"না মা! রোগা হই নাই, পথে একটু কষ্ট হইয়াছে, তাই রোগা রোগা দেখাইতেছে। মা! এখন আমি হাঁটিয়া যাই এত দূর তুমি আমাকে লইয়া যাইতে পারিবে না।" —মা বলিলেন,—"না না, আমি তোমাকে কোলে করিয়া লইয়া যাইব।"

কোলে যাইতে যাইতে খেতু পয়াসাগুলি চুপি চুপি মা'র আঁচলে বাঁধিয়া দিলেন। বাড়ী যাইয়া যখন খেতু মা'র কোল হইতে নামিলেন, তখন ম'ার আঁচল ভারি ঠেকিল।

মা বলিলেন,—'এ আবার কি? খেতু! তুমি বুঝি আমার আঁচলে পয়সা বাঁধিয়া দিলে?"

খেতু হাসিয়া উঠিলেন আর বলিলেন—"মা! রও, তোমাকে আবার একটা তামাসা দেখাই।" এই বলিয়া খেতু মালা ছড়াটি মা'র গলায় দিয়া দিলেন, আর বলিলেন—"কেমন মা! মনে আছে তো?" —মা খেতুর গালে ঈষৎ ঠোনা মারিয়া বলিলেন,—"ভারি দুষ্ট ছেলে!" খেতু হাসিয়া উঠিলেন, মাও হাসিলেন।

পর দিন খেতু দেখিলেন যে, তাঁহাদের বাটীতে কোথা হইতে একটি ছোট মেয়ে আসিয়াছে। খেতু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা! ও মেয়েটি কাদের গা?"

মা বলিলেন—"জান না? ও যে তোমার তনু কাকার ছোট মেয়ে! ওর নাম কঙ্কাবতী। তনু রায়ের স্ত্রী এখন সর্ব্বদাই আমার নিকট আসেন। আমি পৈতা কাটি আর দুই জনে বসিয়া গল্পগাছা করি। মেয়েটিকে তিনি আমার কাছে মাঝে মাঝে ছাড়িয়া যান। মেয়েটি আপনার মনে খেলা করে, কোনওরূপ উপদ্রব করে না। আমার কাছে থাকিতে ভাল বাসে।" —তনু রায়ের সহিত খেতুর কোন সম্পর্ক নাই, কেবল পাড়া প্রতিবাসী, সুবাদে কাকা কাকা বলিয়া ডাকেন। কঙ্কাবতীকে খেতু বলিলেন,—"এস, এই দিকে এস।"

কঙ্কাবতী সেই দিকে যাইতে লাগিল। খেতু বলিলেন,—"দেখ দেখ, মা! কেমন এ টল্ টল্ করিয়া চলে!" —খেতুর মা বলিলেন,—পা এখনও শক্ত হয় নাই।" —একটি পাতা

দেখাইয়া খেতু বলিলেন,—"এই নাও।"

—পাতাটি লইবার নিমিত্ত কঙ্কাবতী হাত বাড়াইল ও হাসিল।

খেতু বলিলেন,—"মা! কেমন হাসে দেখ?" —মা উত্তর করিলেন,—হাঁ বাছা! মেয়েটি খুব হাসে, কাঁদিতে একেবারে জানে না অতি শান্ত।" খেতু বলিলেন' "মা! আগে যদি জানিতাম, তো ইহার জন্য একটি পুতুল কিনিয়া আনিতাম।" মা বলিলেন—"এইবার যখন আসিবে, তখন আনিও।"

নবম পরিচ্ছেদ – মেনী

পূজার ছুটী ফুরাইলে, খেতু কলিকাতায় যাইলেন; সেখানে অতি মনোযোগের সহিত লেখাপড়া করিতে লাগিলেন। বৎসরের মধ্যে দুইবার ছুটী হইলে তিনি বাটী আসেন। সেই সময় মার জন্য কোনও না কোনও দ্রব্য, আর কঙ্কাবতীর জন্য পুতুলটি খেলনাটি লইয়া আসেন। খেতুর মার নিকট কঙ্কাবতী সর্ব্বদাই থাকে, কঙ্কাবতীকে তিনি বড় ভালবাসেন।

খেতুর যখন বার বৎসর বয়স, তখন তিনি একটি বড় মানুষের ছেলেকে পড়াইতে লাগিলেন। বালকের পিতা খেতুকে মাসে পাঁচ টাকা করিয়া দিতেন।

প্রথম মাসের টাকা কয়টি খেতু, রামহরির হাতে দিয়া বলিলেন,"দাদা মহাশয়! এ মাস হইতে মা'র চাউলের দাম আর আপনি নিবেন না, এই টাকা মাকে দিবেন। আমি শুনিয়াছি, আপনার ধার হইয়াছে, তাই যত্ন করিয়া আমি এই টাকা উপার্জ্জন করিয়াছি।"

রামহরি বলিলেন,—খেতু! তুমি উত্তম করিয়াছ। উদ্যম, উৎসাহ, পৌরুষ মনুষ্যের নিতান্ত প্রয়োজন। এ টাকা আমি তোমার মার নিকট পাঠাইয়া দিব। তাঁহাকে লিখিব যে, তুমি নিজে এ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছ। আর আমি সকলকে বলিব যে, দ্বাদশ বৎসরের শিশু আমাদের খেতু, তাহার মাকে প্রতিপালন করিতেছে।"

এইবার যখন খেতু বাটী আসিলেন, তখন মার জন্য একখানি নামাবলী, আর কঙ্কাবতীর জন্য একখানি রাঙা কাপড় আনিলেন। রাঙা কাপড়খানি পাইয়া কঙ্কাবতীর আর আহ্লাদ ধরে না। ছুটিয়া তাহার মাকে দেখাইতে যাইলেন।

খেতু বলিলেন,—"মা! কঙ্কাবতীকে লেখাপড়া শিখাইলে হয় না?" —মা বলিলেন,— "কি জানি বাছা! তনু রায় এক প্রকার লোক। কি বলিতে কি বলিয়া বসিবে।"

খেতু বলিলেন,—"তাতে আর দোষ কি, মা? কলিকাতায় কত মেয়ে স্কুলে যায়;

মা বলিলেন-'কঙ্কাবতীর মাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিব।"

সেই দিন তনু রায়ের স্ত্রী আসিলে, খেতুর মা কথায় কথায় বলিলেন,—"খেতু বলিতেছে,—'এবার যখন বাটী আসিব, তখন কঙ্কাবতীর জন্য একখানি বই আনিব, কঙ্কাবতীকে একটু একটু পড়িতে শিখাইব।' আমি বলিলাম—'না বাছা!' তাতে আর কাজ নাই, তোমার তনু কাকা হয় তো রাগ করিবেন।"

তনু রায়ের স্ত্রী উত্তর করিলেন,—"তাতে আবার রাগ কি, আজ কাল তো ঐ সব হইয়াছে। জামা গায়ে দেওয়া, লেখা পড়া করা, আজ কাল তো সকল মেয়েই করে। তবে

আমাদের পাড়া-গাঁ তাই, এখানে ও সব নাই।”

বাটী গিয়া কঙ্কাবতীর মা স্বামীকে বলিলেন,—“খেতু বাড়ী আসিয়াছে। কঙ্কাবতীর জন্য কেমন একখানি রাঙ্গা কাপড় আনিয়াছে!”

তনু রায় বলিলেন,—“খেতু ছেলেটি ভাল! লেখা পড়ায় মন আছে। দু'পয়সা আনিয়া খাইতে পারিবে! তবে বাপের মত বোকা না হয়।”

স্ত্রী বলিলেন,—“খেতু বলিতেছিল যে, এইবার যখন বাটী আসিব, তখন একখানি বই আনিয়া কঙ্কাবতীকে একটু একটু পড়িতে শিখাইব।” —তনু রায় বলিলেন,—স্ত্রী লোকের আবার লেখাপড়া কেন? লেখাপড়া শিখিয়া আর কাজ নাই।”

না বুঝিয়া তনু রায় এই কথাটি বলিয়া ফেলিলেন। কিন্তু যখন তিনি স্থিরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, তখন বুঝিতে পারিলেন যে লেখাপড়ার অনেক গুণ আছে।

আজকালের বরেরা শিক্ষিতা কন্যাকে বিবাহ করিতে ভালবাসে। এরূপ কন্যার আদর হয়, মূল্যও অধিক হয়।

তবে কথা এই—কাজটি শাস্ত্রবিরুদ্ধ কি না? শাস্ত্র সম্মত না হইলে তনু রায় কখনই মেয়েকে লেখাপড়া শিখাইতে দিবেন না। মনে মনে তনু রায় শাস্ত্রবিচার করিতে লাগিলেন।

বিচার করিয়া দেখিলেন যে স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ বটে, তবে—এ সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগের নিমিত্ত, কলিকালের জন্য নয়। পূর্ব্বকালে যাহা করিতে ছিল, এখন তাহা করিতে নাই। তাহার দৃষ্টান্ত, নরমেধ যজ্ঞ। এখন মানুষ বলি দিলে ফাঁসি যাইতে হয়। আর এক দৃষ্টান্ত,—সমুদ্রযাত্রা এখন করিলে জাতি যায়। তাই তনুরায়ের মা যখন জীবিত ছিলেন, তখন তিনি একবার সাগর যাইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তনু রায় পাঠান নাই।

মাকে তিনি বুঝাইয়া বলিলেন,—“মা! সাগর যাইতে নাই! সমুদ্র যাত্র একে বারে নিষিদ্ধ। শাস্ত্রের সঙ্গে আর সমুদ্রের সঙ্গে ঘোরতর আড়ি। সমুদ্র দেখিলে পাপ, সমুদ্র ছুঁইলে পাপ। কেন মা পয়সা খরচ করিয়া পাপের ভরা কিনিয়া আনিবে? কেন মা জাতি কুল বিসর্জন দিয়া আসিবে?”

এক্ষণে তনু রায় বিচার করিয়া দেখিলেন যে, পূর্ব্বকালে যাহা করিতে ছিল, এখন তাহা করিতে নাই। সুতরাং পূর্ব্বকালে যাহা করিতে মানা ছিল, এখন তাহা লোকে স্বচ্ছন্দে করিতে পারে। স্ত্রীলোকদিগের লেখা-পড়া শিক্ষা করা পূর্ব্বে মানা ছিল, তাই এখন তাহাতে কোনরূপ দোষ হইতে পারে না।

শাস্ত্রকে তনু রায় এইরূপ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গড়িলেন। শাস্ত্রটি যখন মনের মতন গড়া হইল, তখন তিনি স্ত্রীকে বলিলেন,—“আচ্ছা! খেতু যদি কঙ্কাবতীকে একটু আধটু পড়িতে শিখায়, তাহাতে আমার বিশেষ কোনও আপত্তি নাই।”

তনু রায়ের স্ত্রী সেই কথা খেতুর মাকে বলিলেন। খেতুর মা সেই কথা খেতুকে বলিলেন। এবার যখন খেতু বাড়ী আসিলেন, তখন কঙ্কাবতীর জন্য একখানি প্রথমভাগ বর্ণপরিচয় আনিলেন। “লেখা পড়া শিখিব, এই কথা মনে করিয়া প্রথম প্রথম কঙ্কাবতীর

খুব আহ্লাদ হইল। কিন্তু দুই চারি দিন পরেই তিনি জানিতে পারিলেন যে লেখাপড়া শিক্ষা করা নিতান্ত আমোদের কথা নহে। কঙ্কাবতীর চক্ষে অক্ষরগুলি সব এক প্রকার দেখায়। কঙ্কাবতী এটি বলিতে সেটি বলিয়া ফেলেন।

খেতুর রাগ হইল। খেতু বলিলেন,—"কঙ্কাবতী! তোমার লেখাপড়া হইবে না। চিরকাল তুমি মূর্খ হইয়া থাকিবে।" কঙ্কাবতী অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিলেন। তিনি বলিলেন,—"আমি কি কবিব, আমার যে মনে থাকে না?"

খেতুর মা বলিলেন,—"ছেলেমানুষকে কি বকিতে আছে? মিষ্ট কথা বলিয়া শিখাইতে হয়। এস, মা! তুমি আমার কাছে এস। তোমার আর লেখাপড়া শিখিতে হইবে না।"

খেতু বলিলেন,—"মা! কঙ্কাবতী রাত্রি দিন মেনীকে লইয়া থাকে। তাতে কি আর লেখাপড়া হয়?" মেনী কঙ্কাবতীর বিড়াল। অতি আদরের ধন মেনী।

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"জেঠাই মা! আমি মেনীকে ক খ শিখাই; তা আমিও যেমনি বোকা, মেনীও তেমনি বোকা; কেমন মেনী, না? মেনীও পড়িতে পারে না, আমিও পড়িতে পারি না। আমিও ছেলে মানুষ, মেনীও ছেলে মানুষ। আমি বড় হইলে পড়িতে শিখিব, মেনীও বড় হইলে পড়িতে শিখিবে। না মেনী?

খেতু হাসিয়া উঠিলেন। খেতু বলিলেন,—"কঙ্কাবতী। তুমি পাগল নাকি?"

যাহা হউক, ক্রমে কঙ্কাবতীর প্রথমভাগ বর্ণ-পরিচয় সারা হইল।

খেতু বলিলেন,—"আমি শীঘ্র কলিকাতায় যাইব। তাড়াতাড়ি করিয়া প্রথমভাগখানি শেষ করিলাম, কিন্তু ভাল করিয়া হইল না। এই কয় মাসে পুস্তকখানি একেবারে মুখস্থ করিয়া রাখিবে। এবার আমি দ্বিতীয়ভাগ লইয়া আসিব।"

পুনরায় যখন খেতু বাটী আসিলেন, তখন কঙ্কাবতীর দ্বিতীয় ভাগ শেষ হইল। কঙ্কাবতীকে আর পডাইতে হইল না! কঙ্কাবতী এখন আপনা-আপনি সব পড়িতে শিখিলেন। খেতু কঙ্কাবতীকে একখানি পাটিগণিত দিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া কঙ্কাবতী অঙ্ক শিখিলেন। মাঝে মাঝে খেতু কেবল একটু আধটু বসিয়া বলিয়া দিতেন।

কঙ্কাবতী পড়িতে বড় ভালবাসিতেন। কলিকাতা হইতে খেতু তাঁহাকে নানারূপ পুস্তক ও সংবাদ-পত্র পাঠাইয়া দিতেন। সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনগুলি পর্যন্ত কঙ্কাবতী পড়িতেন।

দশম পরিচ্ছেদ – বৌ-দিদি

তের বৎসর বয়সে খেতু ইংরাজীতে প্রথম পাসটি দিলেন। পাস দিয়া তিনি জলপানি পাইলেন। জলপানি পাইয়া মার নিকট তিনি একটি ঝি নিযুক্ত করিয়া দিলেন। মা বৃদ্ধ হইতেছেন, মার যেন কোনও কষ্ট না হয়। এটি সেটি আনিয়া. কাপড়খানি চোপড়খানি কিনিয়া, রামহরির সংসারেও তিনি সহায়তা করিতে লাগিলেন।

পনের বৎসর বয়সে খেতু আর একটি পাশ দিলেন। জলপানি বাড়িল। সতের বৎসর বয়সে আর একটি পাস দিলেন। জলপানি আরও বাড়িল।

খেতু টাকা পাইতে লাগিলেন, সেই টাকা দিয়া মা'র দুঃখ সম্পূর্ণরূপে ঘুচাইলেন। মা যখন যাহা চান, তৎক্ষণাৎ তাহা পান। তাঁহার আর কিছুমাত্র অভাব রহিল না।

শিবপূজা করিবেন বলিয়া খেতুর মা একদিন ফুল পান নাই। তাহা শুনিয়া খেতু বাড়ির নিকট একটি চমৎকার ফুলের বাগান করিলেন। কলিকাতা হইতে কত গাছ লইয়া সেই বাগানে পুঁতিলেন। নানা রঙের ফুলে বাগানটি বার মাস আলো করিয়া থাকিত।

রামহরির কন্যা সীতার এখন সাত বৎসর বয়স। মা একেলা থাকেন, সেই জন্য দাদাকে বলিয়া, খেতু সীতাকে মার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সীতাকে পাইয়া খেতুর মার আর আনন্দের অবধি নাই।

কঙ্কাবতীও সীতাকে খুব ভালবাসিতেন। বৈকাল বেলা দুইজনে গিয়া বাগানে বসিতেন। কঙ্কাবতী এখন খেতুর সম্মুখে বড় বাহির হন না! খেতুকে দেখিলে কঙ্কাবতীর এখন লজ্জা করে। —তবে খেতুর গল্প করিতে, খেতুর গল্প শুনিতে তিনি ভাল বাসিতেন। অন্য লোকের সহিত খেতুর কথা শুনিতে, লজ্জা করিত। এ সব কথা সীতার সহিত হইত। বৈকালবেলা দুইজনে ফুলের বাগানে যাইতেন। নানা ফুলে মালা গাঁথিয়া কঙ্কাবতী সীতাকে সাজাইতেন। ফুল দিয়া নানারূপ গহনা গড়িতেন। গলায়, হাতে, মাথায়, যেখানে যাহা ধরিত, কঙ্কাবতী সীতাকে ফুলের গহনা পরাইতেন। তাহার পর সীতার মুখ হইতে বসিয়া বসিয়া খেতুর কথা শুনিতেন।

নিরঞ্জন কাকাকে খেতু ভুলিয়া যান নাই। যখন খেতু বাটী আসেন, তখন নিরঞ্জন কাকার জন্য কিছু না কিছু লইয়া আসেন। নিরঞ্জন ও নিরঞ্জনের স্ত্রী তাঁহাকে বিধিমতে আশীর্ব্বাদ করেন। —কঙ্কাবতী বড় হইলে, খেতু তাঁহাকে পুস্তক ও সংবাদপত্র ব্যতীত আরও নানা দ্রব্য দিতেন। আজকাল বালিকাদিগের নিমিত্ত যেরূপ শেমিজ প্রভৃতি পরিচ্ছদ প্রচলিত হইয়াছে, কঙ্কাবতীর নিমিত্ত কলিকাতা হইতে খেতু তাহা লইয়া যাইতেন।

রামহরির সংসারের খেতু সহায়তা করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু রামহরি এ কথায় সহজে স্বীকার হন নাই। একবার খেতু নরহরির জন্য একজোড়া কাপড় কিনিয়াছিলেন। তাহা জানিতে পারিয়া রামহরি খেতুকে বকিয়াছিলেন। খেতুর তাহাতে অতিশয় অভিমান হইয়াছিল। দাদাকে কিছু না বলিয়া তিনি রামহরির স্ত্রীর নিকট গিয়া নানারূপ দুঃখ করিতে লাগিলেন। রামহরির স্ত্রীকে খেতু বৌ-দিদি বলিয়া ডাকিতেন।

খেতুর অভিমান দেখিয়া বৌ-দিদি বলিলেন,—"তোমার দাদাকে কিছু বলিতে না পারিয়া, তুমি বুঝি আমার সঙ্গে ঝগড়া করিতে আসিয়াছ?"

খেতু উত্তর করিলেন,—"বৌ-দিদি! তোমরা আমাকে প্রতিপালন করিয়াছ। তোমাদের পুত্র নরহরি যেরূপ, আমাকেও সেইরূপ দেখা উচিত। পুত্রের মত আমাকে যখন না দেখিলে, তখন আমি পর। আমি যখন পর, তখন আবার তোমাদের সঙ্গে আমার ঝগড়া কি? দাদা মহাশয় আমাকে পর মনে করিয়াছেন, এখন তুমিও তাই কর, তাহা হইলে সকল কথা ফুরাইয়া যায়।"

বৌ-দিদি বলিলেন,—"তাহা হইলে কি হয়, খেতু?"

খেতু উত্তর করিলেন,—কি হয়? হয় আর কি? তাহা হইলে আমি আর অর্থোপার্জ্জন করিতে যত্ন করি না। তোমাদের সহিত আর কথা কই না। তোমাদের বাড়ীতে আর থাকি না। মনে করি, আমার মাকে ভিখারিণী দেখিয়া ইঁহারা ভিক্ষা দিয়াছিলেন। আমার এই শরীর, আমার এই অস্থি, মাংস সমুদায় ভিক্ষায় গঠিত। ভদ্রসমাজে আর যাই না, ভদ্র-সমাজে আর মুখ তুলিয়া কথা কহি না। দুঃখিনী ভিখারিণীর ছেলে, ভিক্ষায় যাহার দেহ গঠিত, কোন্ মুখে সে আবার ভদ্র-সমাজে দাঁড়াইবে?"

বৌ-দিদি বলিলেন,—"ছি খেতু! অমন বলিতে নাই। সম্পর্কে তুমি দেবর বটে, কিন্তু পুত্রের চেয়ে তোমাকে অধিক স্নেহ করি। তুমি উপযুক্ত সন্তান, তুমি যাহা করিবে, তাহাই হইবে; তাহার আবার অভিমান কি?"

খেতু বলিলেন,—"বৌ-দিদি! মাকে সুখে রাখিব, তোমাদিগকে সুখে রাখিব, চিরকাল আমার এই কামনা। এক্ষণে আমার ক্ষমতা হইয়াছে, এখন যদি তোমরা আমাকে সে কামনা পূর্ণ করিতে না দাও, তাহা হইলে আমার মনে বড় দুঃখ হইবে।"

বৌ-দিদি উত্তর করিলেন,—"সার্থক তোমার মা তোমাকে গর্ভে ধরিয়াছেন। এখন আশীর্ব্বাদ করি, খেতু! শীঘ্রই তোমার একটি রাঙা বউ হউক।"

সেই দিন রামহরির স্ত্রী, রামহরিকে আনক বুঝাইয়া বলিলেন,—"দেখ! আমাদের সংসারের কষ্ট দেখিয়া খেতু বড কাতর হইয়াছে। খেতু এখন দু পয়সা আনিতেছে। সে বলে,—"যখন ইঁহারা আমাকে পুত্রের মত প্রতিপালন করিয়াছেন, তখন আমিও পুত্রের মত কার্য্য করিব।' সংসার খরচে খেতু যদি কোনওরূপ সহায়তা করে, তাহা হইলে খেতুকে কিছু বলিও না! এ বিষয়ে খেতুকে কিছু বলিলে, তাহার মনে বড় দুঃখ হয়।"

স্ত্রীর কাছে সকল কথা শুনিয়া, রামহরির খেতুকে ডাকিলেন। খেতু আসিলে রামহরি তাঁহাকে বলিলেন,—"রাগ করিয়াছ, দাদা? পৃথিবী অতি ভয়ানক স্থান! আমার মত যখন বয়স হইবে তখন জানিতে পারিবে যে, টাকা টাকা করিয়া পৃথিবীর লোক কিরূপ পাগল। সেই জন্য, খেতু, তোমাকে আমার সংসারে টাকা খরচ করিতে মানা করিয়াছিলাম। আমাদের দুঃখ চিরকাল। আমাদের কখনও 'নাই নাই' ঘুচিবে না।

সে দুঃখের ভাগী তোমাকে আমি কেন করিব? অনেক দিন হইতে আমি জলখাবার খাই না। জ্বর হইলে উপবাস দিয়া ভাল করি। তুমি দুধের ছেলে, তোমাকে কেন এ দুঃখে পড়িতে দিব? এই মনে করিয়া তোমাকেএ সংসারে টাকা খরচ করিতে মানা করিয়াছিলাম। আমি তখন ভাবি নাই, তুমি কিরূপ পিতার পুত্র। খেতু! অধিক আর তোমাকে কি বলিব, এই পৃথিবীতে তিনি সাক্ষাৎ দেবতাস্বরূপ ছিলেন। তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি, ভাই! যেন তুমি সেই দেবতুল্য হও।" —রামহরির চক্ষু দিয়া ফোঁটায় ফোঁটায় জল পড়িতে লাগিল। রামহরির স্ত্রীও চক্ষু মুছিতে লাগিলেন। খেতুরও চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল।

খেতু তিনটা পাস দিলেন, আর কন্যা ভারগ্রস্ত লোকেরা রামহরির নিকট আনাগোনা

করিতে লাগিলেন। সকলের ইচ্ছা খেতুর সহিত কন্যার বিবাহ দেন। ইনি বলেন,—"আমি এত সোনা দিব, এত টাকা দিব;" তিনি বলেন,—"আমি এত দিব, তত দিব;" এইরূপে সকলে নিলাম-ডাকা ডাকি করিতে লাগিলেন।

রামহরি সকলকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, যত দিন না খেতুর লেখাপড়া সমাপ্ত হয়, যত দিন না খেতু দু-পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারে, তত দিন তিনি খেতুর বিবাহ দিবেন না।

কিন্তু কন্যাভারগ্রস্ত লোকেরা সে কথা শুনিবেন কেন? রামহরির নিকট তাঁহারা নানারূপ মিনতি করিতে লাগিলেন। অবশেষে রামহরি মনে করিলেন,—"দূর হউক! এক স্থানে কথা দিয়া রাখি। তাহা হইলে সকলে আর আমাকে এরূপ ব্যস্ত করিবে না।"

এই মনে করিয়া তিনি অনেকগুলি কন্যা দেখিলেন। শেষে জন্মেজয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যাকে তিনি মনোনীত করিলেন। জন্মেজয় বাবু সঙ্গতিপন্ন লোক ও সদ্বংশ জাত। রামহরি কিন্তু তাঁহাকে সঠিক কথা দিতে পারিলেন না। খেতুর মা'র মত না লইয়া কি করিয়া তিনি কথা স্থির করেন?

একাদশ পরিচ্ছেদ – সম্বন্ধ

কঙ্কাবতীর যত বয়স হইতে লাগিল, ততই তাঁহার রূপ বাড়িতে লাগিল। কঙ্কাবতীর রূপে দশদিক্ আলো, কঙ্কাবতীর পানে চাওয়া যায় না। রংটি উজ্জ্বল ধবধবে, ভিতর হইতে যেন জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে; জল খাইলে যেন জল দেখা যায়। শরীরটি স্থূলও নয়, কৃশও নয়, যেন পুতুলটি, কি ছবিখানি। মুখখানি যেন বিধাতা কুঁদে কাটিয়েছেন। নাকটি টিকালো টিকালো, চক্ষু দুটি টানা, চক্ষুর পাতা দীর্ঘ, ঘন ও ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। চক্ষু কিঞ্চিৎ নীচে করিলে পাতার উপর পাতা পড়িয়া এক অদ্ভুত শোভার আবির্ভাব হয়। এইরূপ চক্ষু দুইটির উপর যেরূপ সরু সরু কাল কাল, ঘন ভুরুতে মানায়, কঙ্কাবতীর তাহাই ছিল। গাল দুটি নিতান্ত পূর্ণ নহে, কিন্তু হাসিলে টোল পড়ে। তখন সেই হাসিমাখা টোল-খাওয়া মুখখানি দেখিলে শত্রুর মনও মুগ্ধ হয়। ঠোঁট দুটি পাতলা। পান খাইতে হয় না, আপনা-আপনি সদাই টুক্‌টুক্ করে। কথা কহিবার সময় ঠোঁটের ভিতর দিয়া, সাদা দুধের মত দুই চারিটি দাঁত দেখিতে পাওয়া যায়, তখন দাঁতগুলি যেন ঝক্‌ঝক্ করিতে থাকে। কঙ্কাবতীর খুব চুল, ঘোর কাল, ছাড়িয়া দিলে, কোঁকড়া হইয়া পিঠের উপর গিয়া পড়ে। সম্মুখের সিঁথিটি কে যেন তুলি দিয়া ঈষৎ সাদা রেখা টানিয়া দিয়াছে। স্থূল কথা, কঙ্কাবতী একটি প্রকৃত সুন্দরী, পথের লোককে চাহিয়া দেখিতে হয়, বার বার দেখিয়াও আশা মিটে না। সমবয়স্কা বালিকাদিগের সহিত কঙ্কাবতী যখন দৌড়াদৌড়ি করিয়া খেলা করেন, তখন যথার্থই যেন বিজলী খেলিয়া বেড়ায়।

এখন কঙ্কাবতীর বয়স হইয়াছে। এখন কঙ্কাবতী সেরূপ আর দৌড়াদৌড়ি করিয়া খেলিয়া বেড়ান না। তবে কি জন্য একদিন একটু ছুটিয়া বাড়ী আসিয়াছিলেন। শ্রমে মুখ ঈষৎ রক্তবর্ণ হইয়াছে, গাল দিয়া সেই রক্তিমাআভা যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে, সমস্ত

মুখ টল্ টল্ করিতেছে, জগতে কঙ্কাবতীর রূপ তখন আর ধরে না।

মা, তাহা, দেখিয়া, তনু রায়কে বলিলেন,—"তোমার মেয়ের পানে একবার চাহিয়া দেখ! এ সোনার প্রতিমাকে তুমি জলাঞ্জলি দিও না। কঙ্কাবতী স্বয়ং লক্ষ্মী। এমন সুলক্ষণা মেয়ে জনমে কি কখনও দেখিয়াছ? মা যেরূপ লক্ষ্মী, সেইরূপ নারায়ণ দেখিয়া মা'র বিবাহ দিও। এবার আমার কথা শুনিও।

তনু রায় কঙ্কাবতীর পানে একটু চাহিয়া দেখিলেন, দেখিয়া চকিত হইলেন। তনু রায়ের মন কখনও এরূপ চকিত হয় নাই। তনু রায় ভাবিলেন,—"এ কি? একেই বুঝি লোকে অপত্যস্নেহ বলে?" —স্ত্রীর কথায় তনু রায় কোনও উত্তর করিলেন না।

আর একদিন তনু রায়ের স্ত্রী স্বামীকে বলিলেন,—"দেখ, কঙ্কাবতীর বিবাহের সময় উপস্থিত হইল। আমার একটি কথা তোমাকে রাখিতে হইবে। ভাল, মনুষ্যজীবনে তো আমার একটি সাধও পূর্ণ কর!" —তনু রায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি তোমার সাধ?"

স্ত্রী উত্তর করিলেন,—"আমার সাধ এই যে, ঝি-জামাই লইয়া আমোদ-আহ্লাদ করি। দুই মেয়ের তুমি বিবাহ দিলে, আমার সাধ পূর্ণ হইল না, দিবারাত্রি ঘোর দুঃখের কারণ হইল। যা হউক, সে যা হইবার তা হইয়াছে; এখন কঙ্কাবতীকে একটি ভাল বর দেখিয়া বিবাহ দাও। মেয়ে দুইটি বলে যে, "আমাদের কপালে যা ছিল, তা হইয়াছে, এখন ছোট বোনটিকে সুখী দেখিলে আমরা সুখী হই।

স্ত্রী বল, পুত্র বল, কন্যা বল, টাকার চেয়ে তনু রায়ের কেহই প্রিয় নয়। তথাপি কঙ্কাবতীর কথা মনে পড়িলে, তাঁহার মন কিরূপ করে। সে কি মমতা, না আতঙ্ক? দেবীরূপী কঙ্কাবতীকে সহসা বিসর্জ্জন দিতে তাঁহার সাহস হয় না। এদিকে দুরন্ত অর্থলোভও অজেয়। ত্রিভুবন-মোহিনী কন্যাকে বেচিয়া তিনি বিপুল অর্থ লাভ করিবেন, চিরকাল এই আশা করিয়া আছেন। আজ সে আশা কি করিয়া সমূলে কাটিয়া ফেলেন? তনু রায়ের মনে আজ দুই ভাব। এরূপ সঙ্কটে তিনি আর কখনও পড়েন নাই।

কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া তনু রায় বলিলেন,—"আচ্ছা! আমি না হয়, কঙ্কাবতীর বিবাহ দিয়া টাকা না লইলাম! কিন্তু ঘর হইতে টাকা তো আর দিতে পারিব না? আজ কা'ল যেরূপ বাজার পড়িয়াছে, টাকা না দিলে সুপাত্র মিলে না। তা আর কি করিব?"

স্ত্রী উত্তর করিলেন,—"আচ্ছা! আমি যদি বিনা টাকায় সুপাত্রে সন্ধান করিয়া দিতে পারি, তুমি তাহার সহিত কঙ্কাবতীর বিবাহ দিবে কি না, তা আমাকে বল?"

তনু রায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোথায়? কে?"

স্ত্রী বলিলেন,—"বৃদ্ধ হইলে চক্ষুর দোষ হয়, বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ হয়। চক্ষুর উপর দেখিয়াও দেখিতে পাও না?" —তনু রায় বলিলেন,—"কে বল না শুনি?"

স্ত্রী উত্তর করিলেন,—"কেন খেতু?"

তনু রায় বলিলেন,—"তা কি কখনও হয়? বিষয় নাই, বন্ধু নাই, বান্ধব নাই; এরূপ পাত্রে আমি কঙ্কাবতীকে কি করিয়া দিই। ভাল, আমি না হয় কিছু না লইলাম, মেয়েটি

যাহাতে সুখে থাকে, দুখানা গহনা-গাঁটি পরিতে পায়, তা তো আমাকে করিতে হইবে?"

তনু রায়ের স্ত্রী উত্তর করিলেন,—"খেতুর কি কখনও ভাল হইবে না? তুমি নিজেই বল না যে, 'খেতু ছেলেটি ভাল,খেতু দু'পয়সা আনিতে পারিবে?'যদি কপালে থাকে ত'খেতু হইতেই কঙ্কাবতী কত গহনা পরিবে। কিন্তু, গহনা হউক আর না হউক, ছেলেটি ভাল হয়, এই আমার মনের বাসনা। খেতুর মত ছেলে পৃথিবী খুঁজিয়া কোথায় পাইবে, বল দেখি? মা কঙ্কাবতী আমার যেমন লক্ষ্মী, খেতু তেমনি দুর্লভ সুপাত্র। এক বোঁটায় দুইটি ফুল সাধ করিয়া বিধাতা যেন গড়িয়াছেন।"

তনু রায় বলিলেন,—"ভাল, সে কথা তখন পরে বুঝা যাইবে। এখন তাড়াতাড়ি কিছু নাই।" —আরও কিছুদিন গত হইল। কলিকাতা হইতে খেতুর মা'র নিকট একখানি চিঠি আসিল। সেই চিঠিখানি তিনি তনু রায়কে দিয়া পড়াইলেন। পত্র-খানি রামহরি লিখিয়াছিলেন। তাহার মর্ম্ম এই—

"খেতুর বিবাহের জন্য অনেক লোক আমার নিকট আসিতেছেন। আমাকে তাঁহারা বড়ই ব্যস্ত করিয়াছেন। আমার ইচ্ছা যে, লেখাপড়া সমাপ্ত হইলে, তাহার পর খেতুর বিবাহ দিই। কিন্তু কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তিগণ সে কথা শুনিবেন কেন? তাঁহারা বলেন, কথা স্থির হইয়া থাকুক, বিবাহ না হয় পরে হইবে।' আমি অনেকগুলি কন্যা দেখিয়াছি। তাহাদিগের মধ্যে জন্মেজয় বাবুর কন্যা আমার মনোনীত হইয়াছে। কন্যাটি সুন্দরী, ধীর ও শান্ত। বংশ সৎ, কোন ও দোষ নাই। মাতা-পিতা, ভাই-ভগিনী বর্ত্তমান। কন্যার পিতা সঙ্গতিপন্ন লোক। কন্যাকে নানা অলঙ্কারও জামাতাকে নানা ধন দিয়া বিবাহকার্য্য সমাধা করিবেন। এক্ষণে আপনার কি মত জানিতে পারিলে কন্যার পিতাকে আমি সঠিক কথা দিব।"

পত্রখানি পড়িয়া তনু রায় অবাক্। দুঃখী বলিয়া যে খেতুকে তিনি কন্যা দিতে অস্বীকার, আজ নানা ধন দিয়া সেই খেতুকে জামাতা করিবার নিমিত্ত লোকে আরাধনা করিতেছে।

খেতুর মা রামহরিকে উত্তর লিখিলেন,—"আমি স্ত্রীলোক, আমাকে আবার জিজ্ঞাসা কর কেন? তুমি যাহা করিবে, তাহাই হইবে। তবে আমার মনে একটি বাসনা ছিল, যখন দেখিতেছি, সে বাসনা পূর্ণ হইবার নহে, তখন সে কথায় আর আবশ্যক নাই।"

এই পত্র পাইয়া, রামহরি খেতুকে সকল কথা বলিলেন, আর এ বিষয়ে খেতুর কি মত, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন।

খেতু বলিলেন,—"দাদা মহাশয়! মা'র মনে বাসনা কি, আমি বুঝিয়াছি। যতদিন মা'র সাধ পূর্ণ হইবার কিছুমাত্রও আশা থাকিবে, ততদিন কোনও স্থানে আপনি কথা দিবেননা।"

রামহরি বলিলেন,"হ্যাঁ, তাহাই উচিত। তোমার বিবাহ বিষয়ে আমি এক্ষণে কোনও স্থানে কথা দিব না।" —খেতুর অন্য স্থানে বিবাহ হইবে, এই কথা শুনিয়া, কঙ্কাবতীর মা একেবারে শরীর ঢালিয়া দিলেন। স্বামীর নিকট রাত্রি-দিন কান্না-কাটি করিতে লাগিলেন।

এদিকে তনু রায়ও কিছু চিন্তিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, "আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। দুইটি বিধবা গলায়, পুত্রটি মূর্খ। এখন একটি অভিভাবকের প্রয়োজন। খেতু যেরূপ বিদ্যাশিক্ষা

করিতেছে, খেতু যেরূপ সুবোধ, তাহাতে পরে তাহার নিশ্চয় ভাল হইবে। আমাকে সে একেবারে এখন কিছু না দিতে পারে, না পারুক; পরে, মাসে মাসে আমি তাহার নিকট হইতে কিছু কিছু লইব।"

এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া তনু রায় স্ত্রীকে বলিলেন,—"তুমি যদি খেতুর সহিত কঙ্কাবতীর বিবাহ স্থির করিতে পার তাহাতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু আমি খরচ পত্র কিছু করিতে পারিব না।"—খেতুর মা বলিলেন,—"কঙ্কাবতী আমার বৌ হইবে, চিরকাল আমার এই সাধ। কিন্তু বোন! দুই দিন আগে যদি বলিতে, অন্য স্থানে কথা স্থির করিতে আমি রামহরিকে চিঠি লিখিয়াছি। রামহরি যদি কোন স্থানে কথা দিয়া থাকে, তাহা হইলে সে কথা নড়িবার নয়। তাই আমার মনে বড় ভয় হইতেছে।"

তনু রায়ের স্ত্রী বলিলেন,—"দিদি! যখন তোমার মত আছে, তখন নিশ্চয় কঙ্কাবতীর সহিত খেতুর বিবাহ হইবে। তুমি একখানি চিঠি লিখিয়া রাখ। চিঠিখানি লোক দিয়া পাঠাইয়া দিব।" —তাহার পরদিন খেতুর মা ও কঙ্কাবতীর মা দুই জনে মিলিয়া কলিকাতায় লোক পাঠাইলেন। খেতুর মা রামহরিকে একখানি পত্র লিখিলেন।

খেতুর মা লিখিলেন যে,—"কঙ্কাবতীর সহিত খেতুর বিবাহ হয়, এই আমার মনের বাসনা। এক্ষণে তনু রায় ও তাঁহার স্ত্রী, সেই জন্য আমার নিকট আসিয়াছেন। অন্য কোনও স্থানে যদি খেতুর বিবাহের কথা স্থির না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমরা কঙ্কাবতীর সহিত স্থির করিয়া তনু রায়কে পত্র লিখিবে।"

এই চিঠি পাইয়া রামহরি, তাঁহার স্ত্রী ও খেতু, সকলেই আনন্দিত হইলেন।

খেতুর হাতে পত্রখানি দিয়া রামহরি বলিলেন,—"তোমার মা'র আজ্ঞা, ইহার উপর আর কথা নাই।"

খেতু বলিলেন—"মা'র যেরূপ অনুমতি, সেইরূপ হইবে। তবে তাড়াতাড়ি কিছুই নাই। তনু কাকা তো মেয়েগুলিকে বড় করিয়া বিবাহ দেন। আর দুই তিন বৎসর তিনি অনায়াসেই রাখিতে পারিবেন। তত দিনে আমার সব পাসগুলিও হইয়া যাইবে। —তত দিনে আমিও দু'পয়সা আনিতেও শিখিব। আপনি এই মর্ম্মে তনু কাকাকে পত্র লিখুন।"

রামহরি তনু রায়কে সেইরূপ পত্র লিখিবেন। তনু রায় সে কথা স্বীকার করিলেন। বিলম্ব হইল বলিয়া তাঁহার কিছুমাত্র দুঃখ হইল না, বরং তিনি আহ্লাদিত হইলেন।

তিনি মনে করিলেন,—"স্ত্রীর কান্নাকাটিতে আপাততঃ এ কথা স্বীকার করিলাম। দেখি না, খেতুর চেয়ে ভাল পাত্র পাই কি না? যদি পাই—আচ্ছা, সে কথা তখন পরে বুঝা যাইবে।" —খেতুর মা, নিরঞ্জনকে সকল কথা বলিয়াছিলেন। নিরঞ্জন মনে করিলেন,—"বৃদ্ধ হইয়া তনু রায়ের ধর্ম্মে মতি হইতেছে।"

কঙ্কাবতী আজ কয়দিন বিরস-বদনে ছিলেন। সকলে আজ কঙ্কাবতীর হাসি-হাসি মুখ দেখিল। সেই দিন তিনি মেনীকে কোলে লইয়া বিরলে বসিয়া কত যে তাহাকে মনের কথা বলিলেন, তাহা আর কি বলিব! মেনী এখন আর শিশু নহে, বড় একটি বিড়াল। সুতরাং

কঙ্কাবতী যে তাহাকে মনের কথা বলিবেন, তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ – ষাঁড়েশ্বর

একবার পূজার ছুটীর কিছু পূর্ব্বে, কলিকাতার পথে, খেতুর সহিত ষাঁড়েশ্বরের সাক্ষাৎ হইল। ষাঁড়েশ্বর বলিলেন,—"খেতু বাড়ী যাইবে কবে? আমি গাড়ী ঠিক করিয়াছি, যদি ইচ্ছা কর তো আমার গাড়ীতে তুমি যাইতে পার।'

খেতু উত্তর করিলেন,—"আমার এখনও কলেজের ছুটি হয় নাই। কবে যাইব, তাহার এখনও ঠিক নাই।" –ষাঁড়েশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"খেতু! তোমার হাতেও কি?"

খেতু উত্তর করিলেন,—"এ একটি সিংহাসন। মা প্রতিদিন মাটীর শিব গড়িয়া পূজা করেন, তাই মা'র জন্য একটি পাথরের শিব কিনিয়াছি। সেই শিবের জন্য এই সিংহাসন।"

ষাঁড়েশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"শিবটি তোমার কাছে আছে? কৈ দেখি?"

খেতু শিবটি পকেট হইতে বাহির করিয়া ষাড়েশ্বরের হাতে দিলেন।

ষাঁড়েশ্বর বলিলেন,"শিবটি পকেটে রাখিয়াছিলে? খুব ভক্তি তো তোমার?"

খেতু উত্তর করিলেন,—"শিবের তো এখনও পূজা হয় নাই। তাতে আর দোষ কি?"

ষাঁড়েশ্বর বলিলেন,—"তাই বলিতেছি!"

এই কথা বলিয়া যাঁড়েশ্বর শিবটি পুনরায় খেতুর হাতে দিলেন।

এ-কথা সে-কথায় যাইতে যাইতে ষাঁড়েশ্বর বলিলেন, "এই যে পাদ্‌রি সাহেবের বাড়ী! পাদ্‌রি সাহেবের সঙ্গে তোমার তো আলাপ আছে! এস না? একবার দেখা করিয়া যাই!"

ষাঁড়েশ্বর ও খেতু, দুই জনে পাদ্‌রি সাহেবের নিকট যাইলেন।

পাদ্‌রি সাহেবের সহিত নানারূপ কথাবার্ত্তার পর, ষাঁড়েশ্বর বলিলেন,—"আর শুনিয়াছেন, মহাশয়? মা পূজা করিবেন বলিয়া খেতু একটি পাথরের শিব কিনিয়াছেন। সেই শিবটি খেতুর পকেটে রহিয়াছে।"

পাদ্‌রি সাহেব বলিলেন,—অ্যাঁ! সে কি কথা! ছি ছি, খেতু! তুমি এমন কাজ করিবে, তা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না। তোমাদের জন্য যে আমরা এত স্কুল করিলাম, সে সব বৃথা হইল। বড় এক জন লেখক লিখিয়াছেন যে, এই বাঙ্গালীজাতি মিথ্যাবাদী, ফেরেবী, জালিয়াত, ভীরু, দাসের জাতি।"

খেতু বলিলেন,—"আহা! কি মধুর ধর্ম্মের কথা আজ শুনিলাম! সর্ব্বশরীর শীতল হইয়া গেল। ইচ্ছা করে, এখনি খৃষ্ঠান হই। যদি ঘরে জল থাকে তো নিয়ে আসুন, আর বিলম্ব করেন কেন? আমার মাথায় দিন, দিয়া আমাকে খৃষ্ঠান করুন। বাঙ্গালীদের উপর চারি দিক্‌ হইতে যেরূপ আপনারা সকলে মিলিয়া সুধা বর্ষণ করিতেছেন, তাতে বাঙ্গালীদের মন খৃষ্টীয় ধর্ম্মামৃতরসে একেবারে ভিজিয়া গিয়াছে। দেখেন কি আর? এই সব পট পট করিয়া খৃষ্ঠান হয় আর কি? আবার আমেরিকার কালা খৃষ্ঠানদিগের উপর আপনাদের যেরূপ ভ্রাতৃভাব, তা যখন লোকে শুনিবে, আর আফ্রিকার নিরস্ত্র কালা-আদমিদিগের প্রতি আপনাদের যেরূপ দয়া- মায়া, তা যখন লোকে জানিবে, তখন এ দেশের জনপ্রাণীও আর

বাকি থাকিবে না, সব খৃষ্টান হইয়া যাইবে। এখন সেলাম।”

এই কথা বলিয়া খেতু সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। ষাঁড়েশ্বরও হাসিতে হাসিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিলেন। —পথে খেতু ষাঁড়েশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“শুনিতে পাই, আপনি প্রতিদিন হরিসঙ্কীর্ত্তন করেন। তবে পাদ্‌রি সাহেবের নিকট আমাকে ওরূপ উপহাস করিলেন কেন?”

—ষাঁড়েশ্বর বলিলেন,—উপহাস আর তোমাকে কি করিলাম? সে যাহা হউক, সন্ধ্যা হইয়াছে, হরি-সঙ্কীর্ত্তনের সময় হইল। এস না, একটু দেখিবে? দেখিলেও পুণ্য আছে।”

ষাঁড়েশ্বরের বাসা নিকটে ছিল। খেতু ও ষাঁড়েশ্বর দুই জনে সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। খেতু দেখিলেন যে, ষাঁড়েশ্বরের দালানে হরি-সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু ষাঁড়েশ্বর সেখানে না যাইয়া, বরাবর উপরের বৈঠক-খানায় যাইলেন। খেতুকে সেইখানে বসিতে বলিয়া ষাঁড়েশ্বর বাটীর ভিতর গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে ষাঁড়েশ্বর ফিরিয়া আসিলেন ও খেতুকে বলিলেন,—“খেতু! চল, অন্য ঘরে যাই।” —খেতু অন্য ঘরে গিয়া দেখিলেন যে, ষাঁড়েশ্বরের আর দুইটি বন্ধু সেখানে বসিয়া আছেন। সেখানে খানা খাইবার সব আয়োজন হইতেছে।

নীচে হরি সঙ্কীর্ত্তন চলিতেছে। ষাঁড়েশ্বর হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুসমাজের এক জন চাঁই।

অল্পক্ষণ পরে খানা খাওয়া আরম্ভ হইল। দুই জন মুসলমান পরিবেশন করিতে লাগিল।

খেতু বলিলেন,—“আপনারা তবে আহারাদি করুন, আমি এখন যাই।”

ষাঁড়েশ্বর বলিলেন,—“না না, একটু থাক না, দেখ না, দেখিলেও পুণ্য আছে। এখন যা আমরা খাইতেছি, ইহা মাংসের ঝোল, ইহার নাম সুপ্; একটু সুপ্ খাইবে?”

খেতু বলিলেন,—“এ সব দ্রব্য আমি কখনও খাই নাই, আমার প্রবৃত্তি হয় না। আপনারা আহার করুন?” —আবার কিছুক্ষণ পরে ষাঁড়েশ্বর বলিলেন,—“খেতু! এখন যা খাইতেছি, ইহা ভেটকি মাছ। মাছ খাইতে দোষ কি? একটু খাও না?”

খেতু বলিলেন,—“মহাশয়! আমাকে অনুরোধ করিবেন না। আপনারা আহার করুন। আমি বসিয়া থাকি।” —ষাঁড়েশ্বর বলিলেন,—“তবে না হয়, এই একটু খাও। ইহা অতি উত্তম ব্র্যাণ্ডি। পাদ্‌রি সাহেবের কথায় মনে তোমার ক্লেশ হইয়া থাকিবে, একটু খাইলেই এখনি সব ভাল হইয়া যাইবে।” —খেতু বলিলেন,—“মহাশয়! যোড়হাত করিয়া বলি, আমাকে অনুরোধ করিবেন না। অনুমতি করুন, আমি বাড়ী যাই।”

ষাঁড়েশ্বরের একটি বন্ধু বলিলেন,—“তবে না হয় একটু হ্যাম আর মুরগী খাও। এ হ্যাম—বিলাতি শুকরের মাংস। ইহা বিলাত হইতে আসিয়াছে। অভক্ষ্য, গ্রাম্য শুকর। বিলাতী শুকর খাইতে কোনও দোষ নাই। আর এ মুরগীও মহা-কুক্কুট, রামপাখী-বিশেষ। হগ্ সাহেবের বাজার হইতে কেনা, যে সে মুরগী নয়।”

ষাঁড়েশ্বরের অপর বন্ধু বলিলেন,—“এইবার ভি-র কটলেট আসিয়াছেন। খেতু বাবু নিশ্চয় এইবার একটু খাইবেন।”

খানসামা এবার কি দ্রব্য আনিয়াছিল, সে কথা আর শুনিয়া কাজ নাই। নীচে হরিসঙ্কীর্ত্তনের ধূম। তাহাই শ্রবণ করিয়া সকলে প্রাণ পরিতৃপ্ত করুন।

কিয়ৎক্ষণ পরে দুই বন্ধুতে চুপি চুপি কি পরামর্শ করিলেন। তখন এক বন্ধু উঠিয়া গিয়া খেতুকে ধরিলেন, অপর জন খেতুর মুখে ব্রাণ্ডি ঢালিয়া দিতে চেষ্টা করিলেন। ষাঁড়েশ্বর বসিয়া বসিয়া হাসিতে লাগিলেন। —খেতুর শরীরে বিলক্ষণ বল ছিল। এক এক ধাক্কায় দুই জনকেই ভূতলশালী করিলেন। তাহার পর মেজটি উলটাইয়া ফেলিলেন। কাচের বাসন, কাচের গেলাস, সম্মুখে যাহা কিছু পাইলেন, আছাড় মারিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। এইরূপ দক্ষযজ্ঞ করিয়া সেখান হইতে খেতু প্রস্থান করিলেন।

দেখিতে দেখিতে তিন বৎসর কাটিয়া গেল। খেতুর এক্ষণে কুড়ি বৎসর বয়স। যা কিছু পাশ ছিল, খেতু সব পাশগুলি দিলেন। বাহিরেরও দুই একটি পাশ দিলেন। শীঘ্র একটি উচ্চপদ পাইবেন, খেতু এরূপ আশা পাইলেন।

রামহরি ও রামহরির স্ত্রী ভাবিলেন যে, এক্ষণে খেতুর বিবাহ দিতে হইবে। দিন স্থির করিবার নিমিত্ত তাঁহারা খেতুর মাকে পত্র লিখিলেন।

পত্রের প্রত্যুত্তরে খেতুর মা অন্যান্য কথা বলিয়া অবশেষে লিখিলেন,—"তনু রায়কে বিবাহের কথা কিছু বলিতে পারি নাই। আজকাল সে বড়ই ব্যস্ত, তাহার দেখা পাওয়া ভার। জনার্দ্দন চৌধুরীর স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছে। জনার্দ্দন চৌধুরীর স্ত্রীর ধন্য কপাল। পুত্র পৌত্র দৌহিত্র চারিদিকে জাজ্বল্যমান রাখিয়া, অশীতিপর স্বামীর কোলে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ইহার চেয়ে স্ত্রীলোকের পুণ্যবল আর কি হইতে পারে? যখন তাঁহাকে ঘাটে লইয়া যায়, তখন আমি দেখিতে গিয়াছিলাম। সকলে এক মাথা সিন্দুর দিয়া দিয়াছে, আর ভাল একখানি কস্তাপেড়ে কাপড় পরাইয়া দিয়াছে! আহা! তখন কি শোভা হইয়াছিল! যাহা হউক, তনু রায়ের একটু অবসর হইলে, আমি তাহাকে বিবাহের কথা বলিব।"—কিছু দিন পরে খেতুর মা, রামহরিকে আর একখানি পত্র লিখিলেন। তাহার মর্ম্ম এই,—

"বড় ভয়ানক কথা শুনিতেছি। তনু রায়ের কথার ঠিক নাই। তাহার দয়া-মায়া নাই, তাহার ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নাই। শুনিতেছি, সে নাকি জনার্দ্দন চৌধুরীর সহিত কঙ্কাবতীর বিবাহ দিবে। কি ভয়ানক কথা! আর জনার্দ্দন চৌধুরীও পাগল হইয়াছেন না কি? পুত্র পৌত্র দৌহিত্র চারিদিকে বর্ত্তমান। বয়সের গাছ পাথর নাই। চলিতে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপে। ঘাটের মড়া! আর আবার এ কুবুদ্ধি কেন? বিষয় থাকিলে, টাকা থাকিলে, এরূপ করিতে হয় না কি? তিনি বড় মানুষ জমীদার, না হয় রাজা! তা বলিয়া কি একেবারে বিবেচনাশূন্য হইতে হয়? বৃদ্ধ মনে ভাবে না যে, মৃত্যু সন্নিকট? যেরূপ তাহার অবস্থা, তাহাতে আর কয় দিন? লাঠি না ধরিয়া একটি পা চলিতে পারে না। কি ভয়ানক কথা! আর তনু রায় কি নিকম্মা! দুধের বাছা কঙ্কাবতীকে কি করিয়া এই অশীতিপর বৃদ্ধের হাতে সমর্পণ করিবে? কঙ্কাবতীর কপালে কি শেষে এই ছিল? সেই মধুমাখা মুখখানি মনে করিলে, বুক ফাটিয়া যায়। শুনিতে পাই, কঙ্কাবতীর মা না কি রাত্রি দিন কাঁদিতেছেন। আমি ডাকিতে

পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু আসেন নাই। বলিয়া পাঠাইলেন যে, দিদির কাছে আর মুখ দেখাইব না, এ কালা মুখ লোকের কাছে আর বাহির করিব না। এই বিবাহের কথা শুনিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। আহা! তাঁহার মা'র প্রাণ! কতই না তিনি কাতর হইয়া থাকিবেন?"

এই চিঠিখানি পাইয়া রামহরি খেতুকে দেখাইলেন।

খেতু বলিলেন,—"দাদা মহাশয়! আমি এইক্ষণে দেশে যাইব।" —রামহরি বলিলেন,— "জনার্দ্দন চৌধুরী বড়লোক, তুমি সহায়হীন বালক তুমি দেশে গিয়া কি করিবে?"

খেতু বলিলেন,—"আমি কিছু করিতে পারিব না সত্য, তথাপি নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়। কঙ্কাবতীকে এ বিপদ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করাও কর্ত্তব্য।

কৃতকার্য্য না হই, কি করিব?"

খেতু দেশে আসিলেন। মা'র নিকট ও পাড়া প্রতিবেশীর নিকট সকল কথা শুনিলেন। শুনিলেন যে, জনার্দ্দন চৌধুরী প্রথমে কিছুতেই বিবাহ করিতে সম্মত হন নাই। কেবল তাঁহার সভাপণ্ডিত গোবর্দ্ধন শিরোমণি তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া সম্মত করাইয়াছেন।

বৃদ্ধ হইলে কি হয়? জনার্দ্দন চৌধুরীর শ্রীচাঁদ আছে, প্রাণে সখও আছে। দুর্লভ পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষের মাল্য দ্বারা গলদেশ তাঁহার সর্ব্বদাই সুশোভিত থাকে। কফের ধাত বলিয়া শৈত্য নিবারণের জন্য চূড়াদার টুপি মস্তকে দিন-রাত্রি বিরাজ করে এইরূপ বেশ ভূষায় সুসজ্জিত হইয়া নিভৃতে বসিয়া যখন তিনি গোবর্দ্ধন শিরোমণির সহিত বিবাহ-বিষয়ে পরামর্শ করেন, তখন তাঁহার রূপ দেখিয়া ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণকেও লজ্জায় অধোমুখ হইতে হয়।

খেতু শুনিলেন যে, জনার্দ্দন চৌধুরী বিবাহ করিবার জন্য এখন একেবারে পাগল হইয়া উঠিয়াছেন। আর বিলম্ব সহে না। এই বৈশাখ মাসের ২৪শে তারিখে বিবাহ হইবে। জনার্দ্দন চৌধুরী এক্ষণে দিন গণিতেছেন। তাঁহার পুত্র-কন্যা সকলের ইচ্ছা, যাহাতে এ বিবাহ না হয়। কিন্তু কেহ কিছু বলিতে সাহস করেন না। তাঁহার বড় কন্যা এক দিন মুখ ফুটিয়া মানা করিয়াছিলেন। সেই অবধি বড় কন্যার সহিত তাঁহার আর কথা-বার্ত্তা নাই।

জনার্দ্দন চৌধুরীকে কন্যা দিতে তনু রায়ও প্রথমে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন জনার্দ্দন চৌধুরী বলিলেন যে,—"আমার নব-বিবাহিতা স্ত্রীকে আমি দশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ দিব, একখানি তালুক দিব, স্ত্রীর গা সোনা দিয়া মুড়িব, আর কন্যার পিতাকে দুই হাজার টাকা নগদ দিব।" তখন তনু রায় আর লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না। --কঙ্কাবতীর মুখপানে চাহিয়া তবুও তনু রায় ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র টাকার কথা শুনিয়া, একেবারে উন্মত্ত হইয়া পড়িলেন। বকিয়া বকিয়া পিতাকে তিনি সম্মত করিলেন। টাকার লোভে এক্ষণে পিতাপুত্র দুই জনেই উন্মত্ত হইয়াছেন।

তবুও তনু রায় স্ত্রীর নিকট নিজে এ কথা বলিতে সাহস করেন নাই। তাঁহার পুত্র বলিলেন,—"তোমাকে বলিতে হইব না, আমি গিয়া মাকে বলিতেছি।"

এই কথা বলিয়া পুত্র মা'র নিকট যাইলেন। মাকে বলিলেন,—'মা। জনার্দ্দন চৌধুরীর সহিত কঙ্কাবতীর বিবাহ হইবে। বাবা সব স্থির করিয়া আসিয়াছেন।

মা'র মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। মা বলিলেন,— সে কি রে? ওরে, সে কি কথা! ওরে, জনার্দ্দন চৌধুরী যে তেকেলে বুড়ো! তার সে বয়সের গাছ পাথর নাই! তার সঙ্গে কঙ্কাবতীর বিবাহ হবে কি রে?"

পুত্র উত্তর করিলেন,...... বুড়ো নয় তো কি যুবো? না সে খোকা? জনার্দ্দন চৌধুরী তুলো করিয়া দুধ খায় না কি? না ঝুম্‌ঝুমি নিয়ে খেলা করে? মা যেন ঠিক পাগল! মা'র বুদ্ধি সুদ্ধি একেবারে নাই। কঙ্কাবতীকে দশ হাজার টাকা দিবে, গায়ে যেখানে যা ধরে গহনা দিবে, তালুক মুলুক দিবে, বাবাকে দুই হাজার টাকা নগদ দিবে, আবার চাই কি? বুড়ো মরিয়া যাইলে, কঙ্কাবতীর টাকা গহনা সব আমাদের হইবে। থুড় থুঁড়ে বুড়ো বলিয়াই তো আহ্লাদের কথা। শক্তি সামর্থ্য থাকিলে এখন কত দিন বাঁচিত, তার ঠিক কি? মা! তোমার কিছুমাত্র বিবেচনা নাই।"

এ কথার উপর আর কথা নাই! মা একেবারে বসিয়া পড়িলেন। অবিরল ধারায় তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। মনে করিলেন, যে,.......পৃথিবী! তুমি দুই ফাঁক হও, তোমার ভিতর আমি প্রবেশ করি।" মেয়ে দুইটিও অনেক কাঁদিলেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। কঙ্কাবতী নীরব। প্রাণ যাহার ধূ ধূ করিযা পুড়িতেছে, চক্ষে তাহার জল কোথা হইতে আসিবে?

মা ও প্রতিবেশীদিগের নিকট হইতে খেতু এই সকল কথা শুনিলেন।

খেতু প্রথম তনু রায়ের নিকট যাইলেন। তনু রায়কে অনেক বুঝাইলেন। খেতু বলিলেন,.... 'মহাশয়! এরূপ অশীতিপর বৃদ্ধের সহিত কঙ্কাবতীর বিবাহ দিবেন না। আমার সহিত বিবাহ না হয় না দিবেন, কিন্তু একটি সুপাত্রের হাতে দিন। মহাশয় যদি সুপাত্রের অনুসন্ধান করিতে না পারেন, আমি করিয়া দিব।'

এই কথা শুনিয়া তনু রায় ও তনু রায়ের পুত্র, খেতুর উপর অতিশয় রাগান্বিত হইলেন। নানারূপ ভর্ৎসনা করিয়া তাঁহাকে বাটী হইতে তাড়াইয়া দিলেন।

নিরঞ্জনকে সঙ্গে করিয়া খেতু তাহার পর জনার্দ্দন চৌধুরীব নিকট গমন করিলেন। হাত যোড় করিয়া অতি বিনীতভাবে জনার্দ্দন চৌধুরীকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিলেন। প্রথমতঃ জনার্দ্দন চৌধুরী সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। তাহার পর খেতু যখন তাঁহাকে দুই একবার বৃদ্ধ বলিলেন তখন রাগে তাঁহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। তাঁহার শ্লেষ্মার ধাত, রাগে এমনি তাঁহার ভয়ানক কাসি আসিয়া উপস্থিত হইল যে, সকলে বোধ করিল দম আট্‌কাইয়া তিনি না মরিয়া যান!

কাসিতে কাসিতে তিনি বলিলেন,—"গলাধাক্কা দিয়া এ ছোঁড়াকে আমার বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দাও।" —অনুমতি পাইয়া পারিষদগণ খেতুর গলাধাক্কা দিতে আসিল।

খেতু জনার্দ্দন চৌধুরীর লাঠিগাছটি তুলিয়া লইলেন। পারিষদবর্গকে তিনি ধীরভাবে বলিলেন,—"তোমরা কেহ আমার গায়ে হাত দিও না। যদি আমার গায়ে হাত দাও, তাহা হইলে এই দণ্ডে তোমাদের মুণ্ডপাত করিব।"

খেতুর তখন সেই রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া, ভয়ে সকলেই আকুল হইল। গলাধাক্কা দিতে আর কেহ অগ্রসর হইল না।

নিরঞ্জন উঠিয়া, উভয় পক্ষকে সান্ত্বনা করিয়া খেতুকে সেখান হইতে বিদায় করিলেন। খেতু চলিয়া গেলেন। তবুও জনার্দ্দন চৌধুরীর রাগও থামে না, কাসিও থামে না। রাগে থর থর করিয়া শরীর কাঁপিতে লাগিল, খক্ খক্ করিয়া ঘন ঘন কাশি আসিতে লাগিল।

গোবর্দ্ধন শিরোমণি বলিলেন,—"না না! আপনি বৃদ্ধ কেন হইবেন? আপনাকে যে বুড়ো বলে, সে নিজে বুড়ো।"

ষাঁড়েশ্বর সেখানে উপস্থিত ছিলেন। যাড়েশ্বর বলিলেন,—"হয় তো ছোকরা মদ খাইয়া আসিয়াছিল! চক্ষু দুইটা যেন জবা ফুলের মত, দেখিতে পান নাই?"

নিরঞ্জন বলিলেন,—"ও কথা বলিও না! যারা মদ খায়, তারা খায়। কে মদ মুরগী খায়, তা সকলেই জানে। পরের নামে মিথ্যা অপবাদ দিও না।"

ষাঁড়েশ্বর উত্তর করিলেন,—"সকলে শুনিয়া থাকুন, ইনি বলিলেন,—'যে, আমি মদ-মুরগী খাই আমি ই'হার নামে মানহানির মকদ্দমা করিব। এ'র হাড় কয়খানা জেলে পচাইব।" --গোবদ্ধন শিরোমণি বলিলেন,—"ক্ষেত্রচন্দ্র মদ খান, কি না খান, তাহা আমি জানি না। তবে তিনি যে যবনের জল খান, তাহা জানি। সেই যারে বলে 'বরখ', সাহেবেরা কলে যাহা প্রস্তুত করেন, ক্ষেত্রচন্দ্র সেই বরখ খান। গদাধর ঘোষ ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াছে।"

জনার্দ্দন চৌধুরী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি কি? কি বলিলে?"

ষাঁড়েশ্বর বলিলেন,—"সর্বনাশ! বরফ খায়? গোরক্ত দিয়া সাহেবেরা যাহা প্রস্তুত করেন? এবার দেখিতেছি, সকলের ধর্ম্মটি একেবারে লোপ হইল। হায় হায়! পৃথিবীতে হিন্দুধর্ম্ম একোবারে লোপ হইল।"

নিরঞ্জন বলিলেন,—ষাঁড়েশ্বর বাবু! একবার মনে করিয়া দেখ, খেতুর বাপ তোমার কত উপকার করিয়াছেন। খেতুর অপকার করিতে চেষ্টা করিও না।"

জনার্দ্দন চৌধুরী বলিলেন,—"ও সব বাজে কথা এখন তোমরা রাখ। গদাধর ঘোষকে ডাকিতে পাঠাও।" গদাধর ঘোযকে ডাকিতে লোক দৌড়িল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ – গদাধর-সংবাদ

গদাধর ঘোষ আসিয়া উপস্থিত হইল। চৌধুরী মহাশয়কে কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কার করিয়া অতি দূরে সে মাটীতে বসিল।

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—"কেমন হে গদাধর। এ কি কথা শুনিতে পাই? শিবচন্দ্রের ছেলেটা, ঐ খেতা, কি খাইয়াছিল? তুমি কি দেখিয়াছিলে? কি শুনিয়াছিলে? তাহার সহিত তোমার কি কথাবার্ত্তা হইয়াছিল? সমুদয় বল, কোনও বিষয় গোপন করিও না।"

গদাধর বলিল,—"মহাশয়! আমি মুর্খ মানুষ অত শত জানি না। যাহা হইয়াছিল, তাহা আমি বলিতেছি।"

গদাধর বলিল,—"তার বৎসর আমি কলিকাতার গিয়াছিলাম। কোথায় থাকি? তাই

রামহরির বাসায় গিয়াছিলাম। সন্ধ্যাবেলা বাহিরের ঘরে বসিয়া আছি, এমন সময় এক মিনষে হাঁড়ী মাথায় করিয়া পথ দিয়া কি শব্দ করিতে করিতে যাইতেছিল। সেই শব্দ শুনিয়া রামহরি বাবুর ছেলেটি বাটীর ভিতর হইতে ছুটিয়া আসিল, আর খেতুকে বলিল,—'কাকা, কাকা! কুলফী যাইতেছে, আমাকে কিনিয়া দাও। খেতু তাহাকে দুই পয়সার কিনিয়া দিলেন। আমি বলিলাম, 'না দাদাঠাকুর! আমি কুলফী খাই না।' রামহরি বাবুর ছেলে খেতুকে বলিল'—'কাকা! তুমি খাইবে না?' খেতু বলিলেন,—'না, আমার পিপাসা পাইয়াছে, ইহাতে পিপাসা ভাঙ্গে না, আমি কাঁচা বরফ খাইব।' এই কথা বলিয়া খেতু বাহিরে যাইলেন। কিছুক্ষণ পরে একটি সাদা ধব্‌ধবে কাঁচের মত ঢিল গামছায় বাঁধিয়া বাটী আনিলেন। সেই ঢিলটি ভাঙ্গিয়া জলে দিলেন, সেই জল খাইতে লাগিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'দাদা ঠাকুর! ও কি?' খেতু বলিলেন,—'ইহার নাম বরখ। এই গ্রীষ্মকালের দিনে যখন বড় পিপাসা হয়, তখন ইহা জলে দিলে জল শীতল হয়।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'দাদাঠাকুর। সকল কাচ কি জলে দিলে জল শীতল হয়?' খেতু উত্তর করিলেন,—'এ কাচ নয়, এ বরখ। জল জমিয়া ইহা প্রস্তুত হয়। ইহা জল। নদীতে যে জল দেখিতে পাও, ইহাও তাই, জমিয়া গিয়াছে এইমাত্র। আকাশ হইতে যে শিল পড়ে, বরখ তাহাই। সাহেবেরা বরখ কলে প্রস্তুত করেন। একটু হাতে করিয়া দেখ দেখি?' এই বলিয়া আমার হাতে একটুখানি দিলেন। হাতে রাখিতে না রাখিতে আমার হাত যেন করাত দিয়া কাটিতে লাগিল। আমি হাতে রাখিতে পারিলাম না, আমি ফেলিয়া দিলাম। তাহার পর খেতু বলিলেন,—'গদাধর! একটু খাইয়া দেখ না? ইহাতে কোনও দোষ নাই।' আমি বলিলাম,—'না দাদাঠাকুর! তোমরা ইংরেজি পড়িয়াছ, তোমাদের সব খাইতে আছে, তাহাতে কোনও দোষ হয় না। আমি ইংরেজী পড়ি নাই। সাহেবেরা যে দ্রব্য কলে প্রস্তুত করেন, যে দ্রব্য খাইলে আমাদের অধর্ম্ম হয়, আমাদের জাতি যায়।'

চৌধুরী মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া গদাধর বলিল,—"ধর্ম্মবিতার! আমি যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহা আপনাকে বলিলাম। তার পর খেতু আমাকে অনেক সেকালের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, অনেক সেকালের কথা-বার্ত্তা হইল, সে বিষয় এখানে আর বলিবার আবশ্যক নাই।"

জনার্দ্দন চৌধুরী বলিলেন,—"না না, কি কথা হইয়াছিল, তুমি সমুদয় বল। কোনও কথা গোপন করিবে না।" —গোবর্দ্ধন শিরোমণিকে সম্বোধন করিয়া গদাধর বলিল,—"শিরোমণি মহাশয়। সেই গরদওয়ালা ব্রাহ্মণের কথা গো!"

শিরোমণি বলিলেন,—"সে বাজে কথা। সে কথা আর তোমাকে বলিতে হইবে না।"

জনার্দ্দন চৌধুরী বলিলেন,—"না না, খেতার সহিত তোমার কি কথা হইয়াছিল, আমি সকল কথা শুনিতে ইচ্ছা করি। গরদওয়ালা ব্রাহ্মণের কথা আমি অল্প-অল্প শুনিয়াছিলাম, গ্রামের সকলেই সে কথা জানে। তবে খেতা তোমাকে কি জিজ্ঞাসা করিল আর তুমি কি বলিলে, সে কথা আমি জানিতে ইচ্ছা করি।"

গদাধর বলিতেছে,—"তাহার পর খেতু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'গদাধর। আমাদের মাঠে সেকালে না কি মানুষ মারা হইত? আর তুমি না কি সেই কাজের এক জন সর্দ্দার ছিলে?" আমি উত্তর করিলাম,—"দাদাঠাকুর! উচক্কা বয়সে কোথায় কি করিয়াছি, কি না করিয়াছি, সে কথায় এখন আর কাজ কি? এখন তো আর সে সব নাই? এখন কোম্পানীর কড়া হুকুম।' খেতু বলিলেন,—'তা বটে; তবে সে কালের ঠেঙ্গাড়েদের কথা আমার শুনিতে ইচ্ছা হয়। তুমি নিজে হাতে এ সব করিয়াছ, তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। তোমরা দুই চারি জন যা বৃদ্ধ আছ, মরিয়া গেলে. আর এ সব কথা শুনিতে পাইব না। আর দেখ, গ্রামের সকলেই তো জানে যে, তুমি এ কাজের এক জন সর্দ্দার ছিলে!" আমি বলিলাম,—'না দাদাঠাকুর! আপনারা থাকিতে আমরা কি কোনও কাজের সর্দ্দার হইতে পারি? আপনারা ব্রাহ্মণ, আমাদের দেবতা! সকল কাজের সর্দ্দার আপনারা।' তাহার পর খেতু জিজ্ঞাসা করিলেন,— 'তবে তোমাদের দলের সর্দ্দার কে ছিলেন? আমি বলিলাম.....'আজ্ঞা! আমাদের দলের সর্দ্দার ছিলেন, কমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়। এক সঙ্গে কাজ করিতাম বলিয়া তাঁহাকে আমার কমল কমল বলিয়া ডাকিতাম। তিনি এক্ষণে মরিয়া গিয়াছেন।' খেতু তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন,—'গদাধর! তোমরা কখনও ব্রাহ্মণ মারিয়াছ?' আমি বলিলাম,—'আজ্ঞা, মাঠের মাঝখানে যারে পাইতাম, তাহাকেই মারিতাম। তাহাতে কোনও দোষ নাই। পরিচয় লইয়া মাথার লাঠি মারিতে গেলে আর কাজ চলে না। পথিকের কাছে কি আছে না আছে, সে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াও মারিতে গেলে চলে না। প্রথমে মারিয়া ফেলিতে হইত। তাহার পর গলায় পৈতা থাকিলে জানিতে পারিতাম যে, সে লোকটি ব্রাহ্মণ, না থাকিলে বুঝিতাম যে, সে শূদ্র। আর প্রাপ্তির বিষয় যে দিন যেরূপ অদৃষ্টে থাকিত, সেই দিন সেইরূপ হইত। কত হতভাগা পথিককে মারিয়া শেষে একটি পয়সাও পাই নাই। ট্যাঁকে, কাচায়, কোঁচায় খুঁজিয়া একটি পয়সাও বাহির হয় নাই। সে বেটারা জুয়াচোর, দুষ্ট, বজ্জাৎ! পথ চলিবে বাপু, টাকা-কড়ি সঙ্গে নিয়া চল। তা না শুধু হাতে! বেটাদের কি অন্যায় বলুন দেখি, দাদাঠাকুর? একটি মানুষ মারিতে কি কম পরিশ্রম হয়? খালি হাতে রাস্তা চলিয়া আমাদের সব পরিশ্রম বেটারা নষ্ট করিত।' খেতু আমাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হাঁ, গদাধর! মানুষের প্রাণ কি সহজে বাহির হয় না?' আমি বলিলাম,—সকলের প্রাণ সমান নয়। কেহ বা লাঠি খাইতে না খাইতে উদ্দেশে মরিয়া যায়। কেহ বা ঠাশ করিয়া এক ঘা খাইয়াই মরিয়া যায়। আর কাহাকেও বা তিন চারি জনে পড়িয়া পঞ্চাশ লাঠিতেও মারিতে পারা যায় না। একবার এক জন ব্রাহ্মণকে মারিতে কষ্ট হইয়াছিল।' খেতু জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কি হইয়াছিল?' গোবর্দ্ধন বলিলেন,—"চৌধুরী মহাশয়! আপনার আর ও সব পাপ কথা শুনিয়া কাজ নাই। এক্ষণে ক্ষেত্রচন্দ্রকে লইয়া কি করা যায়, আসুন, তাহার বিচার করি! সাহেবের জল পান করিয়া অবশ্যই তিনি সাহেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।"

জনার্দ্দন চৌধুরী বলিলেন,—"না না! খেতার সহিত গদাধরের কি কি কথা হইয়াছিল,

আমি সমস্ত শুনিতে চাই। ছোঁড়া যে গদাধরকে এত কথা জিজ্ঞাসা করিল, তাহার অবশ্যই কোনও না কোনও দুরভিসন্ধি থাকিবে। গদাধর! তাহার পর কি হইল, বল।”

গদাধর পুনরায় বলিতেছে,—“খেতু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে, ব্রাহ্মণ মারিতে কষ্ট হইয়াছিল কেন?' আমি বলিলাম,—'দাদাঠাকুর, কোথা হইতে একবার তিন জন ব্রাহ্মণ আমাদের গ্রামে গরদের কাপড় বেচিতে আসেন। গ্রামে তাঁহারা থাকিবার স্থান পাইতেছিলেন না। বাসার অন্বেষণে পথে পথে ফিরিতেছিলেন। আমার সঙ্গে পথে দেখা হইল। একটি পাতা হাতে করিয়া আমি তখন ব্রাহ্মণের পদধূলি আনিতে যাইতেছিলাম। প্রত্যহ ব্রাহ্মণের পদধূলি না খাইয়া আমি কখনও জলগ্রহণ করি না। ব্রাহ্মণ দেখিয়া আমি সেই পাতায় তাঁহাদের পদধূলি লইলাম, আর বলিলাম,—'আসুন আমার বাড়ীতে, আপনাদিগকে বাসা দিব।' তাঁহারা আমার বাড়ীতে বাসা লইলেন। আমাদের গ্রামে তিন দিন রহিলেন, অনেকগুলি কাপড় বেচিলেন, অনেক টাকা পাইলেন! আমি সেই সন্ধান কমলকে দিলাম। কমলেতে আমাতে পরামর্শ করিলাম যে, 'তিনটিকে সাবাড় করিতে হইবে।' দলস্থ অন্য কাহাকেও কিছু বলিলাম না, কারণ, তাহা হইলে ভাগ দিতে হইবে। কমলকে বলিলাম,—'তুমি আগে গিয়া মাঠের মাঝখানে লুকাইয়া থাক। অতি প্রত্যুষে ইহাদিগকে আমি সঙ্গে লইয়া যাইব। দুই জনেই সেইখানে কার্য্য সমাধা করিব।' তাহার পরদিন প্রত্যুষে আমি সেই তিন জন ব্রাহ্মণকে পথ দেখাইবার জন্য লইয়া চলিলাম। ভগবানের এমনি কৃপা যে সে দিন ঘোর কোয়াসা হইয়াছিল, কোলের মানুষ দেখা যায় না। নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র কমল বাহির হইয়া একজনের মাথায় লাঠি মারিলেন। আমিও সেই সময় আর এক জনের মাথায় লাঠি মারিলাম। তাঁরা দুই জনেই পড়িয়া গেলেন। আমরা সেই দুই জনকে শেষ করিতেছি, এমন সময় তৃতীয় ব্রাহ্মণটি পলাইলেন। কমল তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলেন আমিও আমার কাজটি সমাধা করিয়া তাঁহাদিগের পশ্চাৎ দৌড়িলাম। ব্রাহ্মণ গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিলেন। শিরোমণি মহাশয়ের বাটীতে গিয়া,—'ব্রহ্মহত্যা হয়! ব্রাহ্মণের প্রাণ রক্ষা করুন,—এই বলিয়া আশ্রয় লইলেন। অতি স্নেহের সহিত শিরোমণি মহাশয় তাঁহাকে কোলে করিয়া লইলেন। শিরোমণি মহাশয় তাঁহাকে মধুর বচনে বলিলেন,—'জীবন ক্ষণভঙ্গুর! পদ্মপত্রের উপর জলের ন্যায়। সে জীবনের জন্য এত কাতর কেন বাপু?' এই বলিয়া ব্রাহ্মণকে পাঁজা করিয়া বাটীর বাহিরে দিয়া শিরোমণি মহাশয় ঝনাৎ করিয়া বাটীর দ্বারটি বন্ধ করিয়া দিলেন। কমল পুনরায় ব্রাহ্মণকে মাঠের দিকে তাড়াইয়া লইয়া চলিলেন। ব্রাহ্মণ যখন দেখিলেন যে, আর রক্ষা নাই, কমল তাঁহাকে ধরধর হইয়াছেন, তখন তিনি হঠাৎ ফিরিয়া কমলকে ধরিলেন। কিছুক্ষণের নিমিত্ত দুই জনে হুটাহুটি হইল। হাতীর মত কমলের শরীরে বল, কমলকে তিনি পারিবেন কেন? কমল তাঁহাকে মাটীতে ফেলিয়া দিলেন, তাঁহাকে মারিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ-দেবতার এমনি কঠিন প্রাণ যে, তিনি অজ্ঞানও হয় না, মরেও না। ক্রমাগত কেবল এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন,—'হে মধুসূদন!

আমাকে রক্ষা কর! হে মধুসূদন! আমাকে রক্ষা কর। আমি পশ্চাতে পড়িয়াছিলাম। কোন দিকে ব্রাহ্মণ পলাইয়াছেন আর কমল বা কোন দিকে গিয়াছেন, কোয়াসার জন্য তাহা আমি দেখিতে পাই নাই। এখন ব্রাহ্মণের চীৎকার শুনিয়া আমি সেই দিকে দৌড়িলাম। গিয়া দেখি, ব্রাহ্মণ মাটীতে পড়িয়া রহিয়াছেন, কমল তাঁহার বুকের উপরে; কমল আপনার দুই হাত দিয়া ব্রাহ্মণের দুটি হাত ধরিয়া মাটীতে চাপিয়া রাখিয়াছেন, কমলের বাম পা মাটিতে রহিয়াছে, দক্ষিণ পা ব্রাহ্মণের উদরে, এই পায়ের বুড়ে আঙ্গুল ঘোরতর বলের সহিত ব্রাহ্মণের নাভির ভিতর প্রবেশ করাইতেছেন। পড়িয়া পড়িয়া ব্রাহ্মণ চীৎকার করিতেছেন। কমল আমাকে বলিলেন, —'এ বামুন বেটা কি বজ্জাৎ! বেটা যে মরে না হে! গদাধর! শীঘ্র একটা যা হয় কর। তা না হইলে বেটার চীৎকারে লোক আসিয়া পড়িবে। আমার হাতে তখন লাঠি ছিল না, নিকটে এ খানা পাথর পড়িয়া ছিল। সেই পাথরখানি লইয়া আমি ব্রাহ্মণের মাথাটি ছেঁচিয়ে দিলাম। তবে ব্রাহ্মণের প্রাণ বাহির হইল। যাহা হউক, এই ব্রাহ্মণকে মারিতে পরিশ্রম হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেবার লাভও বিলক্ষণ হইয়াছিল। অনেকগুলি টাকা আর অনেক গরদের কাপড় আমরা পাইয়াছিলাম। কি করিয়া নশিরাম সর্দ্দার এই কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন। নশিরাম ভাগ চাহিলেন। আমরা বলিলাম, —'এ কাজে তোমাকে কিছু করিতে হয় নাই, তোমাকে আমরা ভাগ দিব কেন?' কথায় কথায় কমলের সহিত নশিরামের ঘোরতর বিবাদ করিয়া উঠিল; ক্রমে মারামারি হইবার উপক্রম হইল। কমল পৈতা ছিঁড়িয়া নশিরামকে শাপ দিলেন। কমল ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ। সাক্ষাৎ অগ্নিরূপ। শিষ্য যজমান আছে। সেরূপ ব্রাহ্মণের অভিশাপ ব্যর্থ হইবার নহে। পাঁচ-সাত বৎসরের মধ্যেই মুখে রক্ত উঠিয়া নশিরাম মরিয়া গেল। যাহা হউক, সেই সব কাপড় হইতে এক জোড়া ভাল গরদের কাপড় আমরা শিরোমণি মহাশয়কে দিয়াছিলাম। যখন সেই গরদের কাপড়খানি পরিয়া, দোবজাটি কাঁধে ফেলিয়া, ফোঁটাটি কাটিয়া, শিরোমণি মহাশয় পথে যাইতেন, তখন সকলে বলিত,—'আহা! যেন কন্দর্প পুরুষ বাহির হইয়াছেন!' বয়সকালে শিরোমণি মহাশয়ের রূপ দেখে কে? না, শিরোমণি মহাশয়?"

শিরোমণি মহাশয় বলিলেন,—"গদাধর! গদাধর! তোমার এরূপ বাক্য বলা উচিত নয়। তুমি যাহা বলিতেছ, তাহার আমি কিছু জানি না। পীড়া-শীড়ায় তোমার বুদ্ধি লোপ হইয়াছে, আমি তোমার জন্য নারায়ণকে তুলসী দিব। তাহা হইলে তোমার পাপক্ষয় হইবে।" —নিরঞ্জন এই সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিতেছিলেন, মাঝে মাঝে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছিলেন, আর বলিতেছিলেন,—"হা মধুসূদন! হা দীনবন্ধু!" —জনার্দ্দন চৌধুরী কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহার পর কি হইল গদাধর?"

গদাধর উত্তর করিল,—"তাহার পর আর কিছু হয় নাই। খেতু অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, অন্যমনস্কভাবে আমাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'একটু বরফ খাবে গদাধর? আমি বলিলাম,—'না দাদাঠাকুর! আমি বরফ খাইব না, বরফ খাইলে আমার অধর্ম্ম হইবে, আমার জাতি যাইবে।'

জনার্দ্দন চৌধুরী বলিলেন,—"তবে তুমি নিশ্চয় বলিতেছ, যে খেতু বরফ খাইয়াছে?"

গদাধর উত্তর করিল,—"আজ্ঞা হাঁ ধর্ম্মাবতার! আমি তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। আপনি ব্রাহ্মণ! আপনার পায়ে হাত দিয়া আমি দিব্য করিতে পারি।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ - বিকার

গদাধরের মুখে সকল কথা শুনিয়া, জনার্দ্দন চৌধুরী তখন তনু রায় প্রভৃতি গ্রামের ভদ্রলোকদিগকে ডাকিতে পাঠাইলেন।

সকলে আসিয়া উপস্থিত হইলে, জনার্দ্দন চৌধুরী বলিলেন,—"আজ আমি ঘোর সর্ব্বনাশের কথা শুনিলাম। জাতি কুল, ধর্ম্ম-কর্ম্ম, সর্ব লোপ হইতে বসিল। পিতা পিতামহদিগকে যে এক গণ্ডুষ জল দিব, তাহারও উপায় রহিল না। ঘোর কলি উপস্থিত।"

সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হইয়াছে, মহাশয়?"

জনার্দ্দন চৌধুরী উত্তর করিলেন,—"শিবচন্দ্রের পুত্র ঐ যে খেতা, কলিকাতায় রামহরির বাসায় থাকিয়া ইংরেজী পড়ে, সে বরফ খায়। বরফ সাহেবেরা প্রস্তুত করেন, সাহেবের জল। শিরোমণি মহাশয় বিধান দিয়াছেন, যে বরফ খাইলে সাহেবত্ব প্রাপ্ত লোকের সহিত সংস্রব রাখিলে সেও সাহেব হইয়া যায়। তাই, এই খেতার সহিত সংস্রব রাখিয়া সকলেই আমরা সাহেব হইতে বসিয়াছি।

এই কথা শুনিয়া দেশ শুদ্ধ লোক একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। সর্ব্বনাশ! বরফ খায়? যাঃ! এইবার ধর্ম্ম কর্ম্ম সব গেল।

সর্ব্বের চেয়ে ভাবনা হইল ষাড়েশ্বরের। ডাক ছাড়িয়া তিনি কাঁদেন নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মগত প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিয়াছিল। কত যে তিনি "হায়, হায়!" করিলেন, তাহার কথা আর কি বলিব!

যাহা হউক, সর্ব্ববাদি-সম্মত হইয়া খেতুকে 'এক-ঘোরে' করা স্থির হইল।

নিরঞ্জন কেবল ঐ কথায় সার দিলেন না। আমরা না হয় দু'ঘোরে হইয়া থাকিব।"

নিরঞ্জন আরও বলিলেন,—"চৌধুরী মহাশয়! আজ প্রাতঃকাল হইতে যাহা দেখিলাম যাহা শুনিলাম, তাহাতে বুঝিতেছি যে, ঘোর কলি উপস্থিত। নিদারুণ নরহত্যার ব্রহ্ম-হত্যার কথা শুনিলাম। চৌধুরী মহাশয়! আপনি প্রাচীন, বিজ্ঞ, লক্ষ্মীর বরপুত্র; বিধাতা আপনাব প্রতি সুপ্রসন্ন। এ কুচক্র আপনাকে শোভা পায় না; লোককে জাতিচ্যুত করায় কিছুমাত্র পৌরুষ নাই, পতিতকে উদ্ধার করাই মানুষের কার্য্য। বিষ্ণু ভগবান্ পতিতকে উদ্ধার করেন বলিয়াই তাঁহার নাম 'পতিত-পাবন' হইয়াছে। পৃথিবীতে সজ্জনকুল সেই পতিত-পাবনের প্রতিরূপ। এই ষাঁড়েশ্বরের মত সুরাপানে আর অভক্ষ্য-ভক্ষণে যাহারা উন্মত্ত, এই তনু রায়ের মত যাহাদিগের অপত্য-বিক্রয়-জনিত শুল্ক গ্রহণে মানুষ কলুষিত, এই গোবর্দ্ধনের মত যাহারা ব্রহ্মহত্যা মহাপাতকে পতিত, সেই গলিত নরক-কীটেরা ধর্ম্মের মর্ম্ম কি জানিবে?" এই বলিয়া নিরঞ্জন সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন!

নিরঞ্জন চলিয়া যাইলে, গোবর্দ্ধন শিরোমণি বলিলেন,—"ষাঁড়েশ্বর বাবাজীকে ইনি

গালি দিলেন ষাঁড়েশ্বর বাবাজী বীর পুরুষ। ষাঁড়েশ্বর বাবাজীকে অপমান করিয়া এ গ্রামে আবার কে বাস করিতে পারে?" —খেতু যে একঘোরে হইয়াছেন,.....নিয়মিতরূপে লোককে সেইটি দেখাইবার নিমিত্ত, স্ত্রী মাসিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে জনার্দ্দন চৌধুরী সপ্তগ্রাম সমাজ নিমন্ত্রণ করিলেন। চারিদিকে হৈ হৈ পড়িয়া গেল যে, কুসুমবাটী নিবাসী শিবচন্দ্রের পুত্র, ক্ষেত্র, "বরফ" খাইয়া কৃস্তান হইয়াছে।

সেই দিন রাত্রিতে ষাঁড়েশ্বর চারি বোতল মহুয়ার মদ আনিলেন। তারীফ শেখের বাড়ী হইতে চুপি চুপি মুরগী রাঁধাইয়া আনিলেন। পাঁচ ইয়ার জুটিয়া পরম সুখে পান ভোজন হইল। একবার কেবল এই সুখে ব্যাঘাত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। খাইতে খাইতে ষাঁড়েশ্বরের মনে উদয় হইল যে, তারীফ শেখ হয় তো মুরগীর সহিত বরফ মিশ্রিত করিয়াছে! তাই তিনি হাত তুলিয়া লইলেন, আর বলিলেন,......"আমার খাওয়া হইল না। বরফ-মিশ্রিত মুরগী খাইয়া শেষে কি জাতিটি হারাইব?" সকলে অনেক বুঝাইলেন যে, মুরগী বরফ দিয়া রান্না হয় নাই। তবে তিনি পুনরায় আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। পান ভোজনের পর নিরঞ্জনের বাটীতে সকলে গিয়া ঢিল ও গোহাড় ফেলিতে লাগিলেন। এইরূপ ক্রমাগত প্রতি রাত্রিতে নিরঞ্জনের বাটীতে ঢিল ও গোহাড় পড়িতে লাগিল। আর সহ্য করিতে না পারিয়া, নিরঞ্জন ও তাঁহার স্ত্রী কাঁদিতে কাঁদিতে পৈতৃক বাস্তুভূমি পরিত্যাগ করিয়া অন্য গ্রামে চলিয়া গেলেন।

খেতু বলিলেন,—"কাকা মহাশয়! আপনি চলুন। আমিও এ গ্রাম হইতে শীঘ্র উঠিয়া যাইব।" খেতুর মার নিকট যে ঝি ছিল, সে ঝিটি ছাড়িয়া গেল। সে বলিল—"মা ঠাকুরাণি! আমি আর তোমার কাছে কি করিয়া থাকি? পাঁচজনে তাহা হইল আমার হাতে জল খাইবে না।"

আরও নানা বিষয়ে খেতুর মা উৎপীড়ত হইলেন। খেতুর মা ঘাটে স্নান করিতে যাইলে, পাড়ার স্ত্রীলোকেরা দূরে দূরে থাকেন; পাছে খেতুর মা তাঁহাদিকে ছুঁইয়া ফেলেন।

যে কমল ভট্টাচার্য্যের কথা গদাধর ঘোষ বলিয়াছিল, একদিন সেই কমলের বিধবা স্ত্রী মুখ ফাটিয়া খেতুর মাকে বলিলেন,—"বাছা! নিজে সবধান হইতে জানিলে কেহ আর কিছু বলে না! বসিতে জানিলে উঠিতে হয় না। তোমার ছেলে বরফ খাইয়াছে, তোমাদের এখন জাতিটি গিয়াছে। তা বলিয়া আমাদের সকলের জাতিটি মার কেন? আমাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম নাশ কর কেন? তা তোমার বাছা দেখিতেছি, এ ঘাটটি না হইলে আর চলে না। সেদিন মেটে কলসটি যেই কাঁকে করিয়া উঠিয়াছি, আর তোমার গায়ের জলের ছিটা আমার গায়ে লাগিল, তিন পয়সার কলসীটি আমাকে ফেলিয়া দিতে হইল। আমাকে পুনরায় স্নান করিতে হইল। আমরা তোমার বাছা কি করিয়াছি? যে তুমি আমাদের সঙ্গে এত লাগিয়াছ?"

খেতুর মা কোন উত্তর দিলেন না। কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী আসিলেন।

খেতু বলিলেন,...."মা! কাঁদিও না। এখানে আর আমরা অধিক দিন থাকব না। এ গ্রাম

হইতে আমরা উঠিয়া যাইব।"

খেতুর মা বলিলেন,—"বাছা! অভাগীরা যাহা কিছু বলে, তাহাতে আমি দুঃখ করি না। কিন্তু তোমার মুখপানে চাহিয়া রাত্রি দিন আমার মনের ভিতর আগুন জ্বলিতেছে। তোমার আহার নাই, নিদ্রা নাই; একদণ্ড তুমি সুস্থির নও! শরীর তোমার শীর্ণ, মুখ তোমার মলিন। খেতু! আমার মুখপানে চাহিয়া একটু সুস্থির হও, বাছা!"

খেতু বলিলেন,—"মা! আর সাত দিন! আজ মাসের হইল ১৭ তারিখ। ২৪শে তারিখে কঙ্কাবতীর বিবাহ হইবে। সেই দিন আশাটি আমার সমূলে নির্ম্মূল হইবে। সেই দিন আমরা জন্মের মতো এ দেশ হইতে চলিয়া যাইব।"

খেতু বলিলেন,—" দাসেদের মেয়ের কাছে শুনিলাম যে, কঙ্কাবতীকে আর চেনা যায় না। সে রূপ নাই, সে রং নাই, সে হাসি নাই। আহা! তবুও বাছা মা'র দুঃখে কাতর! আপনার সকল দুঃখ ভুলিয়া, বাছা—আমার মা'র দুঃখে দুঃখী। কঙ্কাবতীর মা রাত্রি দিন কাঁদিতেছেন, আর কঙ্কাবতী মাকে বুঝাইতেছেন।

"শুনিলাম, সেদিন কঙ্কাবতী মাকে বলিয়াছেন যে, 'মা। তুমি কাঁদিও না! আমার এই কয়খানা হাড় বেচিয়া বাবা যদি টাকা পান, তাতে দুঃখ কি মা? এরূপ কত হাড় শ্মশানঘাটে পড়িয়া থাকে, তাহার জন্য কেহ একটি পয়সাও দেয় না। আমার এই হাড় ক'খানার যদি অত মূল্য হয়, বাপ ভাই সেই টাকা পাইয়া যদি সুখী হন, তার জন্য আর আমরা দুঃখ কেন করি মা? তবে মা! আমি বড় দুর্ব্বল হইয়াছি, শরীরে আমার সুখ নাই। পাছে এই কয়দিনের মধ্যে

আমি মরিয়া যাই, সেই ভয় হয়। টাকা না পাইতে পাইতে মরিয়া গেলে, বাবা আমার উপর বড় রাগ করিবেন। আমি তো ছাই হইয়া যাইব, কিন্তু আমাকে তিনি যখনি মনে করিবেন, আর তখনি কত গালি দিবেন।"

খেতুর মা পুনরায় বলিলেন,—"খেতু কঙ্কাবতীর কথা যা আমি শুনি, তা তোমাকে বলি না, পাছে তুমি অধৈর্য্য হইয়া পড়! কঙ্কাবতীর যেরূপ অবস্থা শুনিতে পাই, কঙ্কাবতী আর অধিক দিন বাঁচিবে না!"

খেতু বলিলেন,—"মা। আমি তনু রায়কে, বলিলাম যে, রায় মহাশয়! আপনাকে আমার সহিত কঙ্কাবতীর বিবাহ দিতে হইবে না, একটি সুপাত্রের সহিত দিন। রামহরি দাদা ও আমি ধনাঢ্য সুপাত্রের অনুসন্ধান করিয়া দিব। কিন্তু মা! তনু রায় আমার কথা শুনিলেন না, অনেক গালি দিয়া আমাকে তাড়াইয়া দিলেন। আমাদের কি মা? আমরা অন্য গ্রামে গিয়া বাস করিব। কিন্তু কঙ্কাবতী যে এখানে চিরদুঃখিনী হইয়া রহিল সেই মা দুঃখ! আমি কাপুরুষ, যে তাহার কোন উপায় করিতে পারিলাম না, সেই মা দুঃখ। আমি কাপুরুষ, যে তাহার কোন উপায় করিতে পারিলাম না, সেই মা দুঃখ! আর মা, যদি কঙ্কাবতীর বিষয়ে কোন কথা শুনিতে পাও, তো আমাকে বলিও। আমার নিকট কোনও কথা গোপন করিও না। আহা! সীতাকে এ সময়ে কলিকাতায় কেন পাঠাইয়া দিলাম! সীতা যদি এখানে

থাকিত, তাহা হইলে প্রতিদিনের সঠিক সংবাদ পাইতাম।"

খেতুর মা, তার পর দিন খেতুকে বলিলেন,—"আজ শুনিলাম, কঙ্কাবতীর বড় জ্বর হইয়াছে। আহা! ভাবিয়া ভাবিয়া বাছার যে জ্বর হইবে, সে আর বিচিত্র কথা কি? বাছার এখন প্রাণরক্ষা হইলে হয়। জনার্দ্দন চৌধুরী কবিরাজ পাঠাইয়াছেন, আর বলিয়া দিয়াছেন যে, যেমন করিয়া হউক, চারি দিনের মধ্যে কঙ্কাবতীকে ভাল করিতে হইবে।"

খেতু বলিলেন,—"তাই তো মা! এখন কঙ্কাবতীর প্রাণটা রক্ষা হইলে হয়। মা! কঙ্কাবতীর বিড়াল আসিলে এ কয়দিন তাহাকে ভাল করিয়া দুধ-মাছ খাইতে দিবে। হাঁ মা! আমরা এখান হইতে চলিয়া যাইলে, কঙ্কাবতীর বিড়াল কি আমাদের বাড়ীতে আর আসিবে? না, বড়মানুষের বাড়ীতে গিয়া আমাদিগকে ভুলিয়া যাইবে?"

খেতুর মা কোনও উত্তর দিলেন না, আঁচলে চক্ষু মুছিতে লাগিলেন।

এইরূপ দিন দিন কঙ্কাবতীর পীড়া বাড়িতে লাগিল, কিছুই কমিল না। সাত দিন হইল। বিবাহের দিন উপস্থিত হইল।

সে দিন কঙ্কাবতীর গায়ের বড় জ্বালা, কঙ্কাবতীর বড় পিপাসা, কঙ্কাবতী একেবারে শয্যাধরা। কঙ্কাবতীর সমূহ রোগ। কঙ্কাবতীর ঘোর বিকার। কঙ্কাবতীর জ্ঞান নাই, সংজ্ঞা নাই। লোক চিনিতে পারেন না, কঙ্কাবতী এখন যান্ তখন যান্!

দ্বিতীয় ভাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ – নৌকা

বড় পিপাসা, বড় গায়ের জ্বালা!

কঙ্কাবতী মনে মনে করিলেন;—"যাই নদীর ঘাটে যাই, সেইখানে বসিয়া এক পেট জল খাই, আর গায়ে জল মাখি, তাহা হইলে শান্তি পাইব।"

নদীর ঘাটে বসিয়া কঙ্কাবতী জল মাখিতেছেন, এমন সময়ে কে বলিল,—"কে ও কঙ্কাবতী?" কঙ্কাবতী চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। কেহ কোথাও নাই! কে এ কথা বলিতেছে, কঙ্কাবতী তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। নদীর জলে দূরে কেবল একটি কাতলা মাছ ভাসিতেছে, আর ডুবিতেছে, তাহাই দেখিতে পাইলেন। পুনরায় কে জিজ্ঞাসা করিল,—"কেও, কঙ্কাবতী?"

কঙ্কাবতী এইবার উত্তর করিলেন,—"হাঁ গো, আমি কঙ্কাবতী।" —পুনরায় কে জিজ্ঞাসা করিলেন,"তোমার কি বড় গায়ের জ্বালা তোমার কি বড় পিপাসা?"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—"হাঁ গো আমার বড় জ্বালা, আমার বড় পিপাসা।"

কে আবার বলিল,—"তবে তুমি এক কাজ কর না কেন? নদীর মাঝখানে চল না কেন? নদীর ভিতর অতি সুশীতল ঘর আছে, সেখানে যাইলে তোমার পিপাসার শান্তি হইবে, তোমার শরীর জুড়াইবে।" কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—"নদীর মাঝখান যে অনেক দূর! সেখানে আমি কি করিয়া যাইব?"

সে বলিল,—"কেন? ঐ যে জেলেদের নৌকা রহিয়াছে? ঐ নৌকার উপর বসিয়া কেন এস না?" জেলেদের একখানি নৌকার উপর গিয়া কঙ্কাবতী বসিলেন। এমন সময় বাটীতে কঙ্কাবতীর অনুসন্ধান হইল। 'কঙ্কাবতী কোথায় গেল,—কঙ্কাবতী কোথায় গেল?" এই বলিয়া একটা গোল পড়িল। কে বলিল,—"ও গো! তোমাদের কঙ্কাবতী ঐ ঘাটের দিকে গিয়াছে।"

কঙ্কাবতীর বাড়ীর সকলে মনে করিলেন যে জনার্দ্দন চৌধুরীর সহিত বিবাহ হইবার ভয়ে কঙ্কাবতী পলায়ন করিতেছেন। তাই কঙ্কাবতীকে ডাকিয়া আনিবার জন্য প্রথমে বড় ভগ্নী ঘাটের দিকে দৌড়িলেন। ঘাটে আসিয়া দেখেন, না কঙ্কাবতী একখানি নৌকার উপর চড়িয়া নদীর মাঝখানে যাইতেছেন। কঙ্কাবতীর ভগ্নী বলিলেন,—

"কঙ্কাবতী বোন্ আমার, ঘরি ফিরে এস না?
বড় দিদি হই আমি, ভাল কি আর বাস না?
তিন ভগ্নী আছি দিদি, দুইটি বিধবা তার।
কঙ্কাবতী তুমি ছোট বড় আদরের মা'র।"

নৌকায় বসিয়া বসিয়া কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—

"শুনিয়াছি আছে না-কি জলের ভিতর।
শান্তিময় সুখময় সুশীতল ঘর।
সেই খানে যাই দিদি পুজি তোমার পা।
এই কঙ্কাবতীর নৌকাখানি হুথু যা।"

এই কথা বলিতেই কঙ্কাবতীর নৌকাখানি আরও গভীর জলে ভাসিয়া গেল। তখন, ভাই আসিয়া কঙ্কাবতীকে বলিলেন,—

"কঙ্কাবতী ঘরে এস, কুলেতে দিও না কালি।
রেগেছেন বাবা বড়, দিবেন কতই গালি।
বালিকা অবুঝ তুমি, কি জান সংসার-কথা?
ঘরে ফিরে এস, দিও না, বাপের মনে ব্যথা।"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—

"কি বলিছ দাদা তুমি বুঝিতে না পারি।
জ্বলিছে আগুন দেহে নিবাইতে নারি।
যাও দাদা ঘরে যাও হও তুমি রাজা।
এই কঙ্কাবতীর নৌকাখানি হুথু যা।"

এই কথা বলিতেই কঙ্কাবতীর নৌকাখানি আরও দূর জলে ভাসিয়া গেল। তখন কঙ্কাবতীর মা আসিয়া বলিলেন—

"কঙ্কাবতী লক্ষ্মী আমার, ঘরে ফিরে এস না?
কাঁদিতেছে মায়ের প্রাণ, বিলম্ব আর ক'রো না।

ভাত হ'ল কড় কড়, ব্যঞ্জন হইল বাসি।
কঙ্কাবতী মা আমার সাত দিন উপবাসী।"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—

"বড়ই পিপাসা মাতা না পারি সহিতে।
তুষের আগুন সদা জ্বলিছে দেহেতে।
এই আগুন নিবাইতে যাইতেছি মা।
কঙ্কাবতীর নৌকা খানি এই হুথু যা।"

এই বলিতে কঙ্কাবতীর নৌকাখানি আরও দূর জলে ভাসিয়া গেল। তখন বাপ আসিয়া বলিলেন,—

"কঙ্কাবতী ঘরে এস, হইবে তোমার বিয়া।
কত যে হতেছে ঘটা দেখ তুমি ঘরে গিয়া।
গহনা পরিবে কত আর সাটিনের জামা।
কত যে পাইবে টাকা নাহিক তাহার সীমা।"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—

"টাকা কড়ি কাজ নাই বসন-ভূষণ।
আগুনে পুড়িছে পিতা শরীর এখন।
দারুণ যাতনা পিতা আর ত সহে না!
এই কঙ্কাবতীর নৌকাখানি ডুবে যা।"

এই বলিতেই কঙ্কাবতীব নৌকাখানি নদীর জলে টুপ্ করিয়া ডুবিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ – জলে

নৌকার সহিত কঙ্কাবতীও ডুবিয়া গেলেন। কঙ্কাবতী জলের ভিতর ক্রমেই ডুবিতে লাগিলেন। নেমেই নীচে যাইতে লাগিলেন। যাইতে য'ইতে অনেক দূর চলিয়া গেলেন। তখন নদীর যত মাছ সব একত্র হইল। নদীব ভিতর মহা-কোলাহল পড়িয়া গেল যে "কঙ্কাবতী আসিতেছেন।" রুই বলে,—"কঙ্কাবতী আসিতেছেন, পুঁটে বলে,—"কঙ্কাবতী আসিতেছেন।" সবাই বলে,—"কঙ্কাবতী আসিতেছেন। পথ পানে এক দৃষ্টে চাহিয়া জলচর জীবজন্তু সব যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, ক্রমে কঙ্কাবতী আসিয়া সেইখানে উপস্থিত হইলেন। সকলেই কঙ্কাবতীকে আদর করিল। সকলেই বলিল, "এস এস, কঙ্কাবতী এস।"

মাছেদের ছেলে-মেয়েরা বলিল,—"আমরা কঙ্কাবতীর সঙ্গে খেলা করিব।"

বৃদ্ধা কাতলা মাছ তাহাদিগকে ধমক দিয়া বলিলেন,—কঙ্কাবতীর এ খেলা করিবার সময় নয়। বাছার বড় গায়ের জ্বালা দেখিয়া আমি কঙ্কাবতীকে ঘাট হইতে ডাকিয়া আনিলাম। আহা কত পথ আসিতে হইয়াছে। বাছার আমার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে! এস মা তুমি আমার কাছে এস। একটু বিশ্রাম কর, তার পর তোমার একটা বিলি করা যাইবে।

কঙ্কাবতী আস্তে আস্তে কাতলা মাছের নিকট গিয়া বসিলেন।

এদিকে কঙ্কাবতী বিশ্রাম করিতে লাগিলেন, ওদিকে জলচর জীব-জন্তুগণ মহাসমারোহে একটি সভা করিলেন। তপস্বী মাছের দাড়ি আছে দেখিয়া, সকলে তাঁহাকে সভাপতিরূপে বরণ করিলেন। "কঙ্কাবতীকে লইয়া কি করা যায়"—সভায় এই কথা লইয়া বাদানুবাদ হইতে লাগিল। —অনেক বক্তৃতার পর, চতুর বাটা মাছ প্রস্তাব করিলেন,—"এস ভাই! কঙ্কাবতীকে আমরা আমাদের রাণী করি।"

এই কথাটি সকলের মনোনীত হইল। চারিদিকে জয়ধ্বনী উঠিল।

মাছেদের আর আনন্দের পরিসীমা নাই। সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল যে,—ভাই! কঙ্কাবতী আমাদের রাণী হইলে, আর আমাদের কোনও ভাবনা থাকিবে না। বঁড়শী দিয়া আমাদিগকে কেহ গাঁথিলে হাত দিয়া কঙ্কাবতী সূতাটি ছিঁড়িয়া দিবেন। জেলেরা জাল ফেলিলে ছুরি দিয়া কঙ্কাবতী জালটি কাটিয়া দিবেন। কঙ্কাবতী রাণী হইলে আর আমাদের কোনও ভয় —থাকিবে না। এস, এখন সকলে কঙ্কাবতীর কাছে যাই, আর কঙ্কাবতীকে গিয়া বলি যে, কঙ্কাবতী তোমাকে আমাদের রাণী হইতে হইবে।

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"এখন আমি তোমাদের রাণী হইতে পারিব না। আমার শরীরে সুখ নাই, আমার মনেও বড় অসুখ। তাই এখন আমি তোমাদের রাণী হইতে পারিব না।"

তখন কাতলানী বলিলেন,—"তোমরা রাজ-পোষাক প্রস্তুত করিয়াছ? রাজ-পোষাক না পাইলে কঙ্কাবতী রাণী হইবে কেন?"

এই কথা শুনিয়া মাছেরা সব বলিল,—"ও হো বুঝেছি বুঝেছি। রাজ-পোষাক না পাইলে কঙ্কাবতী রাণী হইবে না। রাঙা কাপড় চাই, মেঘের মত পোষাক চাই, তবে কঙ্কাবতী রাণী হইবে।"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—"না গো না! রাঙা কাপড়ের জন্য নয়। সাজিবার গুজিবার সাধ আমার নাই। একেলা বসিয়া কেবল কাঁদি, এখন আমার এই সাধ।"

মাছেরা সে কথা শুনিল না। বিষম কোলাহল উপস্থিত করিল। তাহাদের কোলাহলে অস্থির হইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভাল। না হয় আমি তোমাদের রাণী হইলাম। এখন আমাকে করিতে হইবে কি?"

মাছেরা উত্তর করিল,—"করিতে হইবে কি? কেন? দরজীর বাড়ী যাইতে হইবে, গায়ের মাপ দিতে হইবে, পোষাক পরিতে হইবে।" সকলে তখন কাঁকড়াকে বলিলেন,—"কাঁকড়া মহাশয়! আপনি জলেও চলিতে পারেন, স্থলেও চলিতে পারেন, আপনি বুদ্ধিমান লোক। চক্ষু দুইটী যখন আপনি পিট্ পিট্ করেন, বুদ্ধির আভা তখন তাহার ভিতর চিক্ চিক্ করিতে থাকে। কঙ্কাবতীকে সঙ্গে লইয়া আপনি দরজীর বাড়ী গমন করুন। ঠিক করিয়া কঙ্কাবতীর গায়ের মাপটি দিবেন, দামি কাপড়ের জামা করিতে বলিবেন। কচ্ছপের পিঠে বোঝাই দিয়া টাকা মোহর লইয়া যান্। যত টাকা লাগে, তত টাকা দিয়া কঙ্কাবতীর ভাল কাপড় করিয়া দিবেন।"

কাঁকড়া মহাশয় উত্তর করিলেন,—"অবশ্যই আমি যাইব। কঙ্কাবতীর ভাল কাপড় হয়,

ইহাতে কার না আহ্লাদ? আমাদের রাণীকে ভাল করিয়া না সাজাইলে গুজাইলে, আমাদের অখ্যাতি। তোমরা কচ্ছপের পিঠে টাকা মোহর বোঝাই দাও, আমি ততক্ষণ ঘর হইতে পোষাকি কাপড় পরিয়া আসি, আর মাথার মাঝে সিঁথি কাটিয়া আমার চুলগুলি বেশ ভাল করিয়া ফিরাইয়া আসি।" কচ্ছপের পিঠে টাকা মোহর বোঝাই দেওয়া হইল। ততক্ষণ কাঁকড়া মহাশয় ভাল কাপড় পরিয়া, মাথা আঁচড়াইয়া, ফিট্ পিট্ হইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ – রাজ-বেশ

কঙ্কাবতী করেন কি? সকলের অনুরোধে তাঁহাদের সঙ্গে চলিলেন। কাঁকড়া মহাশয় আগে, কঙ্কাবতী মাঝখানে, কচ্ছপ পশ্চাতে, এইরূপে তিন জনে যাইতে লাগিলেন।

প্রথম অনেক দূর জলপথে যাইলেন, তাহার পর অনেক দূর স্থলপথে যাইলেন। পাহাড়, পর্ব্বত, বন, জঙ্গল, অতিক্রম করিয়া অবশেষে বুড়ো দরজীর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

বুড়ো দরজী চশমা নাকে দিয়া কাঁচি হাতে করিয়া কাপড় সেলাই করিতেছিলেন। দূরে পাহাড় পানে চাহিয়া দেখিলেন যে, তিন জন কাহারা আসিতেছে। মনে মনে ভাবিলেন,—"ও কারা আসে?" নিকটে আসিলে চিনিতে পারিলেন।

তখন বুড়ো দরজী বলিলেন,—"কে ও কাঁকড়া ভায়া?"

কাঁকড়া মহাশয় উত্তর করিলেন,—"হাঁ দাদা! কেমন, ভাল আছ তো?"

দরজী বলিলেন,—আর ভাই! আমাদের আর ভাল থাকা না থাকা! এখন গেলেই হয়! তোমরা সৌখীন পুরুষ; তোমাদের কথা স্বতন্ত্র। এখন কি মনে করিয়া আসিয়াছ বল দেখি?" —কাঁকড়া উত্তর করিলেন,—"এই কঙ্কাবতীকে আমরা আমাদের রাণী করিয়াছি। কঙ্কাবতীর জন্য ভাল জামা চাই, তাই তোমার নিকট আসিয়াছি।"

দরজী বলিলেন,—"বটে! তা আমার নিকট উত্তম জামা আছে। ভাল পাটনাই খেরোর জামা আছে। টক্-টকে লাল খেরো, রং উঠিতে জানে না, ছিঁড়িতে জানে না, আগা-গোড়া আমি বখেই দিয়া সেলাই করিয়াছি। তোমাদের রাণী কঙ্কাবতী যদি শিমূল তুলা হয়, তো পরাও, অতি উত্তম দেখাইবে। দামের জন্য আটক খাইবে না। এখন টিপিয়া দেখ দেখি? কঙ্কাবতী শিমূল তুলা কি না?"

দাড়া দিয়া কাঁকড়া মহাশয় কঙ্কাবতীর গা টিপিয়া টিপিয়া দেখিলেন। তাহার পর দরজীর পানে চাহিয়া বলিলেন,—"কৈ না! সেরূপ নরম তো নয়!"

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"খেরোর খোল পরাইয়া তোমরা আমাকে বালিশ করিবে না কি? এই সকলে মিলিয়া আমাকে রাণী করিলে, তবে আবার বালিশ করিবার পরামর্শ করিতেছ কেন?"

দরজী উত্তর করিলেন,—"ঈশ! মেয়ের যে আস্বা ভারি! বালিশ হ'বে না তো কি তাকিয়া হইতে চাও না কি?" —দরজীর এইরূপ নিষ্ঠুর বচনে কঙ্কাবতীর মনে বড় দুঃখ

হইল, কঙ্কাবতী কাঁদিতে লাগিলেন।

কাঁকড়া মহাশয় বলিলেন,—"তুমি ছেলে মানুষ! আমাদের কথায় কথা কও কেন বল দেখি! যা তোমার পক্ষে ভাল তাই আমরা করিতেছি, চুপ করিয়া দেখ। চুপ কর; কাঁদিতে নাই।" —এইরূপ সান্ত্বনা-বাক্য বলিয়া কাঁকড়া মহাশয় আপনার বড় দাঁড়া দিয়া কঙ্কাবতীর মুখ মুছাইয়া দিলেন। তাহাতে কঙ্কাবতীর মুখ ছড়িয়া গেল।

বুড়ো দরজী বলিলেন,—"তাই তো! তবে এর গায়ের জামা আমার কাছে নাই। এর জামা আমি কাটিতেও জানি না সেলাই করিতেও জানি না।"

কাঁকড়া মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে এখন উপায়? ভাল জামা কোথায় পাই?" —বুড়ো দরজী বলিলেন, "তুমি এক কাজ কর, তুমি খলীফা সাহেবের কাছে যাও। খলীফা সাহেব ভাল কারিগর; খলীফা সাহেবের মত কারিগর এ পৃথিবীতে নাই, তাহার কাছে নানাবিধ কাপড় আছে, সে কাপড় পরিলে খাঁদারও নাক হয়।"

এই কথায় কাঁকড়া মহাশয়ের রাগ হইল। তিনি বলিলেন,—তুমি কি আমাকে ঠাট্টা করিতেছ না কি? তোমার না হয় নাকটি একটু বড়, আমার না হয় নাকটি ছোট, তাতে আবার ঠাট্টা কিসের?

বুড়ো দরজী উত্তর করিলেন,—"না না! তা কি কখনও হয়! তোমাকে আমি ঠাট্টা করিতে পারি? কেন? তোমার নাকটি মন্দ কি? কেবল দেখিতে পাওয়া যায় না, এই দুঃখের বিষয়।"

বুড়ো দরজীর এইরূপ প্রিয় বচনে কাঁকড়া মহাশয়ের রাগ পড়িল। সন্তোষ লাভ করিয়া তিনি উত্তর করিলেন,—"তা বটে! তা বটে! আমার নাকটি ভাল, তবে দোষের মধ্যে এই যে দেখিতে পাওয়া যায় না। কোথায় আছে, আমি নিজেই খুঁজিয়া পাই না। যদি দেখিতে পাওয়া যাইত, তাহা হইলে আমার নাক দেখিয়া সকলেই প্রশংসা করিত, সকলেই বলিত, আহা! কাঁকড়ার কি নাক ! যেন বাঁশীর মত। আর যারা ছড়া বাঁধে তারা লিখিত,—"তিল ফুল জিনি নাসা!' কিম্বা শুকচঞ্চু মত নাসা!' যা বল, যা কও, আমার অতি সুন্দর নাক।"

কঙ্কাবতী ভাবিলেন,—'ব্যাপারখানা কি? আমি দেখিতেছি সব পাগলের হাতে পড়িয়াছি। এ কাঁকড়াটা তো বদ্ধ পাগল। এরে পাগলা গারদে রাখা উচিত।'

মুখ ফুটিয়া কিন্তু কঙ্কাবতী কিছু বলিলেন না।

সকলে পুনরায় সেখান হইতে চলিলেন। আগে কাঁকড়া মহাশয়, তাহার পর কঙ্কাবতী, শেষে কচ্ছপ। এইরূপে তিনজনে যাইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে অনেক দূর গিয়া অবশেষে উপস্থিত হইলেন তখন খলীফা অন্দরমহলে ছিলেন।

কাঁকড়া মহাশয় বাহির হইতে ডাকিলেন,—"খলীফা সাহেব! খলীফা সাহেব।"

ভিতর হইতে খলীফা উত্তর দিলেন,—"কে হে! কে ডাকাডাকি করে?"

কাঁকড়া মহাশয় উত্তর করিলেন,—"আমি কাঁকড়াচন্দ্র। একবার বাহিরে আসুন, বিশেষ

কাজ আছে।" —খলীফা বাহিরে আসিলেন। কাঁকড়াচন্দ্রকে দেখিয়া অতি সমাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। —খলীফা বলিলেন,—"আসুন কাঁকড়াবাবু আসুন!' আর এই যে কচ্ছপবাবুকেও দেখিতেছি। কচ্ছপ বাবু। আপনি ঐ টুলটিতে বসুন, আর কাঁকড়া বাবু! আপনি ঐ চেয়ারখানি নিন্! এ মেয়েটিকে বসিতে দিই কোথায়? দিব্য মেয়েটি কাঁকড়া! এ কন্যাটি কি আপনার?"

কাঁকড়াচন্দ্র উত্তর করিলেন,—"না, এ কন্যাটি আমার নয় আমি বিবাহ করি নাই। ওঁর জন্য এখানে আসিয়াছি। ওঁরে আমরা আমাদের রাণী করিয়াছি। এক্ষণে রাজপরিচ্ছদের প্রয়োজন। তাই আপনার নিকট আসিয়াছি। এঁর জন্য অতি উত্তম রাজপরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে।

খলীফা উত্তর করিলেন,—"রাজ-পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিতে পারি। আমার কাছে রেশম আছে পশম আছে সাটিন আছে, মায় বারাণসী কিংখাপ পর্য্যন্ত আছে। কিন্তু রাজ-পোষাক তো আর অমনি হয় না? তাতে হীরা বসাইতে হইবে মতি বসাইতে হইবে জরি-লেস্ প্রভৃতি ভাল ভাল দ্রব্য লাগাইতে হইবে। অনেক টাকা খরচ হইবে। টাকা দিতে পারিবেন তো?" --কাঁকড়াচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন,—"আমাদের টাকার অভাব কি? যত নৌকা-জাহাজ ডুবি হয়, তাহাতে যে টাকা থাকে সে সব কোথায় যায়? সে সকল আমাদের প্রাপ্য। এক্ষণে আপনার কত টাকা চাই, তাই বলুন?"

খলীফা উত্তর করিলেন,—"যদি দুই তোড়া টাকা দিতে পারেন, তাহা হইলে উত্তম রাজপোষাক প্রস্তুত করিয়া দিতে পারি।"

কাঁকড়া তৎক্ষণাৎ কচ্ছপের পিঠ হইতে লইয়া দুই তোড়া মোহর খলীফার সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন। খলীফা—অনেক রাজার পোষাক, অনেক বাবুর পোষাক অনেক বরের পোষাক প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কিন্তু একেবারে দুই তোড়া মোহর কেহ কখনও তাঁহাকে দেয় নাই। —মোহর দেখিয়া কঙ্কাবতী ব্যাকুল হইয়া বলিলেন,—'ও গো! তোমরা এ টাকাগুলি আমাকে দাও! আমি বাড়ী লইয়া যাই। আমার বাবা বড় টাকা ভালবাসেন, এত টাকা পাইলে বাবা কত আহ্লাদ করিবেন। এই ময়লা কাপড় পরিয়াই আমি না হয় তোমাদের রাণী হইব, ভাল কাপড়ে আমার কাজ নাই। তোমাদের পায়ে পড়ি, এই টাকাগুলি আমাকে দাও, আমি বাবাকে গিয়া দিই।"

কাঁকড়া কঙ্কাবতীকে বকিয়া উঠিলেন। কাঁকড়া বলিলেন—"তুমি বড় অবাধ্য মেয়ে দেখিতেছি। একবার তোমাকে মানা করিয়াছি যে, তুমি ছেলেমানুষ আমাদের কথায় কথা কহিও না। চুপ করিয়া দেখ, আমরা কি করি।"

কি করিবেন? কঙ্কাবতী চুপ করিয়া রহিলেন। মোহর পাইয়া খলীফার আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তিনি বলিলেন,—"টাকাগুলি বাড়ীর ভিতর রাখিয়া আসি, আর ভাল ভাল কাপড় বাহির করিয়া আনি। এইক্ষণেই তোমাদের রাণীর রাজবস্ত্র করিয়া দিব।"

বাটীর ভিতর খলীফা দুই তোড়া লইয়া যাইলেন। আহ্লাদে পুলকিত হইয়া দন্তপাতি

বাহির করিয়া এক গাল হাসির সহিত সেই মোহর স্ত্রীকে দেখাইতে লাগিলেন।

স্ত্রী অবাক্! কি আশ্চর্য্য! "আজ সকাল বেলা আমরা কার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিলাম?" খলীফানী এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন। অবশেষে প্রকাশ্যে খলীফানী বলিলেন,—"এবার কিন্তু আমাকে ডায়মনকাটা তাবীজ গড়াইয়া দিতে হইবে।"

তাহার পর খলীফা কঙ্কাবতীকে বাটীর ভিতর লইয়া গেলেন। স্ত্রীকে বলিলেন—'ইনি রাণী! এঁর নাম কঙ্কাবতী। এঁর জন্য রাজ-পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিতে হইবে। অতি সাবধানে তুমি ই'হার গায়ের মাপ লও!"

খলীফানী কঙ্কাবতীর গায়ের মাপ লইলেন। অনেক লোক নিযুক্ত করিয়া অতি সত্বর খলীফা রাজবস্ত্র প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন। খলীফা-রমণী যত্নে সেই পোষাক কঙ্কাবতীকে পরাইয়া দিলেন। রাজপরিচ্ছদ পরিধান করিয়া কঙ্কাবতীর রূপ ফাটিয়া পড়িতে লাগিল।

খলীফা-রমণী বলিলেন,—"আহা! মরি কি রূপ!"

খলীফা বলিলেন,—"মরি কি রূপ!"

সকলেই বলিলেন,—"মরি কি রূপ!"

রাজ-পরিচ্ছদ পরা হইলে কাঁকড়া ও কচ্ছপ, কঙ্কাবতীকে লইয়া পুনরায় গৃহাভিমুখে চলিলেন। অনেক স্থল অতিক্রম করিয়া তিন জনে পুনরায় নদীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে উপস্থিত হইলে কঙ্কাবতীর মনোহর রূপ মনোহর পরিচ্ছদ দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইল। সকলেই 'ধন্য-ধন্য করিতে লাগিল। সকলেই বলিল,—'আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আমরা কঙ্কাবতী হেন রাণী পাইলাম।"

এক্ষণে একটি মহা ভাবনার বিষয় উপস্থিত হইল। জলচর জীবগণের এখন এই ভাবনা হইল যে, রাণী থাকেন কোথায়? যে সে রাণী নয়, কঙ্কাবতী রাণী! যেরূপ জগৎসুশোভিনী মনোমোহিনী কঙ্কাবতী রাণী, সেইরূপ সুসজ্জিত, অলঙ্কৃত, মনোমোহিত অট্টালিকা চাই। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে সকলে স্থির করিলেন যে, রাণী কঙ্কাবতীর নিমিত্ত মতিমহলই উপযুক্ত স্থান। যাহাকে মতি বলে, তাহাকেই মুক্তা বলে। মুক্তার যথায় উৎপত্তি মুক্তার যথায় স্থিতি, সেই স্থানকে 'মতিমহল' বলে।

রুই প্রভৃতি মৎস্যগণ যোড়হাত করিয়া কঙ্কাবতীকে বলিলেন,—"রাণীধিরাণী মহারাণী। মতিমহল আপনার বাসের উপযুক্ত স্থান, আপনি ঐ মতিমহলে গিয়া বাস করুন।

এইরূপে সসম্ভ্রমে সম্ভাষণ করিয়া মাছেরা কঙ্কাবতীকে একটি ঝিনুক দেখাইয়া দিল। ঝিনুকের ভিতরে মুক্তা হয় বলিয়া ঝিনুকের নাম মতিমহল। কঙ্কাবতী সেই ঝিনুকের ভিতর প্রবেশ করিলেন। ঝিনুকের ভিতর বাস করিয়া কঙ্কাবতী মাছেদের রাণীগিরি করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ – গোয়ালিনী

এইরূপ কিছুদিন যায়। এখন, এক দিন এক গোয়ালিনী নদীতে স্নান করিতে আসিয়াছিল। স্নান করিতে করিতে তাহার পায়ে সেই ঝিনুকটি ঠেকিল। ডুব দিয়া সে

সেই ঝিনুকটি তুলিল। দেখিল যে, চমৎকার ঝিনুক। ঝিনুকটি সে বাড়ী লইয়া গেল; আর আপনার চালের বাতায় গুঁজিয়া রাখিল।

বাহিরের দ্বারে কুলুপ দিয়া গোয়ালিনী প্রতিদিন লোকের বাড়ী দুধ দিতে যায়। কঙ্কাবতী সেই সময় ঝিনুকের ভিতর হইতে বাহির হন। প্রথম দিন ঝিনুকের ভিতর হইতে বাহির হইয়া যেমন তিনি মাটীতে পা দিলেন, তাঁহার রাজবেশ গিয়া একেবারে পুর্ব্ববৎ বেশ হইল। কঙ্কাবতী তাহা দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্য হইলেন। প্রতিদিন ঝিনুকের ভিতর হইতে বাহির হইয়া কঙ্কাবতী, গোয়ালিনীর সমুদয় কাজ-কর্ম্ম সারিয়া রাখেন। ঘর-দ্বার পরিষ্কার করেন, বাসন-কোষণ মাজেন, ভাত ব্যঞ্জন রাঁধেন, আপনি খান আর গোয়ালিনীর জন্য ভাত বাড়িয়া রাখেন।

বাড়ী আসিয়া, সেই সব দেখিয়া, গোয়ালিনী বড়ই আশ্চর্য্য হয়। গোয়ালিনী মনে করে,—"এমন করিয়া আমার সমুদয় কাজকর্ম্ম কে করে? দ্বারে যেরূপ চাবি দিয়া যাই সেইরূপ চাবি দেওয়াই থাকে। বাহির হইতে বাড়ীর ভিতর কেহ আসে নাই। তবে এসব কাজকর্ম্ম করে কে?"

ভাবিয়া চিন্তিয়া গোয়ালিনী কিছুই স্থির করিতে পারে না। এইরূপ প্রতিদিন হইতে লাগিল। অবশেষে গোয়ালিনী ভাবিল,—"আমাকে ধরিতে হইবে। প্রতিদিন যে আমার কাজ কর্ম্ম সারিয়া রাখে, তারে ধরিতে হইবে!"

এইরূপ মনে মনে স্থির করিয়া, গোয়ালিনী তার পর দিন সকাল সকাল বাটী ফিরিয়া আসিল। নিঃশব্দে, অতি ধীরে ধীরে দ্বারটি খুলিয়া দেখে যে, বাটীর ভিতর এক পরমা সুন্দরী বালিকা বসিয়া বাসন মাজিতেছে।

গোয়ালিনীকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি কঙ্কাবতী যেই ঝিনুকের ভিতর লুকাইতে গেলেন, আর সে গিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল। ধরিয়া দেখে না কঙ্কাবতী।

আশ্চর্য্য হইয়া গোয়ালিনী জিজ্ঞাসা করিল,—"কঙ্কাবতী! তুমি এখানে ? তুমি এখানে কি করিয়া আসিলে? তুমি না নদীর জলে ডুবিয়া গিয়াছিলে?"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—"হাঁ মাসি! আমি কঙ্কাবতী। আমি নদীর জলে ডুবিয়া গিয়াছিলাম। নদীতে আমি ঐ ঝিনুকের ভিতর ছিলাম। ঝিনুকটি আনিয়া তুমি চালের বাতায় রাখিয়াছ। তাই মাসি! আমি তোমার বাড়ী আসিয়াছি।"

গোয়ালিনী এখন সকল কথা বুঝিল। আশ্চর্য্য হইবার আর কোনও কারণ রহিল না।

কঙ্কাবতী পুনরায় বলিলেন,—"মাসি! আমি যে এখানে আছি, সে কথা এখন তুমি আমার বাড়ীতে বলিও না! শুধু হাতে বাড়ী যাইলে বাবা হয় তো বকিবেন। জলের ভিতর আমি অনেক টাকা দেখিয়াছি। তাহারা দরজীকে দিল, কিন্তু আমাকে দিল না। আমি কত কাঁদিলাম, তবুও তাহারা আমাকে দিল না। দেখি, যদি তাহারা আমাকে কিছু দেয়, তাহা হইলে বাবাকে দিব, বাবা তাহা হইলে বকিবেন না, দাদা গালি দিবেন না।"

গোয়ালিনী বলিল,—"বাছা রে আমার। জনার্দ্দন চৌধুরীকে এই সোনার বাছা বেচিতে

চায়! পোড়ার মুখো বাপ। রও, এইবার দেখা হইলে হয়! গালি দিয়া ভূত ছাড়াইব!”

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—“না মাসি, বাবাকে গালি দিও না। জান তো, মাসি? বাবা দুঃখী মানুষ! ঘরে অনেকগুলি খাইতে। আমাকে না বেচিলে, বাবা, সংসার প্রতিপালন কি করিয়া করিবেন?” —এইরূপ কথা বার্ত্তার পর স্থির হইল যে, কঙ্কাবতী এখন কিছুদিন গোয়ালিনীর ঘরে থাকিবেন। কঙ্কাবতী বলিলেন,—“মাসি! প্রতিদিন তুমি পাড়ার যাও। গ্রামে যে দিন যে ঘটনা হয়, আমাকে আসিয়া বলিও।”

গোয়ালিনীর ঘরে কঙ্কাবতী বাস করিতে লাগিলেন। গ্রামে যে দিন যেখানে যাহা হয়, গোয়ালিনী আসিয়া তাঁহাকে বলে। এক দিন গোয়ালিনী আসিয়া বলিল,—“আহা! খেতুর মা'র বড় অসুখ! খেতুর মা এবার বাঁচেন কি না!”

অতি কাতরভাবে, কাঁদ-কাঁদ হইয়া, কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—“কি হইয়াছে, মাসি? তাঁর কি হইয়াছে?”

গোয়ালিনী উত্তর করিল,—“শুনিলাম, তাঁহার জ্বর-বিকার হইয়াছে। খেতু বৈদ্য ডাকিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু বৈদ্য আসেন নাই। বৈদ্য বলিয়াছেন,—“তোমার বাটীতে চিকিৎসা করিতে গিয়া, শেষে জাতিটি হারাইব না কি?”

কঙ্কাবতী বলিলেন,—“মাসি! তিনি আমাকে বড় ভালবাসেন। আমার আপনার মা যেরূপ, তিনিও আমার সেইরূপ। তাঁর অসময়ে আমি কিছু করিতে পারিলাম না, সে জন্য বড় দুঃখ মনে রহিল।” —এই বলিয়া কঙ্কাবতী কাঁদিতে লাগিলেন।

তাহার পরদিন অতি প্রত্যুষে কঙ্কাবতী বলিলেন,—“মাসি! আজ একটু সকাল সকাল তুমি পাড়ায় যাও। শীঘ্র ফিরিয়া আসিয়া আমাকে বল, তিনি কেমন আছেন।”

গোয়ালিনী সকাল সকাল পাড়ায় যাইল, সকাল সকাল ফিরিয়া আসিয়া, কঙ্কাবতীকে বলিল,—“আহা! বড় দুঃখের কথা! খেতুর মা নাই। খেতুর মা মারা গিয়াছেন। মাকে ঘাটে লইয়া যাইবার নিমিত্ত, খেতু দ্বার দ্বার ঘুরিতেছেন, কিন্তু কেহই আসিতেছে না। সকলেই বলিতেছে,—“তুমি বরখ খাইয়াছ, তোমার জাতি গিয়াছে; তোমার মাকে ঘাটে লইয়া যাইলে আমাদের জাতি যাইবে।” ষাঁড়েশ্বর চক্রবর্ত্তী, গোবর্দ্ধন শিরোমণি, আর কঙ্কাবতী! তোমার বাপ্ এই তিনজনে সকলকে মানা, করিয়া বেড়াইতেছেন, যেন কেহ না যায়।“

এই সংবাদ শুনিয়া কঙ্কাবতী একেবারে শুইয়া পড়িলেন। অবিশ্রান্ত কাঁদিতে লাগিলেন। গোয়ালিনী তাঁহাকে কত বুঝাইল। গোয়ালিনী কত বলিল,—“কঙ্কাবতী! চুপ কর। কঙ্কাবতী! উঠ, খাও।” কঙ্কাবতী উঠিলেন না, সে দিন রাঁধিলেন না, খাইলেন না। মাটীতে পড়িয়া কেবল কাঁদিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যা বেলা কঙ্কাবতী বলিলেন,—“মাসি! তুমি একবার পাড়ায় যাও। দেখ গিয়া সেখানে কি হইতেছে। শীঘ্র আসিয়া আমাকে বল।”

গোয়ালিনী পুনরায় পাড়ায় যাইল। একটু রাত্রি হইল, তবুও গোয়ালিনী ফিরিল না। একপ্রহর রাত্রি হইল, তবুও গোয়ালিনী ফিরিল না। মাটিতে শুইয়া পথ পানে চাহিয়া,

কঙ্কাবতী কেবল কাঁদিতে লাগিলেন।

এক প্রহর রাত্রির পর গোয়ালিনী ফিরিয়া আসিল।

গোয়ালিনী বলিল,—"কঙ্কাবতী! বড়ই দুঃখের কথা শুনিয়া আসিলাম। খেতুর মাকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত কেহই আসেন নাই। খেতু করেন কি? সন্ধ্যা হইলে কাঠ আলনি মাথায় করিয়া প্রথম ঘাটে রাখিয়া আসিলেন! আচ্ছা! একেবারে অতগুলি কাঠ লইয়া যাইতে পারিবেন কেন? তিন বার কাঠ লইয়া তাঁকে ঘাটে যাইতে হইয়াছে। এখন তিনি মাকে ঘাটে লইয়া যাইতেছেন। একেলা আপনি কোলে করিয়া মাকে লইয়া যাইতেছেন। মরিলে লোক ভারি হয়। তাতে শ্মশান ঘাট তো আর কম দূর নয়! খানিক দূর লইয়া যান, তারপর আর পারেন না মাকে মাটীতে শয়ন করান, একটু বিশ্রাম করিয়া পুনরায় লইয়া যান, এইরূপ করিয়া তিনি এখন মাকে ঘাটে লইয়া যাইতেছেন। অন্ধকার রাত্রি। একটু দূরে দূরে থাকিয়া আমি এই সব দেখিয়া আসিলাম।"

এই কথা শুনিয়া কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত কঙ্কাবতী বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে উঠিলেন, ধীরে ধীরে গিয়া বাটীর দ্বারটি খুলিলেন, বাটীর বাহিরে যাইয়া উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িলেন।

গোয়ালিনী বলিল,—"কঙ্কাবতী কোথায় যাও? কঙ্কাবতী, কোথায় যাও?"

আর কোথায় যাও! আজ কঙ্কাবতী রাণীধিরাণী, মহারাণী নন—আজ কঙ্কাবতী পাগলিনী। মনোহর রাজবেশে আজ কঙ্কাবতী সুসজ্জিত নন, আজ কঙ্কাবতী গোয়ালিনীর একখানি সামান্য মলিন বসনপরিধৃতা। কঙ্কাবতীর মুখ আজ উজ্জ্বল প্রভাবসম্পন্ন নয়—আজ কঙ্কাবতীর মুখ ঘনঘটায় আচ্ছাদিত। —বাটীর বাহির হইয়া, মলিন বেশে, আলুলায়িত কেশে, পাগলিনী সেই শ্মশানের দিকে ছুটিলেন। "কঙ্কাবতী শুন, কঙ্কাবতী শুন!" এই কথা বলিতে বলিতে কিয়দ্দূর গোয়ালিনী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। কিন্তু কঙ্কাবতী তাহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না, একবার ফিরিয়া দেখিলেন না।

রাহুগ্রস্ত পূর্ণশশী অবিলম্বেই নিশার তমোরাশিতে মিশিয়া যাইল। গোয়ালিনী আর তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। কাঁদিতে কাঁদিতে গোয়ালিনী বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ – শ্মশান

দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া, পাগলিনী এখন শ্মশানের দিকে দৌড়িলেন। কিছুদূর যাইয়া দেখিতে পাইলেন, পথে খেতু মাতাকে রাখিয়াছেন, মা'র মস্তকটি আপনার কোলে লইয়াছেন; মা'র কাছে বসিয়া মা'র মুখ দেখিতেছেন আর কাঁদিতেছেন। অবিরলধারায় অশ্রুবারি তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে বিগলিত হইতেছে।

কঙ্কাবতী নিঃশব্দে তাঁহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন। অন্ধকার রাত্রি, সেই জন্য খেতু তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না।

মা'র মুখপানে চাহিয়া খেতু বলিলেন,—"মা! তুমিও চলিলে? যখন কঙ্কাবতী গেল, তখন-মনে করিয়াছিলাম, এ ছার জীবন আর রাখিব না। কেবল, মা, তোমার মুখ পানে

চাহিয়া বাঁচিয়া ছিলাম। এখন, মা, তুমিও গেলে? তবে আর আমার এ প্রাণে কাজ কি? কিসের জন্য কার জন্য বাঁচিয়া থাকিব? এ সংসারে থাকা কিছু নয়। এখানে বড় পাপ, বড় দুঃখ? বেশ করিয়াছ, কঙ্কাবতী, এখান হইতে গিয়াছ! বেশ করিলে, মা! যে, এ পাপ সংসার হইতে তুমিও চলিলে! চল, মা! যেখানে কঙ্কাবতী, যেখানে তুমি, সেইখানে আমিও শীঘ্র যাইব। এই সসাগরা পৃথিবী আজ আমার পক্ষে শ্মশান ভূমি হইল। এ সংসারে আর আমার কেহ নাই। চল, মা, শীঘ্রই

তোমাদিগের নিকট গিয়া প্রাণের এ দারুণ জ্বালা জুড়াইব। মা! কঙ্কাবতীকে বলিও, শীঘ্রই গিয়া আমি তাহার সহিত মিলিব।" কঙ্কাবতী আসিয়া অধোমুখে খেতুর সম্মুখে দাঁড়াইলেন। খেতু চমকিত হইলেন, অন্ধকারে চিনিতে পারিলেন না।

কঙ্কাবতী মা'র পায়ের নিকট গিয়া বসিলেন। মা'র পা দুখানি আপনার কোলের উপর তুলিয়া লইলেন। সেই পায়ের উপর আপনার মাথা রাখিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন।

ঘোরতর বিস্মিত হইয়া, অনেকক্ষণ ধরিয়া, খেতু তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

অবশেষে খেতু বলিলেন,—"কঙ্কাবতী! জ্ঞান হইয়া পর্য্যন্ত এ পৃথিবীতে কখনও কাহারও অনিষ্ট-চিন্তা করি নাই, সর্ব্বদা সকলের ইষ্টচিন্তাই করিয়াছি। জানিয়া শুনিয়া কখনও মিথ্যা কথা বলি নাই, প্রবঞ্চনা কখনও করি নাই, কোনওরূপ দুষ্কর্ম কখনও করি নাই। তবে কি মহাপাপের জন্য আজ আমার এ ভীষণ দণ্ড আজ এ ঘোর নরক! বিনা দোষে কত দুঃখ পাইয়াছি, তাহা সহিয়াছি। গ্রামে লোকে বিধিমত উৎপীড়ন করিল, তাহাও সহিলাম, প্রাণের পুতমি তুমি কঙ্কাবতী জলে ডুবিয়া মরিলে, তাহাও সহিলাম; প্রাণের অধিক মা আমার আজ মরিলেন, তাহাও সহিলাম; কিন্তু এই সঙ্কট সময়ে তুমি যে আমার শত্রুতা সাধিবে, স্বপ্নেও তাহা কখনও ভাবি নাই! মাতার মৃত-দেহ একেলা আমি আর বহিতে পারিতেছি না। মাতার পীড়ার জন্য আজ তিন দিন আমার আহার নাই, নিদ্রা নাই। আজ তিন দিন এক বিন্দু জল পর্য্যন্ত আমি খাই নাই। শরীরে আমার শক্তি নাই, শরীর আমার অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। আর একটি পা-ও আমি মাকে লইয়া যাইতে পারিতেছি না। কি করি, ভাবিয়া আকুল হইয়াছি। এমন সময়ে কি না, তুমি কঙ্কাবতী, ভূত হইয়া আমাকে ভয় দেখাইতে আসিলে! দুঃখের এইবার আমার চারি পো হইল! এ দুঃখ আমি আর সহিতে পারি না।

কাঁদ কাঁদ স্বরে অধোমুখে, কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—"আমি ভূত হই নাই, আমি মরি নাই, আমি জীবিত আছি।"

আশ্চর্য্য হইয়া খেতু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি জীবিত আছ? জলে ডুবিয়া গেলে, তোমায় আমরা কত অনুসন্ধান করিলাম। তোমাকে খুঁজিয়া পাইলাম না। মনে করিলাম, আমিও মরি। মরিবার নিমিত্ত জলে ঝাঁপ দিলাম। সাঁতার জানিয়াও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া জলের ভিতর রহিলাম, কিছুতেই উঠিলাম না। তাহার পর জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলাম। অজ্ঞান অবস্থায় জেলেরা আমাকে তুলিল, তাহারা আমাকে বাঁচাইল। জ্ঞান হইয়া দেখিলাম,

মা আমার কাঁদিতেছেন। মা'র মুখপানে চাহিয়া প্রাণ ধরিয়া রহিলাম। কঙ্কাবতী, তুমি কি করিয়া বাঁচিলে?"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—"সে অনেক কথা। সকল কথা পরে বলিব। আমি গোয়ালিনী মাসীর বাটীতে ছিলাম। এই ঘোর বিপদের কথা সেইখানে শুনিলাম। আমি থাকিতে পারিলাম না, আমি ছুটিয়া আসিলাম। এক্ষণে চল, মাতাকে ঘাটে লইয়া যাই। তুমি একদিক্ ধর, আমি একদিক্ ধরি।" —এই প্রকারে কঙ্কাবতী ও খেতু মাকে ঘাটে লইয়া যাইলেন। সেখানে গিয়া দুই জনে চিতা সাজাইলেন। মাকে উত্তমরূপে স্নান করাইলেন। নুতন কাপড় পরাইলেন। তাহার পর চিতার উপর তুলিলেন। চিতার উপর তুলিয়া দুইজনে মায়ের পা ধরিয়া অনেকক্ষণ কাঁদিলেন।

খেতু বলিলেন,—"মা! তুমি স্বর্গে চলিলে। দীনহীন তোমার এই পুত্রকে আশীর্ব্বাদ কর, ধর্ম্মপথ হইতে যেন কখনও বিচলিত না হই। সত্য যেন আমার ধ্যান, সত্য যেন আমার জ্ঞান, সত্য যেন আমার ক্রিয়া হয়। ধনলালসায়, কি সুখ-লালসায়, কি যশোলালসায় যেন সত্যপথ, ধর্ম্মপথ কখনও পরিত্যাগ না করি। অজ্ঞান কপটচারী জনসমাজের ভ্রূকুটি-ভঙ্গিমায় ভীরু নরাধমদিগের মত কম্পিত হইয়া, যেন কর্ত্তব্যে কখনও পরাঙমুখ না হই। হে মা! প্রাণ যায় —যাউক! পুরুষ হইয়া যেন কখনও কাপুরুষ না হই।"

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"মা! তুমি স্বর্গে চলিলে, তোমার এই অনাথিনী কঙ্কাবতীর প্রতি একবার কৃপাদৃষ্টি কর। জাগরণে, শয়নে, স্বপনে, মা যেন ধর্ম্মে আমার মতি হয়, যেন ধর্ম্মে আমার গতি হয়। অধিক আর, মা তোমাকে কি বলিব! কঙ্কাবতীর মনের কথা তুমি সকলি জান। কঙ্কাবতীর প্রাণ রক্ষা হউক না হউক, কঙ্কাবতীর ধর্ম্ম রক্ষা হইবে। যদি এ-দিকের সূর্য্য ও-দিকে উদয় হন, যদি মহাপ্রলয় উপস্থিত হয়, তবুও কঙ্কাবতী যদি সতী হয়, কঙ্কাবতীকে কেহ ধর্ম্মচ্যুত করিতে পারিবে না। মনে মনে চিরকাল এই প্রতিজ্ঞা রহিয়াছে, আজ আবার, মা, তোমার পা ছুঁইয়া মুখ ফুটিয়া সেই প্রতিজ্ঞা করিলাম। হে মা! তোমার কঙ্কাবতী এখন পাগলিনী, তোমার কঙ্কাবতীর অপরাধ ক্ষমা কর।"

খেতু বলিলেন,—"কঙ্কাবতী! কি করিয়া চিতায় আগুন দিই? জনমের মত কি করিয়া মাকে বিদায় করি! আর মাকে দেখিতে পাইব না। এস কঙ্কাবতী! ভাল করিয়া আর একবার মা'র মুখখানি দেখিয়া লই!"

মুখের নিকট দাঁড়াইয়া, অনেকক্ষণ ধরিয়া খেতু মা'র চুলগুলি নাড়িতে লাগিলেন। কঙ্কাবতী পাশে দাঁড়াইয়া কেবল কাঁদিতে লাগিলেন।

খেতু বলিলেন,—"দেখ কঙ্কাবতী! কি স্থির শান্তিময়ী মুখশ্রী! মা যেন পরম সুখে নিদ্রা যাইতেছেন। তোমার কি মনে পড়ে, কঙ্কাবতী! ছেলে বেলা যখন তুমি বিড়াল লইয়া খেলা করিতে? প্রথম ভাগ বর্ণপরিচয় যখন তুমি পড়িতে পারিতে না? আমি তোমাকে কত বকিতাম, আর মা আমার উপর রাগ করিতেন। মা আমাকে যেরূপ ভালবাসিতেন, সেই রূপ তোমাকেও ভালবাসিতেন। আহা! কঙ্কাবতী! কি মা আমরা হারাইলাম!"

এই প্রকারে নানারূপ খেদ করিয়া, অবশেষে চিতা প্রদক্ষিণ করিয়া, খেতু অগ্নিকার্য্য করিলেন। চিতা ধূধূ করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

কঙ্কাবতী ও খেতু নিকটে বসিয়া মাঝে মাঝে কাঁদেন, মাঝে মাঝে খেদ করেন, আর মাঝে মাঝে অন্যান্য কথাবার্ত্তা কন। কি করিয়া জল হইতে রক্ষা পাইয়াছেন, কঙ্কাবতী সেই সমুদয় কথা খেতুকে বলিলেন। খেতু মনে করিলেন, নানা দুঃখে কঙ্কাবতীর চিত্ত বিকৃত হইয়াছে। দুঃখের উপর দুঃখ, এ আবার এক নূতন দুঃখ তাঁহার মনে উপস্থিত হইল। মনের কথা খেতু কিন্তু কিছু প্রকাশ করিলেন না।

মা'র সৎকার হইয়া যাইলে, দুই জনে নদীনে স্নান করিলেন।

তাহার পর খেতু বলিলেন,—"কঙ্কাবতী! চল, তোমাকে বাড়ীতে রাখিয়া আসি।"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—"পুনরায় আমি কি করিয়া বাড়ী যাই? বাবা আমাকে তিরস্কার করিবেন, দাদা আমাকে গালি দিবেন! আমি জলের ভিতর গিয়া মাছেদের কাছে থাকি, না হয়, গোয়ালিনী মাসীর ঘরে যাই।"

খেতু বলিলেন,—"কঙ্কাবতী! সে কাজ করিতে নাই। তোমাকে বাড়ী যাইতে হইবে। যতই কেন দুঃখ পাও না, ঘরে থাকিয়া সহ্য করিতে হইবে। মনোযোগ করিয়া আমার কথা শুন! আর এখন বালিকার মত কথা কহিলে চলিবে না। ভীষণ মহাসাগরবক্ষে উন্মত্ত তরঙ্গ-তাড়িত জীর্ণ-দেহ সামান্য দুইখানি তরণীর ন্যায়, আমরা দুই জনে এই সংসার কর্ত্তৃক তাড়িত হইতেছি। তাই কঙ্কাবতী! বুদ্ধি বিবেচনার সহিত আমাদের কথা বলিতে হইবে, বুদ্ধি বিবেচনার সহিত আমাদের কাজ করিতে হইবে। মাতার পদ-যুগল ধরিয়া আজ রাত্রিতে যেরূপ ধীর জ্ঞান গম্ভীর বাক্য তোমার মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল এখন হইতে সেইরূপ কথা আমি তোমার মুখে শুনিতে চাই। ভাবী ঘটনার উপর মনুষ্যদিগের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব না থাকুক, অনেক পরিমাণে আছে। তা না হইলে ভাবী ফলের প্রতীক্ষায় কৃষক কেন ক্ষেত্রে কর্ম্ম বীজ বপন করিবে? উদ্যম উৎসাহের সহিত মনুষ্য এই সংসারক্ষেত্রে কর্ম্ম-বীজ কেন রোপন করিবে? মনুষ্যের অজ্ঞানবশতঃ ভাবী ঘটনার উপর কর্ত্তৃত্বের ইতর-বিশেষ হইয়া থাকে। এই ভাবী ফলপ্রতিক্ষাই মনুষ্যের আশা ভরসা। সেই আসা ভরসাকে সহায় করিয়া আজ আমি তোমার নিকট হইতে বিদায় হইতেছি। তুমি বাড়ী চল, তোমাকে বাড়ীতে রাখিয়া আসি। বাটীর বাহিরে তুমি পা রাখিয়াছ বলিয়া জনার্দ্দন চৌধুরী আর তোমাকে বিবাহ করিবেন না। লাঞ্ছনা করেন এক বৎসর কাল পর্য্যন্ত সহ্য করিয়া থাক, শুনিয়াছি পশ্চিম অঞ্চলে অধিক বেতনে কর্ম্ম পাওয়া যায়। আমি এক্ষণে পশ্চিমে চলিলাম। কাশীতে মাতার শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সমাধা করিয়া, কর্ম্মের অনুসন্ধান করিব। এক বৎসরের মধ্যে যাহা কিছু অর্থসঞ্চয় করিতে পারি, তাহা অনিয়া তোমার পিতাকে দিব। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তখন তোমার পিতা আহ্লাদের সহিত আমার প্রার্থনা পরিপূর্ণ করিবেন। কেবল এক বৎসর কঙ্কাবতী! দেখিতে দেখিতে যাইবে। দুঃখে হউক, সুখে হউক ঘরে থাকিয়া, কোনও রূপে এই এক বৎসর কাল অতিবাহিত কর।"

তখন কঙ্কাবতী বলিলেন,—"তুমি আমাকে যেরূপ আজ্ঞা করিবে, আমি সেইরূপ করিব।" —দুই জনে ধীরে ধীরে গ্রামাভিমুখে চলিলেন। রাত্রি সম্পূর্ণ প্রভাত হয় নাই, এমন সময় দুই জনে তনু রায়ের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

খেতু বলিলেন,—"কঙ্কাবতী! তবে এখন আমি যাই। সাবধানে থাকিবে।"

'যাই যাই' করিয়াও খেতু যাইতে পারেন না। যাইতে খেতুর পা সরে না। দুই জনের চক্ষুর জলে তনু রায়ের দ্বার ভিজিয়া গেল।

একবার সাহসে ভর করিয়া খেতু কিছুদূর যাইলেন, কিন্তু ফিরিয়া আসিলেন, আর বলিলেন,—"কঙ্কাবতী! একটি কথা তোমাকে ভাল করিয়া বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। কথাটি এই যে, অতি সাবধানে থাকিও।"

আবার কিছুক্ষণ ধরিয়া দুইজনে কথা কহিতে লাগিলেন। ক্রমে প্রভাত হইল, চারি দিকে লোকের সাড়া শব্দ হইতে লাগিল।

তখন খেতু বলিলেন,—"কঙ্কাবতী! এইবার অতি নিশ্চয় যাই। অতি সাবধানে থাকিবে। কাঁদিও কাটিও না। যদি বাঁচিয়া থাকি, তো এক বৎসর পরে নিশ্চয় আমি আসিব। তখন আমাদের সকল দুঃখ ঘুচিবে! তোমার মাকে সকল কথা বলিও অন্য কাহাকেও কিছু বলিবার আবশ্যক নাই।"

খেতু এইবার চলিয়া গেলেন। যতদূর দেখা যাইল, ততদূর কঙ্কাবতী সেই দিক্ পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর, চক্ষুর জলে তিনি পৃথিবী অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন। জ্ঞানশূন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইবার ভয়ে, দ্বারের পাশে প্রাচীরে তিনি ঠেশ দিয়া —দাঁড়াইলেন। খেতু ফিরিয়া দেখিলেন যে, চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় কঙ্কাবতী দাঁড়াইয়া আছেন! তাহার পর আর দেখিতে পাইলেন না।

খেতু ভাবিলেন,—"হা জগদীশ্বর! মনুষ্য হৃদয় তুমি কি পাষাণ দিয়াই নির্ম্মাণ করিয়াছে! সে ঐ প্রভাবহীনা মলিনা কাঞ্চন-প্রতিমাকে ওখানে ছাড়িয়া এখানে আমার হৃদয় এখনও চূর্ণ বিচূর্ণ হয় নাই।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ – বাঘ

খেতু চলিয়া যাইলে, দ্বারের পাশে প্রাচীরে ঠেশ দিয়া, অনেকক্ষণ ধরিয়া কঙ্কাবতী কাঁদিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দ্বার ঠেলিতে তাঁহার সাহস হইল না। অবশেষে সাহসে বুক বাঁধিয়া আস্তে আস্তে তিনি দ্বার ঠেলিতে লাগিলেন।

শয্যা হইতে উঠিয়া বাটীর ভিতর বসিয়া তনু রায় তামাক খাইতেছিলেন। কে দ্বার ঠেলিতেছে দেখিবার নিমিত্ত তিনি দ্বার খুলিলেন। দেখিলেন, কঙ্কাবতী!

কঙ্কাবতীকে দেখিয়া তিনি বলিলেন,—"এ কি? কঙ্কাবতী যে! তুমি মর নাই তাই বলি তোমার কি আর মৃত্যু আছে! এতদিন কোথায় ছিলে? আজ কোথা হইতে আসিলে? এতদিন যেখানে ছিলে, পুনরায় সেইখানে যাও। আমার ঘরে তোমার আর স্থান হইবে না।

কঙ্কাবতী বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন না! সেই মলিন আর্দ্রবস্ত্রপরিহিতা থাকিয়া

দ্বারের পাশে দাঁড়াইয়া কেবল কাঁদিতে লাগিলেন। পিতার কথায় কোনও উত্তর করিলেন না। পিতার তর্জ্জন-গর্জ্জনের শব্দ পাইয়া পুত্রও সত্বর সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ভাই বলিলেন,—"এই যে, পাপীয়সী কালামুখ নিয়ে ফের এখানে এসেছেন! যাবেন আর কোন্ চুলো! কিন্তু তা হবে না—এ বাড়ী হইতে তোমার অন্ন উঠিয়াছে। এখন আর মনে করিও না যে, জনার্দ্দন চৌধুরী তোমাকে বিবাহ করিবে! বাধা! পাড়ার লোক জানিতে না জানিতে কুলাঙ্গারী পাপীয়সীকে দূর করিয়া দাও।"

বচসা শুনিয়া কঙ্কাবতীর দুই ভগিনী বাহিরে আসিলেন। অবশেষে মা'ও আসিলেন। মা দেখিলেন দুঃখিনী কঙ্কাবতী দীন দরিদ্র মলিন বেশে দ্বারের পাশে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছেন। স্বামী ও পুত্র তাঁহাকে বিধিমতে ভর্ৎসনা করিয়া তাড়াইয়া দিতেছেন।

কঙ্কাবতীর মা কাহাকেও কিছু বলিলেন না স্বামী কি পুত্র কাহারও পানে একবার চাহিলেন না। কঙ্কাবতীর বক্ষঃস্থল একবার আপনার বক্ষঃস্থলে রাখিয়া গদগদ মৃদু ভাষে বলিলেন,—"এস, আমার মা এস! দুঃখিনী মাকে ভুলিয়া এতদিন কোথা ছিলে মা?"

মা'র বুকে মাথা রাখিয়া কঙ্কাবতীর প্রাণ জুড়াইল। অন্তরে অন্তরে যে খরতর অগ্নি তাঁহাকে দহন করিতেছিল, সে অগ্নি এখন অনেকটা নির্বাণ হইল।

তাহার পর, মা, কঙ্কীবতীর একটি হাত ধরিলেন! অপর হাত দিয়া আর একটি মেয়ের হাত ধরিলেন। স্বামী ও পুত্রকে তখন সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"তোমরা কঙ্কাবতীকে দূর করিয়া দিবে? কঙ্কাবতীকে ঘরে স্থান দিবে না? বটে! এ দুধের বাছা কি যেন দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে যে, মা বাপের কাছে ইহা প্রদান হইবে না? মান সম্ভ্রম পুণ্য ধর্ম্ম লইয়া তোমরা এখানে সুখে স্বচ্ছন্দে থাক। আমরা চারি জন হতভাগিনী এখান হইতে বিদায় হই। এস, মা, আমরা সকলে এখান হইতে যাই। দ্বারে দ্বারে আমরা মুষ্টি ভিক্ষা করিয়া খাইব তবু এই মুনি-ঋষিদের অন্ন আর খাইব না!"

তিন কন্যা ও মাতা, সত্য সত্যই বাটী হইতে প্রস্থান করিবার উপক্রম করিলেন। তখন তনু রায়ের মনে ভয় হইল।

তনু রায় বলিলেন,—"গৃহিণী! কর কি! তুমিও যে পাগল হইলে দেখিতেছি? এখন এ মেয়ে লইয়া আমি করি কি? এ মেয়ের কি আর বিবাহ হইবে? সেই জন্য বলি ওর যেখানে দুই চক্ষু যায় সেইখানে ও যাক্ ওঁর কথায় আর আমাদের থাকিয়া কাজ নাই।"

তনু রায়ের স্ত্রী বলিলেন,—"কঙ্কাবতীর বিবাহ হইবে না? আচ্ছা সে ভাবনা তোমার ভাবিয়া কাজ নাই। সে ভাবনা আমি ভাবিব। কিন্তু তোমার তো প্রকৃত সে চিন্তা নয়? তোমার চিন্তা যে জনার্দ্দন চৌধুরীর টাকাগুলি হাত-ছাড়া হইল। যাহা হউক, তোমার গলগ্রহ হইয়া আমরা থাকিব না। যেখানে আমাদের দু'চক্ষু যায়, আমরা চারিজনে সেইখানে যাইব। মেয়ে তিনটির হাত ধরিয়া দ্বারে দ্বারে আমি ভিক্ষা করিব।"

স্ত্রীর এইরূপ উগ্র মূর্ত্তি দেখিয়া তনু রায় ভাবিলেন,—"ঘোর বিপদ্!" নানারূপ মিষ্ট বচন বলিয়া স্ত্রীকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। স্ত্রীর অনেকটা রাগ পড়িয়া আসিলে শেষে

তনু রায় বলিলেন,—"দেখ্! পাগলের মত কথা বলিও না। যাও, বাড়ীর ভিতর যাও। যাও, মা, কঙ্কাবতী বাড়ীর ভিতর যাও!"

মা কঙ্কাবতী ও ভগিনী দুইটি বাটীর ভিতর যাইলেন। কঙ্কাবতী পুনরায় বাপ মা'র নিকট রহিলেন। বাটী পরিত্যাগ করিয়া যাহা যাহা ঘটনা হইয়াছিল, আদ্যোপান্ত সমুদয় কথা কঙ্কাবতী মাকে বলিলেন,—কঙ্কাবতীর মা, এ সমুদয় কথা অন্য কাহাকেও কিছু বলিলেন না। –কঙ্কাবতীকে তনু রায় সর্ব্বদাই গঞ্জনা দেন। কঙ্কাবতী সে কথায় কোনও উত্তর করেন না, আধোবদনে চুপ করিয়া শুনেন।

তনু রায় বলেন,—"এমন রাজা হেন পাত্রের সহিত তোমার বিবাহ স্থির করিলাম। তোমার কপালে সুখ নাই তা আমি কি করিব? জনার্দ্দন চৌধুরীকে কত বুঝাইয়া বলিলাম, কিন্তু তিনি আর বিবাহ করিবেন না। এখন এ কন্যা লইয়া আমি করি কি? পঞ্চাশ টাকা দিয়াও কেহ এখন ইহাকে বিবাহ করিতে চায় না।"

স্ত্রী-পুরুষে মাঝে মাঝে এই কথা লইয়া বিবাদ হয়। স্ত্রী বলেন,—"কঙ্কাবতীর বিবাহের জন্য তোমাকে কোনও চিন্তা করিতে হইবে না। এক বৎসর কাল চুপ করিয়া থাক। কঙ্কাবতীর বিবাহ আমি নিজে দিব। যদি আমার কথা না শুন যদি অধিক বাড়াবাড়ি কর তাহা হইলে মেয়ে তিনটির হাত ধরিয়া তোমার বাটী হইতে চলিয়া যাইব।"

তনু রায় বৃদ্ধ হইয়াছেন। স্ত্রীকে এখন তিনি ভয় করেন, এখন স্ত্রীকে যা ইচ্ছা তাই বলিতে বড় সাহস করেন না। –এইরূপে দেখিতে দেখিতে এক বৎসর কাটিয়া গেল। খেতুর দেখা নাই, খেতুর কোনও সংবাদ নেই, কঙ্কাবতীর মুখ মবিন হইতে মলিনতর হইতে লাগিল, কঙ্কাবতীর মার মনে ঘোর চিন্তার উদয় হইল। কঙ্কাবতীর বিবাহ বিষয়ে স্বামী কোনও কথা বলিলে, এখন আর তিনি পূর্ব্বের ন্যায় দম্ভের সহিত উত্তর করিতে সাহস করেন না। বৎসর শেষ হইয়া যতই দিন গত হইতে লাগিল, তনু রায়ের তিরস্কার ততই বাড়িতে লাগিল। কঙ্কাবতীর মা অপ্রতিভ হইয়া থাকেন, বিশেষ কোনও উত্তর দিতে পারেন না। --এক দিন সন্ধ্যার পর তনু রায় বলিলেন,—"এত বড় মেয়ে হইল, এখন এ মেয়ে লইয়া আমি করি কি? সুপাত্র ছাড়িয়া কুপাত্র মিলাও দুর্ঘট হইল।"

কঙ্কাবতীর মা উত্তর করিলেন,—"আজ এক বৎসর অপেক্ষা করিলে, আর অল্প দিন অপেক্ষা কর। সুপাত্র শীঘ্রই মিলিবে।"

তনু রায় বলিলেন,—'এক বৎসর ধরিয়া তুমি এই কথা বলিতেছ। কোথা হইতে তোমার সুপাত্র আসিবে, তাহা বুঝিতে পারি না। তোমার কথা শুনিয়া আমি এই বিপদে পড়িলাম। সে দিন যদি কুলাঙ্গারীকে দূর করিয়া দিতাম, তাহা হইলে আজ আর আমাকে এ বিপদে পড়িতে হইত না। এখন দেখিতেছি, সে কালের রাজারা যা করিতেন, আমাকেও তাই করিতে হইবে। ব্রাহ্মণ না হয়, চণ্ডালের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে হইবে। মনুষ্য না হয় জন্তুর সহিত কন্যার বিবাহ দিতে হইবে। রাগে আমার সর্ব্ব শরীর জ্বলিয়া যাইতেছে। আমি সত্য বলিতেছি, যদি এই মুহূর্ত্তে বনের বাঘ আসিয়া কঙ্কাবতীকে বিবাহ করিতে চায়,

তো আমি তাহার সহিত কঙ্কাবতীর বিবাহ দিই। যদি এই মুহূর্ত্তে, বাঘ আসিয়া বলে,—'রায় মহাশয়! দ্বার খুলিয়া দিন', তো আমি তৎক্ষণাৎ দ্বার খুলিয়া দিই।"

এই কথা বলিতে না বলিতে, 'বাহিরে ভীষণ গৰ্জ্জনের শব্দ হইল। গৰ্জ্জন করিয়া কে বলিল,—"রায় মহাশয়! তবে কি দ্বার খুলিয়া দিবেন?"

সেই শব্দ শুনিয়া তনু রায় ভয় পাইলেন! কিসে এরূপ গৰ্জ্জন করিতেছে, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। দেখিবার নিমিত্ত আস্তে আস্তে দ্বার খুলিলেন। দ্বার খুলিয়া দেখেন না, কী সর্ব্বনাশ! এক প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র বাহিরে দণ্ডায়মান!

ব্যাঘ্র বলিলেন,—"রায় মহাশয়! এই মাত্র আপনি সত্য করিলেন যে, ব্যাঘ্র আসিয়া যদি কঙ্কাবতীকে বিবাহ করিতে চায়, তাহা হইলে ব্যাঘ্রের সহিত আপনি কঙ্কাবতীর বিবাহ দিবেন। তাই আমি আসিয়াছি, এক্ষণে আমার সহিত কঙ্কাবতীর বিবাহ দিন; না দিলে এই মুহূর্ত্তে আপনাকে খাইয়া ফেলিব।"

তনু রায় অতি ভীত হইয়াছিলেন সত্য ভয়ে এক প্রকার হতজ্ঞান হইয়াছিলেন সত্য কিন্তু তবুও আপনার ব্যবসায়টি বিস্মরণ হইতে পারেন নাই।

তনু রায় বলিলেন,—"যখন কথা দিয়াছি, তখন অবশ্যই আপনার সহিত কঙ্কাবতীর বিবাহ দিব। আমার কথার নড়-চড় নাই। মুখ হইতে একবার কথা বাহির করিলে সে কথা আর আমি কখনও অন্যথা করিও না। তবে আমার নিয়ম তো জানেন? আমার কুল-ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া যদি আপনি বিবাহ করিতে পারেন তো করুন, তাহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই।"

ব্যাঘ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কত হইলে আপনার কুল ধর্ম্ম হয়?"

তনু রায় বলিলেন,—"আমি সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণ। সন্ধ্যা-আহ্নিক না করিয়া জল খাই না। এরূপ ব্রাহ্মণের জামাতা হওয়া পরম সৌভাগ্যের কথা। আমার জামাতা হইতে যদি মহাশয়ের অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে আপনাকে আমার সম্মান রক্ষা করিতে হইবে। মহাশয়কে কিঞ্চিৎ অর্থব্যয় করিতে হইবে!"

ব্যাঘ্র উত্তর করিলেন,—"তা বিলক্ষণ জানি! এখন কত টাকা পাইলে মেয়ে বেচিবেন তা বলুন।"

তনু রায় বলিলেন,—"এ গ্রামের জমিদার, মান্য-বর শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন চৌধুরী মহাশয়ের সহিত আমার কন্যার সম্বন্ধ হইয়াছিল; দৈব ঘটনাবশতঃ কার্য্য সমাধা হয় নাই। চৌধুরী মহাশয় নগদ দুই সহস্র টাকা দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি মনুষ্য, ব্রাহ্মণ, স্বজাতি। আপনি তাহার কিছুই নন্; সুতরাং আপনাকে কিছু অধিক দিতে হইবে।"

ব্যাঘ্র বলিলেন,—"বাটীর ভিতর চলুন। আপনাকে আমি এত টাকা দিব যে, আপনি কখনও চক্ষে দেখেন নাই, জীবনে স্বপনে কখনও ভাবেন নাই।"

এই কথা বলিয়া, তৰ্জ্জন গৰ্জ্জন করিতে করিতে ব্যাঘ্র বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন! তনু রায়ের মনে তখন বড় ভয় হইল। তনু রায় ভাবিলেন, এইবার বুঝি সপরিবারে খাইয়া

ফেলে। নিরুপায় হইয়া তিনিও ব্যাঘ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাটীর ভিতর যাইলেন।

বাহিরে ব্যাঘ্রের গর্জ্জন শুনিয়া, এতক্ষণ কঙ্কাবতী, কঙ্কাবতীর মাতা ও ভগিনীগণ ভয়ে মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন। তনু রায়ের পুত্র তখন ঘরে ছিলেন না, বেড়াইতে গিয়াছিলেন। গুণবিশিষ্ট পুত্র,—তাই অনেক রাত্রি না হইলে তিনি বাটী ফিরিয়া আসেন না।

যেখানে কঙ্কাবতী প্রভৃতি বসিয়াছিলেন, ব্যাঘ্র গিয়া সেইখানে উপস্থিত হইলেন। সেইখানে সকলের সম্মুখে তিনি একটি বৃহৎ টাকার তোড়া ফেলিয়া দিলেন।

ব্যাঘ্র বলিলেন,—"খুলিয়া দেখুন, ইহার ভিতর কি আছে!"

তনু রায় তোড়াটি খুলিলেন; দেখিলেন, তাহার ভিতর কেবল মোহর! হাতে করিয়া, চশমা নাকে দিয়া, আলোর কাছে লইয়া, উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, মোহর নয়, প্রকৃত স্বর্ণমুদ্রা! সকলেই আশ্চর্য্য হইলেন যে, এত টাকা বাঘ কোথা হইতে আনিল? তনু রায়ের মনে আনন্দ আর ধরে না।

তনু রায় ভাবিলেন,—"এত দিন পরে এইবার আমি মনের মত জামাই পাইলাম।"

প্রদীপের কাছে লইয়া তনু রায় মোহরগুলি গণিতে বসিলেন।

এই অবসরে, ব্যাঘ্র ধীরে ধীরে কঙ্কাবতী ও কঙ্কাবতীর মাতার নিকট গিয়া বলিলেন,— "কোনও ভয় নাই!" —কঙ্কাবতী ও কঙ্কাবতীর মাতা চমকিত হইলেন। কার সে কণ্ঠস্বর, তাহা তাঁহারা সেই মুহূর্ত্তেই বুঝিতে পারিলেন। সেই কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাঁহাদের প্রাণে সাহস হইল। কেবল সাহস কেন? তাঁহাদের মনে অনির্বচনীয় আনন্দের উদয় হইল। কঙ্কাবতীর মাতা মৃদুভাবে বলিলেন,—"হে ঠাকুর! যেন তাহাই হয়!"

ব্যাঘ্র এই কথা বলিয়া, পুনরায় তনু রায়ের নিকটে গিয়া থাবা পাতিয়া বসিলেন। তোড়ার ভিতর হইতে তনু রায় তিন সহস্র স্বর্ণ-মুদ্রা গণিয়া পাইলেন।

ব্যাঘ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে এখন?"

তনু রায় উত্তর করিলেন,—"এখন আর কি? যখন কথা দিয়াছি, তখন এই রাত্রিতেই আপনার সহিত কঙ্কাবতীর বিবাহ দিব। সে জন্য কোনও চিন্তা করিবেন না। আর মনে করিবেন না যে, ব্যাঘ্র বলিয়া আপনার প্রতি কিছুমাত্র অভক্তি হইয়াছে।না না! আমি সে প্রকৃতির লোক নই। কাহারে কিরূপ মান-সম্ভ্রম করিতে হয়, তাহা আমি ভালরূপ বুঝি। জনার্দ্দন চৌধুরী দূরে থাকুক, যদি জনার্দ্দন চৌধুরীর বাবা আসিয়া আজ আমার পায়ে ধরে, তবুও আপনাকে ফেলিয়া তাহার সহিত আমি কঙ্কাবতীর বিবাহ দিই না।"

তাহার পর তনু রায় স্ত্রীকে বলিলেন,—"তুমি আমার কথার উপর কথা কহিও না; তাহা হইলে অনর্থ ঘটিবে; আমি নিশ্চয় ইঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিব। ইঁহার মত সুপাত্র আর পৃথিবীতে পাইব না। এ বিষয়ে আমি কাহারও কথা শুনিব না। যদি তোমরা কান্নাকাটি কর, তাহা হইলে এই ব্যাঘ্র মহাশয়কে বলিয়া দিব, ইনি এখনি তোমাদিগকে খাইয়া ফেলিবেন।"

তনু রায়ের স্ত্রী উত্তর করিলেন,—"তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই কর। আমি কোনও

কথায় থাকিব না।”

যাহার টাকা আছে, তাঁহার কিসের ভাবনা? সেই দণ্ডেই তনু রায় পুত্রকে ডাকিতে পাঠাইলেন, সেই দণ্ডেই প্রতিবাসী প্রতিবাসনীগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন; সেই দণ্ডেই নাপিত পুরোহিত আসিলেন; সেই দণ্ডেই বিবাহের সমস্ত আয়োজন হইল।

সেই রাত্রিতেই ব্যাঘ্রের সহিত কঙ্কাবতীর বিবাহকার্য্য সমাধা হইল। প্রকাণ্ড বনের বাঘকে জামাই করিয়া কার না মনে আনন্দ হয়? আজ তনু রায়ের মনে তাই আনন্দ ধরে না। —প্রতিবাসীদিগকে তিনি বলিলেন, “আমার জামাইকে লইয়া তোমরা আমোদ-আহ্লাদ করিবে। আমার জামাই যেন মনে কোনরূপও দুঃখ না করেন।”

জামাইকে তনু রায় বলিলেন,—“বাবাজি! বাসর ঘরে গান গাহিতে হইবে। গান শিখিয়া আসিয়াছ তো? এখানে কেবল হালুম হালুম করিলে চলিবে না। শালী শালাজ তাহা হইলে কান মলিয়া দিবে। বাঘ বলিয়া তাহারা ছাড়িয়া কথা ক'বে না!”

বর না চোর! ব্যাঘ্র ঘাড় হেঁট করিয়া রহিলেন। বাসর ঘরে গান গাহিয়াছিলেন কি না, সে কথা শালী-শালাজ ঠানদিদিরা বলিতে পারে। আমরা কি করিয়া জানিব?

প্রভাত হইবার পূর্বে ব্যাঘ্র তনু রায়কে বলিলেন,—মহাশয়! রাত্রি থাকিতে থাকিতে জনসমাজ পরিত্যাগ করিয়া বনে আমাকে পুনরাগমন করিতে হইবে। অতএব আপনার কন্যাকে সুসজ্জিত করিয়া আমার সহিত পাঠাইয়া দিন আর বিলম্ব করিবেন না।”

প্রতিবাসিনীগণ কঙ্কাবতীর চুল বাঁধিয়া দিলেন। কঙ্কাবতীর মাতা কঙ্কাবতীর ভাল কাপড়গুলি বাছিয়া বাহির করিলেন।

তাহা দেখিয়া তনু রায় রাগে আরক্ত-নয়নে স্ত্রীকে বলিলেন,—“তোমরা মত নির্বোধ আর এ পৃথিবীতে নাই। যাহার ঘরে এরূপ লক্ষ্মী-ছাড়া স্ত্রী, তাহার কি কখনও ভাল হয়? ভাল বল দেখি? বাঘের কিসের অভাব? কাপড়ের দোকানে গিয়া হালুম করিয়া পড়িবে, দোকানী দোকান ফেলিয়া পলাইবে, আর বাঘ কাপড়ের গাঠরি লইয়া চলিয়া যাইবে! স্বর্ণকারের দোকানে গিয়া বাঘ হালুম করিয়া পড়িবে, প্রাণের দায়ে স্বর্ণকার পলাইবে, আর বাঘ গহনাগুলি লইয়া চলিয়া যাইবে। দেখিয়া শুনিয়া যখন এরূপ সুপাত্রের হাতে কন্যা দিলাম, তখন আবার কঙ্কাবতীর সঙ্গে ভাল কাপড়-চোপড় দেওয়া কেন? তাই বলি, তোমার মত বোকা আর এ ভূ-ভারতে নাই।”

তনু রায় লক্ষ্মীমন্ত পুরুষ, বৃথা অপব্যয় একেবারে দেখিতে পারেন না। যখন তাঁহার মাতার ঈশ্বর প্রাপ্তি হয়, তখন মাতা বিছানায় শুইয়াছিলেন। নাভিশ্বাস উপস্থিত হইলে, মাকে তিনি কেবল মাত্র একখানি ছেঁড়া মাদুরে শয়ন করাইলেন। নিতান্ত পুরাতন নয়, এরূপ একখানি বস্ত্র তখন তাঁহার মাতা পরিয়াছিলেন। কণ্ঠশ্বাস উপস্থিত হইলে, সেই বস্ত্রখানি তনু রায় খুলিয়া লইলেন। আর একখানি জীর্ণ ছিন্ন গলিত নেকড়া পরাইয়া দিলেন। এইরূপ টানা হেঁচড়া করিতে ব্যস্ত থাকা প্রযুক্ত, মৃত্যু-সময়ে তিনি মাতার মুখে এক বিন্দু জল দিতে অবসর পান নাই। কাপড় ছাড়াইয়া, ভক্তিভাবে, যখন পুনরায় মাকে শয়ন

করাইলেন, তখন দেখিলেন, যে মা অনেকক্ষণ হইয়া গিয়াছে।

স্বামীর তিরস্কারে, তনু রায়ের স্ত্রী, দুই একখানি ছেঁড়া খোঁড়া নেকড়া-চোপড়া লইয়া একটি পুঁটলি বাঁধিলেন। সেইটি কঙ্কাবতীর হাতে দিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে, ঠাকুরদের ডাকিতে ডাকিতে, কন্যাকে বিদায় করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ – বনে

পুঁটলী হাতে করিয়া, কঙ্কাবতী ব্যাঘ্রের নিকট আসিয়া অধোবদনে দাঁড়াইলেন। ব্যাঘ্র মধুর ভাবে বলিলেন,—"কঙ্কাবতী! তুমি বালিকা! পথ চলিতে পারিবে না। তুমি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ কর, আমি তোমাকে লইয়া যাই। তাহাতে আমার কিছুমাত্র ক্লেশ হইবে না।"

কঙ্কাবতী গাছ-কোমর বাঁধিয়া বাঘের পিঠের উপর চড়িয়া বসিলেন। ব্যাঘ্র বলিলেন,—"কঙ্কাবতী! আমার পিঠের লোম তুমি দৃঢ়রূপে ধর। দেখিও, যেন পড়িয়া যাইও না।" কঙ্কাবতী তাহাই করিলেন। ব্যাঘ্র বন্যাভিমুখে দ্রুতবেগে ছুটিলেন।

বিজন অরণ্যের মাঝখানে উপস্থিত হইয়া ব্যাঘ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কঙ্কাবতী! তোমার কি ভয় করিতেছে?"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—"তোমার সহিত যাইব, তাতে আবার আমার ভয় কি?"

কঙ্কাবতী এ কথা বলিলেন বটে, কিন্তু একেবারেই যে তাঁহার ভয় হয় নাই, তাহা নহে। বাঘের পিঠে তিনি আর কখনও চড়েন নাই, এই প্রথম। সুতরাং ভয় হইবার কথা।

ব্যাঘ্র বলিলেন,—"কঙ্কাবতী! কেন আমি বাঘ হইয়াছি, সে কথা তোমাকে বলিব। এ দশা হইতে শীঘ্রই আমি মুক্ত হইব, সেজন্য তোমার কোন চিন্তা নাই। এখন কোনও কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না?" —এইরূপ কথা কহিতে কহিতে দুইজনে যাইতে লাগিলেন। অবশেষে বৃহৎ এক অতুচ্চ্য পর্ব্বতের নিকট গিয়া দুইজনে উপস্থিত হইলেন।

ব্যাঘ্র বলিলেন,—"কঙ্কাবতী! কিছুক্ষণের নিমিত্ত তুমি চক্ষু বুজিয়া থাক। যত্‌ক্ষণ না আমি বলি, ততক্ষণ চক্ষু চাহিও না।

কঙ্কাবতী চক্ষু বুজিলেন। ব্যাঘ্র দ্রুতবেগে যাইতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরে, খল খল করিয়া বিকট হাসির শব্দ কঙ্কাবতীর কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিল। —কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি বিকট, কি ভয়ানক হাসি! ওরূপ করিয়া কে হাসিল?"

বাঘ উত্তর করিলেন,—সে কথা সব তোমাকে পরে বলিব। এখন শুনিয়া কাজ নাই। এখন তুমি চক্ষু উন্মীলন কর,—আর কোনও ভয় নাই।"

কঙ্কাবতী চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন যে, এক মনোহর অট্টালিকায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত, বহুমূল্য মণি-মুক্তায় অলঙ্কৃত, অতি সুরম্য অট্টালিকা। ঘরগুলি সুন্দর, পরিষ্কৃত, নানা ধনে পরিপূরিত, নানা সাজে সুসজ্জিত। রজত, কাঞ্চন, হীরা, মাণিক, মুকুতা, চারিদিকে রাশি রাশি স্তূপাকার রহিয়াছে দেখিয়া কঙ্কাবতী মনে মনে

অদ্ভুত মানিলেন। অট্টালিকাটি কিন্তু পর্ব্বতের অভ্যন্তরে স্থিত। বাহির হইতে দেখা যায় না। পর্ব্বত-গাত্রে সামান্য একটি নিবিড় অন্ধকারময় সুড়ঙ্গ দ্বারা কেবল ভিতরে প্রবেশ করিতে পারা যায়! পর্ব্বতের শিখরদেশ হইতে অট্টালিকার ভিতর আলোক প্রবেশ করে। কিন্তু আলোক আসিবার পথও এরূপ কৌশলভাবে নিবেশিত ও লুক্কায়িত আছে যে, সে পথ দিয়া ভূচর খেচর কেহ অট্টালিকার ভিতর প্রবেশ করিতে পারে না; অট্টালিকার ভিতর হইতে কেহ যাইতেও পারে না। অট্টালিকার ভিতর, বসন, খাট, পালঙ্ক প্রভৃতি কোনও দ্রব্যের অভাব নাই। নাই কেবল আহারীয় সামগ্রী।

অট্টালিকা ভিতর উপস্থিত হইয়া ব্যাঘ্র বলিলেন,—"কঙ্কাবতী! এখন তুমি পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ কর। একটুখানি এইখানে বসিয়া থাক, আমি আসিতেছি। কিন্তু সবাধান। এখানকার কোনও দ্রব্যে হাত দিও না, কোন দ্রব্য লইও না। যাহা আমি হাতে করিয়া দিব, তাহাই তুমি লইবে, আপনা আপিনি কোনও দ্রব্য স্পর্শ করিবে না।"

এইরূপ সতর্ক করিয়া ব্যাঘ্র সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে খেতু আসিয়া কঙ্কাবতীর সম্মুখে দাঁড়াইলেন। খেতু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কঙ্কাবতী! আমাকে চিনিতে পার?" কঙ্কাবতী ঘাড় হেঁট করিয়া রহিলেন।

খেতু পুনরায় বলিলেন,—"কঙ্কাবতী! এই বনের মাঝখানে আসিয়া তোমার কি ভয় করিতেছে?" কঙ্কাবতী মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন—"না, আমার ভয় করে নাই। তোমাকে দেখিয়া আমার ঘোমটা দেওয়া উচিত, লজ্জা করা উচিত। তাহা পারিতেছি না। তাই আমি ভাবিতেছি। তুমি কি মনে করিবে।"

খেতু বলিলেন,—"না, কঙ্কাবতী! আমাকে দেখিয়া তোমার ঘোমটা দিতে হইবে না, লজ্জা করিতে হইবে না; আমি কিছু মনে করিব না, তাহার জন্য তোমার ভাবনা নাই। আর এখানে কেবল তুমি আর আমি, অন্য কেহ নাই, তাতে লজ্জা করিলে চলিবে কেন? তাও বটে, আবার এখানে আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ নই। বিপদের আশঙ্কা বিলক্ষণ আছে।"

কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি বিপদ?"

খেতু বলিলেন,—"এখন সে কথা শুনিয়া তোমার কাজ নাই। তাহা হইলে তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না। তবে, এখন তোমাকে এই মাত্র বলিতে পারি যে, যদি তুমি এখানকার দ্রব্য সামগ্রী স্পর্শ না কর, তাহা হইলে কোনও ভয় না; কোনও বিপদ্ হইবার সম্ভাবনা নাই। যেটি আমি হাতে তুলিয়া দিব, সেইটি লইবে; নিজ হাতে কোনও দ্রব্য লইবে না। এক বৎসর কাল আমাদিগকে এইখানে থাকিতে হইবে। তাহার পর, এ সমুদয় ধনসম্পত্তি আমাদের হইবে। এই সমুদয় ধন লইয়া তখন আমরা দেশে যাইব আচ্ছা। কঙ্কাবতী! যখন আমি তোমাকে বিবাহ করি, তখন তুমি আমাকে চিনিতে পারিয়াছিলে?"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—"তা আর পারিনি? এক বৎসর কাল তোমার জন্য পথপানে চাহিয়াছিলাম। যখন এক বৎসর গত হইয়া গেল, তখনও তুমি আসিলে না, তখন মা আর আমি, হতাশ হইয়া পড়িলাম। মা যে কত কাঁদিতেন, আমি যে কত কাঁদিতাম,

তা আর তোমাকে কি বলিব! কাল রাত্রিতে বাবা যখন বলিলেন যে,—বাঘের সহিত আমি কঙ্কাবতীর বিবাহ দিব, আর সেই কথায় তুমি যখন বাহির হইতে বলিলে,—'তবে কি মহাশয়! দ্বার খুলিয়া দিবেন?' সেই গর্জ্জনের ভিতর হইতেও একটু হেন বুঝিলাম যে, সে কাহার কণ্ঠস্বর। তার পর আবার, ঘরের ভিতর আসিয়া, যখন তুমি চুপি-চুপি মা'র কাণে বলিলে,—'কোনও ভয় নাই, তখন তো নিশ্চয়ই বুঝিলাম যে, তুমি বাঘ নও।"

খেতু বলিলেন,—'অনেক দুঃখ গিয়াছে। কঙ্কাবতী! তুমিও অনেক দুঃখ পাইয়াছ, আমিও অনেক দুঃখ পাইয়াছি। আর এক বৎসর কাল দুঃখ সহিয়া এইখানে থাকিতে হইবে। তাহার পর ঈশ্বর যদি কৃপা করেন তো আমাদের সুখের দিন আসিবে। দেখিতে দেখিতে এক বৎসর কাল কাটিয়া যাইবে। তখন এই সমুদয় ঐশ্বর্য্য আমাদের হইবে। আহা! মা নাই এত ধন লইয়া যে কি করিব? তাই ভাবি মা যদি বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে পৃথিবীতে যাহা কিছু পুণ্য কর্ম্ম আছে, সমস্ত আমি মাকে করাইতাম। যাহা হউক, পৃথিবীতে অনেক দীন-দুঃখী আছে। কঙ্কাবতী! এখন কেবল তুমি আর আমি। যতদূর পারি, দুই জনে জগতের দুঃখ মোচন করিয়া জীবন অতিবাহিত কবিব।'

কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মাতাব সৎকার কার্য্য সমাপ্ত করিয়া আমাকে বাটীতে রাখিয়া তাহার পর তুমি কোথায় যাইলে? কি করিলে? ফিরিয়া আসিতে তোমার এক বৎসরের অধিক হইলে কেন? তুমি ব্যাঘ্রের আকার ধরিলে কেন? সে সব কথা তুমি আমাকে এখন বলিবে না?"

খেতু বলিলেন,—"না, কঙ্কাবতী! এখন নয়। এক বৎসর গত হইয়া যাক তাহার পর সব কথা তোমাকে বলিব।" কঙ্কাবতী আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না।

কঙ্কাবতী ও খেতু পর্ব্বত অভ্যন্তরে সেই অট্টালিকায় বাস করিতে লাগিলেন। অট্টালিকার কোনও দ্রব্য কঙ্কাবতী স্পর্শ করেন না। কেবল খেতু যাহা হাতে করিয়া দেন, তাহাই গ্রহণ করেন।

অট্টালিকার ভিতর সমুদয় দ্রব্য ছিল, কেবল খাদ্যসামগ্রী ছিল না। প্রতিদিন বাহিরে যাইয়া খেতু বনের ফল-মূল লইয়া আসেন, তাহাই দুইজনে আহার করিয়া কালযাপন করেন। বাঘ না হইয়া খেতু ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করেন। বাঘ না হইয়া খেতু কখনও বাহিরে যান না। আবার অট্টালিকার ভিতর আসিয়া খেতু পুনরায় মনুষ্য হন। কেন তিনি বাঘের রূপ না ধরিয়া বাহিরে যান না, কঙ্কাবতী তাহা বুঝিতে পাবেন না। খেতু মানা করিয়াছেন, সে জন্য জিজ্ঞাসা করিবারও যো নাই! এইরূপে দশ মাস কাটিয়া গেল।

একদিন কঙ্কাবতী বলিলেন,—"অনেকদিন মাকে দেখি নাই। মাকে দেখিতে বড় ইচ্ছা হয় মা'ও আমাদের কোন সংবাদ পান নাই; মা'ও হয় তো চিন্তিত আছেন। আমরা কোথায় যাইলাম, কি করিলাম মা তাহার কিছুই জানেন না।"

খেতু উত্তর করিলেন,—"অল্প দিনের মধ্যে পুনরায় দেশে যাইব সে জন্য আর তাঁহাদিগকে কোনও সংবাদ দিই নাই। আর লোকালয়ে যাইতে হইলেই আমাকে বাঘ হইয়া

যাইতে হইবে সেজন্য আর যাইতে বড় ইচ্ছা হয় না? কি জানি কখন কি বিপদ ঘটে বলিতে তো পারা যায় না। যাহা হউক মাকে দেখিতে যখন তোমার সাধ হইয়াছে, তখন কাল তোমার এ সাধ পূর্ণ করিব। কা'ল সন্ধ্যার সময় মা'র নিকট তোমাকে আমি লইয়া যাইব। কঙ্কাবতী! বৎসর পূর্ণ হইতে আর কেবল দুই মাস আছে; যদি তোমার ইচ্ছা হয় তাহা হইলে এই দুই মাস তুমি না হয়, বাপের বাড়ী থাকিও।" কঙ্কাবতী বলিলেন,—"না তা আমি থাকিতে চাই না! তুমি এই বনের ভিতর নানা বিপদের মধ্যে একেলা থাকিবে, তা কি কখনও হয়? মার জন্য মন উতলা হইয়াছে—কেবল এক্‌বাব খানি মাকে দেখিতে চাই। দেখা-শুনা করিয়া আবার তখন ফিরিয়া আসিব।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ – শ্বশুরালয়

তাহার পরদিন সন্ধ্যাবেলা, খেতু ব্যাঘ্ররূপ ধরিয়া কঙ্কাবতীকে তাঁহার পিঠে চড়িতে বলিলেন। অট্টালিকা হইতে অনেকগুলি টাকা কড়ি লইয়া কঙ্কাবতীকে দিলেন, আর বলিলেন যে, "এই টাকাগুলি তোমার মাতা, পিতা, 'ভাই ও ভগিনীদিগকে দিবে।"

অট্টালিকা হইতে বাহির হইয়া, দুই জনে অন্ধকারময় সুড়ঙ্গের পথে চলিলেন। সুড়ঙ্গ হইতে বাহির হইবার সময় খেতু বলিলেন,—"কঙ্কাবতী! চক্ষু মুদ্রিত কর। যতক্ষণ না বলি, ততক্ষণ চক্ষু চাহিও না।"

কঙ্কাবতী চক্ষু বুজিলেন। পুনরায় সেই বিকট হাসি শুনিতে পাইলেন। সেই ভায়বহ হাসি শুনিয়া আতঙ্কে তাঁহার শরীর শিহরিয়া উঠিল।

সুড়ঙ্গের বাহিরে আসিয়া বনের ভিতর প্রবেশ করিয়া খেতু কঙ্কাবতীকে চক্ষু চাহিতে বলিলেন। ব্যাঘ্র দ্রুতবেগে গ্রামের দিকে ছুটিল। প্রায় এক প্রহর রাত্রির সময়, ঝি-জামাতা, তনু রায়ের বাটীতে উপস্থিত হইলেন।

কঙ্কাবতীকে পাইয়া, কঙ্কাবতীর মা যেন স্বর্গ হাত বাড়াইয়া পাইলেন। কঙ্কাবতীর ভগিনীগণও কঙ্কাবতীকে দেখিয়া পরম সুখী হইলেন। অনেক টাকা মোহর দিয়া ব্যাঘ্র, তনু রায়কে নমস্কার করিলেন। শ্যালককেও তিনি অনেক টাকা-কড়ি দিলেন। ব্যাঘ্রে আদর রাখিতে আর স্থান হয় না! মা, পঞ্চোপচারে কঙ্কাবতীকে আহারাদি করাইলেন। তনু রায়ের বাসনা হইল,—"জামাতাকে কি আহার করিতে দিই?"

অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া, মনে মনে বিচার করিয়া, তনু রায় বলিলেন,—"বাবাজি! এত পথ আসিয়াছ, ক্ষুধা অবশ্যই পাইয়াছে। কিন্তু আমাদের ঘরে কেবল ভাত ব্যঞ্জন আছে, আর কিছুই নাই। ভাত-ব্যঞ্জন কিছু তোমার খাদ্য নয়। তাই ভাবিতেছি,—তোমাকে খাইতে দিই কি? তা, তুমি এক কৰ্ম্ম কর। আমার গোয়ালে একটি বৃদ্ধা গাভী আছে। সময়ে সে দুগ্ধবতী গাভী ছিল। এখন তাহার বৎস হয় না, এখন আর সে দুধ দেয় না। বৃথা কেবল বসিয়া খাইতেছে। তুমি সেই গাভীটিকে আহার কর। তাহা হইলে, তোমার উদর পূর্ণ হইবে; আমারও জামাতাকে আদর করা হইবে। মিছামিছি আমাকে খড় যোগাইতে হইবে না।"

ব্যাঘ্র বলিলেন,—"না মহাশয়! আজ দিনের বেলায় আমি উত্তমরূপে আহার

করিয়াছি। এখন আমার আর ক্ষুধা নাই;—গাভীটি এখন আমি আহার করিতে পারিব না।" —তনু রায় বলিলেন,—"আচ্ছা! যদি তুমি গাভীটি না খাও, তাহা হইলে না হয়, আর একটি কাজ কর। তুমি নিরঞ্জন কবিরত্নকে খাও। তাহার সহিত আমার চিরবিবাদ। সে শাস্ত্র জানে না, তবু আমার সহিত তর্ক করে। তাহাকে আমি দুটি চক্ষু পাড়িয়া দেখিতে পারি না। সে এ গ্রাম হইতে এখন উঠিয়া গিয়াছে। এখান হইতে ছয় ক্রোশ দূরে মামার বাড়ীতে গিয়া আছে। আমি তোমায় সব সন্ধান বলিয়া দিতেছি। তুমি স্বচ্ছন্দে গিয়া তাহাকে খাইয়া আইস।"

ব্যাঘ্র উত্তর করিল.—"না মহাশয় আজ রাত্রিতে আমার কিছু মাত্র ক্ষুধা নাই! আজ রাত্রিতে আমি নিরঞ্জন কবিরত্নকে খাইতে পারিব না।"

তনু রায় পুনর্ব্বার বলিলেন,—"আচ্ছা! ততদূর যদি না যাইতে পার, তবে এই গ্রামেই তোমার আমি খাবার ঠিক করিয়া দিতেছি। এই গ্রামে এক গোয়ালিনী আছে। মাগী বড় দুষ্ট। দু'বেলা আসিয়া আমার সঙ্গে ঝগড়া করে। তোমাকে কন্যা দিয়াছি বলিয়া মাগী আমাকে বলে,—"অল্পায়ু, বুড়ো, ডেক্‌রা। টাকা নিয়ে কি না বাঘকে মেয়ে বেচে খেলি!' তুমি আমার জামাতা, ইহার একটা প্রতিকার তোমাকে করিতে হইবে। তুমি তার ঘাড়টি ভাঙ্গিয়া রক্ত খাও? তার রক্ত ভাল, খাইয়া তৃপ্তিলাভ করিবে।"

ব্যাঘ্র বলিল,—"না মহাশয় আজ আমি কিছু খাইতে পারিব না, আজ ক্ষুধা নাই।"

তনু রায় ভাবিলেন,—"জামাতারা কিছু লজ্জাশীল হন। বার বার 'খাও খাও' বলিতে হয়, তবে কিছু খান্। খাইতে বসিয়া 'এটি খাও, ওটি খাও, আর একটু খাও' এইরূপে পাঁচজনে বার বার না বলিলে, জামাতারা পেট ভরিয়া আহার করেন না। পাতে সব ফেলিয়া যান। এদিকে জঠরানল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে থাকে, ওদিকে মুখে বলেন,—"আর ক্ষুধা নাই, আর খাইতে পারি না।' জামাতা দিগের রীতি এই।'

এইরূপ চিন্তা করিয়া, তনু রায় আবার বলিলেন,—"শ্বশুর বাড়ী আসিয়া কিছু না খাওয়া কি ভাল? লোকে আমার নিন্দা করিবে। পাড়ার লোকগুলির কথা তোমাকে আর কি পরিচয় দিব? পাড়ার মেয়েপুরুষগুলি এক একটি সব অবতার! তামাসা দেখিতে খুব প্রস্তুত। পরের ভাল একটু দেখিতে পারেন না। তুমি আমার জামাতা হইয়াছ, যাহা হউক, তোমার দু'পয়সা সঙ্গতি আছে, এই হিংসায় সকলে ফাটিয়া মরিতেছেন। এখনি কা'ল সকালে বলিবেন যে, 'তনু রায়ের জামাতা আসিয়াছিল, তনু রায় জামাতার কিছুমাত্র আদর করে নাই, এক ফোঁটা জল পর্য্যন্ত খাইতে দেয় নাই।' সেই জন্য কিছু খাইতে তোমাকে বার বার অনুরোধ করিতেছি। চল, গোয়ালিনীর ঘর তোমাকে দেখাইয়া দিই। সে দুধ ঘি খায়? মাংস তাহার কোমল। তাহার মাংস তোমার মুখে ভাল লাগিবে। খাইয়া তৃপ্তি লাভ করিবে। মন্দ দ্রব্য কি তোমাকে খাইতে বলিতে পারি?

ব্যাঘ্র উত্তর করিল,—"এবার মহাশয় আমাকে ক্ষমা করুন। এইবার যখন আসিব, তখন দেখা যাইবে।" —তনু রায় মনে মনে কিছু ক্ষুন্ন হইলেন। জামাতা আদরের সামগ্রী।

প্রাণ ভরিয়া আদর করিতে না পারিলে শ্বশুর-শাশুড়ীর মনে ক্লেশ হয়। তিনি তিনটি সুখাদ্যের কথা বলিলেন, জামাতা কিন্তু একটিও খাইলেন না। তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইবার কথা।

তনু রায় বলিলেন,—"শ্বশুরবাড়ীতে এরূপ খাইয়া দাইয়া আসিতে নাই। শ্বশুর-শাশুড়ীর মন তাহাতে বুঝিবে কেন? জামাতা কিছু না খাইলে শ্বশুর-শাশুড়ীর মনে দুঃখ হয়। এই আজ তুমি কিছু খাইলে না, সে জন্য তোমার শাশুড়ীঠাকুরাণী আমাকে কত বকিবেন। তিনি বলিবেন,—'তুমি জামাতাকে ভাল করিয়া বল নাই, তাই জামাতা আহার করিলেন না।' আবার যখন আসিবে, তখন আহারাদি করিয়া এস না। এইখানে আসিয়া আহার করিবে। তোমার জন্য এই তিনটি খাদ্য-সামগ্রী আমি ঠিক করিয়া রাখিলাম। এবার আসিয়া একেবারেই তিনটিকে খাইতে হইবে। যদি না খাও, তাহা হইলে বনে যাইতে দিব না, তোমার চাদর ও ছাতি লুকাইয়া রাখিব। না না! ও কথা নয়; তোমার যে আবার ছাতি কি চাদর নাই। যদি না খাও, তা হইলে তোমার উপর আমি রাগ করিব।

কঙ্কাবতী, সমস্ত রাত্রি মা ও ভগিনীদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। ব্যাঘ্র প্রকৃত কে, তাহা মাতাকে বলিলেন। আর দুই মাস পরে তাঁহারা যে বিপুল ঐশ্বর্য্য লইয়া দেশে আসিবেন, তাহাও মাতাকে বলিলেন।

তনু রায়, একবার কঙ্কাবতীকে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিলেন,—"কঙ্কাবতী! বোধ হইতেছে যে, জামাতা আমার প্রকৃত ব্যাঘ্র নন। বনের শিকড় মাথায় দিয়া মানুষে যে, সেই বাঘ হয়, ইনি বোধ হয় তাই! আমি ইহাকে নানারূপ সুখাদ্য খাইতে বলিলাম। আমার গোয়ালের বুড়ো গরুটিকে খাইতে বলিলাম, নিরঞ্জনকে খাইতে বলিলাম, গোয়ালিনীকে খাইতে বলিলাম, কিন্তু ইনি ইহার একটিকেও খাইলেন না। যথার্থ বাঘ হইলে কি এ সব লোভ সামলাইতে পারিতেন? তাই আমার বোধ হইতেছে, ইনি প্রকৃত বাঘ নন। তুমি দেখিও দেখি? ইহার মাথায় কোনও রূপ শিকড় আছে কি না? যদি শিকড পাও, তাহা হইলে সেই শিকড়টি দগ্ধ করিয়া ফেলিবে। যদি লোকে মন্দ করিয়া থাকে, তো শিকডটি পোড়াইলে ভাল হইয়া যাইবে। যে কারণেই কেন বাঘ হইয়া থাকুন না, শিকড়টি দগ্ধ করিয়া ফেলিলেই সব ভাল হইয়া যাইবে। তখন পুনরায় মানুষ হইয়া ইনি লোকালয়ে আসিবেন।"

পিতার এই উপদেশ পাইয়া কঙ্কাবতী যখন পুনরায় মার নিকট আসিলেন, তখন মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"উনি তোমাকে চুপি চুপি কি বলিলেন?"

পিতা যেরূপ উপদেশ দিলেন, কঙ্কাবতী যে সমস্ত কথা মার নিকট ব্যক্ত করিলেন।

মা সেই কথা শুনিয়া বলিলেন,—"কঙ্কাবতী! তুমি এ কাজ করিবে না। করিলে নিশ্চয় মন্দ হইবে। খেতু অতি ধীর ও সুবুদ্ধি। খেতু যাহা করিতেছেন, তাহা ভালর জন্যই করিতেছেন। খেতুর আজ্ঞা তুমি কোনমতেই অমান্য করিও না। সাবধান, কঙ্কাবতী! আমি যাহা বলিলাম, মনে যেন থাকে!"

রাত্রি অবসান প্রায় হইলে খেতু ও কঙ্কাবতী পুনরায় বনে চলিলেন। পর্ব্বতের নিকট

আসিয়া, খেতু পুর্ব্বের মত কঙ্কাবতীকে চক্ষু বুজিতে বলিলেন। সুড়ঙ্গ-দ্বারে পুর্ব্বের মত কঙ্কাবতী সেই বিকট হাসি শুনিলেন। অট্টালিকায় উপস্থিত হইয়া পুর্ব্বের মত ইহারা দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ – শিকড়

আর একমাস গত হইয়া গেল। খেতু বলিলেন, "কঙ্কাবতী! কেবল আর এক মাস রহিল। এই এক মাস পরে আমরা স্বাধীন হইব। আর এক মাস গত হইয়া যাইলে, আমাদিগকে আর বনবাসী হইয়া থাকিতে হইবে না। এই বিপুল বিভব লইয়া আমরা তখন দেশে যাইব।" এক একটি দিন যায়, আর খেতু বলেন,—"কঙ্কাবতী! আর ঊনত্রিশ দিন রইল; কঙ্কাবতী! আর আটত্রিশ দিন রহিল; কঙ্কাবতী! আর সাতাইশ দিন রইল।"

এইরূপ কুড়িদিন গত হইয়া গেল। কেবল আর দশ দিন রহিল। দশ দিন পরে কঙ্কাবতীকে লইয়া দেশে যাইবেন, সে জন্য খেতুর মনে অসীম আনন্দের উদয় হইল। খেতুর মুখে সদাই হাসি!

খেতু বলিলেন,—"কঙ্কাবতী! তুমি এ কর্ম্ম কর। কয়লা দ্বারা এই প্রাচীরের গায়ে দশটি দাগ দিয়া রাখ। প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া একটি করিয়া দাগ পুঁছিয়া ফেলিব, তাহা হইলে সম্মুখে সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ দেখিব, ক-দিন আর বাকী রহিল।"

কঙ্কাবতী ভাবিলেন যে,—"দেশে যাইবার নিমিত্ত স্বামীর মন বড়ই আকুল হইয়াছে। প্রাচীরে তো দশটি দাগ দিলাম, যেমনি এক একটি দিন যাইবে, তেমনি এক একটি দাগ তো মুছিয়া ফেলিলাম; তা তো সব হইবে। কিন্তু এক দিনেই কি দশটি দিন মুছিয়া ফেলিতে পারি না? এক দিনেই কি স্বামীর উদ্ধার করিতে পারি না? বাবা যা বলিয়া দিয়াছেন, তাই করিয়া দেখিলে তো হয়! আজ কি কাল যদি দেশে যাইতে পান, তাহা হইলে আমার স্বামীর মনে কতই না আনন্দ হইবে!"

এই দুই মাসের মধ্যে, পিতার কথা তাঁহার অনেক বার স্মরণ হইয়াছিল। মন্দ লোকে তাঁহার স্বামীকে গুণ করিয়াছে এই চিন্তা তাঁহার মনে বারবার উদয় হইয়াছিল। তবে মা বারণ করিয়া দিয়াছিলেন, সে জন্য এতদিন তিনি কোনও রূপ প্রতিকারের চেষ্টা করেন না। এক্ষণ দেশে যাইবার নিমিত্ত স্বামীর ঘোরতর ব্যগ্রতা দেখিয়া কঙ্কাবতীর মন নিতান্ত অস্থির হইয়া পড়িল।

কঙ্কাবতী ভাবিলেন,—"বাবা পুরুষ মানুষ! পাহাড়-পর্ব্বত, বন-জঙ্গল, বাঘ-ভাল্লুক, শিকড়-মাকড় তন্ত্র-মন্ত্র, এ সকলের কথা বাবা যত জানেন, মা তত কি করিয়া জানিবেন? মা, মেয়ে মানুষ ঘরের বাহিরের যান না। মা কি করিয়া জানিবেন যে, লোকে শিকড় দিয়া মন্দ করিলে, তাহার কি উপায় করিতে হয়? শিকড়টি দগ্ধ করিয়া ফেলিলেই সকল বিপদ্ কাটিয়া যায়, বাবা এই কথা বলিয়াছেন। এখনও দশ দিন আছে, স্বামী আমার দিন গণিতেছেন। যদি কা'ল তিনি বাড়ী যাইতে পান, তাহা হইলে তাঁর কত না আনন্দ হইবে!"

এইরূপ কঙ্কাবতী সমস্ত দিন ভাবিতে লাগিলেন। একবার মনে ভাবেন,—"কি জানি,

পাছে ভাল করিতে গিয়া মন্দ হয়! কাজ নাই, এ দশটা দিন চক্ষু-কর্ণ বুজিয়া চুপ করিয়া থাকি। বাবা যাহা করিতে বলিয়াছেন, মা তাহা বারণ করিয়াছেন।"

আবার ভাবেন,—"দুষ্টেরা আমার স্বামীর মন্দ করিয়াছে। দুষ্টদিগের দুরভিসন্ধি হইতে স্বামীকে আমি মুক্ত করিব। আমি যদি স্বামীকে মুক্ত করিতে পারি, তাহা হইলে তিনি কত না আমার উপর পরিতুষ্ট হইবেন।" ভাবিতে ভাবিতে সমস্ত দিন চলিয়া গেল। কি করিবেন, কঙ্কাবতী কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। রাত্রিতেও কঙ্কাবতী এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিলক-সুন্দরী ও ভুশকুমড়োর গল্প মনে পড়িল।

রাজপুত্র, তিলকসুন্দরীর রূপে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিলকসুন্দরীকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত তাঁহার মন হইয়াছিল। তিলকসুন্দরীর সৎ-মা তাহার মাথায় একটি শিকড় দিয়া দিলেন। শিকড়ের গুণে তিলকসুন্দরী পক্ষী হইয়া গেল। উড়িয়া গিয়া গাছের ডালে বসিল। সৎ-মা কৌশল করিয়া আপনার কন্যা ভুশকুমড়োর সহিত রাজপুত্রের বিবাহ দিলেন। ভুশকুমড়োকে রাজপুত্র আদর করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া তিলকসুন্দরী গাছের ডাল হইতে বলিল,—"ভুশকুমড়ো কোলে! তিলকসুন্দরী ডালে!!" রাজপুত্র মনে করিলেন, "পাখীটি কি বলে?" রাজপুত্র সেই পাখীটিকে ডাকিলেন। পাখীটি আসিয়া রাজপুত্রের হাতে বসিল। হাত বুলাইতে মাথার শিকড়টি পড়িয়া গেল। পাখী তখন পুনরায় তিলকসুন্দরী হইল। রাজপুত্র তখন সৎ-মার দুষ্টাভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন। সৎ-মার কন্যা ভুশকুমড়োকে হেঁটে কাঁটা, উপরে কাঁটা দিয়া পুঁতিয়া ফেলিলেন। তিলকসুন্দরীকে লইয়া সুখে ঘরকন্না করিতে লাগিলেন।

কঙ্কাবতীর সেই তিলকসুন্দরীর কথা এখন মনে হইল। আরব্য উপন্যাসে এই ভাবের যে গল্প আছে, তাহাও তাঁর মনে পড়িল। তিনি ভাবিলেন,—"দুষ্টগণ শিকড়ের দ্বারা এইরূপে লোকের মন্দ করে। আচ্ছা যাই দেখি, আমার স্বামীর মাথায় কোনরূপ শিকড় আছে কি না।" —এই মনে করিয়া তিনি অন্য ঘরে গিয়া বাতি জ্বালিলেন। বাতিটি হাতে করিয়া, শয্যার পাশে দাঁড়াইয়া, খেতুর মাথায় শিকড়ের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। খেতু ঘোর নিদ্রার অভিভূত। খেতু ইহার কিছুই জানেন না।

সর্ব্বনাশ! অনুসন্ধান করিতে করিতে কঙ্কাবতী খেতুর মাথায় একটি শিকড় দেখিতে পাইলেন। "বাবা যা বলিয়াছিলেন, তাই! দুষ্টলোকদিগের একবার দুরভিসন্ধি দেখ। ভাগ্যক্রমে আজ আমি মাথাটি অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম; তা না হইলে কি হইত?"

কঙ্কাবতী, শিকড়টি খেতুর মাথা হইতে খুলিতে চেষ্টা করিলেন। শিকড়টি মাথার চুলের সহিত দৃঢ়রূপে আবদ্ধ ছিল, খুলিয়া লইতে পারিলেন না! পাছে খেতু জাগিয়া উঠেন, এই ভয়ে আর অধিক বল প্রয়োগ করিলেন না। পুনরায় অপর ঘরে গিয়া, সে স্থান হইতে কাঁচি লইয়া আসিলেন। চুলের সহিত শিকড়টি খেতুর মাথা হইতে কাটিয়া লইলেন। শিকড়টি তৎক্ষণাৎ বাতির অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন!

শিকড় পুড়িয়া ঘরের ভিতর অতি ভয়ানক তীব্র দুর্গন্ধ বাহির হইল। সেই গন্ধে

কঙ্কাবতীর শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল। ভয়ে কঙ্কাবতী বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। কঙ্কাবতীর সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল।

চমকিয়া খেতু জাগরিত হইলেন। মাথায় হাত দিয়া দেখিলেন যে, শিকড় নাই। ভয়ে বিহ্বলা, কম্পিত-কলেবরা, জ্ঞানহীনা, কঙ্কাবতীকে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিলেন। অচেতন হইয়া, কঙ্কাবতী ভূতলশায়িনী হন আর কি, এমন সময় খেতু উঠিয়া তাঁহাকে ধরিলেন। বাতিটি তাঁহার হাত হইতে লইয়া, কঙ্কাবতীকে আস্তে আস্তে বসাইলেন। কঙ্কাবতীর মুখে জল দিয়া, কঙ্কাবতীর মুখে জল দিয়া, কঙ্কাবতীকে সুস্থ করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

সুস্থ হইয়া কঙ্কাবতী বলিলেন,—"আমি যে, ঘোর কু-কর্ম্ম করিয়াছি, তাহা আমি এখন বুঝিতে পারিতেছি। আমাকে তুমি ক্ষমা কর!"

এই কথা বলিয়া, কঙ্কাবতী অধোবদনে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

খেতু বলিলেন,—"কঙ্কাবতী! ইহাতে তোমার কোনও দোষ নাই। প্রথম তো অদৃষ্টের দোষ। তা না হইলে এতদিন গিয়া আজ এ দুর্ঘটনা ঘটিবে কেন? তাহার পর আমার দোষ। আমি যদি আদ্যোন্ত সকল কথা তোমাকে প্রকাশ করিয়া বলিতাম, যদি তোমার নিকট কিছু গোপন না করিতাম, তাহা হইলে এ কাজ তুমি কখনও করিতে না আজ এ দুর্ঘটনা ঘটিত না। শিকড়টি কি বাতির আগুনে পোড়াইয়া ফেলিয়াছ?" কঙ্কাবতী ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন,—'হাঁ! শিকড়টি দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছি।'

খেতু বলিলেন,—"তবে এখন তোমাকে বুকে সাহস বাঁধিতে হইবে। স্ত্রীলোক, বালিকার মত এখন আর কাঁদিলে চলিবে না। এই জনশূন্য অরণ্যের মধ্যে তুমি একাকিনী! তোমার জন্য প্রাণ আমার নিতান্ত আকুল হইয়াছে। কঙ্কাবতী প্রকৃত যাহারা পুরুষ হয়, মরিতে তাহারা ভয় করে না। ভয় করে না তবে অনাথিনী স্ত্রী প্রভৃতি পোষ্যদিগের জন্যই তাহারা কাতর হয়।" —ব্যস্ত হইয়া কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন ? কি? আমাদের কি বিপদ হইবে? কি বিপদের আশঙ্কা তুমি করিতেছ?"

খেতু উত্তর করিলেন,—"কঙ্কাবতী! যদি গোপন করিবার সময় থাকিত, তাহা হইলে আমি গোপন করিতাম। কিন্তু গোপন করিবার আর সময় নাই। তোমাকে একাকিনী এ স্থান হইতে বাটী ফিরিয়া যাইতে হইবে। সুড়ঙ্গের ভিতর হইতে বাহির হইয়া ঠিক উত্তর মুখে যাইবে। প্রাতঃকাল হইলে সূর্য্য উদয় হইবে, সূর্য্যকে দক্ষিণদিকে রাখিয়া চলিলেই তুমি গ্রামে গিয়া পৌঁছিবে ।" —কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আর তুমি?

খেতু বলিলেন,—"আমাকে এই খানেই থাকিতে হইবে। আমি এ স্থানের দ্রব্য ছুঁইয়াছি, এখান হইতে আমি টাকা-কড়ি লইয়াছি, সুতরাং এখান হইতে আমি আর যাইতে পারিব না। আমাকে এইখানেই থাকিতে হইবে। সেইজন্য এখানকার কোনও দ্রব্য স্পর্শ করিতে তোমাকে মানা করিয়াছিলাম। এক্ষণে তুমি আর বিলম্ব করিও না। অট্টালিকা হইতে বাহির হইয়া সুড়ঙ্গপথে গমন করিবে। পর্ব্বতের ভিতর হইতে বাহির হইয়া কোনও গাছতলায়

রাত্রিটি যাপন করিবে। যখন প্রাতঃকাল হইবে, সূর্য্য উদয় হইবে, তখন কোন্ দিক উত্তর, অনায়াসেই জানিতে পারিবে। উত্তর মুখে যাইলেই গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইবে। কঙ্কাবতী! আর বিলম্ব করিও না।"

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"এ স্থান হইতে আমি যাইব? তোমাকে এইখানে রাখিয়া আমি এখান হইতে যাইব? এমন কথা তুমি কি করিয়া বলিলে? আমি ঘোরতর কুকর্ম্ম করিয়াছি সত্য, আমি অপরাধিনী সত্য, আমি হতভাগিনী। কিন্তু তা বলিয়া কি আমাকে দূর করিতে হয়? আমি বালিকা, আমি অজ্ঞান, আমি জানি না; না জানিয়া এ কাজ করিয়াছি, ভালভাবিয়া মন্দ করিয়াছি। আমার কি আর ক্ষমা নাই!"

খেতু উত্তর করিলেন,—"কঙ্কাবতী! তোমার উপর আমি রাগ করি নাই। রাগ করিয়া তোমাকে বলি নাই যে, 'তুমি এখান হইতে যাও।' বড় বিপদের কথা, বড় নিদারুণ কথা, কি করিয়া তোমাকে বলি। এখান হইতে তোমাকে যাইতে হইবে, কঙ্কাবতী! নিশ্চয় তোমাকে এখান হইতে যাইতে হইবে, আর এখনি যাইতে হইবে; বিলম্ব করিলে চলিবে না। এখন তুমি পিতার বাটীতে গিয়া থাক, লোকজন সঙ্গে করিয়া দশ দিন পরে পুনর্ব্বার এই বনের ভিতর আসিও। এই অট্টালিকার ভিতর যাহা কিছু ধন-সম্পত্তি আছে, তাহা লইয়া যাইও। দশ দিন পরে লইলে কোনও ভয় নাই, তখন তোমাকে কেহ কিছু বলিবে না। এই ধন-সম্পত্তি চারিভাগ করিবে। একভাগ তোমার পিতাকে দিবে, এক ভাগ রামহরি দাদা মহাশয়কে দিবে, এক ভাগ নিরঞ্জন কাকাকে দিবে, আর এক ভাগ তুমি লইবে। ব্রত-নিয়ম ধর্ম্ম-কর্ম্ম দানধ্যান করিয়া জীবন যাপন করিবে। মনুষ্য-জীবন কয় দিন? কঙ্কাবতী! দেখিতে দেখিতে কাটিয়া যাইবে। তাহার পর এখন আমি যেখানে যাইতেছি, সেইখানে তুমিও যাইবে; দুই জনে পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে।"

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"তোমার কথা শুনিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে, প্রাণে বড় ভয় হইতেছে।—হায়! আমি কি করিলাম। কি বিপদের কথা? কি নিদারুণ কথা? এখন কোথায় তুমি যাইবে? আমাকে ভাল করিয়া সকল কথা তুমি বল।"

খেতু বলিলেন,—"তবে শুন। এই অট্টালিকার যা ধন দেখিতেছ, ইহার প্রহরিণীস্বরূপ নাকেশ্বরী নামধারিণী এক ভয়ঙ্করী ভূতিনী আছে। সুড়ঙ্গের দ্বারে সর্ব্বদা সে বসিয়া থাকে। যে কেহ তাহার এই ধন স্পর্শ করিবে, মুহূর্ত্তের মধ্যে সে তাহাকে খাইয়া ফেলিবে। আমি এই ধন লইয়াছি। কিন্তু যে শিকড়টি তুমি দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছ, সেই শিকড়ের দ্বারা এতদিন আমি রক্ষিত হইতেছিলাম। তা' না হইলে এতদিন কোন্ কালে নাকেশ্বরী আমাকে খাইয়া ফেলিত! শিকড় নাই, এ কথা নাকেশ্বরী এখনও বোধ হয় জানিতে পারে নাই। কিন্তু শীঘ্র সে জানিতে পারিবে। জানিতে পারিলেই সে এখানে আসিয়া আমাকে মারিয়া ফেলিবে। নাকেশ্বরীর হাত হইতে নিস্তার পাইবার উপায় বা এখান হইতে বাহিরে যাইবার অন্য উপায় নাই। তা থাকিলেও কোনও লাভ নাই। বনে যাই কি জলে যাই, গ্রামে যাই কি নগরে যাই, যেখানে যাইব, নাকেশ্বরী সেইখানে গিয়া আমাকে মারিয়া ফেলিবে।"

এই কথা শুনিয়া, কঙ্কাবতী খেতুর পা-দুটি ধরিয়া সেইখানে শুইয়া পড়িলেন।

খেতু বলিলেন,—"কঙ্কাবতী! কাঁদিও না। কাঁদিলে আর কি হইবে? যাহা অদৃষ্টে ছিল, তাহা ঘটিল। সকলি তাঁর ইচ্ছা। উঠ, যাও, আস্তে আস্তে সুড়ঙ্গ দিয়া বাহিরে যাও। এখনি নাকেশ্বরী এখানে আসিবে। তাহাকে দেখিলে তুমি ভয় পাইবে। যাও, বাড়ী যাও; মা'র কাছে যাইলে, তবু তোমার প্রাণ অনেকটা সুস্থ হইবে।"

কঙ্কাবতী বলিলেন, "আমি তোমাকে এইখানে ছাড়িয়া যাইব? তোমাকে এইখানে ছাড়িয়া নাকেশ্বরীর ভয়ে প্রাণ লইয়া আমি পলাইব? তা যদি করি, তো ধিক্ আমার প্রাণে, ধিক্ আমার বাঁচনে। শত ধিক্ আমার প্রাণে! শত ধিক্ আমার বাঁচনে! তোমার কঙ্কাবতী অল্পবুদ্ধি বালিকা বটে, সেইজন্য সে তোমার আজ্ঞা অবজ্ঞা করিয়াছে। তা বলিয়া কঙ্কাবতী নরকের কীট নয়! নাকেশ্বরী হাত হইতে তোমাকে উদ্ধার করিতে পারি ভাল; না পারি তোমারও যে গতি, আমারও সেই গতি। যদি তোমার মৃত্যু, তো আমারও মৃত্যু। কঙ্কাবতী মরিতে ভয় করে না। তোমাকে ছাড়িয়া কঙ্কাবতী ও পৃথিবীতে থাকিতেও চায় না! কঙ্কাবতীর এই প্রতিজ্ঞা। কঙ্কাবতী নিশ্চয় আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবে।"

খেতু, কঙ্কাবতীর মুখপানে চাহিয়া দেখিলেন। কঙ্কাবতীর মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁর প্রতিজ্ঞা অটল, অচল। কঙ্কাবতীর চক্ষে আর জল নাই, কঙ্কাবতীর মুখে ভয়ের চিহ্নমাত্র নাই। খেতু ভাবিলেন,—"কঙ্কাবতীকে আর যাইতে অনুরোধ করা বৃথা।"

দশম পরিচ্ছেদ – চুরি

খেতু বলিলেন,—"কঙ্কাবতী! যদি নিতান্ত তুমি এখান হইতে পলাইবে না, তবে তোমাকে সকল কথা বলি,—শুন। তুমি বালিকা, তা'তে জন-শূন্য এই নির্জন অরণ্যের মধ্যে আমাদের বাস। ঘরের দ্বারে ভয়ঙ্করী নাকেশ্বরী। পাছে তুমি ভয় পাও, তাই এতদিন সকল কথা তোমাকে বলি নাই। এখন বলি,—শুন। কিন্তু কথা আমার শেষ হইলে হয়। শিকড় পোড়ার গন্ধ পাইলেই বোধ হয় নাকেশ্বরী জানিতে পারিবে যে, আমার কাছে আর শিকড় নাই। তখনি সে ভিতরে আসিয়া আমার প্রাণবধ করিবে। আমার কথা শেষ হইতে না হইতে পাছে আসিয়া পড়ে, সেই ভয়।

"মাতার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া, আমি কাশী অভিমুখে যাত্রা করিলাম। কলিকাতায় না গিয়া কি জন্য পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিলাম, সে কথা তোমাকে আমি পুর্ব্বেই বলিয়াছি। কাশীতে উপস্থিত হইয়া মাতার শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সমাপ্ত করিলাম। তাহার পর কর্ম্ম-কাজের অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। সৌভাগ্যক্রমে অবিলম্বেই একটি উত্তম কাজ পাইলাম। অতিশয় পরিশ্রম করিতে হইত সত্য, কিন্তু বেতন অধিক ছিল। এক বৎসরের মধ্যে অনেক গুলি টাকা সঞ্চয় করিতে পারিব,এরূপ আশা হইল। কেবল মাত্র শরীরে প্রাণ রাখিতে যাহা কিছু আবশ্যক, সেইরূপ যৎসামান্য ব্যয় করিয়া, অবশিষ্ট টাকা আমি তোমার বাপের জন্য রাখিতে লাগিলাম।

সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া এক এক দিন সন্ধ্যা বেলা, এরূপ ক্ষুধা পাইত যে, ক্ষুধায়

দাঁড়াইতে পারিতাম না, মাথা ঘুরিয়া, পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইত। কিন্তু রাত্রিতে আর কিছু খাইতাম না। জল-খাবার নয়, কেবল খালি জল, তাই পান করিয়া উদর পূর্ণ করিতাম। তাহাতে শরীর অনেকটা সুস্থ হইত; কিছুক্ষণের নিমিত্ত ক্ষুধার জ্বালাও নিবৃত হইত। তাহার পর শয়ন করিলে নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িতাম, ক্ষুধার জ্বালা আর জানিতে পারিতাম না। জল আনিবার জন্য কাহাকেও একটি পয়সা দিতাম না। একটি বড় লোটা কিনিয়াছিলাম। সন্ধ্যার পর, যখন কেহ আমাকে চিনিতে পারিবে না, সেই সময়ে আপনি গিয়া গঙ্গার ঘাট হইতে জল আনিতাম। কাশীতে গঙ্গার ঘাট বড় উচ্চ। জল আনিতে গিয়া একদিন অন্ধকার রাত্রিতে আমি পড়িয়া গিয়াছিলাম। হাতে ও পায়ে অতিশয় আঘাত লাগিয়াছিল। কোনও মতে উঠিয়া সেই ঘাটের একটি সোপানে বসিলাম। কঙ্কাবতী! সেইখানে বসিয়া কত যে কাঁদিলাম, তাহা আর তোমাকে কি বলিব!

মনে মনে করিলাম যে, হে ঈশ্বর! আমি কি পাপ করিয়াছি? যে, তাহার জন্য আমার এ ঘোর 'শাস্তি!' কেন লোকে সংসার পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করে, তাহা বুঝিলাম। নিজের সুখ-দুঃখ যিনি কেবল নিজের উপর নির্ভর করেন, এ জগতে শান্তির আসা কেবল তিনিই করিতে পারেন। যাঁহারা পাঁচটা লইয়া থাকেন, পাঁচটার ভালমন্দের উপর যাঁহারা আপনাদিগের সুখ-দুঃখ নির্ভর করেন, তাঁহাদের আবার এ জগতে শান্তি কোথায়? যা'রে আমি ভালবাসি, যার জীবনের সহিত আমার জীবন জড়িত করিয়া রাখিয়াছি, যা'র মঙ্গল-কামনা সতত করিয়া থাকি, সে কি অকর্ম্ম-দুষ্কর্ম্ম করিবে, তাহা আমি কি করিয়া জানিব? তাহার কর্ম্মের উপর আমার কোনও অধিকার নাই, অথচ তাহার অসুখ, তাহার ক্লেশ দেখিলে হৃদয় আমার ঘোরতর ব্যথিত হয়।

আবার সে নিজে যদিও কোনও দুষ্কর্ম্ম না করে, কি নিজে নিজের অসুখের কারণ না হয়, পরের অত্যাচারে সে প্রপীড়িত হইতে পারে। আমি হয়ত ত পরের অত্যাচার হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে অসমর্থ। নিরুপায় হইয়া প্রাণসম সেই প্রিয় বস্তুর যাতনা আমাকে দেখিতে হয়। এই ধর,—যেমন তোমার প্রতি পিতা মাতার পীড়ন; তাহার আমি কি করিতে পারিয়াছিলাম? চারিদিকে সাধুদিগের ধূনী দেখিয়া তখন আমার মনে এইরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল। আবার ভাবিলাম,—এই সংসার-ক্ষেত্র প্রকৃত যুদ্ধক্ষেত্র! নানা পাপ, নানা দুঃখ, এই সংসারে অহরহ বিচরণ করিতেছে। কোটি কোটি প্রাণী সেই পাপে, সেই তাপে তাপিত হইয়া সংসার-যাতনা ভোগ করিতেছে।

আমি—যা'র জ্ঞান-চক্ষু তাহাদের চেয়ে অনেক পরিমাণে উন্মীলিত হইয়াছে, পাপ-তাপের সহিত যুদ্ধ করিতে যে অধিকতর সুসজ্জিত হইয়াছে, আমি কি সে যুদ্ধে পরাঙ্‌মুখ হইব? জগতের হিতের নিমিত্ত অহিতের সহিত যুদ্ধ না করিয়া কাপুরুষের ন্যায় পরাজয় মানিয়া, নির্জ্জন গভীর কাননে গিয়া বসিয়া থাকিব? কঙ্কাবতী! এইরূপ কত কি যে ভাবিলাম, তাহা আর তোমাকে কি বলিব!

"আস্তে আস্তে পুনরায় জল লইয়া বাটী প্রত্যাগমন করিলাম। এইরূপে এক বৎসর গত

হইল। এই সময়ের মধ্যে প্রায় দুই সহস্র টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলাম। মনে করিলাম,—এই টাকা পাইলে, তোমার পিতা পরিতোষ লাভ করিবেন। তোমাকে আমি পাইব। টাকাগুলি লইয়া দেশাভিমুখে যাত্রা করিলাম। সমুদয় নগদ টাকা ছিল, নোট লই নাই; কারণ, নোটের প্রতি আমাদের গ্রামের লোকের আস্থা নাই।

একটি ব্যাগের ভিতর টাকাগুলি লইয়া রেলগাড়িতে চড়িলাম। ব্যাগটি আপনার কাছে অতি যত্নে অতি সাবধানে রাখিলাম। পাছে কেহ চুরি করে, পাছে কেহ লয়, এই ভয়ে একবারও গাড়ী হইতে নামি নাই। যখন সন্ধ্যা হইল, তখন বড় একটি স্টেশনে আসিয়া গাড়ী থামিল। সেখানে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গাড়ী দাঁড়াইবে। আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছিল। তবুও জলখাবার কিনিবার জন্য গাড়ী হইতে আমি নামিলাম না। সে গাড়ীতে আর একটি অপরিচিত লোক ছিল,—অন্য আর কেহ ছিল না। সে লোকটি নিজের জন্য জল-খাবার আনিতে গেল। যাইবার সময় সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,—'মহাশয়! আপনার যদি কিছু প্রয়োজন থাকে তো বলুন, আমি আনিয়া দিই।' আমি উত্তর করিলাম,—'যদি তুমি আনিয়া দাও, তাহা হইলে আমি উপকৃত হইব।' এই বলিয়া, জল-খাবার কিনিবার নিমিত্ত তাহাকে আমি পয়সা দিলাম, সে আমাকে জল-খাবার আনিয়া দিল। আমি তাহা খাইলাম। অল্পক্ষণ পরে আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল! মনে করিলাম,—'গাড়ীর উত্তাপে এইরূপ হইয়াছে।' একটু শুইলাম। শুইতে না না শুইতে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম। চৈতন্য কিছু মাত্র রহিল না।

প্রাতঃকাল হইলে অল্পে অল্পে জ্ঞানের উদয় হইল। কিন্তু মাথা বড় ব্যথা করিতে লাগিল, মাথা যেন তুলিতে পারি না। যাহা হউক, জ্ঞান হইলে দেখি যে, শিয়রে আমার ব্যাগ নাই। চারিদিকে চাহিয়া দেখি যে, গাড়ীতে সে লোকটা নাই। আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়িল। আস্তে-আস্তে উঠিয়া গাড়ীর চারিদিক্ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলাম। ব্যাগ নাই। ব্যাগ দেখিতে পাইলাম না। আমার যে ঘোর সর্ব্বনাশ হইয়াছে, এখন তাহা নিশ্চয় বুঝিলাম। এক বৎসর ধরিয়া, এত কষ্ট পাইয়া, জল খাইয়া, যে টাকা আমি সঞ্চয় করিয়াছিলাম, আজ সে টাকা আমার নাই।

কিরূপ মর্ম্মভেদী অসহ্য যাতনা অমার মনের ভিতর তখন হইল, একবারও বুঝিয়া দেখ! কঙ্কাবতী! মানুষের মনে এরূপ নিষ্ঠুরতা কোথা হইতে আসিল? যদি এ নিষ্ঠুরতা নরক না হয়, তবে নরক আবার কি? কঙ্কাবতী! মানুষ মানুষকে এরূপ যাতনা দেয় কেন? পরকে যাতনা দিতে, তাদের কি ক্লেশ হয় না?"

অনেকক্ষণ পরে কঙ্কাবতীর চক্ষুতে জল আসিল, কঙ্কাবতী কাঁদিতে লাগিলেন। কঙ্কাবতী বলিলেন,—"ভাল হইয়াছে। —কাজ নাই আর এ জগতে থাকিয়া। চল আমরা এ জগৎ হইতে যাই। নাকেশ্বরী আমাদের শত্রু নয়,—নাকেশ্বরী আমাদের পরম মিত্র।"

খেতু বলিলেন,—"কান পাতিয়া শুন দেখি! নাকেশ্বরীর কোনও সাড়া-শব্দ পাও কি না?" কঙ্কাবতী একটু কান পাতিয়া শুনিলেন, তাহার পর বলিলেন,—"না—কোনরূপ

সাড়া-শব্দ নাই।" —খেতু পুনরায় বলিলেন,—"তবে শুন, তাহার পর কি হইল। নাকেশ্বরী আসিতে আসিতে সকল কথা বলিয়া লই।"

"যখন বুঝিলাম যে, আমার টাকাগুলি চুরি গিয়াছে, তখন মনে করিলাম,—'আজ আমার সকল আশা নির্ম্মুল হইল!" যে লোকটি আমার সঙ্গে গাড়ীতে ছিল সে চোর। জল-খাবারের সঙ্গে সে কোনও প্রকার মাদক দ্রব্য মিশাইয়া দিয়াছিল। সেই জল-খাবার খাইয়া যখন আমি অজ্ঞান হইয়া পড়ি, তখন সে আমার টাকাগুলি লইয়া পলাইয়াছে। কখন কোন্ ষ্টেশনে নামিয়া গিয়াছে, তাহা আমি কি করিয়া জানিব? সুতরাং চোর ধরা পড়িবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। তবু, রেলের কর্ম্মচারীদিগকে সকল কথা জানাইলাম। আমাকে সঙ্গে লইয়া, সমস্ত গাড়ী তাঁহারা অনুসন্ধান করিলেন।

"কোনও গাড়ীতে সে লোকটিকে দেখিতে পাইলাম না। তখন আমি পৃথিবী শূন্য দেখিতে লাগিলাম! কঙ্কাবতী! এই যে মনুষ্যজীবন দেখিতেছ, কেবল কতকগুলি আশা ও হতাশা, এই লইয়াই মনুষ্যজীবন। কি করিব আর, কঙ্কাবতী! চুপ করিয়া রহিলাম। ভাবিতে লাগিলাম—'এখন করি কি? যাই কোথায়? কলিকাতা যাই, কি কাশী ফিরিয়া যাই, কি দেশে যাই।' তারপর মনে পড়িল যে রাণীগঞ্জের টিকিটখানি, আর গুটি-কত পয়সা ভিন্ন হাতে আর কিছুই নাই যাহা হউক, হাতে পয়সা থাকুক আর নাই থাকুক, দেশে আসাই যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিলাম। কারণ তোমাকে বলিয়াছিলাম যে, এক বৎসর পরে ফিরিয়া আসিব। তুমি পথ পানে চাহিয়া থাকিবে।

হয় তো কত তাড়না, কত গঞ্জনা, কত লাঞ্ছনা তোমাকে সহ্য করিতে হইতেছে। মনে করিলাম,—'তোমার বাপের পায়ে গিয়া ধরি, তাঁহাকে দুই হাজার টাকার·খত লিখিয়া দিই, মাসে মাসে টাকা দিয়া ঋণ-পরিশোধ করিব। কঙ্কাবতী! বার-বার তোমার বাপের কথা মুখে আনিতে মনে বড় ক্লেশ হয়। তিনি কেন যাই হউন না, তোমার পিতা তো বটে। তাঁর কথা বলিতে গেলেই যেন নিন্দা হইয়া পড়ে।

মনে করিয়াছিলাম, এখান হইতে প্রচুর ধন দিয়া, ধনের উপর তাঁহার বিতৃষ্ণা করিয়া দিব!' পৃথিবীর আর একটি রোগ দেখ, কঙ্কাবতী। ধনের জন্য সবাই উন্মত্ত, ধনের জন্য সবাই লালায়িত। পেটে কত-কটি খাই, কঙ্কাবতী!

গায়ে কি পরি? যে ধন-পিপাসায় এক তৃষিত হইব! হা! ধন উপার্জ্জনের আবশ্যক কেন না, ইহা দ্বারা আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের উপকার করিতে পারা যায়, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় প্রদান করিতে পারা যায়, ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দিকে পারা যায়, দায়গ্রস্তকে দায় হইতে মুক্ত করিতে পারা যায়, অনেক পরিমাণে দুঃখময় জগতের দুঃখ মোচন করিতে পারা যায়।

"যাঁহার দ্বারা অনেকের-উপকার হয়, যিনি আমোদ-প্রমোদে বিরত হইয়া, ভোগ-বিলাস পরিহার করিয়া, জগতের হিতের নিমিত্ত অর্থোপার্জ্জনের যা জ্ঞানো-পার্জ্জনে সময় অতিবাহিত করেন, তিমিরাবৃত এই সংসারে তিনি দেবতাস্বরূপ। কিন্তু তা বলিয়া কঙ্কাবতী! ধনোপার্জ্জনে লোক যেন উন্মত্ত না হয়।

জ্ঞানোপার্জ্জনে ও ধনোপার্জ্জনে লোক উন্মত্ত হয় হউক। মেঘের বর্ষণ, প্রবল প্রভঞ্জনের গভীর গর্জ্জন, পৃথিবীর নিম্ন প্রদেশেই ঘটিয়া থাকে। উর্দ্ধপ্রদেশে সেই মহা আকাশে সব স্থির, সব শান্ত।

সেইরূপ মানবের এই কর্ম্মক্ষেত্রেও উচ্চতা নীচতা আছে। ধন মান জাত ধর্ম্ম লইয়া যত কিছু কোলাহল শুনিতে পাও, অজ্ঞানতাময় নাচ-পথাশ্রিত মানব মন হইতেই সে সমুদয় উত্থিত হয়। এই মৃত্যু-সময়ে পাও, মোহান্ধ, নিম্ন-পথাবলম্বী মানব কুলের বৃথা-বিসংবাদ প্রত্যক্ষ দেখিয়া, কঙ্কাবতী! আমি আর হাস্য-সংবরণ করিতে পারিতেছি না।

"কলিকাতা কি কাশী না গিয়া বাড়ী যাইব, এইরূপ মনে মনে স্থির করিয়া রাণীগঞ্জে নামিলাম। রাণীগঞ্জ হইতে আমাদের গ্রামে আসিতে দুইটি পথ আছে। একটি রাজপথ, যাহা দিয়া অনেক লোক গতি-বিধি করে, দ্বিতীয়টি বনপথ, যাহাতে বাঘ-ভাল্লুকের ভয় আছে, সেজন্য সে পথ দিয়া লোকে বড় যাতায়াত করে না। বনপথটি কিন্তু নিকট। সে পথটি দিয়া আসিলে পাঁচ দিনে আমাদের গ্রামে উপস্থিত হইতে পারা যায়, রাজপথ দিয়া যাইলে ছয় দিন লাগে। রাণীগঞ্জে যখন নামিলাম, তখন আমার হাতে কেবল চারিটি পয়সা ছিল। শীঘ্র গ্রামে পৌঁছিব, সে নিমিত্ত আমি বন-পথটি অবলম্বন করিলাম।

প্রথম দিনেই পয়সা কয়টি খরচ হইয়া গেল। পাহাড় পর্ব্বত, বন-উপবন, নদীনির্ঝর অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিলাম। বনের ফল-মূল যাহা কিছু পাই, তাহাই খাই। রাত্রিতে যে দিন গ্রাম পাই, সে দিন কাহারও দ্বারে পড়িয়া থাকি। যে দিন গ্রাম না পাই সে দিন গাছতলায় শুইয়া থাকি। মনে করিলাম আমাকে বাঘ-ভাল্লুকে কিছু বলিবে না, তার জন্য কোন চিন্তা নাই। আমাকে যদি বাঘ ভাল্লুকে খাইবে, তবে পৃথিবীতে এমন হতভাগ্য আর কে আছে যে, এ দুঃখ সব ভোগ করিবে।

"এই চারিদিন কাটিয়া গেল। আমাদের গ্রাম হইতে যে উচ্চ পর্ব্বতটি দেখিতে পাওয়া যায় সন্ধ্যাবেলা আমি সেই পর্ব্বতের নিম্নদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেই পর্ব্বতটি এই; যাহার ভিতর এক্ষণে আমরা রহিয়াছি। এখান হইতে আমাদিগের গ্রাম প্রায় এক দিনের পথ। কয় দিন অনাহারে ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম। মনে করিলাম, প্রাতঃকালে আরও অধিক দুর্ব্বল হইয়া পড়িব, তাহার চেয়ে সমস্ত রাত্রি চলি, সকাল বেলা গ্রামে গিয়া পৌঁছিব। এইরূপ ভাবিয়া, সে রাত্রিতে আর বিশ্রাম না করিয়া, ক্রমাগত চলিতে লাগিলাম! —রাত্রি এক প্রহরের পর চন্দ্র অস্ত যাইলেন, ঘোরতর অন্ধকারে বন আচ্ছন্ন হইল, আমি পথ হারাইলাম। নিবিড় বনের মধ্যে গিয়া পড়িলাম, কোনও দিকে আর পথ পাই না। একবার অগ্রে যাই, একবার পশ্চাতে যাই, একবার দক্ষিণে যাই, একবার বামদিকে যাই, পথ আর কোনও দিকে পাই না। —অনেকক্ষণ ধরিয়া অতি কষ্টে বনের ভিতর ঘুরিয়া বেড়াইলাম, পথ কিন্তু কিছুতেই পাইলাম না।

অবশেষে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। এমন সময়, সম্মুখে একটি মন্দির দেখিতে পাইলাম। মন্দিরটি দেখিয়া আমার মৃতপ্রায় দেহে পুনরায় প্রাণের সঞ্চার হইল।

ভাবিলাম, অবশ্য এই স্থানে লোক আছে। আর কিছু পাই না পাই, এখন একটু জল পাইলে প্রাণ রক্ষা হয়। এই ভাবিয়া,তৃষিত চাতকের ন্যায় ব্যগ্রতার সহিত মন্দিরের দিকে যাইলাম।

হা অদৃষ্ট! গিয়া দেখিলাম, মন্দিরে দেবী নাই, মন্দিরটি অতি প্রাচীন, ভগ্ন; ভিতর ও বাহির বন্য বৃক্ষলতায় আচ্ছাদিত! বহুকাল হইতে জনমানবের সেখানে পদার্পণ হয় না। 'হা ভগবান্! তোমার মনে আর ও কত কি আছে।' এই বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সেইখানে আমি শুইয়া পড়িলাম।

একাদশ পরিচ্ছেদ – ভূত-কোম্পানী

খেতু বলিলেন,—"রাত্রি প্রায় দুই প্রহর হইয়াছে, অতিশয় ভ্রান্তি বশতঃ আমার একটু নিদ্রার আবেশ হইয়া আসিতেছে, এমন সময় মন্দিরের সোপানে কি ঠক্ ঠক্ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল। চাহিয়া দেখি না, ভীষণাকার শ্বেতবর্ণ এক মড়ার মাথা। একটি পৈটা হৈতে অন্য পৈটার উপর লাফাইয়া উঠিতেছে। কঙ্কাবতী! ভয় আমার শরীরে কখনও, নাই, তবুও এই মড়ার মাথার কাণ্ড দেখিয়া আমার শরীর কেমন একটু রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। আমি উঠিয়া বসিলাম। মড়ার মাথাটি লাফাইয়া সমস্ত পৈটাগুলি উঠিল, তারপর ভাঁটার মত গড়াইতে গড়াইতে আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। আমার নিকট আসিয়া একটি লাফ মারিল, লাফ মারিয়া আমার ঠিক মুখের সন্মূখে শূণ্যেতে কিছুক্ষণের নিমিত্ত আমার দিকে চাহিয়া রহিল। সেইখানে থাকিয়া আকর্বণ হাঁ করিয়া দন্তপাঁতি বাহির করিল।

এইরূপ বিকটাকার হাঁ করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবু! তুমি না কি ভূত মানো না?" —আমি উত্তর করিলাম,—'রক্ষা করুন, মহাশয়! আপনারা পর্যন্ত আর আমার সহিত লাগিবেন না। নানা কষ্টে, নানা দুঃখে আমি বড়ই উৎপীড়িন হইয়াছি। যান, ঘরে যান! আমাকে আর জ্বালাতন করিবেন না।"

আমার কথায় মুণ্ডুটির আরও ক্রোধ হইল। চীৎকার করিয়া সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবু! তুমি নাকি ভূত মানো না? ইংরেজী পড়িয়া তুমি নাকি ভূত মানো না?"

আমি বলিলাম,—'ইংরেজি-পড়া বাবুরা ভূত মানেন না বলিয়া কি আপনার রাগ হইয়াছে? লোকে ভূত না মানিলে কি আপনাদের অপমান বোধ হয়?"

মড়ার মুণ্ডু উত্তর করিল,—"রাগ হইবে না তো কি, সর্ব্বশরীর শীতল হইবে? ভূত না মানিলে ভূতদিগের অপমান হয় না তো কি আর মর্য্যাদা বাড়ে? কেন লোকে বলিবে যে, পৃথিবীতে ভূত নাই? ইংরেজী-পড়া বাবুদের আমরা কি করিয়াছি যে, তাহারা আমাদিগকে পৃথিবী হইতে একেবারে উড়াইয়া দিবে। দেবতাদিগকে তোমরা উড়াইয়া দিয়াছ, এখন এই উপদেবতা কয়টাকে শেষ করিতে পারিলেই হয়। বটে!"

দুঃখের সময়ও হাসি পায়! দেবতাদিগকে না মানিলে না পূজা দিলে, দেবতাদিগের রাগ হয়, দেবতারা মুখ হাঁড়ি করিয়া বসিয়া থাকেন, এ কথা পূর্ব্বে জানিতাম; কিন্তু লোকে ভূত না মানিলে, ভূতের রাগ হয়, ভূতের অপমান হয়, এ কথা কখনও শুনি নাই। আমার তাই

হাসি পাইল। আমি বলিলাম,—"হাঁ মহাশয়! ইংরেজী-পড়া বাবুদের এটি অন্যায় বটে।"

আমার কথায় মড়ায় মাথা কিছু সন্তুষ্ট হইল, অনেকটা তাহার রাগ পড়িল। মুণ্ড বলিল,—"তুমি ছোকরা দেখিতেছি ভাল। ইংরেজী-পড়া বাবুদের মত ত্রিপণ্ড নাস্তিক নও! তোমার মাথায় টিকি আছে?" আমি বলিলাম,—"না মহাশয়! আমার মাথায় টিকি নেই।"

মুণ্ড বলিল,—এইবার ঘরে গিয়া টিকি রাখিও। আর শুন, ইংরেজী-পড়া বাবুদের আমরা সহজে ছাড়িব না। যাহাতে পুনরায় ভূতের উপর তাহাদিগের বিশ্বাস জন্মে, আমরা সে সমুদয় আয়োজন করিয়াছি। আমরা তাহাদিগকে ভজাইব। যেখানে সেখানে গিয়া বক্তৃতা করিব, পুস্তক ছাপাইব, সংবাদ-পত্র বাহির করিব। এই সকল কার্য্যের নিমিত্ত আমরা কোম্পানী খুলিয়াছি। কোম্পানীর নাম রাখিয়াছি, "স্কল, স্কেলিটন এণ্ড কোং!"

'কঙ্কাবতী! তোমার বোধ হয়, মনে থাকিতে পারে যে, "স্কল" মানে মনুষ্যের মাথার খুলি, "স্কেলিটন" মানে কঙ্কাল, অর্থাৎ অস্থি-নিৰ্ম্মিত মনুষ্য-শরীরের কাঠামো। মুণ্ড যাহা বলিল, তাহার অর্থ এই যে, ইংরেজী-পড়া লোকেরা যাহাতে ভূতের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাঁহাদের মনে যাহাতে ভূতের উপর বিশ্বাস হয়, ভূতের প্রতি ভক্তি হয়, এইরূপ শিক্ষা দিবার নিমিত্ত খুলি, কঙ্কাল প্রভৃতি ভূতগণ দলবদ্ধ হইয়াছেন।

স্কল অর্থাৎ সেই মড়ার মাথাটি আমাকে পুনরায় বলিলেন,—"আমরা কোম্পানী খুলিয়াছি। কোম্পানীর নাম রাখিয়াছি, 'স্কল স্কেলিটন এণ্ড কোং।' ইংরেজী নাম রাখিয়াছি কেন, তা জান? তাহা হইলে পসার বাড়িবে, মান হইবে, লোকের মনে বিশ্বাস জন্মিবে। যদি নাম রাখিতাম 'খুলি, কঙ্কাল এবং কোম্পানী' তাহা হইলে কেহই আমাদিগকে বিশ্বাস করিত না। সকলে মনে করিত, ইহারা জুয়াচোর। দেখিতে পাও না? যে, যখন মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়ও চট্টোপাধ্যায় মহাশয়েরা জুতা কি শরাপ কি হ্যাম বা শুকরের মাংসের দোকান করেন, তখন সে দোকানের নাম দেন, 'লংম্যান এণ্ড কোং।' অথবা 'গুডম্যান এণ্ড কোং।' দেখিয়া শুনিয়া শত-সহস্র বার ঠকিয়া দেশী লোককে আর কেহ বিশ্বাস করে না। বরং ইংক্রুজ পিংক্রুজ দোকানীর কথা লোকে বিশ্বাস করে, তবু দেশী দোকানীর কথা লোকে বিশ্বাস করে না। আবার দেখ, বেদের কথা বল, শাস্ত্রের কথা বল, বিলাতী সাহেবেরা যদি ভাল বলেন, তবেই বেদ পুরাণ ভাল হয়। দেশী পণ্ডিতদের কথা কেহ গ্রাহ্য করে না। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া আমাদের কোম্পানীর নাম দিয়াছি 'স্কল স্কেলিটন এণ্ড কোং।' স্কেলিটন ভায়া ঐখানে দাঁড়াইয়া আছেন। এস তো, স্কেলিটন ভায়া, একটু এদিকে এসে তো।"

হাড় ঝম্ ঝম্ করিতে করিতে স্কেলিটন আমার নিকটে আসিলেন। সৰ্ব্বশরীরের অস্থিকে স্কেলিটন বলে, কিন্তু এক্ষণে আমার সম্মুখে যিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তিনি দেখিলাম মুণ্ডহীন স্কেলিটন। —তখন স্কল আমাকে পুনরায় বলিলেন,—"কেমন! ভূতের উপর এখন তোমার সম্পূর্ণরূপ বিশ্বাস হইয়াছে তো?"

আমি উত্তর করিলাম,—"পূৰ্ব্ব হইতেই আমার বিশ্বাস আছে। কারণ, ভূতের ষড়যন্ত্রেই

আমি এত দিন ধরিয়া ক্লেশ ভোগ করিতেছি, কিন্তু সে অন্য প্রকার ভূত। এখন হইতে আপনাদিগের মত ভূতকে মানিয়া লইলাম। প্রত্যক্ষ চক্ষের উপর দেখিয়া আর কি করিয়া না মানি? তার জন্য আর আপনারা কোনও চিন্তা করিবেন না; যান, এক্ষনে ঘরে যান। রাত্রি অধিক হইয়াছে। আপনাদিগের ঘরের লোক ভাবিবে। আর আমাকে একটু নিদ্রা যাইতে হইবে। কারণ, কা'ল প্রাতঃকালে আবার আমাকে পথ চলিতে হইবে।"

স্কল তখন স্কেলিটনকে বলিলেন,—"দেখিলে, স্কেলিটন ভায়া! কোম্পানী খুলিলে কত উপকার হয়। ইংরেজী পড়িয়া এই বাবুটির মতি-গতি একেবারে বিকৃত হইয়া গিয়াছিল। দু'কথাতেই পুনরায় ইঁহাকে স্বধর্ম্মে আনয়ন করিলাম। এক্ষণে চল, অন্যান্য বিকৃতমতি বাবুদিগকে অন্বেষণ করি। ভূতবর্গের প্রতি যাহাতে তাঁহাদের শ্রদ্ধা-ভক্তি হয়, চল, সেইরূপ উপায় করি।"

স্কেলিটন হাড়ঝম্ ঝম্ করিলেন। আমি একটু কান পাতিয়া শুনিলাম যে, সে কেবল হাড় ঝম্ ঝম্ নয়। তাঁহার মুণ্ড নাই, সুতরাং মুখ দিয়া কথা কহিবার তাঁহার উপায় নাই। সে জন্য গায়ের হাড় নাড়িয়া হাড় ঝম্ ঝম্ করিয়া তিনি কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সে কথা আমি অনায়াসে বুঝিতে পারিলাম।

স্কেলিটন বলিলেন,—"যদি ইনি ভূতভক্ত হইলেন, তবে ইঁহাকে পুরস্কার দেওয়া উচিত। লোককে ভক্ত করিতে হইলে অর্থদান একটি তাহার প্রধান উপায়। অর্থ পাইলে লোকে অতি ধর্ম্মবান্, অতি ভক্তিমান্ মহাপুরুষ হয়। অতএব তুমি ইঁহাকে ধন দান কর। যখন দেশে গিয়া, ইনি গল্প করিবেন, তখন শত শত লোক অর্থলোভে ভূতভক্ত হইবে।"

আমি বলিলাম,—'সম্প্রতি আমার অর্থের নিতান্ত প্রয়োজন আছে বটে কিন্তু আমি অর্থলোভী নই। ধন দিয়া আমাকে ভূতভক্ত করিতে হইবে না। আপনাদের অর্থ লইব না।"

এই কথা শুনিয়া স্কল আরও প্রসন্নমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তিনি বলিলেন,—"এস্, আমাদের সঙ্গে এস। আমাদের সঞ্চিত ধন তোমাকে দিলে ধনের সাফল্য হইবে, ধন সুপাত্রে অর্পিত হইবে, সে ধন দ্বারা মঙ্গল সাধিত হইবে সেই জন্য তোমাকে আমাদের সঞ্চিত ধন দিব। জীবিত থাকিতে আমরা ধনের সদ্ব্যবহার করি নাই। এক্ষণে তোমা কর্ত্তৃক সে ধনের সদ্ব্যবহার হইলে, আমাদের উপকার হইবে।"

স্কেলিটনও আমাকে সেইরূপ অনেক অনুরোধ করিলেন। দুই ভূতের অনুরোধে আমি তাঁহাদিগের সঙ্গে চলিলাম। স্কেলিটন হাঁটিয়া চলিলেন, আর স্কল স্থানবিশেষে লাফাইয়া বা গড়াইয়া যাইতে লাগিলেন। প্রথমে তাঁহারা আমাকে অনেকগুলি-বৃক্ষের নিকট লইয়া যাইলেন। আম্র, কদলী পনস, কেন্দু পিয়াল নানা ফল সেইখানে সুপক্ক হইয়াছিল। সেই ফল আমাকে তাঁহারা আহার করিতে বলিলেন। আমি আহার করিলাম। তাহার পর তাহাঁরা আমাকে সুশীতল স্ফটিকসদৃশ নির্ঝর দেখাইয়া দিলেন। জলপান করিয়া পিপাসা দূর করিলাম। সেখান হইতে আমরা পুনরায় চলিলাম। অল্পক্ষণ পরে এই পর্ব্বতের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলাম। পর্ব্বতের এক স্থানে আসিয়া স্কল বলিলেন,—"এই খানকার

বন আমাদিগকে একটু পরিষ্কার করিতে হইবে। আজ সহস্র বৎসর ধরিয়া এখানে জনমানব পদাপর্ণ করে নাই।" আমরা তিন জনে অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই বন পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। পরিষ্কৃত হইলে পর্ব্বতের গাঁথুনির ঈষৎ একটু রেখা বাহির হইয়া পড়িল। সুড়ঙ্গ দ্বারে ভয়ঙ্করী নাকেশ্বরী দেখিলাম। নাকেশ্বরী খল খল করিয়া হাসিল। কিন্তু যেই স্কল চক্ষু-কোটর বিস্তৃত করিয়া তাহার দিকে কোপ কটাক্ষ করিলেন, আর সে চুপ করিল। সুড়ঙ্গের পথ দিয়া আমরা এই অট্টালিকার ভিতরে প্রবেশ করিলাম। এই বিপুল ধনরাশি দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইলাম।

স্কল বলিলেন,—"সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই অঞ্চলের আমরা রাজা ছিলাম। প্রতিবেশী রাজগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া এই অপরিমিত ধন অর্জ্জন করি। জীবিত থাকিতে ধর্ম্ম-কর্ম্ম কিছুই করি নাই, কেবল যুদ্ধ ও ধনসঞ্চয় করিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলাম। আমাদের সন্তান সন্ততি ছিল না। সে জন্য কিন্তু আমরা দুঃখিত ছিলাম না, বরং আনন্দিত ছিলাম। যেহেতু সন্তান-সন্ততি দ্বারা ধনের ব্যায় হইবার সম্ভাবনা। টাকা গণিয়া, টাকা নাড়িয়া চাড়িয়া, আমরা স্বর্গ-সুখ উপভোগ কবিতাম। আমাদের অবর্ত্তমানে পাছে কেহ এই ধন লয়, সে জন্য আমরা ইহার উপর, 'যক্' দিলাম, অর্থাৎ ইহার উপর এক ভূতিনীকে প্রহরিণী-স্বরূপ নিযুক্ত করিলাম, এ কার্য্যে যক্ষ বা যক্ষিণী নিযুক্ত করি নাই। কথায় বলেন বটে, কিন্তু ধনের উপরে যক্ষ বা যক্ষণী কেহ নিযুক্ত করিতে পারে না। যাহা হউক আমাদিগের ধন ঐশ্চর্য্যের উপর যক্ দিবার উদ্দেশ্য প্রথমে পর্ব্বত অভ্যান্তরে এই সুরম্য অট্টালিকা নির্ম্মান করিলাম। রাজবাড়ী হইতে সমুদয় টাকাকড়ি মণি-মুক্তা বসন-ভূষণ ইহার ভিতর লইয়া আসিলাম। যথাবধি যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়া করিয়া নবমবর্ষীয়া সুলক্ষণা একটি বালিকাকে উৎসর্গ করিয়া, তাহাকে বলিয়া দিলাম যে এক সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত তুমি এই ধনের প্রহরিণীস্বরূপ নিযুক্ত থাকিবে এক সহস্র বৎসরের মধ্যে যদি কেহ এই ধনের এক কণা মাত্রও লয় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তুমি তাহার প্রাণবধ করিবে। এক সহস্র বৎসর পরে তুমি যেখানে ইচ্ছা সেইখানে যাইও, তখন যাহার অদৃষ্টে থাকিবে, সে এই ধনের অধিকারী হইবে। বালিকাকে এইরূপ আদেশ করিয়া, অট্টালিকার ভিতর একটি প্রদীপ জ্বালিয়া, আমরা সুড়ঙ্গের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলাম! প্রদীপটি যেই নির্ব্বাণ হইল, আর বালিকার মৃত্যু হইল, মরিয়া সে ভীষণাকৃতি অতি দীর্ঘ নাসিকা-ধারিণী ভূতিনী হইল। ভূত সমাজে সে জন্য সে নাকেশ্বরী নামে পরিচিতা। দ্বারে যে এই প্রহরিণী-স্বরূপ রহিয়াছে, সে সেই বিকৃত আকৃতি ভূতিনী, যাহার বিকট হাসি তুমি এই মাত্র শুনিলে। বালিকা না রাখিয়া ধনের উপর অনেকে বালক প্রহরী নিযুক্ত করিয়া থাকে। বালক মরিয়া ভূত হয়। কিছুদিন পরে যুদ্ধে আমরা হত হইয়া শত্রুর তরবারি-আঘাতে দেহ হইতে মরিয়া ভূত হয়। কিছুদিন পরে যুদ্ধে আমরা হত হইয়া শত্রুর তরবারি-আঘাতে দেহ হইতে মুণ্ড বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। জীবিত থাকিতে ছিলাম এক জন মনুষ্য; মরিয়া হইলাম দুই জন ভূত। মুণ্ডটি হইলাম আমি স্কল আর ধড়টি হইলেন ইনি স্কেলিটন ভায়া। ৯৯৯ বৎসর পূর্ব্বে আমরা এই ধনের উপর যক্

দিয়াছি। আর এক বৎসর গত হইলেই সহস্র বৎসর পূর্ণ হয়। তখন নাকেশ্বরী এ ধন ছাড়িয়া দিবে। গত পৌষ মাসে নাকেশ্বরীর সহিত ঘ্যাঁঘোঁ নামক ভূতের শুভবিবাহ হইয়াছে। নাকেশ্বরী আপনার শ্বশুরালয়ে চলিয়া যাইবে। তখন এ ধন লইলে আর তোমার কোনও বিপদ্ ঘটিবে না। কিন্তু এই এক বৎসরের ভিতর কোনও মতে এ ধনের কণামাত্র স্পর্শ করিবে না, করিলেই অবিলম্বে নাকেশ্বরী তোমাকে খাইয়া ফেলিবে, অবিলম্বে তোমার মৃত্যু ঘটিবে। এই ধনসম্পত্তির প্রকৃত স্বামী আমরা দুই জন। এই ধন আমরা তোমাকে প্রদান করিলাম। কিন্তু সাবধান, এই এক বৎসরের ভিতর এ ধন স্পর্শ করিবে না।" —আমি উত্তর করিলাম,—"মহাশয়! আপনাদের কৃপায় আমি অতিশয় অনুগৃহীত হইলাম। যদি আমাকে এ সম্পত্তি দিলেন তবে এরূপ কোন একটা উপায় করুন, যাহাতে এ ধন হইতে এখন আমি কিছু লইতে পারি। সম্প্রতি আমার অর্থের নিতান্ত প্রয়োজন। এখন যদি পাই, তবে আমার বিশেষ উপকার হয়, এমন কি, আমার প্রাণরক্ষা হয়! এখন না পাইলে, এক বৎসর পরে জীবিত থাকি কিনা তাই সন্দেহ।"

এই কথা শুনিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া স্কল ও স্কেলিটন পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কি বলা-বলি করিলেন, আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

স্কল বলিলেন,—"এস্, আমাদের সঙ্গে পুনরায় বাহিরে এস, সকলে পুনরায় যাইলাম,—বনের ভিতর পুনরায় আমরা ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। স্কল বন খুঁজিতে লাগিলেন। অবশেষে সামান্য একটি ওষুধির গাছ দেখাইয়া তিনি আমাকে বলিলেন,— "এই গাছটির তুমি মূল উত্তোলন কর!" আমি সেই গাছটির শিকড় তুলিলাম। স্কলের আদেশে অপর একটি গাছের আঠা দিয়া সেই শিকড়টি আমার চুলের সহিত জুড়িয়া দিলাম। তাহার পর সকলে পুনরায় আবার এই অট্টালিকায় ফিরিয়া আসিলাম।

এইখানে উপস্থিত হইয়া স্কল বলিলেন,—"যে সকল কথা তোমাকে আমি এখন বলি অতি মনোযোগের সহিত শুন। আপাততঃ যথা প্রয়োজন টাকা লইয়া তুমি তোমার কার্য্য সমাধা করিবে। যে শিকড় তোমাকে আমরা দিলাম, তাহার গুণ এই যে, ইহা মাথায় থাকিলে, যতক্ষণ তুমি অট্টালিকার ভিতর থাকিবে, ততক্ষণ নাকেশ্বরী তোমার প্রাণবধ করিতে পারিবে না। অট্টালিকার বাহিরে শিকড় তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না শিকড়ের কিন্তু আর একটি গুণ এই যে, ইহা মাথায় থাকিলে যে জন্তুর আকার ধরিতে ইচ্ছা করিবে, তৎক্ষণাৎ সেই জন্তু হইতে পারিবে! ব্যাঘ্র হইতেছেন নাকেশ্বরীর ইষ্ট দেবতা। সেজন্য যখন তুমি অট্টালিকার বাহিরে যাইবে, তখন ব্যাঘ্ররূপ ধরিয়া যাইবে। তাহা হইলে নাকেশ্বরী তোমাকে কিছু বলিতে পারিবে না। তাহার পর অট্টালিকার ভিতর প্রত্যাগমন করিয়া ইচ্ছা করিলেই মানুষ্যের মূর্ত্তি ধরিতে পারিবে। অতএব দুইটি কথা স্মরণ রাখিও, কোনও মতেই ভুলিবে না। প্রথম এ এক বৎসর শিকড়টি যেন কিছুতেই তোমার মাথা হইতে না যায় যাইলেই মৃত্যু। তুমি যেখানে থাক না কেন, সেইখানেই মৃত্যু। দ্বিতীয়, ব্যাঘ্ররূপ না ধরিয়া বাহিরে যাইবে না, এক মূহূর্ত্ত কালের নিমিত্তও নিজরূপে বাহিরে থাকিবে না, থাকিলেও মৃত্যু সেই দণ্ডেই মৃত্যু। এক বৎসর পরে শিকড়টি দগ্ধ করিয়া

সমুদয় ধনসম্পত্তি লইয়া দেশে চলিয়া যাইবে। এ এক বৎসরের ভিতর যদি তুমি ধন না লইতে, তাহা হইলে এ সব কিছুই করিতে হইত না। কারণ নাকেশ্বরী রক্ষিত ধন না লইলে, নাকেশ্বরী কাহাকেও কিছু বলে না, বলিতেও পারে না। যাহা হউক, এক বৎসর পরে ধন ছাড়িয়া নাকেশ্বরী আপনার শ্বশুরালয়ে চলিয়া যাইবে। ঘ্যাঘোঁ ভূতের সহিত যখন তাহার বিবাহের কথা হয়, তখন লোকে কত না ভ্যাঙচি দিয়াছিল!"

আমি জিজ্ঞাস করিলাম,—"ভ্যাঙচি কেন দিয়াছিল, মহাশয়?"

স্কল বলিলেন,—"তুমি জান না, তাই পাগলের মত কথা জিজ্ঞাসা কর। বিবাহের ভাঙচি দিলে যেমন আমোদটি হয়, এমন আমোদ আর কিছুতে হয় না তুমি একটি পাত্র কি পাত্রী স্থির করিয়া বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজনের মত জিজ্ঞাসা কব; তাঁরা বলিলেন,—"দিবে দাও! কিন্তু—'। ঐ যে 'কিন্তু' কথাটি, উহার ভিতর এক জাহাজ মানে থাকে। যাহা হউক, যাহা বলি আর যাহা কই, ঘ্যাঘোঁর বিবাহে অতি চমৎকার ভাঙচি দিয়াছিল। প্রশংসা করিতে হয়!" —আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ভাঙচি আবার চমৎকার কি মহাশয়?"

স্কল উত্তর করিলেন,—"সাতকাণ্ড,—সেই যা আমাদের নাম করিতে নাই, তা পড়িয়া থাকিবে, কিন্তু ভূতের কাণ্ড তুমি কিছুই জান না। কি হইয়াছিল বলিতেছি,—শুন। ঘ্যাঘোঁর সহিত বিবাহের কথা উপস্থিত হইলে, নাকেশ্বরী মাসী পাত্র দেখিতে একটি ভূত পাঠাইয়া দিলেন। ঘ্যাঘোঁর বাটীতে সেই ভূত উপস্থিত হইলে, ঘ্যাঘোঁ তাঁহার বিশেষ সমাদর করিলেন। আহারাদি প্রস্তুত হইলে, তিনি নিকটস্থ একটি বিলের জলে স্নান করিতে যাইলেন। সেইখানে প্রতিবেশী ভূতগণও পরামর্শ করিয়া স্নান করিতে যাইলেন। তাঁহাদের মধ্যে এক জন আগন্তুক ভূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমার নিবাস একঠেঙো মুল্লুকের ওধারে, বোঁ-ভুলুনি নামক আঁব গাছে।' ঘ্যাঘোর প্রতিবেশী ভূত পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'এখানে কি মনে করিযা আগমন হইযাছে?' আগন্তুক ভূত উত্তর করিলেন,—'আমি ঘ্যাঘোঁকে দেখিতে আসিয়াছি।' প্রতিবেশী ভূতগণ তখন জিজ্ঞাসা করিলেন,—'মহাশয়, তবে কি বৈদ্য?' আগন্তুক ভূত বলিলেন,—কেন? বৈদ্য কেন হইব? ঘ্যাঘোঁর কি কোনও পীড়া-শীড়া আছে না-কি?' প্রতিবেশী ভূতগণ একটু যেন অপ্রতিভ হইয়া উত্তর করিলেন,—'না না! এমন কিছু নয়! তবে একটু একটু খুক্ খুক্ করিয়া কাসি আছে, তাহার সহিত অল্প অল্প আলকাতরার ছিট থাকে, আর বৈকাল বেলা যৎসামান্য ঘুষ-ঘুষে জ্বর হয়। তা সে কিছু নয়, গরমে হইয়াছে, নাইতে নাইতে ভাল হইয়া যাইবে।' এই কথা শুনিয়া আগন্তুক ভূতের তো চক্ষুস্থির! আর তিনি ঘ্যাঘোঁর কাছে ফিরিয়া যাইলেন না। সেই বিল হইতে একেবারে একঠেঙো মুল্লুকের ও-ধারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। নাকেশ্বরী মাসীকে সকল কথা বলিলেন। সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেল। নাকেশ্বরী একটি সুন্দরী ভূতিনী। তাহার রূপে ঘ্যাঘো একেবারে মুগ্ধ হইয়াছিল। কত দিন ধরিয়া পাগলের মত সে গাছে গাছে কাঁদিয়া বেড়াইয়াছিল! তারপর মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া অন্ধকুপের ভিতর বসিয়াছিল। যাহা হউক, অবশেষে বিবাহ যে হইয়া গিয়াছে, তাহাই সুখের কথা।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"শ্লেষ্মার সহিত আলকাতরা কি?"

স্কল বলিলেন,—"তোমাদের যেরূপ রক্ত, আমাদের সেইরূপ আলকাতরা। কাসরোগে আমাদের বক্ষঃস্থল হইতে আলকাতরা বাহির হয়।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"যদি আমাদের মত ভূতদিগের রোগ হয়, তাহা হইলে ভূতেরাও তো মরিয়া যায়? আচ্ছা! মানুষ মরিয়া তো ভূত হয়, ভূত মরিয়া কি হয়?"

স্কল উত্তর করিলেন,—"কেন? ভূত মরিয়া মারবেল হয়? সেই যে ছোট ছোট গোল গোল ভাঁটার মত মারবেল, যাহা লইয়া ছেলেরা সব খেলা করে!"

আমি বলিলাম,—"মারবেল হয়! পৃথিবীতে এত বস্তু থাকিতে মারবেল হয় কেন?"

স্কল আমার এই কথায় কিছু রাগতঃ হইয়া বলিলেন,—"ভুল হইয়াছে। তোমার সহিত পরামর্শ করিয়া তারপর আমাদের মরা উচিত। এখন হইতে না হয় তাই কবা যাইবে।"

আমি বলিলাম,—"মহাশয়! আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। আমি জানি না, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি! যদি অনুমতি করেন তো আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করি,—ভূত মরিয়া যদি মারবেল হয়, তাহা হইলে মারবেল লইয়া খেলা করা তো বড় বিপদের কথা?"

স্কল উত্তর করিলেন,—"মরা ভূত লইয়া খেলা করিতে আবার দোষ কি? হাঁ! জীবন্ত ভূত হইত! তাহা হইলে তাহার সহিত খেলা করা বিপদের কথা বটে!"

স্কল পুনরায় বলিলেন,—"তোমার সহিত আর আমাদের মিছামিছি বকিবার সময় নাই। আমরা কোম্পানী খুলিয়াছি, এখন গিয়া কোম্পানীর কাজ করি। আমরা 'স্কল স্কেলিটন এণ্ড কোম্পানী।' আমরা কম ভূত নই। যে সব কথা বলিয়া দিয়াছি, সাবধানে মনে করিয়া রাখিবে। তা না হইলে বিপদে পড়িবে। এখন আমরা চলিলাম। আর তোমার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইবে না!"

এই বলিয়া স্কল ও স্কেলিটন সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। অট্টালিকার ভিতর আমি একেলা বসিয়া রহিলাম। তাহার পর কি করিলাম, তাহা তুমি জান, বলিবার আর অবশ্যক নাই। কঙ্কাবতী! কথা এই! এখন সকল কথা তোমাকে বলিলাম।" --কঙ্কাবতী বলিলেন,—"তবে আমিও যাই, গিয়া নাকেশ্বরীর টাকা লই, তাহা হইলে আমাদের দুই জনকে সে এক সঙ্গে মারিয়া ফেলিবে। পতিপরায়ণ সতীর ইহার চেয়ে আর সৌভাগ্য কি?"

এই কথা বলিয়া কঙ্কাবতী উঠিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় এক অতীথি ভয়াবহ চীৎকারে সে স্থান পরিপুরিত হইল। অট্টালিকা কাঁপিতে লাগিল। দ্বার গবাক্ষ পরস্পরে আঘাতিত হইয়া ঝন্ ঝন্ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল। অট্টালিকা ঘোর অন্ধকারে আচ্ছাদিত হইল। প্রজ্বলিত বাতিটি নির্ব্বাণ হইল না বটে, কিন্তু অন্ধকারে আবৃত হইয়া গেল। খেতু বলিলেন,—"কঙ্কাবতী! ঐ নাকেশ্বরী আসিতেছে।"

কঙ্কাবতী এতক্ষণ শয্যার ধারে বসিয়াছিলেন। এখন তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘরের দ্বারটি উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া দিলেন, আর দ্বারের উপর সমুদয় শরীরের বলের সহিত ঠেশ দিয়া দাঁড়াইলেন। নাকেশ্বরীকে তিনি ভিতরে আসিতে দিবেন না।

অতি দুর্গন্ধে, নিবিড় অন্ধকারে, ঘন ঘন ঘোর গভীর শব্দে, ঘর পরিপূরিত হইল।

ক্রমে শব্দ থামিল, অন্ধকার দূর হইল, বাতির আলোকে পুনরায় ঘর আলোকিত হইল। তখন কঙ্কাবতী দেখিতে পাইলেন যে, মৃতপ্রায় অচেতন হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, খেতু বিছানায় পড়িয়া আছেন। ভীমরূপা নাকেশ্বরী পার্শ্বে দণ্ডায়মানা, কঙ্কাবতী দৌড়িয়া গিয়া নাকেশ্বরীর পায়ে পড়িলেন।

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"ওগো! তুমি আমার স্বামীকে মারিও না। আমি বড় দুঃখিনী, আমি কাঙ্গালিনী কঙ্কাবতী। কত দুঃখ পাইয়া আমি এই প্রাণসম পতিকে পাইয়াছি। পৃথিবীতে এই পতি ভিন্ন আমার কেহ নাই। ওগো! আমার স্বামীকে না মারিয়া তুমি আমার প্রাণবধ কর। তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমার স্বামীকে মারিও না। আমরা তোমার এ ধন চাহি না, কিছু চাহি না আমার পতিকে তুমি দাও, আমার পতিকে লইয়া আমি ঘরে যাই। তোমার যাহা কিছু টাকা লইয়াছি, সব ফিরিয়া দিব। মানুষ, খাইতে যদি তোমার সাধ হইয়া থাকে, তুমি আমাকে খাও, তুমি আমার রক্ত পান কর। আমার স্বামীকে তুমি কিছু বলিও না, স্বামীকে আমার ফিরিয়া যাইতে দাও।"

নাকেশ্বরী পা ধরিয়া কঙ্কাবতী এইরূপে কাঁদিতে লাগিলেন, নানা মতে কাকুতি মিনতি করিতে লাগিলেন। সে খেদের কথা শুনিলে পাষাণও দ্রব্য হইয়া যায়। নাকেশ্বরীর মনে কিন্তু কিছুমাত্র দয়া হইল না, নাকেশ্বরী সে কথায় কর্ণপাতও করিল না। কঙ্কাবতী যত কাঁদেন, আর নাকেশ্বরী বাম হস্ত উত্তোলন করিয়া কেবল বলে—"দূর! দূর।"

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"ও গো! আমার স্বামীকে ছাড়িয়া আমি এখান হইতে দূর হইব না। আমার স্বামীকে দাও' আমি এখান হইতে এখুনি দূর হইতেছি স্বামী স্বামী ! উঠ। চল আমরা এখান হইতে যাই; স্বামী উঠ!" --কঙ্কাবতী যত কাঁদেন, যত বলেন, হাত উত্তোলন করিয়া নাকেশ্বরী তত বলে,—"দূর, দূর!" কঙ্কাবতী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। চক্ষু মুছিলেন। তাহার পর আরক্ত নয়নে দর্পের সহিত নাকেশ্বরীকে বলিলেন,—"আমার স্বামীকে দিবে না? আমাকেও খাইবে না? কেবল—'দূর দূর'! মুখে অন্য কথা নাই? বটে! তা নাকেশ্বরী হও, আর যাই হও, আজ তোমার একদিন, কি অ'মার একদিন!"

এই কথা বলিয়া পাগলিনী উন্মদিনীর ন্যায়, কঙ্কাবতী নাকেশ্বরীকে ধরিতে যাইলেন। কোনও উত্তর না করিয়া নাকেশ্বরী কেবলমাত্র একটি নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। সেই নিশ্বাসের প্রবল বেগে কঙ্কাবতী একেবারে দ্বারের নিকট গিয়া পড়িলেন। —কঙ্কাবতী পুনরায় উঠিলেন, পুনরায় উঠিয়া নাকেশ্বরীকে ধরিতে দৌড়িলেন। নাকেশ্বরী আর একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিল, আর কঙ্কাবতী একেবারে অট্টালিকার বাহিরে গিয়া পড়িলেন।

তখন কঙ্কাবতী আস্তে-আস্তে পুনরায় উঠিয়া নাকেশ্বরীকে বলিলেন,—"ওগো! তোমাকে আমি আর ধরিতে যাইব না, তোমাকে আমি মারিব না। আমি আমার স্বামীকে আর ফিরিয়া চাই না। এখন কেবল এই চাই যে, স্বামী হইতে তুমি আমাকে পৃথক করিও না। স্বামীর পদ-যুগল ধরিয়া আমাকে মরিতে দাও। যদি মারিবে তো আমাদের দুই জনকেই এক সঙ্গে মার, খাইবে তো আমাদের দুই জনকেই এক সঙ্গে খাও। আর তোমার কাছে

আমি কিছু চাই না। তোমার নিকট এখন কেবল এই প্রার্থনাটি করি। ইহা হইতে তুমি আমাকে বঞ্চিত করিও না।" —এই বলিয়া কঙ্কাবতী পুনরায় ঘরের দিকে দৌড়িলেন। কোনও কথা না বলিয়া নাকেশ্বরী আর একটি নিশ্বাস ছাড়িল, আর কঙ্কাবতী একেবারে পর্বতের বাহিরে বনের মাঝখানে গিয়া পড়িলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ – ব্যাঙ-সাহেব

বনের মাঝে কঙ্কাবতী একেবারে নির্জীব হইয়া পড়িলেন। বার বার উঠিয়া-পড়িয়া শরীর তাঁহার ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছিল। শরীরের নানা স্থান হইতে শোণিতধারা বহিতেছিল। কঙ্কাবতীর এখন আর উঠিবার শক্তি নাই। উঠিয়াই বা কি করিবেন? স্বামীর নিকট যাইতে গেলেই নাকেশ্বরী আবার তাঁহাকে নিশ্বাসের দ্বারা দূরীকৃত করিবে। বনের মাঝে পড়িয়া কঙ্কাবতী অবিরাম কাঁদিতে লাগিলেন। স্বামীর পদপ্রান্তে পর্ড়িয়া তিনি যে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে পাইলেন না, এখন কেবল এই দুঃখ তাঁহার মনে অত্যন্ত প্রবল হইল। কাঁদিয়া শরীর তাঁহার অবসন্ন হইয়া পড়িল। তখন তিনি মনে মনে স্থির করিলেন,—'আচ্ছা! তাই ভাল! স্বামী ভিতরে থাকুন আমি এই বাহিরে পড়িয়া থাকি। তাঁহার পদযুগল ধ্যান করিতে করিতে এই বাহিরেই আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিব। করুণাময় জগদীশ্বর আমার প্রতি কৃপা করিবেন। মরিয়া আমি তাঁহাকে পাইব।"

এইরূপ চিন্তা করিয়া, কঙ্কাবতী স্বামীর পা দুটি মনে মনে প্রত্যক্ষ দেখিতে লাগিলেন,—উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণ অল্প আয়তন চম্পককলি সদৃশ অঙ্গুলি বিশিষ্ট সেই পা দু'খানি মনে মনে ধ্যান করিতে লাগিলেন।

একাবিষ্ট চিত্তে এইরূপ ধ্যান করিতেছেন এমন সময় কঙ্কাবতীর মনে একটি নূতন ভাবের উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন—ভূতিনী প্রেতিনী ডাকিনীতে মনুষ্যের মন্দ করিলে তাহারতো উপায় আছে। পৃথিবীতে অনেক গুণী মানুষ আছেন, তাঁহারা মন্ত্র জানেন তাঁহারা তো ইহার চিকিৎসা করিতে পারেন। কেন বা আমার স্বামীকে তাঁহারা রক্ষা করিতে না পারিবেন? আর যদি একান্তই আমার স্বামীর প্রাণরক্ষা না হয় তাঁহার মৃতদেহ তো আমি পাইব। তাহা লইয়া পুড়িয়া মরিতে পারিলেও আমি কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিব। যাহা হউক, আমি আমার স্বামীকে নাকেশ্বরীর হাত হইতে রক্ষা করিতে যত্ন করিব—নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিব না। হই না কেন স্ত্রীলোক? আমি কি মানুষ নই? পতির হিতকামনায় আমি সমুদয় জগৎকে তৃণ জ্ঞান করি—কাহাকেও আমি ভয় করি না।"

মনে মনে, এইরূপ কল্পনা করিয়া কঙ্কাবতী চক্ষু মুছিলেন উঠিয়া বসিলেন। এখন লোকালয়ে যাইতে হইবে, এই উদ্দেশে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

কিন্তু লোকালয় কোন্ দিকে, তাহা তো তিনি জানেন না! উত্তরমুখে যাইতে খেতু বলিয়াছিলেন, কিন্তু কোন্ দিক্? বিস্তীর্ণ তমোময় সেই বনকান্তরে দিক্ নির্ণয় করা তো সহজ কথা নহে! রাত্রি এখনও প্রভাত হয় নাই সূর্য এখনও উদয় হন নাই তবে কোন্ দিক উত্তর কোন্ দিক্ দক্ষিণ কিরূপে তিনি জানিবেন?

তাই তিনি ভাবিলেন—যে দিকে হয় যাই একটানা একটা গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইব। লোকালয়ে গিয়া সুচিকিৎসকের অনুসন্ধান করিব। কালবিলম্ব করা উচিত নয়। কালবিলম্ব করিলে আমার আশা হয় তো ফলবতী হইবে না।"

বন-জঙ্গল গিরি-গুহা অতিক্রম করিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় কঙ্কাবতী চলিলেন। কত পথ যাইলেন, কতদূর চলিয়া গেলেন কিন্তু গ্রাম দেখিতে পাইলেন না। রাত্রি প্রভাত হইল সূর্য্য উদয় হইল, দিন বাড়িতে লাগিল তবুও জন-মনিবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল না।

" কি করি কোন দিকে যাই কাহাকে জিজ্ঞাসা করি, কঙ্কাবতী এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময় সম্মুখে একটি ব্যাঙ দেখিতে পাইলেন। ব্যাঙের অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়া কঙ্কাবতী বিস্মিত হইলেন। ব্যাঙের মাথায় হাট গায়ে কোট কোমরে পেন্টুলেন ব্যাঙ সাহেবের পোষাক পরিয়াছেন। ব্যাঙকে আর চেনা যায় না। রংটি কেবল ব্যাঙেব মত আছে, সাবান মাখিয়াও রংটি সাহেবের মত হয় নাই। আর পায়ের জুতা এখনও কেনা হয় নাই। ইহারপর তখন কিনিয়া পরিবেন। আপাততঃ সাহেবের সাজ সাজিয়া দুই পকেটে হাত রাখিয়া সদর্পে ব্যাঙ চলিয়া যাইতেছেন।

এই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়া এই ঘোর দুঃখের সময়ও কঙ্কাবতীর মুখে ঈষৎ একটু হাসি দেখা দিল। কঙ্কাবতী মনে করিলেন—ইঁহাকে আমি পথ জিজ্ঞাসা করি।"

কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ব্যাঙ মহাশয়! গ্রাম কোন্ দিকে? কোন্ দিক দিয়া যাইলে লোকালয়ে পৌঁছিব?" কঙ্কাবতী বলিলেন—"ব্যাঙ মহাশয়! আপনি কি বলিলেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না ভাল করিয়া বলুন। আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি—কোন্ দিক্ দিয়া যাইলে গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইতে পারা যায়?"

ব্যাঙ বলিলেন, —" হিশ্ ফিশ্ ড্যাম্।" কঙ্কাবতী বলিলেন,—"ব্যাঙ মহাশয়! আমি দেখিতেছি,—আপনি ইংরেজী কথা কহিতেছেন। আমি ইংরেজী পড়ি নাই, আপনি কি বলিতেছেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না, অনুগ্রহ করিয়া যদি বাঙ্গালা করিয়া বলেন, তাহা হইলে আমি বুঝিতে পারি।" —ব্যাঙ এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন যে, কেহ কোথাও নাই। কারণ, লোকে যদি শুনে যে, তিনি বাঙ্গালা কথা কহিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহার জাতি যাইবে, সকলে তাঁহাকে "নেটিভ" মনে করিবে। যখন দেখিলেন, —কেহ কোথাও নাই, তখন বাঙ্গালা কথা বলিতে তাঁহার সাহস হইল।

কঙ্কাবতীর দিকে কোপ দৃষ্টিতে চাহিয়া, অতিশয় ক্রুদ্ধভাবে ব্যাঙ বলিলেন,—"কোথাকার ছুঁড়ী রে তুই! আ গেল যা! দেখিতেছিস, আমি সাহেব! তবু বলে, ব্যাঙ মশাই, কেন? সাহেব বলিতে তোর কি হয়?"

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"ব্যাঙ সাহবে! আমার অপরাধ হইয়াছে, আমাকে ক্ষমা করুন। এক্ষণে গ্রামে যাইব কোন্ দিক্ দিয়া, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বলিয়া দিন।"

এই কথা শুনিয়া ব্যাঙ আরও জ্বলিয়া উঠিলেন, আরও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বলিলেন,—"মোলো যা! এ হতভাগা ছুঁড়ীর রকম দেখ! মানা করিলেও শুনে না কথা গ্রাহ্য হয় না।

কেবল বলিবে, ব্যাঙ, ব্যাঙ! কেন?" আমার নাম ধরিয়া ডাকিতে কি মুখে ব্যাথা হয় না কি? আমার, নাম মিষ্টার গামিশ।"

কঙ্কাবতী বলিলেন,—'মহাশয়! আমার অপরাধ হইয়াছে। না জানিয়া অপরাধ করিয়াছি, আমাকে ক্ষমা করুন। এক্ষণে মিষ্টার গামিশ? আমি লোকালয়ে যাইব কোন্ দিক্ দিয়া তাহা আমাকে বলিয়া দিন্। আমার নাম কঙ্কাবতী। বড় বিপদে আমি পড়িয়াছি। প্রাণের পতিকে আমি হারাইয়াছি! পতির চিকিৎসার নিমিত্ত আমি অনুসন্ধান করিতেছি। রতিমাত্র বিলম্ব আর করিতে পারি না। এই হতভাগীনির প্রতি দয়া করিয়া বলিয়া দিন—কোন্ দিক্ দিয়া আমি গ্রামে যাই!

কঙ্কাবতী তাঁহাকে 'সাহেব' বলিলেন, কঙ্কাবতী তাঁহাকে 'মিষ্টার গামিশ' বলিয়া ডাকিলেন, সে জন্য ব্যাঙের শরীর শীতল হইল, রাগ একেবারে পড়িয়া গেল।—কঙ্কাবতীর প্রতি হৃষ্ট হইয়া ব্যাঙ জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমি সাহেব হইয়াছি কেন তা জান?"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—"আজ্ঞা না! তা আমি জানি না! মহাশয়!' গ্রামে কোন্ দিক্ দিয়া যাইতে হয়? গ্রাম এখান হইতে কত দূর?"

ব্যাঙ বলিলেন,—'দেখ লঙ্কাবতী! তোমার নাম লঙ্কাবতী বলিলে বুঝি? দেখ লঙ্কাবতী! এক দিন আমি এই বনের ভিতর বসিয়াছিলাম। হাতী সেই পথ দিয়া আসিতেছিল। আমি মনে করিলাম আমার মান-মর্য্যাদা রাখিয়া অনেক ভয় করিয়া, হাতী অবশ্যই পাশ দিয়া যাইবে। একবার আস্পর্দ্ধার কথা শুন! দুষ্ট হাতী পাশ দিয়া না গিয়া আমাকে ডিঙাইয়া গেল। রাগে আমার সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল। রাগ হইলে আর জ্ঞান থাকে না। আমার ভয়ে তাই সবাই সদাই সশঙ্কিত। আমি ভাবিলাম, হাতীকে একবার উত্তমরূপে শিক্ষা দিতে হইবে। তাই আমি হাতীকে বলিলাম,—'উট-কপালী চিরুণ-দাঁতী বড় যে ডিঙুলি মোরে?" কেমন, বেশ ভাল বলি নাই, লঙ্কাবতী?"

কঙ্কাবতী বলিলেন,—আমার নাম কঙ্কাবতী; 'লঙ্কাবতী' নয়। আপনি উত্তম বলিয়াছেন। গ্রামে যাইবার পথ আপনি বলিয়া দিলেন না? তবে আমি যাই, আর আমি এখানে অপেক্ষা করিতে পারি না।

ব্যাঙ বলিলেন,—"শুন না। অত তাড়াতাড়ি কর কেন? দুষ্ট হাতীর একবার কথা শুন। আমি রাগিয়াছি দেখিয়া তাহার প্রাণে ভয় হইল না। হাতীটি উত্তর করিল,—'থাক্ থাক্ থাক্ থ্যাবড়া নাকী ধর্ম্মে রেখেছে তোরে!' হাঁ কঙ্কাবতী। আমার কি থ্যাবড়া নাক?"

কঙ্কাবতী ভাবিলেন যে, এই নাক লইয়া কাঁকড়ার অভিমান হইয়াছিল, আবার দেখিতেছি এই ভেকটিরও সেই অভিমান।কঙ্কাবতী বলিলেন,—"না, না। কে বলে আপনার থ্যাবড়া নাক? আপনার চমৎকার নাক! এই দিক্ দিয়া কি গ্রামে যাইতে হয়?"

কিছুক্ষণের নিমিত্ত ব্যাঙ একটু চিন্তায় মগ্ন হইলেন। কঙ্কাবতী মনে করিলেন, ভাবিয়া চিন্তিয়া ইনি আমাকে পথ বলিয়া দিবেন। কখন পথ বলিয়া দেন, সেই প্রতীক্ষায় একাগ্রচিত্তে কঙ্কাবতী ব্যাঙের মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন।

স্থির-গম্ভীর ভাবে অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া অবশেষে ব্যাঙ বলিলেন,—"তবে বোধ হয় কথার মিলি করিবার নিমিত্ত হাতী আমাকে 'থ্যাবড়া-নাকী' বলিয়াছে। কারণ, এই দেখ না? আমার কথায় আর হাতীর কথায় মিল হয়—

উট্-কপালী চিরুণ-দাঁতী বড় যে ডিঙুলি মোরে!

থাক্ থাক্ থাক্ থ্যাবড়া-নাকী ধর্ম্মে রেখেছে তোরে!

কঙ্কাবতী! কবিতাটি খবরের কাগজে ছাপাইলে হয় না? কিন্তু ইহাতে আমার নিন্দা আছে, থ্যাবড়া নাকের কথা আছে। তাই খবরের কাগজে ছাপাইব না। শুনলে তো এখন? হাতীর একবার আস্পর্দ্ধার কথা! তাই আমি ভাবিলাম, সাহেব না হইলে লোকে মান্য করে না। সেই জন্য এই সাহেবের পোষাক পরিয়াছি। কেমন? আমাকে ঠিক সাহেবের মত দেখাইতেছে তো? এখন হইতে আমাকে সকলে সেলাম করিবে, সকলে ভয় করিবে। যখন রেলগাড়ীর তৃতীয় শ্রেণীতে গিয়া চড়িব, তখন সে গাড়ীতে অন্য লোক উঠিবে না। টুপি মাথায় দিয়া আমি দ্বাবের নিকট গিয়া দাঁড়াইব। সকলে উঁকি মারিয়া দেখিবে, আর ফিরিয়া যাইবে.—আর বলিবে—"ও গাড়ীতে সাহেব রহিয়াছে। কেমন কঙ্কাবতী? এ পরামর্শ ভাল নয়?" --কঙ্কাবতী বলিলেন,—"উত্তম পরামর্শ! এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া পথ বলিয়া দিন! আর যদি না দেন, তো বলুন আমি চলিয়া যাই!"

কানে হাত দিয়া ব্যাঙ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি বলিলে?"

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কোন্ পথ দিয়া গ্রামে যাইব? গ্রাম এখান হইতে কত দূর! কতক্ষণে সেখানে গিয়া পৌঁছিব?"

ব্যাঙ বলিলেন,—"আমার একটা হিসাব করিয়া দাও। পথ দেখাইয়া দিব কি, আমি এখন ঘোর বিপদে পড়িয়াছি। আমার একটি আধুলি ছিল; একজনকে তাহা আমি ধার দিয়াছি। তাহাব সহিত নিময় হইয়াছে যে, যাহা বাকী থাকিবে, প্রতিদিন তাহার অর্দ্ধেক দিয়া সে ঋণ পরিশোধ করিবে। প্রথম দিন সে আমাকে চারি আনা দিবে, দ্বিতীয় দিন দুই আনা দিবে, তৃতীয় দিন এক আনা, চতুর্থ দিন দুই পয়সা পঞ্চম দিন সে এক পয়সা দিবে। এক পয়সায় হয় পাঁচ কড়া দিবে। তার পরদিন আড়াই কড়া, তার পরদিন স-কড়, তার অর্দ্ধেক, পরদিন তার অর্দ্ধেক, পরদিন তার অর্দ্ধেক—"

অতি চমৎকার সুমিষ্ট কান্না-সুরে ব্যাঙ এইবার গলা ছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন,—"ওগো! মা গো! এ যে আর কখনও শোধ হবে না গো! আমার আধুলিটি যে, আর কখন পুরাপুরিহবে না গো! ওগো আমি যাব গো! জুয়াচোরের হাতে পড়িয়া আমার যে সর্ব্বস্ব গেল গো! ওগো আমার যে ঐ আধুলিটি বৈ পৃথিবীতে আর কিছু নাই গো! ওগো তা লইয়া মানুষে যে ঠাণ্টা করে গো! ওগো মা গো! আমার কি হ'ল গো!"

ব্যাঙ পুনরায় আধ-কান্না সুরে ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া বলিলেন,—"ওগো! আমি যে মনে করিয়াছিলাম,—দুই দণ্ড বসিয়া তোমার সঙ্গে গল্পগাছা করিব গো! আমি তা যে আর হইল না গো! ওগো আমার যে শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিল গো! ওগো তুমি ঐ দিক্ দিয়া

যাও গো? তাহা হইলে লোকালয়ে পৌঁছুতে পারিবে গো! ওগো সে যে অনেক দূর গো! ওগো আজ সেখানে যাইতে পারিব না গো! ওগো তোমরা যে আমাদের মত লাফাইতে পার না গো! ওগো তোমরা যে গুটি-গুটি চলিয়া যাও গো। ওগো তোমাদের চলন দেখিয়া, আমার যে হাসি পায় গো! ওগো তোমাদের চলন দেখিয়া, আমার যে কান্না পায় না গো! ওগো তুমি যে লোক ভাল গো! ওগো লেখাপড়া শিখিয়া তুমি যে মদ্দা মেয়েমানুষ হওনি গো! ওগো তুমি যে ধীর শান্ত, লজ্জাশীলা পতিপরায়ণা গো! ওগো! তুমি মেয়ে-জ্যাটা নও গো! আমার যে আধুলিটি এইবার জন্মের মত গেল গো! ওগো! আমার কি হইল গো! ওগো মা গো!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ – পচাজল

কঙ্কাবতী ভাবিলেন,—"একে আপনার দুঃখে মরি, তাহার উপর এ আবার এক জ্বালা! যাহা হউক, ব্যাঙের কান্না একটু থামিয়াছে, এইবারে আমি যাই।

ব্যাঙ যেরূপ বলিয়া দিলেন, কঙ্কাবতী সেই পথ দিয়া চলিলেন। চলিতে চলিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল, তবুও বন পার হইতে পারিলেন না। যখন সন্ধ্যা হইয়া গেল, তখন তিনি অতিশয় শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন; আর চলিতে পারিলেন না। বনের মাঝখানে একখানি পাথরের উপর বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

পাথরের উপর বসিয়া কঙ্কাবতী কাঁদিতেছেন, এমন সময় মৃদু মধুর তানে গুন্‌গুন করিয়া কে তাঁহার কানে বলিল,—"তোমরা কারা গা? তুমি কাদের মেয়ে গা?"

কঙ্কাবতী এদিক্ ওদিক্ চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। অবশেষে দেখিতে পাইলেন যে, একটি অতি ক্ষুদ্র মশা তাহার কানে এই কথা বলিতেছে। মশাটিকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে, সেটি নিতান্ত বালিকা-মশা।

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—"আমি মানুষের মেয়ে গো! আমার নাম কঙ্কাবতী!"

মশা-বালিকা বলিলেন,—"মানুষের মেয়ে! আমাদের খাবার? বাবা যাদের রক্ত নিয়ে আসেন? খাই বটে, কিন্তু মানুষ কখনও দেখি নাই। আমরা ভদ্র মশা কি—না? তাই আমরা ওসব কথা জানি না। আমি কখনও মানুষ দেখি নাই। কিরূপ গাছে মানুষ হয়, তাহাও আমি জানি না না। কৈ? দেখি দেখি। মানুষ আবার কিরূপ হয়!"

এই বলিয়া মশা-বালিকা, কঙ্কাবতীর চারিদিকে উড়িয়া উড়িয়া দেখিতে লাগিলেন।

ভাল করিয়া দেখিয়া, শেষে মশা-বালিকা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি ধাড়ি মানুষ নও, বাছা মানুষ;—না?" কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—"নিতান্ত ছেলে-মানুষ নই, তবে এখনও লোকে আমাকে বালিকা বলে।" —মশা-বালিকা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার নাম কি বলিলে?" —কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—"আমার নাম কঙ্কাবতী।"

মশা-বালিকা বলিলেন,—"ভাল হইয়াছে। আমার নাম রক্তবতী। ছেলেবেলায় রক্ত খাইয়া পেটটি আমার টুপ টুপে হইয়া থাকিত, বাবা তাই আমার নাম রাখিয়াছেন,—রক্তবতী। আমাদের দুই জনের নামে নামে বেশ মিল হইয়াছে, রক্তবতী আর কঙ্কাবতী।"

এস ভাই! আমরা দুইজনে কিছু একটা পাতাই।"

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"আমি এখন বড় শোক পাইয়াছি, এখন ঘোর মনোদুঃখে আছি। কিছু পাতাইয়া আহ্লাদ-আমোদ করি, এখন আমার সে সময় নয়।"

রক্তবতী বলিলেন,—"তুমি পতিহারা সতী! তার জন্য আর ভাবনা কি? বাবা আসুন, বাবাকে আমি বলিব। বাবা তোমার কত পতি আনিয়া দিবেন। এখন এস ভাই! কিছু একটা পাতাই। কি পাতাই বল দেখি? আমি 'পচা-জল' বড় ভালবাসি। যেখানে পচা-জল থাকে, মনের সুখে আমি সেইখানে উড়িয়া বেড়াই,—পচাজলের ধারে উড়িয়া উড়িয়া আমি কত খেলা করি। তোমার সহিত আমি 'পচাজল' পাতাইব তুমি আমার 'পচাজল', আমি তোমার 'পচাজল'! কেমন! এখন মনের মতন হইয়াছে তো?"

কঙ্কাবতী ভাবিলেন,—ইহাদের সহিত তর্ক করা বৃথা। বুড়ো মিন্‌সে ব্যাঙ, তারেই বড় বুঝাইয়া পারিলাম না, তা এ তো একটা সামান্য বালিকা-মশা। ইহার এখনও জ্ঞান হয় নাই। ইহাদের যাহা ইচ্ছা হয়, করুক; আর আমি কোনও কথা কহিব না।

কঙ্কাবতী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা তাহাই ভাল। আমি তোমার পচাজল, তুমি আমার পচাজল। হা জগদীশ্বর। হে হৃদয়-দেবতা। তুমি কোথায়, আব আমি কোথায়! সেখানে তোমার কি দশা, আর এখানে আমার কি দশা।"

এই কথা বলিয়া কঙ্কাবতী বার বার নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন, আর কাঁদিতে লাগিলেন! --রক্তবতী বলিলেন,—"পচাজল! তোমার ভাই! আর দুটি পা কোথায় গেল? ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বুঝি? ওঃ। সেই জন্য তুমি কাঁদিতেছ? তার আবার কান্না কি, পচাজল? খেলা করিতে করিতে আমারও একটি পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। এই দেখ, সে পা-টি পুনরায় গজাইতেছে। তোমারও পা সেইরূপ গজাইবে, চুপ কর—কাঁদিও না!"

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"আমার পা ভাঙ্গিয়া যায় নাই। তোমাদের মত আমাদের পা নয়; আমাদের পা এইরূপ। পায়ের জন্য কাঁদি নাই।"

মশা-বালিকা পুনরায় গুন্‌গুন্ করিয়া উড়িতে লাগিলেন। চারিদিকে ঘুরিয়া কঙ্কাবতীর শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমুদয় নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। অবশেষে কঙ্কাবতীর নাকের কাছে গিয়া বলিলেন,—"একি ভাই, পচাজল! সর্ব্বনাশ! তোমার নাম কোথায় গেল? তোমার নাকটিকে কে কাটিয়া নিল? আহা! তোমার নাক নাই তো খাবে কি দিয়া?" মশা-বালিকা কি বলিতেছে, কঙ্কাবতী তাহা প্রথম বুঝিতে পারিলেন না। পরে বুঝিলেন যে, সে শুঁড়ের কথা বলিতেছে। কঙ্কাবতী মনে করিলেন, যে, "এ মশা-বালিকাটি নিতান্ত শিশু এখনও ইহার কিছুমাত্র জ্ঞান হয় নাই।"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—"আমাদের নাক এইরূপ। তোমাদের নাক যেরূপ দীর্ঘ আমাদের নাক সেরূপ লম্বা নয়। আমরা নাক দিয়া খাই না, আমরা মুখ দিয়া খাই।"

রক্তবতী বলিলেন,—"আহা! তবে পচাজল! তোমার কি দুরদৃষ্ট যে, আমার মত তোমার নাক নয়। এই বড় নাকে আমাকে কেমন দেখায় দেখ দেখি। জলের উপর গিয়া

আমি আমার মুখখানি দেখি, আর মনে মনে কত আহ্লাদ করি। মা বলেন যে, ‘বড় হইলে আমার রক্তবতী একটি সাক্ষাৎ সুন্দরী হইবে।’ তা ভাই পচাজল! তোমাকেও আমি সুন্দরী করিব। বাবা বাড়ী আসিলে বাবাকে বলিব, তিনি তোমার নাকটি টানিয়া বড় করিয়া দিবেন। তখন তোমাকে বেশ দেখাইবে।”

কঙ্কাবতী ভাবিলেন,—“আবার সেই নাকের কথা! নাক নাক করিয়া ইহারা সব সারা হইয়া গেল। কাঁকড়া নাকের কথা বলিয়াছিল ব্যাঙ বলিয়াছিল; এই মশা-বালিকাও সেই কথা বলিয়াছিল; তার পর সেই নাকেশ্বরীর নাক! উঃ! কি ভয়ানক!”

কঙ্কাবতী আরও ভাবিতে লাগিলেন,—“এই ঘোর দুঃখের সময় আমি বড় বিপদেই পড়িলাম। কোথায় তাড়াতাড়ি গ্রামে গিয়া চিকিৎসক আনিয়া স্বামীর প্রাণরক্ষা করিব; না,—ওখানে ব্যাঙ, এখানে মশা,—সকলে মিলিয়া আমাকে বিষম জ্বালাতনে ফেলিল। ব্যাঙের হাত এড়াইতে না-এড়াইতে মশার হাতে পড়িলাম। মশার একরতি মেয়েটি তো এই রঙ্গ করতেছেন; আবার ইহাঁর বাপ বাড়ী আসিয়া যে কি রঙ্গ করিবেন, তা তো বলিতে পারি না।” —রক্তবতী বলিলেন,—“ঐ যে পাতাটি দেখিতেছ, পচাজল! যার কোণটি কুঁকড়ে রহিয়াছে? উহার ভিতর আমাদের ঘর! আমার মা'রা উহার ভিতরে আছেন। আমার তিন মা। বাবা চরিতে গিয়াছেন, বাবা এখনি কত খাবার আনিবেন। যাই, মাদের বলিয়া আসি যে, আমার পচাজল আসিয়াছে।” এই বলিয়া রক্তবতী উড়িয়া গেলেন।

অল্পক্ষণ পরে রক্তবতী পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—“পচাজল! মা তোমাকে ডাকিতেছেন। উঠ, চল, আমার মার সঙ্গে দেখা করিবে।’

কঙ্কাবতী করেন কি? ধীরে ধীরে উঠিলেন। মশাদের ঘর, সেই কোঁকড়ানো পাতাটির কাছে যাইলেন। —একটি নবীনা মশানী কুঞ্চিত পত্রকোণ হইতে ঈষৎ মুখ বাড়াইয়া বলিলেন,...“হ্যাঁ গা বাছা! তুমি আমার রক্তবতীর সহিত পচাজল পাতাইয়াছ? তা বেশ করিয়াছ। রক্তবতী আমাদের বড় আদরের মেয়ে। কর্ত্তার এত বিষয়-বৈভব, তা আমার এই রক্তবতীই তাঁর একমাত্র সন্তান। তা, হাঁ গা বাছা! রক্তবতী কি তোমার পতির কথা বলিতেছিল? কি হইয়াছে?”

কঙ্কাবতী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—“ওগো আমি বড় দুঃখিনী। আমি বড় শোক পাইয়াছি। পৃথিবী আমি অন্ধকার দেখিতেছি। যদি আমার পতিকে আমি না পাই, তবে এ ছার প্রাণ আমি কিছুতেই রাখিব না। আমার পতিকে নাকেশ্বরী খাইয়াছে। পতিকে বাঁচাইবার নিমিত্ত লোকালয়ে যাইতেছি। সেখান হইতে ভাল চিকিৎসক আনিব, আমার স্বামীকে দেখাইব। তাই আমি বিলম্ব করিতে পারি না। পুনরায় আমি এই রাত্রিতেই পথ চলিব। কিন্তু আমি পথ জানি না, অন্ধকারে আমি পথ দেখিতে পাইব না। তোমরা আমাকে যদি একটু পথ দেখাইয়া দাও, তাহা হইলে আমার বড় উপকার হয়।”

মশানী বলিলেন,—“ছেলে মানুষ, বালিকা তুমি তোমার কোন জ্ঞান নাই! একে আমরা স্ত্রীলোক, যে-সে মশার স্ত্রী নই, গণ্য-মান্য সম্ভ্রান্ত মশার স্ত্রী; তাতে আমরা পর্দ্দানশীন,

কুলবধু। আমাদিগের কি ঘরের বাহিরে যাইতে আছে, বাছা? না,—আমরা পথ-ঘাট জানি? তুমি কাঁদিও না। কর্ত্তা বাড়ী আসুন কর্ত্তাকে আমি ভাল করিয়া বলিব। তুমি এখন আমাদের কুটুম্ব,—রক্তবতী, পচাজল। যাহা ভাল হয়, তোমাদের জন্য কর্ত্তা অবশ্যই করিবেন। তুমি একটু অপেক্ষা কর।" -কঙ্কাবতীর সহিত যিনি এতক্ষণ কথা কহিতেছিলেন তিনি রক্তবতীর মা;—মশার ছোট-রাণী। এইবার মশার বড় রাণী পাশ দিয়া একটু মুখ বাড়াইলেন।

বড় মশানী বলিলেন,—"ওটা একটা মানুষের ছানা বুঝি? আমি ওরে পুষিব। আমার ছেলে-পিলে নাই; অনেক দিন ধরিয়া আমার মনে সাধ আছে যে, জীব-জন্তু কিছু একটা পুষি! তা ভাল হইয়াছে, ঐ মানুষের ছানাটা এখানে আসিয়াছে; ওটাকে আমি পুষিব। কিছু বড় হইয়া গিয়াছে সত্য—তা যাই হউক, এখনও পোষ মানিবার সময় আছে। মানুষে শুনিয়াছি মেষ, ছাগল, পায়রা এই সব খায়, আবার সাধ করিয়া তাদের পোষে। এই মানুষের ছানাটাকে পুষিলে, ইহার উপর আমার মায়া পড়িবে। ইহাকে খাইতে তখন আর আমার ইচ্ছা হইবে না।"

মেজ-মশানী আর এক পাশ দিয়া উঁকি মারিয়া বলিলেন,—"দিদি! তোমার এক কথা! মানুষের ছানাটাকে যদি পুষিবে তো যা'তে কাজে লাগে, এরূপ পুষিয়া রাখ। মানুষের যেরূপ দুধের জন্য গরু পোষে, সেইরূপ করিয়া ইহাকে ঘরে পুষিয়া রাখ। কর্ত্তা কতদূর হইতে রক্ত লইয়া আসেন। আনিতে আনিতে রক্ত বাসি হইয়া যায়। মানুষ একটি ঘরে থাকিলে, যখন ইচ্ছা হইবে তখন টাট্‌কা রক্ত খাইতে পাইব।"

রক্তবতীর মা বলিলেন,—"তোমাদের সব এক কথা। সব তা'তেই তোমাদের প্রয়োজন ছেলেমানুষ, রক্তবতী, মানুষের ছানাটিকে পথে কুড়াইয়া পাইয়াছে; পুষিতে কি খাইতে সে তোমাদিগকে দিবে কেন? ছেলের হাতের জিনিষটি তোমরা কাড়িয়া লইতে চাও! তোদের কিরূপ বিবেচনা বল দেখি? আসুন, আগে কর্ত্তা আসুন, তাঁহাকে সকল কথা বলিব। এ সংসারে আর আমি থাকতে চাই না। আমকে তিনি বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিন। আমার বাপ ভাই বাঁচিয়া থাকতে, আমার ভাবনা কিসের? আমি ছন্নছাড়া আঁটকুড়োদের মেয়ে নই। আমার চারিদিকে সব জাজ্জ্বল্যমান!" —বড় মশানী বলিলেন,—"আঃ মর্, ছুঁড়ির কথা শুন! বাপ-ভাইয়ের গরবে ওঁর মাটীতে পা পড়ে না। বাপ-ভাইয়ের মাথা খাও!"

এইরূপে তিন সপত্নীতে ধুন্ধুমার ঝগড়া বাধিয়া গেল। কঙ্কাবতী অবাক্। কঙ্কাবতী মনে করিলে,—"ভাল কথা! জীব-জন্তুর মত ইহারা আমাকে পুষিতে চায়!"

তিন সতীনে ঝগড়া ক্রমে একটু থামিল। কখন মশা ঘরে আসিবেন, সেই প্রতীক্ষায় কঙ্কাবতী সেইখানে বসিয়া রহিলেন; অনেক বিলম্ব হইতে লাগিল, তবু, মশা ফিরিলেন না।

কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হাঁ গা! তোমাদের কর্ত্তার এত বিলম্ব হইতেছে কেন?

ছোট রাণী বলিলেন,—"বাঁশ কাট্‌ছেন, ভার বাঁধছেন রক্ত নিয়ে আস্‌ছেন তারা!"

অর্থাৎ কিনা, কর্ত্তা হয় তো আজ অনেক রক্ত পাইয়াছেন। একেলা বহিয়া আনিতে পারিতেছেন না। তাই বাঁশ কাটিয়া ভার বাঁধিয়া মুটে করিয়া রক্ত আনিতেছেন। বিলম্ব

সেইজন্য হইতেছে। —কঙ্কাবতী আরও কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন, তবুও মশা ঘরে ফিরিলেন না! —কঙ্কাবতী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমাদের কর্ত্তা কখন আসিবেন গা? বড় যে বিলম্ব হইতেছে!' —এবার মধ্যম-মশানী উত্তর দিলেন,—"তুষের ধোঁ, কুলোর বাতাস, কোণ নিয়েছেন পারা।"

অর্থাৎ কিনা,—চরিবার নিমিত্ত কর্ত্তা হয় তো কোনও লোকের ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়াছেন। সে লোক তূষের অগ্নি করিয়া তাহার উপর সূর্পের বাতাস দিয়া ঘর ধুম পূর্ণ করিয়াছে।কর্ত্তাগিয়া ঘরের এককোনে লুক্কয়িত হইয়াছেন, ব্যহির হইতে পারিতেছেন না। সেই জন্য বিলম্ব হইতেছে। —একটু ধুম কমিলে বাহির হইয়া আসিবেন।

কঙ্কাবতী আবার অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার পর পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কৈ গা! তিনি তো এখনও এলেন না! আর কত বিলম্ব হইবে?"

এইবার বড়-মশানী উত্তর করিলেন,—"কটাস্ কামড়, চটাস্ চাপড়, ম'রে গিয়াছেন পারা!" —অর্থাৎ কিনা,—কর্ত্তা হয় তো কোনও লোকের গায়ে বসিয়াছিলেন। গায়ে বসিয়া যেমন কটাস্ করিয়া কামড় মারিয়াছেন, আর অমনি সে লোকটি একটি চটাস্ করিয়া চাপড় মারিয়াছে। সেই চাপড়ে কর্ত্তা হয় তো মরিয়াছেন।

"কর্ত্তা মরিয়া গিয়াছেন," এইরূপ অকল্যাণের কথা শুনিয়া ছোট রাণী ফোঁস্ করিয়া উঠিলেন! তিনি বলিলেন,—"তোমার যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। আসুন কর্ত্তা! তাঁরে বলি, 'তুমি মরিয়া গেলে, তোমার বড় রাণীর হাড়ে বাতাস লাগে।' তোমার মুখে চুণ-কালি দিয়া তোমার মাথা মুড়াইয়া, তোমার মাথায় ঘোল ঢালিয়া, তোমাকে এখনি বিদায় করিবেন।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ – মশা প্রভু

তিন সতীনে পুনরায় ঘোরতর বিবাদ বাধিল। রক্তবতী চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মশার ঘরে কোলাহলের রোল উঠিল। এমন সময় মশা বাড়ী আসিলেন ঘরে কলহ-কচকচির কোলাহল শুনিয়া, মশার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া গেল।

মশা বলিলেন,—"এ যন্ত্রণা আর আমার সহ্য হয় না। তোমাদের ঝগড়ার জ্বালায়, আমাদের ঘরের কাছে গাছের ডালে কাক-চিল বসিতে পারে না। যেখানে এরূপ বিবাদ হয়, সেখানে লক্ষ্মী থাকেন না,—তালুকে মনুষ্যদিগের শরীরে শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়; ইচ্ছা হয় যে, গলায় দড়ি দিয়া মরি, কি বিষ খাইয়া মরি! আত্মহত্যা করিয়া আমাকে মরিতে হইবে। এই সেদিন ধর্ম্মে ধর্ম্মে আমার প্রাণটি রক্ষা হইয়াছে। আমি একজন আফিমখোরের গায়ে বসিয়াছিলাম। তাহার রক্ত কি তিক্ত! এক শুঁড় রক্ত সব ফেলিয়া দিলাম। বার বার কুলকুচা করিয়া তবে প্রাণ রক্ষা হইল। মনে করিলাম,—অপঘাত মৃত্যুতে মরিব! তাই এত কাণ্ড করিয়া প্রাণ বাঁচাইলাম। কিন্তু তোমাদের জ্বালায় এত জ্বালাতন হইয়াছি যে, বাঁচিতে আর আমার তিলমাত্র সাধ নাই!"

এইরূপে মশা স্ত্রীগণকে অনেক ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার রাগ

পড়িলে, তিনি একটু সুস্থির হইলে, রক্তবতী গিয়া তাঁহার কোলে বসলেন।

রক্তবতী বলিলেন,—"বাবা! আমার পচাজল আসিয়াছে।"

মশা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে আবার কে? পচাজল আবার কি?"

রক্তবতীর মা উত্তর করিলেন,—"ওগো! একটি মানুষের কন্যা! সন্ধ্যা হইতে এখানে বসিয়া আছে। রক্তবতী তাহার সহিত পচাজল পাতাইয়াছে। আহা! বালিকা এখানে আসিয়া পর্য্যন্ত কেবল কাঁদিতেছে। বলে, 'আমি পতিহারা সতী! পতিকে নাকেশ্বরী খাইয়াছে। আমি লোকালয়ে যাইব, সেখান হইতে বৈদ্য আনিয়া আমার পতিকে ভাল করিব।' আমি তাকে বলিলাম,—'বাছা! একটু অপেক্ষা কর। কর্ত্তাটি বাড়ী আসুন, তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া তোমার একটা উপায় করা যাইবে। তুমি যখন রক্তবতীর পচাজল হইয়াছে, তখন তোমার দুঃখ মোচন করিতে আমরা যথাসাধ্য যত্ন করিব!' রক্তবতীর পচাজল হইবে, রক্তবতী পচাজলকে লইয়া সাধ আহ্লাদ করিবে, তোমার আর দুইটি রাণীর প্রাণে সহিবে কেন? তাঁদের আবার ঐ মানুষের ছানাটিকে পুষিতে সাধ হইল। সেই কথা লইয়া আমাকে তাঁরা যা-না-তাই বলিলেন। তা, আমার আর এখানে থাকিয়া আবশ্যক নাই, তুমি আমাকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দাও। দিয়া, দুই রাণী নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না কর। আমি তোমার কণ্টক হইয়াছি, আমি এখান হইতে যাই।"

মশা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে মানুষের কন্যাটি কোথায়?" —রক্তবতীর মা বলিলেন,—"ঐ বাহিরে বসিয়া আছে!" —রক্তবতী বলিলেন,—"বাবা! তুমি আমার সঙ্গে এস। আমার পচাজল কোথায়, আমি এখনি দেখাইয়া দিব।"

মশা ও রক্তবতী দুই জনে উড়িলেন! বিষণ্ণ-বদনে অশ্রুপূরিতনয়নে, যেখানে কঙ্কাবতী বসিয়াছিলেন, গুন্‌গুন্ করিয়া দ্‌ই জনে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

রক্তবতী বলিলেন,—"পচাজল। এই দেখ, বাবা আসিয়াছেন।"

কঙ্কাবতী সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া মশাকে নমস্কার করিলেন। কঙ্কাবতীকে ভাল করিয়া দেখিতে পাইবেন বলিয়া, মশা গিয়া একটি ঘাসের ডগার উপর বসিলেন। তাহার পাশে আর একটি ঘাসের ডগার উপব রক্তবতী বসিলেন। মশার সম্মুখে হাত যোড় করিয়া কঙ্কাবতী দণ্ডায়মান রহিলেন।

অতি বিনীতভাবে কঙ্কাবতী বলিলেন,—"মহাশয়! বিপন্না অনাথা বালিকা আমি। জনশূন্য এই গহন কাননে আমি একাকিনী, আমি পতিহারা সতী। আমি দুঃখিনী কঙ্কাবতী! প্রাণসম পতি আমার ভূতিনীর হস্তগত হইয়াছে। আমার পতিকে উদ্ধার করিয়া দিন। আমি আপনার শরণ লইলাম।" —মশা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কাহার সম্পত্তি?"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন, "মহাশয়! পূর্ব্বে আমি পিতার সম্পত্তি ছিলাম। বাল্যকালে মনুষ্য-বালিকারা পিতার সম্পত্তি থাকে। দানবিক্রয়ের অধিকার পিতার থাকে। অন্ধ, আতুর, বৃদ্ধ, ব্যাধিগ্রস্ত যাহাতে ইচ্ছা তাহাকেই তিনি দান-বিক্রয় করিতে পারেন। জ্ঞান না হইতে হইতে মাতা পিতা আপন আপন বালিকাদিগকে দানবিক্রয় করিয়া নিশ্চিন্ত হন।

আমাদের মধ্যে এই রীতি প্রচলিত। আমার পিতা, তিন সহস্র স্বর্ণ-মুদ্রা পাইয়া, আমাকে আমার পতির নিকট বিক্রয় করিয়াছেন। এক্ষণে আমি আমার পতির সম্পত্তি, যে পতিকে হারাইয়া অনাথা হইয়া আজ আমি বনে বনে কাঁদিয়া বেড়াইতেছি। পূর্বে পিতার সম্পত্তি ছিলাম, এক্ষণে আমি আমার পতির সম্পত্তি।"

মশা বলিলেন,—"উঁহু! সে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি না। তুমি কোন মশার সম্পত্তি?"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—"কোন্ মশার সম্পত্তি। সে কথা ত আমি কিছু জানি না। কৈ আমি কোন মশার সম্পত্তি নই।" —মশা বলিলেন,—"রক্তবতি। তোমার পচাজল দেখিতেছি পাগলিনী, উন্মত্তা; ইহার কোনও জ্ঞান নাই। সঠিক সত্য সত্য কথায় উত্তর না পাইলে তোমার পচাজলের কি করিয়া আমি উপকার করি?"

রক্তবতী বলিলেন,—"ভাই পচাজল! বাবা যে কথা জিজ্ঞাসা করেন, সত্য সত্য তাহার উত্তর দাও!"

মশা বলিলেন,—"শুন, মনুষ্য-শাবক! এই ভারতে যত নর-নারী দেখিতে পাও, ইহারা সকলেই মশাদিগেব সম্পত্তি। যে মশা মহাশয় তোমার অধিকাবী, তাঁহার নিকট হইতে বোধ হয়, তুমি পলাইয়া আসিয়াছ। সেই ভয়ে তুমি আমার নিকট সত্য কথা বলিতেছ না, আমার নিকট কথা গোপন করিতেছ! তোমার ভয় নাই, তুমি সত্য সত্য আমার কথার উত্তর দাও। আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি,—তুমি কোন্ মশার সম্পত্তি, কোন্ মশা তোমাব গায়ে উপবিষ্ট হইয়া বক্ত পান করেন? তাঁহার নাম কি? তাঁহার নিবাস কোথায়? তাঁহার কয় স্ত্রী? কয় পুত্র? কয কন্যা? পৌত্র, দৌহিত্র আছে কি না? তাঁহাব জ্ঞাতি-বন্ধুদিগের তোমার উপর কোনও অধিকারী আছে কি না? তাঁহারা তোমাকে এজমালিতে রাখিয়াছেন, কি তোমার হস্তপদাদি বন্টন করিয়া লইয়াছে? যদি তুমি বন্টিত হইয়া থাক, তাহা হইলে সে বিভাগের কাগজ কোথায়? মধ্যস্থ দ্বারা তুমি বন্টিত হইয়াছ, কি আদালত হইতে আমীন আসিয়া তোমাকে বিভাগ করিয়া দিয়াছে? এই সব কথার তুমি আমাকে সঠিক উত্তর দাও! কারণ, আমি তোমাকে কিনিয়া লইবার বাসনা করি। আমার তালুকে অনেক মানুষ আছে, মানুষের অভাব নাই। আমার সম্পত্তি নরনারীগণের দেহে যা রক্ত আছে, তাহাই খায় কে? তবে তুমি রক্তবতীর সহিত 'পচাজল' পাতাইয়াছ, সেই জন্য তোমাকে আমি একেবারে কিনিয়া লইতে বাসনা করি। তাহা যদি না করি, তাহা হইলে তোমার অধিকার মশাগণ আমার নামে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিতে পারেন। তোমাকে এখান হইতে তাঁহারা পুনরায় লইয়া যাইতে পারেন। আমার রক্তবতী তাহা হইলে কাঁদিবে। আমি আর একটি কথা বলি, এরূপ করিয়া এক গ্রাম হইতে আর এক গ্রামে ভারতবাসীদিগের যাওয়া উচিত নয়। ভারত-বাসীদিগের উচিত, আপন আপন গ্রামে বসিয়া থাকা। তাহা করিলে, মশাদিগের মধ্যে সম্পত্তি লইয়া আর বিবাদ হয় না। মশাগণ আপন আপন সম্পত্তি সুখে স্বচ্ছন্দে সম্ভোগ করিতে পারেন! শীঘ্রই আমরা ইহার একটা উপায় করিব। এক্ষণে আমার কথার উত্তর দাও। এখন বল তোমার মশা-প্রভুর নাম কি?"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—"মহাশয়! আমি আপনাকে সত্য বলিতেছি, আমার মশা-প্রভুর নাম আমি জানি না। মনুষ্যেরা যে মশাদিগের সম্পত্তি, তাহাও আমি এত দিন জানিতাম না। মশাদিগের মধ্যে যে মনুষ্যেরা বিতরিত, বিক্রীত ও বন্টিত হইয়া থাকে, তাহাও আমি জানিতাম না। মশাদিগের যে আবার নাম থাকে, তাহাও আমি জানি না। তা আমি কি করিয়া বলি যে, আমি কোন্ মশার সম্পত্তি।"

ক্রোধে মশা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। রাগে তাঁহার নয়ন আরক্ত হইয়া উঠিল। মশা বলিলেন,—"না, তুমি কিছুই জান না! তুমি কচি খুকীটি! গায়ে কখনও মশা বসিতে দেখ নাই! সে মশাগুলিকে তুমি চেন না! তাহাদের তুমি নাম জান না! তুমি ন্যাকা। পতিহারা সতী হইয়া কেবল পথে পথে কাঁদিতে জান!"

মশার এইরূপ তাড়নায় কঙ্কাবতী কাঁদিতে লাগিলেন। কঙ্কাবতীর পানে চাহিয়া রক্তবতী চক্ষু টিপিলেন। সে চক্ষু টিপুনীর অর্থ এই যে,—"পচাজল! তুমি কাঁদিও না। বাবা বড় রাগী মশা! একে রাগিয়াছেন, তাতে তুমি কাঁদিলে আরও রাগিয়া যাইবেন।"

রক্তবতী যা বলিলেন, তাহা হইল। কঙ্কাবতীর কান্না দেখিয়া মশা আরও রাগিয়া উঠিলেন। মশা বলিলেন,—"এ কোথাকার প্যান্‌পেনে মেয়েটা র‍্যা। ভ্যানোর ভ্যানোর করিয়া কাঁদে দেখ। আচ্ছা! যে সব কথা এতক্ষণ ধরিয়া জিজ্ঞাসা-পড়া করিলাম, তার তুমি কিছুই জান না, বলিলে! এখন এ কথাটার উত্তর দিতে পারিবে কি না? ভাল এই যে সব মানুষ হইয়াছে, এই যে কোটি কোটি মানুষ ভারতে রহিয়াছে, এ সব মানুষ কেন? কিসের জন্য সৃজিত হইয়াছে? এ কথার এখন আমাকে উত্তর দাও।"

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"মানুষ কেন, কিসের জন্য সৃজিত হইয়াছে? তা, আমি জানি না।" মশা বলিলেন,—"এ? মেয়েটা নিতান্ত বোকা! একেবারে বদ্ধ পাগল! কিছু জানে না! এই ভারতের মানুষগুলো বড় বোকা! কাণ্ডজ্ঞান-বিবর্জ্জিত। রক্তবতী শিশু বটে, কিন্তু এর চেয়ে আমার রক্তবতীর লক্ষগুণে বুদ্ধিশুদ্ধি আছে! তুমি বল তো মা, রক্তবতি, ভারতের মানুষ কিসের জন্য সৃজিত হইয়াছে?"

রক্তবতী বলিলেন,—"কেন বাবা! আমরা খাব বলিয়া তাই হইয়াছে।"

মশা বলিলেন,—"এখন শুনিলে? ভারতের মানুষ কিসের জন্য হইয়াছে তা বুঝিলে?"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—"আজ্ঞা হাঁ, এখন বুঝিলাম। মশারা আহার করিবেন বলিয়া তাই মানুষের সৃজন হইয়াছে।" —রক্তবতী বলিলেন,—"আমার পচাজল মানুষের ছানা বই তো নয়! মানুষদের বুদ্ধি শুদ্ধি নাই, তা সকল মশাই জানে। নির্ব্বোধ মশাকে সকলে মানুষ বলিয়া গালি দেয়। সকলে বলে, 'অমুক মশা ত' মশা নয়—ওটা মানুষ। তা আমাদের মত পচাজলের বোধ-শোধ কেমন করিয়া হইবে? আমার পচাজলকে বাবা, তুমি আর বকিও না!" —মশা ভাবিলেন,—"সত্য কথা। মানুষের ছানাটাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করা বৃথা। আমাকে নিজেই সকল সন্ধান লইতে হইবে।"

মশা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বলি হাঁগো মেয়ে! এখন তোমার বাড়ী কোন্ গ্রামে বল

দেখি? তা' বলিতে পারিবে তো?"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন যে, তাঁহাদের গ্রামের নাম কুসুমঘাটী। মশা তৎক্ষণাৎ আপন অনুচরদিগকে কুসুমঘাটী পাঠাইলেন ও কঙ্কাবতীর প্রভুগণকে ডাকিয়া আনিতে আদেশ করিলেন! দূতগণ কুসুমঘাটীতে উপস্থিত হইয়া, অনেক সন্ধানের পর জানিতে পারিলেন যে, কঙ্কাবতীর অধিকারী তিনটি মশা। তাঁহাদের নাম, গজগণ্ড, বৃহৎমুণ্ড ও বিকৃততুণ্ড। রক্তবতীর পিতার নাম দীর্ঘশুণ্ড। দূতগণ শুনিলেন যে কঙ্কাবতীর অধিকারিগণের বাস আকাশমুখ নামক শালবৃক্ষ। সেইখানে যাইয়া কঙ্কাবতীর অধিকারীগণকে সকল কথা তাঁহারা বলিলেন। তাহারা দূতগণের সহিত আসিয়া অবলিম্বে দীর্ঘশুণ্ডের নিকট উপস্থিত হইলেন। অনেক বাদানুবাদ, অনেক কষা-কষির পর, তিন ছটাক নররক্ত দিয়া, কঙ্কাবতীকে দীর্ঘ-শুণ্ড কিনিয়া লইলেন! কঙ্কাবতীকে ক্রয় করিয়া তিনি কন্যাকে বলিলেন,—"রক্তবতী! এই নাও, তোমার পচাজল নাও! এ মানুষের ছানাটি এখন আমাদের নিজস্ব, ইহা এখন আমাদের সম্পত্তি।"

দীর্ঘ-শুণ্ড, তাহার পর, গজগণ্ড, বৃহমুণ্ড, বিকৃততুণ্ড প্রভৃতি মশাগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"মহোদয়গণ! আমি দেখিতেছি, আমাদের ঘোর বিপদ্ উপস্থিত। ভারতবাসিগণের রক্ত পান করিয়া পৃথিবীর যাবতীয় মশা এতদিন সুখে-স্বাচ্ছন্দে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। ভারতের তিন দিকে কালাপানি, এক দিকে অত্যুচ্চ পর্বতশ্রেণী। জীবজন্তুগণকে লোকে যেরূপ বেড়া দিয়া রাখে, ভারতবাসিগণকে এত দিন আমরা সেইরূপ আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম। ভারতের লোক ভারতে থাকিয়া এতদিন আমাদিগের সেবা করিতেছিল, বিনীতভাবে শোণিত-দান করিয়া আমাদের দেহ পরিপোষণ করিতেছিল। এক্ষণে কেহ কেহ মহাসাগর ও মহাপর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এরূপ কার্য্য করিয়া আমাদিগকে রক্ত হইতে বঞ্চিত করিলে যে তাহাদের মহাপাতক হয়, তাহা আপনারা সকলেই জানেন। যেমন করিয়া হউক, ভাবতবাসীদিগের এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমনাগমন আজকাল কিছু অধিক হইয়াছে। এই দেখুন, আজ সন্ধ্যাবেলা কুসুমাঘাটী হইতে একটি মনুষ্য শাবক আমার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। সে মনুষ্য-শাবকটি আপনাদের সম্পত্তি। আজ আপনার সম্পত্তি পলাইবে, কাল আমার সম্পত্তি পলাইবে। এই প্রকারে মনুষ্যেরা যদি এক গ্রাম হইতে অপর গ্রামে যায়, তাহা হইলে সম্পত্তি লইয়া আমাদের মধ্যে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইবে। তাহার পর আবার বুঝিয়া দেখুন, দেশ-ভ্রমণের কি ফল! দেশভ্রমণ করিলে মনুষ্যেরা নানা নূতন বিষয় শিক্ষা করিতে পারে, মনুষ্যদিগের জ্ঞানের উদয় হয়। দেশভ্রমণ করিয়া ভারতবাসীদিগের যদি চক্ষু উন্মীলিত হয়, তাহা হইলে, মনুষ্যগণ আর আমাদের বশ্যতাপন্ন হইয়া থাকিবে না। আবার বাণিজ্যাদি ক্রিয়া দ্বারা ক্রমে তাহারা ধনবান্ হইয়া উঠিবে! তখন মশারি প্রভৃতি নানা উপায় করিয়া, রক্তপান হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিবে। অতএব, যাহাতে ভারতবাসীরা বিদেশে গমনাগমন না করিতে পারে, যাহাতে এক গ্রামের লোক অপর গ্রামে যাইতে না

পারে, এরূপ উপায় সত্বর আমাদিগকে করিতে হইবে।"

দীর্ঘ-শুণ্ডের বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। সকলেই বলিলেন, দীর্ঘ-শুণ্ড অতি বিচক্ষণ মশা, দীর্ঘ শুণ্ডের অতি দূর-দৃষ্টি, এরূপ বিজ্ঞ বুদ্ধিমান্ মশা পৃথিবীতে আর নাই। ভারতবাসীরা যাহাতে ভবিষ্যতে এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে যাইতে না পারে, এরূপ উপায় করা অবশ্য-কর্ত্তব্য, তাহা সকলেই স্বীকার করিলেন। মশাগণ অনেক অনুধাবনা—অনেক বিবেচনা করিয়া অবশেষে স্থির করিলেন যে, পণ্ডিতদিগকে আহ্বান করিয়া একটি ভাল বিধি প্রচলিত করিতে হইবে, তবে লোকে সে বিধি প্রতিপালন করিবে; তা না হইলে লোকে মানিবে না। এইরূপ পরামর্শ করিয়া সমাগত মশাবৃন্দ ভারতের মহামহা পণ্ডিতদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। পণ্ডিতগণ উপস্থিত হইলে, দীর্ঘশুণ্ড তাঁহাদিগকে মশাকূল-অনুমোদিত শাস্ত্রীয় বচন বাহির করিতে অনুরোধ করিলেন। শাস্ত্রাদি পর্য্যালোচনা করিয়া পণ্ডিতগণ অবিলম্বে বিধি বাহির করিলেন যে, এ কলিকালে ভারতবাসীদিগের পক্ষে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমন করা একেবারে নিষিদ্ধ। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমন করিলে অতি মহাপাতক হয়। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। তবে কলিকালে ভারতবাসিগণ করিবে কি? কলিকালে ভারতবাসীদিগের নিমিত্ত এই বিধি আছে—

সদা কৃতাঞ্জলিপুটা ব্যাংশুকাঃ পিহিতেক্ষণাঃ!
ঘোরান্ধতমসে কূপে সন্তু ভারতবাসিনঃ।।
পিবন্তু রুধিরন্ধেষাং যাবন্তো মশকা ভুবি।
অদ্যপ্রভৃতি বৈ লোকে বিধিরেষ প্রবর্ত্তিতঃ।।

ইহার স্থূল অর্থ এই যে,—কলিকালে ভারতবাসিগণ চক্ষে ঠুলি দিয়া, হাত যোড় করিয়া, অন্ধকূপের ভিতর বসিয়া থাকিবে, আর পৃথিবীর যাবতীয় মশা আসিয়া তাহাদিগের রক্ত শোষণ করিবে। এইরূপ মনের মত ব্যবস্থা পাইয়া মশাগণ পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। পণ্ডিতগণ যথাবিধি বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অন্যান্য মশাগণও আপন আপন দেশে প্রতিগমন করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ – খর্ব্বুর

দীর্ঘ শুণ্ড মশা বলিলেন,—"রক্তবতি! এক্ষণে মনুষ্য-শাবকটি তোমার। ইহাকে লইয়া তুমি যাহা ইচ্ছা হয় কর।"

রক্তবতী বলিলেন,—"পিতা! ইনি আমার ভগিনী! ইঁহার সহিত আমি পচাজল পাতাইয়াছি। আমার পচাজল বিপদে পড়িয়াছে। পচাজলের পতিকে নাকেশ্বরী খাইয়াছে। কাঁদিয়া কাঁদিয়া পচাজল আমার সারা হইয়া গেল। যাহাতে আমার পচাজল আপনার পতি পায়, বাবা, তুমি তাহাই কর।" কি করিয়া কঙ্কাবতীর পতিকে নাকেশ্বরী খাইয়াছে, মশা আদ্যোপান্ত সমুদয় বিবরণ শুনিতে ইচ্ছা করিলেন। আগা-গোড়া সকল কথা কঙ্কাবতী তাঁহাকে বলিলেন।

ভাবিয়া চিন্তিয়া মশা শেষে বলিলেন,—"তুমি আমার রক্তবতীর পচাজল, সে নিমিত্ত তোমার প্রতি আমার স্নেহের উদয় হইয়াছে। তোমাকে আমরা কেহ আর খাইব না। স্নেহের সহিত তোমাকে আমরা প্রতিপালন করিব। যাহাতে তুমি তোমার পতি পাও, সে জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। আমার তালুকে খর্ব্বুর মহারাজ বলিয়া একটি মনুষ্য আছে। শুনিয়াছি, সে নানারূপ ঔষধ, নানারূপ মন্ত্র-তন্ত্র জানে। আকাশে বৃষ্টি না হইলে, মন্ত্র পড়িয়া মেঘে সে ছিদ্র করিয়া দিতে পারে। শিলা-বৃষ্টি পড় পড় হইলে সে নিবারণ করিতে পারে। বৃদ্ধা স্ত্রী দেখিলেই সে বলিতে পারে,—এ ডাইনী কি ডাইনী নয়! তাঁহাকে দেখিবামাত্র ভূতগণ পলায়ণ করে। তাহার মত গুণী মনুষ্য পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই। নাকেশ্বরীর হাত হইতে তোমার পতিকে সেই উদ্ধার করিতে পারিবে।"

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"তবে মহাশয় আর বিলম্ব করিবেন না। চলুন, এখনি তাঁহার নিকট যাই। মহাশয়! স্বামী-শোকে শরীর আমার প্রতিনিয়তই দগ্ধ হইতেছে, সংসার আমি শূন্য দেখিতেছি। তাঁহার প্রাণ রক্ষা হইবে, কেবল এই প্রত্যাশায় জীবিত আছি। তা না হইলে, কোন্ কালে এ পাপ প্রাণ বিসর্জ্জন দিতাম।"

মশা বলিলেন,—"অধিক রাত্রি হইয়াছে, তুমি পরিশ্রান্ত হইয়াছ। আমার তালুক নিতান্ত নিকট নয়। তবে রও! আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ডাকিতে পাঠাই। তাহার পিঠে চড়িয়া আমরা সকলে এখনি খর্ব্বুর মহারাজের নিকট গমন করিব।"

মশা এই বলিয়া আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ডাকিতে পাঠাইলেন। কিছুক্ষণ বিলম্বে মশার ছোট ভাই আসিয়া উপস্থিত হইলেন; মশানীগণ তাঁহাকে "হাতি-ঠাকুর-পো, হাতি-ঠাকুর-পো" বলিয়া অনেক সমাদর ও নানারূপ পবিহাস করিতে লাগিলেন।

রক্তবতী তাঁহাকে বলিলেন,—"কাকা! আমি একটি মানুষের ছানা পাইয়াছি। তাহার সঙ্গে আমি পচাজল পাতাইয়াছি। আমি পচাজলকে বড় ভালবাসি, আমার পচাজলও আমাকে বড় ভালবাসে।"

কঙ্কাবতী আশ্চর্য্য হইলেন! মশার ছোট ভাই, হাতী! প্রকাণ্ড হস্তী! বনের সকলে তাঁহাকে "হাতি-ঠাকুর-পো" বলিয়া ডাকে।

রক্তবতীর পিতা হস্তীকে বলিলেন,—"ভায়া! আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি। রক্তবতী একটি মানুষের মেয়ের সহিত পচাজল পাতাইয়াছে। মেয়েটির পতিকে নাকেশ্বরী খাইয়াছে। মেয়েটি পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতেছে। রক্তবতীর দয়ার শরীর। রক্তবতী তার দুঃখে বড় দুঃখী। আমি তাই মনে করিয়াছি, যদি কোনও মতে পারি তো তার স্বামীকে উদ্ধার করিয়া দিই। খর্ব্বুর মহারাজের দ্বারাই এ কার্য্য সাধিত হইতে পারিবে। তাই আমার ইচ্ছা যে, এখনি খর্ব্বুরের নিকট যাই। কিন্তু মানুষের মেয়েটি পথ হাঁটিয়া ও কাঁদিয়া কাঁদিয়া অতিশয় শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। এত পথ সে চলিতে পারিবে না। এখন ভায়া, 'তুমি যদি কৃপা কর, তবেই হয়। আমাদিগকে যদিপিঠে করিয়া লইয়া যাও তো বড় উপকার হয়।' —হাতি-ঠাকুর-পো সে কথায় সম্মত হইলেন। কঙ্কাবতী মশানীদিগকে

নমস্কার করিয়া, তাঁহাদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

রক্তবতীর গলা ধরিয়া কঙ্কাবতী বলিলেন,—"ভাই পচাজল, তুমি আমার অনেক উপকার করিলে। তোমার দয়া, তোমার ভালবাসা, কখনও ভুলিতে পারিব না। যদি ভাই পতি পাই, তবেই পুনরায় দেখা হইবে। তা না হইলে, ভাই, এ জনমের মত তোমার পচাজল এই বিদায় হইল।" রক্তবতীর চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল, রক্তবতীর চক্ষু হইতে অশ্রুবিন্দু ফোঁটায় ফোঁটায় ভূতলে পতিত হইতে লাগিল!

মশা ও কঙ্কাবতী দুই জনে হাতীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। হাতি-ঠাকুর-পো মৃদুমন্দ গতিতে চলিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে সমস্ত রাত্রি গত হইয়া গেল। অতি প্রত্যূষে খর্ব্বুরের বাটীতে গিয়া সকলে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে, খর্ব্বুর শয্যা হইতে উঠিয়াছেন। অতি বিষণ্ণ-বদনে আপনার দ্বারদেশে বসিয়া আছেন। একটু একটু তখনও অন্ধকার রহিয়াছে। আকাশে কৃষ্ণপক্ষীর প্রতিপদের চন্দ্র তখনও অস্ত যান নাই। খর্ব্বুরের বিষণ্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া আকাশের চাঁদ অতি প্রসন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। চাঁদের মুখে আর হাসি ধরে না। চাঁদের হাসি দেখিয়া খর্ব্বুরের রাগ হইতেছে। খর্ব্বুর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, —এই চাঁদের এক দিন আমি দণ্ড করিব। চাঁদকে যদি উচিত মত দণ্ড না দিতে পারি, তা হইলে, খর্ব্বুরের গুণ-জ্ঞান, তুকতুাক্ মন্ত্র-তন্ত্র, শিকড়-মাকড়, সবই বৃথা।" মশা, কঙ্কাবতী ও হস্তী খুর্ব্বরের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। মশাকে দেখিয়া খর্ব্বুর শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। —হাত যোড় করিয়া খর্ব্বুর বলিলেন,—"মহাশয়। আজ প্রাতঃকালে কি মনে করিয়া? প্রতিদিন তো সন্ধ্যার সময় আপনার শুভাগমন হয়। আজ দিনের বেলা কেন? ঘরে কুটুম্ব-সাক্ষাৎ আসিয়াছেন না কি? তাই কনিষ্ঠকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন যে, তাঁহার পিঠে বোঝাই দিয়া প্রচুর পরিমাণে রক্ত লইয়া যাইবেন?"

মশা উত্তর করিলেন,—"না, তা নয়! সে জন্য আমি আসি নাই; কি জন্য আসিয়াছি, তাহা বলিতেছি। আপাততঃ জিজ্ঞাসা করি, তুমি বিষণ্ণ-মুখে বসিয়া আছ কেন? এরূপ বিষণ্ণ-বদনে থাকা তো উচিত নয়! মনোদুঃখে থাকিতে তোমাদিগকে আমি বার বার নিষেধ করিয়াছি। মনের সুখে না থাকিলে, শরীরে রক্ত হয় না, সে রক্ত সুস্বাদ হয় না। মনের সুখে যদি তোমরা না থাকিবে, পুষ্টিকর তেজস্কর দ্রব্য-সামগ্রী যদি আহার না করিবে, তবে তোমাদের রক্তহীন দেহে বসিয়া আমাদের ফল কি? তোমরা সব যদি নিয়ত এরূপ অন্যায় কার্য্য করিবে, তবে আমরা পরিবারবর্গকে কি করিয়া প্রতিপালন করিব? তোমাদের মনে কি একটু ত্রাস হয় না যে, আমাদের গায়ে বসিযা মশা-প্রভু যদি সুচারুরূপে রক্তপান করিতে না পান, তাহা হইলে, তিনি আমাদিগের উপর রাগ করিবেন?"

খর্ব্বুর বলিলেন,—"প্রভু! শীর্ণ হইয়া যাইতেছি সত্য। আমার শরীরে ভালরূপ সুস্বাদ রক্ত না পাইলে, মহাশয় যে রাগ করিবেন, তাহাও জানি। কিন্তু কি করিব, স্ত্রীর তাড়নায় আমার এই দশা ঘটিয়াছে।" —মশা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন? কি হইয়াছে? তোমার স্ত্রী তোমার প্রতি কিরূপ অত্যাচার করেন?"

খর্ব্বুর উত্তর করিলেন,—"প্রভু! আমাদের স্ত্রী-পুরুষে সর্ব্বদা বিবাদ হয়। দিনের মধ্যে দুই তিন বার মারামারি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের কথা আর মহাশয়কে কি বলিব! আমি হইলাম, তিন হাত লম্বা, আমার স্ত্রী হইলেন, সাত হাত লম্বা। যখন আমাদের মারামারি হয়, তখন আমার স্ত্রী নাগরা জুতা লইয়া ঠন্‌ঠন্ করিয়া আমার মস্তকে প্রহার করেন। আমি ততদূর নাগাল পাই না; আমি যা মারি, তা আমার প্রহারে স্ত্রীর কিন্তু কিছুই হয় না; সুতরাং স্ত্রীর নিকটে আমি সর্ব্বদাই হারিয়া যাই। একে মার খাইয়া, তাতে মনঃক্লেশে শরীর আমার শীর্ণ হইয়া যাইতেছে; দেহে আমার রক্ত নাই। সে জন্য মহাশয় রাগ করিতে পারেন, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি কি করিব? আমার অপরাধ নাই।" —মশা বলিলেন,—"বটে! আচ্ছা, তুমি এক কর্ম্ম কর। আজ হাতী ভায়ার পিঠে চড়িয়া তুমি স্ত্রীর সহিত মারামারি কর।"

এই বলিয়া মশা খর্ব্বুরকে হাতীটি দিলেন। খর্ব্বুর হাতীর পিঠে চড়িয়া বাড়ীর ভিতর গিয়া স্ত্রীর সহিত বিবাদ করিতে লাগিলেন। কথায় কথায় ক্রমে মারামারি আরম্ভ হইল। খর্ব্বুর আজ হাতীর উপর বসিয়া মনের সুখে ঠন্ ঠন্ করিয়া স্ত্রীর মাথায় নাগরা জুতা মারিতে লাগিলেন। আজ স্ত্রী যাহা মারেন, খর্ব্বুরের গায়ে কেবল সামান্য ভাবে লাগে। যখন তুমল যুদ্ধ বাঁধিয়া উঠিল, মশার তখন আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। মশার হাত নাই যে, হাততালি দিবেন, নখ নাই যে নখে নখে ঘর্ষণ করিবেন! তাই তিনি কখনও এক পা তুলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, কখনও দুই পা তুলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন ও গুন্‌গুন্ করিয়া"নারদ নারদ' বলিতে লাগিলেন। অবিলম্বেই আজ খর্ব্বুরের স্ত্রীকে পরাভব মানিতে হইল। খর্ব্বুরের মন আজ আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। খর্ব্বুরের ধমনী ও শিরায় প্রবলবেগে আজ শোণিত সঞ্চালিত হইতে লাগিল। মশা, সেই রক্ত একটু চাখিয়া দেখিলেন, দেখিয়া বলিলেন,—"বাঃ! অতি সুমিষ্ট, অতি সুস্বাদু!"

মশা মহাশয়কে খর্ব্বুর শত শত ধন্যবাদ দিলেন ও কি জন্য তাঁহাদের শুভাগমন হইয়াছে, সে কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কঙ্কাবতী ও নাকেশ্বরীর বিবরণ মশা মহাশয় আদ্যোপান্ত তাঁহাকে শুনাইলেন।

সমস্ত বিবরণ শুনিয়া খর্ব্বুর বলিলেন,—"আপনাদের কোনও চিন্তা নাই। নাকেশ্বরীর হাত হইতে আমি ইহার পতিকে উদ্ধার করিয়া দিব। ভূত, প্রেতিনী, ডাকিনী, সকলেই আমাকে ভয় করে। চলুন, আমাকে সেই নাকেশ্বরীর ঘরে লইয়া চলুন, দেখি সে কেমন নাকেশ্বরী!" —মশা বলিলেন—"এবার চল! কিন্তু তোমাদের চলা-চলি সব শেষ হইল। বড় সব জাহাজে চড়িয়া, কোথায় রেঙ্গুন, কোথায় বিলাত, এ-খানে ও-খানে সেখানে যাইতে আরম্ভ করিয়াছে! বড় সব রেল-গাড়ী করিয়া এ-দেশ ও-দেশ করিতেছে! রও এবারকার শাস্ত্র একবার জারি হইতে দাও, তাহা হইলে টের পাবে!"

খর্ব্বুর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এবার শাস্ত্রে আমাদের গমনাগমন একেবারেই নিষিদ্ধ হইল না কি? গাছগাছড়া আনিতে যাইতেও পাইব না?"

মশা উত্তর করিলেন,—"না! এবারকার শাস্ত্রে লেখা আছে যে, ঘর হইতে তোমরা আর একেবারেই বাহির হইতে পারিবে না। সকলকে অন্ধকূপ খনন করিতে হইবে, চক্ষে ঠুলি দিয়া সকলকে সেই অন্ধকূপে বসিয়া থাকিতে হইবে। অন্ধকূপ হইতে বাহির হইলে, কি চক্ষুর ঠুলিটি খুলিলে, পাপ হইবে, জাতি যাইবে, আর 'এক-ঘোরে' হইয়া থাকিতে হইবে। যেমন তেমন পাপ নয়, সেই যারে বলে পাতক। কেবল পতাকা নয়, যারে বলে মহাপাতক। শুধু মহাপাতক নয়, সেই যারে বলে অতি মহাপাতক! কেমন! বড় যে সব জাহাজ চড়া, রেল চড়া, লেখা-পড়া শেখা, মশারি করা! এইবার?"

খর্ব্বুর বলিলেন,—"আপনারা মহাপ্রভু! যেরূপ শাস্ত্র করিয়া দিবেন, আমাদিগকে মানিতে হইবে। আপনারা আমাদিগের হর্ত্তা-কর্ত্তা বিধাতা। আপনারা সব করিতে পারেন।"

মশা, কঙ্কাবতী ও খর্ব্বুর হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। প্রায় দুই প্রহরের সময় পর্ব্বতের নিকট উপস্থিত হইলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ – খোক্কোশ

নাকেশ্বরী যখন খেতুকে পাইল, তখন খেতু একেবারে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলেন। জ্ঞান-গোচর আর তাঁহার কিছু মাত্র রহিল না। নিশ্বাস দ্বারা নাকেশ্বরী কঙ্কাবতীকে দূরীভূত করিল, খেতু তাহার কিছুই জানেন না।

খেতুকে মৃতপ্রায় করিয়া নাকেশ্বরী মনে মনে ভাবিল—বহুকাল ধরিয়া অনাহারে আছি ইষ্ট দেবতা ব্যাঘ্রের প্রসাদে আজ যদি এরূপ উপাদেয় খাদ্য মিলিল, তবে ইহাকে ভালরূপে রন্ধন করিয়া খাইতে হইবে। এমন সুখাদ্য একেলা খাইয়া তৃপ্তি হইবে না, যাই, মাসীকে গিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আনি।" –মাসী আসিতে আসিতে পাছে খাদ্য পচিয়া যায়, সেজন্য নাকেশ্বরী তখন খেতুকে একেবারে মারিয়া ফেলিল না, মৃত্যুপ্রায় অজ্ঞান করিয়া রাখিল।

নাকেশ্বরী মাসীকে নিমন্ত্রণ করিতে যাইল। নাকেশ্বরীর মাসীর বাড়ী অনেক দূর, সাত সমুদ্র তের নদী পার, সেই এক-ঠেঙো মুল্লকের ওধারে! সেখান যাইতে, আবার মাসীকে লইয়া আসিতে অনেক বিলম্ব হইল।

মাসী বুড়ো মানুষ। মাসীর দাঁত নাই। খেতুর কোমল মাংস দেখিয়া মাসীর আর আহ্লাদের সীমা নাই। মাসীর মুখ দিয়া নাল পড়িতে লগিল।

খেতুব গা টিপিয়া টিপিয়া মাসী বলিলেন,—"আহা! কি নরম মাংস। বুড়ো হইয়াছি, একঠেঙো মানুষের দড়িপানা শক্ত মাংস দাগা দাগা করিয়া কাটিয়া ভাজা হউক, আঙুলগুলির চড়চড়ি হউক, অন্যান্য মাংস অম্বল করিয়া বাঁধা থাকুক, দুই দিন আহার করা যাইবে, গন্ধ হইয়া যাইবে না।"

মাসী বোনঝীতে এইরূপ পরামর্শ হইতেছে, এমন সময় বাহিরে এক গোল উঠিল। হাতীর বংশীধ্বনি, মশার গুন্ গুড় মানুষের কণ্ঠস্বর, পর্ব্বতের বাহির হইতে অট্টালিকার ভিতর প্রবেশ করিল।" –নাকেশ্বরী ব্যস্ত হইয়া বলিল,—"মাসি। সর্ব্বনাশ হইল। মুখের গ্রাস বুঝি কাড়িয়া লয়! ছুঁড়ী বুঝি ওঝা আনিয়াছে।"

মাসী বলিলেন,—"চল চল চল! দ্বারের উপর দুই জনে পা ফাঁক করিয়া দাঁড়াইল।

অট্টালিকা দ্বারের উপর নাকেশ্বরী ও নাকেশ্বরীর মাসী পদপ্রসারণ করিয়া দাঁড়াই।

পর্ব্বতের ধারে সুড়ঙ্গের দ্বারে উপস্থিত মশা, কঙ্কাবতী ও খর্ব্বুর হস্তীর পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন। হাতি-ঠাকুর-পো বাহিরে দণ্ডায়মান থাকিয়া গাছের ডাল ভাঙিয়া মাছি তাড়াইতে লাগিলেন। কখনও বা শুঁড়ে করিয়া ধুলারাশি লইয়া আপনার গায়ে পাউডার মাখিতে লাগিলেন। দোল খাইতে ইচ্ছা হইলে কখনও মনের সাধে শরীর দোলাইতে লাগিলেন। —মশা, কঙ্কাবতী ও খর্ব্বুর সুড়ঙ্গের ভিতর প্রবেশ করিলেন। সুড়ঙ্গের পথ দিয়ে অট্টালিকার ভিতর প্রবেশ করিবার সময় দ্বারে নাকেশ্বরীর মাসীর পদতল দিয়া সকলকে যাইতে হইল।

ভিতরে প্রবেশ করিয়া, খেতুর নিকট সকলে যাইয়া দেখিলেন যে, খেতু মৃত-প্রায় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন। অজ্ঞান অচৈতন্য। শরীরে প্রাণ আছে কি না সন্দেহ। নিশ্বাস-প্রশ্বাস বহিতেছে কি না সন্দেহ। কঙ্কাবতী তাঁহার পদপ্রান্তে পড়িয়া পা দুটি বুকে লইয়া নানারূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন খর্ব্বুর খেতুকে নানা প্রকারে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন।

অবশেষে খর্ব্বুর বলিলেন,—"কঙ্কাবতী! তুমি কাঁদিও না। তোমার পতি এখন জীবিত আছেন। সত্বর আরোগ্য লাভ করিবেন। আমি এইক্ষণেই এ রোগের প্রতীকার করিতেছি।"এই খর্ব্বুর মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন খেতুর শরীরে শত শত ফুৎকার বর্ষণ করিতে লাগিলেন নানারূপ ঔষধ প্রয়োগ করিলেন। কিন্তু কোনও ফল হইল না। সংজ্ঞাশূন্য হইয়া খেতু যেভাবে পড়িয়াছিলেন, সেইভাবেই পড়িয়া রহিলেন। তিলমাত্র নড়িলেন চড়িলেন না। খর্ব্বুর বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—"এ কি হইল! আমার মন্ত্র-তন্ত্র এরূপ কখন তো বিফল হয় না! রোগী পুনর্জ্জীবিত হউক, মন্ত্রের ফল অল্পাধিক অবশ্যই প্রকাশিত হইয়া থাকে। আজ যে আমার মন্ত্র-তন্ত্র শিকড়-মাকড় একেবারেই নিরর্থক হইতেছে ইহার কারণ কি?" —খর্ব্বুর সাতিশয় চিন্তিত হইলেন। ভাবিয়া কারণ কিছু স্থির করিতে পারেন না।

অবশেষে তিনি বলিলেন,—"মহা-প্রভু! আসুন দেখি সকলে পুনর্ব্বার বাহিরে যাই! বাহিরে গিয়া দেখি, ব্যাপারখানা কি?"

অট্টালিকা হইতে পুনর্ব্বার বাহির হইলেন। কঙ্কাবতী একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন। কঙ্কাবতী ভাবিলেন যে অভাগিনীর কপালে পতি যদি বাঁচিবেন, তবে এত কাণ্ড হবেই বা কেন? তবে এখন তিনি পতিদেহ পাইবেন, পতিপাদপদ্মে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারিবেন, অসীম শোকসাগরে ভাসমান থাকিয়াও সে চিন্তাটি কথঞ্চিৎ তাঁহার শান্তির কারণ হইল।

একবার বাহিরে যাইয়া সুড়ঙ্গের পথ দিয়া সকলে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে লাগিলেন। অতি তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে, আশ-পাশ, অগ্র-পশ্চাৎ, উৰ্দ্ধ-নিম্ন দশ দিক্ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রূপে পরীক্ষা করিতে করিতে খর্ব্বুর আসিতে লাগিলেন। অট্টালিকার নিকট আসিয়া উর্দ্ধদিকে চাহিয়া দেখেন যে, ভূতিনীদ্বয় পদপ্রসারণ করিয়া দ্বারের উপর দাঁড়াইয়া আছে! খর্ব্বুর ঈষৎ

হাসিলেন; আর মনে মনে করিলেন,—"বটে। তোমাদের চাতুরী তো কম নয়!"

এবার বাহির হইতে খর্ব্বুর মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন। মন্ত্রের প্রভাবে ভূতিনীদ্বয় পদ উত্তোলন করিয়া সেখান হইতে পলায়ন করিল। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া খর্ব্বুর পুনরায় ঝাড়ান কাড়ান আরম্ভ করিলেন। ক্রমে মন্ত্রবলে নাকেশ্বরী আসিয়া খেতুর শরীরে আবির্ভূত হইল। খেতু বক্তা, হইলেন, অর্থাৎ কি না খেতুর মুখ দিয়া ভূতিনী কথা কহিতে লাগিল। নানারূপ ঔষধ প্রয়োগ করিয়া, নানারূপ মন্ত্র পড়িয়া খর্ব্বুর নাকেশ্বরীকে ছাড়িয়া যাইতে বলিলেন! নাকেশ্বরী কিছুতেই ছাড়িবে না। নাকেশ্বরী বলিল যে,—এ মনুষ্য ঘোরতর অপরাধে অপরাধী হইয়াছে, আমা-রক্ষিত সঞ্চিত ধন অপহরণ করিয়াছে। সে জন্য আমি ইহাকে কখনই ছাড়িতে পারি না, আমি ইহাকে নিশ্চয় ভক্ষণ করিব।" খর্ব্বুর পুনরায় নানারূপ মন্ত্রাদি দ্বারা নাকেশ্বরীকে অবশেষে যন্ত্রণা দিতে লাগিলেন। যন্ত্রনা-ভোগে নিতান্ত অসমর্থ হইয়া অবশেষে নাকেশ্বরী খেতুকে ছাড়িয়া যাইতে সম্মত হইল। কিন্তু "যাই যাই" বলে, তবু কিন্তু যায় না। নাকেশ্বরীর শঠতা দেখিয়া খর্ব্বুর অতিশয় বিরক্ত হইলেন। ক্রোধে তাঁহার ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিতে লাগিল। ক্রোধে চক্ষুদ্বয় রক্ত বর্ণ হইয়া উঠিল। খর্ব্বুর বলিলেন, —"যাবে না? বটে! আচ্ছা দেখি এইবার যাও কি না!" এই বলিয়া তিনি একটা কুষ্মাণ্ড আনয়ন করিলেন, মন্ত্র পূত করিয়া তাহার উপর সিন্দুরের ফোঁটা দিয়া কুমড়াটিকে বলিদান দিবার উদ্যোগ করিলেন। খর্পরে কুমড়াটি রাখিয়া খর্ব্বুর খড়্গ উত্তোলন করিলেন। কোপ মারেন আর কি! এমন সময় নাকেশ্বরী অতি কাতর স্বরে চীৎকার করিয়া বলিল,—"রক্ষা করুন, রক্ষা করুন! কোপ মারিবেন না, আমাকে কাটিয়া ফেলিবেন না। আমি এখন সত্য সত্য সকল কথা বলিতেছি।"

খর্ব্বুর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি বলিবে বল? সত্য বল, কেন তুমি ছাড়িয়া যাইতেছ না? সত্য সত্য না বলিলে, এখনি তোমাকে কাটিয়া ফেলিব।"

নাকেশ্বরী বলিল,—আমি ছাড়িয়া গেলে কোনও ফল হইবে না। রোগী এখনি মরিয়া যাইবে। রোগীর পরমায়ূটুকু লইয়ো কচুপাতে বাঁধিয়া আমি তাল গাছের মাথায় রাখিয়াছিলাম, মনে করিয়াছিলাম, মাসী আসিলে পরমায়ুটুকু বাটিয়া চাটনী করিয়া দুই জনে খাইব । তা, পরমায়ু-সহিত কচুপাতটি বাতাসে তালগাছ হইতে পড়িয়া গিয়াছে। ক্ষুদ্র পিপীলিকাতে পরমায়ুটুকু খাইয়া ফেলিয়াছে। এখন আর আমি পরমায়ু কোথায় পাইব যে, রোগীকে আনিয়া দিব? সেই জন্য বলিতেছি যে, আমি ছাড়িয়া যাইলেই রোগী মরিয়া যাইবে।"

খর্ব্বুর গুণিয়া গাঁথিয়া দেখিলেন যে, নাকেশ্বরী যাহা বলিতেছে, তাহা সত্য কথা,—মিথ্যা নয়। খর্ব্বুর মনে মনে ভাবিলেন যে,—"এইবার প্রমাদ হইল। ইহার এখন উপায় কি করা যায়? পরমায়ু না থাকিলে পরমায়ু তো আর কেহ দিতে পারে না?" —অনেক চিন্তা করিয়া, খর্ব্বুর নাকেশ্বরীকে আদেশ করিলেন,—"যে ক্ষুদ্র পিপীলিকা ইহার পরমায়ু ভক্ষণ করিয়াছে, তুমি অনুসন্ধান করিয়া দেখ, সে খুদে পিঁপিড়েরা এখন কোথায়?"

নাকেশ্বরী গিয়া, তালতলায়, পাথরের ফাটলে, মাটীর গর্ত্তে, কাঠের কোঠরে, সকল স্থানে সেই ক্ষুদ্র পিপীলিকাদিগের অন্বেষণ করিতে লাগিল। কোথাও আর তাহাদিগকে দেখিতে পাইল না। ডেওপিঁপড়ে, কাঠ-পিঁপড়ে শুশ শুড়ে-পিঁপড়ে, টোপ-পিঁপড়ে, যত প্রকার পিঁপড়ের সহিত সাক্ষাৎ হয়, সকলেই নাকেশ্বরী ও নাকেশ্বরীর মাসী জিজ্ঞাসা করে,—"হাগা! খুদে-পিঁপড়েরা কোথায় গেল, তোমরা দেখিয়াছ?" খুদে-পিঁপড়ের তত্ত্ব কেহই বলিতে পারে না। বোনঝীর বিপদে মাসীও ব্যথিত হইয়া চারিদিকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। কিন্তু শীঘ্রই বুড়ী হাঁপ লাগিল, চলিতে চলিতে নাকেশ্বরীর মাসীর পায়ে ব্যথা হইল। তখন নাকেশ্বরীর মাসী মনে করিল,—ভাল দু ঠেঙো মানুষের মাংস খাইতে আসিয়াছিলাম বটে! এখন আমার প্রাণ নিয়ে টানাটানি!"

অনুসন্ধান করিতে করিতে অবশেষে কাণা-পিঁপড়ের সহিত নাকেশ্বরীর সাক্ষাৎ হইল! কাণাপিঁপড়েকে নাকেশ্বরী খুদে-পিঁপড়ের কথা জিজ্ঞাসা করিল। কাণা-পিঁপড়ে বলিল—"আমি খুদে পিঁপড়ের কথা জানি। তালতলায়, কচুপাতা হইতে মানুষের সুমিষ্ট পরমায়ুটুকু চাটিয়া খাইয়া, হাত মুখ পুঁছিয়া খুদে-পিঁপড়েরা গৃহে গমন করিতেছিল। এমন সময় সাহেবের পোষাক পরা একটি ব্যাঙ তাহাদিগকে কুপ কুপ করিয়া খাইয়া ফেলিল।"

অট্টালিকায় প্রত্যাগমন করিয়া নাকেশ্বরী এই সংবাদটি খর্ব্বুরকে দিল। ভেকের অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত খর্ব্বুর পুনরায় নাকেশ্বরীকে পাঠাইলেন। নাকেশ্বরী মনে করিল,—"ভাল কথা? আমার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইবে, আবার সেই কাজে আমাকেই খাটাইবে।" কিন্তু নাকেশ্বরী করে কি? কথা না শুনিলেই খর্ব্বুর সেই কুমড়াটি বলিদান দিবেন। এ দিকে তিনি কুমড়াটি কাটিবেন. আর ও-দিকে নাকেশ্বরীর গলাটি দুইখানা হইয়া যাইবে। বনে বনে, পথে পথে পর্ব্বতে পর্ব্বতে, খানায় ডোবায়, নাকেশ্বরীর মাসী ভেকের অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতে লাগিলেন। কোথায় কোন্ গর্ত্তের ভিতর ব্যাঙ খাইয়া দাইয়া বসিয়া আছেন, তাহার সন্ধান ভূতিনীরা কি করিয়া পাইবে? ব্যাঙের কোন সন্ধান হইল না। নাকেশ্বরী ফিরিয়া খর্ব্বুরকে বলিল,—আমাকে মারুন আর কাটুন, ব্যাঙের সন্ধান আমি কিছুতেই করিতে পারিলাম না।"

নাকেশ্বরীর কথা শুনিয়া খর্ব্বুর পুনরায় ঘোর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া অবশেষে তিনি এক মুষ্টি সর্ষপ হাতে লইলেন। মন্ত্রপূত করিয়া সরিষাগুলিকে ছড়াইয়া ফেলিলেন। পড়া সরিষারা নক্ষত্রযোগে পৃথিবীর চারিদিকে ছুটিল, দেশে বিদেশে, গ্রাম নগর, উপত্যকা, সাগর মহাসাগর, চারিদিকে খর্ব্বুরের সরিষা-পড়া ছুটিল। পর্ণপূর্ণ, পুষ্করিণীর পার্শ্বে, সুশীতল গর্ত্তে ব্যাঙ মহাশয় মনের সুখে নিদ্রা
... সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইল। সূচের সূক্ষ্ম ধারে চর্ম্ম-মাংস ভেদ
... মস্তকে চাপিয়া বসিল। ভেকের মাথা হইতে সাহেবি টুপিটি
ব্যাঙ মহাশয় ঘোরতর চীৎকার করিতে লাগিলেন। ঠেলিয়া
...র্ত্তের ভিতর হইতে বাহির করিল। ঠেলিয়া ঠেলিয়া তাঁহাকে

অট্টালিকায় দিকে লইয়া চলিল। ঠেলিয়া ঠেলিয়া তাঁহাকে সুড়ঙ্গের পথে প্রবিষ্ট করিল। অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া ব্যাঙ মহাশয় হস্ত দ্বারা দ্বারে আঘাত করিলেন।

মশা দ্বার খুলিয়া দিলেন, ভেক মহাশয় অট্টালিকার ভিতর প্রবেশ করিয়া যেখানে কঙ্কাবতী ও খর্ব্বুর বসিয়া ছিলেন, সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কঙ্কাবতী চিনিলেন যে, এ সেই ব্যাঙ! ব্যাঙ চিনিলেন যে, এ সেই কঙ্কাবতী।

ব্যাঙ বলিলেন,—"ওগো ফুটফুটে মেয়েটি! তোমার সহিত এত আলাপ পরিচয় করিলাম, আর তুমি আসিয়া সকলকে আমার আধুলিটির সন্ধান বলিয়া দিলে গা! ছি! বাছা! তুমি এ ভাল কাজ কর নাই। ধনের গল্প গাঁট-কাটাদের কাছে কি করিতে আছে? বিশেষতঃ ঐ চেপ্টা গাঁটকাটার কাছে। আমার আধুলির যাহা কিছু বাকী আছে, সকলে ভাগ করিয়া লও, লইয়া আমাকে এখন ছাড়িয়া দাও। চেপ্টা মহাশয়! আমি দেখিতেছি, এ সরিষাগুলি আপনার চেলা। এখন কৃপা করিয়া সরিষাগুলিকে আমার মাথাটি ছাড়িয়া দিতে বলুন। ইহাদের যন্ত্রণায় আমার প্রাণ বাহির হইতেছে!"

খর্ব্বুর বলিলেন,—"তোমার আধুলিতে আমাদের প্রয়োজন কি। এ বালিকাটি তোমার পরিচিত। বালিকাটি কি ঘোর বিপদে পতিত হইয়াছে, তাহাও বোধ হয় তুমি জান। ঐ যে মৃতবৎ যুবকটিকে দেখিতেছ, উনিই ইহার পতি। নাকেশ্বরী দ্বারা উনি আক্রান্ত হইয়াছেন। নাকেশ্বরী ওর পরমায়ু লইয়া তালবৃক্ষের মস্তকে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। বাতাসে সেই পরমায়ুটুকু তলায় পড়িয়া গিয়াছিল। ক্ষুদ্র পিপীলিকাদিগের উদর হইতে পরমায়ুটুকু বাহির করিয়া কঙ্কাবতীর পতির প্রাণরক্ষা করি। পিপীলিকাগুলিকে বাহির করিয়া দিলেই সরিষাগণ তোমাকে ছাড়িয়া দিবে।"

ব্যাঙ উত্তর করিলেন,—"এই বালিকাটি আমার পরিচিত বটে, যাহাতে ইহার মঙ্গল হয়, তাহা করিতে আমি প্রস্তুত আছি।" এই বলিয়া ব্যাঙ গলায় আঙ্গুলি দিয়া উদ্গিরণ করিতে যত্ন করিলেন, কিন্তু বমন কিছুতেই হইল না। অবশেষে খর্ব্বুর তাহাকে নানাবিধ বমনকারক ঔষধ সেবন করাইতে লাগিলেন, কিন্তু ব্যাঙের বমন আর কিছুতেই হইল না।

খর্ব্বুর ভাবিলেন,—"এ আবার এক নূতন বিপদ। ইহার উপায় কি করা যায়?

খর্ব্বুর ব্যাঙের নাড়ী ধরিয়া উত্তমরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। তিনি ভাবিলেন,—"এইবার চাঁদকে আমি পতনে পাইয়াছি।" চাঁদের কথা তাঁহার মনে পড়িল। চাঁদের মূল শিকড় এ রোগের অব্যর্থ মহৌষধ; সেবন করাইলে এখনি ভেকের বমন হইবে।

মশাকে সম্বোধন করিয়া খর্ব্বুর কহিলেন,—"মহাশয়! এ ব্যাঙের বমন হয়, এরূপ ঔষধ পৃথিবীতে নাই। জগতে ইহার কেবল একমাত্র ঔষধ আছে। ঐ যে আকাশে চাঁদ দেখিতে পান, ঐ চাঁদের মূল-শিকড়ের ছাল এক তোলা, সাতটি মরিচ দিয়া বাটিয়া খাইলে, তবেই ব্যাঙের বমন হইবে, নতুবা আর কিছুতেই হইবে না।" —এই কথা শুনিয়া মশা বিমর্ষ হইয়া রহিলেন। কঙ্কাবতী একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন।

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"মশা মহাশয়! খর্ব্বুর মহারাজ! এই হতভাগিনীর জন্য

আপনারা অনেক পরিশ্রম করিলেন। কিন্তু আপনারা কি করিবেন? এ হতভাগিনীর কপাল নিতান্তই পুড়িয়াছে। আকাশে গিয়া চাঁদের মুল শিকড় কে কাটিয়া আনিতে পারে? চাঁদের মুলশিকড়ও সংগ্রহ হইবে না, পতিও আমার প্রাণ পাইবেন না। আপনারা সকলে গৃহে প্রত্যাগমন করুন, আমার জন্য বৃথা আর ক্লেশ পাইবেন না। আপনাদিগের অনুগ্রহে আমি যে, আমার পতির মৃতদেহটি পাইলাম, তাহাই যথেষ্ট। পতির পদ আশ্রয় করিয়া আমি এক্ষণে প্রাণ পরিত্যাগ করি। আপনারা সকলে গৃহে প্রত্যাগমন করুন।"

মশা বলিলেন,—"আমি অনেক দূর উড়িতে পারি সত্য। কিন্তু চাঁদ পর্য্যন্ত যে উড়িয়া যাই, অরূপ শক্তি আমার নাই। সে জন্য আমি দেখিতেছি যে, আমাদের সমুদয় পরিশ্রম বিফল হইল। আহা! রক্তবতী মা আমার পথপানে চাহিয়া আছেন! রক্তবতীকে গিয়া কি বলিব?" —খর্ব্বুর বলিলেন,—"আপনারা নিতান্ত হতাশ হইবেন না। একটি খোক্কোশের বাচ্ছার সন্ধান হয়? তাহা হইলে, তাহার পিঠে চড়িয়া অনায়াসেই আকাশে উঠিতে পারা যায়। ধাড়ী খোক্কেশ পাইলে, কাজ হইবে না, ধাড়ী খোক্কোশ বাগ মানিবে না। বাচ্ছা খোক্কোশ আবশ্যক।'

ব্যাঙ বলিলেন,—"এক স্থানে খোক্কোশের বাচ্ছা হইয়াছে, তাহার সন্ধান আমি জানি। কিন্তু খোক্কোশের বাচ্ছা তোমরা ধরিবে কি করিয়া? ধাড়ী খোক্কোশ যে তোমাদিগকে এক গালে খাইয়া ফেলিবে? আচ্ছা, যেন পাকে-প্রকারে তাহাকে ধরিলে। তাহার পিঠে চড়িয়া আকাশের উপর যায় কে? প্রাণটি হাতে করিয়া আকাশে যাইতে হইবে। আকাশে ভয়নাক সিপাহী আছে, আকাশের সে চৌকিদার। কর্ণে সে বধির! কানে ভাল শুনিতে পায় না বটে, কিন্তু অন্য দিকে সে বড়ই দুর্দ্দান্ত সিপাহী। আকাশের লোক তাহার ভয়ে সব জড়সড়। আকশের চারিদিকে সে পাহারা দিয়া বেড়ায়, তাহার হাতে পড়িলে আর রক্ষা নাই। তাই ভাবিতেছি, চাঁদের মূলশিকড় কাটিয়া আনিতে আকাশে যায় কে?"

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"সে জন্য আপনাদিগের কোনও চিন্তা নাই। যদি খোক্কোশের বাচ্ছা পাই, তাহা হইলে তাহার পিঠে চড়িয়া আমি আকাশে যাইব। আমার আর ভয় কিসের? যদি আকাশের সিপাহীর হাতে পড়ি, সে না হয় আমাকে মারিয়া ফেলিবে, আর আমার সে কি করিতে পারে? পতি বিহনে আমি তো এ প্রাণ রাখিব না, এ তো আমার একান্ত প্রতিজ্ঞা! তবে প্রাণের ভয় আর কি জন্য করিব?

এখন খোক্কোশের বাচ্ছা ধরাই স্থির হইল! যে পাহাড়ের ধারে, গর্ত্তের ভিতর খোক্কোশের বাচ্ছা হইয়াছে, ব্যাঙ তাহার সন্ধান বলিয়া দিলেন। মশা বলিলেন,—"কৌশল করিয়া খোক্কোশের বাচ্ছা ধরিতে হইবে।"

এইরূপ স্থির হইল যে, ব্যাঙ ও খর্ব্বুর অট্টালিকায় খেতুকে চৌকি দিয়া বসিয়া থাকিবেন, আর মশা, কঙ্কাবতী ও হাতি ঠাকুর-পো খোক্কোশকে ধরিতে যাইবেন।

যাত্রা করিবার সময় কঙ্কাবতী, খেতুর পদধুলি লইয়া আপনার মস্তকে রাখিলেন।

মশা, কঙ্কাবতীকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেমন কঙ্কাবতী। তুমি আকাশে

উঠিতে পারিবি তো? তোমার ভয় তো করিবে না?"

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"ভয়? আমার আবার কিসের? যদি আকাশে একবার উঠিতে পারি, তাহা হইলে দেখি, কি করিয়া চাঁদ আপনার মূল-শিকড় রক্ষা করেন। আর দেখি, আকাশের সেই বধির সিপাহীর কত ঢাল-খাঁড়া আছে; পতিপরায়ণা সতীর পরাক্রম আজ আকাশের লোককে দেখাইব।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ – নক্ষত্রদের বৌ

খোক্কোশের বাচ্ছা ধরিয়া আকাশে উঠিবার কথা নাকেশ্বরী ও নাকেশ্বরীর মাসী বসিয়া শুনিল। তাহারা দুইজনে পরামর্শ করিতে লাগিল যে,—"যদি এই কাজটি নিবারণ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে খর্ব্বুর আর আমাদের দোষ দিতে পারিবে না, অথচ খাদ্যটিও আমাদের হাত ছাড়া হইবে না।

মাসী বলিল,—"বৃদ্ধা হইয়াছি। এখন পৃথিবীর অর্দ্ধেক দ্রব্যে অরুচি। এইরূপ কোমল রসাল মাংস খাইতে এখন সাধ হয়। যদি ভাগ্যক্রমে একটি মিলিল, তাও বুঝি যায়!"

নাকেশ্বরী বলিল,—"মাসি, তুমি এক কর্ম্ম কর! তোমার ঝুড়িতে বসিয়া তুমি গিয়া আকাশে উঠ। সমস্ত আকাশ তুমি একেবারে চুণ-খাম করিয়া দাও। ভাল করিয়া দেখিয়া শুনিয়া চুনখাম করিবে, কোথাও যেন একটু ফাঁক না রহিয়া যায়! তুমি তোমার চশমা নাকে দিয়া যাও, তাহা হইলে ভাল করিয়া দেখিতে পাইবে। চুণখাম করিয়া দিলে ছুঁড়ি আকাশের ভিতর যাইতে পথ পাইবে না, চাঁদও দেখিতে পাইবে না, চাঁদের মূল শিকড়ও কাটিয়া আনিতে পারিবে না।" —দুই জনে এইরূপ পরামর্শ করিয়া মাসী গিয়া ঝুড়িতে বসিল। ঝুড়ি হুহু আকাশে উঠিয়া সমস্ত আকাশে নাকেশ্বরীর মাসী চুণখাম করিয়া দিল।

অট্টালিকা হইতে বাহির হইবার সময়ে মশা দেখিলেন যে, সেখানে একটি ঢাক পড়িয়া রহিয়াছে। মশা সেই ঢাকটি সঙ্গে লইলেন। বাহিরে আসিয়া কঙ্কাবতী ও মশা, হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। যে বনে খোক্কোশের বাচ্ছা হইয়াছে, সেই বনে সকলে চলিলেন। সন্ধ্যার পর খোক্কোশের গর্ত্তের নিকট উপস্থিত হইলেন।

একবার আকাশ পানে চাহিয়া মশা বলিলেন,—"কি হইল? আজ দ্বিতীয়বার রাত্রি, চাঁদ এখনও উঠিলেন না কেন? মেঘ করে নাই, তবে নক্ষত্র সব কোথায় গেল? আকাশ এরূপ শুভ্রবর্ণ ধারণ করিল কেন?"

ধাড়ী খোক্কোশ আপনার বাচ্ছা চৌকী দিয়া গর্ত্তে বসিয়া আছ! একে রাত্রি, তাতে নিবিড় অন্ধকার বন। দূর হইতে ধাড়ী খোক্কোশ কঙ্কাবতীর গন্ধ পাইল।

ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া ধাড়ী খোক্কোশ বলিল,—"হাউ মাউ খাঁউরে, মনুষ্যের গন্ধ পাঁউরে! কেরে তোরা, এদিকে আসিস?" মশা চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুই কে?" খোক্কোশ বলিল,——"আমি আবার কে! আমি খোক্কোশ!"

মশা বলিলেন,—"আমরা আবার কে! আমরা ঘোক্কোশ!"

এই উত্তর শুনিয়া খোক্কোশের ভয় হইল। খোক্কোশ বলিল,—"বাপ রে! তবে তো

তোরা কম নয়? ক, খ, গ, ঘ আমি খ-য়ে তোরা ঘ-য়ে, আমার চেয়ে তোরা দুই পৈঠা উঁচু! আচ্ছা, কেমন তোরা ঘোক্কোশ, একবার কাস দেখি, শুনি?"

মশা তখন সেই ঢাকটি ঢং ঢং করিয়া বাজাইলেন।

সেই শব্দ শুনিয়া খোক্কোশ বলিল,—"ওরে বাপ রে! তোদের কাসির শব্দ! শুনলে ভয় হয়, কানে তালা লাগে! তোরা ঘোক্কোশ বটে!"

খোক্কোশ কিন্তু সন্দিগ্ধ চিত্ত। এরূপ অকাট্য প্রমাণ পাইয়াও তবু তাহার মনে সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল না। তাই সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,—"আচ্ছা তোরা কেমন ঘোক্কোশ, তোদের মাথার একগাছা চুল ফেলিয়া দে দেখি?"

এই কথা বলিতে, মশা হাতীর কাছি গাছটি ফেলিয়া দিলেন। খোক্কোশ তাহা হাতে করিয়া দেখিতে লাগিল। অনেকক্ষণ দেখিয়া শেষে বলিল,—"ওরে বাপ রে! এই কি তোদের মাথার চুল! তোদের চুল যখন এত বড়, এত মোটা, তখন তোরা না জানি কত বড়, কত মোটা। তোদের সঙ্গে পারা ভার!"

তবুও কিন্তু খোক্কোশের মনে সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল না। ভাবিয়া চিন্তিয়া খোক্কোশ পুনরায় বলিল,—"আচ্ছা, তোরা যদি ঘোক্কোশ, তবে তোদের মাথার একটা উকুন ফেলিয়া দে দেখি?" —মশা বলিলেন,—"কঙ্কাবতী! শীঘ্র হাতীর পিঠ হইতে নামো।"

তাহার পর মশা হাতীকে বলিলেন,—"হাতী ভায়া! এইবার!"

এই কথা বলিয়া মশা, হাতীটিকে ধরিয়া, খোক্কোশের গর্ত্তে ফেলিয়া দিলেন। গর্ত্তে পড়িয়া হাতী শুঁড় দিয়া খোক্কোশের বাচ্ছাটিকে ধরিলেন। খোক্কোশের বাচ্ছা 'চ্যাঁ, চ্যাঁ শব্দে ডাকিয়া, স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল তোল পাড় করিয়া ফেলিল। শুঁড়-বিশিষ্ট পর্ব্বতাকার উকুন দেখিয়া, ত্রাসে খোক্কোশের প্রাণ উড়িয়া গেল। খোক্কোশ ভাবিল,—"তোদের মাথার উকুন আসিয়া তো আমার বাচ্ছাটিকে ধরিল, ঘোক্কোশেরা নিজে আসিয়া আমাকে না ধরে!" এই মনে করিয়া খোক্কোশ বাচ্ছা ফেলিয়া উড়িয়া পলাইল।

মশা ও কঙ্কাবতী তখন সেই গর্ত্তের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মশা বলিলেন,—"কঙ্কাবতী! তুমি এখন ইহার পৃষ্ঠে আরোহণ কর। খোক্কোশ-শাবকের পিঠে চড়িয়া তুমি এখন আকাশে গিয়া উঠ; চাঁদের শিকড় লইয়া পুনরায় আসিলে, আমরা খোক্কোশের বাচ্ছাটীকে ফিরিয়া দিব। কারণ এখনও এ স্তন্য পান করে, অতি শিশু; ইহাকে লইয়া আমরা কি করিব? যাই হউক, তুমি এখন আকাশের দুর্দ্দণ্ড সিপাহীর হাত হইতে রক্ষা পাইলে হয়। শুনিয়াছি , সে অতি ভয়ঙ্কর দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপান্বিত সিপাহী! সাবধানে আকশে উঠিবে।"

আকাশ পানে চাহিয়া মশা পুনরায় বলিলেন,—"কঙ্কাবতী! আমার কিছু আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। আজ দ্বিতীয়ার রাত্রি, চাঁদ উঠিবার সময় অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু চাঁদও দেখিতে পাই না, নক্ষত্রও দেখিতে পাই না। অথচ মেঘ করে নাই। কালো মেঘে না ঢাকিয়া সমস্ত আকাশ বরং শুভবর্ণ হইয়াছে; ইহার অর্থ আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি

না। ইহার কারণ কি? আকাশে উঠিলে হয় তো তুমি বুঝিতে পারিবে। অতি সাবধানে আপনার কার্য্য উদ্ধার করিবে।" —কঙ্কাবতী খোক্কোশ-শাবকের পিঠে চড়িয়া আকাশের দিকে তাহাকে পরিচালিত করিলে দ্রুতবেগে খোক্কোশ-শাবক উড়িতে লাগিল। কঙ্কাবতী অবিলম্বে আকাশের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন।

আকাশের কাছে গিয়া কঙ্কাবতী দেখিলেন যে, সমুদয় আকাশে চুণ-খাম করা। কঙ্কাবতী ভাবিলেন,—"এ কি প্রকার কথা। আকাশের উপর এরূপ চুণ-খাম করিয়া কে দিল?"

আকাশের উপর উঠিতে কঙ্কাবতী আর পথ পান না। যে দিকে যান, সেই দিকেই দেখেন চুণ-খাম। আকাশের একধার হইতে অন্যধার পর্য্যন্ত ঘুরিয়া বেড়াইলেন, পথ কিছুতেই পাইলেন না! সব চুণ-খাম। কঙ্কাবতী ভাবিলেন,—"ঘোর বিপদ! আকাশের উপর এখন উঠি কি করিয়া?"

হতাশ হইয়া, আকাশের চারি ধারে কঙ্কাবতী পথ খুঁজিতে লাগিলেন। অনেক অন্বেষণ করিয়া, সহসা এক স্থানে একটি সামান্য ছিদ্র দেখিতে পাইলেন। সেই ছিদ্রটি দিয়া নক্ষত্রদের বৌ উঁকি মারিতেছিল। কঙ্কাবতী সেই ছিদ্রটির নিকট যাইলেন। কঙ্কাবতীকে দেখিয়া নক্ষত্রদের বৌ একবার লুকাইল, পুনরায় আবাব ভয়ে ভয়ে উঁকি মারিতে লাগিল।

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"ওগো নক্ষত্রদের বৌ! তোমার কোন ভয় নাই! আমিও মেয়ে মানুষ আমাকে দেখিয়া আবার লজ্জা কেন বাছা!"

নক্ষত্রদের বৌ উত্তর করিল,—"কে গা মেয়েটি তুমি? তোমার কথাগুলি বড় মিষ্ট! অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিতেছি, তুমি চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ। তাই মনে করিলাম তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, কি তুমি খুঁজিতেছ? কিন্তু হাজার হউক, আমি বৌ মানুষ সহসা কি কাহারও সঙ্গে কথা কহিতে পারি? তাতে রাত্রি কাল! একটু আস্তে কথা কও, বাছা। আমার ছেলে-পিলেরা সব শুয়েছে, এখনি জাগিয়া উঠিবে, কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিলে কাঁদিয়া জ্বালাতন করিবে।"

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"ওগো। নক্ষত্রদের বৌ। আমার নাম কঙ্কাবতী! আমি পতিহারা সতী। আমি বড় অভাগিনী। আকাশের ভিতর যাইবার নিমিত্ত পথ অন্বেষণ করিতেছি। তা আজ এ কি হইয়াছে, বাছা, পথ কেন পাই না? একবার আকাশের ভিতর উঠিতে পারিলে আমার পতির প্রাণ রক্ষা হয়! বাছা। তুমি যদি পথটি বলিয়া দাও, তো আমার বড় উপকার হয়।" —নক্ষত্রদের বৌ উত্তর করিল, "পথ আর বাছা, তুমি কি করিয়া পাইবে? এ সন্ধ্যা বেলা এক বেটী, ভূতিনী-বুড়ী আসিয়া আকাশের উপর সব চূণখাম করিয়া দিয়াছে। ও যাই হউক, আমি চুপি চুপি তোমাকে আকাশের খিড়কি-দ্বারাটি খুলিয়া দিই। সেই পথ দিয়া তুমি আকাশের ভিতর প্রবেশ কর।" —এই কথা বলিয়া নক্ষত্রদের বৌ চুপি চুপি আকাশের খিড়কি-দ্বারটি খুলিয়া দিল। সেই পথ দিয়া কঙ্কাবতী আকাশের উপর উঠিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ – দুর্দান্ত সিপাহী

আকাশের ভিতর গিয়া কঙ্কাবতী খোক্কোশ-শাবককে একটি মেঘের ডালে বাঁধিয়া

দিলেন। তাহার পর পদব্রজে আকাশের মাঠ দিয়া চলিতে লাগিলেন। চারিদিকে দেখিলেন, নানা বর্ণের নক্ষত্র সব ফুটিয়া রহিয়াছে। নক্ষত্র ফুটিয়া আকাশকে আলো করিয়া রাখিয়াছে। অতি দূরে চাঁদ, চাকার মত আকাশের উপর বসিয়া আছেন।

কঙ্কাবতী আকাশের ভিতর প্রবেশ করিলে চাঁদ সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহার মূল-শিকড় কাটিতে মানুষ আসিতেছে। খন্তা কুড়ুল লইয়া এক মানবী উন্মত্তার ন্যায় ছুটিয়া আসিতেছে। এই দুঃসংবাদ শুনিয়া চাঁদের মনে ত্রাস হইল। আর চাঁদ কাঁপিতে লাগিলেন।

চাঁদ মনে করে,—"কেন যে মরিতে সুন্দর হইয়াছিলাম? তাই তো আমার প্রতি সকলের আক্রোশ। যদি সুন্দর না হইতাম, তাহা হইলে কেহ আর আমার মুল শিকড় কাটিতে আসিত না। একে তো রাহুর জ্বালায় মরি তাহার উপর আবার যদি মানুষের উপদ্রব হয় তাহা হইলে আর কি করিয়া বাঁচি। যদি আমার গলা থাকিত, তো আমি গলায় দড়ি দিয়া মরিতাম। তা যে ছাই, এ পোড়া শরীর কেবল চাকার মত। গলা নাই তা আমি কি করিব? দড়ি দিই কোথা?

নানারূপ খেদ করিয়া, অতিশয় ভীত হইয়া চাঁদ আকাশের সিপাহীকে ডাকিতে পাঠাইলেন। আকাশের সিপাহী সকল দিকে বীরপুরুষ বটে, কেবল কর্ণে কিছু হীনবল—একটু কালা। অতিশয় চীৎকার করিয়া কোনও কথা না বলিলে তিনি শুনিতে পান না।

সিপাহী আসিয়া উপস্থিত হইলে অতি চীৎকার করিয়া চাঁদ তাহাকে সকল কথা বলিলেন। চাঁদ তাঁহাকে বলিলেন,—"আমার মূল শিকড় কাটিতে মানুষ আসিতেছে।"

সিপাহী ভাবিলেন যে, চাঁদ তাহাকে কালা মনে করিয়া এত হাঁ করিয়া কথা কহিতেছেন। সিপাহীর তাই রাগ হইল। সিপাহী বলিলেন,—"নাও। আর, অত হাঁ করিতে হ'বে না। শেষকালে চিড় খাইয়া, চারিদিক্ ফাটিয়া দুইখানা হইয়া যাবে?"

এইবার একটু হাঁ কম করিয়া, চাঁদ পুনরায় বলিলেন,—"আমার মূল শিকড় কাটিতে মানুষ আসিতেছে।" —সিপাহী বলিলেন,—"অত আর চুপি চুপি কথা কহিতে হইবে না। কোথাও ডাকাতি করিবে না কি যে অত চুপি চুপি কথা। যদি কোথাও ডাকাতি কর, তো আমায় কিন্তু ভাগ দিতে হইবে।"

চাঁদ ভাবিলেন,—"সিপাহী লোকের সঙ্গে কথা কওয়া দায়। কথায় কথায় রাগিয়া উঠে।" চাঁদ পুনরায় বলিলেন,—"না ডাকাতি করিবার কথা বলি নাই। আমি কোথাও ডাকাতি করিতে যাইব না। আমি বলিতেছি যে, আমার মূল-শিকড় কাটিতে মানুষ আসিতেছে।" সিপাহী এতক্ষণে চাঁদের কথা শুনিতে পাইলেন।

সিপাহী বলিলেন,—"তোমার মুল শিকড় কাটিতে মানুষ আসিতেছে? তা বেশ কাটিয়া লইয়া যাইবে। তার আর কি?"

চাঁদ বলিলেন,—"তুমি আকাশের চৌকিদার, তুমি আমাকে রক্ষা করিবে না?"

সিপাহী উত্তর করিলেন,—"তোমাকে রক্ষা করিতে গিয়া যদি আমার মুল শিকড়টি কাটা যায়? তখন?" চাঁদ বলিলেন,—"যদি তুমি এরূপ সমূহ বিপদ হইতে আমাকে রক্ষা

না করিবে, তবে তুমি আকাশের মাহিনা খাও কি জন্য?"

সিপাহী উত্তর করিলেন,—"রেখে দাও তোমার মাহিনা! না হয় কর্ম্ম ছাড়িয়া দিব? পৃথিবীতে গিয়া কনেষ্টেবিলি করিয়া খাইব। আমা হেন প্রসিদ্ধ দুর্দ্দান্ত সিপাহী পাইলে, সেখানে তাহারা লুফিয়া লইবে। সেখানে এমন মূল শিকড় কাটাকাটি নাই। সেখানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সব হইয়া যাইলে দাঙ্গাবাজেরা আপনার আপনার ঘরে চলিয়া গেলে, তখন আমি রাস্তার দু চারি জন ভাল মানুষ ধরিয়া কাছারিতে নিয়া হাজির করিব। তবে এখন আমি যাই। কারণ, মানুষটি যদি আসিয়া পড়ে? শেষে যদি আমাকে পর্য্যন্ত ধরিয়া টানাটানি করে?" এই কথা বলিয়া, দুর্দান্ত সিপাহী সেখান হইতে অতি দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলেন। নিরুপায় হইয়া "যা থাকে কপালে", এই মনে করিয়া, চাঁদ আকাশে গা ঢালিয়া দিলেন।

মেঘের ডালে খোক্কোশ বাঁধিয়া আকাশের মাঠ দিয়া কঙ্কাবতী অতি দ্রুতবেগে চাঁদের দিকে ধাবমান হইলেন। চারিদিকে জনরব উঠিল যে, আকাশবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার সকলের মূল শিকড় কাটিতে পৃথিবী হইতে মনুষ্য আসিয়াছে। আকাশবাসীরা সকলে আপনার আপনার ছেলেপিলে সাবধান করিয়া, ঘবে খিল দিয়া বসিয়া রহিল। নক্ষত্রগণের পলাইবার যো নাই, তাই নক্ষত্রগণ বন-উপবনে, ক্ষেত্র-উদ্যানে ফুটিয়াছিল, সে সেইখানে বসিয়া মিট্‌মিট করিয়া জ্বলিতে লাগিল। চাঁদের পালাইবার যো নাই, কারণ, জগতে আলো না দিয়া পালাইলে জারিমানা হইবে, চাঁদ তাই বিরসমনে ম্লানবদনে ধীরে ধীরে আকাশের পথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে কঙ্কাবতী চাঁদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

চাঁদ ভাবিলেন,—"এইবার তো দেখিতেছি, আমার মূল শিকড়টি কাটা যায়। এখন আমি-শুদ্ধ না যাই, তবেই রক্ষা। এরে বিশ্বাস কি? যদি বলিয়া বসে যে,—'বাঃ! দিব্য চাঁদটি, কাপড়ে বাঁধিয়া লইয়া যাই!' তাহা হইলে আমি কি কবিতে পাবি? কাজ নাই বাপু! আমি চক্ষু বুজিয়া থাকি, নিশ্বাস বন্ধ করি, মড়াব মত কাঠ হইয়া থাকি। মানুষটা মনে করিবে যে, "এ মরা চাঁদ লইয়া আমি কি করিব? আমাকে সে আর ধরিয়া লইয়া যাইবে না।" —বুদ্ধিমন্ত চাঁদ এইরূপ মনে মনে পরামর্শ করিয়া চক্ষু বুজিলেন, নিশ্বাস বন্ধ করিয় রহিলেন।

চাঁদকে বিবর্ণ, বিষণ্ণ মৃত্যু-ভাবাপন্ন দেখিয়া কঙ্কাবতী ভাবিলেন,—"বাঃ, চাঁদটি বা মরিয়া গেল? মূল শিকড়টি কাটিয়া লইব, সেই ভয়ে চাঁদের বা প্রাণত্যাগ হইল। আহা, কেমন সুন্দর চাঁদটি ছিল। কেমন চমৎকার জ্যোৎস্না হইত, কেমন পূর্ণিমা হইত। সে সকল আর হইবে না। চিরকাল অমাবস্যার রাত্রি থাকিবে। লোকে আমায় কত গালি দিবে।

একটু ভাল করিয়া দেখিয়া কঙ্কাবতী পুনরায় মনে মনে বলিলেন, "না, চাঁদটি মরে নাই। বোধ হয় মূর্চ্ছা গিয়াছে। তা ভালই হইয়াছে। কাটিতে হইলে, ডাক্তারেরা প্রথম ঔষধ শুঁকাইয়া অজ্ঞান করেন, তার পর করাত দিয়া হাত-পা কাটেন। ভালই হইয়াছে যে, চাঁদ আপনা-আপনি অজ্ঞান হইয়াছে। মূল শিকড় কাটিতে ইহাকে আর লাগিবে না। কিন্তু শিকড়টি একেবারে দুইখণ্ড করিয়া কাটা হইবে না। তাহা হইলে চাঁদ মরিয়া যাইবে। আমার

কেবল এক তোলা শিকড়ের ছালের প্রয়োজন ততটুকু আমি কাটিয়া লই।"

এইরূপ ভাবিয়া চারিদিক্ ঘুরিয়া, কঙ্কাবতী অবশেষে চাঁদের মূল শিকড়টি দেখিতে পাইলেন। ছুরি দিয়া উপর মূল শিকড়ের ছাল চাঁচিয়া তুলিতে লাগিলেন।।

অল্পক্ষণের নিমিত্ত চাঁদ অতি কষ্টে যাতনা সহ্য করিলেন, তার পর আর সহিতে পারিলেন না। চাঁদ বলিলেন,—"উঃ। লাগে যে।"

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"ভয় নাই। এই হইয়া গেল।" তাড়াতাড়ি কঙ্কাবতী চাঁদের মূল শিকড় হইতে এক তোলা পরিমাণ ছাল তুলিয়া লইলেন।

তখন চাঁদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমার শিকড় পুনরায় গজাইবে তো?"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—"গজাইবে বৈ কি। চিরকাল কি আর এমন থাকিবে। ইহার উপর একটু কাদা দিয়া দিও, মন্দ লোকের দৃষ্টি পড়িয়া বিষিয়ে উঠিবে না।"

চাঁদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যদি ঘা হয়?" কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—"যদি ঘা হয়, তাহা হইলে ইহার উপর একটু লুচি-ভাজা ঘি দিও।"

চাঁদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি বুঝি মেয়ে-ডাক্তার? দাঁতের গোড়ার ঔষধ জান? আমার দাঁতের গোড়া বড় কন্ কন্ করে।"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—"আমি মেয়ে-ডাক্তার নই। তবে এই বয়সে আমি অনেক দেখিলাম, অনেক শুনিলাম, তাই দুটা একটা ঔষধ শিখিয়া রাখিয়াছি। তোমার দাঁতের গোড়া আর ভাল হইবে না। লোকের দাঁত কি চিরকাল সমান থাকে? তুমি কত কালের চাঁদ হইলে, মনে করিয়া দেখ দেখি। কবে সেই সমুদ্রের ভিতর হইতে বাহির হইয়াছ। এখন আর ছেলে চাঁদ হইতে সাধ করিলে চলিবে কেন।

চাঁদ বলিলেন,—"ছেলে চাঁদ হইতে চাই না। ঘরে আমার অনেকগুলি ছেলে-চাঁদ আছে। আশীর্ব্বাদ কর, তাহারা বাঁচিয়া থাকুক, তাহা হইলে এর পর দেখিতে পাইবে, আকাশে কত চাঁদ হয়। আকাশের চারিদিকে তখন চাঁদ উঠিবে। এখনি আমার ছেলে মেয়েগুলি বলে,—"বাবা। অমাবস্যার রাত্রিতে তুমি শ্রান্ত হইয়া পড়, সন্ধ্যা বেলা বিছানা হইতে আর উঠিতে পার না। তাই যাই না? আমরা গিয়া আকাশেতে উঠি না? আমি তাদের মানা করি। আকাশের এক ধার হইতে অন্য ধার পর্যন্ত, পথটুকু তো আর কম নয়? তারা ছেলে মানুষ, অত পথ গড়াইতে পারিবে কেন?"

কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার ছেলে-মেয়েগুলি কত বড় হইয়াছে?"

চাঁদ উত্তর করিলেন,—"বড় মেয়েটি একখানি কাঁসির মত হইয়াছে। কেমন চক্ চকে কাঁসি। তেঁতুল দিয়া মাজিলেও তোমাদের কাঁসির সেরূপ রং হয় না। মেজ-ছেলেটি একখানি খণ্ডালের-মত হইয়াছে। মাঝে আরও অনেকগুলি ছেলে মেয়ে আছে। কোলের মেয়েটি একটু কালো। তোমরা যে সেকালে পাথুরে পোকার টিপ পরিতে, সেই ততবড় হইয়াছে। কিন্তু কালো হউক, মেয়েটির শ্রী আছে। বড় হইলে, এর পর সেই যখন আকাশে কালো চাঁদ উঠিবে, তখন তোমরা বলিবে, হাঁ চটক-সুন্দরী অন্ধকার হইবে, সমুদয় জগৎ

যেন বারনিশ চামড়ায় মুড়িয়া যাইবে। তা, যাই হইক, এখন দাঁতের গোড়ার কি হইবে। কিছু যে খাইতে পারি না। ডাঁটা চিবাইতে যে বড় লাগে। ভাল যদি কোনও ঔষধ থাকে, তো আমাকে দিয়া যাও।" --কঙ্কাবতী বলিলেন,—"চাঁদ। তুমি এক কাজ কর। আমার সঙ্গে তুমি চল। তোমার শিকড় পাইয়াছি, পতি আমার এখন ভাল হইবেন।। পতি আমার কলিকাতায় থাকেন। কলিকাতায় দন্তকারেরা আছে। তোমার পোকা-ধরা পচা দাঁতগুলি সাঁড়াশি দিয়া তাহারা তুলিয়া দিবে, নূতন কৃত্রিম দন্ত পরাইয়া দিবে।"

এই কথা শুনিয়া চাঁদের ভয় হইল। চাঁদ বলিলেন,—"আমার মূল শিকড়ে ব্যাথা হইয়াছে, আমি এখন গড়াইতে পারিব না, তত দূর আমি যাইতে পারিব না।"

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"তার ভাবনা কি? আমি তোমাকে কাপড়ে বাঁধিয়া লইয়া যাইব।" চাঁদের প্রাণ উড়িয়া গেল। চাঁদ ভাবিলেন,—"যা ভয় করিয়াছিলাম তাই। কেন মরিতে ইহার সহিত কথা কহিয়াছিলাম। চক্ষু বুজিয়া, চুপ করিয়া থাকিলেই হইত।

চাঁদ বলিলেন,—"আমার দাঁতের গোড়া ভাল হইয়া গিয়াছে, আর ব্যাথা নাই। সে জন্য তোমাকে আর কষ্ট করিতে হইবে না, আমি বড় ভারি, আমাকে তুমি লইয়া যাইতে পারিবে না। এখন যাও। বিলম্ব করিলে তোমার বাড়ীর লোকে ভাবিবে।"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—"কি বলিলে? তুমি ভারি। বাপের বাড়ী থাকিতে তোমার চেয়ে বড় বড় বগী-থালা আমি ঘাটে লইয়া মাজিতাম। এই দেখ, তোমাকে লইয়া যাইতে পারি কি না।" --এই কথা বলিয়া কঙ্কাবতী আকাশের উপর আঁচলটি পাতিলেন! চাঁদটিকে ধরিয়া আঁচলে বাঁধেন আর কি। এমন সময় চাঁদের স্ত্রী চাঁদের ছানা-পোনা লইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে আছাড়ি-পিছাড়ি খাইতে-খাইতে, সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। --চাঁদনীর কান্নায় আকাশ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। চাঁদের ছানা-পোনার কান্নায় কঙ্কাবতীর কানে তালা লাগিল।

চাঁদনী কাঁদিতে লাগিলেন,—"ওগো আমি দুর্দ্দান্ত সিপাহীর মুখে শুনিলাম যে, মানুষে তোমার মূল শিকড় কাটিবে; ওগো, আমি সে পোড়ারমুখী মানুষীর কি বুকে ধান ভানিয়াছি যে, সে আমার সহিত এরূপ শত্রুতা সাধিবে। আমাকে যদি বিধবা হইতে হয়, তাহা হইলে তারও আমার মত হাত হইবে। সে বাপ ভাইয়ের মাথা খাইবে।"

চাঁদের ছানা-পানাগুলি কঙ্কাবতীর কাপড় ধরিয়া টানিতে লাগিল, আর বলিতে লাগিল,—"ওগো, তোমার পায়ে পড়ি। বাবার তুমি মূল শিকড় কাটিও না, বাবাকে ধরিয়া লইয়া যাইও না।" --চাঁদের ছোট মেয়েটি—যেটি পাথুরের পোকার টিপের মত, সেই মেয়েটি মাঝে মাঝে কাঁদে, মাঝে মাঝে রাগে, আর কঙ্কাবতীকে গালি দিয়া বলে,— "অভাগী, পোড়ারমুখী, শালী।" আবার সে কঙ্কাবতীকে গায়েব চারিদিকে আঁচড়ায় আর চিম্‌টি কাটে। তার চিম্‌টির জ্বালায় কঙ্কাবতী ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

কঙ্কাবতী বলিলেন,—ওগো ও চাঁদনী। তোমার মেয়ে সামলাও বাছা; তোমার এ ছোট মেয়েটি চিম্‌টি কাটিয়া আমার গায়ের ছাল-চামড়া তুলিয়া লইতেছে।"

চাঁদনী উত্তর করিলে—"হাঁ, মেয়ে সামলাবো বৈ কি? তুমি আমার সর্ব্বনাশ করিবে,

আর আমি মেয়ে সামলাবো। কেন, বাছা? তোমার আমি কি করিয়াছি যে, তুমি আমার সর্ব্বনাশ করিবে? মূল শিকড়টি কাটিয়া তুমি আমার পতির প্রাণবধ করিবে?"

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"না গো না। আমি তোমার পতির প্রাণবধ করি নাই। একটুখানি শিকড়ের আমার আবশ্যক ছিল, তা আমি উপর উপর চাঁচিয়া লইয়াছি। অধিক রক্তও পড়ে নাই, কিছুই হয় নাই। তুমি বরং চাঁদকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ? তার পর, তোমার স্বামী—বলিলেন, যে তাঁর দাঁত নড়িতেছে।' তাই মনে করিলাম যে, কলিকাতায় লইয়া যাই, দাঁত ভাল করিয়া পুনরায় তোমার স্বামীকে আকাশে পাঠাইয়া দিব। তাতে আর কাজ নাই বাছা, এখন তোমরা সব, আমায় যেন আর চিম্‌টি না কাটো।"

এই কথা শুনিয়া চাঁদনী আশ্বস্ত হইলেন। চাঁদের ছেলে-পুলেরও কান্না থামিল।

চাঁদনী বলিলেন,—"তোমার যদি বাছা, কাজ সারা হইয়া থাকে, তবে তুমি এখন বাড়ী যাও! তোমার ভয়ে আকাশ একেবারে লণ্ড ভণ্ড হইয়া গিয়াছে। আকাশবাসীরা সব ঘরে খিল দিয়া বসিয়া আছে। সবাই সশঙ্কিত।

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"আমার কাজ সারা হইয়াছে সত্য, কিন্তু কতকগুলি নক্ষত্র চাই। আমাদের সেখানে নক্ষত্র নাই। আহা এখানে কেমন চারিদিকে সুন্দর সুন্দর নক্ষত্র ফুটিয়া রহিয়াছে। আমি মনে করিয়াছি, কতকগুলি নক্ষত্র এখান হইতে তুলিয়া লইয়া যাইব। এখান হইতে অনেক দূরে আমার খোক্কোশ বাঁধা আছে। কি করিয়া নক্ষত্রগুলি তত দূর লইয়া যাই? একটি মুটে কোথায় পাই?

চাঁদনী বলিলেন,—"আর বাছা তোমার ভয়ে ঘর হইতে আর কি লোক বাহির হইয়াছে, তুমি মুটে পাইবে? দোকানী-পসারী সব দোকান বন্ধ করিয়াছে, আকাশের বাজার-হাট আজ সব বন্ধ। পথে জনপ্রাণী নাই। আমি কেবল প্রাণের দায়ে ঘর হইতে বাহির হইয়াছি।"

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় কঙ্কাবতী দেখিতে পাইলেন যে, মেঘের পাশে লুকাইয়া কে একটি লোক উঁকিঝুঁকি মারিতেছে। কঙ্কাবতী ভাবিলেন,—"ঐ লোকটিকে বলি, খোক্কোশের বাচ্ছার কাছ পর্য্যন্ত নক্ষত্রগুলি দিয়া আসে।" এইরূপ চিন্তা করিয়া কঙ্কাবতী তাহাতে ডাকিলেন। কঙ্কাবতী বলিলেন,—"ওগো শুন। একটা কথা শুন।"

কঙ্কাবতী যেই এই কথা বলিয়াছেন আর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যান, আর লোকটি ততই প্রাণপণে দৌড়িতে থাকে। কঙ্কাবতী মনে করিলেন—"লোকটি কি দৌড়িতে পারে। বাতাসের মত যেন উড়িয়া যায়।"

কঙ্কাবতী তাহাকে কিছুতেই ধরিতে পারিলেন না, কিন্তু দৈবক্রমে এক ঢিপি মেঘ তাহার পায়ে লাগিয়া সে হোঁচোট খাইয়া পড়িয়া গেল। পড়িয়াও পুনরায় উঠিতে কত চেষ্টা করিল, কিন্তু উঠিতে না উঠিতে কঙ্কাবতী গিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন।

কঙ্কাবতী তাহার গায়ে হাত দিয়া দেখেন যে, তাহার গায়ে হাড়, মাংস কিছুই নাই! দেহ তার অতি লঘু। দুইটি অঙ্গুলিদ্বারা কঙ্কাবতী তাহাকে ধরিয়া তুলিলেন। চক্ষুর নিকট আনিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে, কেবল দুই চারটি তালপাতা দিয়া তাহার শরীর নির্ম্মিত।

তালপাতের হাত, তালপাতের নাক-মুখ। সেই তালপাতের উপর জামা জোড়া পরা। তাহার শরীর দেখিয়া কঙ্কাবতী অতিশয় বিস্মিত হইলেন।

কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কে?

লোকটি উত্তর করিল,—"আমি আকাশের দুর্দ্দান্ত সিপাহী। আবার কে? এখন ছাড়িয়া দাও, বাড়ী যাই। আঙ্গুল দিয়া অমন করিয়া টিপিও না।'

কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার শরীর তালপাতা দিয়া গড়া?"

দুর্দ্দান্ত সিপাহী বলিলেন,—"তালপাতা দিয়ে গড়া হইবে না তো কি দিয়া গড়া হইবে? ইট পাথর চূণ সুরকি দিয়া রেক্তার গাঁথুনি করিয়া আমার শরীর গড়া হ'বে না কি? এত দেশ বেড়াইলে, এত কাণ্ড করিলে আর তালপাতার সিপাহীর নাম কখনও শুননি? এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে আমাকে কে না জানে? বীর-পুরুষ দেখিলেই লোকে আমার সহিত উপমা দেয়। এখন ছাড়িয়া দাও, বাড়ী যাই। ভাল এক মূস্ল শিকড় কাটাকাটি হইয়াছে বটে!"

কঙ্কাবতী এখন বুঝিলেন যে, ছেলে-বেলা তিনি যে সেই তালপাতার সিপাহীর কথা শুনিয়াছিলেন, তাহার বাস আকাশে পৃথিবীতে নয়। আর সেই-ই আকাশের দুর্দ্দান্ত সিপাহী।

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"দেখ দুর্দ্দান্ত সিপাই তোমাকে আর একটি কাজ করিতে হইবে। তা না করিলে তোমাকে আমি কিছুতেই ছাড়িব না এখান হইতে নক্ষত্র এক বোঝা আমি তুলিয়া লইয়া যাইব। কিছু দূর মোটটি তোমাকে লইয়া যাইতে হইবে।"

সিপাহী আর করেন কি? কাজেই সম্মত হইলেন। কঙ্কাবতীর আঁচলে আর কতটি নক্ষত্র ধরিবে? তাই কঙ্কাবতী ভাবিতে লাগিলেন—"কি দিয়া নক্ষত্রগুলি, বাঁধিয়া লই?"

সিপাহী বলিলেন,—"অত আর ভাবনা-চিন্তা কেন? চল, আমরা আকাশ বুড়ীর কাছে যাই। কদমতলায় বসিয়া চরকা কাটিয়া সে কত কাপড় করিয়াছে! তাহার কাছে হইতে একখানি গামছা চাহিয়া লই?'

কঙ্কাবতী ও সিপাহী আকাশ-বুড়ীর নিকট গিয়া একখানি গামছা চাহিলেন। অনেক বকিয়া-ঝকিয়া আকাশবুড়ী একখানি গামছা দিলেন। তখন কঙ্কাবতী আকাশের মাঠে নক্ষত্র তুলিতে লাগিলেন। বাছিয়া বাছিয়া ফুটন্ত আধ-কুঁড়ি আধ-ফুটন্ত, নানাবর্ণের নক্ষত্র তুলিলেন। সেইগুলি গামছায় বাঁধিয়া, মোটটি সিপাহীর মাথায় দিলেন।

সিপাহী ভাবিলেন,—"এতকাল আকাশে চাকরি করিলাম, কিন্তু মুটেগিরি কখনও করিতে হয় নাই। ভাগ্যক্রমে আকাশের লোক সব আজ দ্বারে খিল দিয়া বসিয়া আছে। কেহ যদি আমার এ দুর্দ্দশা দেখিত, তাহা হইলে আজ আমি মরমে মরিয়া যাইতাম।"

মোটটি মাথায় করিয়া সিপাহী আগে আগে যাইতে লাগিলেন। কঙ্কাবতী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন! কিছুক্ষণে খোক্কোশের বাচ্চার নিকট আসিয়া দুজন উপস্থিত হইলেন। সিপাহীর মাথা হইতে নক্ষত্রের বোঝাটি লইয়া তখন কঙ্কাবতী বলিলেন,—এখন তুমি যাইলে যাইতে পার তোমাকে আমার আর প্রয়োজন নাই।" এই কথা বলিতে না বলিতে সিপাহী এমনি ছুট মারিলেন যে, মুহূর্ত্তের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। কঙ্কাবতী ভাবিলেন,—"তালপাতার সিপাহী কি না! তাই এত দ্রুতবেগে ছুটিতে পারে।

মোটটি লইয়া কঙ্কাবতী খোক্কোশের বাচ্ছার পিঠে চড়িলেন। খোক্কোশের পিঠে চড়িয়া আকাশ হইতে পৃথিবীর দিকে পুনরায় অবতরণ করিতে লাগিলেন।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ – সতী

যেখানে মশা ও হাতী কঙ্কাবতীর প্রতীক্ষায় অবিস্থিতি করিতেছিলেন অবিলম্বে কঙ্কাবতী আসিয়া সেইখানে উপস্থিতি হইলেন। শিকড় লাভে কৃতকার্য্য হইয়াছে শুনিয়া মশা ও হাতীর আনন্দের আর অবধি রহিল না। খোক্কোশের বাচ্ছাটিষক পনুরায় তাহার গর্ত্তে ছাড়িয়া মশা ও কঙ্কাবতী হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন ও পর্ব্বত অভ্যন্তর স্থিত সেই অট্টালিকার দিকে যাত্রা করিলেন।

অট্টালিকায় উপস্থিত হইয়া কঙ্কাবতী চাঁদের মুল শিকড়টুকু খর্ব্বুরের হস্তে অর্পণ করিলেন। খর্ব্বুর তাহার এক তোলা ওজন করিয়া সাতটি গোলমরিচের সহিত অতি সাবধানে শিলে বাটিলেন। ঔষধটুকু বাটা হইলে ব্যাঙকে তাহা সেবন করাইলেন। ঔষধ সেবন করিয়া ব্যাঙের হুড় হুড় করিয়া বমন আরম্ভ হইল। পেটে যাহা কিছু ছিল সমুদয় বাহির হইয়া পড়িল। ব্যাঙ বলিলেন,—"ব্যাঙাচি-অবস্থায় জলে কিল্‌কিল করিতে করিতে আমি যাহা কিছু খাইয়াছিলাম তাহা পর্য্যন্ত বাহির হইয়া গিয়াছে উদরে আর আমার কিছুই নাই।"

বমনের সহিত সেই ক্ষুদ্র পিপীলিকাগুলি বাহির হইয়া পড়িল। খর্ব্বুর অতি যত্নে তাহাদিগকে বমনের ভিতর হইতে বাছিয়া লইলেন। তাহার পর একটি পিপীলিকা লইয়া, তাহার উদর হইতে অতি সুক্ষ্ম সোন্না-দ্বারা খেতুর পরমায়ুটুকু বাহির করিতে লাগলেন! এইরূপে খুঁটিয়া খুঁটিয়া সমস্ত পিপীলিকাগুলি হইতে পরমায়ু বাহির করা হইলে, খর্ব্বুর বলিলেন,—"এ কি হইল? পরমায়ু তো অধিক বাহির হইল না! এ যৎসামান্য পরমায়ুটুকু লইয়া কি হইবে? ইহাতে তো কোনও ফল হইবে না?

খর্ব্বুর বিষণ্ণচিত্ত হইলেন, মশা হতাশ হইলেন, ব্যাঙের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল, কঙ্কাবতী নীরবে বসিয়া রহিলেন। অদৃশ্যভাবে অবস্থিত নাকেশ্বরী ও তাহার মাসী পরিতোষ লাভ করিল। —যাহা হউক, সেই যৎসামান্য পরমায়ুটুকু লইয়া খর্ব্বুর খেতুর নাকে নাস দিয়া দিলেন। খেতু চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন।

খেতু বলিলেন,—"কি অঘোর নিদ্রায় আমি অভিভূত হইয়াছিলাম। কঙ্কাবতী! তুমি আমাকে জাগাইতে পার নাই? দেখ দেখি, কত বেলা হইয়া গিয়াছে?"

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"সাধ্য থাকিলে আর জাগাইতাম না?"

খেতু তাহার পর চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, কঙ্কাবতীর চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে। খর্ব্বুর, মশা ও ব্যাঙ বিষণ্ণ বদনে বসিয়া আছেন। —খেতু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কঙ্কাবতী! কাঁদিতেছ কেন?এঁরা কারা?" কঙ্কাবতী কোন উত্তর করিলেন না।

খেতু একটু চিন্তা করিয়া পুনরায় বলিলেন,—"আমার সকল কথা এখন মনে পড়িতেছে। আমার মাথায় শিকড় ছিল না বলিয়া আমাকে নাকেশ্বরী খাইয়াছিল।

কঙ্কাবতী। তুমি বুঝি ইহাদিগকে ডাকিয়া আনিয়া আমাকে সুস্থ করিয়াছ? তবে আর কান্না কেন। আমি তো এখন ভাল আছি। কেবল আমার মাথা অল্প অল্প ব্যাথা করিতেছে! আমি আর একবার শুই। কঙ্কাবতী! তুমি আমার মাথাটি একটু টিপিয়া দাও। আমার মাথা বড় বেদনা করিতেছে! প্রাণ বুঝি আমার বাহির হয়! ওগো! তোমরা সকলে আমরা কঙ্কাবতীকে দেখিও! আমার কঙ্কাবতীকে তার মা'র কাছে দিয়া আসিও। হা-ঈশ্বর।"

খেতুর মৃত্যু হইল। —ঘাড় হেঁট করিয়া সকলে নীরবে বসিয়া রহিলেন। কাহারও মুখে বাক্য নাই। সকলের চক্ষু দিয়া জলধারা পড়িতে লাগিল। কেবল কঙ্কাবতী স্থির হইয়া রহিলেন। —অনেকক্ষণ পরে খর্ব্বুর বলিলেন,—"এইবার সব ফুরাইল। আমাদের সমুদয় পরিশ্রম বিফল হইল। এখন আর কোনও উপায় নাই। তালগাছ হইতে পতনের সময় পরমায়ুর অধিকাংশ ভাগ বাতাসে উড়িয়া গিয়াছিল, কেবল অতি সামান্য ভাগ পিপীলিকাতে খাইয়াছিল। সে পরমায়ুটুকুতে মনুষ্য আর কতক্ষণ বাঁচিতে পারে?"

এই বলিয়া খর্ব্বুর কাঁদিতে লাগিলেন, মশা কাঁদিলেন, ব্যাঙ রুমাল দিয়া চক্ষু মুছিতে লাগিলেন, বাহিরে হাতী শুড় দিয়া ধূলা উড়াইতে লাগিলেন। কেবল কঙ্কাবতী নীরব, কঙ্কাবতীর কান্না নাই। --অবশেষে মশা বলিলেন,—"মা, উঠ। বিলাপে আর কোনও ফল নাই। তোমার পতির এক্ষণে আমরা যথাবিধি সৎকার করি। তাহার পর তুমি আমার সহিত রক্তবতীর নিকট যাইবে। রক্তবতীকে দেখিলে তোমার মন অনেক শান্ত হইবে।"

মশা, খর্ব্বুর ও ব্যাঙ কঙ্কাবতীকে বুঝাইতে লাগিলেন।

খর্ব্বুর বলিলেন—"সংসার অনিত্য। জীবনের কিছুই স্থিরতা নাই। কখন কে নাই। উঠ, মা, উঠ। তোমার পতির যথাবিধি সৎকার হইলে, কিছুদিন তুমি রক্তবতীর নিকটে গিয়া থাক। তাহার পর তোমার মা'র নিকট গিয়া রাখিয়া আসিব।"

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"মহাশয়গণ। আপনারা আমার অনেক উপকার করিলেন। আমার জন্য আপনারা অনেক পরিশ্রম করিলেন। আপনাদিগের পরিশ্রম যে সফল হইল না, সে কেবল আমার অদৃষ্টের দোষ। ঈশ্বর আপনাদিগের মঙ্গল করিবেন। আপনারা যখন এত পরিশ্রম করিলেন, তখন এক্ষণে আমার একটি যৎসামান্য উপকার করুন। সেইটি করিয়া আপনারা স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করুন। পতিপদে আমি আমার প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি। এই— যে আমার শরীর দেখিতেছেন, এ প্রাণহীন জড় দেহ। এক্ষণে আমি পতিদেহের সহিত আমার এই জড়দেহ ভস্ম করিব। সে নিমিত্ত যাহা কিছু প্রয়োজন, আপনারা সেই সমস্ত উপকরণের আয়োজন করিয়া দিন।"

মশা বলিলেন,—"ছি মা। ও কথা কি মুখে আনিতে আছে? পতিহারা হইয়া শত শত সতী এ পৃথিবীতে জীবিত থাকে। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া পরোপকারে জীবন অতিবাহিত করে।" —খর্ব্বুর ও ব্যাঙ সকলেই কঙ্কাবতীকে সেইরূপ নানা প্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন।

নাকেশ্বরী বলিল,—"মাসী।" মাসী বলিল,—"উঁ।" নাকেশ্বরী বলিল,—"মানুষটাকে সৎকার করিবে যে। তাহা হইলে আর আমরা কি ছাই খাইব?"

মাসী বলিল,—"হুঁ।" নাকেশ্বরী বলিল,—"এই ছুঁড়ীর জন্যই যত বিপত্তি। এখন ছুঁড়ীও যাতে মরে, এস তাই করি।"

এই কথা বলিয়া নাকেশ্বরী, খৰ্ব্বুর প্রভৃতির নিকট আসিয়া আবির্ভূত হইল।

নাকেশ্বরী বলিল,—"পরামর্শ করিতেছ? কঙ্কাবতীকে দেশে লইয়া যাইবে? লইয়া যাও, তাহাতে আমাদের কোনও ক্ষতি নাই। কিন্তু এ ধর্ম্মভূমি ভারতভূমির নিয়ম তোমরা জান না। লোকের এখানে ধর্ম্মগত প্রাণ। শোকেই হউক আর তাপেই হউক, সহসা যদি কেহ মুখে একবার বলিয়া ফেলে যে, 'আমি পতির সঙ্গে যাইব,' তাহা হইলে তাহাকে যাইতেই হইবে, সতী হইতেই হইবে। না হইলে পতিকুল, পিতৃকুল, মাতৃকুল, সকল কুল ঘোর কলঙ্কে কলঙ্কিত হইবে। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, আত্মীয়বর্গের মস্তক অবনত হইবে। সে কলঙ্কিনী একেবারেই পতিত হইবে। তাহার সহিত যিনি আচার-ব্যবহার করিবেন, তিনিও পতিত হইবেন। তাই বলিতেছি, তোমরা ইহাঁকে ঘরে লইয়া যাও, তাহাতে আমাদের কিছু ক্ষতি নাই; কিন্তু শুন মশা মহাশয়। শুন খৰ্ব্বুর মহারাজ। আমি একথা তোমাদিগের আত্মীয়-স্বজনকে বলিয়া দিব। তোমাদের আত্মীয়-স্বজনেরা কিন্তু তোমাদিগের মত নাস্তিক নন্। তাঁরা নিশ্চয় ইহার যথাশাস্ত্র বিচার করিবেন। তখন দেখিব, পুত্র-কন্যার বিবাহ দাও কোথায়? —নাকেশ্বরীর কথা শুনিয়া মশার ভয় হইল। আজ বাদে কাল তাঁর রক্তবতীর বিবাহ দিতে হইবে। পাত্র না মিলিলে তাঁকে ঘোর বিপদে পড়িতে হইবে। মশা তাই খৰ্ব্বুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সত্য সত্য কি ভারতের এই নিয়ম?"

খৰ্ব্বুর উত্তর করিলেন—"পূর্ব্বে এইরূপ নিয়ম ছিল সত্য। কিন্তু এক্ষণে সহমরণ উঠিয়া গিয়াছে। সাহেবেরা ইহা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।" —নাকেশ্বরী বলিল, "উঠিয়া গেছে সত্য। কিন্তু আজ-কাল শিক্ষিত পুরুষদিগের মত কি জান? পূর্ব্বপ্রথা সমুদয় পুনঃপ্রচলিত করিবার নিমিত্ত তাঁহারা যথোচিত প্রয়াস পাইতেছেন। শোক-বিহ্বলা ক্ষিপ্তপ্রায়া জননী-ভগিনীদিগকে জ্বলন্ত অনলে পোড়াইবার নিমিত্ত আজ-কালের শিক্ষিত পুরুষেরা নাচিয়া উঠিয়াছেন! এইরূপ ধর্ম্মের আমরা সম্পূর্ণভাবে পোষকতা করিয়া থাকি।"

খৰ্ব্বুর বলিলেন—"আমার যাই থাকুক কপালে, আমি কঙ্কাবতীর সহিত আচার-ব্যবহার করিব। তাহাকে আমাকে পতিত হইতে হয় সেও স্বীকার। আত্মীয়-স্বজন আমাকে পরিত্যাগ করেন করুক, তাহাতে আমি ভয় করিব না। তা বলিয়া অনাথা বালিকাটি যে অসহনীয় শোকে ক্ষিপ্ত-প্রায়া হইয়া পুড়িয়া মরিবে, তাহা আমি চক্ষে দেখিতে পারিব না।"

মশা বলিলেন,—"আমারও ঐ মত, ভীরু কাপুরুষের মত কার্য্য করিতে পারিব না। আমি কঙ্কাবতীকে ঘরে লইয়া যাইব।

ব্যাঙ বলিলেন,—"আমারও ঐ মত। কাপুরুষ হয়, মানুষেরা হউক। আমি হইব না।"

নাকেশ্বরী বলিল,—"ধর্ম্মের তোমরা কিছুই জান না। ঘোর অধর্ম্মে যে তোমরা পতিত হইবে, সে জ্ঞান তোমাদের নাই। ইনি যদি সতী না হয়, তাহা হইলে ইহাঁকে প্রাজাপাত্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে তবুও ইনি ঘরে যাইতে পারিবেন না। মুর্দ্দাফরাশের রমণী হইয়া

ইহাঁকে চিরকাল থাকিতে হইবে।''

কঙ্কাবতী বলিলেন,—''এই কথা লইয়া আপনারা বৃথা তর্ক-বিতর্ক করিতেছেন। আমি নিশ্চয় সতী হইব, আমি কাহারও কথা শুনিব না। আমি নিশ্চয় প্রাণত্যাগ করিব। বাঁচিয়া থাকিতে আর আপনারা আমাকে অনুরোধ করিবেন না, যেহেতু আপনাদিগের কথা আমি রক্ষা করিতে পারিব না। এক্ষণে আমার প্রার্থনা এই যে সতী হইতে যাহা কিছু আবশ্যক সেই সমুদয় দ্রব্যের আয়োজন করিয়া দিন। আমার আর একটি কথা আছে। আমাদিগের যে ঘাট আছে, সেইখানে আমার শাশুড়ী-ঠাকুরাণীর চিতা হইয়াছিল, সেই স্থানে চিতা করিয়া আমি আমার পতির সঙ্গে পুড়িয়া মরিব।''

কঙ্কাবতীর দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা দেখিয়া অতি দুঃখের সহিত, অগত্যা এ কার্য্যে সকলকে সম্মত হইতে হইল। মশা বলিলেন,—''কঙ্কাবতী! যদি তুমি নিতান্তই এই দুষ্কর কার্য্য করিবে, তবে আমি আমার বাড়ীতে সংবাদ দিই, আমার স্ত্রীগণ ও রক্তবতী আসিয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করুন।'' —খর্ব্বুর বলিলেন,—'আমিও তবে আমার স্ত্রীকে সংবাদ দিই। আমার আত্মীয়-স্বজনকে সঙ্গে লইয়া তিনিও আসুন। সহমরণের উপকরণ আনয়ন করুন ও নাপিত, পুরোহিত, ঢাকি-ঢুলির নিকট সংবাদ পাঠাইয়া দিই।''

ব্যাঙ বলিলেন—আমিও আমার জ্ঞাতি বন্ধুদিগকে ডাকিতে পাঠাই।''

নাকেশ্বরী বলিল,—''মাসী! তবে আমরা আর বাকী থাকি কেন? তুমি তোমার ঝুড়িতে গিয়া চড়। পৃথিবীতে যত ভূতিনী প্রেতিনী আছে, সহমরণ দেখিবার জন্য তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ কর। আজকাল সহমরণ কিন্তু আর প্রতিদিন হয় না। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী, বালক-বালিকা সকল ভূতিনীই-প্রেতিনীই সহমরণ দেখিয়া পরম পরিতোষ উপভোগ করিবে।'' —এইরূপে সকলেই আপন র আত্মীয়-স্বজনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাহার পর, খেতু ও কঙ্কাবতীকে লইয়া, সকলে হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। রাত্রে এক প্রহরের সময় সকলে কুসুমঘাটীর ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

কঙ্কাবতী যে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন, সেই স্থানে চিতা সুসজ্জিত হইল।

এই সময় রক্তবতী ও রক্তবতীর মাতাগণ সেই শশ্মানঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সহমরণের সমুদয় উপকরণ লইয়া নাপিত পুরোহিত ঢাকী ঢুলি সঙ্গে করিয়া খর্ব্বুরের সপ্তহস্ত-পরিমিত স্ত্রী ও তাঁহার আত্মীয়-স্বজন আপন আপন বালক-বালিকাগণকে লইয়া সেইখানে আসিলেন। ব্যাঙ ও হস্তীর আত্মীয়বর্গও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নানাদিক্ হইতে অসংখ্য ভূতিনীগণও আগমন করিল। সেই শশ্মান-ঘাটে সে রাত্রিতে মনুষ্য ও ভূত-ভূতিনী ভিন্ন, অপরাপর নানা প্রকার জীবজন্তু সমাগম হইল! সে রাত্রিতে কুসুমঘাটীর শশ্মান-ঘাট জনাকীর্ণ হইয়া পড়িল। রক্তাবতী কঙ্কাবতীর গলা জড়াইয়া ধরিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে রক্তাবতী বলিলেন,—''পচাজল! তুমি কোথায় যাও? আমাকে ছাড়িয়া তুমি কোথায় যাইবে? আমি কখনই তোমাকে যাইতে দিব না।''

কঙ্কাবতী বলিলেন,—''পচাজল! তুমি কাঁদিও না। সতী হইয়া পতি-সঙ্গে আমি স্বর্গে

চলিলাম। সে কার্য্যে তুমি আমাকে বাধা দিও না। কি করিব পচাজল। মন্দ অদৃষ্ট করিয়া এ পৃথিবীতে আসিয়াছিলাম; এ পৃথিবীতে সুখ হইল না। পতির সহিত এখন স্বর্গে যাই। আশীর্ব্বাদ করি, রাজপুত্র মশা তোমার বর হউক। পতি লইয়া তুমি সুখে ঘরকন্না কর। আমার মত হতভাগিনী যেন শত্রুও না হয়।"

এই বলিয়া কঙ্কাবতী, মশা-কন্যাকে নক্ষত্রের পুটুলিটি বাহির করিয়া দিলেন। কঙ্কাবতী বলিলেন,—"ভাই পচাজল! এই নক্ষত্রগুলি দিয়া তিন ছড়া মালা গাঁথ। এক ছড়া তুমি লও, আর দুই ছড়া আমার জন্য রাখ, প্রয়োজন আছে।"

সকলে তখন খেতুকে চিতার উপর রাখিলেন। প্রেত পিণ্ডাদি যথাবিধি প্রদত্ত হইল। নাপিত আসিয়া কঙ্কাবতীর নখ কাটিয়া দিল। তাহার চুড়ি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। সেই ভাঙ্গা চুড়ি লোকে হুড়াহুড়ি কাড়াকাড়ি করিয়া কুড়াইতে লাগিল। কেন না, কাহাকেও ভূত-প্রেতিনীতে পাইলে, এই চুড়ি রোগীর গলায় পরাইয়া দিলে, ভূত-প্রেতিনী ছাড়িয়া যায়।

কঙ্কাবতী হাতের নোয়া খুলিয়া স্নান করিয়া আসিলেন। খর্ব্বুরপত্নী তখন তাঁহাকে রক্তবর্ণের চেলির কাপড় পরাইয়া দিলেন। রাঙাসূতা দিয়া হাতে আলতা বাঁধিয়া দিলেন। চুলের উপর থরে থরে চিরুণি সাজাইয়া দিলেন। কপাল জুড়িয়া সিন্দুর ঢালিয়া দিলেন।

এইরূপ বেশ-ভূষা হইলে, কঙ্কাবতী আচমন করিয়া তিল জল কুশ হস্তে পর্ব্বমুখে বসিলেন। পুরোহিত তাঁহাকে মন্ত্র পড়াইয়া এইরূপ সঙ্কল্প করাইলেন।

"অদ্য ভাদ্রামাসে, কৃষ্ণপক্ষে , তৃতীয়া তিথিতে ভরদ্বাজ গোত্রের আমি শ্রীমতী কঙ্কাবতী দেবী,—বশিষ্ঠকে লইয়া অরুন্ধতী যেরূপ স্বর্গে মহামান্যা হইয়াছিলেন,—আমিও যেন সেইরূপ, মানুষের শরীরে যত লোক আছে, তত বৎসর স্বর্গে পতিকে লইয়া সুখে থাকিতে পারি। আমার মাতৃ-পিতৃ ও শ্বশুর যেন পবিত্র হয়। যতদিন চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অধিকার থাকিবে, ততকাল পর্য্যন্ত যেন অপ্সরাগণ, আমাদিগের স্তব করিতে থাকে। পতির সঙ্গে যেন সুখে থাকি। ব্রহ্মহত্যা ও কৃতঘ্নতাজন্য যদি পতির পাপ হইয়া থাকে, আমার স্বামী যেন সে পাপ হইতে মুক্ত হন। এই সকল কামনা করিয়া আমি পতির জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিতেছি।" —এইরূপে পুরোহিত কঙ্কাবতীকে সঙ্কল্প করাইলেন। তাহার পর সূর্য্যার্ঘ দিয়া দিক্‌পালগণকে সাক্ষী করিলেন। সে মন্ত্রের অর্থ এই;—

"অষ্ট-লোকপাল, আদিত্য, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, ভূমি, জল, হৃদয়স্থিত অন্তর্য্যামী পুরুষ, যম, দিন, রাত্রি, সন্ধ্যা, ধর্ম্ম, তোমরা সকলে সাক্ষী থাক, আমি জ্বলন্ত চিতারোহণ করিয়া স্বামীর অনুগমন করিতেছি।" —লোকপালদিগকে সাক্ষী মানা হইলে, কঙ্কাবতী আঁচলে খই, খণ্ডের পরিবর্ত্তে বাতাসা ও কড়ি লইয়া, সাত বার চিতাকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন, আর সেই খই-কড়ি ছড়াইতে লাগিলেন। বালক-বালিকাগণ হুড়াহুড়ি করিয়া খই-কড়ি কুড়াইতে লাগিল। কেন না, এই খই বিছানায় রাখিলে ছারপোকা হয় না।

উপস্থিত রমণীদিগের মধ্যে এক জন সতীর নিকট হইতে তাঁহার কপালের একটু সিন্দুর চাহিয়া লইলেন। তাহার কপালে এই সিন্দুর পরাইয়া দিলে সে অবিলম্বে পতিপরায়ণা

হইবে। চিতা প্রদক্ষিণ করা হইলে, পুরোহিত কঙ্কাবতীকে ঋগ্‌মন্ত্র পড়াইলেন। শেষে কঙ্কাবতী রক্তবতীর নিকট হইতে নক্ষত্রের মালা দুই ছড়া চাহিয়া লইলেন। চিতার উপর আরোহণ করিয়া এক ছড়া মালা খেতুর গলায় দিলেন, এক ছড়া মালা আপনি পরিলেন। তাহার পর, চিতার উপর স্বামীর বাম পার্শ্বে শয়ন করিলেন।

গাছের কাঁচা ছাল, দিয়া, সকলে তাঁহাকে সেই চিতার সহিত বাঁধিয়া দিলেন। তাহার পর চিতার চারিদিকে সকলে আগুন দিয়া দিলেন। আগুন দিয়া, বড় বড় কঞ্চির বোঝা, বড় বড় শবের বোঝা, বড় বড় পাকাটির বোঝা, চারিদিক, হইতে সকলে ঝুপ ঝাপ করিয়া চিতার উপর ফেলিতে লাগিলেন! বাদ্যকরদিগের ঢাক-ঢোলের কোলাহলে সকলের কর্ণে তালি লাগিল। চিতা ধূ ধূ করিয় জ্বলিয়া উঠিল। আকাশপ্রমাণ হইয়া অগ্নিশিখা উঠিল।

কঙ্কাবতী অঘোর নিদ্রায় অভিভূতা হইলেন! অতি সুখ-নিদ্রা! অতি শান্তিদায়িনী নিদ্রা!!

পরিশেষ – অতি সুখ-নিদ্রা! অতি শান্তি-দায়িনী নিদ্রা!

বৈদ্য বলিলেন,—"এই যে নিদ্রাটি দেখিতেছেন, ইহা সুনিদ্রা। বিকারের ঘোর নহে। বিকার কাটিয়া গিয়াছে। নাড়ী পরিষ্কার হইয়াছে। এক্ষণে বাড়িতে যেন শব্দ হয় না! নিদ্রাটি যেন ভঙ্গ হয় না।" –বৈদ্য প্রস্থান করিলেন। অঘোর অচৈতন্য হইয়া রোগী নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। বাড়ীতে সকলেই চুপি চুপি কথা কহিতে লাগিলেন। বাড়ীতে পিপীলিকার পদশব্দটি পর্য্যন্ত নাই। –মাতা কাছে বসিয়া রহিলেন। এক একবার কেবল কন্যার নাসিকার নিকট হাত রাখিয়া দেখিতে লাগিলেন. রীতিমত নিশ্বাস-প্রশ্বাস বহিতেছে কি না?

আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, মা আজ বাইশ দিন কন্যার নিকট এইরূপে বসিয়া আছেন। প্রাণসম কন্যাকে লইয়া যমের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিতেছেন। প্রবল বিকারের উত্তেজনায় কন্যা যখন উঠিয়া বসেন, মা তখন আস্তে আস্তে পুনরায় তাঁহাকে চুপ করিতে বলেন। সুধাময় মার বাক্য শুনিয়া বিকারের আগুনও কিছুক্ষণের নিমিত্ত নির্ব্বাণ হয়।

কন্যা নিদ্রিত! চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আছেন। বহুদিন অনাহারে, প্রবল দুরন্ত জ্বরে, ঘোরতর বিকারে, দেহ এখন তাঁর শীর্ণ, মুখ এখন মলিন। তবুও তাঁর মধুর রূপ দেখিলে সংসার সুন্দর বলিয়া প্রতীতি হয়। মা সেই অপূর্ব্ব রূপরাশি অবলোকন করিতেছেন।

রাত্রি প্রভাত হইল। বেলা হইল। তবুও রোগীর নিদ্রাভঙ্গ হইল না। মা কাছে বসিয়া রহিলেন। নিঃশব্দে ভগিনী আসিয়া মার কাছে বসিলেন।

রোগীর ওষ্ঠদ্বয় একবার ঈষৎ নড়িল। অপরিস্ফুট স্বরে কি বলিলেন। শুনিবার নিমিত্ত ভগিনী মস্তক অবনত করিলেন। শুনিতে পাইলেন না, বুঝিতে পারিলেন না। –আবার ওষ্ঠ নড়িল, রোগী আবার কি বলিলেন। মা এইবার সে কথা বুঝিতে পারিলেন।

মা বলিলেন,—'খেতু খেতু করিয়াই বাছা আমার সারা হইলেন, আজ কয়দিন মুখে কেবল ঐ নাম। এখন যদি চারি হাত এক করিতে পারি, তবেই মনের কালি যায়।"

মার সুমধুর কণ্ঠ-স্বর কন্যার কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিল। সম্পূর্ণরূপে জাগরিত হইয়া,

ধীরে ধীরে তিনি চক্ষু উন্মীলন করিলেন। বিস্মিত-বদনে চারি দিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। মা বলিলেন,—"বিকার সম্পূর্ণরূপে এখনও কাটে নাই। চক্ষুতে এখনও সুদৃষ্টি হয় নাই। আজ উনিশ দিন মা আমার কাহাকেও চিনিতে পারেন নাই।"

ভগিনী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কঙ্কাবতী! তুমি আমাকে চিনিতে পার?

কঙ্কাবতী অতি মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন,—"পারি, তুমি বড় দিদি।"

ভগিনী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ইনি কে বল দেখি?" কঙ্কাবতী বলিলেন,—"মা।" তনু রায় ঘরের ভিতর আসিলেন। তনু রায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কঙ্কাবতী! আজ কেমন আছ মা?" কঙ্কাবতী বলিলেন,—"ভাল আছি, বাবা।"

তনু রায় একটু কাছে বসিলেন। স্নেহের সহিত কন্যার গায় মাথায় একটু হাত বুলাইলেন। তাহার পর বাহিরে চলিয়া গেলেন।

কঙ্কাবতী ভাবিলেন,—"মা, ভগিনী পিতা সকলকেই দেখিতেছি আমার সহিত স্বর্গে আসিয়াছেন। পৃথিবীতে পিতার স্নেহ কখনও পাই নাই। আজ স্বর্গে আসিয়া পাইলাম। পৃথিবীতে আমাদের যেরূপ বাড়ী, আমার যেরূপ ঘর ছিল, স্বর্গেও দেখিতেছি সেইরূপ। কিন্তু যাঁহার সহিত সহমরণ যাইলাম, তিনি কোথায়?"

অনেকক্ষণ কঙ্কাবতী তাঁর প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। তিনি আসিলেন না।

অবশেষে কঙ্কাবতী মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা, তিনি কোথায়?"

মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তিনি কে?" —কঙ্কাবতী বলিলেন,—"সেই যিনি বাঘ হইয়াছিলেন।" মা বলিলেন,—"এখনও ঘোর বিকার রহিয়াছে, এখনও প্রলাপ রহিয়াছে।"

মা'র কথা শুনিয়া কঙ্কাবতী চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। শরীর তাঁহার নিতান্ত দুর্ব্বল, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। অল্প অল্প করিয়া তাঁহার পূর্ব্ব কথা সব স্মরণপথে আসিতে লাগিল। —কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—মা। আমার কি অতিশয় পীড়া হইয়াছিল?"

মা বলিলেন,—"হাঁ বাছা। আজ বাইশ দিন তুমি শয্যাগত। তোমার কিছুমাত্র জ্ঞান ছিল না। এবার যে তুমি বাঁচিবে, সে আশা ছিল না।"

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"মা। আমি আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিয়াছি। স্বপ্নটি আমার মনে এরূপ গাঁথা রহিয়াছে যে, প্রকৃত ঘটনা বলিয়া আমার বিশ্বাস হইতেছে। এখন আমার মনে নানা কথা আসিতেছে। তাহার ভিতর আবার কোন্‌টি স্বপ্ন, তাহা আমি স্থির করিতে পারিতেছি না। তাই মা তোমাকে গুটিকতক কথা জিজ্ঞাসা করি। আচ্ছা মা জনার্দ্দন চৌধুরীর স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছে, সে কথা সত্য?"

মা বলিলেন,—"সে কথা সত্য। তাই লইয়াই তো আমাদের যত বিপদ্। কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা। বরফ লইয়া কি দলাদলি হইয়াছিল, সে কথা কি সত্য?" মা উত্তর করিলেন,—"হাঁ বাছা। সে কথাও সত্য। সেই কথা লইয়া পাড়ার লোকে খেতুর মাকে অপমান করিয়াছিল।" কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তিনি এখন কোথায় মা।"

মা বলিলেন,—"তিনি আসেন এই। সমস্ত দিন এইখানেই থাকেন। আমার চেয়ে তিনি

তোমাকে ভালবাসেন। তাঁর হাতে তোমাকে একবার সঁপিয়া দিতে পারিলেই, এখন আমার সকল দুঃখ যায়। কর্ত্তার মত হইয়াছে, সকলের মত হইয়াছে, এখন তুমি ভাল হইলেই হয়।" কঙ্কাবতী বুঝিলেন যে, তবে খেতুর মার মৃত্যু হয় নাই, সে কথাটি স্বপ্ন।

কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই দলাদলির পর আমার জ্বর হয়, না মা?

"তাহার পর, মা, আমি নদীর ঘাটে গিয়া একখানি নৌকার উপর চড়ি, না মা?"

মা বলিলেন,—"বালাই! তুমি নৌকায় চড়িবে কেন মা? সেই অবধি তুমি শয্যাগত।"

কঙ্কাবতী বলিলেন,—"মা! কত যে কি আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিয়াছি, তাহা আর তোমায় কি বলিব; সে সব কথা মনে হইলে হাসিও পায় কান্নাও পায়। স্বপ্নে দেখিলাম কি মা, যে, গায়ের জ্বালায় আমি নদীর ঘাটে গিয়া জল মাখিতে লাগিলাম। তাহার পর একখানি নৌকাতে চড়িয়া নদীর মাঝখানে যাইলাম। নৌকাখানি আমার ডুবিয়া গেল! মাছেরা আমাকে তাদের রাণী করিল। তাহার পর কিছুদিন গোয়ালিনী মাসীর বাড়ীতে রহিলাম। সেখান হইতে শশ্মানঘাটে যাইলাম। তাহার পর পুনরায় বাড়ী আসিলাম। এক বৎসর পরে আমাদের বাটীতে একটি বাঘ আসিল। সেই বাঘের সহিত আমি বনে যাইলাম। তার পর ভূতিনী, ব্যাঙ, মশা কত কি দেখিলাম। তার পর মা আকাশে উঠিলাম, কত কি করিলাম, কত কি দেখিলাম, স্বপ্নটি যেন আমার ঠিক সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে। হাঁ মা! সে দলাদলির কি হইল?" —মা উত্তর করিলেন,—"যে দলাদলি সব মিটিয়া গিয়াছে। যখন তোমার সমূহ পীড়া, যখন তুমি অজ্ঞান অভিভূত হইয়া পড়িয়া আছ, আজ আট নয় দিনের কথা আমি বলিতেছি, সেই সময় জনার্দ্দন চৌধুরীর একটি পৌত্রেব হঠাৎ মৃত্যু হইল। জনার্দ্দন চৌধূরী সেই পৌত্রটিকে অতিশয় ভালবাসিতেন।

তিনি শোকে অধীর হইয়া পড়িলেন। সেই সময গোবর্দ্ধন শিরোমণিরও সঙ্কটাপন্ন পীড়া হইল। আর আমাদের বাটীতে তো তোমাকে লইয়া সমূহ বিপদ্। জনার্দ্দন চৌধুরীর সুমুতি হইল। তিনি রামহরিকে আনিতে পাঠাইলেন। রামহরি সপরিবারে কলিকাতা হইতে দেশে আসিলেন। রামহরি জনার্দ্দন চৌধূরী অনেকক্ষণ পরামর্শ করিলেন। তাহার পর রামহরি নিরঞ্জনকে ডাকিয়া আনিলেন।

রামহরি, নিরঞ্জন, আমাদের কর্ত্তাটি ও খেতু সকলে মিলিয়া জনার্দ্দন চৌধূরীর বাটীতে যাইলেন। জনার্দ্দন চৌধুরী বলিলেন,—আমি পাগল হইয়াছিলাম যে, এই বৃদ্ধ বয়সে আমি পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম! নিরঞ্জনকে আমি দেশত্যাগী করিয়াছি, খেতু বালক, তাহার প্রতি আমি ঘোরতর অত্যাচার করিয়াছি। সেই অবধি নানাদিকে আমাদের অনিষ্ট ঘটিতেছে। লোকের টাকা আত্মসাৎ করিয়া ষাঁড়েশ্বব কয়েদ হইয়াছে! গোবর্দ্ধন শিরোমণি পক্ষাঘাত রোগে মরণাপন্ন হইয়া আছেন।

বৃদ্ধ বয়সে আমাকে এক দারুণ শোক পাইতে হইল। এঁর কন্যাটিও রক্ষা পাওয়া ভার।' এই কথা বলিয়া তিনি নিরঞ্জনকে অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া তাঁহার ভূমি ফিরিয়া দিলেন। নিরঞ্জন এখন আপনার বাটীতে বাস করিতেছেন। খেতুকে অনেক আশীর্ব্বাদ

করিয়া জনার্দ্দন চৌধুরী সান্ত্বনা করিলেন।

আমাদের কর্ত্তাটি আর সে মানুষ নাই। এক্ষণে তাঁহার মনে স্নেহ-মায়া দয়া-ধর্ম্ম হইয়াছে। বিপদে পড়িলে লোকের এইরূপ সুমতি হয়। তোমার দাদাও এখন আর সেরূপ নাই। মাকে যেরূপ আস্থা-ভক্তি করিতে হয় সুপুত্রের, তোমার দাদাও এক্ষণে আমাকে আস্থা-ভক্তি করে। তোমার পীড়ার সময় খেতু, খেতুর মা, রামহরি, সীতা প্রভৃতি সকলেই প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াছেন। এক্ষণে সকল কথা শুনিলে এখন আর অধিক কথা কহিয়া কাজ নাই। এখনও তুমি অতিশয় দুর্ব্বল। পুনরায় অসুখ হইতে পারে।"

কঙ্কাবতী অনেক দিন দুর্ব্বল রহিলেন। ভাল হইয়া সারিতে তাঁহার অনেক বিলম্ব হইল। সীতা তাঁহার নিকট আসিয়া সর্ব্বদা বসিতেন। স্বপ্ন-কথা তিনি সীতার নিকট সমুদয় গল্প করিলেন। সীতা মাকে বলিলেন, বৌদিদি খেতুকে বলিলেন, এইরূপে কঙ্কাবতীর আশ্চর্য্য স্বপ্ন-কথা পাড়ার স্ত্রী-পুরুষ সকলেই শুনিলেন! স্বপ্ন-কথা আদ্যোপান্ত শুনিয়া কঙ্কাবতীর উপর সীতার বড় অভিমান হইল।

সীতা বলিলেন,—"সমুদয় নক্ষত্রগুলি তুমি নিজে পরিলে, আর আপনার পচাজলকে দিলে। আমার জন্য একটিও রাখিলে না। আমাকে তুমি ভালবাস না, তুমি তোমার পচাজলকে ভালবাস। আমি তোমার সহিত কথা কহিব না।"

কঙ্কাবতী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিলেন। পূর্ব্বের ন্যায় পুনরায় সবল হইলেন। পীড়া হইতে উঠিয়া তিনি খেতুর সম্মুখে একটু-আধটু বাহির হইতেন। একদিন খেতু কঙ্কাবতীদের বাটীতে গিয়াছিলেন। সেইখানে একটি মশা উড়িতেছিল খেতু সেই মশাটিকে ধরিয়া কঙ্কাবতীতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দেখ দেখি কঙ্কাবতী এই মশাটি তো তোমার 'পচাজল' নয়? আহা! রক্তবতী আজ অনেক দিন তাহার পচাজলকে দেখিতে পায় নাই। তাহার মন কেমন করিতেছে। তাই সে হয় তো তোমাকে খুঁজিতে আসিয়াছে।"

লজ্জায় কঙ্কাবতী গিয়া ঘরে লুকাইলেন। সেই অবধি আর খেতুর সম্মুখে বাহির হইতেন না।

নিরঞ্জন একদিন খেতুকে বলিলেন,—"খেতু! কঙ্কাবতীর অদ্ভুত স্বপ্নকথা আমি শুনিয়াছি। কি আশ্চর্য্য স্বপ্ন! কিন্তু স্বপ্ন বা বিকারের প্রলাপ বলিয়া তুমি উপহাস করিও না। স্বপ্ন,—কি নয়? তাহাই বুঝিতে পারি না। এই আমাদের জীবন, আমাদের আশা-ভরসা, সুখ-দুঃখ সকলই স্বপ্নবৎ বলিয়া বোধ হয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই অপূর্ব্ব মায়া কিছুই বুঝিতে পারি না। সামান্য একটি পদার্থের কথাই আমরা ভালরূপ অবগত নহি।

এই দেখ, আমার হাতে এখন যে পুস্তকখানি রহিয়াছে, প্রকৃত ইহা—কি, তাহার কিছুই জানি না। আমাদের ইন্দ্রিয় দ্বারা কেবল কতকগুলি গুণ অনুভব হয়। চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাই যে, ইহার দৈর্ঘ্য প্রস্থ স্থূলতা ও বর্ণ আছে ত্বকের দ্বারা জানিতে পারি যে, ইহার কাঠিমা আছে নাসিকা দ্বারা ইহার ঘ্রাণ জিহ্বার দ্বারা ইহার স্বাদ অনুভব করি। প্রকৃত পুস্তকখানি আমরা দেখিতে পাই না, যাহাকে পুস্তকের গুণ বলি তাহাই আমরা অনুভব

করিতে পারি। —কিন্তু সে গুণগুলি পুস্তকের কি আমাদের ইন্দ্রিয়ের? আমাদের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক প্রভৃতি এখন যে ভাবে গঠিত, সেই ভাবে আমরা গুণাদি অনুভব করি। যদি আমাদের ইন্দ্রিয় সমুদয় অন্যরূপে গঠিত হইত, তাহা হইলে পৃথিবীস্থ সমস্ত পদার্থ আবার অন্যরূপ ধারণ করিত। —এই পুস্তকের পত্রগুলি এখন শুভ্র ও কৃষ্ণবর্ণ দেখাইতেছে। যদি পাণ্ডুরোগে আক্রান্ত হইয়া কিঞ্চিৎমাত্র আমার চক্ষুর গঠন পরিবর্ত্তিত হয় তাহা হইলে এই পুস্তকখানিই আবার আমার চক্ষে পীতবর্ণ দেখাইবে।

তাই দেখ, প্রথম তো পুস্তকখানি দেখিতে পাই না. কতকগুলি গুণ কেবল অনুভব করি। আবার বলিতে গেলে সেইগুণগুলি পুস্তকের নয়, আমাদের ইন্দ্রিয়ের। তবে পুস্তক রহিল কোথা? কোনও বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে না পরিয়া স্বপ্ন সৃজিত কাল্পনিক জীবের ন্যায় আমরা সকলেই এই সংসারে যেন বিচরণ করিতেছি।

সে জন্য কঙ্কাবতীর স্বপ্নকে আমরা সকলে উপহাস করিব কেন? সমুদয় বাহ্যজগৎ যেরূপ আমাদের জাগরিত ইন্দ্রিয়-কল্পিত, কঙ্কাবতীর স্বপ্নজগৎও সেইরূপ কঙ্কাবতীর সুযুপ্ত ইন্দ্রিয় নির্ম্মিত হইয়াছিল। স্বপ্নের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সকল স্থানেই কঙ্কাবতী বর্ত্তমান। কঙ্কাবতী দেখিতেছে, কি শুনিতেছে, কি বলিতেছে, তা ছাড়া স্বপ্নে আর কিছুই নাই। কঙ্কাবতীর যেরূপ ভ্রম হওয়া সম্ভব, স্থানে স্থানে সেইরূপ নাও দেখিতে পাই। হাতীদিগের মন মশাদিগের নাক পরিবর্দ্ধিত হইয়া হইয়া শুঁড়া হয় না, আবার অন্য স্থানে, যেমন আকাশে, কল্পনা-দেবী কঙ্কাবতীর সহিত কিছু ক্রীড়া করিয়াছেন। যাহা হউক, স্বপ্নটি অদ্ভুত বলিয়া মানিতে হইবে। আমি আশ্চর্য্য হই, কঙ্কাবতী সেই মশাদিগের সংস্কৃত শ্লোকটি কি করিয়া বচনটি রচনা করিযাছিল।। এ অনেক দিনের কথা। একখানি কাগজে ইহা লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। কিছু দিন পবে কাগজখানি ফেলিয়া দিই। কঙ্কাবতী বোধ হয় সেই কাগজখানি দেখিয়া থাকিবে।"

কঙ্কাবতী উত্তমরূপে আরোগ্য লাভ করিলে, শুভ দিনে শুভ লগ্নে খেতু ও কঙ্কাবতীর শুভ-বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল। ঘোরতর দুঃখের পর এই কার্য্য সুসম্পন্ন হইল, সে জন্য সপ্তগ্রাম সমাজের লোক সকলেই আনন্দিত হইলেন। বিশেষতঃ জনার্দ্দন চৌধুরী পরম প্রীতিলাভ করিলেন।

তাঁহার বৃদ্ধ বয়স ও কফের ধাত, কিন্তু সে জন্য তিনি কিছু মাত্র উপেক্ষা করেন নাই। বিবাহের দিন সমস্ত রাত্রি তিনি তনু রায়ের বাটীতে উপস্থিত ছিলেন। চুপি চুপি তিনি কলিকাতা হইতে প্রচুর পরিমাণে বরফ আনয়ন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ-ভোজনের সময় পরিহাসচ্ছলে সকলকে তিনি বলিলেন,—"বর যে একেলা 'বরফ' খাইয়া শরীর সুশীতল করিবে, তাহা হইবে না, আমরাও আমাদের শরীর যৎসামান্য স্নিগ্ধ করিব।

দেশের লোক, যাঁহারা কখনও বরফ দেখেন নাই, আজ বরফ দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইলেন। আগ্রহের সহিত অল্প কাঁচা বরফ লইয়াগেলেন।

শুদ্রভোজনের সময় গদাধর ঘোষ তিন লোটা বরফজল পান করিলেন। আর প্রায়

এক সের সেই করাতের মত কর্ত্তনশীল "বরফ" দন্ত দ্বার চিবাইয়া খাইলেন।

কঙ্কাবতীর মা যখন কঙ্কাবতীকে খেতুর মার হাতে সঁপিয়া দিয়া বলিলেন,—"দিদি! এই নাও, তোমার কঙ্কাবতী নাও" তখন দুই জনের আহ্লাদ রাখিতে পৃথিবীতে কি আর স্থান হইল? মনের আনন্দে তখন খেতুর মা কি পুত্র ও পুত্রবধুকে বরণ করিয়া ঘরে লন নাই? বরণের সময় লজ্জায় খেতুকে কি ঘাড় হেঁট করিয়াছিলেন না? কলাবৌয়ের মত কঙ্কাবতীর কি তখন এক হাত ঘোমটা ছিল না? তা দেখিয়া পাড়ার একটি শিশু ছেলে কি সেই ঘোমটার ভিতর মুখ দিয়া টুঃ দেয় নাই? এ সব কথার আর উত্তর দিবার আবশ্যক নাই। —যে সময় বরণ হইতে ছিল, সেই সময় রামহরির স্ত্রী খেতুর বৌ-দিদি কি করিয়াছিলেন, তা জানেন? অতি উত্তম করিয়া খেতুর কানটি তিনি অল্প মলিয়া দিয়াছিলেন। —কান-মলা খাইয়া খেতু কি বলিলেন, তা জানেন? খেতু বলিলেন,—"যাও বৌ-দিদি ছি!"

পাড়ার স্ত্রীগণ তখন কি করিলেন, তা শুনিয়াছেন? কমলের স্ত্রী ঠান্‌দিদি বলিলেন,— "শালা 'বরখ' খায়! ও সীতার মা, ওলো, শালার কান দুইটা একেবারে ছিঁড়িয়া দে! ছিঁড়িয়া দে? —তাহার পর কি হইল? তাহার পর খেতুর অনেক টাকা হইল। সকলে সুখ-স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করিতে লাগিলেন। খেতুর অনেকগুলি ছেলেপিলে হইল। তনু রায় তাহাদিগের সহিত খেলা করিতে ভালবাসিতেন। পাড়ার বালক-বালিকারা তাঁব দৌহিত্রদিগকে মারিলে তাহাদের ঠাকুরমার সহিত তনু রায় হাত নাড়িয়া ঝগড়া করিতেন। —তাহার পর? বার বার "তাহার পর তাহার পর" করিলে চলিবে না। দেখিতে দেখিতে পুস্তকখানি বৃহৎ হইয়া পড়িয়াছে। ইহার মূল্য দেয় কে? তাহার ঠিক নাই, কাজেই তাড়াতাড়ি শেষ কবিতে বাধ্য হলাম। —তাহার পর কি হইল? তাহার পর আমার গল্পটি ফুরাইল। নোটে গাছটির কপালে যাহা লেখা ছিল, তাহা ঘটিল! সেই ঘটনা লইয়া কত অভিযোগ উপস্থিত হইল।

—o—

সোনা-করা জাদুগরের গল্প

আদিকথা

মন্ত্র পড়িয়া যাহারা কোন আশ্চর্য্য কাজ করিতে পারে, তাহাদিগকে জাদুগর বা গুণী লোক বলে। জাদুগর সত্য সত্য আছে কি না, সে কথায় এখন প্রয়োজন নাই। তবে যাহারা জাদুগর সাজিয়া বেড়ায়, তাহারা প্রায় অনেকেই জুয়াচোর, ফাঁকি দিয়া লোকেব নিকট হইতে তাহারা টাকা উপার্জ্জন করে। "সোনা করিয়া দিব"। এই কথা বলিয়া অনেক সন্ন্যাসী ও ফকীর লোককে প্রতারণা করে। কোন লোকের বাটী গিয়া তাহারা বলে, "তোমার ঘরে যত রূপার গহনা ও টাকা আছে, সে সমুদয় আমার নিকট আনয়ন করিলে মন্ত্রবলে ও দ্রব্যগুণে সেই রূপাকে আমি সোনা করিয়া দিব।" এক দিনে বড় মানুষ হইব,

এই লোভে গৃহস্বামী ঘরের সমস্ত রূপার দ্রব্য ও নগদ টাকা তাহাকে প্রদান করেন। অবশেষে সন্ন্যাসী সেই সমস্ত রূপার দ্রব্য লইয়া পলায়ন করে।

কিন্তু লোককে যাহারা প্রতারণা করে, কখন তাহাদের ভাল হয় না। অসৎ লোকদিগকে নিদারুণ কষ্ট ভোগ করিতে হয়। কখন একটিও মিথ্যা কথা বলিব না, যে কাজ মিথ্যা আমার বিশ্বাস, সে কাজ কখনই করিব না, কখন অসৎ কাজ করিব না,—বালককাল হইতে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে হয়। মিথ্যা কথা, মিথ্যা ব্যবহার,—ইতরের কাজ। মিথ্যাবাদী লোককে ভগবান্ নিদারুণ দণ্ডে দণ্ডিত করিয়া থাকেন।

মিথ্যাবাদী লোক কিরূপ ভগবানের কোপে পতিত হয়, তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ তোমাদের নিকট আজ আমি একটি গল্প করিব। গল্পটি সম্পূর্ণ সত্য যে লোকটির গল্প আমি করিব, অতি প্রখর বুদ্ধি ও নানা বিদ্যায় তাঁহার মন বিভূষিত ছিল; কিন্তু জীবনের প্রারম্ভে তিনি গুটিকত মিথ্যাকথা বলিয়াছিলেন। সে জন্য এত বুদ্ধি—এত বিদ্যা থাকিতেও, তাঁহার জীবনটি মাটী হইয়া গিয়াছিল! সমস্ত জীবন তাঁহাকে কষ্ট-ভোগ করিতে হইয়াছিল। যে দিন তাঁহার মৃত্যু হইল, কেবল সেই দিন তাঁহার দুঃখের শেষ হইল। পাছে মিথ্যা কথা মুখ দিয়া বাহির হয়, পাছে কোন কুকাজ করিয়া ফেলি, পাছে কোন নীচ চিন্তা মনে উদয় হয়, তাহার জন্য সর্ব্বদা সাবধান হইতে হয়।

কিসে টাকা হয়, সে জন্য সকলেই চেষ্টা করিয়া থাকে। সীসা ও পারাকে রূপা এবং লৌহ ও তামাকে সোনা করিতে পারা যায়, অনেক কাল হইতে লোকের মনে এইরূপ একটা বিশ্বাস আছে। এক পয়সার তামাকে সোনা করিতে পারিলে, অনায়াসে দশ টাকা লাভ হয়। অর্থোপার্জ্জনের ইহা অপেক্ষা সহজ উপায় আর কি হইতে পারে? সে জন্য তামাকে সোনা করিবার নিমিত্ত অতি প্রাচীনকাল হইতে লোকে চেষ্টা করিতেছে। সে কালে কত দেশে কত লোকে এই কাজে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল। যে বিদ্যা-বলে লোকে এই চেষ্টা করিত, সে কালে লোকে তাহাকে "আলকেমি" বলিত। "আলকেমি" বিদ্যা লইয়া লোকে কোথায় কি করিয়াছিল, সে কথা বলিতে গেলে একটি গল্প হয়; কিন্তু আজ সে গল্পটি করিব না। আজ তোমাদিগের নিকট আমি বটগার সাহেবের গল্প করিব। জীবনের প্রথম অবস্থায় 'আলকেমি" বিদ্যার চর্চা করিয়াছিলেন; অর্থাৎ তামাকে সোনা করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ২১৭ বৎসর পূর্ব্বে বটগার জর্ম্মণীদেশের অন্তর্গত প্রুশিয়া রাজ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১২ বৎসর বয়সে কাজ শিখিবার নিমিত্ত তিনি এক ডাক্তারখানায় নিযুক্ত হন। বাল্যকাল হইতেই রসায়নশাস্ত্রের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। এই সময়ে রসায়নশাস্ত্র ও "আলকেমি" একই বিদ্যা ছিল। অবসর পাইলেই বটগার "আলকেমি" বিদ্যার চর্চা করিতেন; অর্থাৎ নানা বস্তুর সংযোগে তামা, লৌহ প্রভৃতি নিকৃষ্ট ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেন। কয়েক বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত তিনি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। এবং দিনরাত্রি নানাবস্তু আগুনে গলাইতে লাগিলেন। বটগারের প্রখর বুদ্ধি ও অসাধারণ বিদ্যা দেখিয়া ডাক্তারখানার স্বামীও তাঁহাকে এ কাজে সহয়তা করিতে

লাগিলেন। কয়েক বৎসর পরে বটগার সকলকে বলিলেন যে,—"আমি তামাকে সোনা করিবার উপায় করিয়াছি।" বটগার সত্য বলিতেছেন, কি মিথ্যা বলিতেছেন, তাহা স্থির করিবার নিমিত্ত একদিন তাঁহার প্রভুর অর্থাৎ ডাক্তারখানার স্বামীর সম্মুখে পরীক্ষা হইল। কি উপায়ে, তাহা বলিতে পারা যায় না; কিন্তু বটগার প্রভুর সম্মুখে সোনা প্রস্তুত করিলেন। লোককে ফাঁকি দিবার নিমিত্ত সচরাচর সাধুগন এইরূপ একটা উপায় অবলম্বন করে। একটি ফাঁপা লৌহনির্ম্মিত নল লইতে হয়; নলের ভিতর কিছু সোনা রাখিয়া তাহার মুখ মোমের দ্বারা বন্ধ করিয়া দিতে হয়। নলটি এখন ছড়ির ন্যায় দেখায়। ঘৃত, গন্ধক প্রভৃতি নানারূপ বাজে দ্রব্য মুচিতে রাখিয়া মুচিটি আগুনে বসাইতে হয়। আগুনের তাপে মুচির দ্রব্য বার বার নাড়িতে হয়। যে মোমের দ্বারা নলের মুখ বন্ধ করা হইয়াছিল, আগুনের তাপে তাহা এখন গলিয়া যায়; সুতরাং নলের ভিতর যে সোনা ছিল, তাহা এখন বাহির হইয়া মুচির ভিতর গিয়া পড়ে। আগুনেব আরও প্রখর তাপে ঘৃত গন্ধক প্রভৃতি জ্বলিয়া যায়। ক্রমে মুচিতে সেই স্বর্ণ ব্যতীত আর কিছুই থাকে না। তখন সকলের নিশ্চয় বিশ্বাস হয় যে,—"হ্যাঁ! এই সাধু স্বর্ণ প্রস্তুত করিতে জানে বটে।"বটগার এই উপায়ে নিজের প্রভুকে ফাঁকি দিয়াছেন কিনা, তাহা বলিতে পারি না। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, তাঁহার ও উপস্থিত অন্যান্য ব্যক্তির সকলের মনে বিশ্বাস হইল যে, বটগার সত্য সত্যই সোনা প্রস্তুত করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

চারিদিকে জনরব হইল যে, অমুক ডাক্তারখানায় একজন লোক সোনা করিতে পারে! "সোনা-করা" লোককে দেখিবার নিমিত্ত ডাক্তারখানার সম্মুখে ভিড হইল। ক্রমে এই কথা প্রুশিয়া দেশের রাজার কানে উঠিল। তিনি বটগারকে ডাকিতে পাঠাইলেন। বটগার রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া এক খণ্ড সোনা নজর দিয়া বলিলেন,—"তামা হইতে এই স্বর্ণখণ্ড আমি প্রস্তুত করিয়াছি।" এই সময় নানা যুদ্ধে রাজার অনেক টাকা খরচ হইয়াছিল। তাঁহার ভাণ্ডার শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। টাকর বড় খাঁকতি! রাজার মনে আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি ভাবিলেন যে, এই লোকের দ্বারা যত ইচ্ছা, তত সোনা প্রস্তুত করিতে পারিব। কোন এক দুর্গম দুর্গের ভিতর আবদ্ধ থাকিয়া রাশি রাশি স্বর্ণ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত তিনি বটগারকে আদেশ করিলেন।

বটগার এখন অন্ধকার দেখিলেন। কেবল যে কেল্লার ভিতর কয়েদ থাকিতে হইবে, তাহা নহে। সোনা প্রস্তুত যে সব ফাঁকি, সে কথা জানিতে পারিলে রাজা ফাঁসী দিবেন, কি কি করিবেন, তাহা বলিতে পারা যায় না। সাক্ষণি (সাক্‌ষণি) দেশ অভিমুখে বটগার পলায়ন করিলেন। ক্রোধে অধীর হইয়া রাজা তাঁহাকে ধরিবার নিমিত্ত অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করিলেন। সাক্ষণি দেশের সীমায় দেশের অধিপতি তাঁহাকে রাজধানী ড্রেসডেন নগরে পাঠাইবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন, আর সেই সময় প্রুশিয়া দেশের সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। যাহা হউক, তাহারা তাঁহাকে ধরিতে পারিল না।

বিলাতে এখন কার্ণেজি নামক এক জন সাহেব আছেন। ইনি বাল্যকালে মজুরি করিয়া

দিনপাত করিতেন। তাহার পর বড় হইয়া আমেরিকা মহাদেশে লৌহ হইতে ইস্পাত প্রস্তুত করিয়া ইনি বিপুল সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়াছেন। সেই সম্পত্তি হইতে পঁচাত্তর কোটি টাকা, অঙ্কে লিখিলে এইরূপ হয়,—৭৫,০০,০০,০০০—দীন-দরিদ্রদিগের চিকিৎসার নিমিত্ত কোন হাঁসপাতালে তিনি দুই কোটি টাকা, দুঃখী ছাত্রদিগের বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত কোন হাঁসপাতালে তিনি দুই কোটি টাকা, দুঃখী ছাত্রদিগের বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত কোন অনাথাশ্রমে এক কোটি টাকা, সাধারণের জ্ঞানলাভের নিমিত্ত কোন পুস্তকাগারে এক কোটি টাকা, এইরূপ নানা স্থানে নানা প্রকার সৎকার্য্যের তিনি অনুষ্ঠান করিতেছেন। কার্ণেজির মত লোকের অর্থলাভের বাসনা পরিতৃপ্ত হইয়া থাকিবে তা না হইলে অর্থ লালসা-শূন্য লোক পৃথিবীতে অতি বিরল।

অর্থলাভের লালসা চিরকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। আর এ লালসা সহজে কেহ মন হইতে দূর করিতে পারে না। দুই শত বৎসর পূর্বে যিনি সাক্ষণি দেশের অধিপতি ছিলেন, তিনিই আবার পোলাণ্ড দেশের রাজা ছিলেন। রাজা হইলে কি হয়, তাঁহারও ঘোরতর টাকার খাঁক্‌তি ছিল। বিশেষতঃ এই সময়ে পোলাণ্ড দেশে বিদ্রোহানল প্রবলবেগে প্রজ্জ্বলিত ছিল। সেই বিদ্রোহানল নির্বাণ করিবার নিমিত্ত টাকার নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছিল। সুতরাং সাক্ষণাধিপতি যখন শুনিলেন যে, "সোনা-করা" বটগার প্রুশিয়া হইতে পলায়ন করিয়া, তাঁহারা আসিয়া এখানে আশ্রয় লইয়াছে, তখন আনন্দে তাঁহার মন প্রফুল্লিত হইল। তিনি মনে করিলেন যে, "আর ভাবনা নাই, এখন যত ইচ্ছা তত স্বর্ণ প্রস্তুত হইল। এইরূপ ভাবিয়া বটগারকে তিনি অতি সমাদরে রাজবাটীর নিকট বৃহৎ এক অট্টালিকায় স্থান প্রদান করিলেন, আর পঞ্চোপচারে তাঁহার সেবা করিবার নিমিত্ত রাজকর্ম্মচারী ও রাজ-ভৃত্যদিগকে আদেশ করিলেন।

নানারূপ সুখাদ্য ভোজনে ও মহমূল্য পরিচ্ছদ পরিধানে বটগারের সেবা হইতে লাগিল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে চারিদিকে পাহারাও নিযুক্ত হইল। বাটীর বাহিরে পাহারা, বাটীর ভিতরে পাহারা, শয়নঘরে পাহারা—রাত্রিদিন রক্ষকগণ বটগারকে চক্ষুর আড়াল করে না। বটগার ভাবিলেন যে, যে বিপদের ভয়ে স্বদেশ হইতে পলায়ন করিলাম, এখানেও সেই বিপদ।

ইতিমধ্যে বিদ্রোহদমনের নিমিত্ত সাক্ষণ-অধি-পতিকে সহসা পোলাণ্ড দেশে গমন করিতে হইল। যাইবার পূর্ব্বে বটগারের সহিত কথা-বার্ত্তা কহিতে তাঁহার অবকাশ হয় নাই। সে জন্য পোলাণ্ড দেশে উপস্থিত হইয়াই তিনি বটগারকে এক পত্র লিখিলেন,—"আমার টাকার নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। সোনা না করিলে আর চলে না। অতএব কি করিয়া সোনা করিতে হয়, তাহা তুমি আমাকে বলিয়া দাও।" সেই সঙ্গে রাজকর্ম্মচারী-দিগকেও রাজা আজ্ঞা করিলেন যে, "যতক্ষণ না বটগার আমার আদেশ প্রতিপালন করে, ততক্ষণ তাহাকে বিধিমতে উৎপীড়িত করিবে।" রাজ-কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা দিতে আরম্ভ করিল।

শেষ কথা

ঘোরতর উৎপীড়িত হইয়া অবশেষে বটগার রাঙ্গা রঙের আরকে পরিপূর্ণ একটি শিশি রাজ-কর্ম্মচারিদিগের হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন,—"রাজাকে তোমরা এই শিশিটি দিবে। তাঁহাকে বলিবে যে, তিনি যেন শুদ্ধদেহ ও পবিত্র মনে নির্জ্জন একটি গৃহে গমন করেন। তাহার ভিতর অগ্নি-র প্রজ্জ্বালিত করিয়া সেই অগ্নির উত্তাপে লৌহ তাম্র অথবা অন্য নিকৃষ্ট ধাতু গলাইয়া তাহার উপর দুই তিন ফোঁটা এই লাল আরক ফেলিয়া দিলেই, সে দ্রবীভূত ধাতু তৎক্ষণাৎ সুবর্ণে পরিণত হইবে।" এমন বহুমূল্যআরক যে-সে লোকের হাতে রাজার নিকট প্রেরণ করিতে পারা যায় না। সে জন্য রাজকুমার নিজে তাহা লইয়া চলিলেন। অশ্বমেধের ঘোড়ার সঙ্গে যেরূপ বহুসংখ্যক সৈন্য থাকিত, সেইরূপ এই শিশির সঙ্গেও অশ্বারোহী, পদাতি, তীরন্দাজ, গোলন্দাজ প্রভৃতি নানাবিধ সৈন্য প্রেরিত হইল। যথাসময়ে শিশি গিয়া রাজা ও রাজকুমার নির্জ্জন একটি গৃহে প্রবেশ করিলেন। ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া, প্রচণ্ড অগ্নির উত্তাপে পর্ব্বত-প্রমাণ তাম্ররাশি তাঁহারা দ্রবীভূত করিলেন। তাহার পর অতি সন্তর্পণে সেই দ্রবীভূত ধাতুরাশির উপর দুই চারি বিন্দু সেই লাল আরক ঢালিয়া দিলেন। কিন্তু হায়! সে তামার রাশি সোনা হইল না। যেমন তামা—তেমনি তামা রহিল। তামা কেন সোনা হইল না, রাজা তাহার কারণ বুঝিতে পারিলেন না। ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মনে হইল—"ও! মদ খাইয়া অপবিত্র আমোদ-প্রমোদে গত রাত্রি আমি অতিবাহিত করিয়াছিলাম। সেই জন্য আমার পরিশ্রম বিফল হইয়া থাকিবে।" এইরূপ চিন্তা করিয়া রাজা অনেক পূজা-পাঠ করিলেন এবং যথাবিধি শান্তি স্বস্ত্যয়ন করিবার নিমিত্ত পাদরীদিগের হস্তে ও অনেক টাকাকড়ি প্রদান করিলেন। পূজা-পাঠ ও যথাবিধি শান্তি স্বস্ত্যয়ন করিয়া যখন সব পাপ কাটিয়া গেল। তখন পুনরায় সেই "সোনা-করা" কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। পুনরায় আগুন জ্বালাইলেন, পুনরায় তাম্র গলাইলেন, পুনরায় তাহার উপর সেই আরক ঢালিয়া দিলেন।

কিন্তু হায়! এবারও সমুদয় পরিশ্রম বিফল হইল! তামা কিছুতেই সোনা হইল না। তামা তামাই রহিল। ক্রোধে রাজা অধীর হইলেন।

তিনি ভাবিলেন যে,—"বেটা সোনা করিতে জানে, কেবল দুষ্টামি করিয়া সে গুপ্তবিদ্যা আমার নিকট প্রকাশ করিতেছে না। ইহাকে যন্ত্রণা দিয়া সে গুপ্তবিদ্যা বাহির করিতে হইবে।" কথা বাহির করিবার নিমিত্ত সে কালে লোককে নিদারুণ যন্ত্রণা প্রদান করা হইত, সাঁড়াশী দ্বারা এক একটি করিয়া মুখ হইতে দন্ত উৎপাদিত করা হইত, সর্ব্বশরীরে আগুনের ছেঁকা দেওয়া হইত, কলে ফেলিয়া মড় মড় শব্দে শরীরের হাড় ভাঙ্গা হইত। অসহ্য যন্ত্রণায় হতজ্ঞান হইয়া নির্দ্দোষ লোকও স্বীকার করিত যে, আমি চোর বটে; নিরপরাধ বৃদ্ধা স্ত্রীলোকও বলিয়া ফেলিত যে, আমি ডাইনী বটে। এ দিকে রাজা রুষ্ট হইলেন, ও দিকে বটগারও বুঝিতে পারিলেন যে, আর তাঁহার এ রাজ্যে বাস করা উচিত নহে। কোনমতে প্রহরীদিগকে ফাঁকি দিয়া তিনি পলায়ন করিলেন। তিন দিন রাত্রি ক্রমাগত

দ্রুতবেগে ভ্রমণ করিয়া তিনি অষ্ট্রীয়া-রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

কিন্তু সাক্ষণ দেশীয় সৈন্যও উপস্থিত হইয়া নিশ্চিন্তমনে এক স্থানে রাত্রিকালে বটগার নিদ্রা যাইতেছিলেন। সেই স্থানে সাক্ষণ-সৈন্য তাঁহাকে ধৃত করিয়া পুনরায় ড্রেসডেন নগরে লইয়া আসিল। রাজার আজ্ঞায় এবার তাঁহাকে এক সুদৃঢ় কেল্লার ভিতর কয়েদীর ন্যায় আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল। এই স্থানে রাজা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে। নিতান্ত কোপাবিষ্ট হইয়া, কর্কশ বচনে রাজা তাঁহাকে বলিলেন,—"আমার ধনাগার শূন্য হইয়া আছে। দশ পল্টন সৈন্য অনেক দিন বেতন পায় নাই। সোনা তোমাকে নিশ্চয় প্রস্তুত করিতে হইবে। সোনা প্রস্তুত না করিলে আমি তোমাকে ফাঁসি দিব।"

প্রকৃত কথা এই যে, বটগার সোনা করিতে জানিতেন না! লোককে প্রতারণা করিবার উদ্দেশ্যে হউক, অথবা মান-সম্ভ্রমের জন্য হউক, তিনি মিথ্যা করিয়া বলিয়াছিলেন, যে. আমি সোনা করিতে জানি; সুতরাং রাজার জন্য তিনি সোনা প্রস্তুত কবিতে পারিলেন না। যাহা হউক, রাজা তাঁহাকে ফাঁসি দিলেন না, চোরের ন্যায় তাহাকে কয়েদ করিয়া রাখিলেন। এইরূপে কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। ইহার কিছু দিন পূর্ব্বে পোর্ত্তগাল দেশের লোক জাহাজে চড়িয়া ভারতবর্ষ, চীন জাপান প্রভৃতি দেশে আসিয়াছিল।

তাহার পর ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরেজ আসিয়াছিল। পূর্ব্ব অঞ্চল হইতে নানা দ্রব্য লইয়া এই সকল দেশের বণিক্‌গণ ব্যবসা করিতেছিল। চীন হইতে চীনের বাসন কেহ কেহ স্বদেশে লইয়া গিয়াছিল। উৎকৃষ্ট চীনের বাসন দেখিতে অতি সুন্দর। এক প্রকার সাদা রঙের মাটি লইয়া চীনের লোকে রেকাবি, বাটী প্রভৃতি বাসন প্রস্তুত করে। সেই বাসন লাল নীল প্রভৃতি নানা বর্ণের মসলা দ্বারা তাহারা অলঙ্কৃত করে ঃ তাহার পর সেই বাসন আগুনে পোড়াইলে মৃত্তিকা গলিয়া এক প্রকার অসচ্ছ কাচে পরিণত হয়। লাল নীল প্রভৃতি নানা বর্ণের অলঙ্কারে পরিশোভিত উজ্জ্বল মসৃণ শুভ্রবর্ণের বাসনগুলি দেখিতে অতি সুন্দর। জার্ম্মানি, হল্যাণ্ড, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে এই বাসন সোনা অপেক্ষা অধিক মূল্যে বিক্রীত হইতে লাগিল।

তাহা দেখিয়া বটগারের এক জন বন্ধু তাঁহাকে বলিলেন,—"বটগার! তুমি যে সোনা করিতে জান না, এখন সে কথা বলিলে কেহ বিশ্বাস করিবে না। রাজা মনে করিতেছে যে, তুমি সোনা করিতে জান, কেবল দুষ্টামি করিয়া তুমি সে বিদ্যা তাঁহার নিকট প্রকাশ করিতেছ না। তুমি রাজার কোপে পতিত হইয়াছ। চিরকাল তোমাকে বন্দী হইয়া থাকিতে হইবে। তুমি পণ্ডিত লোক। রসায়ন শাস্ত্র তুমি ভালরূপ অবগত আছ! তুমি এক কাজ কর।

চীন হইতে এখন যে মৃন্ময় বাসন আমদানী হইতেছে, তাহার মূল্য সোনা অপেক্ষা অধিক! তুমি সেই বাসন প্রস্তুত কর তাহা বেচিয়া রাজা অনেক টাকা পাইলে সন্তুষ্ট হইয়া কারাবাস হইতে তিনি মুক্ত করিয়া দিবেন!" বটগার বন্ধুর পরামর্শ মত কাজ করিলেন। নানারূপ মৃত্তিকা লইয়া তিনি পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজাও তাঁহাকে এ কার্য্যে সহায়তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার আদেশে নানাস্থান হইতে নানা বর্ণের নানা প্রকারের

মৃত্তিকা আসিতে লাগিল। সেই মৃত্তিকা দিয়া পাত্র নির্ম্মাণ করিয়া তাহাদিগকে আগুনে পোড়াইয়া, তিনি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন মৃত্তিকায় চীনের মত বাসন প্রস্তুত হইল না। মুচি প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত কোন স্থান হইতে এক প্রকার লোহিত বর্ণের মৃত্তিকা আনিয়াছিল। বটগার সেই মৃত্তিকা দ্বারা পাত্র নির্ম্মাণ করিয়া পোড়াইয়া দেখিলেন যে, তাহা হইতে লোহিত বর্ণের এক প্রকার চীনের বাসন প্রস্তুত হইতে পারে। বটগার সেইরূপ অনেক বাসন প্রস্তুত করিয়া রাজাকে প্রদান করিলেন। তাহা বিক্রয় করিয়া রাজা অনেক টাকা পাইলেন। কিন্তু প্রকৃত চীনে বাসন শুভ্রবর্ণের হইয়া থাকে। সাদা রঙের বাসন যত মূল্যে বিক্রীত হয়, এ লাল রঙের বাসন তত মূল্যে বিক্রয় হয় না।

সে জন্য বটগার সাদা রঙের বাসন প্রস্তুত করিতে ক্রমাগত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রাজার যাহাতে টাকা হয়, সে জন্য বটগার দিবারাত্রি ঘোরতর পরিশ্রম করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু রাজা তাঁহাকে কারাবাস হইতে মুক্ত করিলেন না। কত বিনয় করিয়া, কত খেদ করিয়া বটগার রাজাকে পত্র লিখিতে লাগিলেন। একখানি চিঠিতে তিনি এইরূপ লিখিয়াছিলেন,—“মহারাজ! আপনার কার্য্যে আমি প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি।

দিবারাত্রি আপনার জন্য পরিশ্রম করিতেছি। কোন পারিতোষিক আমি চাই না; আমি কেবল এই ভিক্ষা চাই যে, আর আমাকে পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া রাখিবেন না। আমাকে মুক্ত করিয়া দিন। আমাকে স্বাধীনতা প্রদান করুন। আমি আর পলায়ন করিব না। যত দিন দেহে আমার প্রাণ থাকিবে, ততদিন প্রাণপণে আমি আপনার জন্য পরিশ্রম করিব।” কিন্তু রাজা সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। দিবসে বটগার প্রহরিগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিতেন। রাত্রিকালে ঘরে তাঁহাকে চাবি দিয়া রাখা হইত।

যাহা হউক, বটগার শুভ্রবর্ণের চীনের বাসন প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নানারূপ মৃত্তিকা ও নানারূপ মশলা দ্বারা পরীক্ষা হইতে লাগিল। দিবা রাত্রি পরীক্ষা চলিতে লাগিল। পরীক্ষার বিরাম নাই। ক্রমাগত পরীক্ষা না করিলে নূতন বিষয় আবিষ্কার করিতে পারা যায় না। শত শত পরীক্ষা বিফল হইয়াও যদি একটি সফল হয়, তাহা হইলেও সৌভাগ্য বলিয়া মানিতে হয়। জার্ম্মাণি দেশের নানাস্থান হইতে যে সমুদয় মৃত্তিকা ও প্রস্তর প্রেরিত হইত, তাহাদিগকে পোড়াইয়া বটগার শুভ্রবর্ণের চীনের বাসন প্রস্তুত করিতে পারিলেন না।

বিলাত প্রভৃতি দেশের লোক এই সময় কোঁকড়া সুদীর্ঘ পরচুল পরিধান করিত। ইংরেজী ভাষায় ইহাকে Wig বলে। এক প্রকার শুভ্রবর্ণের মৃত্তিকাচূর্ণ মাখাইয়া এই পরচুলের শোভা আরও বৃদ্ধি করা হইত। প্রচলিত প্রথা অনুসারে বটগারও মাথায় পরচুল পরিধান করিতেন। এক দিন তাঁহার পরচুল মাথায় কিছু ভারি বোধ হইল। তিনি লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“আজ আমার পরচুল এত ভারি কেন? এক জন উত্তর করিল,—“আজ ইহার উপর এক প্রকার নূতন মৃত্তিকায় চূণ লেপন করা হইয়াছে।”

বটগার বলিলেন,—“কৈ, সে মাটী দেখি! সেই মৃত্তিকা দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন।

তিনি ভাবিলেন,—"হয় তো এক মৃত্তিকা দ্বারা পাত্র নির্ম্মাণ করিলে, শুভ্রবর্ণের চীনের বাসন প্রস্তুত হইবে। বস্তুতঃ তাহাই হইল। এই শুভ্র মৃত্তিকাকে কাওলিন (kaolin) বলে। আমাদের দেশে ইহা সাঁওতাল পরগণা, ভাগলপুর, মুঙ্গের প্রভৃতি জেলায় পাওয়া যায়। জার্ম্মাণি দেশের যে অংশ হইতে ইহা আসিয়াছিল, রাজা সেই স্থান হইতে এক মৃত্তিকা প্রচুর পরিমাণে আনাইলেন। চীনের বাসন প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত তিনি প্রকাণ্ড এক কারখানা স্থাপিত করিলেন। অন্যান্য দেশের রাজাদিগেব নিকট তিনি সংবাদ পাঠাইলেন যে,—"আমার নগরে উৎকৃষ্ট চীনের বাসন প্রস্তুত হইতেছে। এখন চীন হইতে আর সে বাসন আমদানী করিতে হইবে না।" ফল কথা, এই বাসন বেচিয়া রাজা সোনা করা অপেক্ষা অধিক লাভ মনে করিলেন। কি মৃত্তিকা দিয়া পাত্র প্রস্তুত করিতে হয়, কেবল তাহা জানিলে হয় না। পাত্রগুলি নানাবর্ণের অলঙ্কারে বিভূষিত করিবার নিমিত্ত নানা উপাদানের আবশ্যক। বটগার রসায়নবিদ্যা বলে, সেই সমুদয় মশলা আবিষ্কার করিলেন। বটগার আগাগোড়া সমুদয় কাজ করিতে লাগিলেন বটে; তাঁহার পরিশ্রমের ফলে রাজা বিপুল অর্থের অধীশ্বর হইলেন বটে; তথাপি তিনি তাঁহাকে কারখানায কোনরূপ উচ্চপদ প্রদান করিলেন না। বটগারকে রাজা ঠিক ক্রীতদাস কবিয়া রাখিলেন। স্বাধীনতার জন্য বটগার বিনয় বচনে কত বার প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু রাজা কিছুতেই তাঁহাকে স্বাধীনতা প্রদান করিলেন না। অবশেষে মনোদুঃখে বটগার মদ খাইতে আরম্ভ করিলেন। কিছু দিন দিবারাত্রি সুরাপান কবিয়া তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া গেল। কেবল মাত্র পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁহার পরলোক হইল। জীবনের প্রথম অবস্থায় বটগার যদি মিথ্যা কথা না বলিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, তাঁহার এরূপ দুর্গতি হইত না

ভানুমতী ও রুস্তম

প্রথম অধ্যায়– কুঁজো বর

সে কালে ইরাণদেশে এক রাজা ছিলেন। সেই রাজার ভানুমতী নামক এক কন্যা ব্যতীত অন্য সন্তান-সন্ততি ছিল না। বাজা ও রাণী ভানুমতীকে আপনাদিগের প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসিতেন। কেবল পিতা মাতা নহে, ভানুমতীর রূপে-গুণে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিল। দেশের সকল লোকেই ভানুমতীকে প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসিত।

ভানুমতী দিন দিন বাড়িতে লাগিল পদ্মের মুকুল প্রস্ফুটিত হইলে তাহার শোভার সমুদয় সরোবর যেমন আলোকিত হয় ও তাহার সৌরভে যেমন চারি দিক্ আমোদিত হয়, ভানুমতীর রূপে সেইরূপ সমুদয় ইরাণ রাজ্য যেন আলোকিত হইল এবং তাহার গুণের যশ সেইরূপ দেশ-বিদেশে বিস্তৃত হইল। কিন্তু তাহার বিবাহ দিতে রাজা বিলম্ব করিতে লাগিলেন। এক দিন রাজা, রাণীকে বলিলেন,—"দেখ রাণী! ভানুমতী আমাদের নয়নের পুতলি। প্রাণ অপেক্ষা তাহাকে আমরা ভালবাসি। এক মুহূর্ত্তের জন্য তাহাকে চক্ষের

অন্তরাল করিতে পারি না। বিবাহ দিলেই তাহাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইতে হইবে। তাহাকে তখন না দেখিয়া কি করিয়া আমরা বাঁচিব? ভানুমতী এখনও তেমন বড় হয় নাই। আরও কিছুদিন যাউক, তখন তাহার বিবাহের চেষ্টা করিব।"

কিন্তু দেশ-বিদেশের রাজা ও রাজপুত্রগণ সে কথা জানিত না। ভানুমতীর রূপগুণের কথা তাহারা সকলেই শুনিয়াছিল। ভানুমতীকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত সকলেই লালায়িত হইল। সেইরূপ প্রার্থনা করিয়া অনেক রাজা ও অনেক রাজপুত্র ভানুমতীর পিতার নিকট দূত পাঠাইল। কিন্তু ভানুমতীর পিতা কাহারও প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। দূতদিগকে তিনি বলিলেন যে,—"আমার মেয়ের এখনও বয়স হয় নাই! আরও বড় না হইলে আমি কন্যার বিবাহ দিব না।" এই কথা বলিয়া তিনি দূতদিগকে বিদায় করিলেন।

এই সময়ে নিশাপুর নামক দেশে এক জন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন; কিন্তু তিনি দেখিতে সুপুরুষ ছিলেন না। বয়সে তিনি বৃদ্ধ ছিলেন, তাঁহার মুখে সাত হাত লম্বা পাকা-দাড়ি ছিল। আর তাঁহার পিঠে বৃহৎ একটি কুঁজ ছিল।

রূপ ছিল না বটে; কিন্তু তাঁহার গুণ অনেক ছিল। যাহাকে গুণী অর্থাৎ জাদুগর বলে, তিনি তাই ছিলেন। তিনি নানারূপ মন্ত্র-তন্ত্র জানিতেন। সেই মন্ত্রবলে তিনি দিনকে রাত ও রাতকে দিন করিতে পারিতেন। মনুষ্যকে জন্তু করিতে পারিতেন ও জন্তুকে মানুষ করিতে পারিতেন। ভূত, প্রেত, দানা, দৈত্য, জিন, পরী সকলকে তিনি বশীভূত করিয়াছিলেন। তাঁহার ভয়ে ভূত প্রেত পরী সর্ব্বদাই সশঙ্কিত থাকিত।

ভানুমতীকে বিবাহ করিতে তাঁহার সাধ হইল। তিনি ভাবিলেন যে,—"আমার গায়ের রঙ কিছু ময়লা, ফুটফুটে গৌরবর্ণ নয় বটে, দাড়িটি সাত হাত লম্বা,—আর শণের ন্যায় পাকাও বটে। আর পিঠের মাঝখানে বড় একটি বিলাতি কুমড়ার ন্যায় কুঁজও আছে বটে,—কিন্তু তা হইলে কি হয়, ভানুমতীকে আমি অনেক গহনা দিব! গহনা পাইলে ভানুমতীর পিতা-মাতা ভুলিয়া যাইবে, ভানুমতীও আমাকে ভালবাসিবে। সংসারের নিয়ম এই।"এইরূপ মনে করিয়া ভানুমতীর পিতার নিকট তিনি দূত পাঠাইলেন। যেমন ভানুমতীর রূপগুণের সুখ্যাতি দেশ-বিদেশে প্রচারিত হইয়াছিল, সেইরূপ নিশাপুরের কুঁজো রাজার সুখ্যাতিও দেশ-বিদেশে প্রচার হইয়াছিল। ইরাণরাজ-সভায় যখন তাঁহার দূত আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন ভানুমতীর পিতার প্রথম অতিশয় রাগ হইল। তিনি ভাবিলেন,—"বেটার একবার আস্পর্দ্ধা দেখ! বামন হইয়া চাঁদে হাত! বেটার রূপ দেখিলে আমাদের ভয় হয়। কোন্ সাহসে সে ভানুমতীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিল?"

প্রথমে রাজা এইরূপ ভাবিলেন বটে; কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার বড় ভয় হইল। কুঁজো রাজা কিরূপ তন্ত্র-মন্ত্র জানিত, ভানুমতীর পিতা তাহা জানিতেন। পাছে রাগিয়া ভানুমতীর কোন মন্দ করে, তাঁহার সেই ভয় হইল। কিন্তু এরূপ কুৎসিত কদাকার দুষ্টলোকের সহিত ভানুমতীর হেন কন্যার তিনি কি করিয়া বিবাহ দিবেন? সে প্রস্তাবে তিনি কিছুতেই সম্মত হইতে পারিলেন না। অন্যান্য রাজ দূতকে তিনি, যে কথা বলিয়াছিলেন, নিশাপুরের দূতকেও তিনি সেই কথা বলিলেন। তাহা ছাড়া তাহাকে অনেক বহুমূল্য উপঢৌকন দিয়া

মধুর বচনে বিদায় করিলেন।

দূত যখন নিশাপুরে প্রত্যাগমন করিয়া কুঁজো রাজাকে সকল কথা বলিল, তখন ক্রোধে তিনি জ্বলিযা উঠিলেন। তিনি বলিলেন,—"আমি এমন সুপাত্র, তথাপি আমার সহিত ভানুমতীর বিবাহ দিবে না? আচ্ছা, আমি তাহাদিগকে খুব জব্দ করিব।"

এইরূপ ভাবিয়া কুঁজো রাজা আপনার গুরুর নিকট গমন করিলেন। নিবিড় বনের ভিতর মন্ত্রবলে বৃহৎ একটি কেল্লা নির্ম্মাণ করিয়া গুরু তাহার ভিতর বাস করেন। গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া কুঁজো রাজা বলিলেন,—"মহাশয়! ইরাণের রাজা আমায় বড় অপমান করিয়াছে। ভানুমতী নামে তাহার এক কন্যা আছে। তাহাকে আমি বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু আমার পিঠে কুঁজ ও মুখে সাত হাত পাকা দাড়ি আছে বলিয়া সে আমার কথায় সম্মত হয় নাই। ইরাণের রাজাকে দণ্ড দিতে হইবে। কিন্তু ভানুমতীকে আমি বধ করিতে ইচ্ছা করি না, যেমন করিয়া পারি, তাহাকে আমি বিবাহ করিব। এক্ষণে কি উপায়ে তাহাদিগকে আমি জব্দ করিতে পারি, তাহা আমাকে বলিয়া দিন।"

গুরু হাসিয়া বলিলেন,—"তাহার ভাবনা কি! এই তুমি অঙ্গুরীটি লইয়া যাও। কোনরূপে ভানুমতীকে এই আঙটীটি দিবে। ভানুমতী নিজের অঙ্গুলিতে এই অঙ্গুরী পবিধান করিলে প্রাণে মরিবে না; কিন্তু বিলক্ষণ তামাসা হইবে! তাহাতে রাজা রাণী সকলেই দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িবে। তখন ভানুমতীকে ভাল করিবার নিমিত্ত তাহার বাপ-মা পায়ে ধরিয়া তোমার সহিত বিবাহ দিবে।"

আঙটী লইয়া কুঁজো রাজা নগরে প্রত্যাগমন কবিলেন। সেস্থানে আসিয়া তিনি সহরের প্রধান জহুরীকে ডাকিতে পাঠাইলেন। জহুরী আসিযা উপস্থিত হইলে তিনি তাহাকে বলিলেন,—"রাজভাণ্ডার হইতে তোমাকে আমি অনেক মণি মুক্তা ও বহুমূল্য আভরণ প্রদান করিতেছি। সে সকল লইয়া তুমি ইরাণ দেশে গমন কর। ইরাণ রাজার বাড়ীতে গিয়া সেই সকল দ্রব্য তুমি অতি অল্প মূল্যে বিক্রয় কবিবে। কিন্তু আর যাহা বিক্রয় কর আর নাই কর, রাজকন্যা যাহাতে এই আঙটী নিজের হাতে পরিধান করে, তুমি সেই উপায় করিবে। রাজকন্যাকে যদি তুমি আঙটী পরাইতে না পার, তাহা হইলে আমি তোমার পরিবারবর্গের মাথা কাটিয়া ফেলিব।"

এই কথা বলিয়া কুঁজো রাজা তাহাকে সেই অঙ্গুরী ও রাজ-ভাণ্ডার হইতে অনেক মণি-মুক্তা ও নানারূপ অলঙ্কার প্রদান করিলেন। সেই সমুদয় লইয়া ভয়ে ভয়ে জহুরী ইরাণ দেশে গিয়া উপস্থিত হইল। ইরাণ নগরে উপস্থিত হইয়া প্রথম সে সাধারণ লোককে সেই সমুদয় বহুমূল্য প্রস্তর ও গহনা অতি অল্প মূল্যে বিক্রয় করিতে লাগিল। তাহাতে ক্রমে চারিদিকে জনরব হইল যে, কোন দেশ হইতে এক জহুরী আসিয়া অতি অল্প মূল্যে বহুমূল্য দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতেছে। সেই কথা ক্রমে রাজমন্ত্রিগণের কানে উঠিল। রাজমন্ত্রিগণ তাহার নিকট হইতে অনেক দ্রব্য ক্রয় করিলে। রাজাও ক্রমে তাহার কথা শুনিলেন। জহুরীকে রাজা ডাকিতে পাঠাইলেন। এইবার জহুরী সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম উত্তম হীরা মাণিক মুক্তা বাহির

করিয়া রাজাকে দেখাইল। রাজা তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। এরূপ উৎকৃষ্ট প্রস্তরাদি রাজ-ভাণ্ডারে ছিল না। তিনি নিজে অনেক দ্রব্য ক্রয় করিয়া জহুরীকে অন্তঃপুরে রাণী ও ভানুমতীর নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। রাণী ও ভানুমতী তাহার নিকট হইতে অনেক অলঙ্কার ক্রয় করিলেন। সকলের শেষে জহুরী সেই আঙটী বাহির করিলেন। বহুমূল্য হীরক-সম্বলিত সেই আঙটীর গঠন ও চাকচিক্য দর্শন করিয়া ভানুমতী ঘোরতর আশ্চর্য হইলেন। শত মুখে সেই অঙ্গুরীর প্রশংসা করিয়া তাহার মূল্য জিজ্ঞাসা করিলেন জহুরী উত্তর করিল,—"এ আঙটীব মূল্য নাই। আপনি রাজকন্যা, আপনি যদি এই আঙটী নিজের হাতে পরিধান করেন, তাহা হইলেই আমি কৃতার্থ হইব।" জহুরীকে নানারূপ পারিতোষিক প্রদান করিয়া রাজ-কন্যা সেই অঙ্গুরী লইয়া আপনার হাতে পরিধান করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়– নরমুণ্ডের হাসি

পরদিন প্রাতঃকালে রাজবাড়ীতে কোলাহল পড়িয়া গেল। রাজা ও রাণী ঘোর শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। নগরে চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গেল। তাহার কারণ এই যে, সকাল বেলা উঠিয়া সকলে দেখিল যে, রাজকন্যা ভানুমতীর কেবল মুখখানি ব্যতীত সর্ব্বশরীর খড়ের হইয়া গিয়াছে। ঠাকুর গড়িবার সময় লোকে যেরূপ প্রথম খড় দিয়া ঠাকুরের কাঠামো করিয়া লয়, ভানুমতীর হাত পা বক্ষঃস্থল প্রভৃতি সমুদয় শরীর সেইরূপ খড়ের হইয়া গিয়াছে। ভানুমতীর মুখখানি কেবল রক্তমাংসের ছিল। সেই মুখ দিয়া ভানুমতী কথা কহিত ও খাইতে পারিত। খড়ের হাত-পা দিয়াও সে বিছানার উপর উঠিতে বসিতে পারিত, কিন্তু চলিতে ফিরিতে পারিত না।

রাজা ও রাণী কাঁদিতে লাগিলেন; কিন্তু কাঁদিলে আর কি হইবে! ডাক্তাব-বৈদ্য আনিয়া ভানুমতীর যথাবিধি চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। ডাক্তারেরা ঝালেমেল ও বৈদ্যগণ মহাদেব-চূর্ণ পর্যন্ত ব্যবস্থা করিলেন, তথাপি কোনরূপ উপকার হইল না। ভানুমতীর শরীর যে খড়ের, সেই খড়ের রহিয়া গেল। বৈদ্যগণ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নাড়ী টিপিয়া দেখিলেন; কিন্তু কি জন্য ভানুমতীর শবীর খড়ের হইয়া গিয়াছে, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিলেন না। অবশেষে রাজা গুণিগণকে আনিয়া ভানুমতীর চিকিৎসা করাইলেন। গুণিগণ অনেক ঝাড়ান-কাড়ান করিল, ভানুমতীর শরীরে শত শত ফুৎকার দিল; তথাপি কিছুমাত্র উপকার হইল না। তাহার পর যাহারা ভূত নামাইতে জানে, রাজা তাহাদিগকে আনিয়া ভূত নামাইলেন। অন্ধকার ঘরে ভূতগণ দুপ-দাপ করিতে লাগিল, দুই সের দুধ ও তিন সের সন্দেশ খাইয়া ফেলিল, নাকে কথা বলিয়া অনেক জটিবুড়ীর নাম করিল। কিন্তু তাহাতেও কোন উপকার হইল না, ভানুমতীর শরীর যে খড়ের, সেই খড়ের রহিয়া গেল। নিতান্ত নিরুপায় হইয়া রাজা শেষে আপনার রাজ্যের ভিতরসোনার চেঙড়া ফিরাইয়া দিলেন। সোনার চেঙড়া লইয়া রাজার লোকগণ নানা নগরে ও নানা গ্রামে ফিরিতে লাগিল, আর তাহার সহিত যে ঢুলি ছিল, সে এই বলিয়া ঢেট্‌রা দিতে লাগিল,—"রাজকন্যা ভানুমতীর মুখব্যতীত সর্ব্বশরীর খড়ের হইয়া গিয়াছে। যে রাজকন্যাকে ভাল করিতে পারিবে, রাজা

তাহাকে অর্দ্ধেক রাজ্য দিবেন ও রাজকন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিবেন, ঢ্যাং, ঢ্যাং, ঢ্যাং।"

সোনার চেঙড়ার সহিত রাজার ঢেট্‌রা গ্রামে গ্রামে ফিরিতে লাগিল। কিন্তু সে সোনার চেঙড়া কেহই ধরিতে সাহস করিল না। মানুষের শরীর যদি সহসা খড় হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে সুস্থ করা বড় সহজ কথা নহে। অর্দ্ধেক রাজ্য ও রাজকন্যা পাইবার লোভ অনেকের হইল বটে; কিন্তু এ রোগের কথা পুঁথিতে লেখা নাই, ইহার ঔষধের নামও কেতাবে লেখা নাই।

ইরাণ দেশের লোক এখন সকলেই মুসলমান হইয়াছে। কিন্তু সে কালে এ স্থানের লোকে সূর্য্য ও অগ্নিকে পূজা করিত। সে কালে এ দেশে অনেক ব্রাহ্মণেরও বাস ছিল। ইরাণ দেশের কোন গ্রামে এই সময় এক ব্রাহ্মণী বাস করিতেন। এক শিশু পুত্র রাখিয়া তাঁহার পতির মৃত্যু হইয়াছিল। বিধবা অতি কষ্টে সেই পুত্রটিকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। সে শিশুটির নাম ছিল রুস্তম। এক্ষণে সেই পুত্র যৌবনকালে পদার্পণ করিয়াছে, তাহার বয়ঃক্রম আঠার বৎসর হইয়াছে। কিন্তু এখনও সে অর্থোপার্জ্জন করিতে পারে নাই। সুতরাং মাতা ও পুত্রের অতি কষ্টে দিনাতিপাত হইতেছিল। মাঝে মাঝে সর্ব্বদাই তাহাদিগকে উপবাস করিয়া দিনযাপন করিতে হইত।

এইরূপ একদিন তাঁহাদের ঘরে অন্ন ছিল না। মাতা-পুত্র সে দিন উপবাস করিয়া রহিলেন। নিজের যত কষ্ট হউক আর না হউক, বৃদ্ধা মাতার কষ্ট দেখিয়া রুস্তম অতিশয় কাতর হইলেন। পরদিন প্রাতঃকালে তিনি আপনার মাতাকে বলিলেন,—"মা! বিদেশে গিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবার নিমিত্ত আমি বার বার তোমার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছি। কিন্তু তুমি আমাকে সে অনুমতি প্রদান কর নাই। কিন্তু মা! তোমার কষ্ট আমি আর দেখিতে পারি না! বৃদ্ধা মাতাকে প্রতিপালন করা পুত্রের কর্ত্তব্য। তাহা যদি আমি না করি, তাহা হইলে অধর্ম্মে পতিত হইব, সকলে আমাকে কাপুরুষ নরাধম বলিয়া জানিবে। এক্ষণে বিদেশে গিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে মা, তুমি আমাকে অনুমতি প্রদান কর। অনেক টাকা লইয়া শীঘ্রই আমি ঘরে ফিরিয়া আসিব। তখন দুই জনে সুখে স্বচ্ছন্দে চিরকাল দিন যাপন করিব।"

মা প্রথম সে কথা শুনিয়া প্রাণসম পুত্রকে বিদেশে পাঠাইয়া কি করিয়া তিনি প্রাণ ধরিবেন, তাহাই ভাবিয়া তিনি আকুল হইলেন! কিন্তু পুত্রের বিনয়বাক্যে অবশেষে তাঁহাকে সম্মত হইতে হইল। কাঁদিতে কাঁদিতে রুস্তমকে তিনি বিদায় করিলেন।

এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট রুস্তম বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। প্রাচীন জেণ্ড ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত নানা শাস্ত্র তিনি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। শরীরেও তাঁহার অপরিমিত বল ছিল। সেই জন্য প্রতিবাসিগণের অনুরোধে মাতা তাহার নাম রুস্তম রাখিয়াছিলেন। বাঞ্জ নামক এক প্রকার বৃক্ষের শাখা কাটিয়া তিনি মোটা এক ছড়ি প্রস্তুত করিলেন। সেই ছড়ি গাছটি হাতে করিয়া তিনি পথ চলিতে লাগিলেন। রাজধানীতে নানারূপ অর্থোপার্জ্জনের উপায় আছে। সে নিমিত্ত তিনি রাজধানী অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

পথ চলিতে চলিতে তিনি গ্রামের নিকট এক মাঠের মাঝখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন যে, সে স্থানে কৃষক একটি গাভীকে নিদারুণ ভাবে প্রহার করিতেছে। গাভী তাহার ক্ষেত্রে গিয়া কিছু শস্য খাইয়াছিল। এই অপরাধে দুর্ব্বৃত্ত সেই গাভীকে বাঁধিয়া অতি নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করিতেছিল। নিগড়বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া গাভী পলাইতে পারিতেছিল না। প্রহারের যাতনায় তাহার দুই চক্ষু দিয়া দর দর ধারার অশ্রুধারা বিগলিত হইতেছিল। সেই সময় একটি কাক সেই কৃষকের একবার এ দিকে একবার ও দিকে উড়িয়া তাহাকে ঠোকরাইতে চেষ্টা করিতেছিল। গাভীর ক্লেশ দেখিয়া কাক হেন পক্ষীর হৃদয় ব্যথিত হইয়াছিল; কিন্তু দুর্বৃত্ত কৃষকের হৃদয় ব্যথিত হয় নাই।

গাভীর যাতনা দেখিয়া রুস্তম দ্রুত বেগে কৃষকের নিকট অগ্রসর হইলেন ও গরুকে আর মারিতে নিষেধ করিলেন। কৃষক রুস্তমকে গালি দিয়া গরুকে আরও অধিক নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করিতে লাগিল। রুস্তম আর ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিলেন না। সম্মুখে মাটীর উপর গোলাকার প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় কি পড়িয়া ছিল। রুস্তম সেই বস্তু তুলিয়া লইলেন ও তাহা দিয়া কৃষককে ছুঁড়িয়া মারিলেন। কৃষকের গায়ে তাহা লাগিল না, তথাপি সহসা সে ঘোরতর ভীত হইল। ভয়ে তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল চক্ষুকোটর হইতে তাহার চক্ষু দুইটি যেন বাহির হইবার উপক্রম হইল। বিকট চীৎকার করিয়া সে রুদ্ধশ্বাসে সে স্থান হইতে পলায়ন করিল। রুস্তম আশ্চর্য্য হইল কি জন্যে কৃষক এত ভীত হইল, তাহার কারণ তিনি বুঝিতে পারিলেন না। যে স্থানে গোলাকার প্রস্তরখণ্ডটি পড়িয়াছিল, সেই স্থানে গিয়া তিনি দেখিলেন যে তাহা প্রকৃত প্রস্তরখণ্ড নহে। তাহা নরমুণ্ড। রুস্তমকে দেখিয়া সেই নরমুণ্ড দুই পাটি ভীষণ দন্ত বাহির করিয়া খল খল শব্দে হাসিয়া উঠিল।

তৃতীয় অধ্যায়— সাদি ও তারা

যাহাকে ঢিল মনে করিয়াছিলেন, তাহা মানুষের মাথা হইল দেখিয়া রুস্তম বিস্মিত হইলেন। মুণ্ডের হাসি দেখিয়া রুস্তম আরও বিস্মিত হইলেন। অবশেষে তাহার কথা শুনিয়া রুস্তম আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

মুণ্ড বলিল,—"বেটা কৃষক যেমন গরুর উপর অত্যাচার করিতেছিল, আমি তেমনি তাহাকে দণ্ড দিয়াছি। আমার বিকট মূর্ত্তি দেখিয়া বেটা হতজ্ঞান হইয়া গিয়াছে। আর সে এমন কাজ কখন করিবে না। কিন্তু আমি এস্থানে না থাকিলে তোমার দশা কি হইত? দুষ্ট কৃষক তোমাকে হয় তো মারিয়া ফেলিত।

হাতের লাঠি গাছটি ঘুরাইয়া রুস্তম উত্তর করিল,—"আমাকে সে মারিয়া ফেলিত, এক লাঠির ঘায়ে আমি তাহার মাথা ভাঙ্গিয়া ফেলিতাম। কিন্তু সে যাহা হউক, তুমি কে? রক্তমাংসহীন কাটা মুণ্ড যে কথা কয়, তাহা আমি জানিতাম না।"

মুণ্ড উত্তর করিল,—"আমি এক রাজার পুত্র, আর যে কাক কৃষককে ঠোকরাইতেছিল, সে আমার ছোট ভগিনী। আমাদের কাকা তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বধ করিয়া মন্ত্রবলে

আমাকে ও আমার ছোট ভগিনীকে কাক করিয়া রাখিয়াছেন। সমস্ত দিন আমরা এইরূপ হইয়া থাকি, কিন্তু রাত্রি হইলেই আমরা দুই জনেই পুনরায় মানুষ হই।"

রুস্তম জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কোন্ দেশের রাজপুত্র,তোমাদের কাকার নাম কি?"

মুণ্ড উত্তর করিল,—"আমার পিতা নিশাপুরের রাজা ছিলেন। তাঁহাকে মারিয়া আমাদের কাকা সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন, আর আমাদিগকে এইরূপ করিয়া রাখিয়াছেন। নিশাপুরের কুঁজো রাজার কথা তুমি বোধ হয় শুনিয়া থাকিবে। তিনিই আমাদের খুল্লতাত।

রুস্তম জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমাদিগকে উদ্ধার করিবার কোন উপায় নাই?"

মুণ্ড উত্তর করিলেন,—কৃষক যখন নিষ্ঠুর ভাবে গাভীকে প্রহার করিতেছিল, তখন ঢিল মন্ত্রে, করিয়া, আমাকে লইয়া তুমি তাহার প্রতি নিক্ষেপ করিযাছিলে। তাহার জন্য তোমার আমার ও আমার ভগিনীর অনেক পুণ্য হইয়াছে। সেই পুণ্যফলে তোমার মঙ্গল হইবে ও আমাদেরও উদ্ধার হইবে!"

রুস্তম জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমি অতি দরিদ্র ও কাপুরুষ। একমাত্র মাতাকেও আমি প্রতিপালন করিতে পারি না। কি করিয়া আমার মঙ্গল হইবে? আর কি উপায়ে বা তোমাদের উদ্ধার হইবে!"

মুণ্ড উত্তর করিল,—"এই দেশের রাজকন্যাব নাম ভানুমতী। ভানুমতীর দেহকে আমাদের কাকা যাদুবলে খড়ের কবিয়াছেন। ইরাণ দেশের রাজা সোনার চেঙ্ড়া বাহির করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, যে ভানুমতীকে ভাল করিতে পারিবে, তাহাকে তিনি অর্দ্ধেক রাজত্ব প্রদান করিবেন ও তাহার সহিত ভানুমতীর বিবাহ দিবেন। তুমি গিয়া সোনার চেঙড়া ধর। তাহার পর সন্ধ্যা বেলা পুনরায় আমার নিকট আসিবে। ভানুমতী কি উপায়ে সুস্থ হইবে, তখন তোমাকে আমরা বলিয়া দিব।"

মুণ্ডের নিকট হইতে বিদায় লইয়া রুস্তম পুনরায় পথ চলিতে লাগিলেন। কিছু দূর গিয়া তিনি এক গ্রামে উপস্থিত হইলেন। তখন সেই গ্রামে সোনার চেঙড়া ও ঢেঁটরা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। ঢুলি উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছিল—"রাজকন্যা ভানুমতীর শরীর খড়ের হইয়া গিয়াছে। যে তাহাকে ভাল করিতে পারিবে, রাজা তাহাকে অর্দ্ধেক রাজ্য দিবেন ও রাজকন্যার সহিত বিবাহ দিবেন।"

রাস্তায় লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। ছেলে-বুড়ো সকলেই সেই ঢেট্‌রার কথা হাঁ করিয়া শুনিতেছিল; কেহই সোনার চেঙড়া ধরিতে সাহস করিতেছিল না। ভিড় ঠেলিয়া রুস্তম অগ্রসর হইয়া সেই সোনার চেঙডা ধরিলেন। সকল লোক আশ্চর্য্য হইল। অল্পবয়স্ক ব্রাহ্মণকুমার রাজকন্যাকে কিরূপে ভাল করিবে, এই কথা ভাবিয়া সকলে বিস্মিত হইল।

রাজার সেনাগণ রুস্তমকে তৎক্ষণাৎ দ্রুতগামী অশ্বের পৃষ্ঠে বসাইয়া তাঁহাকে রাজ-সভায় লইয়া গেল। রুস্তমের রূপ দেখিয়া রাজা মনে করিলেন যে,—"যুবক আমার জামাতা হইবার উপযুক্ত বটে; কিন্তু কি করিয়া এ আমার কন্যাকে ভাল করিবে!" তাহার

পর রাজা প্রকাশ্যভাবে রুস্তমকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি আমার কন্যাকে ভাল করিবে? তুমি জান যে, বড় বড় হাকিম, বৈদ্য, রোজা প্রভৃতি কেহ তাহাকে সুস্থ করিতে পারে নাই?

রুস্তম উত্তর করিলেন,—"আজ্ঞে হাঁ, আমি রাজকন্যাকে নিশ্চয় ভাল করিতে পারিব।"-রাজা বলিলেন,—"যদি তুমি তাহাকে ভাল করিতে পার, তাহার সহিত তোমার বিবাহ দিব, আর আমি এই রাজ্যের অর্দ্ধেক তোমাকে প্রদান করিব। কিন্তু যদি ভাল করিতে না পার, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিও যে, তোমার মাথা আমি কাটিয়া ফেলিব।"

রুস্তম বলিলেন,—"যে আজ্ঞা! রাজকন্যাকে যদি ভাল করিতে না পারি, তাহা, হইলে আপনার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই করিবেন। এক্ষণে অনুমতি করুন যে, রাজকন্যার নিমিত্ত আমি ঔষধ আনিতে গমন করি।"

রাজা অনুমতি প্রদান করিলেন। রজাসভা হইতে প্রস্থান করিয়া রুস্তম পুনরায় পথ চলিতে লাগিলেন! যে স্থানে কৃষক গরুকে প্রহার করিতেছিল ও যে স্থানে নরমুণ্ড ও কাকের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল সন্ধ্যার পূর্ব্বে রুস্তম সেই প্রান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে আসিয়া তিনি দেখিলেন যে, মুণ্ডটি এক গর্ত্তের ভিতর পড়িয়া আছে ও কাক নিকটস্থ এক বৃক্ষ-শাখায় বসিয়া আছে। সন্ধ্যা হইলে রাজপুত্র ও রাজকন্যা মানবদেহ প্রাপ্ত হইবে, সেই প্রতীক্ষায় রুস্তম সেই স্থানে বসিয়া রহিলেন।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। যেই অন্ধকার হইল, আর সেই সময়ে ষোড়শবর্ষীয় এক বালক ও দশম বর্ষীয়া এক বালিকা সহসা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। অন্ধকারে রুস্তম তাহাদিগকে ভালরূপ দেখিতে পাইলেন না; কিন্তু যাহা দেখিতে পাইলেন, তাহাতেই রুস্তমের মন মোহিত হইয়া গেল। তিনি ভাবিলেন যে,—ইহারা প্রকৃতই রাজপুত্রও রাজকন্যা বটে, সাধারণের ঘরে এমন লাবণ্য হয় না। আচ্ছা! কোন্ প্রাণে কাকা ইহাদের প্রতি এরূপ অত্যাচার করিয়াছে?

ভাই ভগিনী দুইজনে রুস্তমের পার্শ্বে বসিল। রাজপুত্র বলিল,—"এই দেখ, পুনরায় আমরা মানুষ হইয়াছি। ঈশ্বরের কৃপায় তোমার সহিত আমাদের মিলন হইয়াছে। তোমার সহায়তায় আমাদের উদ্ধার হইবে। আমার নাম সাদি আর আমার ভগিনীর নাম সিতারা অর্থাৎ তারা। রাজকন্যার শরীর কি জন্য খড়ের হইয়াছে, আর কি উপায়ে সে আরোগ্য লাভ করিবে, আমি তাহা বলিতে পারি না। দাইয়ের নিকট হইতে তারা কিছু জাদু-বিদ্যা শিখিয়াছিল। তারা তোমাকে বলিয়া দিতে পারিবে।

চতুর্থ অধ্যায়— দ্বিতীয় অঙ্গুরী

রুস্তম, বালিকা তারার মুখপানে চাহিলেন। তারা বলিল,—"তুমি চলিয়া গেলে আমি নিশাপুরে উড়িয়া গিয়াছিলাম। সে স্থানে গিয়া আমি সকল কথা অবগত হইয়াছি। কাকা ভানুমতীকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন, ভানুমতীর পিতা সে কথায় সম্মত হয় নাই। সেই রাগে গুরুর সহায়তায় কাকা তাহার শরীর খড়ের করিয়াছেন। একমাত্র কাকার গুরু

তাহাকে ভাল করিতে পারিবেন।" —রুস্তম জিজ্ঞাসা করিলেন,—"গুরুর দেখা আমি কোথায় পাইব? তাহার পর গুরু আমার কথা শুনিবে কেন?"

তারা বলিল,—"তুমি প্রথম নিশাপুরে গমন কর। সেই নগরের আটটি দ্বার আছে। উত্তর দিকের দ্বারের নাম সমরখণ্ড-দ্বার। সেই দ্বারের বাহিরে বৃহৎ এক কেলু গাছ আছে। সেই কেলু গাছের মূলের নিকট তুমি অল্প খনন করিলে সুতীক্ষ্ণ এক খড়্গ পাইবে। সেই খড়্গ আমাদের পিতার, তাহার নাম শম্শের। নিশাপুর হইতে কিছু দূরে এক নিবিড় বন আছে। বনের ভিতর দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া গুরু তাহার ভিতর বাস করিতেছে। দুর্গের দ্বারে উপস্থিত হইয়া শমশের দ্বারা তুমি আঘাত করিবে। তখন দ্বারা আপনা-আপনি খুলিয়া যাইবে। তাহার পর তুমি সেই দুব্বৃত্ত ওস্তাদ অর্থাৎ গুরুর নিকট উপস্থিত হইবে। শমশের খড়্গ তোমার হাতে থাকিলে, সে তোমার অনিষ্ট করিতে পারিবে না। শমশের তলোয়ারকে তোমার হাতে দেখিলেই সে ভয়ে জড় সড় হইবে। ভানুমতীকে ভাল করিবার উপায় তখন তাহাকে তুমি জিজ্ঞাসা করিবে; না বলিলে শমশের দ্বারা তুমি তাহার গলা কাটিতে যাইবে।" —এইরূপে নানা প্রকার উপদেশ প্রদান করিয় রাজপুত্র সাদি ও রজকন্যা তারা রুস্তমকে বিদায় করিলেন; নগরের উত্তর দ্বারের বাহিরে তিনি সেই বৃহৎ বহুমূল্য হীরা-মাণিক-জড়িত কোফতাগিতি কারুকার্য্যে শোভিত সুতীক্ষ্ণ এক খড়্গ বাহিব হইয়া পড়িল। উত্তর মুখে ক্রমাগত পথ চলিয়া দুইদিন পবে তিনি এক গভীর কানন দেখিতে পাইলেন। নির্ভয়ে বনের ভিতর প্রবেশ করিয়া তিনি ক্রমাগত অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অনেক দূর গিয়া বনের ভিতর এক সুদৃঢ় দুর্গ তাঁহার নয়নগোচর হইল। দুর্গের প্রাচীর আকাশে গিয়া ঠেকিয়াছিল। এই সময়ে বনের চারিদিকে অতি ভয়াবহ শব্দ হইতে লাগিল। বনের বৃক্ষগণ সকলেই যেন উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল,—"ধর ধর, মার্ মাব্, কাট কাট্।" কিন্তু রুস্তম তাহাতে ভয় পাইলেন না। নিকটে গিয়া রুস্তম শমশের তলোয়ার দ্বারা দ্বারে আঘাত করিতে লাগিলেন। লৌহনির্ম্মিত সেই দ্বার হইতে বজ্র-নিনাদের ন্যায় শব্দ বাহির হইতে লাগিল। কিন্তু সাত বার আঘাত করিতেই দুর্গের দ্বার খুলিয়া গেল।

নির্ভয়ে রুস্তম দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিলেন। কিন্তু তাঁহাকে অধিক দূর যাইতে হইল না। দ্বারে আঘাত শুনিয়া গুরু তাড়াতাড়ি সেই দিকে আসিতেছিল। গুরুর উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া রুস্তমের এইবার ভয় হইল। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, সর্ব্বশরীর শুষ্ক, চক্ষু দুইটি রক্তবর্ণ, গুরুর মূর্ত্তি অতি বিকট—অতি ভয়াবহ। তাহাকে দেখিয়া রুস্তম স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন!

গুরু বলিল,—"দুষ্ট, কে রে তুই? কাহার এমন সাহস যে, আমার দ্বারে আঘাত করে। রও, এখনি তোকে বাঁদর করিয়া বনে আমি ছাড়িয়া দিব।"

এই কথা বলিয়া গুরু এক মুষ্টি ধূলি লইল। ধূলার উপর মন্ত্র পড়িয়া রুস্তমের শরীরে তাহা নিক্ষেপ করিয়া বলিল,—"দুষ্ট! এই মুহূর্ত্তে তুই বাঁদর হইয়া যা!"

কিন্তু শমসের খড়্গের গুণে রুস্তমের কিছুই হইল না, তাঁহার যেমন শরীর—সেইরূপ শরীর রহিয়া গেল। তখন সেই খড়্গ উত্তোলন করিয়া তিনি গুরুর মস্তক ছেদন করিতে

ধাবিত হইলেন। শমশের খড়্গের প্রতি গুরুর যেমন দৃষ্টি পড়িল, আর ভয়ে তাহার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল, ভয়ে তাহার পদদ্বয় কাঁপিতে লাগিল। রুস্তমের পায়ে পড়িয়া তখন সে বিনয় করিয়া বলিতে লাগিল,—"তুমি আমাকে বধ করিও না, তুমি যাহা বলিবে, তাহাই আমি করিব।" —রুস্তম বলিলেন,—"আচ্ছা! তোমাকে আমি বধ করিব না। কিন্তু রাজকন্যা ভানুমতীর শরীর কি উপায়ে পুনরায় পূর্ব্বের মত হইবে, তাহা তোমাকে বলিয়া দিতে হইবে, না বলিলে নিমিষের মধ্যে আমি তোমার গলা কাটিয়া ফেলিব।"

এই কথা শুনিয়া গুরু বলিল,—নিশাপুরের কুঁজো রাজা আমার চেলা, আমি তাহার ওস্তাদ। আমার নিকট হইতে অঙ্গুরী লইয়া ভানুমতীকে সে পরিতে দিয়াছিল; সেই আঙটীর গুণে ভানুমতীর শরীর খড়ের হইয়া গিয়াছে। এখন তোমাকে আমি আর একটি আঙটী দিতেছি। সেই অঙ্গুরীটি ভানুমতীর দক্ষিণ হাতের অঙ্গুলিতে পরাইলেই তাহার শরীর পূর্ব্বের ন্যায় রক্তমাংসের হইয়া যাইবে।"

এই কথা বলিয়া গুরু রুস্তমের হস্তে আর একটি আঙটী প্রদান করিলেন। অঙ্গুরী পাইয়া রুস্তম ইরাণ-নগরের দিকে প্রত্যাগমন করিলেন। রাজসভায় গিয়া তিনি রাজাকে বলিলন,—"মহারাজ! ভানুমতীকে অদ্যই আমি ভাল করিব। রাজকন্যার নিকট আমাকে লইয়া চলুন।" —রুস্তমকে লইয়া সানন্দচিত্তে রাজা অন্তঃপুরে গমন করিলেন। যে ঘরে ভানুমতী শয়ন করিয়াছিলেন, সেই ঘরে সকলে গমন করিলেন। অগ্রসর হইয়া রুস্তম ভানুমতীর শয্যার নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর ভানুমতীর খড়ের দক্ষিণ হাতটি ধরিয়া তাহার খড়ের অঙ্গুলিতে তিনি সেই দ্বিতীয় আঙটী পরাইয়া দিলেন। আঙটী পরাইবামাত্র ভানুমতীর সেই খড়ের দেহ দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

ভানুমতীর খড়ের দেহে আগুন লাগিয়া গেল। চারিদিকে হাহাকাব পড়িয়া গেল। জল আনিয়া সকলে সেই অগ্নি নির্ব্বাণ করিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইল। কেন এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিল, রুস্তম তাহা বুঝিতে পারিলেন না। ভয়ে তাঁহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। হতভম্বের ন্যায়, কিছুক্ষণের নিমিত্ত তিনি সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার জ্ঞান হইল। তিনি ভাবিলেন যে, এ স্থানে আর থাকা উচিত নহে। রাজা নিশ্চয় তাঁহাকে কাটিয়া ফেলিবেন। অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে সকলে যখন ব্যস্ত ছিল, সেই অবসরে রুস্তম রাজবাটী হইতে পলায়ন করিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়— শিশির ঔষধ

ভানুমতীর খড়ের শরীর দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সেই আগুন নিবাইতে সকলে ব্যস্ত হইল। সেই অবসরে রুস্তম সে স্থান হইতে পলায়ন করিলেন।

তাড়াতাড়ি সকলে জল আনিয়া আগুন নিবাইল। ভানুমতীর প্রাণ বাঁচিল। কিন্তু তাহার নাক, কান ও জিহ্বা পুড়িয়া গেল। আশ্চর্য্য কথা এই যে, তাহার খড়ের হাত-পা একেবারে পুড়িয়া গেল না; কিন্তু রক্ত-মাংসের নাক, কান ও জিহ্বা পুড়িয়া গেল।

রাজা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি বলিলেন যে, "রাজ্য ও রাজকন্যার লোভে কোথা

হইতে একটা জুয়াচোর আসিয়াছিল। শীঘ্র তাহাকে ধরিয়া আন। এক্ষণেই আমি তাহাকে শুলে প্রদান করিব, অথবা তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিব।" কিন্তু রুস্তমকে কেহ খুঁজিয়া পাইল না। —রাজবাটী হইতে বাহির হইয়া রুস্তম রুদ্ধশ্বাসে দৌড়িতে লাগিলেন। সহর হইতে বাহির হইয়াও তিনি অতি দ্রুত বেগে পথ চলিতে লাগিলেন। অবশেষে সন্ধ্যার পূর্ব্বে তিনি সেই প্রান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সন্ধ্যা হইলে সেই নরমুণ্ড ও কাক অর্থাৎ সাদি ও তারা পুনরায় নরদেহ প্রাপ্ত হইল। রুস্তম তাহাদিগের নিকট গিয়া রাজবাটীর দুর্ঘটনার কথা সমুদয় বর্ণনা করিলেন। তাহা শুনিয়া তারা বলিল,—"তোমাকে গুরু ফাঁকি দিয়াছে। ভানুমতীকে ভাল করিবার নিমিত্ত প্রকৃত উপায় তোমাকে বলিয়া দেয় নাই। যে আঙটী দিলে গায়ে আগুন লাগিয়া যায়, সেই আঙটী তোমাকে দিয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল যে, ভানুমতীর গায়ে আগুন লাগিয়া গেলে, রাজা, রাগে তোমাকে কাটিয়া ফেলিবেন। তখন আর শমশের তলোয়ার দেখাইয়া তাহাকে জ্বালাতন করিতে পারিবে না। যাহা হউক, শমশের তলোয়ার তোমার কাছে আছে তো?" —শমশের রুস্তমের কোমরে বাঁধা ছিল। তাহার উপর হাত দিয়া রুস্তম উত্তর করিলেন,—"হাঁ শমশের আমার কাছেই আছে।"

তারা বলিল,—"বেশ! তুমি পুনরায় সেই জাদুগর গুরুর নিকট গমন কর। তাহাকে এখন বধ করা হইবে না। ভানুমতী ভাল না হইলে তাহাকে বধ করিও না। আপাততঃ ভয় দেখাইয়া তাহার নিকট হইতে ভানুমতীর ঔষধ গ্রহণ কর।"

পরদিন প্রাতঃকাল হইবার পূর্ব্বে, সাদি ও তারার নিকট হইতে বিদায় হইয়া রুস্তম চলিতে আরম্ভ করিলেন। যথা সময়ে তিনি গুরুর বনে গিয়া উপস্থিত হইলেন; বনের ভিতর পূর্ব্বের ন্যায় ভয়ানক শব্দ হইতে লাগিল। কিন্তু রুস্তম সে শব্দে ভয় পাইলেন না। দুর্গের দ্বাবের নিকট উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় শমশের তলোয়ার দ্বারা তিনি তাহাতে ঘা মারিলেন। দ্বার খুলিয়া গেল। দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিয়া রুস্তম গুরুর অনুসন্ধান করিলে লাগিলেন। কিন্তু কোন স্থানে তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। অনেক খুঁজিতে খুঁজিতে অবশেষে তিনি এক অন্ধকারময় ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। ঘরটি নানারূপ শুষ্ক জীব-জন্তুর দেহ, নানারূপ গাছের ছাল ও মূলে পরিপূর্ণ ছিল। তাহার মাঝখানে বসিয়া হাপরে আগুন জ্বালাইয়া গুরু মন্ত্রবলে ঔষধ প্রস্তুত করিতেছিল।

রুস্তম গিয়া একেবারে গুরুর ঝুঁটি ধরিলেন। ঝুঁটি টানিয়া তাহার মুণ্ড কাটিবার নিমিত্ত শমশের তলোয়ার উত্তোলন করিলেন। ভয়ে বিহ্বল হইয়া গুরু রুস্তমের পায়ে পড়িল। জোড়হাত করিয়া সে বলিতে লাগিল,—"আমার প্রাণবধ করিও না। জীবনের কাজ এখনও আমার শেষ হয় নাই। মানুষ কি উপায়ে অমর হইতে পারে তাহার ঔষধ আমি বাহির করিতেছি। আবিষ্কার হইলে সে ঔষধ তোমাকে আমি দিব। দোহাই তোমার! আমাকে এখন বধ করিও না।"

রুস্তম বলিলেন,—"তোমাকে আর বিশ্বাস নাই। মিথ্যা আঙটী দিয়া তুমি আমার প্রাণবধের উপায় করিয়াছিলে। নিশ্চয় আমি তোমার মাথা কাটিয়া ফেলিব।"

গুরু অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া বলিল,—"আমি সত্য বলিতেছি যে, আমি তোমাকে ফাঁকি দিই নাই। আমি তোমাকে ঠিক ঔষধ দিয়াছিলাম। তবে কেন উপকার হয় নাই, তাহা বলিতে পারি না। আচ্ছা, কি হইয়াছে, তাহা তুমি আমাকে বল। বিনা অপরাধে আমাকে বধ করিও না।"

রুস্তম বলিলেন,—"তুমি আমাকে যে আঙটী দিয়াছিলে, ভানুমতীর দক্ষিণ হাতের অঙ্গুলিতে তাহা আমি পরাইয়া দিলাম। আঙটী পরাইবামাত্র ভানুমতীর খড়ের দেহ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তাহার পর কি হইল, তাহা আমি বলিতে পারি না। কারণ, তৎক্ষণাৎ আমি সে স্থান হইতে পলায়ন করিলাম। ভানুমতী বাঁচিয়া আছে কি মরিয়া গিয়াছে, তাহাও আমি জানি না।"

গুরু বলিলেন,—"ভানুমতী বাঁচিয়া আছে, মরে নাই। কি জন্য মানুমতীর দেহে আগুন লাগিয়াছিল, তাহা আমি বুঝিয়াছি। তাহার দক্ষিণ হাতে আঙটী পরাইবার পূর্ব্বে, তুমি তাহার বাম হাতের আঙটী খুলিয়া লইয়াছিলে? যে আঙটী আমি নিশাপুরের কুঁজো রাজাকে দিয়াছিলাম? —রুস্তম উত্তর করিলেন,—"না, আমি সে আঙটী খুলিয়া লই নাই।"

গুরু বলিলেন,—তবে সে তোমার দোষ! পূর্ব্বের আঙটী না খুলিয়া তুমি তাহার হাতে নূতন আঙটি পরাইলে কেন? যাহা হউক, আমি তোমাকে এখন আর একটি ঔষধ দিতেছি। প্রথম ভানুমতীর বাম হাত হইতে তুমি সেই পূর্ব্বের আঙটী খুলিয়া লইবে। দক্ষিণ হাতে যে নূতন আঙটী আছে, তাহা খুলিয়া লইবে না। তাহার পর ভানুমতীর দেহে ও এই ঔষধ সিঞ্চন করিবে। তাহা করিলে ভানুমতী ভাল হইয়া যাইবে, তাহার খড়ের হাত পা রক্তমাংসের হইবে।" —এই বলিয়া গুরু রুস্তমের হাতে ছোট একটি শিশি প্রদান করিলেন। "এবার যদি ভানুমতি ভাল না হয়, তাহা হইলে পুনরায় আসিয়া তোমাকে কাটিয়া ফেলিব।" এইরূপ ভয় দেখাইয়া রুস্তম সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। দুর্গ হইতে বাহির হইয়া রুস্তম পুনরায় পথ চলিতে লাগিলেন। রাজধানীতে উপস্থিত হইবামাত্র রাজার সেনাগণ তাঁহাকে ধরিয়া রাজার নিকট লইয়া গেল। রুস্তমকে দেখিয়া রাজা ক্রোধে অধীর হইয়া পড়িলেন ও তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে শূলে দিবার নিমিত্ত আজ্ঞা করিলেন।

রুস্তম জোড়হাত করিয়া বলিলেন,—"মহারাজ! আমাকে বধ করিলে আপনার কোন লাভ হইবে না; বরং আমি বাঁচিয়া থাকিলে আপনার কন্যা আরোগ্য লাভ করিবে। গতবারে আমি একটি ভুল করিয়াছিলাম, সে জন্য সে বিড়ম্বনা ঘটিয়াছিল; কিন্তু এবার আমি ঠিক ঔষধ আনিয়াছি। সেই ঔষধে আপনার কন্যা যদি ভাল না হয়, তাহা হইলে যাহা ইচ্ছা হয় করিবেন।"

রুস্তমের আশ্বাসবাক্যে রাজা কিয়ৎ পরিমাণে শান্ত হইলেন, তাঁহাকে লইয়া পাত্রমিত্রগণের সহিত পুনরায় তিনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। পূর্ব্বের ন্যায় রুস্তম ভানুমতীর শয্যার নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন। ভানমুতীর নাক, কান ও জিহ্বা যে পুড়িয়া গিয়াছে, পূর্ব্বে তিনি তাহা জানিতেন না। চন্দ্রসম মানুমতীর মুখমণ্ডল ঘোরতর বিশ্রী হইয়া

গিয়াছে, তাহা দেখিয়া তিনি সাতিশয় দুঃখিত ও ভীত হইলেন।

যাহা হউক, ভানুমতীর বাম হাত হইতে তিনি কুঁজো রাজার আঙটী খুলিয়া লইলেন। দক্ষিণ হাত হইতে নূতন আঙটী তিনি খুলিলেন না। তাহার পর, ভানুমতীর অঙ্গে শিশির ঔষধ সিঞ্চন করিলেন। শিশির ঔষধ পড়িবামাত্র ভানুমতীর খড়ের দেহ রক্ত মাংসের দেহ হইয়া গেল। ভানুমতী পুনরায় মানুষের আকার পাইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার নাক, কান ও জিহ্বা সুস্থ হইল না। নাসিকা-কর্ণবিহীন মুখ অতি কদাকার অবস্থাতেই রহিয়া গেল।

ষষ্ঠ অধ্যায়– পক্ষিরাজ ঘোড়া

ভানুমতীর খড়ের দেহ রক্ত-মাংসের দেহ হইল দেখিয়া রাজার আনন্দ হইল। কিন্তু তাঁহার নাসিকা, কর্ণ ও জিহ্বার অবস্থা দেখিয়া রাজার হরিষে বিষাদ হইল।

রাজাকে সম্বোধন করিয়া রুস্তম বলিলেন,—"মহারাজ! ভয় করিবেন না। ভানুমতীর মুখ যাহাতে পূর্ব্বের ন্যায় হয়, সেইরূপ উপায় করিবার নিমিত্ত আমি পুনরায় যাইতেছি। শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিব।"

এই কথা বলিয়া রুস্তম রাজার নিকট হইতে বিদায় হইয়া পুনরায় সেই প্রান্তর অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া রাত্রির জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। রাত্রি হইলে পুনরায় সাদি ও তারা সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ভানুমতীর সমুদয় বৃত্তান্ত তিনি তাহাদিগের নিকট বর্ণনা করিলেন।

সেই সমুদয় কথা শ্রবণ করিয়া তারা বলিল,—"ভানুমতীর নাক, কান ও জিহ্বা ভাল করিবার কেবল একমাত্র উপায় আছে। জাদুগর গুরুর নাক কাটিয়া তাহার রক্ত যদি ভানুমতীর নাক, কান ও জিহ্বায় লাগাইতে পারা যায়, তাহা হইলে সেই সমুদয় স্থান সুস্থ হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় হয়।" —রুস্তম বলিলেন—"প্রাণের ভয়েও জাদুগর-গুরু স্ব ইচ্ছায় আমার সহিত আসিবে না। কারণ, আপনার নাক কাটাইতে কে আর ইচ্ছা করে? তাহাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনিতে হইবে। তাহার দেহ শুষ্ক ও হালকা, কিছুদূর তাহাকে আমি ধরিয়া আনিতে পারি। কিন্তু এতদূর তাহাকে কি করিয়া আনিব?"

তারা বলিল,—"সে দিন নিশাপুরে যখন আমি দাই মায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম, তখন তিনি আমাকে শমশের তলোয়ারের কথা, ভানুমতীর কথা, আর আমাদের উদ্ধারের কথা বলিয়া দিয়াছিলেন। আর সাদি! তোমার সেই পক্ষিরাজ ঘোড়ার কথাও তিনি বলিয়াছিলেন। যখন আমাদের পিতাকে কাটিয়া কাকা জাদুবলে আমাদিগকে মুণ্ড ও কাক করিয়া ফেলেন, তখন আমরা শিশু ছিলাম, সেই জন্য তখন দাই-মা আমাদের উদ্ধারের কোন উপায় করিতে পারেন নাই। দাই-মা বলিলেন যে, সাদির এখন বয়স হইয়াছে এখন উদ্ধারের সময় আসিয়াছে। যাহা হউক সাদি! তোমার পক্ষিরাজ ঘোড়াটি তুমি রুস্তমকে প্রদান কর।" — রুস্তমের দিকে চাহিয়া সাদি বলিল,—"কাল প্রাতঃকালে তুমি এই বলিয়া আমার পক্ষীরাজ ঘোড়াকে ডাকিবে,—

স্বর্ণখূর পক্ষিরাজ অশ্ব মনোহর।
উড্ডাম ঈশ্বর আজ্ঞা আইশ সত্বর।।

এই মন্ত্রটি পাঠ করিলেই তোমার নিকট আমার সেই পক্ষিরাজ ঘোড়া আসিয়া যাইবে। পিতা আমাকে আদর করিয়া এই ঘোড়া দিয়াছিলেন। ঘোড়াকে তুমি চাবুক মারিবে না। যে স্থানে যাইতে ইচ্ছা করিবে, ঘোড়া আপনি তোমাকে সেই স্থানে লইয়া যাইবে। ঘোড়ার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তুমি জাদুগরের কেল্লায় গমন করিবে, তাহার পর তাহাকে ধরিয়া আপনার কোলের নিকট বসাইয়া তুমি ইরাণের রাজধানীতে উড়িয়া আসিবে।"

রুস্তম জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এত দিন ধরিয়া তোমরা কেবল আমার কাজ করিতেছ। কিন্তু তোমাদের উদ্ধারের উপায় কি?"

তারা উত্তর করিল,—"সে জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই। আমাদের উদ্ধার তোমার এই কাজ হইতেই হইবে।" --পরদিন প্রাতঃকালে যখন সাদি নরমুণ্ড ও কাক হইয়া গেল, তখন রুস্তম সেই পক্ষিরাজ ঘোড়াকে স্মরণ করিলেন,—

স্বর্ণখুর পক্ষিরাজ অশ্ব মনোহর।
উড্ডাম ঈশ্বর আজ্ঞা আইস সত্বর।।

মন্ত্রটি উচ্চারণ করিবামাত্র আকাশপথে অতি সুন্দর এক অশ্ব আসিয়া উপস্থিত হইল। সে ঘোড়ার বর্ণ সবুজ ছিল, ইহার খুর চারিটির সোনার ছিল ও নানারূপ বহুমূল্য প্রস্তরখচিত ছিল। রুস্তম ঘোড়ার পৃষ্ঠে উঠিয়া জাদুগরের দুর্গে যাইবার নিমিত্ত মনন করিল। তৎক্ষণাৎ ঘোড়া আকাশপথে বায়ুবেগে উড়িতে লাগিলেন। নিমিষের মধ্যে জাদুগরের দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিলেন। কিছুদূর গিয়া সম্মুখে জাদুগর গুরুকে দেখিতে পাইলেন। রুস্তম তাহার সহিত এবার আর কোনরূপ বাক্যালাপ করিলেন না। দুই হাতে একেবারে তাহাকে ধরিয়া বাহিরে লইয়া চলিলেন। জাদুগরের দেহ শুষ্ক ও লঘু ছিল। রুস্তম অনায়াসেই তাহাকে বাহিরে আনিয়া ঘোড়ার পৃষ্ঠে আরোহণ করিতে পারিলেন। জাদুগর বিষম ব্যাপার দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিল। রুস্তমের হাত ছাড়াইবার নিমিত্ত কোনরূপ চেষ্টা করিতে পারে নাই।

ঘোড়ার পৃষ্টে উড়িয়া রুস্তম ইরাণ-রাজধানীতে গমন করিবার বাসনা করিলেন। ঘোড়া বায়ুবেগে উড়িয়া তৎক্ষণাৎ ইরাণ-রাজের রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজা ও সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তি পক্ষিরাজ ঘোড়া, রুস্তম ও জাদুগর-গুরুকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। জাদুগর-গুরুকে তৎক্ষণাৎ শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার নিমিত্ত রুস্তম রাজাকে অনুরোধ করিলেন। রাজাজ্ঞায় গুরুকে তৎক্ষণাৎ নিগড়বন্ধনে আবদ্ধ করা হইল। কি জন্য জাদুগর-গুরুকে তিনি ধরিয়া আনিয়াছেন, রুস্তম তখন সে সমুদয় বৃত্তান্ত রাজার নিকট খুলিয়া বলিলেন। সেই সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিয়া রাজা আশ্চর্য্য হইলেন। তাহার পর শৃঙ্খলাবদ্ধ গুরুকে লইয়া সকলে ভানুমতির ঘরে গমন করিলেন। সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া রুস্তম তীক্ষ্ণ ছুরি দ্বারা গুরুর নাকটি কাটিয়া ফেলিলেন। সেই কর্ত্তিত নাসিকা হইতে নীলবর্ণের শোণিত বাহির

হইতে লাগিল। সেই রক্ত লইয়া রুস্তম ভানুমতীর নাসিকায়, কর্ণদ্বয়ে ও জিহ্বাতে লেপন করিয়া দিলেন। ভানুমতীর নাক, কানও জিহ্বা তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বের আকার ধারণ করিল। ভানুমতী এইবার সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইলেন। পূর্ব্বের ন্যায় ভানুমতীর রূপে চারিদিক্ আলোকিত হইল। —রাজা, রাণী, মন্ত্রিগণ ও ইরাণ দেশের সমুদয় লোক আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিল! রাজা বলিলেন যে, "আজ রাত্রিতেই আমি রুস্তমের সহিত ভানুমতীর বিবাহ দিব।" নিজের মাতা, সাদি ও তারার অবস্থা স্মরণ করিয়া রুস্তম বিবাহকার্য্যে বিলম্ব করিবার নিমিত্ত রাজাকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু রাজা রুস্তমের সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। রাজা বলিলেন,—"তুমি আমার বড় উপকার করিয়াছ। এ শুভকার্য্যে বিলম্ব করা উচিত নহে। আজ রাত্রিতেই ভানুমতীর সহিত তোমার বিবাহ দিব।"

নাসিকা-হীন শৃঙ্খলাবদ্ধ জাদুগর-গুরুকে রাজা কারাগারে প্রেরণ করিলেন। তাহার পর অতি সমারোহের সহিত তিনি বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন। রাজার আজ্ঞা, অবিলম্বেই সমুদয় আয়োজন হইয়া গেল। নগরের রাজপথ সমুদয় পরিষ্কৃত ও নবপল্লবে পরিশোভিত হইল। নগরবাসিগণ আপন আপন গৃহ যথাসাধ্য অলঙ্কৃত করিল। চারিদিকে নৃত্য গীত আরম্ভ হইল।

ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল, সমুদয় ইরাণ-নগর দীপমালায় আলোকিত হইল। ক্রমে বিবাহের লগ্ন উপস্থিত হইল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সভায় উপবেশন করিলেন। বর, কন্যা, পুরোহিত, রাজা প্রভৃতি যথাস্থানে উপবেশন করিলেন। বিবাহ কার্য্য আরম্ভ হয় আর কি, এমন সময় সেই বিবাহ-সভায় সহসা বিষম ঝঞ্ঝাবাত উপস্থিত হইল। সেই ঝড়ে সমুদয় আলোক নিবিয়া গেল। বায়ুবলে ধূলিরাশি উঠিয়া ঘোরতর অন্ধকার হইল। কিন্তু নিমিষের মধ্যে পুনরায় ঝড় থামিয়া গেল, তখন পুনরায় আলোক জ্বালিয়া সকলে দেখিল যে, সভাস্থলে আর সকলেই আছেন, কেবল কন্যা ভানুমতী সে স্থানে নাই। চারিদিকে সকলে খুঁজিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি খুঁজিয়াও ভানুমতীর সন্ধান কেহ পাইল না। ভানুমতীকে কে যে কোথায় লইয়া গেল, তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না।

সপ্তম অধ্যায়– ভানুমতির পলায়ন

ভানুমতীর কোন সন্ধান হইল না বটে; কিন্তু তাঁহার পিতা, মাতা ও অন্যান্য লোক সকলেই বুঝিলেন যে, এ কুঁজো রাজার চাতুরি, সেই জাদুবলে ভানুমতীকে সভা হইতে লইয়া গিয়াছে। রাজাকে আশ্বাস দিয়া রুস্তম বলিলেন,—"মহারাজ! আপনি চিন্তা করিবেন না। কুঁজো রাজার গুরুকে যখন আমি পরাভব করিয়া বন্দী করিতে পারিয়াছি, তখন তাহাকেও পরাভব করিয়া আমি ভানুমতীকে উদ্ধার করিতে পারিব। ভানুমতীর সন্ধানে আমি এখনি চলিলাম। ভানুমতীকে লইয়া আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব।" এই কথা বলিয়া রুস্তম সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

ভানুমতীকে সত্য সত্যই কুঁজো রাজা লইয়া গিয়াছিল। আকাশপথে বায়ুবেগে উড়িয়া ভানুমতীকে লইয়া মুহূর্তমধ্যে কুঁজো রাজা নিশাপুরে গিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পর

ভানুমতীকে সে একটা ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিল।

তাহার পর আপনার ঘরে আসিয়া কুঁজো রাজা প্রথম সাবান দিয়া স্নান করিল। তাহার পর সুন্দর হইবার নিমিত্ত মুখে সে পাউডার মাখিল। পোড়া হাঁড়ির উপর ঈষৎ চূণের দাগ লাগিলে যেরূপ দেখায়, তখন তাহার মুখ সেইরূপ দেখাইল। তাহার পর সে ভাল ভাল সাচ্চার পোষাক পরিধান করিল। পাকা তাল হইতে স্থানে স্থানে খোসা ছাড়াইয়া লইলে যেরূপ দেখায়, জরির পোষাক পরিয়া তাহাকে সেইরূপ দেখাইতে লাগিল। তাহার পর সে গায়ে নানারূপ সুগন্ধ লেপন করিল। তাহার পর সে বাক্স হইতে সামান্য টুপিটি একবার সে পরিধান করিল। সেই টুপিটি পরিয়া আরসীর দিকে চাহিয়া ঈষৎ একটু হাসিল। তাহার পর সেই সামান্য টুপিটি মাথা হইতে খুলিয়া সে আপনার পকেটে রাখিল ও মাথায় পুনরায় সেই সাচ্চার টুপি পরিধান করিল।

যে ঘরে ভানুমতী আবদ্ধ ছিলেন, সাজ-গোজ করিয়া কুঁজো রাজা সেই ঘরে প্রবেশ করিল। ঘরে একখানি খাট ছিল। ভানুমতী সেই খাটে একপার্শ্বে বসিয়া কাঁদিতেছিলেন, অবিরল ধারায় চক্ষুর জলে তাঁহার বুক ভাসিয়া যাইতেছিল। কিন্তু কুঁজো রাজাকে দেখিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ চক্ষুর জল মুছিয়া ফেলিলেন ও তাহার পর তিনি আরক্ত নয়নে তাহাকে বলিলেন,—"দুষ্ট! আমাকে তুই এখানে কেন আনিয়াছিস? আমার বাবা এখন সসৈন্যে আসিয়া তোকে নিপাত করিবেন। যদি প্রাণের ভয় থাকে, তাহা হইলে শীঘ্র আমাকে বাড়ী রাখিয়া আয়।" —কুঁজো রাজা বলিল,—"ছি ভাই! অত রাগ কেন? তোমাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত আনিয়াছি। আমার মত বর পৃথিবীতে খুঁজিয়া তুমি পাইবে না।"

ভানুমতী বলিলেন,—"তোরে আমি বিবাহ করিব? নরাধম! তোর বলিতে একটু লজ্জা হয় না? নিজের মুখ একবার আরসীতে গিয়া দেখ! মরণ আর কি! সাত হাত দাড়িতে আবার তেল মাখা হইয়াছে; দূর! দূর!"

কুঁজো রাজা উত্তর করিল,—"দাড়িতে তেল মাখি নাই, আতর মাখিয়াছি। যদি স্ব-ইচ্ছায় আমাকে তুমি বিবাহ না কর, তাহা হইলে জোর করিয়া তোমাকে আমি বিবাহ করিব। দেখি, কে তোমাকে রক্ষা করিতে পারে। তোমার বাপকে আমি ভয় করি না। এক ফুঁয়ে তোমার বাপকে আমি উড়াইয়া দিব।"

ভানুমতী বলিলেন,—"আমার বাপ যদি না পারেন, তাহা হইলে যে তোর গুরুর নাক কাটিয়াছে, সে আমাকে উদ্ধার করিবে, সে আসিয়া দণ্ড করিবে।"

গুরু যে বন্দী হইয়াছে, কুঁজো রাজা তাহা শুনিয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল যে, ভানুমতীকে প্রথম বিবাহ করিয়া তাহার পর সে গুরুকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিবে। গুরুর নাক কাটা গিয়াছে, এখন সেই কথা শুনিয়া সে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল। ভানুমতীর সে বাম হাতটি ধরিল। বাম হাত ধরিয়া দ্বারের দিকে টানিতে লাগিল, আর বলিতে লাগিল,—"চল্, বাহিরে চল্, দালানে গিয়া সভা করিয়া পুরোহিত ডাকিয়া এখনি তোকে আমি বিবাহ করিব। তাহার পর দেখা যাইবে, কে কি করে।"

ভানুমতী আপনার হাত ছাড়াইয়া লইতে চেষ্টা করিলে লাগিলেন, আর দক্ষিণ হাত দিয়া তাহার মুখ আঁচড়াইয়া ও সেই সাত হাত দাড়ি ছিঁড়িয়া দিতে লাগিলেন। দাড়ি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া শোণের ন্যায় চারিদিকে পড়িতে লাগিল। দাড়িটি কুঁজো রাজার সখের ছিল। দাড়ি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া চারিদিকে পড়িতে লাগিল, তাহা দেখিয়া কুঁজো রাজার বড় ভয় হইল! সে ভাবিল যে ভানুমতীর সহিত আর কিছুক্ষণ হুটু-পুটি করিলে তাহার এমন যে তরিবৎ করা দাড়ি, তাহা সব ছিঁড়িয়া যাইবে। এইরূপ ভাবিয়া সে ভানুমতীর হাত ছাড়িয়া দিল, আর বলিল,—"রও! তোমাকে ধরিবার নিমিত্ত যাহাদের দাড়ি নাই, এমন সব লোক এখনি ডাকিয়া আনিতেছি।"

এই কথা বলিয়া কুঁজো রাজা ঘোরতর রাগান্বিত হইয়া সে ঘর হইতে প্রস্থান করিল। ভানুমতী তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘরের দ্বারে খিল দিয়া দিলেন। ঘরে খিল দিয়া পুনরায় সেই খাটে আসিয়া বসিলেন। তাহার পর তিনি দেখিলেন যে, ভূমির উপর সামান্য একটি টুপি পড়িয়া রহিয়াছে। হুটু-পুটি করিবার সময় কুঁজো রাজার পকেট হইতে টুপিটি পড়িয়া গিয়াছে। খাটের এক ধারে বসিয়া ভানুমতী টুপিটি নাড়িয়া নাড়িয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিলে লাগিলেন। অবশেষে তিনি টুপিটি আপনার মাথায় পরিলেন। স্ত্রীলোক! এত বিপদে পড়িয়াও স্ত্রীলোকের স্বভাবটুকু কোথায় যাইবে? ঘরে বড় একখানি আর্‌সী ছিল। টুপি পরিয়া তাঁহাকে কেমন দেখাইতেছে তাহা দেখিবার নিমিত্ত ভানুমতী আর্‌সীর নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য কথা। ভানুমতীর প্রতিবিম্ব আর্‌সীর উপর পড়িল না। বিস্মিত হইয়া ভানুমতী ভাবিতে লাগিলেন,—"এ বড় অদ্ভুত কথা কিছু পূর্ব্বে আমার ছায়া আর্‌সীর উপর পড়িয়াছিল। এখন আর্‌সীর উপর আমার ছায়া পড়ে নাই কেন?" ভানুমতী মাথা হইতে টুপিটি খুলিয়া লইলেন, আর সেই মুহূর্ত্তে আর্‌সী হইতে তাঁহার ছায়া অন্তর্হিত হইল। এইরূপ দুই চারি বার তিনি করিলেন। তখন তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—"হাঁ বুঝিয়াছি! মাথায় এইটুপি পরিলে লোকে অদৃশ্য হইয়া যায়। টুপিটির গুণ এই।" অতি সাবধানে টুপিটি লইয়া ভানুমতী পুনরায় খাটের উপর আসিয়া বসিলেন। কিছুক্ষণ পরে লোক জন লইয়া কুঁজো রাজা বাহিরে দ্বার ঠেলিতে লাগিল। ভানুমতী দ্বারে খিল দিয়াছিলেন। দ্বার সে সহজে খুলিতে পারিল না। কিন্তু জাদুবলের কাছে সামান্য একটা দ্বার কতক্ষণ বন্ধ থাকিতে পারে? মন্ত্রবলে কুঁজো রাজা তৎক্ষণাৎ দ্বারা খুলিয়া ফেলিল। সেই সময় ভানুমতী মাথায় সেই টুপিটি পরিধান করিলেন। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া কুঁজো রাজা ও তাহার দাড়িহীন লোকগণ ভানুমতীকে দেখিতে পাইল না। সকলেই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। ভানুমতীকে কেন দেখিতে পায় নাই, কুঁজো রাজা তাহা বুঝিতে পারিল। সকলকে সে বলিল,—"শীঘ্র দ্বার বন্ধ কর। ভানুমতী এই ঘরেই আছে! চারিদিকে হাত দিয়া সকলে অনুসন্ধান কর। চক্ষুতে দেখিতে না পাইলেও আমাদের হাতে সে ঠেকিয়া যাইবে।"

অষ্টম অধ্যায়— পলায়ন

কিন্তু এ কথা বলিবার পূর্ব্বে ও দ্বার বন্ধ করিবার পূর্ব্বে, ভানুমতী লোকের পাশ দিয়া আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন। কুঁজো রাজার লোকজন প্রথম ঘর আতি-পাতি করিয়া হাতড়াইতে লাগিল। ভানুমতীকে ঘবের ভিতর তাহারা পাইল না। তাহার পর সমস্ত বাড়ী তাহারা অনুসন্ধান করিল। কোন স্থানে তাহারা ভানুমতীকে পাইল না। কূঁজো রাজার বাটীর চারিদিকে ফুল ও ফলের বাগান ছিল। ঘর হইতে বাহির হইয়া ভানুমতী বাগানের ভিতর গিয়া একটি ঝোপের ভিতর লুক্কায়িত হইয়া রহিলেন। সে জন্য কেহই তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইল না। কুঁজো রাজা ক্রোধে অন্ধ হইয়া চারিদিকে লোক পাঠাইল। ভানুমতীকে ধরিবার নিমিত্ত অশ্বারোহী পদাতিক প্রভৃতি চতুরঙ্গ সৈন্য চারিদিকে ধাবিত হইল।

এ দিকে রুস্তম রাজবাড়ী হইতে বাহির হইয়া দ্রুতবেগে সেই প্রান্তর অভিমুখে চলিতে লাগিল। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময় তিনি সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভাগ্যক্রমে সাদি ও তারা তখনও মনুষ্যদেহে ছিল; তাহাদের নিকট গিয়া রুস্তম আদ্যোপান্ত সকল কথা বলিলেন।

সাদি বলিল,—"এ যে আমাদের কাকার কর্ম্ম, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যাহা হউক, শমশের তলোয়ারের গুণে তুমি তাহাকে পরাভব করিতে পারিবে। প্রাতঃকাল হইলে তুমি আমার পক্ষিরাজ ঘোড়াকে পুনরায় স্মরণ করিবে। কালবিলম্ব করা উচিত নহে। তুমি তাহার পিঠে বসিয়া নিশাপুরে গমন করিবে। কি উপায়ে তুমি ভানুমতীকে উদ্ধার করিতে পারিবে, তাহা আমি বলিতে পারি না; সে স্থানে গিয়া যেমন দেখিবে, সেইরূপ করিবে।'

তারা সেই কথায় সায় দিয়া বলিল,—"কিন্তু তুমি আমাদের কাকাকে বধ করিও না। তিনি আমাদের পিতাকে বধ করিয়াছেন সত্য; হাজার হউক তিনি আমাদের কাকা। ভানুমতীকে উদ্ধার করিয়া তুমি আমাদের দাই-মায়ের নিকট গমন করিবে! আমাদেরও উদ্ধারের সময় আসিয়াছে। কি উপায়ে আমরা কাকার জাদুবল হইতে নিষ্কৃতি পাইব, দাই-মা তাহা তোমাকে বলিয়া দিবেন।

অবিলম্বে প্রাতঃকাল হইল। রুস্তম পক্ষিরাজ ঘোড়াকে স্মরণ করিলেন,—

স্বর্ণখুর পক্ষিরাজ অশ্ব মনোহর।
উড্ডাম ঈশ্বর আজ্ঞায় আইস সত্বর।।

এই মন্ত্র বলিবামাত্র তৎক্ষণাৎ আকাশপথে উড্ডীয়মান হইয়া পক্ষিরাজ ঘোড়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পৃষ্ঠে বসিয়া রুস্তম ক্ষণকালের মধ্যে নিশাপুরে উপস্থিত হইলেন।

সেই ঝোপের ভিতর বসিয়া ভানুমতী সমস্ত রাত্রি কাটাইলেন। প্রাতঃকাল হইল। মাথার চুল তাঁহার আলু থালু হইয়া গিয়াছিল। চুলগুলি কিছু পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত তিনি একবার সেই টুপিটি খুলিলেন। সেই সময় দোতালার উপর জানালার নিকট কুঁজো

রাজা দাঁড়াইয়া ছিল। কুঁজো রাজা ভানুমতীকে দেখিতে পাইল। কিন্তু পরক্ষণেই ভানুমতী আবার টুপিটি মাথায় পরিলেন, আর সেই মুহূর্ত্তে তিনি অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন।

কুঁজো রাজা উপর হইতে নামিয়া ধীরে ধীরে সেই ঝোপ অভিমুখে গমন করিল। ঝোপের নিকট উপস্থিত হইয়া যে স্থানে ভানুমতী বসিয়াছিলেন, সেই স্থানে সে হাতড়াইতে লাগিল। অন্যমনস্ক হইয়া ভানুমতী বসিয়াছিলেন।

ভানুমতী তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। সহসা কুঁজো রাজার হাত ভানুমতীর গায়ে ঠেকিয়া গেল। শশব্যস্ত হইয়া ভানুমতী পলায়ন করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু দুভার্গ্যক্রমে ভানুমতীর টুপি গাছের ডালে লাগিয়া সেই স্থানে ঝুলিতে লাগিল। কুঁজো রাজা তখন ভানুমতীকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল ও চুল ধরিয়া তাঁহাকে বাড়ীর দিকে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিল। প্রাণপণে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া ভানুমতী তাহার হাত হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহাতে কুঁজো রাজা অতিশয় কুপিত হইল। রাগে ভানুমতীকে কাটিবার চেষ্টা করিল। বাম হাতে ভানুমতীর চুল ধরিয়া দক্ষিণ হাতে কোমর হইতে অসি বাহির করিয়া সে ভানুমতীর গলা কাটিয়া ফেলিতে উদ্যত হইল। গলা কাটিবার নিমিত্ত সে খড়্গ উত্তোলন করিল। কোপ মারে আর কি! এমন সময় পক্ষিরাজ ঘোড়ার উপর রুস্তম সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শমশের তলোয়ারের পশ্চাৎ দিক্ দ্বারা রুস্তম কুঁজোর দক্ষিণ হাতে সবলে আঘাত করিলেন। কুঁজোর হাত হইতে অসি স্খলিত হইয়া দূরে গিয়া ভূমির উপর পতিত হইল। তৎক্ষণাৎ রুস্তম অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া কুঁজোর সেই সাত হাত লম্বা দাড়ি ধরিয়া ফেলিলেন। তাহার পর শমশের তলোয়ার উত্তোলন করিয়া তিনি বলিলেন,—"দুর্বৃত্ত! এখন যদি তোমাকে কাটিয়া ফেলি, তাহা হইলে কে তোমাকে রক্ষা করিতে পারে।"

রুস্তমের হাতে শমশের খড়্গ দেখিয়া কুঁজো রাজা ঘোরতর বিস্ময়াপন্ন। ভয়ে তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। সে বলিল,—"শমশের তলোয়ার তুমি কোথায় পাইলে? মৈনুক পরি আমার দাদাকে ইহা দিয়াছিল! দাদার মৃত্যুর পর আমি ইহার জন্য কত খুঁজিয়াছিলাম। তারার দাই-বেটী বোধ হয় ইহা লুকাইয়া রাখিয়াছিল। যাহা হউক, তোমার ইচ্ছা হয়, তুমি আমার গলা কাটিয়া ফেল। আমি কিছু বলিব না।"

কুঁজো রাজাকে রুস্তম কাটিয়া ফেলিলেন না। একটা ঘরে তাহাকে তিনি কয়েদ করিয়া রাখিলেন। ভানুমতীকেও তিনি আর একটি সুন্দর ঘরে রাখিয়া দাস-দাসীদিগকে তাহার সেবা শুশ্রূষা করিবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন। তাহার পর রুস্তম তারার দাই-মায়ের নিকট গমন করিয়া ভাই ভগ্নী কিরূপে কুঁজোর যাদু হইতে নিষ্কৃতি পাইবে, সেই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। দাই-মা বলিল যে,—কুঁজোর সাত হাত দাড়ি কাটিয়া সেই দাড়ি পোড়াইয়া সাদি ও তারার শরীরে লেপন করিলেই দুইজন উদ্ধার পাইবে।"

রুস্তম কুঁজো রাজার বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া ভানুমতীকে পক্ষিরাজ ঘোড়ার উপর আপনার পশ্চাৎ দিকে বসাইয়া তৎক্ষণাৎ ইরাণ নগরে গমন করিলেন। ভানুমতীকে পাইয়া

ইরাণের রাজা, রাণী ও সমুদয় প্রজাবর্গ ঘোরতর আনন্দিত হইল। তাহার পর তিনি সেই প্রান্তরে আসিয়া নরমুণ্ড-রূপধারী সাদি ও কাকরূপী তারাকে লইয়া নিশাপুরে প্রত্যাগমন করিলেন। সাদি ও তারাকে দাইয়ের বাটীতে রাখিয়া তিনি পুনরায় ইরাণ নগরে গিয়া কুঁজো রাজার গুরুকে লইয়া নিশাপুরে প্রত্যাগমন করিলেন। যে ঘরে কুঁজো রাজাকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই ঘরে গুরুকে লইয়া তিনি প্রবেশ করিলেন। স্বভাবতই গুরু দেখিতে অতি কদাকার ছিল। নাসিকা ও কর্ণবিহীন হইয়া তখন আরও বিশ্রী হইয়াছিল। গুরুর দুরবস্থা দেখিয়া কুঁজো রাজা অনেক খেদ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু রুস্তম তাহাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন—"দুঃখ করিতে হইবে না। তোমার দশাও ঐরূপ হইবে। পিঠে তোমার বৃহৎ কুঁজ আছে। তোমার কেবল এক দাড়ির গৌরব ছিল! সেই সাত হাত পাকা দাড়ি আজ কাটা যাইবে।"

কুঁজো রাজা রুস্তমের পায়ে পড়িয়া বলিল,—"তুমি আমার গলা কাটিয়া ফেল, কিন্তু আমার দাড়ি কাটিও না। আহা! কত তরিবৎ করিয়া আমি আমার দাড়ি প্রস্তুত করিয়াছিলাম। আর এই দাড়ির গুণেই আমার যত জাদুবিদ্যা। হায়! হায়! সে সাধের দাড়ি আজ আমার কাটা গেল।

এই বলিয়া কুঁজো রাজা কাঁদিতে লাগিল; কিন্তু তাহার ক্রন্দনে রুস্তম কর্ণপাত করিলেন না। নাপিত ডাকাইয়া তিনি তাহার দাড়ি কাটিয়া ফেলিলেন। তাহার পর সেই দাড়ি পোড়াইয়া তাহার ভস্ম সাদি ও তারার গায়ে লেপন করিয়া দিলেন। সাদি ও তারা তৎক্ষণাৎ মানুষের আকৃতি প্রাপ্ত হইল। রুস্তম সাদিকে নিশাপুরের সিংহাসনে বসাইলেন। সাদি পুত্র-নির্বিশেষে সেই দেশের প্রজাদিগকে পালন করিতে লাগিলেন। সাদি আপনার পিতৃব্যকে বধ করিলেন না। গুরু ও তাহাকে তিনি কারাবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। কিছুদিন পর রুস্তম ইরাণ নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তিনি বলিলেন,—"মহারাজ! ভানুমতীকে আমি প্রাণদান করিয়াছি। ভানুমতীকে আমি বিবাহ করিতে ইচ্ছা করি না। নিশাপুরের রাজা—আমার বন্ধু সাদির সহিত যদি তাহার বিবাহ দেন, তাহা হইলে আমি পরম অনুগৃহীত হইব।" রাজা সে কথায় সম্মত হইলেন। অতি সমারোহে ভানুমতীর সহিত সাদির বিবাহ হইল। তারার রূপে রুস্তম মোহিত হইয়াছিলেন। ভানুমতী অপেক্ষা তারাকে তিনি অধিক ভালবাসিতেন। সেই জন্য তিনি ভানুমতীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন নাই। কিছু দিন পরে তারার সহিত রুস্তমের বিবাহ হইল। ইরাণের অর্দ্ধেক ও নিশাপুরের কিয়দংশ লইয়া সমরখণ্ড নামক একটি রাজ্য সংস্থাপিত হইল। রুস্তম তাহার রাজা হইলেন। বৃদ্ধা মাতা ও তারাকে লইয়া রুস্তম, আর ভানুমতীকে লইয়া সাদি সুখে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

——০——

জাপানের উপকথা

সূচনা

ইউরোপ, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার অধিবাসীগণ ব্যতীত পৃথিবীর অন্যান্য যাবতীয় জাতির এক্ষণে পতন অবস্থা। অনেক দিন পূর্ব্বে কুভেয়ার নামক এক জন ফরাসি পণ্ডিত যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই—"যেমন একখানি ইটের উপর আর একখানি ইট রাখিয়া লোক বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করে, সেইরূপ একটি আবিষ্কৃত জ্ঞানের উপর আর একটি নূতন আবিষ্কৃত জ্ঞানের স্থাপন করিয়া বর্ত্তমান কালের অদ্ভুত বিজ্ঞান-শাস্ত্রকে আয়ত্তাধীন করিয়াছে, তাহারা ধনে, মানে, পরাক্রমে উন্নত হইয়া পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াছে। যাহার এই নূতন বিজ্ঞান-শাস্ত্রকে তুচ্ছ করিয়াছে, তাহারা দাস জাতিতে পরিণত হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে।"

আরব, তুর্ক তাতার প্রভৃতি যে সমুদয় মুসলমান জাতি বাহুবলে পৃথিবীর এক অলঙ্কার-স্বরূপ ছিল, শিল্প-কৌশলে যে চীনজাতি পৃথিবীতে এক দিন অজেয় ছিল, নূতন বিজ্ঞানকে অবহেলা করিয়া সেই সমুদয় জাতির আজ ঘোরতর অবনতি হইয়াছে। পূর্ব্ব অঞ্চলে একমাত্র জাপানের লোক কেবল এই নূতন বিদ্যার আশ্রয় লইয়াছে। সেই বিদ্যাবলে জাপানের লোক প্রবলপরাক্রান্ত হইয়াছে। জাপান,—এশিয়া মহাখণ্ডের যাবতীয় জাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে। বিশেষতঃ আমবা জাপানের গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়াছি। জাপান যে কেবল আমাদের রাজার বন্ধু, তাহা নহে, জাপান আমাদের শিষ্য। কেবল তাহাও নহে, আমার বোধ হয় যে, সিংহলবাসীদের পুর্ব্ব পুরুষগণ বঙ্গদেশ হইতে গমন করিয়াছিল। পূর্ব্বকালে বঙ্গ কলিঙ্গ দেশ হইতে হিন্দু বণিকগণ সমুদ্রপথে গমন করিয়া যব, বালি, কাম্বোজ প্রভৃতি দ্বীপে ও নানা দেশে বাস করিয়াছিল। সেই সমুদয় দেশে এখনও হিন্দুদিগের কীর্ত্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

জাপানেও যে হিন্দুগণ গিয়া বাস করিয়াছিল নানা কারণে আমি এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য হইয়াছি; সুতরাং জাপানের সহিত আমাদের যতই সৌহার্দ্দ্য হয়, ততই ভাল। জাপান কোথায়, জাপানের লোক কিরূপ তাহাদের আচার-ব্যবহার কিরূপ এই সমুদয় বিষয়ে আমাদের জ্ঞানলাভ করা আবশ্যক। চীন ও জাপান সম্বন্ধে পূর্ব্বে আমি কয়টি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। আজ অন্য প্রকার বিবরণ প্রদান করিব। উপকথা সকল দেশে প্রচলিত আছে। সকল দেশেই মাতা, পিতা, পিতামহ, পিতামহীগণ—বালকবালিকাদিগের নিকট উপকথা বলিয়া থাকেন। জাপানের পিতা পিতামহীগণ,—পৌত্রপৌত্রগণের নিকট কিরূপ উপকথা বলিয়া থাকেন, দৃষ্টান্তস্বরূপ আজ সেইরূপ একটি গল্প এ স্থানে প্রদান করিব।

গল্পারম্ভ- শিউতেন-দোজি রাক্ষস

জাপানের সম্রাটকে মিকাড়ো বলে। এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মুরাকোমি নামক সম্রাট মিকাড়ো পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। জাপান দ্বীপপুঞ্জের ভিতর সুমিযোশি নামক এক প্রদেশ আছে মুরাকোমি সম্রাটের শাসনকালে এই প্রদেশে ভয়ানক রাক্ষসের উপদ্রব হইয়াছিল। শিউতেন-দোজি নামক এক অতি নিষ্ঠুর রাক্ষসরাজ এই প্রদেশের বন্য অঞ্চলে বৃহৎ এক দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার ভিতর বাস করিতে লাগিল। আপনার সহচর অন্যান্য ভীষণাকৃতি রাক্ষসগণের সহিত বাহির হইয়া সে গ্রামবাসীদিগের গো, মহিষ, মেষ, ছাগ, অশ্ব, গর্দ্দভ প্রভৃতি গৃহপালিত জীবগণকে ভক্ষণ করিতে লাগিল। অবশেষে মনুষ্যমাংসের আস্বাদ পাইয়া, সে নরনারী, বালক-বালিকা শিশু-বৃদ্ধ—সকলকে খাইতে লাগিল। মনুষ্যগণকে ধৃত করিয়া কিছু দিনের নিমিত্ত সে আপনার দুর্গে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিত। কারাবদ্ধ থাকিয়া সেই নরনারীগণকে কিছু দিনের নিমিত্ত তাহার সেবক-সেবিকার কাজ করিতে হইত।

অবশেষে হৃষ্টপুষ্ট হইলে তাহাদিগকে সে রন্ধন করিয়া ভক্ষণ করিত। জাপানের লোক সাকে নামক এক প্রকার উগর সুরা ব্যবহার করিয়া থাকে। এই সুরাপান করিয়া রাক্ষস-রাজ শিউতেন-দোজি সর্ব্বদাই উন্মত্ত অবস্থায় থাকিত। সেই অবস্থায় নর-মাংসের ঝোল, ঝাল, ভাজা, অম্বল রাশি রাশি নর-মাংস ভোজন করিয়াও তাহার ক্ষুধা কিছুতেই নিবৃত্ত হইত না। সে জন্য রাক্ষস-রাজ সসৈন্যে প্রতিদিন মনুষ্য শিকারে বাহির হইত। আজ এ গ্রামে—কাল সে গ্রামে পড়িয়া সে স্থানে অধিবাসিগণকে বন্ধন করিয়া সে আপনার দুর্গে লইয়া যাইত। বলা বাহুল্য যে, রাক্ষসের উপদ্রবে চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গেল। যে স্থানের লোকগণ রাক্ষসের জ্বালায় উৎপীড়িত হইয়া আপন আপন বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া দূরদেশে পলায়ন করিতে লাগিল। কিন্তু নিকটে যতই মনুষ্যের অভাব হইতে লাগিল, দুষ্ট রাক্ষসগণ ততই অগ্রসর হইয়া দূরস্থিত গ্রাম-নগরসমূহ আক্রমণ করিতে লাগিল। এইরূপে ক্রমে কেবল যে সুমিযোশি প্রদেশ জনহীন হইয়া বিজন অরণ্যে পরিণত হইল, তাহা নহে, রাক্ষসের উপদ্রবে অন্যান্য প্রদেশও সেইরূপ দুর্দ্দশাপন্ন হইবার উপক্রম হইল।

সাম্রাজ্য ছারখার হইতে বসিয়াছে দেখিয়া মিকাড়ো ঘোরতর চিন্তিত হইলেন। সম্রাট বৃদ্ধ ছিলেন; রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিবার শক্তি তাঁহার ছিল না। আর শক্তি থাকিলেই বা কি হইবে? নানাপ্রকার মায়া অবলম্বন করিয়া শিউতেন-দোজি মনুষ্যদিগকে ধৃত ও সংহার করিত; মায়া যুদ্ধে অন্যান্য রাক্ষসগণও তাহার সমকক্ষ ছিল না। সুতরাং সম্রাট একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন। আমার সাম্রাজ্য বিনষ্ট হইল, জাপানে মানবকুল নির্ম্মূল হইয়া গেল, গহন কাননে পরিণত হইয়া জাপান রাক্ষসের বাসস্থান হইল,—এইরূপ চিন্তা করিয়া, সম্রাট সর্ব্বদাই অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

মিনামোটো কুলপতি রাসকো

পাত্রমিত্র-সেনাপতিগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া, এক দিন সম্রাট সভায় বসিয়া আছেন। এমন সময় দূত আসিয়া সংবাদ দিল যে, পূর্ব্বদিন দুর্ব্বৃত্ত নিশাচরগণ প্রায় এক শত গ্রাম অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া, তাহাদের অধিবাসিগণকে বন্দী করিয়া রাক্ষস-দুর্গে লইয়া গিয়াছে। এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ করিয়া রাজা কাঁদিতে লাগিলেন; খেদ করিয়া আপনাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন ও কাতর বচনে মনের বেদনা ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। গণ্ডদেশে বামহস্ত রাখিয়া চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে রাজা বলিতে লাগিলেন,—"ধিক্ আমাকে! পুত্রসম প্রজাপুঞ্জকে রক্ষা করিবার সামর্থ আমার নাই। হায়! হায়! এই বিপুল জাপান সাম্রাজ্যের ভিতর এমন কি কোন বীর নাই যে, রাক্ষসকে বধ করিয়া স্বদেশ ও স্বাজাতিকে রক্ষা করে!

রাজার খেদোক্তি সভাসদ্গণ সকলেই শ্রবণ করিল। বড় বড় বীরগণ, বড় বড় সেনাপতিগণ,—সকলেই মস্তক অবনত করিয়া নীরব হইল। মায়া-বিদ্যা-বিশারদ রাক্ষসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করিতে কাহারও সাহস হইল না। মিনামোটো নামক ক্ষত্রিয়কুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করিতে কাহারও সাহস হইল না। মিনামোটো নামক ক্ষত্রিয়কুলের কুলপতি যোরিমিৎসু নামক যুবক আজ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সম্রাট্পদে প্রণিপাত করিবার নিমিত্ত কোন দূরপ্রদেশ হইতে তিনি আগমন করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রকৃত নাম যোরিমিৎসু ছিল বটে; কিন্তু কালক্রমে ইনি রাইকো অর্থাৎ মহাবীর নামে সাধারণের নিকট পরিচিত হইয়াছিলেন। সুতরাং এখন হইতে এই বিবরণে রাইকো নামেই ইনি অভিহিত হইবেন। রাইকো এখন যুবক ছিলেন; তাঁহার বয়ঃক্রম সপ্তদশ কি অষ্টাদশের অধিক হয় নাই। দেখিতে তিনি অতি সুপুরুষ ছিলেন! শরীরের গঠন তাঁহার সুকোমল ছিল; বর্ণ উজ্জ্বল গঙ্গাজলী গোধুমের ন্যায় ছিল, গণ্ডদেশ দুইটি পূর্ণ ছিল, চক্ষু দুইটি বাদামের ন্যায় ঈষৎ বক্রভাবে সন্নিবেশিত ছিল, মস্তকের কেশ ঘোর কৃষ্ণবর্ণের ছিল। জনক রাজার গৃহে ধনুভঙ্গের পূর্ব্বে শ্রীরামচন্দ্রের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যেরূপ কোমলতা সকলে নিরীক্ষণ করিয়াছিল, রাইকোর শরীরেও সেইরূপ কোমলতা ছিল। পুষ্পদলাচ্ছাদিত বজ্রের যেরূপ কোমলতা, রাইকোর দেহে সেইরূপে কোমলা ছিল।

সম্রাটের খেদোক্তি শুনিয়া, রাইকো দণ্ডায়মান হইয়া, যোড় হস্তে নিবেদন করিতে লাগিলেন,—"মহারাজ! আমাকে অনুমতি প্রদান করুন। রক্ষঃকুলের সহিত সংগ্রাম করিয়া, আমি তাহাদিগকে নিহত করিব।"

সম্রাট তাঁহার অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত কুসুম সদৃশ লাবণ্যবিশিষ্ট সুকুমার দেহের প্রতি দৃষ্টি করিয়া উত্তর করিলেন,—"পুত্র! তুমি ধন্য! এরূপ দুঃসাধ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে তুমি যে সাহস করিতেছ, সে জন্য তোমাকে ধন্যবাদ করি। কিন্তু বালক। যে কার্য্যে মহামহাবীরগণ প্রবৃত্ত হইতে, সাহস করিতেছে না, সে কার্য্যে তোমাকে আমি পাঠাইতে পারি না।"

অতি বিনীতভাবে রাইকো পুনরায় নিবেদন করিলেন,—"মহারাজ! মিনামোটো কুলোদ্ভুত ক্ষত্রিয়গণ স্বদেশের হিতসাধনে জীবন বিসর্জ্জনে কখন পরাঙ্মুখ হয় না।

রাক্ষসের সহিত সংগ্রামে যদি বিজয়ী হইতে পারি, তাহা হইলে স্বদেশকে বিষম বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারিব; আর যদি রণস্থলে একান্তই আমি পতিত হই, তাহা হইলে মানবের প্রার্থনীয় স্বর্গ আমার তৎক্ষণাৎ লাভ হইবে।"

সম্রাট,— রাইকোকে অনেক বুঝাইলেন; কিন্তু অটল অচল ভাবে রাইকো বার বার তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অবশেষে সম্রাট বলিলেন,—"যদি তুমি একান্তই রাক্ষরে সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিবে, তাহা হইলে আমিও সসৈন্যে তোমার সহিত গমন করিব। তোমাকে একেলা আমি দুরন্ত রাক্ষসের বিরুদ্ধে পাঠাইতে পারিব না। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি; কিন্তু জীবনের যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, স্বদেশের ও স্বজাতির হিতের নিমিত্ত তাহা আমি বিসর্জ্জন করিব।"

রাইকো উত্তর করিলেন,—"না মহারাজ! তাহা হইবে না। আমার সহিত আপনি যাইলে, অথবা সৈন্য প্রেরণ করিলে, কোন উপকার হইবে না। রাক্ষসগণ মায়াবলে যুদ্ধ করে, বাহুবলে তাহারা পরাজিত হইবে না। কৌশলে তাহাদিগকে বধ করিতে হইবে। সে জন্য মিনামোটো ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব তিন জন বীরকে কেবল সঙ্গে লইয়া, আমি রাক্ষসের বিরুদ্ধে গমন করিব।"

সম্রাটকে অগত্যা সেই প্রস্তাবে সম্মত হইতে হইল। সম্রাটের নিকট বিদায় লইয়া, রাইকো প্রথম দেব-মন্দিরে গমন করিয়া, যথাবিধি পূজা দ্বারা দেবতাদিগকে পরিতুষ্ট করিলেন। তাহার পর তাঁহার তিন জন সঙ্গী ও তিনি নিজে সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিলেন জাপানে সন্ন্যাসীদিগকে যমবুশি বলে। যমবুশিগণ কিছুমাত্র সম্বল সঙ্গে না লইয়া পাহাড়-পর্ব্বত পর্য্যটন করে। সাধু বলিয়া তাহাদিগের কেহ অনিষ্ট করে না;. বরং গৃহস্থগণ আহারাদি প্রদান করিয়া, তাহাদের সন্তোষভাজন হইতে চেষ্টা করে। রাইকো ও তাঁহার সঙ্গিগণ স্কন্ধে একটি করিয়া ঝুলি লইলেন। ঝুলির ভিতর লৌহ-নির্ম্মিত বর্ম্ম ও দুই হস্তে ধারণোপযোগী খড়্গ লুক্কায়িত রাখিলেন। এইরূপে সজ্জিত হইয়া রাইকো, রাক্ষসের দুর্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

যতই তাঁহারা অগ্রসর হইতে লাগিলেন, রাক্ষসের উপদ্রবের কথা লোকের মুখে ততই তাঁহারা শুনিতে লাগিলেন। তাঁহারা রাক্ষসের দুর্গে যাইতেছেন শুনিয়া, সকলেই তাঁহাদিগকে নিষেধ করিতে লাগিল। সকলে বলিল,—"দুর্ব্বৃত্ত সাধু-সন্ন্যাসী কাহাকেও মান্য করে না। একবার তাহাদের হাতে পড়িলে আর রক্ষা নাই, নিশ্চয় খাইয়া ফেলিবে।"

রাইকো উত্তর করিলেন,—"আমাদের প্রাণ যায়,—তাহাও স্বীকার। হয় রাক্ষসগণকে আমরা নিহত করিব আর না হয়, রাক্ষসগণের হস্তে আমরা নিহত হইব। বৃদ্ধাবস্থায় জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া, রোগে নানারূপ কষ্ট ভোগ করিয়া মৃত্যু অপেক্ষা পরহিতে জীবন বিসর্জ্জন করাই শ্রেয়ঃ।"

লোককে এইরূপ উত্তর দিয়া, রাইকো ও তাঁহার বন্ধুগণ পথপর্যটন করিতে লাগিলেন। বহু দিন পথ চলিয়া ও নানাস্থান অতিক্রম করিয়া, ক্রমে তাঁহারা সুমিযোশি প্রদেশের ভিতর প্রবেশ করিলেন। রাক্ষস দ্বারা উপদ্রবের চিহ্ন সকল সেই স্থান হইতে আরম্ভ হইল।

ভয়বিহ্বল পলায়নপর সহস্র সহস্র লোকের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। তাহারা বলিল,—"যে রাক্ষসের ভয়ে জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া, প্রাণ লইয়া আমরা পলায়ন করিতেছি, তোমরা সেই রাক্ষসের মুখে যাইতেছ! ছি ছি! এমন কাজ কখন করিও না। মিছামিছি কেন প্রাণ হারাইবে? ঘরে ফিরিয়া যাও।"

বলা বাহুল্য যে, রাইকো তাহাদের নিষেধ-বাক্য শুনিলেন না। তিনি আরও অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্রমে জনশূন্য ভস্মীভূত নগর ও গ্রাম তাঁহাদের নয়নপথে পতিত হইতে লাগিল। অবশেষে একখানি গ্রামে গিয়া তাঁহারা উপস্থিত হইলেন। সে গ্রামে একটিও মানুষ কি গ্রাম্য পশু ছিল না; আর সে স্থানের সমুদয় গৃহ সমুদয় নর-শোণিতে প্লাবিত হইয়াছিল। এই স্থানে কোনরূপ রাত্রি যাপন করিয়া তাঁহারা আরও অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এখন হইতে আর তাঁহাদের জনমানবের সহিত সাক্ষাৎ হইল না। তাঁহারা দেখিলেন, যে রাক্ষসের উপদ্রবে এই জনাকীর্ণ প্রদেশ এখন একবারে জনশূন্য মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে।

বন, উপবন, পর্ব্বত, প্রান্তর, হ্রদ, নদী অতিক্রম করিয়া, তাঁহারা পথ চলিতে লাগিলেন। সেই জন্যশূন্য দেশে আহারের অভাবে তাঁহাদের বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। ক্রমে তাঁহারা প্রস্তরপূর্ণ কন্টকাবৃত এক পর্ব্বত শ্রেণীর নিম্নে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সে স্থান হইতে দূরে এক অত্যুচ্চ গিরিশিখরে রাক্ষস রাজার দুর্গ তাঁহাদের নয়ন গোচর হইল, কিন্তু পথ ক্রমে এতই দুর্গম হইয়া উঠিল যে, আর তাঁহারা অগ্রসর হইতে পারিলেন না। পথ-শ্রান্তিতে ক্লান্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় ব্যথিত হইয়া, তাঁহাদের শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল। আগে যাইতে আর তাঁহাদের পা উঠিল না। তাঁহারা সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন।

এমন সময় নিকটস্থ সামান্য একটি পর্ব্বতের চূড়ায় তাঁহারা এক বৃদ্ধকে দেখিতে পাইলেন। তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় তাঁহার শরীর ছিল, শুভ্রবর্ণের জটাজুটে তাঁহার মস্তক পরিশোভিত ছিল ও শুভ্রবর্ণের শ্মশ্রু দ্বারা তাঁহার মুখমণ্ডল আবৃত ছিল। পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া রাইকোর সম্মুখে তিনি দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার উজ্জ্বল দেহ ও প্রসন্নমূর্ত্তি দেখিয়া রাইকো বিবেচনা করিলেন যে, ইনি সামান্য ব্যক্তি নহেন। এইরূপ মনে করিয়া তিনি ও তাঁহার সঙ্গিগণ ভক্তিভাবে তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিলেন।

অতি সুমধুর স্বরে বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বৎসগণ! তোমরা কে? এই রাক্ষস ভয়সঙ্কুল প্রদেশ দিয়া তোমরা কোথায় যাইতেছ?"

যোড় হস্তে রাইকো উত্তর করিলেন,—"প্রভো! এই দাসের নাম যোরিমিৎসু, কিন্তু রাইকো বলিয়া সকলে আমাকে সম্বোধন করে। দাস মিনামোটো ক্ষত্রিয়কুলের কুলপতি, আর ইঁহারা তাহার জ্ঞাতি ও বন্ধু। শিউতেন-দোজি রাক্ষসের দুর্গে দাস গমন করিতেছে।"

বৃদ্ধ উত্তর করিলেন,—"পুত্র রাইকো! তোমাকে দেখিয়া আজ আমি পরম সন্তোষ লাভ করিলাম। আমি মনুষ্য নহি, এই সুমিযোশি প্রদেশের আমি প্রদেশ-দেবতা। রাক্ষসের জ্বালায় যেরূপ এ প্রদেশের অধিবাসীগণ উৎপীড়িত হইয়াছে, আমি ও আমার অধীনস্থ যাবতীয় গ্রাম্য-দেবতাগণও সেইরূপ উৎপীড়িত হইয়াছেন। দেশ পরিত্যাগ করিয়া সমুদয় লোক পলায়ন করিয়াছেন। দিনান্তে আমাদিগকে একটি ফুল প্রদান করে এমন লোক এ

দেশে নাই। পূজা অভাবে আমাদের দেব-দেহ জীর্ণ ও শীর্ণ হইয়াছে, অস্থিচর্ম্মসার হইয়া আমরা পথে পথে ভ্রমণ করিতেছি। অসামান্য সাহস সম্পন্ন নির্ম্মলচিত্ত মনুষ্যের সহায়তা ব্যতীত রাক্ষসের মায়াজল আমরা ছিন্ন করিতে পারি না। বৎস রাইকো! তুমি সেই প্রকৃতির লোক। বহু দিন হইতে তোমার প্রতীক্ষায় আমি কালক্ষেপ করিতেছি।"

রাইকো বলিলেন,—"বাবা! তবে এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করুন রাক্ষসের দুর্গে প্রবেশ করিয়া যেন দুর্ব্বৃত্তদিগকে বধ করিতে সমর্থ হই।"

প্রদেশ-দেবতা বলিলেন,—"পুত্র রাইকো! বাহুবলে তুমি রাক্ষসগণকে বধ করিতে পারিবে না। কৌশলে তুমি তাহাদিগকে বধ করিবে। যখন তুমি রাক্ষসের দুর্গে প্রবেশ করিবে, অদৃশ্যভাবে তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া আমি ও যাবতীয় গ্রাম্য-দেবতাগণ তোমাদের সহায়তা করিব। যাহা হউক, আজ তোমরা আমর অতিথি হইয়া এই স্থানে রাত্রিযাপন কর। পানভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়া বিশ্রামে পথ-ক্লান্তি দূর করিয়া, কল্য প্রাতঃকালে পুনরায় পথপর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইবে।"

এই কথা বলিবামাত্র সেই স্থানে চমৎকার এক অট্টালিকার আবির্ভাব হইল। অট্টালিকার ভিতর প্রবেশ করিয়া রাইকো ও তাঁহার সঙ্গিগণ নানা প্রকার সুখাদ্য ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন ও মণিমুক্তখচিত পর্যঙ্কের উপর দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া তাঁহারা পরম সুখে রাত্রিযাপন করিলেন।

প্রভাত হইলে প্রদেশ দেবতা পুনরায় দর্শন দিয়া বলিলেন—"রাইকো! তোমাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আমি তোমাকে দুইটি অদ্ভুত সামগ্রী প্রদান করিতেছি। তাহাদের দ্বারা তোমার বিশেষ উপকার হইবে। প্রথম,—স্বর্ণ নির্ম্মিত এই টুপিটি তোমাকে আমি প্রদান করিলাম। উষ্ণীষের নিম্নে ঠিক মস্তকের উপর তুমি ইহা পরিধান করিবে। যতক্ষণ ইহা তোমার মস্তকে থাকিবে, ততক্ষণ রাক্ষসের শেল, শূল, খড়্গ প্রভৃতি অস্ত্রের প্রহারে বিন্দুমাত্র তুমি আঘাতিত হইবে না। মায়া-অস্ত্র প্রহারেও রাক্ষস তোমার কিছুমাত্র ক্ষতি করিতে পারিবে না। তাহার পর তোমাকে এই ঔষধটি প্রদান করিলাম। রাক্ষস-রাজ সাকে নামক সুরা সর্ব্বদাই পান করে। তাহার সুরার সহিত কোন রূপে এই ঔষধটি তুমি মিশাইয়া দিবে। ঔষধ মিশ্রিত সুরা পান করিলে রাক্ষস হীনবল হইবে ও নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িবে। তখন তুমি তাহাকে অনায়াসেই বধ করিতে পারিবে।"

প্রদেশ-দেবতা রাইকোকে রাক্ষসের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে আরও নানারূপ উপদেশ প্রদান করিলেন। তাহার পর সেই কণ্টকময় দুর্গম পর্ব্বতের উপর পথ দেখাইয়া বহুদূর পর্য্যন্ত তিনি তাঁহাদের সঙ্গে গমন করিলেন। অবশেষে অপরাহ্নে এক হ্রদের কুলে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে প্রদেশ-দেবতা রাইকোর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া অদৃশ্য হইলেন। সেই হ্রদের কুল অনুসরণ করিয়া রাইকো ও তাঁহার সঙ্গিগণ রাক্ষসের দুর্গাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া তাঁহারা দেখিলেন যে, এক প্রবল স্রোতস্বতী নদী আসিয়া সেই হ্রদে পতিত হইয়াছে।

আরও কিছু দূরে অগ্রসর হইয়া রাইকো দেখিলেন যে, সেই নদীতীরে এক যুবতী ভদ্র-

মহিলা বসিয়া রোদন করিতেছে। তাহার পরিধেয় বস্ত্র রক্তে রঞ্জিত হইয়াছিল। নিকটে গিয়া রাইকো তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, তাহার পিতা-মাতা, ভাই-ভগিনীকে রাক্ষসেরা ভক্ষণ করিয়াছে। আপাততঃ তাহাকে দাসী করিয়া রাখিয়াছে কিন্তু কিছু দিন পরে তাহাকেও রাক্ষসেরা ভক্ষণ করিবে।

সে দিন যে সমুদয় মানুষকে বধ করিয়া রাক্ষসগণ রন্ধন করিয়াছিল, তাহাদের রক্তেই তাহার বস্ত্র রঞ্জিত হইয়া গিয়াছে। কাপড় ধৌত করিতে সে নদীকূলে আসিয়াছে। এইরূপে আপনার পরিচয় প্রদান করিয়া যুবতী রাইকোকে রাক্ষস-দুর্গে প্রবেশ করিতে বার বার নিষেধ করিল। কিন্তু রাইকো তাহার নিষেধ শুনিলেন না অবশেষে যুবতী রাক্ষস দুর্গে প্রবেশের পথ রাইকোকে দেখাইয়া দিল।

যথাসময়ে রাইকো ও তাঁহার সঙ্গিগণ দুর্গদ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রকাণ্ড লৌহনির্ম্মিত দ্বার। পর্ব্বতশিখরে অতি উচ্চ প্রাচীর দ্বারা দুর্গটি বেষ্টিত ছিল। সেই প্রাচীরের নিম্নে জলপূর্ণ গভীর খাদ খনিত ছিল। কাহার সাধ্য সে, বিনা অনুমতিতে দুর্গের ভিতর প্রবেশ করে। দুর্গ-দ্বারে বিকটাকার বহুসংখ্যক দানব প্রহরী স্বরূপ নিযুক্ত ছিল। মুখমণ্ডল কাহারও জালার মত, কাহারও দন্ত হস্তি দন্তের ন্যায়, কাহারও কর্ণ সূর্পের ন্যায় কাহারও চক্ষু জ্বলন্ত মালসার ন্যায়। ফল কথা, তাহাদের ভীষণ আকৃতি দেখিলে মানুষের হৃৎকম্প হয়।

সহসা চারি জন মনুষ্যকে দ্বারে দেখিয়া প্রহরিগণ বিস্মিত হইল! তাহার পর যখন রাইকো বলিলেন,—"আমরা সন্ন্যাসী, আজ রাত্রিতে তোমাদের প্রভুর নিকট আমরা আতিথ্য প্রার্থনা করি।" তখন তাহারা হাসি আর রাখিতে পারিল না। বিকট শব্দে হাস্য করিয়া তাহারা নানারূপ পরিহাস করিতে লাগিল। কেহ বা রাইকোর শরীর টিপিয়া আপনার মুখের ভিতব আপনার অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করিয়া ইঙ্গিত করিল যে,—"আজ রাত্রিতে তোমাদের কোমল মাংস ভক্ষণ করিয়া আমরা পরম পরিতোষ লাভ করিব।"

সে সময় সমুদয় বিদ্রূপের উপর ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, রাইকো তাহার প্রভুকে সংবাদ দিবার নিমিত্ত বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে এক জন দাবন দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহাদের রাজার নিকট সংবাদ দিল যে,—"মহারাজ! চারি জন কোমল-মাংসবিশিষ্ট অতি উপাদেয় খাদ্য অকস্মাৎ কোথা হইতে আসিয়া সিংহদ্বারে উপস্থিত হইয়াছে।"

সন্ন্যাসীদিগকে তৎক্ষণাৎ ভিতরে আনিবার নিমিত্ত রাক্ষস-রাজ আদেশ করিল। ভিতরে গিয়া রাইকো দেখিলেন যে, শিউতেন-দোজি সিংহাসনে বসিয়া আছে। বহুসংখ্যক রাক্ষস নানারূপ অস্ত্র ধারণ করিয়া সিংহাসনের নিম্নে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। অন্যান্য রাক্ষসের মূর্ত্তি অতি ভয়ানক বটে; কিন্তু শিউতেন-দোজির আকৃতি— মূর্ত্তি যেরূপ ভীষণ, তাহা বর্ণনা করিতে পারা যায় না। তাহার মুখপানে চাহিয়া দেখিলে মানুষ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হয়। কিন্তু রাইকো ও তাঁহার সঙ্গিগণ মিনা মাটো কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভয় কাহাকে বলে, তাঁহারা জানিতেন না। শিউতেন দোজি রাক্ষসের বিকট মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহারা

কিছুমাত্র শঙ্কিত হইলেন না; কিন্তু রাজাকে যেরূপ সম্মান করা উচিত, তাহা তাঁহারা করিলেন, সাষ্টাঙ্গে ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহারা নয়বার কৌ-চৌ করিলেন, অর্থাৎ ভূমির উপর নয়বার মাথা ঠুকিলেন। তখন রাক্ষস-রাজ তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমরা কে, কোথা হইতে কি জন্য এ স্থানে আসিয়াছ?"

রাইকো উত্তর করিলেন,—"মহারাজ! আমরা সন্ন্যাসী,—আমাদের ঘর-দ্বার নাই। এক তীর্থস্থান হইতে অন্য তীর্থস্থান পর্য্যটন করিয়া আমরা জীবন অতিবাহিত করি। আজ কয়দিন এই প্রদেশে আমরা প্রবেশ করিয়াছি। জনমানবের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। অদ্য দূর হইতে মহারাজের অট্টালিকা দেখিয়া আপনার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। আজ রাত্রির নিমিত্ত মহারাজের আশ্রয় প্রার্থনা করি। সন্ন্যাসীদিগকে দীন-দুঃখী গৃহস্থও এক মুষ্টি অন্ন প্রদান করে। ভরসা করি, মহারাজ আমাদিগকে যৎকিঞ্চিৎ অন্ন ও একটু আশ্রয়দান দিতে কাতর হইবেন না।"

শিউতেন-দোজি ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন,—"স্বইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, আমার ভবনে অনেক লোক আগমন করে। সে সমুদয় লোককে আমি যে ভাবে অভ্যর্থনা করিয়াছি, তোমাদিগকেও আমি সেই ভাবে অভ্যর্থনা করিব।"

এই কথা শুনিয়া উপস্থিত রাক্ষসগণ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। সন্ন্যাসীদিগের এরূপ অভ্যর্থনা হইবে, তাহা সকলেই বুঝিল। কল্য ইহাদিগকে ভক্ষণ করিতে পাইবে, তাহা ভাবিয়া অনেকের মুখে লালা আসিয়া গেল।

শিউতেন দোজি তখন অনুচরদিগকে অনুমতি করিলেন—"আমার গৃহে আজ যাহা কিছু সুখাদ্য প্রস্তুত হইয়াছে, সে সমুদয় আনয়ন কর। আজ আমি যথাবিধি অতিথি সৎকার করিব। অতিথির সহিত একত্রে আজ আমরা সকলে ভোজন করিব।"

ভোজনের আয়োজন হইল। ভিতর ও বাহির হইতে রাক্ষসগণ আসিয়া সারি সারি উপবিষ্ট হইল। অতি সমাদর করিয়া রাক্ষস-রাজ রাইকো ও তাঁহার সঙ্গিগণকে আপনার দক্ষিণ ও বামদিকে বসাইলেন। পরিবেশকগণ সকলের সম্মুখে অনেকগুলি আচ্ছাদিত পাত্র রাখিয়া দিল। আচ্ছাদন খুলিয়া সকলে আহার করিতে আরম্ভ করিল।

আপনার পাত্রের আচ্ছাদন খুলিয়া রাইকো দেখিলেন যে, তাহার ভিতর একটি নরমুণ্ড ও নরপদ রহিয়াছে। সেই নরমুণ্ড হইতে তখনও রক্তধারা বিগলিত হইতেছিল। রাইকোর সঙ্গিগণকেও সেই প্রকার আহার প্রদত্ত হইয়াছিল। রাক্ষসগণও কেবল নরমাংস ভোজন করিতেছিল। সেই কদর্য্য আহারীর সামগ্রী দর্শন করিয়া রাইকো কিছুমাত্র ভয় কি বিস্ময় প্রকাশ করিলেন না। প্রতিদিন যেন তাঁহারা নরমুণ্ডই ভক্ষণ করিয়া থাকেন, এইরূপ মুখ ভঙ্গি প্রদর্শন করিয়া তাঁহারা আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু বস্তুতঃ তাঁহারা নরমাংস আহার করিলেন না। মুণ্ড ও পদ হইতে মাংস ছিঁড়িয়া মুখের কাছে লইয়া কৌশলে ঝুলির ভিতর তাঁহারা নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রাক্ষস-রাজ মনে করিয়াছিল যে, ইহারা ভয়ে কাঁপিতে থাকিবে, তখন ইহাদিগকে লইয়া নানারূপ কৌতুক করিব। সে আশায় সে বঞ্চিত হইল। মনুষ্য হইয়া পাতে নরমুণ্ড দেখিয়া ভয় পাইল না, আর তাহা অক্ষুণ্ণ চিত্তে আহার করিল,

সে জন্য রাক্ষস-রাজ ঘোরতর বিস্মিত হইল।

কিছুক্ষণ পরে রাইকো বলিলেন,—"মহারাজ! আপনার অনুগ্রহে আজ পরম তৃপ্তিলাভ করিলাম। আমরা উদাসীন ভিখারী; এমন সুখাদ্য জনমে কখন ভক্ষণ করি নাই। ইহার বিনিময়ে কোনরূপ যে প্রত্যুপকার করি, সে শক্তি আমাদের নাই। তবে নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া নানা প্রকার বিষয় আমরা অবগত হইয়াছি, মহারাজ সাকে-সুরা পান করিয়া থাকেন। চাউল হইতে প্রস্তুত সাকে সুরা সুগন্ধযুক্ত নহে; কিন্তু এক প্রকার দ্রব্য আমাদের নিকট আছে, যাহা সাকের সহিত মিশ্রিত করিলে পরম উপাদেয় সুরাতে ইহা পরিপূর্ণ হয়। এমন কি, দেবতাগণ যে সুধা পান করেন, ইহা সেই সুধার সমান হয়।"

শিউতেন-দোজি ও তাহার অনুচরগণ রাত্রিদিন অবিরত সাকে পান করিয়া উন্মত্ত অবস্থায় থাকিত; কিন্তু সাকের আস্বাদ ভাল নহে, কষ্টে ইহা পান করিতে হয়। যখন সে শুনিল যে, দ্রব্যগুণে সাকে-সুরাকে পরম উপাদেয় পেয় বস্তুতে পরিণত করিতে পারা যায়, তখন তাহার আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। দুর্গন্ধযুক্ত সাকে-সুরাকে সুগন্ধযুক্ত সুমিষ্ট সুধায় পরিণত করিবার নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ সে আদেশ করিল।

রাক্ষসের নৃত্য

জাপান শীতপ্রধান দেশ। উত্তাপের নিমিত্ত সেই ভোজনাগারেই অগ্নি প্রজ্বলিত ছিল। রাইকোর আদেশে সাকে-পূর্ণ লৌহকটাহ আগুনের উপর বসান হইল। অগ্নির উত্তাপে সুরা ফুটিতে লাগিল। তখন রাইকো প্রদেশদেবতা প্রদত্ত সেই ঔষধ ফুটন্ত সুরার উপর নিক্ষেপ করিলেন। সুরার সহিত ঔষধ উত্তমরূপ মিশ্রিত হইলে, অগ্নি হইতে কড়া নামাইয়া সেই সুরা রাইকো রাক্ষসগণকে পান করিতে দিলেন। রাক্ষসরাজ তাহা পান করিয়া দেখিলেন যে, অতি সমধুর সুরা—অমৃত বলিলেও চলে। সে যতই ইহা পান করিতে লাগিল, বার বার পানের পিপাসা ততই বাড়িতে লাগিল। পাত্রের পর পাত্র পান করিয়া, সে উদর পূর্ণ করিতে লাগিল। অন্যান্য রাক্ষসগণও অমৃত তুল্য এই সুধা প্রাণ ভরিয়া পান করিতে লাগিল। বলা বাহুল্য যে, রাইকো ও তাঁহার সঙ্গিগণ সুরা পান করিলেন না। তাঁহারা ছদ্মবেশী সন্ন্যাসী, সে জন্য কেহ তাঁহাদিগকে পান করিবার নিমিত্ত অনুরোধও করিল না।

ঔষধ-মিশ্রিত সুরা পান করিয়া প্রথম অবস্থায় সকলের মনে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের আবির্ভাব হইল। আনন্দে বিমোহিত হইয়া শিউতেন-দোজি নর্ত্তকীগণকে আনিবার নিমিত্ত আদেশ করিল। বড় বড় মনুষ্যের যুবতী দুহিতাগণকে বলপূর্ব্বক আনিয়া সে নর্ত্তকীরূপে নিয়োজিত করিয়াছিল। তাহাদিগের নৃত্য-গীতে কিছু দিনের নিমিত্ত পরিতোষ লাভ করিয়া অবশেষে সে তাহাদিগকে ভক্ষণ করিত ও পুনরায় নূতন যুবতীগণকে আনিয়া তাহাদের পদে নিযুক্ত করিত। সেবা করিবার নিমিত্ত যে সমুদয় ভদ্রমহিলা নিয়োজিত ছিল, তাহাদের সহিতও সে এইরূপ ব্যবহার করিত। নর্ত্তকীগণ নাচিতে লাগিল, হাততালি দিয়া রাক্ষসরাজ তাল রাখিতে লাগিল। ক্রমে আনন্দে বিভোর হইয়া, সে নিজে উঠিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। ক্রমে অন্যান্য রাক্ষসগণও সেই নৃত্যে যোগ প্রদান করিল। প্রথম মানুষী

নর্ত্তকীদিগের ঝুণু-ঝুণু শব্দ জগৎ স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল। তাহার পর রাক্ষস নর্ত্তকীদিগের গুপ-গাপ শব্দ কম্পিত হইল। সাদামিটি নামক রাইকোর একজন সঙ্গী চমৎকার নাচিতে জানিতেন। রাক্ষসদিগের মন হরণ করিবার নিমিত্ত রাইকোর আদেশে তিনিও নৃত্য আরম্ভ করিলেন। তাঁহার নৃত্য দেখিয়া রাক্ষসগণ ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিতে লাগিল।

নৃত্যের সহিত অবিরত সুরাপানও চলিতেছিল। সুরা ও ঔষধের গুণে রাক্ষসগণ ক্রমেই নিস্তেজ, হীনবল ও হতজ্ঞান হইতে লাগিল। শিউতেন-দোজী রাক্ষস-রাজ সকলের অপেক্ষা অধিক সুরা পান করিয়াছিল। প্রথম সে অজ্ঞান হইয়া ভূতলশায়ী হইল। অনুচরগণ তাহাকে ধরাধরি করিয়া শয়নাগারে লইয়া গেল। তাহার পর রাক্ষসগণ পুনরায় সুরা পান ও নৃত্য আরম্ভ করিল। অবশেষে একে একে সমুদয় দানবগণ উন্মত্ত ও জ্ঞানহত হইয়া ভূতলে পতিত হইল।

তখন রাইকো সঙ্গিগণের সহিত শিউতেন-দোজির শয়নাগারে প্রবেশ করিলেন। সে স্থানে গিয়া দেখিলেন যে, স্বর্ণময় পর্য্যঙ্কে রাক্ষসবাজ অজ্ঞান অবস্থায় পড়িযা আছে, আব অনেকগুলি ভদ্র-ঘরের মানবী তাহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত আছে। কেহ বা তাহাব পদসেবা করিতেছে, কেহ বা পাখা ব্যজন করিতেছে, কেহ বা তাহার মস্তক কণ্ডুয়ন করিতেছে। কারাবদ্ধ মানব ও মানবীগণ রাইকো ও তাঁহার সঙ্গিগণকে রাক্ষসদিগের সহিত একসঙ্গে বসিয়া আহার করিতে দেখিয়াছিল। তাহারা মনে করিয়াছিল যে ইঁহাবা প্রকৃত সন্ন্যাসী নহেন, ছদ্মবেশধারী রাক্ষস। সুতবাং রাইকো ও তাঁহার সঙ্গিগণকে আশ্ব" প্রদান করিয়া বলিলেন,—"ভয় নাই, তোমাদের মত আমরাও মানুষ। সম্রাট কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইযা তোমাদিগকে উদ্ধার করিতে আমবা আসিয়াছি।"

এই কথা বলিয়া রাইকো ও তাঁহার সঙ্গিগণ আপন আপন ঝুলি হইতে বর্ম্ম ও খড়্গ বাহির করিলেন। আপন আপন বর্ম্ম সকলে পবিধান করিলেন। তাহাব পর তাঁহাবা দুই হস্তে ধারণের উপযোগী গরুর ও ক্ষুরের ন্যায় তীক্ষ্ণ খড়্গ লইয়া রাক্ষসের মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু এমন সময ঘরের ভিতর সেই প্রদেশ-দেবতার আবির্ভাব হইল। হাত তুলিয়া তিনি রাইকোকে নিষেধ করিলেন। তিনি বলিলেন,—"বৎস রাইকো! কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর। রাক্ষসের বিষম মায়া! ইহার মস্তক ছেদন করিলেও তৎক্ষণাৎ ইহার মৃত্যু হইবে না। ইহার ছিন্ন মস্তক, ছিন্ন হস্ত ও ছিন্ন পদ তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিবে। ছিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহিত যুদ্ধে তোমরা জয়লাভ করিতে পারিবে না। অতএব এই রজ্জু দ্বারা প্রথম ইহার সর্ব্বশরীর উত্তমরূপে খাটের সহিত বন্ধন কর। তাহার পর ইহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তিল তিল করিয়া কর্ত্তন করিবে।" এই কথা বলিয়া প্রদেশ-দেবতা রাইকোকে একগাছা মায়ারজ্জু প্রদান করিলেন। সেই রজ্জু দ্বারা রাইকো ও তাঁহার সঙ্গিগণ নিদ্রিত হতজ্ঞান রাক্ষসকে উত্তমরূপে খাটের সহিত বন্ধন করিলেন। তাহার পর খড়্গ উত্তোলন করিয়া এককোপে তাহার মস্তক শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। রাক্ষসের মস্তক

কাটিবামাত্র বজ্রনিনাদের ন্যায় ভীষণ শব্দে ঘর পরিপূর্ণ হইল। দুঃখের বিষয় যে, দেবদত্ত মায়া-রজ্জু দ্বারা রাইকো রাক্ষসের মস্তককে ভালরূপে খাটের সহিত বন্ধন করেন নাই সে জন্য যেই তিনি রাক্ষসের মস্তক কাটিয়া ফেলিলেন, আর সেই ছিন্ন মস্তক ঊর্দ্ধে ঘরের ছাদ পর্য্যন্ত উত্থিত হইল। অবশেষে সেই ছিন্ন মস্তক হস্তি-দন্তের ন্যায় দন্ত বাহির করিয়া কড়-মড় শব্দ করিতে করিতে রাইকোর মস্তকের উপর পতিত হইল। রাইকোর মস্তকে লৌহ-নির্মিত সুদৃঢ় শিরোরক্ষক মুকুট ছিল। এক কামড়ে রাক্ষসের মুণ্ড তাহাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিল। ছিন্ন মুণ্ডের কামড়ে রাইকোর মস্তকও সেইরূপ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইত, কিন্তু ভাগ্যে তিনি ঠিক মাথার উপর প্রদেশ-দেবতা-প্রদত্ত সেই স্বর্ণ-টুপি পরিধান করিয়াছিলেন। রাক্ষসের দন্ত সে দেবদত্ত টুপিকে ভেদ করিতে পারিল না। তাহাতেই রাইকোর প্রাণ বাঁচিয়া গেল। এই সময় রাইকোর সঙ্গী অপর তিনি বীর নিশ্চিন্ত ছিলেন না। ইঁহাদের মধ্যে সুনা নামক রাইকোর এক পরম সুহৃদ্ ছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে নানা যুদ্ধে সুনা রাইকোর সহায়তা করিয়াছেন। কোন স্থানে মাকড়শাসুর নামক এক দৈত্য কিছু দিনের নিমিত্ত অতিশয় প্রবল হইয়াছিল। সুনার সাহায্যে বাইকো সেই পর্ব্বতপ্রমাণ মাকড়শাসুরকে বধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহার পর আর এক জন অসুরের উৎপাতে দেশ নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়াছিল, সে অসুরের শরীর ঠিক চরকার ন্যায় ছিল। আকাশের উপর দ্রুতবেগে ঘূর্ণায়মান হইয়া চরকাসুর অকস্মাৎ আজ এ দেশে,কাল সে দেশে পতিত হইত ও বিদ্যুৎসম অগ্নিশিখার ন্যায় ভ্রমণ করিয়া নিমেষের মধ্যে সমুদয় দেশকে ছারখার করিত। তাহাকে বধ করিবার সময়ও সুনা রাইকোর বিশেষরূপ সহায়তা করিয়াছিলেন।

রাইকোর বিপদ

রাইকোর মস্তকের উপর ছিন্ন মুণ্ডের দংশন যখন ব্যর্থ হইল, তখন মুণ্ড কিঞ্চিৎ নামিয়া রাইকোর বক্ষঃস্থল কামড়াইতে চেষ্টা করিল। রাইকোর বক্ষ স্থল বর্ম্ম দ্বারা রক্ষিত ছিল বটে, কিন্তু সে দেবদত্ত বর্ম্ম নহে; সুতরাং রাক্ষসের তীক্ষ্ণ দন্ত অনায়াসে তাহা ভেদ করিতে পারিত। ছিন্ন মুণ্ডের বিপুল বলে রাইকো ভূমির উপর বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার হাত হইতে খড়্গ স্খলিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। দুই হাতে ছিন্ন মুণ্ডের কেশ ধরিয়া রাইকো তাহাকে বক্ষঃস্থল হইতে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টা বৃথা হইল! মুহূর্ত্তকাল আর বিলম্ব হইলে, মুণ্ডের দন্ত রাইকোর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া তাঁহার প্রাণ বিনষ্ট করিত। এমন সময় প্রদেশ-দেবতা পুনর্ব্বার আবির্ভূত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—"সুনা! সুনা! দেখ কি! রাইকোর প্রাণরক্ষা কর।"

চকিতের মধ্যে সুনা রাইকোর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। চকিতের মধ্যে রাইকোর বিপদ তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল। চকিতের মধ্যে সবলে খড়্গ প্রহারে ছিন্ন মুণ্ডকে তিনি দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন; তাহার পর বার বার খড়্গ প্রহারে তিনি মুণ্ডকে তিল তিল করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন। তখন মুণ্ডের আর কোন শক্তি রহিল না। রাইকোর প্রাণ বাঁচিয়া গেল।

এ দিকে রাইকো ও সুনা যখন ছিন্ন মস্তকের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, সেই সময় ও দিকে রাক্ষসের হস্ত-পদ সহসা মত্ত হস্তিবলে রজ্জু হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত চেষ্টা করিল; কিন্তু সে দেবদত্ত মায়া-রজ্জু। রাক্ষসের হস্ত পদ সে রজ্জুকে ছিন্ন করিতে পারিল না। খাটসহ রজ্জু বারবার ছাদের নিকট উঠিয়া পুনরায় নিম্নে পতিত হইয়া সকলকে বধ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু রাক্ষসের সে চেষ্টা বৃথা হইল। তাহার শরীর হইতে মস্তক ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। মস্তকবিহীন রাক্ষস শরীরে দৃষ্টিশক্তি ছিল না। খাট যেই নিম্নে পতিত হয়, আর রাইকো ও তাঁহার সঙ্গিগণ কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া দণ্ডায়মান হন। সেজন্য একবারও ঠিক তাঁহাদের মস্তকের উপর খাট পতিত হইল না। খাট যেই নিম্নে উপস্থিত হয়, আর রাইকোর দুইজন সঙ্গী খড়্গদ্বারা রাক্ষস-শরীরের উপর কোপ মারিতে থাকেন। মুণ্ডকে তিল তিল করিয়া, রাইকো ও সুনা এই কার্য্যে যোগপ্রদান করিলেন। চারিজনের ক্রমান্বয়ে প্রহারে রাক্ষসের শরীর খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। তখন আর তাহার কোন শক্তি রহিল না। রাক্ষসরাজ দুরাত্মা শিউতেন-দোজি এইরূপে রাইকো ও তাঁহার সঙ্গীগণের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইল।

জয়লাভ

শয়নাগারের ভীষণ কোলাহলে অন্যান্য রাক্ষসও ক্রমে জাগরিত হইল। অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া প্রবলবেগে তাহারা সেইস্থানে উপস্থিত হইল। রাইকোর ও তাঁহার সঙ্গিগণের সহিত তাহাদের তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া গেল। ভাগ্যে শয়নাগারের ন্যায় সঙ্কীর্ণ স্থানে এই যুদ্ধ হইল। সে জন্য দ্বারে দাঁড়াইয়া সেই অল্পসংখ্যক মনুষ্য বহুসংখ্যক রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন। রাক্ষসগণ চারিদিক্ হইতে তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিতে পারিল না। তাহা ব্যতীত দেবদত্ত ঔষধ মিশ্রিত সুরা সেবনে রাক্ষসগণ নিস্তেজ ও হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল ও সুরার উন্মত্ততায় তাহাদের বুদ্ধি লোপ পাইয়াছিল। যাহা হউক, তথাপি রাইকো ও তাঁহার বন্ধুগণকে সমস্ত রাত্রি সেই রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। ঠিক প্রভাতের সময় শেষ চারিজন রাক্ষস রাইকো ও তাঁহার বন্ধুগণের নিদারুন খড়্গপ্রহারে হত হইয়া ভূমিতে পতিত হইল।

যে যুবতীগণ রাক্ষসরাজের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিল, এই ভয়ানক যুদ্ধের সময় তাহাদের কেহ কেহ রাইকোর সহায়তা করিয়াছিল, কেহ বা ঘরের এক কোণে বসিয়া কাঁদিতেছিল। কেহ বা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া রাইকো ও তাঁহার সঙ্গিগণ তাহাদের সান্ত্বনা করিলেন। তাহার পর রাক্ষসের কারাগার কোথায়, তাহা দেখাইয়া দিতে বলিলেন্। দুর্গের নিম্নে কিছু দূরে রাক্ষস-রাজের কারাগার ছিল। যুবতীগণ সুড়ঙ্গপথে রাইকো ও তাঁহার সঙ্গিগণকে সেই স্থানে লইয়া গেল! সে স্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা দেখিলেন যে, দ্বার-প্রহরী স্বরূপ আর দুইজন রাক্ষস রহিয়াছে। তাহাদের সহিত পুনরায় ঘোরতর সংগ্রাম বাধিয়া গেল। কিন্তু রাইকো ও তাঁহার বীরগণ অবিলম্বে তাহাদিগকে

পরাভূত করিয়া বাঁধিয়া ফেলিলেন। রাইকো মনে করিলেন যে, জীয়ন্ত অবস্থায় এই দুই রাক্ষসকে আমি সম্রাটের নিকট লইয়া যাইব।

রাক্ষস দুইজনকে বন্ধন করিয়া তাঁহারা কারাগারের ভিতর প্রবেশ করিলেন। সে স্থানে বহুসংখ্যক নরনারী কারাবদ্ধ ছিল। রাইকো তাহাদিগকে উদ্ধার করিলেন। তাহাদের আনন্দধ্বনিতে জগৎ পরিপূর্ণ হইল। দুই হাত তুলিয়া তাহারা রাইকোর প্রশংসা করিতে লাগিল। সে স্থান হইতে যুবতীগণ রাইকোকে আর একটি পর্ব্বত-গহ্বরে লইয়া গেল। সে স্থানে রাক্ষসেরা মনুষ্যগণকে আহার করিবার পূর্ব্বে বধ করিত। সে স্থানের মৃত্তিকা নরশোণিতে সিক্ত হইয়াছিল, আর চারিদিকে স্তূপাকার হইয়া নরমুণ্ড, নর-অস্থি ও নর-কঙ্কাল পড়িয়াছিল। তাহা দেখিয়া রাইকো ঘোরতর ক্রুদ্ধ হইলেন। বন্দী রাক্ষস দুইজনকে তৎক্ষণাৎ বধ করিবার নিমিত্ত তিনি আজ্ঞা করিলেন। রাইকোর সঙ্গিগণ তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের মাথা কাটিয়া ফেলিল।

রাইকোর মনস্কামনা এক্ষণে সিদ্ধ হইল। রাক্ষসের দুর্গে যত ধনরত্ন ছিল, তাহা লইয়া ও রাক্ষসকর্ত্তৃক ধৃত সহস্র সহস্র নর-নারীদিগকে লইয়া, রাইকো সম্রাটের রাজধানী অভিমুখে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। কখনও সাক্ষাৎভাবে কখনও অসাক্ষাৎভাবে প্রদেশ দেবতা তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে রহিলেন। সূর্য্য সেই কয়দিন তাহাদের উপর সামান্যভাবে কেবল একটু মৃদু জ্যোতি ও উত্তাপবিশিষ্ট কিরণ বর্ষণ করিলেন। মনোহর গন্ধপূর্ণ বায়ু ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতে লাগিল। পথে বৃক্ষ সমুদয় তাঁহাদিগকে সুমিষ্ট ফল প্রদান করিল। নির্ঝর সকল সুশীতল বারি প্রদান করিয়া তাঁহাদের তৃষ্ণা নিবারণ করিল। অন্তরীক্ষে থাকিয়া গ্রাম্যদেবতাগণ তাঁহাদের উপর পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহার পর বিজন সুমিযোশি প্রদেশ অতিক্রম করিয়া যখন তাঁহারা অন্যান্য জানকীর্ণ প্রদেশে প্রবেশ করিলেন, তখন সে স্থানের অধিবাসীগণ কিরূপ সমারোহের সহিত তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিল, সে কথা আর প্রকাশ করিয়া বলিতে হইবে না। তাহার পর সম্রাটের সভায় উপস্থিত হইলে তিনি রাইকোর কিরূপ সম্মান ও সমাদর করিলেন, সে কথাও প্রকাশ করিয়া আর বলিতে হইবে না। দীপমালায় কয়েকদিন নগরের লোক আপন আপন গৃহ আলোকিত করিল। মহোৎসবে কিছুদিন নগর পূর্ণ হইল। অবশেষে সম্রাট, রাজকবিকে ডাকিয়া রাইকো ও তাঁহার সঙ্গিগণের কীর্ত্তি সুমধুর ভাষায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন। সেই বিবরণ হইতে এই গল্পটি সংগৃহীত হইল।

——০——

পূজার ভূত

প্রথম অধ্যায়— ভয়ঙ্কর বাড়ী

আমার নাম তারক। কলিকাতায় আমি বোর্ডিংয়ে থাকি। পূজার সময় আমি বাড়ী আসিয়াছি। আমার নিজের বাড়ী নয়, মামার বাড়ী। মামার বাড়ীতেই আমরা মানুষ হইয়াছি। আমি ও আমার ভনিগী প্রভা। শামীমাসী আমাদিগকে মানুষ করিয়াছে। আমার মাকেও সে মানুষ করিয়াছিল। শামীমাসী সদ্‌গোপের মেয়ে।

সন্ধ্যার সময় আমরা শামীমাসীকে ঘিরিয়া বসিলাম। আমি, প্রভা, আর আমার মামাতো ভাই ও ভগিনীগণ। আমি বলিলাম,—"শামীমাসী! আজ তোমাকে একটি গল্প বলিতে হইবে। কেমন মেঘ করিয়াছে। দেখ! কেমন অন্ধকার হইয়াছে। কেমন টিপটিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। আর বাতাসের একবার জোর দেখ। গাছের পাতার ভিতর দিয়া শোঁ শোঁ করিয়া চলিতেছে। যেন রাগিয়া কি বলিতেছে। এই অন্ধকারে এমন দুর্য্যোগের সময় ভূত-প্রেত সব বাহির হয় বাপরে! গা যেন শিহরিয়া উঠে।"

শামীমাসী বলিল,—"এই পূজোর সময়—এইরূপ দুর্য্যোগের সময়, তোমার মাকে লইয়া আমি বড় বিপদে পড়িয়াছিলাম। এখনও সে কথা মনে করিলে ভয়ে আমার বুক ধড়ফড় করে।" --আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি হইয়াছিল শামীমাসী?"

শামীমাসী উত্তর করিল,—"না, সে কথা এখন তোমাদিগকে আমি বলিব না। তোমবা ছেলেমানুষ! সে কথা শুনিলে তোমাদের ভয় করিবে।"

আমরা সকলেই বলিলাম,—"সে কথা শুনিলে আমাদের ভয় করিবে না।"

যাহা হউক, অনেক জেদাজেদির পর শামীমাসী সে গল্প বলিতে সম্মত হইল। শামীমাসী বলিল,—"তারক ও প্রভার মায়ের নাম সীতা ছিল। সীতার মা, অর্থাৎ তোমাদের মাতামহীর নাম তারামণি ছিল। মৃত্যুশয্যায় তিনি আমাকে বলিয়া যান,—'শামী! আমার কাছে তুই সত্য কর যে, সীতাকে তুই কখন ছাড়িয়া যাবি না। সীতা পাঁচ বৎসরের শিশু পৃথিবীতে তাহার আর কেহ নাই।"

সীতাকে আমি দিদিমণি বলিয়া ডাকিতাম। আমি বলিলাম,—"মাতাঠাক্‌রুণ! দাদাবাবু (অর্থাৎ তোমাদের মার ভাই) ও দিদিমণি কোথায় কাহার কাছে থাকিবে, তাহা আমি জানি না। দিদিমণি যাহাদের কাছে থাকিবে, তাহারা যদি আমাকে ছাড়াইয়া দেয়, তাহা হইলে আমি কি করিতে পারি? কিন্তু তাহারা যদি আমাকে রাখে, তাহা হইলে তোমার গায়ে হাত দিয়া আমি দিব্য করিয়া বলিতেছি যে, দিদিমণিকে আমি কখন ছাড়িব না?"

তোমাদের মাতামহীর মৃত্যু হইল, তোমাদের মামা, যাহার এই বাড়ী, তিনি তখন বালক। লেখাপড়া শিখাইবার নিমিত্ত এক জন আত্মীয় তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া গেলেন।

সীতা তাহার মামার বাড়ীতে গেল। সীতার মামা আমাকে ছাড়াইলেন না। আমি দিদিমণিকে মানুষ করিতে লাগিলাম।

দিদিমণির মামারা এক সময়ে খুব বড়মানুষ ছিলেন। শুনিলাম যে, তাহার মাতামহ জগমোহন রায় চৌধুরী এক জন দুর্দ্দান্ত লোক ছিলেন। দিদিমণিকে লইয়া আমি যখন তাঁহার বাড়ীতে যাইলাম, তখন তিনি জীবিত ছিলেন না। দিদিমণির মামাও দেশে থাকিতেন না, পশ্চিমে কোথায় কর্ম্ম করিতেন। দিদিমণিকে বাড়ীতে রাখিয়া তিনি সে স্থানে চলিয়া গেলেন। সে বাড়ী কি ভয়ঙ্কর! তিন মহল বাড়ী বাহির-বাড়ীতে, মাঝের বাড়ীতে, ভিতর বাড়ীতে, একতলায় দোতলায় কত যে ঘর, তাহা গণিতে পারা যায় না। কিন্তু সব ভোঁ ভোঁ, দেখিলেই যেন ভূতের বাড়ী বলিয়া মনে হয়; বাহিরের বাড়ীতে কি মাঝের বাড়ীতে জন-প্রাণী বাস করে না। এত বড় বাড়ীতে আমরা কেবল ছয় জন রহিলাম; (১) তোমার মায়ের পিসী অলক ঠাক্‌রুণ, তাঁহার বয়স প্রায় আশী হইয়াছিল, আর তিনি সম্পূর্ণ কালা ছিলেন। (২) আর একজন ব্রাহ্মণী, তাঁহার সহচরী, তাঁহারও বয়স বড় কম হয় নাই। তিনি রন্ধন করিতেন। (৩) একজন চাকর, তাহার নাম পিতেম। (৪) পিতেমের স্ত্রী, তাহার নাম বিলাসী। (৫) তাহার পর আমি ও (৬) তোমাদের মা, আমার দিদিমণি, সীতা। বাড়ীর ভিতর দোতলায় তিনটি ঘরে আমরা ছয় জনে বাস করিতে লাগিলাম! প্রথম অলক ঠাক্‌রুণ ও সহচরীর ঘর; তাহার পার্শ্বে পিতেম ও বিলাসীর ঘর। পশ্চিম দিকে এই তিনটি ঘর ছিল! উত্তর ও পূর্ব্বদিকে অনেক ঘর পড়িয়াছিল। বিলাসীর ঘরের পার্শ্বে আর একটি ঘর লইয়া আমি দিদিমণির খেলাঘর বাঁধিয়া দিয়াছিলাম। বাটীর চারিদিকে অনেক দূর পর্য্যন্ত আঁখ, কাঁটাল, নারিকেল, সুপারী প্রভৃতি নানা গাছের বাগান ছিল। বাগানের ভিতর চারি পাঁচটি পুকুর ছিল। উত্তর দিক ভিন্ন বাটীর আর চারিদিকে গ্রাম ছিল! কিন্তু সে মিথ্যা গ্রাম, ম্যালোরিয়া জ্বরের উপদ্রবে অনেক লোক মরিয়া গিয়াছে; অনেক লোক ঘরদ্বার ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছে। বাটীর উত্তর দিকে মাঠ, যতদূর দেখিতে পাই, ততদূর মাঠ ধূ ধূ করিতেছে।

শ্মশানের ন্যায় সেই বাড়ীতে গিয়া আমি মনে করিলাম,—"ওমা! এ বাড়ীতে আমি কি করিয়া থাকিব? ভয়েই মরিয়া যাইব।"

"যাহা হউক, যেখানে দিদিমণি, সেখানে সব ভাল, —সেইখানেই আলো,—সেইখানেই সুখ। দিদিমণির দৌড়াদৌড়ি, দিদিমণির খেলা, দিদিমণির কথা, দিদিমণির হাসিতে সেই শ্মশানভূমি,—যেন স্বর্গতুল্য হইল। এমন যে অলক-ঠাকুরুণ, যাহার গোমড়া মুখ দেখিলে ভয় হয়, দিদিমণিকে দেখিলে তাঁহারও মুখ যেন একটু উজ্জ্বল হইত, তাঁহারও মুখে যেন একটু হাসি দেখা দিত। দিদিমণির যেমন রূপ, তেমনি গুণ। তেমন ফুটফুটে, দুধে আলতার রং আমি আর কোন মেয়ের দেখি নাই। কেমন পুরন্ত গাল দুইটি, কেমন ছোট্টো হাঁ টুকু। কেমন টুকটুকে ঠোঁট, কেমন পটল-চেরা ঢুলু ঢুলু উজ্জ্বল চক্ষু, কেমন কাল কাল চক্ষুর পাতা, কেমন সরু সুর চক্‌চকে রেশমের মত নরম চুল। হা কপাল! সে দিদিমণিকে ছাড়িয়া এখনও আমি প্রাণ ধরিয়া বাঁচিয়া আছি। তারপর দিদিমণি যখন কথা

কহিত, তখন প্রাণ যেন শীতল হইত, প্রাণের ভিতর দিদি আমার যেন সুধা ঢালিয়া দিত।

দিদিমণিকে লইয়া আমি সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলাম। একবার এই সময় ঘোরতর দুর্যোগ করিয়াছিল। বাহিরে বাতাস হুহু করিয়া বহিতেছে। দিদিমণিকে লইয়া আমি শুইয়া আছি। সহসা বাহির-বাড়ীতে বেহালার শব্দ হইল। রাত্রি তখন প্রায় দুই প্রহর হইয়াছিল। আমি মনে করিলাম যে, এত রাত্রিতে আমাদের বাহির-বাড়ীতে বেহালা বাজায় কে? বাহির-বাড়ীতে তো কেহ বাস করে না।

পরদিন আমি বাহির-বাড়ীতে গিয়া চারি দিক দেখিলাম। জনপ্রাণীকেও সে স্থানে দেখিতে পাইলাম না। পোড়ো ভাঙ্গা বাড়ীর যেরূপ অবস্থা হয়, বাহির বাড়ীর সেইরূপ অবস্থা হইয়াছিল।

সে দিন বিলাসীকে একবার একেলা পাইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"বিলাসি! কাল রাত্রিতে বাহির-বাটীতে বেহলা কে বাজাইতেছিল?" --আমার কথা শুনিয়া বিলাসীর মুখ শুষ্ক হইয়া গেল। আম্‌তা আম্‌তা করিয়া সে উত্তর করিল,—"বেহালা! বেহালা আবার কে বাজাইবে? ও বাতাসের শব্দ।" --বিলাসীর কথায় আমার প্রত্যয় হইল না। আমি নিশ্চয় বুঝিলাম যে, সে আমার নিকট কোন বিষয়ে গোপন করিতেছে।

বিলাসী পুনরায় বলিল,—"যাহা হউক, দিদিমণিকে তুমি সদর বাড়ীতে যাইতে দিও না। সাপ খোপ কি আছে না আছে, কাজ কি ওদিকে গিয়া।

আরও কিছুদিন গত হইয়া গেল। একবার নয়, আরও অনেকবার আমি সেই বেহালার শব্দ শুনিতে পাইলাম। যখনই রাত্রিকালে বাদলা ও দুর্যোগ হয়, তখনই বাহির-বাড়ীতে কে যেন প্রাণপণে বেহালা বাজায়। কেবল বেহালা নহে, সে বৎসর পূজার সময়া মহা-অষ্টমীর রাত্রিতে বাহির-বাড়ীতে আমি শাঁকঘন্টার শব্দও শুনিয়াছিলাম, ধূপ-ধূনার গন্ধও পাইয়াছিলাম। বলিদানের সময় যেমন এক জন ভক্ত বিকট স্বরে মা মা বলিয়া চীৎকার করে, সে শব্দও শুনিয়াছিলাম। এ সমুদয় ব্যাপারের অর্থ কি, তাহা জানিবার নিমিত্ত বৃদ্ধা সহচরীকে, পিতেমকে, বিলাসীকে আমি বার বার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। কিন্তু কেহই আমাকে বলে নাই। "ও কিছু নয়", এই কথা বলিয়া সকলে প্রকৃত তত্ত্ব আমার নিকট গোপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল।

এইরূপ সে স্থানে আমাদের দিন কাটিতে লাগিল। কত শতবার আমি সেই বেহালার শব্দ শুনিতে পাইলাম। পুনরায় পূজার সময় আসিল। মহাষ্টমীর দিন দুই প্রহরের সময় দিদিমণি, পিতেম ও বিলাসীর সহিত গ্রামের ভিতর পূজা দেখিতে গিয়াছিল। আমি বিদেশী লোক, আমাকে কেহ নিমন্ত্রণ করে নাই, সে জন্য আমি তাহাদের সঙ্গে যাই নাই। পূজা দেখিয়া বেলা পাঁচটার সময় দিদিমণি ফিরিয়া আসিল। বিলাসী আমাকে বলিল,-- "যদু ভড়ের বাড়ী পূজার এবার খুব ধুম। আহা! কি চমৎকার প্রতিমা করিয়াছে। আর শামীদিদি, ভড় গিন্নী তোমাকে অনেক করিয়া যাইতে বলিয়াছে।"

আমি বলিলাম,—"আচ্ছা, বিলাসী! তবে আমি একবার মাকে দেখিয়া আসি। তুই ভাই দেখিস যেন দিদিমণি কোথাও না যায়।"

এই কথা বলিয়া আমি ভড়েদের বাড়ী ঠাকুর দেখিতে যাইলাম। ভড়গিন্নী আমাকে অনেক আদর করিলেন। অনেকগুলি খই মুড়কি নারিকেল-সন্দেশ রসকরা—আরও কত কি আমার কাপড়ে বাঁধিয়া দিলেন। ফিরিয়া আসিতে আমার সন্ধ্যা হইয়া গেল।

দ্বিতীয় অধ্যায়– আয় না ভাই

বাড়ী আসিয়া তাড়াতাড়ি আমি বিলাসীর ঘরে যাইলাম। দিদিমণিকে সে স্থানে দেখিতে পাইলাম। না।

বিলাসী বলিল,—"বোধ হয় অলক ঠাক্রুণের ঘরে আছে।" রুদ্ধশ্বাসে সে ঘরে আমি দৌড়িয়া যাইলাম। অলক ঠাকুরুণ ও সহচরী দুইজনেই তখন সে ঘরে। দিদিমণিকে দেখিতে না পাইয়া সহচরীকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম। সহচরী উত্তর করিলেন,—"কৈ! সীতা ত এ ঘরে আসে না!"

এই কথা শুনিয়া প্রাণ আমার উড়িয়া গেল। পুনরায় আমি বিলাসীর ঘরে যাইলাম। কাঁদিতে কাঁদিতে আমি বিলাসীকে তিরস্কার করিতে লাগিলাম। –বিলাসী কাঁদিতে লাগিল। সে বলিল,—"এইমাত্র আমার ঘরের বারাণ্ডায় সে খেলা করিতেছিল। ঘরের ভিতর আমি কাজ করিতেছিলাম। বোধ হয়, অন্য কোন ঘরে সে খেলা করিতেছে।'

এমন সময় পিতেম আসিয়া উপস্থিত হইল। আমার কান্না ও বিলাসীকে ভর্ৎসনার শব্দ শুনিয়া সহচরীও সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। প্রদীপ হাতে লইয়া সকলে মিলিয়া আমরা বাড়ী আতিপাতি করিয়া খুঁজিতে লাগিলাম। ভিতর-বাড়ী খুঁজিয়া মাঝের বাড়ী, তাহার পর সদর বাড়ীর সকল ঘর তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলাম; কিন্তু কোন স্থানে দিদিমণিকে দেখিতে পাইলাম না। মাথা খুঁড়িয়া বুক চাপড়াইয়া আমি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলাম। আমি ভাবিলাম যে, হয় গহনার জন্য দিদিমণিকে কেহ মারিয়া ফেলিয়াছে কিংবা পুষ্করিণীতে পড়িয়া সে ডুবিয়া গিয়াছে। সমস্ত বাড়ী ওলট পালট করিয়া অবশেষে আমরা বাগান ও পুকুবের ধারগুলি মনোযোগের সহিত দেখিলাম। কিন্তু কোন স্থানে দিদিমণির চিহ্নমাত্র দেখিতে না পাইয়া তাহার মন কেমন করিয়াছিল তোমাকে খুঁজিবার নিমিত্ত নিশ্চয় সে পূজা-বাড়ীর দিকে গিয়াছে। আমি এখনই তাহাকে আনিতেছি।" এই কথা বলিয়া পিতেম গ্রামের দিকে চলিয়া গেল।

কিন্তু তা বলিয়া আমরা নিশ্চিত থাকিতে পারিলাম না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমাদের বাড়ী ও বাগানের উত্তর দিকে দূর পর্য্যন্ত মাঠ ছিল। দিদিমণিকে খুঁজিবার নিমিত্ত বিলাসী ও আমি সেই মাঠের দিকে যাইলাম। মেঘ করিয়াছিল, খুব অন্ধকার হইয়াছিল। তাহার উপর এখন আবার বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল। কিছুক্ষণ পরে সম্মুখে আমরা এক প্রকার সাদা কি দেখিতে পাইলাম। বিলাসীর বড় ভয় হইল। সে বলিল,—"দিদি, ঐ দেখ একটি শাকচূর্ণী আসিতেছে। এখনি আমাদের খাইয়া ফেলিবে। আর গিয়া কাজ নাই। এস, বাড়ী ফিরিয়া যাই। এতক্ষণ দিদিমণি বাড়ী আসিয়া থাকিবে।'

কোন উত্তর না দিয়া বিলাসীর আমি হাত ধরিলাম, আর সেই সাদা জিনিসের দিকে

তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিলাম। সেও অন্য দিক হইতে আমাদের দিকে আসিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরে তাহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। কাপড় ঢাকা তাহার বুকের উপর কি ছিল। আমরা কোন কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে না করিতে সে বলিল,—"তোমাদের মেয়েটি মাঠের মাঝখানে গাছতলায় অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল। কি করিয়া সে মাঠের মাঝখানে আসিয়াছিল, তাহা আমি বলিতে পারি না। আমি দেখিতে পাইয়া এখন তোমাদের বাড়ী লইয়া যাইতেছি।"

তাড়াতাড়ি দিদিমণিকে আমি তাহার কোল হইতে আপনার কোলে লইলাম। কিন্তু দিদিমণির সর্ব্ব শরীরই ঠাণ্ডা দেখিয়া আমার প্রাণ উড়িয়া গেল। আমি ভাবিলাম, সে মরিয়া গিয়াছে। কাঁদিতে কাঁদিতে আমি তাহার নাকে ও বুকে হাত দিয়া দেখিলাম যে, নাক দিয়া অল্প অল্প নিশ্বাস পড়িতেছে। তাহা দেখিয়া প্রাণে আমার কতকটা আশা হইল। তাড়াতাড়ি মাঠ পার হইয়া আমরা বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। অনেক তাপ-সেক করিতে করিতে দিদিমণির চেতনা হইল। সেই চন্দ্রমুখে মধুর হাসি দেখা দিল, সুধামাখা দুই একটি কথা দিদিমণির মুখ হইতে বাহির হইল। অল্প গরম দুধ আনিয়া সহচরী তাহাকে খাইতে দিলেন। তাহার সেই পদ্ম চক্ষু দুটি ঘুমে বুজিয়া গেল। সে রাত্রিতে দিদিমণিকে আমরা কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না।

দূরে মাঠের মাঝখানে একেলা সে কি করিয়া গিয়াছিল, পরদিন সেই কথা দিদিমণিকে আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম। দিদিমণি বলিলেন,—"বারেণ্ডায় আমি খেলা করিতেছিলাম। তাহার পর যে ঘরে আমার খেলা-ঘর আছে, আমি তাহার ভিতর যাইলাম। সেই ঘরের জানালার ধারে যেই দাঁড়াইয়াছি, আর দেখি না ঠিক তাহার নীচেতে বাগানে একটি মেয়ে রহিয়াছে। মেয়েটি আমার মত বড়, কিন্তু খুব সুন্দর। উপর দিকে আমার পানে চাহিয়া সে বলিল,—"সীতা! নেমে আয় না ভাই, আমরা দুই জনে খেলা করি।" আমি বলিলাম,—"না ভাই! এখন আমি নীচে নামিয়া যাইতে পারিব না। সন্ধ্যা হইয়াছে এখন নীচে নামিবার সময় নয়। বিলাসী আমাকে বকিবে, তাহার পর শামী আসিয়া আমাকে বকিবে। কাল সকালবেলা তুমি আসিও দুই জনে তখন অনেকক্ষণ খেলা করিব।" মেয়েটি বলিল,—"এখনও তেমন সন্ধ্যা হয় নাই, এখনও অনেক আলো রহিয়াছে। এই দেখ আমার মাথায় রক্ত পড়িতেছে, তবুও দেখ আমি খেলা করিতেছি। আয় না ভাই।"

তবুও আমি নামিলাম না। নীচে নামিতে মেয়েটি আমাকে বার বার বলিতে লাগিল। শেষে সে মাটীর উপর বসিয়া পড়িল, বসিয়া হাপুস নয়নে কাঁদিতে লাগিল। আমি আর থাকিতে পারিলাম না। নীচে নামিয়া বাটীর বাহির হইয়া আমি তাহার কাছে যাইলাম। কিছুক্ষণ বাগানের ভিতর আমরা দুই জনে খেলা করিলাম। এক স্থানে অনেকগুলি রজনীগন্ধা ফুল ফুটিয়া. একটি গাছ আলো করিয়াছিল। নীচে হইতে যত পারিলাম, সেই টগর ফুলও আমরা তুলিলাম। কেমন করিয়া জানি না, সেই মেয়েটির সঙ্গে অনেক পথ চলিয়া ক্রমে মাঠের মাঝখানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সে স্থানে একটি গাছ ছিল। সে গাছতলায় একটি মেয়ে-মানুষ বসিয়া কাঁদিতেছিল। আমার মাকে স্বপ্নের ন্যায় আমার মনে

পড়ে। সে মেয়ে মানুষটি ঠিক আমার মায়ের মত। সেই রকম রং, সেই রকম মুখ, সেই রকম চুল, সেই রকম কথা। আদর করিয়া তিনি আমাকে কোলে লইলেন, আমার মুখে তিনি কত চুমা খাইলেন। কোলে বসাইয়া আমার মাথায় তিনি হাত বুলাইতে লাগিলেন। তাহার পর কি হইল আর আমার মনে নাই।"

তৃতীয় অধ্যায়– বালিকা ভূত

দিদিমণির এই কথা শুনিয়া সহচরী পিতেমকে চক্ষু টিপিলেন। তাহার পর তিনি বিলাসীর গা টিপিলেন। ইহার মানে আমি কিছু বুঝিতে পরিলাম না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"সে মেয়েটি কে? সে তো বড় দুষ্ট মেয়ে দেখিতেছি। তাহাকে আর বাগানে আসিতে দেওয়া যাইবে না।"

আমার কথার কোন উত্তর না দিয়া সহচরী বলিলেন,—"এ বিষয় অলক ঠাক্‌রুণকে জানাইতে হইবে। তিনি যেরূপ বলেন, সেইরূপ করিতে হইবে।" এই কথা বলিয়া সহচরী সে ঘর হইতে চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি আমাকে পিতেমকে ও বিলাসীকে অলক ঠাক্‌রুণের ঘরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। দিদিমণিকে কোলে লইয়া আমি পিতেম ও বিলাসীর সঙ্গে সেই ঘরে যাইলাম। অলক ঠাকুরুণ থুড় থুড়ে বুড়ী হইয়াছিলেন। তিনি অধিক কথা বলিতে পারিতেন না। তাঁহার হইয়া সহচরী আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন,— অলক ঠাকুরুণ তোমাকে বলিতে বলিলেন যে, সে মেয়েটি মানুষ নহে। তাহার মা, যাঁহাকে সীতা গাছতলায় দেখিয়াছিল, তিনি অলক ঠাক্‌রুণের ভাইঝি, সীতার মাসী। অনেক দিন হইল, তিনি ও তাঁহার কন্যা অপঘাত মৃত্যুতে মরিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের গতি হয় নাই, এখন তাঁহারা এরূপ হইয়া আছেন। তাঁহারা সর্ব্বদা বিশেষতঃ ঝড় বাতাস বাদলার দিনে, আর এই পূজার সময়, বাড়ীর চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়ান। পিতেম, বিলাসী আর তুমি শামী, তোমাদের সকলকে অলক ঠাক্‌রুণ বলিতেছেন যে, সীতাকে তোমরা খুব সাবধানে রাখিবে, নিমিষের নিমিত্ত তোমরা তাহাকে চক্ষের আড় করিবে না। সে মেয়েটা এবার যদি সীতাকে ভুলাইয়া লইয়া যায়, তাহা হইলে আর তোমরা সীতাকে পাইবে না।"

এই কথা শুনিয়া আমার আত্মাপুরুষ উড়িয়া গেল। কি করিয়া মেয়েকে ভূতের হাত হইতে বাঁচাইব, সেই ভাবনায় আমি আকুল হইয়া পড়িলাম। তোমার মামার তখনও কর্ম্ম-কাজ হয় নাই, এক দিন গিয়া দাঁড়াই, এক বেলা এক মুঠা কেহ যে ভাত দেয়, এমন স্থান ছিল না। কাদায় গুণ ফেলিয়া দিদিমণিকে লইয়া কাজেই আমাকে সেই ভয়ানক বাড়ীতে থাকিতে হইল। কিন্তু সেই দিন হইতে দিদিমণিকে আমরা নিমিষের জন্যও চক্ষুর আড় করিতাম না। হয় আমি, না হয় বিলাসী, না হয় পিতেম, কেহ না কেহ সর্ব্বদা তাহার কাছে থাকিত। কিন্তু মাঝে মাঝে জানালার দ্বারে দাঁড়াইয়া দিদিমণি আমাদিগকে বলিত,—"ঐ সেই মেয়েটি আসিয়াছে, ঐ আমাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। শামী, তুই আমাকে সুন্দর বলিস, কিন্তু ওর পানে একবার চাহিয়া দেখ। আহা! কি চমৎকার রূপ। কেবল ওর পানে চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে, অন্যদিকে চক্ষু ফিরাইতে ইচ্ছা করে না। ঐ দেখ, আবার

আমাকে ডাকিতেছে। আমি যাইতেছি না বলিয়া, আহা! মেয়েটির মাথায় কে মারিয়াছে, মাথা হইতে গাল বহিয়া রক্ত পড়িতেছে। শামী! একবার আমাকে ছাড়িয়া দে। আমি উহার কাছে যাই, উহাকে বাড়ীর ভিতর ডাকিয়া আনি! তুই উহার মাথায় ঔষুধ দিয়া দিব। আমার ঐ কাপড়খানি আমি উহাকে পরিতে দিব। যাই ভাই, যাই!"

এইরূপ বলিলে তাড়াতাড়ি আমি তোমার মাকে গিয়া কোলে লইতাম। উপর হইতে বাগানের দিকে আমি চাহিয়া দেখিতাম, কিন্তু আমি কিছু দেখিতে পাইতাম না। কি করিব! ঘরের দ্বার-জানালা বন্ধ করিয়া, মেয়েকে কোলে লইয়া, ভয়ে জড়সড় হইয়া আমি বসিয়া থাকিতাম।

এইরূপে অতি কষ্টে আমরা সেই বাড়ীতে দিনপাত করিতে লাগিলাম। পুনরায় পূজার সময় আসিল। এই সময় দিদিমণি সেই মেয়েটিকে ঘন ঘন দেখিতে লাগিল। বাগানের দিকে জানালা এখন আমি সর্ব্বদাই বন্ধ করিয়া রাখিতাম। তথাপি দিদিমণি বলিত,—"শামী! জানালা খুলিয়া দে। মেয়েটি নীচে আসিয়াছে, সে আমাকে ডাকিতেছে। শামী! তোর পায়ে পড়ি, একবার জানালা খুলিয়া দে, একবার তাহাকে আমি দেখি।"

মহাষ্টমীর দিন মেয়েকে লইয়া আমি বড়ই বিব্রত হইলাম। সে দিন ভয়ানক দুর্য্যোগ হইয়াছিল। সীতাকে কোলে লইয়া আমি ঘরে বসিয়া ছিলাম। এখন আর বাহিরে নয় সে দিন দিদিমণি মেয়েটিকে বাড়ীর ভিতরেই দেখিতে লাগিল। আমি দ্বার বন্ধ করিয়াছিলাম। তথাপি দিদিমণি বলিতে লাগিল,—"ও শামী! মেয়েটি আজ বাড়ীর ভিতর আসিয়াছে, ঘরের বাহিরে আমাদের ঘরের নিকট দাঁড়াইয়া আছে। ছাড়িয়া দে শামী। আমি একব তাহার কাছে যাই ।। একবার তাহাকে না দেখিলে মরিয়া যাইব।"

এই বলিয়া দিদিমণি হাপুস নয়নে কাঁদিতে লাগিল! কি যে কি, তাহা বুঝিতে আমি পারিলাম না। মেয়ে লইয়া আমি অলক ঠাক্‌রুণের ঘরে যাইলাম। সে স্থানে সহচরী উপস্থিত ছিলেন। আমি বলিলাম,—"আজ বাছা, আমাদের খাওয়া দাওয়াতে কাজ নাই। সকলে মিলিয়া এস, আজ আমরা মেয়েকে ঘিরিয়া বসিয়া থাকি। তা না করিলে, দিদিমণিকে আজ আমরা বাঁচাইতে পারিব না, সেই দুষ্ট মেয়েটা আসিয়া দিদিমণিকে নিশ্চয় আজ লইয়া যাইবে।"

সহচরী অলক ঠাক্‌রুণকে সকল কথা বলিলেন। অলক ঠাক্‌রুণ আমার কথায় সম্মত হইলেন। পিতেম ও বিলাসীকে ডাকিয়া দ্বার-জানালা বন্ধ করিয়া দিদিমণিকে ঘিরিয়া, সকলে আমরা অলক ঠাক্‌রুণের ঘরে বসিয়া রহিলাম।

বলা বাহুল্য যে, ইতিপূর্ব্বে এই বিড়ম্বনা নিবারণের জন্য অনেক প্রতিকার করা হইয়াছিল। গয়াতে পিণ্ড দেওয়া হইয়াছিল, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করা হইয়াছিল, রোজা আনিয়া ঝাড়ান ও ভূত নামানো হইয়াছিল, দিদিমণির অষ্টাঙ্গে কবচ, মাদুলি ও নেকড়ার পুঁটলি বাঁধা হইয়াছিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই।

চতুর্থ অধ্যায়— বিষম মহাষ্টমী

সকলে ঘিরিয়া রহিলাম বটে, কিন্তু সেই মহাষ্টমীর সমস্ত দিন দিদিমণি বড়ই ছট্‌ফট্‌

করিয়াছিল। "এ সেই মেয়েটি আসিতেছে, সে আমাকে ডাকিতেছে, তাহার কাপড় ভিজিয়া গিয়াছে, তাহার মাথা দিয়া রক্ত পড়িতেছে; দাও, আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি তাহার কাছে যাই।" এই বলিয়া দিদিমণি বার বার কাঁদিতেছিল, আর আমার কোল হইতে উঠিয়া আমার হাত ছাড়াইয়া বার বার বাহিরে পলাইতে চেষ্টা কবিতেছিল। অতি কষ্টে আমি তাহাকে ধরিয়া রাখিতেছিলাম।

সন্ধ্যার পর দিদিমণি ঘুমাইয়া পড়িল। আমি ভাবিলাম যে, এইবার বুঝি আমাদের বিপদ কাটিয়া গেল, আর বুঝি কোন উপদ্রব হইবে না। কিন্তু আমরা কেহ নিদ্রা যাইলাম না, ঘরে দুইটা আলো জ্বালাইয়া সকলে জাগিয়া বসিয়া রইলাম।

রাত্রি প্রায় দুই প্রহর হইয়াছে। এমন সময় সহসা বাহির-বাটীতে সেই বেহালা বাজিয়া উঠিল। সেই সকল বাজনা ছাপাইয়া বলিদানের সেই ভনায়ক মা মা চীৎকারে আমাদের যেন কানে তালা লাগিতে লাগিল, আতঙ্কে আমাদের প্রাণ শিহরিয়া উঠিল, ভয়ে আমাদের শরীর রোমাঞ্চ হইয়া উঠিল। হতভোম্বা হইয়া আমরা বসিয়া আছি, এমন সময় ধড়মড় করিয়া দিদিমণি উঠিয়া বসিল। আমরা কিছু বলিতে না বলিতে চোৎ করিয়া সে দ্বারের নিকট গিয়া খিল খুলিয়া ফেলিল। তাহার পর আমরা তাহাকে ধরিতে না ধরিতে রুদ্ধশ্বাসে বাহির-বাড়ীর পূজার দালানের দিকে সে দৌড়িল। "ও মা, কি হইল, সর্ব্বনাশ হইল।" এই কথা বলিতে বলিতে অলক ঠাক্‌রুণ ছাড়া আর সকলেই আমরা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলাম। কিন্তু তাহাকে ধরিতে পারিলাম না। দিদিমণি আমাদের আগে আগে গিয়া বাহির-বাড়ীর পূজার দালানে গিয়া উপস্থিত হইল। সে স্থানের অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া আমরা জ্ঞানহারা হইলাম। এখন আর সে ভাঙ্গা জনশূন্য বাড়ী নাই। খুব ধুম-ধামের দুর্গোৎসব হইলে যেরূপ হয়, সে স্থানে এখন সেইরূপ হইয়াছে। দালানের মাঝখানে প্রতিমা রহিয়াছে। সম্মুখে পুরোহিতগণ বসিয়া আছেন। এক পার্শ্বে এক জন চণ্ডীপাঠ করিতেছেন। সম্মুখের প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য হইয়াছে, ধূপধূনার গন্ধে চারিদিক, আমোদিত হইয়া আছে। দালানে, উঠানে, সকল স্থান ঝাড় লণ্ঠন জ্বলিতেছে। ফল কথা এমন ধূমধামের পূজা আমি কখন দেখি নাই।

দিদিমণি কাহারও প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া দালান পার হইয়া দালানের পূর্ব্বদিকে চলিয়া গেল। ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে আমরাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। দালানের পূর্ব্বদিকে একটি ঘর ছিল। সেই ঘরের ভিতর তক্তপোষের উপর এক জন বৃদ্ধ বসিয়া ছিলেন। তাহার বামহাতে বেহালা, আর দক্ষিণ হাতে যা দিয়া বাজায় তাই ছিল। একটি পরমা সুন্দরী স্ত্রীলোক মাটিতে বসিয়া বৃদ্ধের পা দুইখানি ধরিয়া কি বলিতেছিলেন। সেই স্ত্রীলোকের পার্শ্বে সাত আট বৎসরের এক বালিকা দাঁড়াইয়া ছিল।

দিদিমণি বরাবর গিয়া সেই ঘরের দ্বারের এক পার্শ্বে দাঁড়াইল। খপ করিয়া আমি গিয়া দিদিমণির হাত ধরিয়া ফেলিলাম। তাহার পর আমরা সকলেই সেই দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া রহিলাম।— সে স্ত্রীলোক বৃদ্ধের পা ধরিয়া ছিলেন, তিনি এখন কাঁদ-কাঁদ মৃদু মধুর-স্বরে বলিলেন,—"বাবা, অপরাধ করিয়াছি সত্য। কিন্তু আমি তোমার কন্যা। শত অপরাধ

করিলে, কন্যাকে ক্ষমা করিতে হয়! এই মেয়েটিকে লইয়া আমি এখন কোথায় যাই।"

বৃদ্ধ অতি নিষ্ঠুর ভাষায় বলিলেন,—"আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, তোর আমি মুখ দেখিব না। কালামুখ লইয়া এ বাড়ী হইতে এখনই দূর হইয়া যা।"

স্ত্রীলোক উত্তর করিলেন,—"বাবা! আমি কোনরূপ দুষ্কর্ম্ম করি নাই, স্বামীর ঘরে গিয়াছি, এই মাত্র।" বৃদ্ধ বলিলেন,—"তুই দূর হ, আমার সম্মুখ হ'তে দূর হ।" স্ত্রীলোকটি অবশেষে বলিলেন, "আচ্ছা, বাবা, আমি দূর হইতেছি, কিন্তু আমার কন্যাটি তো কোন অপরাধ করে নাই। ইহাকে আমি তোমার নিকট রাখিয়া যাইতেছি! পাতের হাতের দুইটি ভাত দিয়া ইহাকে প্রতিপালন করিলও।" সেই কথা শুনিয়া বৃদ্ধ আরও জ্বলিয়া উঠিলেন,— "তোর ঝাড় আমার এ বাড়ীতে থাকিতে পারিবে না। দূর দূর, এখনি দূর হ।"

স্ত্রীলোক ও তাহার কন্যা সত্বর দূর হইতেছে না, তাহা দেখিয়া বৃদ্ধ রাগে অন্ধ হইয়া পড়িলেন। ধৈর্য্য ধরিতে না পারিয়া তিনি বেহালার বাড়ী কন্যার মাথায় মারিয়া বসিলেন। কন্যার মাথা হইতে দর দর ধারায় রক্ত পড়িতে লাগিল। গাল বাহিয়া সেই রক্ত মাটিতে পড়িল।

এই নিষ্ঠুর ব্যবহার দেখিয়া স্ত্রীলোক তখন উঠিয়া দাঁড়াইলেন। চক্ষু দিয়া তাঁহার যেন আগুনের ফিন্‌কি বাহির হইতে লাগিল। তিনি বলিলেন,—"বাবা! তুমি এ কাজ করিলে! যাহা হউক, আমি তোমাকে কিছু বলিব না। কিন্তু আজ হইতে তোমার লক্ষ্মী ছাড়িল।

এই কথা বলিয়া মেয়েটির হাত ধরিয়া স্ত্রীলোকটি সেই ঘর হইতে বাহির হইলেন। তাহার পব দালানের ভিতর দিয়া উঠানে নামিলেন। তাহার পর উঠান পার হইয়া বাড়ীর বাহিরে চলিয়া গেলেন। যেই তিনি বাড়ীর বাহির হইলেন, আর বৃদ্ধ ভয়ানক চীৎকার করিয়া সেই তক্তপোশের উপর শুইয়া পড়িলেন সেই সময় ঝাড় লণ্ঠন সব নিবিয়া গেল। প্রতিমা, পুরোহিত, লোক-জন সব অদৃশ্য হইয়া পড়িল। ঢাক-ঢোলের কলরব সব থামিয়া গেল। অন্ধকারে আমি পিতেমের কথা শুনিতে পাইলাম। পিতেম বলিল,—"শ্যামা! সীতা তোমার কাছে আছে?" আমি উত্তর করিলাম,—"হাঁ, আমি তাহাকে ধরিয়া আছি।"

পিতেম পুনরায় বলিল,—"তবে চল, ঘরে চল।"

পঞ্চম অধ্যায়— পূর্ব্ব-বিবরণ

সকলে পুনরায় অলক ঠাক্‌রুণের ঘরে যাইলাম। সীতা তৎক্ষণাৎ ঘুমাইয়া পড়িল। সে রাত্রিতে আর কোন উপদ্রব হইল না।

কিন্তু সে রাত্রিতে আমাদের নিদ্রা হইল না। আমরা সকলে বসিয়া রহিলাম। পিতেম তখন আমাকে সকল কথা বলিল। পিতেম বলিল,—

"ঐ যে বৃদ্ধ দেখিলে, উনি বাড়ীর কর্ত্তা ছিলেন। উঁহার নাম জগমোহন চৌধুরী। উনি বড় দুর্দ্দান্ত লোক ছিলেন। একবার যাহা বলিতেন, তাহাই করিতেন, তা সে ভালই হউক আর মন্দ হউক। পৃথিবীতে তাঁহার কেবল একটি সখ ছিল। বেহালা বাজাইতে তিনি বড় ভাল বাসিতেন! সময় নাই, অসময় নাই, সর্ব্বদাই তিনি বেহালা বাজাইতেন। বিশেষতঃ ঝড় বাতাস বাদলার রাত্রিতে তাঁহার সখটি কিছু প্রবল হইত। অলক ঠক্‌রুণ তাঁহার

ভগিনী। জগমোহন রায়ের এক পুত্র ও দুই কন্যা ছিল। পুত্র সীতার মামা, যিনি এখন পশ্চিমে কাজ করেন। বড় কন্যার নাম ছিল রামমণি, যাঁহার ভূতকে সীতা মাঠের মাঝখানে গাছতলায় দেখিয়াছিল। ছোট মেয়ের নাম ছিল তারামণি, তিনি সীতার মা। রয় চৌধুরী বড়মানুষ লোক, কোন পুরুষে কন্যা শ্বশুরবাড়ী পাঠাইতেন না। কিন্তু রামমণির এক তেজস্বী পুরুষের সহিত বিবাহ হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, যে,—"ঘর-জামাই হইয়া আমি কিছুতেই থাকিব না।" আপনার স্ত্রীকে তিনি নিজের বাড়ী লইয়া যাইতে চাহিলেন। কিন্তু কর্ত্তা সম্মত হইলেন না। শ্বশুর-জামাতায় ঘোর বাদ-বিসম্বাদ বাধিয়া গেল। অবশেষে কর্ত্তা এক দিন রামমণিকে ডাকিয়া জামাতার সমক্ষে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি ইহাকে চাও—না আমাকে চাও।" রামমণি উত্তর করিলেন,—"বাবা! তুমি পিতা বটে, কিন্তু স্ত্রীলোকের পতিই সর্ব্বস্ব।" এই উত্তর শুনিয়া কর্ত্তা ঘোরতর রাগিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন,—"বটে! তবে এখনি আমার বাড়ী হইতে দূর হও। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আজ হইতে আমি তোমার মুখ দেখিব না।" রামমণি শ্বশুরালয়ে গমন করিলেন। নয় দশ বৎসর স্বামীর ঘর করিলেন। তাঁহার একটি কন্যা হইল। সে কন্যাটির ভূত সীতাকে মাঠে লইয়া গিয়াছিল। নয় দশ বৎসর পরে রামমণির স্বামীর মৃত্যু হইল। পরিবার প্রতিপালনের নিমিত্ত তিনি একটি পয়সাও রাখিয়া যান নাই। রামমণি ঘোর বিপদে পড়িলেন।

পিতাকে কয়েকখানি পত্র লিখিলেন। পিতা কোন উত্তর দিলেন না। অবশেষে ভাবিলেন,—"পূজার সময় লোকের মন নরম হয়। এই পূজার সময় বাবার পায়ে গিয়া পড়ি, তাহা হইলে তিনি বোধ হয় ক্ষমা করিবেন।" পূজার সময় কন্যাকে লইয়া রামমণি পিতার বাটীতে আসিলেন। তাহার পর তোমরা এইমাত্র যাহা দেখিলে, অষ্টমীর দিন সত্য-সত্যই সে সমুদয় ঘটনা ঘটিয়াছিল। কন্যার হাত ধরিয়া রামমণি চলিয়া গেলেন;। পক্ষাঘাত রোগ হইয়া কর্ত্তা তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। অল্পক্ষণ পরে তুমুল ঝড় উঠিল, সেই সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। পর দিন সকলে দেখিল যে, রামমণি ও তাঁহার কন্যা দুইজনেই মাঠের মাঝখানে গাছতলায় মরিয়া পড়িয়া আছেন। কর্ত্তা আরও কয়েক মাস জীবিত রহিলেন। কিন্তু সেই দিন হইতেই আর তিনি কথা কহিতে পারেন নাই, কি উঠিয়া বসিতে পারেন নাই। সেই তাঁহার লক্ষ্মী ছাড়িয়া গেল। জমিদারী, টাকা কড়ি কিরূপে কোথায় যে উড়িয়া গেল, তাহা কেহ বলিতে পারে না। ঘর জামাই রাখার অহঙ্কারও সেই সঙ্গে দূর হইল। সে জন্য সীতার মাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাইতে আর কোন আপত্তি রহিল না। কর্ত্তা, রামমণি ও তাঁহার কন্যা—তিন জনেই এখন ভূত হইয়া আছেন। কতবার গয়াতে পিণ্ড দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু কোন ফল হয় নাই!"

পরদিন প্রাতঃকালে আমি ভাবিলাম যে, ভিক্ষা করিয়া খাইতে হয়, সেও স্বীকার; তবু সীতাকে লইয়া সে বাড়ীতে আর আমি থাকিব না। সীতার ভাই, তোমার মামাকে আমি পত্র লিখিলাম। ভাগ্যক্রমে এই সময় তাঁহার কর্ম্ম হইয়াছিল। তিনি আসিয়া আমাকে ও সীতাকে তাঁহার নিজের বাড়ীতে লইয়া গেলেন। কিছুদিন পরে তোমার পিতার কাল হইল। অল্পদিন পরে দিদিমণিও তাঁহার সঙ্গে স্বর্গে গেলেন। দিদিমণিকে হারাইয়া কি করিয়া আমি

যে প্রাণ ধরিয়া আছি, তাহাই আশ্চর্য্য। যাহা হউক, তোমাদের দুই জনকে পাইয়া আমি শোক অনেকটা নিবারণ করিতে পারিয়াছি; মা দুর্গা তোমাদিগকে আর যত ছেলে-পিলেকে বাঁচাইয়া রাখুন।

পিঠে-পার্ব্বণে চীনে ভূত

প্রথম অধ্যায়— ইঙ্গলা পিঙ্গলা নাড়ী

রাধামাধব গুপ্ত তাঁহার মাতুলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। মাতুল ব্রহ্মদেশে কোন স্থানের ডাক্তার ছিলেন। অস্ত্রচিকিৎসায় তাঁহার বিশেষ নৈপুণ্য ছিল। লোকের হাত পা কাটিয়া তিনি অনেক টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন। সে টাকা তিনি খরচ করেন নাই, সঞ্চয় করিয়াছেন। সে জন্য তাঁহাকে এক জন ধনবান্ লোক বলিলেও বলিতে পারা যায়। বৃদ্ধ-বয়সে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তিনি দেশে আসিয়াছেন। দেশে আসিয়া প্রথম তীর্থদর্শন করিয়া কিছুকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এখন তিনি কলিকাতায় আসিয়া বাস করিয়াছেন। রাধামাধব সেই স্থানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।

রাধামাধব নিজে পাশ-করা ডাক্তার। কলিকাতায় নহে, অন্য কোন স্থানে তিনি ডাক্তারি করেন। প্রথম প্রথম সেই স্থানে তাঁহার কাজ ভালরূপ চলিয়াছিল, কিন্তু এখন আর তাঁহার সেরূপ পসার নাই। এখন যাহা কিছু উপার্জ্জন করেন, তাহাতে কষ্টে সৃষ্টে কেবল বাঁসা খরচ চলে, কিছুই সঞ্চয় হয় না।

সে জন্য রাধামাধবের বড় ভাবনা হইয়াছে। তাঁহার চারিটি কন্যা। বড় কন্যাটি ত্রয়োদশ বৎসর পার হইয়াছে, আর রাখা যায় না। তাহার বিবাহ দিতে অন্ততঃ দুই হাজার টাকা খরচ হইবে। সে টাকা কোথা হইতে আসিবে?

বহুকাল পরে মাতুল দেশে আসিয়াছেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা কর্ত্তব্য কাজ বটে। তাহা ব্যতীত রাধামাধব ভাবিলেন,—"মাতুল-মাতুলানীর পুত্র কন্যা নাই, আমি তাঁহাদের একমাত্র উত্তবাধিকারী। তাঁহাকে আমি আমার বিপদের কথা জানাইব। এখন কিছু যদি তিনি আমাকে সাহায্য করেন, তাহা হইলে বড় উপকার হয়।"

মাতু মাতুলানীকে তিনি প্রণাম করিলেন। রাধামাধবকে তাঁহারা অনেক আদর করিলেন। নানারূপ সুখাদ্যের আয়োজন করিয়া মাতুলানী তাঁহাকে ভোজন করাইলেন। এইরূপে একদিন, দুই দিন, তিন দিন কাটিয়া গেল। কিন্তু এখনও তিনি টাকার কথা তুলিতে পারিলেন না। সে কথা মুখে আনিতে তাঁহার লজ্জা বোধ হইল। অনেকবার সেই কথা ঠোঁটের আগায় আনিয়াও তিনি বলিতে পারিলেন না। লজ্জা ব্যতীত এ কথা না বলিবার আর একটি কারণ ছিল। তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার মাতুল-মাতুলানী দুই জনেরই

শরীর সুস্থ নহে। দুই জনেরই শরীর শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, মুখে যেন কালি মাড়িয়া দিয়াছে। দুই জনেরই সর্ব্বদা অতি বিমর্ষভাবে থাকেন। মনে যেন সর্ব্বদাই কিরূপ একটা ভয়—কিরূপ একটা দুশ্চিন্তা। রাধমাধব আরও দেখিলেন যে, তাঁহার মাতুলের মস্তকটি মুণ্ডিত, তাঁহার মাথায় চুল নাই।

এক দিন তিনি মাতুলকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বর্মায় আপনি যে স্থানে ছিলেন, সে স্থানের জলবায়ু কি ভাল ছিল না? আপনারা দুই জনেই অতিশয় শীর্ণ হইয়া গিয়াছেন। দেখিলে বোধ হয়, যেন আপনাদের শরীরে কোন একটা রোগ আছে।"

মাতুল উত্তর করিলেন,—"না, আমাদের শরীরে কোন রোগ নাই।"

এইরূপ উত্তর দিয়া তিনি সে কথা চাপা দিতে চেষ্টা করিলেন। রাধামাধব সে সম্বন্ধে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করেন, ইহাই যেন তাঁহার ইচ্ছা। সে জন্য রাধামাধব আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। কিন্তু তিনি বুঝিলেন যে, তাঁহার মামা-মামীর শরীরে রোগ না থাকুক, মনে কোনরূপ রোগ হইয়াছে। কোনরূপ একটা ভয় অথবা দুর্ভাবনায় তাঁহাদের শরীর এরূপ শীর্ণ ও মলিন হইয়া গিয়াছে।

পরদিন টাকাকড়ির কথা মামা নিজেই তুলিলেন। মামা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেমন রাধামাধব! তুমি যে স্থানে ডাক্তারী কর, সে স্থানে দু'পয়সা হয় তো?"

রাধামাধব উত্তর করিলেন,—"প্রথম প্রথম বেশ দু'পয়সা হইত। তাহার পর কোথা হইতে সে স্থানে এক অবতার আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই অবধি আমার আর বড় কিছু হয় না।" মাতুল জিজ্ঞাসা করিলেন,—"অবতার কিরূপ?"

রাধামাধব উত্তর করিলন,—"গেরুয়া কাপড় পরা একটা লোক। সেও চিকিৎসা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। রোগীকে কখন ডাক্তারি, কখনও হোমিওপ্যাথি, কখন কবিরাজি, কখন হাকিমি, কখন স্বপ্নলব্ধ ভৌতিক ঔষধ প্রদান করে। নানা ভাবে পা রাখিয়া নানা ভঙ্গী করিয়া সে বসিতে জানে। রোগীর নিকট বসিয়া ইঙ্গলা পিঙ্গলা নাড়ী, কুণ্ডলিনী প্রভৃতি নানা গল্প করে। সে বলে যে,—'আমি ভূত নামাইতে পারি, মৃত ব্যক্তির আত্মাকে ডাকিতে পারি।' যে পর্য্যন্ত এই অবতারটি সে স্থানে আসিয়াছে, সেই অবধি আমার পসার প্রতিপত্তি একেবারে গিয়াছে। বড় কন্যাটির বিবাহ না দিলে আর চলে না। কোথা যে টাকা পাইব, সে জন্য বড়ই দুর্ভাবনা হইয়াছে।"

মাতুল জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে লোকটি ভূত প্রেত সম্বন্ধে যে সমুদয় গল্প করে, তাহা কি মিথ্যা?" রাধামাধব উত্তর করিলেন,—"সমুদয় মিথ্যা। ভূত আবার কোথায়? ভূত বলিয়া জগতে কোনরূপ বস্তু নাই।" মাতুল বলিলেন,—"বটে! যদি দেখিতে পাও?"

রাধামাধব উত্তর করিলেন,—"এ বিষয়ে আমি নিতান্ত অনভিজ্ঞ নহি। মৃত ব্যক্তির আত্মাকে আহ্বান করা সম্বন্ধে ইংরেজীতে যত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, সে সমুদয় আমি পাঠ করিয়াছি। যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া আত্মাকে আহ্বান করিতে হয়, বন্ধু-বান্ধবের সহিত তাহা করিয়া আমি অনেক দেখিয়াছি। যেখানে ভূত আছে বলিয়া শুনিয়াছি, একেলা নির্ভয়ে সে স্থানে রাত্রিযাপন করিয়াছি। ভূত দেখিবার নিমিত্ত রাত্রিকালে একেলা শ্মশানে

মশানে অনেক ঘুরিয়াছি। এক দিন দুই দিন নয়, তিন বৎসর কাল এরূপ চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু ভূতের চিহ্নমাত্রও আমি দেখিতে পাই নাই। ভূতের গল্প সব অলীক। ভূত বলিয়া জগতে কিছুই নাই।" মাতুল বলিলেন,—"যদি প্রত্যক্ষ তোমাকে দেখাইতে পারি?"

রাধামাধব উত্তর করিলেন,—তাহা হইলে আপনার নিকট আমি চিরঋণী হইয়া থাকিব পরকালের প্রতি আমার বিশ্বাস নাই। যদি ভূত দেখিতে পাই, তাহা হইলে পরকাল সম্বন্ধে আমার মনের সন্দেহ দূর হয়।"

মাতুল বলিলেন,—"না, তুমি ছেলে-মানুষ, তাই ওরূপ কথা বলিতেছ। কাজ নাই, শেষে একটা বিপদ ঘটিবে।"

রাধামাধব মাতুলকে জোর করিয়া ধরিলেন। তিনি বলিলেন যে,—"যদি যথার্থই আপনি আমাকে ভূত দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে দেখাইতেই হইবে। আমি আপনাকে কিছুতেই ছাড়িব না। আপনার কোন ভয় নাই। আমার মন রতিমাত্রও বিচলিত হইবে না।"

মামা-ভাগ্নেতে যখন এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল, তখন রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছিল। মাতুল যখন দেখিলেন যে, রাধামাধব তাঁহাকে কিছুতেই ছাড়িলেন না, তখন তিনি বলিলেন,—"তবে আমার সঙ্গে এস।"

দ্বিতীয় অধ্যায়— হাতকাটা চিনেম্যান

রাধামাধবকে লইয়া মাতুল বড় একটা ঘরের দ্বারে গিয়া তালা খুলিলেন। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া রাধামাধব দেখিলেন যে, দেয়ালের গায়ে দুই দিকে কাঠের আলমারী আছে। সেই আলমারীতে দুই স্তর কাঠের সেল্‌ফ আছে, আর তাহার উপর অনেকগুলি ছোট বড় শিশি রহিয়াছে। কোন শিশিতে মানুষের পা, কোনটিতে চক্ষু, কোনটিতে পাথুরী, কোনটিতে অস্থি, মনুষ্যদেহের নানারূপ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রহিয়াছে।

মাতুল বলিলেন,—"এ আমার বাই। আমি নিজহাতে যত কিছু কাটিয়াছি-কুটিয়াছি, তাহা আমি স্পিরিটে রাখিয়া দিয়াছি। ইহা অপেক্ষা আরও অনেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিল। আমার বাড়ীতে একবার আগুন লাগিয়া তাহার অধিকাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।"

ঘরের পার্শ্বে একখানি কোচ ছিল। মাতুল বলিলেন,—"এই কোচের উপর তোমায় আমি বিছানা করিয়া দিতেছি। এই ঘবে একেলা শুইতে পারিবে? আমি একটি ল্যাম্প আনিয়া দিতেছি। ল্যাম্পা জ্বলিতে থাকুক, অন্ধকারে থাকিয়া কাজ নাই।"

রাধামাধব উত্তর করিলেন,—"স্বচ্ছন্দে আমি এই ঘরে একেলা শুইয়া থাকিব। অন্ধকার করিলেও আমার ভয় হইবে না।" মাতুল বলিলেন,—"বেশ কথা! তুমি কিছু দেখিবে কি না দেখিবে, সে কথা এখন তোমাকে বলিব না। এখন বলিলে পূর্ব্ব হইতে তোমার মনে একটা সংস্কার জন্মিয়া যাইবে।"

মাতুল নিজ হাতে কোচের উপর বিছানা করিয়া দিলেন। ঘরের পার্শ্বে ছোট একটি টেবল ছিল। সেই টেবলের উপর ল্যাম্প রাখিয়া তিনি বলিলেন,—"রাধামাধব এখন আমি চলিলাম। পাশের ঘরেই আমি শয়ন করি। রাত্রিতে আমার নিদ্রা হয় না। আবশ্যক

হইলে তুমি আমাকে ডাকিবে, আমি তৎক্ষণাৎ আসিয়া উপস্থিত হইব।"

মাতুল প্রস্থান করিলে, রাধামাধব ঘরের দ্বার উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া দিলেন। তাহার পর ঘরের অন্যান্য দ্বার-জানালা ভালরূপ বন্ধ আছে কি না, তাহাও পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। অবশেষে ল্যাম্পের আলোক কমাইয়া দিলেন। ল্যাম্প মিট মিট করিয়া জ্বলিতে লাগিল। কিন্তু ঘরের সকল বস্তু স্পষ্টভাবে দেখা যাইতে লাগিল।

আজ সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটাইব, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া কোচের উপর রাধামাধব শয়ন করিলেন। কিন্তু এক ঘন্টা পরেই তিনি ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। কতক্ষণ নিদ্রা গিয়াছিলেন, তাহা তিনি বলিতে পারেন না। সহসা তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। ঘরের ভিতর ঠক্ ঠক্ শব্দ হইতেছিল। সেই দিকে তিনি চাহিয়া দেখিলেন, দেখিলেন যে আলমারীর ধারে ধারে এক জন পুরুষমানুষ বেড়াইতেছে। নিজ হাতে রাধামাধব ঘরের দ্বার-জানালা বন্ধ করিয়াছিলেন। বাহির হইতে ঘরের ভিতর লোক-আসিবার সম্ভাবনা ছিল না।

"এ মানুষ নহে—এ ভূত"—রাধামাধবের মনে নিশ্চয় এইরূপ বিশ্বাস হইল, ভয়ে প্রাণের ভিতর তাঁহার গুরু গুরু করিয়া উঠিল। সর্ব্বশরীরে রোমাঞ্চ হইল। চীৎকার করিয়া ফেলেন আর কি। —"এমন সময় মনকে দৃঢ় করিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—পৃথিবীতে ভূত নাই, থাকিলেও তাহাকে আমি ভয় করি না। চিরকাল লোকের নিকট আমি এইরূপ মুখ শাপট করিয়াছি। আজ যদি ভয়-বিহুল হইয়া চীৎকার করিয়া ফেলি, তাহা হইলে সকলের নিকট আমি হাস্যাস্পদ হইব। অতএব, প্রাণ থাকে আর যায়, কিছুতেই আমি চীৎকার করিব না।" রাধামাধব এইরূপ মনকে আশ্বাস দিয়া, ভূত কি করে, চুপ করিয়া তাহা দেখিতে লাগিলেন।

আলমারীর উপর যে সমুদয় শিশি সাজান ছিল, ভূত একে একে সেই সমুদয় শিশি অতি মনোযোগের সহিত নিরক্ষীণ করিয়া দেখিতে লাগিল। কোন শিশিটি বা হাতে করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়াও দেখিতে লাগিল। ঘরের অপর পার্শ্ব হইতে শিশি দেখিতে দেখিতে ভূত রাধামাধবের দিকে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিছু নিকটবর্ত্তী হইলে রাধামাধব দেখিলেন, ভূতটির মাথা নেড়া। আরও একটু নিকটে আসিলে তিনি দেখিলেন যে, তাহার পশ্চাৎ দিকে লম্বা বেণী ঝুলিতেছে। বিনুনী দেখিয়া রাধামাধব ভাবিলেন যে,—"এঃ! এটা দেশী ভূত নহে, চীনে ভূত।" অর্থাৎ কি না কলিকাতায় যাহারা জুতা গড়ে ও সূত্রধরের কাজ করে সেই চীন দেশের লোকের ভূত। আরও একটু নিকটে আসিলে তাহার পাণ্ডুবর্ণ মুখ দেখিয়া, রাধামাধবের মনে নিশ্চয় প্রতীতি হইল যে, সে চীনে ভূত বটে। তাহার পোষাকও সেইরূপ ছিল। নিম্নদেহ নীলবর্ণের ঢিলা ঢিলা ইজের দ্বারা ও উর্দ্ধদেশে সেই বর্ণের ঢিলে-ঢালা ঘুন্টিওয়ালা জামার দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল।

আলমারীর ধারে ধারে ঘরের দুই দিক্ ঘুরিয়া ভূত একে একে সমুদয় শিশিগুলি নিরিক্ষণ করিয়া দেখিল। যখন সমুদয় শিশি দেখা হইয়া গেল, তখন সে ঘোর দুঃখসূচক এক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল; তাহার মুখ বিষণ্ণ হইল; তাহার চক্ষু দিয়া ফোঁটায়

ফোঁটায় জল পড়িতে লাগিল। তাহার পর কোচের নিকট আসিয়া রাধামাধবের সম্মুখে দাঁড়াইল ও অতিশয় ক্ষুণ্ণমনে আপনার হাত দুইটি তুলিয়া যেন কি দেখাইল। হাত দুইটি নহে, দেড়টি হাত। রাধামাধব দেখিলেন যে, তাহার দক্ষিণ হাত আধখানি আছে। জামার আস্তিন কেবল কোণুই পর্য্যন্ত উঠিল। অবশিষ্ট ভাগ ঝুলিয়া পড়িল; কারণ, তাহার ভিতর হাত ছিল না ভয়ে রাধামাধব অচেতনপ্রায় হইলেন। তাঁহার সর্ব্বশরীর ঘর্ম্মে সিক্ত হইয়া গেল। চীৎকার করিয়া ফেলেন আর কি!—এমন সময় ভূত অদৃশ্য হইয়া গেল।

মৃতদেহের ন্যায় রাধামাধব কিছুক্ষণের নিমিত্ত পড়িয়া রহিলেন। তাহার পর ক্রমে ক্রমে তাঁহার মনে সাহসের সঞ্চার হইল। প্রথমে তিনি ঘর হইতে পলায়ন করিবার মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে ইচ্ছা এখন তিনি পরিত্যাগ করিলেন। আরও কি হয়, তাহা দেখিবার নিমিত্ত চুপ করিয়া তিনি শুইয়া রহিলেন। কিন্তু সে রাত্রিতে আর কোন উপদ্রব হইল না।

তৃতীয় অধ্যায়– পরলোকে ঠুঁটো চীন

প্রভাত হইলে রাধামাধব উঠিয়া, পুনরায় ঘরের দ্বার জানালাগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। দেখিলেন যে, দ্বার-জানালা যে ভাবে তিনি বন্ধ করিয়াছিলেন, সেই ভাবেই আছে। তাঁহাকে ভয় দেখাইবার নিমিত্ত বাহির হইতে যে কেহ আসিবে, সে উপায় ছিল না। ক্রমে মাতুলের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। মাতুল বলিলেন,—"রাত্রিতে তুমি যে কিছু দেখিয়াছ, তোমার মুখ দেখিয়া তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি। তোমার মাতুলানীর ও আমার ইহাই রোগ; ইহার জন্যই আমাদের শরীর শীর্ণ হইয়া যাইতেছে ও দিন দিন আমাদের আয়ুক্ষয় হইতেছে। ইহার জন্যই শীঘ্র আমরা মৃত্যুমুখে পতিত হইব। যাহা হউক, ইহার সবিশেষ বিবরণ আজ দিনের বেলা তোমাকে আমি প্রদান করিব।'

সেই দিন আহারের পর মামা-ভাগিনেয় এক স্থানে বসিয়া গল্পগাছা করিতে লাগিলেন। সেই সময় মাতুল বলিলেন,—"বর্ম্মায় যে স্থানে আমি কাজ করিতাম, সে স্থানের হাসপাতাল আমার অধীনে ছিল। নিম্নপদস্থ ডাক্তারগণ বৃহৎ বৃহৎ অস্ত্রচিকিসা করিতে বড় সুবিধা পান না, কিন্তু এই হাসপাতালে আমার সে সুবিধা ছিল। অঙ্গচ্ছেদনাদি অনেক বড় বড় অস্ত্র চিকিৎসা আমি করিয়াছি। কোন লোকের অঙ্গছেদন করিয়াছি। সেই কর্ত্তিত অঙ্গ টি স্পিরিটপূর্ণ শিশির ভিতর রাখা আমার বাই ছিল। যে ঘরে গত রাত্রিতে তুমি শয়ন করিয়াছিলে, সেই ঘরে সেইরূপ অনেক গুলি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে। বর্ম্মা চীনের নিকট, চীন দেশের অনেক লোক এ দেশে বাস করিয়াছে। এক দিন এক জন চীনেম্যান আমার হাসপাতালে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি দেখিলাম যে তাহার দক্ষিণ হাতটির কোণুই পর্য্যন্ত পচিয়া গিয়াছে। আমি তাহাকে বলিলাম যে,—হাতটি কাটিয়া না ফেলিলে কিছুতেই তোমার প্রাণরক্ষা হইবে না।" প্রথম সে কথায় সে সম্মত হইল না। তাহার পর যখন দেখিল যে, হাত না কাটিলে তাহার প্রাণ কিছুতেই বাঁচিবে না, তখন সে অগত্যা সম্মত হইল। অজ্ঞান করিয়া কোণুই পর্য্যন্ত আমি তাহার হাত কাটিয়া ফেলিলাম। তাহার

পর সেই হাত আমি যথারীতি সুরাপূর্ণ শিশিতে রাখিলাম। পুনরায় জ্ঞান হইবামাত্র চীনে রোগী আপনার কাটা হাত দেখিতে চাহিল। পাছে ভয় পায়, সে জন্য প্রথম আমি তাহাকে দেখাইতে চাহিলাম না। কিন্তু কাটা হাত দেখিবার জন্য সে এত কাতর হইল যে, তাহাকে না দেখাইয়া আমি থাকিতে পারিলাম না। হাসপাতালের যে খাটের উপর সে শুইয়া ছিল, শিশিটি আপনার পার্শ্বে তাহার উপর রাখিয়া, বাম হাত দিয়া সে অনেকক্ষণ নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল। তাহার পর একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া শিশিটি সে চার পাইয়ের নীচে রাখিয়া দিল। সেই দিন হইতে মুহূর্ত্তের নিমিত্ত শিশিটি সে চক্ষুর আড় করিতে দিত না। আর দিনের মধ্যে অনেকবার তাহাকে খাটের উপর তুলিয়া অতি স্নেহের সহিত নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিত। কিছু দিন পরে সে আরোগ্য লাভ করিল। হাসপাতাল হইতে যাইবার পূর্ব্বে আমি তামাসাচ্ছলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ডাক্তারকে বিদায় করিবে না?"

চীনে উত্তর করিল,—'আমি দুঃখী লোক। আমি আপনাকে কি দিতে পারি?"

আমি বলিলাম,—'তোমার হাতটি আমাকে প্রদান কর।'

তাহার মুখ বিষণ্ন হইল। সে বলিল,—'মহাশয় আমাকে ক্ষমা করুন। হাতটি আমি আপনাকে দিতে পারিব না। আমার যখন মৃত্যু হইবে, তখন দেহের সহিত এই হাতটিও কবর দিতে হইবে। তা না করিলে পরলোকে আমাকে ঠুঁটো হইয়া বেড়াইতে হইবে। আমরা চীনের লোক, সেই জন্য হস্ত পদ অথবা মুণ্ডচ্ছেদনকে বড় ভয় করি। আমাদের বড় লোকদের প্রাণদণ্ড হইলে, সেই জন্য তাঁহারা হারিকুরি অর্থাৎ স্বহস্তে পেট পাঁড়িয়া প্রাণত্যাগ করেন। মুণ্ডচ্ছেদ করিতে তাঁহারা দেন না। আমি এই হাতটিকে নুন দিয়া রাখিব। তাহা করিলে পচিয়া যাইবে না। আমার মৃত্যু হইলে আমার আত্মীয় স্বজন ইহাকেও দেহের সহিত গোর দিবেন।

পুনরায় তামাসাচ্ছলে আমি বলিলাম,—'লবণ অপেক্ষা আরকে ইহা ভালরূপ থাকিবে। তাহার পর তোমার নিকট অপেক্ষা আমার নিকট হাতটি আরও ভাল অবস্থায় থাকিবে। কারণ, এরূপ বস্তু ভালরূপে রাখিবার নিমিত্ত আমার নিকট মশলা আছে। আর কিরূপে রাখিতে হয়, তাহাও আমি জানি। তোমার নিকট থাকিলে হাতটি নিশ্চয় পচিয়া যাইবে। পচা হাত লইয়া শেষে কি পরলোক যাইবে?

আমার কথাগুলি লোকটির মনে লাগিল। উৎফুল্ল নয়নে আমার দিকে চাহিয়া সে বলিল,—'আমার মৃত্যুর পর আমার আত্মীয় স্বজনেরা আসিয়া হাতটি প্রার্থনা করিলে যদি ইহা ফিরিয়া দিতে আপনি প্রতিজ্ঞা করেন, তাহা হইলে আপনার নিকট রাখিয়া যাইতে পারি।'আমার কুবুদ্ধি! আমি সেইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলাম। একবার নহে, লোকটি বার বার আমাকে তিন সত্য করাইল। তাহার পর শিশিটি আমার হাতে দিয়া সে প্রস্থান করিল। অন্যান্য শিশির সঙ্গে আমি সে শিশিটিও রাখিয়া দিলাম।

আমি যে বাড়ীতে বাস করিতাম, তাহা কাষ্ঠনির্ম্মিত ছিল। কিছুদিন পরে আমার বাড়ীতে আগুন লাগিল। অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে, অনেকগুলি শিশিও আমার নষ্ট হইয়া

গেল। তাহার মধ্যে চীনেম্যানের হাত-সম্বলিত শিশিটিও ধ্বংস হইয়া গেল। যাহা হউক, চীনের কথা আমি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম! তাহার হাতের কথা অথবা আমার প্রতিজ্ঞার কথা,—একবারও আমার মনে উদয় হয় নাই।

চতুর্থ অধ্যায়— ফিং ফোং ফা

পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল। একদিন প্রাতঃকালে দুইজন চীনেম্যান আসিয়া আমাকে বলিল,—'মোঙ্গ নামক যে চীনের হাত আপনি কাটিয়াছিলেন, গত রাত্রিতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। আপনার নিকট হইতে সেই হাতটি লইয়া কবরে দিতে সে বার বার অনুরোধ করিয়াছে। সেই হাতের নিমিত্ত আমরা আপনার নিকট আসিয়াছি।আমার মাথায় যেন বাজ পড়িল! হাতটি ফিরিয়া দিতে আমি বার বার তিন সত্য করিয়াছিলাম। সেই সত্য হইতে আজ আমি ভ্রষ্ট হইলাম। কি আর করিব? দৈব্যক্রমে হাতটি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, আমি সেই কথা তাহাদিগকে বলিলাম। বিরস বদনে তাহারা চলিয়া গেল।

সেই দিন রাত্রিতে ঘরে শয়ন করিয়া আমি নিদ্রা যাইতেছি। রাত্রি দুই প্রহব অতীত হইয়া গিয়াছে? ঘরে অল্প অল্প আলো জ্বলিতেছে। সহসা কে আসিয়া চুল ধরিয়া শয্যা হইতে আমাকে তুলিয়া বসাইল। চকিত হইয়া আমি চাহিয়া দেখিলাম দেখিলাম যে, এক জন চীনে আমায় বিছানার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। আরও দেখিলাম যে, সে আর কেহ নহে, সে সেই মোঙ্গ,—যাহার হাত আমি কাটিয়াছিলাম। ভয়ে বিহ্বল হইয়া আমি কথা কহিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু আমার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। কেবল গোঁ গোঁ শব্দ বাহির হইতে লাগিল। খাটের এক পার্শ্বে তোমার মামী শয়ন করিয়া ছিলেন। সেই শব্দে তাঁহারও নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনিও চীনাকে দেখিতে পাইলেন। কিছুক্ষণ আমাদের খাটের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া চীনে কুপিত কটাক্ষে আমার দিকে চাহিযা ঘোরতর ভর্ৎসনাসূচক ভঙ্গী করিয়া, তাহার দক্ষিণ হাতের আধখানি অর্থাৎ কেবল বাহুটি আমাকে তুলিয়া দেখাইল। তাহার পর, সে ঘর হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল। পরে যে ঘরে শিশি থাকে, সেই ঘরে খুট খাট শব্দ হইতে লাগিল! পরে অবগত হইয়াছি যে, প্রত্যেক শিশি নিরীক্ষণ করিয়া সে আপনার হাতের অনুসন্ধান করে। শিশিতে আপনার হাত দেখিতে না পাইয়া, তাহার পর বাড়ীর অন্যান্য ঘর সে পাতি পাতি করিয়া অনুসন্ধান করে। আজ কয় বৎসর ধরিয়া প্রতি রাত্রিতে এইরূপ করিতেছে। প্রথমে শয্যা হইতে সে আমাকে উত্তোলন করে, তাহার পর কুপিত ও ভর্ৎসনার ভাবে সে আমাকে তাহার হাতের আধখানি দেখায়, তাহার পর শিশিগুলিকে দেখিয়া বেড়ায়, তাহার পর অন্যান্য ঘর অনুসন্ধান করে। রাত্রিকালে সহসা মাথার চুল ধরিয়া তুলিতে আমার বড় কষ্ট হয়। সেই জন্য মাথাটি আমি নেড়া করিয়াছি। এখন সে হাত ধরিয়া আমাকে উত্তোলন করে। যাহা হউক, তোমার মামী ও আমি এই রোগে আজ কয় বৎসর ভুগিতেছি। চাকর চাকরাণী আমার বাড়ীতে তিষ্ঠিতে পারে না। এখন যাহারা আছে, রাত্রিতে তাহাদের কেহ আমার বাড়ীতে থাকে না। এই রোগের জন্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমি দেশে আসিয়াছি! কিন্তু চীনে ভূত আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে। বলা বাহুল্য যে, এই বিপদ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার নিমিত্ত আমি না করিয়াছি—এক কাজ নাই। তন্ত্র, মন্ত্র

জড়ি, বড়ি, কবচ, মাদুলী, ঝাড়ান, কাড়ান, ভূত নামানো, চন্ডু নামানো, যাহা কিছু আছে, সব করিয়াছি। তাহার পর দেশে আসিয়া চীনের নামে শ্রাদ্ধ করিয়াছি, গয়াতে পিণ্ড দিয়াছি, গরীব দুঃখীকে দান করিয়াছি, এক তীর্থস্থান হইতে অন্য তীর্থস্থানে পলায়ন করিয়া বাস করিয়াছি। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। যেখানে যাই না কেন, চীনে ভূত সেইখানেই আমার সঙ্গে সঙ্গে যায়। আর একটি আশ্চর্য্য কথা এই যে, শিশিগুলি যদি আমি সঙ্গে না লইয়া যাই, তাহা হইলে উপদ্রবের আর পরিসীমা থাকে না। রাত্রিতে আমাকে শয্যা হইতে তুলিবার পর যখন সে শিশি দেখিতে না পায়, তখন ঘোরতর কুপিত হইয়া সে আমার ঘরের দ্রবাদি ভাঙ্গিতে থাকে, বাড়ীতে ইট-পাটকেল বৃষ্টি করিতে থাকে, ঘরদ্বার বিশেষতঃ রান্নাঘরের হাঁড়ি কুড়ি মল-মূত্রে পরিপূর্ণ করিয়া দেয়। সে জন্য যেখানে যাই না কেন, শিশিগুলি আমাকে সঙ্গে রাখিতে হয়। আর কোন উপায় নাই। এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। এখন মৃত্যু হইলেই আমি যেন বাঁচি।

রাধামাধব মাতুলের কথাগুলি শুনিলেন। মাতুলকে নানারূপ আশ্বাস প্রদান করা ব্যতীত তখন আর কিছু বলিলেন না। তাহার পর রাত্রিকালে শয়ন করিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—"আমি যদি মামাকে এ দায় হইতে উদ্ধার করিতে পারি, তাহা হইলে, তাঁহার প্রাণদান করা হইবে। কন্যার বিবাহের জন্য তখন আর আমাকে ভাবিতে হইবে না। কিন্তু এ রোগের ঔষধ কি?" ভূত প্রেত সম্বন্ধে রাধামাধব যে সমুদয় পুস্তক পাঠ করিয়াছিলেন, সে সমুদয় পুস্তকের বিষয় সকল তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্মরণ হইল যে,— "একস্থানে আমি পাঠ করিয়াছি যে, মৃত্যুকালে লোকের মনে যদি কোনরূপ একটা একান্ত বাসনা থাকে, তাহা হইলে সে লোকের আত্মার মুক্তি হয না। সেই বাসনা পরিতৃপ্ত করিবার নিমিত্ত অনেক দিন পর্য্যন্ত সে পৃথিবীতে ঘুরিয়া বেড়ায়। শ্রাদ্ধ, গয়াতে পিণ্ড দান অথবা দুঃখীদিগকে দান, এরূপ লোকের নাম করিলে সেই আবদ্ধ আত্মার উপকার হয়। কিন্তু এ সমুদয় কাজ মাতুল করিয়াছে। তাহাতে কোন ফল হয় নাই।"

রাধামাধবের পুনরায় স্মরণ হইল,—"আর একখানি পুস্তকে পাঠ করিয়াছি যে, ভূতদিগের দৃষ্টিশক্তি প্রখর নহে, তাহাদের বুদ্ধিও তীক্ষ্ণ নহে। তাহাদিগকে অনায়াসে প্রতারণা করিতে পারা যায়।" রাধামাধব স্থির করিলেন,—"এই ভূতটাকে আমি ঠকাইতে চেষ্টা করিব।" —পরদিন রাধামাধব মাতুলকে বলিলেন,—"এ ঘোর বিপদ হইতে আপনাকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত আমি একটা উপায় ভাবিয়াছি। যদি অনুমতি করেন, তাহা হইতে কিছু দিন এই স্থানে থাকিয়া চেষ্টা করিয়া দেখি।"

মাতুল সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। যাঁহারা কলিকাতার হাসপাতলে কাজ করেন, সেইরূপ ডাক্তারের সহিত রাধামাধব একসঙ্গে পড়িয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট হইতে তিনি একটি মড়ার হাত চাহিয়া লইলেন। হাতটি শিশিতে করিয়া মাতুলের অন্যান্য শিশির সহিত রাখিয়া দিলেন। কি হয়, তাহা দেখিবার নিমিত্ত সে রাত্রি পুনরায় সেই কোচের উপর তিনি শয়ন করিলেন। রাত্রি দুই প্রহর অতীত হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে মাতুলের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। যথারীতি একে একে সমুদয় শিশিগুলি সে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে

লাগিল। যে শিশির ভিতর রাধামাধব সেই হাতটি রাখিয়াছিলেন, ভূত আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। শিশির ভিতর হাত দেখিয়া আনন্দে তাহার মুখ প্রফুল্ল হইল। শিশিটি সে বাম হাতে তুলিয়া মনোযোগপূর্ব্বক দেখিতে লাগিল। কিছুক্ষণ দেখিয়া রাগে তাহার মুখ রক্তবর্ণ হইল। রাগে সে শিশি দূরে ভূমির উপর নিক্ষেপ করিল। শিশিটি ভাঙ্গিয়া গেল। ভূত অদৃশ্য হইল।

রাধামাধবের চেষ্টা বিফল হইল। ভূত প্রতারিত হইল না। কেন এরূপ হইল রাধামাধব তাহা ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে তিনি স্থির করিলেন যে, বাঙ্গালী অথবা হিন্দুস্থানীর হস্ত দ্বারা ভূতকে ভুলাইতে পারা যাইবে না। হাসপাতালের চীনম্যানের হাত চাই। কিন্তু হাসপাতালে চীনম্যানের হাত সহজে পাওয়া যায় না। তথাপি রাধামাধব নিরাশ হইলেন না। এই রূপ একটি হাতের জন্য বন্ধুদিগকে তিনি বলিয়া রাখিলেন। দৈব্যক্রমে এক সময় এক জন চীনে সূত্রধর তেতালার ভারা হইতে পড়িয়া গিয়াছিল। সে একেবারে মরে নাই। তাহার একটি হাত চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সেই হাতটি ছেদন করা হইল। রাধামাধব সেই হাতটি পাইলেন। পূর্ব্বের মত হাতটি শিশিতে রাখিয়া পুনরায় তিনি বোঁচের উপর শয়ন করিয়া রহিলেন। রাত্রি দুই প্রহরের পর ভূত যথারীতি উপস্থিত হইয়া শিশিগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিল। হস্তসম্বলিত শিশি দেখিয়া আজও প্রথম তাহার মনে আনন্দ হইল। কিন্তু আজও সে পূর্ব্বের ন্যায় কুপিতা হইয়া শিশিটি আছাড়াইয়া ফেলিয়া দিল। শিশিটি ভাঙ্গিয়া গেল।

রাধামাধবের চেষ্টা এবারও বিফল হইল। কেন এমন হইল, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। পরদিন প্রাতঃকালে মাতুল ও তিনি হাতটি ভূমি হইতে তুলিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ দেখিয়া মাতুল বলিলেন,—"ওঃ, বুঝিয়াছি। এটা বাম হাত। চীনে ভূতের দক্ষিণ হাত গিয়াছে। বামহাত দেখিয়া সে জানিতে পারিয়াছে যে, এটা জাল হাত, তাহার নিজের হাত নহে। সেই জন্য সে রাগ করিয়া ফেলিয়া গিয়াছে।"

রাধামাধব বুঝিলেন যে, ইহাই প্রকৃত কারণ বটে। সেই দিন হইতে চীনেম্যানের দক্ষিণ হাতের জন্য তিনি সন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু এক মাস গত হইয়া গেল তথাপি এরূপ হাতের যোগাড় করিতে পারিলেন না। রোগে মৃত ব্যক্তির হাত হইলে চলিবে কি না, সেরূপ একটা সন্দেহ মাতুল ও ভাগিনেয়ের মনে উপস্থিত হইল। এমন সময় চীনের লড়াই আরম্ভ হইল। কলিকাতা হইতে যে সমুদয়-জাহাজ চীনদেশে গমন করে, সেইরূপ জাহাজের এক জন খালাসির সহিত রাধামাধব আলাপ করিয়া তাহাকে বলিলেন,—"আরকপূর্ণ একটি শিশি তোমাকে দিতেছি। অস্ত্রাঘাতে হত হইয়াছে, এরূপ চীনে পুরুষ মানুষের দক্ষিণ হাত যদি তুমি এই শিশির ভিতর আনিয়া দিতে পার, তাহা হইলে তোমাকে আমি একশত টাকা পুরস্কার দিব।"

খালাসি সম্মত হইল। অস্ত্রাঘাতে সে সময় অনেক চীনে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছিল। সুতরাং এরূপ একটি হাতের যোগাড় করিতে খালাসিকে অধিক কষ্ট পাইতে হয় নাই। দুই মাস পরে সেই আরকপূণ শিশি করিয়া এক জন চীনেম্যানের দক্ষিণ হস্ত সে রাধামাধবকে

আনিয়া দিল।

শিশিটা রাধামাধব অন্যান্য শিশির সহিত রাখিয়া পূর্বের ন্যায় সেই ঘরে শয়ন করিয়া রহিলেন। পূর্বের ন্যায় যথাসময়ে ভূত আসিয়া একে একে শিশিগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিল। পূর্বের ন্যায় আজও সে হস্তসম্বলিত শিশিটি হাতে লইয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল; কিন্তু আজ তাহার মুখে ক্রোধের লক্ষণ উদয় হইল না; আজ সে ক্রোধে শিশিটি আছড়াইয়া ফেলিল না। আনন্দের উপর আনন্দে আজ তাহার মুখশ্রী প্রফুল্ল হইতে প্রফুল্লতর হইতে লাগিল। অবশেষে শিশিটি হাতে লইয়া আনন্দে সে ঘরের ভিতর দুপ দাপ, ধূপ ধাপ নৃত্য করিতে লাগিল। নাচিতে নাচিতে গান গাহিতে গাহিতে শিশিটা হাতে করিয়া ঘর হইতে সে অদশ্য হইয়া পড়িল। রাধামাধব তাড়াতাড়ি মাতুলকে ডাকিয়া এই সুসমাচার প্রদান করিলেন। কিন্তু চীনে ভূত তখনও বাটী হইতে যায় নাই। মাঝের একটি ঘরে তখন সে এক প্রকার চপর চপর শব্দ করিতেছিল। মাতুল, মাতুলানী ও রাধামাধব সেই ঘরের দ্বারের নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন। সে ঘরে আলো জ্বলিতেছিল। দ্বারের ফাঁক দিয়া সকলে দেখিলেন যে, ঘরের মাঝখানে বসিয়া চীনে ভূত—থালা ও অনেকগুলি বাটি হইতে কি সব আহার করিতেছে। মাতুলানী তখন আসিয়া বলিলেন,—"আজ পৌষ মাসের সংক্রান্তি। আজ আমি নানারূপ পিষ্টক প্রস্তুত করিয়াছিলাম। তাই মনে করিলাম যে—"আহা! এই চীনে ভূতটি প্রতিদিন আমাদের বাটীতে আসে; তাহাকে কিছু দিব না! তাই থালা ও বাটিতে নানারূপ পিঠে ও পরমান্ন তাহার জন্য সাজাইয়া রাখিয়াছিলাম। মনের আনন্দে বসিয়া বসিয়া সে তাই খাইতেছে।"

পিষ্টকাদি আহার করিয়া চীনে ভূত পরম পরিতোষ লাভ করিল। তাহার পর সে চলিয়া গেল। --সেই দিন হইতে মাতুলের বাটীতে আর সে চীনে ভূতের উপদ্রব হয় নাই। মাতুল ও মাতুলানীর শরীর ও মন সুস্থ হইল। সেই দিন হইতে পরম সুখে তাঁহারা দিন যাপন করিতে লাগিলেন। মাতুল এখন মাথায় চুল রাখিয়াছেন; রাধামাধবকে তিনি বলেন,—"তোমার বুদ্ধিবলে আমরা এই নিদারুণ যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছি। তুমি আমার বাটীতে আসিয়া বাস কর। আমি যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিয়াছি। টাকার জন্য তোমাকে আর ভাবিতে হইবে না।"

রাধামাধব এখন মাতুলের গৃহে বাস করিতেছেন। মাতুল ও তিনি বিজ্ঞানশাস্ত্র আলোচনা-জনিত স্বর্গসুখ উপভোগ করিয়া, পরম সুখে দিনযাপন করিতেছেন। যাহাতে স্বজাতি ও স্বদেশের হিত সাধিত হয়, সেইরূপ নানাপ্রকার পরীক্ষায় দুই জনে ব্যস্ত আছেন। সে দিন অতি ধুমধামের সহিত রাধামাধব সুপাত্র-হস্তে জ্যেষ্ঠা কন্যাকে সম্প্রদান করিয়াছেন। অহার পর এই পোষড়া পার্ব্বণের সময় নানারূপ পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া বন্ধুবান্ধবকে ভোজন করাইবেন, সে জন্য মাতুল, মাতুলানী ও তিনি আয়োজন করিতেছেন। এই পোষড়ার সময় রাধামাধবের মাতুল যেরূপ ঘোর বিপদ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন, আরপুনরায় এই পোষড়ার সময় যেমন তাঁহারা মনের আনন্দে পিষ্টক প্রস্তুত করিতেছেন, সেইরূপ শত্রু-মিত্র সকলেই বিপদ হইতে উদ্ধার হউন, সকলেই সেইরূপ

আনন্দমনে বন্ধুবান্ধবকে পিষ্টক পরমান্ন প্রভৃতি সুখাদ্য প্রদান করিয়া পরিতোষ করুন, ইহাই প্রার্থনা। আর তাঁহাদের এই পিষ্টক-ব্যাপারে গল্প-লেখককে তাঁহারা বঞ্চিত না করেন, ইহাও একান্ত প্রার্থনা।

বিদ্যাধরীর অরুচি

প্রথম অধ্যায়– গোলাপীর হিংসা

গোলাপী ঝি বলিল—"দেখ বিদ্যাধরি! বাবুর সমুখে তুমি আর চুণকালি দিও না। আমাদের বাবু এক জন বড় উকীল। নীলাম্বর ঘোষের নাম কে না জানে? তাঁর বাড়ীর ঝি হইয়া তুমি মুদীর দোকানে একটু গুড়, উড়ের দোকানে একটি ফুলুরী, ময়রার দোকানে একটু চিনির রস, রায় বামনীর কাছে একটু মোচার ঘন্ট, যার তার কাছে যা তা জিনিষ মাগিয়া বেড়াইলে বাবুর অপমান হয়। বাবুর কথা দুরে থাক্, আমাদের পর্য্যন্ত ঘাড় হেঁট হয়। তোমার মাগার জ্বালায় লোকের কাছে আমরা মুখ তুলিয়া কথা কহিতে পারি না।"

বিদ্যাধরী ফোঁস করিয়া বলিল,—"তোমরা সকল তাতেই আমার ছল ধর। মা আমাকে একটু ভালবাসেন, তাই সকলে তোমরা ফাটিয়া মর। আমার অরুচি, মুখে কিছু ভাল লাগে না। চড়াই পাখীর আহার। না খাইয়া যেন দড়ি হইয়া যাইতেছি। গতর না থাকিলে পরের বাড়ী কাজ করিব কি করিয়া? তাই তেঁতুল দিয়া, গুড় দিয়া, যা দিয়া পারি এক মুঠা ভাত খাইতে চেষ্টা করি। আমি গরীব মানুষ। পয়সা কোথা পাইব যে, সন্দেশ, রসগোল্লা কিনিব? মুদী আমাকে ভালবাসে, তাই সে দিন সে আমাকে একটু গুড় দিয়াছিল। ময়রা আমাকে ভালবাসে, তাই সে দিন আমাকে শালপাতের ঠোঙা করিয়া রসগোল্লার খানিক রস দিয়াছিল। তাতে তোমরা হিংসায় ফাটিয়া মর কেন বল দেখি?

পিতেন বলিল,—"তোমার অরুচি। পাথরটি টই-টুম্বর করিয়া বামুন ঠাকুর তোমাকে ভাত দেয়, তার পর দুই বার তিন বার তুমি ভাত চাহিয়া লও। এই ত তোমার অরুচি, এর উপর যদি রুচি থাকিত, তাহা হইলে ঘোড়াশালের ঘোড়া হাতীশালের হাতী খাইতে। অনেক বাবুর বাড়ী চাকুরী করিয়াছি, অনেক ঝি দেখিয়াছি, কিন্তু তোমার মত মাগন্তড়ে বেহায়া ঝি কখনও দেখি নাই। বামুন ঠাকুর! তুমি বল দেখি, এ মাগী তিন জনের খোরাক একেলা খায় কি না।"

ছিদেম বলিল—"দেখ বিদ্যাধরি। লোকের কাছে গিয়া যা তাই বলা ভাল নয়, তাতে মনিবের অপমান হয়। আমি রসুই করি, নিজে আমি তোমাকে ভাত দিই। সকলের চেয়ে তোমাকে আমি বেশী তরকারী দিই। তোমার বাছা, আবার অরুচি কোথায়?"

গোলাপী বলিল,—"নোলা যদি সামলাইতে না পার, সন্দেশ-রসগোল্লা যদি খাইতে সাধ হয়, তাহা হইলে পয়সা দিয়া কিনিয়া খাও না কেন? তুমি গরীব, তোমার পয়সা

নাই? তোমার গলায় অমন মোটা সোনার দানা, হাতে অমন মোটা তাগা। আর কতবার তুমি আমাকে বলিয়াছ যে, তোমারা খোলার ঘরে তক্তোপোষের খুরোর নীচে তুমি ছয়শ টাকা হাঁড়ি করিয়া পুঁতিয়া রাখিয়াছ। সর্ব্বশুদ্ধ তোমার সেই যার নাম—হাজার টাকা আছে। বিধবা হইয়া পর্য্যন্ত আমি চাকরাণীগিরি করিতেছি। আমার হাজারটা কড়া-কড়ি নাই। এই পিতেম ছেলে বেলা হইতে খানসামাগিরি করিতেছে। কত টাকা সে করিয়াছে? ছিদেম বামুন ঠাকুর দেশে জমী বাঁধা দিয়া বে করিয়াছে। এখনও সে দেনা শোধ করিতে পারে নাই। তবে তার মেয়েটি বড় হইয়া উঠিয়াছে, সেই মেয়েটিকে বেচিয়া যদি সে কিছু সংস্থান করিতে পারে।"

বিদ্যাধরী বলিল,—"আমার পৃথিবীতে কে আছে? এক দিন এক মুঠা ভাত দেয়, এমন আর কেহ নাই। কাজেই মাহিনাটি যাহা পাই, সেটি আমাকে রাখিতে হয়; ধার-ধোর দিয়া সেটিকে আমাকে বাড়াইতে হয়। তোমার ভাবনা কি বাছা! তোমার ভাই আছে, ভাই-পো আছে। অসময়ে তারা তোমার খোঁজ-খবর লইবে।" ছিদম বলিল,—"সকলের কাছে তুমি বল যে, তুমি না খাইয়া খাইয়া রোগা হইয়া যাইতেছ। কিন্তু রোজ রোজ তুমি মোটা হইতেছ। তোমার গায়ে মাছি বসিলে, মাছি পিছলাইয়া পড়ে।"

বিদ্যাধরী বলিল,—"তুমি আমায় খুঁড়িলে। তোমার মা'গ মরুক, তোমার মেয়ে মরুক। মেয়ে বেচিয়া টাকা করিবার অহঙ্কার তোমার ঘুচুক।"

ছিদেম ব্রাহ্মণ বলিল,—"দেখলে পিতেম! দেখলে গোলাপী! আমি এমন কি বলিয়াছি যে, মাগী আমাকে এমন শক্ত গালি দিল। গিন্নী মায়ের মাগিশো ঝি, তাই জন্য এত অহঙ্কার! গিন্নী-মা বলেন যে, আমার মাথা ঘোরে, আমার বুক ধড় ধড় করে, আমার তিনশ ষাটখানা ব্যায়রাম। বিদ্যাধরী সেই কথায় বাতাস দেয়। তাই গিন্নী-মা ইহাকে এত ভালবাসেন। কিন্তুসকল কথা যদি বলিয়া দিই, তাহা হইলে দুই দিন এখানে থাকিতে পাবেনা। হাঁ রে মাগী! সে দিন গিন্নী-মায়ের জন্য চা করিবার সময় এক থাবা চিনি কে মুখে দিয়াছিল? কড়ার এক পাশে সরের উপর একটু ছেঁদা করিয়া দুধ খাইবার জন্য সকলে আমরা এক একটি নল করিয়াছি। সেই নল দিয়া সকলে আমরা এক আধ ঢোক দুধ খাই-ই। কিন্তু সে দিন সমুদয় কড়া হইতে দুধের সরটুকু কে তুলিয়া খাইয়াছিল? সে দিন মাছ কুটিতে কুটিতে কে কই মাছের পেট থেকে ডিমটুকু বাহির করিয়া লইয়াছিল?"

গোলাপী বলিল,—"পূর্ব্বে চাইল, ডাল, তেল যাহা কিছু আমরা বাঁচাইতাম, সকলে ভাগ করিয়া লইতাম। এখন তুমি সেগুলি সব নিজে লও। এ কি ভাল? আমরা কি চাকরী করিতে আসি নাই? সে দিন মোচার ঘন্টের জন্য উপর হইতে ভিজে ছোলা আর নারিকেল-কোরা আসিয়াছিল। তাহার আর্দ্ধেকগুলি তুমি নিজে খাইলে। তার পর, এক দিন সকালবেলা গিন্নীর জন্য টাটকা গরম গরম জিলেপি আসিয়াছিল। তাহার পাশ হইতে পাপড়ি ভাঙ্গিয়া তুমি এতগুলি জমা করিলে। সবগুলি তুমি নিজে খাইলে। কোন্ বলিলে যে, গোলাপী! তুইও দুই একটা পাপড়ি খা। কেন বাছা, আমাদের কি মুখ নাই? না—ভাল-মন্দ জিনিষ খাইতে আমাদের সাধ হয় না?"

নীলাম্বর ঘোষের রান্নাঘরে চারি জনে এইরূপ তুমুল বাক্‌যুদ্ধ বাধিয়া গেল। একদিকে ছিদেম ব্রাহ্মণ, পিতে চাকর ও গোলাপী ঝি। একদিকে তিন জন, অন্য দিকে বিদ্যাধরী ঝি একা! সপ্তরথী বেষ্টিত অভিমন্যু কতক্ষণ বিপক্ষের সহিত সংগ্রাম করিতে পারে? বিদ্যাধরীকে শীঘ্রই পরাভব মানিয়া, সে স্থান হইতে প্রস্থান করিতে হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়– পুরুষোত্তমের সৌভাগ্য

কাঁদিতে কাঁদিতে গিন্নী-মায়ের নিকট গিয়া বিদ্যাধরী বলিল,—"মা! বামুন ঠাকুর বলে যে, তোমার কোন ব্যায়রাম নাই, সব ঠাট্টা। তোমার মাথা ঘোরে না, তোমার বুক ধড় ধড় করে না! সোহাগ করিয়া তুমি বাবুর টাকারা শ্রাদ্ধ করিতেছ। তোমার অরুচি নাই, তোমার গায়ে মাছি বসিলে, মাছি পিছলাইয়া পড়ে।"

গিন্নী বলিলেন,—"বটে! বামুনের আর্স্পর্দ্ধা কম নয়, ছোট মুখে বড় কথা।"

বিদ্যাধরী বলিল,– " আমিও মা, সেই কথা বলি। আমি বলিলাম, দেখ বামুন ঠাকুর, মনিবকে অমন কথা বলিতে নাই, মাকে আমি অষ্টপ্রহর দেখিতেছি। তাঁর যে কত অসুখ সে কথা আর বলিব কি! কেবল আমার সেবার জোরে তিনি বাঁচিয়া আছেন। এই কথা মা,—আমি যেই বলিয়াছি, আর পোড়ার-মুখ বামুনে বলিল,—সে কথা মা, তোমাকে আমি আর কি বলিব! সে একা নয়। বাবুর সখের চাকর, পোড়ারমুখো পিতেম, আঁটকুড়ী গোলাপীও তার সঙ্গে যোগ দিল! তুমি আমার মা, একটু ভালবাসো, সেই জন্য সকলের হিংসা। তা আমি মা! আর তোমার কাছে থাকতে চাই না। তুমি মা, অন্য ঝি দেখিয়া লও।"

পরদিন নীলাম্বর বাবু ছিদেম ব্রাহ্মণকে ডিস্‌মিস করিলেন ও পিতেম এবং গোলাপীকে অনেক তিরস্কার করিলেন।

বিদ্যাধরী নিজে মনোনীত করিয়া আর এক জন ব্রাহ্মণকে লইয়া আসিল। এ ব্রাহ্মণের যেরূপ মুখশ্রী, লক্ষ লোকের মধ্যেও সেরূপ একটা মুখশ্রী হয় না। মুখমণ্ডলটি প্রকাণ্ড, কিন্তু যতটা দীর্ঘে, প্রস্থে ততটা নহে। বর্ণ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। কিন্তু বসন্তের দাগে সমুদয় মুখখানি নানা আকারের গর্ত্তে এক পূর্ণ হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণের প্রকৃত বর্ণ কি তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায় না। গণ্ডদেশের উপর হাড় দুইটি এত উচ্চ হইয়া আছে যে, দুই পার্শ্বে চক্ষু দুইটি কুপের মত বোধ হয়। দুই চক্ষুর মাঝখানে নাসিকা অতি দীর্ঘ ও উচ্চ। মুখের হাঁ বৃহৎ পুষ্করিণীর ন্যায় প্রশস্ত। সে মুখের হাসি দেখিলে মানুষের আত্মা-প্রাণ শুকাইয়া যায়। চক্ষু ও চুলের বর্ণ তাম্রের ন্যায়; হাজার তেল মাখিলেও চুলের রুক্ষতা যায় না। ব্রাহ্মণের নাম পুরুষোত্তম, বাস উৎকল দেশে।

ঝগড়ার পর বিদ্যাধরী, কিছুদিন ধরিয়া মুদী ও ময়রা কাহার নিকট আর কিছু চায় নাই। –দুই দিন পরে সে পুরোযোত্তমকে বলিল,—"বামুন ঠাকুর! আমাকে তুমি যেমন তেমন ঝি মনে করিও না। এই দেখ গলায় আমার কেমন সোনার দানা; এই দেখ হাতে আমার মোটা তাগা। আর আমার ঘরে হাঁড়ি করিয়া ছয়শ টাকা আমি পুঁতিয়া রাখিয়াছি। কোন কুলে আমার কেহ নাই। আমি অধিক দিন বাঁচিব না। আমার বড় অরুচি। বৈকাল

বেলা রোজ চক্ষু জ্বালা করিয়া জ্বর হয়। বাঁচিতে আমার সাধ নাই। মরণ হইলেই বাঁচি! কিন্তু পোড়া যম আমাকে ভুলিয়া আছে। আত্মহত্যা করিলে অগতি হইবে, তা না হইলে আমি কোন্ কালে আফিম খাইয়া, কি গলায় দড়ি দিয়া, কি জলে ডুবিয়া মরিতাম। যাহা-হউক, অধিক দিন আমি আর বাঁচিব না। আমায় গহনা ও টাকাগুলি আমার মরণের পর তোমার মত কোন একটি ব্রাহ্মণের ছেলে পায়, তাহাই আমার ইচ্ছা।" পুরুষোত্তমের মুখ প্রফুল্ল হইল। সে বলিল,—"না, না,—তুমি এখন অনেক দিন বাঁচিবে। তোমার ব্যায়রাম তত কঠিন নয়। টাকা পাই না পাই,—মায়ের মত আমি তোমার সেবা করিব। সময়ে অসময়ে আমি তোমাকে দেখিব।"

বিদ্যাধরী বলিল,—"সে আর অধিক দিন দেখিতে হইবে না। নিজের শরীর আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি। তা ছাড়া বাঁচিতে আর আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই। টাকাগুলি তোমাকে আমি দিয়া যাইব। বাবু উকীল; উইল কাহাকে বলে, তা আমি জানি। গিন্নীর নামে বাবু উইল করিয়াছেন। একখানা কাগজে লিখিলেই হইবে যে অমুককে আমার টাকা গহনা দিয়া যাইলাম! তা করিলেই তুমি সব পাইবে। কিন্তু এ কথা প্রকাশ করিও না।"

সেই দিন হইতে পুরুষোত্তম যত মাছ, যত তরকারী বিদ্যাধরীর পাতে চাপাইতে লাগিল। পিতেম ও গোলাপী কিছু পায় না। সেজন্য তাহারা ক্রমাগত গজ গজ করিতে লাগিল, কিন্তু বাবুর তিরস্কারের ভয়ে প্রকাশ্যে ঝগড়া করিতে পারিল না।

চারি পাঁচ দিন পরে বিদ্যাধরী একখানা কাগজ আনিয়া পুরুষোত্তমের হাতে দিল। সমুদয় সম্পত্তি সে পাইবে, কাগজে এইরূপ লেখা ছিল। পুরুষোত্তম আরও জানিয়া দেখিল যে, এরূপ কাগজে উইল বলে, এইরূপ উইল করিয়া লোক আপনার সম্পত্তি অন্য লোককে প্রদান করে।

পুরুষোত্তমের মন আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। সেই দিন হইতে গোয়ালিনীকে বলিয়া বিদ্যাধারীর জন্য সে এক পোয়া করিয়া দুধের রোজ করিয়া দিল। সেই দিন হইতে সে নিজের পয়সা দিয়া মেঠাই-মোণ্ডা প্রভৃতি ভাল ভাল জিনিস বিদ্যাধরীকে খাওয়াতে লাগিল।

এক দিন বিদ্যাধরী বলিল,—"আমার আর বিলম্ব নাই। কবিরাজ মহাশয় বলিলেন যে—'*বিদ্যাধরি! দিন দিন তুই যেন পাখী হইয়া যাইতেছিস। মুখে যেন তোর কালি মাড়িয়া দিয়াছে,* বড় জোর আর তিন মাস।' আমি বলিলাম, –কবিরাজ মহাশয়! বাঁচিতে আর আমার ইচ্ছা নাই। রোগের যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। নিজ হাতে বিষ খাইয়া মরিলে অগতি হইবে। ঔষধের সঙ্গে যদি একটু বিষ দিয়া আপনি আমাকে মারিতে পারেন, তাহা হইতে বড় পুণ্য হয়।" কবিরাজ মহাশয় বলিলেন—'না রে না না! তা আর করিতে হইবে না! তোর নাড়ীর গতিক যেরূপ তাহাতে বড় জোর আর তিন মাস।"

পুরুষোত্তম বিদ্যাধরীর দিকে চাহিয়া দেখিল। পূর্ব্বে যদি সে এক পাথর ভাত খাইত, এখন সে দুই পাথর ভাত খায়। রোগা হওয়া দূরে থাকুক, পুরুষোত্তমের নিকট হইতে ভাল

ভাল আহারীর দ্রব্য পাইয়া দিন দিন সে যেন ফুলিয়া উঠিতেছিল। আজ তিন মাস পুরুষোত্তম তাহার সেবা করিতেছিল। আজ তিন মাস সে আপনার মাহিনা দেশে পাঠায় নাই। সমুদয় টাকা বিদ্যাধরীর জন্য খরচ করিয়াছিল।

আরও তিন মাস কাটিয়া গেল। বিদ্যাধরী মরে না! ভাল ভাল জিনিস খাইয়া তাহার শরীরে বরং কান্তি ফাটিয়া পড়িতে লাগিল। এ পর্য্যন্ত বিদ্যাধরীর জন্য পুরোষোত্তমের পঁচিশ টাকা খরচ হইয়াছিল। পুরুষোত্তমের মনে খটকা জন্মিল।

তৃতীয় অধ্যায়— প্রাণ মুগরো গাছের শিঁকড়

এক দিকে পিতেম চাকর ও গোলাপী ঝি, অপর দিকে পুরুষোত্তম ব্রাহ্মণ ও বিদ্যাধরী ঝি, ইহাদের মধ্যে সর্ব্বদা ঝগড়া হইতে লাগিল। একদিন বিদ্যাধরীকে গোলাপী বলিল, "তোমার কি বিবেচনা! আজ সকাল বেলা বাবুর জন্য তুমি সন্দেশ কিনিয়া আনিলে। বাবুকে দিবার পূর্ব্বে, বামুন ঠাকুরকে তুমি দুইবার চাটিতে দিলে তাহার পর সন্দেশটি তুমি নিজে দশবাব চাটিলে। কোন্ বলিলে যে, গোলাপী! তুই দুইবার চাট। কোন জিনিস পাইলে সকলকে ভাগ নিয়া খাইতে হয়। আমিও ঝি, তুমিও ঝি। আমাকে ভাগ দিয়া না খাইলে তোমার অধর্ম্ম হয় তা জান? মাথার উপর ভগবান্ আছেন, তিনি বিচার করিবেন। আর এই চাবড়ামুখো বামুনের কি আক্কেল? আহা, মুখখানি তো নয়—যেন ডায়মনকাটা আড়াই হাত শীতলা। পোড়ারমুখোরা আর ঠাকুর খুঁজিয়া পায় নাই, জগন্নাথকে ঠাকুর করা হইয়াছে; না আছে নাক, না কান। যে হাতে বিদ্যাধরীকে সব জিনিস দিস্, জগন্নাথের মত তোর সেই হাত ঠুঁটো হউক। মরণ আর কি?"

গোলাপীর গালিতে পুরুষোত্তমের শরীর জর্ জর্ হইল। এ দিকে বিদ্যাধরীর অরুচি দিন দিন বাড়িতে লাগিল। বিদ্যাধরী বলে,—"বামুনঠাকুর, বড় অরুচি। যদি ক্ষীরমোহন পাই, তাহা হইলে বোধ হয় কষ্টে শ্রেষ্টে একটা খাইতে পারি।" আবার কোন কোন দিন সে বলে,—'সর-ভাজা বেচিতে আসিয়াছে। বড় অরুচি। একটু যদি সরভাজা পাই, তাহা হইলে চেষ্টা করিয়া দেখি, খাইতে পারি কি না।' আবার কোন দিন বলে,—"বামুন ঠাকুর, শুনিয়াছি বাগবাজারে এক রকম সন্দেশ আছে, তাহার নাম 'আবার খাব' যদি আনিয়া দিতে পার, তাহা হইলে বোধ হয় একটু রুচি হয়।" এইরূপ নিত্য নিত্য বিদ্যাধরীর আবদার। পুরুষোত্তম কি করিবে? যখন এত টাকা খরচ করিয়াছে, তখন বিদ্যাধরীর সঙ্গে সহসা চটাচটি করিতে পারে না। কাজেই সমুদয় দ্রব্য তাহাকে আনিয়া দিতে হয়। কিন্তু বিদ্যাধরীর মরণ হওয়া দূরে থাকুক, দিন দিন সে তেলের কুপোর মত মোটা হইতে লাগিল। পুরুষোত্তম তাহার শরীরের দিকে চাহিয়া দেখে আয় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করে। এক দিন পুরুষোত্তম মুদীর দোকানে বসিয়া আছে। মুদী জিজ্ঞাসা করিল,—"ব্রাহ্মণ ঠাকুর! তোমাদের বিদ্যাধরী ঝিয়ের অরুচি সারিয়াছে?"

পুরুষোত্তম উত্তর করিল,—"বিদ্যাধরীর অরুচি! আগে যদি সে এক পাথর ভাত খাইত এখন সে দুই পাথর ভাত খায়।"

"বটে!" এই কথা বলিয়া মুদী একটি নিশ্বাস ফেলিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া মুদী বলিল, —"বিদ্যাধরীর ব্যায়রাম বাড়িতেছে? কবিরাজ মহাশয় তাহার নাড়ী ধরিয়া বলিয়াছেন যে, সে আর অধিক দিন বাঁচিবে না। সেই জন্য আমার নিকট হইতে প্রতিদিন সে এক ছটাক ঘি লইয়া যায়, আর পানা করিয়া খাইবার জন্য রোজ সে আধ পোয়া বাতাসা লইয়া যায়।" —পুরুষোত্তম জিজ্ঞাসা করিল,—"দাম দিয়া?"

মুদী উত্তর করিল,—"না; আমার ছেলেকে সে বড় ভালবাসে। বিদ্যাধরীর যাহা কিছু আছে, সে আমার ছেলেকে দিয়া যাবে । আমার ছেলের নামে সে উইল করিয়াছে।"

পুরুষোত্তমের মাথায় বজ্রাঘাত হইল। মুদী তাহার সছিদ্র বাক্স হইতে উইল বাহির করিয়া তাহাকে দেখাইল। পুরুষোত্তমও আপনার উইল আনিয়া মুদীকে দেখাইল। তখন ইহারা বুঝিল যে, সমুদয় বিদ্যাধরীর চালাকি; দানা, অনন্ত ও টাকার লোভ দেখাইয়া তাহাদের নিকট হইতে সে ফাঁকি দিয়া খাইতেছে। অনুসন্ধান করিতে করিতে আরও প্রকাশ পাইল যে, ময়রাকে একখানি সেইরূপ উইল দিয়া সে দুধ রাবড়ী ও মাখন খাইয়াছে। উড়ে দোকানদারকে উইল দিয়া, সে মুড়ির চাক্কি আর তেলেভাজা বেগুনি খাইয়াছে। এইরূপ সকলকে এক একখানি উইল দিয়া অনেক দ্রব্য খাইয়াছে।

একটা সামান্য স্ত্রীলোক তাহাকে ফাঁকি দিয়াছে—সেই লজ্জায় পুরুষোত্তম কাহাকেও কোন কথা বলিল না বিশেষতঃ সে ভাবিল যে,—"মাগীর কাছ হইতে এ টাকা যেমন করিয়া হউক আমায় আদায় করিতে হইবে। এ কথা লইয়া যদি আমি গোল করি তাহা হইলে সকলে হাসিবে, আমার টাকা আদায় হইবে না।"

কিন্তু কিরূপে সে টাকা আদায় করিবে? ঝগড়া করিলে কোন ফল হইবে না। ফাঁকি দিয়া আদায় করিতে হইবে।

পুরুষোত্তম ভাবিতে লাগিল। দুই তিন দিন চিন্তা করিয়া এক দিন সন্ধ্যোবেলা বিদ্যাধরীকে নিভৃতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার জন্য কাল আমি যে মাছের ঝোল রাঁধিয়াছিলাম, তাহা খাইয়া তুমি কেমন আছ? পেট-জ্বালা করিতেছে?" —বিদ্যাধরী বলিল,—"কেন, পেট-জ্বালা বুক-জ্বালা করিবে কেন? সে মাছের ঝোলে কি ছিল?"

পুরুষোত্তম উত্তর করিল, "এমন কিছুই নয়! তবে তুমি বলিয়াছিলে যে, মরণ হইলেই বাঁচি। তোমাকে যদি কেহ বিষ দিয়া মারে, তাহা হইলে তাহার অনেক পুণ্য হয়। মনে নাই? তুমি কবিরাজ মহাশয়ের কাছ হইতে সেই জন্য ঔষধ চাহিয়াছিলে? আমি ভাবিলাম যে,—'আহা! বিদ্যাধরী রোগের যন্ত্রণায় বড় কষ্ট পাইতেছে, বাঁচিতে ইচ্ছা নাই, তা আমি উহাকে একটু বিষ দিই, যাহাতে শীঘ্র উহার গঙ্গালাভ হয়! তাই আমাদের দেশের প্রাণমুগরো গাছের শিকড় বাটিয়া মাছের ঝোলের সহিত মিশাইয়া দিয়াছিলাম।"

বিদ্যাধরী যেন আকাশ হইতে পড়িল। শশব্যস্ত হইয়া সে বলিল,—"বলিস কিরে—উনুনমুখো ডেক্‌রা বামুন!" পুরুষোত্তম বলিল,—"তা তুমি তো নিজে আমাকে বার বার বলিয়াছ যে, এক তিল আমার বাঁচিতে ইচ্ছা নাই। এখন অমন কথা বলিলে চলিবে কেন!"

বিদ্যাধরী বলিল,—"ওরে সর্ব্বনেশে! ওরে আঁটকুড়ো উড়ে বামুন! তোর মনে কি এই

ছিল? ওঃ! আমার পেট জ্বলিয়া গেল, আমার বুক জ্বলিয়া গেল! প্রাণ যায়, ওমা! আমার প্রাণ যায়।!" —এইরূপ বলিতে বলিতে বিদ্যাধরী সেইখানে ধড়াশ করিয়া শুইয়া পড়িল, আর কাঁদিতে কাঁদিতে ক্রমাগত বলিতে লাগিল,—"আমার পেট গেল, আমার বুক গেল, আমার বুক গেল, আমার প্রাণ যায়। ও গিন্নী-মা! তোমার বিদ্যাধরী ঝি যায়। শীঘ্র ডাক্তার লইয়া এস। ও পিতেম! ও গোলাপী! শীঘ্র আয় রে! সকলে মিলিয়া আমার প্রাণ বাঁচা রে। ওমা কালি! আমাকে বাঁচাও মা! তোমাকে জোড়া পাঁঠা দিব, মা! হে বাবা তারকনাথ! আমাকে বাঁচাও বাবা, গণ্ডি দিয়া আমি তোমার মন্দিরে গিয়া পূজা দিব বাবা!"

পাছে অধিক চীৎকার করে,—সে জন্য হাত দিয়া পুরুষোত্তম তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল। পুরুষোত্তম বলিল—"চুপ চুপ।"

বিদ্যাধরী পুনরায় ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল,—আর বলিল, "হাঁ রে আঁটকুড়ীর বেটা! কি গাছের শিকড় দিয়াছিস? চুপ করিব? এখনি আমি থানায় যাইব। তোর হাতে হাতকড়ি দিয়া তোকে ফাঁসিকাঠে ঝুলাইব। ও পিতেম! ওরে শীঘ্র পাহারাওলাকে ডাক! এই আঁটকুড়ীর বেটা আমাকে বিষ দিয়াছে। আমার টাকা পাইবে, সে জন্য বেটা আমাকে খুন করিয়াছে। ওঃ! পেট আমার জ্বলিয়া গেল! হায় হায়! আমার কি হইল!"

পুরুষোত্তম বলিল,—"চুপ চুপ! যদি তুমি একান্তই মরিতে না ইচ্ছা কর, তাহা হইলে বিষের কাটান করিতে আমি জানি। সে ঔষধ ডাক্তার বৈদ্য কেহই জানে না। পুলিশের লোকে যদি আমাকে ধরিয়া লইয়া যায়, তাহা হইলে সে ঔষধ তোমাকে কে দিবে? তাহা হইলে বেখোরে তুমি মারা যাইবে।"

বিদ্যাধরী বলিল,—"ওরে আঁটকুড়ীর বেটা! তবে সে ঔষধ শীঘ্র আনিয়া দে।"

পুরুষোত্তম বলিল,—"সে ঔষধ আনিতে পাঁচ টাকা খরচ হইবে। আমার কাছে এখন একটি পয়সাও নাই! টাকা কোথায় পাইব যে, সে ঔষধ আনিব? আজ এক শিশি খাইলে আপাততঃ তোমার প্রাণটা বাঁচিবে। কিন্তু তাহার পর আরও পাঁচ ছয় শিশি খাইলে বিষটা নির্দ্দোষ হইয়া তোমার শরীর হইতে যাইবে। আমি গরীব মানুষ! ত্রিশ পঁয়ত্রিশ টাকা আমি কোথায় পাইব! আগে যদি বলিতে যে, আমার মরিতে ইচ্ছা নাই, তাহা হইলে মাছের ঝোলের সহিত আমি বিষ দিতাম না।"

বিদ্যাধরী বলিল,—ওরে আঁটকুড়ীর বেটা! আমি তোকে টাকা দিতেছি। তুই আমার প্রাণ বাঁচা। তুই আমার বাবা! তুই আমার প্রাণ রক্ষা কর। ও মা, আমার পেট জ্বলিয়া খাক হইয়া গেল।"পেটে হাত দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বিদ্যাধরী ছোট এক অন্ধকার ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। সেই ঘর হইতে পাঁচটি টাকা আনিয়া পুরুষোত্তমের হাতে দিয়া বলিল,— "যা বাবা, যা শীঘ্র যা। যা করিয়াছিস্! এখন আমার প্রাণ বাঁচা!"

পুরুষোত্তম বলিল,—"কোন ভয় নাই! ঔষধ খাইলেই তুমি ভাল হইয়া যাইবে। কাহাকেও কোন কথা বলিও না। আমি শীঘ্র ফিরিয়া আসিতেছি। যতক্ষণ না ফিরিয়া আসি, ততক্ষণ খিড়কীর দিকে কলের নীচে বসিয়া মাথায় ও পেটে একটু একটু জল দিতে থাক।"

চতুর্থ অধ্যায়– গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ

এই কথা বলিয়া পুরুষোত্তম বাটী হইতে বাহির হইল। বলা বাহুল্য যে, বিদ্যাধরীকে প্রকৃত সে বিষ দেয় নাই। আপনার টাকার আদায় করিবার নিমিত্ত সে এইরূপ ফন্দি করিয়াছিল।

বাটী হইতে বাহির হইয়া সে চারি পয়সা দিয়া একটা শিশি কিনল। রাস্তায় কল হইতে শিশিটি জলে পরিপূর্ণ করিল। তাহার পর এক পয়সার সোডা কিনিয়া সেই জলের সহিত মিশ্রিত করিল। এইরূপে মিছামিছি একটা ঔষধ প্রস্তুত করিয়া সে বাটী প্রত্যাগমন করিল! মনে করিল যে, এবার পাঁচ টাকা আদায় হইল। আর পাঁচ ছয় শিশি এইরূপ ঔষধ দিতে পারিলেই তাহার সমুদয় টাকা আদায় হইবে।

পুরুষোত্তম যখন বাড়ী ফিরিয়া আসিল, তখন অল্প অল্প অন্ধকার হইয়াছিল। সে দেখিল যে, রান্না ঘরের নিকট পিতেম ও গোলাপী বসিয়া সুড়-বুড় করিয়া কথা কহিতেছে। কয় মাস ধরিয়া পুরুষোত্তম অন্য চাকর-চাকরাণীদিগকে বঞ্চিত করিয়া, বিদ্যাধরীকে অধিক মাছ ও তরকারী দিয়াছিল, সে জন্য তাহার উপর সকলের রাগ। বিষ প্রদানের কথা পাছে পিতেম কি গোলাপী শুনিয়া থাকে, সেই ভয়ে পুরুষোত্তমের প্রাণ উড়িয়া গেল।

তাহাকে অধিকক্ষণ চিন্তা করিতে হইল না। পিতেম তাহাকে ডাকিয়া বলিল,—"বামুন ঠাকুর! সর্ব্বনাশ করিয়াছ। বিদ্যাধরীকে বিষ দিয়াছ। পুলিশের লোক টের পাইলে এখনি তোমাকে বাঁধিয়া লইয়া যাইবে। তাহার পর তোমার ফাঁসী হইবে।"

পুরুষোত্তমের মুখ শুকাইয়া গেল। সে বলিল,—"আমি সত্য সত্য তাহাকে বিষ দিই নাই। মিছিমিছি করিয়া বলিয়াছি।" –পিতেম বলিল,—"সে কথা কে বিশ্বাস করিবে? যদি বিষ দাও নাই, ঔষধ আনিবার জন্য তাহার নিকট হইতে পাঁচ টাকা লইয়াছ কেন? তবে বিদ্যাধরী উন্মাদ, পাগল হইয়াছে কেন?"

আশ্চর্য্য হইয়া পুরুষোত্তম বলিল,—"উন্মাদ পাগল হইয়াছে? আমি সত্য বলিতেছি, তাহাকে আমি পাগল হইবার ঔষধ দিই নাই।" পিতেম বলিল,—"সে ভয়ানক উন্মাদ হইয়াছে। আমরা দুইজনে তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারি না। অনেক কষ্টে তাহাকে আমরা একটু সুস্থ করিয়াছি। কিন্তু সুস্থ হইয়া সে আর এক সর্ব্বনাশ করিয়াছে। বরাবর উপরে গিয়া গিন্নী-মায়ের খাটে গিয়া শুইয়াছে। মা বাগানের কলতলায় কাপড় কাচিতে গিয়াছেন। উপরে আসিয়া দেখেন যে, বিদ্যাধরী তাঁহার বিছানায় শুইয়া আছে, তাহা হইলে আর রক্ষা রাখিবেন না। বাবুও এখনি বাড়ী আসিবেন। সকল কথা তখন প্রকাশ হইবে। তখন নিশ্চয় পুলিশ ডাকিয়া তোমাকে ধরাইয়া দিবেন।"

পুরুষোত্তম ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। যে বলিল,—"দোহাই ভাই! আমি তোমার পায়ে পড়ি। আমাকে এ বিপদ্ হইতে রক্ষা কর। এখন কি করিলে আমি রক্ষা পাই, তা বল ভাই।" পিতেম উত্তর করিল,—"আমরা অনেক কষ্টে চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিছুতেই তাহাকে গিন্নীর খাট হইতে উঠাইতে পারিনি। তুমি যদি পাঁজা করিয়া কোনরূপে তাহাকে

নীচে আনিতে পার, তাহা হইলে উপায় হইতে পারে। কিন্তু আর বিলম্ব করিলে চলিবে না। গিন্নী এখনি উপরে আসিবেন। নিজের বিছানায় বিদ্যাধরীকে দেখিলে তিনি আর রক্ষা রাখিবেন না।" পুরুষোত্তম বলিল,—"তবে আমি এখনি যাই।"

গোলাপী বলিল,—"না, অমনি গেলে হইবে না। তাহাকে পাঁজা করিয়া ধরিলেই চীৎকার করিয়া সে ফাটাইয়া দিবে। তাহার চীৎকারে গিন্নী দৌড়িয়া আসিবেন, তাহা হইলে সকল কথা প্রকাশ পাইবে।" পুরুষোত্তম জিজ্ঞাসা করিল,—"তবে কি করি?"

গোলাপী ঘরের ভিতর হইতে একটি বড় থলি আনিয়া পুরুষোত্তমের হাতে দিয়া বলিল,—"উপরে গিন্নীর ঘরে গিয়া টপ করিয়া বিদ্যাধরীর মুখে এই থলিটি পরাইয়া দিবে। তাহার পর দুই হাতে পাঁজা করিয়া তাহাকে ধরিবে। কিন্তু সাবধান! মুখ হইতে থলি যেন সে খুলিতে না পারে। তাহাকে নীচে নামাইয়া আনিবে। তাহাকে যদি আমাদের কাছে আনিতে পার, তখন আমরা তাহাকে বুঝাইয়া ঠাণ্ডা করিব।"

থলিটি হাতে লইয়া আর কোন কথা না বলিয়া পুরুষোত্তম তড়তড় করিয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিল। তাহার পর দ্রুতবেগে গিন্নীর ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। তখন অন্ধকার হইয়াছে, তখনও আলো জ্বালা হয় নাই। গিন্নীর খাটের উপর যে শুইয়া ছিল, পুরুষোত্তম নিকটে গিয়া সহসা তাহার মুখে থলিটি পরাইয়া দিল মস্তকে, বক্ষঃস্থলে, পৃষ্ঠদেশে, দুই হাতে, কোমর পর্য্যন্ত তাড়াতাড়ি থলিটি টানিয়া দিল। তাহার পর তাহাকে পাঁজা করিয়া ধরিয়া হিঁচড়াইতে হিঁচড়াইতে ঘরের ভিতর হইতে বাহির করিল। সে চীৎকার করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু থলির ভিতর হইতে কোন শব্দ বাহির হইল না, থলির ভিতর হইতে ঘড় ঘড় আর গোঁ গোঁ শব্দ হইতে লাগিল। তাহার হাত দুইটি আবদ্ধ ছিল। যথাসাধ্য আপনাকে ছাড়াইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু উড়ে বামুন নাছোড়বান্দা। কতক টানিয়া কতক হিঁচড়াইয়া পুরুষোত্তম তাহাকে সিঁড়ির নিকট পর্য্যন্ত আনিল! এমন সময় সে থলির ভিতর হইতে আপনার দুই হাতের কতকটা বাহির করিয়া ফেলিল!

সেই দুই হাতে পুরুষোত্তমকে প্রাণপণে খিমচাইতে আর থলি ভেদ করিয়া ভিতর হইতে পুরুষোত্তমকে কামড়াইতে লাগিল, আর দুই পায়ে লাথি মারিতে লাগিল। সিঁড়ির উপরে যেন গজকচ্ছপের যুদ্ধ বাধিয়া গেল। তাঁহার আঁচড়ানি কামড়ানিতে পুরুষোত্তম বড়ই বিব্রত হইল। অনেক চেষ্টা করিয়াও সে তাহাকে সিঁড়িতে নামাইতে পারিল না। দুই পা আগে যায়, আর এক পা পশ্চাতে গিয়া পড়ে। সিঁড়ির ঠিক উপরে তাহাকে লইয়া পুরুষোত্তম এইরূপ টানাটানি করিতেছে, এমন সময় সিঁড়ির একটু নিম্নে বাড়ীর কর্ত্তা-বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

একে উড়ে ব্রাহ্মণের সেই অদ্ভুত মূর্ত্তি। সেই মূর্ত্তি গুণ-মোড়া আর একটা মূর্ত্তিকে লইয়া টানা-হেঁচড়া করিতেছে। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া বাবু ভাবিলেন, এ ভূত, না প্রেত, না পাগল, এ কি? ঘোরতর বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—"এ কি! এ কি!"

চমকিত হইয়া পুরুষোত্তম বাবুর দিকে চাহিয়া দেখিল যে, দুইটা পৈঠার নীচে সিঁড়িতে স্বয়ং বাবু দাঁড়াইয়া আছেন, আর তাহার ঠিক পশ্চাতে আলো হাতে করিয়া স্বয়ং বিদ্যাধরী

ঝি দাঁড়াইয়া আছে।

বাবুর পশ্চাতে সিঁড়ির উপর বিদ্যাধরীকে দেখিয়া পুরুষোত্তমের প্রাণ উড়িয়া গেল। তৎক্ষণাৎ সে চটমোড়া সেই স্ত্রীলোককে সেই স্থানে ফেলিয়া দ্রুতবেগে বাবুর পাশ দিয়া সিঁড়ি হইতে নামিল। নীচে নামিয়া তৎক্ষণাৎ সে বাটী হইতে পলায়ন করিল। আপনার মাহিনা কি কাপড়-চোপড় লইতে আর সে ফিরিয়া আসিল না। সে পর্য্যন্ত পুরুষোত্তম ব্রাহ্মণের আর কোন সন্ধান কেহ পায় নাই। পুরুষোত্তম যখন চলিয়া গেল, তখন বিদ্যাধরী ঝি, গোলাপী ঝি ও পিতেম চাকর সকলেই হাবা সাজিল। তাহারা বলিল,—"ব্রাহ্মণ কেন এরূপ কাজ করিয়াছে, তাহার বিন্দুবিসর্গ কিছুই আমরা জানি না।" সে জন্য এ ব্যাপার কেন যে ঘটিয়াছিল, নীলাম্বর বাবু এখনও সবিশেষ কারণ জানিতে পারেন নাই। তাঁহার ধারণা এই যে, উড়ে ব্রাহ্মণ হয় পাগল হইয়াছিল, আর না হয় তাহাকে ভূতে পাইয়াছিল।

যাহা হউক, নীলাম্বর বাবু তাড়াতাড়ি স্ত্রীলোকের মাথা হইতে থলিটি খুলিয়া লইলেন। বলা বাহুল্য যে, থলির ভিতর হইতে তাঁহার স্ত্রীর মুখ বাহির হইয়া পড়িল। গিন্নী তখন জ্ঞানশূন্য, মূর্চ্ছিত। অনেক কষ্টে পুনরায় তাঁহার চেতন হইল। তাহার পর, হিষ্টিরিয়া রোগ দ্বারা তিনি আক্রান্ত হইলেন। ছয় মাস কাল পর্য্যন্ত নানা রোগে তিনি কষ্ট পাইলেন। ডাক্তার বৈদ্য দেখাইয়া অনেক টাকা খরচ কবিয়া, নীলাম্বর বাবু এখন তাঁহাকে ভাল করিয়াছেন। সকলে এখন সুখে স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতেছেন।

মেঘের কোলে ঝিকিমিকি - সতী হাসে ফিকি ফিকি

প্রথম অধ্যায়— আশ্চর্য্য ছবি

হৃষীকেশ রায় কলিকাতার আর্ট স্কুলে অধ্যয়ন করেন এই বিদ্যালয়ে বালকেরা ছবি আঁকিতে শিক্ষা করে। ছবি আঁকা ভিন্ন হৃষীকেশ ফটোগ্রাফ লইতে অর্থাৎ আলোকযন্ত্রের সহায়তায় মানুষের চেহারা তুলিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন।

গ্রীষ্মের ছুটি পাইয়া হৃষীকেশ বাটী আসিয়াছিলেন। তাঁহার নিবাস রামদেবপুর। পূর্ব্বে এই গ্রামে অনেক লোকের বাস ছিল। ম্যালেরিয়ার উপদ্রবে গ্রামখানি এক্ষণে জনশূন্য প্রায় হইয়াছে। হৃষীকেশের পিতা দর্পনারায়ণ রায় মহাশয় এক্ষণে গ্রামের মধ্যে প্রধান ব্যাক্তি। তিনি নিজে অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়া ধনবান্ হইয়াছেন।

নিকটস্থ কোন গ্রামের একজন লোক তাঁহার শিশু পুত্রের ছবি তুলিবার নিমিত্ত হৃষীকেশকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। হৃষীকেশ চাকরের দ্বারা প্রথম চেহারা তুলিবার যন্ত্র ও ছবি আঁকিবার দ্রব্যাদি পূর্ণ বাক্স প্রভৃতি পাঠাইয়া দিলেন। তাহার পর বৈকাল বেলা

নিজে বাইসাইকেলে অর্থাৎ চাকায় চড়িয়া সেই গ্রামে গমন করিলেন।

যথারীতি বালককে বসাইয়া যন্ত্রনিহিত কাচের উপর হৃষীকেশ বালকের ছায়া গ্রহণ করিলেন। কিরূপ ছবি উঠিল, তাহা দেখিবার নিমিত্ত যন্ত্র হইতে কাচখানি তিনি অতি সাবধানে বাহির করিলেন। আশ্চর্য্য! কাচের উপর বালিকের মুখশ্রী কি করিয়া উঠিল? নিকটে কোন বালিকা ছিল না। কাচের উপর বালিকার মুখশ্রী কি করিয়া উঠিল? এরূপ অদ্ভুত ঘটনা কেহ কখন দেখে নাই, কেহ কখন শুনে নাই। বিস্ময়ে হৃষীকেশ স্তম্ভিত হইলেন। তাহার পর এরূপ রূপও কেহ কখনও দর্শন করে নাই। ছবিতে সেই মুখশ্রী দেখিয়া হৃষীকেশের মন মোহিত হইল। এরূপ দেবকন্যা-সমা বালিকা কি পৃথিবীতে আছে। মানুষের এরূপ অসামান্য রূপ কি হইতে পারে? যাই হউক, এই ছবির উপর আমি আমার প্রাণ সঁপিলাম। যদি পৃথিবীতে থাকে, যদি সে আমার স্বজাতি হয়, যদি আমি তাহাকে পাই, তাহা হইলে আমি সংসার-ধর্ম করিব। নতুবা সন্ন্যাসী হইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিব। গ্রীষ্ম বর্ষায় নানা ক্লেশে শরীরকে ক্লিষ্ট করিয়া অবশেষে সাদরে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিব।

"হৃষীকেশ! ছবি কি ভাল উঠে নাই?" বালকের পিতা এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

চমকিত হইয়া হৃষীকেশ উত্তর করিলেন,—"না। আমার যন্ত্র বিকল হইয়া গিয়াছে। আজ আর ছবি হইবে না। আজ আমি বাড়ী যাই।"

এই কথা বলিয়া তাড়াতাড়ি বালিকার প্রতিবিম্বে অঙ্কিত সেই কাচখানি তিনি বাক্সের মধ্যে লুক্কায়িত করিলেন। তাহার পর আপনার চাকার উপর চড়িলেন। যে চাকার তাঁহার যন্ত্রাদি লইয়া আসিয়াছিল, তাহাকে তিনি পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে বলিলেন। গ্রামের বাহিরে এক নিভৃত স্থানে গাছতলায় চাকরের প্রতীক্ষায় তিনি বসিয়া রহিলেন। চাকর সেই স্থানে আসিয়া পৌঁছিলে তাহার নিকট হইতে ছবি আঁকিবার দ্রব্যাদিপূর্ণ বাক্সটি গ্রহণ করিয়া তাহার ভিতর হইতে তুলি, নানাবিধ রং ও একখণ্ড গোলাকার ক্ষুদ্র হাতীর দাঁতের উপর তিনি সেই বালিকার ছবি আঁকিতে লাগিলেন। উপরে কাচ ও চারিধারে পিত্তলের গড়ন দ্বারা আবদ্ধ চোট একখানি ছবি তাহার বাক্সর ভিতর ছিল। সেই ছবিখানি বাহির করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে হস্তি-দন্তে চিত্রিত বালিকার ছবিখানি তিনি আপনার গলায় পরিলেন। যন্ত্র ও দ্রব্যাদির সহিত চাকরকে আগে পাঠাইয়া সেই গাছতলায় তিনি পড়িয়া রহিলেন। হৃষীকেশের বয়স অধিক হয় নাই, ষোল কি সতের বৎসর। তথাপি সেই বালিকার জন্য তিনি পাগলের ন্যায় হইয়াছিলেন। গাছতলায় পড়িয়া কেবল তিনি তাহাকে ভাবিতে লাগিলেন। আর যতক্ষণ পর্য্যন্ত দিন ছিল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বক্ষঃস্থল হইতে তিনি সেই বালিকার ছবি বাহির করিয়া বার বার দেখিতে লাগিলেন। বালকের ছায়া গ্রহণের সময় কোথা হইতে বালিকার ছবি আসিল, তাহা তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। নিশ্চয় এ দৈব ঘটনা। যদি দৈব ঘটনা হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় বালিকা কোন না কোন স্থানে আছে, আর নিশ্চয় বিধাতা তাহার জীবনের সহিত আমার জীবন জড়িত করিয়া রাখিয়াছেন। ঘাসের উপর মাটীতে পড়িয়া হৃষীকেশ এইরূপ নানা কথা ভাবিতে লাগিলেন।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। তথাপি হৃষীকেশ উঠিলেন না। ক্রমাগত সেই বালিকার অপূর্ব

মুখশ্রী ধ্যান করিতে লাগিলেন। রাত্রি প্রায় এক প্রহর অতীত হইল। ঘোর অন্ধকার। সমস্ত পৃথবী আমি এই বালিকাকে অন্বেষণ করিব। আমার এই প্রতিজ্ঞা, যদি হৃষীকেশ এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া সে স্থান হইতে উঠিলেন। উঠিয়া দেখিলেন যে, আকাশের পশ্চিম-উত্তর কোণে ঘোরতর মেঘ করিয়াছে, আর সেই কাল মেঘের কোলে চক্‌মক্ করিয়া বিজলী খেলিতেছে, তাড়াতাড়ি তিনি আপনার চাকার উপর চড়িয়া গৃহ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

যে গ্রামে তিনি গিয়াছিলেন, সে স্থান হইতে বাটী যাইতে মাঝে একটা জলা আছে। তাহার মাঝখান দিয়া একটি পাকা রাস্তা গিয়াছে। এক ক্রোশ জলা পার হইয়া নিজের গ্রামে যাইতে হয়। রাত্রি নয়টার অধিক হইয়াছে। মাঠের পথে জনমানব নাই। হৃষীকেশ দ্রুতবেগে জল পার হইতে লাগিলেন। প্রায় অর্দ্ধেক পথ পার হইয়াছেন, এমন সময় সহসা তাঁহার চারিদিকে প্রবলবেগে ঘূর্ণিবাতাস উত্থিত হইল। বায়ুর সোঁ সোঁ, বৃক্ষপত্র ও শুষ্ক ঘাসের খড় খড় শব্দ হইতে লাগিল। তাঁহার চক্ষু ও মুখ ধূলায় পূর্ণ হইয়া গেল। বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। সেই মুহূর্তে কে এক জন যেন শূন্য হইতে তাঁহার চাকার উপর পড়িল। তাঁহার পশ্চাতে চাকার উপর বসিয়া দুই হাতে তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিল! গলা ধরিয়া তাঁহার কানে চুপি চুপি বলিল,—

'মেঘের কোলে ঝিকিমিকি। সতী হাসে ফিকিফিকি ।

অকস্মাৎ এই অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া ভয়ে হৃষীকেশের প্রাণ উড়িয়া গেল। মূর্চ্ছিত হইয়া চাকা হইতে তিনি পতিতপ্রায় হইলেন। কিন্তু যে তাঁহার পশ্চাতে বসিয়া ছিল, সে দুই হাতে তাঁহর গলা জড়াইয়া ছিল। সে জন্য মাটীতে তিনি পড়িয়া গেলেন না। অজ্ঞান অবস্থায় হাত পা অবশ হইয়াগেল। কিন্তু তবুও তাঁহার চাকা মাটীতে পড়িয়া যায় নাই। পূর্ব্বের ন্যায় চাকা বন্ বন্ করিয় অগ্রসর হইতেছিল। হৃষীকেশের ক্রমে একটু সংজ্ঞা হইল। বিদ্যুতের আলোকে তিনি দেখিলেন যে, যে তাঁহার গলা ধরিয়া ছিল, তাহার দুই হাতে শাঁখা রহিয়াছে। তাহাতে তিনি বুঝিলেন যে, সে স্ত্রীলোক। এ যে মানুষ নহে, তাহা তিনি পূর্ব্বেই ঠিক করিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন যে, প্রেতিনী অথবা শঙ্খচূর্ণীর হাতে আজ আমি পড়িয়াছি। আমাকে নিশ্চয় এ মারিয়া ফেলিবে। প্রথম তিনি আপনার গলা হইতে ভূতিনীর হাত দুইটি ছাড়াইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা বিফল হইল। ভূতিনী হাত দুইটির দ্বারা তাঁহার গলা এত দৃঢ়রূপে চাপিয়া ধরিল যে, তাঁহার শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল। আরব্য উপন্যাসের বৃদ্ধ পদ দ্বারা যেরূপ সিন্ধুবাদের্ গলা চাপিয়া ধরিয়াছিল, ভূতিনী তাহার দুই হাত দিয়া হৃষীকেশের গলা সেইরূপে চাপিয়া ধরিল। ভূতিনীর হস্তদ্বয় হইতে নিষ্কৃতি না পাইয়া হৃষীকেশ চাকা হইতে লম্ফ প্রদানের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ভূতিনী তাঁহাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া ছিল; সুতরাং সে চেষ্টাও বিফল হইল। আজ ভূতের হাতে নিশ্চয় প্রাণ হারাইলাম, এইরূপ ভাবিয়া হৃষীকেশ মুখে ধুলি মাড়িয়া দিল, তাঁহার হাত-পা কাঁপিতে লাগিল, তাঁহার হৃৎপিণ্ড ধড় ফড় করিতে লাগিল, পুনরায় মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হইল। কিন্তু যাহাতে জ্ঞানশূন্য না হইয়া পড়েন, সে জন্য মনকে দৃঢ়

করিতে চেষ্টা করিলেন। অবশেষে সাহসে ভর করিয়া ভূতিনীকে বলিলেন,—"কে তুমি? আমি তোমার কাছে কি অপরাধ করিয়াছি যে, তুমি কষ্ট দিতেছ? আমাকে ছাড়িয়া দাও।

ভূতিনী হাসিয়া পুনরায় তাঁহার কানে কানে বলিল,—

মেঘের কোলে ঝিকিমিকি
সতী হাসে ফিকি ফিকি।।

তাহার পর গানের সুর ধরিয়া ভূতিনী উচ্চৈঃস্বরে বলিল,—

ঘর ঘর ঘর চাকা ঘোরে। ভাল বেসেছেন বঁধু মোরে।।
বঁধুর গলায় ছবি দোলে। বঁধুকে আমি নিয়েছি কোলে।।

চাকা বন্ বন করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। ভূতিনী সেই চাকার উপর বসিয়া নাচিতে লাগিল। নাচিতে নাচিতে সুর করিয়া সে পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল,—

টিপি টিপি বৃষ্টি পড়ে মেঘে ঝিকি মিকি।
ডুলির ভিতর বসে ক'নে হাসে ফিকি ফিকি।।
বিয়ের সম্বন্ধ মামা করে, খুড়ো নয়কো রাজি।
হিঁদুর ঘরে বিয়ের মামলা বিচার করেন কাজি।।
লাল কাপড়ে ময়ূর আঁকা হাতে রাঙ্গা কড়।
বিয়ের সময় ছান্‌লা তলায় উঠলো বড় ঝড়।।
বিয়ের পরে বাসর-ঘরে ক'নে বেটী যান।
পাড়ার মেয়ে এসে করে শিব ঠাকুরের গান।।
ডাকাত সাজে বুড়ো কাজি দেড়ে থানাদার।
চক্‌চকানি টাকা পেয়ে খুলে দিলাম দ্বার।।
জলার ভিতর আছি ভাই নাইকো আমার গতি।
যতদিন না বঁধুর সঙ্গে মিলবে পুন সতী।।
যাও বঁধু সেই ক'নের কাছে গলায় ছবি যার।
উলু উলু উলু উলু উলু পাঁচবার।।

উলু দিতে দিতে ভূতিনী চাকার উপর হইতে লাফাইয়া পড়িল ও অন্ধকারের ভিতর অদৃশ্য হইয়া গেল। হৃষীকেশের চাকা আপনার বেগে কিছুদুর অগ্রসর হইয়া এক পাশ হইয়া পড়িয়া গেল। সেই সঙ্গে চীৎকার করিয়া হৃষীকেশ অজ্ঞান হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। —নিকটে কয়েক ঘর মুসলমানের বাস ছিল। হৃষীকেশের চীৎকার শুনিয়া তাহাদের চারি পাঁচজন লোক বাহিরে আসিল। মূর্চ্ছিত হৃষীকেশকে দেখিয়া তাহারা চিনিতে পারিলেন। মুখে-হাতে জল দিয়া বাতাস করিয়া তাহারা তাঁহাকে চেতনা করিল। তাঁহার জ্ঞান হইল বটে, কিন্তু তিনি কোন কথা বলিতে পারিলেন না। কি হইয়াছিল, কেন তিনি চীৎকার করিয়াছিলেন, কেন তিনি পড়িয়া গিয়াছিলেন, সে সব প্রশ্নের উত্তরে তিনি কেবল বিজ-বিজ করিয়া বকিতে লাগিলেন। এক জন মুসলমান বলিল,—"ঝিকি মিকি,

ফিকি ফিকি কি বলিতেছেন, বুঝিতে পারা যায় না।"

সকলে বলিল,—"নিশ্চয় জলার পেতনী ইঁহাকে ধরিয়াছিল। চল, ইঁহাকে বাড়ীতে রাখিয়া আসি।"

এই বলিয়া তাহারা হৃষীকেশকে বাড়ী লইয়া গেল হৃষীকেশের মাতা ছিলেন না। সংসারে ছিলেন কেবল পিতা, বড় ভ্রাতৃবধু ও তাঁহার একটি শিশু-পুত্র। তাঁহার মাতার কিছুদিন পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদরও অল্পবয়সে পরলোক গমন করেন। যাহার মাতা নাই, সংসারে তাহার কেহ নাই।

হৃষীকেশের কেহ খোঁজ-খবর বড় লইল না। পিতা কেবল একবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার কি হইয়াছে?

হৃষীকেশ বিজ-বিজ করিয়া কি বলিলেন। তাহা শুনিয়া পিতা বলিলেন,—ঝিক মিক্ ফিক্ ফিক্ আবার কি?" –এই বলিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

রাত্রির শেষভাগে হৃষীকেশ শয্যা হইতে উঠিলেন। ছবিখানি বুকের উপর রাখিয়া যৎকিঞ্চিৎ অর্থ লইয়া তিনি গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন। পিতা লোক দ্বারা তাঁহার অনুসন্ধান করিলেন। কিন্তু হৃষীকেশের কোন সন্ধান হইল না।

দ্বিতীয় অধ্যায়– রায় মহাশয়ের পরিবার

হৃষীকেশের পিতা, —দর্পনারায়ণ রায় মহাশয় উগ্রস্বভাববিশিষ্ট লোক, সর্ব্বদাই তিনি রাগিয়া থাকেন। নিজে তিনি অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন, সেই অহঙ্কারে তাঁহার মেজাজ সর্ব্বদাই গরম হইয়া থাকে। তাহার কটুবাক্যে সকলেই বিরক্ত। পাড়াপ্রতিবাসী আত্মীয়-স্বজন কাহারও সহিত তাঁহার সদ্ভাব নাই, এমন কি, তাঁহার পুত্রদিগের সহিতও তাঁহার সম্প্রীতি ছিল না জ্যেষ্ঠ পুত্র বধূ তাঁহার তাড়নায় সর্ব্বদাই জর্জ্জরীভূত। অল্প বয়সে তিনি বিধবা হইয়াছেন। পুত্রটির বয়স এক্ষণে পাঁচ বৎসর। তাহার নাম বিনয়। বিনয় অতি সুবোধ ও শান্ত বালক। পিতামহ সংসারে কখন কাহাকেও ভালবাসেন নাই। এক মাত্র বিনয়ের প্রতি কেবল তাঁহার যৎকিঞ্চিৎ স্নেহ জন্মিয়াছিল। এক বিনয় ভিন্ন আর কেহ তাঁহার নিকট যাইতে অথবা তাঁহার সহিত কথা কহিতে সাহস করিত না।

কিন্তু আজ বিনয়ের উপরও তাঁহার রাগ হইয়াছে। বিনয় কোন দোষ করে নাই, বিনয়ের মাতাও কোনও দোষ করে নাই। দোষ করিয়াছিলেন, বিনয়ের মাতামহ মৃত্যুঞ্জয় নস্কর। বিনয়ের মাতার এক অবিবাহিতা ভগিনী আছে, তাহার রূপ ও গুণের সুখ্যাতি রায় মহাশয় অনেক লোকের মুখে শুনিয়াছিলেন। হৃষীকেশের সহিত তাঁহার বিবাহ দিবার জন্য রায় মহাশয় ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু কন্যার পিতা সে প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। বৈবাহিককে তিনি স্পষ্ট বলিলেন যে,—"তোমার ধন থাকিলে কি হইবে? আমার জ্যেষ্ঠা কন্যাকে তুমি একদিনও সুখী কর নাই। আমার জামাতা,—তোমার পুত্র—তাহার সহিত তোমার সদ্ভাব ছিল না। তোমার তর্জ্জন গর্জ্জনে সে অল্প বয়সে মরিয়া গেল, আমার কন্যা বিধবা হইল। তাহাকেও তুমি একদিনের জন্যও সুখে রাখ নাই। আমার যদি অবস্থা ভাল

হইত, তাহা হইলে তোমার বাড়ীতে একদিনের জন্য বিধবা কন্যাকে আমি থাকিতে দিতাম না। বিনয় ও তাহাকে আনিয়া আমার ঘরে রাখিতাম। আমার কনিষ্ঠা কন্যা অন্নপূর্ণা সুলক্ষণা,—লক্ষ্মীস্বরূপা কন্যা। চিরদুঃখিনী হইবার জন্য তোমার বাড়ীতে তাহাকে আমি পাঠাইতে পারি না।"

নস্কর মহাশয়ের এই উত্তর শুনিয়া রায় মহাশয়ের মন রাগে পরিপূর্ণ হইল। পুত্রবধূকে তিনি সর্ব্বদাই ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। যখন হৃষীকেশ বাড়ী হইতে পলায়ন করিলেন, তখন তাঁহার রাগের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি ভাবিলেন যে, সুরূপা সুলক্ষণা অন্নপূর্ণার সহিত বিবাহ দিলে পুত্র দেশত্যাগী হইত না। এইরূপ ভাবিয়া পুত্রবধুকে তিনি দিবারাত্র তিরস্কার করিতে লাগিলেন। পুত্র হৃষীকেশের প্রতি তাঁহার যে প্রগাঢ় স্নেহমমতা ছিল, তাহা নহে। ক্রোধে অভিভূত হইবার, লোককে গালি দিবার একটি কারণ পাইয়াছেন, তাহাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট। অহোরাত্রি তিরস্কারের জ্বালায় পুত্রবধুর জীবন অসহনীয় হইয়া উঠিল। সমস্ত দিন আহার না করিয়া অবিরল ধারায় চক্ষের জল ফেলিতে লাগিলেন। রায় মহাশয়ের রাগ তাহাতে আরও বৃদ্ধি হইল। পুত্রবধুর প্রতি নানারূপ নিদারুণ বাক্য প্রয়োগ করিয়া অবশেষে তিনি বলিলেন,—"তোমার পিতার দোষে আমার পুত্র বিবাগী হইয়া গেল। তোমার পিতা বলে যে, তোমাকে এখানে থাকিতে দিতে তাহার ইচ্ছা নাই। পুত্র লইয়া তুমি আমার বাটী হইতে দূর হও!"

বিধবা পুত্রবধূ, কর্ত্তার নিষ্ঠুর বাক্য আর সহ্য করিতে পারিলেন না। শিশু-পুত্রটির হাত ধরিয়া তিনি বাটী হইতে বাহির হইলেন, তাহার পর অতি কষ্টে পিতার ভবনে গিয়া উপস্থিত হইলেন। পিতা বলিলেন যে,—"মা! যদি আমাদের একমুঠা জোটে, তাহা হইলে তাহার আধমুঠা তোমাকে ও তোমার পুত্রকে আমরা দিব। সে নরাধমের বাড়ীতে আর তোমার গিয়া কাজ নাই।"

বড় পুত্র জীবিত নাই, কনিষ্ঠ পুত্র দেশত্যাগী হইয়াছে। বিধবা পুত্রবধু পৌত্রকে তিনি তাড়াইয়া দিলেন। রায় মহাশয়ের সংসার শূন্য বোধ হইল। কতক রাগে, কতক মনের খেদে, তিনি পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার বয়স এক্ষণে ষাটি বৎসরেরও অধিক। কিন্তু টাকায় কি না হয়? নিকটস্থ একখানি গ্রামে চতুর্ভুজ হড় নামক এক ব্যক্তি বাস করিতেন। কন্যা বিক্রয় করিয়া অনেক অর্থ লাভ করিবেন, এইরূপ আশা করিয়া, কন্যাকে তিনি বড় করিতেছিলেন। অনেক দিয়া রায় মহাশয় তাঁহার পনর বৎসর বয়স্কা কন্যাকে বিবাহ করিলেন। হড় মহাশয়কে কেবল যে তিনি নগদ টাকা দিলেন তাহা নহে, তাঁহার কন্যাকে প্রচুর অলঙ্কার প্রদান করিলেন। কন্যার যদি পুত্র হয়, তাহা হইলে তাহাকেই সমুদয় সম্পত্তি দিয়া যাইবেন, সেইরূপ অঙ্গীকার করিলেন। আর সপরিবারে হড় মহাশয়কে চিরকাল প্রতিপালন করিতেও স্বীকৃত হইলেন। সে জন্য বিবাহের পর কন্যার পিতা হড় মহাশয়, কন্যার মাতা, কন্যার ভ্রাতা বৃন্দাবন ও ভ্রাতার স্ত্রী সকলে আসিয়া রায় মহাশয়ের বাটিতে বাস করিতে লাগিলেন। রায় মহাশয়ের সংসার পুনরায় জাজ্বল্যমান

হইল।

কিন্তু বিধাতা কপালে সুখ না লিখিলে সুখ হয় না। এক বৎসর পরে, ঠিক পূজার পূর্ব্বে, রায় মহাশয়ের নব বিবাহিতা পত্নী সহসা রোগগ্রস্ত হইয়া ইহলীলা সম্বরণ করিলেন। রায় মহাশয়ের পুনরায় গৃহশূন্য হইল। পত্নীর পরলোক হইল বটে, কিন্তু হড়বংশ রায় মহাশয়ের বাটীতে বাস করিতে লাগিলেন। মনের দুঃখে রায় মহাশয় বলিলেন যে,— "আমার পুত্র, পুত্র-বধু কেহই আমার অসময়ে মুখপানে চাহিয়া দেখিল না। পুত্র, পুত্রবধু অথবা পৌত্রকে আমি আমার সম্পত্তির এক পয়সা দিয়া যাইব না। যাহারা আমার সেবা-শুশ্রূষা করিবে, তাহাদিগকে আমি আমার সমুদয় সম্পত্তি দিয়া যাইব।"

এই কথা শুনিয়া হড়-বংশের মন পুলকিত হইল। বড় হড়, ছোট হড়, হড়নী ও হড়-বৌ সকলে একান্ত মনে রায় মহাশয়ের সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

রায় মহাশয় বলিলেন বটে, কিন্তু বিনয়কে তিনি একেবারে ভুলিয়া যান নাই। পৃথিবীতে যদি কখন কাহাকেও তিনি ভালবাসিয়া থাকেন, তাহা হইলে বিনয়কে তিনি ভাল বাসিতেন। শান্ত সুবোধ বিনয়ও পিতামহকে অন্তরের সহিত ভালবাসিত। হড়গণ যে নিতান্ত স্বার্থপর, রায় মহাশয় তাহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার টাকা পাইবার লোভে তাহারা যে তাঁহার আজ্ঞাকারী হইয়া আছে তাহাদের মনে যে অনুমাত্র স্নেহ-মমতা নাই, তাহাও তিনি জানিতেন। সে জন্য সর্ব্বদাই তাঁহার মন উদাস থাকিত। শিশু বিনয় ভিন্ন পৃথিবীতে আর কোন প্রাণী যে তাঁহাকে ভালবাসে না, এই বৃদ্ধ বয়সে সর্ব্বদাই তাঁহার মনে সেই চিন্তা উদয় হইত। সংসার সর্বদাই তিনি শূন্য দেখিতেন। বৃদ্ধ বয়সে মানুষ যখন পৃথিবীর সমুদয় সুখ হইতে বঞ্চিত হয়, তখন আত্মীয়-স্বজনের স্নেহমমতায় মানুষ অনেক পরিমাণে শান্তি লাভ করে। রায় মহাশয় দোল-দুর্গোৎসব করেন বটে; কিন্তু প্রকৃত ঈশ্বরে ভক্তি তাঁহার ছিল না। ঈশ্বরের একান্ত বিশ্বাসজনিত যে শান্তি, সে শান্তি আস্বাদ তিনি একেবারেই জানেন না। তাহার পর এত টাকা থাকিতেও সাংসারিক সুখ তাঁহার একেবারেই নাই। দ্বিতীয় পত্নী-বিয়োগের পর এক বৎসরকাল তিনি অতি দুঃখে কাটাইলেন। তাহার পর বিনয়কে কাছে আনিতে তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা হইল হড়গণ এ প্রস্তাবে যতদূর সাধ্য আপত্তি করিলেন। কিন্তু পুত্রবধুকে আসিতে মানা করিলেন। তাঁহার পিতা আমাকে কটু কথা বলিয়াছেন, তাহার পিতার দোষে আমার পুত্র গৃহত্যাগী হইয়াছে, সে পুত্রবধুর মুখ আমি দেখিব না।

বিনয়ের মাতা ভাবিলেন যে,—'আমার পিতার অবস্থা ভাল নহে। এ স্থলে বিনয় থাকিলে, তাহার লেখা-পড়া হইবে না। পিতামহের নিকট থাকিলে, বিনয়ের প্রতি তাঁহার স্নেহ হইবে। তাহা হইলে হড়দিগকে তিনি সমুদয় বিষয় দিয়া যাইবেন না, বিনয়কে হয় তো কিছু দিবেন।'

এইরূপ ভাবিয়া পুত্রের হিতার্থে তিনি বিনয়কে পিতামহের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।। বিনয়কে পাইয়া রায় মহাশয়ের মন অনেকটা শান্তিলাভ করিল। বিনয়ের সহিত গল্প করিয়া, বিনয়কে অঙ্ক প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিয়া তিনি যেরূপ আনন্দ পাইলেন,

এরূপ আনন্দ জীবনে তিনি কখন উপভোগ করেন নাই। হড়-বংশের হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

বিনয়কে বাড়ীতে আনিবার অতি অল্প দিন পরে রায় মহাশয় ঘোরতর পীড়িত হইলেন। প্রথম অবস্থায় তাঁহার পীড়া কঠিন হয় নাই। কিন্তু বড় হড় ছোট হড় প্রভৃতির কৃত্রিম আদরে তিনি অতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া হড়গণ সর্বদা, বলিত,—'কোন ভয় নাই। সেবা করিয়া আমরা তোমাকে ভাল করিব।"

রায় মহাশয় এই সকল আশ্বাস বাক্য একবার, দুই বার তিনবার চুপ করিয়া শুনিলেন। তাহার পর তিনি বলিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন,—"ভয় নাই! ভয় কে করিয়াছে? মৃত্যুভয়ে কবে তোমাদিগের নিকট আমি কাঁদিয়াছি?"

হড় মহাশয় উত্তর করিলেন,—"না না, আমরা এমন কোন কথা বলি নাই। তবে কথা এই যে, পীড়া কঠিন নহে, শীঘ্রই তুমি আরোগ্যলাভ করিবে।"

সকলে যাহা বলে, রায় মহাশয় কখন তাহা করেন না। সকলে যেরূপ ইচ্ছা করে, তাহার ঠিক বিপরীত কাজ করা তাঁহার স্বভাব। হড় মহাশয় যখন বলিলেন যে, তুমি শীঘ্র ভাল হইবে, তখন রায় মহাশয় মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, 'তবে আমি শীঘ্র ভাল হইব না। শীঘ্র ভাল হইব! বটে। দেখি কে আমাকে শীঘ্র ভাল করিতে পারে।'

এইরূপ করিয়া তিনি নানারূপ অত্যাচার ও কুপথ্য করিতে লাগিলেন। দুই চারিদিনের মধ্যে তাঁহার পীড়া কঠিন হইয়া উঠিল। সকলে তাঁহার জীবনের আশা ছাড়িয়া দিলেন। অজ্ঞান অভিভূত হইয়া তিনি পড়িয়া রহিলেন। তিন দিন পরে সামান্য ভাবে তাঁহার একটু চৈতন্য হইল। চক্ষু চাহিয়া কিছুক্ষণের নিমিত্ত তিনি এদিক ওদিক ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। তাহারপর মৃদুস্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, —"বিনয়! বিনয় কোথায়?"

হড়নী তখন তাঁহার নিকট বসিয়াছিলেন। তিনি উত্তর করিলেন,—"বিনয় বালক । পাছে গোলমাল করে, সেই জন্য তোমার নিকট তাহাকে আমরা আসিতে দিই না।"

রায় মহাশয় পুনরায় মৃদুস্বরে বলিলেন,—"তুমি এ ঘর হইতে এখন যাও বিনয়কে পাঠাইয়া দাও।" হড়নী বাহিরে গিয়া হড় মহাশয়কে বলিলেন। হড় মহাশয় রোগীর নিকট আসিয়া তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন। "ভগবানের কৃপায় আজ যদি তুমি একটু ভাল আছ, তাহা হইলে আর অত্যাচার করা উচিত নহে; বিনয় আসিলে তাহার সহিত তুমি কথা কহিবে। এই দুর্বল অবস্থায় কথা কহিলে পীড়া পুনরায় বৃদ্ধি হইবে।"

রায় মহাশয় কিছুতেই শুনিলন না। অগত্যা হড় মহাশয় বিনয়কে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। ঘরে প্রবেশ করিয়া বিনয় পিতামহের শয্যার নিকট বসিল। তাহার পর কাঁদ-কাঁদ মুখে সে বলিল,—"ঠাকুরদাদা! তোমার কাছে ইহারা আমাকে আসিতে দেয় না। একবার তোমার সহিত দেখা করিব, তুমি কেমন আছ তাহা দেখিব, সেই জন্য কতবার আমি এই ঘরের নিকট আসিয়াছিলাম। আমাকে গালি দিয়া ইহারা তাড়াইয়া দিয়াছিল! বুড়ো হড় মহাশয়ের ছেলে বৃন্দাবন দাদা বলে, টাকার ভাগ লইবি, তাই ঠাকুরদাদা

ঠাকুরদাদা! কবে আমি তোমার কাছে টাকা চাহিয়াছি ঠাকুরদাদা! তুমি একটি করিয়া পয়সা দিতে, তাহাই আমি লইতাম। টাকা তো তুমি আমাকে দাও নাই।"

তৃতীয় অধ্যায় – বিনয়

রায় মহাশয় বিনয়ের হাতটি ধরিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ইহারা আর কি বলে।"

বালক উত্তর করিল,—"ডাক্তার বলিয়াছে, তুমি বাঁচিবে না; সে জন্য ইহাদের বড় আমোদ হইয়াছে, ঠাকুরদাদা! উইল কাহাকে বলে?"

রায় মহাশয় বলিলেন,—"কেন সে কথায় তোমার কাজ কি?"

বিনয় উত্তর করিল,—"সে দিন হড় মহাশয় ও হুড় ঝিমাতে কথা হইতেছিল। তোমার যত টাকাকড়ি আছে, তুমি নাকি উইল করিয়া সব ইহাদিগকে দিয়াছ? তাই হড় মহাশয় বলিতেছিলেন যে, তুমি মরিয়া গেলে এই টাকা দিয়া তিনি জমি কিনিবেন। হড়-ঝিমা বলিলেন, না, প্রথম তিনি তাবিজ গড়াইবেন। বৃন্দাবন দাদা বলিলেন, তিনি একটা ঘোড়া কিনিবেন।" — ঈষৎ হাসিয়া রায় মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হড়-বৌ কি বলিল?"

বালক উত্তর করিল,—"হড় দিদি কিছুই বলেন নাই। তিনি চুপ করিয়াছিলেন।"

রায় মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ডাক্তারে কি বলিয়াছে?"

বিনয় উত্তর করিল,—"দুই বেলা ডাক্তার যখন তোমাকে দেখিয়া যান, তখন হড় মহাশয় জিজ্ঞাসা করেন, মহাশয়! এ বেলা কেমন দেখিলেন? কি রকম বোধ হয়? ডাক্তার বলেন,—আর বড় জোর দুই দিন। তখন ইঁহারা খুব আহ্লাদিত হন। দুই দিন পরে তোমার কিছু হয় নাই বলিয়া সকলে বড় দুঃখিত হইয়াছিলেন। বৃন্দাবন দাদা বলিলেন, বুড়ো কি কাঠপরাণী! মরিতে চায় না। কিন্তু ঠাকুরদাদা! তোমার যদি কিছু হয়, তাহা হইলে আমি কোথায় যাইব? মা বলিয়াছেন যে, মামার বাড়ীতে থাকিলে আমার লেখাপড়া হইবে না।"

রায় মহাশয় চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—"বটে, ইহারা আমার মৃত্যু কামনা করিতেছে? ভাল। কিন্তু আমিও প্রতিজ্ঞা করিলাম, এ যাত্রা আমি কিছুতেই মরিব না।

এইরূপে চিন্তা করিয়া বিনয়কে তিনি বলিলেন,—"বিনয়! আমি মরিব না। তোমার ভয় নাই। আজ রাত্রিতে তুমি একটি কাজ করিতে পারিবে? যদি তোমার ভয় না করে, তাহা হইলে আমি বলি।" বিনয় জিজ্ঞাসা করিল,—"কি কাজ, ঠাকুরদাদা? তোমাকে সকলে রাগী বলে, ভয়ে তোমার কাছে কেহ আসে না। কিন্তু আমি,—ঠাকুরদাদা, তোমাকে খুব ভালবাসি। তুমি যে কাজ বলিবে, সেই কাজ আমি করিব।"

এই বলিয়া বিনয় স্নেহের সহিত পিতামহের মাথার নিকট আপন মাথাটি রাখিল।

পিতামহ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দালানে ঠাকুর গড়া কতদূর হইয়াছে?"

বিনয় উত্তর করিল,—"কুমার আসিয়া খড়ের দুর্গা, গণেশ, কার্ত্তিক,—এই সব করিয়া গিয়াছে। তাহার পর তোমার ব্যায়রাম হইল, সেই জন্য আর কিছু হয় নাই।"

পিতামহ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ঠাকুর দেওয়ালে বাঁধা আছে?"

বিনয় উত্তর করিল,—"ঠাকুরের পিছনে দালানের দেওয়ালের গায়ে মোটা গজাল

পোঁতা আছে। ঠাকুরের পিছনে বাঁশে মোটা দড়ি বাধা আছে। সেই দড়ি দেওয়ালের গজালের সহিত বাঁধা আছে।"

রায় মহাশয় বলিলেন,—"বেশ! রাত্রিতে চুপি চুপি দালানে গিয়া সেই দড়ি কাটিয়া, ঠাকুর ফেলিয়া দিতে পার?"

বিনয় বলিল,—"দালানে ভূত নাই তো?"

পিতামহ উত্তর করিলেন,—"না দালানে ভূত নাই। যদি তোমার ভয় হয়, তবে কাজ নাই। কিন্তু দড়ি কাটিয়া ঠাকুর যদি ফেলিয়া দিতে পার, তাহা হইলে আমি ভাল হইব। তা না করিলে হয় তো আমি মরিয়া যাইব।"

বিনয় বলিল,—"তবে আমি নিশ্চয় তা করিব, দালানে ভূত থাকুক আর নাই থাকুক, আমি নিশ্চয় তা করিব। আমি ঝিয়ের কাছে শুই! কাজ কর্ম্ম-সারিয়া ঝি অনেক রাত্রিতে ঘরে আসে। কিন্তু যেমন করিয়া পারি, আজ রাত্রিতে আমি জাগিয়া থাকিব। তাহার পর ঝি ঘুমাইলে আমি বাহির-বাটীতে দালানে গিয়া দড়ি কাটিয়া ঠাকুর ফেলিয়া দিব। কিন্তু ঠাকুরদাদা! আমি ছুরি কোথায় পাইব?"

খাটের নিম্নে একটি বাক্স ছিল। পিতামহ,—বিনয়কে সেই বাক্সটি আনিতে বলিলেন। শয়ন করিয়াই অতি কষ্টে তিনি বাক্সটি খুলিলেন। তাহার ভিতরে বৃহৎ একখানি চাকু ছুরি ছিল। বিনয়কে সেই ছুরিখানি দিলেন। বিনয় একবার খুলিয়া তাহার পর মুড়িয়া রাখিল। রায় মহাশয় তাহার পর বাক্স হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া বিনয়ের হাতে দিলেন ও দিয়াসলাই জ্বালাইয়া তাহা পোড়াইয়া ফেলিতে বলিলেন। পিতামহের আদেশে বিনয় তাহার পর সে ছাইগুলি জানালা দিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিল। সে উইলে রায় মহাশয় হড়দ্দিগকে আপনার সম্পত্তি দিয়াছিলেন, সেই উইল এইরূপে তিনি ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। উইল রেজেষ্টারি করা হয় নাই।

তাহার পর রায় মহাশয় বলিলেন,—ছুরি লুকাইয়া রাখ। ঠাকুর ফেলার কথা কাহাকেও বলিও না। আজ তবে যাও, কাল সকাল বেলা পুনরায় আমার সঙ্গে দেখা করিও।"

রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল। ঝি তবুও ঘরে আসিল না। নিদ্রায় চক্ষু বুজিয়া আসিতে লাগিল! অনেক কষ্টে কিছুক্ষণের নিমিত্ত বিনয় জাগরিত রহিল। কিন্তু আর পারিল না, কে যেন তাহার চক্ষু দুইটি বলপূর্ব্বক চাপিয়া দিল। কতক্ষণ বিনয় নিদ্রা গিয়াছিল, তাহা সে ঠিক বলিতে পারে না। কিন্তু সহসা তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া সে ভাবিতে লাগিল। পিতামহের আদেশ ক্রমে ক্রমে তাহার স্মরণ হইল। তখন তাহার ভয় হইল। সে ভাবিল,—"ঐ যা! সকাল বুঝি হইয়া গিয়াছে!"

বিনয় কান পাতিয়া কিছুক্ষণ শুনিল,—"চারিদিক্ নিস্তব্ধ, মানুষের সাড়া-শব্দ নাই। জানালার দিকে চাহিয়া দেখিল,—সব অন্ধকার হাত বাড়াইয়া দেখিল,—ঝি কাছে শুইয়া আছে, অঘোরে নিদ্রা যাইতেছে। তখনও রাত্রি আছে, সকাল হয় নাই।

বিনয় আস্তে আস্তে বিছানা হইতে উঠিল। বালিশের নীচে হইতে ছুরিখানি লইল। ধীরে ধীরে ঘরের দ্বার খুলিল। অন্ধকার রাত্রি। ভয়ে বালকের সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। বাহির-বাটীতে দালানে যাইতে বার বার চমকিত হইল। ঐ বুঝি কে দাঁড়াইয়া আছে! ঐ বুঝি কে হাত বাড়াইতেছে, এ বস্তু দূর হইতে দেখিয়া, বার বার তাহার এইরূপ ভয় মনে উদয় হইল। একবার তাহার মুখ দিয়া চীৎকার বাহির হইবার উপক্রম হইল। পুনরায় ঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিবার নিমিত্ত একবার তাহার ইচ্ছা হইল। কিন্তু সে ভাবিল যে,— ঠাকুরের দড়ি না কাটিলে ঠাকুরদাদা বাঁচিবেন না।—এইরূপ ভাবিয়া সে মনকে স্থির করিল। পাছে মুখ দিয়া চীৎকার বাহির হয়, সে জন্য দন্ত দ্বারা নিম্ন-ওষ্ঠ সে কামড়াইয়া রহিল। ভয়ে তাহার বুক টিপ-টিপ করিতেছিল। বুকের শব্দ সে বুক চাপিয়া রহিল। ঠাকুরদাদাকে আমি বাঁচাইব,—এই কথা বার বার সে মনে মনে বলিয়া ভয় ও ভাবনা ভুলিতে চেষ্টা করিল।

আস্তে আস্তে বিনয় দালানে গিয়া উঠিল অর্দ্ধনির্ম্মিত প্রতিমার পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইল। একদিকে প্রতিমার পশ্চাৎদিগের বাঁশের সহতি ও অপরদিকে দালানের প্রাচীরে গজালের সহিত যে রজ্জু বাঁধা ছিল, চাকু খুলিয়া বিনয় তাহা কাটিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু বিনয় সাত বৎসরের শিশু। রজ্জু উচ্চে বাঁধা ছিল। রজ্জু সে নাগাল পাইল না। এত কষ্ট সব আমার বৃথা হইল। ঠাকুরদাদাকে আমি বাঁচাইতে পারিলাম না! ভয় ভুলিয়া বিনয়ের মন এক্ষণে দুঃখে পরিপূর্ণ হইল। কি করি! সেই অন্ধকারে প্রতিমার পশ্চাতে একাকী দাঁড়াইয়া বিনয় ভাবিতে লাগিল। সহসা তাহার মনে হইল যে, দালানের নিম্নে এক পার্শ্বে একটি পুরাতন কাঠের বাক্স পড়িয়া আছে। বৃন্দাবন তাহার উপর কখন কখন বসিয়া তামাকের ধূম পান করেন। অতি কষ্টে সেই বাক্সটি বিনয় দালানে আনিল। তাহর উপর দাঁড়াইয়া তবুও সে দড়ির নাগাল পাইল না। বিনয় পুনরায় ভাবিতে লাগিল। কিছুক্ষণ ভাবিয়া পুনরায় প্রাঙ্গণে গিয়া দুইখানি ইট লইয়া আসিল। বাক্সের উপর ইট রাখিয়া তাহার পর সেই ইটের উপর দাঁড়াইয়া বিনয় দড়ি কাটিতে সমর্থ হইল। কিন্তু দড়ি অতিশয় স্থূল ছিল। পাছে ইন্দুরে কাটে, সেই জন্য তাহার উপর আলকাতরার লেপ ছিল। সেই আলকাতরা শুষ্ক হইয়া দড়ি অতিশয় কঠিন হইয়াছিল। দড়ির উপর ছুরিটি সবলে রাখিয়া একবার উপরে একবার নীচে তুলিতে লাগিল। তাহার শিশু হাত—দড়ি দুই খণ্ড হইতে কিছু বিলম্ব হইল। কিন্তু যেই রজ্জু ছিন্ন হইল, আর হুড়মুড় করিয়া প্রতিমা উপুড় হইয়া পড়িল। সেই সময় ইট দুইখানিও বিনয়ের পা হইতে সরিয়া গেল। বিনয় মাটীতে চিৎপাত হইয়া পড়িয়া গেল। পড়িয়া সে একেবারে জ্ঞানশূন্য হইল। কতক্ষণ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা সে বলিতে পারে না। কিন্তু যখন তাহার চেতনা হইল, তখনও রাত্রি অবসান হয় নাই। ধড়ফড় করিয়া সে উঠিয়া বসিল। আমি এখানে কি করিয়া আসিলাম, প্রথম তাহার সেই চিন্তা হইল। তাহার পরে যখন তাহার সকল কথা স্মরণ হইল, তখন পাছে কেহ দেখিতে পায়, তাহার সেই ভয় হইল। পিতামহ তাহাকে এ কথা গোপন রাখিতে বলিয়াছিলেন। ছুরিখানি একটু দূরে

পড়িয়া ছিল, মাটীতে হাত বুলাইয়া বিনয় তাহা খুঁজিতে লাগিল। অল্প অনুসন্ধানের পর সে তাহা পাইল। বিনয় তখন উর্দ্ধশ্বাসে আপনার ঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া শয়ন করিল।

চতুর্থ অধ্যায় – রায় মহাশয়ের প্রতিজ্ঞা

পরদিন প্রাতঃকালে বিনয়ের উঠিতে বিলম্ব হইয়াছিল। শয্যা হইতে উঠিয়া মুখ-হাত ধুইয়া সে পিতামহের নিকট যাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইল। তাঁহার মুখ দেখিয়া বিনয় বিস্মিত হইল। আনন্দে তাহার মুখখানি প্রফুল্ল হইয়াছে। তাহার পর, হড় মহাশয়ের মুখে সেইরূপ আহ্লাদের লক্ষণ দেখিতে পাইল। বৃন্দাবনের মুখেও সেইরূপ আনন্দের চিহ্ন। হড়-বৌয়ের মুখে সেইরূপ প্রীতি-প্রফুল্লতার লক্ষণ। তাহার পর, বড় হড় বড় হড়নীর সঙ্গে, ছোট হড় ছোট হড়নীর সঙ্গে ফুসফুস করিয়া কথা হাসি হইতে লাগিল। কিসের এত আনন্দ? বিনয় তাহা স্থির করিতে পারিল না। একবার হড় মহাশয় হড়নীকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন,—"বল হরি! হরিবোল! এবার আর সন্দেহ নাই।" ইহার অর্থ কি? বিনয় কিছু বুঝিতে পারিল না। —অল্পক্ষণ পরে ঝিকে নিভৃতে পাইয়া বিনয় জিজ্ঞাসা করিল,—"হড় মহাশয় এত আমোদ করিতেছেন কেন?" ঝি উত্তর করিল,—"কর্ত্তা আর রক্ষা পাইবেন না, আজ কি কাল! এক ধামা টাকা পাইলে কার না আনন্দ হয়? যার যেমন কপাল! বাপ-মায়ের আমি এক পয়সা পাই নাই, আর ইহারা পরের ধনে রাজা হইল। আহ্লাদে তাই সব ফুটিফাটা হইতেছে।"

কাঁদ-কাঁদ মুখে বিনয় জিজ্ঞাসা করিল,—"ঠাকুরদাদার ব্যায়রাম বাড়িয়াছে?"

ঝি উত্তর করিল,—"তা জানি না। তবে কাল রাত্রিতে ঠাকুর পড়িয়া গিয়াছে।"

আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বিনয় জিজ্ঞাসা করিল,—"ঠাকুর পড়িয়া গিয়াছে।" ঠাকুরদাদার তাহাতে কি হইয়াছে?" ঝি উত্তর করিল,—"তুমি ছেলেমানুষ, তুমি সে সব কথা কিছু বুঝিবে না।"

বিনয় তবু ঝিকে ছাড়িল না। বার বার সে সেই কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

অবশেষে ঝি বিরক্ত হইয়া বলিল,—"জান না, এ বাটীতে আধগড়া ঠাকুর পড়িয়া গেলে মানুষ মরিয়া যায়? প্রথমবার যখন পড়িয়া গিয়াছিল, তখন কর্ত্তার পিসী মরিয়াছিলেন। তাহার পর আর একবার ঠাকুর পড়িয়াছিল, তাহাতে তোমার ঠাকুরমা গিয়াছিলেন। তাহার পর আর একবার পড়িয়াছিল, তাহাতে তোমার বাবা মরিয়াছিলেন। তাহার পর আর একবার পড়িয়াছিলে, তাহাতে কর্ত্তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, হড় মহাশয়ের মেয়ে মরিয়াছিলেন। সেই জন্য খুব মোটা দড়ি দিয়া ঠাকুর বাঁধা থাকে, আর পাছে ইন্দুর কাটে, সেই জন্য দড়ির উপর আলকাতরা মাখানো থাকে। এত সাবধানেও যখন ঠাকুর পড়িয়াছে, তখন আর রক্ষা নাই। মা এবারে কর্ত্তাকে না লইয়া ছাড়িবেন না।"

বিনয় ভাবিতে লাগিল—তবে ঠাকুরদাদা আমাকে দড়ি কাটিতে বলিলেন কেন?

কিছুক্ষণ পরে রায় মহাশয় বিনয়কে ডাকিতে পাঠাইলেন। ঘর হইতে আর সকলকে বাহির করিয়া দিয়া তিনি বিনয়কে ডাকিতে পাঠাইলেন। পিতামহের নিকট গিয়া ছল-ছল

চক্ষে বিনয় বলিল,—"ঠাকুরদাদা! তবে তুমি আমাকে ঠাকুর ফেলিয়া দিতে কেন বলিয়াছিলে? সকলে বলিতেছে যে, ঠাকুর যখন পড়িয়া গিয়াছে, তখন আর কৰ্ত্তা কিছুতেই বাঁচিবেন না।"

রায় মহাশয় বলিলেন,—"সে যাহা হউক, হড়েরা এখন কি করিতেছে, তাহা বল?"

বিনয় উত্তর করিল,—"ঠাকুর পড়িয়া গিয়াছে, তুমি আর নিশ্চয় বাঁচিবে না, সে জন্য তাঁহারা চুপি চুপি কথা কহিতেছেন, আর খুব আমোদ করিতেছেন।"

রায় মহাশয় বলিলেন,—"বটে।" রায় মহাশয় পুনরায় হাসিয়া বলিলেন,—"বিনয়! তোমার কোন ভয় নাই, ঠাকুর যদি আপনি পড়িয়া যাইত, তাহা হইলে হয় তো বাঁচিতাম না। কিন্তু ঠাকুর আপনি পড়ে নাই, তুমি ফেলিয়াছ। আমি খুব ভাল আছি। এবার আমি মরিব না। এই দেখ, আজ আমি উঠিয়া বসিতে পারিয়াছি।"

ঠাকুরদাদার আশ্বাস-বাক্য শ্রবণে পিতামহের সহিত সে গল্প করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে পিতামহ বলিলেন,—"আমি মরিয়া গেলে টাকা পাইবে, সেই জন্য হড়েরা আহ্লাদে আটখানা হইয়াছিল। সৰ্ব্বদাই আমার মৃত্যু কামনা করিতেছিল। আমি এবার মরিব না। তাহারা টাকা পাইবে না। খুব জব্দ হইবে। বিনয়! তুমি খুব সাহসের সহিত কাজ করিয়াছ। এবার পূজার সময় তুমি যাহা চাইবে, তাহা আমি তোমাকে দিব। পূজার সময় তুমি কি লইবে, এখন হইতে তাহা ভাবিয়া রাখ।"

রায় মহাশয়কে দেখিবার নিমিত্ত সে দিন যখন ডাক্তার আসিলেন, তখন তাঁহার প্রতীক্ষায় হড়-বংশ উৎফুল্ল মুখে নীচে দাঁড়াইয়া রহিলেন। রোগীকে দেখিয়া ডাক্তার যখন নীচে আসিলেন, তখন হড় মহশায় ঘোরতর আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেমন মহাশয! আজ কেমন দেখিলেন? আর অধিক বিলম্ব নাই, না? আজ রাত্রি কি কাটিবে বলিয়া বোধ হয়? এত বড় একটা লোকের কাল হইলে, তাহার সব যোগাড় করা আবশ্যক, সেই জন্য জিজ্ঞাসা কবিতেছি।"

ঈষৎ হাসিয়া ডাক্তার উত্তর করিলেন,—"আজ রোগীর অবস্থা দেখিয়া আমি আশ্চৰ্য্য হইয়াছি। তাহার নাড়ী কিছু দুৰ্ব্বল আছে বটে, কিন্তু তাহাতে কোনরূপ আর গোলযোগ নাই। রোগীর কোনরূপ পীড়া আছে বলিয়া বোধ হয় না। এ যাত্রা ইনি রক্ষা পাইলেন।"

হড় মহাশয় একেবারে বসিয়া পড়িলেন। বৃন্দাবনের মুখ শুষ্ক হইয়া গেল।

রায় মহাশয় দুৰ্ব্বল রহিলেন বটে, কিন্তু দুই চারিদিনের মধ্যে তিনি সম্পূর্ণভাবে আরোগ্যলাভ করিলেন। তাঁহার পীড়ার জন্য পূজার আয়োজন সমুদয় বন্ধ হইয়াছিল। এত বড় রোগ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া রায় মহাশয় মনের আনন্দে এবার ধূমধামের সহিত দুর্গোৎসব করিতে মানস করিলেন। চারিদিকে সেইরূপ আয়োজন হইতে লাগিল।

পূজার পঞ্চমীর দিন রায় মহাশয় বিনয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বিনয়, আমি বলিয়াছিলাম যে, পূজার সময় তুমি যাহা চাহিবে, তাহাই আমি তোমাকে দিব। তোমার কি চাই, তাহা এখন বল দেখি?" বিনয় উত্তর করিয়া,—"আগে তুমি বল যে, আমি যাহা চাহিব, তাহাই তুমি দিবে? তবে আমি বলিব!"

পিতামহ বলিলেন,—"হাঁ, তুমি যাহা চাহিবে, তাহাই আমি তোমাকে দিব।"

বিনয় বলিল,—"আমি আমার মাকে চাই। আমার মায়ের উপর আর কখন তুমি রাগ করিবে না। মাকে বকিবে না, আমি তাই চাই। এই পূজার সময় আমার মাকে আনিবে, মায়ের বাবাকে আনিবে, মায়ের মাকে আনিবে, অন্নপূর্ণা মাসীকে আনিবে, আমি এই সব চাই।"

এবার রোগ হইতে উঠিয়া আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে অব্যাহৃতি পাইয়া, রায় মহাশয়ের স্বভাব সম্পূর্ণরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। সংসারে সুখ নাই, জীবন ক্ষণভঙ্গুর, ধন-ঐশ্বর্য্য নিতান্ত তুচ্ছ বস্তু, এইরূপ তাঁহার জ্ঞান হইয়াছিল। ধনের অহঙ্কার তিনি মন হইতে একেবারে দূর করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই উগ্র মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে প্রসন্ন মূর্ত্তি দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইয়াছিলেন। আর কখন কটুবাক্য বলিব না, কাহারও মনে দুঃখ দিব না, মনে মনে তিনি এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। হড়েরা তাঁহার মৃত্যু কামনা করিয়াছিল। সেই জন্য তাহাদের প্রতি তাঁহার মনে ঘৃণা জন্মিয়াছিল; কিন্তু সে বিদ্বেষও মন হইতে দূর করিতে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিলেন। হড়দিগের সহিতও তিনি মিষ্টভাবে কথোপকথন করিতেন।

রায় মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার আন্না মাসীর বিবাহ হইয়াছে?"

বিনয় উত্তর করিল,—"না, এখনও তাঁর বিয়ে হয় নাই। আমার মায়ের বাবার টাকা নাই, তাই এখনও তাঁর বিয়ে হয় নাই।"

রায় মহাশয় নিরুদ্দেশ পুত্রকে স্মরণ করিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। তাহার পর তিনি বলিলেন,—"আচ্ছা, আমি আজই তোমার মা, তোমার সেখানকার ঠাকুরদাদা, দিদিমা ও তোমার আন্নামাসীকে আনিতে পাঠাইব।"

পঞ্চম অধ্যায়– আন্নামাসীর স্বপ্ন

রায় মহাশয় তাঁহার বৈবাহিককে মিনতি করিয়া একখানি পত্র লিখিলেন। তিনি বলিলেন যে, —"আমি মরিয়া বাঁচিয়াছি। আমার অপরাধ সমুদয় ক্ষমা করিবেন,"...ইত্যাদি।

বিনয়ের মাতামহ, মাতামহী, মাতা ও মাসী গাড়ী করিয়া রায় মহাশয়ের বাটীতে আসিতেছিলেন। মাতামহের নাম মৃত্যুঞ্জয় নস্কর। যে জলায় হৃষীকেশ ভূত দেখিয়াছিলেন, সেই জলা পার হইয়া আসিতে হয়। সন্ধ্যার সময় গাড়ী জলার অপর পারে আসিয়া উপস্থিত হইল। জলার মধ্যে কিছু দূর অগ্রসর হইলে ঘোড়া অকস্মাৎ ক্ষেপিয়া উঠিল! গাড়ী সহিত ঘোড়া দুইটি রাস্তার পার্শ্বে এক গর্ত্তে গিয়া পড়িল। আরোহীদিগের শরীরে বিশেষ কোনরূপ আঘাত লাগিল না বটে, কিন্তু গাড়ীর একখানি চাকা ভাঙ্গিয়া গেল। বিনয়ের মাতামহ বলিলেন,—"এ গাড়ী আর চলিবে না। রামদেবপুর আর অধিক দূর নহে। জলাটা পার হইলেই আমরা সেখানে গিয়া পৌছিব। এই রাস্তাটুকু চল আমরা হাঁটিয়া যাই।"

জলার মাঝখানে তাঁহারা গিয়া উপস্থিত হইলেন। পথে জনপ্রাণী ছিল না। এই সময় তাঁহাদের বাম দিকে জলার উপর মেঘ নামিয়া যেন ভূমি স্পর্শ করিল। ভূমি হইতে অল্প উচ্চে মেঘের কোলে বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল। আকাশ হইতে অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। বাম দিকে ঘোর কৃষ্ণবর্ণের মেঘ ঘনীভূত হইয়া মানুষের আকার ধারণ করিল। মেঘনির্ম্মিত সেই মানুষ হাত দুইটি দুই দিকে প্রসারিত করিয়া দিল। উজ্জ্বল শুভ্র বর্ণের শাঁখায় তাহার হাত দুইটি অলঙ্কৃত ছিল। বিদ্যুতের আলোকে এই সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া সকলের প্রাণ উড়িয়া গেল। তাহার পর সেই মেঘের মানুষ দুলিতে দুলিতে সুর করিয়া সেই সমুদয় পূর্ব্বকথা বলিতে লাগিল;—

টিপি টিপি বৃষ্টি পড়ে মেঘে ঝিকি মিকি।
ডুলির ভিতর বসে ক'নে হাসে ফিকি ফিকি।।
বিয়ের সম্বন্ধ মামা করে, খুড়ো নয়কো রাজি।
হিঁদুর ঘরে বিয়ের মামলা বিচার করেন কাজি।।
লাল কাপড়ে ময়ূর আঁকা হাতে রাঙ্গা কড়।
বিয়ের সময় ছান্‌লা তলায় উঠলো বড় ঝড়।।
বিয়ের পরে বাসর-ঘরে ক'নে বেটী যান।
পাড়ার মেয়ে এসে করে শিব ঠাকুরের গান।।
ডাকাত সাজে বুড়ো কাজি দেড়ে থানাদার।
চক্‌চকানি টাকা পেয়ে খুলে দিলাম দ্বার।।
জলার ভিতর আছি ভাই নাইকো আমার গতি।
যত দিন না ব'ধুর সঙ্গে মিলবে পুন সতী।।
যাও ক'নে সেই বঁধুর কাছে গলায় ছবি দিয়ে।
বেলগাছেতে ব'সে আছে পথটি পানে চেয়ে।।

জলার মধ্যে ক্রমে ক্রমে সেই মেঘ-মূর্ত্তি মেঘের সহিত ও সেই সুরটি বাতাসের সহিত মিশাইয়া গেল। সকলের শরীর ভয়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিল,— "বাবা, ও কি? ঐ শব্দ শুনিয়া আমার বুক টিপ টিপ করিতেছে।"

নস্কর মহাশয় বলিলেন, "ও কিছু নহে, চল।"

সকলে দ্রুতবেগে জলা পার হইতে লাগিলেন।

সকলেই বুঝিলেন যে, যাহা তাঁহারা শুনিলেন, তাহা মানুষের স্বর নহে। গ্রামে প্রবেশ করিয়া মুসলমানদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলিল, যে,—"জলার ভিতর একটু উচ্চ ভূমিতে একটা শ্যেওড়াগাছ আছে। সেই গাছে একটা পেত্নিনী বাস করে। কখন সে গীত গায়, কখন সে ক্রন্দন করে। তাহার ভয়ে জলার পথ দিয়া রাত্রিকালে কেউ একেলা যাতায়াত করে না।"

নস্কর মহাশয় সপরিবারে রায় মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। রায় মহাশয় তাঁহার বিশেষরূপ সমাদর করিলেন। হড়গণও তাঁহাদের মৌখিক অভ্যর্থনা করিলেন।

বিনয়ের মাতা পুত্রকে পাইয়া আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন! রায় মহাশয়ের স্বভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া ও তাঁহার সুমিষ্ট কথা শুনিয়া সকলে বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন।

আহারাদির পর বিনয়ের মাতা বিনয় ও অন্নপূর্ণা এক ঘরে শয়ন করিলেন। ঘোর রাত্রিতে বিনয়ের মাতার সহসা নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিকটে কে ফোঁশ ফোঁশ করিয়া কাঁদিতেছে, সেইরূপ একটা শব্দ শুনিতে পাইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আন্না! কাঁদিতেছিস? কেন, কি হইয়াছে?"

অন্নপূর্ণা কোন উত্তর করিল না। বিনয়ের মাতা উঠিয়া প্রদীপ জ্বালিলেন। তিনি দেখিলেন, যে, অন্নপূর্ণা ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া আছে। মেঘের ন্যায় তাহার দীর্ঘ কেশপুঞ্জ মুখে ও পৃষ্ঠে পড়িয়াছে। সেই কেশের ভিতর দিয়া, তাহার রূপরাশি যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। বিনয়ের মাতা একদৃষ্টে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই সুন্দর দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া তিনি বলিলেন,—"আন্না! বিধাতা কি তোর রূপে রতিমাত্রও খুঁত রাখেন নাই? কি হইয়াছে? কাঁদিতেছিস কেন?"

অন্নাপূর্ণা কোন উত্তর করিল না। বার বার তাহার ভগিনী জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অবশেষে সে বলিল,—"আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি।"

"কি স্বপ্ন দেখিয়াছিস?"—ভগিনী জিজ্ঞাসা করিলেন। অন্নপূর্ণা কোন উত্তর করিল না। অবশেষে প্রদীপ নিবাইয়া সকলে শয়ন করিলেন। পুনরায় কিছুক্ষণ পরে বিনয়ের মাতার নিদ্রাভঙ্গ হইল। পুনরায় তিনি দেখিলেন যে, অন্নপূর্ণা বসিয়া কাঁদিতেছে! বার বার জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল যে,—"আমি আবার স্বপ্ন দেখিয়াছি," কিন্তু কি স্বপ্ন দেখিয়াছিল, সে কথা সে বলিল না। পুনরায় সকলে শয়ন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে অন্নাপূর্ণা উঠিয়া কাঁদিতে লাগিল। রাত্রিতে তিনবার ঐরূপে অন্নপূর্ণা স্বপ্ন দেখিল ও উঠিয়া কাঁদিল। কিন্তু কি স্বপ্ন সে দেখিল, ভগিনীকে তাহা বলিল না।

পরদিন প্রাতঃকালে বিনয়ের মাতা রাত্রির বিবরণ সকলকে প্রদান করিলেন। বেলা প্রায় নয়টার সময় হড়-বৌ ও অন্নপূর্ণা এক ঘরে বসিয়া ছিল। অন্নপূর্ণার বয়স প্রায় চৌদ্দ বৎসর। হড়-বৌ অর্থাৎ বৃন্দাবনের স্ত্রী তাহা অপেক্ষা দুই তিন বৎসরের বড়। সমবয়স্কা বলিলেও বলা যাইতে পারে। হড়-বৌ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভাই আহা, কাল রাত্রিতে তুই কি স্বপ্ন দেখিয়াছিলি, তাহা আমাকে বলবিনি ভাই?

অন্নপূর্ণা কিছুতেই প্রথমে সম্মত হইল না। অবশেষে হড়-বৌ যখন বলিলেন,—স্বপ্ন কাহারও সাক্ষাতে না বলিলে কি হয় তা জানিস্? কুস্বপ্ন দেখিয়া লোকের সাক্ষাতে না বলিলে কুস্বপ্ন সত্য হইয়া যায়।"

অন্নাপূর্ণার ভয় হইল। সে বলিল, —"তোমাকে আমি বলিতে পারি। কিন্তু তুমি কাহারও সাক্ষাতে বলিবে না বল!" হড়-বৌ সেইরূপ অঙ্গীকার করিল। তখন অন্নপূর্ণা পূর্ব-রাত্রির স্বপ্নকথা তাহাকে বলিতে লাগিল।

"আমি স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম যে, আমি যেন মামার বাড়ী থাকি। আমার সত্যকার মামার বাড়ী নহে, স্বপ্নের মামার বাড়ী। মামা আমার বিবাহের সম্বন্ধ করিলেন। সত্যকার মামা নহেন, স্বপ্নের মামা। আমার কাকা আসিয়া কিন্তু কোথা হইতে স্বপ্নের মামাকে বলিলেন,—"অন্নপূর্ণার বিবাহ তুমি অমুক স্থানে দিতে পারিবে না। তাহা করিলে আমাদের জাতি-কুল সব নষ্ট হইবে। আমি আর এক স্থানে সম্বন্ধ করিয়াছি। সেই স্থানে আমি তাহার বিবাহ দিব।' এই কথা লইয়া মামা-কাকার ঝগড়া হইল। কাজি কাহাকে বলে, তা জানি না। বোধ হয়, সাহেব। কাকা গিয়া কাজির কাছে নালিশ করিলেন। কাজি বিচার করিয়া বলিলেন যে, এ বরের সহিতও বিবাহ হইবে না, ও বরের সহিতও বিবাহ হইবে না। কন্যাকে আমি নিজে নিকে করিব।—সাহেব আমাকে নিকা করিবে, এই কথা শুনিয়া আমার বড় ভয় হইল; আমার বুক ঢিপ ঢিপ করিতে লাগিল, আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; ঘুম ভাঙ্গিয়াও অনেকক্ষণ সব কথা সত্য বলিয়া বোধ হইল। আমি বসিয়া বসিয়া কাঁদিতে লাগিলাম।"

স্বপ্ন-কথা শুনিয়া হড়-বৌ হাসিয়া বলিলেন,—"বেশ তো! সাহেবের বিবি হইবি, তাহার জন্য আবার কান্না কি? শুনিয়াছি, তুই তিনবার উঠিয়া কাঁদিয়াছিলি। দ্বিতীয় কি স্বপ্ন দেখিয়াছিলি?"

অন্নপূর্ণা বলিল,—"আশ্চর্য্য কথা, ভাই, আমি পুনরায় সেই স্বপ্নের আরও খানিকটা দেখিলাম। কাজি যখন বলিল যে, কন্যাকে আমি নিজে বিবাহ করিব, তখন মামা ও খুড়া দুই জনেরই ভয় হইল। খুড়ো যে স্থানে বিবাহের সম্বন্ধ করিয়াছিলেন, দুই জনে পরামর্শ করিয়া আমাকে সেই ঘরের বাড়ীতে চুপি চুপি পাঠাইয়া দিলেন। আজকার মত রাত্রিতে টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছে, মেঘের কোলে চিক্ চিক্ করিয়া বিদ্যুৎ খেলিতেছে, সেই সময় তাঁহারা আমাকে ডুলি করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। ডুলিতে বসিয়া যখন নির্ভয় হইলাম, তখন মুখ পোড়া কাজির বিচার শুনিয়া আমি অল্প অল্প হাসিতে লাগিলাম। ক্রমে আমি সেই বরের বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিলাম। কে জানে সে যেন এই বাড়ী। কিন্তু সে বাড়ীর ইট সব ছোট ছিল, আর ঘরে জানালা ছিল না বলিলেও হয়। তাহার পর আমার বিবাহ হইল। অতিশয় ঝড় উঠিল। পুনরায় ভয়ে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। আমি বসিয়া কাঁদিতে লাগিলাম।' — হড়-বৌ জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তাহার পর কি হইল?'

'দিদি পুনরায় উঠিলেন। প্রদীপ জ্বালিলেন। কেন আমি কাঁদিতেছি, বার বার জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তাঁহাকে কিছু বলিলাম না। তাহার পর পুনরায় আমরা সকলে শুইলাম। সেই স্বপ্ন পুনরায় আমি দেখিলাম। আমি একখানি লাল চেলী কাপড় পরিয়াছিলাম। তাহার উপর সাদা পাখী ছিল। বাসরঘর হইল। যে ঘরে কাল রাত্রিতে আমরা শুইয়াছিলাম, আমার যেন বোধ হয় যে, সেই ঘরে বাসর হইয়াছিল! কিন্তু এখন সে ঘরে বড় বড় জানালা আছে, তখন দুইটি কেবল ছোট জানালা ছিল। সিঁড়ির দুই ধারে তক্তা ছিল। সেই তক্তা ফেলিয়া দিলেই সিঁড়ি বন্ধ হইয়া যায়। বাসর-ঘরে পাড়ার মেয়েরা আসিয়া গান করিতে লাগিল। শিবের কি করিয়া বিবাহ হইয়াছিল, শিবের শাশুড়ী মেনকা কিরূপে বরণ করিয়াছিল, শিবের পাঁচ মাথায় একেবারে মালা দিবার নিমিত্ত দুর্গা কিরূপে দশ হাত বাহির

করিলেন, এক জন মেয়ে সেই গীত গাহিয়াছিল। তাহার পর বাড়ীতে ডাকাত পড়িল। মশালের আলোতে চারিদিক পূর্ণ হইয়া গেল। ডাকাতদিগের হৈ-হৈ শব্দে কানে তালা লাগিতে লাগিল। ভয়ে আমি কাঁপিতে লাগিলাম। পুনরায় আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।' হড়-বৌ জিজ্ঞাসা করিল,—"তাহার পর কি হইল?"

অন্নাপূর্ণা উত্তর করিল,—"দিদি পুনরায় উঠিলেন। আমাকে অনেক বকিতে লাগিলেন। পুনরায় আমরা সকলে শয়ন করিলাম। তাহার পর সকাল হইয়া গেল। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা ভাই! কাল পথে যখন আমাদের গাড়ী ভাঙ্গিয়া গেল, হাঁটিয়া মাঠ পার হইতেছিলাম, তখন সেই মাঠের মাঝখানে আমরা ভয় পাইয়াছিলাম; কা'ল ভূতে আমার এই স্বপ্নের কথা বলিয়াছিল। তাহার পর শেষ রাত্রিতে স্বপ্নেও যেন আমি সেই ছড়াটি শুনিতেছিলাম। সে ছড়াটি আমার মনে গাঁথিয়া গিয়াছে।" এই কথা বলিয়া অন্নপূর্ণা জলের সেই ছড়া হড়-বৌকে শুনাইল। বলা বাহুল্য যে, হড় বৌ তৎক্ষণাৎ সেই স্বপ্নের কথা সকলকে গিয়া বলিল। স্বপ্নের কথা শুনিয়া সকলে হাসিতে লাগিল। অন্নপূর্ণা লজ্জায় ঘরে লুকাইয়া রহিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়— বেলগাছে পাগল

সন্ধ্যা হইয়াছে। দোতালার একটি ঘরে অন্নপূর্ণা একাকী বসিয়া আছে ঘরে আলো জ্বলিতেছে। বিনয় সেই ঘরে আসিয়া বলিল,—"কাল জলায় তোমরা কি দেখিয়াছিলে? ভূতে না কি গান করিতেছিল? গান হড় দিদিকে তুমি বলিয়াছ। আমাকে একবার বল না মাসী!"

অন্নপূর্ণা প্রথম কিছুতেই সম্মত হইল না। কিন্তু বিনয় তাহাকে কিছুতেই ছাড়িল না। অন্নপূর্ণা বলিতে আরম্ভ করিল;—

"টিপি টিপি বৃষ্টি পড়ে মেঘে ঝিকি মিকি।
ডুলির ভিতর ব'সে ক'নে হাসে ফিকি ফিকি।।"

অন্নপূর্ণা চমকিয়া উঠিল। ভয়ে তাহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল। বিনয় বলিল,—"বাহিরে কে কি বলিতেছে।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দুই জনে কান পাতিয়া রহিল। আর কোন সাড়া-শব্দ পাইল না। তখন অন্নপূর্ণা পুনরায় বলিল,—

"বিয়ের সম্বন্ধ মামা করে খুড়ো নয়কো রাজি।
হিঁদুর ঘরে বিয়ের মামলা বিচার করেন কাজি।।"

পুনরায় বাহির হইতে সেই শব্দ আসিল,—

"কালো মেঘে ঝিকি মিকি। সতী হাসে ফিকি ফিকি।"

নিকটে এক ঘরে রায় মহাশয় ছিলেন। জানালার ধারে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে তিনি বলিলেন,—"কে ও? বেলগাছে কে ও?"

অন্নপূর্ণা ও বিনয় যে ঘরে ছিলেন, সেই ঘরের ঠিক পার্শ্বে অতি নিকটে একটি বেলগাছ ছিল। সেই বেলগাছের উপর হইতে কে বলিল,—

'কালো মেঘে ঝিকি মিকি। সতী হাসে ফিকি ফিকি।।'

রায় মহাশয় বলিল,—'কি?'

বেলগাছ হইতে পুনরায় বলিল,—

'কালো মেঘে ঝিকি মিকি। সতী হাসে ফিকি ফিকি।।'

রায় মহাশয় তাড়াতাড়ি বারেণ্ডায় আসিয়া সকলকে ডাকিতে লাগিলেন,—'বৃন্দাবন! হড় মহাশয়। নস্কর মহাশয়! শীঘ্র আপনারা বাহিরে যান। বেলগাছে কে উঠিয়াছে। উহাকে কিছু বলিবেন না, আস্তে আস্তে আমার কাছে লইয়া আসুন।'

পূজাবাড়ী। চারিদিকে অনেক লোক ছিল। বাটীর বাহিরে বেলগাছের দিকে সকলে দৌড়িল। রায় মহাশয় দোতালার জানালার ধারে দাঁড়াইয়াছিলেন। বৃন্দাবন তাঁহাকে বলিল,—'কে এক জন বেলগাছে উঠিয়াছে; বোধ হয় পাগল! ঝিকি মিকি ফিকি ফিকি কি সব আবল-তাবল বকিতেছে।'

রায় মহাশয় বলিলেন,—"আস্তে আস্তে উহাকে নামাইয়া আমার কাছে লইয়া আইস।'

নীচে মানুষের গোলমাল শুনিয়া অন্নপূর্ণার সাহস হইল। কি হইতেছে, তাহা দেখিবার নিমিত্ত সেও আপনার ঘরের জানালা খুলিয়া জানালার ধারে দাঁড়াইল। ঘরের আলো দ্বারা অন্নপূর্ণার মুখ আলোকিত হইল। বেলগাছে যে মানুষ উঠিয়াছিল, অন্নপূর্ণাকে দেখিয়া সে চীৎকার করিযা বলিল,—'ঐ সে! ঐ সে! ঐ সে! ঐ সে!'

এই কথা বলিয়া বেলগাছ হইতে সে নীচে পড়িয়া গেল। গাছ হইতে পড়িয়া একেবারে সে অজ্ঞান হইয়া গেল। তাহাকে ধরাধরি করিয়া সকলে বাড়ীর ভিতর আনিল। রায় মহাশয় ততক্ষণ নীচে আসিয়া সকলকে বলিলেন,—"তোমরা গোল করিও না; এ আমার কনিষ্ঠ পুত্র হৃষীকেশ। ইহাকে উপরে আমার ঘরে লইয়া চল।"

হৃষীকেশকে সকলে উপরে লইয়া গেল। মুখে হাতে জল দিয়া বাতাস করিয়া সকলে তাঁহার চৈতন্য উৎপাদনের নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিল। পৈতার সহিত সংলগ্ন ক্ষুদ্র একখানি গোল আরসির ন্যায় তাহার বুকে কি ঝুলিতেছিল। পৈতা হইতে সেই বস্তু খুলিয়া বৃন্দাবন রায় মহাশয়ের হাতে দিল। রায় মহাশয় আলোতে তাহা ভালরূপ নিরীক্ষণ করিয়া নস্কর মহাশয়ের হাতে দিলেন। নস্কর মহাশয় একবার তাহা দেখিলেন, দুইবার দেখিলেন, চক্ষু মুছিয়া পুনরায় তাহা দেখিলেন। অবশেষে তিনি বলিলেন,—'আশ্চর্য্য কথা! এ যে আমার অন্নপূর্ণার ছবি।'

সকলে একে একে সেই ছবি দেখিলেন। সকলেই ঘোরতর বিস্ময়াপন্ন হইলেন। হৃষীকেশ অন্নপূর্ণাকে কখন দেখে নাই; অন্নপূর্ণার ছবি কেহ কখন তুলে নাই; তবে এ ছবি কোথা হইতে আসিল। ক্রমে হৃষীকেশের জ্ঞান হইল। চক্ষু চাহিয়া তিনি বলিলেন,—"কৈ, সে কৈ? আজি এক বৎসর দেশে দেশে যাহার আমি অন্বেষণ করিতেছি, সে কৈ?'

কিছুক্ষণের জন্য রায় মহাশয় ও নস্কর মহশয় দুই জনে চুপি চুপি কি কথা হইল। নস্কর মহাশয় ঘর হইতে চলিয়া গেলেন। অল্পক্ষণ পরে তিনি অন্নপূর্ণাকে লইয়া আসিলেন। লজ্জায় অধোবদন হইয়া অন্নপূর্ণা হৃষীকেশের সম্মুখে দাঁড়াইল। হৃষীকেশ বলিলেন,—

'সেই মুখ, সেই ফুল, সেই রূপ, ময়ূর আঁকা সেই লাল কাপড়, হাতে সেই রাঙ্গা কড়!'

কাপড়খানি সেকেলে ধরণের চেলি। রায় মহাশয় সেই দিন অন্নপূর্ণাকে দিয়াছিলেন।

হৃষীকেশ ক্রমে সুস্থ হইলেন। পুরুষগণ ঘর হইতে চলিয়া গেলে, বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা আসিয়া তাঁহার কাছে বসিলেন। ছবি তুলিতে গিয়া কিরূপে অন্নপূর্ণার ছবি উঠিয়াছিল, পথের চাকার উপর কিরূপে পেতনী উঠিয়াছিল, কিরূপে বাটী হইতে পলায়ন করিয়া দেশে তিনি অন্নপূর্ণাকে অন্বেষণ করিয়াছিলেন, কিরূপে তাঁহার মুখে—'কালো মেঘে ঝিমি মিকি,—সতী হাসে ফিকি ফিকি,' এই কথা ভিন্ন অন্য কথা ছিল না, সেই সমুদয় পরিচয় তিনি বিনয়ের মাতা ও আর সকলকে দিলেন। অবশেষে তিনি বলিলেন,—'আমি ঠিক পাগল হই নাই, আমার জ্ঞান সম্পূর্ণ ছিল। কিন্তু অন্য কথা আমি বলিতে পারিতাম না; অন্য কথা বলিতে গেলেই ঐ কথাটি আপনা আপনি আমার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িত। কিছুতেই আমি তাহা নিবারণ করিতে পারিতাম না। অন্নপূর্ণার ছবি সর্ব্বদাই আমার বুকের উপর রাখিতাম। পাছে সেই ছবিটি আমি হারাই বা কেহ কাড়িয়া লয়, সেই ভয়ে আমি সর্ব্বাদই শঙ্কিত থাকিতাম। বৌ-দিদি! আমি যদি জানিতাম যে, অন্নপূর্ণা তোমার ভগিনী, তাহা হইলে আমাকে দেশে দেশে বেড়াইতে হইত না। তাহার জন্য কত যে আমি কষ্ট পাইয়াছি, সে কথা তোমাদিগকে আর কি বলিব?"

সপ্তম অধ্যায় – পূর্ব্বকথা

রায় মহাশয়, হড় মহাশয় ও নস্কর মহাশয়, অন্য ঘরে গিয়া বসিলেন। রায় মহাশয় বলিলেন,—'বড়ই আশ্চর্য্য ঘটনা। বাবার মুখে আমি আমার এক পূর্ব্ব.পুরুষের বিবরণ শুনিয়াছিলাম। সেই সমুদায় কথা আজ আমার মনে পড়িয়া গেল। এইরূপ অদ্ভুত ঘটনা কখন কখন দেখি নাই—শুনি নাই, গল্পের পুস্তকেও পাঠ করি নাই! আমার প্রপিতামহেব এক ভ্রাতার নাম হৃষীকেশ ছিল। যখন আমি পুত্রের সেই নাম রাখি, তখন সে কথা আমি একেবারেই বিস্মিত হইয়াছিলাম। কেন যে পুত্রের নাম আমি হৃষীকেশ রাখিয়াছিলাম, সে কথা আমি বলিতে পারি না। আর তুমি নস্কর, কন্যার নাম কেন অন্নপূর্ণা রাখিয়াছিলে, তাহাও বোধ হয় বলিতে পার না।'

নস্কর মহাশয় স্বীকার করিলেন যে, তিনি তাহার কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। রায় মহাশয় পুনরায় বলিলেন,—"আমার প্রপিতামহের ভ্রাতা যে হৃষীকেশ ছিলেন, তাঁহার সহিত অন্নপূর্ণা নামে এক কন্যার বিবাহ হইয়াছিল বিবাহ অদ্ভুতভাবে হইয়াছিল; তাহার পর সেই বিবাহের রাত্রিতে বিষম বিভ্রাট ঘটিয়াছিল। সে ঘটনার কথা বাবার মুখে আমি এইরূপ শুনিয়াছিলাম। হুগলীতে এক ব্রাহ্মণের বাস ছিল। তাহার ঘরে পিতামাতাহীন অবিবাহিতা অন্নপূর্ণা-নামী এক ভাগীনেয়ী থাকিত। কন্যা উচ্চকুলোদ্ভবা। মাতুল কন্যাকে বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন। কন্যার খুড়া সেই সমাচার পাইয়া মাতুলের নিকট আসিয়া আপত্তি করেন। আমার প্রপিতামহের ভ্রাতা, হৃষীকেশের সহিত তিনি সেই কন্যার সম্বন্ধ করিয়াছিলেন। খুড়া ও মাতুল দুই জনের এই কন্যা লইয়া ঘোরতর বিবাদ হয়। হুগলী তখন

মুসলমানদিগের একটি প্রধান আড্ডা ছিল। খুড়া গিয়া কাজির নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। কন্যা অতি রূপবতী ছিল। কাজি কন্যাকে দেখিলেন, উভয় পক্ষের বাদানুবাদও শুনিলেন। অবশেষে তিনি এই মীমাংসা করিলেন,—"খুড়ার বরের সহিত এ কন্যার বিবাহ হইবে না, মাতুলের বরের সহিতও হইবে না। এ কন্যাকে আমি নিজে বিবাহ করিব।' মাতুল খুড়া দুই জনেই বিপদে পড়িলেন; দুই জনেরই জাতি যাইতে বসিল। তখন পরস্পরে বিবাদ ভুলিয়া কিসে এ দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন, সেই চিন্তা করিতে লাগিলেন। আমার প্রপিতামহ ক্ষমতাবান লোক ছিলেন। অবশেষে কন্যা তাঁহার নিকট পাঠাইবার নিমিত্ত দুই জনে স্থির করিলেন, অন্ধকার রাত্রি, যখন ঘন-ঘটায় আকাশ আচ্ছাদিত হইয়াছিল, যখন সেই কাল মেঘের কোলে বিজলী চিক্ চিক্ করিতেছিল, যখন টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছিল, সেই সময় বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সন্ধান করিয়া কাজি তাহা জানিতে পারিল; প্রকাশ্যভাবে বলপূর্ব্বক আমাদের বাটী হইতে কন্যা লইয়া যাইতে কিন্তু সে সাহস করিল না। হুগলীতে সেই সময় হাঁসাই নামে এক জন থানাদার ছিল। আমাদের বাড়ী লুণ্ঠন ও কন্যাহরণ করিবার নিমিত্ত কাজি থানাদারের সহিত পরামর্শ করিল। কিছু দিন পরে কন্যার সহিত হৃষীকেশের বিবাহ হইল। কন্যার কপাল বড় মন্দ। শুনিয়াছিল যে, ছাদনাতলায় যখন স্ত্রী-আচার হইতেছিল, সেই সময় ভয়ানক ঝড় হইয়াছিল। তাহার পর যখন বাসর-ঘরে মেয়েরা বর-কন্যা লইয়া আমোদ-প্রমোদ করিতেছিলেন, সেই সময় আমাদের বাড়ীতে ডাকাত পড়িল। যশোদা নামে এক গোয়ালিনী এই পাড়ায় থাকিত। ডাকাতদিগকে সে দ্বার খুলিয়া দিয়াছিল। আমাদের দোতালা কোটা-বাড়ী ছিল। সে কালের সেই ছোট ছোট ইটের গাঁথুনি ছিল। উপরে উঠিবার জন্য চাপা সিঁড়ি ছিল। আমার বৃদ্ধপ্রপিতামহ সেই চাপা সিঁড়ি বন্ধ করিয়া মেয়েদের ছাদের উপর ইট ছুড়িতে বলিলেন। তাহার পর আমার বৃদ্ধপ্রপিতামহ, আমার প্রপিতামহ ও তাঁহার ভ্রাতা হৃষীকেশ ও বিবাহ নিমন্ত্রিত কয়েক ব্যক্তি ডাকাতদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রথম অবস্থায় তাঁহারা দস্যুদিগকে নিবারণ করিতে পারিলেন না। দস্যুগণ কোনরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া উপরে উঠিয়া পড়িল ও বাড়ীর লোকদিগকে নিদারুণ প্রহার করিতে লাগিল। বলা বাহুল্য যে, ডাকাতের দল কাজি ও থানাদার কর্ত্তৃক আনীত হইয়াছিল। বর হৃষীকেশের উপর কাজির রাগ ছিল। ডাকাতগণ হৃষীকেশকে একেবারে মারিয়া ফেলিল; ইতিমধ্যে গ্রামের লোক আসিয়া বাহিরে ডাকাতদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। বহুসংখ্যক গ্রামবাসী একত্র হইয়াছে দেখিয়া, ডাকাতগণ ভয়ে পলায়ন করিল। কাজির মনস্কামনা পূর্ণ হইল না। কন্যা অন্নপূর্ণাকে হরণ করিবার অবসর তাহারা পাইল না। কিন্তু বিবাহের রাত্রেই অন্নপূর্ণা বিধবা হইলেন। তাঁহার তখন বয়স কেবল চতুর্দ্দশ বৎসর। সেই বালিকা কন্যা পরদিন সহমৃতা হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, আমার বৃদ্ধপ্রপিতামহ তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই শুনিলেন না। ময়ূর-অঙ্কিত লালচেলী,—যেরূপ চেলী কাল আমি তোমার কন্যাকে দিয়াছি,—সেইরূপ চেলী পরিধান করিয়া, স্বামীর মস্তক আপনার কোলে লইয়া

সতী চিতার উপর বসিলেন। চিতায় বসিয়া আমার বৃদ্ধপ্রপিতামহকে তিনি বলিলেন,—'বাবা ! কাঁদিও না। যিনি আমার স্বামী হইয়াছেন, ইনি পুনরায় তোমার ঘরে জন্মগ্রহণ করিবেন, আর আমি পুনরায় তাঁহার পত্নী হইব। সেবার এরূপ বিড়ম্বনা ঘটিবে না। সেবার সুখস্বচ্ছন্দে আমরা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিব।' এই বলিয়া সতী স্বর্গে গমন করিলেন। যশোদা গোয়ালিনী মনের খেদে কিছু দিন পরে জলার মাঝখানে এক গাছে গিয়া গলায় দড়ি দিয়া মরিল। প্রবাদ আছে যে, সে সেই অবধি ভূত হইয়া আছে; হৃষীকেশ তাহাকে দেখিয়া ভয় পাইয়াছিল। আড়াই বৎসর পূর্ব্বে মুসলমানেরা যখন তাহাকে বাটী লইয়া আসিল, তখন সে বীজ বীজ করিয়া কেবল বলিতেছিল,—'কালো মেঘে ঝিকিমিকি, সতী হাসে ফিকি ফিকি।' আজ সন্ধ্যেবেলা বেলগাছে উঠিয়া সে সেই কথা বলিতেছিল। তাহাতেই আমি তাহাকে চিনিতে পারিলাম। ফল কথা, আমার প্রপিতামহের ভ্রাতা এই সেই হৃষীকেশ, আর নস্কর! —তোমার কন্যাও সেই অন্নপূর্ণা!"

রায় মহাশয়ের কথা শুনিয়া হড় ও নস্কর মহাশয় ঘোরতর বিস্মিত হইলেন। বলা বাহুল্য যে, কিছুক্ষণ পূর্ব্বে অন্নপূর্ণার সহিত হৃষীকেশের বিবাহ দিতে নস্কর মহাশয় অমত হইয়াছিলেন। এক্ষণে পূর্ব্ব-ইতিহাস শ্রবণ করিয়া তাঁহার মন আনন্দে পূর্ণ হইল। বহুকাল হইতে অন্নপূর্ণাকে সে হৃষীকেশের পত্নীরূপে বিধাতা নিয়োজিত করিয়াছেন, নস্কর মহাশয় এক্ষণে তাহা বুঝিতে পারিলেন।

তাহার পর রায় মহাশয় পুনরায় বলিলেন,—"বিনয়কে আমি ঘরে আনিয়াছি। বিনয়ের মাতাকেও আনিয়াছি। হৃষীকেশকে পুনরায় আমি পাইলাম। অন্নপূর্ণার সহিত তাহার বিবাহ হইবে। এই সমুদয় কারণে হড় মহাশয় আপনি দুঃখ করিবেন না। আপনার জন্য আমি স্বতন্ত্র একখানি বাড়ি করিয়া দিব। যত বিঘা নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর ভূমি দিলে আপনার সুখে স্বচ্ছন্দে দিনপাত হয়, তত বিঘা ভূমি আমি কিনিয়া দিব। আপনার গৃহিণী ও পুত্রবধূর সাধ মিটাইয়া আমি অলঙ্কার দিব। আর কৃষিকার্য্যের তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত বৃন্দাবনকে আমি একটি সুন্দর ঘোড়া কিনিয়া দিব। কেমন ইহাতে সন্তুষ্ট হইবেন ত?"

রায় মহাশয় তাঁহার জামাতা ছিলেন। সে নিমিত্ত হড় মহাশয় তাঁহাকে দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। রায় মহাশয় পুনরায় বলিলেন,—"নস্কর! তোমার পুত্র নাই, কেবল এ দুইটি কন্যা। দুইটি কন্যাকে আমি লইলাম। তুমি ও তোমার গৃহিণী চিরকাল আমার ঘরে থাকিবে। আর কোন ভয় নাই। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, জিব কাটিয়া ফেলিব, সেও স্বীকার, তথাপি আর কাহারও মনে লেশমাত্র দুঃখ দিব না।"

নস্কর মহাশয় বৈবাহিকের সহিত আনন্দে "সেকহ্যাণ্ড" করিলেন।

সেবার রায় মহাশয়ের বাড়ীতে অতি ধূমধামের সহিত দুর্গোৎসব হইল। অনেক লোককে তিনি কাপড় দিলেন ও অনেক ব্রাহ্মণ ও দীন-দুঃখীকে তিনি ভোজন করাইলেন। নানারূপ নৃত-গীত দর্শন ও শ্রবণে সহস্র সহস্র লোক আনন্দ লাভ করিল।

পূজার পর যখন বিবাহের কাল পুনরায় উপস্থিত হইল, তখন শুভদিনে ও শুভক্ষণে ও শুভলগ্নে অতি সমারোহে অন্নপূর্ণার সহিত হৃষীকেশের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল। নস্কর

মহাশয় ও তাঁহার পরিবারবর্গ আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইলেন।

বিবাহের কিছু দিন পরে এক দিন হৃষীকেশ বলিলেন,—"অন্নপূর্ণা! আজ সন্ধ্যাবেলা চল, সেই জলাতে যাই। যশোদা গোয়ালিনী এখনও ভূত হইয়া আছে কি না, চল গিয়া দেখি। তোমার ভয় করিবে না তো?"

অন্নপূর্ণা উত্তর করিলেন,—তোমার সহিত যাইব, তাহাতে আর ভয় কি? দেখ, যে দিন তোমাদের বাড়ীতে আসিয়া বিবাহের স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, সে দিন স্বপ্নে তোমাকে দেখিয়াছিলাম। তাহার পূর্ব্বে বাপের বাড়ী থাকিতে তোমাকে আমি অনেকবার স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম। বেলগাছে তুমি পাতার ভিতর ছিলে, আর তখন অন্ধকার হইয়াছিল, তা না হইলে তোমাকেও আমি চিনিতে পারতাম। তোমার সঙ্গে বাঘের মুখে যাইতেও আমার ভয় হয় না।'

সন্ধ্যার পর দুই জনে চুপি চুপি জলায় গমন করিলেন; জলার মাঝখানে গিয়া পথের উপর দাঁড়াইলেন। জ্যোৎস্না রাত্রি ছিল; দুই দিকেই অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলেন। সহসা আকাশ কালো মেঘে আচ্ছাদিত হইল। মেঘের কোলে চিকিমিকি বিদ্যুৎ খেলিতে লগিল। আকাশ হইতে টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতে লাগিল! সেই সময় অল্পদূরে তাঁহাদের সম্মুখে জলার ভিতর হইতে অগ্নিশিখা সদৃশ উজ্জ্বল বাষ্প উত্থিত হইতে লাগিল। সেই বাষ্প ক্রমে ঘনীভূত হইয়া সদৃশ উজ্জ্বল স্ত্রী আকারে পরিণত হইল। সেই স্ত্রীমূর্ত্তি একবার দক্ষিণদিকে একবার বামদিকে দুলিতে লাগিল। দুলিতে দুলিতে সুর করিয়া সে বলিতে লাগিল,—

'পতি সঙ্গে আকাশেতে সতী থাকে সুখে।
যশোদা পেতিনী হেথা থাকে মনোদুখে।।
যশোদার দুঃখ দেখি সতী দুঃখ পায়।
পতি সঙ্গে সতী পুন আইল ধরায়।।
যশোদা আঁকিল ছবি কলের ভিতর।
কন্যা অন্বেষিতে বর গেল দেশান্তর।।
গাছে বর ঘরে কন্যা করে শুভদৃষ্টি।
কালো মেঘ থেকে পড়ে টিপি টিপি বৃষ্টি।।
মেঘের কোলে চক্‌চকাতি করে ঝিকিমিকি।
বরের হাত ধ'রে ক'নে হাসে ফিকিফিকি।।
যশোদার পাপমুখে সতীর কৃপায়।
ড্যাং-ড্যাঙাতে ড্যাং ড্যাঙাতে স্বর্গে চলে যায়।।

এই কথা বলিতে বলিতে সেই উজ্জ্বল স্ত্রীমূর্ত্তি ক্রমে আকাশে উঠিতে লাগিল। এ দিকে যেমন তাহার কথাও শেষ হইল, আর ও দিকে সেই উজ্জ্বল মূর্ত্তি মেঘের সহিত মিলিয়া গেল। আশ্চর্য্য হইয়া হৃষীকেশ ও আন্না আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহারা কিছু দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে হৃষীকেশ বলিলেন,—"কি অদ্ভুত ব্যাপার!"

অন্নাপূর্ণা বলিলেন,—"বড়ই অদ্ভুদ! কি অন্ধকার! চল আমরা বাড়ী যাই, এখানে দাঁড়াইয়া আর ভিজিবার আবশ্যক নাই।"

পথে যাইতে যাইতে হৃষীকেশ বলিলেন,—"তোমার ছবি লইয়া তোমার অন্বেষণে যখন আমি দেশে দেশে ভ্রমণ করি, তখন কোন স্থানে এক মহাত্মার সহতি আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। নানা বিষয়ে তিনি আমাকে উপদেশ প্রদান করেন। ভগবান্ অতি নির্দ্দয়; মায়াতে ভুলাইয়া অগণিত নানারূপ ক্লেশ প্রদান করিতেছেন;—এই বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমার তর্কবিতর্ক উপস্থিত হয়। আমার সন্দেহ-ভঞ্জনের নিমিত্ত কিছুক্ষণের জন্য তিনি আমাকে দিব্যচক্ষু প্রদান করিয়াছিলেন। আমি দেখিলাম যে, ভগবান্ প্রকৃতই কৃপাসিন্ধু। তাঁহার সেই দয়ার অণুমাত্র লাভ করিয়া দাতা দীনের দুঃখ দূর করেন। পিতা-মাতা পুত্র-কন্যাকে স্নেহ-মমতা করেন, পতি-পত্নীকে ও পত্নী পতিকে ভালবাসেন। আমাদিগের বঞ্চনা করিবার নিমিত্ত তিনি আমাদের মনে ভালবাসা প্রদান করেন নাই। এই জগৎ অনন্ত সমুদ্রকূলে বালুকারাশির তুলনায় সামান্য একটি বালুকা-কণা যেরূপ, সমগ্র জগতের তুলনায় আমাদের এই পৃথিবী সেইরূপ। আমি দেখিলাম যে, আমাদের প্রকৃত বাসস্থান এখানে নহে।

'আমাদের প্রকৃত বাসভূমি অন্যস্থানে। সে স্থানে শোক নাই, তাপ নাই। যাহাদিগকে আমরা এখানে ভালবাসি, সে স্থানে পুনরায় তাহাদের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইবে। শিক্ষার নিমিত্ত জীব মাঝে মাঝে জড় শরীর ধারণ করিয়া, পৃথিবীর নানা স্থানে জন্মগ্রহণ করে। আত্মীয় স্বজনের মঙ্গলের নিমিত্ত, পরের উপকারের নিমিত্ত, অথবা জগতের হিতের নিমিত্তও মাঝে মাঝে লোক জড় জগতে পুনরাগমন করে। যশোদা গোয়ালিনী পেতনী হইয়াছিল। এইমাত্র সে নিজে বলিল, যে, আমাদের পুনরাগমনে সে নরক-যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইল। অন্নপূর্ণা! সত্য এবং পরোপকার—ইহা অপেক্ষা ধর্ম্ম নাই।'

এক ঠেঙো ছকু

প্রথম অধ্যায়

ধন ফেলে ব্যাঙ পালালো ।
ছকু ভায়ার ঠ্যাঙটি গেল।।

কিনু বাবু ছোট একটি চালা-ঘর করিয়াছেন। তাহার নাম যোগ-মন্দির। বন্ধু-বান্ধব লইয়া সেই ঘরে তিনি গাঁজার ধুম পান করেন। পাল পার্ব্বণে আমোদটা কিছু অধিক মাত্রায় হয়। আজ মহাষ্টমী, দুই বোতল মদ আসিয়াছে। আমোদ করিবার নিমিত্ত বদন ও নবদ্বীপ কিনুর বাড়ীতে গিয়াছেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে ঠক্ ঠক্ করিয়া ছকুও সেই স্থানে চলিয়াছেন।

ছকুকে দেখিয়া পাড়ার ছেলেদের আনন্দ হইল। হাততালি দিয়া দূর হইতে তাহারা বলিতে লাগিল;—

ধন ফেলে ব্যাঙ পালালো।
ছকু ভায়ার ঠ্যাঙটি গেল।।

রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে ছকু যোগ-মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। "শালারা—গু-খেকোর বেটারা!' এইরূপ গালি দিয়া মনের আগুন তিনি নিবাইতে লাগিলেন।

কিনু জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কি হইয়াছে ভাই?'

ছকু উত্তর করিলেন,—'ঐ ছোঁড়ারা! শালারা।'

বদন বলিলেন,—'এক গেলাস মাল টানিলে এখনি রাগ ভাল হইয়া যাইবে।'

সন্ধ্যা হইল। তিনি ছিলিম গাঁজায় ভিত্তি স্বাপন কবিয়া তাহাব পর আসল জিনিসটি আরম্ভ হইল। মন একটু সুস্থ হইলে, ছকু বলিলেন,—'এই মহাষ্টমীর দিন একটু মদ না খাইলে হিঁদুয়ানী বজায় থাকে না।'

কিনু বলিলেন,—'সুরা অতি পবিত্র সামগ্রী, দ্রবীভূত তারা।'

নবদ্বীপ বলিলেন,—'মা এই তিন দিন মর্ত্তে আসিয়াছেন। বাড়ী বাড়ী ফিরিয়া লোকের পূজা গ্রহণ করিতেছেন। আমাদের আরাধনাই ঠিক। গাঁজা উৎসর্গ করিয়া শিবকে ও সুরা দিয়া মাকে সন্তুষ্ট করিলাম! আমরা প্রসাদ পাইলাম।'

বদন বলিলেন,—"ভালরূপে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে সাক্ষাৎ হইয়া মা পূজা গ্রহণ করেন। মন্ত্রের এমনি গুণ।"

ছকু বলিলেন,—"মন্ত্রের গুণ! ও কথা আব বলিও না ভাই! কেবল দেবীর প্রতিমা নহে, মন্ত্রবলে দেবীর বাহন সিংহ ও মাহষাসুর পর্য্যন্ত সজীব হইয়াছিল। কলিকাতায় আমার শ্বশুর চক্রধর রায়ের বাটীতে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। সেই হিঁড়কেই আমার পা কাটা গিয়াছে।"

বদন বলিলেন,—"তুমি না যকের টাকা পাইয়াছিলে? সেই জন্য তোমার না পা কাটা গিয়াছে? মহিষাসুর কি করিয়াছিল?"

ছকু উত্তর করিলেন,—"সে ভাই অনেক কথা। বলিলে বিশ্বাস করিবে না।"

নবদ্বীপ বলিলেন,—"মহাষ্টমীর রাত্রি। মা পৃথিবীতে আগমন করিয়াছেন। অগণিত ভূত, প্রেত, দানা, দৈত্য তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছে। অদ্ভুত গল্প শুনিবার সময় এই।"

দ্বিতীয় অধ্যায়— মাধবের অপমান

গল্পটি বলিতে কিনুও অনুরোধ করিলেন। কিছুক্ষণ সাধ-সাধনার পর ছকু বলিতে আরম্ভ করিলেন। ছকু বলিলেন,—"চক্রধর রায় মহাশয়ের কন্যাকে আমি বিবাহ করিয়াছিলাম। রায় মহাশয় টাকা ধার দিয়া কখনও এক পসয়া সুদ না ছাড়িয়া, লোকের বাড়ী বাঁধা রাখিয়া, তাহার পর তাহাদের ভদ্রাসন বেচিয়া ধনবান্ হইয়াছিলেন। রাঘব হালদার নামে এক জন বড় মানুষের ছেলে বদ-খেয়ালীতে সমুদয় বিষয় নষ্ট করিয়া রায়

মহাশয়ের নিকট আপনার বাড়ী বাঁধা রাখিয়াছিল। তাহার পর সে জাল জুয়াচুরী আরম্ভ করিল। কাবুলী চাকর রাখিয়া তাহাদের দ্বারা সে ডাকাইতি করাইত। অবশেষে জাল করার অপরাধে তাহার দীপান্তর হইল। আমার শ্বশুর মহাশয় তাহার বাড়ী অতি অল্প মূল্যে কিনিয়া লইলেন। কলিকাতা সহরের উত্তর ধারে বৃহৎ বাড়ী, অনেক জমী, চারি দিকে বাগান, প্রাচীর দিয়া ঘেরা। আমি সেই শ্বশুর-বাড়ীতে থাকিতাম।

কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার পত্নীবিয়োগ হইলেও?"

ছকু উত্তর করিলেন,—"হাঁ ভাই, পত্নী-বিয়োগ হইলেও কিছু দিন আমি সে স্থানে ছিলাম। কিন্তু আমার পক্ষে সে এক প্রকার নরক ভোগ হইয়াছিল। শ্বশুরের রাগ আর শাশুড়ী ঠাকুরাণীর গঞ্জনায় প্রাণ আমার অস্থির হইয়াছিল। শাশুড়ী ঠাকুরাণী পরম রূপবতী ছিলেন।" -- নবদ্বীপ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার স্ত্রী, তাঁর কি প্রকার রূপ ছিল?"

ছকু উত্তর করিলেন,—সে কথা কি আর জিজ্ঞাসা করিতে হয়? কেমন গর্ভে জন্ম। রং কিন্তু একটু কাল ছিল। চকচকে্ কাল, বার্ণিস জুতার মত, সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেলে মনে হইত যেন কাল বিজলী খেলিয়া গেল।"

বদন জিজ্ঞাসা করিলেন।—তহার পর?"

ছকু বলিলেন,—"আমার শ্বশুরদের পাড়ার মাধব নামে এক জন ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি নানা দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। নানা বিদ্যা শিখিযাছিলেন। বিলাতী ধরণে তিনি ভূত নামাইতে পারিতেন, গায়ে হাত বুলাইয়া রোগ ভাল করিতেন। আর সেই বিলাতী ভেলকী—যাহাকে হিপনটিশ্যাম বলে, তাহাও তিনি জানিতেন!"

নবদ্বীপ একটু ইংরাজী জানিতেন। তিনি বলিলেন, হিপনটিসম্ (Hypnotism) বলে। তাহার পর?'

ছকু বলিলেন,—"আমার শ্বশুর মহাশয় তাঁহাকে এক-ঘরে করিলেন। কিন্তু কলিকাতায় কে কাহাকে এক-ঘরে করিতে পারে? অনেকে তাঁহার পক্ষ হইল। আমার শ্বশুরের আরও রাগ হইল। কিসে তাঁহাকে জব্দ করিবেন, সর্ব্বদা সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শ্বশুরের প্রিয় পাত্র হইবার নিমিত্ত আমি এক উপায় স্থির করিলাম। শ্বশুর প্রতি বৎসর দুর্গোৎসব করেন। অনেককে নিমন্ত্রণ করেন। সকলের কান মলিয়া প্রণামী আদায় করেন। পূজা করিয়া বিলক্ষণ দুপয়সা তিনি উপার্জ্জন করিতেন। যে যেমন প্রণামী দিত, তাহার সেইরূপ আদর হইত। এক টাকার কম প্রণামী দিলে, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে তিনি একটি নারিকেল-নাড়ুও দিতেন না।

শ্বশুরের সহিত পরামর্শ করিয়া পূজার সময় মাধবকে আমি নিমন্ত্রণ করিলাম। মাধব দুই টাকা প্রণামী দিলেন। পাড়ার অন্যান্য ব্রাহ্মণদের সহিত তাঁহাকে ভোজনে বসাইলাম। এমন সময় সেই স্থানে শ্বশুর মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণের সম্মুখে একটু দূরে খপ করিয়া তিনি বসিয়া পড়িলেন। তাহার পর মাধবের দিকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন,—"ও কে? ও যে বড় ব্রাহ্মণের সহিত বসিয়াছে! ওর জাত গিয়াছে! তুমি এখনি উঠিয়া যাও।"

মাধব বলিলেন,—"তবে আমায় নিমন্ত্রণ করিয়াছেন কেন?"

কান খুঁটিতে খুঁটিতে শ্বশুর বলিলেন,—"কি বলিলে?"

মাধব পুনরায় বলিলেন,—"তবে আমায় নিমন্ত্রণ করিয়াছেন কেন?"

শ্বশুর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমাকে কে নিমন্ত্রণ করিয়াছে?"

মাধব উত্তর করিলেন,—"আপনার জামাতা।"

শ্বশুর বলিলেন,—"মাথা নাই তার আবার মাথা-ব্যাথা। আমার কন্যা কোথায় যে আমার জামাতা! এখনি উঠিয়া যাও, নতুবা গলা ধাক্কা দিয়া তাড়াইব।"

আর কোন কথা না বলিয়া মাধব উঠিয়া গেলেন। দুই চারি জন ব্যতীত তাঁহার সহিত প্রায় সমুদয় ব্রাহ্মণ উঠিয়া গেল। যাইবার সময় মাধব বলিয়া গেলেন,—"যদি বিদ্যাবল থাকে, তাহা হইলে শীঘ্রই আপনি ইহার প্রতিফল পাইবেন।"

তৃতীয় অধ্যায়— সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী

মাধবকে অপমান করিয়া শ্বশুর মহাশয়ের ঘোরতর আনন্দ হইল। বাড়ীর ভিতর গিয়া বিছানায় বসিয়া তিনি ডুকুরে ডুকুরে হাসতে লাগিলেন।

নীচের একটি ঘরে আমি বাস করিতাম। আমিও আমার ঘরে গিয়া ক্রমাগত হাসিতে লাগিলাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বে একবার হাসিতে হাসিতে আমার ঘাড়টি খুট্ করিয়া উঠিল। আর সেই সঙ্গে আমার মাথা হালকা হইয়া গেল, যেন ঠিক শোলার মত বোধ হইতে লাগিল। হাসিবার নিমিত্ত মুখ যে হাঁ করিয়াছিলাম, সেইরূপ হাঁ রহিয়া গেল। মুখ বুজিতে পারিলাম না। কথা কহিতে পারিলাম না। শুনিয়াছিলাম যে, হাই তুলিতে গিয়া অনেকের চলের হাড় নড়িয়া এইরূপ হয়। আমি মনে করিলাম যে, আমারও তাহাই হইল।

"ছকু! ছকু কোথায়? এখনও তুমি ঘরের ভিতর। সখের যাত্রা হইবে, তাহার সব যোগাড় কর।" এই কথা বলিতে বলিতে শ্বশুর মহাশয় আমার ঘরের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আমার মুখের দিকে একবার মাত্র দৃষ্টি করিয়াই তিনি ঘোরতর ভীত হইলেন। ভয়ে সে স্থান হইতে পলায়ন করিবার উপক্রম করিলেন। কিন্তু তিনি সাহসী পুরুষ ছিলেন। পলাইলেন না। পুনর্বার আমার মুখের দিকে চাহিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সর্বনাশ! এ কি হইয়াছে! তোমার নিজের মুখ কোথায় গেল। সর্বাঙ্গসুন্দরীর মাথা তোমার ঘাড়ের উপর কি করিয়া আসিল?"

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী আমার পরলোকগতা স্ত্রীর নাম ছিল। আমার নিজের মুণ্ড আমার স্কন্ধে নাই। সে স্থানে তাহার মুণ্ড বসিয়াছে। হাসিতে হাসিতে ঘাড় কেন যে খুট্ করিয়াছিল, এখন তাহার কারণ বুঝিলাম। মুখ আমার হাঁ হইয়াছিল।

আমি কোন কথা বলিতে পারিলাম না। উত্তর না পাইয়া, শ্বশুর মহাশয় সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। বাড়ীর ভিতর গিয়া তিনি শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে ডাকিয়া আনিলেন। শাশুড়ী ঠাকুরাণীও আমার ঘাড়ের উপর তাঁহার কন্যার মুখ দেখিয়া প্রথমে ভয়ে ব্যাকুলিতা হইলেন ও সে স্থান হইতে পলাইবার উপক্রম করিলেন। কিন্তু রায় মহাশয় তাঁহার হাত

ধরিয়া রাখিলেন, যাইতে দিলেন না। শাশুড়ী ঠাকুরাণী তাহার পর আমার দ্বারের নিকট মাটীতে বসিয়া পড়িলেন। কন্যার শোক এখন তাঁহার উথলিয়া পড়িল।

তিনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন,—"ওগো মাগো! যদি ভূত হইয়া দেখা দিলি, তো সর্ব্বশরীরে দেখা দিলি না কেন? পরের ধড়ের উপর নিজের মুণ্ড বসাইলি কেন! ওগো মা গো! তুই আমার যে বড় সাধের মেয়ে ছিলি। তোর যেমন রূপ তেমনি গুণ ছিল। সেই জন্য আমরা যে তোর সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নাম রাখিয়াছিলাম।"

শাশুড়ী ঠাকুরাণী একটু চুপ করিলে, শ্বশুর মহাশয় আমাকে বলিলেন,—"তোমাকে এ অবস্থায় দেখিলে ভয়ে লোক সব পলাইয়া যাইবে। সন্ধ্যার পর অনেকে নিমন্ত্রণে আসিবে। তাহাদের প্রণামী তাহা হইলে আমি পাইব না। যাত্রাও তাহা হইলে হইবে না। অতএব তুমি আজ রাত্রিতে এই ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া থাক! কাল প্রাতঃকালে রোজা আনিয়া তোমার ঝাড়ান কাড়ান করাইব। যাহাতে এ মুখ গিয়া পুনরায় তোমার নিজের মুখ হয়, সে চেষ্টা করিব।"

আমি হাঁ বুজিতে পারিলাম না। কোন উত্তর করিতে পারিলাম না। শাশুড়ীর হাত ধরিয়া শ্বশুর মহাশয় চলিয়া গেলেন।

তাঁহারা চলিয়া গেলে, আরসিখানি লইয়া আমি মুখ দেখিলাম। আশ্চর্য্য কথা। আমার কাঁধের উপর আমার নিজের মস্তক নাই। আমার মৃত স্ত্রীর মস্তক রহিয়াছে। আহা! সেই রং, সেই দাঁত সেই মধুর হাসি, সেই মুখশ্রী, আমার মুণ্ডর পরিবর্ত্তে তাহার মুণ্ড আমার স্কন্ধে বসিয়াছিল বটে, কিন্তু বুদ্ধি আমর নিজের ছিল।

বলা বাহুল্য যে, আমার ঘোরতর ভাবনা হইল। এই মুণ্ড যদি আমার কাঁধে থাকিয়া যায়, তাহা হইলে আমার দশা যে কি হইবে, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। কিনু বলিলেন,—"ঘোর বিপদের কথা বটে। তাহার পর?"

চতুর্থ অধ্যায়— দুরন্ত মহিষাসুর

ছকু বলিলেন,—"ছোট ঘরটিতে মনের দুঃখে চুপ করিয়া আমি বসিয়া রহিলাম। সন্ধ্যার পর আরতি হইল। নিমন্ত্রিত ব্যাক্তিদিগের প্রণামীর টাকা ঝমাৎ ঝমাৎ শব্দে পড়িতে লাগিল। আরও অধিক রাত্রি হইল। সখের যাত্রা আরম্ভ হইল। বাড়ী লোকে লোকারণ্য হইল। যাত্রাদলের বালকেরা কেহ ছোঁড়া, কেহ ছুঁড়ী সাজিয়া কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল-চেঁচাইতে লাগিল। এমন সময় সহসা দালানে প্রতিমা খানি দুলিতে লাগিল। গান বন্ধ হইয়াগেল।

যত লোক শঙ্কিত ও স্তম্ভিত হইয়া একদৃষ্টে প্রতিমার দিকে চাহিয়া রহিল। কার্ত্তিকের ময়ূর ভয়ঙ্কর ক্যাঁ ক্যাঁ রবে বাড়ী যেন ফাটাইয়া দিল। সহসা দেবীর সিংহ বজ্রনিনাদের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া অসুরকে ছাড়িয়া দূরে গিয়া বসিল। যে বল্লম দ্বারা অসুরকে মা বিদ্ধ করিয়া ছিলেন, এখন তিনি সেই বল্লমটি তুলিয়া লইলেন। অসুর উঠিয়া দাঁড়াইল। আসল মহিষাসুর! হস্তীর ন্যায় প্রকাণ্ড দেহ-বিশিষ্ট ভয়াবহ অরণ্যবাসী অর্ণা।

দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বিপরীত বক্রাকার শৃঙ্গ পাতিয়া মহিষ গা-ঝাড়া দিল। তাহার পর শিং পাতিয়া ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে লোকদিগকে তাড়া করিল। শিঙ্গে তুলিয়া আমার শ্বশুরকে দূরে একটি তাকিয়ার উপর ফেলিয়া দিল। অজ্ঞান হইয়া শ্বশুর মহাশয় সেই তাকিয়ার উপর পড়িয়া রহিলেন। তাহার পর লাফ দিয়া উঠানে যাত্রাদলের মাঝখানে গিয়া পড়িল। সম্মুখের খুর দিয়া সপ বিছানা দূরে নিক্ষেপ করিল; খুর দিয়া প্রাঙ্গণের মাটী খুঁড়িতে লাগিল, তাহার পর শিং পাতিয়া মাথা নীচে করিয়া দুরন্ত মহিষ একবার এ-দিকে একবার ও-দিকে লোক সকলকে তাড়া করিতে লাগিল।

বাপ'রে মা'রে চীৎকার করিয়া লোক পরস্পরের ঘাড়ে গিয়া পড়িতে লাগিল। কাহারও মাথায় ভয়ানক চোট লাগিল। যাত্রাদলের ছেলেদের কান্নায় বাড়ী পরিপূরিত হইল। দোতালার উপর বারাণ্ডায় বসিয়া স্ত্রীলোকেরা যাত্রা শুনিতেছিল। "মা গো, কি হইল গো" বলিয়া তাহারা কাঁদিয়া উঠিল। কচি ছেলেরা সব চ্যাঁ ভ্যাঁ করিয়া বাড়ী ফাটাইয়া দিল। দেবীর পাদপদ্মের নিকট সিংহ বসিয়া ভীষণ মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল। কার্ত্তিককে পৃষ্ঠে করিয়া মাথা তুলিয়া ময়ূর পুনরায় ক্যাঁ ক্যাঁ করিতে লাগিল।

মহিষ গাঁ গাঁ শব্দ করিয়া একটা ঢাকের ভিতর শিং প্রবিষ্ট করিয়া দিল। তাহার পর মাথা তুলিয়া ঢাকটি দশ হাত দূরে ফেলিয়া দিল। পুনরায় শিং পাতিয়া মাথা নীচে করিয়া একবার এ-দিক্ একবার ও-দিক্ প্রবলবেগে দৌড়িতে লাগিল। তখন তাহার পর খুরের দুড় দুড় শব্দে মেদিনী কাঁপিতে লাগিল। দক্ষযজ্ঞের কথা শুনিয়াছিলাম, আজ আমার শ্বশুরবাড়ীতে সেই দক্ষযজ্ঞ হইতে লাগিল। শৃঙ্গে তুলিয়া মহিষ শত শত লোককে দূরে নিক্ষেপ করিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কাহারও সে প্রাণবধ করিল না। লোক সব রুদ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিল। বাদ্যকারদিগের ঢাক ঢোল, যাত্রাওয়ালাদিগের বিলাতী যন্ত্র ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একাকার করিয়া দিল। দোল-মঞ্চে ঝাড়-লণ্ঠন ঝুলিতেছিল, সে সব ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া ফেলিল।

বাহিরে ভয়ানক কোলাহল হইতেছে। ঘরের ভিতব একাকী আমি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিলাম না। ব্যাপারখানা কি জানিবার নিমিত্ত বাহিরে আসিলাম। মহিষের ভয়ে কতক লোক আশে পাশে লুকাইয়াছিল। আমাকে দেখিয়া "বাপ রে! আবার রাক্ষস আসিয়াছে!" এইরূপ চীৎকার করিতে করিতে সকলে পলায়ন করিল। মহিষ আমাকে তাড়া করিল। ভয়ে আমি ঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিলাম।

কিছুক্ষণ পরে বাটী নীরব হইল। আস্তে আস্তে আমি দ্বার খুলিয়া উঁকি মারিলাম। মহিষ নাই, বাটীতে জন-প্রাণী নাই। আরও আগে গিয়া দেখিলাম, প্রাঙ্গণের ঝাড়-লণ্ঠন চূণ-বিচূর্ণ হইয়া পড়িয়া আছে! ভগ্ন ঢাক ঢোল ও নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র পড়িয়া আছে। দালানের প্রতিমার নিকট লণ্ঠন জ্বলিতেছিল। মায়ের প্রতিমা পূর্ব্বে যেরূপ ছিল—এখনও ঠিক সেইরূপ ছিল। শ্বশুর মহাশয় তখনও তাকিয়ার উপর পড়িয়া ছিলেন। আমি তাঁহার মাথাটি তুলিলাম। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন। তাহার পর "বাপ! মহিষাসুর!" এই কথা বলিয়া তিনি বাটীর ভিতরে চলিয়া গেলেন।

আমি নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। তক্তপোষের উপর আমি শুইয়া পড়িলাম। কিন্তু নিদ্রা হইল না। কি করিয়া পুনরায় নিজের মুণ্ড ফিরিয়া পাইব, কেবল সেই কথা ভাবিতে লাগিলাম। টং টং টং করিয়া রাত্রি তিনটা বাজিয়া গেল। ঘরে আমার প্রদীপ জ্বলিতেছিল। সহসা প্রদীপ নিবিয়া গেল। নিবিড় অন্ধকারে ঘর পরিপূর্ণ হইল। সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া দুইটি সাদা চক্ষু আর দুই দাঁত জ্বল-জ্বল করিতে লাগিল।

আমি মনে করিলাম, "এ আবার কি? কি কুক্ষণেই আজ প্রভাত হইয়াছিল। সপ্তমী পূজার দিন, কোথায় আমোদ প্রমোদ করিব, তাহা না হইয়া বিপদের উপর বিপদ। ভয়ের উপর ভয়। ঘোর আতঙ্কে আমার সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল। আবার ভাবিলাম,—ভয় করি—কেন? আমার নিজের মুণ্ড নাই, পরের মুণ্ড আমার ঘাড়ে। এরই অবস্থায় কালযাপন করা অপেক্ষা মৃত্যুই ভাল।"

কিনু বলিলেন,—"তা বটে! তোমার কিন্তু খুব সাহস। তাহার পর কি হইল?"

পঞ্চম অধ্যায়— যকের ধন

ছকু বলিলেন,—"দাঁতওয়ালা সেই মূর্ত্তি লোহার ন্যায় কঠিন হাত বাহির করিয়া আমার দুই গালে দুইটি চড় মারিল। তখন আমার চলের হাড় নড়িয়া গেল। ঠিক আমার নহে, আমার ঘাড়ের যে মুণ্ড ছিল, তাহার মুখ বুজিয়া গেল। সেই মুখ দিয়া এখন কথা কহিতে পারিলাম। –দাঁতওয়ালা বলিল,—"আমি ভূত!"

আমার মনে এখন ভয়ের লেশমাত্র ছিল না। আমি বলিলাম,—"বটে! মহাশয়, ভূত?"

ভূত বলিল,—"এস, তোমার ঘাড়টি ভাঙ্গিয়া দিই।"

আমি বলিলাম,—"এ আমার মস্তক নহে, অন্য লোকের।"ভূত পুনরায় বলিল,—"সম্প্রতি আমি ভূত হইয়াছি। ভূতগিরি করিতে এখনও ভাল করিয়া শিক্ষা করিতে পারি নাই। আজ ভোর হইতে কি যে কি করিব, তাহাই ভাবিতেছি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কেন?"

ভূত উত্তর করিল,—"আমরা হাওয়া। রাত্রি হইলে আমরা মানুষের আকার ধারণ করিয়া ভূতগিরি করি। ভোর হইলে আবার পুনরায় হাওয়া হইয়া যাই। কি করিয়া পুনরায় হাওয়া হইতে হয়, তাহা আমি ভুলিয়া গিয়াছি। দিন হইলেও আমাকে এইরূপ মানুষের আকার ধরিয়া থাকিতে হইবে।"–আমি বলিলাম,—"তা কি হয়! তাহা হইলে লোক সব ভয় পাইবে, কাজকর্ম্ম সব বন্ধ হইয়া যাইবে।"

ভূত বলিল,—"তবে এক কর্ম্ম কর। তোমার ঘাড়ে যে মুণ্ডটি রহিয়াছে, ঐটি আমাকে দাও, ও পুরাতন ভূত, কি করিয়া পুনরায় হাওয়া হইতে হয় ও আমাকে বলিয়া দিবে।"

আমি বলিলাম,—"আমার নিজের মুণ্ডু ফিরিয়া না পাইলে এ মুণ্ডু কি করিয়া দিব?"

ভূত বলিল, —"কেন, কবন্ধকাটা হইয়া থাকিবে। সাধুভাষায় যাহাকে কবন্ধ বলে।"

আমি বলিলাম,—"জীয়ন্ত শরীরে তাহা হয় না।"

ভূত বলিল,—"তোমার মুণ্ডু খিড়কীর বাগানে চালতে-তলায় পোঁতা আছে। সাবল

লইয়া আমার সঙ্গে চল; আমি দেখাইয়া দিব।"

সাবল লইয়া আমি ভূতের সঙ্গে চলিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম যে, আমার শ্বশুরবাড়ীর চারিদিকে বাগান ছিল, আর সেই বাগান উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল। পূর্ব্বদিকে প্রাচীরের ধারে একটি চালতে-গাছ ছিল। সেই গাছের অনেকগুলি ডাল প্রাচীরের উপর পড়িয়াছিল। চালতে-তলার এক স্থান ভূত আমাকে দেখাইয়া দিল। সাবল দিয়া সেই স্থান আমি খুঁড়িতে লাগিলাম। অল্প খুঁড়িতে সরা ঢাকা এক হাঁড়ি বাহির হইয়া পড়িল। সরা খুলিয়া দেখি যে, তাহার ভিতর আমার মুণ্ডু! আমর স্কন্ধ হইতে ভূত তখন সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীর মুণ্ডু তুলিয়া লইয়া আবার আমার নিজের মুণ্ডু সেই স্থানে বসাইয়া দিল। নিজের মুণ্ডু যদি না পাইতাম, তাহা হইলে কি করিয়া যে গাঁজা খাইতাম, তাহাই ভাবি; সে হাঁ-করা দাঁত বাহির-করা মুখ দিয়া গাঁজার দম দিতে পারিতাম না।"

কিনু বলিলেন,—"আশ্চর্য্য! তাহার পর।"

ছকু বলিলেন,—"ভূত তখন হাওয়া হইয়া গেল। কিন্তু হাওয়া হইবার পূর্ব্বে সে আমাকে আর একটু খুঁড়িতে বলিয়া গেল। আর একটু খুঁড়িয়া প্রায় এক ঝুড়ি মাটী আমি তুলিয়া ফেলিলাম। তাহার পর দেখি যে, নিম্নে বৃহৎ একটি কাঠের বাক্স রহিয়াছে, আর সেই বাক্সের উপর প্রকাণ্ড এক ব্যাঙ বসিয়া আছেন, ব্যাঙের গা হইতে এক প্রকার লালা নির্গত হইতেছে! আর সেই লালা আগুনের মত জ্বলিতেছে।

লাফ দিযা ব্যাঙ গর্ত্তের উপর গিয়া বসিল। আমি ভাবিলাম যে, ভূতের কল্যাণে আমি আমার নিজের মুণ্ড ফিরিয়া পাইলাম। ভূত আমাকে বোধ হয় যকের ধন দিয়া গেল। যকের টাকায় শুনিয়াছি সাপ থাকে, ভূত মহাশয় সাপ লইয়া গিয়াছেন। আহারের নিমিত্ত সাপ ব্যাঙটি যোগাড় করিয়াছিলেন।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সাবলের চাড়া দিয়া বাক্সর ডালা আমি খুলিলাম। তখন আমার যে কি আনন্দ হইল, তাহা তোমাদিগকে আর কি বলিব। বাক্সটি টাকায় পরিপূর্ণ ছিল চক্‌চকে নূতন টাকা। কেবল এক ধারে এক তাড়া কাগজ ছিল।

ব্যাঙের আলোতে আমি দুই চারিটি টাকা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছি, এমন সময় আমার শ্বশুর মহাশয় দোতালায় তাহার শয়নঘরের জানালা হইতে বলিয়া উঠিলেন,—"কেও! চালতে-তলায় কেও!"

আমি তাড়াতাড়ি বাক্সর উপর মাটী চাপা দিতে লাগিলাম। ব্যাঙ দুই চারি লাফে সে স্থান হইতে পলাইয়া গেল। ব্যাঙ অভাবে চালতে তলা অন্ধকারময় হইয়া গেল।

সেই জন্য ভাই, ছোঁড়ারা আমায় ক্ষেপায়; বলে,

—ধন ফেলে ব্যাঙ পালালো। ছকু ভায়ার ঠ্যাঙটি গেল।।

কিনু বলিলেন,—"ছোঁড়াদের বড় অন্যায়। তোমার ঠ্যাঙটি কি করিয়া গেল?"

ছকু বলিলেন,—"আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণীও সেই সময় জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইলেন।" তিনি বলিলেন,—"কোথায় কে?"" শ্বশুর উত্তর করিলেন,—"চাল্‌তে-

তলায় একটা আলোর মত কি দেখিলাম। এখন নিবিয়া গিয়াছে।" —শাশুড়ী বলিলেন,— "হয় ত আলেয়া!" —শ্বশুর বলিলেন,—"আলেয়া নয়, হয় ত চোর। ভোজালে দাও, দেখিয়া আসি।" —তাড়াতাড়ি গর্ত্তটি পরিপূর্ণ করিয়া আমি সে স্থান হইতে পলায়ন করিলাম। নিজের ঘরে আসিয়া শয়ন করিলাম। ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম!

প্রাতঃকালে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। আমি বাহিরে আসিলাম। শ্বশুর ভাঙ্গা ঝাড়-লণ্ঠন ও বাদ্য-যন্ত্র প্রভৃতি দেখিতেছিলেন। আমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া, তিনি বলিলেন,—"এই যে, তুমি তোমার নিজের মাথা পাইয়াছ।" তাহার পর পুনরায় তিনি বলিলেন,—"এই সকল বাদ্য-যন্ত্রের দাম আমাকে দিতে হইবে। মোদো মহিষাসুর সাজিয়া আমার জিনিসপত্র ভাঙ্গিয়াছে, তাহার নামে আমি নালিশ করিব। তাহাকে জেলে পচাইব।"

আমি কোন উত্তর করিলাম না। "নিজের ঘরে আসিয়া যকের টাকার কথা ভাবিতে লাগিলাম। সত্য সত্য কি আমার কপাল ফিরিয়াছে?"

ষষ্ঠ অধ্যায়– ছকুর ঠ্যাঙ

সমস্ত দিন কেবল ভাবিতে লাগিলেন, ভগবান্ যদি যকের ধন আমাকে দিলেন, তাহা হইলে কি করিয়া ইহা লইয়া এ স্থান হইতে পলায়ন করি। কত উপায় ভাবিলাম। অর্দ্ধেক ভাগ আমাকে প্রদান করেন, তাহা হইতে তাঁহাকে গিয়া বলি। কিন্তু রায় মহাশয়ের প্রকৃতি আমি ভালরূপ জানিতাম। তিনি নিশ্চয় বলিবেন যে,—"এ আমার টাকা, আমি এই স্থানে পুঁতিয়া রাখিয়াছিলাম! তোমাকে ইহার ভাগ দিব কেন?"

সমস্ত দিন ভাবিয়া কোন উপায় স্থির করিতে পারিলাম না। সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাজার হইতে একটি আঁধারে লণ্ঠন কিনিয়া আনিলাম। সে দিন মহাষ্টমী, সে রাত্রিতে বাড়ীতে কোন নাচ-গাওয়া ছিল না। যকের ধন ঠিক আছে কি না, তাহা দেখিবার নিমিত্ত রাত্রি দুইটার সময় লণ্ঠনটি হাতে লইয়া পুনরায় সেই চাল্‌তে-তলায় উপস্থিত হইয়া হাত দিয়া মাটী সরাইতে সবে মাত্র আরম্ভ করিয়াছি, এমন সময়ে দোতালার উপর জানালার ধারে দাঁড়াইয়া শ্বশুর মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "সেই চোর বেটা আজ আবার বুঝি আসিয়াছে। ভোজালে দাও।" —আর আমি বিলম্ব করিলাম না। মাটী যেমন ছিল, তাড়াতাড়ি সেইরূপ করিয়া সে স্থান হইতে পলায়ন করলাম। নিজের ঘরে আসিয়া পুনরায় ভাবিতে লাগিলাম অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া এক উপায় স্থির করিলাম। তাহার পর সেই দিন ভোরে কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া শ্বশুরের বাড়ী হইতে পলায়ন করিলাম।

নিকটে একখানি খোলার বাড়ী ছিল! সেই বাড়ীর লোকদিগের সহিত আমার আলাপ-পরিচয় ছিল। সে স্থানে গিয়া আমি রহিলাম। আমার শ্বশুরের বাগানের পূর্ব্বদিকে প্রাচীরের বাহিরে একটি গলি ছিল। এ স্থানে লোকের অধিক বাস ছিল না। রাত্রিকালে এ গলিতে লোকের বড় যাতায়াত ছিল না। দিনের বেলা দুই তিন বার সেই গলিতে গিয়া বাহির হইতে বাগানের প্রাচীর ও সেই চালতে-গাছ দেখিয়া আসিলাম। চালতা বৃক্ষের নিম্নদেশে ডাল ছিল। দুই তিনটি শাখা প্রাচীরের উপর পড়িয়াছিল। সেই ডাল ধরিয়া

প্রাচীরের উপর হইতে বাগানের ভিতর সহজে নামিতে পারিব। কিন্তু বাহির হইতে প্রাচীরে কি করিয়া উঠিব, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। ঘুরিতে ঘুরিতে এক স্থানে দুইটি বাঁশ পড়িয়া আছে দেখিলাম, মনে করিলাম, এই বাঁশের সহায়তায় আমি প্রাচীরের উপর উঠিব।

নবমী পূজার দিন সন্ধ্যার পর ঘোর বাদলা উপস্থিত হইল। আকাশ নিবড়ি মেঘে ঢাকিয়া গেল। সমস্ত রাত্রি বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের আলোকে পৃথিবী আলোকিত হইতে লাগিল! আমি মনে ভাবিলাম যে, ভালই হইয়াছে। এ দুর্য্যোগে কেহ ঘর হইতে বাহির হইতে পারিবে না। অনায়াসে আমি বাক্সটি আনিতে পারিব।

রাত্রি তিনটার সময় খোলার ঘর হইতে বাহির হইলাম। প্রাচীরের গায়ে বাঁশ দিয়া উপরে উঠিলাম। চালতে গাছের ডাল ধরিয়া নীচে নামিলাম। হাত দিয়া মাটী খুঁড়িয়া বাক্স বাহির করিলাম। বাক্‌স গর্ত্তর উপর তুলিলাম। কিন্তু সর্ব্বনাশ! বাক্‌স অতিশয় ভারি। কি করিয়া ইহা লইয়া গাছে উঠিব, কি করিয়া প্রাচীর পার হইয়া গলিতে গিয়া নামিব! এ বুদ্ধি পূর্ব্বে আমার যোগায় নাই।

যাহা হউক, অতি কষ্টে বাক্স আমি মাথায় তুলিলাম। এক হাতে বাক্স ধরিয়া অপর হাত দিয়া চাল্‌তে গাছের উপর উঠিতে লাগিলাম। ভাগ্যক্রমে গাছের ডালগুলি সুবিধামত ছিল। তাই উঠিতে পারিলাম। একটি ডালের উপর উঠিলাম। দুইটি ডালের উর উঠিলাম। প্রাচীরের মাথা আর অল্প দূরে আছে, আর দুই তিনটা ডাল পার হইলেই, তাহার উপর গিয়া উঠিতে পারি, এমন সময় বিদ্যুতের আলোকে দিনের ন্যায় চারিদিক্ আলোকিত হইল। সেই সময় হড়াৎ করিয়া শ্বশুর-বাটীর খিড়কীদ্বার কে খুলিয়া ফেলিল। পুনরায় আর একবার বিদ্যুৎ হইল। ঘোর বিপদ। আমি দেখিলাম যে, দক্ষিণ হাতে ভোজালে, আর বাম হাতে লণ্ঠন লইয়া মশ মশ করিয়া শ্বশুর মহাশয় সেই চাল্‌তে-তলার দিকে আসিতেছেন। তাঁহার পশ্চাতে শাশুড়ী ঠাকুরাণী আসিতেছেন।

ভয়ে আমার সর্ব্ব শরীর কাঁপিয়া উঠিল। আমার হাত-পা অবশ হইয়া গেল। গাছ হইতে আমি পড়িয়া যাই আর কি। যাহা হউক, আমি নিজে পড়িলাম না। কিন্তু বাক্সটি ঝনাৎ করিয়া নীচে পড়িয়া গেল। ডালাটি ভাঙ্গিয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইল। চক্‌চকে টাকা সব চারিদিকে ছত্রাকার হইয়া ছড়াইয়া পড়িল।

শ্বশুর-শাশুড়ী চাল্‌তে-তলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সম্মুখে একটি কাগজের তাড়া দেখিয়া শ্বশুর মহাশয় প্রথম তাহাই কুড়াইয়া লইলেন। লণ্ঠনের আলোতে কাগজগুলি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। —শাশুড়ী জিজ্ঞাসা করলেন,—"ও কি কাগজ?" শ্বশুর উত্তর করিলেন,—' নোট, এক একখানি হাজার টাকার নোট, অনেকগুলি আছে।"

শাশুড়ী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ বাক্স, এ নোট, এ সব টাকা কোথা হইতে আসিল?"

শ্বশুর উত্তর করিলেন, —"এ বাড়ী পূর্ব্বে এক জন বড় মানুষের ছেলের ছিল। নিজের বিষয় উড়াইয়া সে কাবুলী চাকর দ্বারা ডাকাতি করাইত। চোরাই মাল সে বোধ হয়, এই স্থানে পুঁতিয়া রাখিয়াছিল। আমরা এইবার বড় মানুষ হইব।" —শাশুড়ী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাক্স খুঁড়িয়া তুলিতে চোর আসিয়াছিল?" —শ্বশুর উত্তর করিলেন,—"চোর

নয়, জামাই বেটারকাণ্ড। যদি এখন পাই, তাহা হইলে এই ভোজালে দিয়া টকুরা টুক্‌রা করিয়া তাহাকে কাটি, আর এই গর্ত্তের ভিতর পুঁতিয়া রাখি।"

এই কথা বলিয়া তিনি গাছের দিকে লণ্ঠনটি তুলিয়া দেখিতে লাগিলেন। পাতার ভিতর এতক্ষণ চুপ করিয়া আমি লুক্কায়িত ছিলাম! আর থাকিতে পারিলাম না। ডাল ধরিয়া প্রাচীরের উপর গিয়া উঠিলাম। তাহার পর বাঁশ ধরিয়া তাড়াতাড়ি নামিবার চেষ্টা করিলাম। বাঁশ পড়িয়া গেল। আমি সবলে নীচে গলিতে গিয়া পড়িলাম। আমার দক্ষিণ পায়ের হাড় ভাঙ্গিয়া চর্ম্মভেদ করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। তথাপি বুকে হাঁটিয়া আমি সে স্থান হইতে পলায়ন করিতে লাগিলাম। বুকে হাঁটিয়া ক্রমে সদর রাস্তায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আর আগে যাইতে পারিলাম না। অল্পক্ষণ পরে এক জন পাহারাওয়ালা আমাকে দেখিতে পাইল। তাহার পর কি হইল, তাহা আমি জানি না। আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম।

তিন দিন পরে একবার আমার জ্ঞান হইল! দেখিলাম যে, আমি হাসপাতালে পড়িয়া আছি। আর জানিতে পারিলাম যে, করাত দিয়া ডাক্তারে আমার দক্ষিণ পা কাটিয়া ফেলিয়াছে। আমার জ্ঞান অক্ষিকক্ষণ রহিল না, প্রবল জ্বর দ্বারা আমি আক্রান্ত হইলাম। জ্বরের উপর বিকার হইল। জ্ঞানগোচরশূন্য হইয়া পঁচিশ দিন আমি এখন যাই, তখন যাই হইয়া পড়িয়া রহিলাম। পঁচিশ দিন পরে পুনরায় আমার জ্ঞান হইল। কিন্তু আরও দুই মাস আমাকে হাঁসপাতালে বিছানায় পড়িয়া থাকিতে হইল। হাঁসপাতাল হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বে, এক জন বাঙ্গালী ডাক্তার আমাকে একখানি খবরের কাগজ দিয়াছিলেন, তাহাতে লেখা ছিল যে, চক্রধর রায়ের সাত বৎসর কারাবাস হইয়াছে। কিনু জিজ্ঞাসা করিলেন,— "কেন?" ছকু উত্তর করিলেন,—"জাল নোট, মেকি টাকা বাজারে চালাইতেছিলেন।"

বদন বলিলেন,—"তবে সে বাক্সতে কেবল জাল নোট আর মেকি টাকা ছিল?"

ছকু উত্তর করিলেন,—"হুঁ! বাক্সটি মেকি টাকায় পরিপূর্ণ ছিল। নোটগুলিও সব জাল। পূর্ব্বে যাহার ঐ বাড়ী ছিল, সে এই কাজ করিত।" নবদ্বীপ বলিলেন,—"উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে।"—কিনু জিজ্ঞাসা করিলেন, —"ভূত, মহিষাসুর—এ সব কি করিয়া হইয়াছিল?" —ছকু উত্তর করিলেন,—"মাধব হিপনটিশ্যাম করিয়াছিল।" বদন বলিলেন,—"গেলাসে ঢালো।" কিনু বলিলেন,—"তামাক ঢালো।"

ছকু বলিলেন,—"তামাক সাজিতেছি, কিন্তু তোমাদিগকে একটা কথা বলি, আমার পা কাটা গিয়াছে সত্য, কিন্তু আমি সুপুরষ। তথাপি কেহ আমাকে কন্যা দিতে চায় না। *তোমরা প্রাণের বন্ধু! যদি কাহারও অবিবাহিতা কন্যা থাকে, যদি আমা হেন সু-পাত্রকে* ঘর-জামাই রাখিতে সাধ থাকে, তাহা হইলে এই আমি মজুদ আছি।"

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

তৃতীয় খণ্ড

মুক্তা-মালা

সূচনা

প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা মহাদেব বাবু মজলিস করিয়া বসেন। সেই মজলিসে যাদব, মাধব, রাঘব, ত্রিলোচন, গদাধর, ঘনশ্যাম প্রভৃতি বন্ধুগণ নিয়মিতরূপে উপস্থিত থাকেন। সেই মজলিসে সকলে গাঁজার ধূমপান করেন। মহাদেব বাবুর টাকায় সভার সমুদয় ব্যয় নির্ব্বাহিত হয়। সুতরাং মহাদেব বাবু আড্ডার আড্ডাধারী, দলের দলপতি। সভায় সভ্যগণ সর্বদা তাঁহার প্রিয়পাত্র হইতে চেষ্টা করেন; ভালরূপে আজগুবি গল্প করিতে পারিলেই মহাদেব বাবুর সন্তোষ ভাজন হইতে পারা যায়। গাঁজার ধূম পান করিতে করিতে সভায় প্রতিদিন নানারূপ গল্প হয়।

মহাদেব বাবু বলিলেন,—'এই দুর্য্যোগের সময় মজার দুই একটি গল্প না হইলে প্রাণ শিথিল হইয়া যায়। কাহারও তবিলে কি একটিও ভাল গল্প নাই?'

যাদব বলিলেন,—'কি গল্প শুনিতে ইচ্ছা করেন? একটা ভূতের গল্প করিব?'

মহাদেব বাবু উত্তর করিলেন,—'নূতন ধরণের ভূতের গল্প হয় তো বল। পচা গল্প শুনিতে ইচ্ছা হয় না।

হলধর বলিলেন—'ভূতের গল্প, সাপের গল্প, বাঘের গল্প, চোর ডাকাতের গল্প, রাজা-রাণীর গল্প, যুদ্ধের গল্প, এ সব অনেক হইয়া গিয়াছে। নূতন আর কিছু নাই।'

মহাদেব বাবু বলিলেন, —সেকালের মত একালে আশ্চর্য্য ঘটনাও ঘটে না। আরব্য উপন্যাসের লোকে কত জিন্ দেখিতে পাইত। পঞ্চাশের উপর আমার বয়স হইয়া গেল। এ পর্য্যন্ত একটাও জিন্ কি একটা পরী আমি দেখি নাই। সে জন্য আরব্য উপন্যাসের মত গল্পও আর একালে হয় না।

রাঘব বলিলেন,—'একালে তেমন বাদশাও নেই, তেমনি রাজাও নাই। বিক্রমাদিত্যের মত রাজা একালে থাকিলে, কত বত্রিশ-সিংহাসন, কত বেতাল-পঞ্চবিংশতি হইত।'

ঘনশ্যাম বলিলেন—'ভাল কথা বলিলে! একটি লোকের কথা আমার মনে পড়িয়া গেল। কিছুদিন পূর্বে বাঁকুড়া হইতে আমাদের বাসায় একটি লোক আসিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত অতি অদ্ভুত। প্রতিদিন রাত্রিতে শয়ন করিয়া সেই গল্প তিনি আমাদের নিকট করিয়াছিলেন। তাহার অনেক কথা আমি একখানি খাতায় লিখিয়া লইয়াছিলাম। ঠিক যেন আরব্য উপন্যাস কি বেতাল পঁচিশের গল্প। এ কলিকালে যে এরূপ ঘটনা হইতে পারে, তাহা বিশ্বাস হয় না।

আগ্রহ সহকারে সকলেই সেই গল্প শুনিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু ঘনশ্যাম বাবুর মনে মনে গৌরব বাড়িয়া গেল। তিনি বলিলেন,—'না না, সে মিথ্যা গল্প। লোকটা গল্পে।

তাহার কথা বিশ্বাস হয় না। সে গল্প শুনিবার উপযুক্ত নহে।'

হলধর বলিলেন,—'যদি বেতাল-পঁচিশের মত গল্প হয়, তাহা হইলে এই বাদলার সময় বড়ই মিষ্ট লাগিবে। বল না, ভাই ঘনশ্যাম! সে কি গল্প?

ঘনশ্যাম উত্তর করিলেন,—'সে কাজের গল্প নহে। সে লোকটা হয় তো গাঁজাখোর। তাহার গল্প শুনিবার উপযুক্ত নহে।'

রাঘব বলিলেন,—'আমরাই কোন্ গাঁজাখোর নই! গাঁজাখোরের গল্প গাঁজাখোরকেই ভাল লাগে।' —ঘনশ্যাম বলিলেন, —'গাঁজাখোর বলিলাম বটে, কিন্তু গাঁজা খাইতে তাহাকে আমি কখন দেখি নাই। গুড়ু পর্যন্ত সে খায় না। পাগলের গল্প শুনিয়া কি হইবে?'

যাদব বলিলেন,—'তা হউক! পাগলের গল্পই আমরা শুনিব।'

এইরূপে সকলে অনেক সাধ্য-সাধনা করিলেন, কিন্তু ঘনশ্যাম সে গল্প বলিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। নিরাশ হইয়া সকলে অন্য প্রসঙ্গ আরম্ভ করিলেন। তখন ঘনশ্যাম বাবুর ভয় হইল। তিনি মনে করিয়াছিলেন, সকলে যখন আরও অনেক সাধ্য সাধনা করিবে, তখন তিনি গল্প আরম্ভ করিবেন। এখন আর কেহ অনুরোধ করিল না দেখিয়া তাঁহার ভয় হইল যে, পাচ্ছে গল্পটি বলা না হয়। তিনি ভাবিলেন, আর একবার অনুরোধ করিলেই আমি গল্প করিব।

কিন্তু সে অনুরোধ কেহই আর করিল না। তখন ঘনশ্যাম বাবুকে নিজেই সেই কথা পুনরুত্থাপন করিতে হইল। তিনি বলিলেন,—'গড়গড়ি মহাশয় যে গল্পটি করিয়াছিলেন, আমাকে তাহা ভাল লাগিয়াছিল বটে, কিন্তু তোমাদের ভাল লাগিবে কি না, সেই ভয়ে আমি বলিতে সাহস করি নাই!''

আড্ডাধারী মহাদেব বাবু এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন। গম্ভীর স্বরে এখন জিজ্ঞাসা করিলেন,—'গড়গড়ি মহাশয় কে?' ঘনশ্যাম উত্তর করিলেন,—'সেই বাঁকুড়ার লোক, যিনি আমাদের নিকট তাঁহার অদ্ভুত জীবন বিবরণ প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার নিবাস মানভূম জেলা। কিন্তু এখন তিনি বাঁকুড়া জেলায় শ্বশুরালয়ে বাস করিতেছেন। তিনি লেখাপড়া জানেন। ইংরাজীতে দুই একটা পাশ দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কাহিনী শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ঠিক আরব্য উপন্যাস কি বেতাল-পঁচিশের গল্প।'

মহাদেব বাবু বলিলেন,—'গল্পটি যদি এত ভাল, তবে বলই না কেন, ছাই! কিন্তু সকলে যতই তোমায় অনুরোধ করিল, ততই যেন তোমার লেজ মোটা হইয়া উঠিল।'

ঘনশ্যাম বলিলেন,—'আপনার যখন শুনিতে ইচ্ছা হইয়াছে, তখন নিশ্চয় আমি বলিব। কিন্তু এ একটি গল্প নয়। আরব্য উপন্যাসের মত অনেকগুলি গল্প। দিনারজারদির মত আজ সূচনা করিয়া রাখি। তাহার পর আমার খাতাখানি আনিয়া প্রতিদিন কিস্তিবন্দি করিয়া কিছু কিছু বলিব।' মহাদেব বাবু সে কথায় সম্মত হইলেন। ঘনশ্যাম বাবু গল্প আরম্ভ করিলেন।

ঘনশ্যাম বাবু বলিলেন,—'যাহার নিকট আমি এ গল্প শুনিয়াছি, তাঁহার নাম সুবল

গড়গড়ি। আমার নিজের কথায় আমি এ গল্প করিব না; গড়গড়ি মহাশয় যে ভাবে আমাদের বাসায় বলিয়াছিলেন, আমিও সেই ভাবে তাঁহার কথায় গল্পটি করিব।'

প্রথম রজনী — গড়গড়ি মহাশয়

গড়গড়ি মহাশয় বলিতেছেন,—আমার নাম সুবলচন্দ্র গড়গড়ি। আমাদের বাড়ী মানভূম জিলার সামান্য একখানি গ্রামে। আমাদের গ্রামের নিকট অনেকগুলি ছোট ছোট পাহাড় আছে। নিকটে বনও আছে। সেই বনে পূর্বে অনেক ব্যাঘ্রও ভল্লুক বাস করিত। কখন কখন বন্য হস্তীরও উপদ্রব হইত। গ্রামের নিকট আমাদের কিছু সম্পত্তি ছিল। আমাদের নিজের চাষবাসও ছিল।

সে জন্য সেই সামান্য স্থানে আমরা সম্পত্তিশালী লোক বলিয়া পরিগণিত ছিলাম। পুরুলিয়ার জিলা স্কুলে প্রথম আমি বিদ্যা-শিক্ষা করি। সে স্কুল হইতে পাশ দিয়া, কলিকাতার কলেজে আমি অধ্যয়ন করি। কলিকাতার কলেজ হইতে আর একটা পাশ দিলাম। ইহার কিছু দিন পরেই আমার পিতার পরলোক হইল। সে জন্য আর আমার লেখাপড়া হইল না। পৈতৃক সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণের নিমিত্ত আমাকে দেশে প্রত্যাগমন করিতে হইল।

সে সময় সংসারে আমার মাতা, আমার পরিবার ও এক কণিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম অক্রুর ছিল, কিন্তু তাহাকে আমরা 'ওক্কুর' বলিয়া ডাকিতাম। যখন পিতার পরলোক হয়, তখন ভ্রাতার বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসরের অধিক হয় নাই। কনিষ্ঠকে আমি প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসিতাম। মাতাঠাকুরাণীরও সে চক্ষুর পুত্তলি স্বরূপ ছিল। আমার পরিবারও তাহাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন।

বাঁকুড়া জিলায় কুতুবপুর নাম গ্রামে আমার শ্বশুরালয়। এক্ষণে সেই স্থানে আমি বাস করিতেছি। আমার শ্বশুরের পুত্র অথবা অন্য কন্যা ছিল না। আমার পিতার পরলোকের পাঁচ বৎসর পরে আমার শ্বশুর মহাশয় ও ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি আমার স্ত্রী পাইলেন। এই সম্পত্তি পাইয়া আমি মনে করিলাম যে, নিজে আমি ভালরূপে বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারি নাই; কনিষ্ঠ ওক্কুরকে ভালরূপে একটি স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলাম। কলিকাতায় যাহাতে সে পরম সুখে দিনযাপন করিতে পারে, সেইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া পুনরায় আমি দেশে প্রত্যাগমন করিলাম।

আরও পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল। ভ্রাতার লেখাপড়া বিষয়ে আমি বড়ই নিরাশ হইলাম। তাহার এখন যেরূপ বয়স, তাহাতে তিনটা পাশ দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এ পর্যন্ত সে একটিও পাশ দিতে পারিল না। পূজা ও গ্রীষ্মের অবকাশে যখন সে বাটী থাকিত, তখন তাহার কথা-বার্ত্তায় আমি সন্তোষ লাভ করিতে পারি নাই। তাহার চরিত্র-বিষয়েও ক্রমে দুই একটা কথা আমার কর্ণগোচর হইতে লাগিল! কলিকাতার খরচের নিমিত্ত যাহা প্রয়োজন, তাহা অপেক্ষা অধিক টাকা প্রতি মাসে তাহাকে আমি দিতাম। কিন্তু ক্রমে আমি শুনিতে পাইলাম যে, তাহা ব্যতীত মাঝে মাঝে সে গোপন ভাবে মাতার নিকট

হইতে আরও অনেক টাকা লইত। এসব কথা শুনিয়া আমি কলিকাতা আসিয়া তাহাকে মিষ্ট বাক্যে অনেক বুঝাইলাম। টাকা যে সে অপব্যয় করে নাই, তাহার প্রমাণ স্বরূপ আমাকে অনেক প্রকার হিসাব দেখাইল। কিন্তু সে যে আমাকে মিথ্যা কথা বলিতেছে, তাহার চরিত্র যে নিষ্কলঙ্ক নহে, এখন তাহা আমি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিলাম। আমি মনে করিলাম যে, ইহার লেখা-পড়া আর হইবে না, ইহাকে আর কলিকাতায় রাখা উচিত নহে। দেশে লইয়া গিয়া শীঘ্রই ইহার বিবাহ দিতে হইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি তাহাকে দেশে লইয়া যাইবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিলাম। কিন্তু সে কিছুতেই সম্মত হইল না। কলিকাতায় থাকিয়া এখন হইতে যত্ন করিয়া লেখাপড়া শিখিবে, আমার নিকট বার বার সে এইরূপ অঙ্গীকার করিল। অগত্যা একেলাই আমি দেশে প্রত্যাগমন করিলাম।

বাটী গিয়া আমি নিশ্চিত হইতে পারিলাম না। তাহার বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই সময়ে আমাদের মাতা ঠাকুরাণীর পরলোক হইল। সুতরাং বিবাহ বিষয়ে অন্ততঃ এক বৎসর কাল বিলম্ব হইয়া গেল। মাতার শ্রাদ্ধোপলক্ষ্যে কনিষ্ঠকে দেশে আনাইলাম। তাহার চাল-চলন দেখিয়া আমি বড়ই অসন্তুষ্ট হইলাম। মনে করিলাম যে, আর তাহাকে কলিকাতায় পাঠাইব না। মিষ্ট বাক্যে তাহাকে অনেক বুঝাইলাম, কিন্তু সে আমার কথা শুনিল না। আমার অমতেই কলিকাতায় চলিয়া গেল।

কলিকাতায় আমার দুই তিনটি বন্ধু ছিলেন। আমার ভ্রাতার প্রতি একটু লক্ষ্য রাখিতে তাঁহাদিগকে আমি অনুরোধ করিয়াছিলাম। তাঁহারা আমাকে মাঝে মাঝে পত্র লিখিতেন। সেই সমুদয় পত্রে ক্রমাগতই মন্দ সংবাদ আসিতে লাগিল। আমার ভ্রাতার চরিত্র দিন দিন মন্দ হইতে মন্দতর হইতে লাগিল। ভ্রাতাও আমার নিকট ক্রমাগত টাকা চাহিতে লাগিল। এতদিন মাতার নিকট হইতে গোপনে টাকা লইয়া সে অকুলান কুলান করিত। এখন মাতা নাই। টাকার নিমিত্ত আমাকে না লিখিলে আর উপায় নাই। প্রথম প্রথম ভয়ে ভয়ে নানারূপ ওজর করিয়া সে আমার নিকট টাকা চাহিত। কখন চুরি গিয়াছে, কখন টাকা হারাইয়া গিয়াছে, পুস্তক কিনিতে হইবে,—অন্যায় খরচের নিমিত্ত টাকা আবশ্যক হইলে প্রথম প্রথম এইরূপ নানা প্রকার ওজর করিয়া সে আমাকে চিঠি লিখিত। কিন্তু ক্রমে তাহার সে ভয় দূর হইল। পৈতৃক বিষয়ের সে এক জন অংশীদার, অর্দ্ধাংশের উপর তাহার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, সেই টাকা লইয়া যে যাহা ইচ্ছা করিবে,—'ক্রমে ক্রমে সে আমাকে এইরূপ অসম্মানসূচক পত্র লিখিতে লাগিল।

বলা বাহুল্য যে, এইরূপ পত্র পাইয়া প্রথম আমি যার-পর নাই আশ্চর্য হইলাম ও তাহার পর ঘোরতর দুঃখিত হইলাম। ভ্রাতাকে বুঝাইবার নিমিত্ত আমি কলিকাতায় আসিলাম। সে স্থানে আসিয়া আমি তাহাকে অনেক বুঝাইলাম। কিন্তু সে আমার মুখের উপর উত্তর করিতে লাগিল। যাহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করি, যাহাকে প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসি, সে আমার সহিত এইরূপ কথাবার্ত্তা করিতে লাগিল, এ দুঃখ কি আর রাখিবার স্থান আছে। ভ্রাতাকে কত বুঝাইলাম, কত মিনতি করিয়া তাহাকে বলিলাম। কিন্তু আমার কথা অপেক্ষা তাহার

বন্ধুদিগের কথা তাহার নিকট অধিক হইল। দেশে লইয়া যাইবার নিমিত্ত কাঁদিতে কাঁদিতে আমি তাহার হাত ধরিলাম। আমার হাত ছাড়াইয়া সে বাসা হইতে চলিয়া গেল।

ঘনশ্যাম বলিলেন,—'গড়গড়ি মহাশয় এইরূপে আমাদের নিকট তাঁহার জীবন বিবরণ প্রদান করিতে লাগিলেন। আজ রাত্রি হইয়াছে, আজ এই পর্যন্ত থাকুক। কাল আমার খাতা লইয়া আসিব। যতদূর হয়, কাল পুনরায় গড়াগড়ি মহাশয়ের গল্প করিব।'

দ্বিতীয় রজনী – গুরুদেব

পরদিন ঘনশ্যাম পুনরায় গল্প আরম্ভ করিলেন। গড়গড়ি মহাশয় বলিতেছেন ঃ—

যদিও আমি নিজে এ পর্য্যন্ত দীক্ষা গ্রহণ করি নাই, তথাপি শ্রীযুক্ত শ্রীল গোলোক চক্রবর্তী মহাশয় আমাদের বংশের গুরুদেব। ঠাকুর মহাশয়ের বাটী আমাদেরই গ্রামে। কিন্তু তিনি বার মাস কলিকাতাতেই থাকিতেন, কেবল প্রতিবৎসর পূজার সময় এক মাসের জন্য দেশে গমন করিতেন। আমি মনে করিলাম যে, কনিষ্ঠকে বুঝাইবার নিমিত্ত ঠাকুর মহাশয়কে অনুরোধ করি। ঠাকুর মহাশয় পূর্বে একটি হোটেল করিয়াছিলেন। হোটেলের কাজে তাঁহার লাভ হয় নাই। এক্ষণে তিনি পাঁঠার দোকান করিয়াছেন। সন্ধান করিয়া আমি সেই পাঁঠার দোকানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। রাস্তাব ধারেই দোকান। সেই দোকানে দুইটি ছাড়ানো ছাগল ঝুলিতেছিল। ঠাকুর মহাশয় তখন ব্যস্ত ছিলেন। এক জন খরিদ্দারকে তিনি আধসের মাংস বিক্রয় করিতেছিলেন। ঠাকুর মহাশয় বলিতেছিলেন যে, সে মাংস টাট্‌কা। খরিদ্দার বলিতেছিল যে, সে মাংস বাসি। খরিদ্দার বলিল যে, সে খাসি; ঠাকুর মহাশয় বলিলেন যে, সে পাঁঠা। খরিদ্দার বলিল যে, পিঠের দাঁড়ার মাংস ভাল, সেই মাংস আমি লইব; ঠাকুর মহাশয় বলিলেন যে, পাঁজরার মাংস ভাল, তাহাই লইয়া যাও।

মাংস লইয়া খরিদ্দার প্রস্থান করিলে, ঠাকুর মহাশয়কে আমি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম। ঠাকুর মহাশয়ের দক্ষিণ পদ কিছু স্থূল ছিল, অর্থাৎ সে পায়ে গোদ ছিল। সেই স্থূল পাদপদ্মাদি তিনি আমার মস্তকে তুলিয়া দিলেন। গোদের গ্যাঁজ হইতে রস প্রবাহিত হইয়া আমার মস্তক সিক্ত হইল, দুই চারি ফোটা আমার চক্ষুর উপর দিয়া বাহিয়া গেল। নানারূপ আশিস বচনে সম্ভাষণ করিয়া ঠাকুর মহাশয় আমাকে বাড়ীর ভিতর লইয়া যাইলেন। একখানি খোলার বাটীতে ঠাকুর মহাশয়ের দোকান ছিল। পথের ধারেই দোকান। তাহার পশ্চাতেই ভিতর দিকে খোঁয়াড়। সেই খোঁয়াড়ের ভিতর অনেকগুলি ছাগল ছিল। খোঁয়াড়টি দিন দুই প্রহরেও অন্ধকারে পরিপূর্ণ থাকে। সে নিমিত্ত কিরূপ ছাগল ও কতগুলি ছাগল তাহার ভিতর ছিল, প্রথম তাহা আমি দেখিতে পাই নাই। খোঁয়াড়ের পশ্চাতে বাটীর সর্বশেষে , আর একখানি ঘর। সেই ঘরে ঠাকুর মহাশয় রন্ধন ও শয়ন করেন। এই ঘরখানির সম্মুখে একটি বারেণ্ডা ও তাহার পর একটু উঠান ছিল। সে জন্য খোঁয়াড়ের ন্যায় এ স্থানে অন্ধকার ছিল না। ঠাকুর মহাশয় সেই বারেণ্ডায় আমাকে বসাইলেন। কলিকাতার ও দেশের নানারূপ কথার 'পর, আমার ভ্রাতার কথা গুরুদেবকে

আমি বলিলাম। কিন্তু গুরুদেব আমার সে কথায় বড় কান দিলেন না। এই সম্বন্ধে তিনি যাহা কিছু বলিলেন, আমার ভ্রাতার পক্ষেই তাহা তিনি বলিলেন। 'সে বিশেষ কোন মন্দ কাজ করে নাই, বয়সকালে এইরূপ সকলেই করিয়া থাকে, বড় হইলে তাহার চরিত্র সংশোধিত হইয়া যাইবে,' এইরূপ ভ্রাতার পক্ষ হইয়াই তিনি আমাকে বুঝাইলেন। লোকপরম্পরায় আমি ইতি পূর্বে শুনিয়াছিলাম যে, ঠাকুর মহাশয়ের সহিত আমার ভ্রাতার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। ঠাকুর মহাশয়ের বয়ঃক্রম পঞ্চাশের অধিক; আমার ভ্রাতার ইয়ার তিনি নহেন। কিন্তু অনেকগুলি খোলার বাটী নিবাসিনীদিগের সহিত ঠাকুর মহাশয়ের আলাপ পরিচয় ছিল; কারণ, তাহাদের বাটী ফলাহার করিয়া তিনি বাসা-খরচ বাঁচাইতেন ও দক্ষিণা গ্রহণে যৎকিঞ্চিৎ উপার্জন করিতেন। আমি শুনিয়াছিলাম যে, ঠাকুর মহাশয়ের উদ্যোগে দুই এক জন খোলার বাটী-নিবাসিনীর সহিত আমার ভ্রাতার আলাপ পরিচয় হইয়াছিল কিন্তু এ সকল কথা আমি বিশ্বাস করি নাই। এক্ষণে আমার মনে সন্দেহ হইল যে, ওক্কুর যে ভাবে চলিতেছে, সেই ভাবে চলিলে গুরুদেবের লাভ আছে, নিতান্ত অলাভ নাই। কথোপকথন করিতে করিতে খোঁয়াড়ের ভিতর হইতে ছাগলদিগের কাতরতাসূচক চীৎকার আমি বার বার শুনিতে পাইলাম। অনেকক্ষণ সেই সস্থানে বসিয়া এখন আর আমার ততটা অন্ধকার বোধ হইল না। আমি দেখিলাম যে, ছাগলগুলি অস্থি চর্মসার হইয়া গিয়াছে, ক্ষুধায় ও পিপাসায় তাহারা ছট্‌ফট করিতেছে। খোঁয়াড়ে স্থান অতি সঙ্কীর্ণ ছিল; তাহার ভিতর দশটি ছাগল ধরে কি না সন্দেহ। কিন্তু ঠেশা-ঠেশি করিয়া ঠাকুর মহাশয় পঁচিশ টির অধিক ছাগলে তাহা পূর্ণ করিয়াছিলেন। অতি কষ্টে গায়ে গায়ে ঠেশা-ঠেশি করিয়া তাহারা দাঁড়াইয়া ছিল, শয়ন করিবার স্থান একেবারেই ছিল না।

আমি বলিলাম,—'ঠাকুর মহাশয়! আপনার ছাগলগুলির বোধ হয় বড জল-পিপাসা পাইয়াছে।'

গুরুদেব উত্তর করিলেন,—'দুই একদিনে সমুদয় শেষ হইয়া যাইবে। জল দিবার আর আবশ্যক নাই।'

আমি বলিলাম,—'উহাদের ক্ষুধাও বোধ হয় পাইয়াছে।'

গুরুদেব বলিলেন,—'উহাদের ক্ষুধা নিশ্চয় পাইয়াছে। আজ তিন দিন উহাদিগকে ক্রয় করিয়া আনিয়াছি।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'উহাদিগকে কি খাইতে দেন?'

গুরুদেব উত্তর করিলাম—'খাইতে! খাইতে আবার কি দিব! খাইতে দিলে আর ব্যবসা চলে না।' আমি বলিলাম,—'এরূপ কয় দিন ইহারা আনাহারে থাকে?'

গুরুদেব বলিলেন,—'সাত আট দিনের অধিক ইহাদিগকে অনাহারে থাকিতে হয় না। সাত আট দিনের মধ্যেই এক এক খেপ শেষ হইয়া যায়।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"একটু একটু জলপান করিতে দেন না কেন?'

গুরুদেব উত্তর করিলেন,– উহারা গায়ে গায়ে দাঁড়াইয়া আছে। পিপাসায় উহাদের জ্ঞান নাই। জল দিলে বড়ই গোলমাল করে।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'তবে এ সাত আট দিন জল পর্য্যন্ত উহারা পায় নাই?'

গুরুদেব বলিলেন,—'পূর্বে দুই এক দিন অন্তর এক আধ কলসী জল দিলাম। কিন্তু জল দেখিলে তাহা পান করিবার নিমিত্ত বড়ই হুড়াহুড়ি করে। সে জন্য আর দিই না।'

খোঁয়াড়ের দিকে একটু নিরীক্ষণ করিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'এগুলি কি খাসি?'

গুরুদেব উত্তর করিলেন,—'খাসি! খাসি কোথায় পাইব! খাসির দাম দিবে কে? দুই পয়সা উপার্জন হইবে বলিয়া ব্যবসা করিতেছি। খাসির মাংস দিলে কি আর চলে!'

আমি বলিলাম,—'পাঠাও তো নয়!

গুরুদেব বলিলেন,—'পাঁঠা! তুমি পাগল! পাঁঠার দাম কত? লোককে দেখাইবার নিমিত্ত কেবল তিন চারিটা পাঁঠা রাখিয়াছি। বাকিগুলি পাঁঠী।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'পাঁঠী! স্ত্রী! স্ত্রী পশু না খাইতে নাই?'

গুরুদেব উত্তর করিলেন,—'আমি নিজে খাই না, আমি বিক্রয় করি। আমার শিষ্য যজমান আছে। মাছ-মাংস একেবারেই আমি খাই না। সকলেই জানে যে, গোলাক চক্রবর্তী নিষ্ঠাবান্ সদ্‌ব্রাহ্মণ। লেখা-পড়া জানি না, নিজের নামটিও সই করিতে পারি না, ঢেরা দিয়া সারি। তবুও দেখ, এই নিষ্ঠার জন্য তোমার বাপ মার কল্যানে সকলেই আমাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করে।'

আমাদের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় বাহিরে এক জন খরিদ্দার আসিয়া উপস্থিত হইল। ঠাকুর মহাশয় তাড়াতাড়ি বাহিরের গমন করিলেন। খরিদ্দারের সহিত তাঁহার কথা-বার্তায় আমি বুঝিতে পারিলাম যে, সে পাঁঠার মাংস ভিন্ন অন্য মাংস লইবে না; পাঁঠা তাহাকে দেখাইয়া তৎক্ষণাৎ কাটিয়া দিতে হইবে। তাহার একটিকে ঠাকুর মহাশয় অনেক কষ্টে বাহির করিয়া খরিদ্দারকে দেখাইলেন। ক্রেতার তাহা মনোনীত হইল। তাহার পর ঠাকুর মহাশয় সেই পাঁঠাকে বাটীর ভিতর আনিলেন। যে স্থানে আমি বসিয়াছিলাম, তাহার নিকটে দুইটি খোঁটা ভূমিতে প্রোথিত ছিল পাঁঠাকে ফেলিয়া ঠাকুর মহাশয় তাহাকে সেই খোঁটায় বাঁধিলেন। তাহার পর তাহার মুখদেশ নিজের পা দিয়া মাড়াইয়া জীয়ন্ত অবস্থাতেই মুণ্ডদিক হইতে ছাল ছাড়াইতে আরম্ভ করিলেন। পাঁঠার মুখ গুরুদেব মাড়াইয়া আছেন, সুতরাং সে চীৎকার করিয়া ডাকিতে পারিল না। কিন্তু তথাপি তাহার কণ্ঠ হইতে মাঝে মাঝে এরূপ বেদনাসূচক কাতরধ্বনি নির্গত হইতে লাগিল যে, তাহাতে আমার বুক যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তাহার পর তাহার চক্ষু দুইটি! আহা! আহা! সে চক্ষু দুইটির দুঃখ আক্ষেপ ও ভর্ৎসনাসূচক ভাব দেখিয়া আমি যেন জ্ঞান গোচরশূন্য হইয়া পড়িলাম। সে চক্ষু দুইটির ভাব এখনও মনে হইলে আমার শরীর রোমাঞ্চ হইয়া উঠে। আমি আর থাকিতে পারিলাম না। আমি বলিয়া উঠিলাম,—'ঠাকুর মহাশয়'! ঠাকুর মহাশয়! করেন কি? উহার গলাটা প্রথমে কাটিয়া ফেলুন। প্রথম উহাকে বধ করিয়া তাহার পর উহার চর্ম উত্তোলন করুন।'

ঠাকুর মহাশয় উত্তর করিলেন,—'চুপ! চুপ! বাহিরের লোক শুনিতে পাইবে। জীয়ন্ত

অবস্থায় ছাল ছাড়াইলে ঘোর যাতনায় ইহার শরীর ভিতরে ভিতরে অল্প অল্প কাঁপিতে থাকে। ঘন ঘন কম্পনে ইহার চর্মে এক প্রকার সরু সরু সুন্দর রেখা অঙ্কিত হইয়া যায়। এরূপ চর্ম দুই আনা অধিক মূল্যে বিক্রিত হয়। প্রথম বধ করিয়া তাহার পর ছাল ছাড়াইলে সে চামড়া দুই আনা কম মূল্যে বিক্রীত হয়। জীবন্ত অবস্থায় পাঁঠার ছাল ছাড়াইলে আমার দুই আনা পয়সা লাভ হয়। ব্যবসা করিতে আসিয়াছি, বাবা! দয়ামায়া করিতে গেলে আর ব্যবসা চলে না।' --ঠাকুর মহাশয় এইরূপ বলিতে লাগিলেন, আর ও দিকে তাঁহার হাত চলিতে লাগিল সিদ্ধহস্ত! শীঘ্রই অনেক চর্ম তিঁনি তুলিয়া ফেলিলেন । আর একবার আমি পাঁঠার চক্ষু দুইটির দিকে চাহিয়া দেখিলাম! সেই চক্ষু দুইটি যেন আমাকেও ভর্ৎসনা করিয়া বলিল,—আমি দুর্বল, আমি নিঃসহায়, এ ঘোর যাতনা তোমরা আমাকে দিলে, মাথার উপর ভগবান্ কি নাই!' আমি এ নিষ্ঠুর দৃশ্য আর দেখিতে পারিলাম না। তৎক্ষণাৎ সে স্থানে হইতে প্রস্থান করিলাম।

বাসায় প্রত্যাগমন করিয়া ভ্রাতাকে পুনর্বার আমি অনেক বুঝাইলাম ও তাহাকে দেশে লইয়া যাইতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু কিছুতেই সে আমার সহিত দেশে গমন করিল না। নিরাশ হইয়া পর দিন আমি একেলাই কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া যাত্রা করলাম। দেশে প্রত্যাগমন করিয়া কিছুদিন পরে শুলিলাম যে , যে দিন ঠাকুর মহাশয়ের সহিত আমার কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, ঠিক তাহার পরদিন পুনরায় যখন তিনি ঐরূপ চর্মোত্তোলন্ কার্যে প্রবৃত্ত ছিলেন সেই সময় পুলিশের লোক তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া ছিল। ইতিপূর্বে এই কাজের নিমিত্ত তাঁহার আরও তিনবার জরিমানা হইয়াছিল। সেজন্য এবার তাঁহার কিছু অধিক অর্থ দণ্ড হইল।

ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া কিছুদিন পরে গুরুদেব প্রত্যাগমন করিলেন। দেশে আসিয়া তিনি সকলের নিকট বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন যে, জীবন্ত ছাগলের চর্ম উত্তোলন বিষয়ে আমিই কলিকাতার পুলিসের নিকট সংবাদ দিয়াছিলাম, আমা হইতেই তাঁহার সর্বনাশ হইয়াছে। লোকের নিকট এইরূপ বলিয়া তিনি আমাকে অভিশাপ প্রদান করিতে লাগলেন। বলা বাহুল্য যে এ সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ ছিলাম। কিন্তু কেহই আমার কথা বিশ্বাস করিল না। সকলেই আমাকে ছি ছি করিতে লাগিল। সকলেই বলিল যে, যে লোক গুরুর সর্বনাশ করিতে পারে, তাহার মত পাষণ্ড আর জগতে নাই।

এই পর্যন্ত বলিয়া ঘনশ্যাম সে রাত্রি গল্প বন্ধ করিলেন। পরদিন পুনরায় তিনি সেই গল্প আরম্ভ করিলেন।

তৃতীয় রজনী – পায়ের বেড়ি

গড়গড়ি মহাশয় বলিতেছেন ঃ— টাকার জন্য ভ্রাতা আমাকে বার বার পত্র লিখিতে লাগিল। আমি দেখিলাম যে, ভ্রাতাকে কলিকাতায় থাকিতে দিলে তাহার ইহকাল পরকাল নষ্ট হইবে। সে নিমিত্ত আমি তাহার খরচের টাকা বন্ধ করিয়া দিলাম। ভ্রাতা প্রথম প্রথম আমাকে মান-সম্ভ্রমের সহিত পত্র লিখিত; তাহার পর ক্রমে ক্রমে তাহার তীব্র ভাব ধারণ

করিল। 'এক্ষণে সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে, পৈতৃক টাকা লইয়া সে যাহা ইচ্ছা তাহা করিবে, পৈতৃক টাকার হিসাব না দিলে সে আমার নামে নালিশ করিবে,—অবশেষে সে আমাকে এইভাবে পত্র লিখিতে লাগিল। এরূপ পত্রের আমি কোন উত্তর দিলাম না তাহার নিকট টাকাও পাঠাইলাম না। মনে করিলাম যে অর্থাভাবে নিশ্চয় তাহাকে দেশে আসিতে হইবে। তখন তাহার বিবাহ দিয়া তাহাকে আমি সংসারী করিব। এইরূপ ভাবিয়া আমি একটি সুপাত্রী স্থির করিয়া রাখিলাম।

কিছুদিন পরে কনিষ্ঠ দেশে প্রত্যাগমন করিল। বিবাহ করিবার নিমিত্ত আমি তাহাকে বার বার অনুরোধ করিলাম। কিন্তু আমার কথা সে কিছুতেই শুনিল না। টাকা কড়ি সম্বন্ধে ক্রমাগত সে আমার সহিত কলহ করিতে লাগিল। সে বালক থাকিতে পৈতৃক সম্পত্তির কিরূপ আয় ছিল, সে টাকা কিরূপে ব্যয় হইয়াছিল, সেই হিসাবের নিমিত্ত সে আমাকে ব্যতি-ব্যস্ত করিয়া তুলিল! এই সময় পৈতৃক সম্পত্তির আয় হইতে তাহার অংশের কিছু নগদ টাকা আমার নিকট জমা ছিল। আমি দেখিলাম যে, সে টাকা তাহার হাতে পড়িলে আর রক্ষা থাকিবে না। বিশেষতঃ দেশে আসিয়াই যত দুষ্ট লোকের সহিত তাহার সৌহৃদ্য হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, আমাদের গুরুদেবের প্রতি তাহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। এক দিন ভ্রাতাকে আমি বলিলাম,—'ওক্কুর! দেখ ভাই! আমার পুত্রকন্যা কিছুই নাই। পৃথিবীতে তোমা ভিন্ন স্নেহের বস্তু আমার আর কেহ নাই। পৈতৃক যাহা কিছু আছে, সে সমুদয় তোমার। তাহার পর, আমার শ্বশুরের যে সম্পত্তি আমার স্ত্রী পাইয়াছে, তাহাও পরে তোমার হইবে। পৈতৃক সম্পত্তির হিসাব এই মুহূর্তে আমি তোমাকে কড়ায়-গণ্ডায় দিতে পারি। কিন্তু ভাই! পাছে তুমি টাকা অপব্যয় কর ও পৈতৃক সম্পত্তি নষ্ট কর, সে জন্য এক্ষণে হিসাব দিতে আমি আপত্তি করিতেছি। তুমি বিবাহ কর। তোমার দুই একটি পুত্র-কন্যা হউক। তখন সমুদয় হিসাব তোমাকে আমি বুঝাইয়া দিব।'

বলা বাহুল্য যে, আমার সেরূপ কথায় ওক্কুর সন্তুষ্ট হইল না। আমার নামে সে নালিশ করিবে, এইরূপ ভয় দেখাইয়া তখন সে বাটী হইতে চলিয়া গেল। দুই চারি দিন সে আর বাটী আসিল না। এক দিন দুই প্রহরের সময় তাহার কতকগুলি বন্ধুর সহিত সে বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার বন্ধুগণকে সঙ্গে লইয়া সে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল ও আমার প্রতি নানারূপ কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়া সে বলিল,—'অন্য সম্পত্তি বিভাগের নিমিত্ত পরে আমি আদালতে নালিশ করিব! কিন্তু আমার অংশের যে নগদ তোমার নিকট আছে, তাহা এই মুহূর্তে তোমাকে দিতে হইবে। তাহা না দিলে তোমাকে আমি অপমান করিব।' —সেই মুহূর্তে আমি তাহার টাকা ফেলিয়া দিলাম। পিতার মৃত্যুর দিন হইতে হিসাব-পত্রও তাহাকে আমি দেখাইতে চাহিলাম। কিন্তু হিসাবের প্রতি সে কটাক্ষও করিল না। অনেকগুলি নগদ টাকা হাতে পাইয়া বন্ধুদিগের সহিত তৎক্ষণাৎ সে প্রস্থান করিল। সেই দিন আমি গৃহিণীকে বাঁকুড়া জিলায় তাঁহার পিত্রালয়ে আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণীর নিকট পাঠাইয়া দিলাম।

ইহার পর তিন চারি মাস কনিষ্ঠের আর দেখা নাই। লোকপরম্পরায় শুনিলাম যে টাকা পাইয়া দুই চারি জন বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া সে কলিকাতা গমন করিয়াছে।

এক দিন আমি নিকটস্থ একখানি গ্রামের প্রজার নিকট খাজনা আদায় করিতে গিয়াছিলাম। বাটী ফিরিয়া আসিতে আমার সন্ধ্যা হইয়াছিল। বৃহৎ একটি মাঠ দিয়া আমি আসিতেছি, এমন সময় মানুষের অতি মৃদু কাতর স্বর আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। সেই কাতর স্বর অনুসরণ করিয়া নিকটে গিয়া আমি দেখিলাম যে, মাঠের মাঝখানে এক গাছতলায় একটি লোক পড়িয়া আছে। আমি নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলে সে আমার নিকট একটু জল প্রার্থনা করিল। কিছুদূরে একটী পুষ্করিণী ছিল। পুষ্করিণীতে আমার চাদর ভিজাইয়া সেই জল আনিয়া আমি তাহাকে পান করাইলাম। লোকটির কথায় বুঝিতে পারিলাম যে, সে পশ্চিমদেশীয় খোট্টা। কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে সে আমাকে বলিল যে,—'তাহার নিবাস জৌনপুর জিলা। পত্নীর সহিত পদব্রজে সে জগন্নাথ গিয়াছিল। সে স্থান হইতে সে দেশে প্রত্যাগমন করিতেছিল। পথে বিসূচিকা রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া তাহাব পত্নীর পবলোক হয়। জগন্নাথেই তাহাদের টাকা ফুরাইয়া গিয়াছিল। ভিক্ষা করিয়া অতি কষ্টে তাহারা পথ পর্য্যটন করিতেছিল। যে পথে সচরাচর যাত্রী গমনাগমন করে, সে পথে লোকে বড় ভিক্ষা প্রদান করে না। সে জন্য এই গ্রাম্য-পথ অবলম্বন করিয়াছিল। সেইদিন প্রাতঃকালে এই মাঠ দিয়া যাইতে যাইতে সে ও সহসা বিসূচিকা রোগগ্রস্ত হইয়াছে। চলিবার শক্তি তাহার নাই। পিপাসায় তাহার ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে।''

বিদেশী লোকটির জন্য আমার মনে অতিশয় দুঃখ হইল। আমি দেখিলাম যে রোগে তাহার মৃত্যু না হউক, মাঠের মাঝখানে জীয়ন্ত অবস্থাতেই সেই রাত্রিতে তাহাকে শৃগাল-কুকুরে ছিঁড়িয়া খাইবে। তাহার পর সেই অনাথা নিঃসহায় ব্যক্তি পিপাসায় একটু জলের জন্য কতই না যন্ত্রণা ভোগ করিবে! সে অবস্থায় আমি তাহাকে ফেলিয়া যাইতে পারিলাম না। তাহাকে আমি বুকে তুলিয়া লইলাম। অতি কষ্টে আস্তে আস্তে আমার বাটীর দিকে অগ্রসর হইলাম। অনেক রাত্রিতে আমি বাটী আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বাহিরে একটি চালায় লোকটিকে রাখিয়া তাহার সেবা শুশ্রুষা করিতে লাগিলাম। আমাদের গ্রাম হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে এক হাতুড়ে ডাক্তার ছিলেন। তাঁহাকে আনিতে পাঠাইলাম। কিন্তু তিনি আমার ভ্রাতার ইয়ার। তিনি আসিলেন না। অন্য যাহা কিছু ঔষধ পাইলাম, লোকটিকে তাহাই সেবন করাইলাম। কিন্তু কোন ফল হইল না। দুই দিন পরে সেই অনাথ হিন্দুস্থানী আমার বাটীতে মৃত্যু মুখে পতিত হইল।

তাহার সৎকারের নিমিত্ত আমি প্রতিবাসীদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলাম। কিন্তু কেহই আসিলেন না। বরং গ্রামের সকল লোকেই আমার উপর খড়্গ হস্ত হইলেন। সকলে বলিলেন,—'সুবল উন্মাদ পাগল হইয়াছে। তাহা না হইলে বিসূচিকা রোগগ্রস্ত, অজ্ঞাত-কুলশীল, একটা খোট্টাকে বাটী আনিবে কেন? সে নিজে পাগল হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু গ্রামের ভিতর বিসূচিকা আনিয়া সে আমাদিগকে বিপদগ্রস্ত করে কেন?

গ্রামের লোক যে নিতান্ত অন্যায় কথা বলিল, তাহা নহে। বরং আমি নিজেই যে অন্যায় কাজ করিয়াছি, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু কি করিব! সেই অনাথ লোকটিকে সে অবস্থায় মাঠের মাঝখানে ফেলিয়া আসিতে পারি নাই।

আমার এক জন প্রজার একখানি গরুর গাড়ী ছিল। সেই গরুর গাড়ীতে মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া গিয়া আমি একলাই তাহাকে দাহ করিলাম।

পরদিন আমি এক জন প্রতিবাসীর গৃহে গমন করিয়াছিলাম। তিনি তামাক খাইয়া আমাকে বলিলেন,—'সুবল ভায়া! তামাক ছাড়িয়া দিয়াছ, না?'

ইহার অর্থ আমি বুঝিতে পারিলাম না। আমি বলিলাম,—'তামাক ছাড়িয়া দিব কেন?'

যাহা হউক, তিনি আমাকে হুঁকা দিলেন না, নিজেই ধূমপান করিয়া হুঁকাটি রাখিয়া দিলেন। তাহার পর তিনি বলিলেন,—'যে লোকটিকে তুমি বাটী আনিযাছিলে, যাহার শব তুমি দাহ করিয়াছ, সে কি জাতি তাহার কিছুই ঠিক নাই। এ কথা লইয়া গ্রামে ঘোরতর গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। অন্য লোক দূরে থাকুক, তোমাদের ঠাকুরমহাশয়ও তোমার বাটীতে আর জলগ্রহণ করিবেন না।' —ফল কথা, সেই দিন হইতে গ্রামে আমি একঘরে হইলাম। ক্রমে শুনিলাম যে, আমাদের ঠাকুর মহাশয়ের উদ্যোগেই সকলে আমাকে একঘরে করিয়াছেন। যাহা হউক, আমি চুপ করিয়া রহিলাম। গ্রামাবাসীদিগের সকলে আমাকে একঘরে করিয়াছেন। গ্রামবাসীদিগের বাটীতে গমনাগমন বন্ধ করিয়া দিলাম। আমার বাটীতেও কেহ আসিতেন না। সেই দিন হইতে আমি তামাক ছাড়িয়া দিলাম।

কিছুদিন পরে শুনিলাম যে, আমার ভ্রাতা দেশে আসিয়াছে। গ্রামে এক বন্ধুর বাটীতে সে অবস্থিতি করিতেছে। আরও শুনিলাম যে, পৈতৃক সম্পত্তি বিভাগের নিমিত্ত সে আদালতে নালিশ করিবে। আমার নিকট হইতে যে টাকা পাইয়াছিল, তাহা খরচ হইয়া গিয়াছে। মকদ্দমা-খরচের নিমিত্ত সে তাহার অংশ বন্ধক দিবে। এইরূপ কথা শুনিয়া আমি ভ্রাতার নিকট বলিয়া পাঠাইলাম যে,—'সম্পত্তি বিভাগের নিমিত্ত মকদ্দমা করিবার প্রয়োজন কি? গ্রামের দুই এক জন ভদ্রলোককে সে মধ্যস্থ মনোনীত করুক। তাঁহারা যেরূপ বিভাগ করিয়া দিবেন, আমি তাহাতেই সম্মত হইব। অথবা সে না হয়, নিজেই বিভাগ করুক। তাহার যেরূপ ইচ্ছা, সেইরূপ অংশ সে আমাকে প্রদান করুক। তাহাতে আমি কিছুমাত্র আপত্তি করিব না।'

ভ্রাতার নিকট হইতে আমার এ প্রস্তাবের কোনরূপ উত্তর পাইলাম না।

পাঁচ দিন পরে, এক দিন সন্ধ্যার সময় বাটীর ভিতর আমার ঘরে বসিয়া আমি পুস্তক পাঠ করিতেছিলাম। সহসা সাত আট জন লোকের সহিত আমার ভ্রাতা সেই ঘরে প্রবেশ করিল। ঘরে প্রবেশ করিয়াই তাহারা আমার হাত-পা বাঁধিয়া ফেলিল। আমি চীৎকার করিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কাপড় দিয়া তাহারা আমার মুখ বন্ধ করিয়া দিল। তারপর, আমাকে শয়ন করাইয়া তাহারা আমার মস্তক মুণ্ডন করিয়া দিল ও সেই মুণ্ডিত মস্তকে ও ঘাড়ে কাগজের মত কি বসাইয়া দিল। অবশেষে আমার পদদ্বয় তাহারা শৃঙ্খলে আবদ্ধ

করিল। কিছুক্ষণ পরে আমার মস্তক ঘাড় অতিশয় জ্বলিতে লাগিল। সে স্থানে হাত দিতে পারিলে আমার যাতনার অনেক শান্তি হইত। কিন্তু তাহারা আমার হাত বন্ধন করিয়া রাখিয়াছিল। শরীরের কোন স্থান চুলকাইতে অথবা কোন স্থানে বেদনা হইলে সে স্থানে হাত দিতে না পারিলে যে কি বিষম কষ্ট হয়, তাহা যে ভুগিয়াছে, সেই জানে। কিছুক্ষণ পরে আমার বোধ হইল যে, তাহারা আমার মস্তক ও ঘাড়ে বেলেস্তারা দিয়াছে, কারণ, সেই দুই স্থানে বড় বড় দুইটি ফোস্কা হইয়াছে বলিয়া আমার অনুভব হইল। রাত্রি দুই প্রহরের পর তাহারা আমার মুখ খুলিয়া দিল। তখন আমি আমার ভ্রাতাকে ডাকিলাম। ভ্রাতা ঘরের বাহিরে ছিল, কিন্তু আমার নিকট আসিল না। আমার প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহারের কারণ কি. তখন আমি আর সকলকে জিজ্ঞাসা করিলাম!

নিকটস্থ গ্রামের সেই যে হাতুড়ে ডাক্তারের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছিলাম, তিনি এই গুণ্ডাদের মধ্যে ছিলেন, আর তিনিই আমার মস্তক মুণ্ডন করিয়া ঘাড়ে ও মাথায় বেলেস্তারা দিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন,—'মহাশয়ের মস্তিষ্ক কিছু বিকৃত হইয়াছে। চিকিৎসার নিমিত্ত আপনার ভ্রাতা আমাকে আনিয়াছেন। ভয় নাই, আপনি আরোগ্য লাভ করিতে পারিবেন। তবে আপনার এই উন্মত্ততা কিছু গুরুতর। আরোগ্য লাভ করিতে কিছু বিলম্ব হইবে। এইরূপ উন্মত্ততার গুণ এই যে, উন্মাদের মনে মানুষ খুন করিতে প্রবৃত্তি জন্মে। সে জন্য মহাশয়কে বন্ধন করিয়া রাখিতে আমরা বাধ্য হইয়াছি। আমাদের অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আপনার মঙ্গলের নিমিত্ত আপনাকে আপাততঃ কিছু কষ্ট দিতে বাধ্য হইতেছি।'

আমি উত্তর করিলাম,—'আমি উন্মত্ত! আমি পাগল! আমার উপর এ অত্যাচার কেন? মা'র পেটের ভাই হইয়া জ্যেষ্ঠ সহোদরের উপর কেহ যে এরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে পারে, তাহা আমি স্বপ্নেও কখন ভাবি নাই। আর এ গ্রামের লোকই বা কিরূপ যে. তাহাদের সম্মুখে এরূপ ঘোরতর অত্যাচার হইতেছে, অথচ কেহ কিছু বলিতেছে না।'

ডাক্তার উত্তর করিলেন,—'যে পাগল হয়, সে নিজে বুঝিতে পারে না। অন্য লোককে সে পাগল মনে করে। আপনিও সেইরূপ মনে করিতেছেন। গ্রামেব আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই জানে যে, আপনিও পাগল। তা না হইলে গুরুর নামে কেহ পুলিসে নালিশ করে না, পাগল না হইলে ওলাউঠা রোগগ্রস্ত একটা সাঁওতালকে মাঠ হইতে ঘরে কেহ আনে না।'আমি দেখিলাম যে, বাক্য দ্বারা এ ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ করা বৃথা, তথাপি আমি বলিলাম,—আমার ভ্রাতাকে একবার ডাকিয়া দাও। আমাকে ছাড়িয়া দিতে বল। পৈতৃক সমুদয় সম্পত্তি কল্যই তাহাকে আমি লিখিয়া দেব। পৈতৃক সম্পত্তির এক কপর্দ্দকেও আমার প্রয়োজন নেই। তারপর কল্যই আমি এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া আমার শ্বশুরালয়ে গমন করিব।'

এইরূপ অনেক বিনয় করিয়া আমি বলিলাম, কিন্তু আমার ভ্রাতা আমার নিকটে আসিল না; কেহই আমাকে ছাড়িয়া দিল না। চীৎকার করিতে করিতে বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত আমি অনেক চেষ্টা করিলাম। কিন্তু তাহারা পুনরায় আমার মুখ বন্ধ করিয়া দিল, আর বলপূর্বক আমাকে ধরিয়া রহিল। সুতরাং আমাকে চুপ করিতে হইল। ডাক্তার

আমাকে বলিলেন,—'বৃথা আপনি চেষ্টা করিতেছেন, বৃথা গোলমাল করিতেছেন। গ্রামের সকলেই জানে যে আপনি পাগল হইয়াছেন। কেহই আপনার সাহায্য করিতে এ স্থানে আসিবে না। আপনি যদি স্থিরভাবে থাকিতে অঙ্গীকার করেন, তাহা হইলে আপনার মুখের কাপড় ও হাতের বন্ধন খুলিয়া দিতে পারি। কিন্তু এই উন্মত্ত অবস্থায় পাছে আপনি অন্য লোককে খুন করেন, সে জন্য পায়ে আপনার বেড়ি ও শৃঙ্খল থাকিবে।'

নিরুপায় হইয়া আমি সেইরূপ অঙ্গীকার করিলাম। তাহারা আমার মুখের কাপড় ও হাতের বন্ধন খুলিয়া দিল। ইহাতে আমি অনেকটা সুস্থ বোধ করিলাম। কিন্তু আমার মস্তক ও ঘাড় অতিশয় জ্বলিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে, ঘরে আমাকে চাবি দিয়া সকলে চলিয়া গেল। শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় ঘরের ভিতর একেলা বসিয়া আমি কত কি যে চিন্তা করিতে লাগিলাম, মনে কত যে দুঃখ হইল, তাহা আর আপনাদিগকে কি বলিব, আপনারাই তাহা ভাবিয়া দেখুন।

পরদিন প্রাতঃকালে প্রথমেই গুরুদেব আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আমার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া তিনি অতিশয় শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমার মাথায় তাঁহার পদধূলি দিয়া তিনি বলিলেন,—'আমি জানি যে, সজ্ঞান অবস্থান তুমি আমার সর্বনাশ কর নাই, পাগল অবস্থাতেই তাহা করিয়াছিলে। আর্শীবাদ করি, বাবা, তুমি শীঘ্রই আরোগ্য লাভ কর।'

গ্রামের আরও কয়েক জন লোক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। আমি উন্মত্ত হইয়াছি, সে জন্য অনেকেই দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শীঘ্র আমি আরোগ্য লাভ করিতে পারিব, সে আশ্বাসও অনেকে আমায় প্রদান করিলেন। ইহাদিগের মধ্যে যাঁহাদিগকে আমি সুহৃদ্ বলিয়া জানিতাম, তাঁহাদিগের নিকট আমি অনেক মিনতি করিয়া বলিলাম যে, আমি পাগল হই নাই, আমি সজ্ঞানেই আছি। কিন্তু কেহই আমার কথা বিশ্বাস করিলেন না। সকলেই বলিলেন যে, পাগল না হইলে কেহ গুরুর সর্বনাশ করে না, ওলাউঠা রোগগ্রস্ত সাঁওতালকে কেহ ঘরে আনে না। আমার অনেক কাকুতি-মিনতি বাক্যে এক জন কেবল আমার শ্বশুরালয়ে আমার গৃহিণীর নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। --দিনের বেলা আমার ভ্রাতার এক বন্ধু আমার আহারীয় দ্রব্য লইয়া আসিলেন। কিন্তু সেদিন আমি জল পর্য্যন্ত গ্রহণ করিলাম না। পাড়ার অনেক ছেলেও সে দিন আমাকে দেখিতে আসিল। কেহ বলিল,—'সুবল দাদা,' কেহ বলিল,—'সুবল কাকা, পাগল হইয়াছে, আয় ভাই দেখি।'

ঘরের তখন দ্বার বন্ধ ছিল। জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া তাহারা আমাকে দেখিতে লাগিল। আমি তখন মুখ বুজিয়া ছিলাম। তথাপি একটিছেলে বলিয়া উঠিল—ঈশ! এক বার দাঁত দেখ! ঠাকুর-মা বলিয়াছে যে, একবার ছাড়া পাইলে আর রক্ষা রাখিবে না, পাড়ার যত ছেলে ঐ লম্বা লম্বা দাঁত দিয়া ছিঁড়িয়া একেবারে খণ্ড খণ্ড করিয়া খাইয়া ফেলিবে।' এই বলিয়া তাহারা জানালা দিয়া ছোট ছোট ঢিল ছুড়িয়া আমাকে মারিতে

লাগিল। তাহার পর আমার উঠানের পেয়ারা গাছে উঠিয়া পেয়ারা খাইল। পেয়ারা গাছ হইতে আমার বাটীর এক কোণে দুই ঝাড় আখ দেখিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া খাইতে খাইতে চলিয়া গেল। —সন্ধ্যার পর সেই ডাক্তার ও আর তিন জন লোক পুনরায় আসিলেন। কিন্তু ভ্রাতা আমার নিকট আসিল না। একটি গেলাসে কিছু ঔষধ লইয়া ডাক্তারবাবু আমাকে তাহা খাইতে বলিলেন। আমি কিছুতেই খাইলাম না।

ডাক্তার বাবু বলিলেন,—'এ ডাক্তারি ঔষধ নহে, দেশী গাছ-গাছড়া। অনেক কষ্টে আমি ইহা যোগাড় করিয়াছি। এ ঔষধ সেবন করিলে সত্বর আপনি আরোগ্য লাভ করিতে পারিবেন।' —ঔষধ খাইতে আমি কিছুতেই সম্মত হইলাম না। আমাকে তিনি অনেক বুঝাইলেন, অনেক ভয় দেখাইলেন, কিন্তু ঔষুধ খাইতে কিছুতেই আমি স্বীকৃত হইলাম না। তখন ডাক্তার বাবু, তাঁহার সঙ্গিগণের সহায়তায় বলপূর্বক আমাকে শয়ন করাইয়া, আমার বুকে হাঁটু দিয়া সেই ঔষধু আমাকে সেবন করাইলেন। ইহার পর কি হইল, আর আমি ঠিক বলিতে পারি না। ঔষধ সেবন করিবামাত্র আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম।

চতুর্থ রজনী – যিনি ভূমিকম্প করেন

কত দিন এরূপ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলাম, তাহা আমি বলিতে পারি না। ক্রমে আমাব অল্প অল্প জ্ঞানের উদয় হইল। জ্ঞান হইবার পর এক দিন রাত্রিকালে আমি আমার ভ্রাতার ব্যবহার ও নিজের অবস্থা ভাবিতেছিলাম। আমার স্ত্রী ও শাশুড়ী ঠাকুরাণী আমার শোচনীয় অবস্থার সংবাদ পাইলেন কি না ও ভ্রাতার হাত হইতে তাঁহারা আমাকে উদ্ধার করিতে পারিবেন কি না, এইরূপ নানা চিন্তায় মন আমাব নিতান্ত কাতর হইতেছিল। এমন সময় ঘবের এক কোণ হইতে কে আমাকে ডাকিল,—'সুবল! সুবল!'

অনেক মিনতি করিয়া ডাক্তারের নিকট রাত্রিকালে আমি একটি আলোকের প্রার্থনা করিয়াছিলাম। ডাক্তার তাহাতে সম্মত হইয়াছিলেন। আমার ঘরে এক পার্শ্বে মিট্ মিট্ করিয়া একটি প্রদীপ জ্বলিতেছিল। 'সুবল! সুবল!' বলিয়া কে যখন আমাকে ডাকিল, তখন আমি চমকিয়া উঠিলাম। সে শব্দ শুনিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম যে, আমাকে যে ডাকিতেছে, সে ঘরেব ভিতরেই আছে। ঘরের এদিকে ওদিকে চারি দিকে আমি চাহিয়া দেখিলাম, কিন্তু ঘরের ভিতর কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। অবশেষে আমি মনে করিলাম যে, ভ্রমবশতঃ এইরূপ শব্দ শুনিয়াছি, প্রকৃত কেহ আমাকে ডাকে নাই। এইরূপ মনে করিয়া পুনরায় আমি আমার অবস্থার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। এমন সময় পুনরায় সেই শব্দ আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল।

পুনরায় কে যেন আমাকে ডাকিল,—'সুবল! সুবল!'

পুনরায় আমি চমকিয়া উঠিলাম। চমকিত হইবার আরও কারণ এই যে, এবার আমি সে কণ্ঠস্বর বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যাঁহার এ কণ্ঠস্বর বহুকাল পূর্বে তিনি ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। —পুনরায় সেই শব্দ হইল,—'সুবল! সুবল!'

আমি বলিলাম,—'কে আমাকে ডাকিতেছেন? আমি কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না।'

সেই স্বর বলিল,—'আমাকে দেখিতে পাইতেছ না কেন, এই যে আমি বসিয়া আছি।

আমি বলিলাম,—'কোথায়?' —স্বর উত্তর করিল,—'এই ঘরের কোণে।'

যে দিক্ হইতে শব্দ আসিতেছিল, সেই কোণের দিকে চাহিয়া আমি বলিলাম,—'ও কোণে তো কিছুই নাই, কেবল জলের কলসীটি রহিয়াছে।'

স্বর উত্তর করিল,—'আমি এই জলের কলস। এ জন্মে আমি জলের কলস হইয়াছি।'

আমি বলিলাম,—'আপনি জলের কলস হইয়াছেন। আপনি কে?'

স্বর উত্তর করিল,—'আমি সনাতন নস্কর আব জন্মে আমি তোমার প্রতিবেশী ছিলাম! আমাকে মনে নাই?' —সত্য বটে, সনাতন নস্কর নামে আমাদের এক বৃদ্ধ প্রতিবেশী ছিলেন। তিনি অতি সজ্জন ছিলেন। তাঁহাকে আমরা বিশেষরূপে মান্য করিতাম। আশ্চর্য হইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'আপনি নস্কর মহাশয়? এ জন্মে আপনি মেটে কলসী হইয়াছেন? মানুষ মরিয়া কলসী হয়?'

কলসী উত্তর করিলেন,—''মানুষ মরিয়া নানা রূপ হয়। সে রূপের সংখ্যা চৌরাশি হাজার।' - আমি বলিলাম,—'জীবিত অবস্থায় আপনি এক জন সাধু পুরুষ ছিলেন, তবে কেন আপনাকে সামান্য একটি মেটে কলস হইতে হইয়াছে?'

নস্কব মহাশয় অর্থাৎ কলসী উত্তর করিলেন,—''আমি তো তবু অনেক ভাল দ্রব্য হইয়াছি। জগবন্ধুকে জান? জগবন্ধুর মা মবিয়া সামান্য একখানি খুবি হইয়াছে।''

আমি বলিলাম,—'আমি শুনিয়াছি যে জীবাত্মাব ক্রমে ক্রমে উন্নতি হয়। কুম্ভকারের দ্রব্যে পরিণত হইলে জীবাত্মার উন্নতি কিরূপে হয়?'

নস্কর মহাশয় উত্তর করিলেন,—'জগবন্ধুব মা এখন খুরি হইয়া আছেন। আর জন্মে তিনি হয় তো একখানি সরা হইবেন। আর তার পরজন্মে হয তো তিনি একখানি তিজেল হইবেন, তার পর তোলো হাঁড়ি—এই রূপ ক্রমে ক্রমে তিনি উন্নতি লাভ করিবেন। আমি এখন কলস আছি। আর জন্মে আমি হয় তো পূজাব ঘট হইব। তাহার পর হয় তো পিতলের ঘড়া হইব। কিন্তু আমি আর অধিক বকিতে পারি না। আমার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। পিপাসায় বড় কাতর হইয়াছি। তোমার উপর যে সমুদয় অত্যাচার হইয়াছে, কয় দিন তাহা এই কোণে বসিয়া সমস্ত দেখিয়াছি। তোমার পিতার পুত্র যে এমন কুলাঙ্গার হইবে, স্বপ্নেও তাহা কখন আমি ভাবি নাই। কয় দিন এক ছটাক জলও কেহ আমাকে প্রদান করে নাই। শুষ্ক হইয়া আমি ঢন্ ঢন্ করিতেছি।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'এক্ষণে কি করিতে আপনি আমাকে আজ্ঞা করেন?'

নস্কর মহাশয় বলিলেন—'প্রথমে আমাকে লইয়া বাহিরে চল। তাহার পর পুষ্করিণী হইতে আমাকে জলে পূর্ণ করিয়া আমার পিপাসা নিবারণ কর। তাহার পর, আমি এই পৃথিবীতে আর থাকিতে ইচ্ছা করি না। কলিকাতায় লইয়া আমাকে গঙ্গাজলে নিক্ষেপ কর।' —আমি বলিলাম,—'ওকুর ও তাহার বন্ধুগণ পায়ে বেড়ি দিয়া আমাকে লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিযাছে। কি করিয়া আমি আপনাকে বাহিরে লইয়া যাইব?'

নস্কর মহাশয় উত্তর করিলেন,—"তোমার পায়ের দিকে চাহিয়া দেখ।"

আমি আমার পায়ের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। আশ্চর্য্য! এতক্ষণ আমি কিছুই জানিতে পারি নাই; আমার পায়ে বেড়ি নাই, আমার পায়ে শৃঙ্খল নাই।

অদ্ভুত মানিয়া সেই কলসীতে লক্ষ্য করিয়া নস্কর মহাশয়কে আমি নমস্কার করিলাম। কিন্তু পুনরায় আমার মনে আর এটি সন্দেহ উপস্থিত হল। আমি বলিলাম,—'সত্য বটে, আমার পদদ্বয় মুক্ত হইয়াছে, কিন্তু ঘরের দ্বারে বাহিরে তাহারা কুলুপ দিয়া গিয়াছে। ঘর হইতে কি করিয়া আমি বাহির হইব?'

নস্কর মহাশয় বলিলেন,—'দ্বারা খুলিয়া দেখ।'

শয্যা হইতে আস্তে আস্তে উঠিয়া আমি কপাট টানিয়া দেখিলাম। ঘরের দ্বার স্বচ্ছন্দে খুলিয়া গেল। আরও আশ্চর্য হইয়া নস্কর মহাশয়কে আমি বার বার নমস্কার করিলাম।

কলসী পুনরায় আমাকে বলিলেন,—'সুবল! আর তোমার এ স্থানে থাকা উচিত নহে। তোমার ভ্রাতা কুলাঙ্গার, না করিতে পারে এমন কাজ নাই। তোমার প্রতি সে যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে, তাহার দণ্ড সে শীঘ্রই পাইবে। এক্ষণে আমি তৃষ্ণায় বড় কাতর হইয়াছি। পুষ্করিণীতে লইয়া শীঘ্র আমাকে জলে পূর্ণ কর। তাহার পর কলিকাতায় লইয়া গিয়া শীঘ্র আমাকে মা গঙ্গার নির্মল পবিত্র সলিলে নিক্ষেপ কর। পৃথিবীতে আর আমি থাকিতে ইচ্ছা করি না। আহা! জগবন্ধুর মা, যিনি খুরি হইয়া কাল যাপন করিতেছেন, তাঁহাকেও সঙ্গে লইতে পারিলে ভাল হইত। কিন্তু তাঁহার কপালে নাই, কপাল থাকিলে এই উদ্যোগে পরজন্মে তিনি সরাকুপ লাভ করিতে পারিতেন। তাহার পর অনায়াসে তিনি মালসা হইতে পারিতেন।'

পুনরায় বিছানার নিকট আসিয়া, ঘরের যে স্থানে আমার বাক্সটি থাকিত, সেই দিকে আমি চাহিয়া দেখিলাম। সে স্থানে আমার বাক্স নাই। বুঝিতে আর বাকি রহিল না। বাক্সটি ভ্রাতা লইয়া গিয়াছেন। পথ-খরচের জন্য আমি কি করিব, এখন সেই ভাবনা আমার মনে উদয় হইল। কিন্তু নস্কর মহাশয়ের কি আশ্চর্য মহিমা। এইসময় ঘরের আর এক কোণে এক প্রকার খড় খড় শব্দ হইতে লাগিল। সেই দিকে দৃষ্টি করিয়া আমি দেখিতে পাইলাম যে, কি একটি গোলাকার দ্রব্য ইঁদুরে টানিয়া গর্ত্তের ভিতর লইতে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু গর্ত্তটির মুখ সঙ্কীর্ণ, যে জন্য গোলাকার দ্রব্যটি গর্ত্তের ভিতর সহজে প্রবিষ্ট হইতেছে না। তাড়াতাড়ি নিকটে গিয়া আমি দেখিলাম যে, সে দ্রব্যটি আমাদের ঘরের লক্ষ্মী, বেত-নির্ম্মিত পোয়া, শালগ্রামের সহিত যাঁহাকে পূজা না করিয়া কখনও আমি জলগ্রহণ করিতাম না। আজ তাঁহার এই দুর্দ্দশা দেখিয়া হৃদয় আমার বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। আমি মনে মনে ভাবিলাম,—"মা! তবে সত্য সত্যই তুমি এ পাপ সংসার পরিত্যাগ করিয়াছ!"

মনে মনে আমি এইরূপ খেদ করিতেছি, এমন সময় ঘরের অন্য কোণ হইতে নস্কর মহাশয় বলিয়া উঠিলেন,—"সুবল! লক্ষ্মীর ভিতর যে মোহরটি আছে, তাহা বাহির করিয়া লও। এ বিপদের সময় তাহা লইতে দোষ নাই। ইহাতে তোমার পথ-খরচ হইবে।"

এইরূপে আদিষ্ট হইয়া পোয়ার ভিতর হইতে মোহরটি বাহির করিয়া লইলাম। তাহার পর অন্য কোণ হইতে মৃন্ময় কলসরূপধারী নস্কর মহাশয়কে অতি ভক্তিভাবে তুলিয়া লইলাম। ধীরে ধীরে বাটী হইতে বাহির হইলাম। প্রথমেই বৃহৎ একটি সরোবরে গিয়া সুশীতল বারি দ্বারা কলসটি পূর্ণ করিলাম। নস্কর মহাশয়কে এইরূপে পরিতৃপ্ত করিয়া পূর্ণ কলসটি স্কন্ধে লইয়া আমি কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলাম।।

যথা সময়ে কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া অতি ভক্তিভাবে কলসটি আমি গঙ্গাজলে সমর্পণ করিলাম তাহার পর যথাশক্তি নস্কর মহাশয়ের শ্রাদ্ধ করিলাম।

শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া, আমি কোথায় যাই, কি করি, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। অবশেষে বাঁকুড়ায় শ্বশুরালয়ে গমন করাই স্থির করিলাম!

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আমি ক্রমে গড়ের মাঠে গিয়া উপস্থিত হইলাম সে স্থানে নির্জ্জন একটি বৃক্ষতলে বসিয়া নিজের অবস্থার কথা ভাবিতে লাগিলাম। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া গেল। পথে এক একটি গ্যাসের লণ্ঠন জ্বলিয়া উঠিল। আকাশে এক একটি করিয়া নক্ষত্র উদিত হইল। সাহেব ও মেমদিগের গাড়ীর আলোক আকাশভ্রষ্ট নক্ষত্রের ন্যায় দ্রুতবেগে ছুটিতে লাগিল। —এই সময় সহসা এক বৃদ্ধ আমার নয়নগোচর হইলেন। আমার নিকট হইতে প্রায় দশ হাত দূরে বসিয়া ছিলেন। এত দুরে তিনি বসিয়া ছিলেন, তথাপি তাঁহার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ আমি শুনিতে পাইতেছিলাম। দ্রুতবেগে অতি কষ্টে শ্বাস-প্রশ্বাস কার্য্য সাধিত হইলে যেরূপ শব্দ হয়, তাঁহার নাসারন্ধ্র হইতে সেইরূপ শব্দ নির্গত হইতেছিল। বৃদ্ধের যাতনা দেখিয়া আমার মনে দুঃখ হইল।

আমি তাঁহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"মহাশয়ের কি হাঁপানি রোগ আছে? নিশ্বাস ফেলিতে কি আপনার বড় কষ্ট হইতেছে?"

কিছু রুক্ষভাবে তিনি উত্তর করিলেন,—"হাঁপানি রোগ থাকিবে কেন? আমি অতিশয় শ্রান্ত হইয়াছি, সেই জন্য এত দ্রুতবেগে নিশ্বাস-প্রশ্বাস প্রবাহিত হইতেছে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,— "দ্রুতবেগে দৌড়িয়া আসিয়াছেন?এ বয়সে দৌড়াদৌড়ি করা উচিৎ নয়।" —বৃদ্ধা উত্তর করিলেন,— "তোমাদের মত দৌড়িয়া আমাকে পথ চলিতে হয় না। আকাশপথে আমি ভ্রমণ করি! এই মাত্র জাপান হইতে আসিতেছি।"

তাঁহার কথায় আমার প্রত্যয় হইল না। মানুষ হইয়া শূন্যপথে কেহ কি ভ্রমণ করিতে পারে! না, জাপান হইতে এক মুহূর্ত্তে কেহ ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে। আমি মনে করিলাম, লোকটা পাগল।

তথাপি আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"জাপানে, মহাশয় কি জন্য গিয়াছিলেন?"

বৃদ্ধ উত্তর করিলেন,—"সে স্থানে আমি ভূমিকম্প করিতে গিয়াছিলাম। পৃথিবীতে যত ভূমিকম্প হয়, সে সমুদয় ভূমিকম্প আমিই করিয়া থাকি। ভূমিকম্প করিয়া আমি জীবিকা নির্ব্বাহ করি।"

আমি ঘোরতর আশ্চর্য্য হইলাম। মানুষে যে আবার ভূমিকম্প করে, ভূমিকম্প করা

যে আবার মানুষের একটা ব্যবসা, এ কথা আমি পূর্ব্বে কখন শুনি নাই। এখন আমার নিশ্চয় বিশ্বাস হইল যে, লোকটা বদ্ধ পাগল।

তথাপি পুনরায় আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'পিতা-মাতার নিকট আমি শুনিয়াছি যে, সহস্রফনা বাসুকি পৃথিবী বহন করিয়া আছেন। একটি মস্তক শ্রান্ত হইলে, যখন তাহা পরিবর্ত্তিত করিয়া অন্য মস্তকে তিনি পৃথিবী গ্রহণ করেন, তখনই পৃথিবী কম্পিত হয়, আর তাহাকেই লোকে ভূমি-কম্প বলে। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আপনার কথা কিরূপে আমি বিশ্বাস করিতে পারি?'

বৃদ্ধ উত্তর করিলেন,— 'সে সব গাল-গল্প। বাসুকিকে আর ভূমি-কম্প করিতে হয় না! বাসুকির মস্তক-পরিবর্ত্তনে যদি ভূমিকম্প হইত, তাহা হইলে এককালে সমস্ত পৃথিবী কম্পিত হইত। এইমাত্র আমি জাপানে বৃহৎ একটি ভূমিকম্প করিয়া আসিতেছি, কিন্তু দেখ, সে ভূমি-কম্প কলিকাতায় হয় নাই।'

আমি উত্তর করিলাম;—'সত্য বটে, বাসুকি দ্বারা ভূমিকম্প হইলে এককালে পৃথিবীতে হইত। কিন্তু তথাপি, মহাশয় যে ভূমিকম্প করেন, তাহাও আমার বিশ্বাস হয় না।'

বৃদ্ধ উত্তর করিলেন,—প্রত্যক্ষ যদি দেখিতে পাও, তাহা হইলে তো বিশ্বাস করিবে? যদি তোমার প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তে সামান্য একটু ভূমিকম্প করিয়া তোমাকে আমি দেখাইতে পারি। কিন্তু দেখ ইহাই আমার উপজীবীকা। সে ভূমিকম্পের মূল্য তোমাকে দিতে হইবে।'

আমি বলিলাম,—আচ্ছা, এক টাকার ভূমি-কম্প আমি ক্রয় করিতে পারি।'

এই কথা বলিয়া,—'পকেট হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া আমি তাঁহার হাতে দিলাম।'

টাকাটি পাইয়া বৃদ্ধ ভূমির উপর ফুৎকার করিলেন। তৎক্ষণাৎ বহুদূর পর্য্যন্ত নিকটের ভূমি কাঁপিয়া উঠিল, আর নিকটস্থ বৃক্ষসমূহ হেলিতে দুলিতে লাগিল। তাহার উপর সে সমুদয় কাক বসিয়া ছিল, বৃক্ষ পরিত্যাগ করিয়া তাহারা উড়িতে লাগিল। সভয়ে কা কা রবে তাহারা চারি দিক্ পূর্ণ করিল। আমিও ঘোরতর শঙ্কিত হইলাম। কিন্তু চিন্তা করিবার, কি ভয় করিবার আমি আর সময় পাইলাম না। নিম্নদিক্ হইতে মুখ তুলিয়া বৃদ্ধ আমার শরীরে একটু ফুঁ দিল। তৎক্ষণাৎ আকশপথে নক্ষত্র বেগে আমার শরীর ধাবিত হইল। প্রাণের আশ আমি একেবারে পরিত্যাগ করিলাম। ভয়ে আমি জ্ঞান-গোচর-শূন্য হইয়া পড়িলাম। সামান্য একটু যা জ্ঞান ছিল, তাহার সহায়তায় আমি ভাবিলাম যে, পৃথিবীর উপর পড়িলেই আমার দেহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে, আর তৎক্ষণাৎ আমার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া যাইবে।

হু হু শব্দে আমি নিম্নে পতিত হইতে লাগিলাম। ভূমিতে পড়িতে আর অধিক বিলম্ব নাই। ঝড়ের ন্যায় শোঁ শোঁ শব্দে বায়ু আমার কানের কাছ দিয়া উপরদিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল। চৌরঙ্গির উচ্চ উচ্চ অট্টালিকা ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। গাছপালা ক্রমেই

স্পষ্টরূপে আমার নয়নগোচর হইতে লাগিল। আর বিলম্ব নাই। এইবার সবলে ভূমির উপর পতিত হইব, ইহলীলা এইবার শেষ হইবে। এমন সময় সহসা আমার হাতে কি ঠেকিয়া গেল। প্রাণপণ যত্নে তাহা আমি ধরিয়া ফেলিলাম। চক্ষু চাহিয়া দেখিলাম যে, তাহা এক গির্জ্জার চূড়া। কলিকাতার দক্ষিণে যে কাথিড্রাল নামক গির্জ্জা আছে, নৈবেদ্যের উর্দ্ধে-দেশের ন্যায় যাহার শিখর-দেশ সূক্ষ্ম হইয়া আকাশ অভিমূখে উত্থিত হইয়াছে, ইহা সেই গির্জ্জার চূড়া।

পঞ্চম রজনী —সাগর-বক্ষে

প্রাণপণে যত্নে সেই গির্জ্জার চূড়া আমি ধরিয়া রহিলাম। আপততঃ অল্পক্ষণের নিমিত্ত আমাব প্রাণ বাঁচিয়া গেল বটে, কিন্তু আমি সুস্থির থাকিতে পারিলাম না। সেই সময় বায়ু সবলে প্রবাহিত হইতেছিল। বায়ুবলে গির্জ্জার চূড়াকে প্রদক্ষিণ করিয়া আমার দেহ দ্রুতবেগে ঘুরিতে লাগিল। বায়ুর গতি নির্দ্দেশ করিবাব নিমিত্ত কেহ কেহ ছাদের উপর উচ্চ স্থানে যে যন্ত্র স্থাপিত করেন, সেই যন্ত্রের ন্যায় গির্জ্জার চূড়াকে বেষ্টন করিয়া আমি ক্রমাগত ঘুরিতে লাগিলাম।

সে রাত্রি এই ভাবে কাটিয়া গেল। পর দিন প্রাতঃকালে গির্জার নিম্নে দুই একটি লোককে আমি দেখিতে পাইলাম। উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া আমি তাহাদিগকে ডাকিতে লাগিলাম। কিন্তু আমার চীৎকার কেহই শুনিতে পাইল না, কেহই দেখিতে পাইল না। সমস্ত দিন আমি বায়ুবলে সেইরূপ চক্রবৎ ঘুরিতে লাগিলাম। মাঝে মাঝে সমস্ত দিন চীৎকার করিলাম। কিন্তু প্রাণ বাঁচাইবার নিমিত্ত আমার সমুদয় চেষ্টা বিফল হইল। গির্জার সেই চূড়া অনুসরণ করিয়া কতবার নিম্নে অবতরণ কবিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তাহাতেও আমি কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। এইরূপে চারিদিন ও পাঁচ রাত্রি কাটিয়া গেল। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় আমার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল। কখন আমাকে সেই আশ্রয়স্থান ছাড়িয়া দিতে হয়, জ্ঞানশূন্য হইয়া কখন আমি ভূতলে পতিত হই, এখন কেবল সেই চিন্তা মনে উদিত হইতে লাগিল। কিন্তু বলিতে আমার লজ্জা হয়, জীবনধারণের নিমিত্ত এই সময় আমি একটি উপায় আবিষ্কার করিলাম। সে উপায়টি অতি ঘৃণিত। কিন্তু কি করিব! এরূপ অবস্থায় পড়িলে মানুষের ভাল-মন্দ বিচার থাকে না।

মহাদেব বাবুকে লক্ষ্য করিয়া ঘনশ্যাম বলিলেন, 'আড্ডাধারী মহাশয়! আমরা দেখিলাম যে, গড়গড়ি মহাশয় সেই জীবনধারণের উপায় গোপন করিতেছেন। সে নিমিত্ত তাঁহাকে আমরা নানারূপ প্রবোধ বচনে উৎসাহিত করিলাম। আমাদের প্রবোধ বাক্যে আশ্বাসিত হইয়া গড়গড়ি মহাশয় পুনরায় তাঁহারা গল্প আরম্ভ করিলেন।'

এই কলিকাতা সহরে অসংখ্য কাক আছে। সকল স্থানেই তাহা উপবিষ্ট হয়। গির্জার মাথায় কয়দিন আমাকে ঘূর্ণিত হইতে দেখিয়া কাকেরা মনে করিল যে, বস্তুটা মানুষ নহে, বায়ুর গতিনির্দ্দেশ করিবার নিমিত্ত কোনরূপ একটা যন্ত্র। সাহেবেরা এই যন্ত্র এরূপ উচ্চ স্থানে সংস্থাপিত করিয়াছে। এইরূপ মনে করিয়া কাকেরা নির্ভয়ে আমার মস্তকে বসিতে

আরম্ভ করিল। সেই কাক ধরিয়া আমি ভক্ষণ করিতে লাগিলাম! এরূপ স্থানে রন্ধন করিবার সুযোগ ছিল না।; সুতরাং কাকগুলিকে কাঁচা অবস্থাতেই ভক্ষণ করিতে হইল। গির্জার মাথায় এইরূপে আমি দিনাতিপাত করিতে লাগিলাম!

কিন্তু এরূপ ঘূর্ণায়মান অবস্থায় গির্জার শিখর দেশে মানুষ চিরজীবন অতিবাহিত করিতে পারে না। কিরূপে এই ঘোর বিপদ হইতে মুক্ত হইব, সর্বদাই সেই চিন্তা করিতে লাগিলাম। চিন্তা করিতে করিতে বেলুনের কথা আমার স্মরণ হইল। বেলুনের সহায়তায় মানুষ আকাশে উড্ডিয়মান হয়। তাহার পর পারাচুট, অর্থাৎ বৃহৎ একটি ছাতার সহায়তায় মানুষ অনেক উচ্চ স্থান হইতে পৃথিবীত অবতরণ করেন। আমি মনে করিলাম যে, সেই উপায়ে আমিও আপনাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিব!

যে দিন হইতে আমি গির্জার মাথায় ঘুরিতে ছিলাম, সেই দিন হইতে অনেক কাটা ঘুঁড়ি আমার নিকট দিয়া যাইতে দেখিয়াছিলাম। প্রতিদিন অনেকগুলি কাটা ঘুঁড়ির সূতাও আমার গায়ে ও গির্জার মাথায় লাগিয়া যাইতেছিল। এখন হইতে আমি সেই ঘুঁড়িগুলি ধরিতে লাগিলাম। এইরূপে প্রায় দুইশত ঘুঁড়ি সংগ্রহ করিলাম। তাহাদের সূতা একত্রিত করিয়া মোটা রজ্জুর ন্যায় করিলাম।

তাহার সহিত আমার চাদরখানিও যোগ করিলাম। সেই দুই শত ঘুঁড়ি পৃথক পৃথক রাখিলাম বটে, কিন্তু সকলকেই সেই রজ্জু ও চাদরে সংযুক্ত করিলাম। এইরূপ আয়োজন করিয়া যে দিন বায়ু প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছিল, সেই দিন আমি ঘুঁড়ি ছাড়িয়া দিলাম। সেই রজ্জু ও চাদর আমার শরীরে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়াছিলাম। বায়ুভরে আকাশপথে চলিতে লাগিল, দড়ি ধরিয়া আমি তাহার নীচে ঝুলিতে লাগিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ ঘুঁড়িগুলি মাটীর দিকে নামিল না, আকাশের উপর উঠিতে লাগিল। ইহার কারণ এই যে, ঘুঁড়ি অনেকগুলি ছিল, বায়ু অধিক প্রবল ছিল, আর মনোদুঃখে ও ভালরূপ আহার অভাবে আমার শরীর শীর্ণ শুষ্ক ও লঘু হইয়া গিয়াছিল।

হু হু শব্দে আমি আকাশে উঠিতে লাগিলাম। মেঘরাশি পার হইয়া অসীম আকাশের নিবিড় নীল প্রান্তরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল, আকাশে তখন সূর্য্য, কি চন্দ্র আমার মাথায় লাগিয়া গেলে বড়ই বিপদ ঘটিত। কিন্তু আকাশের উপর নক্ষত্র বিজ্ বিজ্ করিতেছিল। পাছে নক্ষত্র আমার চক্ষুতে লাগিয়া যায়, সে জন্য আমাকে বড়ই সতর্ক হইতে হইল। যত দূর সাধ্য অতি সাবধানে নক্ষত্রের নিকট দিয়া ঘুঁড়িগুলি চালাইতে লাগিলাম।

তথাপি হঠাৎ একটি নক্ষত্রের গায়ে আমার ঘুঁড়িগুলি লাগিয়া গেল। আকাশ-পটে নক্ষত্রগণ চুম্‌কির ন্যায় পোতা থাকে। নীচে হইতে তাহাদের স্থূল গোড়াগুলি আমরা দেখিতে পাই। কোন কোন পুরাতন পেরেকের ন্যায় নক্ষত্রের গোড়া আলগা হইয়া গিয়াছে। খোঁচার ন্যায় তাহারা উঠিয়া আছে।

এইরূপ একটা নক্ষত্রের গায়ে আমার ঘুঁড়ি লাগিয়া গেল। নক্ষত্রটি তৎক্ষণাৎ আকাশ-

পট হইতে খসিয়া পড়িল। সেই সঙ্গে আমার পঞ্চাশখানি ঘুঁড়ি ছিঁড়িয়া গেল। প্রথম আমার বড় ভয় হইয়াছিল, সেই জন্য তাঁহারা নীচে নামে নাই, আমাকে লইয়া উপরে উঠিয়াছিল। একে একে ঘুঁড়িগুলিকে আমি কাটিয়া দিতে আরম্ভ করিলাম। ঘুঁড়ির সংখ্যা যতই অল্প হইতে লাগিল, ততই আমি নীচে নামিতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণ পরে এক প্রকার কোলাহল শব্দ আমার কর্ণগোচর হইল। তখন ঘোর রাত্রি, নিবিড় অন্ধকার। নিম্নদিকে চাহিয়া দেখিলাম। কিছুই দেখিতে পাইলাম না, কিসের কোলাহল কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আরও নীচে নামিলাম। সর্বনাশ! সুন্দরবন পার হইয়া আমি সমুদ্রের মাঝখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।

কিসের কোলাহল, এখন বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু আর উপায় নাই। সমুদয় ঘুঁড়ি প্রায় কাটিয়া দিয়াছি, পুনরায় উপরে উঠিবার আর উপায় নাই। ফল কথা, অবিলম্বে ঝপ করিয়া আমি সমুদ্রের জলে পড়িলাম। পর্বত সমান তরঙ্গ আমাকে একবার আকাশে তুলিতে লাগিল, একবার পাতালে নামাইতে লাগিল। নাকে মুখে আমার জল প্রবেশ করিতে লাগিল। ভয়ানক লোনা জল! ভাগ্যে আমি সাঁতার জানিতাম, তাই জলের উপর ভাসিয়া থাকিতে পারিলাম। কিন্তু সমুদ্রের পর্বত সমান ভীষণ তরঙ্গের ভিতর পড়িয়া মানুষ কতক্ষণ বাঁচিয়া থাকিতে পারে! গ্রামের আশা আমি একেবারে ছাড়িয়া দিলাম। মনে মনে আমি ঠাকুরদের নাম করিতে লাগিলাম।

হাত-পা শিথিল হইয়া কখন জলমগ্ন হই, সেই প্রতীক্ষা করিতেছি, এমন সময় নিকটে বৃহৎ একটি ঝিনুক দেখিতে পাইলাম। আপনারা পুষ্করিণীতে যে ঝিনুক দেখিয়াছেন, এ সেরূপ নহে, এ সমুদ্রের ঝিনকু, বৃহৎ একখানি মানোয়ারি জাহাজের মত। ঝিনুকটি হাঁ করিয়া সমুদ্র জল পান করিতেছিল। আমি মনে করিলাম, ঝিনুকটির ভিতর গিয়া কিছুকাল বিশ্রাম করি।

এইরূপ মনে করিয়া আমি তাহার মুখের ভিতর প্রবেশ করিলাম। কিন্তু যে তাহার ভিতর গিয়াছি, আর ঝিনুক তৎক্ষণাৎ তাহার খোলা দুইখানি বন্ধ করিয়া দিল। যাহা হউক, পূর্বেই বলিয়াছি যে, ঝিনুকটি বৃহৎ মানোয়ারি জাহাজের মত বড়। সেজন্য তাহার বিতর বায়ুর অভাব ছিল না, নিশ্বাস প্রশ্বাস কার্য্যে আমার কোন ক্লেশ হয় নাই। ঝিনুকের পেটের ভিতর তাহার নাড়ীর এক অংশ বালিশ করিয়া আমি শয়ন করিলাম। গির্জ্জার চূড়ায় ঘূর্ণায়মান অবস্তায় অনেক দিন আমি নিদ্রা যাইতে পারি নাই। ঝিনুকের ভিতর আজ যেমন শয়ন করিলাম, তেমনি নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম।

জীয়ন্ত সামুদ্রিক ঝিনুকের ভিতর শয়ন করিয়া কয় দিবস আমি নিদ্রা গিয়াছিলাম, তাহা ঠিক বলিতে পারি না। বোধ হয়, তিন চারি দিন একাদিক্রমে নিদ্রা গিয়া থাকিব। নিদ্রা হইতে উঠিয়া ক্ষুধায় আমি কাতর হইলাম। ঝিনুকের উদরটি নিতান্ত তমসমাচ্ছন্ন ছিল না; কারণ, ইহার পেটের জালার ন্যায় বৃহৎ একটি মুক্তা ছিল। সেই মুক্তার আলোকে ঝিনুকের উদরদেশ আলোকিত ছিল। ইতিপর্বে ঝিনুক মাংসের আমিষ গন্ধ আমার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ

করিয়াছিল। এক্ষণে হাত দিয়া দেখিলাম যে, ঝিনুকটি বৃহৎ বটে, কিন্তু তাহার মাংস নিতান্ত কঠিন নহে। কাকের মাংস ভক্ষণে কাঁচা মাংসের প্রতি আমার বিতৃষ্ণা দূর হইয়াছিল; সুতরাং জঠরের জ্বালায় আমি এইবার ঝিনুকের কাঁচা মাংস খাইতে আরম্ভ করিলাম। কথার আছে যে, এমন কাজ নাই যাহা ক্ষুধার্থ ব্যক্তি না করিতে পারে।

ঝিনুকের উদরে থাকিয়া তিন মাস কাল তাহারই মাংস ভক্ষণ করিয়া আমি জীবন ধারণ করিলাম । তিন মাস পরে সে মাংস নিঃশেষ হইয়া গেল। এখন হইতে কি খাইয়া প্রাণ-ধারণ করিব, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। তাহার মাংস ভক্ষণে ঝিনুকটি কিছু দিন পূর্বে মরিয়া গিয়াছিল। সে জন্য শেষ কালের মাংসে কিছু দুর্গন্ধও হইয়াছিল। দুই দিন উপবাসী থাকিয়া বাহির হইবার চেষ্টায় ভিতর হইতে ঝিনুকের খোলা ধরিয়া আমি টানা-টানি করিতে লাগিলাম।

আমার টানা-টানিতে সহসা বজ্র পাতের ন্যায় শব্দ হইয়া ঝিনুকটি দুই খণ্ড হইয়া গেল। এক এক খণ্ড এক এখখানি জাহাজের ন্যায় সমুদ্রের উপর ভাসিতে লাগিল। যে খণ্ডের উপর আমি ছিলাম, তাহাতে সে জালা সদৃশ মুক্তাটি ছিল না। অপর খণ্ড, যাহাতে মুক্তাটি ছিল, তাহা কিছু দূরে ভাসিতেছিল। আমি ভাবিলাম যে, যেমন করিয়া হউক, মুক্তাটি আমায় দেশে লইয়া যাইতে হইবে। এত বড় মুক্তা কেহ কখন দেখে নাই, ইহার মূল্য সাত রাজার ধন, ইহা বিক্রয় করিয়া পুরুষ-পুরুষানুক্রমে আমি ধনবান হইতে পারিব। এইরূপ মনে করিয়া আমি জলে ঝাঁপ দিয়া ঝিনুকের অপর খণ্ড, যাহার উপর মুক্তা ছিল, সাঁতার দিয়া তাহাতে গিয়া উঠিলাম।

আমাকে লইয়া ঝিনুকের খোলা সেই অকুল সমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে চলিল। দুই দিন পরে দূরে একখানি জাহাজ দেখিতে পাইলাম। দাঁড়াইয়া, আমি আমার চাদর নাড়িয়া, জাহাজের লোককে সঙ্কেত করিতে লাগিলাম। কিন্তু তাহারা আমাকে দেখিতে পাইল না। অবিলম্বে জাহাজখানি অদৃশ্য হইয়া পড়িল।

এইরূপে আরও পাঁচ দিন কাটিয়া গেল। সাত দিন আমি অনাহারে ছিলাম, জল পর্য্যন্ত আমার উদরে যায় নাই। আমার শরীর ক্ষীণ ও অবসন্ন হইয়া পড়িল, দুর্বলতায় আমার নিদ্রা আসিয়া গেল। অজ্ঞান অভিভূত হইয়া আমি শুইয়া পড়িলাম।

কতক্ষণ নিদ্রা গিয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না। সমুদ্র-তরঙ্গে ঝিনুকের খোলাখানি উঠিতে-নামিতে ছিল, সর্ব্বদাই খোলাখানি সমুদ্র-বক্ষে দুলিতেছিল। সহসা "খ্যাঁস" করিয়া একটি শব্দ হইল ও সেই মুহূর্ত্তে ঝিনুকের খোলাখানি স্থির হইয়া দাঁড়াইল। তাহাতেই আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল।

আমি দেখিলাম যে, ঝিনুকের খোলাখানি সমুদ্রতীরে লাগিয়াছে। তখন সন্ধ্যা হয় হয় হইয়াছে। এত দুঃখের পর আমি যে পুনরায় তীরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, তাহা দেখিয়া আমার আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। মনে করিলাম যে, উপরে নিশ্চয় গ্রাম আছে। গ্রামে গিয়া প্রথম ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করিব, তাহার পর একখানি গরুর গাড়ী আনিয়া

মুক্তাটিকে লইয়া যাইব।

এইরূপ মনে করিয়া ঝিনুকের খোলা হইতে আমি নামিলাম, কিন্তু যেই আমি নামিয়াছি, আর পর্ব্বত প্রমাণ একটি তরঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হইল। তরঙ্গটি আমার মাথার উপর দিয়া চলিয়া গেল। তরঙ্গ দ্বারা তাড়িত হইয়া আমি অনেক দূর বালুকাময় শুষ্ক চড়ার উপর গিয়া পড়িলাম। তাড়াতাড়ি পুনরায় উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

যে স্থানে ঝিনুকের খোলা ছিল, সেই দিকে দৃষ্টি করিলাম। দেখিলাম যে, নিম্নগামী তরঙ্গ জলের সহিত ঝিনুকের খোলাখানি দূর সমুদ্র অভিমুখে চলিয়া যাইতেছে। হায়! হায়! আমার বহুমূল্য মুক্তাটি ভাসিয়া গেল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত একদৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া রহিলাম। ঝিনুকের খোলাখানি সমুদ্রের মাঝখানে চলিয়াগেল,—অবিলম্বে সমুদ্র-তরঙ্গে লীন হইয়া অদৃশ্য হইয়া পড়িল।

এইসময় পশ্চিম দিকে সূর্য্যদেব অস্তমিত হইলেন। বালুকাময় সমুদ্রকূল পরিত্যাগ করিয়া আমি উপরে উঠিতে লাগিলাম। উপরে উঠিয়া লোকালয় দেখিতে পাইলাম না। প্রথমে নিবিড় হেঁতাল বন দেখিতে পাইলাম। তাহার পর অন্যান্য গাছও দেখিতে পাইলাম। নিবিড় অরণ্য, যে দিকে দৃষ্টি করি, সেই দিকেই বন। আমি মনে করিলাম যে, এ স্থানটি হয় সাগরদ্বীপ অথবা সুন্দরবনের অপর কোন অংশ।

আরও অগ্রসর হইতে লাগিলাম। বন নিবিড় হইতে নিবিড়তর হইতে লাগিল। তখনও অল্প অল্প আলোক ছিল। সেই আলোকে দেখিতে পাইলাম যে, আমাব দক্ষিণ দিকে বনের ভিতর দিয়া কি একটা বৃহৎ জন্তু অতি নিঃশব্দে আমার সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছে। তখন আমার বড় ভয় হইল। আমি নিশ্চয় বুঝিলাম যে, এ অন্য জন্তু নহে, এ ব্যাঘ্র, দূর হইতে আমার অনুসরণ করিতেছে, সুবিধা পাইলেই লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক আমার ঘাড়ে আসিয়া পড়িবে। আমি তাড়াতাড়ি একটি গাছে উঠিয়া পড়িলাম।

গাছে কিছুদূর উঠিয়াছি, আর বাঘ ভয়াবহ গর্জ্জন করিয়া এক লম্ফে সেই বৃক্ষতলে আসিয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি আমি গাছের আরও উপরে উঠিতে লাগিলাম, বাঘ উচ্চ এক লম্ফ প্রদান করিয়া গাছ হইতে আমাকে পাড়িতে চেষ্টা করিল। কিন্তু আমি তখন যে স্থানে উঠিয়াছিলাম, লম্ফ প্রদান করিয়া বাঘ ততদূর পৌঁছিতে পারিল না। বাঘ পুনরায় ভূতলে পতিত হইল। ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে পুনরায় সে উঠিয়া দাঁড়াইল, আর আমার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তাহার চক্ষু দুইটি গোলাকার অগ্নি-শিখার ন্যায় জ্বলিতে লাগিল।

বৃক্ষের উপর যতদূর উঠিতে পারা যায়, ততদূর আমি উঠিলাম। তাহার পর সরু শাখা, তাহার উপর আর উঠিতে পারিলাম না। বৃক্ষটি একটু হেলা,অর্থাৎ বক্রভাবে ভূমি হইতে উপরে উঠিয়াছিল। সর্বনাশ! ব্যাঘ্র বৃক্ষের উপর উঠিতে আরম্ভ করিল। আমি ভাবিলাম, আর রক্ষা নাই। এইবার আমার আসন্নকাল উপস্থিত হইয়াছে। প্রাণপণ যত্নে আমি গাছটি নাড়া দিতে লাগিলাম, কিন্তু তাহাতে ব্যাঘ্রের কিছুমাত্র ক্ষতি হইল না। ব্যাঘ্র ক্রমাগত বৃক্ষের উপর আরোহণ করিতে লাগিল।

আমার নিকট হইতে ব্যাঘ্র আর পাঁচ হাত আছে, আমার নিকট হইতে আর চারি হাত আছে, আমার নিকট হইতে আর তিন হাত আছে, আমার নিকট হইতে আর দুই হাত আছে। ভয়ে থর থর করিয়া আমার শরীর কাঁপিতে লাগিল।

ব্যাঘ্র আমার এক হাত নিম্নে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমাকে ধরিবার নিমিত্ত সে হাত বাড়াইল। যদিও ইহার পর শাখা-প্রশাখা অতিশয় সরু ও ভঙ্গপ্রবণ ছিল, তথাপি প্রাণের দায়ে আমি আরও একটু উচ্চে গিয়া উঠিলাম। আশ্চর্য্য ! সেই সময় আমার মাথার উপর খিল্ খিল্ শব্দে কি হাসিয়া উঠিল।

চকিত হইয়া আমি উপরে দৃষ্টি করিলাম। দেখিলাম যে, ঠিক আমার মস্তকের উপর সরু এক শাখাতে এক নরমুণ্ড ঝুলিতেছে। দেহ হইতে মুণ্ডটি নূতন কর্ত্তিত হইয়াছে; কারণ, তাহার গলদেশ হইতে তখনও ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত পড়িতেছিল। মস্তকটি মুণ্ডিত, কেবল মধ্যস্থলে এক গুচ্ছ কেশ ছিল। টিকিটি গাছের ডালে বাঁধা ছিল। টিকি দ্বারা লম্বিত হইয়া মুণ্ডটি নারিকেলের ন্যায় বৃক্ষ-শাখায় ঝুলিতেছিল। মুণ্ডটি খিল খিল করিয়া হাসিতেছিল, আর আমাকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত মুখব্যাদান করিয়াছিল। কি ভয়ানক তাহার দন্ত দুই পাঁতি!

উপরে অদ্ভুত ভয়াবহ মুণ্ড, নিম্ন দুরন্ত ব্যাঘ্র, আমি বড়ই বিপদে পড়িলাম। কিন্তু তখন অন্য সমুদয় চিন্তা আমার মন হইতে দূর হইল। মনে কবিলাম যে,—"মুণ্ড! তুমি ভূত হও, আর রাক্ষস হও! তোমার দ্বারা আমি ব্যাঘ্রের মুখ হইতে রক্ষা পাইব।" এইরূপ ভাবিয়া আমি মুণ্ডটিকে ধরিয়া টান মারিলাম। তাহার শিখার কেশগুচ্ছ চড়্চড়্ করিয়া ছিঁড়িয়া গেল। এক টানে মুণ্ডটিকে বৃক্ষশাখা হইতে ছিঁড়িয়া টিকি দ্বারা লম্বিত করিয়া আমি ব্যাঘ্রের মুখের নিকট ধরিলাম। সম্মুখে টাট্‌কা নরমুণ্ড দেখিয়া ব্যাঘ্রের মুখে একটু হাসি দেখা দিল। যথালাভ মনে করিয়া সে হাত দিয়া মুণ্ডটি ধরিল। পরক্ষণেই এক লম্ফ প্রদান কবিয়া বৃক্ষের নীচে গিয়া পড়িল। তাহার পর নুরমুণ্ডটিকে মুখে লইয়া ব্যাঘ্র দ্রুতবেগে বনের ভিতর প্রবেশ করিল।

ষষ্ঠ রজনী – ডাকিনীর বাড়ী

আমি বৃক্ষ হইতে নামিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় আর একটি ভয়াবহ দৃশ্য আমার নয়নগোচর হইল। জন্তু নহে, মনুষ্য নহে, কিরূপ নূতন এক প্রকার জীব এই সময় বৃক্ষতলে আসিয়া উপস্থিত হইল। মানুষের ন্যায় তাহার আকৃতি, কিন্তু প্রায় ছয় হাত লম্বা। মূর্ত্তিটি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। দীর্ঘ কৃষ্ণবর্ণের নর-দেহ, অনেক দিন রৌদ্রে শুষ্ক করিলে যেরূপ হয়, মূর্ত্তিটি সেইরূপ শীর্ণ ও শুষ্ক ছিল। তাহার শরীরে মাংস একেবারেই ছিল না, শুষ্ক চর্ম্ম দ্বারা কেবল হাড়গুলি আবৃত ছিল। তাহার মুখ কৃষ্ণবর্ণের বৃহৎ একটি ঝুনা নারিকেলের মত ছিল। মস্তকের চুল ঠিক ছোবড়ার মত, স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত লম্বিত ছিল। তাহার স্তন নাভিদেশ পর্য্যন্ত পাড়িয়াছিল। অলঙ্কার স্বরূপ তাহার দুই কর্ণে দুইটি শুভ্রবর্ণের কৃমি ঝুলিতেছিল। নোলোকস্বরূপ নাসিকাতেও একটি কৃমি ছিল। সেই কৃমির অগ্রভাগে মুক্তার স্থানে বৃহৎ

একটি কোলা ভেক ঝুলিতেছিল। মূর্ত্তিটির কোমর রক্তবর্ণের ঘাগ্‌রা দ্বারা আবৃত ছিল, কিন্তু সে ঘাগ্‌রা কেবল জানু পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল। তাহার নিম্নে শুষ্ক বাঁশের ন্যায় পা দুইখানি অনাবৃত ছিল।

মুখমণ্ডলে মানুষের যে স্থানে চক্ষু থাকে, ইহার সেই স্থানে দুইটি কোটর ছিল, আর সেই কোটরের মধ্যে দুইটি রক্তবর্ণের বর্ত্তু ঘূর্ণিত হইতেছিল। এখন অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এই ভয়াবহ মূর্ত্তি মাঝে মাঝে মুখব্যাদান করিতেছিল, আর সেই সময় তাহার মুখের ভিতর হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছিল। সেই অগ্নির আলোকে আমি ইহার শরীরের ভাবভঙ্গী দেখিতে পাইলাম। সেই আলোকে আমি ইহার দন্ত দুই পাঁতিও দেখিতে পাইলাম। কি দীর্ঘ, কি উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণের দন্ত!

যেন নরমাংস চিবাইবার নিমিত্তই সেই দন্ত গঠিত হইয়াছে। এরূপ ভয়ানক দৃশ্য পূর্ব্বে আমি কখন দেখি নাই। ভয়ে আমার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। নীরবে গাছের উপর আমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। আমি যে বৃক্ষে বসিয়াছিলাম এই ভয়াবহ মূর্ত্তি আসিয়া সেই বৃক্ষে আরোহণ করিল। কিছু দূর উঠিয়া একটি স্থূল শাখার উপর অশ্বারোহণের ন্যায় সে উপবিষ্ট হইল। তাহার পর বিড় বিড় করিয়া সে কিরূপ শব্দ করিল। আর সেই মুহূর্ত্তে বৃক্ষটি আকাশের উপর উঠিয়া হু হু শব্দে বায়ুর ন্যায় চলিতে লাগিল।

এখন আমি সকল কথা বুঝিতে পারিলাম। গাছটি ডাকিনীর গাছ। সেই অদ্ভুত জীব ডাকিনী ব্যতীত আর কিছুই নহে। পূর্ব্বে আমার ধারণা ছিল যে, ডাকিনীদিগের আকৃতি ঠিক মানুষের মত হয়। কিন্তু আজ আমার সে ভ্রম দূর হইল। এখন আমি বুঝিতে পারিলাম যে ডাকিনীদিগের আকৃতি কতকাংশে মানুষের মত হইলেও ইহারা ভয়াবহ জীব।

গাছ, দেশ প্রদেশ নদ নদী অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিল। রাত্রি প্রায় দুই প্রহরের সময় এক পার্ব্বত্য প্রদেশে গিয়া উপস্থিত হইল। চারিদিকে গিবিশ্রেণী, সেই সমুদয় গিরিশ্রেণী নিবিড় অরণ্যে আবৃত। ইহাই কি হিমালয় প্রদেশ?

এই স্থানে উপস্থিত হইয়া বৃক্ষ পৃথিবীতে অবতরণ করিল। পৃথিবী স্পর্শ করিবামাত্র ইহার মূল এরূপ ভাবে ভূমিতে লাগিয়া গেল, যেন বীজ হইতে উৎপন্ন হইয়া বৃক্ষটি সেই স্থানেই চিরকাল বর্দ্ধিত হইয়াছে।

ডাকিনী লম্ফ প্রদান করিয়া বৃক্ষ হইতে নামিল। সেই মুহূর্ত্তে নিকটস্থ এক গিরিগহ্বর হইতে আর একটি ডাকিনী বাহির হইল। তাহার আকৃতি ঠিক প্রথম ডাকিনীর মত ছিল। কিন্তু ইহার মুখ কৃষ্ণবর্ণের ঝুনা নারিকেলের মত নহে, শুষ্ক অলাবুর মত। দ্বিতীয় ডাকিনী নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"নারিকেলমুখী! মুণ্ড আনিয়াছ?" তাহার প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম যে, প্রথম ডাকিনীর মুখ নারিকেলমুখী! নারিকেলমুখী উত্তর করিল,—"হাঁ লাউমুখী! মুণ্ড আনিয়াছি। ভাল মুণ্ড! আজ চমৎকার ভাঁটা খেলা হইবে।"

নারিকেলমুখীর এই উত্তরে আমি বুঝিতে পারিলাম যে, গহ্বর হইতে যে ডাকিনী বাহির হইল, তাহার নাম "লাউমুখী।"

লাউমুখী বলিল,—"তবে আমি আমার মুণ্ড লইয়া আসি, আর জয়-পরাজয় বিচার করিবার নিমিত্ত ভূমিকম্প-দাদাকে ডাকিয়া আনি।"

এই কথা বলিয়া পুনরায় সে গিরিগহ্বরে প্রবেশ করিল। অল্পক্ষণ পরে সে টাটকা একটি নরমুণ্ড হাতে লইয়া বাহির হইল। তাহার সঙ্গে এক বৃদ্ধও গহ্বব হইতে বাহির হইলেন। ডাকিনীদ্বয়ের মুখ-নির্গত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের আলোকে আমি দেখিলাম যে, ইনি সেই বৃদ্ধ, পৃথিবীতে ভূমিকম্প করা যাঁহার উপজীবিকা। তাঁহাকে দেখিয়া আমার বড় ভয় হইল। কিন্তু নারকেলমুখী বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া আছে, পলায়ন করিবার কোন উপায় ছিল না। সে জন্য গাছের উপর আমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

বৃদ্ধের সহিত, মুণ্ড হাতে লইয়া লাউমুখী গিরিগহ্বর হইতে বাহির হইয়া বলিল,—"কৈ নারিকেলমুখী! তোমার মুণ্ড কৈ? রাত্রি অধিক হইয়াছে। শীঘ্র এস, ভাঁটা খেলা আরম্ভ করি। কে হারে, কে জিতে, ভূমিকম্প ঠাকুরদাদা তাহার বিচার কবিবেন।"

"আমার মুণ্ড লইয়া আসি।" এই কথা বলিয়া নারিকেলমুখী বৃক্ষে আরোহণ করিতে লাগিল। আমার বড় ভয় হইল। যে স্থানে মুণ্ড লম্বিত ছিল, সে স্থান হইতে সরিয়া বৃক্ষের আর এক শাখায় গিয়া আমি লুক্কায়িত থাকিতে চেষ্টা করিলাম।

নারিকেলমুখী গাছে উঠিয়া মুণ্ড অন্বেষণ করিতে লাগিল। কিন্তু যে স্থানে মুণ্ড ঝুলিতেছিল, সে স্থানে মুণ্ড নাই। "এ কি হইল! মুণ্ড কোথায গেল!" এইরূপ বলিতে বলিতে ঘোরতব বিস্মিতা হইয়া সে গাছের এ শাখা সে শাখা হাতড়াইতে লাগিল। সামান্য সেই গাছে কতক্ষণ আব আমি লুক্কায়িত থাকতে পারি? সহসা তাহার বাখারিনিন্দিত হস্ত আমার গায়ে ঠেকিয়া গেল। "এ কি!" এই কথা বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ আমকে ধরিয়া ফেলিল। বলপূর্ব্বক বৃক্ষ হইতে নামাইয়া সে আমাকে ভূমিকম্পের নিকট লইয়া গেল।

বৃদ্ধকে সম্বোধন করিয়া নারিকেলমুখী বলিল,—"দাদা! গাছে আমার মুণ্ড নাই। তাহাব পরিবর্ত্তে গাছে এই আস্ত মানুষটি ছিল। এই মানুষ বোধ হয় আমার মুণ্ড চুবি কবিয়াছে।"

ভূমিকম্প বৃদ্ধ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কে?"

আমি উত্তর করিলাম,—"আমি আপনার অপরিচিত নহি। কলিকাতা গড়ের মাঠে যাহাকে আপনি এক টাকার ভূমিকম্প বিক্রয় করিয়াছিলেন, আমি সেই ব্যক্তি।"

বৃদ্ধ বলিলেন,—"বটে! তুমি সেই ব্যক্তি! ইহার মুণ্ড লইয়া কি করিয়াছে?"

মুণ্ড লইয়া যাহা করিয়াছিলাম, সত্য সত্য বৃদ্ধকে সেই বিবরণ আমি প্রদান করিলাম। বৃদ্ধ তাহা শুনিয়া বলিলেন,—"এ বড় বিষম কথা! নাতিনী দুইটি মুণ্ডে মুণ্ডে ঠোকাঠুকি করিয়া ভাঁটা ক্রীড়া করে। তোমাদের মত ইহাদের পা নাই যে, ইহারা ফুটবল খেলিবে। কিন্তু এ বড় অন্যায় কথা যে, তোমরা তাহাদিগকে এ সামান্য ক্রীড়া হইতেও বঞ্চিত করিবে। অন্য লোক হইলে, তাহার মুণ্ডটি ছিঁড়িয়া আমি নাতিনীকে ভাঁটা খেলিতে দিতাম। কিন্তু তুমি আমার খরিদ-দার। সে জন্য তোমার মুণ্ড আমি ছিঁড়িয়া লইতে পারি না। কিন্তু নারিকেলমুখীর মনোদুঃখ তোমায় নিবারণ করিতে হইবে। তাহাকে তোমার বিবাহ করিতে

হইবে। আজ রাত্রিতেই তাহার সহিত তোমার আমি বিবাহ দিব। লাউমুখী! বিবাহের আয়োজন কর। শঙ্খ আনয়ন কর, আমি নিজে শঙ্খ বাজাইব। লাউমুখী, তুমি উলু দাও।"

লাউমুখী তৎক্ষণাৎ উলুধ্বনি করিল। উলু! উলু! উলু! তাহার উলুধনিতে জগৎ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। —নারিকেলমুখীর দিকে আমি একবার চাহিয়া দেখিলাম। তাহার রূপ দেখিয়া আমার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। এ কিম্ভূত কদাকার ডাকিনীকে কিরূপে আমি পত্নীরূপে বরণ করিব!

অতি মিনতি সহকারে আমি ভূমিকম্প মহোদয়কে বলিলাম,—"মহাশয়! আপনি যেরূপ আজ্ঞা করিলেন, তাহা আমার শিরোধার্য্য । কিন্তু মহাশয়! আমি হইলাম মানুষ, ইনি হইলেন ডাকিনী। ইঁহার সহিত কিরূপে আমার পরিণয় হইতে পারে? তাহা ব্যতীত ঘরে আমার আর একটি পত্নী আছেন। সপত্নীর নিকট গিয়া আপনার নাতিনীর সুখ হইবে না।"

ভূমিকম্প ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"সে জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই। তোমাকে আমরা ছাড়িয়া দিব না। নারিকেলমুখী তোমাকে ভেড়া করিয়া চিরকার এই স্থানে রাখিয়া দিবে।"

আমি বলিলাম,—"সে সুখের কথা বটে। কিন্তু মহাশয়! এরূপ সুপাত্রীর উপযুক্ত পাত্র আমি নই।" —ভূমিকম্প উত্তর করিলেন,—"সে চিন্তা তোমাকে করিতে হইবে না। নারিকেলমুখীর ভাব দেখিয়া আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, তোমার প্রতি তাহার মন হইয়াছে।"

এই কথা শুনিয়া নারিকেলমুখী ঈষৎ হাসিয়া আমার প্রতি কটাক্ষবাণ নিক্ষেপ করিল। পুনরায় ঈষৎ হাসিয়া ভেকসংযুক্ত নোলোকটি একবার নাড়িল। তাহার অপূর্ব্ব রূপ ও হাব-ভাব দেখিয়া আমার মন একেবারে মোহিত হইয়া গেল। আমি ভাবিলাম যে, মৃত্যু হউক, তাহাও আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ, তথাপি এ কদাকার ডাকিনীকে আমি বিবাহ করিতে পারিব না।

বৃদ্ধের নিকট আমি বারবার অনেক ওজর আপত্তি করিলাম, বিনয় বচনে আমি অনেক সাধ্যসাধনা করিলাম। কিন্তু বৃদ্ধ কিছুতেই আমাকে নিষ্কৃতি প্রদান করিতে স্বীকৃত হইলেন না। অবশেষে নিরূপায় হইয়া আমি বলিলাম,—"মহাশয়। ইনি ডাকিনী, আমি মানুষ। কিছুতেই আম ইঁহাকে বিবাহ করিব না। আপনি আমার মস্তক কাটিয়া ইঁহাকে প্রদান করুন। আমার মুণ্ড লইয়া ইনি ভাঁটা ক্রীড়া করুন। বিবাহ আমি ইঁহাকে কিছুতেই করিব না।"

বৃদ্ধি বলিলেন,—"তুমি আমার খরিদ-দার। তোমার মুণ্ড আমি কিছুতেই কাটিয়া ভাঁটা করিতে পারি না। নিশ্চয় তোমায় নারিকেলমুখী বিবাহ করিতে হইবে। লাউমুখী! শঙ্খ আনয়ন কর! উলু দাও।"

পুনরায় উলুধ্বনিতে আকাশ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। এইবার উলু দিতে দিতে লাউমুখী আমার নিকটবর্ত্তী হইয়া মৃদুস্বরে বলিল, —"বল যে, ঐ মন্দিরে গিয়া কালীর গলদেশস্থিত মুণ্ডমালা হইতে একটি মুণ্ড আনিয়া দিতেছি।"

আমি চাহিয়া দেখিলাম। দেখিলাম যে, কিছু দূরে বনের ভিতর একটি ভগ্ন মন্দির

রহিয়াছে। লাউমুখীর সঙ্কেত আমি বুঝিতে পারিলাম।

ভূমিকম্প বৃদ্ধকে আমি বলিলাম,—"এ বিবাহকার্য্য অল্পক্ষণের নিমিত্ত আপনি স্থগিত রাখুন। আমি আপনাদের মুণ্ড লইয়াছি, তাহার পরিবর্ত্তে আর একটি মুণ্ড আনিয়া দিতেছি।"

আশ্চর্য্য হইয়া ভূমিকম্প আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আর একটি মুণ্ড তুমি আনিয়া দিবে! সে মুণ্ড তুমি কোথায় পাইবে?'

আমি উত্তর করিলাম,—'ঐ মন্দিরে মা আছেন। মায়ের গলদেশে যে মুণ্ডমালা আছে, তাহা হইতে একটি মুণ্ড আনিয়া দিব।" বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল,—'এ সন্ধান তোমাকে কে বলিয়া দিল?'

আমি কোন উত্তর করিলাম না।

ভূমিকম্প বৃদ্ধ পুনরায় বলিলেন,—'এ কথার উপর, কথা বলিবার আমাদের শক্তি নাই! যখন তুমি মা জগদম্বার নাম করিয়াছ, তখন আব আমরা কোন আপত্তি করিতে পারি না! যদি তুমি মায়ের মুণ্ডমালা হইতে ভাল একটি মুণ্ড আনিয়া দিতে পার, তাহা হইলে তোমাকে আমরা ছাড়িয়া দিব। কিন্তু মায়ের গলদেশ হইতে মুণ্ড আনয়ন করা নিতান্ত সহজ কাজ নহে।'

আমি বলিলাম,—'সহজ হউক আর কঠিন হউক। আমি এ কাজ করিতে চেষ্টা কবিব।'

বৃদ্ধ বলিলেন,—'বেশ! তবে চল, সকলে মন্দিরে যাই। আমরা মন্দিরের বাহিরে থাকি। নারিকেলমুখী ও লাউমুখীর সহিত আমি সম্মুখ দিকে পাহারা দিব। শাঁখমুখীকে ডাকিয়া আন, সে আপনার দলবলের সহিত পশ্চাৎ দিকে পাহারা দিবে। তুমি পলাইতে পাবিবে না।' শাঁকমুখী আপনার দল-বলের সহিত আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলে আমরা মন্দিবেব নিকট গমন করিলাম। আমি মন্দিরের ভিতব প্রবেশ করিলাম। ঠিক দ্বারে শ্রীমতী নারিকেলমুখী পাহারা রহিলেন। তাঁহার বাম দিকে ভূমিকম্প মহাশয় ও দক্ষিণ দিকে শ্রীমতী লাউমুখী বসিয়া রহিলেন। মন্দিরের 'পশ্চাৎ দিকে শাঁকমুখী আপনার দল-বলের সহিত পাহারা দিতে লাগিল।

সপ্তম রজনী – মুণ্ডমালা

ভিতরে প্রবেশ করিয়া আমি দেখিলাম যে, মন্দিরটি অতি প্রাচীন, কিন্তু নিতান্ত ভগ্ন হয় নাই। ভিতরে একটি কালীমূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিটি বোধ হয় প্রস্তর দ্বারা গঠিত মন্দিরের একপার্শ্বে একটি কুলঙ্গি আছে, সেই কুলঙ্গিতে লৌহ-নির্মিত একটি প্রদীপ মিট্‌মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছিল। পাদপদ্মে ফুল ও কুলঙ্গিতে প্রদীপ দেখিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম যে, মায়ের নিত্য-পূজা হইয়া থাকে। বোধ হয়, ডাক ও ডাকিনীগণ তাঁহার পূজা করে। কিন্তু আর আশ্চর্য্য কথা! মায়ের হস্তে ও গলদেশে যে নরমুণ্ড রহিয়াছে, সে মুণ্ডগুলি প্রস্তর নির্মিত কৃত্রিম মুণ্ড নহে। প্রকৃত টাট্‌কা নরমুণ্ড। কিন্তু সকল মুণ্ডগুলিই মুণ্ডিত, কেবল উপরিভাগে এক একটি শিখা আছে! সেই টিকি দ্বারা আবদ্ধ হইয়া মুণ্ডগুলি মালার সূত্রে লম্বিত আছে। ডাকিনীর বৃক্ষ আমি যেরূপ মুণ্ড দেখিয়াছলাম, আর সেই মুণ্ডটি বৃক্ষ-শাখায় যে ভাবে

টিকি দ্বারা লম্বিত ছিল, মায়ের গলদেশেও সেইরূপ মুণ্ড ছিল ও সেই ভাবে লম্বিত ছিল।

মন্দিরে প্রবেশ করিয়া অতি ভক্তি ভাবে সাষ্টাঙ্গে মাতাকে আমি প্রণাম করিলাম। তাহার পর মায়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাত যোড় করিয়া স্তবস্তুতি করিতে লাগিলাম। আমি বলিলাম,—'মা জগদম্বে! তুমি জগতের মাতা। মা! তুমি দক্ষিণ হস্তদ্বয় উত্তোলন করিয়া জগৎকে অভয় ও বর প্রদান করিতেছ, আমাকে মা তুমি অভয় প্রদান কর।

আমি মা, বড় বিপদে পড়িয়াছি। তোমার নিকট মা, কোন বিষয় অবিদিত নাই। কত বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অবশেষে আমি ডাকিনীর হাতে পড়িয়াছি। মা নারিকেলমুখীকে আমি কিছুতেই বিবাহ করিতে পারিব না। কিন্তু মা, সে আমাকে বলপূর্বক বিবাহ করিবে। তোমার মুণ্ডমালা হইতে যদি একটি মুণ্ড আমাকে প্রদান কর, তাহা হইলে, মা, এ বিপদ হইতে আমি পরিত্রাণ পাই। কিন্তু মা, তোমার অনুমতি মা, তুমি আমাকে প্রদান কর।'

মা বোধ হয় আমার স্তবে সন্তুষ্ট হইলেন। কারণ, আমি দেখিলাম যে, তাঁহার অভয় ও বব হস্তযুগল নিম্নগামী হইল, আর তাঁহার মুখমণ্ডল প্রসন্নভাব ধারণ করিল।

মায়ের এইরূপ প্রসন্ন ভাব দর্শন করিয়া মুণ্ডমালা স্পর্শ কবিতে আমার সাহস হইল। পূর্বেই বলিয়াছি যে মুণ্ডগুলি টিকি দ্বারা লম্বিত ছিল। আমি মনে করিলাম যে, অনায়াসেই একটি মুণ্ড খুলিয়া লইতে পারিব! এইরূপ মনে করিয়া প্রথম আমি বন্ধন কিছুতেই খুলিতে পারিলাম। না,তাহার পর আমি মুণ্ডটি ধরিয়া টানিতে লাগিলাম। আমার দেহে যত বল ছিল, সমুদয় বল প্রয়োগ করিয়া দুই হাতে টানাটানি করিতে লাগিলাম।

কিন্তু কিছুতেই ছিঁড়িতে পারিলাম না। তাহার পর মায়ের হাতে খড়্গখানি লইয়া শিখাটি কাটিতে চেষ্টা করিলাম। খড়্গ অতি সুতীক্ষ্ণ ছিল, তথাপি শিখার একগাছি কেশও কাটিতে পারিলাম না। তাহার পর কুলঙ্গি হইতে সেই লৌহ-প্রদীপটি আনিয়া দীপশিখা দ্বারা টিকিকেশগুচ্ছ দগ্ধ করিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু তাহার একগাছি কেশও দগ্ধ হইল না। নিরুপায হইয়া সে মুণ্ডটি ছাড়িয়া অন্য মুণ্ডগুলি একে একে টানিয়া দেখিলাম; কিন্তু একটি মুণ্ড ও মালা হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলাম না। অবশেষে মায়ের বাম হস্তের মুণ্ডটি দুই হাতে ধরিয়া টানিতে লাগিলাম। বাহির হইতে ডাকিনীগণ খল্ খল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

আমার টানাটানি দেখিয়া মুণ্ডটির মনে বোধ হয় দয়া হইল। ঈষৎ হাসিয়া সে আমাকে বলিল,—'বৃথা টানাটানি! ভগদত্তর হাতী আনিয়া যদি তুমি টানা-হেঁচড়া কর, তাহা হইলেও কিছু করিতে পারিবে না।"

আমি বলিলাম,—"তবে, মহাশয় কৃপা করিয়া আপনি নিজে গমন করুন। আপনি না গমন করিলে নারিকেলমুখী আমাকে বিবাহ করিবে।"

মুণ্ড বলিল,—"মন্দ কথা নহে। আমি নারিকেলমুখীর নিকট স্ব-ইচ্ছায় গমন করিব। আমাকে লইয়া লাউমুখীর সহিত সে ভাঁটা খেলিবে। লাউমুখীর যে তার একটি মুণ্ড আছে, তাহার সহিত আমাকে ঠোকাঠুকি করিবে। যদি আমি ভাঙ্গিয়া যাই তাহা হইলে লাউমুখী

জিতিবে; আর যদি লাউমুখীর মুণ্ড ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলে নারিকেলমুখী জিতিবে; আর যদি লাউমুখীর মুণ্ড ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলে নারিকেলমুখী জিতিবে। ভাবিয়া দেখ, এরূপ কাজে কোন্ মুণ্ড স্ব-ইচ্ছায় গমন করে?'

আমি বলিলাম,—মহাশয় দেবতা! মায়ের বাম হস্তে আপনি বিরাজ করিতেছেন। আমি আপনার নিকট কৃপা ভিক্ষা করিতেছি। কৃপা করিয়া যদি আপনি আমাকে রক্ষা করেন, তবেই হয়।'

মুণ্ড বলিল, —'দেখ! আমরা বেতাল। আমরা সমস্যা, হেঁয়ালি গল্প ভালবাসি। সমস্যা দিলে বিক্রমাদিত্যের ন্যায় পূরণ করিতে পারিবে?'

আমি বলিলাম,—' না মহাশয়! আমার সে শক্তি নাই। আমি পাড়া-গেঁয়ে অজ্ঞ লোক।'

মুণ্ড বলিল,—'তবে তুমি একটি গল্প কর, আমি শুনি। তাহার পর, ডাকিনীর হাত হইতে তোমাকে উদ্ধার করিতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।'

আমি বলিলাম,—''মহাশয়! পূর্বেই বলিয়াছি যে, আমি এক জন পাড়া-গেঁয়ে অজ্ঞ লোক। গল্প আমি জানি না।'--বেতাল অর্থাৎ মুণ্ড বলিল,—'তুমি সমস্যা পূরণ করিতে পারিবে না, তুমি গল্প বলিতে পারিবে না, কোন কাজ করিতে পারিবে না। অথচ তোমার ইচ্ছা যে, আমি গিয়া আর একটি মুণ্ডের সহতি ঠোকাঠুকি করি। এ কি কাজের কথা! যা! নারিকেলমুখীকে বিবাহ করিয়া সুখে স্বাচ্ছন্দে ঘর-কন্না কর।

আমি বড় বিপদে পড়িলাম। গল্প আমি জানি না। অথচ, গল্প না বলিলে মুণ্ডলাভ হয় না! অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি বলিলাম,—'মহাশয়! ভাল গল্প আমি জানি। তবে দুই একখানি পুস্তকে ও সংবাদপত্রে গুটিকত গল্প আমি পাঠ করিয়াছিলাম।' কিন্তু সে গল্প কি আপনার ভাল লাগিবে?' বেতাল বলিল,—'সেই গল্প আমি ভালবাসি। বিলম্ব করিও না, শীঘ্র আরম্ভ কর।'

আমি বলিলাম,—'আচ্ছা, মহাশয়! একটি গল্প আমি বলিতেছি, শ্রবণ করুন। কিন্তু এ গল্পটি সামান্য এক গোপ-কন্যার কথা। সেই গোপকন্যার নাম ছিল আদুরী।''

বেতাল বলিল,—'আদুরী! গোয়ালার মেয়ে! তাহার গল্প শুনিতে আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছে। সে আদূরীর কি হইয়াছিল, তাহা বল।'

আমি বলিলাম,—'এ গল্পটি আমি কোন সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছিলাম। গল্পটি যেরূপ পাঠ করিয়াছি, সেইরূপ আপনাকে বলিতেছি। শ্রবণ করুন।'

এই বলিয়া আমি আদুরী ও আরসীর গল্প বলিতে আরম্ভ করিলাম। মায়ের বাম হস্তের মুণ্ড ও মালার মুণ্ডগণ মনোযোগপূর্বক আমার গল্প শুনিতে লাগিল।

** বেতালগণের নিকট গড়গড়ি মহাশয় অনেকগুলি গল্প করিয়াছিলেন। তাহার গুটিকত কেবল এই পুস্তকে প্রকাশিত হইল। এখন হইতে 'রজনী' পরিচ্ছেদে পুস্তককে বিভাগ করিবার আর আবশ্যক নাই।*

আদুরী ও আরসী

প্রথম পরিচ্ছেদ – পাঁচ কম পাঁচ কুড়ি

'আদুরি! আদুরি!' প্রাচীরের গায়ে গোবব-লেদি দিতে দিতে আদুরীর মা চীৎকার করিয়া কন্যাকে ডাকিতে লাগিলেন।

'ও আদুরি। আদুরি! ও আভাগি'—আদুরীর মা পুনরায় চীৎকার করিয়া ডাকিলেন।

ঘরের ভিতর হইতে আদুরী সাড়া দিল। সামান্য একখানি মেটে ঘর; তাহার পাশে একটু রান্নার চালা; অপর দিকে গরু থাকিবার নিমিত্ত আর একটি ছোট চালা;—এই হইল আদুরী ও আদুরীর মায়ের ঘর। জাতিতে উহারা গোয়ালা। দুইটি দুগ্ধবতী গাভী,—এই হইল তাহাদের সম্পত্তি।

'বেলা হইয়া গেল যে! কখন হাটে যাইবি? দুপুর বেলা হাটে গেলে কি আর দই বিক্রী হবে?'—আদুরীর মা পুনরায় চীৎকার করিয়া মেয়েকে বকিতে লাগিলেন।

গাভী দুইটির দুগ্ধ ও দধি বিক্রয় করিয়া, আদুরীর মা দিনপাত করেন। যখন দুগ্ধ না থাকে, তখন ধান কিনিয়া চাউল প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করেন। সেই পরিশ্রমে যাহা লাভ হয়, তাহাতে এক প্রকার চলিয়া যায়;—তবে কষ্টে।

একবার আদুরীর মায়ের সৌভাগ্য-সূর্য্যের উদয় হইয়াছিল। সে আজ প্রায় দশ বৎসরের কথা। তখন আদুরীর মাতামহী অর্থাৎ আদুরীর আয়ী বা দিদিমা জীবিতা ছিলেন। একদিন গরু হারাইয়া গিয়াছিল। বনে-বাদাড়ে আদুরীর দিদিমা খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলেন। সে দিন নিকটস্থ একখানি গ্রামে এক শৃগাল ক্ষেপিয়াছিল। সে গ্রামে অনেকগুলি লোককে দংশন করিয়াছিল। পাছে আমাদেব গ্রামে আসিয়া আমাকে কামড়ায়, এই ভয়ে আদুরীর মাতামহী ছোট একটি ঠেঙা হাতে করিয়া গরু খুঁজিতেছিলেন।

যাইতে যাইতে দেখিলেন যে, সামান্য একটি মাঠান পথের ধারে একজন সাহেব বসিয়া আছেন। সাহেব পাখী মারিতে আসিয়াছিলেন। শ্রান্ত হইয়া, বন্দুকটি পাশে রাখিয়া গাছতলায় বসিয়া পকেট হইতে কি বাহির করিয়া সাহেব খাইতেছিলেন। সভয়ে আদুরীর দিদিমা এক পাশ দিয়া চলিয়া গেলেন। দুই চারি হাত গিয়া, সাহেব কি করিতেছেন, তাহা দেখিবার নিমিত্ত একবার মুখ ফিরাইলেন। সর্বনাশ! দেখিলেন যে, সাহেবের পিঠের জামার উপর আগের দুই পা রাখিয়া তাঁহার ঘাড়ের উপর একটা শৃগাল উঠিতেছে। অন্য স্ত্রীলোক হইলে ভয়ে পলায়ন করিত। কিন্তু আদুরীর আয়ী ডাকা-বুকো সাহসী স্ত্রীলোক ছিলেন।

'ও সাহেব, পাগলা শেয়াল! ও সাহেব, শেয়াল!'—এইরূপ চীৎকার করিতে তিনি সাহেবের পশ্চাৎ দিকে আসিয়া হাতে ঠেঙ্গার বাড়ির শৃগালকে দুই ঘা মারিলেন। শৃগাল সাহেবকে ছাড়িয়া আদুরীর দিদিমাকে আক্রমণ করিল ও দুই তিন স্থানে বিলক্ষণ দংশন করিল। মুহূর্ত মধ্যে সাহেব ও উঠিয়া বন্দুকের কুঁদোর আঘাতে শৃগালকে বধ করিলেন।

আদুরীর মাতামহীকে শৃগাল দংশন করিয়াছে, রক্ত পড়িতেছে, তাহা দেখিয়া সাহেব

সাতিশয় দুঃখিত হইলেন। সাহেব বলিলেন,—'তুমি আমার সঙ্গে সহরে চল, ভাল ডাক্তার দেখাইয়া তোমার চিকিৎসা করাইব। তুমি আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছ, তোমার ঋণ আমি কিছুতেই শুধিতে পারিব না।'

আদুরীর দিদিমা কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন,—'তোমার সহিত সহরে যাইলে, ডাক্তারের ঔষধ খাইলে, আমার জাতি যাইবে। আমি ঘরে লোহা পোড়াইয়া দিব, কলার ভিতর করিয়া সুলতান বনাত খাইব; তাহা করিলেই ভাল হইয়া যাইব। আমি বৃদ্ধা বিধবা; আমাদের সহজে মৃত্যু হয় না।'

সাহেব তাহার পর তাঁহাকে ছোট একটি চামড়ার থলি অর্থাৎ মণি ব্যাগ দিলেন ও বলিলেন, —'তুমি আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছ। সে ঋণ ইহাতে শোধ হয় না। তবে আমার নিকট যাহা ছিল, সমস্ত আমি তোমাকে দিলাম। ইহার ভিতর যাহা আছে, তাহা খরচ করিয়া আপনার চিকিৎসা করাইবে।' এই বলিয়া সাহেব প্রস্থান করিলেন।

বাটী আসিয়া আদুরীর আয়ী মণিব্যাগ খুলিয়া দেখিলেন যে, তাহার ভিতর পাঁচটি টাকা ও ছোট একখানি ছাপার কাগজ রহিয়াছে। টাকা কয়টি লইয়া তিনি কাগজখানি ফেলিয়া দিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু আদুরীর মা বলিলেন ,— মা কাগজখানি ফেলিও না, এ হয় তো সামান্য কাগজ নয়; সেই যারে বলে নোট, এ হয় তো তাই। হাটবার দিন হাটে গিয়া গদাধর কাপড় ওয়ালাকে দেখাইবে। এ নোট কি না, সে তোমায় বলিয়া দিবে।'

হাটবার দিন সমুদায় বৃত্তান্ত বলিয়া আদুরীর দিদিমা গদাধরকে কাগজখানি দেখাইলেন। গদাধর সৎ লোক। গদাধর বলিল,—'এ নোট বটে। এক শত টাকার নোট। কিন্তু নোট ভাঙ্গাইতে হইলে বাটা লাগে। এই কাগজখানি লইয়া আমি তোমাকে পাঁচ কম পাঁচ কুড়ি টাকা দিতে পারি।'

কিন্তু তাহাকে তৎক্ষণাৎ কাগজখানি না দিয়া আদুরীর দিদিমা আরও পাঁচজনকে দেখাইলেন। অন্যান্য লোক কেহ চারি টাকা কম, কেহ তিন টাকা কম, কেহ দুই টাকা কম, পাঁচ ঝুড়ি টাকা দিতে চাহিল। কিন্তু আদুরীর দিদিমা তবু কাগজখানি কাহাকেও দিলেন না। বাটী ফিরিয়া আসিয়া মেয়েকে বলিলেন,—' এত নগদ টাকা এখন এই কুঁড়ে ঘরে আনিলে বাড়ীতে ডাকাত পড়িবে, আমাদের সকলকে কাটিয়া ফেলিবে। আমার ঘা সারিয়া গেলে, আমি ভাল হইলে, চুপি চুপি টাকাগুলি আনিয়া ঘটী করিয়া এক স্থানে পুতিয়া রাখিব। এখন খরচ করিয়া ফেলা হইবে না। সময় আছে, অসময় আছে। অসময়ে কাজে লাগিবে।'

তাহাই স্থির হইল। আদুরীর মাতামহী নোট খানি লুকাইয়া রাখিলেন। কিন্তু কোথায় রাখিলেন, সে কথা কাহাকেও বলিলেন না, মেয়েকে ও বলিলেন না। আদুরীর দিদিমার জলাতঙ্করোগ ঘটিল না বটে; কিন্তু অল্প দিন পরে জ্বরবিকার-রোগে সহসা তাঁহার মৃত্যু হইল। পীড়ার প্রারম্ভেই তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। সুতরাং নোট খানি কোথায় যে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারিলেন না।

তাঁহার মৃত্যু হইলে, আদুরীর মা ঘর আতিপাতি করিয়া সর্বত্র খুঁজিলেন; কিন্তু নোট কিছুতেই পাইলেন না। নোটখানির জন্য অনেক কাঁদিলেন, অনেক দুঃখ করিলেন, অবশেষে নিরাশ হইয়া চুপ রহিলেন। সুতরাং আদুরীর মাতার সৌভাগ্যসূর্য্য যেমনি উদয় হইল, তেমনি অমাবস্যা-নিশির নিবিড় তম-রাশিতে মিশিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ – চন্দ্রহার

'আদুরি! আদুরি! পোড়ারমুখি! বেলা উল্টে গেল যে! তোর জন্যে কি হাট বসিয়া থাকিবে? পোড়ারমুখি! দইটুকু না বেচিলে নুন, লঙ্কা, হলুদ কোথা হইতে আসিবে? আর কি সে নোট আছে, যে ষট করিয়া ভাঙ্গাইব আর এক মালসা টাকা লইয়া আসিব? তা যে, কপালগুণে কাঠের ময়ূরে হার গিলিল। তোর কি! তুই দুই দিন পরে শ্বশুরবাড়ী যাবি। আমার এমন কেউ নাই যে, এক বেলা এক মুঠা ভাত দেয়।' এইরূপ বলিয়া আদুরীকে বকিতে লাগিলেন।

ঘরের ভিতর হইতে আদুরী বলিল,—'যাই মা! যাই! এই যাই! এখনও তত বেলা হয় নাই।' আদুরী কিছু বিলম্ব করিতেছিল, সত্য। বিলম্ব করিবার বিশেষ কারণও ছিল। আদুরী নিতান্ত বালিকা নহে; অষ্টাদশবর্ষীয়া পূর্ণ যুবতী। দুই বার শ্বশুরবাড়ী ঘর করিয়াছে। সংসারের কাজ লইয়া ছোট ননদ তাহাকে মারিয়াছিল। ভগিনীকে কিছু বলিতে না পারিয়া, স্বামী আদুরীকে মায়ের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। আজ কয় মাস আদুরী মাতার গৃহে বাস করিতেছে, কিন্তু তাহার সর্বদা ভয় পাছে শ্বশুরবাড়ীর লোক লাগাইয়া ভাঙ্গাইয়া স্বামীকে পর করিয়া দেয়। তাহার শ্বশুরবাড়ীর গ্রাম অধিক দূরে কেহ কেহ তাহার স্বামীকে সেই সৌরভীর সহিত কথাবার্তা কহিতে দেখিয়াছিল। আদুরীর কানে সে কথা উঠিয়াছিল। তাহাতে আদুরীর মন সাতিশয় ক্ষুণ্ন হইয়াছিল। তাহার পর, স্বামী পূর্বে যেরূপ ঘন ঘন তাহার নিকট আসিতেন, এক্ষণে সেরূপ ঘন ঘন আর আসেন না। গত কল্য আসিবার কথা ছিল; কিন্তু আসেন নাই। তাহাও আদুরীর এক দুঃখের কারণ হইয়াছিল। স্বামী হয় তো হাটে আসিবেন, স্বামীর সহিত হয় তো হাটে সাক্ষাৎ হইবে, এই ভাবিয়া আদুরী আজ একটু ভাল করিয়া সাজ-গোজ করিতেছিল। সেই জন্যই আদুরীর ঘর হইতে বাহির হইতে বিলম্ব হইতেছিল। মা আদুরীর মনের কথা জানেন না; বিলম্ব দেখিয়া মা চীৎকার করিয়া ডাকিতেছিলেন।

আদুরীর একখানি ভাল কালোপেড়ে কাপড় ছিল। সেই ধব-ধবে কাপড়খানি আজ সে পরিধান করিল। একটু তেল মাখিয়া মাথার চুলগুলি আঁচড়াইল। গর-গরে চুন খয়ের দিয়া একটি পান খাইল। ঘরের ভিতর মেটে দেয়ালের গায়ে পেরেকে বহুদিনের একখানি আরসী থাকিত। পান খাইয়া ঠোঁট লাল হইল কি না, তাহা দেখিবার নিমিত্ত পেরেক হইতে আদুরী আরসীখানি পাড়িয়া লইল। আরসীখানি হাতে লইয়া, ঠোঁট একটু ফুলাইয়া, মুখ দেখিতে লাগিল। যে দুই এক কোসা চুল এলোমেলো ভাবে আশে পাশে পড়িয়াছিল, তাহা

সোজা করিয়া দিল। একমনে এইরূপ ভাবনা করিতে ব্যস্ত আছে, এমন সময়ে বাহির হইতে মা পুনরায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন, —'পোড়ারমুখি! আজ তোর কি আর বার হবে না?

'যাই মা! যাই!' —এই কথা বলিয়া আদুরী আরসীখানি দেয়ালের গায়ে পেরেকে ঝুলাইতে গেল। দৈবক্রমে আরসীর সূতা পেরেকে না লাগিয়া, পাশ দিয়া গেল। আরসীখানি তাহার হাত হইতে পড়িয়া চুরমার হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। দঃখে ও ভয়ে আদুরীর মন নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িল। বহু দিনের আরসী। এই আরসীতে তাহার দিদিমা যৌবনকালে মুখ দেখিয়াছিলেন, চুল বাঁধিয়াছিলেন; তাহার মাও তাহাই করিয়াছিলেন, আদুরী ও নিজেও বাল্যকাল হইতে এই আরসীতে মুখ দেখিতেছিল। আজ সেই আরসীখানি তাহার অসাবধানতা বশতঃ ভাঙ্গিয়া গেল। মা সহজেই উগ্রস্বভাব বিশিষ্টা স্ত্রীলোক; কথায় কথায় সর্বদা বকিয়া ঝকিয়া থাকেন।

আজ মা যে কত তিরস্কার করিবেন, তাহার ঠিক নাই। খণ্ড খণ্ড হইয়া আরসী ঘরের মেজেতে পড়িয়া রহিল। সে সব কাচের খণ্ড আদুরী আর তুলিল না। ভয়বিহ্বল চিত্তে, শসব্যাস্ত হইয়া দধির ভাণ্ড মাথায় লইয়া, সে তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইল। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, —'ঘরের ভিতর ঝণাৎ করিয়া কি শব্দ হইল?

আদুরী তাহার উত্তর না দিয়া বলিল,—'ইশ! অনেক বেলা হইয়া গিয়াছে!' এই বলিয়া হন্ হন্ করিয়া সে চলিয়া গেল।

হাটের নিকট বড় একটি আমবাগান আছে। সেই আমবাগান প্যার হইয়া হাটে প্রবেশ করিতে হয়। আদুরী দেখিল যে, সেই আমবাগানের ভিতর একজন পুরুষ একটি স্ত্রীলোকের সহিত কথাবার্তা কহিতেছেন। পুরুষ মানুষটি যে তাহার স্বামী, আদুরী তাহা চিনতে পারিল। স্ত্রীলোকটির কেবল পশ্চাৎ দিক্ সে দেখিতে পাইল, তাহাকে সে চিনিতে পারিল না।

'এ আর কেহ নয়, এ সেই সৌরভী নাপতিনী, —এই ভাবিয়া আদুরী ঘোর শোকাকুলা হইয়া, সোজা পথ ছাড়িয়া, অপথ ধরিল। কাঁটা খোঁচা পায়ে ফুটিতে লাগিল; কিন্তু আদুরীর তাহা গ্রাহ্য নাই। মনের আবেগে দ্রুতবেগে সে চলিতে লাগিল। সহসা একটা কাঁটায় বিঁধিয়া তাহার সেই কালোপেড়ে কাপড়খানি ফালা ফালা হইয়া ছিঁড়িয়া গেল। বহুকালের সঞ্চিত আরসীখানি ভাঙ্গিল, স্বামী পর হইয়া গেল, বড় সাধের কালোপেড়ে কাপড় ছিঁড়িয়া নষ্ট হইল!—আদুরীর আর দুঃখের সীমা রহিল না।

নিকটে একটি ছোট পুষ্করিণী ছিল। সেই পুষ্করিণীর ধারে, এক নির্জন গাছের তলায়, দধির ভাণ্ডটি মাথা হইতে নামাইয়া সে ভূমিতে রাখিল। তাহার পর বাম হাতের উপর গণ্ডদেশ রাখিয়া বসিয়া বসিয়া সে কাঁদিতে লাগিল। বিপদের উপর বিপদ! এমন সময় কোথা হইতে একটা কুকুর আসিয়া সেই দধিভাণ্ডের ভিতর মুখ প্রবিষ্ট করিয়া দধি খাইতে চেষ্টা করিল। দধিভাণ্ড গড়াইয়া পুষ্করিণীর ভিতর পড়িল।

আর কিছু বাকি রহিল না। দুর্ভাগ্য একেবার চরম সীমায় উঠিল। 'হে ঠাকুর! আমার উপর আজ কেন এত লাগিয়াছ?' —এই বলিয়া আদুরী আরও অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই স্থানে বসিয়া কাঁদিল। নিজের দুঃখ চাপা দিয়া, 'মাকে আজ কি বলিয়া মুখ দেখাইব, —'কেবল তাহাই সে ভাবিতে লাগিল। যাহা হউক, আর কি করিবে? অনেকক্ষণ পরে চক্ষু মুছিয়া সে ধীরে ধীরে উঠিল; তাহার পর হাটে প্রবেশ করিল। সে স্থানে স্বামীকে দেখিতে পাইল না। একজন অপরিচিত লোকের নিকট হইতে দুই আনা পয়সা ধার করিয়া লঙ্কা, হলুদ, লবণ প্রভৃতি যাহা আবশ্যক ছিল, তাহা ক্রয় করিল। তাহার পর দুই প্রহর অতীত হইয়া গেলে, বিষণ্ণ বদনে বাটী ফিরিয়া আসিল।

বাটী আসিয়া, আদুরী পিঁড়া অর্থাৎ দাওয়ার উপর থপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল ও দুই হাতে চক্ষু দুইটি ঢাকিয়া অবিরত কাঁদিতে কাঁদিতে আদুরী বলিল,—'মা! আজ যে কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিলাম, তাহা বলিতে পারি না।'

মা বলিলেন,—'আজ যাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিস, প্রতিদিন যেন তাহার মুখ দেখা আমাদের ভাগ্যে ঘটে।'

এ আবার কি কথা! আরসীর জন্য তো গালাগালি তিরস্কারই হইবে,—তাহা না হইয়া, মায়ের মুখে মিষ্ট কথা! চক্ষু হইতে হাত দুইখানি সবাইয়া বিস্মিতভাবে আদুরী মাতার মুখপানে চাহিল!

আদুরীর মা বলিলেন,—'হাটের নিকট আমবাগানে জামাইকে দেখিয়া তুই অপথে চলিয়া গিয়াছিলি কেন? তোর বড় ননদ, যে তোকে বড় ভালবাসে, তাহার শ্বশুরবাড়ী হইতে সে আজ হাটে আসিয়াছিল। তোর ছোট ননদ বিনা অপরাধে তোরে মারিয়াছে,—ভাই-ভগিনীতে সেই কথা হইতেছিল। হাটের মাঝখানে ঘরের কথা না বলিয়া আমবাগানে একটু আড়ালে গিয়া ভাই-ভগিনীতে কথাবার্তা হইতেছিল। তাহাদিগকে দেখিয়া তুই অপথ দিয়া পলাইয়া গেলি কেন?

আদুরীর তখন চক্ষু ফুটিল। আদুরী তখন বুঝিতে পারিল যে, তাহার স্বামী সৌরভী নাপতিনীর সহিত কথা কহিতেছিলেন না, আপনার বড ভগিনীর সহিত কথাবার্তা কহিতেছিলেন।।

আদুরীর মা পুনরায় বলিলেন,—'তোর বড় ননদ তোকে দেখিতে আসিয়াছে। তোর জন্য চমৎকার একখানি নীলাম্বরী কাপড় আনিয়াছ; গুলবসানো ভাল নীলাম্বরী কাপড়;—দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। জামাই ও আসিয়াছেন। তাঁহারা স্নান করিতে গিয়াছেন। আর আদুরি! এখনও তোকে আমি সকল কথা বলি নাই। বড় আহ্লাদের কথা, আদুরী—

স্বামী আসিয়াছেন শুনিয়া আদুরীর মন প্রফুল্ল হইল। সহাস্য বদনে আদুরী জিজ্ঞাসা করিল,—'কি মা? কি আহ্লাদের কথা?'

আদুরীর মা বলিলেন,—'বল দেখি, কি? সেই যারে বলে চন্দ্রহার।'

ব্যগ্র হইয়া আদুরী জিজ্ঞাসা করিল, 'কি মা? কি? বল না!

আদুরীর মা বলিলেন,—'এত দেশ থাকিতে তোর আয়ী আর স্থান পায় নাই। আরসীর পিছনের কাঠ খুলিয়া, নোট যে তাহার ভিতর গুঁজিয়া রাখিবে, আবার কাঠটি যেরূপ ছিল, সেইরূপ করিয়া জুড়িয়া দিবে, এত কাণ্ড-কারখানা যে তোর আয়ী করিবে,—এ কথা আমি কি করিয়া জানিব? অন্য কোন স্থানে লুকাইয়া রাখিলে পাছে উইপোকায় খাইয়া ফেলে, সেই জন্য বোধ হয়, তোর আয়ী আরসীর ভিতর রাখিয়াছিল।

যাহা হউক, ভাগ্যে আজ তুই আরসীখানি ভাঙ্গিয়া ফেলিলি, তাই তো নোটখানি বাহির হইয়া পড়িল! আমি ঘরের ভিতর গিয়া দেখিলাম, আরসী চুরমার হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তাহা দেখিয়া রাগে আমার সর্ব শরীর জ্বলিয়া গেল। তোরে গালি দিতে দিতে কাচগুলি কুড়াইতেছি, এমন সময় দেখি না পাশে একখানি কাগজ পড়িয়া রহিয়াছে। কাগজখানি তুলিয়া দেখিলাম যে, সেই নোট! তখন তোরে যে কত আর্শীবাদ করিলাম, তা বলিতে পারি না।'

সেদিন বড় আনন্দের দিন বটে। স্বামী আসিয়াছেন, বড় ননদ আসিয়াছেন। নীলাম্বরী কাপড় হইয়াছে, তাহার পর, সেই এক ঘটী টাকার কাগজ পুনরায় লাভ হইয়াছে। স্বামীর সহিত কথাবার্তা হইলে আদুরী বুঝিল যে, সৌরভী বিষয়ে কথাটা সম্পূর্ণ অলীক ও অমূলক। সে দিন আদুরীর মুখে আর হাসি ধরে না।

আদুরীর মা পঞ্চাশ টাকা দিয়া মেয়েকে রূপার চন্দ্রহার গড়াইয়া দিলেন। সময় অসময়ের জন্য বাকি টাকা ঘটী করিয়া ঘরের এক কোণে পুঁতিয়া রাখিলেন।

ভূতের বাড়ী

দ্বিতীয় মুণ্ড

ঘনশ্যাম বলিলেন,—সুবল গড়গড়ি মহাশয় আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—'গল্পটি সমাপ্ত করিয়া মুণ্ডকে আমি বলিলাম,—তবে, মহাশয়! এখন চলুন!'

– আমি কোন উত্তর পাইলাম না। কোন উত্তর না পাইয়া মুণ্ডের দিকে আমি চাহিয়া দেখিলাম। আশ্চর্য্য! মায়ের বাম হস্তে মুণ্ড নাই। মুণ্ডের স্থানে চমৎকার একটি রক্তবর্ণের বৃহৎ মুক্তা রহিয়াছে মুণ্ড এক্ষণে সেই মুক্তার আকার ধারণ করিয়াছে। কিন্তু এমন মুক্তা কখন দেখি নাই। সমুদ্রের মাঝখানে জ্বালার মত মুক্তা দেখিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার এরূপ জ্যোতি ছিল না। মায়ের বাম হস্তে এ রক্ত-মুক্তার প্রভায় চারিদিক আলোকিত হইয়াছিল।

কিছুক্ষণ আমি স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম। এক্ষণে কি করা কর্তব্য, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। চিন্তা করিয়া অবশেষে এই স্থির করিলাম যে, ডাকিনীর নিকট যাইতে একে একে সমস্ত মুণ্ডদিগকে অনুরোধ করিব। একান্ত কাহাকেও যদি না লইয়া যাইতে পারি, সকল মুণ্ডই যদি ইহার মত রক্ত-মুক্তার রূপ ধারণ করে, তাহা হইলে শেষকালে মায়ের এই খড়্গ আমি

আপনার মুণ্ড কর্তন করিয়া মায়ের পাদপদ্মে সমর্পণ করিব।

এইরূপ স্থির করিয়া মুণ্ড-মালার নিম্ন দেশে যে মুণ্ডটি ছিল, তাহাকে আমি বলিলাম,—'মহাশয় আপনাদিগের খুলিয়া কি কাটিয়া কি ছিঁড়িয়া লইয়া যাই, এরূপ শক্তি আমার নাই, তবে অনুগ্রহ করিয়া যদি আমার সহিত স্ব-ইচ্ছায় ডাকিনীর নিকট গমন করেন, তবেই আমার পরিত্রাণ হয়।'

মুণ্ডমালার মুণ্ড বলিল,—'একটি গল্প বল!'

আমি বলিলাম,—'এই মাত্র একটি গল্প করিলাম, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। গল্পটি শুনিয়া আমাকে ফাঁকি দিয়া মায়ের হাতে উনি রক্ত মুক্তার আকার ধারণ করিলেন।'

মালার মুণ্ড বলিল,—'তবে ডাকিনীকে গিয়া বিবাহ কর।'

ইহার শেষ পর্যন্ত দেখিতে হইবে, মনে মনে আমি এইরূপ স্থির করিয়াছিলাম। সে জন্য অধিক বাক্য ব্যয় না করিয়া আমি আর একটি গল্প বলিতে আরম্ভ করিলাম।

আমি বলিলাম,—'মুণ্ড মহাশয়! এবার আমি আপনার নিকট এক ভূতের গল্প করিব। এ বিলাতী ভূত. দেশী ভূত নহে, এ ঘটনাটি বিলাতে ঘটিয়াছিল।'

মুণ্ড বলিল,—'তবে শীঘ্র আরম্ভ কর, ভূতের গল্প শুনিতে আমি বড় ভালবাসি।'

আমি বলিলাম,—'এ গল্পটি টম সাহেবের কথা, আমার নিজের কথা নহে। মনে করুন, যেন টম সাহেব এ গল্পটি বলিতেছেন।'

প্রথম পরিচ্ছেদ – টম্ সাহেব

টম্ সাহেব বলিতেছেনঃ—সম্প্রতি এক জন পুরাতন বন্ধুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। হাসিতে হাসিতে তিনি আমাকে বলিলেন,—'দেখ টম্, এ লণ্ডন নগরে একখানি ভূতের বাড়ি আছে।'

আমি উত্তর করিলাম,—'বটে! সত্য বলিতেছ, না তামাসা করিতেছ? তুমি পণ্ডিত লোক, ভূতে তোমার বিশ্বাস নাই।'

আমার বন্ধু বলিলেন—'না ভাই না, তামাসা নয়। সেই বাটী আমি ভাড়া লইয়াছিলাম। তিন দিনের অধিক তাহাতে বাস করিতে পারি নাই। বিশেষ কিছু যে ভয়ানক দেখিয়াছি, তাহা নহে! তবে কিরূপ শব্দ হয়, মনের ভিতর সর্বদাই কেমন একটা আতঙ্ক হয়। কিন্তু সেই বাটীতে এক জন বৃদ্ধা বাস করে। কি করিয়া সে থাকে তা জানি না। বৃদ্ধা বলিল,—'কোন ভাড়াটীয়াই সে বাড়ীতে দুই দিনের অধিক বাস করিতে পারে না।'

বন্ধুর কথা শুনিয়া আমি ভাবিতে লাগিলাম। ভূতের বাড়ী। এত দিনের পর বুঝি আমার সাধ মিটিল। ভূত কিরূপ, দেখিতে চিরকাল আমার মনে একান্ত বাসনা। সেই সাধ মিটাইবার জন্য আমি শ্মশানে বনে জঙ্গলে ঘোর নিশীথে কত যে ঘুরিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু ভূত দেখা আমার কপালে কখন ঘটে নাই। আজ কি ভগবান্ আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন? দেখা যাউক, কি হয়।

বন্ধুর নিকট হইতে সে বাটীর ঠিকানা জানিয়া লইলাম। বাটীর নিকট গিয়া দেখিলাম—

তালা বন্ধ। প্রতিবাসিগণের নিকট শুনিলাম যে, সে বাটীতে যে বৃদ্ধা বাস করিত, সম্প্রতি তাহার মৃত্যু হইয়াছে। রাত্রিকালে ভূতে ঘাড় ভাঙ্গিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে। সেই দিন থেকে সে বাড়ীর ভিতর মনুষ্য দূরে থাকুক, কাক পক্ষী, কেহ প্রবেশ করে না। সে বাড়ীতে নেঙটি ইঁদুর, কি বড় কোন ইঁদুর বাস করে । আমার আরও কৌতূহল জন্মিল। প্রতিবাসীদিগের নিকট হইতে গৃহস্বামীর ঠিকানা জানিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি ধনবান্ লোক।

ভূতের বাড়ী আমি ভাড়া লইব শুনিয়া তিনি আমাকে বলিলেন,—'বাড়ীর যে দুর্নাম আছে, তাহা বোধ হয়, শুনিয়া থাকিবেন। আমি এতদিন নানা দেশ ভ্রমণ করিতেছিলাম। সম্প্রতি দেশে আসিয়াছি। আমার খুড়া মহাশয় ঐ বাড়ী ক্রয় করিয়াছিলেন। কবে হইতে ঐ বাড়ীতে ভূতের উপদ্রব আরম্ভ হয়, তাহা আমি বলিতে পারি না। সপবিবারে নিজে আমি ঐ বাড়ীতে দুই দিন বাস করিয়াছিলাম। দুই দিনের পর প্রাণভয়ে পলাইয়া আসিলাম। আপনি যদি সে বাটীতে কিছুদিন বাস করিতে পারেন, তাহা হইলে ভাড়ার টাকা লওয়া দূরে থাকুক, বরং ঘর হইতে আপনাকে কিছু দিতে প্রস্তুত আছি।'

যাহা হউক, আমি চাবি লইয়া আসিলাম। আমার এক জন ডানপিটে বীরপুরুষ চাকর ছিল। ভূত প্রেত দানা দৈত্য কিছুই সে মানিত না। মনে তাহার অপবিমিত সাহস, দেহে তাহার অসীম বল। তাহাকে আমি সকল কথা খুলিযা বলিলাম, আর জিজ্ঞাসা করিলাম,—'কেমন হে, তুমি আমার সহিত বাডীতে রাত্রি যাপন কবিবে?'

চাকর উত্তর করিল,—'ভূত! ভূত আমার কাছে আসিবে? আমি ভূতের বাবা। দেখি, কেমন আমার সম্মুখে ভূত বাহির হয়। ভূতের চড়চড়ি করিয়া খাইব।

তাহার কথা শুনিয়া আমার মনে আহ্লাদ হইল। ভূত মানি আব নাই মানি, তবু যেন স্থানবিশেষে প্রাণটা কেমন ছেঁক ছেঁক করে, গাযে কাঁটা দিয়া উঠে। একজন সঙ্গী থাকিলে মনে অনেকটা সাহস হয়। চাকবের হাতে চাবি দিয়া আমি বলিলাম,—তুমি তবে সেই বাড়ীতে যাও, ঘর-দ্বার পরিষ্কার করিয়া রাখ, বিছানা ঠিক করিয়া রাখ। আমাব পিস্তল ও ছোরা লইয়া যাও, তোমার নিজেরও পিস্তল ও ছোরা ছাড়িও না। সন্ধ্যা বেলা আমি সে স্থানে যাইব।'

সন্ধ্যার সময় আমি সে বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। আমার চক্ষুর দ্বার খুলিয়া দিল। চাকরের মুখে ঈষৎ হাসির রেখা দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—কি হে, সব ভাল তো?'

ভৃত্য বলিল,—'আজ্ঞে হাঁ, সব ভাল।' এই কথা বলিয়া, চাকর আর একটু ঈষৎ হাসিল। —আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'কিছু দেখিয়াছ, না, কি?'

সে উত্তর করিল,—'আজ্ঞে না, কিছু দেখি নাই, তবে আমার কানের কাছে কে যেন ফুসং ফুস করিয়া কথা কহিতেছিল। এরূপ শব্দ বার বার শুনিয়াছি।

আমি বলিলাম,—'তোমার ভয় হইয়াছে না কি?

চাকর হাসিয়া বলিল,—'ভয়! আমার শরীরে ভয় নাই, আমি ভূতের বিধাতা পুরুষ। যদি ভূত দেখিতে পাই, আনন্দ হইবে, ভয়ের লেশ মাত্র মনে উদয় হইবে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ – ভূতের খেলা

চাকরের সহিত এইরূপ কথা কহিতে কহিতে আমি গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলাম। সঙ্গে আমার একটি কুকুর ছিল। কুকুরটি অতি বিক্রমশালী, ভীরুতা কাহাকে বলে সে জানিত না। আপনা অপেক্ষা দ্বিগুণ দেহবিশিষ্ট বড় বড় ডালকুত্তাকে তাড়া করিয়া তাহার ঘাড় ধরিত। কোনও একটি নূতন বাড়ীতে যাইলে প্রথমেই সে কোন ইঁদুর আছে, কোথায় আরশুলা আছে, তাহার জন্য গলি-খুঁজি এ কোণ সে কোণ শুঁকিয়া ফোঁশ ফোশ করিয়া বেড়াইত। কিন্তু আজ সেই কুকুরের ব্যবহার দেখিয়া আমি বড়ই আশ্চর্য হইলাম। প্রথমতঃ সে সেই বাড়ীর ভিতর কিছুতেই প্রবেশ করিবে না। অনেক আদর করিয়া ভুলাইয়া যদিও প্রবেশ করাইলাম, কিন্তু ভয়ে একবারে জড় সড় হইয়া গেল। পদদ্বয়ের ভিতর লাঙ্গুল রাখিয়া কুণ্ডলী হইয়া সে কাঁপিতে কাঁপিতে আমার পাশে পাশে বেড়াইতে লাগিল। লম্ফ ঝম্ফ নাই, শব্দ নাই, ইঁদুর অনুসন্ধান নাই। আজ সে নীরব, আজ তাহার কিছুই নাই। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া আমরা এ ঘর সে ঘর বেড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম। প্রকাণ্ড অট্টালিকা, এক তালা দোতালা, তেতলায় কত যে কামরা, তাহা বলিতে পারি না। দেখিতে দেখিতে আমরা বৃহৎ একখানি ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। এই ঘরের ভিতর ভূতের দৌরাত্ম্য যাহাকে বলে, তাহার প্রথম সূচনাহইল।

ঘরটি আমার চাকর পরিষ্কার করে নাই। মেজেতে নিবিড় ধূলা পড়িয়াছিল। কোথায় কিছু নাই, হঠাৎ দেখিলাম, আমার ঠিক সম্মুখে কেটি পায়ের দাগ পড়িল। শিশুর পদচিহ্ন। তাহার আগে কি আশে পাশে আর দাগ নাই, কেবল সেই একটি দাগমাত্র। অগ্রসর হইয়া সেই পদচিহ্নের উপর নিজের পা রাখিলাম। অমনি, ঠিক সেই সময়ে আমার সম্মুখে আর একটি পায়ের দাগ পড়িল। আমি চাকরের গা টিপিলাম, চাকরও আমার গা টিপিল। এইরূপ যতই যাই, আগে আগে ধূলার উপর ততই এক একটি শিশুপদচিহ্ন অঙ্কিত হইতে থাকে। কিন্তু কেবল এক পায়ের চিহ্ন, দুই পায়ের দাগ পড়ে না। যখন ঘরের অপর প্রান্তে প্রাচীরের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম, তখন আর দাগ পড়িল না।

সে ঘর হইতে বাহির হইয়া আমরা অন্যান্য ঘর পরিদর্শন করিতে লাগিলাম। ক্রমে একখানি বড় ঘরে গিয়া বসিলাম। তখন রাত্রি হইয়াছিল। চাকর বাতি জ্বালাইয়া আমার সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিল। সহসা ঘরের অন্য দিক্ হইতে একখানি চৌকি আকাশ-পথে উড়িয়া ঠিক আমার সম্মুখে পড়িল। আমি বলিলাম,—'বাঃ! মন্দ কথা নয়!'

ক্রমে দেখিলাম, সেই চৌকির উপর যেন কে বসিয়া রহিয়াছে। মানবের আকৃতি বটে, কিন্তু তাহার দেহ যেন অতি তরল ধূম দ্বারা গঠিত। কুকুরটি ভয়বিহ্বল হইয়া ঘোরতর আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। চাকর তাহাকে সান্ত্বনা করিতে গেল। ঘাড় হেঁট করিয়া কুকুরকে সান্ত্বনা করিতেছে, এমন সময় হঠাৎ আমার দিকে ফিরিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল,—'মহাশয়

কি আমার পিঠে কিল মারিলেন?' —আমি উত্তর করিলাম,—'না, কি হইয়াছে?

চাকর বলিল,—'আমার পিঠে কে ভয়ানক একটা কিল মারিল।'

আমি বলিলাম,—'এ সব কারখানা বোধ হয় বদমায়েশ লোকের। কি করিয়া করিতেছে, ধরিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব বাহির না করিয়া ক্ষান্ত হইব না।'

এক্ষণে এ ঘর পরিত্যাগ করিয়া আমরা দ্বিতলে গিয়া উঠিলাম। আমার শয়ন-ঘর এই তালায় নির্দিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু এখনও নিদ্রা যাইবার সময় হয় নাই। সুতরাং এই তালায় অন্যান্য ঘর পরিদর্শন করিতে লাগিলাম। একটি ক্ষুদ্র কামরার নিকট উপস্থিত হইয়া চাকর বলিল,—'এ কি হইল! এ ঘরের দরজা বন্ধ কেন? আমি এই মাত্র ইহার চাবি খুলিয়া কপাট উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছি।' আমি দ্বার টানিয়া দেখিলাম ভিতর হইতে কে খিল বন্ধ করিয়া দিয়াছে। বিস্ময়ে দ্বারের দিকে চাহিয়া আছি, এমন সময়ে, আশ্চর্য! দ্বার আস্তে আস্তে আপনি খুলিয়া গেল। আমরা দুই জনে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলাম। এক প্রকার অমানুষিক গন্ধে ঘরে ক্রমে পরিপূরিত হইতে লাগিল। এক প্রকার ভৌতিক ত্রাসে আমাদের হৃদয় অবসন্ন হইতে লাগিল। সে আশঙ্কা যে কি তাহা বর্ণনা করিতে পারি না। নরজীবনের প্রতিকুল কোন একটা ভীষণ পদার্থ যেন সেই ঘরে আছে, এইরূপ আমাদের মনে হইল। সর্বনাশ! সহসা ঘরের দ্বার বন্ধ হইয়া গেল। সে ঘরে আর অপর দ্বার কি জানালা ছিল না। প্রথম দুই জনে দ্বার টানা-টানি করিয়া দেখিলাম। কিছুতেই খুলিতে পারিলাম না। আমার চাকর বলিল,—'অতি পাতলা তক্তা দিয়ে কপাট যোড়টি গঠিত। দুই লাথিতে ভাঙ্গিয়া ফেলিব। দেখি ভূতে কি করিয়া রক্ষা করে! দুই লাথি নয় হাজার লাথিতে ও সে কপাট ভাঙ্গিল না। আমি অনেক চেষ্টা করিলাম কিন্তু কিছুতেই সে ভঙ্গপ্রবণ কপাট ভাঙ্গিতে পারিলাম না। শ্রান্ত হইয়া আমরা নিবৃত্ত হইলাম। তখন খলখল করিয়া বিকট হাসির শব্দ হইল। দ্বারটি আস্তে আস্তে আপনি খুলিয়া গেল। সে ভয়াবহ ঘর হইতে তাড়াতাড়ি আমরা বাহির হইয়া পড়িলাম।

সে ঘর হইতে বাহির হইয়া আমরা বারেন্দায় দাঁড়াইলাম। এক পার্শ্বে মিট্ মিট্ করিয়া কেমন একটা নীল বর্ণের অলৌকিক আলো জ্বলিতেছিল। কি আলো কোথায় যাইতেছে, দেখিবার নিমিত্ত আমরা তাহার পশ্চাদগামী হইলাম। সিঁড়ি দিয়া আমাদের আগে আগে আলোটি তেতলায় উঠিতে লাগিল তেতলার উপর উঠিয়া সামান্য একটি শয়নাগারে প্রবেশ করিল। যে বৃদ্ধা এই বাড়ীতে একাকী বাস করিত, এই ঘরটি তাহার ছিল, আমরা এইরূপ অনুমান করিলাম। ঘরের ভিতর দেরাজ ছিল। খুলিয়া দেখিলাম, তাহার ভিতর একখানি রেশমের বুমাল রহিয়াছে। রুমালের একধারে দুইখানি চিঠি বাঁধা রহিয়াছে। চিঠি দুইখানি লইয়া সে ঘর হইতে বাহির হইলাম। দ্বিতলে আসিবার নিমিত্ত সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিলাম। মনে হইল, আমার পাশে পাশে যেন আর কে নামিতেছে। কিন্তু তাহাকে আমি দেখিতে পাইতেছিলাম না। সহসা খপ করিয়া কে আমার হাত ধরিল। আমার হাত হইতে

চিঠি দুইখানি কাড়িয়া লইবার জন্য কে যেন বার বার চেষ্টা করিল। দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ করিয়া আমি তাহার সে চেষ্টা বিফল করিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ – ঘোর বিভীষিকা

আমার নিজের শয়ানাগারে উপস্থিত হইয়া প্রথম ঘড়ি, পিস্তল ও ছোরা মেজের উপর রাখিলাম। নিকটস্থ ছোট একটি ঘরে চাকরকে শুইতে বলিলাম। মাঝের দ্বার খোলা রহিল। কুকুর ঘোরতর ভয়ে ভীত হইয়া ঘরের কোণে গিয়া আশ্রয় লইল। মাঝে মাঝে ত্রাসজনিত বিকট রোদনের ন্যায় শব্দ করিতে লাগিল। যে পত্র দুইখানি উপর হইতে আনিয়াছিলাম. এক্ষণে তাহা পড়িতে লাগিলাম। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে চিঠি দুইখানি কোন একটি পুরুষ তাহার প্রিয়তমাকে লিখিয়াছিল; কিন্তু নাম-ধাম কাহারও ছিল না। ভালবাসার কথা ছাড়া, তাহাতে কোন একটা বিভীষিকার আভাসও ছিল। যেন কে কাহাকে খুন করিয়াছে, এই ভাবের কথা। পত্র দুইখানি পাঠ করিয়া আমি চৌকির উপর রাখিলাম। ঘরে দুইটি বড় বড় বাতি জ্বলিতেছিল। শীতপ্রধান দেশ। অগ্নিস্থানে দাউ দাউ করিয়া অগ্নি জ্বলিতেছিল। ফল কথা, ঘরটি উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত ছিল। সহসা টেবিলের উপর হইতে আমার ঘড়িটি শূন্যপথে চলিয়া যাইতে লাগিল। এক হাতে ছোরা, অপর হাতে পিস্তল লইয়া তাড়াতাড়ি আমি ঘড়ি ধরিতে দৌড়িলাম। কিন্তু 'সোঁৎ' করিয়া ঘড়ি যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল, আর আমি দেখিতে পাইলাম না।

পুনরায় আমি চৌকিতে বসিয়া একখানি পুস্তক খুলিয়া পড়িতে লাগিলাম। ঘরের ভিতর এক্ষণে বিকট শব্দ হইতে লাগিল। কুকুরটি ভয়ানক কাতর রবে ঘর পরিপূরিত করিল। আমি তাহাকে থামাইতে যাইলাম। যে কুকুর আমাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিত, আজ সেই কুকুর আমাকে কামড়াইতে আসিল! দংশনের ভয়ে আমি তাহার গায়ে হাত দিতে সাহস করিলাম না।

চাকর এই সময় সহসা তাহার ঘর হইতে দৌড়িয়া আসিল। চক্ষু রক্তবর্ণ, যেন কোটর হইতে বাহির হইয়া পড়িতেছে; মুখে নীল মাড়িয়া দিয়াছে। 'মহাশয় পলায়ন করুন, মহাশয় পলায়ন করুন! এ স্থানে আর তিলার্দ্ধকাল থাকিলে মারা পড়িবেন। বাপ রে, ধরিল রে, মা রে!' এইরূপ চীৎকার করিতে করিতে সে আমার ঘর হইতে বাহির হইয়া তড়তড় করিয়া লাফে লাফে সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল। তাহাকে ফিরাইবার নিমিত্ত আমি পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলাম। কিন্তু ধরিতে না ধরিতে সে সদর দরজা খুলিয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। সেই ভয়াবহ শ্মশান সদৃশ অট্টালিকার ভিতর আমি এখন একা পড়িলাম।

এখন প্রাণে আমার অতিশয় ত্রাস হইল। একবার মনে ভাবিলাম, আমি ও পলায়ন করি। কিন্তু বন্ধু-বান্ধব সকলে হাসিবে ও বিদ্রুপ করিবে। যা থাকে কপালে, এই মনে করিয়া পুনরায় আমি পড়িতে বসিলাম। আমার হস্তে পুস্তক,—সম্মুখে বাতি। পুস্তক ও বাতির মধ্যবর্তী স্থানে, আমার কোলে, তালগাছ প্রমাণ কৃষ্ণবর্ণ একটি মানুষের আকৃতি দাঁড়াইল। তাহার মস্তক ছাদে ঠেকিল। সেই মস্তকে চক্ষু দুইটি জ্বলিতে লাগিল। সর্ব শরীর

আমার শিহরিয়া উঠিল। পিস্তল লইবার নিমিত্ত আমি হাত বাড়াইলাম। হাত উঠিল না আমি দাঁড়াইবার চেষ্টা করিলাম পা অসাড় ও অবশ। পা উঠিল না। চীৎকার করিতে চেষ্টা করিলাম, মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। জ্ঞান হত হইবার উপক্রম হইল।

কিন্তু তখনও একটা চিন্তাশক্তি আমার মনে ছিল। ভাবিলাম, যদি এখন ভয় করি তাহা হইলে নিশ্চয় আমি প্রাণ হারাইব! এইরূপ মনে করিয়া অনেক চেষ্টা করিয়া ধৈর্য্য ধরিয়া রহিলাম, বাতি নিবিল না, অগ্নি-স্থানে অগ্নি নির্বান হইল না, তথাপি ঘর অন্ধকারে আবৃত হইয়া গেল। আমি ভাবিলাম, যেমন করিয়া হউক, ঘরে আলো রাখিতে হইবে। অন্ধকারে থাকিলে মারা পড়িব।

পুনরায় উঠিতে চেষ্টা করিলাম। এবার উঠিতে পারিলাম। আস্তে আস্তে গিয়া একটি জানালা খুলিয়া দিলাম। জ্যোৎস্না রাত্রি ছিল। অল্প অল্প চাঁদের আলো ঘরে প্রবেশ করিল। সেই আলোকে দেখিলাম যে, তালবৃক্ষ প্রমাণ কৃষ্ণবর্ণের বিকট মূর্তি তখন সম্পূর্ণভাবে ঘরে নাই কেবল তাহার ছায়াটি এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পুনরায় গিয়া চৌকিতে বসিলাম। পীত, হরিত, লোহিত—নানা বর্ণের গোলাকার আলোক এক্ষণে ঘরের চারিদিকে ঘুরিয়া ও গড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার পর ভূমিকম্প হইলে যেরূপ হয়, ঘর সেইরূপ দুলিতে লাগিল। যে চৌকির উপর চিঠি দুইখানি রাখিয়াছিলাম, তাহার নীচে হইতে ঠিক জীয়ন্ত মানুষের রক্ত-মাংসের হাতের ন্যায় একখানি স্ত্রীলোকের হাত বাহির হইল। তাড়াতাড়ি আমি সেই হাতখানি ধরিতে যাইলাম। খপ করিয়া চিঠি দুই খানি লইয়া নিমেষের মধ্যে হাতখানি অদৃশ্য হইয়া গেল।

ইহার পর, একখানি চৌকির উপর একটি যুবতী বসিয়া রহিয়াছে, এইরূপ দেখিলাম তাহার পর একজন পুরুষ ঘরের ভিতর উপস্থিত হইল। বালকের মূর্ত্তি, বৃদ্ধার মূর্ত্তি, নানা প্রকার মূর্ত্তি ঘরের ভিতর আবির্ভাব হইতে লাগিল ও একে একে বিলীন হইতে লাগিল। তাহা ব্যতীত আরও যে কত ভয়াবহ ঘটনা সংঘটিত হইল, সে সকল বর্ণনা করিবার আর স্থান নাই। —মাঝে মাঝে গলা টিপিয়া আমাকে মারিয়া ফেলিবার জন্য কে যেন চেষ্টা করিতে লাগিল। আমার ঘাড় ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য মাঝে মাঝে ঘাড়ে হাতও আসিতে লাগিল। সাহসে ভর করিয়া আমি বার বার সেই ভৌতিক হাত ঝাড়িয়া ফেলিতে লাগিলাম। সে রাত্রিতে আমি যে কি করিয়া প্রাণে বাঁচিলাম, আশ্চর্য্য কথা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ – শেষ কথা

উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা টম্ সাহেবের বিবরণ। প্রভাত হইল এই সমুদয় উপদ্রব থামিল। টম্ সাহেব তখন এক প্রকার নির্জীব হইয়া পড়িয়াছিলেন। যাহা হউক, সে বাটী হইতে কি করিয়া পালাইবেন, এক্ষণে সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কোনরূপে উঠে কুকুরকে ডাকিলেন। কুকুর তাঁহার নিকটে আসিল না। কাছে গিয়া দেখিলেন, যে কুকুরটির গলদেশ ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। কুকুর মরিয়া গিয়াছে। টম্ সাহেবের চাকর সেই দিন অবধি বায়ুগ্রস্ত হইল। ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া সে অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপে পলায়ন করিল।

বাড়ীওয়ালার নিকট গিয়া টম্ সাহেব চাবি ফিরাইয়া দিলেন, আর বলিলেন,—ভূত দেখিতে আর আমার ইচ্ছা নাই। যথেষ্ট হইয়াছে, সাধ বিলক্ষণ মিটিয়াছে।'

বাড়ীওয়ালা সকল কথা শুনিয়া বলিলেন,—'মহাশয়! আপনার মত সাহসী পুরুষ পৃথিবীতে অতি বিরল। আপনার যে প্রাণরক্ষা হইয়াছে, তাহাই পরম লাভ।'

তাহার পর চিঠি দুইখানির কথা শুনিয়া তিনি আরও বলিলেন,—'এত দিন ঐ বাড়ীতে যে বৃদ্ধা বাস করিতেছিল, পত্র দুইখানি বোধ হয় তাহার স্বামীর। আমার খুড়া মহাশয়ের জীবনকালে সে ব্যক্তি একবার ঐ বাটি ভাড়া লইয়াছিল। বৃদ্ধার স্বামী অতিশয় পাষণ্ড ছিল। বৃদ্ধার ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে টাকার লোভে সে বধ করিয়াছে, দিনকতক এইরূপ জনরব শুনিয়াছিলাম। যাহা হউক, ঐ বৃদ্ধা ব্যতীত সে বাটীতে এ পর্যন্ত আর কেহ বাস করিতে পারে নাই। বৃদ্ধার মৃত্যুও সে অকস্মাৎ ঘটিয়াছে। সে সম্বন্ধে নানা লোক নানা কথা বলিয়া থাকে। সেই অবধি এমন একটি লোক পাই না, যে সাহস করিয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করে। বাড়ীটি দেখিতেছি, আগা-গোড়া ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে।'

টম্ সাহেব উত্তর করিলেন,—বাড়ীটি আগা-গোড়া না ভাঙ্গিয়া একটি কর্ম করিলে হয়। যে ঘরে আমরা বদ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম, যে ঘরে বিকট গন্ধ বাহির হইয়াছিল, কেবল সেই ঘরটি প্রথম ভাঙ্গিয়া দেখিলে হয়।'

বাড়ীওয়ালা তাহাই করিলেন। সেই ঘরের মাটিতে নিম্ন হইতে নানারূপ অদ্ভুত দ্রব্য বাহির হইল। তাহা কি, সে কথা বলিবার আর স্থান নাই, আবশ্যকও নাই। বাড়ীওয়ালা সেই সমুদয় দ্রব্য পোড়াইয়া ফেলিলেন। সেই দিন হইতে ভূতের উপদ্রব থামিয়া গেল।

গড়াগড়ি মহাশয় বলিলেন,—গল্পটি সমাপ্ত হইবার পূর্বে আমি মুণ্ডের দিকে দৃষ্টি করিয়াছিলাম। কেবল ধীরে ধীরে ইহার নাসিকা, কর্ণ, মুখ প্রভৃতি বিলীন হইয়া গোলাকার ধারণ করিল কেমন ধীরে ধীরে ইহা রক্তবর্ণে রঞ্জিত হইল! ফলকথা, এ দিকে আমার গল্পটি সমাপ্ত হইল, আর ও দিকে মুণ্ডটিও রক্ত-মুক্তা হইয়া গেল।

এবার আর আমি পূর্বের ন্যায় আশ্চর্য্য হইলাম না। আর অধিক তর্ক-বিতর্ক না করিয়া, মালায় তাহার পাশের মুণ্ডটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—'মহাশয়ের অভিপ্রায় কি? আস্তে আস্তে আমার সহিত গমন করিবেন, না আপনার নিকটও একটি গল্প করিতে হইবে?

তৃতীয় মুণ্ড বলিল,—'ডাকিনীর হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে যদি ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে আর একটি গল্প কর। নতুবা বাহিরে গিয়া নারিকেল মুখীকে বিবাহ কর।'

কাজেই আমাকে আর একটি গল্প বলিতে হইল।

** গড়াগড়ি মহাশয় একে একে মুণ্ডদিগের নিকট গল্প করিতে লাগিলেন। এক একটি গল্প সমাপ্ত হয়, আর এক একটি মুণ্ড রক্ত-মুক্তা হইয়া যায়, বার বার এই বিষয়ের উল্লেখ অনাবশ্যক।*

পুরাতন কূপ

প্রথম অধ্যায় – নীলকুঠি

কানপুরের নিকট নবাবগঞ্জ নামক একটি স্থান আছে। সেই স্থানে একটি পুরাতন কূপ আছে। সেই কূপে এক বাঙ্গালী বালক একবার পড়িয়া গিয়াছিল। বাঙ্গালী বালক সেই সময়ে পাঁড়েনী নামক এক ব্রাহ্মণীর নিকট বাস করিতেছিল। পাঁড়েনীর স্বামী বালকের পিতার পাচক-ব্রাহ্মণ ছিল। এই ঘটনার কুড়ি বৎসর পরে জন কয়েক বাঙ্গালী বাবু পাঁড়েনীকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট পাঁড়েনী সেই ঘটনা এইরূপে বর্ণনা করিলঃ—

পাঁড়েনী বলিল,—কানপুর হইতে ফরক্কাবাদের রাস্তায় জোন সাহেবের নীলকুঠি ছিল। গোবিন্দবাবু সেই নীলকুঠিতে কাজ করিতেন। তিনি বড়বাবু ছিলেন। সাহেব, বাবুকে অতিশয় ভালবাসিতেন। নিকটে একটি গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। পরিবার লইয়া, গোবিন্দ বাবু তাহাতে বাস করিতেন। পরিবারের মধ্যে গোবিন্দবাবুর বৃদ্ধ মাতা ও স্ত্রী। আমার স্বামী সেই সংসারে পাচক-ব্রাহ্মণের কাজ করিতেন। কালক্রমে গোবিন্দ বাবুর ভার্য্যা যুগল-পুত্রসন্তান প্রসব করিয়া, সূতিকা-ঘরেই মানবলীলা সংবরণ করেন। এ অঞ্চলে তখন বাঙ্গালীদিগের যথেষ্ট সম্মান ছিল। চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গেল। গোবিন্দবাবুর বিপদে আবাল বৃদ্ধবনিতা সকলেই কাঁদিতে লাগিল। তিনি নিজে শোকে অধীর হইয়া পড়িলেন। সদাশয় জোন সাহেবও তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইলেন।

গোবিন্দবাবুর বৃদ্ধ মাতা নবপ্রসূত শিশু দুইটিকে লালন-পালন করিতে লাগিলেন। এক সঙ্গে দুই জনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, সে নিমিত্ত পিতামহী তাহাদের নাম লব কুশি রাখিলেন। কিছু দিন করে বাবু দেশে গিয়া পুনরায় বিবাহ করিয়া নব বধূ লইয়া কর্ম্মস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন। নূতন বধূটির ক্রমে চক্ষু-মুখ ফুটিল, সেই সঙ্গে সপত্নীপুত্রদ্বয়ের উপর তাঁহার বিদ্বেষ দিন দিন প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। বাবু নিজেও ক্রমে ছেলেদের প্রতি অনাস্থাপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। নিতান্ত দুরন্ত, এই বলিয়া সর্ব্বদাই তিনি তাহাদিগকে তাড়না করিতেন। কিন্তু যত দিন তাঁহার বৃদ্ধা পিতামহী জীবিতা ছিলেন, তত দিন শিশু দুইটির বিশেষ কোন অযত্ন হইতে পায় নাই। ছেলে দুইটির বয়স যখন পাঁচ বৎসর, দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সময়ে পিতামহীর পরলোক হইল। পিতামহীকে হারাইয়া বালক দুইটি একেবারে নিঃসহায় হইয়া পড়িল। বাপ স্নেহহীন, বিমাতা শত্রু। উঠিতে বসিতে প্রহার, তিরস্কার ও কুবাক্যে তাহাদের সুকোমল হৃদয় জর্জ্জরিত হইল। বালক দুইটি দেখিতে কিন্তু রাজপুত্রের ন্যায়। সাধ করিয়া পিতামহী তাহাদের মস্তকে কেশ বাড়িতে দিয়াছিলেন। ঝোঁকড়া-ঝোঁকড়া কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল স্কন্ধের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। দীর্ঘকেশ-সম্বলিত মস্তক নাড়িয়া যখন দুই ভ্রাতার কথাবার্ত্তা হইত, তখন কাহার পাষাণ মন সে

রমণীয় দৃশ্যে ও সে সুধামাখা স্বরে দ্রবীভূত না হইত? হইত না কেবল বিমাতার, আর হইত না স্ত্রীচরণপরায়ণ পিতা ঠাকুরের। মাতৃহীন বালক দুইটির সকল গুণই ছিল। দোষের মধ্যে ছিল কেবল বয়সগুণে অস্থিরতা, দৌড়াদৌড়ি ও দুরন্তপনা। ফল কথা, শিশু দুইটির রূপ গুণ দিন দিন যতই বিকশিত হইতে লাগিল, বিমাতার মনে হিংসা-দ্বেষও ততই প্রবল হইতে লাগিল। কিন্তু জোন সাহেব তাহাদিগকে বড়ই স্নেহ করিতেন, তাহাদের দুরন্তপনা তিনি ভালবাসিতেন, তাহাদের সহিত তিনি নিজে ছুটাছুটি করিতেন। নীলেজ হাউজ হইতে শিশু দুইটি যখন তাঁহার দুগ্ধফেননিভ ধবল বসন কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করিয়া দিত, তখন রাগ করা দূরে থাকুক, আদরে তিনি তাহাদিগকে বুকে করিয়া লইতেন। জুতা, মোজা ও ভাল পরিচ্ছদ জোন সাহেব তাহাদিগকে সর্বদাই কিনিয়া দিতেন। শিশু দুইটির আর এক জন সহায় ছিলেন। আমার পতি-পাঁড়ে তাহাদিগকে প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসিতেন। ভাল মাছ, দুধের সর, ঘরে যাহা কিছু উপাদেয় বস্তু প্রস্তুত হইত, লুকাইয়া তিনি তাহাদিগকে তাহা আহার করিতে দিতেন!

আরও দুই বৎসর কাটিয়া গেল। লব কুশির বয়স সাত বৎসর হইল। এই সময়ে গদর পড়িল, অর্থাৎ সিপাহী-বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। দেশে অরাজকতার আর সীমা-পরিসীমা রহিল না। গৃহদাহ, লুট-পাট, মার-পিট, চুরি-ডাকাতি, খুন-খরাবি চারিদিকেই চলিতে লাগিল।

বিদ্রোহীগণ ঘোর নিষ্ঠুরতা সহকারে সাহেবদিগকে বধ করিতে লাগিল। বাঙ্গালীরা ইংরেজের গুরু, এই বলিয়া বাবুদের প্রতিও অত্যাচার কম হইল না। নানা সাহেবের প্রধান মন্ত্রী আজিমুল্লা বাবুদের ডাকিয়া বলিল,—'তোমরা আমাদের অধীনে চাকরী কর।' বাবুরা তাহাতে সম্মত হইলেন না। সেই অপরাধে বাবুদিগকে তোপে উড়াইয়া দিবার হুকুম হইল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কার্য্যে তাহা পরিণত হয় নাই।

জোন সাহেব গোবিন্দ বাবুকে ডাকিয়া বলিলেন,—'বাবু! এ স্থানে আর আমার থাকা উচিত নয়। বদমায়েসেরা আমাকে মারিয়া ফেলিবে। আপাততঃ কানপুরে গিয়া আশ্রয় লইব। আমার অনুপস্থিতিতে তুমি যথারীতি কুঠির কর্ম চালাইবে। যদি জীবিত থাকি, তাহা হইলে পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে।'

এই বলিয়া গোবিন্দ বাবুর হস্তে সমস্ত কার্য্যের ভার দিয়া সাহেব প্রস্থান করিলেন। নিকটস্থ গ্রামবাসীদিগের জোন সাহেব বাপ-মা ছিলেন। দয়া-মায়া, পরোপকারে তিনি দেবস্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। জোন সাহেব তাহাদিগকে ছাড়িয়া যাইবেন, এই অশুভ সংবাদে চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গেল। শত শত লোক আসিয়া যোড়হস্তে জোন সাহেবকে বলিল,—'মহাশয়! আপনি আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবেন না, আপনার নিমিত্ত আমরা সকলে প্রাণ দিব।'

কিন্তু সে ঘোরতর বিপ্লবের সময় জোন সাহেব সে স্থানে থাকা উচিত বোধ করিলেন না। বাবুর হাতে সকল কর্মের ভার দিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। জোন সাহেব একবার

বিলাতে গিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন; কিন্তু অল্পদিন পরেই তাঁহার গৃহশূন্য হইয়াছিল। আর তিনি বিবাহ করেন নাই।

জোন সাহেব চলিয়া গেলে, দুই দিবস পরেই বদমায়েসরা সাহেবের বাঙ্গলো জ্বালাইয়া দিল। গোবিন্দ বাবুর ঘর লুট-পাট করিল। তাঁহাকে খুঁটিতে বাঁধিয়া বিলক্ষণ প্রহার করিল। তাঁহার স্ত্রীর গায়ে যাহা কিছু গহনা-পত্র ছিল, সে সমস্তই কাড়িয়া লইল। পুনরায় আসিয়া সকলকে মারিয়া ফেলিবে, এরূপ ভয়ও দেখাইল। সর্বত্রই তখন বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত! বিচার নাই, বিবেচনা নাই, ঘোরতর অরাজকতা। কোন স্থানে সপরিবারে পলাইয়া যে, আপনার, স্ত্রীর ও শিশু দুইটির প্রাণরক্ষা করিবেন এরূপ উপায় গোবিন্দ বাবুর ছিল না। বাবুরাম নামক এক জন সে দেশী কায়স্থ তাঁহার অধীনে কর্ম করিতেন।

বাবুরামের নিবাস অযোধ্যার এলাকায় হরডুই জিলায় একখানি গ্রামে। এই বিপ্লবের সময় পরিবারবর্গকে বিদেশে নিজের কাছে রাখা উচিত নয়, এই ভাবিয়া বাবুরাম তাহাদিগকে হরডুই পাঠাইবার নিমিত্ত আয়োজন করিলেন।

গোবিন্দ বাবু তাঁহাকে বলিলেন,—'ভাই! তোমার পরিবারবর্গের সহিত যদি আমর স্ত্রী

ও পুত্র দুইটিকে তোমার গ্রামে পাঠাইয়া দাও, ও তোমার গৃহে তাহাদিগকে কিছু দিনের নিমিত্ত আশ্রয় দাও, তাহা হইলে আমার বড় উপকার হয়; এমন কি, তাহাদিগের প্রাণদান করা হয়। তা না হইলে এবার আসিয়া বদমায়েসেরা সকলকে মারিয়া ফেলিবে। পরিবারবর্গ কোন নিরাপদ স্থানে আশ্রয় প্রাপ্ত হইলে, আমি একপ্রকার নিশ্চিন্ত হই। তাহার পর আমার নিজের কপালে যাহা থাকে, তাহাই হইবে।'

বাবুরাম উত্তর করিলেন,—'আমার পরিবারের সহিত আপনার স্ত্রীকে আমি পাঠাইতে পারি। কিন্তু বালক দুইটিব ভার আমি লইতে পারিব না। তাহারা এখানে সেখানে দৌড়াদৌড়ি করিবে। এ হুলস্থূলের সময় কে তাহাদিগকে রক্ষাণাবেক্ষণ করিবে? সঙ্গে আমি নিজে যাইতে পারিতাম, তাহা হইলেও এক কথা থাকিত। কিন্তু সাহেবের অবর্তমানে তাঁহার কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া আপনিও যাইবেন না, আমিও যাইব না।' অগত্যা গোবিন্দ বাবু কেবল স্ত্রীকে বাবুরামের পরিবারের সহিত পাঠাইতে বাধ্য হইলেন।

ছেলে দুইটি লইয়া এখন ঘোর ভাবনা উপস্থিত হইল। কবে কে আসিয়া তাহাদিগকে কাটিয়া যাইবে, সর্বদাই এই ভয় হইতে লাগিল। অবশেষে পাঁড়ে বলিলেন,—'মহাশয় যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে ছেলে দুইটিকে আমি কানপুরে রাখিয়া আসি। কানপুরের নিকট নবাবগঞ্জে মাঠের মাঝখানে একটি নির্জন বাগানে বনের ভিতর আমার স্ত্রী বাস করেন। সে স্থানে কোন ভয় নাই। আমার স্ত্রীর দুইটা মেটে কলসী চুরি করিতে কেহ আর যাইবে না। যদি বলেন তো লব কুশিকে আমার স্ত্রীর কাছে রাখিয়া আসি।'

গোবিন্দ বাবু আমার স্বামীর কথায় সম্মত হইলেন। স্বামী রাত্রিকালে ছেলে দুইটিকে একখানি গরুর গাড়ীতে বসাইয়া প্রাতঃকালে আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় – লব ও কুশি

তাড়াতাড়ি আমি একখানি চারপাই পাতিয়া দিলাম। জোন সাহেব যে ভাল মখমলের জামা দিয়াছিলেন, ছেলে দুইটি সেই জামা পরিয়াছিল। তাহাদের কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল এলোথেলো হইয়া বুকে পিঠে পড়িয়াছিল,দেবকুমার তুল্য তাহাদের রূপবনের ভিতর আমার সেইভাঙ্গা খোলার ঘর সেই অপূর্ব্ব রূপরাশিতে আলোকিত হইল। বাজার হইতে পেঁড়া, জিলেপি প্রভৃতি খাবার কিনিয়া দিয়া আমার স্বামী পুনরায় বাবুর নিকট প্রত্যাগমন করিলেন।

অজ্ঞাত স্থানে, অপরিচিত লোকের কাছে আসিয়া ছেলে দুইটি একটু ভীত হইয়াছিল। কিছুক্ষণ তাহারা বিষণ্ণ বদনে বসিয়া রহিল। কিন্তু আমার আদর ও স্নেহে ক্রমে তাহাদের সাহস হইল। ক্রমে তাহারা দুই একটি কথা কহিতে লাগিল। তাহার পর যখন কে লব কে কুশি এই লইয়া আমি ক্রমাগত ভুল করিতে লাগিলাম, তখন আর তাহারা হাসি রাখিতে পারিল না; হা হা করিয়া দুই ভাই এক সঙ্গে হাসিয়া উঠিল। সেই সময় হইতে তাহারা ভয় ও লজ্জা-ভাঙ্গা হইয়া গেল। বস্তুতঃ কে লব আর কে কুশি, তাহা চিনিবাব যো ছিল না। একরূপ মুখ, একরূপ চক্ষু, সব ঠিক একরূপ। তাহার উপর আবার একরূপ চুল ও একরূপ পোষাক। কে লব কে কুশি, চারি পাঁচ দিন আমার চিনিতে গেল।

এক দিন লব আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"পাঁড়েনি! তোমরা হিন্দুস্থানী; বাবাকে বাঁধিয়া তোমরা মারিয়াছিলে। তোমরা কি আমাদিগকে কাটিয়া ফেলিবে?

আমি বলিলাম—"না বাবা! তোমাদিগকে কেহ কিছু বলিবে না। কাহার এমন পাষাণ হৃদয় আছে যে, তোমাদের গায়ে হাত তুলিবে?"

কুশি জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার কাঁসিখানি আমাকে বাজাইতে দিবে, পাঁড়েনী? কাঁসি বাজাইলে কাঁসি ভাঙ্গিয়া যাইবে। আমরা গরীব মানুষ; পুনরায় কাঁসি কোথায় পাইব?—তোমারাই বা কিসে রুটি খাইবে?"

শুনিয়াছিলাম, ছেলে দুইটি বড় দুরন্ত। কিন্তু আমার কাছে তাহারা কিছুমাত্র দুষ্টপণা করে নাই। ছেলেমাত্রই মিষ্ট কথার বশ। লব কুশিও তাহাই ছিল। তবে দোষের মধ্যে এই যে, আমি তাহাদিগকে ঘরে আটক করিয়া রাখিতে পারিতাম না। তাহারা মাঠে-মাঠে, এ বাগানে সে বাগানে বেড়াইতে যাইত। ছোট ছোট গাছে উঠিত। মাঝে মাঝে নবাবগঞ্জের বাজারেও যাইত, কিন্তু নবাবগঞ্জের সকল লোকেই তাহাদিগকে ভালবাসিত।

রামদীন নামক নবাবগঞ্জে একটি যুবক ছিল। সে ভাল লোক ছিল না। এই দুর্দ্দিনে মন্দ লোকের বড়ই প্রভুত্ব বাড়িয়াছিল। দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করা তো সামান্য কথা, এখন কেহ কাহার গলা কাটিয়া ফেলিলেও তাহার দাদ-ফরিয়াদ ছিল না। এক দিন লব কুশিকে রামদীনের সঙ্গে বেড়াইতে দেখিয়া আমার প্রাণে বড় আতঙ্ক হইল। বাঙ্গালীর ছেলে বলিয়া যদি সে তাহাদিগকে কাটিয়া ফেলে, আমার সেই আশঙ্কা হইল। কিন্তু ভয়ে আমি কিছুই বলিতে পারিলাম না।

আর এক দিন দুই ভাই একটি পায়রার ছানা লইয়া বাটী আসিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"পায়রার ছানা তোমরা কোথায় পাইলে?

কুশি বলিয়া ফেলিল, —"রামদীন আমাদিগকে পাতকোর ভিতর হইতে ধরিয়া দিয়াছে।" —লব অমনি বলিয়া উঠিল,—"কুশি! কুশি! করিলে কি? বলিয়া দিলে! রামদীন যে মানা করিয়াছিল। রামদীন যে তোমাকে কাটিয়া ফেলিবে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কূপ! কোন্ কূপ হইতে রামদীন তোমাদিগকে পায়রা ধরিয়া দিয়াছে?"

কুশি উত্তর করিল,—"না পাঁড়েনী, আমি আর বলিব না। সে কূপের ভিতর গর্ত্ত আছে। সে গর্ত্তের ভিতর রামদীন কখন কখন শুইয়া থাকে। তাহার ভিতর রামদীনের টাকা আছে। বলিতে সে মানা করিয়াছিল। যদি বলি, সে আমাকে কাটিয়া ফেলিবে।

যাহা হউক দুইটিকে ভুলাইয়া আমি সকল কথা বাহির করিলাম। বুঝিলাম যে, আমাদের বাড়ী হইতে অল্প দূরে যে একটি বাগান আছে, আর সেই বাগানের ভিতর যে এক পুরাতন অন্ধকূপ আছে, রামদীন সেই কূপে হইতে কপোত শাবক ধরিয়া দিয়াছিল। আরও বুঝিলাম যে, সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়া যখন সরকারী খাজনাখানা লুঠ করে ও পথে মাঠে টাকা ছড়াইয়া ফেলে তখন রামদীন কিছু টাকা সংগ্রহ করে, আর সেই টাকা কূপের ভিতর সে লুকাইয়া রাখিয়াছে।

পরদিন আমি রামদীনকে মিনতি করিয়া বলিলাম, —"বাবা! অনাথ শিশু দুইটি আমাদের আশ্রয়ে আসিয়াছে। তাহাদিগকে প্রাচীন অন্ধকূপের নিকট লইয়া যাওয়া কি ভাল? কোন্ দিন পড়িয়া গিয়া শেষে কি তাহারা প্রাণ হারাইবে!" "তোমাকে বলিয়া দিয়াছে, বটে!" এই কথা বলিতে বলিতে রামদীন গজ্ গজ্ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

চারি পাঁচ দিন গত হইয়া গেল। এক দিন অপরাহ্ন তিনটার সময়, যে বাগানে সেই অন্ধকূপ আছে, ছেলে দুইটি সেই বাগানে খেলা করিতেছিল। কুশি সে দিন আমার নিকট হইতে আর একবার কাঁসি চাহিয়া লইয়াছিল। নিকটে সেই বাগানের বাহিরে, আমি গরু দুইটি ছাড়িয়া দিয়া, পাছে কাহারও ক্ষেতে পড়ে, এ নিমিত্ত চৌকি দিয়া বসিয়াছিলাম। ও দিকে কুশি কাঁশি বাজাইতেছিল। সেই শব্দ শুনিয়া ছেলেদের জন্য আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। কিছুক্ষণ পরে সহসা কাঁশির শব্দ বন্ধ হইয়া গেল। "লব তুমি পারিবে না, আমি নামি", এই কয়টি কথা সহসা আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। এই কয়টি কথা শুনিয়া আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। দাঁড়াইয়া সেই প্রাচীন কূপের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। দেখিলাম যে, লব উপরে দাঁড়াইয়া আছে, আর সর্ব্বনাশ! একটি ঝ্যাকড়ামাথা কূপের ভিতর নামিতেছে! সেই মুহূর্ত্তে ঝাঁকড়া মাথাটি কূপের ভিতর অদৃশ্য হইয়া গেল।

"ও মা! এ কি সর্ব্বনাশ হইল," "কে কোথায় আছ শীঘ্র এস," —এইরূপ চিৎকার করিতে করিতে আমি কূপের দিকে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িলাম। কূপের নিকট আসিয়া লবকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"লব! লব! কুশি কই?"

লব উত্তর করিল,—"তোমার কাঁশিখানি কূপের ভিতর পড়িয়া গিয়াছে, কুশি তাহা তুলিয়া আনিতে কূপের ভিতর নামিয়াছে।"

পাতকোর ভিতর আমি উঁকি মারিয়া দেখিলাম, কিন্তু কুশিকে দেখিতে পাইলাম না। আমি তাড়াতাড়ি কূপের ভিতর নামিতে চেষ্টা করিলাম; কিছুতেই নামিতে পারিলাম না। পুনরায় উপরে আসিয়া কূপের ভিতর মুখ করিয়া,—"কুশি! কুশি! করিয়া বারবার চিৎকার করিতে লাগিলাম। আমি কত ডাকিলাম, লব কত ডাকিল; কিন্তু কোন উত্তর নাই; কোন সাড়া শব্দ নাই। ঘোরতর বিপদ যে ঘটিয়াছে, তখন তাহা নিশ্চয় বুঝিতে পারিলাম। উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে লোক ডাকিতে লাগিলাম। কিন্তু সে মাঠের মাঝখানে কাহারও সাড়া পাইলাম না, জনপ্রাণী কেহ আসিল না। তখন আমি লবকে বলিলাম,—"তুমি শীঘ্র নবাবগঞ্জে গিয়া খবর দাও। দুই চারি জন পুরুষ মানুষ, যাহাকে দেখিতে পাও, তাহাকে ডাকিয়া আন। আমি কূপের ধারে দাঁড়াইয়া থাকি।"

লব নবাবগঞ্জের দিকে দৌড়িল। মাঝে মাঝে আমি কূপের ভিতর মুখ করিয়া, 'কুশি কুশি' করিয়া ডাকিতে লাগিলাম। মাঝে মাঝে চীৎকার করিয়া লোক ডাকিতে লাগিলাম। মাঝে মাঝে শিরে করাঘাত করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। মনে করিলাম যে, আর এখন লোক আসিলেই বা কি হইবে! যা হইবার, তা হইয়া গিয়াছে, ঘোর সর্বনাশ ঘটিয়াছে! কূপে তখন প্রায় চারি পাঁচ হাত জল ছিল। হয় কুশি তাহাতে ডুবিয়া মরিয়াছে, আর না হয় কূপের দূষিত বায়ুতে শ্বাসরোধ হইয়া তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। এখন লোক আসিলে আর কোন ফল হইবে না, কেবল তাহার মৃতদেহটি তুলিবে। আশাভরসা একেবারে গেল বটে, তথাপি মন বুঝিল না। প্রায় আধ ঘন্টা হইয়া গেল, তখনও লব ফিরিল না। আমি আর থাকিতে পারিলাম না। নিজে নবাবগঞ্জের দিকে দৌড়িলাম। পথে দেখিলাম লব দুই জন পুরুষ মানুষ সঙ্গে লইয়া আসিতেছে। তাহাদের এক জনের হাতে কূপ হইতে লোটা তুলিবার কাঁটা ছিল।

সকলে পুনরায় কূপের নিকট আসিলাম। রজ্জু-সংযুক্ত কাঁটা প্রথম তাহারা কূপের ভিতর নামাইয়া দিল। জল ভেদ করিয়া কাঁটা গিয়া ভূমি স্পর্শ করিল! চারিদিকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া কাঁটা দিয়া তাহারা কূপের নিম্নদেশ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিল। কাঁটাতে কোন বস্তুই বাধিয়া গেল না। কূপের ভিতর কুশির চিহ্ন মাত্রও তাহারা দেখিতে পাইল না। অবশেষে এক জন লোক কূপের ভিতর গিয়া নামিল। জলে ডুব দিয়া অনেক অনুসন্ধান করিল। কুশির মৃতদেহ তাহারা পাইল না। কুশি যে কূপের ভিতর পড়িয়াছে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। যখন সে কূপের ভিতর প্রবেশ করে, লব তখন উপরে; সে আগা-গোড়া সমুদয় দেখিয়াছে। দূর হইতে আমিও কুশির মাথা দেখিতে পাইয়াছিলাম। সুতরাং সে যে কূপে পড়িয়া মরিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। কিন্তু মৃতদেহ গেল কোথা?

যে লোকটি কূপের ভিতর নামিয়াছিল, সে বলিল,—"কূপের পার্শ্বে অনেকগুলি গহ্বর

আছে, এমন কি জলের ভিতরও পার্শ্বে একটি প্রকাণ্ড গর্ত্ত। সেই গর্ত্ত বোধ হয়, পাতাল পর্য্যন্ত গিয়াছে। রাক্ষসে হয় তো তাহার মৃতদেহ টানিয়া লইয়া খাইয়া ফেলিয়াছে।" ক্রমে সে স্থানে আরও অনেক লোক আসিল। আরও দুই চারি জন কূপের ভিতর নামিল। কিন্তু কুশির কিছুমাত্র সন্ধান হইল না। রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল। আর কি করিব! লবকে লইয়া আমি আমার কুটীরে যাইলাম।

তৃতীয় অধ্যায় – শুভ সংবাদ

"কুশি কোথায় গেল, কুশির কি হইল," এই কথা বলিয়া লব কাঁদিয়া আকুল হইল। দুই জনে এক প্রাণ এক শরীর বলিলেও হয়। আজ কুশিকে হারাইয়া চারিদিক সে অন্ধকার দেখিতে লাগিল। আমি মনে মনে ভাবিলাম যে, লবও বাঁচিবে না! তাহার পর আমার নিজের কথা। আমার ছেলে পিলে হয় নাই। কুশি যদি আমার নিজের ছেলে হইত, তাহা হইলে, সে দিন আমি যেরূপ হইয়াছিলাম, তাহা অপেক্ষা বোধ হয়, অধিক শোকাকুলা বা অধিক অধিরা হইতাম না। লবের ভয়ে অধিক কাঁদিতে পারিলাম না। মনের ভিতর শোকানল গুমে গুমে জ্বলিতে লাগিল। হায়! কি করিয়া আমি পুনরায় পাঁড়ের নিকট এ পোড়া মুখ বাহির করিব? আমি কুশির বাবাকে কি বলিব!

কোনরূপে সে কাল-রাত্রি কাটিয়া গেল। তাহার পর দিন লব ও আমি পুনরায় কূপের ধারে গিয়া বসিলাম। সান্ত্বনা করিতে করিতে আমি লবকে একবার বলিয়াছিলাম যে, "কুশি স্বর্গে গিয়াছে।" লব সেই কথাটি ক্রমাগত তোলা-পাড়া করিতে লাগিল।

লব বলিল, "স্বর্গ উপরে, যে স্থানে সূর্য্য উঠে, চন্দ্র উঠে, নক্ষত্র উঠে। কুশি সেখানে যায় নাই, কুশি কূপের ভিতর গিয়াছে। সেখানে অন্ধকার, সেখানে পাতাল; সেখানে স্বর্গ নয়। কুশি যদি স্বর্গে যায় তাহা হইলে প্রথম সে কূপ হইতে উঠিবে, তাহার পর স্বর্গে যাইবে। সেই সময় আমি তাহাকে ধরিয়া ফেলিব, তাহাকে স্বর্গে যাইতে দিব না। চল, পাঁড়েনি, তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত কূপের ধারে গিয়া আমরা বসিয়া থাকি।"

কি করি! ছেলেকে তা না হইলে কিছুতেই সুস্থির রাখিতে পারি না। কাজেই দুই জনে কূপের ধারে গিয়া বসিয়া রহিলাম। বাজার হইতে খাবার আনাইয়া লবকে দিলাম, কিন্তু সে কিছুই খাইল না। বিরসবদনে, একান্ত মনে, সমস্ত দিন কেবল কূপের দিকে সে চাইয়া রহিল। সন্ধ্যা হইলে অনেক বুঝাইয়া লবকে লইয়া বাড়ী যাইলাম।

কিন্তু লব বলিল,—"পাঁড়েনি! আজ আমি ঘরের ভিতর শুইব না। ঘরের বাহিরে এই স্থান হইতে পাতকো দেখা যায়, কূপের দিকে চাহিয়া আমি এই স্থানে বসিয়া থাকিব। কূপ হইতে কুশি যখন উঠিবে, তখন তাহাকে ধরিয়া আনিব।"

কি করি। চারপাই আনিয়া সেই স্থানে দুই জনে বসিয়া রহিলাম। জ্যোৎস্না রাত্রি ছিল। লব একদৃষ্টে কূপের দিকে চাহিয়া রহিল। আমার চক্ষু দিয়া অবিরল ধারায় অশ্রুবারি বিগলিত হইতে লাগিল।

রাত্রি প্রায় দুই প্রহর। শোকে তাপে অনাহারে, আমি অতিশয় শ্রান্ত হইয়াছিলাম।

বসিয়া বসিয়াই একটু অবসন্ন হইয়া পড়িলাম; আমার চক্ষু দুইটি একটু বুজিয়া আসিল। এমন সময় সহসা লব চীৎকার করিয়া উঠিল,—"ঐ কুশি, ঐ কুশি, ঐ কুশি আসিয়াছে।

এই কথা বলিয়া সে পাগলের ন্যায় উর্দ্ধশ্বাসে কূপের দিকে দৌড়িল। আমি তাহার পশ্চাৎ দৌড়িলাম। কিছু দূরে দেখি যে, সত্য সত্যই কুশি! টলিতে টলিতে কুশি আসিতেছে!

লব তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল, বলিল,—"কুশি এতক্ষণ কোথায় ছিলে ভাই! পাঁড়েনী বলে, তুমি স্বর্গে গিয়াছ। আমি বলিলাম, না পাঁড়েনী, কুশি স্বর্গে যায় নাই। সে একলা কোথাও যায় না। যেখানে যাই, আমরা দুই জনে একসঙ্গে যাই। এখন চল, ভাই, বাড়ী চল। আমি তোমাকে স্বর্গে যাইতে দিব না।"

অন্য সময় হইলে, বোধ হয় ভূত বলিয়া আমার মনে ভয় হইত। কিন্তু তখন আমার জ্ঞান ছিল না। তাড়াতাড়ি গিয়া আমি কুশিকে কোলে লইলাম! কোলে লইয়া তাহাকে বাড়ী আনিলাম। কিন্তু ছেলে কথা কহে না। তাহার শরীর কৃশ, মুখ মলিন, মুখে যেন কালি মাড়িয়া দিয়াছে। মুখে হাতে তাহার জল দিলাম। ঘরে দুধ ছিল, তাহাকে খাইতে দিলাম, কিঞ্চিৎ সুস্থ হইতে কুশির মুখ দিয়া দুই একটি কথা বাহির হইল। কি ঘটিয়াছিল, কুশির মুখ হইতে তখন ক্রমে ক্রমে সকল কথা জানিতে পারিলাম।

কুশি বলিল,—"পাতকোর ধারে আমরা দুই জনে খেলা করিতেছিলাম। মাঝে মাঝে একবার লব, একবার আমি, আমবা দুই জনে কাঁসি বাজাইতেছিলাম। এমন সময় কূপের ভিতর হইতে একটি পায়রা উড়িয়া গেল। কূপের ভিতর কোন্ স্থানে পায়রার বাসা আছে, তাহা দেখিবার নিমিত্ত আমি উঁকি মারিলাম। দৈবক্রমে আমার হাত হইতে কাঁসিখানি কূপের ভিতর পড়িয়া গেল। কূপের গা অনেক স্থানে ভাঙ্গা ছিল, ইটের খাটাল বাহির হইয়াছিল। কূপে যে জল আছে, তাহা আমি জানিতাম না। এ কূপ হইতে কেহ জল লয় না। সে জন্য মনে করিলাম যে, কূপে জল নাই, কূপ শুষ্ক। ইটের খাটাল দিয়া কূপের ভিতর অনায়াসে নামিতে পারা যায়। কাঁসির জন্য, পাঁড়েনী, তুমি দুঃখ করিবে, তাই লব কূপের ভিতর নামিতে চাহিল। কিন্তু আমি তাহাকে নামিতে দিলাম না। কাঁসি আনিবার নিমিত্ত আমি নিজেই নামিলাম।"

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া কুশি পুনরায় বলিল,—"ভাঙ্গা স্থানের গর্ত্তে ও ইটের খাটালে পা দিয়া কূপের ভিতর আমি আস্তে আস্তে নামিতেছিলাম। এমন সময় একবার যেখানে আমি পা রাখিয়াছিলাম, হঠাৎ সেই স্থানের ইট একটু ভাঙ্গিয়া গেল। আমি ঝুপ করিয়া অনেক নীচে গিয়া পড়িলাম; কিন্তু একেবারে জলে গিয়া পড়ি নাই। সে স্থানে ইটের ভিতর হইতে ছোট একটি গাছ বাহির হইয়াছিল। আমি সেই গাছটি ধরিয়া ঝুলিতে লাগিলাম। তৎক্ষণাৎ কে আসিয়া আমার কোমর জড়াইয়া ধরিল। আমাকে টানিয়া কূপের গায়ে একটি গর্ত্তে লইয়া গেল। সে স্থানে নিবিড় অন্ধকার। কে আমাকে ধরিয়া লইয়া গেল, তাহা আমি জানিতে পারিলাম না। তাহার পর তোমরা, 'কুশি, কুশি' করিয়া ডাকিতে লাগিলে। তখন সে বলিল,—"খবরদার! যদি কথা কও, কি উত্তর দাও, তাহা হইলে তোমাকে এখনি

কাটিয়া ফেলিব।" তাহার স্বর শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, সে রামদীন। ভয়ে আমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। তাহার পর উপরে তোমাদের আর কোন সাড়া পাইলাম না। তখন রামদীন বলিল,—তুমি এই স্থানে চুপ করিয়া বসিয়া থাক, আমি দেখিয়া আসি।' এই বলিয়া রামদীন উপরে উঠিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ নামিয়া আসিল। আসিয়া বলিল,—'এখন উপরে কেহ নাই। বড় যে পায়রার কথা পাঁড়েনীকে বলিয়া দিয়াছিলি? এখন কি হয়? এখন যদি তোকে মারিয়া ফেলি, তাহা হইলে তোর কোন্ বাপ রাখে? কিন্তু তোকে প্রাণে মারিব না। বিলক্ষণ সাজা দিয়া তাহার পর ছাড়িয়া দিব।' রামদীন এখন আমাকে উপরে উঠিতে বলিল। ইটে পা দিয়া ছোট ছোট গাছ ধরিয়া আমি উপরে উঠতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু আমি একলা কিছুতেই উপরে উঠিতে পারিতাম না। উপর হইতে রামদীন হাত বাড়াইয়া দিতে লাগিল। সেই হাত ধরিয়া ক্রমে ক্রমে অতি কষ্টে উপরে উঠিলাম। উঠিয়া দেখিলাম, তুমিও নাই, লবও নাই, কেহ কোথাও নাই। তখন তোমরা নবাবগঞ্জে লোক ডাকিতে গিয়াছিলে। হাত ধরিয়া রামদীন আমাকে টানিয়া লইয়া চলিল। বাগানের বাইরে সাহেবদের যে খোলার ঘরে সহিস ও চাকরেরা থাকিত, রামদীন আমাকে সেই স্থানে লইয়া গেল। আমাকে সে দুটি ছোলাভাজা খাইতে দিল। সেই ছোলাভাজা ও একটু জল খাইয়া আমি মাটির উপর শুইয়া পডিলাম। কিছুক্ষণ পরে রাত্রি হইল। আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

সে রাত্রিতে আর কি হইল, তাহা আমি জানি না। আজ দিন হইলে রামদীন তলওয়ার বাহির করিয়া কখন আমাকে কাটিতে যাইতেছিল, কখন আমাকে মারিতে যাইতেছিল। সে বলিল, —'তোরে এক একবার মারিয়া ফেলিতে মন হয়, কিন্তু আবার মন হয় না। তাহা না হইলে কূপের ভিতর গলা টিপিয়া তোরে আমি মারিয়া ফেলিতাম। কেমন! পাঁড়েনীকে আর কিছু বলিবি? পায়রার কথা বলিয়াছিলি, তাহাতে কোন ক্ষতি ছিল না। কিন্তু আমার টাকার কথা প্রকাশ করিয়া দিলি কেন?' আমি বলিলাম,—'পাঁড়েনীকে আর কখন কিছু বলিয়া দিব না। তুমি আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি বাড়ী যাই। আমার জন্য লব তো কত কাঁদিতেছে।' সে বলিল,—'এখনও নয়, আরও জব্দ করিয়া তাহার পর ছাড়িয়া দিব।' রামদীনের কাছে অনেক টাকা আছে, সাহেবদের কাপড় আছে। সে সকল আমাকে দেখাইল। তাহার পর সে টাকা গুণিতে বসিল। তাহার পর ঘরের ভিতর আমাকে বন্ধ করিয়া দ্বারে শিকল দিয়া, আজ রামদীন একবার বাহিরে গিয়াছিল। যদি আমি চীৎকার করি, তাহা হইলে আমাকে কাটিয়া ফেলিবে, এইরূপ ভয় দেখাইয়া সে একবার মাত্র অল্পক্ষণের নিমিত্ত বাজারে গিয়াছিল। বাজার হইতে পুরি আনিয়া সেও খাইল, আমাকেও খাইতে দিল। তাহার পর পুনরায় রাত্রি হইল। রামদীন নিদ্রা গেল। আজ আমি কোনরূপে পলাইব, এইরূপ মনে করিয়া জাগিয়া রহিলাম। অনেক রাত্রিতে রামদীনের ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে লাগিল। যখন আমার নিশ্চয় বোধ হইল যে, সে নিদ্রা গিয়াছে, তখন আমি আস্তে আস্তে দ্বার খুলিয়া পলাইয়া আসিলাম।'

এই গেল কুশির বিবরণ। পর দিন আমি রামদীনের নিকট গিয়া তাহার পায়ে হাতে অনেক পড়িলাম। ঘরে আমার দুধ হইত, তাহাকে এক লোটা দুধ দিলাম। ঘি করিয়া রাখিয়াছিলাম, সে ঘি তাহাকে দিলাম। বাজার হইতে পেড়া কিনিয়া দিলাম। এইরূপ বিধিমতে সান্ত্বনা করিয়া তাহাকে বলিলাম,—'বাবা! শিশু দুইটির মা নাই! আমাদের আশ্রয়ে আসিয়াছে। আমার নিকট কুশি কিছুমাত্র নিন্দা করে নাই। তোমার কি আছে না আছে, সে কথাও কিছু বলে নাই। আব যদি তুমি দু-পয়সা রোজগার করিয়া থাক, সে তো ভাল কথা। সে কথা আমি গোপন রাখিব, কাহাকেও কিছু বলিব না। তুমি তাহাদিগকে পায়রা ধরিয়া দিয়াছিলে, সে জন্য লব কুশি তোমার কত সুখ্যাতি করিয়াছিল। সে দিন তুমি পাতকোর ভিতর না থাকিলে কুশি নিশ্চয় জলে পড়িয়া মারা পড়িত। ভাগ্যে তুমি সে সময পাতকোর ভিতর ছিলে, তাই তাহার প্রাণ বাঁচিয়া ছিল। যদি বাছা, ছেলেটির তুমি প্রাণ রক্ষা করিলে, তবে আর তাহাকে কিছু বলিও না।'

কিছু দিন পরে ইংরেজের পুনরায় রাজত্ব হইল। দেশে পুনরায় বিচার-আচার আরম্ভ হইল, অরাজকতা ঘুচিল, লুট-পাট, খুন-খাবারি সব বন্ধ হইয়া গেল। দেশে পুনরায় শান্তি সংস্থাপিত হইলে, গোবিন্দবাবু হরডুই হইতে স্ত্রীকে আনাইয়া ও আমার নিকট হইতে ছেলে দুইটিকে লইয়া স্বদেশে চলিয়া গেলেন। আমাদিগকে পারিতোষিক স্বরূপ তিনি যে টাকা দিলেন, পাঁড়ে সেই টাকা দিয়া জমি লইয়া চাষ করিতে লাগিলেন। আজ দশ বৎসর হইল, পাঁড়ে পরলোক গমন করিয়াছেন। এক্ষণে আমি লোকের গম পিষিয়া ও নানা প্রকার দুঃখ ধান্ধা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করি।

কিন্তু বাবু । ছেলে দুইটির জন্য এখনও আমার প্রাণ কাঁদে। সেই পর্য্যন্ত লব কুশির আমি কোন সংবাদ পাই নাই। তাহারা কোথায় আছে, কেমন আছে বলিতে পারেন?'

যাঁহাদের নিকট পাঁড়েনী লব ও কুশীর গল্প করিতেছিল, সেই বাঙ্গালী বাবুগণ উত্তর করিলেন,—'না, পাঁড়েনি! আমরা তাহাদিগকে জানি না; যদি তুমি তাহাদের বাড়ী কোন্ গ্রামে, কোন্ জেলায়, যখন তাহার কিছুই তুমি জান না, তখন কি করিয়া আমরা তাহাদের সন্ধান লইব?'

এই কথা শুনিয়া, আপনার পারিতোষিক লইয়া বিরস বদনে পাঁড়েনী চলিয়া গেল।

শম্ভু ঘোষের কন্যা

প্রথম পরিচ্ছেদ – হরিদাসী

'হ্যাঁ! মহাশয়! ইহার নাম হরিদাসী, আমার এক মাত্র কন্যা। হরিদাসী আমাদের প্রাণ, গৃহিণীর ও আমার। হরিদাসীকে এক দণ্ড না দেখিলে পৃথিবী আমরা আঁধার দেখি। হরিদাসীকে একবার ভাল করিয়া দেখুন, মহাশয়! আমাদের ঘরে এমন মেয়ে হয় না রাজার ঘরে হইলে তবে শোভা পায়।'

সত্য সত্যই হরিদাসীর রূপ-লাবণ্য দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। কন্যাটির বয়স দশ বৎসরের অধিক নয়। তথাপি তাহাকে একবার দেখিলে, বার বার দেখিতে ইচ্ছা হয়। রংটি ফুটফুটে; চক্ষু দুইটি উজ্জ্বল, ঢুল ঢুলে ও ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, চক্ষুর পাতাগুলি ঘন দীর্ঘ; নিবিড় মেঘরাশির ন্যায় মাথার চুল;—ফল কথা, কৃষকের ঘরে এরূপ কন্যা অতি বিরল।

হরিদাসী শম্ভু ঘোষের কন্যা। শম্ভু ঘোষের নিবাস বীরভূম জেলা। ইঁহার ঘরে আজ কুটুম্ব আসিয়াছেন। বৈশাখ মাস, বেলা দুই প্রহর, রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। এমন সময় নাচিতে নাচিতে হাসিতে হাসিতে হরিদাসী আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল চালাখানি সহসা যেন আলোকির হইল। কুটুম্ব হরিদাসীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। তাহা দেখিয়া হরিদাসীর পিতা উপরের কথাগুলি বলিলেন।

শম্ভু ঘোষ পুনরায়,—'হ্যাঁ মহাশয়! ধর্ম কর্ম করিলে জীবের প্রতি দয়া করিলে ভগবান্ যে প্রসন্ন হয়, তাহা আমি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি।'

কুটুম্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, —'আপনি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন? কি হইয়াছিল?'

শম্ভু বলিলেন,—'আপনি একটু শয়ন করুন, কাছে বসিয়া আমি সেই গল্প করি। বড় গল্প করিয়া আপনাকে আমি বিরক্ত করিব না, গল্পটি ছোট। হরিদাসী, মা। তুমি ঘরের ভিতর যাও। শম্ভু বলিলেন,—আঁজ পাঁচ বৎসরের কথা বলিতেছি। একবার ধান বেচিতে আমি শিউড়ি গিয়াছিলাম। আমার নিজের সামান্য একখানি গরুর গাড়ী আছে। ধানের থলিগুলি সেই গাড়ীতে লইয়া গিয়াছিলাম।

যাইবার চারি পাঁচ দিন পূর্ব হইতে পাড়া প্রতিবাসী সকলে আসিয়া বলিতেছিলেন,— 'ঘোষের পো! আমার জন্য এ জিনিস আনিও, কেহ বলিতেছিলেন, আমার জন্য সে জিনিস আনিও। কাহারও কাপড়, কাহারও বাসন, কাহারও শিল, এইরূপ নানাবিধ জিনিস আনিতে সকলে আমাকে অনুরোধ করিতেছিলেন। তাহার পর আমার নিজের গৃহিণীর ফর্দ। সেও একরাশি জিনিসের ফর্দ! আমি লেখা পড়া জানি না মন আমার কাগজ কলম! যাহার যে বস্তু আবশ্যক, সে সব আমি মনে করিয়া লসলাম। অবশেষে হরিদাসীকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'তোমার কি চাই, মা?'

হরিদাসী উত্তর করিল,—'আমার জন্য ভাল একটি কাঠোর পুতুল আনিও, বাবা।'

যাইবার দিন প্রাতঃকালে হরিদাসী গাড়ীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। আদর করিয়া আমি তাহাকে কোলে লইলাম। আমার বক্ষঃস্থলে মাথা রাখিয়া হরিদাসী পুনরায় বলিল,— 'আমার জন্য ভাল দেখিয়া কাঠের পুতুল আনিও বাবা।'

আমি উত্তর করিলাম,—'হ্যাঁ, মা! নিশ্চয় আনিব। শিউড়ির বাজারে সকলের চেয়ে ভাল যে কাঠের পুতুল পাই, তোমার জন্য তাহাই আনিব।'

আমাদের গ্রাম হইতে শিউড়ি দশ ক্রোশ পথ। সন্ধ্যা বেলা সে স্থানে উপস্থিত হইলাম। তাহার পর ধান বেচিলাম। কতক কতক জিনিসও ক্রয় করিলাম। তৃতীয় দিন যাহা বাকী ছিল, সেই সমস্ত জিনিস-পত্র কিনিলাম। বলা বাহুল্য যে, হরিদাসীর জন্য একটি কাঠের

পুতুল কিনিলাম। এই সব কাজ সারিতে অনেকটা বেলা হইয়া গেল। আজ আমার বাটী ফিরিবার কথা সকলকে নিশ্চয় করিয়া বলিয়া আসিয়াছিলাম যে, তৃতীয় দিন যেমন করিয়া পারি বাড়ী আসিয়া পৌঁছিব। কিন্তু এত বেলায় শিউড়ি হইতে বাহির হওয়া উচিত নয়, কারণ বাড়ী পৌঁছিতে রাত্রি হইয়া যাইবে। সময়টাও ভাল ছিল না। দেশে এক প্রকার আকাল উপস্থিত হইয়াছিল। ঠেঙাড়েরা পথে দুই একটা মানুষও মাবিয়াছিল। ধান বেচিয়া আমার সঙ্গে টাকা ছিল। এই সকল কারণে একবার মনে করিলাম, আজ আর বাটী ফিরিব না। কিন্তু না গেলে বাড়ীর লোক অতিশয় চিন্তিত হইবে। তাহার পর হরিদাসীর চাঁদমুখখানি দেখিবার নিমিত্ত প্রাণ বড়ই কাতর হইয়া উঠিল। যা থাকে কপালে, যাই! অবশেষে এই মনে করিযা দুর্গা বলিযা যাত্রা কবিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ – বাবা গো

শীতকালে! দারুণ শীত। তাহার উপর সমস্ত দিন বাদলাব মত করিযাছিল। টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। হু-হু শব্দে বাতাস বহিতেছিল। সন্ধ্যাবেলা বিলক্ষণ এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গেল। আমার কাপড়-চোপড সব ভিজিয়া গেল। শীতে আমি কাঁপিতে লাগিলাম। সর্ব শবীর আমার অবশ হইয়া গেল। তখনও আমার গ্রাম হইতে আমি পাঁচ ক্রোশ দূরে।

দ্রুতবেগে গাড়ী হাঁকাইয়া দিলাম। আমাদের গ্রাম হইতে দুই ক্রোশ দুরে বড় মাঠের মাঝখানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। পুনরায় ঘোর মেঘ কবিয়া আসিল। মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল তাহার উপর প্রবল ঝড় উপস্থিত হইল। নিবিড় অন্ধকাব। কোলের মানুষ দেখা যায় না। আমাদের গ্রাম হইতে এক ক্রোশ দূরে ছোট একটি নদী আছে। সেই নদীর ধারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। নদীটি পার হইয়াছি , এমন সময় হঠাৎ একবার শিশু-কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। কোন শিশু যেন কাঁদিতেছে, এইরূপ বোধ হইল! কিন্তু একবারের অধিক আর সে শব্দ শুনিতে পাইলাম না। কারণ, তাহার পরক্ষণেই বাতাসের ঝট্‌কা প্রবল হইয়া উঠিল। সেই বাতাসের শব্দে অন্য শব্দ সব ডুবিয়া গেল।

মনে করিলাম এ কিছু নয় ভ্রান্তিবশতঃ ওরূপ শব্দ আমার কানে লাগিয়াছিল। এরূপ ভাবিতেছি, এমন সময় আবার 'বাবা গো!' এইরূপ একটি শিশুকণ্ঠ-শব্দ আমার কানে প্রবেশ করিল। তখন আমার মনে অতিশয় ভয় হইল। একবাব মনে করিলাম, এ আর কিছু নয়, এ ভূত কি পেতিনী আবার মনে হইল, না তা নয়, এ ঠেঙাড়ে, আমাকে মারিয়া ফেলিবার জন্য এরূপ কৌশল করিতেছে। একবার মনে করিলাম যে, গাড়ী ছাড়িয়া আমি দৌড়িয়া পলায়ন করি। কিন্তু গরু জোড়াটি নূতন কিনিয়াছিলাম্। তাহার মায়া ছাড়িতে পারিলাম না। গাড়ী দ্রুত-বেগে হাঁকাইয়া দিলাম।

দুই চারি পা গিয়াছি, এমন সময় আবার 'মা গো!' বলিয়া শব্দ হইল। তখন মনে আমার চিন্তা হইল—সত্য সত্যই যদি কোন ছেলে এই মাঠের মধ্যে, এই রাত্রিকালে, এই

দুর্য্যোগে, এই শীতে, একা পড়িয়া থাকে! তাহা হইলে শম্ভু ঘোষ, তুমি কি বলিয়া ভয়ে পলায়ন করিতেছ? তোমার মনে কি দয়ামায়া নাই? তুমি না যাদব ঘোষের বেটা? ছি। শম্ভু ঘোষ! তোমার এরূপ করা উচিত নয়।

এইরূপে মনকে প্রবোধ দিয়া আমি গাড়ী হইতে নামিলাম। যে দিক হইতে শব্দ আসিতেছিল সেই দিকে আস্তে আস্তে যাইতে লাগিলাম। কিন্তু ঘোর অন্ধকার! কিছু দেখিবার যো ছিল না। যথাসাধ্য এ দিক্ ও দিক খুঁজিতে লাগিলাম। কিছুই পাইলাম না। গাড়ীতে ফিরিয়া আসিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় একবার বিদ্যুৎ হইল। সেই আলোকে দেখিলাম যে, আমার নিকট হইতে অল্প দূরে নদীর ধারে ঝোপের ভিতর সাদা রঙ্গের কি পড়িয়া রহিয়াছে। নিকটে গিয়া হাত দিয়া দেখিলাম যে, একটি চারি পাঁচ বৎসরের শিশু! তখনও জীবিত আছে, শীতে কাঁপিতেছে, কিন্তু কথা কহিতে পারে না। যাহার শিশু হউক, হাড়ীর হউক, আর মুচির হউক, বালক হউক, কি বালিকা হউক, ভগবানের জীব! আমি যে তাহার প্রাণ রক্ষা করিতে পারিলাম, সে জন্য আমার মনে ঘোর আনন্দের উদয় হইল।

তাড়াতাড়ি আমি তাহাকে বুকে তুলিয়া লইলাম। শিশুটিকে গাড়ীর উপর শয়ন করাইলাম। আমার পাছুড়িখানির যে দিক্‌টি শুষ্ক ছিল, সেই দিক্‌টি তার গায়ে চাপা দিলাম। এইরূপ করিয়া গাড়ী হাঁকাইয়া দিলাম।

যখন আমার বাড়ীর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তখন রাত্রি প্রায় দেড় প্রহর হইয়াছিল। মনে করিয়াছিলাম, সকলে নিদ্রা গিয়াছে; কিন্তু তাহা নহে। দূর হইতে দেখি যে, আমার বাড়ীতে অনেকগুলি আলো জ্বলিতেছে, অনেকগুলি মেয়ে-পুরুষ আমার বাটীতে আসিয়াছে। আমার ভয় হইল। মনে করিলাম, কি বিপদ ঘটিয়াছে! রাস্তায় গাড়ী রহিল, আমি লাফাইয়া পড়িলাম। দৌড়িয়া গিয়া গৃহে উপস্থিত হইলাম। আমার স্ত্রী কাঁদিয়া উঠিল। পাড়ার মেয়েরা হাউ কাউ করিয়া উঠিল। শশব্যস্ত হইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি হইয়াছে? হরিদাসী ভাল আছে তো? হরিদাসী কই?'

গোলমালের ভিতর হইতে অনেক কষ্টে এক জনের মুখ হইতে শুনিলাম যে, হরিদাসী হারাইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যা হইতে তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। গ্রামের ঘরে ঘরে, মাঠে ঘাটে সর্বত্র অনুসন্ধান হইয়াছে; কিন্তু কোথাও হরিদাসীকে পাওয়া যায় নাই। তাহার গায়ে গহনা ছিল, নিশ্চয় তাহাকে চোরে মারিয়া ফেলিয়াছে।

এত দূর বলিয়া কুটুম্বের দিকে লক্ষ্য করিয়া শম্ভু ঘোষ জিজ্ঞাসা করিলেন,—মহাশয় নিদ্রা গেলেন কি?'

কুটুম্ব উত্তর করিলেন,—'না নিদ্রা যাই নাই। সকল কথা শুনিতেছি। তাহার পর কি হইল?'

শম্ভু পুনরায় বলিলেন,—নয়নের পুতলী আমার হরিদাসী নাই, প্রতিবাসিনীর মুখে এই নিদারুণ শুনিয়া আমি জ্ঞান-হারা পাগলের ন্যায় হইয়া পড়িলাম। কাহাকেও কোন কথা

না বলিয়া পুনরায় ঘর হইতে বাহির হইলাম। রাস্তায় যে স্থানে আমার গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল, নক্ষত্র বেগে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। গাড়ী হইতে তুলিয়া শিশুটিকে বুকে লইলাম। দৌড়িয়া পুনরায় ঘরের ভিতর গিয়া প্রদীপের আলোকে শিশুর মুখখানি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম। সেই চাঁদ মুখখানি দেখিয়া শূন্য দেহে আমি প্রাণ পাইলাম। তাহার পর অনেক তাপ দিয়া, অনেক শুশ্রূষা করিয়া মেয়েকে আমরা ভাল করিলাম।

কুটুম্ব জিজ্ঞাসা করিলেন,—'বাটী হইতে মাঠের মাঝে সে কি করিয়া গিয়াছিল?'

শম্ভু বলিলেন,—'আমি যে সে দিন বাটী পৌঁছিব, হরিদাসী তাহা শুনিয়াছিল। বাবা কখন আসিবেন, কখন, আমার জন্য পুতুল আনিবেন, সমস্ত দিন সে বার বার সকলকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিল। বৈকালবেলা আর থাকিতে পারিল না। চুপি চুপি একাকী আগে হইতে আমাকে আনিবার নিমিত্ত সে বাটী হইতে বাহির হইল। পাঁচ বৎসরের শিশু! পথ-ঘাট জানে না। মাঠের মাঝখানে গিয়া পড়িল। সন্ধ্যা হইল, ঝড়-জল হইল, অন্ধকার হইল। জনশূন্য সেই মাঠের মাঝখানে কত কাঁদিল, কাহারও সাড়া শব্দ পাইল না। ভয়ে ও শীতে মৃতপ্রায় হইয়া সেই নদীর ধারে ঝোপের ভিতর গিয়া শুইয়া পড়িল। ভাগ্যে আমার মনে একটু দয়ার উদয় হইল, তাই সে রাত্রিতে আমার মেয়ে বাঁচিল। সেই জন্য বলি যে, জীবে দয়া করা ভাল। যে জীবে দয়া করে, ভগবান তাহার প্রতি কৃপা করেন।'

ললিত ও লাবণ্য

প্রথম পরিচ্ছেদ – প্রাইজের পুস্তক

হাসিতে হাসিতে ললিত আজ বাটী আসিল। স্কুলে ললিত আজ প্রাইজ পাইয়াছে। ললিত সাত বৎসরের ছেলে। কিন্তু এরূপ সুবোধ শিশু পৃথিবীতে অতি বিরল। প্রাইজের পুস্তকগুলি ললিত মাতাকে দেখাইতে লাগিল। পাঁচ বৎসরের ভগিনী লাবণ্য আহ্লাদে কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। ললিত বলিল,—'মা! আমি ভাল পড়া বলিতে পারি, সে জন্য এই বইখানি পাইয়াছি; কাহারও সহিত ঝগড়া করি না, একটিও মিথ্যা কথা বলি না, সে জন্য এই বইখানি পাইয়াছি।' ললিতের মা বলিলেন,—'বাঁচিয়া থাক, বাবা! চিরজীবী হও!'লাবণ্য জিজ্ঞাসা করিল,—'ইহাতে ছবি আছে, দাদা?'

ললিত উত্তর করিল.—'কেবল একটি গরু ও একটি ঘোড়ার ছবি আছে; ভাল ছবি নাই।' মাতার দিকে নিরীক্ষণ করিয়া, ললিত পুনরায় বলিল,—'মা! বইগুলি বাবাকে দেখাইব? কিন্তু মা, ভয় করে। আর সকলের বাবা ছেলেদের আদর করেন, কিন্তু আমাদের বাবা কেবল বকেন কেন, মারেন কেন, মা? কিন্তু মা! যা থাকে কপালে, কেবল আজ আমি তাঁহাকে প্রাইজের বইগুলি দেখাইব।

ছেলের কথা শুনিয়া ললিতের মা ঘাড় হেঁট করিয়া রহিলেন, তাঁহার চক্ষু দিয়া টস্ টস্

করিয়া জল পড়িতে লাগিল। মাতার কান্না দেখিয়া লাবণ্য তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিল। লাবণ্য কাঁদিতে লাগিল। হয় তো মন্দ কথা বলিয়াছি, এই মনে করিয়া ললিত অপ্রতিভ হইল। সন্ধ্যা হইলে পিতা বাটী আসিলেন। রাগত মনে আরক্ত নয়নে তিনি স্বতন্ত্র ঘরে গিয়া বসিলেন। কিছু পরে কাঁপিতে কাঁপিতে ললিত দ্বারের নিকট গিয়া বলিল,—'বাবা! আজ আমি প্রাইজ পাইয়াছি, এই বইগুলি পাইয়াছি!'

ঘরের ভিতর হইতে কর্কশ বচনে পিতা উত্তর করিলেন।' 'যা যা, ছোঁড়া, আমাকে বিরক্ত করিসনে।'বিষণ্ণ বদনে ললিত ফিরিয়া যাইতেছে, এমন সময় পিতা কি ভাবিয়া পুনরায় বলিলেন,—'কই! কি বই পাইয়াছিস, দেখি?'

ললিত পুস্তক দুইখানি লইয়া পিতার নিকট গেল। পিতা বলিলেন,—'বই এখন এইখানে রাখিয়া যা, পরে দেখিব।' পুস্তকগুলি পিতার নিকট রাখিয়া ললিত চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে পিতা পুস্তক দুইখানি বাজারে লইয়া বিক্রয় করিলেন! নয় আনা পয়সা হইল। সেই নয় আনা পয়সায় মদ খাইয়া প্রতিদিন যে স্থানে তিনি রাত্রিযাপন করেন, সেই স্থানে গিয়া রাত্রিযাপন করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ – মেয়ের হাতের বালা

ললিতের পিতার কিছু সম্পত্তি ছিল। সে সমুদয় তিনি নষ্ট করিযাছেন। যে দুই বিষয়ে মানুষ অধঃপাতে যায়, সে দুই বিষয় এখনও পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। সংসার চলিবার আর উপায় নাই; কিন্তু তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আসামে ভাল কর্ম করেন। বড় ভ্রাতৃবধূকে তিনি মাতার ন্যায় ভক্তি করেন, আর ললিত ও লাবণ্যের প্রতি তাঁহাব প্রগাঢ় স্নেহ। পাছে ইহাদের কোনওরূপ কষ্ট হয়, সে নিমিত্ত তিনি প্রতি মাসে টাকা পাঠাইয়া দেন। যে টাকা পাঠাইয়া দেন, তাহাতে সংসার সুখে স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে। কিন্তু কর্তাটির দোষে সংসারে নিয়তই কষ্ট।

চারি মাস পূর্বে ভাই কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। সংসারের কথা লইয়া দুই ভ্রাতার বাদানুবাদ ও অবশেষে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। নানারূপ বকাবকির পর কনিষ্ঠ বলিলেন,—'তুমি যাহা জান, তাহা কর। এখন হইতে তোমাকে আর একটি পয়সাও দিব না।' —ললিতের মাতা সেই কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন। সুতরাং স্বামী যখন তাঁহাকে বলিলেন যে,—'ভাই আর আমাকে টাকা পাঠায় না,' তখন কাজেই তাঁহাকেই সে কথায় বিশ্বাস করিতে হইল।

ভাই রাগবশতঃ টাকা বন্ধ করিবার কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃত তাহা করেন নাই। তিনি মাসে মাসে টাকা পাঠাইতেছিলেন। স্ত্রীকে লুকাইয়া কর্তাটি সে টাকা লইয়া অপব্যয় করিতেছিলেন। সে নিমিত্ত সেই দিন হইতে সংসারে আরও ঘোরতর কষ্ট হইল।

খিদিরপুরে এক বিধবা স্ত্রীলোকের বাটীতে দুইটি ঘর ভাড়া করিয়া ইঁহারা বাস করিতেছিলেন। বিধবার এই ভাড়াটিই ছিল দিনযাপনের একমাত্র সম্বল। তিন মাস তিনি ভাড়া পান নাই। সে জন্য অনেক তাগাদা ও অনেক ভর্ৎসনা করিয়া অবশেষে বিধবা

ইঁহাদিগকে বাটী হইতে উঠিয়া যাইবার নিমিত্ত বার বার বলিতেছিলেন।

এই একখানি যা গহণা ছিল, ললিতের মাতা তাহা বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু সে টাকাও স্বামী কাড়িয়া লইয়া বাহিরে খরচ করিয়া ফেলিলেন। নিজের যাহা হউক, শিশু দুইটিকে লইয়া ললিতের মাতা বড় বিপদে পড়িলেন। তাহাদের আহারের নিমিত্ত ঘটী-বাটি পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন। দুই তিনখানি থালা, দুই একটি লোটা ও লাবণ্যের হাতের দুইগাছি ছোট ছোট সোনার বালা, ইহা ভিন্ন ঘরে আর কিছুই রহিল না।

কিন্তু সে দুইগাছি বালাও এক দিন গেল। কর্ত্তাটি একদিন মেয়ের হাত হইতে সেই বালা দুইগাছি বলপূর্ব্বক খুলিয়া লইলেন। পাঁচ বৎসরের শিশুকন্যা। মাটীতে গড়াগড়ি দিয়া সে কাঁদিতে লাগিল। পিতার মনে দয়ার লেশমাত্র হইল না। বালা দুইগাছি লইয়া স্বামী চলিয়া গেলে, ললিতের মাতা, ললিত ও লাবণ্য তিন জনে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অবশেষে ললিত বলিল,—'লাবণ্য, তুমি কাঁদিও না। আমি যখন টাকা আনিতে শিখিব, তখন তোমাকে বড় বড় বালা কিনিয়া দিব।'

তৃতীয় পরিচ্ছেদ – এখন হইতে ভাল হইব

কর্ত্তাটি এরূপ নিষ্ঠুর আচরণ করিয়া বালা লইয়া গেলেন সত্য, কিন্তু তাঁর সুখ হইল না। প্রতিদিন যে স্থানে তিনি রাত্রিযাপন করেন, যাহার জন্য তিনি স্ত্রী-পুত্র কন্যাকে এরূপ নিদারুণ ক্লেশ দেন, বালা বিক্রয়ের টাকা যাহার শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিয়াছিলেন, দুই চারি দিন পরে সে তাঁহাকে অনেক অপমান করিয়া বাটী হইতে বাহির করিয়া দিল। ললিতের পিতা শোকে অধীর হইয়া পড়িলেন।

ক্ষুণ্ণ মনে ললিতের পিতা সন্ধ্যার পর বাটী আসিলেন। নিঃশব্দে আপনার ঘরে গিয়া শয়ন করিলেন।

পাশের ঘরে শিশু দুইটিকে লইয়া ললিতের মাতা নিদ্রা যাইতেছিলেন। ঘোর রাত্রিতে স্বামীর ঘরে একরূপ শব্দ শুনিয়া সহসা তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাড়াতাড়ি প্রদীপ জ্বালিয়া স্বামীর ঘরে গিয়া দেখিলেন যে, স্বামী 'গোঁ গোঁ' শব্দ করিতেছেন, তাঁহার মুখ দিয়া ফেনা বাহির হইতেছে, চক্ষু দুইটি রক্তবর্ণ হইয়াছে। কি হইয়াছে, বার বার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। বাবু কোন উত্তর দিলে না। ললিতের মাতা তখন আর কি করিবেন? সহায় নাই, সম্পত্তি নাই, টাকা নাই—যে, তৎক্ষণাৎ ডাক্তার আনিবেন। বাড়ীওয়ালী বিধবাকে ডাকিয়া মাথায় জল দিয়া, তাঁহার যথাশক্তি শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

প্রাতঃকাল হইল। নিকটস্থ একটি ডাক্তারের নিকট গিয়া ললিত অনেক কাঁদিয়া ও মিনতি করিয়া তাঁহাকে লইয়া আসিল। ডাক্তার আসিয়াই বলিলেন যে, 'ইনি আফিম খাইয়াছেন; আমি পুলিশে খবর দিই। ইঁহাকে হাঁসপাতালে পাঠাইতে হইবে।'

ললিতের পিতার তখন জ্ঞান ছিল। হাঁসপাতালে যাইতে তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না। ডাক্তারের নিকট অনেক মিনতি করিয়া পুলিশে সংবাদ-প্রেরণবিষয়েও তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলেন। ডাক্তার যথাসাধ্য বাটীতেই তাঁহার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন।

সমস্ত দিন গেল। সন্ধ্যার পর তাঁহার শরীর একটু সুস্থ বলিয়া বোধ হইল। রাত্রি নয়টার সময়ে তিনি স্ত্রী ও পুত্র কন্যাকে আপনার নিকট বসাইয়া স্নেহের সহিত বলিতে লাগিলেন,—'দেখ, আমি এতদিন অন্ধ ও পাগল হইয়াছিলাম; তোমরা আমাকে ক্ষমা কর।' ললিতের মাতা বলিলেন,—'নিশ্বাস ফেলিতে তোমার কষ্ট হইতেছে, এখন আর অধিক কথা কহিয়া কাজ নাই। সম্পূর্ণরূপে ভাল হইয়া তাহার পর যাহা কিছু বলিবার তখন বলিবে।'

হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া ললিতের পিতা উত্তর করিলেন,—না না। আমি বেশ আছি। আমার শরীরে এখন আর কোন অসুখ নাই। ললিত বাবা! লাবণ্য মা! এস বাবা, এস মা, আমার কাছে এস! ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছে, তবু কেন চারিদিক অন্ধকার হইয়া আসিতেছে? আমি তোমাদিগকে ভালরূপ দেখিতে পাইতেছি না। আমি বড় নিষ্ঠুর, তোমাদিগকে আমি বড় কষ্ট দিয়েছি। কিন্তু এখন হইতে আমি খুব ভাল হইব। এখন হইতে তোমাদিগকে খুব আদর করিব। আমি খুব ভাল হইব; এখন হইতে আমি খুব—'

বাকি কথা আর মুখ দিয়া বাহির হইল না! চক্ষু দুইটি কপালে উঠিল। আর তাঁহার ভাল হইতে হইল না, জনমের মত ললিতের পিতার সব ফুরাইল!

ললিতের মাতা কাঁদিয়া উঠিলেন। মাটীতে পড়িয়া ললিত কাঁদিতে লাগিল। লাবণ্য কাঁদিতে লাগিল। সে রাত্রিতে আর কিছুই হইল না। পর দিন ঘটী বাটি যাহা কিছু বাকি ছিল, তাহা বিক্রয় করিয়া কর্তার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া নির্বাচিত হইল। সহায় সম্পত্তি হীনা স্ত্রী, শিশুসন্তান দুইটিকে লইয়া যে কি করিবেন, কি খাওয়াইবেন, তাহার কোন উপায় ছিল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ – মা, তুমি না খাইলে আমি খাইব না

মা কথাগুলি বলিয়া দিলেন, ললিত শিশুহাতে কাকাকে পত্র লিখিল,—'খুড়া মহাশয়! পিতার হঠাৎ পরলোক হইয়াছে। আপনি কয় মাস খরচ দেন নাই। তাহাতে ঘরের গহনা-গাঁটী, বাসন-কোষণ যাহা ছিল, সমুদয় বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। মাতার হাতে আর কিছুই নাই। আপনি শীঘ্র আসিয়া আমাদের যাহা হয় বিলি করিবেন। তা না করিলে অনাহারে আমরা মরিয়া যাইব।'

বাড়ীওয়ালী বলিলেন,—'ললিতের মা! আমি অনাথা বিধবা। ঘর দুইটি ভাড়া দিয়া আমার চলে। তিন মাস ভাড়া পাই নাই। আমি কি করিয়া খাই, তা বল। তুমি বাছা, অন্য স্থানে যাও।'

ললিতের মাতা উত্তর করিলেন,—'দিদি! ললিতের কাকাকে চিঠি লেখা হইয়াছে। চিঠি পাইলেই তিনি আসিবেন। তখন তোমার ভাড়া দিয়া আমরা চলিয়া যাইব। আর দুই দিন অপেক্ষা কর। তা না করিলে, শিশু দুইটিকে লইয়া কোথায় যাই, তা বল? আমার বাপের বাড়ীতে কেহ নাই যে, এক দিন গিয়া দাঁড়াই।'

দুই দিন গেল, তিন দিন গেল। বাড়ীওয়ালী পুনরায় উঠিয়া যাইবার নিমিত্ত উত্তেজনা করিলেন। চারিদিন গেল, পাঁচ দিন গেল, তবুও কাকার কোন সংবাদ নাই। বাড়ীওয়ালী

পুনরায় বলিলেন,—'দুই ভাইয়ের তুমুল ঝগড়া হইয়াছিল। তোমার স্বামী তাঁহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। তোমার দেবর, বাছা, আসিবেন না; আর তিনি তোমাদের মুখ দেখিবেন না। সে আশা ছাড়িয়া দাও। আমার বাটী হইতে আজই উঠিয়া যাও।'

যাহা হউক, আরও দুই দিন কাটিয়া গেল। তবুও কাকার কোনও সংবাদ নাই। সাত দিনের দিন, 'আমি তারকেশ্বরে যাই—এই কথা বলিয়া, ললিতের মাতা ও শিশু দুইটিকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়া দ্বারে চাবি দিয়া, বাড়ীওয়ালী কোথায় চলিয়া গেলেন।

শিশু দুইটির হাত ধরিয়া ললিতের মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে রাস্তা দিয়া যাইতে লাগিলেন। কোথায় যে যাইবেন, তাহা কিছু ঠিক করিতে পারিলেন না। ক্রমে গড়ের মাঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নিভৃত একটি পুষ্করিণীর ধারে বসিয়া অনেকক্ষণ কাঁদিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে মনে হইল যে, তাঁহার পিতার একজন জ্ঞাতি কলিকাতায় বাস করেন। তাঁহার বাটীতে ললিতের মাতা একবার গিয়াছিলেন। কুলের কুলবধু; পথ-ঘাট জানেন না। অনেক সন্ধান করিয়া, অতি কষ্টে অপরাহ্নে, তাঁহার বাটী আসিয়া ললিতের মাতা দিন কয়েকের নিমিত্ত আশ্রয় করিলেন।

পিতার জ্ঞাতি অতি নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি বলিলেন—'তোমাদের এখন অশৌচ অবস্থা। আমাব ঘর দ্বার অধিক নাই। আমাকে ত্রিসন্ধ্যা করিতে হয়, পূজা-অর্চ্চনা করিতে হয়, শুদ্ধাচারে থাকিতে হয়, তাহার উপর আমার স্ত্রীর শুচি বাই। তোমার ছেলে-পিলে আমার পূজার দ্রব্যাদি সব ছুঁইয়া ফেলিবে। আমার এখানে বাছা, স্থান হইবে না।

নিরাশা হইয়া ললিতের মাতা সন্ধ্যার সময় গঙ্গার ধারে আসিয়া একটি ঘাটে বসিলেন। তখন পর্য্যন্ত কেহ কিছু আহার করে নাই। লাবণ্য ক্ষুধা ক্ষুধা করিয়া কাঁদিতেছিল। ললিত নীরবে ছল ছল নয়নে চুপ করিয়া ছিল ললিতের মাতার কেবল চারটি পয়সা ও একটি সিকি ছিল। ললিত গিয়া সেই চার পয়সার মটর ডাল ও কদলী কিনিয়া আনিল। মটর ডাল ভিজাইয়া মাতা পুত্র-কন্যাকে ভাগ করিয়া দিলেন, নিজের জন্য রাখিলেন না। ললিত বলিল,—'না, মা! তুমি যদি না খাও, তাহা হইলে আমি খাইব না।' পুত্রের অনুরোধে কাজেই তাহাকে খাইতে হইল। বাকি আঁচলে বাঁধিয়া রাখিলেন। শিশু দুইটিকে লইয়া সে রাত্রি মাতা সেই গঙ্গার ঘাটেই রহিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ – একবার উঠ বাবা

পর দিন প্রাতঃকালে উঠিয়া পুনরায় তিন জনে আস্তে আস্তে খিদিরপুরে গমন করিলেন। সে স্থানে গিয়া তিনি জানিতে পারিলেন যে, ললিতের কাকা আসেন নাই, তাঁহার নিকট হইতে কোন চিঠিও আসে নাই। নিরাশ হইয়া পুনরায় কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে লাবণ্য ক্ষুধা ক্ষুধা করিয়া বড়ই কাঁদিতে লাগিল। ললিত অতিশয় শ্রান্ত হইয়া পড়িল। গড়ের মাঠে সেই নিভৃত পুষ্করিণীর ধারে পুনরায় তিন জনে গিয়া বসিলেন। পূর্বদিনের মটর ডালের কিয়দংশ মায়ের আঁচলে বাঁধা ছিল। শিশু দুইটিকে তাহাই খাইতে দিলেন। তাহার পর পুনরায় সেই ঘাটে আসিয়া বসিলেন। লাবণ্য পুনরায়

ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদিতে লাগিল। মাতার নিকট তখনও একটি সিকি ছিল। সিকিটি ভাঙ্গাইয়া চারি পয়সার কদলী আনিবার নিমিত্ত ললিতকে তিনি দোকানে পাঠাইলেন।

ললিত দোকানে যাইতেছে এমন সময় দৈবক্রমে তাহার হাত হইতে সিকিটি পড়িয়া গেল। সিকিটি গড়াইয়া একখানি ইটের ধারে গিয়া লাগিল। নিমিষের মধ্যে ইতর লোকের একটি বালক সিকিটি কুড়াইয়া লইল। ললিত তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করিল, বালক সিকিটি আপনার মুখের ভিতর পুরিল। ললিত তাহার গলা টিপিয়া ধরিল, বালক সিকিটি গিলিয়া ফেলিল।

কাঁদিতে কাঁদিতে ললিত মাতার নিকট আসিয়া সকল কথা বলিল। শেষ সম্বল যাহা ছিল, তাহা গেল। মাতা ভাবিলেন,'—আর উপায় নাই। দেবর আসিবেন না। ভগবান্ আর আমাদের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিবেন না। এখন আমি শিশু দুইটিকে লইয়া করি কি? যাই কোথা?'

ক্ষুধার জ্বালায় লাবণ্য অতিশয় কাঁদিতে লাগিল। সন্ধ্যা হইয়া গেল। মাতা, শিশু দুইটিকে লইয়া পুনরায় খিদিরপুর অভিমুখে গিয়া বসিলেন। দুঃখেব আর কূল-কিনারা নাই, অকূল পাথার! ভাবিতে লাগিলেন,—'হায় হায়! আমি কি করি, আমি কোথায় যাই।'

পুষ্করিণীর ধারে বসিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া মাতা একেবাবে পাগলিনী হইয়া পড়িলেন। সেই উন্মত্ত অবস্থায় সহসা তিনি বাম হস্তে লাবণ্য ও দক্ষিণ হস্তে ললিতকে ধবিযা পুষ্করিণীতে ঝাঁপ দিলেন। 'ঝপ' করিয়া একটি শব্দ হইল, জলে অল্প তরঙ্গ উঠিল, তাহার পর সেই গভীর জল পুনরায় পূর্বরূপ স্থির প্রশান্ত আকাব ধারণ করিল।

পরদিন বেলা দশটার সময় শিয়ালদহ হইতে একখানি গাড়ী দ্রুত বেগে খিদিরপুর অভিমুখে যাইতেছিল। গাড়ীর ভিতর একটি বাবু বসিয়া ছিলেন। 'গাড়োয়ান শীঘ্র চল, তোমাকে বকশিস্ দিব,' এই কথা বাবু বার বার বলিতেছিলেন। গড়ের মাঠ দিয়া যাইবার সময় বাবু দেখিলেন যে, একটি পুষ্করিণীর ধারে অনেকগুলি লোক একত্র হইয়াছে। কি হইয়াছে তাহা দেখিবার নিমিত্ত, গাড়ী থামাইয়া, বাবু সেই স্থানে গমন করিলেন। গিয়া দেখিলেন যে, জল হইতে পুলিসের লোকে একটি অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোক, একটি সাত আট বৎসরের বালক ও একটি পাঁচ ছয় বৎসরের বালিকার মৃতদেহ উপরে তুলিয়াছে। মৃতদেহ বটে, কিন্তু তিনটির রূপে পুষ্করিণীর পাড় আলো করিয়াছিল। যে দেখিতেছিল, সেই হায় হায় করিতেছিল।

অজ্ঞান পাগলের ন্যায় হইয়া বাবু গিয়া সেই মৃত-দেহের উপর পড়িলেন। 'ললিত লাবণ্য! একবার উঠ। একটা কথা কও! আমি তোমাদের কাকা আসিয়াছি। আর তোমাদের ভাবনা নাই, আমি তোমাদের জন্য টাকা আনিয়াছি। উঠ বাবা! একটা কথা কও।'

ললিত, লাবণ্য ও তাহাদের মাতা আর উঠিলেন না, আর কথা কহিলেন না।

মূল্যবান্ তামাক ও জ্ঞানবান্ সর্প

প্রথম অধ্যায় – সূচনা

ফরস্‌ডাঙ্গায় পূর্বে অনেক গুলির আড্ডা ছিল। তাহার সঙ্গে দুই একটি গাঁজার আড্ডাও ছিল। তাহাদিগের মধ্যে জয়গোবিন্দ ভড়ের আড্ডাটি সর্বপ্রধান ছিল। সেই আড্ডায় মাণিক বাবু, নবীন বাবু, হরেন বাবু, গণেশ বাবু প্রভৃতি অনেক বাবু সভ্য ছিলেন। ভড় মহাশয় ইহার আড্ডাধারী ছিলেন।

একদিন তিন ছিলিম মূল্যবান্ বড় তামাক সেবনের পর, হরেন বাবু যুদ্ধের কথা আরম্ভ করিলেন। মাণিক বাবু জ্ঞানগম্ভীরস্বরে তাহার আলোচনা করিলেন। গণেশ বাবু তাহার উপর টীকা করিলেন। নবীন বাবু কিছু বলিবার জন্য হাঁ করিয়াছেন, এমন সময় আড্ডাধারী মহাশয় তাঁহাকে নিষেধ করিলেন।

আড্ডাধারী বলিলেন,—'হরেন! তোমাদের মুখে কি আর অন্য কথা নাই? যুদ্ধের কথা শুনিয়া শুনিয়া কান ঝালা-পালা ধরিয়া গেল। যদি অন্য গল্প থাকে তো বল, যে শুনি।

আড্ডাধারীর বিরক্তিভাব দেখিয়া হরেন কিছু অপ্রতিভ হইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কিসের গল্প করিব?'

আড্ডাধারী ভাবিতে লাগিলেন। সেই অবসরে নবীন বাবু বলিলেন,—'শাস্ত্র-প্রসঙ্গ, ভূত-প্রসঙ্গ এ সভায় অনেক হইয়া গিয়াছে। তাহাতে নূতনত্ব আর কিছু নাই। অদ্যকার সংবাদপত্র দেখিলাম যে, আফ্রিকা মহাদেশে এক প্রকার সর্প আছে। তাহাদের শরীর কনিষ্ঠ অঙ্গুলির মত স্থূল। তথাপি তাহারা আস্ত হংস, ডিম্ব গলাধঃকরণ করিতে পারে। সামান্য বাঁশের ন্যায় স্থূল অজগর সর্প ও মহিষ প্রভৃতি পশুকে গ্রাস করে। আজ সাপের গল্প হউক না কেন?' —আড্ডাধারী বলিলেন,—'ঠিক বলিয়াছ, নবীন, আমি একখানি নভেল লিখিব মনে করিয়াছি। ভূতের গল্প সংগ্রহ করিয়াছি; বাঘের গল্প সংগ্রহ করিয়াছি। এখন সাপের গল্প পাইলেই আমার পুস্তকখানি পূর্ণ হয়। কেহ যদি ভাল ভাল, অথচ সম্পূর্ণ সত্য, সাপের গল্প জান তো বল দেখি, শুনি, ভাই।'

সকলে চুপ করিয়া রহিলেন। সকলকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া মাণিক বলিলেন— 'তোমারা সকলেই দেখিতেছি, সর্প বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সঙ্গে করিয়া আজ আমি এই যে বাবুটিকে আনিয়াছি, ইঁহার নাম তিনু, সম্প্রতি ইনি দেশ হইতে আসিয়াছেন। ইঁহাদের দেশে অনেক প্রকার সাপ আছে। ইনি বোধ হয় সাপের গল্প করিতে পারেন।'

এই কথা শুনিয়া তিনু বাবুকে সম্বোধন করিয়া আড্ডাধারী বলিলেন,—'মহাশয়! আপনার সহিত আমার আলাপ-পরিচয় নাই। কিন্তু আপনি যখন মাণিকের বন্ধু, তখন আমারও বন্ধু। অনুগ্রহ করিয়া যদি দুই একটি সাপের গল্প করেন, তাহা হইলে বড়ই বাধিত হই। যে পুস্তকখানি ছাপাইতে আমি মানস করিতেছি, তাহাতে আপনার নাম দিয়া গল্পগুলি ছাপাইব। আপনার দেশ কোথায়?'

তিনু বাবু উত্তর করিলেন,—'অতি নিকটে। এক দিন রেলে যাইতে হয়; তাহার পর, দুই দিন জাহাজে যাইতে হয়; তাহার পর, তিন দিন হাঁটিয়া যাইতে হয়। আমাদের দেশে রং বেরঙের সাপ আছে। সেই সব সাপের গল্প আমি করিতে পারি?'

আড্ডাধারী জিজ্ঞাসা করিলেন,—নূতন গল্প, না পুরাতন?'

তিনু বাবু উত্তর করিলেন,– আনকোরা টস্‌টসে টাট্‌কা গল্প।'

আড্ডাধারী জিজ্ঞাসা করিলেন,—'সত্য গল্প? না মিথ্যা কল্পিত বানানো গল্প?'

তিনু বাবু উত্তর করিলেন,—'সম্পূর্ণ সত্য গল্প। তামা-তুলসী, গঙ্গাজন হাতে লইয়া বলিতে পারি। যাহা আমার নিজের বাড়ীতে ঘটিয়াছে, যাহা নিজে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, সেইরূপ গল্প আমি করিব। এই যে সর্প, ইহারা নাগ জাতি। মানুষ অপেক্ষা ইহাদের বুদ্ধি শতগুণ অধিক। ইহাদের বুদ্ধি বিষয়ে আজ আমি দুই তিনটি দৃষ্টান্ত দিব। তবে বলিতে ভয় হয়। একে তো পাষণ্ডগণ আমাকে গ্যাঁজাখোর বলে। তাহার উপর গল্পগুলি কিছু অদ্ভুত। পাছে আপনারা বিশ্বাস না করেন সেই ভয়'।

আড্ডাধারী, নবীন, মাণিক সকলে এক বাক্যে বলিয়া উঠিলেন,—'না, না, আপানর সে ভয় নাই। আপনি যখন বড় তামাক সেবন করেন, তখন আপনি আমাদের ভাই। আপনার কথা সকলেই আমরা বিশ্বাস করিব।'

এইরূপে আশ্বস্ত হইয়া, তিনু বাবু বলিলেন,—'আচ্ছা। তবে প্রথমে একটি গল্প করি। মহাশয়গণ একটু প্রণিধান করিয়া শ্রবণ করুন।'

দ্বিতীয় অধ্যায় – বালিকা ও কৃষ্ণসর্প

তিনু বলিতেছেন,—'আমার বাড়ীর নিকট এক পুষ্করিণী আছে। তিন বৎসর বয়স্কা আমার একটি কন্যা আছে। একদিন প্রাতঃকালে বালিকাটি পুষ্করিণীতে পড়িয়া গিয়া হাবু ডুবু খাইতেছিল। কেহই দেখিতে পায় নাই, আর একটু হইলেই জলমগ্ন হইয়া সে মরিয়া যাইত। এমন সময় কোথা হইতে একটি কৃষ্ণসর্প আসিয়া উপস্থিত হইল। বালিকার বিপদ দেখিয়া সাপটি তৎক্ষণাৎ জলে ঝাঁপ দিল ও তাহাকে ধরিয়া অবিলম্বে কিনারায় আনিয়া ফেলিল। সাপটি বালিকার প্রাণরক্ষা করিল; কিন্তু যেরূপ বুদ্ধিসহকারে সে এক কার্য সাধন করিল, তাহাই আশ্চর্যের বিষয়।'

আড্ডাধারী জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কিরূপ বুদ্ধি?'

তিনু বাবু উত্তর করিলেন,—'সাপটি প্রায় দশ হাত লম্বা হইবে। পুষ্করিণীর মাঝখানে যে স্থানে মেয়ে আমার হাবু-ডুবু খাইতেছিল, সাপটি তাড়াতাড়ি প্রথম সে স্থানে গিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পর আপনার শরীরের মধ্যভাগ দিয়া বালিকার গলায় সে দৃঢ়রূপে একটি পাক দিল। সেই পাকে গলা বন্ধ হইয়া বালিকা আর জল গিলিতে পারিল না। সাপটি তখন তাহার মস্তক ও লাঙ্গুল দ্বারা সাঁতার দিতে লাগিল। এইরূপে সন্তরণ করিয়া বালিকাকে ক্রমে সে কিনারায় আনিয়া ফেলিল। এমন দৃঢ়রূপে সাপ তাহার গলায় পাক

দিয়াছিল যে এক ফোঁটা জলও বালিকার উদরস্থ হইতে পায় নাই। অতি সুবুদ্ধি সাপ। কেমন, গল্পটি ভাল নহে?'

আড্ডাধারী উত্তর করিলেন,—'অতি চমৎকার গল্প। তাহার পর?'

তিনু বলিলেন,—'মেয়েকে কিনারায় রাখিয়া সাপটি আস্তে আস্তে তাহার গলার পাক খুলিয়া দিল। তখন মেয়ে নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিল। নিঃশ্বাস ফেলিয়া মেয়ে ভূমি হইতে উঠিল। তখন সাপটি কুলোপানা চক্র ধরিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। আমার মেয়ে সেই ফণার উপর স্নেহের সহিত ধীরে ধীরে চাপড়াইয়া তাহাকে অনেক আদর করিল। আহ্লাদে আটখানা হইয়া সাপটি হাসিতে লাগিল। এইরূপে আমোদ-আহ্লাদ করিয়া সে দিন বনে চলিয়া গেল। তাহার পর দিন সকাল বেলা দেখি যে, সেই সাপটি আবার আমার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত! আমার মেয়ে তখন ধামি করিয়া মুড়ি খাইতেছিল। সুড়-সুড় সুড়-সুড় করিয়া সাপটি তাহার নিকট গিয়া বসিল। চিনিতে পারিয়া ধামি হইতে আমার মেয়ে তাহাকে দুই গাল মুড়ি দিল। কুড় কুড় কুড় কুড় করিয়া সাপ বসিয়া সেই মুড়িগুলি খাইল। খাইয়া সে পুনরায় বনে চলিয়া গেল। এইরূপে প্রতিদিন সকাল বেলা আমার মেয়ের কাছে সে মুড়ি খাইতে আসে। বিশ্বাস না করেন, চলুন আমার বাড়ী গিয়া দেখিয়া আসিবেন।

আড্ডাধারী বলিলেন,—'না না! আপনার বাড়ী অতি নিকটে বটে; কিন্তু সে স্থানে আমাদের যাইতে হইবে না। আপনার কথাই যথেষ্ট। আর আছে?'

তৃতীয় অধ্যায় – শিশু ও বেঁড়ে

তিনু বলিলেন,—'আছে বৈকি। আর একটি বলি শুনুন। আট মাসের আমার এক শিশু ছেলে আছে। গৃহিণী কাজকর্মে ব্যস্ত থাকেন; ছেলেটিকে বাড়ীর উঠানে ছাড়িয়া দেন। বাড়ীর উঠানে সে হামাগুড়ি দিয়া বেড়ায়, আর মাঝে মাঝে ষাঁড়ের মত চীৎকার করে। তাহার শব্দ শুনিলে গর্ভিণীর গর্ভপাত হয়। কিন্তু এখন আর সে কাঁদে না! দু এক দিন চুপ করিয়া থাকিবার পর, আমরা একদিন ভাবিলাম যে, ছেলে পূর্বের মত আর কাঁদে না কেন? মন-মন্‌সারে একদিন আমরা আড়ি পাতিয়া দেখিলাম। দেখিলাম যে, ছেলে যেই কান্নার সুর তুলিল, আর নিকটে এক গর্তের ভিতর হইতে একটি সাপ উঁকি মারিয়া দেখিল। তাহার পর সাপটি ক্রমে ক্রমে সেই গর্তের ভিতর হইতে বাহির হইল। চন্দ্রবোড়া কাহাকে বলে তা জানেন তো? এ সেই চন্দ্রবোড়া সাপ। সে জন্য এটি বেঁড়ে বোড়া সাপ। গর্তের ভিতর হইতে বাহির হইয়া ক্রমে শিশুর নিকটে আসিয়া সাপটি বসিল। তাহার পর শিশুর মুখপানে চাহিয়া চক্ষু টিপিয়া কি ইশারা করিল। অবশেষে সাপ পিছন ফিরিয়া, আপনার সেই বেঁড়ে লেজটি শিশুর হাতে পুরিয়া দিল।

আড্ডাধারী বলিলেন,—'বটে! তাহার পর?'

তিনু উত্তর করিলেন,—'বেঁড়ে লেজটি হাতে পাইয়া মায়ের স্তন মনে করিয়া, শিশু সন্তোষের সহিত তাহা চুষিতে লাগিল। আমরা ভাবিলাম,—ওঃ, এই জন্যে ছেলে আর

কাঁদে না বটে! এইরূপ প্রতিদিন আসিয়া সাপ আপনার বেঁড়ে লেজটি শিশুর হাতে প্রদান করে। শিশু তাহা চুষিয়া চুপ করিয়া থাকে, কখন বা লেজটি মুখে করিয়া নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ে। এইরূপে কিছুদিন যায়, এমন সময় একদিন দেখি না যে,—ছেলে পুনরায় কাঁদিতে আরম্ভ করিল। সাপের দেখা নাই। আমরা ভাবিলাম যে, বড়ই বিপদ হইল; সাপ আসিল না, এখন ছেলে ভুলাই কি করিয়া? ঘোর চিন্তায় আমরা নিমগ্ন আছি, এমন সময় কোথা হইতে আর একটি কিছু বড় বেঁড়ে বোড়া সাপ হুড়তে পুড়তে ছেলের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। সেও সেইরূপ চক্ষু টিপিয়া ছেলেকে প্রথমে ইশারা করিল; তাহার পর আপনার বেঁড়ে লেজটি তাহার হাতে গুঁজিয়া দিল। লেজটি মুখে দিয়া ছেলে চুপ করিলে। এই নূতন সাপটি এইরূপে সাত দিন ছেলের নিকট আনাগোনা করিল। তাহার পর সেই পুরাতন সাপটি পুনরায় আসিয়া উপস্থিত হইল। আমরা দেখিলাম, পুরাতন সাপটি কিছু রোগা হইয়া গিয়াছে। তাহা দেখিয়া ভাবিলাম,—ওঃ, আর কিছু নয়, পুরাতন সাপটির জ্বর হইয়াছিল, তাই নূতন সাপকে এই কয়দিনের নিমিত্ত আপনার এক্‌টিনী করিতে সে পাঠাইয়া দিয়াছিল। চট করিয়া আপনার মত আর একটি বেঁড়ে সাপ সে খুঁজিয়া পায় নাই। পাঠাইতে তাই একটু বিলম্ব হইয়াছিল। কেমন মহাশয়, এ গল্পটি কেমন?' —আড্ডাধারী বলিলেন,—'অতি চমৎকার।'

তিনু বলিলেন,—ছেলেটির নাম আমরা সুরেন্দ্র রাখিয়াছি। তাহার নামটি ছাপাইবেন। তাহা হইলে তাহার গর্ভধারিণীর মনে খুব আনন্দ হইবে। আর শিশুদের সরল হৃদয়,—কাল-সর্পকেও তাহাদের বিশ্বাস; এইরূপ নানাপ্রকার অলঙ্কার দিবেন। আর 'সাপিনী তাপিনীতাপে বিবরে লুকায়'—এইরূপ ছড়াও তাহার ভিতর দুই একটি দিবেন।'

আড্ডাধারী বলিলেন,—'ছড়ায় আবশ্যক নাই, গল্পটি অতি চমৎকার। তাহাই যথেষ্ট। আর আছে?'

চতুর্থ অধ্যায় – গরুর দড়ি

তিনু উত্তর করিলেন,—'আছে বই কি! আর একটি গল্প বলি, তবে শুনুন। দাঁড়াশ সাপ কারে বলে তা জানেন? আমাদের বাড়ীর কাছে প্রকাণ্ড এক দাঁড়াশ সাপ ছিল। বিশ হাতের কম নয়। জাহাজি দড়া বলিলেও চলে। প্রতিদিন রাত্রিতে গোয়ালে আমার গরু বাঁধা থাকে; তাহার একটু দূরে বাছুরটি বাঁধা থাকে। এক দিন রাত্রিতে কি করিয়া গরুর দড়িটি ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। আর একটু হইলেই সমস্ত দুধটুকু বাছুরে খাইয়া ফেলিত। ভাগ্যে, সেই সময় নিকটে সেই পাড়ার দাঁড়াশ সাপ যেই দেখিল যে, গরুর দড়ি ছিঁড়িয়া গিয়াছে, গরু ছুটিয়া বাছুরের নিকটে যাইতেছে, আর দুধ খাইবার জন্য বাছুর লাফালাফি করতেছে, তখন সাপটি আপনার মাথার দিক্ দিয়া গরুর গলায় একটি বেড় দিল, আর লেজটি খোঁটায় জড়াইয়া গরুকে আটক করিয়া রাখিল। এইরূপে সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল। গরু কত টানাটানি করিল, কিন্তু সাপ কিছুতেই তাহাকে ছাড়িয়া দিল না। প্রাতঃকালে উঠিয়া আমরা গরু ও সাপকে এই অবস্থায় দেখিলাম। সাপের সঙ্গে ঘরকন্না করিয়া আমাদের ভরসা

হইয়াছিল। সে জন্য গোয়ালের ভিতর গরুর গলায় সাপ দেখিয়া আমাদের কিছুমাত্র ভয় হইল না। ছেঁড়ো দড়িতে গিরা দিয়া আমরা গরুকে বন্ধন করিলাম। সাপ তখন ছাড়িয়া বনে চলিয়া গেল। গাভী দোহন হইলে, আমি মনে করিতেছি যে, এইবার যাই, গরুর জন্য একগাছি নূতন দড়ি কিনিয়া আনি। এমন সময়ে দেখি না যে, সেই সাপটি পুনরায় আসিয়া উপস্থিত হইল। এবার সে একেলা আসে নাই, আপনার স্ত্রী, দাঁড়াশনীকেও সঙ্গে আনিয়াছিল। আমার মনের ভাব বুঝিয়া দুই জনেই ঘাড় নাড়িতে লাগিল। সাপে কথা কহিতে পারে না, তাই ঘাড় নাড়িয়া বলিল, দড়ি কিনিবার জন্য তোমাকে আর পয়সা খরচ করিতে হইবে না। এখন হইতে আমরা দুই জনে দড়ির কাজ করিব।'

এই বলিয়া একটি সাপ পূর্ব্ববৎ মস্তকের দিক্ দিয়া গরুর গলায় ও লেজের দিক্ দিয়া খোঁটাতে ফের দিয়া রহিল। তখন আমি ছেঁড়া দড়ি গাছটি গরুর গলা হইতে খুলিয়া লইলাম। পালা করিয়া পাখীতে যেরূপ ডিমে তা দেয়, সেইরূপ দাঁড়াশ ও দাঁড়াশনী এখন পালা করিয়া আমার গরু বাঁধিয়া রাখে। আমাকে আর দড়ি কিনিতে হয় না। তবে প্রতিদিন সাপ দুইটিকে খাইবার নিমিত্ত একটু একটু দুগ্ধ প্রদান করিতে হয়। হয় না হয়, আমার বাড়ী গিয়া দেখিয়া আসুন।'

আড্ডাধারী বলিলেন,—'না না, আপনার বাড়ী আমাকে যাইতে হইবে না। আপনি কি আর মিথ্যা বলিতেছেন। আর আছে?

পঞ্চম অধ্যায় – চুল বাঁধা ফিতা

তিনু উত্তর করিলেন,—'আজ আর অধিক বলিব না। আর একটি বলি, শ্রবণ করুন। আমার বড় মেয়েটি যখন দশ বৎসরের তখন এক দিন তাহাকে সঙ্গে লইয়া আমি রথ দেখিতে যাইতেছিলাম। মেয়েটির চুল বড় দীর্ঘ ছিল না, কেবল কাঁধের উপর পড়িত। গৃহিণী তাহার সাজগোজ করিয়া চুলগুলি একটি সবুজ ফিতা দিয়া বাঁধিয়া দিয়াছেন। যাইতে যাইতে একটি আমবাগানের নীচে গিয়া উপস্থিত হইয়াছি, এমন সময় মেয়ের মাথা হইতে ফিতাটি খুলিয়া বাতাসে কোথায় উড়িয়া গেল। আর খুঁজিয়া পাইলাম না। মেয়ের চুল এলোথেলো হইয়া পড়িল। দুই হাত মাথায় দিয়া মেয়ে আমার কাঁদিতে লাগিল। এই স্থানে একটি আঁব-ডাল ঝুলিয়া ছিল। লাউ-ডগা সাপ জানেন? সেই সুন্দর উজ্জ্বল সবুজ বর্ণের সরু সাপ? যাহারা গাছের পাতার সঙ্গে মিশিয়া থাকে? সেই স্থানে সেই আঁব-ডালে পাতার ভিতর লাউ-ডগা সাপের একটি ছানা ছিল। মেয়ের কান্না শুনিয়া সাপের ছানাটি ডাল হইতে তড়াক্ করিয়া মেয়ের কাঁধের উপর পড়িল। তাহার পর মস্তকের উপর উঠিয়া প্রথম মুখ ও লেজ দিয়া চুলগুলি পরিষ্কার ও সমান করিল। অবশেষে চারিদিকে ফের দিয়া চুলগুলি বাঁধিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু হায়! ছানা সাপ! বেড় দিতে কুলান হইল না। সে নিমিত্ত বিরস বদনে সে পুনরায় গাছের ডালে গিয়া উঠিল। ডালে উঠিয়া ঘাড় নাড়িল। ঘাড় নাড়িয়া যেন সে বলিল,—'আমি ছানা-সাপ, আমি ছোট, সে জন্য আমার দ্বারা এ কাজ হইল না, ইহাতে আমার দোষ নাই।'

আড্ডাধারী বলিলেন,—'তাহার পর?'

তিনু বলিলেন,—'তখন আমরা আর কি করি! মেয়ের চুল বাঁধা হইল না। সেই আলুথালু চুলে মেয়ে সঙ্গে লইয়া চলিলাম। প্রায় দুই শত হাত আগে গিয়াছি, ডাল হইতে একটি বড় লাউ-গড়া সাপ সহসা লাফ দিয়া টপ করিয়া মেয়ের মাথার উপর পড়িল। গাছ পানে চাহিয়া দেখি যে, সে ছানা সাপটিও ডালে বসিয়া আছে। দুইটি সাপে অতি দ্রুতবেগে দৌড়িয়া আসিয়া থাকিবে। কারণ, দুই জনেরই ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস বহিতেছিল, দুই জনেই গলদঘর্ম হইয়া গিয়াছিল। তখন আমি বুঝিতে পারিলাম যে, ছানা সাপটি নিজে চুল বাঁধিতে না পারিয়া, তাহার মাকে তাড়াতাড়ি ডাকিয়া আনিয়াছে। ডালে ছানা ও আমার মেয়ের মাথায় তাহার মা। দুই জনে চক্ষুঠারে প্রথম যেন কি বলাবলি করিল। তাহার পর বড় সাপটি মেয়ের চুলগুলির গোড়ায়, যে স্থানে ফিতা ছিল, সেই স্থানে আপনার শরীরটি জড়াইল। অবশেষে মাথার ঠিক মাঝখানে, যে স্থানে ফিতার ফাঁস থাকে, সেই স্থানে আপনার মুখটি রাখিল। তাহার পর মুখের ভিতর আপনার লেজ প্রবিষ্ট করিয়া সাপটি নিদ্রা গেল। তাহার মুখ ও লেজ সংলগ্ন হইয়া চমৎকার ফুল-কাটা ফাঁসের মত হইল ও সাপটি নিজে অতি সুন্দর রেশমী সুবজ ফিতার ন্যায় দেখাইতে লাগিল। বথ দেখা হইলে, বাটী প্রত্যাগমন করিয়া সাপটিকে আমরা উঠানে লাউমাচায় ছাড়িয়া দিলাম। প্রতি দিন বৈকাল বেলা মেয়ের চুল বাঁধিবার সময়, সে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাকে ডাকিতে হয় না। আমার গৃহিণী সাপটিকে লইয়া মেয়েব চুল বাঁধিয়া দেন। হয় না হয়, চলুন, এখনি আমার দেশে চলুন, স্বচক্ষে সাপটিকে দেখিয়া আসিবেন।'

আড্ডাধারী বলিলেন,—'আর আছে?'

ষষ্ঠ অধ্যায় – পাকা মুহুরী

তিনু উত্তর করিলেন,—''আরও? আমার গৃহিণী অনেক জানেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আপনাকে আরও অনেক সাপের কথা বলিব। আপাততঃ কেবল আর একটি বলিয়া শেষ করি। আমার আট বৎসরের একটি বালক আছে। স্কুলে সে পড়িতে যায়। বাড়ী আসিয়া যোগ করিবার নিমিত্ত মাষ্টার তাহাকে এক তেরিজ দিয়াছিলেন। শ্লেটে লিখিয়া অঙ্কটি ছেলে ঘরে আনিয়াছিল। বালক অনেক চেষ্টা করিল; কিন্তু অঙ্কটি বড় ছিল, কিছুতেই সে ঠিক দিতে পারিল না। হতাশ হইয়া বিরসবদনে শ্লেটের পানে চাহিয়া ভাবিতেছে, এমন সময় তাহার কাঁধের উপর বসিয়া একটি সাপ মুখ বাড়াইল। তাহার পর সাপটি আরও অগ্রসর হইয়া পেন্সিল সহিত তাহার দক্ষিণ হস্তে অনেকগুলি পাক দিয়া জড়াইয়া ধরিল। এইরূপে বালকের হাত ধরিয়া শ্লেটের উপর তাহাকে লিখাইতে লাগিল। মুহূর্ত্তমধ্যে বিনা ভুলে যোগটি সমাপ্ত করাইল। তাহার পর দিন আমরা সকলে মিলিয়া বালককে ত্রৈরাশিক প্রভৃতি আরও নানারূপ কঠিন কঠিন অঙ্ক দিলাম। বালক যোগও ভাল করিয়া শিক্ষা করে নাই। কিন্তু সেই সর্পের সহায়তায় মুহূর্ত্তের মধ্যে সমুদয় অঙ্কগুলি সে কষিয়া ফেলিল। সেই অবধি মুহুরিগিরি করিবার নিমিত্ত সাপটিকে আমরা পুষিয়া

রাখিয়াছি। সংসার খরচের হিসাব, গয়লার সহিত দুধের হিসাব, ধোপার সহিত কাপড়ের হিসাব, আমাদের সামান্য একটু পৈতৃক সম্পত্তির হিসাব,—কড়ায় গণ্ডায় সমুদয় হিসাব সেই সাপটি রাখে। জমিদারী সেরেস্তায় হিসাবের গোলমাল হইলে, সাপটিকে ভাড়া দিয়া আমরা মাঝে মাঝে বিলক্ষণ দু'পয়সা উপার্জ্জন করি। তাহাকে আমায় মাহিনা দিতে হয় না, খাইতে দিতেও হয় না। সাপটি বনে চরিয়া আসে। তবে ভাল ব্যাঙ পাইলে, সমাদর করিয়া কখন কখন তাহাকে আমরা নিমন্ত্রণ করি।"

আড্ডাধারী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার বাড়ীতে যে মুহুরিগিরি করে, এ কোন্ জাতীয় সাপ? এ সাপের নাম কি?"

তিনু উত্তর করিলেন,—"ইহার নাম শঙ্খচুড়। হিসাবপত্রে এ জাতীয় সাপ সাক্ষাৎ শুভঙ্কর।" তিনু বাবুর গল্পে সকলেই ঘোরতর বিস্মিত হইলেন। সকলেই তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন।

সে-কালের মোহর

প্রথম অধ্যায় – বালিকা

কলিকাতা সহব। গলির পথ। সন্ধ্যায় সময়। ঘোর অন্ধকার। বর্যাকাল। টিপ-টিপ কবিযা জল পড়িতেছে। গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হন্ হন্ করিয়া যাইতেছেন। গিরিশচন্দ্র একজন নব্য যুবক। শান্ত সুশীল সভ্যভব্য নব্য-যুবক। গিরিশচন্দ্রের বয়ঃক্রম প্রায় কুড়ি বৎসর হইবে। শ্যাম বর্ণ; মুখে দুই চারিটা ব্রণের দাগ আছে। গোঁফ-দাড়ির রেখা দিয়াছে। গিরিশচন্দ্র মাঝারি গোছের মানুষ দীর্ঘও নহেন, খর্ব্বও নহেন, স্থূল নহেন, কৃশও নহেন। তাঁহাকে দেখিলে বলবান্ ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয় না, বিশষতঃ বক্ষঃস্থলের সঙ্কুচিত গঠনটি দেখিলে ভবিষ্যতের লক্ষণ ভাল বলিয়া বোধ হয় না।

গিরিশচন্দ্রের গায়ে কামিজ আছে। কুঞ্চিত পাকানো চাদরখানি তাঁহার বক্ষঃস্থলের দুই দিকে লম্ববান রহিয়াছে। সেই অন্ধকারে ছাতি মাথায় দিয়া গিরিশচন্দ্র হন্ হন্ করিয়া চলিতেছেন। সে গলির রাস্তায় সে সময় কেবল দুই একটি লোক যাতায়াত করিতেছিল। গিরিশ দেখিলেন যে, এক জন শুভ্রবস্ত্র-পরিধায়ী মানুষ বিপরীত দিক্ হইতে তাঁহার দিকে দ্রুত বেগে আসিতেছে। এক পার্শ্বে কতকগুলি খোয়া জমা করা ছিল। সহসা সেই খোয়ার উপর সেই মানুষ পতিত হইল। গিরিশ তাড়াতাড়ি গিয়া তাহাকে হাত ধরিয়া তুলিলেন। কিছুদূরে অবস্থিত রাস্তার লণ্ঠনের ঈষৎ আলোকে দেখিলেন যে, লোকটি এক বালিকা। বালিকার বয়স দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ বৎসর হইবে। মুখশ্রী ও ভাবভঙ্গী দেখিয়া তাহাকে ভদ্রলোকের কন্যা বলিয়া বোধ হইল।

গিরিশ তাহার হাত ধরিয়া তুলিলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার কি বড় আঘাত লাগিয়াছে?'

বালিকা অধোমুখে উত্তর করিল, —"আজ্ঞা না, আমাকে অধিক লাগে নাই।"

গিরিশ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দেখিতেছি, তুমি ভদ্রলোকের কন্যা। এ অন্ধকারে রাত্রিতে একাকিনী তুমি কোথায় যাইতেছ? নিকটে কোন লোকের বাটীতে যাইবে?" বালিকা ছল্ ছল্ চক্ষে মৃদুস্বরে উত্তর করিল,—"আমার পিতা সহসা অতিশয় পীড়িত হইয়াছেন। আমাদের কেউ নাই। সে নিমিত্ত আমি ডাক্তার ডাকিতে দৌড়িয়া যাইতেছি। আমার পিতা ডাক্তারখানার কর্ম করেন। সেই ডাক্তারখানায় যাইতেছি। সে ডাক্তারখানা এ স্থান হইতে কিছু দূরে।"

বালিকার মৃদু-মধুর স্বর গিরিশের মন হরণ করিল। এরূপ ভাব,—কখন কাহাকেও দেখিয়া কি কাহারও কথা শুনিয়া তাঁহার মনে উদয় হয় নাই। গিরিশ মনে মনে ভাবিলেন যে, এই বালিকার জন্য আমি প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে পারি।

গিরিশ বলিলেন,—"আমি ডাক্তারি শিক্ষা করিতেছি। অল্প দিনের মধ্যেই বোধ হয় ডাক্তার হইব। চল, তোমার পিতাকে গিয়া দেখি। আমি যদি কোন প্রতিকার করিতে পারি, তো ভালই; তাহা না হইলে, আমাকে ঠিকানা বলিয়া দিও, আমি ডাক্তার আনিয়া দিব। এ রাত্রিতে, এ অন্ধকারে এ বৃষ্টিতে তোমায় যাইতে হইবে না।"

বালিকা সে কথায় সম্মত হইল। বালিকা আগে আগে যাইতে লাগিল। গিরিশ তাহার পশ্চাতে যাইতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় – মাধব চক্রবর্ত্তী

বালিকা আগে আগে চলিল; গিরিশ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। কিছুদূর গিয়া তাঁহারা আরও একটি সঙ্কীর্ণ অন্ধকারময় অপরিষ্কার গলিতে প্রবেশ করিলেন। সেই গলির ভিতর একটি একতালা বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, বালিকা দ্বারে ঘা মারিল। ভিতর হইতে এক জন বয়স্কা স্ত্রীলোক আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন। বালিকা তাঁহাকে মৃদুস্বরে বলিলেন,—'সে ডাক্তার হয় নাই, অন্য ডাক্তার আনিয়াছি।"

গিরিশ তাঁহাদের সঙ্গে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়াই বাম দিকে সামান্য বৈঠকখানা দেখিলেন। সে ঘরে কেহ নাই; সব অন্ধকার। বৈঠকখানার পর সামান্য একটু প্রাঙ্গণ। তাহার পর, ভিতর-বাটী। ভিতর-বাটীতে দুইটি ছোট একতালা ঘর। ঘরের অবস্থা, জিনিসপত্রের অভাব, স্ত্রীলোক দুইটির অলঙ্কারশূন্য দেহ, মলিন বস্ত্র, এই সমুদয় দেখিয়া গিরিশ মনে করিলেন যে, ইহারা নিতান্ত দরিদ্র। যে ঘরে মিট্-মিট্ করিয়া একটি প্রদীপ জ্বলিতেছিল, সকলে সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। ঘরের একপার্শ্বে একখানি তক্তপোষে একজন কৃষ্ণকায় পুরুষ মানুষ শয়ন করিয়া ছিলেন। তাঁহার শরীর কৃশ ও রুগ্ন বলিয়া বোধ হইল। বয়ঃক্রম পঞ্চাশের অধিক হইবে। গলায় যজ্ঞোপবীত, তাহাতে গিরিশ বুঝিলেন যে, ইঁহারা জাতিতে ব্রাহ্মণ। গিরিশ আরও বুঝিলেন যে, বয়স্কা স্ত্রীলোক তাঁহার গৃহিণী ও বালিকা তাঁর কন্যা। কিন্তু তাহাকে সেই কৃষ্ণকায় ব্যক্তির কন্যা বলিয়া বোধ হয় না। চমৎকার আহা-মরি রূপ না হউক, বালিকা সুন্দরী বটে;—মাজা-মাজা রং, বড় বড় চক্ষু, বক্র ভ্রূযুগল, পূর্ণ গণ্ডদেশ, গোল গোল গড়ন, মেঘরাশির ন্যায়

কেশ, তাহার উপর একটু মৃদু-মধুর ভাব। সেই মৃদু-মধুর ভাবে মন আকর্ষণ করে। সেই মৃদু-মধুর ভাবে মস্তক অবনত করিয়া, বালিকা যখন দুই একটি কথা বলে, তখন সতৃষ্ণ সকলকেই তাহার মুখপানে চাহিয়া থাকিতে হয়, তাহার সেই কমলমুখনির্গত পীযুষময় কথা আরও দুইটি শুনিতে ইচ্ছা হয়। সামান্য সেই প্রদীপের আলোকে বালিকার মুখশ্রী দেখিয়া গিরিশের মন মোহিত হইল। বালিকার বয়স বুঝি দ্বাদশ উত্তীর্ণ হইয়াছে।

ব্রাহ্মণী আধ ঘোমটা দিয়া স্বামীর পদতলে তক্তপোষের এক কোণে বসিলেন। মাঝে মাঝে তাঁহার চক্ষু দিয়া ফোঁটায় জল পড়িতেছিল। মাঝে মাঝে আঁচল দিয়া তিনি সেই জল মুছিতেছিলেন। বালিকা পিতার নিকট অগ্রসর হইয়া বলিল,—"বাবা! পথে বড় অন্ধকার; বৃষ্টি পড়িতেছে। এক স্থানে আমি পড়িয়া গিয়াছিলাম। ইনি আমাকে ধরিয়া তুলিয়াছিলেন। ইনি ডাক্তার। সে জন্য, তোমার ডাক্তারখানায় পর্য্যন্ত আর যাই নাই। ইহাঁকে আনিয়াছি।"

ইহাঁরা ব্রাহ্মণ; তাহা দেখিয়া গিরিশের মনে প্রথম কতকটা আনন্দ-সঞ্চার হইয়াছিল। তাহার পর, কন্যার এখনও বিবাহ হয় নাই, এই কথা শুনিয়া গিরিশের মন আরও প্রফুল্ল হইল। গিরিশ মনে মনে ভাবিলেন যে, আজ রাত্রির এই ঘটনাতে বিধাতার কোনরূপ ফন্দি আছে। তা না হইলে, পথে প্রথম এই অপরিচিতা বালিকার কণ্ঠস্বর শুনিয়া আমার হৃদয়-তন্ত্রী বাজিয়া উঠিবে কেন? তাহার পর, আলোকে ইহার মুখশ্রী দেখিয়া আমার মন এত চঞ্চল হইবে কেন? বালিকা যেন কত দিনের পরিচিতা, এ যেন আমার, এইরূপ ভাব আমার মনে উদয় হইবে কেন? দেখা যাউক,—বিধাতা কিরূপ ভবিতব্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন।

গিরিশ মনে মনে এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময় ব্রাহ্মণী পুনরায় বলিলেন,—"কেন বাবা! চুপ করিয়া রহিলে যে?" তবে কি কোন বিপদের সম্ভাবনা আছে? তবে কি ইনি এ যাত্রা রক্ষা পাইবেন না?"

গিরিশ চমকিত হইয়া তাড়াতাড়ি উত্তর করিলেন,—"না মা! কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই। আপনি যখন আমাকে ছেলে বলিলেন, তখন আমিও আপনাকে মা বলিয়া ডাকি। কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু একটু ঔষুধ সেবন করিতে হইবে। আমি ঔষুধ লিখিয়া দিতেছি, সেই ঔষুধ সেবন করিলে রাত্রিতে ভালরূপ নিদ্রা হইবে, আর কাল ইনি ভাল হইয়া যাইবেন। ইহাকে প্রকৃত রক্তবমন বলে না। ইহাতে কোন ভয় নাই।"

ব্রাহ্মণী বলিলেন,—"এত রাত্রিতে ঔষধ আনিতে যায় কে? তার পর—"ব্রাহ্মণী সহসা চুপ করিলেন।

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"তাহার পর ঔষধের দাম কোথা হইতে আসিবে? আমি যে ডাক্তারখানায় কাজ করি, সে ডাক্তার খানা হইতে ঔষধ আনিতে পারিলে দাম লাগে না। কিন্তু এত রাত্রিতে সে স্থানে যায় কে? তখন প্রাণের দায়ে মেয়েকে পাঠাইয়াছিলাম। এত রাত্রিতে পুনরায় সে স্থানে কন্যাকে পাঠাইতে পারি না।"

গিরিশ উত্তর করিলেন,—"সে জন্য কোন ভাবনা নাই। কোন্ ডাক্তারখানা আমাকে

বলিয়া দিন, আমি এইক্ষণে গিয়া ঔষধ আনিয়া দিতেছি।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"গোপীমোহন রায়ের ডাক্তারখানা। তোমাদের মুহুরি মাধব চক্রবর্তীর পীড়া হইয়াছে, এই কথা বলিয়া ঔষধ চাহিলেই, তাহারা তৎক্ষণাৎ দিবে।"

গিরিশ একটু কাগজ লইয়া যথাপ্রয়োজন ঔষধ লিখিলেন। তাহার পর নিজেই ঔষধ আনিতে যাইলেন।

গোপীমোহন রায়ের ডাক্তারখানা কিছু দূর। যথাসময়ে গিরিশ সেই বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বাটীতে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, বাম দিকে একটি বড় ঘর; দক্ষিণ দিকেও সেইরূপ একটি বড় ঘর। সম্মুখে প্রাঙ্গণ; প্রাঙ্গণের পরে পূজার দালান। পূজার দালানের পশ্চাতে অন্তঃপুর। সদর দরজায় গ্যাস জ্বলিতেছিল। বাম দিকের বড় ঘরখানিতে ডাক্তারখানা,—নানারকম ঔষধের বোতলে ও নানারূপ যন্ত্রে সুসজ্জিত। বাম দিকের সেই বড় ঘরের পার্শ্বে একটি ছোট ঘর। সেই ঘরে কম্পাউন্ডার ঔষধ প্রস্তুত করে। দক্ষিণ দিকের বড় ঘরখানিতে ঔষধাদি কোনরূপ দ্রব্য ছিল না। ঘরের মধ্যস্থলে একটি টেবিল ছিল; তাহার পাশে

তিনখানি চৌকি ছিল। ঘরের তিনদিকে দেয়ালের নিকট এক একখানি বেঞ্চি ছিল। সেই ঘরে বসিয়া গোপীমোহন ডাক্তার প্রাতঃকালে আগত রোগীদিগের নিমিত্ত ব্যবস্থা করেন। যেমন বাম দিকের বড় ঘরের পার্শ্বে এক ছোট ঘর, দক্ষিণ দিকেও সেইরূপ একটি ছোট ঘর। এই ছোট ঘরের দ্বার তখন বন্ধ ছিল। এ ঘরে কি আছে না আছে, গিরিশ তাহা দেখিতে পাইলেন না। গিরিশ দেখিলেন যে পূজার দালানে অনেকগুলি বড় বড় কাঠের বাক্স আছে। বিলাত হইতে যাহাতে ঔষধ আমদানি হয়, সেই বাক্স।

বাম দিকে ডাক্তারখানায় প্রবেশ করিয়া, গিরিশ কম্পাউণ্ডারের নিকট হইতে ঔষধ প্রার্থনা করিলেন। গিরিশ বলিলেন,—"আপনাদের মুহুরি মাধব চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অসুখ হইয়াছে; তিনি আমাকে এই ঔষুধ লইতে পাঠাইয়াছেন।"

কম্পাউন্ডার গিরিশকে দক্ষিণ দিকের ঘরে বসিতে বলিল;—যে ঘরে টেবিল, চেয়ার ও বেঞ্চি ছিল, গিরিশ সেই ঘরে বসিলেন। তাহার পার্শ্বে যে ছোট কুঠরি ছিল, তাহা তখন তালা ছিল।

কম্পাউন্ডার ঔষধ প্রস্তুত করিয়া গিরিশকে দিল। গিরিশ প্রত্যাগমন করিয়া, ঔষধ মাধব চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে প্রদান করিলেন; আর বলিলেন,—"প্রাতঃকালে আমায় কলেজে যাইতে হইবে। এগারটার সময় ছুটী পাইব। সেই সময় আসিয়া আপনি কেমন থাকেন, তাহা দেখিয়া যাইব।"

তৃতীয় অধ্যায় – মোহর চুরি

গিরিশ আপনার বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন। সে রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রা হইল না। সেই বালিকার মুখখানি কেবল তাঁহার মনে জাগিতে লাগিল। বালিকা অবিবাহিতা, নাম সরলা, মাধব চক্রবর্তীর কন্যা। গিরিশ কুপাত্র নহেন। তবে কেনই বা বিবাহ হইবে না? এইরূপ

কত চিন্তা গিরিশের মনে উদয় হইতে লাগিল। তাহার পর, গিরিশ নিজের অবস্থা ভাবিয়া দেখিলেন। বালিকার পিতা-মাতা বিবাহ দিতে সম্মত হইলেও এ অবস্থায় কি করিয়া তিনি পরিবার প্রতিপালন করিবেন? গিরিশের নিবাস কৃষ্ণনগর জেলায় সামান্য একখানি গ্রামে। তাঁহার মাতার অনেকদিন পরলোক হইয়াছে। অভিভাবকের মধ্যে একমাত্র পিতা ছিলেন। পল্লীগ্রামে ডাক্তারি করিয়া তিনি গিরিশের খরচ যোগাইতেন। এক বৎসর গত হইল, পিতার কাল হইয়াছে। গিরিশ তখন চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন। গ্রামে গিয়া যাহা কিছু সম্পত্তি ছিল, সমুদয় বিক্রয় করিয়া তিন শত টাকা হইল। ডাক্তারি পাশের তখনও দুই বৎসর বাকি ছিল। গিরিশ মনে করিলেন, এই তিন শত টাকা সম্বল করিয়া কোনরূপে আমি ডাক্তারি পাশ দিব। কলিকাতা আসিয়া সেই তিন শত টাকায় হাত দিব না। সন্ধ্যার সময় এক ধনবান ব্যক্তির দুইটি পুত্রকে পড়াইয়া যাহা পাইতেন, তাহাতেই বাসা ও কলেজের খরচ নির্বাহ করিতেন। গিরিশ ভাবিলেন,—"এ অবস্থায় আমার বিবাহ করা কিছুতেই উচিত নহে। আমার ডাক্তারি পাশ হইবার এক বৎসর বাকি আছে। যদি চক্রবর্ত্তী মহাশয় অপেক্ষা করেন, আর যদি পাশ হইতে পাবি, তাহা হইলে দেখা যাইবে।"

এইরূপ নানা প্রকার চিন্তায় গিরিশ রাত্রিযাপন করিলেন।

কলেজের ছুটী হইলে, পর দিন এগারটার সময় গিরিশ,—মাধব চক্রবর্ত্তীকে দেখিতে যাইলেন। দেখিলেন যে, তিনি ভাল আছেন; কিন্তু অতিশয় দুর্ব্বল।

মাধব চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—"এই অবস্থায় আমাকে ডাক্তারখানায় যাইতে হইয়াছিল। আমার মনিব গোপীবাবু আমাকে ডাকিতে পাঠাইয়াছিলেন। ডাক্তারখানায় এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছে। গোপীবাবুর বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই দক্ষিণ দিকে যে বড় ঘরখানি আছে যে ঘরে বসিয়া প্রাতঃকালে তিনি বাহিরের রোগীদের নিমিত্ত ব্যবস্থা করেন, সেই ঘরের পাশে একটি ছোট কুঠরি আছে। সেই কুঠরিতে একটি দেরাজ আছে। দেরাজে অনেকগুলি ছোট ছোট কুঠরি আছে। সেকালের মোহর ক্রয় করা গোপী বাবুর বাই। মাঝে মাঝে এক একটি মোহর কিনিয়া কাগজ নির্ম্মিত একটি সাবানের বাক্সর ভিতর ফেলিয়া তিনি দেরাজের টানার ভিতর রাখিয়া দেন। ক্রমে ক্রমে পশ্চাশটি মোহর হইয়াছিল। এ কথা কিন্তু জনপ্রাণী কেহই জানিত না। দেরাজের টানার চাবি, সে কুঠরির চাবি, গোপী বাবু আপনার কাছে রাখিতেন, কাহারও হাতে কখনও দিতেন না। আজ প্রাতঃকালে গোপীবাবু নিজে দাঁড়াইয়া সেই ঘরের দেরাজ আলমারি প্রভৃতি স্থানান্তরিত হইলে আজও যথারীতি মোহরগুলি গণিয়া দেখিতে যাইলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য কথা এই যে, মোহর দেখিতে পাইলেন না। দেরাজের টানার ভিতর সে সাবানের বাক্সও নাই, সে মোহরও নাই। চারিদিকে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। গোপীবাবু বলেন যে, দুই দিন পূর্ব্বে তিনি মোহর গণিয়া দেখিয়াছিলেন। এই দুই দিনের ভিতর কেহ তাহা চুরি করিয়াছে। এই দুই দিনের ভিতর কে সে কুঠরির ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল, অথবা কুঠরির বড় ঘরে একাকী কে ছিল, সেই বিষয়ের অনুসন্ধান হইতেছে।"

গিরিশ বলিলেন,—"আমি কাল রাত্রিতে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই বড় ঘরে একাকী বসিয়াছিলাম। পাশের কুঠরিও দেখিয়াছিলাম। তখন তাহাতে তালা বন্ধ ছিল।"

মাধব চক্রবর্ত্তী বলিলেন, —"হাঁ, তোমারও কথা উঠিয়াছিল। গোপীবাবু তোমার কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য কথা এই যে, আজ প্রাতঃকালে কুঠরির তালা যেমন বন্ধ সেইরূপ বন্ধ ছিল। সে নিমিত্ত গোপীবাবু বলেন যে, বাহিরের চোর আসিয়া তাঁহার মোহর চুরি করে নাই; ঘরের চোরেই করিয়াছে।"

দুই মাস গত হইল চোর ধরা পড়িল না। মোহর পুনঃপ্রাপ্তির আশা গোপীবাবু ছাড়িয়া দিলেন। গিরিশ, মাধব চক্রবর্ত্তীর বাটীতে আনা-গোনা করিতে রাগিলেন। মাধব চক্রবর্ত্তীর স্ত্রীকে তিনি মা বলিতেন। গিরিশ তাঁহাদের বাটী যাইলে সরলার মুখ প্রফুল্ল হইত। গিরিশের কথা সরলা এক মনে এক ধ্যানে শুনিত। দুই এক দিন গিরিশ যদি তাঁহাদের বাটীতে না যাইতেন, তাহা হইলে সরলা ভালরূপে কাজ-কর্ম্ম করিত না, সর্ব্বদাই বিরস মনে থাকিত।

এক দিন সরলার মাতা স্বামীকে বলিলেন,—"মেয়ে বড় হইয়াছে। তাহার জ্ঞান হইয়াছে বিবাহেব জন্য আমরা কতই না ভাবিতেছিলাম। বিধাতা আপনি বুঝি সরলাব বর আনিয়া দিলেন।"

মাধব চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—"আমি চুপ করিয়া নাই। গিরিশের পরিচয় আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। সকল বিষয়ে সুপাত্র বটে, কিন্তু অবস্থা ভাল নহে, তাহা ব্যতীত, গিরিশের কোন কুলে কেউ নাই। তাহার সহিত এ বিষয়ে আমার কথা হইয়াছিল। সরলাকে বিবাহ করিতে গিরিশের বিশেষরূপ আগ্রহ আছে। কিন্তু সে বলে যে, পাশ না দিয়া কিরূপে বিবাহ করি? যদি পাশ না হই, তাহা হইলে কি করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিব? ভাল, যখন এত দিন গিয়াছে, তখন আরও কিছু দিন অপেক্ষা করা যাউক। গিরিশ আমার নিকট সত্য করিয়াছে যে, পাশ হইলে সে অন্য কোন স্থানে বিবাহ করিবে না।"

মাধব চক্রবর্ত্তীর মনিব, গোপীমোহন ডাক্তারের সহিতও গিরিশের আলাপ পরিচয় হইল। গিরিশের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও শান্ত স্বভাব দেখিযা গোপীবাবু সর্ব্বদাই তাহার প্রশংসা করিতেন।

একদিন গোপী বাবু গিরিশকে বলিলেন,—"আমি দিন দিন দুর্বল হইয়া পড়িতেছি। হাঁপানি কাশিতে বড়ই কষ্ট পাইতেছি। প্রতিদিন যত বাড়ী হইতে ডাক আসে, সে সকল স্থানে যাইতে পারি না। তুমি যদি আমার ডাক্তাখানায় আসিয়া নিযুক্ত হও, তাহা হইলে আমার বড় উপকার হয়। প্রাতঃকালে আমার বাটীতে যে সমুদয় রোগী আসে, অবসর পাইলে তাহাদিগকে তোমায় দেখিতে হইবে, আর ডাক্তারখানার কাজকর্মের ভারও লইতে হইবে। আপাততঃ তোমার সমুদয় খরচ আমি দিব, তাহার পর তুমি পাশ হইলে তোমাকে ডাক্তারখানার একটা অংশ দিব। আর যাহাতে তোমার ভালরূপ পসার হয়, তাহাও আমি করিব।"

গিরিশ এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে। যে বালক দুইটিকে তিনি পড়াইতেন, তাহাদের

নিমিত্ত অন্য শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া, গিরিশ ডাক্তারখানার কাজেই সমুদয় সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। যে দিন প্রাতঃকালে কলেজে যাইতে হইত না, সে দিন বাহিরের রোগীদিগকে দেখিয়া, তাহাদের নিমিত্ত ঔষধের ব্যবস্থা করিতেন। সন্ধ্যার সময় ডাক্তারখানার সময় ডাক্তারখানার কাজ দেখিতেন। গিরিশের বাসা কিছু দূরে ছিল। সে নিমিত্ত এক দিন মাধব চক্রবর্ত্তী তাঁহাকে বলিলেন,—"প্রতিদিন এত দূর হইতে ডাক্তারখানায় আসিতে তোমার কষ্ট হয়। আমার বাটীতে বাহিরে ছোট ঘরটি পড়িয়া আছে। যদি তুমি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে সেই ঘরে আসিয়া থাকিতে পার। আমাদেরও যদি এক মুঠা হয়, তোমারও একমুঠা হইবে।"

সরলার নিকট বাস করিবেন, সরলাকে প্রতিদিন দেখিতে পাইবেন, সে জন্য গিরিশের মনে আনন্দ হইল। মাধব চক্রবর্ত্তীর সেই ছোট বৈঠকখানায় গিরিশ বাস করিতে সম্মত হইলেন। —গিরিশ বলিলেন,—'আপনার বাহিরের ঘরে আমি থাকিব, আপনার ঘরেও আমি খাইব। কিন্তু আপনার অবস্থা ভাল নহে। আপনাকে খরচ লইতে হইবে। আমার যত ব্যয় যখন গোপীবাবু নির্ব্বাহ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তখন আপনি খরচ লইবেন না কেন? খরচ না লইলে আপনার বাটীতে থাকিব না।"

অগত্যা মাধব চক্রবর্ত্তীকে এ কথায় সম্মত হইতে হইল। গিরিশ মাধব চক্রবর্ত্তীর বাটীতে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার ঘরে আহার করিতে লাগিলেন। সরলাকে সর্ব্বদাই দেখিতে পাইতেন। সরলার লজ্জাশীলতা, সরলার মধুর কথা, সরলার নানা গুণ দেখিয়া তিনি নিতান্ত মুগ্ধ হইলেন।

চতুর্থ অধ্যায় – বাক্সমোড়া চট

গোপী বাবুর ডাক্তারখানায় এক দিন বিলাত হইতে অনেক ঔষধ আসিয়াছিল। গিরিশ সেই বাক্সগুলি পূজার দালানে রাখাইলেন। কিন্তু মূল্যবান ঔষধের বাক্স কয়টি গোপী বাবু সেই মোহর-চুরির কুঠারিতে রাখিতে আদেশ করিলেন।

গোপী বাবু বলিলেন,—"ছোট কুঠরিতে ঐ দেরাজটা মিছামিছি স্থান যোড়া করিয়া আছে। ঐ দেরাজ হইতে আমার মোহর চুরি গিয়াছে। ওটাকে দেখিলে আমার রাগ হয়। দেরাজটা বিক্রয় করিয়া ফেল। তাহার পর ঐ ঘরে ভাল ভাল ঔষধের বাক্সগুলি রাখিয়া দাও।" —যাহার কাঠকাঠরার ব্যবসা করে, সেইরূপ এক ব্যক্তিকে ডাকিয়া, মাধব চক্রবর্ত্তী দেরাজটা বিক্রয় রিয়া ফেলিলেন। কুলি ডাকিয়া সেই ব্যক্তি দেরাজ বাহিরে আনিল। গোপী বাবু দেরাজের টানার চাবিগুলি ফেলিয়া দিলেন। চাবি কয়টি হাতে করিয়া গিরিশ মনে করিলেন,—"দেখি, দেরাজের ভিতর কিছু আছে কি না!"

একে একে টানাগুলি খুলিয়া, তাহার ভিতর হাত প্রবিষ্ট করিয়া গিরিশ উত্তমরূপে দেখিতে লাগিলেন। এ টানা সে টানা দেখিবার পর, অবশেষে একটি ভিতর যেই তিনি হাত দিয়াছে, অমনি তাঁহার হাতে কি ঠেকিয়া গেল। তিনি সেই জিনিসটি টানিয়া বাহিরে আনিলেন। দেখিলেন যে,—সাবানের বাক্স! খুলিয়া দেখিলেন যে তাহার ভিতর মোহর!

সকলের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। মোহরগুলি গোপী বাবু গণিয়া দেখিলেন যে, ঠিক তাঁহার সেই পঞ্চাশটি মোহর রয়িাছে। মোহর দেখিতে ডাক্তারখানার সকলে দৌড়িয়া আসিল। সকলেই এক একবার এক একটি মোহর তুলিয়া হাতে করিয়া দেখিল। গিরিশও একবার একটি মোহর তুলিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলেন।

টানার ভিতর মোহরের বাক্স কি করিয়া পুনরায় আসিল? মোহর যখন চুরি গিয়াছিল, তখন গোপী বাবু এক একটি টানার ভিতর হাত দিয়া তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াছিলেন। বিলাতী দেরাজ। টানা একেবারে বাহির করিয়া ফেলিবার যো ছিল না। কিন্তু খুঁজিতে তিনি বাকি করেন নাই। তিনি একেলা নহেন, ডাক্তারখানার প্রায় সকল লোকেই টানার ভিতর হাত দিয়া দেখিয়াছিল। কাহারও হাতে তখন সাবানের বাক্স ঠেকে নাই। আজ পুনরায় ইহার ভিতর সে মোহরপূর্ণ বাক্স কোথা হইতে আসিল।

যে লোক দেরাজ কিনিয়াছিল, সে অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া ও অনেক বার দেরাজের টানাগুলি টানিয়া ও নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল। তাহার পর গোপী বাবুর নিকট হইতে সাবানের বাক্সটি লইয়া কাত অর্থাৎ আড় করিয়া টানার ভিতর প্রবিষ্ট করিয়া দিল। সাবানের বাক্স গিয়া দেবাজের পশ্চাৎ দিকের কাঠের গায়ে লাগিল। তখন সকলকে সে হাত দিয়া দেখিতে বলিল। সাবানের বাক্স আড় হইয়া কাঠের গায়ে ঠিক সমান ভাবে লাগিয়াছিল। হাত দিলেই কাঠের মত বোধ হইতে লাগিল। যে দিন মোহর আন্তর্হিত হয়, সে দিন গোপী বাবু দেরাজ নাড়িয়াছিলেন। সেই নাড়া-চাডায় টানার ভিতর সাবানের বাক্স আড় হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার পর, টানাব ভিতর যে হাত দিয়া দেখিয়াছিল, তাহার হাতেই সাবানের বাক্সর পৃষ্ঠদেশ ঠিক কাঠের মত বোধ হইয়াছিল। সকলেই বুঝিল যে, মোহর অন্তর্হিত হইবার কারণ ইহা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

গোপী বাবু তাঁহার বৃদ্ধা মাতা ও স্ত্রীকে দেখাইবার নিমিত্ত মোহরপূর্ণ সাবানের বাক্সটি লইয়া সত্বর বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। যে দিন এ ঘটনা ঘটিল, সে দিন মঙ্গলবার।

গিরিশ বাসায় আসিলেন। মাধব চক্রবর্ত্তী তখন বাটী আসেন নাই? মোহর পুনঃপ্রাপ্তির বিষয়ে গিরিশ সরলা ও সরলার মাতার নিকট গল্প করিলেন।

সরলা বলিল,—'মোহর কিরূপ, আমি কখনও দেখি নাই!'

গিরিশ বলিলেন,—'মোহর কখন দেখ নাই? রও! আমি তোমাকে দেখাইতেছি। আমার যে দিন জন্ম হয়, সেই দিন পিতামহ আমাকে একটি মোহর দিয়া দেখিয়াছিলেন। আমি বড় হইলে পিতা এই মোহরটি আমার হাতে দিয়া বলিলেন,—"গিরিশ! ইহা আকবরী মোহর, ইহা লক্ষ্মী; যাহার কাছে থাকে, তাহার ভাল হয়। সে জন্য তোমাকে আমি ইহা দিতেছি। অতি যত্নে ইহা রাখিবে, কিছুতেই ইহা নষ্ট করিবে না' সেই অবধি মোহরটি আমি অতি সাবধানে রাখিয়াছি।'

এই কথা বলিয়া গিরিশ আপনার ঘরে গমন করিলেন। বাক্স হইতে মোহরটি আনিয়া সরলাকে দেখাইলেন। সরলা হাতে করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া মোহরটি পুনরায় গিরিশকে

দিল। গিরিশ তখন তাহা আপনার পকেটে রাখিলেন। মনে করিলেন যে, পরে ইহা বাক্সতে তুলিয়া বাখিব।

কিছ ক্ষণ পরে গোপী বাবুর দরওয়ান আসিল। হোলির সময় গিরিশের নিকট সে বক্‌শিশ চাহিয়াছিল। আট আনা দিতে গিরিশ প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। গিরিশ বলিলেন,—"তোমাব আমি আট আনা পয়সা ধারি; দিই, লইয়া যাও।'

এই বলিয়া গিরিশ পকেট হইতে একটি সিকি ও কতকগুলি পয়সা বাহির করিলেন। সেই পয়সার সহিত মোহরটিও বাহির পড়িল। দরওয়ান তাহা দেখিল। মোহরটি পুনরায় পকেটে রাখিয়া, গিরিশ তাহাকে একটি সিকি ও চারি আনা পয়সা গণিয়া দিলেন। দরওয়ান তাহা লইয়া চলিয়া গেল।

পরদিন বুধবার প্রাতঃকালে গিরিশ ডাক্তাবখানায গমন করিলেন। বিলাত হইতে যে সমুদয বাক্স আসিযা পূজার দালানে ছিল, গিরিশ তাহার গুটিকত বাক্স খুলিয়া, একেলা ফর্দ্দের সহিত ঔধুধ মিলাইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে মোহরপূর্ণ সেই মোহরপূর্ণ সাবানের বাক্স হাতে করিয়া গোপী বাবু সেই স্থানে আসিলেন। গিরিশ যে স্থানে মাটীতে বসিয়া ফর্দ্দের সহিত ঔষধ মিলাইতেছিলেন, তাহাব পার্শ্বে একখানি তক্তপোষ ছিল। মোহরপূর্ণ সেই সাবানের বাক্স তক্তপোষের উপর রাখিযা গোপী বাবু বন্ধু-বান্ধবদিগকে ডাকিয়া আহ্লাদ-সহকারে সেই মোহর দেখাইতে লাগিলেন।

সকলকে তিনি বলিতে লাগিলেন,—'দুই বৎসর পরিশ্রম করিয়া আমি এই মোহরগুলি জমা করিয়াছিল। আমি মনে করিয়াছিলাম, আব ইহাদের মুখ দেখিতে পাইব না। কিন্তু কা'ল হঠাৎ পুনরায় বাহির হইয়া পড়িল। আর একটু হইলেই যে দেরাজ কিনয়াছিল, সে লইয়া যাইত। ভাগ্যে গিরিশ টানাব ভিতর হাত দিয়া দেখিল, তাই আমি পুনরায় মোহরগুলি পাইলাম। সে এই গিরিশ, যে মাটীতে বসিয়া কাজ করিতেছে। এই গিরিশ হইতেই আমি আমার মোহরগুলি পাইয়াছি।'

গোপী বাবু গিরিশের প্রতি চাহিয়া একটু হাসিলেন। গিরিশও তাঁহার মুখপানে চাহিয়া একটু হাসিলেন। বন্ধুবান্ধবকে ডাকিয়া গোপী বাবু এইরূপ পরিচয় দিয়া মোহর দেখাইতে লাগিলেন। তাঁহারা বাস্ক হইতে দুই একটি মোহর তুলিয়া, নাড়িয়া, চলিয়া গেলেন। তাহাতেও গোপী বাবুর মন তৃপ্ত হইল না। তিনি সদর দরজায় গিয়া দাঁড়াইলেন। রাস্তা দিয়া পরিচিত লোক যে যান। তাহাকে মোহর দেখিবার নিমিত্ত ডাকিয়া আনেন।

গিরিশ আপনার মনে কাজ করিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে গোপী বাবুর বৃদ্ধ মাতা এক দাসী সঙ্গে করিয়া দালানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি গিরিশকে বলিলেন,—'গিরিশ! বাক্সমোড়া এই চটগুলি ফেলিয়া দিও না অনেক কাজে লাগিয়া যাবে চটগুলি আমাকে দাও, আমি ভিতর লইয়া যাই।

যে চট-দ্বারা আবৃত বিলাস বিলাত হইতে কতকগুলি বাক্স আসিয়াছিল, গোপী বাবু মাতা সেই চটগুলি বাছিয়া ও ঝাড়িয়া তক্তপোষের উপর রাখিতে লাগিলেন। এ কার্য্যে

চাকরাণীও তাঁহার সহয়াতা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে বাটীর ভিতর একটি ছেলে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। গোপী বাবুর মাতা বলিলেন,—'ঐ যাঃ। খোকা বুঝি পড়িয়া গেল। আহ্লাদি। মাটীতে যে চট পড়িয়া আছে, তুই সেইগুলি লইয়া আয়।'

এই বলিয়া গোপী বাবুর মাতা তক্তপোষের উপর যে চটগুলো রাখিয়াছিলেন তাড়াতাড়ি দুই হাতে সেইগুলিকে জড় করিয়া বাটীর ভিতর লইয়া গেলেন। নীচে অর্থাৎ মাটীর উপর যে চটগুলি পড়িয়াছিল, আহ্লাদি চাকরাণী তাহা লইয়া তাঁহার সঙ্গে বাটীর ভিতর চলিয়া গেল। গিরিশ এক মনে আপনার কাজ করিতে লাগিল।

পঞ্চম অধ্যায় – শোণিত-পাত

বন্ধু-বান্ধবের প্রতীক্ষায় গোপী বাবু সদর দরজায় দাঁড়াইয়া ছিলেন। আর এক জন পরিচিত লোককে পাইয়া মোহর দেখাইতে আনিলেন। দালানে উপস্থিত হইয়া তক্তপোষের উপর চাহিয়া তিনি বলিলেন,—'মোহরের বাক্স কি হইল? গিরিশ মোহরের বাক্স কই?' —গিরিশ উত্তর কহিলেন,—'মোহরের বাক্স আমি কি জানি!'

গোপীবাবু বলিলেন,—'সে কি, তক্তপোষের উপর আমি এই স্থানে বাক্স রাখিয়াছিলাম। সে বাক্স কোথায় গেল?'

গিরিশ বলিলেন,—'আহ্লাদী ঝীকে সঙ্গে লইয়া আপনার মাতা চট লইতে দালানে আসিয়াছিলেন। তবে বোধ হয় তিনিই বাক্স বাটীর ভিতর লইয়া গিয়াছেন।'

গোপীবাবু বাটীর ভিতর দৌড়িয়া গেলেন ও মোহরের কথা মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার মাতা বলিলেন,—'সে কি! আমি কেন মোহরের বাক্স আনিব? বাক্স তক্তপোষের উপর রহিয়াছে, আমি একমাত্র দেখিয়া আসিলাম।' আহ্লাদী ঝীও ঠিক সেই কথা বলিল।

গোপী বাবু পুনরায় দালানে আসিয়া গিরিশকে বলিলেন,—'গিরিশ! মা বাক্স লইয়া যান নাই। বাক্স তক্তপোষের উপর রহিয়াছে, তিনি দেখিয়া গিয়াছেন। আহ্লাদী ঝীও তাহা দেখিয়া গিয়াছে। তুমি বোধ হয়, তামাসা করিয়া বাক্স লুকাইয়া রাখিয়াছ। আর কেন, দাও। বাক্স বাহির করিয়া দাও।'

গিরিশ উত্তর করিলেন,'—'সে কি মহাশয়! আপনার সহিত আমি তামাসা করিব, এ কি সম্ভব। বাক্স তক্তপোষের উপর ছিল তাহা আমিও দেখিয়াছি। বন্ধু-বান্ধবকে আনিয়া আপনি দেখাইতেছেন, তাহাও শুনিতেছি। কিন্তু আমি আপন মনে কাজ করিতেছি। আপনার বাক্সতে আমি হাত দিই নাই। বাক্স কে লইল, কোথায় গেল, তাহার বিন্দুবিসর্গ আমি জানি না।'

·গোপী বাবু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—'বাক্সর পা নাই যে চলিয়া যাইবে, পাখা নাই যে উড়িয়া যাইবে। আমার মা কিছু আর বাক্স চুরি করেন নাই। বাক্স তক্তপোষের উপর রহিয়াছে, তিনি দেখিয়া গিয়াছেন। আহ্লাদী ঝীও তাহা দেখিয়া গিয়াছে। তাহার পর এ দালানে অপর কোন ব্যক্তি আসে নাই। তুমি একেলা এই দালানে আছ। দাও, বাক্স কোথায়

রাখিয়াছ, বাহির করিয়া দাও।'

গিরিশও রাগত হইয়া উত্তর করিলেন, 'তবে কি মহাশয় আমাকে চোর বলেন নাকি?'

গোপী বাবু আরও কুপিত হইয়া বলিলেন, 'বাক্স না পাওয়া গেলে আর কি বলিব?'

গিরিশ বলিলেন,—'তবে এই আপনার ঔষধ রহিল, এই কাগজ রহিল, এই দোয়াত কলম রহিল, আমি চলিলাম। এই দেখুন, আমার হাতে কিছুই নাই, কাপড়ে কিছু নাই, চাদরে কিছু নাই, জামার ভিতর কিছু নাই। আপনার মোহর আমি খাইয়া ফেলি নাই।'

এই কথা বলিয়া গিরিশ চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। ক্রোধে কম্পিত হইয়া গোপী বাবু বলিলেন,—'তুমি যাবে কোথা? বাক্স বাহির করিয়া দিয়া তবে যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাও। তা না হইলে তোমাকে আমি কিছুতেই ছাড়িব না। ওরে, এরে ধর তো। ছোট কুঠরিতে বন্ধ করিয়া রাখ।'

পূর্বে গোপী বাবুর ডাক্তারখানা হইতে অনেক ঔষধ চুরি যাইত। কম্পাউণ্ডার দ্বারবান প্রভৃতি সকলের তাহাতে সড় ছিল ও সকলের তাহাতে ভাগ ছিল। গিরিশ আসিয়া সেই সব চুরি বন্ধ করিয়াছিলেন। সে নিমিত্ত গিরিশের উপর সকলের ঘোরতর রাগ ছিল। সকলে আসিয়া গিরিশকে ধরিল ও সেই মোহর চুরির ছোট কুঠরিতে লইয়া গেল। সেই স্থানে লইয়া, কাপড়ে মুখ বন্ধ করিয়া, গিরিশকে তাহারা নিদারুণ প্রহার করিতে লাগিল। প্রহারের চোটে গুরুতর আঘাত লাগিয়া গিরিশের মুখ দিয় ভলকে ভলকে রক্ত বাহির হইতে লাগিল। সে রক্ত মুখ হইতে বাহির হয় নাই; সে রক্ত কৃষ্ণবর্ণের নহে। গিরিশের শ্বাস-প্রশ্বাস-যন্ত্র বাল্যকাল হইতেই দুবল ছিল। সে রক্ত লোহিতবর্ণ; বক্ষঃস্থলের ভিতর হইতে বাহির হইয়াছিল। গিরিশকে যাহারা মারিতে ছিল, শোণিত দেখিয়া তাহাদের ভয় হইল। হাতে মুখে জল দিয়া গিরিশকে তাহারা একটু সুস্থ করিল, রক্তের চিহ্ন ধুইয়া ফেলিল। তাহার পর গিরিশকে সেই ঘরে বন্ধ করিয়া দালানে ও সকল স্থানে পাতি পাতি করিয়া তাহারা মোহরের বাক্স খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু সকল অনুসন্ধান বৃথা হইল, মোহরের বাক্স বাহির হইল না। যখন এই সমুদয় ব্যাপার ঘটিয়াছিল তখন মাধব চক্রবর্তী ডাক্তারখানায় ছিলেন না। তিনি তাগাদায় গিয়াছিলেন।।

এই গোলযোগের সময় গোপী বাবুর দরওয়ান তাঁহাকে বলিল যে,—'মহাশয় গত কল্য গিরিশ বাবুর নিকট আমি একটা মোহর দেখিয়াছি। কাল আমার সাক্ষাতে গিরিশ বাবু পকেটে হাত দিয়া কতকগুলি পয়সা বাহির করিলেন। সেই পয়সার সহিত একটা মোহর দেখিয়াছিলাম।'

দরওয়ান বলিল, কাল সে গিরিশের নিকট মোহর দেখিয়াছে। গোপী বাবুর মোহর চুরি গেল, আজ প্রাতঃকালে। সে বাবুর হৃদয়ঙ্গম হইল না। ক্রোধে ও দুঃখে তিনি জ্ঞানহারা হইয়াছিলেন। দরওয়ান গিরিশের নিকট মোহর দেখিয়াছে, এই কথা শুনিয়াই তাঁহার নিশ্চয় প্রতীতি হইল যে, মোহর গিরিশ চুরি করিয়াছে। পূর্ব দিনে যখন দেরাজ হইতে বাহির হয়, তখন দুই একটা মোহর হাতে করিয়া সকলেই নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়াছিল।

গিরিশও তাহা হাতে করিয়াছিলেন। সে নিমিত্ত গোপী বাবু ভাবিলেন যে, গিরিশ কাল একটা মোহর কোনরূপে পকেটে ফেলিয়াছিল। তাহার পর আজ সমুদয়গুলি লইয়াছে। মোহর আবার কে কবে পয়সার সঙ্গে পকেটে রাখিয়া থাকে?

ষষ্ঠ অধ্যায় – হাতে হাতকড়ি

মাতা অনেক নিষেধ করিলেন, কিন্তু তাহা না শুনিয়া গোপী বাবু পুলিশে নালিশকরিলেন। পুলিশের লোক আসিয়া তদন্ত আরম্ভ করিল।

গোপী বাবু বলিলেন, —'আর এক বার আমার মোহর চুরি গিয়াছিল। রাত্রিতে চুরি যায়, সে রাত্রিতে গিরিশ আসিয়া পাশের ঘরে অনেকক্ষণ বসিয়াছিল। কিন্তু তখন আমি তাহাকে কোনরূপ সন্দেহ করি নাই। তাহার পর সে আমার ডাক্তারখানায় কর্ম্ম করে। গত কল্য সেই গিরিশ টানার ভিতর হইতে মোহর বাহির করিয়া আমাকে প্রদান করে। কি অভিপ্রায়ে তাহা আমি বুঝিতে পারি না। সে বোধ হয়, টানার ভিতর প্রথম নিজেই রাখিয়া তাহার পর আপনি সেই মোহর বাহির করিয়াছিল। আজ প্রাতঃকালে মোহরের বাক্স দালানে তক্তপোষের উপর রাখিয়া আমি সদর-দরজায় গিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। এই অবসরে মোহর সে কোন স্থানে সরাইয়া রাখিয়া থাকিবে। ইহার একটি মোহর আমার দরওয়ান তাহার পকেটে দেখিয়াছে। দালানে আজ প্রাতঃকালে এক গিরিশ ব্যতীত অপর কেহ আসে নাই। একবার কেবল আমার মাতা, ঝীকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। মাতা যখন বাটীর ভিতর ফিরিয়া যান, তখন মোহরের বাক্স তক্তপোষের উপর ছিল। ঝীও তাহা দেখিয়াছে।'

গোপী বাবুর মাতা, আহ্লাদী ঝী, দ্বারবান প্রভৃতি সকল লোকের সাক্ষ্য পুলিশেব লোকে গ্রহণ করিল। গিরিশের পকেট অনুসন্ধান করিয়া তাহারা একটি মোহর পাইল। গিরিশের ঘর-তল্লাস করিয়া কিন্তু আর কিছু পাইল না। যাহা হউক, অবশেষে হাতে হাতকড়ি দিয়া পুলিশের লোক গিরিশকে চালান দিল। মাধব চক্রবর্ত্তী, তাঁহার স্ত্রী ও সরলা শোকে অভিভূত হইলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় গোপী বাবুর অনেক হাতে-পায়ে ধরিলেন, কিন্তু তিনি কোন কথাই শুনিলেন না।

দুই দিন পরে গিরিশের মকদ্দমা আদালতে উঠিল। গিরিশ যে মোহর চুরি করিয়াছে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহার কোন প্রমাণ ছিল না। কিন্তু গোপী বাবু মকদ্দমার বিশেষরূপ তদবির করিতে লাগিলেন। যে হাকিমের নিকট গিরিশের বিচার হইতেছিল, তাঁহার শ্রীমুখ হইতে যে দুই একটি কথা নির্গত হইল, তাহাতে সকলের বোধ হইল যে, গিরিশের তিনি দণ্ড না করিয়া ছাড়িবেন না। ফরিয়াদির পক্ষের সাক্ষীদিগের সাক্ষ্য গৃহীত হইলে, হাকিম গিরিশকে চুরি অপরাধে অভিযুক্ত করিলেন ও তাঁহার কোন রূপ সাফাই সাক্ষী আছে কি না, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। গিরিশ বলিলেন যে, তাঁহার কোন সাফাই সাক্ষী নাই। গিরিশকে কারাবাস-প্রেরণের উদ্দেশে হাকিম রায় লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এমন সময় আদালতে একটা গোল পড়িল। সকলে দেখিল, এক জন কৃষ্ণকায় ব্যক্তি এক বালিকার হাত ধরিয়া ভিড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইতেছে। কন্যাটি ঠিক বালিকা নহে, যৌবন

প্রস্ফুটিতপ্রায়। বালিকার মধু-মাখা লাবণ্য দেখিয়া সকলেই তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

বলা বাহুল্য যে, সে বালিকা আর কেহ নহে—সরলা। গিরিশের বিপদে সরলা ও সরলার মাতা নিতান্ত কাতর হইয়াছিলেন। কয় দিন আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, দুই জনেই এক মনে ভগবানকে ডাকিতেছিলেন। লোকপরম্পরায় সরলা শুনিল যে, গিরিশের বিরুদ্ধে বিশেষ কোন প্রমাণ নাই, কেবল তাঁহার নিকট হইতে সেই যে মোহরটি বাহির হইয়াছিল, তাহার জন্য গিরিশের কয়েদ হইবার সম্ভাবনা।

পিতাকে সরলা বলিল,—'বাবা গোপী বাবুর মোহর বুধবার দিন চুরি গিয়াছে, কিন্তু মঙ্গলবার দিন আমি গিরিশ বাবুর নিকট মোহর দেখিয়াছি। তাহা হইলে গিরিশ বাবু কি করিয়া মোহর চুরি করিলে? আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যে, গিরিশ বাবুর পিতামহ এই মোহর দিয়া আঁতুড়ে তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন। গিরিশ বাবু কাহারও কোন বস্তু চুরি করিবার লোক নহেন। চুরি হইবার পূর্ব দিন অর্থাৎ মঙ্গলবার দিন দ্বারবান যে গিরিশ বাবুর পকেটে মোহর দেখিয়াছিল, সে কথা সকলে গোপন করিয়াছে। আমি গিয়া হাকিমকে এ কথা বলিব। কোথায় বিচার হইতেছে, সে স্থানে আমাকে লইয়া চল।'

মাধব চক্রবর্ত্তী উত্তর করিলেন,—'বাপ রে! ও কথা মুখে আনিও না আমি নিশ্চয় জানি বটে যে, গিরিশ মোহর চুরি করে নাই। কিন্তু কি করিব বল, গোপী বাবুর কত হাতে-পায়ে ধরিলাম, তিনি আমার কথা শুনিলেন না। ভগবান যা কপালে লিখিয়াছেন তাহাই হইবে। তুমি এখন বালিকা নও, তোমাকে কি আদালতে লইয়া যাইতে পারি? লোকের কাছে তাহা হইলে মুখ দেখাইতে পারিব না। তাহার পর গোপী বাবু আমাকে ছাড়াইয়া দিবেন। এ বৃদ্ধ বয়সে কোথায় আবার চাকরি খুঁজিয়া বেড়াইব?'

সরলা ও সরলার মাতা বার বার তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। দুই জনে কাঁদিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণী বলিলেন যে, —'সরলা যদি একটা কথা বলিলে গিরিশ বিপদ হইতে উদ্ধার পায় তাহা হইতে সে কাজ নিশ্চয় করতে হইবে। ব্রাহ্মণের ছেলেকে অন্যায় করিয়া গোপী বাবু কয়েদ দিতেছেন। তাহাকে রক্ষা করিলে লোকে যদি আমাদের নিন্দা করে, তো করুক। গোপী বাবু যদি তোমাকে ছাডাইয়া দেন, এতই যদি তিনি নরাধম হন্ তো হউন; আমরা ভিক্ষা মাগিয়া খাইব।'

মাধব চক্রবর্ত্তী অগত্যা সরলাকে আদালতে লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন।

সপ্তম অধ্যায় – ফণ্ডে টাকা

কন্যাকে লইয়া মাধব চক্রবর্ত্তী আদালতে উপস্থিত হইলেন। হাকিম তৎক্ষণাৎ সরলার সাক্ষ্য গ্রহণ করিলেন। সরলাকে বড় অধিক কিছু বলিতে হইল না। গিরিশের পক্ষ হইয়া সরলার আগমন, তাহাই যথেষ্ট হইল। এরূপ সুশীলা সুরূপা ভদ্রকন্যা যাহার সপক্ষ সাক্ষী, সে যে নির্দোষ, সরলাকে দেখিয়াই হাকিমের মনে সেই বিশ্বাস জন্মিল, চুরি হইবার পূর্ব দিন গিরিশের নিকট তিনি মোহর দেখিয়াছিলেন, সরলাকে কেবল এই কথা বলিতে হইল।

সরলার আন্তরিক ভাব হাকিম বুঝিতে পারিলেন। গিরিশকে ছাড়িয়া দিবার সময় ঈষৎ

হাসিয়া তিনি সরলাকে বলিলেন,—'ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, যেন তোমরা দুই জনে সুখী হও।' লজ্জায় সরলা ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল।

বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া গিরিশ, মাধব চক্রবর্ত্তী ও সরলা তিন জনে বাটী ফিরিয়া আসিলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীতে সে দিন আর আনন্দের সীমা রহিল না। সরলার মাতা সন্ধ্যার সময়ে হরি লুট দিলেন।

তাহার পর দিন গোপী বাবু মাধব চক্রবর্ত্তীকে কর্ম হইতে জবাব দিলেন। বিরস বদনে চক্রবর্ত্তী বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। গিরিশ বলিলেন,—'মহাশয়! এজন্য কিছুমাত্র ভয় করিবেন না। আর এক মাস পরে আমি পাশ হইব, নিশ্চয় পাশ হইব। তখন আমি ডাক্তার হইব। যে কোন প্রকারে হউক, নিশ্চয় আপনাদিগকে প্রতিপালন করিতে পারিব। আপাততঃ আমার তিন শত টাকা জমা আছে, সেই তিন শত টাকা খরচ করিব। তবে আর ভাবনা কি? আপনার যদি অমত না থাকে, তাহা হইলে সত্বর একটা ভাল দিন দেখাইয়া সরলাকে আমার হস্তে প্রদান করুন।' —এই ঘটনার আট দিন পরেই সরলার সহিত গিরিশের শুভ বিবাহকার্য সম্পন্ন হইল। গিরিশ শ্বশুরের সংসারেই রহিলেন।

এক মাস পরে গিরিশ সুখ্যাতির সহিত ডাক্তারি পাশ দিলেন। তিন শত টাকার যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহা দিয়া নিকটে একটি ভাল বাটী লইয়া নিজের ডাক্তারখানা খুলিলেন। কিন্তু গোপী বাবু তাঁহার পরম শত্রু হইয়া উঠিলেন। গিরিশ চোর, গিরিশের চরিত্র ভাল নহে, ভদ্রলোকের বাড়ীতে ইহাকে প্রবেশ করিতে দেওয়া উচিত নহে, চারি দিকে এইরূপ কুৎসা রটাইতে লাগিলেন। সে জন্য গিরিশের পসার ভাল হইল না। ভালরূপ অর্থোপার্জ্জন হইল না। যাহা হউক, তিনি, শ্বশুর-শাশুড়ীকে, পিতা মাতার ন্যায় ভক্তিসহকারে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। মাধব চক্রবর্ত্তী মহাশয় দুই এক স্থানে কর্মের যোগড় করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার শরীর দুর্বল ও রুগ্ন, সে জন্য গিরিশ তাঁহাকে আর চাকরি করিতে দিলেন না। চাকরি আর তিনি করিতেও পারিতেন না। কারণ, অল্প দিন পরে বাতরোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া তিনি শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। ধন না হউক, গহনা না হউক, মনের মত পতি পাইয়া, বাপ মায়ের কাছে থাকিয়া, সরলা সুখে কালযাপন করিতে লাগিল। কিছু দিন পরে সরলার এক কন্যা হইল। মাতামহ আদর করিয়া কন্যার নাম রাখিলেন,—লীলা।

গোপী বাবুর ধন-ঐশ্বর্য অনেক ছিল বটে; কিন্তু মনে তাঁহার সুখ ছিল না। যত বয়স হইতে লাগিল, তাঁহার হাঁপানি কাশি ততই প্রবল হইতে লাগিল। জীবন তাঁহার কষ্টময় হইল, শরীর ক্লেশের আগার হইল, প্রত্যেক নিশ্বাস প্রশ্বাস তাঁহার যন্ত্রণাদায়ক হইল। ইহার উপর তাঁহার দুইটি পুত্রই বিসূচিকা রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া এক দিনেই মৃত্যুমুখে পতিত হইল। একটির বয়ঃক্রম দ্বাদশ ও অপরটির বয়স দশ বৎসর। ইহার কিছু দিন পরে গোপী-বাবুর আর একটি বিপদ ঘটিল। তাঁহার একমাত্র কন্যা ছিল। সেই কন্যার একটি শিশু পুত্র ছিল। যে দিন মোহর চুরি যায়, সে দিন তাহারই কান্না শুনিয়া গোপী বাবুর মাতা

তাড়াতাড়ি বাটীর ভিতর গমন করেন। কয়েক বৎসর পরে গোপী বাবুর কন্যা শ্বশুর-বাড়ীতে এক দিন তাঁহার পুত্র পুষ্করিণীর জলে পড়িয়া যায়। তখন ঘাটে আর কেহ ছিল না। পুত্রকে বাঁচাইবার জন্য গোবী বাবুর কন্যা জলে ঝাঁপ দিলেন। কিন্তু তিনি সাঁতার জানিতেন না। মাতা-পুত্র দুই জনেই জলমগ্ন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। গোপী বাবু এইরূপে নিঃসন্তান হইলেন। সকলেই বলিল, এমন কি, তাঁহার নিজের মাতাও বলিলেন যে, বিনা দোষে গিরিশের প্রতি অন্যায় হইযাছিল, তাহারই প্রতিফল স্বরূপ তাঁহার সমুদয় বিপদ ঘটিল। কিন্তু এ পর্যন্ত সে মোহরের কোন সন্ধান হয় নাই। সে নিমিত্ত এখনও তাঁহার মনে নিশ্চিন্ত বিশ্বাস ছিল যে, গিরিশই তাহার মোহর চুরি করিয়াছে গিরিশের সহিত পুনরায় সদ্ভাব করিতে মাতা তাঁহাকে বার বার অনুরোধ করিলেন। কিন্তু এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া তিনি মাতার অনুরোধ রক্ষা করিলেন না।

বাল্যকাল হইতেই গিরিশের বক্ষঃস্থল বড় ভাল ছিল না। বিশেষ কোন রোগ ছিল না বটে, কিন্তু বক্ষঃস্থলের সঙ্কুচিত গঠন দেখিয়া , তিনি সর্বদা ভয় পাইতেন। শ্বাস-প্রশ্বাস-যন্ত্র ভালরূপ সবল নহে, গিরিশের মনে এই ধারণা ছিল। তাহাব পর গোপী বাবুর লোক দ্বারা প্রহারের পর তাঁহার বক্ষঃস্থলে যে বেদনা জন্মে, সে বেদনা কিছুতেই দূর হয় নাই। সেই সময় বড়ই কষ্ট পাইতেন। এই সকল কারণে, অর্থোপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিয়াই, গিরিশ লাইফইনশিয়োর অর্থাৎ ফণ্ডে টাকা জমা দিতে লাগিলেন। দুইটি ফণ্ডে তিনি টাকা দিতেন। প্রথম স্থানের সহিত এই নিয়ম নির্ধারিত হইয়াছিল যে, গিরিশের মৃত্যু হইলে সে ফণ্ড হইতে তাঁহার স্ত্রী নগদ তিন সহস্র টাকা পাইবেন। দ্বিতীয় সংস্থার সহিত এই নিয়ম করিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার স্ত্রী যত দিন জীবিত থাকিবেন, ততদিন মাসে মাসে দশ টাকা করিয়া পাইবেন। প্রথম স্থানে গিরিশকে ছয় মাস অন্তর পঞ্চাশ টাকা দিতে হইত; দ্বিতীয় স্থানে তিনি প্রতি মাসে তিন টাকা করিয়া দিতেন।

অষ্টম অধ্যায় – সঙ্কট পীড়া

এইরূপে প্রায় সাত বৎসর কাটিয়া গেল। মাধব চক্রবর্তী মহাশয়ের শরীর আর সুস্থ ও সবল হইল না। গ্রীষ্মকালে তাঁহার বাত-বেদনার প্রকোপ যখন কিছু হ্রাস হইত, তখন তিনি একটু উঠিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতে পারিতেন। কিন্তু সে কেবল অল্প দিনের জন্য। বলিতে গেলে প্রায় বারো মাস তাঁহাকে বিছানার পড়িয়া থাকিতে হইত। সরলার আর সন্তানাদি হয় নাই, কেবল সেই একমাত্র কন্যা,—*লীলা*। লীলা পিতার বড় আদরের সামগ্রী। পিতার সহিত তাহার যত মনের কথা হইত। বাবা, বাবা, বলিয়া লীলা অজ্ঞান! বলাবাহুল্য যে, মেয়েটিকে গিরিশ প্রাণের অধিক ভালবাসিতেন। গিরিশের ধনঐশ্বর্য ছিল না বটে; কিন্তু লীলার কথা, লীলার হাসি, লীলার ভালবাসা, তাঁহার লক্ষ টাকার অধিক ছিল। ফল কথা, গিরিশের সংসারে শান্তি ছিল সুখ ছিল।

কিন্তু, হায়! লীলার বয়স যখন পাঁচ বৎসর হইল, তখন এই সুখের সংসারে এক ঘোর

দুর্ঘটনা ঘটিল। এই সময় গিরিশের ভয়ানক কাসি হইল, রাত্রি দিন কাসি, এক মুহূর্তের জন্য বিরাম নাই, বক্ষঃস্থল যেন খানখান হইয়া ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। শ্লেষ্মার সহতি ক্রমে ঈষৎ রক্ত দেখা দিল। প্রত্যহ বৈকাল বেলা অল্প অল্প জ্বর হইতে লাগিল। গিরিশ নিজে ডাক্তার ছিলেন। কি হইতেছে, তাহা তিনি সহজেই বুঝিতে পারিলেন। যক্ষ্মা-কাস রোগ দ্বারাই তিনি আক্রান্ত হইলেন। গিরিশ ভাবিলেন যে, —আর আমার নিস্তার নাই।

ক্রমে তিনি শুষ্ক ও দুর্বল হইয়া পড়িতে লাগিলেন। শ্বশুর, শাশুড়ী, স্ত্রী ও কন্যার মুখপানে চাহিয়া তিনি যত দিন পারিলেন, সংসার-নির্বাহের নিমিত্ত অর্থোপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। নিতান্ত অশক্ত হইয়াও তিনি যথাশক্তি পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। পীড়া ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এরূপ সঙ্কট সাংঘাতিক পীড়াগ্রস্ত হইয়া লোকে আর কত দিন পরিশ্রম করিতে পারে! ছয় মাস পরেই তিনি শয্যাগত হইয়া পড়িলেন।

গিরিশের সঞ্চিত অর্থ ছিল না। মাসে মাসে যাহা উপার্জন করিতেন, তাহাই খরচ হইয়া যাইত। স্ত্রী ও কন্যাকে যে কয়খানি গহনা দিয়াছিলেন, সম্বলের মধ্যে কেবল তাহাই ছিল। শয্যাশয়ী হইয়া, নিরুপায় হইয়া, গিরিশ এখন সেই গহনাগুলি বেচিয়া অতি কষ্টে দিনপাত করিতে লাগিলেন।

রোগ আবও প্রবল হইয়া উঠিল। দিন দিন বিছানার সহিত মিশিয়া যাইতে লাগিলেন। গিরিশ বুঝিলেন যে, তাঁহার আসন্নকাল উপস্থিত, আর অধিক বিলম্ব নাই। অবশিষ্ট যে অলঙ্কার ছিল, তাহা বিক্রয় করিয়া পঞ্চাশ টাকা হইল, কয়দিন? এ পঞ্চাশ টাকা ফুরাইলে তাহার পর কি হইবে? বৃদ্ধ ও রুগ্ন শ্বশুর ও বৃদ্ধ শাশুডীর দশা কি হইবে? সহায় সম্পত্তিহীনা কুলের কুলবধূ সরলার দশা কি হইবে? প্রাণাধিকা শিশু লীলার কি হইবে? আহা! সংসারের সে কিছুই জানে না। সদাই মনের আনন্দে সে হাসিয়া খেলিয়া বেড়ায়। হায়! দুই দিন পরে সে লীলার কি দশা ঘটিবে? ক্ষুধায় কাতর হইয়া দুইটি মুড়ির জন্য কি এক মুষ্টি ভাতের জন্য লীলা যখন কাঁদিবে, তখন কে দুইটি মুড়ি কি এক মুষ্টি ভাত দিয়া তাহাকে শান্ত করিবে? গিরিশ ভাবিয়া আকুল হইলেন, চারিদিক্ তিনি অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। হে ভগবান্! তোমার মনে কি এই ছিল।

গিরিশ অনেক দিন ধরিয়া ফণ্ডে টাকা দিয়া আসিতেছেন। ফণ্ডের সহিত তিনি এই নিয়ম করিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যু হইলেই, তাঁহার স্ত্রী নগদ তিন হাজার ও মাসে দশ টাকা পাইবেন। তবে আর ভাবনা কি? সত্য বটে কিন্তু এক ফণ্ডে মাসে তাঁহাকে তিন টাকা করিয়া দিতে হয়। শয্যাগত হইয়াও অতি কষ্টে তিনি তাহা দিয়া আসিতেছেন। এখন আর তিনি কি করিয়া দিবেন? তাহার পর অপর ফণ্ডে ছয় মাস অন্তর যে পঞ্চাশ টাকা করিয়া দিতে হয়, পাঁচ দিন পরে সেই পঞ্চাশ টাকা দিতে হইবে। এখন কোথা হইতে সে পঞ্চাশ টাকা তিনি দিবেন? নিয়মিত দিনে টাকা দিতে না পারিলে, নিরূপিত প্রাপ্য হইতে তাঁহার পরিবার বঞ্চিত হইবেন। এত দিন তিনি যে ফণ্ডে টাকা দিয়া আসিতেছেন সে বৃথা হইবে; তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হইলে স্ত্রী একটি পয়সাও পাইবে না। যে পঞ্চাশটি টাকা হাতে

আছে, তাঁহার সেই শেষ সম্বল। তাহা যদি তিনি ফণ্ডে প্রদান করেন, তাহা হইলে জীবনের অবশিষ্ট কয়টা দিন কি খাইয়া তিনি জীবিত থাকিবেন? অপর দিকে ফণ্ডে সেই পঞ্চাশ টাকা না দিলে, দুই দিন পরে তাঁহার অনাথা স্ত্রী ও কন্যা একেবারে পথে দাঁড়াইবে। 'হে জগদ্বীশ্বর। এই পাঁচ দিনের ভিতর আমার মৃতু হয়, তবেই রক্ষা! তাহা না হইলে, হে ঈশ্বর! আমার অবর্ত্তমানে এ অনাথদিগের কি দশা হইবে।

এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া গিরিশ নিত্যন্ত আকুল হইয়া পড়িলেন।

নবম অধ্যায় – এ কে?

গিরিশের যিনি চিকিৎসা করিতেছিলেন, তিনি তাঁহার পরম বন্ধু। দুই জনে একসঙ্গে পড়িয়াছিলেন। গিরিশ তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন,—'ভাই! আমার শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রটি তুমি ভালরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখ। আমার নিকট কোন কথা গোপন করিবে না। ঠিক করিয়া বল দেখি, আর কত দিন আমার বাঁচিবার সম্ভাবনা আছে?'

গিরিশের বন্ধু তাঁহার বক্ষঃস্থল অতি সাবধানে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন,—'ভাই! যখন তুমি আমাকে ঠিক সত্য কথা বলিতে অনুরোধ করিতেছ, তখন আমাকে তাহা বলিতে হইবে। আমাব উপর অসন্তুষ্ট হইও না। এ যাত্রা তুমি কিছুতেই রক্ষা পাইবে না। তবে তিন মাসের ভিতর তোমার মৃত্যু হইবে না, ছয় মাসের অধিক তুমি কিছুতেই বাঁচিবে না। চারি পাঁচ মাস পরেই নিশ্চয়ই তোমাকে এ সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে। তোমার বক্ষঃস্থলের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া আমার এইরূপ অনুমান হইতেছে। কিন্তু একেলা আমার কথায় তোমার বিশ্বাস করা উচিত নয়। আমি আরও দুই জন ভাল ডাক্তার আনিয়া দেখাইব। তাঁহারা কি বলেন, শুনিতে হইবে।'

গিরিশের বন্ধু, আরও দুই জন ভাল ডাক্তার আনিয়া দেখাইলেন। সকলেই একমত হইয়া বলিলেন যে ছয় মাসের অধিক গিরিশ কিছুতেই জীবিত থাকিবেন না।

গিরিশ বলিলেন,—'আমি ডাক্তার। আমার শরীরের ভিতর যাহা হইতেছে, তাহা আমি উত্তমরূপ জানি। এ রোগে বাঁচিবার আশা বড়ই প্রবল হয়। কিন্তু আমি শিশু নই। শীঘ্রই যে আমাকে যাইতে হইবে, তাহা আমি নিশ্চয় বুঝিতেছি। এক্ষণে আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি,—পাঁচ দিনের ভিতর মৃত্যু হইবার কোন সম্ভাবনা আছে কি?'

সকলেই একবাক্যে বলিলেন,—'কিছুতেই নয়। পাঁচ দিন কেন, তিন মাসের ভিতর কোন ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।'

অন্য ডাক্তার দুই জন চলিয়া যাইলে, গিরিশ আপনার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'ভাই! তুমি আজ আমার নিমিত্ত যে ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছ, তাহাতে কি কি আছে?'

যে ঔষধ যে পরিমাণে দিয়াছিলেন, গিরিশের বন্ধু তাহার নাম করিলেন।

গিরিশ বলিলেন,—'বারো দাগ ঔষধ দিয়াছ। আচ্ছা, কেহ যদি ভুলিয়া একেবারে বারো দাগ খাইয়া ফেলে, তাহা হইলে কি হয়।' —বন্ধু উত্তর করিলেন,—'কি হয়, তাহা

কি তুমি জান না? দুর্বল লোকের কথা দূরে থাকুক, সুস্থ সবল ব্যক্তিও মরিয়া যায়।'

ঈষৎ হাসিয়া গিরিশ বলিলেন,—'তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।'

সে দিন এইরূপে গত হইল। তাহার পরদিন সন্ধ্যাকালে গিরিশ বলিলেন,—'সরলা! লীলা মা! তোমরা দুই জনে আমার নিকট এস। সরলা, তুমি এক পাশে থাক, লীলা তুমি এক পাশে থাক। তোমরা দুই জনে আমার নিকটে থাকিলে আমি ভাল থাকি।'

গিরিশ খাটে শুইয়া আছেন। সরলা বাম পাশে বসিল, লীলা তাঁহার দক্ষিণ পাশে বসিল। বাম হাতে গিরিশ সরলার একটি হাত ধরিলেন। সন্ধ্যাকাল, অন্ধকার হইয়াছে। ঘরে প্রদীপ জ্বলিতে গিরিশ বারণ করিলেন। সরলা ও লীলার হাত ধরিয়া সেই অন্ধকার ঘরে নিঃশব্দে চক্ষু বুজিয়া গিরিশ শয়ন করিয়া রহিলেন। এই ভাবে আধ ঘন্টা শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময় সহসা সেইঘরে এক জন পুরুষ মানুষ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সরলা চমকিত হইয়া দাঁড়াইলেন। সে পুরুষ মানুষ কে?

দশম অধ্যায় – সেই চট

গিরিশ যে সময়ে সরলা ও লীলাকে ডাকিয়া কাছে বসাইলেন, সেই সময়ে গোপী বাবুর বাটীতে এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটিয়াছিল। গোপী বাবুর বৃদ্ধা মাতা যে ঘরে শয়ন করিতেন, সেই ঘরের দ্বার-জানালায় কিছু ফাঁক হইয়া গিয়াছিল। অগ্রহায়ণ মাস, নূতন শীত পড়িয়াছে। —আহ্লাদী ঝিকে ডাকিয়া গোপী বাবুর মাতা বলিলেন,—'আহ্লাদি! দ্বার-জানালার ফাঁক দিয়া রাত্রিতে ঘরে বড় হিম আসে। বুড়ো হাড়! সমস্ত রাত্রি যেন কুকুরে চিবায়। গায়ের ব্যথায় সকালে উঠিতে পারি না। তুই এক কর্ম্ম কর। এই ছেঁড়া কাপড়খানা ছিঁড়িয়া নেকড়া কর, আর সেই নেকড়া জানালার ফাঁকে ফাঁকে গুঁজিয়া দে। তাহা করিলে রাত্রিতে ঘরে হিম আসিবে না।'

আহ্লাদী বলিল,—'ঠাকুর-মা! সে দিন চোর-কুঠরি ঝাড়িতে ঝাড়িতে একটা ভাঙ্গা বাক্সর ভিতর কতকগুলি চট দেখিয়াছি। সেই চট দিয়া পর্দা করিলে হয় না?'

গোপী বাবুর মাতা বলিলেন,—'চোর-কুঠরিতে চট কোথা হইতে আসিল?'

আহ্লাদী বলিল, —'তা জানি না। একটা ভাঙ্গা বাক্স, ডালা নাই, তাহার ভিতর রহিয়াছে দেখিলাম।' —গোপী বাবুর মাতা বলিলেন,—'চল দেখি, দেখি! কি চট, কোথা হইতে আসিল, আর তাহাতে পর্দা হইবে কি না?' —ঝিকে সঙ্গে লইয়া গোপী বাবুর মাতা চোর কুঠরিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। চোর-কুঠরির ভিতর সহজেই অন্ধকার তাহাতে সন্ধ্যা হইয়াছে। আহ্লাদী গিয়া প্রদীপ আনিল। একটা কাঠের বাক্সে কতকগুলো ছেঁড়া চট রহিয়াছে, গোপী বাবুর মাতা তাহা দেখিতে পাইলেন।

গোপী বাবুর মাতা বলিলেন, —'ওরে! ও আহ্লাদি! এ সেই চট! তোর মনে পড়ে? যে দিন মোহর চুরি যায়, সেই দিন গিরিশের কাছ হইতে বাক্স মোড়া চট আমি আনিয়াছিলাম। সেই চটগুলি আনিয়া আমি এই বাক্সটার ভিতর ফেলিয়াছিলাম। তাহার

পর সেই মোহর লইয়া হাঙ্গাম-হুজ্জৎ, মকদ্দমা-মামলা। এ চটের কথা আমি একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলাম। সে আজ সাত আট বৎসরের কথা। এ চটগুলা দেখিয়া আমার প্রাণে যেন কেমন একটা আতঙ্ক হইতেছে।'

আহ্লাদী ঝি বলিল,—'হাঁ। ঠাকুর মা! এ চটের কথা এখন আমার সব মনে পড়িতেছে। তাড়াতাড়ি আমরা দুই জনে আনিয়া এই বাক্সর ভিতর চটগুলো ফেলিয়া রাখিলাম। তাহার পর সেই হাঙ্গামা, সেই পুলিশের লোক। এখনও সে সব কথা মনে হইলে ভয় হয়। আহা! গিরিশ বাবু না কি মরমর হইয়াছেন।' —গোপী বাবুর মাতা উত্তর করিলেন,—'হাঁ! আমি শুনিয়াছি, ডাক্তারে জবাব দিয়াছে। ছুঁড়ীর যে কি হইবে! এত দিন পরে এ চটে আর কি কোনও কাজ হইবে? পচিয়া হয় তো গোবর হইয়া গিয়াছে!'

একাদশ অধ্যায় – আবার সেই মোহর

গোপী বাবুর মাতা দুই হাতে অনেকগুলি চট ধরিয়া সেই বাক্স হইতে বাহির করিলেন। সেই চটের ভিতর হইতে তৎক্ষণাৎ একটি কঠিন বস্তু ভূতলে পতিত হইল, আর সেই উজ্জ্বল নূতন পয়সার মত কি সব ঘরের চারিদিকে গড়াইয়া গেল।

আহ্লাদী ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। গোপী বাবুর মাতা থপ্ করিয়া মাটীতে বসিয়া পড়িলেন, আর বলিলেন,—'আহ্লাদি! আমাকে বাতাস কর, আমার গা ঝিম্-ঝিম্ করিতেছে!' —একটু সুস্থ হইলে তিনি পুনরায় বলিলেন,—'শীঘ্র গোপীকে ডাকিয়া আন্।'

আহ্লাদী তাড়াতাড়ি গোপী বাবুকে ডাকিয়া আনিল। মাতা বলিলেন,—'গোপী। এই দেখ, কি বাহির হইয়াছে!'

গোপী বাবু আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন যে, চটের সঙ্গে সেই সাবানের বাক্স দুই ভাগ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে ও তাহার ভিতর হইতে মোহর সকল বাহির হইয়া ঘরের চারিদিকে গড়াইয়া গিয়াছে। —গোপী বাবু সাবানের বাক্সটি তুলিয়া লইলেন। ও মোহর কুড়াইতে লাগিলেন। আহ্লাদী ঝিকে ও কুড়াইতে বলিলেন।

আহ্লাদী বলিল,—'না, ও মোহরে আমি হাত দিব না, ও বড় অপয়া মোহর, যে ইহাতে হাত দিবে, তাহার সর্বনাশ হইবে।' —গোপী বাবু নিজেই সমস্ত মোহর কুড়াইয়া গণিয়া দেখিলেন যে,—ঠিক পঞ্চাশটি মোহর রহিয়াছে।

মাতা তখন বলিলেন,—'গোপী। আমি হতভাগীই তবে চোর! গিরিশের মত হাতে হাতকড়ি দিয়া আমাকে এখনি পুলিশের লোক ধরিয়া লইয়া যাইবে! আমাকে জেলখানায় পাঠাইয় দিবে। পায়ে বেড়ি দিয়া আমাকে সেই জেলখানায় রাখিয়া দিবে। তারকেশ্বরের মোহান্তকে যেরূপ করিতে হইয়াছিল, আমাকেও সেইরূপে করিতে হইবে, ঘানিগাছে সরিষা হইতে তেল বাহির করিতে হইবে। কালীঘাটে মোহান্তর পট কিনিয়াছিলাম, তাহাতে এই সব দেখিয়াছি। কি লজ্জার কথা—কি ঘৃণার কথা। এ বৃদ্ধ বয়সে আমি কি করিয়া ইজের পরিব, সে সব কি কাজ কি করিয়া করিব?'

গোপী বাবু বলিলেন, 'না, মা! তোমার সে সব ভয় নাই।'

মাতা বলিলেন,—পুলিশে যদি এ কথা জানিতে না পারে, তাহা হইলে আমি নিজে গিয়া ধরা দিব। আহা! আমার পাপের জন্য সে ব্রাহ্মণের ছেলের কত না লাঞ্ছনা হইয়াছে! শুনিতেছি, সে মর-মর হইয়াছে। আজ সাত বৎসরের কথা হইল বটে, কিন্তু সেই দিন হইতে সে কখন সুখী হয় নাই। সেই অপমান সে কখনও ভুলিতে পারে নাই। সেই মনস্তাপে অবশেষে তাহার এই উৎকট রোগ হইয়াছে। আমার এই পাপের জন্য পুলিশে আমি নিজে গিয়া ধরা দিব। তার পর, না হয় গলায় দড়ি দিয়া কি আফিম খাইয়া মরিব। কিন্তু ধর্ম জানেন, আমি জানিয়া শুনিয়া এ কাজ করি নাই! তাড়াতাড়ি যখন চট সব গুটাইয়া লইলাম, সেই সঙ্গে বোধ হয়, এই কাল বাক্সটাও গুটাইয়া লইয়াছিলাম। যতক্ষণ দালানে ছিলাম, ততক্ষণ তক্তপোষের উপর বাক্স দেখিয়াছিলাম। বাক্স যে সেইখানেই ছিল সে সময় নিশ্চয় তাহাই আমার মনে হইয়াছিল। তাই বলিয়াছিলাম যে যখন আমি বাড়ীর ভিতর আসি, তখনও তক্তপোষের উপর বাক্স দেখিয়া আসিয়াছিলাম। এ মিথ্যা কথার জন্য নরকেও আমার স্থান হইবে না। কিন্তু ভগবান জানেন, ধর্ম জানেন যে, জানিয়া শুনিয়া আমি এ মিথ্যা কথা বলি নাই।'

আহ্লাদী বলিল,—'আমিও তো সেই কথা বলিয়াছিলাম। অত শত কে জানে বাপু! দালানে গিয়া তক্তপোষের উপর মোহরের বাক্স দেখিলাম! আমরা তাড়াতাড়ি আসিলাম। তুমি বাছা যে চটের সঙ্গে বাক্স গুটাইয়া আনিবে, আমি কি করিয়া জানিব? আমি ভাবিয়াছিলাম যে, বাক্স সেইখানেই রহিল, এই মনে করিয়া আমিও সেই কথা বলিয়াছিলাম। আমার কত পাপ হইয়াছে!' এই কথা বলিয়া আহ্লাদী কাঁদিতে লাগিল।

মাতা বলিলেন, 'গোপী! সেই সময়ে গিরিশের নামে নালিশ করিতে আমি তোমাকে নিষেধ করিয়াছিলাম। তুমি আমার কথা শুন নাই। মাধব চক্রবর্ত্তীকে ছাড়াইয়া দিতে মানা করিয়াছিলাম। তুমি আমার কথা রাখ নাই। তাহার পর গিরিশের প্রতি শত্রুতা করিতেও নিষেধ করিয়াছিলাম। সে কথাও তুমি আমার রক্ষা কর নাই। বিনাদোষে সেই ব্রাহ্মণের ছেলের প্রতি তুমি ঘোরতর অত্যাচার করিয়াছে। সেই পাপে একদিনে তোমার চাঁদের মত দুইটি ছেলে গিয়াছে। সেই পাপে আমার বংশ নির্ব্বংশ হইয়া গেল, এক গণ্ডুষ জল দিতে আর কেহ রহিল!' —গোপী বাবু বলিলেন,—'আমি নিশ্চয় বুঝিয়াছিলাম যে, গিরিশ আমার মোহর চুরি করিয়াছে, তাই এই কাজ করিয়াছিলাম। আর মা, আমাকে ভর্ৎসনা করিও না। সেই সব কথা মনে করিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে।'

মাতা বলিলেন,—'এখন তোমাকে একটি কথা বলি, শুন। নিশ্চয় ইহা মাতৃ-আজ্ঞা বলিয়া জানিও। যদি এবার আমার কথা না রক্ষা কর, তাহা হইলে ভগবান্‌কে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি যে, নিশ্চয় আমি গলায় দড়ি দিয়া, না হয় বিষ খাইয়া মরিব।'

গোপী বাবু বলিলেন,—'কি আজ্ঞা করিবে, মা, তা বল। আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, নিশ্চয় আমি তাহা করিব।' মাতা বলিলেন,—'তুমি এই মুহূর্তে গিরিশের নিকট যাও।

তাহার হাতে-পায়ে ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর এই মোহরগুলি তাহাকে দিয়া এস। ও পাপ মোহরে আমাদের কাজ নাই।'

গোপী বাবু উত্তর করিলেন,—'তার আটক কি, মা! আমি এখনি তাহাই করিব। এ পঞ্চাশটা মোহরের আর কতই মূল্য হইবে? ১২০০ টাবার অধিক নয়। এ ১২০০ টাকা দিলে আমরা দুঃখী হইয়া যাইব না।' মাতা বলিলেন,—'তবে এখনি তাহাকে এ মোহরগুলি দিয়া এস, আর বিলম্ব করিও না।'

দ্বাদশ অধ্যায় – গোপী বাবুর দান

মোহরের বাক্সটি হাতে লইয়া গোপী বাবু বাটী হইতে বাহির হইলেন। গিরিশের বাটী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সরলার মাতা তাঁহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। সরলার পিতা ঘরের ভিতর ছিলেন, তিনি, তাঁহাকে দেখেন নাই। গোপী বাবু কাহাকেও কিছু না বলিয়া, গিরিশ যে ঘরে শুইয়া ছিলেন, বরাবর সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। সামান্য বাড়ী, গিরিশের ঘর কোন্‌টি অনায়াসেই তাহা বুঝিতে পারিলেন! ঘরের ভিতর সহসা এক জন পুরুষ মানুষ দেখিয়া সরলা চমকিত হইয়া দাঁড়াইল। সরলার মাতা ঘরে প্রদীপ লইয়া আসিলেন।

ঘবের মাঝখানে দাঁড়াইয়া, স্তব্ধ হইয়া গোপী বাবু গিরিশের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। মুদিত চক্ষে গিরিশ শুইয়া আছেন। কিন্তু আর সে গিরিশ নাই, সর্বশরীর শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, হাত-পা কাঠির ন্যায় হইয়া গিয়াছে, বিছানার সহিত তিনি যেন মিশিয়া রহিয়াছেন। কেবল পূর্বেই ভাব—মুখশ্রীর বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

গোপী বাবুর চক্ষু দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন যে,—'এই শোচনীয় দৃশ্যের এক মাত্র কারণ, আমি পাপিষ্ঠ নরাধম।'

গিরিশ চক্ষু মুদিত করিয়া পড়িয়া আছেন। পার্শ্বে পাঁচ বৎসরের সেই মেয়েটি নিঃশব্দে বসিয়া রহিয়াছে। শীঘ্রই কি বিষম সর্বনাশ ঘটিবে, সেই পাঁচ বৎসরের বালিকা যেন তাহা বুঝিয়াছে। এ বয়সের অস্থিরতা ও চপলতাকে সেই জন্য যেন সে ভুলিয়া চুপ করিয়া এক স্থানে বসিয়া আছে। গোপী বাবু মনে মনে ভাবিলেন --'আমার নিষ্ঠুর ব্যবহারের ফলে এই শিশুটি শীঘ্রই অনাথা হইবে। আমা অপেক্ষা নরাধম পৃথিবীতে আর নাই।'

বালিকাকালে সরলা পিতার সহিত গোপী বাবুর বাটীতে যাইত। সুতরাং গোপী বাবুকে সে বিলক্ষণ জানিত। এত শত্রুতার পর গোপী বাবুকে সহসা আজ তাঁহাদের গৃহে দেখিয়া সরলা বিস্মিত হইল। খাট হইতে নামিয়া সে ভূমিতে দাঁড়াইল। লীলা সভয়ে গোপী বাবুর মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

গোপী বাবু খাটের নিম্নে ভূমিতে হাঁটু গাড়িয়া বসিলেন; বসিয়া আস্তে আস্তে গিরিশের একটি হাত ধরিলেন। গিরিশ চক্ষু চাহিলেন।

গোপী বাবু কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—'গিরিশ! গিরিশ! আমাকে ক্ষমা কর।'

ধীরে ধীরে গিরিশ উত্তর করিলেন,—'এ সময় কাহারও উপর আমার রাগ-দ্বেষ নাই। সকলকেই আমি ক্ষমা করিয়াছি।'

গোপী বাবু পুনরায় বলিলেন,—'গিরিশ, আমি অতি পাপিষ্ঠ; আমি অতি নরাধাম। বিনাদোষে আমি তোমার প্রতি ঘোরতর অত্যাচার করিয়াছি। তোমার এ রোগের কারণ আমি। ক্ষমার পাত্র আমি নই বটে, কিন্তু তোমার হাতে ধরিয়া বলিতেছি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর।' —গিরিশ বলিলেন,—'আপনাকে আমি ক্ষমা করিয়াছি। আপনি নিশ্চিন্ত মনে বাটী প্রত্যাগমন করুন। আমার কথা কহিবার শক্তি নাই। আমি নিদ্রা যাইব।"

গোপী বাবু পুনরায় বলিলেন,—'তুমি যে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, আজ এই মাত্র তাহা আমরা জানতে পারিলাম। জানিতে পারিয়াই তোমার নিকট দৌড়িয়া আসিয়াছি। সেই মোহর আজ পুনরায় বাহির হইয়া পড়িয়াছে। আমার মা না দেখিয়া চটের সহিত গুটাইয়া মোহরের বাক্স বাটীর ভিতর লইয়া গিয়াছিলেন। বাটীর ভিতর চোর-কুঠরিতে একটা ভাঙ্গা বাক্সের সেই চটের সহিত মোহরগুলি এত দিন পড়িয়া ছিল। আজ তাহা পুনরায় বাহির হইয়া পড়িয়াছে। এই দেখ, সেই সাবানের বাক্স, আর ইহার ভিতর সেই পঞ্চাশটি মোহর।'

গিরিশ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"মোহর যে এক দিন না এক দিন পাইবেন, তাহা আমি নিশ্চয় জানিতাম। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করি যে, আজ সেই ঘটনা ঘটিল। সকলে আমাকে নিরপরাধ বলিয়া জানিল, এই কথা আমি যে শুনিয়া যাইতে পারিলাম, সে জন্য আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করি।"

গোপী বাবু বলিলেন,—"যাইবে কেন গিরিশ? কোথায় যাইবে? যত টাকা আবশ্যক হয়, তাহা দিয়া তোমাকে আমি ভাল করিব।"

গিরিশ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"আপনি নিজে ডাক্তার। আপনি সব জানেন। এক্ষণে আপনি বাটী গমন করুন, আমি আর কথা কহিতে পারি না।"

গোপী বাবু বলিলেন,—"আর কেবল একটি কথা বলি। তোমাকে আর অধিক কষ্ট দিব না। সেই কথাটি বলিয়াই আজ আমি বিদায় হই। পুনরায় কাল আসিয়া তোমার ভালরূপ চিকিৎসার আয়োজন করিব।" —গিরিশ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি কথা?"

গোপী বাবু বলিলেন, —"এই মোহরগুলি তোমাকে দিয়া যাইতে মাতা আজ্ঞা করিয়াছেন। এ মোহরগুলি আমি রাখিয়া যাই। এ মোহর এখন তোমার, এ আমার নয়।"

গিরিশের মুখ ঈষৎ রক্তিমবর্ণে রঞ্জিত হইল। অপেক্ষাকৃত একটু উচ্চৈঃস্বরে তিনি বলিলেন,—"কি! ঐ মোহরগুলি আমি লইব! কখনই না!"

মোহর লইবার নিমিত্ত গোপী বাবু গিরিশকে বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কথা কহিতে গিরিশের অতিশয় কষ্ট হইতেছিল। এমন কি, এক্ষণে শ্বাসপ্রশ্বাস-ক্রিয়া সম্পাদনেও তাঁহার ক্লেশ হইতেছিল।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে গিরিশ বলিলেন,—"মহাশয়! কথা কহিবার আর আমার শক্তি নাই। মিনতি করি, এ শেষ অবস্থায় আর আমাকে কষ্ট দিবেন না। আপনার মোহর কিছুতেই আমি লইব না। আপনার ইচ্ছা হয়, গরীব দুঃখীকে ইহা দান করিবেন। আমার স্ত্রী কি আমার কন্যা, কি আমার শ্বশুর-শাশুড়ী কেহ যেন এ মোহর স্পর্শ না করে,

অনাহারে মৃত্যু হলেও কেহ যেন আপনার নিকট হইতে একটি পয়সাও গ্রহণ না করে। সরলা! লীলা! যদি অনাহারে তোমাদের মৃত্যু উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও এ মোহর কি ইঁহার একটি পয়সাও কখন স্পর্শ করিও না। সরলা! আমার এই অন্তিম দশায় তোমাকে আমি এই আজ্ঞা করিলাম। কখনও ভুলিও না।"

একটু নিঃশব্দে থাকিয়া, গোপী বাবুর মুখপানে চাহিয়া গিরিশ পুনরায় বলিলেন,— "মহাশয়! বিনা অপরাধে আমার প্রতি যাহা কিছু অত্যাচার হইয়াছে, সে সব আমি ক্ষমা করিলাম। কিন্তু মোহর লইতে আর আমাকে অনুরোধ করিবেন না। আমার শ্বশুর-শাশুড়ী, অথবা আমার স্ত্রী, অথবা আমার কন্যা আমার অবর্ত্তমানে কেহ আপনার মোহর স্পর্শ করিবে না। এক্ষণে বাটী প্রত্যাগমন করুন। এই আমার শেষ কথা! আর আমি কথা কহিতে পারি না।"

এই কথা বলিবার পর গিরিশের মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হইল। সরলা তাড়াতাড়ি আসিয়া বাতাস করিতে লাগিল। তাহার পর হাত যোড় করিয়া সে গোপী বাবুকে বলিল,—"মোহরের কথা, মহাশয় আর কখন মুখে আনিবেন না। প্রাণ গেলেও আপনার মোহর কখনই লইব না। আপনি বাটী প্রত্যাগমন করুন। আপনাকে দেখিলে ইঁহার মনে কষ্ট হয়। এ স্থানে আপনার আগমন না করাই ভাল ছিল।"

গোপী বাবুকে সরলা এক প্রকার বাটী হইতে দূর করিয়া দিল। নিতান্ত অপ্রতিভ হইয়া মোহরের বাক্স হাতে করিয়া, বিরস বদনে তিনি স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায় – আর কেন ভাই

সরলা ও লীলা পুনরায় গিরিশের দুই পার্শ্বে বসিল। গিরিশ পূর্ব্বই তাহাদের হাত ধরিয়া রহিলেন। মোহর প্রদানের কথা শুনিয়া উত্তেজিত হইয়াছিলেন, সেই কারণেই হউক, অথবা অন্য কারণেই হউক, গিরিশের চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, ঘন ঘন সবলে নিশ্বাস পড়িতে লাগিল।

সেই নিশ্বাসে কিরূপ এক প্রকার শব্দ হইতে লাগিল।সরলা অতিশয় ভয় পাইল। তাড়াতাড়ি পিতাকে সে সেই ঘরে ডাকিয়া আনিল। লাঠি ধরিয়া মাধব চক্রবর্ত্তী অতি কষ্টে সেই ঘরে আসিলেন। ঘরে আসিয়া গিরিশের অবস্থা দেখিয়া তিনি স্ত্রীকে বলিলেন,—শীঘ্র যাও। গোপালকে শীঘ্র ডাক্তার আনিতে বল।"গিরিশ চক্ষু চাহিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, "না মহাশয়! ডাক্তার আনিতে হইবে না। শীঘ্রই আমি সুস্থ হইব।"

সরলার মাতা সে কথা শুনিলেন না। ডাক্তার আনিবার নিমিত্ত তিনি গোপালকে বলিতে গেলেন। গোপাল এক জন প্রতিবাসী।

কিছুক্ষণ পরে গিরিশের বন্ধু সেই ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গিরিশের পার্শ্বে যাই তিনি খাটের উপর বসিয়াছেন আর তাঁহার পা লাগিয়া খাটের নীচে কি ঠন্ করিয়া পড়িয়া গেল। মস্তক অবনত করিয়া খাটের নীচ হইতে তিনি সেই বস্তুটি বাহির করিলেন।

দেখিলেন যে, শিশিটি সম্পূর্ণ খালি। গিরিশ। চক্ষু মুদিত করিয়া ছিলেন। ডাক্তার চক্ষু চাহিতে বলিলেন। গিরিশ চক্ষু চাহিলেন না। চক্ষুর পাতা টানিয়া ডাক্তার দেখিলেন যে, চক্ষু দুইটি ঘোর রক্তবর্ণ হইয়াছে, তারা দুইটি সঙ্কুচিত হইয়াছে।

সরলা, লীলা, মাধব চক্রবর্তী ও তাঁহার স্ত্রীকে ডাক্তার সে ঘর হইতে যাইতে বলিলেন। তাহার পর একাকী পাইয়া, খালি শিশিটি দেখাইয়া, তিনি গিরিশকে বলিলেন,—"গিরিশ, ছি ভাই! এমন কাজও করিতে হয়?"

গিরিশ অতি মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন,—"কি করি ভাই! না করিলে নয়। দুই দিন আগে কি দুই দিন পরে—এই বই তো নয়! আর গোটা কত দিন অধিক বাঁচিয়া স্ত্রী ও কন্যাকে পথের ভিখারিণী করিতে পারি না। করুণাময় জগদীশ্বর আমার প্রতি কৃপা করিবেন, তিনি আমার বিচার করিবেন। কাহাকেও এ কথা বলিও না, ভাই!'

ডাক্তার বলিলেন,—"কাহাকেও বলি না বলি, আমি চুপ করিয়া থাকিতে পারি না। যথারীতি তোমার চিকিৎসা আমি করিব। এখনি তোমাকে বমন করাইব, তাহাব পর তাড়িত-যন্ত্র প্রয়োগ করিব।"

গিরিশ বলিলেন,—"আর কেন ভাই! এ মৃত্যু সময়ে কেন আর আমাকে যন্ত্রণা দাও?"

ডাক্তার বলিলেন,—"না ভাই! আমি কিছুতেই চুপ করিয়া থাকিতে পারিব না। সে অনুরোধ করিও না, সে অনুরোধ আমি কিছুতেই রক্ষা করিতে পারব না।"

গিরিশ বলিলেন,—"তবে যা জান তাই কর। কিছু করিতে পারিবে না। কিন্তু ভিতর প্রতারণা কিছুই নাই। যে ফাণ্ডে টাকা দিয়াছি, তাহাদের নিয়ম ভঙ্গ করি নাই। সে যাই হউক, এ কথা কাহাকেও বলিও না। তুমি আমার বালক-কালের বন্ধু, মরণকালে তোমাব নিকট এই ভিক্ষা চাই।"

ডাক্তারের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। গিরিশের নিকট তিনি সেইরূপ সত্যে আবদ্ধ হইলেন। তাহার পর সরলার মাতাকে একটু জল গরম করিতে বলিয়া তিনি ঔষধ ও যন্ত্রাদি আনিতে সত্বর গমন করিলেন। –সরলা ও লীলা পূর্ববৎ গিরিশের নিকট আসিয়া বসিল। শ্বশুর-শাশুড়ীকে সে ঘরে আসিতে হাত নাড়িয়া গিরিশ নিষেধ করিলেন। সরলা ও লীলার হাত ধরিয়া গিরিশ পূর্ববৎ শুইয়া রহিলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় – সমাপ্ত

গিরিশের নিশ্বাস-প্রশ্বাস এতক্ষণ অতি সবলে পড়িতেছিল, অতি ব্যস্ত হইয়া তিনি যেন বায়ু আকর্ষণ করিতেছিল। ক্রমে নিশ্বাসের সে ভাব কমিয়া আসিল। সরলা মনে করিল যে, গিরিশ বুঝি কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়াছেন ও তাঁহার বুঝি নিদ্রা আসিতেছে। কিছুক্ষণ পরে গিরিশ মৃদুস্বরে বলিলেন,—"কি সুন্দর!"

সরলা মস্তক অবনত করিয়া শুনিতে চেষ্টা করিল।

গিরিশ পুনরায় বলিলেন,—"রম্য দেশ! অতি সুন্দর! সর্বত্র শান্তি বিরাজ করিতেছে। ঘোর হরিদ্‌বর্ণে আচ্ছাদিত প্রান্তর, অদূরে নানা বৃক্ষে সুশোভিত পর্বতশ্রেণী। মাঝে নদী কুল

কুল শব্দে বাহিয়া যাইতেছে। নদীতীরে প্রস্ফুটিত ফুলগুলির কি সুন্দর বর্ণ! কি অপূর্ব সৌরভে চারিদিক্ আমোদিত হইয়াছে। ঐ শুন মধুর বাদ্য! না, ও বাদ্য নয়, মন্দ মন্দ বায়ুহিল্লোলে আলোড়িত বৃক্ষ-পত্রের মর্ম্মর শব্দ। কিন্তু কি মধুর শব্দ! ঐ যে, আমার মা, নদীর অপর পারে দাঁড়াইয়া আমাকে ডাকিতেছেন। ঐ যে, আমার পিতা ও তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন। আরও কত লোক রহিয়াছে। যাই মা যাই! এখনি যাইব। কিন্তু নদী পার হই কি করিয়া? কতকগুলা কাদায় যে আমাকে জড়িত করিয়া রাখিয়াছে! না, এ কাদা নয়, আমার শরীর। যাই হউক, এ শরীরে আর আমার কাজ নই। এ ক্লেদরাশি একবার এগুলা দূর করিয়া পরিষ্কৃত হইতে পারিলেই আমি ও-পারে উড়িয়া যাই। তখন সব সুখ, সব শান্তি! যাই, মা, যাই! আর বিলম্ব নাই।''

সরলা মনে করিল,—গিরিশ প্রলাপ বকিতেছেন। গিরিশের নিশ্বাস-প্রশ্বাস ক্রমেই কমিয়া আসিতে লাগিল।

ঈষৎ চক্ষু চাহিয়া ধীরে ধীরে গিরিশ পুনরায় বলিলেন,—''সরলা! তবে ভাই, যাই! লীলা, মা! তবে আমি যাই! ঐ দেখ, নদীতীরে আমার বাবা ও আমার মা দাঁড়াইয়া আছেন। অতি সুন্দর, অতি রম্য দেশ, সরলা! আমার পিতা-মাতার কি জ্যোতির্ম্ময় শরীর হইয়াছে! ঐ স্থানে যত লোক দেখিতেছি, সকলেরই ঐরূপ দেবশরীর। ঠিক যেন নির্ম্মল, সুশীতল, সূর্য্যকিরণ দ্বারা গঠিত। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর সেই সচ্চিদানন্দ পুরুষের জ্যোতি দ্বারা ঐ প্রদেশ আলোকিত হইয়াছে। তাঁহার বিমল জ্যোতি দ্বারা ঐ পরলোকবাসীদের, ঐ দেবতনুসম্পন্ন লোকদিগের— দেহ ওতপ্রোতভাবে সিক্ত হইয়া রহিয়াছে। সামান্য জলকণা যেরূপ মহাসাগরবক্ষে ক্রীড়া করে, সেইরূপ পূর্ণজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া, রোগ জরা শোক তাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া, প্রিয়জনকে সঙ্গে লইয়া, সেই সচ্চিদানন্দ পুরুষকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া, ঐ দেবতনু বিশিষ্ট জীবগণ পরমানন্দে ক্রীড়া করিতেছে। আমার মা আমাকে ঐ স্থানে ডাকিতেছেন। সরলা! আর আমি অপেক্ষা করিতে পারি না। লীলা মা! তোমরা যখন আসিবে, তখন তোমাদের জন্যও আমি ঐ নদীতীরে দাঁড়াইয়া থাকিব। ঐস্থানে রোগ নাই, শোক নাই, কোন দুঃখ নাই। তোমরা দুই জনে আসিলে, তখন সকলে একসঙ্গে থাকিব। আর কখনও ছাড়াছাড়ি হইবে না। সরলা! লীলা! তবে এখন আমি বিদায় হই।''

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া গিরিশ পুনরায় ধীরে ধীরে বলিলেন,—''কিন্তু সরলা! কিন্তু লীলা! তোমাদের আমি গুটিকতক কথা বলিয়া যাই। আমার এ শেষ কথা। আমার কথাগুলি কখনও ভুলিবে না। লীলা এখন আমার এই সকল কথা বুঝিতে পারিবে না। লীলা বড় হইলে, সরলা তুমি তাহাকে আমার এই শেষ কথাগুলি বুঝাইয়া দিবে। সকল লোক ঐ পবিত্র স্থানে যাইতে পারে না। এই পৃথিবীতে আসিয়া যাহারা সত্য-পথ হইতে বিচলিত হয় না, যাহারা কাহারও অনিষ্ট করে না; যাহারা হিংসা, দ্বেষ ও ঘৃণার চক্ষে কাহাকেও দর্শন করে না; যাহারা সেই সচ্চিদানন্দ পরম পুরুষকে কখন বিস্মৃত হয় না; যাহারা সর্বদা তাঁহাকে হৃদয়-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত রাখিয়া জগতের হিতসাধনে জীবন

অতিবাহিত করে,—কেবল তাহারাই ঐ সুখের স্থানে গমন করিতে পারে, কেবল তাহারাই প্রিয়জনকে লইয়া যাহারা অন্যরূপে জীবন অতিবাহিত করে, তাহাদের পরলোক অন্যরূপ। সেই স্থানে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া অবশেষে তাহারা ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়। দেখিও সরলা! দেখিও লীলা! তোমরা যেন ঐ সুখের স্থান হইতে বঞ্চিত হইও না। দেখিও, যেন পুনরায় তোমাদের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। আজ আমার পিতা-মাতা যেন আমাকে আদর করিয়া ঐ পবিত্র জ্যোতির্ম্ময় স্থানে লইয়া যাইতেছেন, যেন যথাকালে তোমাদিগকেও আমি সেইরূপ আদর করিয়া লইয়া যাইতে পারি। তবে সরলা! তবে লীলা! এখন বিদায় হই।"

গিরিশ নীরব হইলেন। একান্ত মনে তিনি ভগবানের ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন।

সরলা এখন বুঝিতে পারিল যে, গিরিশের অধিক বিলম্ব নাই। নিঃশব্দে সরলা কাঁদিতে লাগিল। চক্ষের জলে তাহার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। পিতার অবস্থা ও মাতার কান্না দেখিয়া লীলা বিস্মিত মনে, মলিন বদনে, সজল নয়নে, একবার মায়ের মুখপানে, একবার বাপের মুখপানে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। গিরিশের নিশ্বাস প্রশ্বাস ক্রমেই হ্রাস হইতেছিল। কাঁদিতে কাঁদিতে সরলা তাঁহাকে বাতাস করিতেছিল। একবার সে পাখা বন্ধ করিল। চকিত হইয়া সে দেখিল যে, গিরিশের গায়ে যে চাদরখানি ছিল, বক্ষঃস্থলে এতক্ষণ যাহা উঠিতেছিল ও নামিতেছিল, তাহা আর নড়িতেছে না, চাদরখানি স্থির হইয়া গিয়াছে। শশব্যস্ত হইয়া সরলা গিরিশের নাকে হাত দিয়া দেখিল। সেই মুহূর্ত্তে সরলা মূর্চ্ছিত হইয়া খাটের উপর হইতে ভূমিতে পতিত হইল। লীলা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। সরলার পিতা-মাতা সেই ঘরে দৌড়িয়া আসিলেন। সেই মুহূর্ত্তে ডাক্তারও পুনরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ডাক্তার দেখিলেন যে, গিরিশ চিরদিনের নিমিত্ত ইহসংসার পরিত্যাগ করিয়াছেন।

ভয়ানক আংটি

প্রথম পরিচ্ছেদ – হারাধনের ধন

কলিকাতার নিকট হাবড়া। হাবড়ার নিকট রাজীবপুর। রাজীবপুরে পরাণ বাঁড়ুয্যের বাড়ী। পরাণ বাঁড়ুয্যের এক মাত্র পুত্র,—তাহার নাম হারাধন। হারাধন কলেজে পড়েন, ছোকরা বয়স,—নিতান্ত ছোকরা নয়, উনিশ কুড়ি বৎসরের যুবা।

রাত্রি হইয়াছে। শয্যার শয়ন করিয়া হারাধন আরব্য উপন্যাস পাঠ করিতেছেন! কমর-উল-জমানের গল্প, যে গল্পে পরীতে এক দেশের রাজকন্যা আনিয়া অন্য দেশের রাজপুত্রের সহতি বিবাহ দিয়াছিল। হারাধন এক মনে এক ধ্যানে সেই গল্প পড়িতেছিলেন।

নিদ্রায় হারাধনের চক্ষু জুড়িয়া যাইতে লাগিল। সুদীর্ঘ একটি নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া হারাধন পুস্তকখানি বন্ধ করিলেন। পাশ ফিরিয়া হারাধন মনে মনে বলিলেন,—"আমার ঐরূপ হয়। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যে পরমাসুন্দরী কন্যা, জিন কি পরীতে আনিয়া তাহার সহিত আমার বিবাহ দেয়!'

কন্যাটির কি প্রকার রূপ হইবে, তাহার মুখ, চক্ষু, কি প্রকার হইবে, হারাধন সেই বিষয় মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে একখানি চিত্র তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া গেল। চিত্রই বা কি করিয়া বলি? সৌদামিনীসদৃশ অপূর্ব প্রভারাশিসম্পন্ন, অলৌকিক রূপলাবণ্যে গঠিত, সহাস্য-বদনা দ্বাদশবর্ষীয়া এক কন্যাকে তিনি যেন প্রত্যক্ষ দেখিতে লাগিলেন। সেই স্বর্গীয় রূপরাশি দর্শনে বিমোহিত হইয়া হারাধন নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

নিদ্রায়ও হারাধন অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত-মনোহর-পুষ্প-মুকুলসদৃশ সৌন্দর্য্যময়ীকে দর্শন করিলেন। হারাধন স্বপ্ন দেখিলেন যে,—সেই কন্যার বিবাহ দিবার নিমিত্ত তাহার পিতা স্বয়ম্ভর সভা করিয়াছেন। নানা দেশ হইতে রাজগণ আগমন করিয়া সভায় ঘটের মত সারি সারি বসিয়া আছেন। মাল্য-চন্দনপূর্ণ পাত্র হস্তে কন্যা বাহির হইল। অর্জ্জুনের সম্মোহন বাণেপ্রপীড়িত কৌরবরথিগণের ন্যায় রাজগণ কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। ঘোর চীৎকারে মালা প্রার্থনা করিয়া, তাঁহারা আপন আপন গলা বাড়াইয়া দিতে লাগিলেন। হারাধন সভার এক পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। কন্যা অন্য কাহারও প্রতি কটাক্ষপাত না করিয়া, হারাধনের নিকটে আসিয়া, তাঁহারই গলার মাল্য প্রদান করিল। চারিদিকে হৈ হৈ পড়িয়া গেল। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের ন্যায় রাজগণ ক্ষেপিয়া উঠিলেন। কামান, বন্দুক, গোলাগুলি লইয়া তাঁহারা হারাধনের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন। হারাধন যুদ্ধ করিলেন না, তিনি বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাঁহার বক্তৃতায় কেহ কর্ণপাত করিলেন না। মুষলমুখবিশিষ্ট কদাকার এক রাজা আসিয়া সবলে তাঁহার কান মলিয়া দিল। সেই কানমলার চোটে হারাধনের নিদ্রা-ভঙ্গ হইল।

সমুদয় অলীক স্বপ্ন—কথা! সমুদয় মিথ্যা। তা বটে! কিন্তু হারাধনের মন কিছুতেই প্রবোধ মানিল না। পূর্ণচন্দ্রসদৃশ কন্যার মুখখানি তাঁহার মনে আরও গভীর ভাবে অঙ্কিত হইয়া গেল। হারাধন পাগলের ন্যায় হইয়া পড়িলেন। এরূপ কন্যা নিশ্চয় কোন স্থানে আছে, ও তাহার সহিত নিশ্চয় আমার পরিণয় হইবে; হারাধনের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া পড়িল। "সেই বালিকা ভিন্ন অন্য কাহাকেও আমি বিবাহ করিব না"—হারাধন মনে মনে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন। —এই প্রতিজ্ঞায় হারাধন দিনযাপন করিতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি এম, এ, পাশ করিলেন। তাঁহার পিতা সঙ্গতিপন্ন লোক। চারিদিক হইতে তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। কিন্তু বিবাহ করিতে হারাধন কিছুতেই সম্মত হইলেন না। যে বালিকার কমলনয়ন দুইটি রাত্রি-দিন তাঁহার হৃদয়ে জাগিতেছিল, একান্ত মনে তাহার ধ্যানেই তিনি নিমগ্ন রহিলেন।

এক বৎসর গত হইয়া গেল, দুই বৎস গেল, তিন বৎসর গেল, তথাপি সে সোনার প্রতিমার সহিত হারাধনের সাক্ষাৎ হইল না। পথে-ঘাটে সকল স্থানেই, সকল সময়েই তিনি সেই বালিকার অনুসন্ধান করেন। এক স্থানে কতকগুলি লোক দেখিলেই সতৃষ্ণ নয়নে তিনি তাহাদের মুখপানে চাহিয়া থাকেন। মনে করেন—এইবার বুঝি আমি তাহার দর্শন

পাইব। কিন্তু বৃথা আশা! স্বপ্নদৃষ্ট বালিকার সহিত এখনও তাঁহার সাক্ষাৎ হইল না। হারাধন কিন্তু নিরাশ হইলেন না। এক দিন নিশ্চয় তাহাকে আমি পাইব,—বরং এই আশা তাঁহার মনে দিন দিন বলবতী হইতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ – স্বপ্নদৃষ্ট বালিকা

সে বৎসর প্লেগের ভয়ে যখন কলিকাতা হইতে লোক পলায়ন করিতেছিল, তখন এক দিন জন কয়েক আত্মীয়কে গাড়ীতে তুলিয়া দিতে হারাধন হাওড়া ষ্টেশনে গিয়াছিলেন। ষ্টেশন জনাকীর্ণ, বড় ভিড়। এক এক গাড়ীতে দ্বিগুণ তিনগুণ আরোহী। অতি কষ্টে আত্মীয়দিগকে গাড়ীতে উঠাইয়া হারাধন দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া রহিলেন। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। প্রথমে গাড়ী ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল, তাহার পর বেগ ক্রমেই বাড়িতে লগিল। গাড়ি চলিতে চলিতে পশ্চাৎ দিকের একখানি তৃতীয় শ্রেণী হারাধনের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। হারাধন দেখিলেন যে, এই গাড়ীখানির দ্বার ধরিয়া এক চতুর্দশ কি পঞ্চদশ বর্ষের বালিকা বাহিরে ঝুলিতেছে। তাহার অভিভাবকগণ সকলেই গাড়ীতে উঠিয়াছেন, বালিকা একেলা কেবল উঠিতে পারিতেছে না। গাড়ীর ভিতর হইতে এক জন লোক, বোধ হয় পিতা, প্রাণপণে বালিকার হাত ধরিয়া টানিতেছেন। কিন্তু গাড়ীতে তিল রাখিবার স্থান নাই, কিছুতেই তিনি তাহাকে গাড়ীর ভিতর লইতে পারিতেছেন না।

ভয়ে মৃতপ্রায় হইযা বালিকা গাড়ীর দ্বারে ঝুলিতে লাগিল। আর একটু এই অবস্থায় থাকিলেই সে রেলের নিম্নে পড়িয়া কাটা যাইবে। ঈশ্বরের কৃপায় এই মুহূর্তে সেই গাড়ীখানি হারাধনের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাহিব হইতে বালিকাকে ধরিয়া হারাধন গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িতে লাগিলেন। দ্বার খোলা ছিল। একবার সুযোগ পাইয়া বলপূর্বক গাড়ীর ভিতর তিনি বালিকাকে ঠেলিয়া দিলেন। বালিকার প্রাণ বাঁচিয়া গেল।

এতক্ষণ বালিকার পশ্চাৎ দিক হারাধনের দিকে ছিল, তিনি তাহাব মুখ দেখিতে পান নাই। আসন্ন বিপৎকালে কিছু দেখিবার কি ভাবিবার অবকাশও ছিল না। বালিকা যখন গাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল, তখন নিমিষের নিমিত্ত হারাধন তাহার মুখখানি দেখিতে পাইলেন। সেই বিকসিত পঙ্কজ মুখ সেই মৃগ-নয়ন, বিম্বাধর, সেই কৃষ্ণধনুসম ভ্রূযুগল, ফল কথা স্বপ্ন-দৃষ্ট সেই বালিকাকে আজ চকিতের ন্যায় দেখিয়া হারাধন স্তম্ভিত হইলেন। শরীর তাঁহার রোমাঞ্চিত ও অবশ হইয়া আসিল, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া চিত্তপুত্তলিকার ন্যায় তিনি সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। গাড়ী চলিয়া গেল।

বালিকা কে, কাহার কন্যা, বাড়ী কোথায়? তাহার তিনি কিছুই জানিতে পারিলেন না। জানিবার আর উপায়ও নাই। তিন বৎসর প্রতীক্ষা করিয়া একবার যদি সেই হৃদয়নিধি তিনি হাতে পাইলেন, আর সেই মুহূর্তেই বিধি তাহা কাড়িয়া লইলেন। এরূপ বাদ-সাধা বিধাতার কি উচিত? মনের খেদে হারাধনের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। তবে সেই নিমেষকালের মধ্যে হারাধন একটি বিষয় লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, বালিকার সিঁথিতে সিন্দুর ছিল না, সুতরাং তাহার বিবাহ হয় নাই। আর সেই ভিড়েও—সেই গোলযোগেও—'গেল

রে, বামুনের মেয়েটা গেল রে!' এইরূপ একটা শব্দ শুনিয়াছিলেন। এই দুই বিষয় স্মরণ করিয়া হারাধনের মনে কথঞ্চিৎ আশা জন্মিল। তিনি মনে করিলেন যে, বিধাতা যখন আমার স্বপ্নটি এতদূর সত্য করিলেন, তখন তাহার শেষ ভাগটাও তিনি করিবেন। এই বালিকার সহিত নিশ্চয় আমার আবার সাক্ষাৎ হইবে, নিশ্চয় ইহার সহিত আমার পরিণয় হইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ – খড়্গ-ধারী বীর

এতক্ষণ হারাধন এক প্রকার চেতনাশূন্য হইয়াছিলেন। যখন পুনরায় তাঁহার মনে আশার সঞ্চার হইল, তখন সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির ন্যায় তিনি চমকিয়া উঠিলেন। হাতের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। দক্ষিণ হস্তের চতুর্থ অঙ্গুলিতে এক অঙ্গুরী দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। বালিকা যখন রেলের দ্বার ধরিয়া গাড়ির বাহিরে ঝুলিতেছিল তখন তাহার বাম হস্তের চতুর্থ অঙ্গুলিতে তিনি এই অঙ্গুরী ক্ষণ কালের নিমিত্ত দেখিয়া ছিলেন। 'তাহার হাত হইতে আমার হাতে আংটী কি করিয়া আসিল। গোলমালে তাহার বাম হাতের চতুর্থ অঙ্গুলি হইতে আসিয়া ঠিক আমরা দক্ষিণ হস্তের চুতুর্থ অঙ্গুলিতে অসিয়া পড়া সম্ভব নহে। তাহার পর বালিকার অঙ্গুলি অপেক্ষা আমার অঙ্গুলি অনেক স্থূল। তাহার অঙ্গুরী ঠিক আমার হাতে কি করিয়া হইল? প্রথম তো অভাবনীয়, এক বালিকাকে নিদ্রাবস্থায় দর্শন করা,—এ এক আশ্চর্য্য কথা। অবশেষে তাহার হাতের আংটী আমার হাতে উড়িয়া আসা,—ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? সত্য-সত্য কি এই ব্যাপারে কোন দেব, দানব, ভূত, প্রেত, অথবা জিন পরী দ্বারা সংঘটিত হইতেছে?

হারাধন এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার বুকের ভিতর 'গুর-গুর' করিতে লাগিল। তাঁহার মনে আতঙ্ক হইল। আংটীর প্রতি তিনি সাবধানে দৃষ্টিপাত করিলেন,—দেখিলেন, তাহা সোনার নহে, রূপার নহে, তামার নহে, নারদের নহে, অষ্ট ধাতুর নহে, কোন প্রকার নহে, কোন প্রকার জ্ঞাত পরিচিত দ্রব্য দ্বারা সে আংটী গঠিত নহে। সে অপূর্ব অলৌকিক আংটী। হারাধন আংটীর প্রতি আরও সাবধানে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন। আশ্চর্য্য! শুভ্রবর্ণের সামান্য সেই রেখা-প্রায় আংটীর ভিতর একজন ভীষণ কৃষ্ণকায় বীর অবিরত তলোয়ার ঘুরাইতেছে, এইরূপ তিনি দেখিতে পাইলেন। ভয় বিহ্বল হইয়া হাত হইতে আংটী খুলিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিলেন। অনেক টানাটানি করিয়া কিছুতেই খুলিতে পারিলেন না। হারাধনের মন নিতান্ত উতলা হইয়া উঠিল। যত মনে করেন, এখন আর আমি আংটীর দিকে চাহিয়া দেখিব না, ততই মন সেই দিকে ধাবিত হয়, ঘুরিয়া ফিরিয়া চক্ষু সেই আংটীর দিকে গিয়া পড়ে। আংটীর দিকে চক্ষু পড়িলেই তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। হারাধন পাগলের ন্যায় হইলেন। 'হাত হইতে আংটী না খুলিলে, হয় পাগল হইয়া যাইব, না হয় মরিয়া যাইব,' তাঁহার মনে এইরূপ ধারণা হইল।

গাড়ী করিয়া দ্রুতবেগে হারাধন গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। বাটী আসিয়া অঙ্গুলীতে তৈল মর্দন করিয়া অঙ্গুরীয় খুলিতে চেষ্টা করিলেন। অঙ্গুরী কিছুতেই বাহির হইল না।

তাহার পর সাবানের জল দিয়া চেষ্টা করিলেন। অঙ্গুরী একটুও সরিল না, বরং টানাটানিতে অঙ্গুলি খুলিয়া আংটী আরও গভীর ভাবে বসিয়া গেল। সুতরাং মানসিক ভয় ব্যতীত এখন শারীরিক যন্ত্রণাও উপস্থিত হইল। 'সহসা এ কি বিপদে পড়িলাম! এমন বিপদে কেহ তো কখন পড়ে না।' হারাধন এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন।

রাত্রি হইল। বালিকার মধুর মুখখানি সর্বদাই তিনি মানস-চক্ষে দর্শন করিতে লাগিলেন। অন্য চিন্তা তাঁহার মনে স্থান পাইল না, সর্বদাই কেবল সেই বালিকার চিন্তা। এ চিন্তায় আনন্দ ছিল বটে, কিন্তু অন্য দিকে আংটীর চিন্তায় তিনি আকুল হইয়া পড়িলেন। আংটির ভিতর যখনই চাহিয়া দেখেন তখনই সেই খড়্গধারী বীরকে তাহার ভিতর দর্শন করেন। 'হায়, আমার এ কি হইল! যাহাকে তিন বৎসর এক মনে ধ্যান করিতেছিলাম, আজ তাহার দর্শন পাইয়া কোথায় আনন্দসাগরে ভাসমান হইব, না আমি ভৌতিক অঙ্গুরীয়ের জ্বালায় অস্থির হইলাম।'

ভয়ে ও চিন্তায় সে রাত্রিতে হারাধনের কিছুমাত্র নিদ্রা হইল না। বিছানায় পড়িয়া তিনি ছট্-ফট্ করিতে লাগিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া তিনি প্রথমে স্বর্ণকারের বাটীতে গমন করিলেন। স্বর্ণকার চিম্‌টা হাতুড়ী ও নানাবিধ যন্ত্র দিয়া অঙ্গুরীয় খুলিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। অবশেষে উকা দিয়া কাটিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু উকা ঘর্ষণে আংটীর গায়ে বিন্দুমাত্র দাগও পড়িল না। এ আংটীর তুলনায় হীরক বরং কোমল, স্বর্ণকারের এইরূপ বোধ হইল। আংটী খুলিয়া কি কাটিয়া ফেলিতে কর্মকারগণও বিধিমত চেষ্ট করিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অবশেষে হারাধন রাসায়নিক পণ্ডিতদিগের নিকট গমন করিলেন। নানা প্রকার অম্ল প্রযোগ করিয়া তাঁহারও সে আংটী গলাইতে পারিলেন না। আংটী যে কি ধাতু দিয়া, গঠিত, তাহাও কোন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত বলিতে পারিলেন না। তাঁহারা বলিলেন যে,—'আমরা আলিউমিনম্, প্লাটিনম প্রভৃতি যত প্রকার নূতন ধাতু বাহির হইয়াছে, সে সব দেখিয়াছি, কিন্তু এরূপ অদ্ভুত ধাতু আর কখন দেখি নাই।'

ফল কথা, হারাধনের হাত হইতে কিছুতেই আংটী বাহির হইল না; আংটীর জ্বালায় হারাধন ঘোর বিপদে পড়িলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ – নূতন বীর

কিছু দিন পরে আংটীর ভিতর হইতে খাড়্গধারী পুরুষের অন্তর্ধান হইল। মাঝে নানা মূর্তি আংটীর ভিতর উদয় হইয়াছিল। এক একটি মূর্তির ভাব দেখিলে গায়ে কাঁটা দিয়া উঠে; সর্বশরীর শিহরিয়া যায়। অবশেষে ইহার ভিতর আর একটি আশ্চর্য্য মূর্তির আবির্ভাব হইল; এই মূর্তির কতকগুলা মুখ, কতকগুলা হাত, আর ছাগলের মত ঠ্যাং। ইহার নাম আংটী-বীর। বিকটাকার আংটী-বীর মনের আনন্দে আংটীর ভিতর নৃত্য করিতেছিল। তাহার নৃত দেখিয়া হারাধনের মূর্চ্ছা হইল। সেই সময় হইতে মৃগীরোগাক্রান্ত ব্যক্তির ন্যায় দিনের মধ্যে চার পাঁচ বার তিনি মূর্চ্ছিত হইতে লাগিলেন। ফল কথা, মনের

মত পত্নী লাভের আশা এখন দূরে গেল, হারাধন সঙ্কটাপন্ন পীড়াগ্রস্ত হইলেন।

হারাধনের পিতা-মাতা আত্মীয়-স্বজন উদ্বিগ্ন হইলেন। ডাক্তার বৈদ্য দ্বারা চিকিৎসা করাইলেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। রোজা আনিয়া ঝাড়ান-কাড়ান করাইলেন, ভূত নামাইলেন, দেবতাস্থানে হত্যা দিলেন, হাতে গলায় কোমরে কবচ ও মাদুলি পরাইলেন, গনৎকারের বাড়ী গিয়া জানিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না; হাত হইতে আংটী খুলিল না। বহুমুণ্ডধারী ছাগ-পদযুক্ত আংটী-বীরও আংটীর ভিতর হইতে অন্তর্হিত হইল না। হারাধনের মূর্চ্ছা দিন দিন ঘনীভূত হইতে লাগিল। হারাধন কৃশ ও দুর্বল হইয়া পড়িলেন। তাহার প্রাণসংশয় হইল। তাঁহার প্রাণের আশা সকলে ছাড়িয়া দিল।

নিরুপায় হইয়া, সকলে অবশেষে হারাধনের অঙ্গুলিটি কাটিয়া ফেলিবার পরামর্শ করিলেন। অঙ্গুলিটির মূলচ্ছেদ ব্যতীত আংটী কিছুতেই বাহির হইবে না। আংটী বাহির না হইলে হারাধন বাঁচিবেন না। সুতরাং ইংরেজ ডাক্তার আনিয়া আঙুল কাটানই স্থির হইল। অজ্ঞান করিয়া আঙুল কাটা হইবে, সেই ভয়ে হারাধন ঘোব ভীত হইলেন। সন্ধ্যার পর হারাধন শয়ন করিলেন। কিন্তু হায়! আঙুল আর কাটিতে হইল না। সেই রাত্রিতে হারাধনের যে মূর্চ্ছা হইল, সে মূর্চ্ছা আর কিছুতেই ভাঙ্গিল না। দেখিতে দেখিতে তাঁহার শ্বাসরোধ হইয়া গেল; হৃৎপিণ্ডের কার্য্য বন্ধ হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার আনা হইল। ডাক্তার আসিয়া বলিলেন যে, হারাধন ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

হারাধনের পিতা-মাতার আজ ঘোর সর্বনাশ হইল। সংসার তাঁহাদের আজ শ্মশানভূমি হইল। পিতা ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া আশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন; মাতা বক্ষে করাঘাত করিয়া মাটীতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ডাক্তার বলিলেন বটে যে হারাধনের মৃত্যু হইয়াছে,কিন্তু জীবিত শরীরের ন্যায় তাঁর দেহে এখনও উত্তাপ ছিল। ডাক্তার বলিলেন,—'কোন কোন মৃতদেহে এরূপ উত্তাপ থাকে।' এই কথা বলিয়া ভিজিট লইয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ – শ্মশান ভূমি

সেই রাত্রিতেই হারাধনের দেহ শ্মশানভূমিতে নীত হইল। চিতা সজ্জিত হইল, চিতায় অগ্নি প্রদত্ত হইল। কিন্তু আগুন কিছুতেই ধরিল না। তিনবার সকলে চেষ্টা করিলেন, তিনবার আগুন নিবিয়া গেল। হারাধনের দেহ শীতলও হইল না। তাঁহাকে লইয়া যাঁহারা শ্মশানে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কোন লোকের মনে ঘোর আতঙ্ক উপস্থিত হইল।

এক জন বলিলেন,—'দেখ ভাই! ছোকরা রোগে মরিল না, কোথা হইতে এক আংটী আসিয়া ইহার প্রাণবধ করিল। তাহার পর চিতায় আগুন ধরিল না; মৃতদেহ যেরূপ শীতল হয়, সেরূপ শীতল হইল না। আর একটি আশ্চর্য্য বিষয় দেখ, ছোকরার মুখশ্রী কিছুমাত্র পরিবর্তিত হয় নাই, ঠিক যেন নিদ্রা যাইতেছে। এ সব ভৌতিক ব্যাপার। চল ভাই! আপনার আপনার প্রাণ লইয়া পলায়ন করি।'

এই বলিয়া কেহ কেহ পলাইবার উপক্রম করিলেন। কিন্তু সেই দলে দুই তিন জন সাহসী পুরুষ ছিলেন। কাহাকেও তাঁহারা পলায়ন করিতে দিলেন না। ভালরূপ উদ্যোগ করিয়া তাঁহার চিতায় অগ্নিপ্রদান করিলেন। এইবার চিতা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। চিতার অধোদেশে হুহু শব্দে অগ্নি শিখা উত্থিত হইল। সকলেই বুঝিল যে, এইবার সেই সুকুমার যুবার কোমল দেহ অল্পক্ষণের মধ্যে ভস্মীভূত হইয়া যাইবে।

কিন্তু এ সময় আর একটি বিচিত্র ঘটনা ঘটিল। এই সময়, সেই রাত্রিকালে, সেই শ্মশানে , কোথা হইতে এক কামিনী আসিয়া সহসা উপস্থিত হইল। যৌবন প্রস্ফুটিত প্রায়; পঞ্চদশবর্ষীয়া পরমা রূপবতী কামিনী সহসা সেই শ্মশানভূমিতে আসিয়া আবির্ভূতা হইল। তাহার রূপের ছটায় সেই অন্ধকার নিশি যেন আলোকিত করিল। ব্যগ্রভাবে কামিনী পাগলিনীর ন্যায় হাত তুলিয়া কি যেন বলিল।

উপস্থিত ব্যক্তিগণ কেহ বা ঘোর ভয়ে ভীত হইলেন কেহ বা স্তম্ভিত হইলেন, কেহ বা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। হাত যোড় করিয়া এক জন বলিলেন,—''মা! তুমি কে তা বল? কি জন্য এ ঘোব নিশিতে এ শ্মশানভূমিতে তোমার আগমন হইয়াছে?'

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ – বিমলা

যে কন্যাকে হারাধন স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, যাঁহার সহিত তাঁহার হাওড়া ষ্টেশনে সাক্ষাৎ হইয়াছিল, যাঁহার হাত হইতে আংটী আসিয়া হারাধনেব অঙ্গুলিতে লাগিয়া গিয়াছিল,— সেই কন্যার নাম বিমলা। তাঁহার পিতার নাম রমানাথ চট্টোপাধ্যায়, নিবাস শ্রীরামপুরের নিকট একখানি গ্রামে। কন্যাব বিবাহ দিতে হইলে ইহাঁদের অনেক টাকা খরচ কবিতে হয়। কিন্তু রমানাথ দরিদ্র।। কন্যাদায়ে রমানাথ বিপন্ন হইলেন। কেবল বিমলা নয়, আর একটি ছোট কন্যা ছিল, তাহার নাম কমলা অনেক কষ্টে রমানাথ একস্থানে বিমলার বিবাহের সম্বন্ধ করিলেন, কিন্তু কি কারণে সে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে বিমলা দ্বদশ বৎসরে পদার্পণ করিল; যৌবন অঙ্কুরিত হইল। পিতার ঘোর দুর্ভাবনা উপস্থিত হইল। কিছু দিন পরে আর এক স্থানে সম্বন্ধ স্থির হইল; কিন্তু দৈবক্রমে তাহাও ভাঙ্গিয়া গেল। পুনরায় তৃতীয় স্থানে স্থির হইল; সব ঠিক ঠাক; বিবাহের দিন পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট হইল, কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বদিন একটি দুর্নাম রটিল। 'ঐ যে, অপূর্ব অলৌকিক রূপ, উহা ভাল লক্ষণ নহে, বিধবা হইবার লক্ষণ। গৃহস্থ ঘরে এত রূপ কেন?' ফল কথা, বিমলা বড় অপয়া মেয়ে—চারি দিকে এইরূপ জনরব উঠিল। সেই দিন হইতে পিতা আর কোন স্থানে তাহার বিবাহ স্থির করিতে পারিলেন না। সেই অপয়া কন্যার সহিত কেহই আপনার পুত্রের বিবাহ দিতে সম্মত হইল না।

এই সময়ে বিমলাদের বাড়ীতে কোথা হইতে একজন সন্ন্যাসী আসিয়া অতিথি হইয়াছিলেন। বিমলার পিতা দুঃখী হইলেও সাধুসঙ্গ ভাল বাসিতেন; যথাসাধ্য সাধু-সন্ন্যাসীর পরিচর্য্যা করিতেন। সপরিবার শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া, তিনি সেই সন্ন্যাসীর সেবা করিলেন। অপরাহ্নে, বিমলার মাতা কন্যার হাত ধরিয়া সন্ন্যাসীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন

ও বলিলেন,—'বাবা, আমার এ কন্যাটির কি কখন বিবাহ হইবে না?'

সন্ন্যাসী, বিমলার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া উত্তর করিলেন,—'তোমার এ কন্যাটির ভাল ঘরেই বিবাহ হইবে, তবে ফুল ফুটিতে এখনও বিলম্ব আছে। যে ঘরে বিবাহ হইবে, সে ঘরে তোমাদের কন্যা সহজে পড়ে না। সর্বস্ব বেচিয়া দিলেও সে সুপাত্র কিছুতেই তোমরা লাভ করিতে পারিবে না। কিন্তু আমি এই অঙ্গুরীটি তোমার কন্যাকে দিলাম। বাম হস্তে সে ইহা ধারণ করিবে। ইহার ভিতর আংটীবীর আছেন। সেই আংটী-বীরের প্রসাদে ও তাঁহার তাড়নায় তোমার কন্যা সেই সুপাত্র লাভ করিবেন!' আংটী প্রদান করিয়া সন্ন্যাসী প্রস্থান করিলেন।

যে দিন বিমলা আংটী ধাবণ করিল, সেই দিন হারাধনের মুখশ্রী চিন্তাপথে উদিত হইয়া, তাহার মানসপটে অঙ্কিত হইল। সেই রাত্রিতে সে হারাধনকে পুনরায় স্বপ্নজগতে দর্শন করিল। বিমলা স্বপ্নে দেখিল যে, তাহার বিবাহের নিমিত্ত পিতা স্বয়ম্বরসভা আহ্বান করিয়াছেন। রাজগণ ঘটের মত সাবি সারি বসিয়া আছেন। মাল্য-চন্দন লইয়া যখন সে বাহিব হইল, তখন আমাকে দাও, আমাকে দাও, বলিয়া একটা চীৎকার পড়িয়া গেল। এক পার্শ্বে মলিন বদনে মানসকল্পিত সেই ব্রাহ্মণযুবক বসিয়াছিলেন। বিমলা তাঁহার গলায় মাল্য প্রদান করিল। ঘোর কোলাহল উপস্থিল হইল। সেই কোলাহলে বিমলার নিদ্রাভঙ্গ হইল। বলা বাহুল্য যে, ঠিক সেই রাত্রিতে হারাধনের ও মানস ক্ষেত্রে বিমলাকে প্রথম দর্শন করিয়াছিলেন ও ঠিক সেই রাত্রিতে তিনিও ঐরূপ স্বয়ম্বরের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। আংটী-বীর এইরূপে ঘটকালী করিলেন।

বিমলা সেই বরের প্রতীক্ষায় দিন যাপন করিতে লাগিল। বাটীতে কোন অপরিচিত লোক আসিলেই সে এক মনে তাঁহার কথাবার্তা শ্রবণ করিত। মনে করিত, যাঁহাকে আমি স্বপ্নে দর্শন করিয়াছি, এইবার বুঝি তিনি আসিয়াছেন। কিন্তু মুখ ফুটিয়া কাহাকেও কোন কথা বলিত না। দেখিতে দেখিতে, এক বৎসর দুই বৎসর, তিন বৎসর কাটিয়া গেল। কন্যা বয়স্কা হইল বটে, কিন্তু সে নিমিত্ত পিতা মাতা উদ্বিগ্ন হইলেন না। কুলীনের ঘরে এরূপ হয়, এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিলেন। সন্ন্যাসীর আশীর্বাদে তাঁহাদের প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। কন্যার বর যে আপনি আসিয়া জুটিবে, সে বিষয়ে তাঁহাদের কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। কনিষ্ঠা কন্যা কমলার বিবাহের নিমিত্ত তাঁহারা চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মনে করিলেন যে, বিমলার বর আসিলেই এক সঙ্গে দুই কন্যার বিবাহ দিব।

গত বৎসর প্লেগের হিড়িক হইবার পূর্বে, বিমলার পিতা সপরিবারে কোন ক্রিয়া উপলক্ষ্যে কলিকাতায় এক আত্মীয়ের বাড়ী আসিয়াছিলেন। বাড়ী ফিরিবার সময় ষ্টেশনে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা পূর্বে কথিত হইয়াছে। হারাধন বিমলাকে গাড়ীর ভিতর ঠেলিয়া দিলেন। গাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া বিমলা একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। 'কে আমার প্রাণরক্ষা করিল,' তাহা দেখিবার নিমিত্ত সেই মুহূর্তে একবার সে ষ্টেশনের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। নিমেষ কালের নিমিত্ত দুই জনের চারি চক্ষু এক হইল। বিমলা আর

হারাধনকে দেখিতে পাইল না। ফিরিয়া গিয়া সেই রাত্রিতে বিমলা প্রথম মুখ ফুটিয়া ছোট ভগিনীকে বলিল,—'কমলা! সন্ন্যাসী যে দিন আংটী দিয়াছিলেন, সেই রাত্রিতে আমি এক ব্যক্তিকে স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। মাঝে মাঝে আর কতবার তাঁহাকে স্বপ্নে দেখিয়াছি। সন্ন্যাসী যাঁহার কথা বলিয়াছিলেন, সে তিনি। আজ তাঁহাকে আমি হাওড়া ষ্টেশনে দেখিয়াছিলাম। গাড়ীর ভিতর ঠেলিয়া দিয়া তিনিই আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন। আর দেখিতেছি, আমার হাতে সে আংটী নাই। আংটী আমার আঙ্গুলে এত কসা কসা হইয়া গিয়াছিল যে, আপনা-আপনি খুলিয়া পড়া সম্ভব নহে। সন্ন্যাসীর বরে শীঘ্রই বোধ হয় কোন একটা ঘটনা ঘটিবে।

কমলা সেই কথা মাতাকে বলিল। সন্ন্যাসীর বাক্য মিথ্যা হইবার নহে, এই মনে করিয়া পিতা-মাতা সাতিশয় আনন্দিত হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ – আরসী

এ দিকে হারাধন আংটীর জ্বালায় অস্থির হইলেন, ওদিকে বিমলা ঘন ঘন তাঁহাকে স্বপ্নে দেখিতে লাগিল। বিমলার চিত্ত সাতিশয় চঞ্চল হইল। শীঘ্রই কিছু একটা ঘটিবে, এই চিন্তা রাত্রি দিন তাহার মনে জাগিতে লাগিল। এইরূপে কিছুদিন গত হইল। একদিন সন্ধ্যার পূর্বে আরসীখানি সম্মুখে রাখিয়া বিমলা চুল বাঁধিতেছিলেন। সহসা আরসীর ভিতর সে নিজের মুখ না দেখিয়া হারাধনের মুখ দেখিতে পাইল। চমকিত হইয়া পশ্চাৎ দিকে ও আশে-পাশে চাহিয়া দেখিল। কেহ কোথাও নাই! বিস্মিতা হইয়া পুনবায় আরসীর দিকে সে চাহিয়া দেখিল; তাহার ভিতর পুনরায় হারাধনের মুখ দেখিতে পাইল। পূর্বে যেরূপ স্বপ্নে দেখিয়াছিল, ষ্টেশনে শরীরী অবস্থায় তাঁহাকে যেরূপ দেখিয়াছিল, এখন সেরূপ নয়। তাঁহার শরীর কৃশ হইয়া গিয়াছে, মুখ মলিন হইয়াগিয়াছে, ভয়ে ও চিন্তায় তাঁহার মুখখানি যেন আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বিমলা আবার চারি দিকে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু সে ঘরে অন্য কাহাকেও দেখিতে পাইল না। পুনরায় সে আরসীর দিকে চাহিয়া দেখিল। এবার দেখিল যে ঘোর সর্বনাশ ঘটিয়াছে। হারাধনের দেহ বিছানায় পড়িয়া রহিয়াছে, পিতা-মাতা মাটীতে পড়িয়া কাঁদিতেছেন, পাড়া-প্রতিবাসী আসিয়া তাঁহাদিগকে বুঝাইতেছেন। ভয়ে বিহ্বল হইয়া বিমলা আরসী হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল। কিন্তু অধিকক্ষণ থাকিতে পারিল না, পুনরায় তাহার দৃষ্টি আরসীর উপর আপনা-আপনি পড়িল। এবার আরও ভীষণ দৃশ্য তাহার নয়নগোচর হইল। এবার সে দেখিল যে, ঘোর অন্ধকার রজনী, নিকটে গঙ্গা কুল্ কুল্ শব্দে প্রবাহিতা হইতেছেন, চারি দিকে ছিন্ন বস্ত্র , শূন্য কলস, কৃষ্ণবর্ণের কয়লা, শুভ্র-বর্ণের নরমুণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে। ভীষণ শ্মশান-ভূমি! হারাধনের দেহ শুভ্র-বর্ণের বস্ত্র দ্বারা আবৃত হইয়া পড়িয়া আছে। চিতা সজ্জিত হইতেছে। ভয়ে বিমলা চক্ষু মুদিত করিল; মন তাহার কাতর হইল, বুক ঢিপ-ঢিপ করিতে লাগিল। চক্ষু দিয়া ফোঁটায়; ফোঁটায় জল পড়িতে লাগিল। 'হে সন্ন্যাসী! হে বাবা! অবশেষে তুমি এ কি করিলে?' এই বলিয়া চক্ষু বুজিয়া বিমলা কাঁদিতে লাগিল। আরসীর দিকে চাহিয়া দেখিল। অশ্রুজলে নয়ন দুইটি ভাসিয়া যাইতেছিল। প্রথম সে কিছুই দেখিতে পাইল না। দৃষ্টিপাত করিল। এবার তাহার

ভিতর বহু মুণ্ডধারী বহুহস্ত সম্পন্ন ছাগপদবিশিষ্ট, দানবাকৃতি এক মূর্তি সে দর্শন করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ – পুনর্জ্জীবন

বাহিরে যে বস্তু থাকে, আরসীতে তাহার প্রতিবিম্ব পড়ে। সম্মুখে বসিয়া বিমলা চুল বাধিতেছিল, আরসীতে তাহারই ছায়া পড়িবার কথা। তা না হইয়া আরসীর ভিতর নূতন নূতন দৃশ্য আপনা-আপনি আর্বিভূত হইতে লাগিল। প্রথম হারাধন, তাহার পর শ্মশান, তাহার পর আংটি-বীর; বিমলা যতবার আরসীর দিকে দৃষ্টিপাত করিল, ততবার নূতন নূতন বিষয় সে দেখিতে পাইল।

বিমলা আরসীর ভিতর আংটি-বীরকে দেখিল। আংটি-বীর হাত তুলিয়া তাহাকে যেন বলিল,—'যাও, যাও! শীঘ্র যাও!'

এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া বিমলার আর কিছুমাত্র জ্ঞান-চৈতন্য রহিল না। এখন হইতে সে আর আত্মবশে রহিল না। এখন হইতে সে কি করিল, সে কথা কিছুই সে জানে না। পরে অনেকে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছিল। সে বলে যে,—'আরসীর ভিতর আমি আংটি-বীরকে দেখিলাম। দেখিয়া, আমি বড় ভয় পাইলাম। কিন্তু আংটি-বীর অতি ব্যস্তভাবে হাত তুলিয়া—'যাও যাও, শীঘ্র যাও!' আমাকে এইরূপ আদেশ করিলেন। তাঁহার কথার শব্দ আমি শুনি নাই, তবে তাঁহার মুখের ভাবে আমি বুঝিলাম যে, তিনি আমাকে এইরূপ আদেশ করিতেছেন। তাহার পব কি হইল আমি কোথায় যাইলাম, কি করিলাম, সে বিষয় আমি কিছুমাত্র জানি না, আমার কিছুমাত্র মনে নাই।'

আংটি বীরের আদেশ পাইয়া বিমলা এলোথেলো বেশে পাগলিনীব প্রায় হইয়া দাঁড়াইল। চুল বাঁধিবার সাজ-সজ্জা ও আরসী সেই স্থানে পড়িয়া রহিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। রূদ্ধশ্বাসে দ্রুতবেগে সে বাড়ী হইতে বাহির হইল। ঘটনাচক্রে কাহাবও সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল না, কেহ তাহাকে নিবারণ করিল না। নিশি-ভূতে মানুষকে রাত্রিকালে ঘর হইতে বাহির করিয়া অজ্ঞান অবস্থায় যেরূপ নানাস্থানে লইয়া যায়, বিমলাকে লইয়া অংটি বীরও সেইরূপ করিল। অজ্ঞান অপরিচিত পথে বিমলা দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল। অজ্ঞান অবস্থায় পাঁচ ছয় ক্রোশ পথ চলিয়া অবশেষে ঘোর রাত্রে সেই অপরিচিত শ্মশান-ভূমিতে আসিয়া সে উপস্থিত হইল। চিতার অধোদেশ হইতে যখন অগ্নিশিখা উঠিতেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে বিমলা আসিয়া শ্মশানে উপস্থিত হইল। নিতান্ত উতলা হইয়া, হাত তুলিয়া বিমলা বলিল,—'রও! অগ্নি শীঘ্র নির্বাণ কর!'

সেই ঘোর নিশীথে, সেই শ্মশানভূমিতে, সহসা চিতার পার্শ্বে এক রূপবতী যুবতীকে দেখিয়া, সকলেই ভয়ে ভীত হইলেন। কিন্তু পলাইতে কাহারও সাহস হইল না। এক জন হাত যোড় করিয়া সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'মা, তুমি কে, তা বল!'

নিতান্ত উতলা হইয়া বিমলা বলিল,—'শীঘ্র অগ্নি নির্বাণ কর। চিতা হইতে শীঘ্র ইহাঁকে বাহির কর। ইনি মরেন নাই, ইনি জীবিত আছেন।' এই কথা বলিয়া বিমলা নিজে চিতা হইতে জ্বলন্ত কাঠ লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তখন আর সকলেও তাড়াতাড়ি

অগ্নি নির্বাণ করিয়া ফেলিলেন ও হারাধনের দেহ ভিতর হইতে বাহির করিয়া মাটীতে শায়িত করিলেন। ভাগ্যে অগ্নি তখনও চিতার উপরদিকে যায় নাই। নতুবা হারাধনের দেহ নিশ্চিত কিছু না কিছু পুড়িয়া যাইত। যাহা হউক, হারাধনের দেহে অগ্নি স্পর্শ পর্য্যন্ত করে নাই।

বিমলা ধীরে ধীরে হারাধনের নিকট গিয়া বসিল, ধীরে ধীরে তাঁহার অঙ্গুলি হইতে আংটী খুলিয়া লইল। যে অঙ্গুরীয় স্বর্ণকার, কর্মকার প্রভৃতি কত লোক টানাটানি করিয়াও খুলিতে পারে নাই, আজ বিমলা একটু ছুঁইবামাত্র সেই আংটী খুস করিয়া খুলিয়া আসিল। কিন্তু সেই সময় হইতে আংটী যে কোথায় গেল, তাহার কিছু ঠিক নাই। তখন হইতে সে আংটী আর কেহ দেখে নাই।

বিমলা যেই আংটী খুলিয়া লইল, আর সেই মুহূর্তে হারাধন একটি নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার শ্বাস-প্রশ্বাস প্রবাহিত হইতে লাগিল, তাঁহার হৃৎপিণ্ডের কার্য পুনরায় আরম্ভ হইল। একবার তিনি চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন, কিন্তু পুনরায় তৎক্ষণাৎ চক্ষু মুদিত করিলেন। তাঁহার জ্ঞান কিন্তু এখনও হইল না। 'হারাধন! হারাধন!' করিয়া সকলে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি উত্তর করিলেন না। যাহা হউক, সকলে এখন বুঝিতে পারিলেন যে, হারাধন পুনরায় জীবনলাভ করিয়াছেন।

কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, যে মুহূর্তে বিমলা হারাধনের অঙ্গুরি হইতে অঙ্গুরীয় খুলিয়া লইল, সেই মুহূর্তে আংটী তাহার হাত হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল, আর সেই মুহূর্তে বিমলাও মূৰ্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। মুখে হাতে জল দিয়া সকলে তাহার চেতনা করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বিমলার কিছুতেই জ্ঞান হইল না। হারাধন ও বিমলা দুই জনেই অচেতন হইয়া পাশাপাশি সেই শ্মশান-ভূমিতে পড়িয়া রহিলেন।

এরূপ অদ্ভুত ঘটনা কেহ কখনও গল্পেও শ্রবণ করে নাই, চক্ষে দেখা তো দূরের কথা! সকলেই ঘোরতর বিস্মিত হইলেন। কোথা হইতে সে রাত্রিতে সে পরমা সুন্দরী কামিনী আসিয়া এরূপ কাণ্ড করিল, কেহই তাহা জানিতে পারিলেন না। এক্ষণে কি কর্তব্য তাহাও কেহ বুঝিতে পারিলেন না।

অবশেষে দুই জনকে তাঁহারা খাটিয়া করিয়া হারাধনের বাটী লইয়া গেলেন। তখন প্রাতঃকাল হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, এই ঘটনা লইয়া ঘোর কোলাহল পড়িয়া গেল। পুত্রকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া, হারাধনের পিতা-মাতা যারপর নাই আনন্দিত হইলেন বটে, কিন্তু তখনও হারাধনের জ্ঞান হয় নাই, তখনও ভয়ের কারণ বিলক্ষণ ছিল। পূর্ণমাত্রায় তাঁহাদের আহ্লাদ হইল না।

তৎক্ষণাৎ বড় বড় ডাক্তার আনাইয়া হারাধনের পিতা দুই জনের বিধিমত চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। তিনি সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন, হারাধন ও বিমলার প্রাণরক্ষার নিমিত্ত অকাতরে অর্থব্যয় করিতে লাগিলেন। দুই জনেই নিদারুণ জ্বর-বিকার দ্বারা আক্রান্ত হইলেন। অজ্ঞান অবস্থায় দুই জনেই প্রলাপ বকিতে লাগিলেন। সেই প্রলাপের দুই একটা

কথা শুনিয়া, হারাধন ও বিমলার স্বপ্ন-দর্শন প্রভৃতি অদ্ভুত কাহিনীর কতকটা আভাস সকলে পাইলেন। তবে প্রকৃত ঘটনা যে কি ঘটিয়াছিল, তাহা কেহ বুঝিতে পারিলেন না! বিমলা যে কে, তাহাও কেহ জানিতে পারিলেন না। তখন সে সকল ভাবনা ভাবিবারও সময় ছিল না। দুই জনেরই পীড়া অতি ভয়ানক উঠিয়াছিল; অনেক সময় তাঁহাদের জীবনের আশা একেবারেই পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু বয়সের বলে হউক, অথবা চিকিৎসার গুণেই হউক, দুই জনেই সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন। তবে একবিংশতি দিন পর্যন্ত দুই জনেই অচৈতন্যভাবে শয্যাগত হইয়া রহিলেন। বাইশ দিনের দিন দুই জনেরই এক সঙ্গে জ্ঞান হইল।

নবম পরিচ্ছেদ – ফলশ্রুতি

বিমলার জ্ঞান হইলে, সকলে তাহার পরিচয় পাইলেন। হারাধনের পিতা তৎক্ষণাৎ তাহার পিতাকে পত্র লিখিলেন। বিমলার পিতা কন্যার অনুসন্ধান করিতে আর বাকী রাখেন নাই। আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া রাত্রি-দিন তাহাকে খুঁজিতে ছিলেন। মাতা ও ভগিনী কমলা, দিবারাত্র তাহার নিমিত্ত কাঁদিতেছিলেন। বিমলার সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ তিন জনেই হারাধনের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিমলার পিতার সহিত হারাধনের পিতার ও বিমলার মাতার সহিত হারাধনের মাতার সাতিশয় সদ্ভাব ও প্রণয় হইল।

বিমলা ও হারাধন ক্রমে সুস্থ ও সবল হইলেন। বিমলা ও হারাধনের গল্প আদ্যোপান্ত ক্রমে সকলেই শুনিলেন। অংটি-বীরের কথা লইয়া অনেক স্থানে অনেকরূপ বাদানুবাদ উপস্থিত হইল। কেহ বলিলেন, সে দেবতা, কেহ বলিলেন সে ভূত; কিন্তু হাঁদাই মোল্লা বলিলেন যে, সে দেবতাও নয়, সে ভূতও নয়, সে এক জাতীয় ইফ্রিট। মাথনতোষ, অর্থাৎ ম্যাকিন্টস নামে একজন ইংরেজের কানে এ কথা উঠিলে, তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, আংটি-বীর এক প্রকার জীব, পিরিনি-পর্বতে একবার এইরূপ জীবের কঙ্কাল বাহির হইয়াছিল।

যাহা হউক, বিমলার রূপ, গুণ ও নম্র প্রকৃতি দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইলেন। হারাধনের তো কথাই নাই! যে রত্ন লাভ করিবার নিমিত্ত তিনি এত যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছেন, যাহার জন্য তাঁহার প্রাণ পর্যন্ত যাইতে বসিয়াছিল, আজ তাহাকে পাইয়া তিনি যে অপার সুখসাগরে নিমগ্ন হইবেন, সে আর বিচিত্র কি? বিমলার মনের ভাবও সেইরূপ। স্বপ্নে সে স্বইচ্ছায় হারাধনকে বরণ করিয়াছিল। এক্ষণে প্রকৃত অবস্থায় তাঁহাকে দর্শন করিয়া সে আপনার জীবন সার্থক জ্ঞান করিল। এই সময় হারাধনের এক ধনবান্ বন্ধু কমলার রূপে মুগ্ধ হইলেন। দুই ভগিনীর এক দিনে বিবাহ হইবে, তাহার আয়োজন হইতে লাগিল। মনের সুখে, স্নেহের ভরে. যখন দুই ভগিনী গলা-জড়াজড়ি করিয়া কথাবার্তা কহিত, তখন এই পাপময় সংসারে এক অপূর্ব শোভার আবির্ভাব হইত।

শুভ দিনে, শুভক্ষণে, শুভকার্য সুসম্পন্ন হইল। বিমলার পিতার অধিক খরচ হইল না, অথচ এক দিনে তিনি দুইটি কন্যার দায় হইতে মুক্ত হইলেন। মনের মত দুইটি জামাতা

পাইয়া বিমলা ও কমলার মাতা পরম সুখে তাঁহাদিগকে বরণ করিলেন। বিমলাও কমলার শরীরে যেখানে যাহা ধরিল, বহুমূল্য অলঙ্কারে সমুদয় শরীর বিভূষিত হইল। তাহাদের ঐশ্বর্য্যের সীমা রহিল না। পরম সুখে তাহারা দিনযাপন করিতে লাগিল।

মুণ্ড মুহাশয়! আমি শুনিয়াছি যে, এই গল্পটির বিশেষ মাহাত্ম্য আছে। কারণ, ইহা সন্ন্যাসি-প্রদত্ত ভৌতিক গল্প। ইহা পাঠ করিলে কি শ্রবণ করিলে, কন্যাদায় হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন; অবিবাহিত যুবকগণ রূপবতী ও গুণবতী পত্নী লাভ করেন; অবিবাহিত কন্যাগন মনের মত পতি পাইয়া, নানা ভূষণে ভূষিত হইয়া কাজ করা সাটিনের জ্যাকেট পরিয়া, গরবে গরবিণী হইয়া, ঠুঁটোর মত বসিয়া নাটক-নবেল পড়িয়া কালযাপন করিতে থাকেন।

মুণ্ড মহাশয়! ইহা হইতে আর একটি উপদেশ লাভ করিতে পারা যায়। লোকের মৃত্যু হইলে তৎক্ষণাৎ দাহ করা উচিত নহে। শ্বাসরোধ ও হৃৎপিণ্ডের কার্য বন্ধ হইলেই যে, লোকের মৃত্যু হইয়াছে, এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় না। হারাধনের মত কখন কখন লোক মৃতবৎ হইয়া পড়িয়া থাকে। পরে তাহাদিগের পুনরায় চেতনা হয়। দেহের কঠিনতা ও পচনচিহ্নের আরম্ভ, এই দুইটি মৃত্যুর নিশ্চিত লক্ষণ। আমাদের দেশে দেহ ভস্মীভূত হইয়া যায়। হারাধনের মত ঘটনা ঘটিলে তাহা আর ধরিবার উপায় থাকে না। ভ্রমক্রমে কখন কখন মৃতবৎ জীবন্ত মানুষকে যে ভূমিস্মাৎ করা হয়, বিলাতের লোক তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাইয়াছেন। সে স্থানে তবু এক দিন দুই দিন পরে কবর দিবার রীতি প্রচলিত আছে। আমাদের এ উষ্ণপ্রধান দেশ। এ স্থানে তত বিলম্ব করিতে পারা যায় না। কিন্তু দ্বাদশ দণ্ড অপেক্ষা করিয়া সৎকার করিলে বোধ হয় কোন ক্ষতি হয় না।

কেন এত নিদয় হইলে

প্রথম অধ্যায় – নটবর দাস

নটবর দাস জাতিতে কায়স্থ, নিবাস কলিকাতা, সৌখিন যুবক, বয়স বাইশ বৎসর। প্রায় এক বৎসর হইল নটবরের পত্নীবিয়োগ হইয়াছে। পুনরায় বিবাহ করিবেন, দুই তিন স্থানে কন্যা দেখিতে গিয়াছিলেন, এখনও মনের মত স্ত্রীরত্ন লাভ হয় নাই।

নটবর ভাবিলেন যে, পুনরায় সংসার-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইবার পূর্বে একটু আমোদ করিয়া বেড়াই। ফিট্‌ফাট্ পোষাক পরিয়া তাই তিনি খড়দহে ফুলদোল দেখিতে গেলেন। রাত্রি দুইটার সময় নিদ্রার ঘোরে তাঁহার চক্ষু দুইটি আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। সেই সঙ্গে ফুলদোলে তাঁহার অরুচি জন্মিল। কলিকাতা প্রত্যাগমনের জন্য তিনি স্টেশনে আসিলেন। গাড়ীতে তিল রাখিবার স্থান নাই, নটবর উঠিতে পারিলেন না।

নটবর মনে করিলেন,—'পাঁচ ক্রোশ পথ বই তো নয়! এমন পূর্ণিমার রাত্রি, এমন দক্ষিণ বায়ু! হাঁটিয়া যাই।'

এইরূপ স্থির করিয়া তিনি বড় রাস্তা ধরিলেন। কিন্তু পথ-চলা তাঁহার অভ্যাস ছিল না। শীঘ্রই ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। রাত্রি প্রায় চারিটার সময় বামদিকে একটি প্রশস্ত পথ দেখিয়া তিনি মনে করিলেন যে, এই রাস্তা দমদমা স্টেশনে গিয়াছে। বাকি পথটুকু রেলগাড়ীতে যাইবেন, এইরূপ মানস করিয়া সেই বামদিকের পথ ধরিলেন।

কিন্তু অনেকক্ষণ চলিয়াও নটবর দমদমার স্টেশন পাইলেন না। পথ ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিল। কেবল বন ও বাগান। জনমানবের সহিত সাক্ষাৎ নাই। নটবর বড় বিপদে পড়িলেন। আর পা উঠে না। নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া এক গাছতলায় তিনি বসিয়া পড়িলেন।

গাছতলায় বসিয়া আছেন, এমন সময় দূর হইতে আগত সুমধুর নারীকণ্ঠস্বর তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। কে যেন অতি মধুরস্বরে গান গাহিতেছে। গীতের কথাগুলি এইরূপ--

কেন এত নিদয় হইলে?
অবসান নিশি, অস্ত গেল শশী,
দাসীরে ভুলিয়া নাথ কোথায় রহিলে।

এই পর্যন্ত নটবর শুনিতে পাইলেন। পরক্ষণেই ভয়ানক এক হৃদয়ভেদী চীৎকার হইল। অমানুষিক চীৎকার। সেই নির্জন স্থানে নটবর একাকী। প্রাণে তাঁহার ঘোর আতঙ্ক উপস্থিত হইল। দ্রুতবেগে সে স্থান হইতে তিনি পলায়ন করিলেন। পুনরায় অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া ষ্টেশন পাইলেন। প্রাতঃকালে কলিকাতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

কলিকাতা আসিলেন বটে; কিন্তু নটবরের মনে মনে সেই গীত, সেই অমানুষিক শব্দ, সর্বদাই জাগিতে লাগিল। 'কেন এত নিদয় হইলে,' এই কথাগুলি যেন তাঁহার জপমন্ত্র হইল। কত চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মন হইতে কথাগুলি কিছুতেই তিনি দূর করিতে পারিলেন না। নটবরকে যেন পাগল করিয়া তুলিল।

নটবর ভাবিলেন যে,—'কাহার সে গীত, কাহার চীৎকাব, তদন্ত করিয়া মীমাংসা করিতে হইবে। তা না করিলে আমি পাগল হইয়া যাইব।'

এইরূপ মনে করিয়া, নটবর তাহার পরদিন শিয়ালদহে গাড়ীতে উঠিয়া দমদমা গমন করিলেন। দমদমা ষ্টেশনে নামিয়া সেই স্থানটার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; কিছুতেই খুঁজিয়া পাইলেন না, কিন্তু হতাশ হইলেন না। মাঝে মাঝে সর্বদাই তিনি এইস্থানে আসিতে লাগিলেন। সেই নারীকণ্ঠস্বর পুনরায় শুনিবার প্রতীক্ষায় দিবাকাল ও রাত্রিকালে সর্বদাই তিনি এই অঞ্চলে পথে পথে ঘুরিতে লাগিলেন।

পুনরায় পূর্ণিমা আসিল। সে দিন অনেক রাত্রি পর্যন্ত নটবর এই স্থানে ঘুরিতে লাগিলেন। রাত্রি দুই প্রহর হইল। নটবর ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। নিকটে দুইটি বাগান-বাড়ী দেখিতে পাইলেন। একটিতে বড় একখানি দোতলা বাড়ী, অপরটিতে ছোট একখানি একতলা অট্টালিকা আছে। দুই বাগানের মাঝখানে একটি মতিঝিল আছে, ঝিলের উপর এক স্থানে একটি পুল বা সাঁকো আছে। এ বাড়ী হইতে ও বাড়ী যাইবার ঐ পুলের উপর

দিয়া গিয়াছে। দুইটি বাড়ীই খালি পড়িয়া আছে বলিয়া বোধ হইল। একটু বিশ্রাম করিবার নিমিত্ত নটবর ছোট বাগানটিতে প্রবেশ করিলেন। চাদরখানি মাথায় দিয়া তাহার বারেণ্ডায় শুইয়া পড়িলেন।

বারেণ্ডা হইতে কিছু দূরে বাগানের সীমায় ইষ্টক-নির্ম্মিত এক নিম্ন প্রাচীর ছিল। নটবর দেখিলেন যে, বাহির হইতে প্রাচীরের উপর মুখ বাড়াইয়া কে এক জন উঁকি ঝুঁকি মারিতেছে। বাগানের বাহিরে সেই সময় গাড়ীর গড় গড় শব্দ হইল। গাড়ীখানি বাগান হইতে কিছু দূরে থামিল। অল্পক্ষণ পরেই নটবর দেখিলেন যে বাগানের ফটক পার হইয়া ত্রয়োদশ কি চতুর্দশ বৎসরের এই বালিকা দ্রুতবেগে চলিয়া আসিতেছে।

ঘোরতর বিস্ময়াপন্ন হইয়া নটবর বারেণ্ডায় চুপ করিয়া পড়িয়া রহিলেন। বালিকা হন্ হন্ শব্দে আসিয়া একটি অশোক বৃক্ষের নিকট দাঁড়াইল। তাহার পর বাতাসাপূর্ণ একখানি সরা সেই বৃক্ষতলে রাখিয়া হাত যোড় করিয়া মনে মনে কি বলিতে লাগিল। যে লোকটা বাহির হইতে উঁকি মারিতেছিল, সেই সময় সে এক লম্ফে প্রাচীর পার হইয়া বালিকার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। উজ্জ্বল শাণিত একখানি ছোরা বাহির করিয়া বালিকাকে সে বলিল,—'যদি চীৎকার কর কি একটি কথা কও, তাহা হইলে এখনি তোমাকে কাটিয়া ফেলিব। শীঘ্র হাতের বালা দুইগাছি খুলিয়া দাও।'

বালিকা ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। শাণিত ছোরা দেখাইয়া লোকটা আরও ভয় দেখাইতে লাগিল। নটবর আর থাকিতে পারিলেন না। দৌড়িয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন ও আপনার ছড়ির দ্বারা লোকটার হাতে নিদারুণ প্রহার করিলেন। তাহার হাত হইতে ছোরা দূরে গিয়া পড়িল। সহসা সেই স্থানে অন্য একজন পুরুষ দেখিয়া লোকটি নিমিষের নিমিত্ত চমকিত ও স্তম্ভিত হইয়া রহিল। তাহার পর ছোরাখানি কুড়াইয়া এক লম্ফে প্রাচীর পার হইয়া পলায়ন করিল। —ভয়ে বালিকা কাঁপিতেছিল। হাত ধরিয়া নটবর তাহাকে বারেণ্ডার ধারে আনিয়া বসাইলেন। আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক নটবর তাহাকে বলিলেন,—'তোমার আর কোন ভয় নাই। আমি চোর নই, আমি ভদ্রলোক। কি জন্য তুমি এই গভীর নির্জ্জন স্থানে একাকী আসিয়াছিলে?

বালিকা ভয়ে কাঁপিতে লাগিল, কোন কথা কহিল না। কতক সাধ্য সাধনা করিয়া, কতক ভয় প্রদর্শন করিয়া, আস্তে আস্তে পশ্চাৎ লিখিত বিবরণটি নটবর সেই বালিকার মুখ হইতে বাহির করিলেন।—

'বালিকার বাড়ী কলিকাতা, পিতার নাম পীতাম্বর বসু। পিতা ব্রহ্মদেশে কর্ম্ম করেন। কর্ম্ম ছাড়িয়া পিতা দেশে আসিতে পারেন নাই, সে জন্যও বটে, টাকার অভাবের জন্যও বটে বালিকার আজ পর্য্যন্ত তিনি বিবাহ দিতে পারেন নাই। সম্প্রতি তিনি দেশে আসিয়াছেন। বালিকার মাতা জীবিত নাই। এক ভগিনী ছিলেন। বালিকা ভগিনীপতির বাটীতে সেই ভগিনীর নিকট থাকিতেন। আজ দেড় বৎসর সেই ভগিনী মারা পড়িয়াছেন। বালিকা বলিল যে, সে ভগিনীপতি অতি মন্দ লোক। কিন্তু পিতা তাহার সহিত বিবাহ স্থির

করিয়াছেন। বালিকা এখন পিসীর নিকট থাকে। যাহাতে এই ভগিনীপতির সহিত বিবাহ না হয়, পিসী চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু পিতা সে কথা শুনিতেছেন না। মাঝের-গাঁ নামক কোন স্থান হইতে সম্প্রতি তাঁহাদের বাটীতে একটি স্ত্রীলোক আসিয়াছিল। তাহার মাথায় একটি ভূত অধিষ্ঠান হয়। পিসীর চেষ্টায় সেই স্ত্রীলোক তাহার ভূতকে আহ্বান করে। ভূত আসিয়া বলিল যে, রাত্রি দুই প্রহরের সময় একাকী আসিয়া বালিকা যদি এই স্থানে সিন্নি প্রদান করে, তাহা হইলে ভগিনীপতির হাত হইতে অব্যাহতি পাইবে, ভাল বর আপনি আসিয়া যাইবে। সেই জন্য সে আজ সিন্নি দিতে আসিয়াছিল। চাকর ও পিসী সঙ্গে আছেন। কিছু দূরে গাড়ী থামাইয়া তাঁহারা সেই গাড়ীতে বসিয়া আছেন।

বালিকার রূপ দেখিয়া ও সুমিষ্ট কথা শুনিয়া নটবরের মন মজিয়া গেল। নটবর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যদি ইহাকে পাই, তাহা হইলে এ প্রাণ রাখিব, না পাইলে এ প্রাণ বিসর্জন দিব। আরও সবিশেষ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এমন সময় ফটকের ধারে একটি স্ত্রীলোক আসিয়া বলিল,—'স্বর্ণ, স্বর্ণ! এখনও হয় নাই?'

'পিসীমা ডাকিতেছেন,' এই কথা বলিয়া বালিকা দ্রুতবেগে পলায়ন করিল। কি করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া, নটবর কিছুক্ষণের নিমিত্ত স্তব্ধভাবে দাড়াইবে রহিলেন। অবশেষে বলিয়া উঠিলেন,—'ঐ যা! বালিকার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গিয়াছি!'

নটবর দৌড়িয়া বাগান হইতে বাহির হইলেন। গাড়ী তখন ছাড়িয়া দিয়াছে। দ্রুতবেগে গাড়ীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলেন। কিন্তু অবিলম্বেই শ্রান্ত হইয়া বসিয়া পড়িলেন। গাড়ী চলিয়া গেল। বালিকার পিতার নাম নটবরের মনে ছিল—পীতাম্বর বসু। কিছুদিন ধরিয়া কলিকাতায় অনেক সন্ধান করিলেন; কিন্তু তাঁহার অনুসন্ধান বিফল হইল। পীতাম্বর বসুকে তিনি খুঁজিয়া পাইলেন না।

দ্বিতীয় অধ্যায় – নর-মুণ্ড

বিশেষরূপে তদন্ত করিবার নিমিত্ত এক দিন নটবর সেই বাগানে আগমন করিলেন। এক জন উড়িয়া মালীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। মালী বাগান খুঁড়িতেছিল। নটবর তাহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সহসা কোদালি হাতে করিয়া মালী চুপ করিয়া দাঁড়াইল। একান্ত মনে কান পাতিয়া কি যেন সে শুনিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে আপনার মনে সে বিড় বিড করিয়া বলিল ঃ—

'কেন এত নিদয় হইলে?
অবসান নিশি, অস্ত গেল শশী,
দাসীরে ভুলিয়া নাথ কোথায় রহিলে।'

ঘোরতর বিস্মিত হইয়া নটবর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তুমি ও কি বলিতেছ?'

চমকিত ও রাগত হইয়া মালী উত্তর করিল,—'আমি যা বলি না কেন, তোমার সে কথায় কাজ কি?'

মালীর নিকট হইতে নটবর সে বালিকারও কোন সন্ধান পাইলেন না। নটবর

ভাবিলেন, —'এই মালীর মুখে সেই গীত আজ আমি পুনরায় শুনিলাম। ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব আমাকে বাহির করিতে হইবে। কিছু দিনের নিমিত্ত এই বাটী ভাড়া লইয়া আমি এ স্থানে বাস করিব। দেখি কি হয়!'

এইরূপ স্থির করিয়া নটবর মালীকে উদ্যান-স্বামীর নাম ও ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিলেন। অবগত হইলেন যে, এই দুই খানি বাগান গোকুল বাবুর। গোকুলবাবুর বাটীতে গিয়া নটবর ছোট বাড়ীখানি ভাড়া লইতে চাহিলেন। গোকুল বাবু বলিলেন যে, ও বাড়ীর অখ্যাতি আছে, সকলে বলে যে, ও বাড়ীতে ভূত আছে। আমার পুত্রবধূ সম্প্রতি ঐ বাটীতে মারা পড়িয়াছেন।

নটবর সে কথায় ভয় পাইলেন না। পুনরায় অতিশয় আগ্রহ সহকারে বাড়ীটি প্রার্থনা করিলেন। অবশেষে বিনা ভাড়ায় সে বাটীতে বাস করিতে গোকুল বাবু তাঁহাকে অনুমতি প্রদান করিলেন। —সন্ধ্যার সময় নটবর বিছানা-পত্র লইয়া ও এক জন চাকর সঙ্গে করিয়া সেই বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাড়ীখানিতে চারটি ঘর ছিল। একটি ঘরে তালা বন্ধ ছিল। তাহাতে গৃহ-স্বামীর টেবিল, চৌকি, খাট প্রভৃতি দ্রব্যাদি ছিল।

আর একটি প্রশস্ত ঘরের মেজেতে নটবর আপনার বিছানা করিলেন। চাকরকে এক পার্শ্বে তাহার বিছানা করিতে বলিলেন। নিদ্রা হইল না। রাত্রি দুই প্রহর হইল। অতিশয় গ্রীষ্ম বোধ করিয়া নটবর বাহিরে বারাণ্ডায় আসিয়া শয়ন করিলেন। পদতলে বসিয়া চাকর তাঁহার পা টিপিতে লাগিল।

সহসা চাকর বলিয়া উঠিল,—'ও কাহারা? মহাশয়! দেখুন, দেখুন, ও কি?'

তাড়াতাড়ি নটবর উঠিয়া বসিলেন। অশোক বৃক্ষের উত্তর দিকে আস্তাবল অথবা মালীর ঘরের মত একটু স্থান ছিল। নটবর দেখিলেন যে, তাহার নিকট কৃষ্ণবর্ণ কাপড়ে আবৃত দুইটি মানুষ একসঙ্গে বেড়াইতেছে, আর আস্তাবলের ভিতর হইতে একটি স্ত্রীলোক উঁকি মারিতেছে। বৃক্ষের ছায়ায় সে স্থানটি অন্ধকারে আবৃত ছিল, নটবর ভাল করিয়া দেখিতে পাইলেন না কৃষ্ণকায় সেই দুইটি মনুষ্যের চক্ষু হইতে গন্ধকের অগ্নির ন্যায় নীলবর্ণের অল্প অল্প অগ্নি-শিখা বাহির হইতেছিল। সেই আলোকে নটবর মানুষ তিনটিকে দেখিতে পাইলেন। আস্তাবল হইতে যে স্ত্রীলোকটি উঁকি মারিতেছিল, সে ঠিক যেন সেই বালিকার মত, যে বালিকার সহিত সে দিন তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। অন্ততঃ নটবরের মনে প্রথম তাহাই বোধ হইয়াছিল। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার সে বিশ্বাস দূর হইল। কৃষ্ণকায় দুই ব্যক্তির মুখ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে, জীবিত মানুষের মত তাহাদের মুখ নয়। মুখে মাংস কি চর্ম কিছুমাত্র নাই, কেবল অস্থি, শ্মশানঘাটে যেরূপ নরমুণ্ড পড়িয়া থাকে, অনেকটা সেইরূপ, কিন্তু অতি ভয়ানক। তাহার পর তাহাদিগের চক্ষুকোটর হইতে যে নীলবর্ণের অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছিল, তাহাও অতি ভয়ানক।

চাকর ভয়ে থর থর কাঁপিতে লাগিল। ভয়ে বাকশক্তিহীন হইয়াছিল, চীৎকার করিতে পারিল না। নটবর নিজেও ঘোরতর ভীত হইলেন বটে, কিন্তু অনেকটা ধৈর্য্য ধরিয়া

রহিলেন। হাত ধরিয়া চাকরকে ঘরের ভিতর আনিয়া তাহাকে বুঝাইতে লাগিলেন। নটবর বলিলেন,—'নিকটে লোকের বাড়ী নাই যে, সে স্থানে পলাইব। মালী রাত্রিকালে এ বাটীতে শয়ন করে যে, তাহার কাছে যাইব। বাতি জ্বালিয়া দুই জনে আয়, সমস্ত রাত্রি জাগিয়া বসিয়া থাকি; তাহার পর সকাল বেলা পলাইব। ভূতে মানুষ খায় না, ভয় কি? রাম রাম বল।'

চাকর কাঁদিতে লাগিল! মাঝে মাঝে পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু নটবর তাহার হাত ধরিয়া রহিলেন।

রাত্রি যতই অধিক হইতে লাগিল, উপদ্রব ততই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। প্রথম দ্বার-জানালা সব আপনা-আপনি খুলিয়া যাইতে লাগিল। তাহার পর যে ঘরে দুই জনে বসিয়া আছেন, সেই ঘরের মেজেতে নর মুণ্ড সব গড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহা দেখিয়াও নটবর ধৈর্য্য ধরিয়া রহিলেন। তাহার পর যে ঘরে তালা বন্ধ ছিল, সেই ঘর হইতে পূর্ব্বের সেই নারীকণ্ঠ বিনির্গত গীত অতি ধীরে ধীরে বাহির হইতে লাগিল,—

'কেন এত নিদয় হইলে?
অবসান নিশি, অস্ত গেল শশী,
দাসীরে ভুলিয়া নাথ কোথায় রহিলে।'

মধুর বটে, কিন্তু অতি অমানুষিক স্বর। গীতের শেষ কথাটি নটবর যেই শুনিতে পাইলেন, আর তাঁহার ঘরের বাতিটি নিবিয়া গেল! সেই মুহূর্তে অতি হৃদয়বিদারক অতি কাতরতাসূচক চীৎকার হইল। নটবর আর ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিলেন না। চাকরের হাত ধরিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইলেন, তাহার পর প্রাণপণে দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন। কলিকাতায় নিজ বাটীতে আসিয়া তবে তাঁহাদের প্রাণ সুস্থ হইল।

সে রাত্রি নটবরের নিদ্রা হইল না সমস্ত রাত্রি এই অদ্ভুত ঘটনার কথা ভাবিতে লাগিলেন। আস্তাবলের ভিতর ঠিক যেন সে দিনের বালিকাকে আমি আজ রাত্রিতে দেখিয়াছি। তবে সে দিনের সে বালিকা কি ভূত? সে চোরও কি ভূত? সে পিসীও কি ভূত? সে গাড়ীও কি ভূত? তবে কি একটা ভূতিনীর উপর আমি আমার প্রাণ সঁপিয়াছি? না, তা কখন হইতে পারে না। সে মানুষী, তাহাকে নিশ্চয় আমি একদিন পাইব।

পরদিন প্রভাতে সূর্য্যালোকে নটবরের পুনরায় সাহস বৃদ্ধি হইল। নটবর ভাবিলেন যে, এ বিষয়ের বিশেষরূপে তদন্ত না করিয়া আমি ক্ষান্ত হইতে পারি না। পুনরায় তিনি সেই বাগানে আসিয়া উপাস্থিত হইলেন। গত রাত্রিতে যে সমুদয় ঘটনা ঘটিয়াছিল মালীর নিকট তাহা বর্ণনা করিলেন।

মালী ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—"আমি যখন শুনিলাম যে, আপনি এই বাটী ভাড়া লইয়াছিলেন, তখন আপনাকে পাগল মনে করিয়াছিলাম। পূর্ব্বে এই স্থানে আমি শয়ন করিতাম। যাহা দেখিয়াছি, যাহা শুনিয়াছি, সে সব কথা আপনাকে আর কি বলিব।

সেইকারণে আমি একরূপ পাগল হইয়া গিয়াছি। 'কেন এত নিদয় হইলে," সর্ব্বদাই আমার মনে এই কথাগুলি জাগিতেছে। আর কেহ শুনিতে পায় না, অনেক সময়ে দিনের বেলাও কাজ করিতে করিতে আমি তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাই, কখন কখন সম্মুখে তাঁহাকে দেখিতে পাই, দুই একটি কথাও তিনি আমাকে বলেন। এখন সেই বেটার গলায় আমি ছুরি দিতে পারি, তবে আমার মনের খেদ যায়।"

নটবর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কাহার কণ্ঠস্বর? কে ঐ গীতের আধখানি গান করিয়া নিস্তব্ধ হয়? বেটাই বা কে?"

মালী বলিল,—"আপনি জানেন না? এ বাড়ীতে যে সমুদয় ঘটনা ঘটিয়াছিল, সে কথা আপনি শুনেন নাই?"

নটবর উত্তর করিলেন,—"সকল কথা দূরে থাকুক, কিছুই আমি শুনি নাই।"

মালী বলিল, —"তবে শুনুন। আমি এ স্থানে আজ প্রায় দশ বৎসর কর্ম্ম করিতেছি। যখন প্রথম আমি কাজে নিযুক্ত হই, তখন এই বাড়ীতে এক জন বাবু সপরিবারে বাস করিতেন। তাঁহার নিকট এক জন হিন্দুস্থানী চাকর ছিল ও তাহার স্ত্রী চাকরাণী ছিল। বাবুর পাঁচ বৎসর বয়স্ক ছেলের গায়ে অনেকগুলি গহনা ছিল। চাকর ও চাকরাণীতে পরামর্শ করিয়া ছেলেটিকে মারিয়া সেই গহনা চুরি করিতে চেষ্টা করে; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই, দৈবে ছেলেটির প্রাণ বাঁচিয়া গিয়াছিল। তাহার পর পুলিশের তদারক হয়। ভয়ে চাকর ও চাকরাণী, স্ত্রী-পুরুষে, এক সঙ্গে আস্তাবলে গলায় দড়ি দিয়া মরে। সেই পর্য্যন্ত তাহারা ভূত হইয়া আছে। গত রাত্রে আপনি যে কৃষ্ণকায় দুইটি মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন, সে সেই দুই জনের ভূত। আমিও ঐ দুই ভূতকে কতবার দেখিয়াছি। এই দুই ভূতের উপদ্রবে সেই বাবুকেও বাড়ী ছাড়িয়া পলাইতে হইল। তাহার পর এ বাড়ীতে আর কেহ বাস করিতে পারে না। অবশেষে আমার মনিব, গোকুল বাবু, বাড়ীটি ভাঙ্গিয়া ফেলিবার উদ্যোগ করেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র নবীন বাবু ভাঙ্গিতে দিলেন না। তিনি যেমন সাহসী ও ডান্‌পিটে, তেমনি মন্দ লোক। কিরূপ মন্দলোক, সে কথা আর আপনাকে কি বলিব। তিনি বলিলেন,—'দেখি কেমন ভূত! আমি নিজে এই বাড়ীতে বাস করিব।' বাপ অনেক নিষেধ করিলেন, কিন্তু তিনি শুনিলেন না। সপরিবারে তিনি এই বাড়ীতে আসিলেন। তাঁহার স্ত্রী, একটি ছোট শালী, এক জন চাকর ও একজন ঝি। স্ত্রী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, যেমন রূপ, তেমনি গুণ। আমি তাঁহাকে মা-লক্ষ্মী বলিয়া ডাকিতাম। আমাকে কত তিনি স্নেহ করিতেন, সে কথা মহাশয়কে আর কি বলিব। স্বামী মন্দ, তথাপি তাঁহার প্রতি মা-লক্ষ্মীর প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। উপদেবতার নানারূপ উপদ্রব দেখিয়া দুই দিন পরেই চাকর-চাকরাণী পলাইয়া গেল। এই বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় কলিকাতা যাইতে মা-লক্ষ্মী নবীন বাবুর নিকট কত মিনতি করিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই শুনিলেন না। বাবুর আর ভয় কি? কলিকাতায় কোনও স্থানে তিনি রাত্রিযাপন করিতেন, কোন দিন এই বাড়ীতে আসিতেন, কোন দিন আসিতেন না। যে দিন আসিতেন, সে দিন রাত্রি প্রায় অবসান করিয়া আসিতেন। বাড়ী

আসিয়া মদের নেশায় অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকিতেন। সে অবস্থায় ভূতে আর তাঁহার কি করিতে পারে? চাকর-চাকরাণী পলাইয়া গেল। মা-লক্ষ্মী ও তাঁহার ভগিনী ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। এ বাড়ীতে কি করিয়া রাত্রিকালে একেলা থাকিবেন? আমি বলিলাম,—'মা! তোমাদের কোন ভয় নাই। আমি তোমাদিগকে কিছুতেই ছাড়িব না। রাত্রিতে তোমাদিগকে চৌকি দিয়া থাকিব। প্রতিদিন আমি বারেণ্ডায় শুইতে লাগিলাম। ভূতের উপদ্রবের বিরাম নাই। কিন্তু মা-লক্ষ্মী, তাঁহার ভগিনী ও আমি তিন জনে এক সঙ্গে বসিয়া কোনরূপে রাত্রি কাটাইতাম। যে দিন বাবু আসিতেন, সে দিন অনেকটা ভরসা হইত। দুই চারি দিন পরে পূর্ণিমার রাত্রি আসিল। আমি বারেণ্ডায় শুইয়া আছি। স্বামীর প্রতীক্ষায় মা-লক্ষ্মী বসিয়া রহিলেন। সেই ঘরের এক পার্শ্বে তাঁহার ভগিনী শয়ন করিল। ঘরে ছোট একটি ইংরেজী বাজনা ছিল, আস্তে আস্তে সেই বাজনা টিপিয়া মা-লক্ষ্মী গুন্ গুন্ শব্দে এই গীতটি গাহিতে লাগিলেন—

'কেন এত নিদয় হইলে?
অবসান নিশি, অস্ত গেল শশী,
দাসীরে ভুলিয়া নাথ কোথায় রহিলে!'

এইটুকু গাহিয়াই মা-লক্ষ্মী ভয়ানক চীৎকার করিয়া উঠিলেন। যেরূপ চীৎকার কাল রাত্রিতে আপনি শুনিয়াছিলেন। সেই মুহূর্ত্তে ঘরের ভিতর হইতে একটি পুরুষ মানুষ তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল। সে লোক কখন ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা আমি দেখি নাই। কিন্তু যখন সে বাহির হইয়া যায়, জ্যোৎস্নার আলোকে তাহাকে আমি তখন চিনিতে পারিলাম। চীৎকার শুনিয়া তাড়াতাড়ি আমি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলাম। গিয়া দেখিলাম যে, মা বিছানায় পড়িয়া আছেন, তাঁহার গলার আধখানি কে কাটিয়া দিয়াছে, ঘর রক্তভাঙ্গা হইয়াছে। মা তখনও জীবিত আছেন। ভগিনীকে ও আমাকে লক্ষ্য করিয়া মা বলিলেন,—"আমার কপালে যাহা ছিল, তাহা ঘটিল। তোমরা দুই জনে আমার নিকট সত্য কর যে, আমাকে যে মারিয়াছে, সে কথা তোমরা প্রকাশ করিবে না।" এত কাকুতি-মিনতি করিয়া মা আমাদিগকে বলিলেন যে আমরা থাকিতে পারিলাম না। তাঁহার পায়ে হাত দিয়া দুই জনেই আমরা সত্য করিলাম। এখনও মা মাঝে মাঝে আমার সম্মুখে আসিয়া সেই সত্য পালন করিতে আদেশ করেন। তাই! তাহা না হইলে, কোন্ কালে বেটাকে মারিয়া আমি ফাঁসি যাইতাম।"

নটবর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তাহার পর?"

মালী বলিল,—"তাহার পর আর বড় কিছু নয়। গোকুল বাবুর অনেক টাকা খরচ হইয়া গেল। মা-লক্ষ্মী আপনার গলায় আপনি ছুরি দিয়াছেন, এইরূপ প্রমাণ হইল। কিন্তু তিনি আত্মহত্যা করেন নাই। আপনার যদি সাহস হয়, তাহা হইলে পূর্ণিমার রাত্রিতে পুনরায় আসিবেন। সে দিন আরও কিছু দেখিতে পাইবেন। কোন ভয় নাই, মা-লক্ষ্মীকে আবার ভয় কি! ঐ পাষণ্ড ভূতকেই যা ভয়।'

তৃতীয় অধ্যায় – মতি ঝিল

পূর্ণিমার রাত্রিতে পুনরায় আসিতে নটবর প্রতিশ্রুত হইলেন। পূর্ণিমা আসিল। সন্ধ্যেবেলা নটবর সেই বাগানে আসিয়া দেখিলেন যে, মালী তখন সে স্থানে আসে নাই। অন্য একটি বাগানে আর কয়েক জন উৎকলবাসীর সহিত তাহার বাসা। তাহার অনুসন্ধানে নটবর-সেই স্থানে গমন করিলেন। মালীকে দেখিয়া নটবর বলিলেন,—"ভূতের বাড়ীর নিকট যে বড় বাড়ীটি আছে, তাহাতে দেখিলাম আলো জ্বলিতেছে। সে বাড়ীতে কেহ আসিয়াছে?"

মালী বলিল,—"হাঁ! গোকুল বাবুর বেহাই, সেই মা-লক্ষ্মীর পিতা, দুই চারি দিনের নিমিত্ত সপরিবারে ঐ বাটীতে আসিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী নাই, কেবল এক কন্যা; আমার মা-লক্ষ্মীর সেই ভগিনী। আর কে কে আসিয়াছে, তাহা জানি না। গোকুল বাবুর পুত্র, সেই হতভাগা নবীনকেও আজ ঐ বাড়ীতে দেখিয়াছি।"

রাত্রি যখন দুই প্রহর হইল, তখন নটবর ও মালী আস্তে আস্তে সেই ভূতের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘরের একটি জানালা খোলা ছিল। কিন্তু ঘরটি তখন অন্ধকারে পূর্ণ ছিল। দুই জনে কিছুই দেখিতে পাইলেন না। প্রায় আধ ঘন্টা পরে সহসা সেই ঘরের ভিতর নীলবর্ণের আলোক জ্বলিয়া উঠিল। মালী ইঙ্গিত করিয়া দেখাইল। নটবর দেখিলেন যে, ঘরের ভিতর টেবিলের পার্শ্বে পরমা সুন্দরী এক যুবতী একখানি চৌকিতে বসিয়া আছেন। তাঁহার পশ্চাতে সেই চাকর-চাকরাণীর কৃষ্ণকায় ভূত দুইটি দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের চক্ষু-কোটর হইতে নীলবর্ণের অগ্নিশিখা বাহির হইতেছে। টেবিলের উপর বাক্সর মত ছোট একটি ইংরেজী বাদ্যযন্ত্র রহিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে যুবতী সেই বাদ্যযন্ত্রটির স্থানে স্থানে টিপিতে লাগিলেন। তাহা হইতে সুমধুর শব্দ নির্গত হইল। সেই সুরে যুবতী সেই গীতটি আরম্ভ করিলেন।

"কেন এত নিদয় হইলে?
অবসান নিশি, অস্ত গেল শশী,
দাসীরে ভুলিয়া নাথ কোথায় রহিলে।"

এই কয়টি কথা ধীরে ধীরে সুমধুর স্বরে গাহিয়াই যুবতী ভয়ানক চীৎকার করিয়া উঠিলেন। ঘরের ভিতর সেই নীলবর্ণের আলোক নির্ব্বাণ হইয়া গেল। পদদ্বয় তাঁহার থর থর কাঁপিতে লাগিল। সেই সময় আর একটি যুবা পুরুষের উপর তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। বারেণ্ডার নিম্নে বৃক্ষে ঠেস দিয়া লোকটি দাঁড়াইয়া আছে। সেও ভয়ে কাঁপিতেছে। সেই মুহূর্ত্তে মালীর দৃষ্টিও তাহার উপর পড়িল।

"নরাধম পাপিষ্ঠ পশু! স্বামী হইয়া এরূপ পতিব্রতা স্ত্রীর গলায় তুই ছুরি মারিয়াছিস! মায়ের কাছে সত্য করিয়াছিলাম বলিয়া, তুই সে সময় ফাঁসী হইতে বাঁচিয়া গিয়াছিস। কিন্তু আজ তোরে যমে টানিয়া এ স্থানে আনিয়াছে। আজ তোরে মারিয়া আমি ফাঁসি যাইব।"

এইরূপ উন্মত্তপ্রায় হইয়া মালী সেই লোকটির প্রতি ধাবিত হইল। তখন লোকটি বড়

বাড়ীর দিকে দ্রুতবেগে পলাইতে লাগিল। মালীও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে লাগিল দুই বাড়ীর মধ্যস্থিত সেই মতিঝিলের উপরে যে পুল ছিল, লোকটি তাহার উপর উপস্থিত হইয়া সবলে পড়িয়া গেল। পুলের মধ্যস্থলে পড়িল না, পার্শ্বে কাষ্ঠনির্ম্মিত রেলের গায়ে পড়িল। তাহার ভারে রেল ভাঙ্গিয়া গেল। রেল ভাঙ্গিয়া লোকটি ঝিলের উপর পড়িল। ঝিলটি অপ্রশস্ত বটে, কিন্তু ইহাতে জল বিলক্ষণ গভীর ছিল। লোকটি ডুবিয়া গেল। মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার মাথাটি একবার ভাসিয়া উঠিল। মাথা তুলিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে লোকটি মালীকে বলিল,—"জগু! আমি সাঁতার জানি না। আমার প্রাণ রক্ষা কর্। তোরে অনেক টাকা দিব।"

এই বলিতে না বলিতে লোকটি পুনরায় ডুবিয়া গেল। তাহার প্রাণরক্ষা করিতে জগু জলে ঝাঁপ দিল না। দুই হাত আপনার বুকে রাখিয়া জলের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া পুলের উপর দাঁড়াইয়া রহিল। নটবরও দৌড়িয়া সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছেন। তিনিও সাঁতার জানেন না। তিনি জলে ঝাঁপ দিতে পারিলেন না। জগুকে তিনি অনেক সাধ্যসাধনা করিলেন, জগু কিছুতেই জলে পড়িল না।

হাবুডুবু খাইয়া লোকটির মাথা আর একবার উপরে উঠিল। আর একবার অতি কাতরস্বরে জগুর নিকট প্রাণভিক্ষা চাহিল। জগু পুর্ব্ববৎ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। লোকটি পুনরায় ডুবিয়া গেল। এমন সময় জগুর সম্মুখে জ্যোৎস্না কিঞ্চিৎ গাঢ় হইয়া যেন জ্যোৎস্না-নির্মিত কিরূপ একটি মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। জগু একদৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া রহিল, আর একান্তমনে সে কি শুনিতে লাগিল। নটবর জ্যোৎস্নানির্মিত সেই মূর্ত্তিটি দেখিতে পাইলেন বটে, কিন্তু কোন কথা শুনিতে পাইলেন না। একান্তমনে মালী কি শুনিয়া উত্তর করিল,—"আচ্ছা, মা! তুমি যখন বলিতেছ, তখন তোমার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য। তোমার পতি হইবার উপযুক্ত ও পাপিষ্ঠ নহে! যাহা হউক তোমার আজ্ঞায় নরাধমের আমি প্রাণরক্ষা করিতেছি।"

এই বলিয়া মালী তৎক্ষণাৎ জলে ঝাঁপ দিল। সেই সময় তৃতীয় লোকটির মাথা জলের উপরে উঠিয়াছিল। জগু তাহার চুল ধরিয়া ফেলিল। কিন্তু লোকটি দুই হাত দিয়া মালীকে জড়াইয়া ধরিল। মালী বলিল,—"পাপিষ্ঠ! যদি আমাকে এরূপ জড়াইয়া ধরিবি, তবে কি করিয়া তোমার প্রাণরক্ষা করিব?"

নটবরের কানে মালীর কেবল এ কয়টি কথা প্রবেশ করিল। তাহার পর তিনি দেখিলেন যে, মালী ও সেই লোকটি জড়াজড়ি করিয়া দুই জনে ডুবিয়া গেল। চীৎকার করিতে করিতে নটবর পুল হইতে নামিয়া ঝিলের কিনারায় গিয়া দাঁড়াইলেন। সাঁতার জানেন না, সে নিমিত্ত নটবর জলে ঝাঁপ দিতে সাহস করিলেন না। মনে করিলেন যে, যদি কোন প্রকারে কিনারার গোড়ায় আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে তিনি তাহাদিগকে ধরিয়া তুলিবেন। কিন্তু নিকটে কেহই আসিল না। দুই জনেই জলমগ্ন হইয়া গেল। একবারও তাহারা আর উপরে উঠিলে না।

চতুর্থ অধ্যায় – মিলন

নটবর ক্রমাগত চীৎকার করিতে লাগিলেন। তাঁহার চীৎকার শুনিয়া বড় বাড়ীর মেয়ে-পুরুষ চাকর বাকর সকলেই দৌড়িয়া আসিল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহই জলে নামিতে সাহস করিল না। ক্রমে দূর হইতে অপর লোকও আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা জলে নামিয়া দুই জনকেই সেই রাত্রিতে তুলিল। কিন্তু দুইটিই মৃতদেহ; অনেকক্ষণ পূর্বে দুই জনেরই প্রাণবিয়োগ হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, যাহাকে মালী তাড়া করিয়াছিল ও যাহাকে বাঁচাইতে সে জলে ঝাঁপ দিয়াছিল সে লোকটি আর কেহ নয়, উদ্যানস্বামী গোকুল বাবুর পুত্র নবীন,—মা-লক্ষ্মীর স্বামী। কলিকাতায় থাকিতে কি হইয়াছিল. সেই জন্য সে গলায় ছুরি মারিয়া স্ত্রীকে বধ করিয়াছিল, আর সেই কু-অভিপ্রায়সাধনের নিমিত্তই সে স্ত্রীকে এই নির্জ্জন বাগান বাড়িতে আনিয়াছিল।

এই বিপত্তির সময় নটবর ভিড়ের মাঝে এক ব্যক্তিকে দেখিয়া যেন স্বর্গ হাতে পাইলেন। তাহার চীৎকার শুনিয়া বড় বাড়ী হইতে স্ত্রী-পুরুষ সকলেই দৌড়িয়া আসিয়াছিল। তাহাদিগেব মধ্যে তাঁহার হৃদয়ধন সেই বালিকাকে তিনি দেখিতে পাইলেন,—সেই স্বর্ণ, —চোরের হাত হইতে যাহাকে তিনি রক্ষা করিয়াছিলেন। স্বর্ণ আর কেহ নহেন, মা-লক্ষ্মীর ভগিনী। পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া, মদের নেশায় উন্মত্ত হইয়া, নীবন যখন তাহার ভগিনীর গলায় ছুরি মারে, স্বর্ণ তখন সেই ঘরে ছিল, স্বর্ণ তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছিল। ব্রহ্মদেশ হইতে পিতা আসিয়া নবীনের সহিত তাহার বিবাহ স্থির করিলেন। সে নরাধমকে কি করিয়া স্বর্ণ বিবাহ করে? মৃত্যুকালে ভগিনীর পায়ে হাত দিয়া স্বর্ণ দিব্য করিয়াছিল; সে নিমিত্ত পিতার নিকট সকল কথা সে খুলিয়া বলিতে পারে নাই। মাঝের-গাঁর সেই মেয়ে-মানুষ সকল সন্ধান লইয়া তাহাদের বাটীতে আসিয়াছিল। "তোমার ভগিনী উপদেবতা হইয়া বাগানবাড়ীতে আছেন। সিন্নি দিয়া হাতযোড় করিয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা কর, তাহা হইলে তুমি নবীনের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবে।" মাঝের-গাঁর মেয়েমানুষ এই কথা বলিয়াছিল। তাহার পর সে চোর পাঠাইয়া দিয়াছিল। প্রাণের দায়ে অসীম সাহসে ভর করিয়া স্বর্ণ সেই বাত্রি ভূতের বাটীতে পূজা দিতে আসিয়াছিল।

আর অধিক বলিবার কিছু নাই। কিছু দিন পরে পীতাম্বর বসু পরম আনন্দে নটবরের হস্তে স্বর্ণকে সমর্পণ করিলেন। পরম আনন্দে নটবরের মাতা নববধূকে বরণ করিয়া ঘরে তুলিলেন। স্বর্ণ হেন স্ত্রীরত্ন লাভ করিয়া নটবর সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। নটবর বলেন,—"ভূতের কৃপায় আমি মনের মত পত্নী লাভ করিয়াছি। ইংরেজী খাঁ বাবুদিগের সুমতি হউক; ভূতের প্রতি তাঁহাদিগের ভক্তি হউক, এই আমার প্রার্থনা।"

বেতাব ষড়বিংশতি

প্রথম অধ্যায় – স্কুলের মাষ্টার

নূতন-পাড়া নামক একখানি গ্রাম আছে। সেই গ্রামে একটি স্কুল আছে। গৌরীশঙ্কর নামক এক ব্রাহ্মণ যুবক সেই স্কুলে মাষ্টারি করেন। তাঁহার বেতন কুড়ি টাকা। কুড়ি টাকা বেতনে কেহ বড় মানুষ হইতে পারে না; কিন্তু বড় মানুষ হইতে গৌরীশঙ্করের বড় সাধ। কাহার বা সাধ নয়? কি করিয়া রাতারাতি অর্থবান্ হইতে পারা যায়, গৌরীশঙ্কর সুবুদ্ধি লোক, সহজেই সে উপায় তিনি বাহির করিলেন।

গৌরীশঙ্কর শুনিলেন যে, শ্মশানে গিয়া শব-সাধন করিতে পারিলে দেবীর বরে যাহা ইচ্ছা তাহাই লাভ করিতে পারা যায়। 'একটা মড়ার উপর বসিয়া, কিছুক্ষণ জপ করা বই তো নয়! কেনই বা তা না পারিব? গৌরীশঙ্কর সাহসী পুরুষ ছিলেন, এ কার্যে তিনি ব্রতী হইলেন। কি করিয়া এ কাজ করিতে হয়, সেই দিন হইতে তিনি সে তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। গুরুগিরিতে তাঁহার বড় বিশ্বাস ছিল না। তিনি দীক্ষিত হন নাই। কিন্তু মাথায় একটি টিকি রাখিয়াছিলেন।

যাহা হউক, গৌরীশঙ্কর শব-সাধনার নিমিত্ত তিনি একটি মন্ত্র পাইলেন। আর এক জনের নিকট ইহার প্রকরণও কিছু কিছু জানিয়া লইলেন। গুরু তাঁহার ছিল না, এ কার্যে উত্তর সাধক হয়, এমন এক জন লোকও তিনি পাইলেন না। উত্তর সাধকের জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টাও করে নাই। কারণ, রাতারাতি বড় মানুষ হইতে হইলে, সে কাজটা গোপনে হইলেই ভাল হয়; ভাগিদার করা উচিত নয়।

মন্ত্রের যোগাড় হইল, প্রকরণ ঠিক হইল। এখন চাই মড়া। মড়া না হইলে শব-সাধন হয় না। যেমন তেমন মড়ায় এ কাজ হয় না। গৌরীশঙ্কর অনেক দিন ধরিয়া, উপযুক্ত শবের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। দৈবক্রমে কিছুদিন পরে তাঁহাদের গ্রামে সর্পাঘাতে এক জন চণ্ডালের মৃত্যু হইল।

গৌরীশঙ্কর সেই চণ্ডালের আত্মীয়গণকে বলিলেন,—'সর্পদংশনে লোকের প্রকৃত মৃত্যু হয় না। একপ্রকার অজ্ঞান হইয়া থাকে। ভাল রোজার হাতে পড়িলে পুনরায় জীবিত হইতে পারে। গঙ্গার ধারে হইলে, মৃতদেহ গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করাই উচিত। এ স্থানে গঙ্গা নাই। শ্মশানে লইয়া বাঁশের একটি উচ্চ মাচা নির্মাণ করিয়া, তাহার উপর ইহাকে সাত দিন রাখিয়া দাও। ইহার যদি আয়ু থাকে, তাহা হইলে এই সাত দিনের মধ্যে কোন স্থান হইতে রোজা আসিয়া ইহার প্রাণদান করিবেন। কত স্থানে এরূপ কত ঘটনা হইয়া গিয়াছে।'

বিন্দু মাত্র আশা থাকিতে কে আর প্রিয়জনকে পরিত্যাগ করে? নূতনপাড়ার বাহিরে মাঠের মাঝখানে যে একটি পুরাতন পুষ্করিণীর ধারে এ স্থানের লোকে শব দাহ করে। বাঁশের মাচা না করিয়া, চণ্ডলেরা সেই পুষ্করিণীর ধারে একটা বটগাছের উপর আত্মীয়ের মৃতদেহ বাঁধিয়া রখিল।

গৌরীশঙ্কর বাবুর আনন্দের আর সীমা রহিল না। কারণ, একে চণ্ডালের মড়া, তাহার উপর আবার সর্পাঘাতে মৃত্যু,—শব সাধনের পক্ষে দুলর্ভ সামগ্রী। শাস্ত্রের বচনটা বোধ হয় তিনি শুনিয়াছিলেন, যতা;—

ষষ্টিবিদ্ধং শূলবিদ্ধং খড়্গবিদ্ধং পয়োমৃতং।
রজ্জুবদ্ধং সর্পদষ্টং চাণ্ডালং বাতিভতিকং।।
তরুণং সুন্দরং শুদ্রং রণে নষ্টং সমুজ্জ্বলং।
পলায়নবিশূন্যঞ্চ সংমুখে রণবর্ত্তিনং।।

গৌরীশঙ্কর বাবুর কপালে আর একটি সুবিধা হইল। চণ্ডালের মৃত্যুর তিন দিন পরেই শনিবার অমাবস্যা পড়িল। নানারূপ শুভ লক্ষণ দেখিয়া তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—'বিপুল ধনসম্পত্তির অধিস্বামী এইবার নিশ্চয় হইবে।' ধনবান হইয়া কোথায় কাহার কন্যাকে বিবাহ করিবেন, কোন স্থানে রাজভবনসদৃশ অট্টালিকা নির্মাণ করিবেন, কিরূপ জমিদারী ক্রয় করিবেন, কি উপায় অবলম্বনে মহারাজা উপাধি লাভ করিবেন, এখন এই সমুদয় কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ত্রিশ হইয়াছিল; কিন্তু নিম্নশ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ বলিয়া, টাকার অভাবে এখনও তাঁহার বিবাহ হয় নাই। সংসারে বৃদ্ধা মাতা ব্যতীত আর কেহ ছিল না। মুখে প্রকাশ না করুন, কিন্তু মনে মনে বিবাহের জন্য গৌরীশঙ্কর বিশেষ লালায়িত ছিলেন। পুত্রবধূ লইয়া ঘর করিতে তাঁহার মাতারও যে একান্ত বাসনা ছিল, সে কথা আর বলা বাহুল্য। এক্ষণে সেই সমুদয় বাসনা পূর্ণ হইবে। চণ্ডালের মড়া পাইয়া, সম্মুখে শনিবার অমাবস্যা পাইয়া, গৌরিশঙ্কর বাবু আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিলেন।

শুভদিন আসিয়া উপস্থিত হইল। মদ্য, মৎস্য, মাংস, গুড়, পিষ্টক, পরমান্ন, তিল, কুশ, সর্ষপ, দীপ, এলাচি, কর্পুর, খয়ের, পান, আদা, পাটের দড়ি, প্রভৃতি নানারূপ কুলাচার-দ্রব্য তিনি আহরণ করিলেন। রাত্রি এক প্রহরের সময় পূজায় উপকরণ লইয়া গৌরীশঙ্কর একাকী শ্মশান অভিমুখে যাত্রা করিলেন। গ্রাম হইতে প্রায় আধ ক্রোশ, মাঠের মাঝখানে, জনশূন্য সেই শ্মশানক্ষেত্র। সে কালে এই পুষ্করিণীর ধারে দুষ্ট দস্যুগণ পথিকগণকে মারিয়া ফেলিত। এখনও দিনের বেলা এ স্থানে যাইতে ভয় হয়। ঘোর তিমিরাবৃত অমাবস্যা নিশার তো কথাই নাই! কিন্তু, গৌরীশঙ্করের মনে বিন্দুমাত্র ভয়ের উদয় হইল না। নির্ভয় চিত্তে একাকী তিনি গমন করিতে লাগিলেন। যদি 'ধন লোভবশতঃ অজ্ঞানতা-সহকারে এ কার্য তিনি না করিতেন, তাহা হইলে বলিতাম,—'ধন্য গৌরীশঙ্কর! তোমার সাহসকে ধন্য! তুমি বীরপুরুষ বটে! বীর সাধনে মন্ত্রসিদ্ধ হইবার নিমিত্ত তুমি উপযুক্ত পাত্র বটে। কিন্তু তোমার অজ্ঞানতার জন্য দুঃখ হয়। তুমি মনুষ্যের নিকট উপদেশ না গ্রহণ কর, সমুদয় চরাচর জগতের শিক্ষাদাতা সদাশিবকে একান্ত মনে গুরুপদে বরণ কর নাই কেন?'

একাকী নির্ভয় হৃদয়ে গৌরীশঙ্কর যাইতে লাগিলেন। ঘোর অন্ধকার! ভয়াবহ নির্জন শ্মশানভূমি! রাত্রি এক প্রহরের সময় সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্মশানে উপস্থিত

হইয়া প্রথম তিনি অঘোর-মন্ত্র দ্বারা চারিদিক রক্ষা করিলেন। তাহার পর পুষ্করিণীর জলে স্নান করিয়া, তিনি অধৌত এক চিতায় উপর পূজার স্থান চিহ্নিত করিলেন। তাহার পার্শ্বে দীপ রাখিবার নিমিত্ত সামান্য এক গর্ত খুঁড়িলেন। অবশেষে তিনি ধীরে ধীরে সেই বটবৃক্ষে উঠিলেন। পকেট হইতে দীপ-শলাকা জ্বালাইয়া মাদূরাবৃত মৃতদেহ দেখিতে পাইলেন। শবের সমীপে উপস্থিত হইয়া তিনি একটি মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন।

মড়ার প্রতি লক্ষ্য করিয়া আর একটি মন্ত্র বলিয়া শবকে নমস্কার করিলেন। তাহার পর শবকে তিনবার পুষ্পাঞ্জলী দিয়া, তিনি কয়েকটি মন্ত্র পাঠ করিলেন। অবশেষে যে রজ্জু দ্বারা শব গাছে আবদ্ধ ছিল, আস্তে আস্তে তাহা কাটিয়া ফেলিলেন। এইরূপে যথাসাধ্য ধীরে ধীরে মড়াকে গাছ হইতে নামাইলেন।

তাহার পর মড়ার কোমর ধরিয়া পূজার স্থানে তাহাকে টানিয়া লইয়া গেলেন। পুষ্করিণী হইতে কলসী কলসী জল আনিয়া তাহাকে উত্তমরূপে স্নান করাইলেন ও চন্দনাদি সুগন্ধ তাহার শরীরে লেপন করিলেন। গৌরীশঙ্কর যখন এইরূপ করিতেছেন, তখন মড়া একবার হুহুঙ্কার শব্দ করিয়া দাঁত কিড়মিড় করিল। তাহার মুখদেশ তখন ভয়ানক মূর্তি ধারণ করিল। —কিন্তু গৌরীশঙ্কর তাহাতে কিছুমাত্র ভীত হইলেন না। মড়ার শরীরে তিনি বার বার থু থু দিতে লাগিলেন। মড়া পুনরায় স্থির হইল। তখন তাহাকে পুনরায় প্রক্ষালন করিয়া, পুনরায় তাহার শরীরে চন্দনাদি লেপন করিলেন।

তাহার পর সেই অধৌত চিতার উপর তিনি কুশ ছড়াইলেন। মড়ার কোমর ধরিয়া, সেই কুশের উপর লইয়া পূর্বশির করিয়া তাহাকে শয়ন করাইলেন। তাহার পর এলাচি কর্পূর প্রভৃতি মশলা সংযুক্ত পান তাহার মুখে দিয়া মড়াকে অধোমুখ অর্থাৎ উপুড় করিলেন। এইরূপ কোণা করিয়া তাহার পৃষ্ঠদেশে চন্দন দ্বারা, এক চারিকোণা ঘর অঙ্কিত করিলেন।সেই চারিকোণা ঘরের ভিতর একটি অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিলেন। মড়া যাহাতে উঠিতে না পারে, সেই জন্য তাহার পদদ্বয় পট্টসূত্র দ্বারা বন্ধন খুব জোরে করিলেন।

অবশেষে মড়ার পৃষ্ঠে একখানি কম্বল বিছাইয়া, অশ্বারোহণের ন্যায় তাহায় পৃষ্ঠে চড়িয়া বসিলেন। মড়ার দুই হাত দুই পার্শ্বে বিস্তৃত করিয়া কুশ রাখিয়া, গৌরীশঙ্কর নিজের দুই পা মড়ার দুই হাতের উপর রাখিলেন। মড়ার উপর দীর্ঘ কেশ ছিল, সেই চুলগুলি খুলিয়া গৌরীশঙ্কর ঝুটি বাঁধিয়া দিলেন। অস্ত্র মন্ত্র পাঠ করিয়া, চারিদিকে ছড়াইয়া দিলেন। তাহার পর আর কয়েকটি মন্ত্র পাঠ করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় – নানা বিভীষিকা

এইরূপ নানা প্রকার আয়োজন ও মন্ত্র পাঠ করিয়া গৌরীশঙ্কর পূজা আরম্ভ করিলেন। গুরু নাই যে গুরুর পূজা করিবেন, কাজেই প্রথম তিনি দশদিকপালের পূজা করিলেন। তাহার পর ইন্দ্রকে বলি প্রদান করিলেন। নানা মন্ত্রে ও নানা উপকরণে দেবতাদিগের পূজা করিয়া, গৌরশঙ্কর জপ আরম্ভ করিলেন। অমাবস্যা রাত্রি তো ছিলই, তাহার উপর ক্রমে

ক্রমে আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন হইল। এরূপ নিবিড় অন্ধকার দ্বারা পৃথিবী অচ্ছন্ন হইল যে, প্রলয়কালে সেরূপ হয় কি না সন্দেহ। তাহার পর তুমুল ঝঞ্ঝাবাতে দশ দিক পূর্ণ হইল।

প্রবল বায়ুবেগে গৌরীশঙ্করকে শবের পৃষ্ঠ হইতে উত্তোলন করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু তাঁহাকে উঠাইতে পারিল না। দৃঢ় বীরাসনে তিনি শবের পৃষ্ঠে বসিয়া রহিলেন। দন্ত কিড় মিড় করিয়া হুহুঙ্কার শব্দ করিয়া মড়া উঠিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহার পদদ্বয় পাটের দড়ি দ্বারা বাঁধা ছিল। নিজের দুই পা দিয়া গৌরীশঙ্কর তাহার হাত দুইটি মাটীতে চাপিয়া রাখিলেন। শব উঠিতে পারিল না। এই সময় আকাশে মাঝে মাঝে উল্কাপাত হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল, ঘোর বজ্র-শব্দে কর্ণে তালিকা লাগিতে লাগিল। এই সমস্ত উপদ্রবে গৌরীশঙ্কর কিছু মাত্র ভীত হইলেন না। শবের উপর বসিয়া একান্ত মনে তিনি জপ করিতে লাগিলেন। বায়ুবেগে মেঘ ক্রমে দূরীভূত হইল, আকাশ পরিষ্কার হইল; পৃথিবী ক্ষণকালের নিমিত্ত স্থির হইল। এমন সময় সহসা এক দিক হইতে বন্য শূকরের পাল আসিয়া দন্ত দ্বারা গৌরীশঙ্করকে বদ্ধ করিবার নিমিত্ত ধাবিত হইল। সহসা এই বিপদ দেখিয়া, ক্ষণকালের নিমিত্ত তিনি চমকিত হইলেন। কিন্তু পরক্ষণেই চক্ষু মুদিত করিয়া, তিনি জপে প্রবৃত্ত হইলেন। বন্য শূকর অদৃশ্য হইয়া পড়িল। পৃথিবী আর একবরে নিস্তব্ধ হইল। তাহার পর, সহসা অতি নিকটে ব্যাঘ্রের ভীষণ গর্জন শ্রবণ করিয়া গৌরীশঙ্কর একবার চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন যে, এক প্রাকণ্ড ব্যাঘ্র তাহার করাল বদন ব্যাদান করিয়া, তাঁহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। গ্রাস করে আরকি! সহসা ভীত হইয়া, গৌরীশঙ্কর পলায়নের উপক্রম করিলেন। কিন্তু সে চিন্তা নিমেষের নিমিত্ত তাঁহার মনে উদয় হইয়াছিল। মনকে দৃঢ় করিয়া চক্ষু মুদিত করিয়া, পুনরায় তিনি জপে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্যাঘ্র চলিয়া গেল। তাহারপর গৌরীশঙ্করের চারিদিকে অসংখ্যা কাল-সর্প আসিয়া ফোঁশ ফোঁশ করিতে লাগিল। কিন্তু এবারও তিনি চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন না, সে নিমিত্ত ভয়ও পাইলেন না। কিছুক্ষণ পরে সাপের গর্জন থামিয়া গেল। তাহার পর গৌরীশঙ্করের ঠিক কানের নিকট বিকট হাসির শব্দ হইল। সেরূপ বিকট হাসি কেহ কখনও শ্রবণ করে নাই। সেই শব্দ শুনিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তিনি মনকে স্থির করিলেন। তাহার পরক্ষণেই পালে পালে পিশাচ, ভূত, প্রেত, দানা, দৈত্য, ডাকিনী শাকিনী, হাকিনী, ভৈরব, বটকু প্রভৃতি তাঁহার চারিদিকে নৃত্য করিতে লাগিল। নৃত্য করিতে করিতে মাঝে মাঝে এরূপ বিকট শব্দ করিতে লাগিল যে, সে শব্দ শুনিলে কোন মনুষ্যই চেতন অবস্থায় থাকিতে পারে না। পুনরায় আর একবার পলায়ন করিবার নিমিত্ত গৌরীশঙ্করের মন হইল, কিন্তু পরক্ষণেই তিনি মনকে দৃঢ় করিতে সমর্থ হইলেন। চক্ষু মুদিত করিয়া তিনি একান্ত মনে জপ করিতে লাগিলেন। গৌরীশঙ্কর ভাবিলেন যে,—'ভূত প্রেত কখন দেখি নাই, একবার চাহিয়া দেখি, ভূত-প্রেত কিরূপ হয়।' এই বলিয়া তিনি নিমিষের নিমিত্ত একবার চাহিয়া দেখিলেন। কিন্তু সেই ভীষণ দৃশ্য দর্শনে পরক্ষণেই পুনরায় তাঁহাকে চক্ষু বুজিতে হইল। সে বিকট মূর্তি দেখিয়া, কেহ স্থির থাকিতে পারে না। সে অন্ধকারে তিনি

তাহাদিগকে দেখিতে পাইতেন না; কিন্তু মাঝে মাঝে তাহাদের মুখবিবর হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছিল। সেই আলোকে তাহাদের রূপ তাঁহার নয়নগোচর হইল। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, সর্বাঙ্গে সহস্র সহস্র কৃমি দুলিতেছে। পাতালের ন্যায় মুখবিবর। মুখের ভিতর হইতে অনবরত রক্ত নির্গত হইতেছে। গজদন্তের ন্যায় বড়, কিন্তু বক্রাকার, ভীষণ দন্ত। ললাট দেশে কেবল একটি গোলাকার চক্ষু। সেই চক্ষু হইতেও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও সর্প বাহির হইতেছিল। চকিতের নিমিত্ত তিনি চাহিয়া দেখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেই সময়ে কেবল একটি ভূতের উপর তাঁহার চক্ষু পড়িয়াছিল। সেই এক জনের যৎসামান্য রূপের পরিচয় তিনি পাইয়াছিলেন। অন্যান্য ভূতের কিরূপ আকার ছিল, তাহা দর্শন করেন নাই। ঐ ভূত ব্যতীত ক্ষণকালের নিমিত্ত আর একজন উপদেবতা তাঁহার নয়নগোচর হইয়াছিল; উপরি উক্ত ভূতকে দেখিয়া তিনি চক্ষু বুজিলেন। কিছুক্ষণ পরে উষ্ণ বায়ুস্রোত তাঁহার মুখের উপর পড়িতে লাগিল। তিনি আর একবার চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন যে, ঠিক তাঁহার সম্মুখে এক বৃদ্ধা ডাকিনী হাঁ করিয়া, দীর্ঘ ও ঘোর রক্তবর্ণ জিহ্বা বার বার লেহন করিতেছে। বৃদ্ধা ডাকিনীর একটিও দন্ত নাই। সর্বশরীর তাহার শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। অতি ভয়ানক আকৃতি। ডাকিনীর জিহ্বা তাঁহার নাসিকা স্পর্শ করে আর কি! ডাকিনীকে দেখিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ চক্ষু মুদিত করিলেন।

গৌরীশঙ্কর পুনরায় জপ করিতে লাগিলেন। চারিদিকে ভূত-প্রেতগণ নৃত্য করিতে লাগিল। এই সময় বার বার ভূমিকম্প আরম্ভ হইল। গৌরীশঙ্কর মনে করিলেন যে,—ভূমিকম্পে পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে। মড়ার সহিত যেন তিনি পাতালপুরীতে নামিয়া যাইতেছেন। কিন্তু পরক্ষণেই হুশ্ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। আর একবার মনে হইল যে, মড়ার সহিত তিনি যেন শূন্যে উঠিতেছেন; কিন্তু পরক্ষণেই হুশ্ করিয়া নামিয়া পড়িলেন। সেই সময় তাঁহার বুক টিপ্ টিপ্ করিতে লাগিল। হৃৎপিণ্ড ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। যাহা হউক, অনেক কষ্টে মনকে স্থির করিয়া পুনরায় তিনি জপে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে ভূত প্রেতের উপদ্রব নিবৃত্ত হইল। পৃথিবী আর একবার স্থির হইল। এই সময় অতি সুমধুর বামা স্বরে নিকটে কে আসিয়া গৌরীশঙ্করকে বলিল,—'নাথ! অনেক কষ্ট করিয়াছ। এক্ষণে উঠ! আমি আসিয়াছি। বিবাহের নিমিত্ত তুমি লালায়িত হইয়াছিলে, এখন চাহিয়া দেখ, দেবী তোমার নিমিত্ত কিরূপ পত্নী প্রেরণ করিয়াছেন। নাথ! চিরকাল তোমাকে আমি প্রেমে আবদ্ধ রাখিব। যে স্বর্গীক সুখ শচী ইন্দ্রকে প্রদান করিতে পারে না, সেইরূপ নানা সুখে তোমাকে পরিতোষ করিব। হে প্রাণনাথ! গাত্রোত্থান কর। ঐ বীভৎস আসনের উপর আর বসিয়া থাকিবার আবশ্যক নাই।' কামিনীর সুমধুর স্বরে গৌরীশঙ্করের হৃদয়ে যেন সুধাসিঞ্চন করিল। তিনি চাহিয়া দেখিলেন,—'সম্মুখে যৌবনপ্রাপ্ত প্রায় চতুর্দশ বর্ষ বয়স্কা এক কামিনী। তাহার রূপে সেই অমাবস্যা রাত্রিও আলোকিত হইয়াছিল।

কামিনীর মধুর বচনে গৌরীশঙ্করের হৃদয় শীতল হইল; তাহার স্থির বিদ্যুৎসম রূপ মাধুরী দর্শনে তাঁহার মন মোহিত হইল। তিনি মনে করিলেন,—'কাজ কি আর ধনে? দেবী

যখন কৃপা করিয়া এরূপ জগন্মোহিনী যুবতীকে আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, তখন ইহাকেই লইয়া পরম সুখে আমি জীবন অতিবাহিত করি। আমার যতই ধন ঐশ্বর্য্য হউক না কেন, সমস্ত পৃথিবী খুঁজিয়া আমি এইরূপ নারী জীবনে পাইব না। আর জপে প্রয়োজন নাই, উঠিয়া ইহাকে আমি হৃদয়ে ধারণ করি।' এইরূপ চিন্তা করিয়া গৌরীশঙ্কর শবের উপর হইতে উঠিবার নিমিত্ত উপক্রম করিলেন; কিন্তু সেই সময় কে যেন তাঁহার পিঠে চাপড় মারিয়া বলিল,—'কর কি? এ যে সব মায়া! জপ পরিত্যাগ করিলে মুহূর্তের মধ্যে হয় তুমি মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, আর না হয় পাগল হইয়া যাইবে। গৌরীশঙ্করের তখন যেন চমক হইল। তিনি মনে করিলেন,—'সত্য বটে এ সমুদয় মায়া। কিন্তু এ কামিনীর রূপ দেখিয়া কেহই স্থির থাকিতে পারেন না। প্রাণ যায় সেও স্বীকার, তথাপি তাহার নিকট ধাবিত হইতে ইচ্ছা হয়। দূর হউক আর ইহার দিকে চাহিয়া দেখিব না' এই বলিয়া গৌরীশঙ্কর চক্ষু মুদিত করিলেন। কামিনী অতি সুমধুর স্বরে নানারূপ সাধ্য সাধনা করিল; কিন্তু গৌরীশঙ্কর কিছুতেই আর চক্ষু উন্মীলন করিলেন না। নিরাশ হইয়া মায়াময়ী অন্তর্হিত হইল। পৃথিবী পুনরায় নীরব হইল। গৌরীশঙ্কর চাহিয়া দেখিলেন যে, এখন আর সে স্থানে বন্য পশু অথবা ভূত-প্রেত প্রভৃতি কিছুই নাই। এখন চারি দিকে কেবল নিবিড় অন্ধকার।

তৃতীয় অধ্যায় – বীরের বাক্যবাণ

গৌরীশঙ্কর পুনরায় একান্ত মনে জপে প্রবৃত্ত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে সহসা মাতার কণ্ঠস্বর তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। সেই অমাবস্যা রাত্রি,—সেই ভয়াবহ মন বড়ই কাতর হইল। তিনি চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন,—সত্য সত্যই তাঁহার বৃদ্ধ মাতা বটে। যষ্টি হস্তে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মা বলিলেন,—

'উত্তিষ্ঠ বৎস তে কার্য্যং সর্ব্বং যাতু ন সংশয়ঃ।
প্রভাতসমদোজাতস্ত্বৎপিতা ক্রোশতে গৃহম্।।
প্রায়ো বিমৎসরা লোকা রাজানো দণ্ডধারিনঃ।
কদাচিৎ কেন বা দৃষ্টিস্তদা কিঞ্চিদ্ ভবিষ্যতি।।'

মাতার মুখে এরূপ সংস্কৃত বচন শুনিয়া গৌরীশঙ্কর বিস্মিত হইলেন। 'আমার পিতা নাই, দেশে রাজপুরুষ আছে বটে; কিন্তু রাজা নাই। ইনি কি আমার মাতা নহেন, ইনি কি মায়া?' গৌরীশঙ্কর ভাল রূপে পুনরায় নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন হু-বহু তাঁহার মাতা, কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। মস্তকে করাঘাত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মাতা বলিলেন—'বাছা তুই আমার একমাত্র সন্তান। কেন তুই এমন অসীম সাহসিক কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিস? যদি তোর কোনরূপ বিপদ ঘটে, তাহা হইলে কাহাকে লইয়া আমি আর এ সংসারে থাকিব? কাজ কি বাছা ধনে? ব্রাহ্মণের ছেলে,—তুই ভিক্ষা করিয়া খাইবি, চল, বাছা ঘরে চল্, আর জপে প্রয়োজন নাই।'

মাতা এইরূপে খেদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু গৌরীশঙ্কর তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি মনে করিলেন যে, যদি প্রকৃত আমার মাতা হন, তাহইলে ইনি আমার

হাত ধরিয়া তুলিতে চেষ্টা করিবেন। কিন্তু মাতা তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন না। অনেক খেদ করিয়া অবশেষে তিনি প্রস্থান করিলেন। ইহার পর আরও অনেক চেষ্টা করিল। বহুকাল পূর্বে মৃত পিতা ও জ্ঞাতিগণও আসিয়া, তাঁহাকে শবের উপর হইতে উঠিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু গৌরীশঙ্কর উঠিলেন না। নানারূপ বিভীষিকা দর্শনে তাঁহার হৃদয় কিছুমাত্র বিচলিত হইল না।

রাত্রি প্রায় তিনটা হইল। এমন সময় এক জন থিয়েটারী বীর সেই শ্মশান-ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইল। গৌরীশঙ্কর একবার থিয়েটার দেখিতে গিয়াছিলেন। সে স্থানে এক জন অভিমন্যু সাজিয়া আসিয়াছিল। থিয়েটারে যাঁহারা বীর সাজেন, তাঁহারা মনে করেন যে, খুব চীৎকার করিতে পারিলেই বীরত্ব প্রদর্শন করা হয়। থিয়েটারের রীতি অনুসারে অভিমন্যুও ভয়ানক চীৎকার করিয়াছিল। তাহার চীংকারে অনেক লোকের কান হইতে পোকা বাহির হইয়া গিয়াছিল; অনেক লোকের কর্ণে তালি লাগিয়াছিল; তাহা ভিন্ন চারি পাঁচ জনের কর্ণতন্তু ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল; চারি পাঁচ জনের কর্ণটহে ছিদ্র হইয়া গিয়াছে। সেই হতভাগারা জন্মের মত বধির হইয়া গিয়াছে। গৌরীশঙ্কর চীৎকারে অস্থির করেন। সেই অবধি থিয়েটারী বীরকে তিনি বড় ভয় করেন। এখন সেই থিয়েটারী বীর শ্মশানক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইল। থিয়েটারী বীর অতি কর্কশ স্বরে ঘোর চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল,—'রে রে রে, কে রে তুই? যুদ্ধং দেহি, যুদ্ধং দেহি! জানিস আমি থিয়টারী বীর। এ জগতে এমন কে আছে যে আমার চীৎকার সহ্য করিতে পারে? আমার কর্কশ বচনে কাহার না কান ঝালা-পালা হয়? আমি যখন থিয়েটারের তক্তার উপর দাঁড়াইয়া ঘোর রবে চীৎকার করিতে থাকি, তখন কোন্ দর্শক, কোন্ শ্রোতা না কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করে? কে না আমাকে শত শত গালি দিয়া থাকে? কে না বলে যে, যবনিকা-পতন হইলে বাঁচি? যুদ্ধং দেহি। যুদ্ধং দেহি।'

গৌরীশঙ্কর অনেকক্ষণ পর্যন্ত থিয়েটারী বীরের বক্তৃতা প্রাণপণে সহ্য করিলেন, কিন্তু শেষকালে তিনি আর পারিলেন না হায়! হায়! এত কষ্ট করিয়া শেষকালে সব বিফল হইল। তিনি মনে করিলেন, বরাহ-ব্যাঘের উপদ্রব সহ্য করিলাম, ভূত-প্রেতের দৌরাত্ম্যেও মনকে স্থির রাখিলাম, অপ্সরার মোহিনী শক্তি আমাকে মোহিত করিতে পারে নাই, মাতার সকরুণ ক্রন্দনেও আমি বিচলিত হই নাই, কিন্তু এই থিয়েটারী বীরের বাক্যবাণে আমার কর্ণ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল, আমার হৃদয় বিদ্ধ হইয়া জর্জরীভূত হইল। ইহার জ্যেঠামি আমি আর সহ্য করিতে পারি না।"

এইরূপ মনে করিয়া, গৌরীশঙ্কর আসন ত্যাগ করিবার উপক্রম করিলেন। কিন্তু এবারও কে যেন তাঁহার পিঠে চাপড় মারিয়া বলিল,—'কর কি? এ প্রকৃত থিয়েটারী বীর নহে, এ মায়া-প্রসূত ভূত। একটু ধৈর্য্য ধরিয়া থাক। এখনি এ চলিয়া যাইবে।'

গৌরীশঙ্কর মন দৃঢ় করিয়া জপে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু থিয়েটারী বীর দ্বিগুণভাবে চীৎকার আরম্ভ করিল, তাহার চীৎকারে গগন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। গৌরীশঙ্কর আর

ধৈর্য্য ধরিয়া থাকতে পারিলেন না। থিয়েটারী বীরের বাক্যবাণে তিনি জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন। কানে অঙ্গুলি দিয়া ধড়্মড় করিয়া তিনি শবের পৃষ্ঠ হইতে উঠিয়া পড়িলেন। শ্মশানক্ষেত্র দ্রুতবেগে পলায়ন করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় চারিদিকে ঘোর কলরব উপস্থিত হইল। সিংহ ব্যাঘ্র বরাহ ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তু, ভূত প্রেত পিশাচ দানা দৈত্য ডাকিণী শাকিনী বেতাল বটুক চেটক প্রভৃতি উপদেবতা, ও শত শত থিয়েটারী বীর এক সঙ্গে তর্জ্জন-গর্জন করিতে লাগিল। কেহ লম্ফপ্রদান করিতে লাগিল। কেহ নৃত্য করিতে লাগিল। অবশেযে ভয়ঙ্কর এক বেতাল আসিয়া গৌরীশঙ্করের টিকি ধরিল। তাঁহার টিকিটি ধরিয়া তাঁহাকে দূরে পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করিল। ভাগ্যে পুষ্করিণীর মাঝখানে গিয়া তিনি পড়েন নাই, তাই রক্ষা। পুষ্করিণীর যে স্থানে কেবল কর্দম ছিল, সেই স্থানে গিয়া পড়িয়াছিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে সকলে দেখিল যে, সেই স্থানে তিনি পড়িয়া রহিয়াছেন সে সময় তাঁহার কিছুমাত্র সংজ্ঞা ছিল না। অজ্ঞান অভিভূত হইয়া তিনি পড়িয়া ছিলেন। কেবল অল্প অল্প নিশ্বাস-প্রশ্বাস চলিতেছিল, কেবল অল্প অল্প গোঁ গোঁ শব্দ করিতেছিলেন, কেবল অল্প অল্প রক্ত-মিশ্রিত ফেনা তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইতেছিল। জীবনের এই সামান্য মাত্র চিহ্ন কেবল অবশিষ্ট ছিল।

চতুর্থ অধ্যায় – খি-বী, যু-দে

প্রাতঃকালে এক জন রাখাল-বালক গৌরীশঙ্কর বাবুকে এই অবস্থায় প্রথম দেখিতে পাইল। তাহার চীৎকারে চারিদিক হইতে লোক আসিয়া পড়িল। নিকটে সেই চণ্ডালের শব ও পূজার আয়োজন দেখিয়া সকলে বুঝিতে পারিল যে, কি কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। গৌরীশঙ্কর বাবুকে ধরাধরি করিয়া সকলে গৃহে লইয়া গেল। প্রথমে ডাক্তার—বৈদ্য আসিয়া তাঁহার চেতনা-সম্পাদনের নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কেহ তাঁহাকে চেতন করিতে পারিল না।

যদি বা যৎসামান্যভাবে তাঁহার দেহে একটু জীবনের সঞ্চার হয়, যদি বা তাঁহার মনে একটু জ্ঞানের উদয় হয়, কিন্তু প্রতিদিন রাত্রি তিনটার সময় গৌরশঙ্করের পৃষ্ঠদেশে গুপ্ গাপ শব্দ হয়। কিরূপে তাঁহার পৃষ্ঠে এরূপ শব্দ হয়, তাহা কেহ দেখিতে পায় না; কিন্তু কে যেন সবলে তাঁহার পৃষ্ঠে কিল মারিতেছে, এইরূপ বোধ হয়। সেই সময় প্রহারের চোটে যন্ত্রণায় গৌরশঙ্করের মুখ বিবর্ণ হইয়া পড়ে। দিনের বেলা শরীরে যাহা একটু বলের সঞ্চার ও মনে যাহা একটু জ্ঞানের উদয় হয়, সেই প্রহারের চোটে তাহা লোপ পাইয়া যায়। তাহার পর গৌরীশঙ্কর পুনরায় জড়ের মত পড়িয়া থাকেন। ফল কথা, ডাক্তার ও বৈদ্য দ্বারা কোন রূপ উপকার হইল না।

একমাত্র পুত্রের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া, গৌরীশঙ্করের মাতার দুঃখের আর সীমা রহিল না। তিনি রাত্রি দিন কাঁদিতে লাগিলেন। আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া পুত্রের সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। রোজার কথা শুনিলেই, দৌড়িয়া তিনি তাহার নিকট গমন

করেন; নানারূপ মিনতি করিয়া তাহাকে ডাকিয়া আনেন। প্রতি রাত্রিতে রোজাগণ নানারূপ ঝাড়ান করিতে লাগিল। দিনের বেলা একটু উপশম হয়। এক আধ বার চক্ষু উন্মীলিত করিয়া, গৌরীশঙ্কর বিস্ময়াপন্ন মুখে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করেন। কিন্তু দিনের বেলা যাহা একটু উপকার হয়, রাত্রি তিনটার সময় ভূতের ভূতে তাঁহার পিঠে গুপ্-গাপ্ গুপ্ কিল মারে। আধ ঘন্টা পরে কিলের শব্দ থামিয়া যায়। গৌরীশঙ্কর তাহার অনেকক্ষণ পর্যন্ত গোঁ-গোঁ শব্দ করিতে থাকেন ও সেই সময় তাঁহার মুখ হইতে রক্ত মিশ্রিত ফেন' নির্গত হইতে থাকে। তাঁহার পিঠে কোন স্থানে কৃষ্ণবর্ণ,— কোন স্থানে রক্তবর্ণ,—কিলের দাগও সকলে দেখিতে পায়; কিন্তু কে যে আসিয়া কিল মারিয়া যায়, কেহ তাহা দেখিতে পায় না। এইরূপে এগার দিন কাটিয়া গেল। এখনও গৌরীশঙ্করের চেতনা হইল না। এখনও প্রতি রাত্রিতে ভূতের প্রহার নিবারিত হইল না। শব-সাধনের একাদশ দিন পরে গৌরীশঙ্করের মাতা শুনিলেন যে, যে চণ্ডালের শব লইয়া গৌরীশঙ্কর সাধনা করিতেছিলেন, তাহার পিতৃব্য ভূতের মন্ত্র অবগত আছে। গৌরীশঙ্করের মাতা তাহার নিকট গমন করিলেন। প্রথমে সে কিছুতে স্বীকার পাইল না। কারণ তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রের দেহ লইয়া গৌরীশঙ্কর সেই বিড়ম্বনা করিয়াছিলেন। কিন্তু অনেক মিনতির পর, সে আসিয়া ঝাড়ান কাড়ান করিতে লাগিল। তাহার মন্ত্রের বলে সামান্য একটু উপকার হইল। গৌরীশঙ্কর এবার চাহিয়া 'থি-বী, যু-দে' এই শব্দ দুইটি কয়বার তিনি উচ্চারণ করিলেন।

চণ্ডালের মন্ত্রে আর অধিক উপকার হইল না। গৌবীশঙ্করের জ্ঞান হইল না, রাত্রিকালের ভূতের প্রহার নিবারিত হইল না। আরও অনেক রোজা আসিযা চিকিৎসা করিল; কিন্তু তাহাদের মন্ত্রেও বিশেষ কোনরূপ উপকার হইল না।

এইরূপে প্রায় এক মাস কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে গৌবীশঙ্করের মাতা এক ব্রাহ্মণের কথা শুনিলেন। তাঁহাব নিবাস প্রায় দশ ক্রোশ দূরে। তিনি ভূত প্রেত সম্বন্ধে জ্ঞানী ব্যক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ। গৌরীশঙ্করের মাতা বৃদ্ধা ছিলেন, তথাপি লাঠি হাতে করিয়া আস্তে আস্তে সেই ব্রাহ্মণের গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণের পদতলে তিনি শয়ন করিয়া পড়িলেন। বৃদ্ধার কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণের দয়া হইল। তিনি গৌরীশঙ্করের নিকট আগমন করিয়া নানারূপ ঔষধ প্রদান করিলেন ও নানারূপ মন্ত্র পাঠ করিলেন। দুই দিন কোনরূপ ফল হইল না। তৃতীয় রাত্রিতে 'অ ক্ষঃ ক্ষাং-ক্ষৌ কাজসি নৌ,' ব্রাহ্মণ যেই এই কয়টি শব্দ উচ্চারণ করিয়াছেন, আর গৌরীশঙ্কর বিপরীত ভাবে হাসিয়া উঠিলেন। হাসিতে হাসিতে তিনি উঠিয়া বসিলেন। এত দিন পরে এই প্রথম তিনি উঠিয়া বসিতে সমর্থ হইলেন। গৌরীশঙ্করের এইরূপ ভাব দেখিয়া ব্রাহ্মণ পুনরায় এই শব্দগুলি উচ্চারণ করিলেন, 'রাঁ রাঁ সাঁ সাঁ লাঁ লাঁ হুঁ হঃ সং সঃ খং খঃ তং তঃ ধঃ সং স্ফুং হীং হুং হুং ক্ষীং ক্ষীং সং সঃ স্তুং স্তুঃ হ্রীং হূং ক্ষীং ক্ষীং ক্ষৌং সং ফং হুং ফট্ স্বাহা; কাহার আজ্ঞা—না শ্রীশ্রীউড্ডামরেশ্বরের আজ্ঞা।' এ শব্দগুলির অর্থ কি, যাঁহাদের এ সম্বন্ধে বোধ আছে, তাঁহারা অনায়াসেই অবগত হইতে পারিবেন।

নানারূপ মন্ত্রবলে ব্রাহ্মণ গৌরীশঙ্করকে জড়ভাব হইতে মুক্ত করিলেন; কিন্তু তিনি ঘোর উন্মাদ অবস্থায় রহিলেন। তাঁহার জ্ঞান কিছুমাত্র হইল না। রাত্রিতে প্রহারও বন্ধ হইল না। গৌরীশঙ্কর যথারীতি আহারাদি করিতে লাগিলেন, উঠিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণের চিকিৎসায় এই পর্য্যন্ত হইল। কিন্তু তিনি কথা কহিতেন না। কখন কখন আপনা-আপনি, অথবা লোকের কথার প্রত্যুত্তরে কেবল 'থি-বী, যু-দে' এই শব্দ উচ্চারণ করিতেন। এই দুইটি শব্দ ভিন্ন অন্য কথা তিনি মুখে আনিতেন না। এই দুইটি শব্দ উচ্চারণ কবিবামাত্র তাঁহার সর্বশরীর শিহরিয়া উঠিত ও সেই সময় আতঙ্কে তাঁহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া উঠিত। প্রতি রাত্রিতে ভূতের প্রহারে গৌরীশঙ্করের দেহ দিন দিন শীর্ণ হইতে লাগিল। অবশেষে গৌরীশঙ্করের মাতাকে ব্রাহ্মণ বলিলেন,—'আপনার পুত্রকে সামান্য ভূতে পাই নাই। সামান্য ভূত হইলে আমি তাহার প্রতিকার করিতে পারিতাম। বেতালকে দূর করি, আমার সেরূপ ক্ষমতা নাই।' এই বলিয়া ব্রাহ্মণ প্রস্থান করিলেন।

পুত্রের উন্মত্ততা দূর করিবার নিমিত্ত ও ভূতের প্রহার হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত, মাতা যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার চেষ্টা সফল হইল না। সেই একমাত্র পুত্র। তাঁহার যখন এ দশা হইল, তখন সংসার ধর্ম আর কাহাকে লইয়া?

গৃহে থাকিয়া আর লাভ কি? মাতা ভাবিলেন,—'পুত্রকে লইয়া যে দিক দুই চক্ষু যায়, সেই দিকে আমি চলিয়া যাইব। নানা তীর্থস্থানে আমি ঘুরিয়া বেড়াইব। যদি কোন স্থানে কোন মহাত্মার সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলে তাঁহার কৃপায় আমার পুত্র আরোগ্য লাভ করিবে। আর তা না হয়, তাহা হইলে পথে পথে বেড়াইয়া, আমি অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিব। আমার অবর্তমানে এই উন্মাদের কপালে যাহা আছে তাহাই হইবে।'

এইরূপ ভাবিয়া, তিনি পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'গৌরীশঙ্কর! বাবা! আমারা যদি কাশী বৃন্দাবনে যাই, তাহা হইলে তুমি কি ভাল হইবে?"

গৌরীশঙ্কর উত্তর করিলেন,—'থি-বী, যু-দে।'

মাতা জানিতেন যে, ঐ দুইটি শব্দ ভিন্ন গৌরীশঙ্কর অন্য কোন কথা মুখে আনিবেন না। তথাপি মায়ের প্রাণ! তিনি কেবল ঐ দুইটি শব্দই শুনিবার নিমিত্ত গৌরীশঙ্করকে সম্বোধন করিয়া নানা কথা কহিতেন, নানা পরিচয় তাহাকে প্রদান করিতেন, চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে, আঁচলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে, পুত্রের সহিত নানা গল্প করিতেন। পুত্র কেবল বলিত,—'থি-বী, যু-দে।'

পঞ্চম অধ্যায় – দেখিতে সামান্য লোক

পুত্রকে লইয়া গৌরীশঙ্করের মাতা বাটী হইতে বাহির হইলেন। প্রথম অর্থাভাব, দ্বিতীয় পাঁচ জনের সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা,—এই দুই কারণে তাঁহারা পদব্রজে পথ চলিতে লাগিলেন। মাতা বৃদ্ধা ছিলেন, অধিক পথ চলিবার তাঁহার শক্তি ছিল না। এক দিনের পথ তিন চারি দিনে অতিক্রম করিতে লাগিলেন। তাঁহার হাতে অতি সামান্য টাকা ছিল। পাছে সেগুলি শীঘ্র শেষ হইয়া যায়, সেই ভয়ে যথাসাধ্য ভিক্ষা দ্বারা তিনি পথে দিনপাত করিতে

লাগিলেন। ক্ষিপ্ত পুত্র সহিত বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীকে দেখিয়া, সকলের দয়া হইত। সে নিমিত্ত পথে আহারাভাবে তাঁহাদিগকে ক্লেশ পাইতে হয় নাই। পুত্র কিরূপে ক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহা শুনিয়া অনেকে বৃদ্ধার দুঃখে দুঃখী হইত। তাঁহার দুঃখে কাতর হইয়া, কোন স্থানে ধনবান লোকের গৃহিণীগণ তাঁহাকে নগদ অর্থও প্রদান করিতেন। পুত্রের চিকিৎসার নিমিত্ত কোন দিন কি আবশ্যক হয়, এই ভাবিয়া ব্রাহ্মণী যথাসাধ্য কিছু কিছু সঞ্চয় করিতেন। এইরূপে দুইজনে গয়া, কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, হরিদ্বার কুরক্ষেত্র প্রভৃতি নানা তীর্থস্থানে ভ্রমণ করিলেন। সাধু সন্ন্যাসী দেখিলে সকলকেই মাতা অতি বিনীত ভাবে পুত্রের বিবরণ প্রদান করিতেন। কিন্তু কোনও স্থানে কাহারও দ্বারা তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইল না; গৌরীশঙ্করকে কেহই সে বিপদ হইতে মুক্ত করিতে পারিলে না। তবে বায়ু পরিবর্তনে, নানা দেশ পর্য্যটনে ও নানা দৃশ্যদর্শনে এই মাত্র উপকার হইল যে, গৌরীশঙ্করের বিমর্ষভাব অনেকটা দূর হইল; পূর্বাপেক্ষা তাঁহার চিত্ত যেন কিছু প্রফুল্লভাব ধারণ করিল। কিন্তু যে স্থানেই গমন করেন, যে স্থানেই দুই জনে রাত্রি যাপনের নিমিত্ত শয়ন করেন, সেই স্থানেই রাত্রি তিন প্রহরের সময় গৌরীশঙ্করের পৃষ্ঠে ভূতের প্রহারে প্রপীড়িত হয়। তবে প্রহারে প্রহারে পিঠে পিঠে কড়া পড়িয়া গেল। পিঠ কঠিন হইয়া পূর্বাপেক্ষা যাতনার কিছু লাঘব হইল। যাহা হউক, গৌরীশঙ্করের উন্মত্তা ঘুচিল না, ভূতও তাঁহাকে ছাড়িল না।

এইরূপে তিন বৎসর পথে পথে কাটিয়া গেল। মাতার বার্দ্ধক্য দিন দিন বাড়িতে লাগিল। বয়সের গুণে, পথক্লেশে, ভাবনা চিন্তায়, দিন দিন তিনি দুর্বল হইতে লাগিলেন। চক্ষুদ্বয়ের দৃষ্টিশক্তি ক্রমে ক্ষীন হইতে লাগিল। রোগগ্রস্ত হইয়া, যদি কিছু দিন তাঁহাকে পড়িয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে দুই জনের কি দশা হইবে, আর সহসা যদি তাঁহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে পুত্রের কি দুর্দশা হইবে, এই সব ভাবিয়া প্রাণ তাঁহার বড়ই আকুল হইল। যাহা হউক, তিন বৎসর পরে শীতকালের প্রারম্ভে তাঁহারা উত্তরাখণ্ড হইতে নামিয়া, পুনরায় হরিদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হরিদ্বারের নিকট জ্বালাপুর নামক একখানি গ্রাম আছে। সেই গ্রামের প্রান্তদেশে বৃহৎ একটি আমবাগান আছে। একদিন অপরাহ্নে গৌরীশঙ্কর ও তাঁহার মাতা সেই বাগানের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পথশ্রমে কাতর হইয়া দুই জনে এক বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িলেন। সেই বৃক্ষতলে আর একটি পুরুষ বসিয়াছিলেন। লোকটি দেখিতে বাঙ্গালীর মত, পরিধান বাঙ্গালীর মত, তবে চাদরখানি তিনি মাথায় বাঁধিয়াছিলেন। সাধু-সন্ন্যাসীর মত তাঁহার বেশভূষা ছিল না। ভদ্র বাঙ্গালী সন্তানের যেরূপ হয়, তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র ও ভাব-ভঙ্গী সেইরূপ ছিল। তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসরের কিছু অধিক হইবে। সাধু-সন্ন্যাসী দেখিলেই, গৌরীশঙ্করের মাতা পুত্রের কথা জিজ্ঞাসা করেন। ইনি সাধু নহেন: সুতরাং বৃদ্ধা তাঁহাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। সেই লোকটি এক বৃক্ষমূলে ঠেস দিয়া, অর্দ্ধশায়িত ভাবে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। মাতা ও পুত্র সেই স্থানে আসিয়া তাঁহার নিকট হইতে কিছুদূরে উপবেশন করিলেন। বাঙ্গালী তাঁহাদের প্রতি একবার কটাক্ষপাত করিবামাত্র তিনি চমকিত হইলেন।

তাহার পর, কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত তিনি স্থিরদৃষ্টিতে গৌরীশঙ্করকে নিরীক্ষণ করিলেন। গৌরীশঙ্করকে ভাল করিয়া দেখিয়া, চক্ষু মুদিত করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। অবশেষে চক্ষু চাহিয়া তিনি বৃদ্ধাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'মা! আমি বাঙ্গালী তোমরা আমার দেশস্থ লোক। কত দিন ধরিয়া তোমার পুত্রের এ দশা হইয়াছে?

সামান্য এই কয়টি কথা শুনিবামাত্র বৃদ্ধার মনে কিরূপ এক অনির্বচনীয় আশার সঞ্চার হইল। সকল লোকেই প্রথম জিজ্ঞাসা করে,—'তোমার পুত্রের কি হইয়াছে?' ইনি যে কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। গৌরীশঙ্করের যাহা হইয়াছে, তাহা যেন তিনি সম্পূর্ণ ভাবে অবগত আছেন, কথার ভাবে সেইরূপ প্রকাশ হইল। তাঁহার দয়া-দাক্ষিণ্য ভাবে, তাঁহার সুমধুর কথায়, বৃদ্ধার তাপিত-হৃদয় যেন শীতল হইল। ফল কথা, বৃদ্ধাকে কে যেন বলিয়া দিল যে,—ইনি সামান্য পুরুষ নহেন। ভাগ্যবলে আজ তুমি ইঁহার দর্শন পাইলে; এইবার তোমার দুঃখের অবসান হইল। তাঁহার প্রশ্নেব কোনও রূপ উত্তর না দিয়া, বৃদ্ধা তাড়াতাড়ি তাঁহার পা দুইটি ধরিতে যাইলেন।

বৃদ্ধাকে নিবারণ করিয়া তিনি বলিলেন,—'ছি! মা! অমন কাজ করিবেন না। আপনি বৃদ্ধা আমার মাতৃস্থানীয়া।'

গৌরীশঙ্করের মাতা বলিলেন,—'বাছা! ভগবান আমাকে যেন বলিয়া দিতেছেন যে, তোমা হইতে আমার পুত্র আরোগ্য-লাভ করিবে। বাছা! এই দুঃখিনীকে তুমি এ দায় হইতে উদ্ধার কর। অধিক আর তোমাকে কি বলিব, এই পুত্রটি ভিন্ন জগতে আমার আব কেহ নাই। ইহার এই দশায় আমি মৃতপ্রায় হইয়া আছি, পাগলের ন্যায় আমি দেশে দেশে ঘুরিতেছি। তুমি আমার প্রতি কৃপা কর।''

বাঙ্গালী উত্তর করিলেন,—'আমি কিছু করিতে পারিব কি না, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। তবে মা আপনার পুত্রকে সুস্থ করিতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। নিকটে এই গ্রামখানির নাম জ্বালাপুর, এ স্থানে পাণ্ডাদের বাস। আমি আজ দুই দিন এ স্থানে আসিয়াছি। এক জন পাণ্ডার বাটীতে বাসা লইয়া আমি অবস্থিতি করিতেছি। আমার সঙ্গে বাসায় চলুন। আজ রাত্রিতে আপনার পুত্রের নিমিত্ত আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।'

বলা বাহুল্য যে, গৌরীশঙ্করের মাতা অতি আগ্রহে এ কথায় সম্মত হইলেন। তিন জনে ধীরে ধীরে জ্বালাপুর অভিমুখে চলিলেন। অল্পক্ষণ পরে তিন জনে সেই পাণ্ডার বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বাঙ্গালী আহারাদির আয়োজন করিয়া দিলেন। সন্ধ্যার পর সকলে আহারাদি করিয়া নিশ্চিন্ত হইলে, বাঙ্গালী গৌরীশঙ্করকে এক স্বতন্ত্র ঘরে একাকী শয়ন করিতে দিলেন। তাঁহার মাতাকে অন্য এক ঘরে বিশ্রাম করিতে বলিলেন। গৌরীশঙ্কর শয়ন করিলে সেই ঘরে বাঙ্গালী গিয়া নানারূপ ক্রিয়া করিলেন। কি কি কাজ করিলেন, তাহার বিবরণ প্রদান করিবার আবশ্যক নাই। বাঙ্গালী নানারূপ ক্রিয়া করিয়া, ঘরের বাহিরে আসিয়া বসিলেন। দ্বারের নিকট বসিয়া বাতির আলোকে একখানি পুস্তক পাঠ করিতে লাগিলেন। ঘরের ভিতর গৌরীশঙ্কর নিদ্রা যাইতে লাগিলেন।

রাত্রির প্রথম ভাগে কোনও রূপ ঘটনা হইল না। তিনটার সময় যথারীতি গুপ্-গাপ্ শব্দ আরম্ভ হইল। সেই শব্দ শুনিয়া বাঙ্গালী আলোক লইয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন যে, গৌরীশঙ্করের পিঠের উপর সেই শব্দ হইতেছে, তিনি গোঁ গোঁ করিতেছেন, মুখ দিয়া তাহার ফেনা বাহির হইতেছে, মাঝে মাঝে তিনি চিৎ হইতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু যতবার তিনি চিৎ হইতে চেষ্টা করিতেছেন, ততবার কে যেন তাঁহাকে বলপূর্বক উপুড় করিয়া ফেলিতেছে। উপুড় করিয়া কে যেন তাঁহার পিঠে কিল মারিতেছে। আলোটি ঘরের মাঝখানে রাখিয়া বাঙ্গালী গৌরীশঙ্করের শিয়রদেশে গিয়া উপবেশন করিলেন। সে স্থানে বসিয়া তিনি তাহা মাথায় জপ করিতে লাগিলেন। জপ আরম্ভ করিবামাত্র কিলের শব্দ থামিয়া গেল। গৌরীশঙ্কর সুস্থির হইলেন। কিন্তু তাঁহার নিঃশ্বাস ঘন ঘন বহিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে গৌরীশঙ্কর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—'থি-বী যু-দে।'

বাঙ্গালী বলিলেন,—'পরিষ্কার করিয়া সকল কথা বল!'

গৌরীশঙ্কর কোন উত্তর করিলেন না! বাঙ্গালী আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া ক্রমাগত জপ করিতে লাগিলেন। প্রায় আধ ঘন্টা এই ভাবে কাটিয়া গেল। জপ ব্যতীত তিনি আরও নানারূপ ক্রিয়া করিলেন। অবশেষে গৌরীশঙ্কর আর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—'থি-বী, যু-দে।' —বাঙ্গালী বলিলেন,—'ভাল করিয়া বল!'

গৌরীশঙ্কর বলিলন,—'থিয়েটারী বীর যুদ্ধং দেহি।'

বাঙ্গালী বলিলেন,—'থিয়েটারী বীর! আজ হইতে আর তুমি ইহাকে বিরক্ত করিতে পারিবে না। কেমন! আমার আজ্ঞা তুমি পালন করিবে তো?'

গৌরীশঙ্কর এইবার প্রকৃতপক্ষে বক্তা হইলেন। আজ তিন বৎসর ধরিয়া 'থি-বী, যু-দে' ভিন্ন অন্য কথা মুখে আনেন নাই, আজ তিনি নানারূপ কথা বলিতে লাগিলেন।

কিন্তু এখন তিনি যে সমুদয় কথা বলিতে লাগিলেন, তাহা তাঁহার নিজের নহে। যে ভূত তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছিল, এ সমুদয় তাহার কথা।

গৌরীশঙ্করের মুখ দিয়া সেই ভূত বলিল,—'মহাশয়! আপনি আমাকে যেরূপ আজ্ঞা করিবেন, আমি সেইরূপ করিব। এ ব্যক্তি অতি অন্যায় কাজ করিয়াছে। ধনলোভে বিনা শিক্ষায় এ অসীম সাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। 'দেখি, মন্ত্র সফল হয় কি না? দেখি, আরাধনা করিলে ঈশ্বর সত্য সত্য মনুষ্যের প্রতি কৃপা করেন কি না,—এইরূপ মনে করিয়া মন্ত্র ও মহাশক্তির পরীক্ষা করিতে এই ব্যক্তি গিয়াছিল। সেরূপ কার্য্যের পরিণাম এইরূপ হয়।' বাঙ্গালী বলিলেন,—'যাই হউক, ইহার যথেষ্ট দণ্ড হইয়াছে। আর কেন? ইহাকে এক্ষণে নিষ্কৃতি প্রদান কর।'

ভূত বলিল,—'আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, আপনি যাহা বলিবেন, আমি তাহাই করিব। আপনি মহাত্মা লোক। মানুষে আপনাকে জানে না, কিন্তু আমি আপনাকে জানি। বিষ্ণুপ্রয়াগ অঞ্চলে তুষারাবৃত হিমালয়শিখরে যেরূপে তাঁহার সহিত আপনার সাক্ষাৎ হয়,

যেরূপে আপনি প্রভুর নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া, নানা শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তাহা আমি জানি। যোগিগণ কেবল সমাধিযোগে যাঁহার দর্শন লাভ করেন, তিনি সর্বদাই আপানর হৃদয় মন্দিরে বিরাজ করিতেছেন। অতি সূক্ষ্ম পরমাণু হইতে জড়জগতের অপর পারে সেই মহান্ জ্যোতির্মণ্ডল পর্য্যন্ত সকল বিষয় আপনি অবগত আছেন। কেবল লোক-শিক্ষার নিমিত্ত অজ্ঞের ন্যায় অজ্ঞ সাজিয়া আপনি সংসারে বিচরণ করেন। মোহে মুগ্ধ, ক্ষুধায় ক্ষীণ, রোগে রুগ্ন, শোকে আকুল ভারতের কোটি কোটি লোকের দুঃখ-নিবারণের নিমিত্ত কত ক্লেশ, কত অপমান, আপনি না ভোগ করেন। জগতের হিতের নিমিত্ত দীনবেশে সামান্য লোকের ন্যায় আপনি অর্থ উপার্জ্জন করিয়া অকাতরে তাহা বিতরণ করেন। হে মহাত্মন্! আমি'— বাঙ্গালী বলিলেন,—'চুপ!'

এই বলিয়া তিনি গৌরীশঙ্করের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। অগ্নিশিখার ন্যায় সেই দৃষ্টি যেন রোগীর উপর পড়িতে লাগিল। তাঁহার সমুদয় মনের ভাব যেন রোগীর মনকে বিদ্ধ করিয়া, তাহার ভিতর ওতপ্রোতভাবে প্রবেশ করিতে লাগিল।

সে দৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া, গৌরীশঙ্কর অর্থাৎ ভূত, মস্তক অবনত করিয়া বলিল,—'বেশ! আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক! অজ্ঞ সাজিয়া সংসারে আপনি থাকিতে ইচ্ছা করেন, তাহাই হউক। পাগল বলিয়া, লোকের নিকট পরিচিত হইতে ইচ্ছা করেন, তাহাই হউক। এক্ষণে আপনার কি আজ্ঞা বলুন।'

বাঙ্গালী বলিলেন,—এ ব্রাহ্মণকে আর তুমি ক্লেশ দিতে পারিবে না।'

'যে আজ্ঞা' বলিয়া ভূত গৌরীশঙ্করের দেহ হইতে প্রস্থান করিল। গৌরীশঙ্কর সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিলেন। মাতার সহিত তিনি দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। বাঙ্গালীর কৃপায় তাঁহার ভাল কর্ম হইল। যথাসময়ে তিনি বিবাহ করিলেন। গৌরীশঙ্করের মাতা, পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া পরম সুখে ঘর-কান্না করিতে লাগিলেন।

* * * *

গড়গড়ি মহাশয় বলিলেন—'এই গল্পটি শেষ করিয়া আমি দেখিলাম যে, এখন কেবল একটি মুণ্ড বাকী আছে। মুণ্ড-মালার আর সমুদয় মুণ্ডগুলি রক্ত মুক্তার আকার ধারণ করিয়াছে । এই শেষ মুণ্ড আমাকে বলিল,—'তুমি এই মাত্র যে গল্পটি বলিলে, সেটি অতি চমৎকার গল্প। সে গল্পটি আমাদের সম্বন্ধে। গৌরীশঙ্করকে যে বেতাল পাইয়াছিল, সে আমার ভগিনীপতির আঁবুই খুড়ো। এখন আমার নিকট সেইরূপ আর একটি ভাল গল্প কর। —ভগিনীপতির আঁবুই খুড়ো কাহাকে বলে, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক, আমি শেষ মুণ্ডকে বলিলাম,—অপনাদিগের নিকট আমি অনেক গল্প করিলাম। কিন্তু ডাকিনীর হাত হইতে কেহই আমাকে পরিত্রাণ করিলেন না। আমাকে ফাঁকি দিয়া সকলেই লাল মুক্তা হইয়া বসিলেন। আপনিও কি তাহাই করিবেন? —মুণ্ড উত্তর করিল—"ডাকিনীর জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই। তুমি ভাল একটি গল্প বল।"

আমি ভাবিলাম যে,—"পূর্বেই আমি স্থির করিয়াছি যে, ইহার শেষ পর্য্যন্ত দেখিব।

একান্তই যদি ডাকিনীর হাত হইতে নিষ্কৃতি না পাই, তাহা হইলে মায়ের এই খড়্গ দ্বারা আমার মুণ্ড কাটিয়া মায়ের চরণে অর্পণ করিব।"

এইরূপ ভাবিয়া মুণ্ডকে আমি বলিলাম,—"আপনার নিকট এবার আমি চমৎকার একটি গল্প বলিব। ইহা মদন ঘোষের গল্প। মদন ঘোষ নিজে এই গল্পটি বলিতেছেন।

মুণ্ড বলিল,—"তবে শীঘ্র আরম্ভ করিয়া দাও।"

আমি মদন ঘোষের গল্প বলিতে আরম্ভ করিলাম।

মদন ঘোষের বদনে হাসি

প্রথম অধ্যায় – ভট্টাচার্য্য মহাশয়

আমি মদন ঘোষ। আমার বদনে আপনারা হাসি দেখিতেছেন। নূতন আমার বিবাহ হইয়াছে। সেই জন্য আমার মুখে এত হাসি। কিন্তু তা' বলিয়া আমি বে-পাগলা নই। তবে মনের মত পত্নীলাভ হইলে চিত্ত একটু প্রফুল্ল হয়। আমারও তাই হইয়াছে। তাই হাসি মুখে সকলকে আমি সম্ভাষণ করিয়া বলিতেছি—'গুড্ মর্ণিং।

সরস্বতী দেবীকে পূজা করিয়া লোকে বিদ্যালাভ করে। সে বস্তু আমি কতটুক লাভ করিয়াছি, তাহা এই গল্পটি পাঠ করিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন। তাহা ব্যতীত আমি আর একটি বহুমূল্য রত্ন লাভ করিয়াছি। দেবীর কৃপায় আমি রাধারাণীকে পাইয়াছি। রাধারাণী আমার গৃহের একাধারে লক্ষ্মী সরস্বতী।

কলিকাতায় যখন আমি স্কুলে পড়িতাম, তখন প্রতি বৎসর শ্রীপঞ্চমীর সময় আমি বাড়ী যাইতাম। বাড়ী আমাদের বর্দ্ধমান জেলা,—সামান্য একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে। বাড়ী গিয়া ভক্তিভাবে দেবীকে অঞ্জলি প্রদান করিতাম। বৈকাল বেলা মাঠে গিয়া দাঁড়াগুলি খেলিতাম।

যে বৎসর আমার প্রথম চাকরী হইল, সে বৎসর শ্রীপঞ্চমীর সময় আমি দেশে যাইতে পারিলাম না। কলিকাতাতেই সে বৎসর মায়ের শ্রীপাদ-পদ্মে অঞ্জলি প্রদান করিলাম। সেই সূত্র আমি রাধারাণীকে লাভ করিলাম।

সে বৎসর প্রাতঃকালে উঠিয়া, আমি আমার দোয়াতটিকে ভাল করিয়া ধুইলাম। পুরাতন নিবগুলি ফেলিয়া, কলমে নূতন নিব পরাইলাম। চারি পয়সা দিয়া একটি সরস্বতী ঠাকুর কিনিয়া আনিলাম। ছোট একখানি চৌকির মাঝখানে ঠাকুরটিকে তাঁহার সম্মুখে ও দুই পার্শ্বে দোয়াত কলম ও পুস্তক সাজাইলাম। শুভ্রবর্ণের ফুল ও পূজার অন্যান্য উপকরণও আহরণ করিলাম।

এ সব আয়োজন করিলাম বটে, কিন্তু পুরোহিতের প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু আজ— উপায়? ভাবিতে ভাবিতে আমার বাসার দ্বারে গলিতে গিয়া দাঁড়াইলাম। আমাদের বাসায় আর যত লোক আছেন, পূজা-পাঠের তাঁহারা ধার ধারেন না। নন্দী ভৃঙ্গীর সন্ধান বরং তাঁহারা জানেন; কিন্তু পুরোহিতের সন্ধান তাঁহারা কিছুই জানেন না। তাই মনে করিলাম যে, পথে যদি সাত্ত্বিক গোছের মানুষ দেখিতে পাই, তাহা হইলে তাঁহাকে পুরোহিতের কথা জিজ্ঞাসা করিব।

ভাগ্যে আমার বাসার নিকট দুই তিনখানি খোলার বাড়ী ছিল, তাই আমাকে অধিকক্ষণ আর পথে প্রতিক্ষা করিয়া থাকিতে হইল না। খোলাঘরের লক্ষ্মীগণের সরস্বতীর প্রতি বিদ্বেষ নাই। কার্ত্তিক ঠাকুরের প্রতি তাঁহাদের যেরূপ ভক্তি, সরস্বতী ঠাকুরাণীর প্রতিও তাঁহাদের সেইরূপ ভক্তি। মহাসমারোহের সহিত আজ তাঁহারা দেবীর পূজা করিতেছেন। ঘরের মাঝখানে তাঁহারা একখানি প্রতিমা খাড়া করিয়াছেন। প্রতিমার সম্মুখে বড় একখানি থালা রাখিয়াছেন, সেই থালে ঝমা-ঝম প্রণামী পড়িতেছেন।

কলিকাতায় পূজা-করা ব্যবসাটি নিতান্ত মন্দ নহে। বড় পূজার সময় নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে অনেক প্রণামী স্বরূপ এত টাকা আদায় করেন যে, বারো মাস সুখে স্বাচ্ছন্দে তাঁহাদের সংসার চলিয়া যায়।

আমি গলির পথে দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময় নিকটের একখানি খোলার বাড়ী হইতে এক জন ব্রাহ্মণ বাহির হইলেন। বর্ণ তাঁহার কালো নহে; শ্যামবর্ণ বলিলে যাহা বুঝায়, তাঁহার বর্ণ সেইরূপ ছিল। তাঁহার মুখে বসন্তের দাগ ছিল। কপালে তাঁহার সুদীর্ঘ একটি ফোঁটা ছিল; গায়ে একখানি নামাবলি ছিল। তিনি যে পুরোহিত, তাঁহাকে আর জিজ্ঞাসা করিতে হয় না।

ভক্তিভাবে আমি তাঁহাকে প্রাণাম করিলাম। হাত তুলিয়া জয়-অস্তু বলিয়া তিনি আমাকে আশীর্বাদ করিলেন। আমার ঘরে গিয়া মায়ের পূজা করিতে তাঁহাকে আমি অনুরোধ করিলাম। আমার কথায় তিনি সম্মত হইলেন। তাঁহার পূজা ও আমার অঞ্জলি প্রদানের পর, আমি তাঁহাকে দক্ষিণা প্রদান করিলাম। আজ আমার মুখে হাসি দেখিয়া আপনারা কত কি মনে করিতেছেন, কিন্তু সে দিন তাঁহার প্রফুল্ল ডায়মনকাটা মুখখানি যদি দেখিতেন, তাহা হইলে বলিতেন যে, হাঁ! হাসি বটে! তাঁহার কারণ এই যে, দক্ষিণাটি কিছু আশাতিরিক্ত হইয়াছিল।

সেই প্রফুল্ল বদনে ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাকে বলিলেন,—'দেখ, বাপু! আজকালের ছোকরাদের মতি -গতি নিতান্ত মন্দ হইয়াছে। সব সাহেবি ধরণ—সাহেবি মত। কিন্তু তুমি ছোকরা দেখিতেছি ভাল। ধর্মকর্মে তোমার মতি আছে। তোমার নাম কি বাপু।'

আমি উত্তর করিলাম,—'আমার নাম মদনমোহন ঘোষ। আমরা সদ্‌গোপ।'

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন,—'বা! চমৎকার নামটি। মদনমোহন। অতি সুন্দর নাম।'

আমার নামটি যে ভাল, জ্ঞান হইয়া পর্য্যন্ত তাহা আমি জানিতাম। মনে মনে কত আমি আমার নামের গৌরব করিতাম। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও আজ সেই নামের প্রশংসা করিলেন। তাঁহার প্রতি আমার প্রগাঢ় ভক্তি হইল।

আমার নিবাস কোথায়, আমার পিতা-মাতা বর্ত্তমান আছেন কিনা, এইরূপ নানাপ্রকার পরিচয় গ্রহণ করিয়া, ভট্টচার্য্য মহাশয় সে দিন বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাহার পর মাঝে মাঝে তিনি আমার বাসায় পদধূলি প্রদান করিতেন। প্রণামী স্বরূপ টাকা-টা সিকি-টা দিয়া আমি তাঁহার সম্মান করিতাম। ক্রমে আমি জানিতে পারিলাম যে, পুরোহিতগিরি ব্যতীত

তিনি ঘটকালী ব্যবসায়ও করিয়া থাকেন। সে নিমিত্ত আমার যে তখনও বিবাহ হয় নাই, কথায়-বার্ত্তায় তাঁহাকে আমি জানাইলাম। —ভট্টাচার্য্য মহাশয় কিছু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন,—'এমন সুপাত্র! বিদ্বান্! চাক্‌রে! এখনও বিবাহ হয় নাই!'

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। উত্তর আর কি করিব! প্রতিদিন আমি সাবান মাখিয়া স্নান করি। এখন আর আমার পাড়াগেঁয়ে চেহারা নাই। নানারূপ সুগন্ধযুক্ত তৈলে সিক্ত করিয়া, চুলগুলি ফিরাইতে প্রতিদিন আমি আধ ঘন্টাকাল অতিবাহিত করি। আরসীতে যখন আমি আমার মুখ দেখি, তখন ভট্টাচার্য্য মহাশয় যাহা বলিলেন, আমিও তাহাই মনে মনে ভাবি। নিজের সুখ্যাতি দেখিবেন, সকলেই বলিবে যে, মদন এক জন সুন্দর পুরুষ বটে। ফল কথা, আমার নাম মদন, আমি কাজেও মদন।

কিছু দিন পরে ভট্টাচার্য্য মহাশয় পুনরায় আমার বাসায় আগমন করিলেন। সে দিন আসিয়াই বলিলেন,—'দেখ, আমি ব্রাহ্মণ কায়স্থের ঘটকালী করি, তোমাদের জাতির ঘটকালী কখন করি নাই। কিন্তু যে স্থানে আমার বাসা, তাহার ভিতব-বাটী—এক প্রবীণ ভদ্রলোক ভাড়া লইয়াছেন। তিনি তোমাদের জাতি; উপাধি পাল। পাল মহাশয়কে সঙ্গতিপন্ন লোক বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার নিবাস শুনিয়াছিল, হুগলী জেলায় কোন স্থানে। তাঁহার এক বয়স্থা কন্যা আছে। কন্যাটির বয়ঃক্রম বারো কি তেরো হইবে। তোমাদের জাতিতে এত বড় কন্যা থাকে না। কিন্তু তাহার কারণ আমি কতকটা পাইয়াছি। আমি যে বাড়ীতে থাকি, সেই বাড়ীর নীচের তলায় একটি ঘবে তোমাদের জাতীর আর এক ব্যক্তি বাস করেন। তাহারও নিবাস হুগলী জেলায় 'সকলে তাঁহাকে নিয়োগী মহাশয় বলিয়া ডাকে। তাঁহার পুত্র পীড়িত হইয়াছে। চিকিৎসার নিমিত্ত তাহাকে তিনি কলিকাতায় আনিয়াছেন। আমি শুনিয়াছি যে এই পুত্রের সহিত পাল মহাশয়ের কন্যার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল। তাহার পীড়াবশতঃ এখনও বিবাহ হয় নাই আমার বোধ হয়, এ বিবাহ কখন হইবেও না; কারণ, নিয়োগী মহাশয়ের পুত্র কাসরোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে। কিন্তু এখনও সকলে তাহার আরোগ্য লাভের আশা করিতেছে। সে জন্য পাল মহাশয়ের নিকট এখন আমি তোমার কথা উত্থাপন করিতে পারি না। কিন্তু তুমি এক কাজ কর। তুমি গিয়া পাল মহাশয়ের সহিত আলাপ-পরিচয় কর। তাহা করিতে পারিলে, যথা সময়ে এ কাজের অনেক সুবিধা হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায় – গোঁফ ছাঁটা বিভীষণ

বিবাহের কথা শুনিয়া প্রাণ আমার উল্লাসে পরিপূর্ণ হইল। কারণ, আমার নাম মদন। প্রাণের কথা আমি খুলিয়া বলিতেছি, সে জন্য আমাকে আপনারা পাগল মনে করিবেন না বিবাহের সময় আপনাদের বোধ হয়, এইরূপ আনন্দ হইয়া থাকিবে। তবে আপনারা প্রকাশ করেন না, এই যা।

আমি ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বলিলাম,—'পাল মহাশয় প্রবীণ, সঙ্গতিপন্ন, আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। তাঁহার সহিত আমি কিরূপে আলাপ-পরিচয় করিব?।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় উত্তর করিলেন,—'তুমি এক কাজ কর। আমাদের বাড়ীতে তুমি একটি ঘর ভাড়া করিয়া সেই স্থানে বাস কর দোতলার অন্দর মহলের দিকে, ঠিক পাল মহাশয়ের ঘরের পার্শ্বে, একটি ঘর খালি আছে। তুমি সেই ঘরটি ভাড়া লও। এক বাড়ীতে বাস করিলে ক্রমে পাল মহাশয়ের সহিত আলাপ-পরিচয় হইবে।'

প্রাতঃকালে ভট্টচার্য্য মহাশয়ের সহিত আমার এইরূপ কথাবার্তা হইল। আফিস হইতে আসিয়া সেই দিন সন্ধ্যাবেলা আমি তাঁহার বাসায় গমন করিলাম। যে বাড়ীতে তিনি থাকেন, সেই বাড়ীটি আমি দেখিলাম। ইহা দক্ষিণ দ্বারী চক্‌মিলান দোতালা বাড়ী। সম্মুখেই পূজার দালান, তাহাতে এক জন স্বর্ণকার কাজ করে। বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া, একতালার দক্ষিণদিকে যে ঘরটি, তাহাতে ভট্টাচার্য মহাশয় বাস করেন। বামদিকের ঘরটিতে এক জন উৎকলবাসীর মুড়ি-মুড়কির ও তেলে ভাজা কচুরির দোকান। পূর্বদিকে একখানি ঘরে পীড়িত পুত্র লইয়া নিয়োগী মহাশয় আছেন। একতলায় পশ্চিম দিকে একখানি ঘরে এক জন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ থাকেন। তাঁহার কি মোকর্দ্দমা আছে। সেই মকোর্দ্দমার কথা একবার জিজ্ঞাসা করিলে আর রক্ষা নাই। দুই ঘন্টা ধরিয়া তোমাকে তিনি সেই পরিচয় প্রদান করিবেন। তুমি তখন মনে করিবে যে, এ কথা জিজ্ঞাসা করিয়া কি কুকর্ম করিয়াছি। বাহির-বাটীর উপরের ঘরগুলিতে আফিসের বাবুদের বাসা। কোনও ঘরে এক জন, কোনও ঘরে দুই জন, কোনও ঘরে বা তিন চারি জন বাবু বাস করেন। নীচের তলার অবশিষ্ট ঘরগুলিতে তাঁহাদের রন্ধন হয়। উপরের একটি ঘরে এক জন সামান্য গোছের দালাল থাকেন। কেশব সেন জীবিত থাকিতে তিনি ঘোরতর ব্রাহ্ম ছিলেন। মাঘোৎসবের সময় তিনি পথে নিশান ধরিয়া যাইতেন। এখন পুনরায় তিনি হিন্দু হইয়াছেন। এখন আর তিনি মুরগী ভক্ষণ করেন না। ভিতর-বাড়ীতে দোতলার পশ্চিম দিকে সারি সারি যে তিনটি ঘর আছে, তাহা ব্যতীত অন্দর মহলে এখন আর অন্য বাসোপযোগী ঘর নাই। বাড়ীটি পুরাতন ও ভগ্ন। ভিতর-বাটীর বাকি বাসোপযোগী সেই তিনটি ঘরে পাল মহাশয় একেলা সপরিবারে বাস করেন। তাঁহার পরিবার অধিক নহে, কেবল স্ত্রী ও সেই কন্যা। ভিতর-বাড়ীর দোতলায় যে ঘরে পাল মহাশয় নিজে থাকেন, ঠিক তাহার পার্শ্বে বাহির-বাটীতেএকটি ঘর খালি আছে।সেই ঘরটি ভাড়া লইবার জন্য ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাকে অনুরোধ করিলেন। আমার ঘরের সম্মুখে বারেণ্ডা আছে। সেই বারেণ্ডা বরাবর পাল মহাশয়ের ঘরের সম্মুখ দিয়া ভিতর-বাটীতে চলিয়া গিয়াছে। ভিতর-বাটী ও বাহির-বাটিতে একটি ঘর খালি আছে। সেই ঘরটি ভাড়া লইবার জন্য ভট্টাচার্য মহাশয় আমাকে অনুরোধ করিলেন। আমার ঘরের সম্মুখে বারেণ্ডা আছে। সেই বারেণ্ডা বরাবর পাল মহাশয়ের ঘরের সম্মুখ দিয়া ভিতর-বাটীতে চলিয়া গিয়াছে। বাহির-বাটী হইতে ভিতর-বাটীতে যাইতে পারা যায়। কিন্তু এখন ইহা সর্বদা ভিতরে খিল ও বাহিরে শৃঙ্খল দ্বারা বদ্ধ থাকে। বাড়ীর দক্ষিণে প্রশস্ত রাজপথ, পশ্চিমে একটি গলি। গৃহস্বামীর অবস্থা এক্ষণে মন্দ। সে জন্য বাড়ী ভাড়া দিয়া তিনি কাশীতে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। বাড়ীটি ভট্টাচার্য মহাশয়ের জিম্মায় আছে। ভাড়া আদায় করিয়া প্রতি মাসে তিনি গৃহস্বামীর নিকট প্রেরণ

করেন। সে জন্য ভট্টাচার্য মহাশয় যে ঘরে থাকেন, তাহার ভাড়া তাঁহাকে দিতে হয় না। বাড়ীটির অবস্থা ভালরূপ অবগত হওয়া আবশ্যক। সে নিমিত্ত আমি এই বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করিলাম।

ভট্টাচার্য মহাশয়ের পরামর্শ অনুসারে আমি উপরের সেই ঘরটি ভাড়া লইয়া তাহাতে বাস করিতে লাগিলাম। কিন্তু দিনের পর দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল, পাল মহাশয়ের সহিত আমার অলাপ-পরিচয় হইল না; তাঁহার কন্যাকেও আমি দেখিতে পাইলাম না। আমার ঘরটি ভিতর-বাটীর ঠিক নিকটেই ছিল; সে জন্য কখন কখন তাহার কণ্ঠস্বর ও মলের শব্দ শুনিতে পাইতাম। পাল মহাশয় বাড়ীর ভিতর হইতে বড় বাহির হইতেন না; অন্ততঃ প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার সময় আমি যখন বাড়ীতে থাকিতাম, তখন তাঁহাকে বড় বাহিরে 'আসিতে দেখিতাম না। দুই দিন কেবল ক্ষণকালের নিমিত্ত আমি তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম। একখানি পুস্তক হাতে লইয়া ঘাড় হেঁট করিয়া তিনি কোথায় গমন করিতেছিলেন। তাঁহার বয়স পঞ্চাশের অধিক হইবে। তাঁহার মুখখানি অতিশয় বিষণ্ণ। তিনি যেন ঘোর দুঃখে সর্বদাই মগ্ন আছেন। হাতে পুস্তক দেখিয়া বুঝিলাম যে, তিনি লেখা-পড়া জানেন। সেই বিষণ্ণবদনে লক্ষ্মীশ্রী দেখিয়া আমি ভাবিলাম যে, যদি কপালে থাকে তাহা হইলে এ লোকের আমি জামাতা হইব।

কিন্তু আর এক জনের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়া আছে। সে কিরূপ, তাহা আমাকে দেখিতে হইবে। কিন্তু তাঁহার পিতা অর্থাৎ নিয়োগী মহাশয়ের ভাব দেখিয়া আমার ভয় হইতে লাগিল। নিয়োগী মহাশয়ের মুখখানি অনেকটা বিভীষণের মত। মুখের দুই পাশে দুই গাল যেন দম্ভ করিয়া আগে বাড়িতেছে। তাহার মাঝখানে আধ-পাকা আধ-কাঁচা ছাঁটা গোঁপগুলি সব খোঁচা খোঁচা হইয়া আছে। তাঁহাকে দেখিয়া আমি মনে করিলাম যে, লোকে যে গোঁপ ছাঁটা বদমায়েশের কথা বলে, ইনি এক জন তাই। সে যাহা হউক, আমি অনেক কৌশল করিয়া তাঁহার পুত্রের সহিত আলাপ করিলাম। তাঁহার পুত্রের মুখমণ্ডলে সুলক্ষণ আমি কিছু দেখিলাম না। পিতার বদমায়েশি ভাব যেন পুত্রের মুখেও প্রতিফলিত হইয়াছে। কিন্তু রোগে এখন তাহার শরীর জীর্ণ হইয়াছে, মুখ তাহার শুষ্ক ও মলিন হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় তাহার জন্য আমার মনে দুঃখ হওয়া উচিত; কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, তাহা আমার হয় নাই। তাহার প্রতি বরং আমার হিংসা হইল। আমি এখন সুন্দর পুরুষ,—যাহাকে মনে মনে পত্নীরূপে বরণ করিয়াছে, সে এই মর্কটের হাতে পড়িলেও পড়িতে পারে, সে চিন্তা আমার অসহ্য হইয়া উঠিল। সত্য বটে, সেই সুন্দরীকে আমি এখনও চক্ষেও দেখি নাই। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়! তাহার পায়ের চারি-গাছি মলের রুণু রুণু শব্দ সর্বদাই আমার কানে লাগিয়া আছে! আফিসে চাবি খোলার শব্দ হয়, আর আমার প্রাণটা ধড়াস করিয়া উঠে; আমি ভাবি, এ বুঝি আমার হৃদয়-আসীনা আমার প্রাণদেবীর পদনিঃসৃত সেই কিঙ্কিণী শব্দ। তাহাকে আমি দেখি নাই সত্য; কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বিবরণ অবলম্বন করিয়া আমার মানসক্ষেত্রে তাহার চিত্র আঁকিয়া লইয়াছিলাম।

নিয়োগী-পুত্রের পীড়া সঙ্কট; সর্বদাই সে ঘরের ভিতর শুইয়া থাকে; উঠিয়া বেড়াইবার

শক্তি বড় নাই; তথাপি সে মাঝে মাঝে বাটীর ভিতর গিয়া পাল মহাশয়ের পরিবারবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করে। পাল মহাশয়ের সহিত নিয়োগী মহাশয়ের বহুদিন ধরিয়া আলাপ-পরিচয় আছে। শুনিলাম যে, দেশে ভূমিসম্পত্তি লইয়া একবার পাল মহাশয়ের কি মকর্দ্দমা হইয়াছিল। তাহাতে জাল করিয়া ও মিথ্যা সাক্ষীর যোগাড় করিয়া নিয়োগী মহাশয় তাঁর অনেক উপকার করিয়াছিলেন। সেই অবধি দুই পরিবারে বিলক্ষণ সদ্ভাব জন্মিয়াছিল। সেই সব কথা শুনিয়া মাঝে মাঝে আমি নিরাশ হইয়া ভাবিতাম যে, কে হে তুমি মদন ঘোষ! যে পাল মহাশয়ের কন্যার প্রতি কটাক্ষ কর? তবে আশা এই যে, নিয়োগী মহাশয়ের পুত্র বোধ হয় এ যাত্রা রক্ষা পাইবে না। সে যাহা হউক, আমি সেই পীড়িত যুবকের নিকট মাঝে মাঝে বসিয়া তাহার সহিত গল্প করিতাম। গল্পচ্ছলে পাল মহাশয়ের কথা, তাঁহার পরিবারের কথা, তাঁহার কন্যার কথা জিজ্ঞাসা করিতাম। নিয়োগী-পুত্র ভাল করিয়া আমাকে পরিচয় প্রদান করিত না। কথার ছলে আমার সন্দেহ হইল যে, পাল মহাশয়ের সংসারে কোনরূপ একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। সে কথা সাধারণের নিকট প্রকাশ করিবার নহে। ইতিপূর্বে বন্ধু-বান্ধব ও কুটুম্বদিগের দ্বারা আমি পাল মহাশয়ের বংশ-পরিচয় গ্রহণ করিয়াছিলাম। সেই সময় কে এক জন আমাকে বলিয়াছিল যে, পাল মহাশয়ের এক পুত্র আছে। সে পুত্র এখন কোথায়? সে কথার কোন সন্ধান আমি পাইলাম না। নিয়োগীপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলে, সে আমাব উপর রাগিয়া উঠে।

তৃতীয় অধ্যায় – রাক্ষস না ভূত

এইরূপে কিছুদিন গত হইল। পাল মহাশয়ের সহিত আমার পরিচয় হইল না। ভট্টাচার্য মহশয়ের সহিত সর্বদা আমি সাক্ষাৎ করিতাম। তিনি বলিতেন,—'ব্যস্ত হইও না। নিয়োগীপুত্রের জীবনের আশা থাকিতে তোমার কোন আশা নাই। অপেক্ষা করদেখা যাউক, কি হয়।'

আমাদের বাটীর সম্মুখে রাস্তার অপর পারে একখানি দোকান আছে। একদিন রবিবার বৈকাল বেলা দেখিলাম যে, পাল মহাশয় সেই দোকানে বসিয়া আছেন। তাঁহার মুখ সেইরূপ বিষণ্ণ ও চিন্তায় আচ্ছন্ন। একখানি পুস্তক তিনি পাঠ করিতে ছিলেন ও কদাচ কখন কখন এক একবার মুখ তুলিয়া কাহারও সহিত দুই একটি কথা কহিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমি দোকানে প্রবেশ করিয়া যে তক্তপোষের উপর তিনি বসিয়াছিলেন, তাহার এক পার্শ্বে উপবেশন করিলাম। কোন দ্রব্য আমার প্রয়োজন আছে কি না, মুদি আমাকে জিজ্ঞাসা করিল। আমি বলিলাম,—'না'। তক্তপোষের উপর আরও তিন ব্যক্তি বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন। পাল মহাশয়ের ন্যায় তাঁহারাও প্রবীন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ আমাকে কোন কথা বলিলেন না। পাল মহাশয় পুস্তক হইতে মুখ তুলিয়া আমার দিকে একবার চাহিয়াও দেখিলেন না। আমি যুবক; সামান্য একটা ছোঁড়া বলিলেও হয়; আর তাঁহারা সকলেই প্রবীণ। তাঁহাদের সহিত প্রথম কথা কহিতে আমি সাহস করিলাম না। তাঁহারা, প্রথম আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবেন, সেই প্রত্যাশায় অনেকক্ষণ পর্যন্ত বসিয়া

রহিলাম; কিন্তু আমার সহিত কেহ একটিও কথা কহিলেন না। নিরাশ হইয়া সে স্থান হইতে আমি প্রস্থান করিলাম। কিন্তু পাল মহাশয় এক মনে কি পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন, তাহা দেখিয়াছিলাম। তিনি কালীসিঙ্গীর মহাভারতের শান্তি পর্ব পাঠ করিতেছিলেন।

সেই দিনই আমি সেই পুস্তক ক্রয় করিলাম; আর সেই রাত্রি হইতে তাহা উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতে লাগিলাম। ভিতর-বাটীতে পাল মহাশয়ের ঘর, আর বাহির-বাটীতে আমার ঘর, দুইয়ের মাঝখানে কেবল একটি প্রাচীর ব্যবধান ছিল। আমি মনে করিলাম যে, আমার মহাভারত পাঠের শব্দ প্রাচীর পার হইয়া, পাল মহাশয়ের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবে। তাহা হইলে আমার প্রতি তাহার শ্রদ্ধা হইবে। কিন্তু ঠিক বিপরীত ফল হইল। আমার সম্মুখে বারেণ্ডা আছে; আর সেই বারেণ্ডার উত্তর-সীমা। বাটীর ভিতর যাইবার জন্য দ্বার আছে। সেই দ্বার সর্বদা বন্ধ থাকে। একদিন রাত্রিকালে আমি যথারীতি উচ্চঃস্বরে মহাভারত পাঠ করিতেছি, এমন সময় বাটীর ভিতর দিক্ হইতে দ্বারে কে ধাক্কা মারিতে লাগিল। মহাভারত পাঠে আমার মন তখন নিমগ্ন ছিল, সুতরাং সে শব্দ প্রথম আমি শুনিতে পাই নাই। ক্রমে ধাক্কার শব্দ বৃদ্ধি হইয়া যখন আমার কণ্ঠ-শব্দকে পরাজয় করিল, তখন সে শব্দ আমি শুনিতে পাইলাম।

তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া সেই দ্বারের নিকট গিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কে গা! কে শব্দ করিতেছ!' ভিতর হইতে পাল মহাশয় উত্তর করিলেন,—'একটু ধীরে ধীরে যদি বাপু তুমি পুস্তক পাঠ কর, তাহা হইলে এ বাড়ীতে আমি তিষ্ঠিতে পারি, তা না হইলে আমাকে অন্যত্র পলায়ন করিতে হইবে।'

ঘোরতর অপ্রতিভ হইয়া আস্তে আস্তে পড়িবার নিমিত্ত আমি তাঁহার নিকট অঙ্গীকার করিলাম। অঙ্গীকার করিয়া সে রাত্রিতে যখন লজ্জায় ও ঘৃণায় অভিভূত হইয়া পুনরায় আমি আমার ঘরে প্রবেশ করিলাম, তখন যদি আপনারা আমাকে দেখিতেন, তাহা হইলে এই মদনের বদনে আপনারা বিন্দুমাত্রও হাসি পাইতেন না। রাগ করিয়া আমি মহাভারত দূরে নিক্ষেপ করিলাম। সেই দিন হইতে আর সে পুস্তক আমি স্পর্শ করিলাম না।

পাল মহাশয়ের সহিত আমার আলাপ-পরিচয় হইল না! বরং মহাভারত পাঠের নিমিত্ত তাঁহার নিকট আমি লাঞ্ছিত হইলাম। গোঁফ ছাটা নিয়োগী মহাশয় বক্ষঃস্থল স্ফীত করিয়া দম্ভের সহিত বিচরণ করেন। তাঁহাকে দেখিলে আমার সর্বশরীর জ্বলিয়া যায়। ডাক্তারগণ আসিয়া তাঁহার পুত্রকে পনর দিনের মধ্যে ভাল করিয়া দিবেন বলিয়া আস্ফালন করে। কিন্তু তাহার কাসি যায় না, জ্বরও কমে না, শরীরে সে বলও পায় না। ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাকে ক্রমাগত আশ্বাস প্রদান করেন। তাঁহার কৃপা আমি কখনও ভুলিতে পারিব না। এই ভাবে আরও কিছুদিন কাটিয়া গেল।

ক্রমে চৈত্র মাস পড়িল। তখন নূতন গ্রীষ্ম পড়িয়াছে। রাত্রিতে সহসা আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তাহার পর পুনরায় নিদ্রা যাইবার নিমিত্ত অনেকক্ষণ চেষ্টা করিলাম; কিছুতেই আর নিদ্রার আবেশ হইল না। শয্যা হইতে উঠিয়া আমি আলো জ্বালাইয়া ঘড়িতে দেখিলাম যে,

একটা বাজিয়া গিয়াছে। আমার পশ্চিম দিকে দুইটি জানালা ছিল। তাহার একটি জানালা খুলিয়া দাঁড়াইলাম। আমার ঘরের নিম্নেই গলি পথ। গলির ভিতর পাল মহাশয়ের নিচে দূরে একটি গ্যাসের আলো। গলির ওপারে অন্যান্য লোকের বাড়ী। আমরা যে বাটীতে থাকি, তাহার উত্তরে একটি অশ্বত্থ গাছ ছিল। তাহার নিম্নে যষ্ঠী ঠাকুরের অনেকগুলি নোড়া-নুড়ি ছিল। সেই অশ্বত্থ গাছের ডাল, পাল মহাশয়ের তিনটি ঘরের মধ্যে দুইটি ঘরের ঠিক গায়ে লগিয়াছিল।

জানালার দিকে দাঁড়াইয়া সহসা আমার সেই গাছের দিকে একবার দৃষ্টি পড়িল। সর্বনাশ! সেই গাছের উপর, নিবিড় শাখা-প্রশাখা ও পত্রের ভিতর হইতে বাহির হইয়া, কি একটা জন্তুর মত সেই স্থূল ডালটির উপর আসিয়া বসিল। তাহার পর ধীরে ধীরে সেই বৃক্ষ-শাখার উপর দিয়া সে পাল মহাশয়ের দ্বিতীয় ঘরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। একটু দূরে গ্যাসের আলোক ছিল, তাই আমি তাহাকে দেখিতে পাইলাম; নতুবা সে অন্ধকার রাত্রিতে আমি তাহাকে দেখিতে পাইতাম না। যখন সে আরও অগ্রসর হইল, তখন আমি দেখিলাম যে, সে কোন রূপ জন্তু নহে। তাহার আকৃতি কতকটা মানুষের মতো। মানুষের মত বটে; অথচ তাহাকে মানুষ বলিয়া আমার বোধ হইল না। ঘোড়ার মত তাহার মুখ লম্বা ছিল। মুখের বর্ণ সবুজ। বন্য শুকরের ন্যায় বড় বড় দাঁত। যে স্থানে চক্ষু থাকে, তাহার সেই স্থানে গোল গোল দুইটি গর্ত ছিল। শরীরের নিম্নভাগ মানুষের মত ছিল। কিন্তু সে যখন মানুষ নহে, ভূতও নহে। আমি ভাবিলাম যে, যখন ইহার সবুজ কপালের উপর রক্তচন্দনের দীর্ঘ ফোঁটা রহিয়াছে, তখন এ নিশ্চয়ই রাক্ষস। আর, তাহার কি দাড়ি! ঘোর কৃষ্ণবর্ণের এমন চাঁপদাড়ি তো কখনও দেখি নাই! গোঁফে ও দাড়িতে তাহার সবুজ মুখ স্তম্ভিত হইয়া আমি আর জানালা বন্ধ করিয়া দিতে পারিলাম না, সে স্থান হইতে পালাতেও পারিলাম না, কি চিৎকার করিতে ও পারিলাম না!

আরও অদ্ভুত কথা। সেই রাক্ষসটা ক্রমে অগ্রসর হইয়া পাল মহাশয়ের দ্বিতীয় অর্থাৎ মাঝের ঘরের জানালার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পর সেই জানালাতে সে অঙ্গুলি দ্বারা টোকা মারিয়া ইঙ্গিত করিতে লাগিল। এইরূপ কিছুক্ষণ অতি ধীরে ধীরে জানালায় শব্দ করিবার পর ভিতর হইতে কে জানালা উদঘাটন করিল, গ্যাসের আলোকে নিমিষের নিমিত্ত আমি তাহার হস্তটি দেখিতে পাইলাম। সেই হাতে সোনার বালা ছিল। মৃণাল সদৃশ সেই কোমল বাহু, —পাল মহাশয়ের বয়স্কা গৃহিণীর নহে, সে হস্ত তাঁহার কন্যার। সবুজ রাক্ষসের সহিত পাল মহাশয়ের কন্যার সম্বন্ধ!

চতুর্থ অধ্যায় – সবুজ রাক্ষস

জানালার ধারে অশ্বত্থ ডালের উপর রাক্ষস বসিয়া রহিল। তাহার আকৃতি দেখিয়া আমার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গেল। ভয়ে আমি কাঁপিতে লাগিলাম। চিন্তা-শক্তি একেবারে আমার লোপ পাইয়া গেল। একদৃষ্টে আমি তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম।

পাল মহাশয়ের কন্যা প্রথম জানালাটি উদঘাটন করিল। তাহার পর আমি শব্দে

বুঝিলাম যে, জানালার দুটি রেল খুলিয়া সে ভিতর দিকে টানিয়া লইল। রেল তুলিয়া রাক্ষসের জন্য সে পথ করিয়া দিল। রাক্ষস জানালা দিয়া, ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল।

রাক্ষস যেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল, আর সেই সময়ে আমার একটু জ্ঞানের উদয় হইল। তাড়াতাড়ি আমি আমার জানালাটি বন্ধ করিয়া দিলাম। জানালা বন্ধ করিয়া আরও আমার একটু সাহস হইল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আর একটি ভয়ের বিষয় আমার মনে উদয় হইল। আমার ঘরের পর পাল মহাশয়ের ঘর; তাহার পর যে ঘর, সেই ঘরে রাক্ষস প্রবেশ করিয়াছে। দূর অধিক নহে, ভিতর ও বাহির-বাটীর মাঝখানে বারেণ্ডায় সেই একমাত্র দ্বার। সেই পথে আসিয়া রাক্ষস যদি আমাকে খাইয়া যায়? পাল মহাশয়ের কন্যার সহিত তাহার প্রণয়, কারণ, তাহার ইঙ্গিত-শব্দ শ্রবণ মাত্র জানালা খুলিয়া রেল তুলিয়া, কত কষ্ট করিয়া, তাহাকে সে ঘরে আসিতে দিয়াছে। নিজের প্রণয়িনীকে সে ভক্ষণ করিবে না। প্রণয়িনীর পিতাকেতাকে ও সে ভক্ষণ করিবে না। থাকিবার মধ্যে নিকটে আছি আমি। যদি সে বলিয়া বসে যে, আমার ক্ষুধা পাইয়াছে, কিছু জলযোগ করিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছে, আর তাহাকে পরিতুষ্ঠ করিবার নিমিত্ত যদি পাল মহাশয়ের কন্যা আমাকে দেখাইয়া দেয়, তাহা হইলে আমি কি করিব?

বিবাহের লোভে কেন যে মরিতে এ স্থানে আসিয়াছিলাম। একবার মনে করিলাম যে, সে বাটী হইতে পলায়ন করি। আর একবার মনে করিলাম যে, চীৎকার করিয়া পাঁচ জনকে আহ্বান করি। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলাম যে, কাজ নাই বাপু! আর দ্বার খুলিবার শব্দ পাইয়া রাক্ষস চাই কি কূপিত হইতে পারে। রাক্ষসের কোপে পড়িয়া শেষে কি প্রাণটা হারাইব আজ হয়, দুই দিন পরে হয়, সুবিধা পাইলেই সে আমাকে খাইয়া ফেলিবে।

এইরূপ চিন্তা করিয়া বিছানায় আমি শুইয়া পড়িলাম। শয়ন করিয়া পাল মহাশয়ের কন্যাব কথা ভাবিতে লাগিলাম। এই বালিকা বয়সে রাক্ষসের সহিত প্রণয়! ছি! ভাল কন্যাকে বিবাহ করিতে আমার মন-প্রাণ এত অ্যাকুল হইয়াছিল। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রায় আমি অভিভূত হইয়া পড়িলাম। ইহার পর কি হইল, আর আমি কিছুই জানি না।

পরদিন প্রাতঃকালে, দিনের আলোকে আমার অনেকটা সাহস হইল। গত রাত্রির ঘটনা বার বার চিন্তা করিতে লাগিলাম। একবার মনে করিলাম, সে সমুদয় মিথ্যা, স্বপ্ন মাত্র। কিন্তু ভালরূপে অনুধাবন করিয়া অবশেষে স্থির করিলাম যে, না, সে স্বপ্ন নহে; সত্য সত্যই আমি এক অপূর্ব জীব দর্শন করিয়াছিলাম; সে জীব রাক্ষস হউক, আর ভূত হউক, আর যাহাই হউক। গত রাত্রিতে মনে করিয়াছিলাম যে, এ বাটীতে আর থাকিব না, অন্য স্থানে গিয়া বাসা করিব। কিন্তু প্রাতঃকালে সে কল্পনা পরিত্যাগ করিলাম। মনে করিলাম যে, ইহার সবিশেষ তত্ত্ব আমাকে লইতে হইবে।

পাল মহাশয়ের বালিকা কন্যা যে সেই কিম্ভূতকিমাকার সবুজ রাক্ষসের প্রেমে আবদ্ধ হইয়াছে, এ কথা বিশ্বাস করিতে আমার প্রবৃত্তি হইল না। তাহা ব্যতীত সহসা বাটী পরিত্যাগ করিয়া অন্য বাটীতে বাসা করিলে পাছে রাক্ষসের কোপে আমি পতিত হই, সে আশঙ্কাও আমার মন হইতে দূর হয় নাই।

আমি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ঘরে গমন করিলাম। তাঁহাকে একেলা পাইয়া গত রাত্রির সমস্ত বিবরণ তাঁহার নিকট বর্ণনা করিলাম। তাঁহার ঘরের ভিতর দাঁড়াইয়া, তাঁহাকে আমি এই বিবরণ প্রদান করিতেছিলাম। আমার কথা প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময় ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাকে চক্ষু টিপিলেন। তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আমি ঘরের দ্বারের নিকট একটু অন্তরালে দাঁড়াইয়া গোঁপ-ছাটা নিয়োগী সমুদয় কথা শুনিতেছে। আমি যেই ফিরিয়া চাহিলাম, আর তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে সে প্রস্থান করিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন,—"নিয়োগী ভাল মানুষ নহে। পাল মহাশয়ের এ বন্ধু, কটুম্ব ও শ্ববৈবাহিক। তোমার কথা এ শুনিয়া ফেলিল। কাজটা বড় ভাল হইল না!"

তাহার পর ভট্টাচার্য্য মহাশয় পুনরায় বলিলেন,—'বড়ই আশ্চর্য্য কথা তুমি বলিলে। যাহা বলিলে, তাহা সত্য কি স্বপ্ন, আমি বুঝিতে পারিতেছি না। কিন্তু যখন তাহার বড় বড় দাঁত, চক্ষু স্থানে কেবল কোটর, রং সবুজ, আর কপালে লাল ফোঁটা, তখন সে নিশ্চয় রাক্ষস, সামান্য ভূত নহে। আমাদের গ্রামের নিকট একবার এইরূপ একটা রাক্ষস আসিয়াছিল।'

পঞ্চম অধ্যায় – হারাণ সুরের গল্প

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'কি হইয়াছিল?'

ভট্টাচার্য্য মহাশয় উত্তর করিলেন,—'সে তোমাদের জাতি। তাহার নাম ছিল হারাণ সুর। লোকালয় হইতে কিছু দূরে গ্রামের প্রান্ত ভাগে মাঠের ধারে হারাণ সুর আপনার স্ত্রী ও দুইটি শিশু -পুত্র লইয়া বাস করিত। হারাণ সুরের পীড়া হইল কিছু দিন পীড়া ভোগ করিয়া এক দিন রাত্রিতে তাহার মৃত্যু হইল। শিশু দুইটিকে ছাড়িয়া লোক ডাকিবার নিমিত্ত, তাহার স্ত্রী সে রাত্রি বাহির হইতে সাহস করিল না। শিশু দুইটিকে লইয়া স্বতন্ত্র একটি শয্যাতে শয়ন করিয়া, সে কাঁদিতে লাগিল। যখন ঘোর রাত্রি হইল, তখন কে এক জন বাহিরে আসিয়া ঘরের আগড় ঠেলিতে লাগিল,—'মাসি!' আগড় খুলিয়া দাও।' হারাণের স্ত্রী মনে করিল যে, আমার বোন্‌পো তো কেহ নাই; এ ঘোর রাত্রিতে বিপদের সময় কে আসিয়া ডাকাডাকি করে। সে জন্য প্রথম উত্তর দিল না। কিন্তু বাহিরের সে ব্যক্তি পুনরায় সবলে আগড় ঠেলিয়া বলিল,—'শীঘ্র দ্বার খুলিয়া দাও, মাসি! মেসো মহাশয়ের পীড়ার কথা শুনিয়া আমি আসিয়াছি। শীঘ্র আগড় খুলিয়া দাও।"—হারাণের স্ত্রী ভাবিল যে,—দূরসম্পর্কীয় তাহার কোন ভগিনী থাকিতে পারে। কর্ত্তা হয় তো তাহার পুত্রের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন। সে জন্য সে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এইরূপ মনে করিয়া চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে শয্যা হইতে উঠিয়া আগড় খুলিয়া দিল। সেই মুহূর্ত্তে ভয়ঙ্কর এক মূর্ত্তি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। ঘরে মিট্ মিট্ করিয়া একটি প্রদীপ জ্বলিতেছিল। সে আলোকে হারাণের পত্নী সেই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিতে পাইল। তাহার বর্ণ সবুজ, তাহার মুখ ও পেট যেন একটি জ্বালা। তাহারও কপালে ফোঁটা ছিল! সেই জন্য আমার বোধ হয় যে তুমি কাল রাত্রিতে যাহাকে দেখিয়াছিলে, সেও রাক্ষস—ভূত নহে। কারণ ভূতে ফোঁটা

কাটে না। আর তাহাদের রং সবুজ হয় না।'

এত দূর বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় চুপ করিলেন। অতি আগ্রহের সহিত আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"হারাণ সুরের ঘরে তাহার পর রাক্ষস কি করিল?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন,—'সেই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিয়া, হারাণ সুরের পত্নীর প্রাণ উড়িয়া গেল! তাড়াতাড়ি সে ছেলে দুইটির নিকটে গিয়া তাহাদের মাঝখানে শয়ন করিল। ভাগ্যে শীতকাল; সে জন্য বিছানায় বড় একখানি কাঁথা ছিল। সেই কাঁথা দিয়া ছেলে দুইটিকে সে ঢাকা দিল! নিজেও কাঁথা মুড়ি দিয়া কাঁপিতে লাগিল।

'রাক্ষস কিন্তু তাহাদিগকে কিছু বলিল না। ঘরের অপর পার্শ্বে যে স্থানে একটি মাদুরের উপর হারাণ সুরের মৃতদেহ পড়িয়া ছিল, রাক্ষস বরাবর সেই স্থানে গিয়া মাদুরের উপর উপবেশন করিল। তাহার পর, মড়াৎ করিয়া হারাণের একটি হাত ভাঙ্গিয়া সেইরূপে ভক্ষণ করিল। হাত দুইটি শেষ হইলে একটি পা ভাঙ্গিয়া খাইতে লাগিল। সেই শব্দে শিশুর নিদ্রাভঙ্গ হইল। গা টিপিয়া মাতা তাহাদিগকে কাঁদিতে নিষেধ করিল। কাঁদিবে কি চীৎকার করিবে কি, তোমার মত তাহারাও ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল। ভয়ে জড়সড় হইয়া কাঁথার ফাঁক দিয়া তিন জনে এই ভীষণ ও বীভৎস ব্যাপার দর্শন করিতে লাগিল। ইহার পেটটি যেরূপ জালার মত দেখিতেছি, তাহাতে একটি দেহ খাইয়া ইহার পেট ভরিবে না। তখন আমাদের তিন জনকেই হয় তো খাইয়া ফেলিবে। নিজের যাহা হউক, শিশু দুইটিকে যে সে ভক্ষণ করিবে, প্রাণ থাকিতে তাহা তো আমি দেখিতে পারিব না। এইরূপ চিন্তা করিয়া হারাণের স্ত্রী গা টিপিয়া শিশু দুইটিকে উঠিয়া বসিতে ইঙ্গিত করিল। তাহারা উঠিয়া বসিল। তখন সে ছেলে দুইটির হাত ধরিয়া ঘর হইতে পলায়ন করিতে চেষ্টা করিল। আগড়ের নিকট গিয়া উপস্থিত হইয়াছে, এমন সময় রাক্ষসের দৃষ্টি তাহাদের উপর পড়িল। চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ করিয়া, দন্ত কড়মড় করিয়া অতি কর্কশ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—'কোথা যাস?'—'হারাণের পত্নী সভয়ে অতি বিনীত ভাবে উত্তর করিল,—'কোথাও যাই নি, বাবা! ছেলে দুইটি এখনি বিছানা ভিজাইয়া দিবে, সে জন্য তাহাদিগকে একবার বাহিরে লইয়া যাইতেছি।'—রাক্ষস বলিল,—'শীঘ্র আসিস! হারাণের পত্নী বলিল,—'হাঁ, বাবা, শীঘ্র আসিব।'—এই কথা বলিয়া আগড় খুলিয়া ছেলে দুইটিকে লইয়া, সে ঘর হইতে বাহির হইল। উর্দ্ধশ্বাসে তিন জনে গ্রামের ভিতর সকল বিবরণ প্রকাশ করিল। কিন্তু সে রাত্রিতে রাক্ষসের সম্মুখে যাইতে কেহই সাহস করিল না। পরদিন প্রাতঃকালে অনেক লোক একত্র হইয়া লাঠি সোঁঠা লইয়া হারাণের গৃহে গিয়া দেখিল যে, সে রাক্ষস নাই, হারাণের দেহও নাই, কেবল দুই চারিখানি অতি ক্ষুদ্র হাড়ের কুচি ঘরের ভিতর মাদুরের উপর পড়িয়া আছে। সমুদয় দেহটি ভক্ষণ করিয়া, রাক্ষস প্রস্থান করিয়াছে।'

ষষ্ঠ অধ্যায় – পত্রের অর্থ

এই গল্প শুনিয়া আমার বড় ভয় হইল। আমি বলিলাম,—'ভট্টাচার্য্য মহাশয়! আর আমি এ বাটীতে থাকিব না। গত রাত্রিতে রাক্ষসের বোধ হয় ক্ষুধা ছিল না, তাই আমার

প্রাণ বাঁচিয়া গিয়াছে। কিন্তু এবার যে দিন সে আসিবে, সে দিন যদি তাহার ক্ষুধা থাকে, তাহা হইলে কি হইবে? নিকটে পাইয়া নিশ্চয় সে আমাকেই খাইবে। অতএব অদ্যই আমি এ বাসা হইতে উঠিয়া যাইব। প্রাণটা থাকিলে অনেক কন্যা জুটিবে, অনেক বিবাহ হইবে। পাল মহাশয়ের কন্যায় আর আমার প্রয়োজন নাই।'

ভট্টাচার্য্য মহাশয় হাসিয়া উত্তর করিলেন,—'তুমি ইংরেজী পড়িয়াছ। ইংরেজী পড়িয়া ভূত প্রেত রাক্ষসে এত তোমার ভয় কেন? এ কলিকাতা সহর। আমি অনেক দিন কলিকাতায় আছি এ স্থানে কখনও রাক্ষসের উপদ্রব হইতে শুনি নাই। কলিকাতা সহরে একটি মানুষকে কখন রাক্ষসে খায় নাই। তোমার কোন ভয় নাই। ব্যস্ত হইও না। দেখ না কি হয়! রাত্রিতে একটু সতর্ক থাকিবে। রাক্ষস যদি পুনরায় আগমন করে, তাহা হইলে আমাকে বলিবে। আজ আমি তোমাকে রাম-কবচ লিখিয়া দিব। তাহা ধারণ করিলে, আর তোমার কোন ভয় থাকিবে না।'

রাম-কবচ ধারণ করিয়া আমার ভয় দূর হইল। সে বাসা পরিত্যাগ করিয়া, অন্য স্থানে আমি আর গমন করিলাম না। তাহার পর দুই রাত্রি আমি একটা পর্য্যন্ত জাগিয়া রহিলাম। মাঝে মাঝে জানালা খুলিয়া, অশ্বত্থ গাছের দিকে দেখিতে লাগিলাম। কিন্তু আর বাক্ষস দেখিতে পাইলাম না। তৃতীয় দিনে আফিস হইতে আসিয়া বারেণ্ডায় দাঁড়াইয়া আমার ঘরের তালা খুলিতেছি, এমন সময় বাড়ীর ভিতর যাইবার যে দ্বার সর্বদা বন্ধ থাকে, পাল মহাশয়ের দিক্ হইতে সে দ্বারে কে ধাক্কা মারিল, আর তৎক্ষণাৎ কপাটের ফাঁক দিয়া আমার দিকে কে এক খণ্ড কাগজ ফেলিয়া দিল। তাড়াতাড়ি আমি কাগজখানি কুড়াইয়া লইলাম। তাহার পর ঘরের ভিতর গিয়া, তক্তপোষের উপর বসিয়া, তাহা আমি পাঠ করিলাম। কাগজখানিতে এইরূপ লেখা ছিল,—

'মহাশয়! আমাদের বিষয়ে আপনি লোককে কোন কথা বলিয়াছেন। লোকের কাছে এরূপ গল্প করিলে আমাদের মন্দ হইবে। এরূপ গল্প আর করিবেন না। আমাদের এই উপকার করিবেন।'' —কাগজখানিতে কাহারও নাম স্বাক্ষর ছিল না। কিন্তু হাতের লেখা নিতান্ত কাঁচা তাহা দেখিয়া আমি বুঝিলাম যে, এ লেখা পাল মহাশয়ের কন্যার। তাহার পত্র পাইয়া আমি রাক্ষসের কথা সব ভুলিয়া যাইলাম। কাগজে লেখা আছে,—'আমাদের এই উপকার করিবেন।' ইহার অর্থ কি? পাল মহাশয়ের কন্যা দ্বারের ফাঁক দিয়া আমাকে দেখিয়া থাকিবে। আমার রূপ দেখিয়া সে মোহিত হইয়াছে, আমার উপরে সে মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছে। ঐ চারিটি কথার ইহা ভিন্ন অন্য অর্থ হইতে পারে না। উপকার! আমাকে ভালবাসে, আমাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত আছে, অন্যে তাহা বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু আমাদের দুই জনের মন-প্রাণ এক হইয়া গিয়াছে, সে জন্য তাহার মনের ভাব আমি অনায়াসেই বুঝিতে পারিলাম।

পুলকে পুলকিত হইয়া কাগজখানি আমি একবার মাথায় রাখিলাম। তাহার অর্থ এই যে, 'হে সুন্দরি! তোমার আজ্ঞা আমি শিরোধার্য্য করিলাম।' তার পর তক্তপোষের উপর

শয়ন করিয়া কাগজখানি আমি বুকের উপর রাখিলাম। তাহার অর্থ যে, 'হে বরাননে! তোমার পত্র স্পর্শে আমার উত্তাপিত হৃৎপিণ্ড সুশীতল হইল।'

সাধে কি পিতা-মাতা আমার নাম মদন রাখিয়াছেন! না হইলে এত ভাবুক আর কেহ হইতে পারে না। কিন্তু এমন সুখের পোড়া রাক্ষসের কথা পুনরায় আমার মনে পড়িল। যাহার পায়ে আমি প্রাণ সঁপিয়াছি, কদাকার দুরন্ত রাক্ষসের সহিত তাহার যে ভাব, সেই চিন্তায় আমার হৃদয় জর জর হইল। তাহারপর যক্ষরক্ষ প্রভৃতি দেব-যোনি-ভুক্ত জীবগণ অন্তর্য্যামী হইয়া থাকে। আমার মনের কথা যদি সেই রাক্ষস জানিতে পারে? কুপিত হইয়া রাত্রিকালে আমার ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া যদি হারাণ সুরের ন্যায় কড়মড় করিয়া আমাকে ভক্ষণ করে? প্রাতঃকালে উঠিয়া সকলে যদি দেখে যে, মদনের আর চিহ্ন মাত্র নাই, বিছানার উপর কেবল মাত্র দুই তিন কুচি হাড় পড়িয়া আছে?

ভয়ের কথা বটে। কিন্তু চিরকাল হইতে আমি সাহসী পুরুষ; তাহাতে রাম-কবচ ধারণ করিয়াছি। নানারূপ প্রবোধ দিয়া মন হইতে আমি রাক্ষসকে দূর করিলাম। আমি ভাবিলাম যে, পাল মহাশয়ের কন্যার ন্যায় শান্ত সুশীলা রূপবতী গুণবতী কামিনী রাক্ষসের সহিত প্রণয় করিতে পারে না। তাহা যদি করিত, তাহা হইলে আমাকে ঘোরতর ভালবাসিয়া আমার নিকট উপকারের প্রার্থনা করিত না। প্রকৃত আমি রাক্ষস দেখি নাই, আমি স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। আর যদিও সে রাক্ষস হয়, তাহা হইলে পাল মহাশয়ের নিকট অন্য কোন কাজে সে আসিয়া থাকিবে। কলিকাতা সহরে জনাকীর্ণ পথে দিনের বেলা গাড়ী করিয়া অথবা পদব্রজে রাক্ষস আসিতে পারে না। সে জন্য রাত্রিকালে গোপন ভাবে আসিয়াছিল। শুনিয়াছি, যে সহরের ভিতর উট কি হাতী আসিবারও বোধ হয়, হুকুম নাই।

এইরপ নানাপ্রকার প্রবোধ দিয়া মন হইতে কুচিন্তা আমি দূর করিলাম। পালকন্যার কল্পিত মুখচন্দ্রের বিমল জ্যোতি দ্বারা আমার তাপিত হৃদয় আলোকিত ও স্নিগ্ধ করিতে লাগিলাম।

সপ্তম অধ্যায় – মদনের বদনে অম্বলের বড়ি

দুই দিন পরে অপরাহ্নে আফিস হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, আমি বাটীর ভিতর প্রবেশ করিতেছি, এমন সময় দ্বারের নিকট পাল মহাশয়ের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। তিনি বাহিরে যাইতেছিলেন, আমি ভিতরে প্রবেশ করিতেছিলাম। আমাকে দেখিয়া পাল মহাশয় দাঁড়াইলেন। তাহার পর, আমাকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আমার ঘরের পার্শ্বে তুমিই বাসা লইয়াছ?'

স্বয়ং পাল মহাশয় আমার সহিত কথা কহিলেন! হৃদয়-মন্দিরে যে দেবীকে স্থাপিত করিয়া অহরহঃ পূজা করি, সেই দেবীর পিতা আমাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। শরীর আমার শিহরিয়া উঠিল, মন আমার পুলকিত হইল, বুক আমার ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল। আমি ভাবিলাম,—'মদন! প্রাতঃকালে আজ কাহার মুখ তুমি দেখিয়াছিলে?

অতি বিনীত ভাবে আমি উত্তর করিলাম,—'আজ্ঞা হাঁ মহাশয়। আমিই আপনার ঘরের

পার্শ্বে বাস করি।'

পাল মহাশয় পুনরায় বলিলেন,—'তুমি অতি উত্তম মহাভারত পাঠ করিতে পার। তবে কি জান, দূর হইতে আমি বুঝিতে পারি না, কেবল শব্দ পাই, এই মাত্র। বৃথা শব্দ শুনিয়া কি হইবে, সেই জন্য ধীরে ধীরে পড়িতে বলিয়াছিলাম। সন্ধ্যার পর যদি তোমার অবকাশ থাকে, আর আমার ঘরে আসিয়া যদি তুমি পাঠ কর, তাহা হইলে আমি শ্রবণ করি। আগ্রহের সহিত আমি উত্তর করিলাম,—'সন্ধ্যার পর আমার কোন কাজ নাই। আপনি ডাকিলেই আমি আপনার ঘরে গিয়া মহাভারত পাঠ করিতে পারি।'

পাল মহাশয় বলিলেন যে,—'তবে আজ সন্ধ্যাবেলা আমি তোমাকে ডাকিব। এক ঘন্টাকাল তোমার নিকট আমি মহাভারত শ্রবণ করিব।'

সন্ধ্যার পর পাল মহাশয় সেই বারেণ্ডার দ্বারে ধাক্কা মারিয়া আমাকে ডাকিলেন। আমি তাঁহার ঘরে গিয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত মহাভারত পাঠ করিলাম। আমার কণ্ঠস্বর অতি মধুর, তাহার উপর আমি সুর করিয়া পড়িতে পারি। নিজে পাঠ করিয়া আমি নিজেই মোহিত হই; কিন্তু পাল মহাশয়ের বোধ হয়, সঙ্গীত-বিদ্যায় অধিকার নাই। তিনি বলিলেন,—'এ কাশীদাসী মহাভারত অথবা কৃত্তিবাসী রামায়ণ নহে। সুর করিয়া পড়িতে হইবে না, সহজ ভাষায় পাঠ কর।' যে আজ্ঞা, বলিয়া আমি তাহাই করিতে লাগিলাম।'

এইরূপ প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা আমি তাঁহার নিকট মহাভারত পাঠ করিতে লাগিলাম। তাঁহার সহিত আমার সদ্ভাব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রবিবারে নিমন্ত্রণ করিয়া, অতি আদরে তিনি আমাকে ভোজন করাইলেন।

প্রথম দুই চারি দিন আমি তাঁহার কন্যাকে দেখিতে পাই নাই। পাল মহাশয়ের গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাকে দেখিবার নিমিত্ত সতৃষ্ণনয়নে আমি চারিদিকে চাহিয়া থাকিতাম; তাহার মলের শব্দ অথবা কণ্ঠ-স্বর শুনিবার নিমিত্ত সতৃষ্ণ কর্ণে সর্বদাই আমি সতর্ক থাকিতাম; যে দিন আমার নিমন্ত্রণ হইয়াছিল সেই রবিবারে আমার বাসনা পূর্ণ হইল। এক জন ঠিকা ঝি ব্যতীত পাল মহাশয়ের অন্য দাস-দাসী ছিল না। প্রাতঃকালে দুই একঘন্টা,—অপরাহ্নে দুই এক ঘন্টা, কাজ করিয়া সে ঝি আপনার গৃহে চলিয়া যাইত। আমি ও পাল মহাশয় যখন ভোজন করিতে বসিলাম, ঝি তখন উপস্থিত ছিল না। আহার করিতে বসিয়া আমাদের যাহা কিছু প্রয়োজন হইল, সে সমুদয় পাল মহাশয়ের কন্যা আনিয়া দিল। সেই দিন তাহাকে দর্শন করিয়া আমার নয়ন সার্থক হইল।

নিশ্চয় নয়ন সার্থক হইল। তাহাকে দেখিলে কাহার না নয়ন সার্থক হয়? কেমন মাজা-মাজা উজ্জ্বল রং! কেমন নরম নরম গোল-গোল গায়ের গড়ন! চাঁদের মত মুখখানি বটে, কিন্তু চাঁদ যেরূপ চাকার ন্যায় গোল, সেরূপ গোল নহে। চাঁদের মুখে অলকা-তিলকা আছে, ইহার তাহা নাই। নাকটি শুক-চঞ্চু ন্যায় মত বটে, কিন্তু সেরূপ ড্যাব্-ডেবে নহে। বাহু দুইটি মৃণালের মত বটে, কিন্তু ততটা সরু নহে। উরুদ্বয় রাম-রম্ভাকে পরাজয় করে বটে, কিন্তু তত মোটা নহে। ফল কথা, কালিদাস, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি কবিদিগের রূপ-বর্ণনা

পাঠ করিয়া যেরূপ মুখশ্রী আমি মনে মনে কল্পনা করিয়া ছিলাম, তাহার কিছুই নহে। তাহার মুখ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঠিক মানুষের মত; কবি-কল্পিত কোনরূপ অলৌকিক অদ্ভুত জীবের ন্যায় নহে। তাহাকে দেখিয়া আপনাদের দাসানুদাস মদনের মুণ্ড ঘুরিয়া গেল। প্রথমে শাকের ঘন্টা না খাইয়া, প্রথমে অম্বলের বড়ি মদন বদনে দিয়া বসিলেন!

অষ্টম অধ্যায় – মেদো চাঁড়াল ও পঞ্চু বাবু

পাল মহাশয়ের সহিত এইরূপে আমার আলাপ পরিচয় হইল। দিন দিন তাঁহার সহিত আমার সদ্ভাব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহার কন্যার রূপে গুণে আমার মন মোহিত হইয়া গেল। কি করিয়া তাহাকে পাইব, কেবল সেই চিন্তায় আমি দিনপাত করিতে লাগিলাম। রাক্ষসকে আর আমি দেখিতে পাই নাই। সে রাত্রির ঘটনা স্বপ্নের ন্যায় মিথ্যা বলিয়া ক্রমে আমার প্রতীতি হইল।

কিছু দিন গত হইলে, পাল মহাশয়ের কন্যার সহিত আমার বিবাহের কথা উত্থাপন করিবার নিমিত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে আমি অনুরোধ করিলাম। তখন বৈশাখ মাস। ফল দিবার নিমিত্ত পাল মহাশয়ের গৃহিণী এক দিন ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বাটীর ভিতর ডাকিলেন। ফল গ্রহণ করিয়া, কিছুক্ষণের নিমিত্ত তিনি পাল মহাশয়ের নিকট বসিলেন। সেই অবসরে তিনি আমার বিবাহের কথা উত্থাপন করিলেন। পাল মহাশয়ের সহিত এ সম্বন্ধে যেরূপ কথাবার্তা হইয়াছিল, সেই দিন সন্ধ্যা বেলা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত তাঁহার এইরূপ কথাবার্তা হইয়াছিল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন,—'নিয়োগী মহাশয়ের পুত্রের পীড়া ক্রমেই কঠিন হইয়া উঠিতেছে। এ যাত্রা সে আর রক্ষা পাইবে না।'

পাল মহাশয় উত্তর করিলেন,—'হাঁ! পীড়া বড়ই কঠিন হইয়াছে।'

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন,—'আমি শুনিয়াছিলাম যে, আপনার কন্যার সহিত তাহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। এ যাত্রা সে রক্ষা পাইলেও, কাস রোগাক্রান্তে কন্যা-সম্প্রদান শাস্ত্রনিষিদ্ধ।' —পাল মহাশয় উত্তর করিলেন,—'আমি তাহা জানি। কিন্তু কি করিব! আমার কন্যা যখন ছয় মাসের, তখন হইতে নিয়োগীর সহিত আমার কথা হইয়াছে। তাহার এই ঘোর বিপদের সময় কোন কথা আমি বলিতে পারি না। নিয়োগীর সহিত বিবাদ করিতেও আমি ইচ্ছা করি না। নিয়োগী-পুত্রের শরীর দিন দিন যেরূপ শীর্ণ হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে অল্প দিনের মধ্যেই বোধ হয়, আমি আমার প্রতিজ্ঞা হইতে মুক্ত হইব। তবে সে কথা এখন আর বৃথা তুলিয়া প্রয়োজন কি?

ভট্টাচার্য্য মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,– কোথাও চেষ্টা করছেন না।

পাল মহাশয় উত্তর করিলেন,—চেষ্টা করিতেছি তবে মনের মত পাইতেছি না।'সেজন্য কোন স্থানে স্থির করিতে পারি নাই; তবে গোপনে অনুসন্ধান করিতেছি।'

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন,—'আপনার ঘরের নিকট মদনমোহন বলিয়া ঐ যে ছোকরা থাকে, তাহার সহিত দিলে হয় না? ছোকরা শান্ত, সচ্চরিত্র, লেখা-পড়া জানে, দু-

পয়সা উপার্জনও করিতেছে।'

পাল মহাশয় উত্তর করিলেন,—'কিছুতেই নয়! সে আমাদের স্বজাতি শুনিয়া আমিও প্রথম সেইরূপ ইচ্ছা করিয়াছিলাম। কিন্তু গোপনে তাহার সমুদয় সন্ধান লইয়া এখন সে ইচ্ছা আমাকে পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। আমরা০১ লেখা-পড়া-জানা চাক্‌রে ভদ্র সদ্‌গোপ। মদনের বাপ স্বহস্তে লাঙ্গল ধরিয়া চাষ করিত। অতি কষ্টে সে ছেলেটিকে লেখা-পড়া শিক্ষা দিয়াছে। চাষ করা যে নিতান্ত গর্হিত কাজ, লেখাপড়া শিখিয়া মদন তাহা বুঝিয়াছে। সে জন্য বাপকে এখন সে একখানি মুদিখানার দোকান করিয়া দিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়! পূর্বের কলঙ্ক ঘুচিবার নহে। আমি চাক্‌রে সদ্‌গোপ হইয়া, চাষী সদ্‌গোপের সহিত বিবাহ কি করিয়া দিব?'

ভট্টাচার্য্য মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'স্বহস্তে চাষ করা কি নিতান্ত অন্যায় কাজ?

পাল মহাশয় উত্তর করিলেন,—'আপনি নিজেই কেন বুঝিয়া দেখুন না? চাষ করিলে মানুষ চাষা হয়, আর চাকরীতে মানুষ বাবু হয়। তাহার যত টাকা থাকুক না কেন, আপনার কাছে চাষা আসিলে নাক সিট্‌কাইয়া আপনি তাহার সহিত কথা কহিবেন না। কিন্তু সেই জাতীয় কোন লোক যদি চাক্‌রে হয়, তাহা হইলে, 'আসুন, আসুন, বাবু আসুন' বলিয়া আপনি তাহাকে মাথায় করিয়া তুলিয়া লইবেন। কেবল আপনি নহেন, দেশের সকল লোকেই এইরূপ করিয়া থাকে। আমাদের গ্রামে দুই জন চাঁড়াল আছে—এক জনের নাম মাধব আর এক জনের নাম পঞ্চু। দুই জনে একসঙ্গে পাঠশালায় লিখিয়াছিল। আলু, আম ও পাটের চাষ করিয়া মাধব বিলক্ষণ দু-পয়সা সঙ্গতি করিয়াছে। কিন্তু সে নিজে হাতে কোদালি-কুঠারি ধরিয়া পরিশ্রম করে। সে জন্য সকলে তাহাকে মাধব না বলিয়া মেদো চাঁড়াল বলিত। এই জন্য হাড়ি বাগ্দী সকলেই আপন পুত্রদিগকে ইংরেজী শিক্ষা দিয়া, চাক্‌রে করিতে চেষ্টা করিতেছে। কাহার না ইচ্ছা যে, তাহার ছেলে জেন্টলম্যান হয়?'

ভট্টাচার্য্যা মহাশয় বলিলেন,—'সত্য বটে। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাঁহারা চিরকাল পুরুষ-পুরুষাণু-ক্রমে অধ্যাপক পণ্ডিতের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহারাও এক্ষণে পুত্রদিগকে ইংরেজী শিক্ষা দিয়া জেন্টলমান করিতেছেন।' —পাল মহাশয় বলিলেন,—'আমাদের মধ্যে যেরূপ ভদ্র সদ্‌গোপ ও চাষী সদ্‌গোপ আছে, আপনাদের মধ্যেও সেইরূপ ভদ্র ও চাষী ব্রাহ্মণ আছে। হলধারী ব্রাহ্মণদিগকে বাভন বলে; বেহার অঞ্চলে তাহারা বাস করে। ভাল ব্রাহ্মণগণ যেরূপ তাহাদের সহিত আদান-প্রদান করিতে পারে না, আমরাও সেইরূপ চাষী সদ্‌গোপকে কন্যা সম্প্রদান করিতে পারি না।'

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ঘরে বসিয়া, তাঁহার মুখ হইতে আমি এই সমুদয় বিবরণ শ্রবণ করিতেছিলাম। পাল মহাশয়ের কথা শুনিয়া আমি একেবারে বসিয়া পড়িলাম। সত্য বটে, আমার পিতা স্বহস্তে চাষ করিতেন। আর এ কথাও সত্য যে, চাষ ছাড়াইয়া আমি তাঁহাকে মুদিখানার দোকান করিয়া দিয়াছি। আমি মনে করিয়াছিলাম যে, চাষের কলঙ্ক দূর হইয়াছে; আমরা এক্ষণে বাবু হইয়াছি। কিন্তু পাল মহাশয় গোপনে গোপনে এত সন্ধান লইবেন, তাহা আমি কি করিয়া জানিব! যাহা হউক, তাঁহার কন্যাকে লাভ করা সম্বন্ধে আমি এক্ষণে

হতাশ হইয়া পড়িলাম।

কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন,—'তুমি হতাশ হইও না,শাস্ত্র হইতে বচন করিয়া পাল মহাশয়কেবুঝাইয়া দিব যে, সকল সদ্‌গোপ একজাতি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'শাস্ত্র হইতে এরূপ বচন বাহির করিতে পারিবেন?'

ঈষৎ হাসিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় উত্তর করিতেলন,—'আমাদের শাস্ত্র মহাসাগর স্বরূপ। এমন জিনিস নাই যা ইহার ভিতর হইতে বাহির হয় না।'

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বৃদ্ধাঙ্গুলি ও মধ্যমা নাড়িয়া ইঙ্গিত করিলেন। তাহার অর্থ এই যে, সব টাকার খেলা! টাকা দিলে শাস্ত্রের ভিতর হইতে যাহা ইচ্ছা তাহাই বাহির করিয়া দিতে পারা যায়।

এই সময় বাহিরে একটু কাসির শব্দ হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় কিছু চমকিত হইয়া বলিলেন,—'এঃ! গোঁপছাঁটা নিয়োগী আড়ালে দাঁড়াইয়া, আমাদের কথা শুনিতেছে।'

এই কথা বলিতে বলিতে নিয়োগী মহাশয় আসিয়া দ্বারের নিকট দাঁড়াইলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন—'কি ঠাকুর! সকল সদ্‌গোপ একজাতি? তাহাদের মধ্যে ইতর-ভদ্র নাই?' —ভট্টাচার্য্য মহাশয় উত্তর করিলেন,—'হাঁ! আমার মত তাই। সকল সদ্‌গোপ একজাতি। চাষ ছাড়িয়া দিলেও সে সদ্‌গোপ থাকে, অন্য জাতি হয় না। তাহা ব্যতীত তোমরা সকলেই ব্রহ্মার পা হইতে বাহির হইয়াছে।

নিয়োগী বলিলেন,—'আমরা ব্রহ্মার পা হইতে বাহির হইয়াছি? আর তোমরা?

ভট্টাচার্য্য মহাশয় উত্তর করিলেন,—'আমরা ব্রহ্মার মুখ হইতে বাহির হইয়াছি।'

এই কথা শুনিয়া নিয়োগী মহাশয় রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন। আমাকে লক্ষ্য করিয়া অন্যান্য জাতি বিষয়ে তিনি নানারূপ প্রশ্ন করিলেন। যথাসাধ্য আমি সেই সমুদয় তর্কের উত্তর দিলাম। অবশেষে যখন দেখিলাম যে, তাঁহার ক্রোধ ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে ও তিনি অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করিতেছেন, তখন সে স্থান হইতে আমি চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলাম। যাইবার সময় নিয়োগী আমাকে বলিলেন,—'পালের কন্যাকে তুমি বিবাহ করিবে! বামন হইয়া চাঁদে হাত! পাল অন্য স্থানে বর খুঁজিতেছে! বটে। তোমার পালকেও আমি দেখিয়া লইব। রাত্রিতে জানালা দিয়া ঘরে রাক্ষস আসে! বটে! পালকে বলিও যে, রাক্ষসের উপর খোক্কোশ আছে।'

নবম অধ্যায় – আবার সেই সবুজ রাক্ষস

এই কথা বলিয়া নিয়োগী সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল। আমিও আমার ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িলাম। মনোদুঃখে সে রাত্রিতে আমি আর আহার করিলাম না। সে রাত্রি পাল মহাশয়ের নিকট মহাভারত পাঠ করিতেও যাইলাম না। ফল কথা, সেই দিন হইতে মহাভারত পাঠে আমার অরুচি জন্মিয়া গেল। পাল মহাশয়ের সহিত কথাবার্তা,—'তাঁহার গৃহে যাতায়াতও সেই দিন হইতে আমার অনেক কমিয়া গেল।

এইরূপে কিছুদিন গত হইল। একদিন রাত্রিকালে আমি শয়ন করিয়া আছি। অঘোর

নিদ্রায় আমি অভিভূত আছি। বাহির বাটীতে আমার ঘর, আর ভিতর-বাটীতে পাল মহাশয়ের ঘর,—এই দুই ঘরের মাঝখানে যে দেয়াল, সেই দেয়ালের ঠিক গায়ে আমার বিছানা ছিল। সহসা পাল মহাশয়ের দিক্ হইতে সেই দেয়ালের গায়ে গুপ গুপ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল। সেই শব্দে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। শুইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,— 'কে শব্দ করে?'

তাঁহার ঘর হইতে পাল মহাশয় উত্তর করিলেন,—'শীঘ্র উঠিয়া বাহিরে এস। বিশেষ প্রয়োজন আছে। গোল করিও না।'

আমি উঠিয়া প্রথমে ঘড়িতে দেখিলাম যে, রাত্রি তখন দুই প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। তাহার পর, দ্বার খুলিয়া আমি বারেণ্ডায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। পাল মহাশয়ও সেই সময় আপনার ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া, বারেণ্ডার দ্বারের খিল খুলিলেন। আমার দিকে সেই দ্বার শৃঙ্খল দ্বারা আবদ্ধ ছিল। পাল মহাশয় আমাকে সেই শৃঙ্খল খুলিতে বলিলেন। আমি শৃঙ্খল খুলিলাম। ভিতর-বাটী এবং বাহির-বাটী এক হইয়া গেল। এই সময় আমি দেখিতে পাইলাম যে, লাঠি ধরিয়া কে এক জন অতি ধীরে ধীরে পাল মহাশয়ের সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিবার উপক্রম করিতেছে, আর প্রদীপ হাতে লইয়া পাল মহাশয়ের গৃহিণী তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন। ভালরূপে দেখিয়া আমি তাহাকে চিনিতে পারিলাম। সে নিয়োগীর পীড়িত পুত্র। শয্যাশায়ী মরণাপন্ন রোগী এত রাত্রিতে কেন সে স্থানে আসিয়াছে, তাহা ভাবিয়া আমি ঘোরতর বিস্মিত হইলাম।

পাল মহাশয় চুপি চুপি আমাকে বলিলেন,—'আস্তে আস্তে কথা কহিও। বিশেষ প্রয়োজন আছে। আমার ঘরের ভিতর এস। তাহার পর সকল কথা তোমাকে বলিব।'

পাল মহাশয়ের আজ্ঞায় বারাণ্ডার দ্বারে খিল দিয়া, নিঃশব্দে আমি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। পাঁচ ছয় পা গিয়াই পাল মহাশয়ের ঘরের দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলাম। পাল মহাশয় ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। আমিও প্রবেশ করিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময়,—সর্বনাশ! চাহিয়া দেখি না তাঁহার ঘরের ভিতর সেই রাক্ষস! ঘরের মাঝখানে মাদুরের উপর আসন পিঁড়ি হইয়া রাক্ষস মহাশয় গট্ হইয়া বসিয়া আছেন! আরও আশ্চর্য্য কথা! লজ্জা সরমের মাথা খাইয়া, পাল মহাশয়ের কন্যা সেই মাদুরের এক পার্শ্বে বসিয়া আছে!

ভয়ে আমার পা থর থর কাঁপিতে লাগিল। আমি ভাবিলাম যে, আর কিছু নয়, পাল মহাশয় এই রাক্ষসকে আপনার জামাতা করিয়াছেন! জল-খাবার স্বরূপ আমার দেহটি তাহাকে প্রদান করিবার নিমিত্ত এই ঘোর রাত্রিতে তিনি আমাকে ডাকিয়া আনিয়াছেন। মহাভারত পাঠ করাইয়া নিমন্ত্রণ করিয়া, অনেক দিন হইতে তিনি ইহার যোগাড় করিতেছেন। আমার প্রতি কেন যে তিনি এত কৃপা করিয়াছিলেন, তাহার অর্থ এখন আমি বুঝিতে পারিলাম। আমি আরও ভাবিলাম যে, নিয়োগীদিগেরও ইহাতে যোগ আছে। তা না হইলে, যে লোক বিছানা হইতে উঠিতে পারে না, সে কেন এই রাত্রি দুই প্রহরের সময় এ স্থানে আসিবে! যাহা হউক, আমি তাঁহার ঘরের ভিতর আর প্রবেশ করিলাম না। প্রাণ

লইয়া তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে পলায়ন করিবার উপক্রম করিলাম। কিন্তু পাল মহাশয় খপ করিয়া আমার হাত ধরিয়া ফেলিলেন। আমার হাত ধরিয়া তিনি বলিলেন,—'কোথা যাও!'

আমি তাঁহার পায়ে পড়িলাম। তাঁহার পা দুইটি জড়াইয়া আমি বলিলাম,—'আমি *একেলা মায়ের একেলা ছেলে! দোহাই আপনার!*

পাল মহাশয় বলিলেন,—'সে আবার কি!'

আমি বলিলাম,—'দোহাই আপনার। আপনার উনি জামাতা, উনি বোধ হয় বিভীষণের প্রপৌত্র। উনি দেবতা। আমাকে খাইয়া উনি সুখ পাইবেন না। উনি বরং আসিয়া টিপিয়া টিপিয়া দেখুন আমার গায়ে মাংস নাই, আমার গায়ে সব হাড়।'

পাল মহাশয় বলিলেন,—'এ বলে কি।'

এই সময় গঙ্গদত্তর কথা আমার মনে পড়িল। আমি বলিলাম,—'আমাকে ছাড়িয়া দিন। রাক্ষস মহাশয়ের নিমিত্ত আমি ভাল মোটা তাজা মানুষ ডাকিয়া আনিতেছি। তাহার কোমল মাংস ভক্ষণ করিয়া, রাক্ষস মহাশয় পরম তৃপ্তিলাভ করিবেন। জামাতার আদর করিয়া. আপনিও সন্তোষ লাভ করিবেন; আমাকে খাইয়া তাঁহার সুখ হইবে না। এ চাষার মাংস। স্বহস্তে আমরা চাষ করি। আমাদের মাংস শুষ্ক ও কঠিন,—ঠিক দড়ির মত। দোহাই আপনার!'

এত বিনয় বচনে আমি প্রাণ-ভিক্ষা চাহিলাম, তথাপি পাল মহাশয়ের দয়া হইল না। তিনি আমাকে ছাড়িয়া দিলেন না। তখন নিরুপায় হইয়া যেমন এক দিকে তাঁহার হাত ছাড়াইতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম, তেমনি অন্য দিকে লোক জড় করিবার নিমিত্ত চীৎকার করিতে উদ্যত হইলাম। 'কর কি!' এস কথা বলিয়া পাল মহাশয় আমার মুখ চাপিয়া ধরিলেন। আর সেই সময় রাক্ষস উঠিয়া আমাকে আসিয়া ধরিল। নিমিষের মধ্যে সে আমাকে ভিতরে টানিয়া লইল; তাহার পর সে ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। এক বার, আমাদের গ্রামে, কাজি বুড়ীর ধামা-ঢাকা বীজ মোরগ রাত্রিকালে আমি চুরি করিয়া খাইয়াছিলাম। জবাই করিবার সময়, আমার হাতে সেই মোরগ যেরূপ ঝট্‌পট্ করিয়াছিল, আজ রাক্ষসের হাতেও আমি সেইরূপ ঝট্‌পট্ করিতে লাগিলাম। কিন্তু সে হইল রাক্ষস, আর আমি হইলাম মানুষ। তাহার হাত হইতে আমি আপনাকে ছাড়াইতে পারিলাম না। তাহার স্পর্শে আমার হাত-পা অবশ হইয়া গেল। ক্রমে আমার সর্বাঙ্গ হিম হইয়া গেল, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল কম্পজ্বরের ন্যায় শরীর আমার কাঁপিতে লাগিল, দাঁতে দাঁতে লাগিয়া ঠক্‌ঠক্ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল। আমি অচেতন প্রায় হইলাম আমার কণ্ঠ হইতে কেবল গোঁ গোঁ ধ্বনি বাহির হইতে লাগিল। কিন্তু তখনও সম্পূর্ণভাবে আমি অজ্ঞান হই নাই, কারণ তখনও আমি ভাবিতেছিলাম যে,—'হায় রে! শেষে রাক্ষসের আহার হইব বলিয়া কি বাপ-মা আমাকে এত বড় করিয়াছিলেন।'

দশম অধ্যায় — আমার সাহস ও বিক্রম

কাজি বুড়ীর সেই বীজ মোরগের মত ঝট্‌পট্‌ করিতে করিতে, শরীর আমার অবশ হইয়া পড়িল। অবশেষে আমি একেবারে অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম। অজ্ঞান অবস্থায় কতক্ষণ ছিলাম, তাহা ঠিক বলিতে পারি না। বোধ হয়, অধিকক্ষণ নহে। পুনরায় আমার জ্ঞান হইলে, চক্ষু চাহিয়া আমি দেখিলাম যে, মাদুরের উপর আমি শয়ন করিয়া আছি। পাল মহাশয়ের গৃহিণী আঁচল দিয়া আমার কপাল মুছাইতেছেন। তাঁহার কন্যা আমাকে বাতাস করিতেছে। নিকটে উনিশ কুড়ি বৎসর বয়স্ক এক সুশ্রী যুবক বসিয়া আছে। আর কিছু দূরে পাল মহাশয় নিজে বাক্সর ভিতর একটি শিশি তুলিয়া রাখিতেছেন। আমি তখন কোথায় আছি, প্রথম তাহা আমার স্মরণ হইল না। ক্রমে সকল কথা স্মরণ হইল। সভয় নয়নে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম। কিন্তু রাক্ষসকে সে ঘরে আর দেখিতে পাইলাম না।

আমাকে চেতন 'করিবার নিমিত্ত পাল মহাশয় শিশি হইতে কি ঔষধ দিয়াছিলেন। সেই শিশি পুনরায় তিনি বাক্সর ভিতর তুলিয়া রাখিতেছিলেন। আমার জ্ঞান হইয়াছে দেখিয়া, তিনি আমার নিকট আসিলেন।

তাঁহার কন্যা ও স্ত্রী সেই সময় সে স্থান হইতে সরিয়া বসিলেন। আমি পাল মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম—'রা-রা-রা?'

সমুদয় প্রশ্নটি স্পষ্টরূপে আমার মুখ দিয়া বাহির হইল না। সে রাক্ষস মহাশয় এখন কোথায়, ইহাই আমার জিজ্ঞাস্য ছিল। আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া পাল মহাশয় উত্তর করিলেন,—'তোমাকে আর কি বলিব! তুমি মানুষ কি, তাহাই আমি বুঝিতে পারি না। রাক্ষস আবার কোথায়? আমার এত বয়স হইয়াছে; কিন্তু রাক্ষস আমি কখনও দেখি নাই। ইনি আমার পুত্র। বিপদে পড়িয়া আমার পুত্রকে ছদ্মবেশ ধারণ করিতে হইয়াছে। এই সে পরচুলের দাঁড়ি গোঁপ, আর এই সে মুখস,—যাহা দেখিয়া তুমি এত ভয় পাইয়াছিলে।'

এই কথা বলিয়া, পাল মহাশয় প্রথম আমায় সেই সুশ্রী যুবককে দেখাইলেন, আর তাহার পর সেই পরচুল ও মুখস দেখাইলেন।

নিজেই বড়াই করিতে নাই; কিন্তু স্বভাবতঃ আমি যে এক জন সাহসী পুরুষ, সে পরিচয় বোধ হয় আর আপনাদিগকে দিতে হইবে না। প্রকৃত রাক্ষস না হউক, রাক্ষসের মত তো বটে! সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষসের হাতে পড়িয়াও আমি ধৈর্য্য ধরিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, তাহাই আমার সাহসের যথেষ্ট পরিচয়। আপনারা হইলে ভয়ে হয় তো কত কি করিয়া ফেলিতেন। তাহারপর বলিলে হয় তো আপনারা বিশ্বাস করিবেন না; কিন্তু সত্য বলিতেছি যে, কিছুমাত্র ভয় না করিয়া, রাক্ষসের মুখস আমি টিপিয়া দেখিলাম,— স্বচ্ছন্দে হাতে করিয়া টিপিয়া দেখিলাম। তাহাতে আমার কিছুমাত্র ভয় হইল না। এখন আপনারা বুঝিয়া দেখুন, আমার কত সাহস!

যখন আমি নিশ্চিয় বুঝিলাম যে, সে বস্তুটা মুখস বটে; রাক্ষসের মুণ্ড বা অন্য কোন ভয়াবহ পদার্থ নহে, তখন আমি উঠিয়া বসিলাম। বসিয়া আমি পাল মহাশয়কে জিজ্ঞাসা

করিলাম,—'কি জন্য আপনার পুত্রকে এরূপ ছদ্মবেশ ধারণ করিতে হইয়াছে? আর কেনই বা ইহা অশ্বত্থগাছ-পথে যাতায়াত করিতে হয়?'

পাল মহাশয় উত্তর করিলেন,—'সে অনেক কথা। বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করিবার সময় নাই। আপাততঃ আমরা ঘোর বিপদে পড়িয়াছি। শীঘ্র তাহার প্রতিকার না করিতে পারিলে, আমাদের সর্বনাশ হইবে।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'এই রাত্রি দুই প্রহরের সময় বিপদ কোথা হইতে আসিবে?'

পাল মহাশয় উত্তর করিলেন,—'আমার পুত্রের নাম মিহির! মিহির এক খুনী মোকদ্দমায় পড়িয়াছে। দুই বৎসর পূর্বে সে ঘটনা ঘটিয়াছে। মিহির সে লোককে খুন করে নাই; কিন্তু সমুদয় দোষটি তাহার ঘাড়ে পড়িয়াছে। সে জন্য এই দুই বৎসর নানারূপ ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া, সে পথে পথে ফিরিতেছে। দুঃখের কথা বলিতে আমার বুক ফাটিয়া যায়, বাবা আমার কতই না কষ্ট ভোগ করিতেছে। ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া রাত্রিকালে অতি গোপনে সে আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করে। আমাদের নিকট আসিতে তাহাকে আমি বার বার মানা করিয়াছি। কিন্তু আমাকে, তাহার গর্ভধারিনীকে ও তাহার ভগিনীকে না দেখিয়া সে থাকিতে পারে না। কিছু দিন পূর্বে রাত্রিকালে যখন সে অশ্বত্থ গাছ দিয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিতেছিল, সেই সময় তুমি তাহাকে দেখিয়াছিলে। পাছে কেহ সন্দেহ করে, সে জন্য আমার কন্যা তোমাকে সেই চিঠি লিখিয়াছিল। মিহির যদি আজ ধরা পড়ে, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহার ফাঁসী হইবে। কারণ, সে যে খুন করে নাই, সে যে সম্পূর্ণরূপে নিরপরাধ, তাহা প্রমাণ করিবার উপায় নাই। এ বিষয়ে যদি তুমি কোনওরূপ সহায়তা করিতে পার, সেই জন্য তোমাকে ডাকিয়াছি। আমি তোমাকে ডাকিতে ইচ্ছা করি নাই। আমার গৃহিণী, আমার পুত্র ও আমার কন্যা, সকলের অনুরোধে আমি তোমাকে ডাকিয়াছি। কিন্তু সামান্য একটি মুখস ও পরচুলের দাড়ি দেখিয়া তোমার যখন এত ভয়, তখন তোমার দ্বারা যে কোন উপকার হইবে, তাহা আমার বোধ হয় না। বরং আর একটু হইলেই, তুমি ভয়ে চীৎকার করিয়া সর্বনাশ করিতে! তোমার চীৎকারে পাড়ার লোক আমার বাড়ীতে আসিয়া জমা হইত। মিহিরের পলায়ন করিবার তখন আর কোন উপায় থাকিত না। সেই জন্য তোমাকে ঘরের ভিতর আনিয়া তোমার মুখ চাপিয়া ধরিতে আমরা বাধ্য হইয়াছিলাম।

পাল মহাশয়ের ভর্ৎসনায় আমি অতিশয় লজ্জিত হইলাম। কিন্তু তাঁহার কন্যা যে আমাকে ডাকিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়াছিল, সে জন্য আমার মন আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। আপনাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছি যে, আমি একজন বুদ্ধিমান্ লোক। এই প্রখর বুদ্ধিবলে ইঙ্গিত মাত্র আমি সকল কথা বুঝিতে পারি। ইতিপূর্বে আমি বলিয়াছিলাম যে, পাল মহাশয়ের কন্যা আমার রূপে গুণে মোহিত হইয়া, আমাকে বিবাহ করিতে লালায়িত হইয়াছে। কেমন! আমার কথা সত্য নয়? আমার বুদ্ধির প্রশংসা করিতে হয়।

আর আমার সাহসেরও প্রশংসা করিতে হয়। পূর্বে সাহসের অনেক পরিচয় দিয়াছি। এখন আমি ভাবিলাম যে, আরও বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া এই কন্যার মন-প্রাণ আমি

একেবারে কাড়িয়া লইব। এইরূপ ভাবিয়া তাঁহার কন্যার মুখপানে চাহিয়া আমি পাল মহাশয়কে বলিলাম,—'ঘরে তলোয়ার আছে? থাকে তো দিন্, আমি লড়াই করিব।'

পাল মহাশয় বিরক্ত হইয়া উত্তর করিলেন,—'তুমি পাগল না কি? কাহার সহিত তুমি লড়াই করিবে? পুলিশের সহিত লড়াই করিবে?'

আমার ভয় হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'পুলিশ এ স্থানে কি করিয়া আসিবে? পুলিশ কি করিয়া জানিবে যে আপনার পুত্র মিহির এ বাটীতে আসিয়াছে?'

পাল মহাশয় উত্তর করিলেন,—'তাহাই তো ভয়! সেই বিপদেই তো এখন আমি পড়িয়াছি; আর সেই জন্যই তো তোমাকে আমি ডাকিয়াছি। কি করিব, কিছুই আমি স্থির করিতে পারিতেছি না। পুলিশের লোক এখনি হয় তো আসিয়া উপস্থিত হইবে। নিয়োগী থানায় খবর দিতে গিয়েছে।'

বিস্মিত হইয়া আমি বলিলাম,—'নিয়োগী।'

পাল মহাশয় উত্তর করিলেন,—'হাঁ, নিয়োগী। তাহার পুত্র বেচুর সহিত আমার কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ হইয়াছিল। কিন্তু বেচুর এখন যেরূপ অবস্থা, তাহাতে সে বিবাহ আমি কিছুতেই দিতে পারি না। সেই কথা শুনিয়া, আমার উপব নিয়োগীর অতিশয় বাগ হইয়াছে। যখন বাসার কোন কোন লোকের নিকট তুমি রাক্ষসেব গল্প করিয়াছিলে, নিয়োগী তাহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিয়াছিল যে, ভূতও নয, রাক্ষসও নয,—সে আমার পুত্র মিহির ব্যতীত অন্য কেহ নয়। ছদ্মবেশ ধাবণ করিয়া সে আমার বাটীতে গমনাগমন করিতেছে। কারণ নিয়োগী সেই খুনের কথা সমুদয় অবগত আছে। সেই বাসাতেই এই খুন হয়। নিয়োগী-পুত্রের পরামর্শে ও সহায়তায় আমার পুত্র পলায়ন কবে। তোমার মুখে রাক্ষসের কথা শুনিয়া পর্য্যন্ত নিয়োগী বোধ হয়, চৌকি দিতেছিল। তাহার পর আজ রাত্রিতে মিহিরকে আসিতে দেখিয়া সে থানায় সংবাদ দিতে গিযাছে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'আপনি কি করিয়া জানিলেন যে, সে থানায় খবর দিতে গিয়াছে?' —পাল মহাশয় উত্তর করিলেন,—'নিয়োগীর পুত্র বেচু আসিয়া আমাকে এইমাত্র বলিয়া গেল। বেচু এখন আর বিছানা হইতে উঠিতে পারে না। তথাপি লাঠি ধরিয়া অতি কষ্টে সে এই মাত্র আসিয়াছিল। তাহাব পিতা যে ঘোর অন্যায় কাজ করিতেছে, তাহা বোধ হয়, সে বুঝিতে পারিয়াছে। সে জন্য আমাকে সে সকল কথা বলিয়া গেল।'

একাদশ অধ্যায় – রাধারাণীর বুদ্ধি

আমি বলিলাম,—'মিহির এই বেলা অশ্বত্থ গাছ দিয়া পলায়ন করুন না কেন?'

পাল মহাশয় উত্তর করিলেন,—'তাহার যো নাই। বেচু বলিয়া গেল যে, সদর দরজায় এক জন কন্‌ষ্টেবল্ দাঁড়াইয়া আছে। সে দিক্ দিয়া পলায়ন করিবার উপায় নাই। পশ্চিমে গলির রাস্তায় এই জানালার পার্শ্বে যে দিকে অশ্বত্থ গাছ রহিয়াছে, সে স্থানে নিয়োগীর বন্ধু সেই দালাল দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছে। দুই পথে দুই জনকে পাহারা রাখিয়া নিয়োগী থানা গিয়াছে।'

আমি জানালার নিকট গিয়া ঈষৎ উঁকি মারিয়া দেখিলাম। দেখিলাম যে, সত্য বটে,— সে স্থানে সেই দালাল দাঁড়াইয়া আছেন, যিনি কেশবী আমলে এক জন ধ্বজাধারী ব্রাহ্ম ছিলেন, যিনি এক্ষণে গোঁড়া হিন্দু হইয়াছেন, ও যিনি এক্ষণে মুরগী ভক্ষণ করেন না।

জানালার নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া, আমি বাটীর উত্তর ও পূর্ব দিক্ পানে চাহিয়া দেখিলাম। সেই দুই দিক একেবারে ভগ্ন; সে দুই দিক্ দিয়া পলায়ন করিবার কোন উপায় নাই। তাহার পর, আমি ছাদে উঠিবার সিঁড়ির কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সিঁড়িও একেবারে ভগ্ন; ছাদে উঠিবার উপায় নাই। পলায়ন করিবার কোন উপায় আমি দেখিতে পাইলাম না।

মিহির এতক্ষণ মাতার নিকট বসিয়া ছিল। খাইবার নিমিত্ত মাতা তাহাকে কিছু মিষ্টান্ন দিয়াছিলেন। মিহির খাইতে অস্বীকার করিতেছিল। কাঁদিতে কাঁদিতে, আঁচলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে, খাইবার নিমিত্ত মাতা তাহাকে জেদ করিতেছিলেন। মাতার অনুরোধে মিহির সন্দেশ ভাঙ্গিয়া একটু মুখে দিয়া জল পান করিল। তাহার পর সে মাতাকে বুঝাইতে লাগিল।

মিহির বলিল,—'মা তুমি জননী! আমার দেবতা। তোমার সাক্ষাতে আমি সত্য বলিতেছি যে, আমি সে ছোক্‌রাকে খুন করি নাই। দুই জনে আমরা এক ঘরে থাকিতাম। চিবকাল তাহাতে আমাতে বড় ভাব ছিল। বাবার সহিত তাহার বাপের মকদ্দমা আরম্ভ হইলেও তাহাতে আমাতে ভাব যায় নাই। তবে যে রাত্রিতে সে খুন হয়, সেই দিন সন্ধ্যাবেলা তাহাতে আমাতে একটু বচসা হইয়াছিল। কিন্তু সে অন্য কথা লইয়া, মোকদ্দমার কথায় নয়। যাহা হউক, সে ঝগড়া কোন কাজের নয়, কথার তর্ক-বিতর্ক মাত্র। তাহার পব আমরা একসঙ্গে কত কথা কহিলাম, একসঙ্গে আহার করিলাম, একঘরে শয়ন করিলাম। রাত্রি দুইটা কি তিনটার সময় আমাকে একবার বাহিরে যাইতে হইল। বাহির হইতে আসিয়া পুনরায় ঘবের ভিতর যই প্রবেশ করিয়াছি, আর সেই সময় বেণীর বিছানার নিকট হইতে কিরূপ একটা ঘড় গড় শব্দ আমি শুনিতে পাইলাম। যে ছোক্‌রা খুন হইয়াছে, তাহার নাম বেণী ছিল। আমি ভাবিলাম, বেণী বুঝি কিরূপ কুভাবে শয়ন করিয়াছে, তাই সে এইরূপ শব্দ করিতেছে। তাহাকে ঠেলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইতে বলিব, এই জন্য আমি সেই অন্ধকার ঘরে তাহার বিছানার দিকে যাইতে লাগিলাম। সহসা আমার পায়ে মানুষের গা ঠেকিয়া গেল। তখনও আমি কোন বিপদের আশঙ্কা করি নাই। তখন আমি ভাবিলাম যে, বেণী ঘুমের ঘোরে তক্তপোষ হইতে পড়িয়া গিয়াছে। 'বেণী' 'বেণী' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে আমি তাহাকে তুলিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু আমি দেখিলাম যে, তাহার সর্বশরীর অবশ হইয়া গিয়াছে, আর তাহার গলা দিয়া সেই ঘড় ঘড় শব্দ হইতেছে; আর সেই সময় আমার পায়ে জল অপেক্ষা ঘন কি সব লাগিয়া গেল। আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম। পাশের ঘরে নিয়োগী মহাশয়ের পুত্র বেচু ও আর এক ছোকরা ছিল। কিন্তু আমার চীৎকার শুনিয়া, কেবল বেচু একেলা দৌড়িয়া আসিল। সঙ্গে সে দিয়াশিলাই আনিয়াছিল। সে দিয়াশিলাই জ্বালিল। সে আলোতে বেণীকে আমি তাহার তক্তোপোষে

শয়ন করাইলাম। আর সেই সময় দেখিলাম যে, তাহার বুকে কেছুরি মারিয়াছে; বুক হইতে ভলকে ভলকে রক্ত বাহির হইতেছে, তাহাতে আমার গা ও কাপড় রক্তে রক্ত হইয়া গিয়াছে। ঘরের মেজেতে যে স্থানে বেণী পড়িয়া ছিল, সে স্থানেও অনেক রক্ত আমার পায়ে লাগিয়া গিয়াছিল। নিয়োগী মহাশয়ের পুত্র বেচু ঘরের ভিতর আসিয়া দিয়াশলাই জ্বালিয়া সমুদয় ব্যাপার দেখিল। বেচু মনে করিল যে, আমি বেণীকে খুন করিয়াছি। সেই জন্য বেচু আমাকে বলিল,—'চুপ চুপ! গোল করিও না। কিন্তু মিহির, এ কি তুমি করিয়াছ? বেণীকে তুমি খুন করিয়াছ? সন্ধ্যা বেলা তাহার সহিত তোমার ঝগড়া হইয়াছিল, সেই জন্য ইহাকে খুন করিয়াছ? না, ইহার বাপের কাছ হইতে যে এক শত টাকার নোট আসিয়াছে, তাহার জন্য তুমি ইহাকে খুন করিয়াছ?' আমি বলিলাম,—'ও কি কথা, বেচু! আমি ইহাকে খুন করিয়াছি! আমি যদি খুন্ করিব, তবে চীৎকার করিয়া লোক ডাকিতে যাইব কেন?'—বেচু বলিল,—'দেখ মিহির! তোর সে কথা কেহ বিশ্বাস করিবে না! তোমরা দুই জনে একঘরে থাক। তোমার সহিত কাল তাহার ঝগড়া হইয়াছিল, তোমার গায়ে রক্ত,—আর এ কি! এই বলিয়া ঘরের মেঝে হইতে একখানি ছুরি সে তুলিয়া লইল। ছুরিখানি রক্তমাখা ছিল। সে ছুরি আমার। ঘরের এক পার্শ্বে ছোট টেবিল ছিল। তাহার উপর কাগজ, কলম পুস্তক প্রভৃতির সহিত আমার সেই ছুরিখানিও থাকিত। ছুরিখানি হাতে লইয়া বেচু বলিল,—'আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিও না। শীঘ্র তুমি পলায়ন কর।' আমি হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলাম। পলায়ন করিতে আমি উদ্যত হইলাম, তখন বেচু বলিল,—'ও কি কর! ওরূপ বক্তমাখা কাপড়ে বাহিরে যাইও না। এখনি তোমাকে চৌকিদারে ধরিবে।' এই কথা বলিয়া সে দৌড়িয়া আপনার ঘরে গেল। আপনার একখানি কাপড় আনিয়া আমাকে দিল। সেই কাপড় পরিয়া আমি পলায়ন করিলাম। সে রাত্রিতে বেচু আমার অনেক উপকার করিয়াছে। আজও দেখ, সে আমাকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু মা! এখন বোধ হইতেছে যে, পলায়ন করিয়া আমি ভাল কাজ করি নাই। যখন আমি অপরাধ করি নাই, তখন কি জন্য যে আমি পলায়ন করিলাম, তাহা বুঝিতে পারি না। এরূপ অবস্থায় আর কত দিন কাল কাটাইব! ইহা অপেক্ষা ফাঁসীকাঠে ঝুলিয়া মরাই আমার পক্ষে ভাল। তোমাদিগকে না দেখিয়া আর পথে পথে ফিরিতে পারি না! আর কষ্ট ভোগ করিতে পারি, না, মা!'

মাতা কাঁদিতে লাগিলেন। পাল মহাশয়ের কন্যা কাঁদিতে লাগিল। পাল মহাশয়ের চক্ষে জল আসিল, আমারও চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

মিহির পুনরায় বলিল,—'আজ আর পলাইবার কোন উপায় নাই। কিন্তু তাহার জন্য আমি কিছু মাত্র দুঃখিত নই। পথে পথে আর বেড়াইতে পারি না।'

এইরূপ বলিতে বলিতে মিহির দেখিল যে, তাহার পিতা, মাতা ও ভগিনী সকলেই অতিশয় কাঁদিতেছেন। সে জন্য তাঁহাদিগকে প্রবোধ দিয়া সে পুনরায় বলিল,—'মা, কাঁদিও না। তুমি ভয় করিও না। ভগবান্ মাথার উপরে আছেন। বিনাদোষে তিনি আমাকে ফাঁসী

যাইতে দিবেন না।'

আমার নিজের সম্বন্ধে এই সময় একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। মিহিরে দুঃখের কাহিনী শুনিয়া আমার বুকের ভিতর গুর্ গুর্ করিয়া উঠিল। কেন বলিতে পারি না, কিন্তু এই সময় হইতে আমার স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হইল।

পাল মহাশয় বলিলেন,—'প্রাণ থাকিতে তোমাকে আমি ধরা দিতে দিব না। পলাইবার কোন উপায় কি নাই?' এই সময় বাটীর নিম্নে অন্দর মহলের দরজায় সবলে কে আঘাত করিতে লাগিল। দরজা যেন ভাঙ্গিয়া ফেলিতে লাগিল। শশব্যস্ত হইয়া সকলে আমরা উঠিয়া দাঁড়াইলাম। পাল মহাশয় বলিলেন,—'ঐ পুলিশ আসিয়াছে।

পাল মহাশয়ের কন্যা ও গৃহিণী কাঁদিয়া উঠিলেন। মিহির পুনরায় তাঁহাদিগকে বুঝাইতে লাগিল। মিহির বলিল,—'ভয় নাই মা! কাঁদিও না অর্ন্তযামী ভগবান্ জানেন যে, আমি কোন দোষে দোষী নই! তিনি আমাকে রক্ষা করিবেন।'

দরজায় অতি সবেগে আঘাত হইতে লাগিল। দরজা যেন ভাঙ্গিয়া ফেলিতে লাগিল।

পাল মহাশয় বারেণ্ডায় গিয়া উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কে ও? দরজা ভাঙ্গে কে?' বাহির দিকে হইতে কে উত্তর দিল,—'আমরা পুলিশের লোক। দরজা খুলিয়া দাও।'

পাল মহাশয় বলিলেন,—'রাত্রি প্রায় একটা বাজে! এ ঘোর রাত্রিতে আমি দরজা খুলিয়া দিতে পারি না। যদি তোমাদের কোন প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে প্রাতঃকালে আসিও, তখন দ্বার খুলিয়া দিব। রাত্রিকালে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিবার আইন নাই।'

পুলিশের লোক উত্তর করিল,—'দ্বার খুলিয়া দাও। যদি না খুলিয়া দাও, তাহা হইলে দ্বার আমরা ভাঙ্গিয়া ফেলিব। তোমার ঘরে খুনী আসামী আছে।

পাল মহাশয় বলিলেন,—'আমার ঘরে খুনী আসামী কোথা হইতে আসিবে? এ ঘোর রাত্রিতে আমি দ্বার খুলিয়া দিব না;—তোমরা পুলিশের লোক হও আর যেই হও।'

তাহারা দ্বার যেন ভাঙ্গিয়া ফেলিবার উদ্যোগ করিল। পাল মহাশয় ঘরের ভিতর আসিয়া বলিলেন,—'সর্বনাশ হইল! আর কোন উপায় নাই! মিহির এইবার ধরা পড়িল। সর্বনাশ হইল!'

মিহিরের এক হাত মা ধরিয়া ছিল। মিহিরকে মাঝখানে রাখিয়া, দুই জনে পার্শ্বে বসিয়া ক্রমাগত কাঁদিতেছিলেন। পাল মহাশয়ের এই নিদারুণ বাক্য শুনিয়া ভগিনী সহসা মিহিরের হাত ছাড়াইয়া দিল। তাহার পর সে উঠিয়া দাঁড়াইল। আঁচলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে পিতাকে সে বলিল,—'বাবা! নীচে গিয়া পুলিশের লোককে তুমি দরজা খুলিয়া দাও। আমি মনে মনে এক উপায় স্থির করিয়াছি! ভগবানের কৃপায় আমাদের বাসনা পূর্ণ হইবে।'

কন্যার কথা শুনিয়া আমরা সকলেই অবাক্ হইয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলাম।

কন্যা ধীর-গম্ভীর স্বরে ভ্রাতাকে বলিল,—'দাদা উঠ! মদন বাবুর ঘরে গিয়া তাঁহার বিছানায় তুমি শয়ন কর। বারেণ্ডার দ্বার ওদিক্ হইতে তুমি শিকল দিয়া দাও, এদিক হইতে সেই দ্বারে আমি খিল দিতেছি।' —পাল মহাশয়ের কন্যা তাহার পর মাদুরের উপর হইতে

সেই রাক্ষসের মুখস ও সেই পরচুল তুলিয়া লইল। স্বহস্তে সেই মুখস ও সেই পরচুলের দাড়ি গোঁপ সে আমার মুখে পরাইয়া দিল।

সকলে তাহার অভিসন্ধি তখন বুঝিতে পারিল। পাল মহাশয় বলিলেন, 'রাধারাণী মা! ধন্য তুমি! ধন্য তোমার বুদ্ধি! তোমার বুদ্ধিবলে ও ভগবানের কৃপায় মিহির বোধ হয়, এবার নিষ্কৃতি পাইবে। মিহির! উঠ বাবা! শীঘ্র মদন বাবুর ঘরে তুমি গমন কর!'

পাল মহাশয়ের কন্যার নাম রাধারাণী।

দ্বাদশ অধ্যায় – মদনের প্রতিজ্ঞা

বারেণ্ডায় দাঁড়াইয়া রাধারাণী মিহিরকে আমার ঘর দেখাইয়া দিল। ভিতর বাটী হইতে বাহির-বাটীতে গমন করিয়া, মিহির প্রথম বারেণ্ডার দ্বারে শিকল দিল। তাহার পর, আমার ঘরে প্রবেশ করিয়া সে ঘরেরও দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। অবশেষে সে আমার বিছানায় শয়ন করিল।

দ্বার খুলিয়া দিবার নিমিত্ত পাল মহাশয় এখনও নীচে গমন করেন নাই। রাধারাণী সে জন্য পুনরায় তাঁহাকে বলিল, 'বাবা! তুমি নীচে গিয়া পুলিশের লোককে দ্বার খুলিয়া দাও। দ্বার খুলিতে কিন্তু একটু নলপত করিও। উপরে কেবল তোমার ঘরের দ্বার খোলা থাকুক। প্রদীপ নিবাইয়া মা ও আমি অন্য ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া শয়ন করি।'

পাল মহাশয় প্রথম বারেণ্ডায় দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে পুলিশের লোককে বলিলেন,— 'আপনাদের আর কষ্ট করিতে হইবে না। এখনি নীচে গিয়া আমি দ্বার খুলিয়া দিতেছি।'

এই বলিয়া সিঁড়ি দিয়া আস্তে আস্তে তিনি নীচে নামিতে লাগিলেন।

পরচুল ও মুখস্ পরিয়া অবাক্ হইয়া এতক্ষণ আমি চুপ করিয়া বসিয়াছিলাম। রাধারাণী স্বহস্তে আমার এই সাজ করিয়া দিয়াছিল। তাহার কোমল হস্তস্পর্শে শরীর আমার রোমাঞ্চ হইয়াছিল। সেই সুখে মুগ্ধ হইয়া, চিন্তা করিতে এতক্ষণ আমি সময় পাই নাই। কিন্তু এখন আমার বড় ভয় হইল। আমি ভাবিলাম,—'এ মন্দ কথা নয়! রাক্ষসের হাত হইতে কত কষ্টে পরিত্রাণ পাইলাম। এখন দেখিতেছি, আমার ফাঁসীর যোগাড় হইতেছে। নিয়োগী মহাশয় পুলিশকে নিশ্চয় বলিয়াছেন যে, রাক্ষসের সাজ সাজিয়া খুনী আসামী বাটীতে আগমন করে। সুতরাং পুলিশ আসিয়াই আমাকে ধরিয়া ফেলিবে। তাহার পর, আমাকে থানায় লইয়া যাইবে। তাহার পর, আমার নামে মোকদ্দমা করিবে। তাহার পর, আমাকে ফাঁসীকাঠে ঝুলাইয়া দিবে। আমাকে দিয়া রাধারাণী ভ্রাতার প্রাণ বাঁচাইতে চেষ্টা করিতেছে। মেয়েটি সামান্য মেয়ে নয়।'

এইরূপ চিন্তা করিতেছি, এমন সময় মিহিরের সেই দুঃখের কাহিনী আমার স্মরণ হইল। আপনাকে ধিক্কার দিয়া আমি মনে মনে বলিতে লাগিলাম,—"ছি মদন! তুমি না এইমাত্র প্রতিজ্ঞা করিয়াছ যে, আজ হইতে আর পাগলামি করিবে না। আর কখন কাপুরুষের ন্যায় ব্যবহার করিবে না? আজ হইতে তুমি তোমার স্বভাব পরিবর্তন করিবে? ছি, মদন! তোমার কি লজ্জা নাই?'

এক দিনে সামান্য কথায় মানুষের চক্ষু ফুটিয়া যে চৈতন্য হয়, তাহা আপনারা অসম্ভব বিবেচনা করিবেন না। লালা বাবু তাহার দৃষ্টান্ত। কথিত আছে যে, এক দিন লালা বাবু বিষয়কর্মে অতিশয় ব্যস্ত ছিলেন। বেলা দুই প্রহর অতীত হইয়া গেল, তথাপি স্নান আহার করিতে তিনি যাইলেন না। অবশেষে তাঁহার কন্যা আসিয়া বলিল,—'বাবা! বেলা গেল যে!' 'বেলা গেল', এই দুইটি কথায় লাল বাবুর হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল। সেই মুহূর্ত হতে সংসারের প্রতি তাঁহার বৈরাগ্য জন্মিল।

মিহিরের কাহিনী শুনিয়া আমারও আজ সেইরূপ হইল। আমার স্বভাবে যে সমুদয় দোষ আছে, এত দিন তাহা আমি ভাবিতে লাগিলাম,—'সংসার কি ভয়ানক স্থান! মিহির সম্পূর্ণ নিরপরাধ; নিশ্চয় খুন করে নাই। তথাপি তাহাকে কত না কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে! ধরা পড়িতে হয় তো তাঁহার ফাঁসীও হইবে। অর্ন্তযামী ভগবান্ কেন এমন করিতেছেন? এ রহস্য আমি বুঝিতে পারি না। হে ঈশ্বর! তুমি জান; আমি কিছুই জানি না।

এইরূপ ভাবিয়া আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম যে,—'আজ হইতে যথাসাধ্য সকল বিষয়ে আমি চুপ করিয়া থাকিব। তাঁহার যাহা ইচ্ছা, তাহাই হউক।'

ভ্রাতাকে আমার ঘর দেখাইয়া দিয়া, বারেণ্ডার দ্বারে ভিতর হইতে খিল দিয়া রাধারাণী পুনরায় আমার নিকট আসিযা বলিল,—'আপনি ভয় করিবেন না! আপনি যে দাদা নহেন, তাহা জানিতে পারিলেই পুলিশ আপনাকে ছাড়িয়া দিবে। কিন্তু অনুগ্রহ করিয়া আপনি শীঘ্র পরিচয় দিবেন না। যত বিলম্ব করিতে পারেন, ততই ভাল। কারণ, বিলম্ব হইলে দাদাকে সরাইতে আমরা সময় পাইব।'

রাধারাণী মধুর বচনে আমার মন আশ্বাসিত হইল। আমিও তখন মনে মনে বুঝিয়া দেখিলাম যে, সত্য বটে; আমাকে কেন তাহারা ফাঁসী দিবে? আমি যে মিহির নই জানিতে পারিলেই, তাহারা অম্যাকে ছাড়িয়া দিবে। আমার নাম-ধাম প্রকাশ করিতে আমি যত পারি, তত বিলম্ব করিব। রাধারাণী পুনরায় বলিল,- -'আপনার এ ঘরে থাকা উচিত নহে। আপনাকে অন্য স্থানে যাইতে হইবে। আসুন!'

রাধারাণীর সহিত সে ঘর হইতে আমি বাহির হইলাম। চক্ষুর উপরে মুখসে দুইটি গোল ছিদ্র ছিল। তাহা পূর্বে রাক্ষসের ভয়াবহ চক্ষু কোটর বলিয়া আমার প্রতীতি হইয়াছিল। সেই ছিদ্র দিয়া আমি দেখিতে পাইতেছিলাম। তেতলার উঠিবার নিমিত্ত পূর্বে যে স্থানে সিঁড়ি ছিল, তাহার পার্শ্বে সামান্য একটি নিভৃত অন্ধকারময় স্থান ছিল। সে স্থানে যে ভগ্ন প্রাচীর আছে, তাহার কোণে রাধারাণী আমাকে বসিতে বলিল। আমি সেই কোণে বসিলাম। ঘর হইতে রাধারাণী মাদুরটি তুলিয়া আনিয়াছিল। সেই মাদুর সে আড়াল করিয়া দিল। মাদুরের অন্তরালে চুপ করিয়া আমি বসিয়া রহিলাম। নানারূপ আশ্বাসবাক্যে আমাকে প্রবোধ দিয়া রাধারাণী সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

প্রাচীরের কোণে মাদুরের আড়ালে বসিয়া, শব্দ শুনিয়া, সমুদয় ঘটনা আমি বুঝিতে

পারিলাম। পাল মহাশয় দ্বার খুলিয়া দিলেন, সে শব্দ আমি পাইলাম। অনেকগুলি লোক বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল; সে শব্দ আমি পাইলাম। সাত আট জন লোক, তড়তড় করিয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিল; সে শব্দ আমি পাইলাম। পাল মহাশয়ের তিনটি ঘর আতি পাতি করিয়া তাহারা খুঁজিতে লাগিল; সে শব্দও আমি পাইলাম। তাহাদের অনুসন্ধান যে বৃথা হইল, তাহাদের কথাবার্তায় তাহাও বুঝিতে পারিলাম। অবশেষে দুই জন লোক আমার দিকে আসিতেছে, পদ-শব্দে তাহাও আমি বুঝিলাম।

যে স্থানে আমি লুক্কায়িত ছিলাম, সেই দুই জন লোক সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। গোল লণ্ঠনের প্রখর আলোক তাহারা মাদুরের উপর ধরিল। তাহার পর, এক জন অগ্রসর হইয়া মাদুরটি সরাইয়া ফেলিল! তৎক্ষণাৎ সেই দুই জন লোক এক সঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল,—'আসামী পাইয়াছি! আসামী পাইয়াছি!'

সেই কথা শুনিয়া পুলিশের অন্যান্য লোক সেই স্থানে দৌড়িয়া আসিল। তাহাদের মধ্যে এক জন তৎক্ষণাৎ আমার হাতে হাতকড়ি লাগাইয়া দিল। ঘরের ভিতর পাল মহাশয়ের কন্যা ও গৃহিণী কাঁদিয়া উঠিলেন। আমি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। এক জন পুলিশের লোক আমার মুখ হইতে সেই রাক্ষসের মুখস্ খুলিতে উদ্যত হইল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে যিনি কর্তা, তিনি তাহাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন, 'উঁ হুঁ' মুখস্ খুলিও না। এই অবস্থাতেই ইহাকে সাহেবের নিকট লইয়া যাইব।'

আমার ভয় হইয়াছিল যে মুখস্ খুলিলে পাছে কেহ আমাকে চিনিতে পারে। রাধারাণীর সমুদয় আয়োজন তাহা হইলে বৃথা হইত, নিয়োগী তখন সে স্থানে উপস্থিত ছিলেন না বটে; কিন্তু পুলিশের লোক যখন আমাকে থানায় লইয়া যায়, সেই সময় বাহির-বাটী যত বাসাড়ে তামাসা দেখিবার নিমিত্ত আপন আপন ঘর হইতে বাহির হইয়াছিল। নীচের বাসাড়েগণ নীচে ও দোতলার বাসাড়েগণ উপরের বারেণ্ডার রেল ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সকলের সম্মুখ দিয়া পুলিশের লোক আমাকে লইয়া গেল। মুখস্ খুলিলে তাহারা আমাকে চিনিতে পারিত। মুখসের চক্ষু-কোটর দিয়া আমি সকলকে দেখিলাম নিয়োগীকে কোন স্থানে দেখিতে পাইলাম না। নিয়োগী জানিতেন না যে, তাহার পুত্র পাল মহাশয়কে গোপনে সংবাদ দিয়া, তাঁহার পরিশ্রম বিফল করিয়াছে। যেন এ ব্যাপারের কিছু জানেন না, পর দিন পাল মহাশয়কে তাহাই বলিবার নিমিত্ত তিনি বোধ হয় আপনার দ্বার বন্ধ করিয়া ঘরের ভিতর বসিয়াছিলেন। দালালকে কোন স্থানে দেখিতে পাইলাম না।

আমি থানায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। সাহেবের সম্মুখে আমার মুখস খোলা হইল। কিন্তু পরচুলের দাড়ি গোঁপ যেমন তেমনি রহিল। থানার সাহেব আমাকে দুই এক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু আমি কোন উত্তর করিলাম না। আমাকে গারদে কয়েদ করিয়া রাখা হইল।

গারদে আমি বসিয়া আছি, এমন সময়ে বাহিরের নিয়োগীর গলার শব্দ পাইলাম নিয়োগীর সহিত পুলিশের যে কথাবার্তা হইল, তাহাতে আমি বুঝিলাম যে, মিহিরকে ধরিয়া দিবার নিমিত্ত পাঁচ শত টাকার পুরস্কার দিবার ঘোষণা ছিল। নিয়োগী সেই

পুরস্কারের প্রার্থনা করিলেন। পুলিশের লোক বলিল যে,—'রও! আগে ইহার মোকদ্দমা হউক, তাহার পর তুমি সে পুরস্কার পাইবে।' সেই কথা শুনিয়া নিয়োগী মহাশয় প্রস্থান করিলেন।

পুলিশের লোক পরদিন আমাকে আর একজন সাহেবের নিকট লইয়া গেল। সে সাহেবও আমাকে দুই চারি কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি কিন্তু একটি কথাও মুখ দিয়া বাহির করিলাম না।

হুগলীতে সেই খুন হইয়াছিল। আমাকে হুগলীতে গিয়া সে স্থানের পুলিশের হাতে সমর্পণ করিবার নিমিত্ত সাহেব আজ্ঞা করিলেন। দুই জন পুলিশের লোক আমাকে হুগলীতে লইয়া চলিল। আমরা তিন জনে রেলগাড়ীতে গিয়া বসিলাম। আমার হাতে হাতকড়ি ছিল। কিন্তু পথে যাইতে যাইতে কৌশল করিয়া আমি সেই পরচুলের দাড়ি গোঁফ খুলিয়া চুপি চুপি গাড়ীর বাহিরে ফেলিয়া দিলাম। পরক্ষণেই পুলিশের লোক আমার দিকে চাহিয়া বিস্মিত হইল। সে যে পরচুল, তা বোধ হয়, তাহারা জানিত না। তাহারা বলিল,—'তুই এক জন পাকা বদমায়েস!'

যথাসময়ে আমরা হুগলীর থানায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। কলিকাতা পুলিশের লোক হুগলী পুলিশের হাতে আমাকে সমর্পণ করিয়া চলিয়া গেল। হুগলী থানার এক জন কর্মচারী মিহিরকে জানিত। সে তখন থানায় উপস্থিত ছিল না। কিছুক্ষণ পরে সে আসিয়া আমাকে দেখিয়া বলিল,—'মিহির পাল! এ কেন মিহির পাল হবে?' এই কথা শুনিয়া থানার দারোগা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তবে তুমি কে?' এইবার আমার মুখ দিয়া কথা ফুটিল। আমি বলিলাম,—'আমি মদ স্মিত হইল।

দারোগা জিজ্ঞাসা করিলেন,—তবে কলিকাতা পুলিশ তোমাকে ধরিয়া আনিল কেন? আর মিহির বলিয়া তোমাকে এ স্থানে দিয়া গেল কেন?'

আমি উত্তর করিলাম,—'পাল মহাশয় ও আমি এক বাটীতে বাস করি। তাঁহার সহিত আমার সদ্ভাব আছে। তামাসা ছলে রাক্ষসের মত মুখস পরিয়া 'পরিবারবর্গকে আমি ভয় দেখাইতে গিয়াছিলাম। সেই অবস্থায় কলিকাতা পুলিশের লোক আমাকে মিহির মনে করিয়া ধৃত করিল।'

দারোগা জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কলিকাতার থানায় তুমি আপনার পরিচয় প্রদান কর নাই কেন?'

আমি বলিলাম,—'ভয়ে আমি হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল।' যাহা হউক, হুগলীর পুলিশের লোক আমাকে তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দিল না। সে স্থানের সাহেবেরে নিকট আমাকে লইয়া গেল। আরও দুই দিন ধরিয়া ভালরূপে তদন্ত করিল। হুগলীর যে সমুদয় লোক মিহিরকে জানিত, তাহাদিগকে আনিয়া আমাকে দেখাইল। পাল মহাশয়ের গ্রামের কয়েক জন লোককে আনিয়া দেখাইল। যখন সকলেই বলিল যে, আমি মিহির নই, তখন আমাকে তাহারা ছাড়িয়া দিল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়— নিয়োগী মহাশয়ের গান

তিন দিন পরে অপরাহ্ণে আমি আমার কলিকাতার বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম। বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে, নিয়োগী আপনার ঘরের দ্বারের নিকট একটি কেরোসিদন তেলের পুরাতন ও ভাঙ্গা বাক্সর উপর বসিয়া খবরের কাগজ পাঠ করিতেছেন! সকলে যে ভাবে সংবাদ-পত্র পাঠ করে, নিয়োগী সে ভাবে পাঠ করিতেছিলেন না; গীত গাহিবার ন্যায় সুর করিয় গদ্য লেখা তিনি পাঠ করিতেছিলেন। যথা,— ম-অ-অ-হে-এ-এ-এশ-পা-আ-আ-লে-এ-এ-এর ইত্যাদি।

সংবাদপত্রের যে কথাগুলি লইয়া তিনি মনের আনন্দে গান করিতেছিলেন, তাহা এইরূপ ছিল,—'মহেশ পালের পুত্র মিহির দুই বৎসর পূর্বে হুগলীতে খুনী মোকদ্দমায় অভিযুক্ত হইয়া ফেরার হইয়াছিল। মুখস্ পরিয়া ছদ্মবেশে মাঝে মাঝে সে পিতা-মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিত। এই অবস্থায় সেদিন সে ধরা পড়িয়াছে।' ইত্যাদি।

মিহির পাল ধরা-পড়িয়াছে। আনন্দে নিয়োগী মহাশয়ের মন একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আনন্দের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া, তিনি সেই গদ্য ভাষার লিখিত সংবাদটি গীতের ন্যায় গাহিতে ছিলেন। নিয়োগী এখনও জানিতে পারেন নাই যে, প্রকৃত মিহির সে রাত্রি ধরা পড়ে নাই, জাল মিহির ধরা পড়িয়াছিল।

আমাকে দেখিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কি হে মদন! এত দিন কোথায় ছিলে?'

আমি উত্তর করিলাম,—'সে সব কথা আপনাকে পরে বলিব। পাল মহাশয় কেমন আছেন?'

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন,—'পাল মহাশয় এখানে নাই। যে রাত্রিতে তাঁহার পুত্র ধরা পড়িল, সেই রাত্রিতেই সপরিবারে তিনি এই স্থান হইতে চলিয়া গিয়াছেন। পুত্রের মোকদ্দমার তদ্বির করিবার নিমিত্ত বোধ হয়, হুগলী গিয়াছেন। ভাল কথা। তোমার ঘরের চাবি আমার কাছে আছে। তিনি আমাকে সেই চাবি দিয়া গিয়াছেন।'

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট হইতে চাবি লইয়া, আমি আমার ঘরে গমন করিলাম। পাল মহাশয় কোথায় গিয়াছেন, বিছানায় শুইয়া সেই কথা ভাবিতে লাগিলাম।

কয় দিন অনুপস্থির পর, আমি আফিস যাইলাম। আফিস হইতে আসিয়া বাসার সকলকে আমি পাল মহাশয়ের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিলাম; কিন্তু কেহই আমাকে বলিতে পারিল না। রবিবার দিন আমি পুনরায় হুগলীতে গিয়া, তাঁহার অনুসন্ধান করিলাম। সে অনুসন্ধান নিষ্ফল হইল। তাহার পর, আর এক দিন রবিবার তাঁহার গ্রামে গিয়া তাঁহার অনুসন্ধান লইলাম। কিন্তু সে স্থানেও কেহ কিছু বলিতে পারিল না। এইরূপ বহু দিন ধরিয়া ক্রমাগত আমি তাঁহার অন্বেষণ করিলাম। কিন্তু আমার সকল চেষ্টা বিফল হইল। অবশেষে হতাশ হইয়া আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

নিয়োগী ক্রমে জানিতে পারিলেন যে, প্রকৃত মিহির ধরা পড়ে নাই, আমি যে মিহির

সাজিয়া ধরা দিয়াছিলাম, সকল লোকেই ক্রমে ক্রমে জানিতে পারিল। একদিকে প্রতিহিংসা ও পুরস্কার বিষয়ে নিয়োগী বিফল মনোরথ হইলেন; অপর দিকে তাঁহার পুত্র বেচুর ক্রমে আসন্নকাল উপস্থিত হইল।

একদিন বেলা নয়টার সময় আমি আফিস যাইতেছি, এমন সময় বেচু আমাকে তাহার নিকট ডাকিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম যে, সে আর অধিক দিন বাঁচিবে না।

বেচু আমাকে বলিল,—'মদন বাবু! আপনাকে আমি একটি বড় গোপন কথা বলিব। সেই কথা বলিবার নিমিত্ত আজ কয় দিন ধরিয়া আমি সুযোগ খুঁজিতেছি; কিন্তু পিতার ভয়ে আমি বলিতে পারি নাই। আজ পিতা আমাদের গ্রামে গিয়াছেন। সেই জন্য আপনাকে ডাকিলাম।' —আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'কি কথা?'

নিয়োগী-পুত্র উত্তর করিল,—'আমি নিশ্চয় বুঝিতেছি যে, তিন চারি দিনের মধ্যেই আমার মৃত্যু হইবে। আমার বড় ভয় হইতেছে যে, মৃত্যুর পর আমি ঈশ্বরের নিকট কি করিয়া দাঁড়াইব। ঘোর নরক! ঘোর নরক! ভাবিলে শরীর আমার শিহরিয়া উঠে।'

এই কথা বলিয়া, বেচু কাঁদিতে লাগিল। আমি তাহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলাম। আমি বলিলাম,—বেচু বাবু! ঈশ্বর দয়াময়। মানুষের শরীরে যে সামান্য দয়া আছে সে কেবল সেই দয়া-সাগরের এক বিন্দুমাত্র। যদি আপনি কোন পাপ করিয়া থাকেন, তাহার নিমিত্ত আন্তরিক অনুতাপ করুন। তাহাই পাপের প্রায়শ্চিত্ত। দয়াময় আপনাকে ক্ষমা করবেন।'

নিয়োগী-পুত্র পুনরায় বলিল,—'দেখুন, মদন বাবু! এই আসন্ন কালে সকল বিষয় আমি প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। জ্ঞান হইয়া পর্য্যন্ত আমি যাহা কিছু করিয়াছি, ব্যোম জগতে সে সমুদয় যেন ছাপ পড়িয়া গিয়াছে। আমার সমুদয় চিন্তা, ও কাজের ফল আমার জন্য সঞ্চিত রহিয়াছে। সে সমুদয় আমাকে ভোগ করিতে হইবে। কাজ করিলেই যে তাহার ফল আছে, মানুষ অনুক্ষণ তাহা দেখিতেছে। হায় হায়! তবু মানুষ কেন কুকর্ম করে! মদন বাবু! মানুষ আর যাহাই করুন, মানুষ সত্য হইতে যেন বিচলিত না হয়। অন্য পাপ মানুষের বিরুদ্ধে, কিন্তু অসত্য ঈশ্বরের বিরুদ্ধে। মনুষ্য-জীবন ছেলেখেলা নহে,—ধর্মও খেলা করিবার বস্তু নহে যে পরকাল আছে, নরক আছে। এই মৃত্যুকালে আমি একান্ত মনে মানুষকে এই উপদেশ প্রদান করি যে, মানুষ যেন সত্য হইতে বিচলিত না হয়।'

তাহার কথা শুনিয়া, আমার শরীর রোমাঞ্চ হইয়া উঠিল। আমিও যেন নরক প্রত্যক্ষ দেখিতে লাগিলাম। পাপীদিগের আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—'সত্য মিথ্যা কি মোটা-মুটি তাহা আমি বুঝি। কিন্তু ধর্ম বিষয়ে সত্য কি?'

বেচু উত্তর করিল,—'আপনি আমাকে বড় কঠিন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ধর্ম বিষয়ে প্রকৃত সত্য কি, সকলে তাহা অনুভব করিতে পারে না; অনুভব করিবার তাহাদের ক্ষমতা নাই।'

এইরূপ বলিয়া সে আমাকে তাহার নিজের বিশ্বাসের কথা বলিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত

আমি মনোযোগের সহিত তাহা শ্রবণ করিলাম। আমার বোধ হইল যে পীড়িত হইয়া পর্য্যন্ত নিয়োগী পুত্র একান্ত মনে সর্বদা ঈশ্বরকে ডাকিয়াছে। কৃপা করিয়া তিনি তাঁহার চক্ষু উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। তা না হইলে, এরূপ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া এত অল্প বয়সে এরূপ জ্ঞান হয় না। প্রথম প্রথম তাহার মুখ দেখিয়া ও তাহার কথাবার্তা শুনিয়া তাহার প্রতি আমার বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল। কিন্তু এখন আমি বুঝিলাম যে, ক্রমাগত ভগবানকে ডাকিয়া পিতৃদত্ত কলুষিত মনকে সে পবিত্র করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাহার নিকট বসিয়া, তাহার কথা শুনিয়া, আমারও চক্ষু যেন উন্মুক্ত হইল। আমি রূপবান্, আমি বুদ্ধিমান, আমি সাহসী পুরুষ, —আমার মনে এই প্রকার যে অভিমান ছিল, মুহূর্ত মধ্যে সে সমুদয় ভাব আমার চিত্ত হইতে তিরোহিত হইল। কীটস্য কীট,—সামান্য একটা অধম জীব বলিয়া, আমি তাহাকে মনে করিতে লাগিলাম। বেচু ধর্মবিষয়ে যাহা আমাকে বলিল, সে সব কথা এ স্থানে বলিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু শেষকালে সে আমাকে এই কয়টি কথা বলিল,—'মদনবাবু! প্রকৃত সত্য কি, তাহা আমি আপনাকে বলিলাম। কিন্তু এ সত্য হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতা সকলের নাই। সে নিমিত্ত সাধারণ মনুষ্যকে আমার উপদেশ এই যে, যাহার যেরূপ বিশ্বাস, সে যেন তদনুযায়ী কাজ করে। মনে একরূপ বিশ্বাস, বাহিরে অন্যরূপে কাজ, এ যেন কেহ করে না। সেরূপ অসত্য কপট জীবনের ক্ষমা নাই; সেরূপ লোককে নিশ্চয় নরকে ডুবিতে হইবে।'

আমি চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলাম। বেচু পুনরায় আমাকে বলিল,—যে কথা বলিবার নিমিত্ত আমি আপনাকে ডাকিয়াছি, তাহা এখনও আপনাকে বলি নাই! বড় বিপদের কথা! কি করিয়া আপনাকে বলিব, তাই ভাবিতেছি। আপনি অনুতাপের কথা বলিতেছিলেন। আজ এক বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত ঘোর অনুতাপিত হৃদয়ে আমি ঈশ্বরকে ডাকিতেছি। যখন সে দিন মিহিরের আগমন সংবাদ পিতা পুলিশকে দিতে গেলেন, সেই জন্যই সে দিন মরিতে মরিতে অতি কষ্টে আমি পাল মহাশয়কে গিয়া সাবধান করিলাম। মিহিরের আমি সর্বনাশ করিয়াছি। আমি ভাবিলাম যে, নিরপরাধ মিহিরকে যে আমার সাক্ষাতে বাঁধিয়া লইয়া যাইবে, তাহা আমি দেখিতে পারিব না।'

বিস্ময়ান্বিত হইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'মিহিরের আপনি সর্বনাশ করিয়াছেন? মিহিরের আপনি কি করিয়াছেন?'

নিয়োগী পুত্র বলিল,—'যে খুনের জন্য মিহির পথে পথে ফিরিতেছে, যে খুনের জন্য তাহার ফাঁসি হইবার সম্ভাবনা, সে খুন সে করে নাই, সে খুন আমি করিয়াছি।'

আমি বলিলাম.—'কি ! ! ! সত্য?'

নিয়োগী পুত্র উত্তর করিল,—সম্পূর্ণ সত্য। মিহির, আমি আর সেই ছোক্‌রা,—তাহার নাম বেণী,—আরও তিন চারি জন, হুগলীতে এক বাসায় থাকিয়া স্কুলে পড়িতাম। সকলেই আমরা এক জাতি। আমরা সকলে পরস্পরের কুটুম্ব ও পরিচিত। মিহির ও বেণী এক ঘরে থাকিত। পাল মহাশয়ের সহিত বেণীর পিতার ভূমি সম্পত্তি লইয়া বিবাদ হয়। কিন্তু

তাহাতে মিহির ও বেণীতে যে সদ্ভাব ছিল, তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। পরীক্ষার টাকার ও অন্যান্য খরচের নিমিত্ত বেণীর পিতা এক শত টাকা প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমার সাক্ষাতে বেণী সেই টাকাগুলি বিছানায় আপনার শিয়র দেশে বালিশের নিম্নে রাখিয়া দিল। আমার পিতা ধনবান ব্যক্তি নহেন। দৈবের লিখন কেহ খণ্ডাইতে পারে না। সেই দিন দুইটা কি তিনটার সময় সহসা আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। জাগ্রত হইয়া আমি বিছানায় শুইয়া আছি, এমন সময় মিহির ও বেণী যে ঘরে থাকে, সেই ঘরের দ্বার খুলিবার শব্দ হইল। বিছানা হইতে উঠিয়া, আমিও আস্তে আস্তে আমার ঘরের দ্বার খুলিলাম। দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া দেখিলাম যে, গাড়ু হাতে লইয়া মিহির বাহিরে গেল। আমি ভাবিলাম, উত্তম সুবিধা হইয়াছে। দেখি, বেণীর বালিশের নীচে হইতে নোটগুলি লইতে পারি কি না। এই মনে করিয়া আমি আস্তে আস্তে তাহার ঘরে প্রবেশ করিলাম। ঘর অন্ধকার পরিপূর্ণ। যাহা হউক, নিঃশব্দে বেণীর বিছানার নিকট গিয়া, আমি নোটগুলি লইতে পারিলাম। নোট লইয়া পলায়ন করিবার উপক্রম করিতেছি, আর বেণী সেই সময় জাগিয়া উঠিল। 'চোর' এই কথা বলিয়া আমাকে যে তৎক্ষণাৎ ধরিয়া ফেলিল।

এত দূর বলিয়া বেচু আর বলিতে পারিল না। তাহার শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া অতি দ্রুতভাবে সম্পন্ন হইতে লাগিল। 'জল'! এই কথা বলিয়া সে আমাকে গেলাশ দেখাইয়া দিল। তাড়াতাড়ি জলের গেলাশ লইয়া আমি তাহার মুখে ধরিলাম।

চতুর্দশ অধ্যায় – বেচুর শেষ কথা

জল পান করিয়া বেচু কিছু সুস্থ হইল। অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পুনরায় সে বলিতে আরম্ভ করিল—

'আমাকে ধরিয়া চোর চোর বলিয়া বেণী পুনরায় চীৎকার করিতে উদ্যত হইল। আমি তাহার মুখ চাপিয়া ধরিলাম ও সেখান হইতে পলায়ন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু বেণী আমাকে সহজে ছাড়িল না। সেই ঘরের দেয়ালের নিকট সামান্য একটি মেজে ছিল। তাহার উপর বেণী ও মিহিরের পুস্তক, কাগজ কলম ইত্যাদি থাকিত। মিহিরের বড় একখানি ছুরি ছিল। ছুরিখানি সর্বদাই এই মেজের উপর পড়িয়া থাকিত। অন্ধকারে বেণীর সহিত জড়াজড়ি করিতে করিতে ক্রমে আমি সেই মেজের উপর গিয়া পড়িলাম। দৈবের ঘটনা! আমার দক্ষিণ হাতটি মেজস্থিত ঠিক সেই ছুরির উপর পড়িল। তখনও বেণী আমাকে সবলে ধরিয়াছিল। তাহাকে যে খুন করিব, সে ইচ্ছা আমার আদৌ ছিল না। কিন্তু কোনরূপে তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি না পাইয়া, আমি সেই ছুরি তাহার বুকে মারিয়া বসিলাম। 'বাপ'! বলিয়া বেণী তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইল। আমি পলায়ন করিয়া আপনার ঘরে প্রবেশ করিলাম। হায় হায়! এক মিনিট পূর্বে আমি এক জন সাধু সচ্চরিত্রবান্ যুবক ছিলাম! এক মিনিটের মধ্যে আমি চোর, খুনে, নর-পিশাচ হইয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ পরে মিহির ঘরে প্রবেশ করিল। ঘরে প্রবেশ করিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিল। আমি তৎক্ষণাৎ তাহার ঘরে গিয়া আলো জ্বালিয়া দেখিলাম যে, বেণী মৃতপ্রায় হইয়াছে, তাহাকে তুলিতে গিয়া মিহিরের শরীর ও কাপড় রক্তে আরক্ত হইয়া গিয়াছে ও

সেই স্থানে মিহিরের ছুরি পড়িয়া আছে। ইহা ব্যতীত সেই দিন বৈকাল বেলা বেণী ও মিহিরে কিছু বচসা হইয়াছিল। আমি মনে করিলাম,—ভাল হইয়াছে। এ দোষ সম্পূর্ণরূপে মিহিরের উপর আরোপিত হইতে পারিবে, আর তাহা হইলে আমাকে কেহ সন্দেহ করিবে না। এইরূপ ভাবিয়া, তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিবার নিমিত্ত মিহিরকে আমি পরামর্শ দিলাম। মিহির সে সময় স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। সে আমার কথা-মত কার্য্য করিল। আমার একখানা কাপড় পরিধান করিয়া সে পলায়ন করিল। তাহার পলায়ন তাহার পরিত্যক্ত রক্তাক্ত কাপড়, তাহার রাক্তাক্ত ছুরি, পূর্ব্ব দিন বেণীর সহিত তাহার বিবাদ, এই সকল দেখিয়া ও শুনিয়া পুলিশ তাহাকেই দোষী, বলিয়া স্থির করিল, অন্য কাহাকেও সন্দেহ করিল না। সে খুনের প্রকৃত বিবরণ এই আমি আপনাকে বলিলাম।'

আমার আফিস-গমন ঘুরিয়া গেল। বেচুকে আমি বলিলাম,—'এ রোগে আপনার মৃত্যু নিশ্চয়, তাহার অধিক বিলম্বও নাই! আজ হউক, কাল হউক, পরশ্ব হউক, শীঘ্রই আপনাকে ঈশ্বরের নিকট দাঁড়াইতে হইবে। নিজের এরূপ গুরুতর অপরাধ অন্যের ঘাড়ে দিয়া, কোন্ মুখে আপনি ঈশ্বরের নিকট দাঁড়াইবেন? অতএব যদি সময় থাকিতে যথার্থই আপনি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে এ সকল কথা কেবল আমাকে বলিলে হইবে না।'

বেচু জিজ্ঞাসা করিল,—'আমাকে আর কি করিতে বলেন?'

আমি উত্তর করিলাম,—'এ সকল কথা আপনাকে পুলিশের নিকট বলিতে হইবে।'

বেচু বলিল, —'তবে শীঘ্র পুলিশের লোককে আপনি ডাকিয়া আনুন। আমার পিতা প্রত্যাগমন করিতে না করিতে আপনি এ কাজ করুন। আমি বেণীকে খুন করিয়াছি, তাহা তিনি জানেন না; এ কথা শুনিলে তিনি আমাকে কিছুতেই বলিতে দিবেন না।

আমি তৎক্ষণাৎ থানায় দৌড়িয়া যাইলাম। থানার লোক আসিয়া নিয়োগী-পুত্রের সমুদয় বিবরণ লিখিয়া লইল। তাহার পর, পুলিশের কর্মচারী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—'বেণীর নিকট হইতে যে নোট তুমি লইয়াছিলে, তাহা কি তুমি খরচ করিয়া ফেলিয়াছ?'

নিয়োগী-পুত্র উত্তর করিল—'একখানি পঞ্চাশ টাকার ও পাঁচখানি দশ টাকার নোট ছিল। দশ টাকার পাঁচখানি নোট ভাঙ্গাইয়া আমি খরচ করিয়াছি; কিন্তু পঞ্চাশ টাকার নোটখানি নম্বরী বলিয়া তাহা ভাঙ্গাইতে আমি সাহস করি নাই। সে নোট এখনও আমার নিকট আছে।'

এই বলিয়া বেচু তাহার তোরঙ্গের চাবি আমাকে দিল ও যে কোণে নোটখানি ছিল, তাহা আমাকে বলিয়া দিল। নোটখানি বাহির করিয়া আমি পুলিশের হাতে দিলাম। ইহার কিছু দিন পরে নম্বর দেখিয়া প্রমাণ হইল যে, ইহা বেণীর পিতার প্রেরিত সেই নোট বটে।

পুলিশ বেচুকে থানায় লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিল। আমি ও বেচু দুই জনেই আপত্তি করিলাম। কিন্তু পুলিশ সে কথা শুনিল না। পাল্কি করিয়া বেচুকে তাহারা লইয়া চলিল। দুধ, জল, ঔষধ প্রভৃতি লইয়া, আমিও সঙ্গে চলিলাম। থানা হইতে পুলিশ তাহাকে

আদালতে লইয়া গেল। সাহেবের নিকট পুনরায় তাহাকে সমুদয় বৃত্তান্ত প্রদান করিতে হইল। সাহেব তাহাকে জেলখানার হাসপাতালে পাঠাইতে আদেশ করিলেন। নিজের খরচে আমি উকীল দিয়া জামিনের প্রার্থনা করিলাম; কিন্তু সে খুনী আসামী; জামিন হইল না।

এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নাড়া-চাড়া, তাহার উপর ঘোরতর মনের আবেগ, এই সমুদয় কারণে আমি দেখিলাম যে, বেচুর অবস্থা ক্রমশই মন্দ হইয়া আসিতেছে। অপরাহ্ণে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের বৈলক্ষণ্য ঘটিল। এ অবস্থায় জেলখানায় তাহাকে গাড়ী করিয়া লইয়া যাইতে পুলিশ সাহস করিল না পাল্কিতে আস্তে আস্তে তাহাকে লইয়া চলিল। দুইজন পুলিশ কর্ম্মচারী সঙ্গে চলিল। পাল্কির উপর হাত রাখিয়া, পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, রোগীর মুখের দিকে সতত দৃষ্টি রাখিয়া, আমিও সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। গড়ের মাঠে গিয়া রোগীর চক্ষুর ভাব দেখিয়া আমার বড় ভয় হইল। এক নিভৃত বৃক্ষতলে আমি পাল্কি নামাইতে বলিলাম। তাহার পর ভাল করিয়া দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, বেচুর আসন্ন কাল উপস্থিত হইয়াছে। আমি তাহার মুখে বিন্দু বিন্দু জল দিয়া ধীরে ধীরে ভগবানের নাম করিতে লাগিলাম।

এবার আমাব পানে চাহিয়া অতি মৃদুস্বরে এই কয়টি কথা বলিল,—'মদন বাবু! আমি চলিলাম। রাধারাণীকে আপনি বিবাহ করিবেন। আপনি সংসারী হইবেন। সে দিন ধর্ম্ম বিষয়ে অনেকগুলি কথা আপনাকে বলিয়াছি। আজ আর একটি কথা আপনাকে বলি। একখানি মহানির্ব্বাণতন্ত্র ক্রয় করিবেন। বর্ত্তমান-কালে মানবজাতির অবস্থা বুঝিয়া চরাচরের গুরু শ্রীশ্রীসদাশিব মনুষ্যজাতিকে এই মহারত্ন প্রদান করিয়াছেন। ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্মণের নিকট এই তন্ত্র অনুসারে উপদেশ গ্রহণ করিবেন। তাহার পর, এই তন্ত্র অবলম্বন করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। তাহা করিলে আপনার ইহকালে সুখ ও পরকালে সদ্গতি হইবে। আর বিশেষ কথা এই যে, এই তন্ত্রের প্রভাবে অকালমৃত্যুজনিত মহা শোকে আপনার হৃদয় সন্তপ্ত হইবে না। সেই সদাশিব এক্ষণে আমার কণ্ঠে আসীন হইয়াছেন। তাঁহার আদেশে আপনাকে আমি এই কথাগুলি বলিলাম।'

আহা! এই কথাগুলি বলিবার নিমিত্ত বেচু যেন এতক্ষণ জীবিত ছিল। যাই এই কথাগুলি শেষ হইল, আর দেহ হইতে তাহার প্রাণবায়ু অন্তর্হিত হইল। আমি কাঁদিতে লাগিলাম।

বেহারাগণ তাহার মৃতদেহ জেলখানায় লইয়া গেল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে যাইলাম। আমি মনে করিলাম যে, মৃতদেহ দিবার অনুমতি হইলে, আমি লোক ডাকিয়া আনিব। এইরূপ মনে করিয়া বাহিরে আমি অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণ পরে নিয়োগী মহাশয় সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাসায় পৌঁছিয়া তিনি সমুদয় ঘটনা শুনিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি থানায়, ও থানা হইতে আদালতে গিয়াছিলেন। আদালত হইতে এইস্থানে উপস্থিত হইলেন।

মিহির মনে করিয়া, যে দিন পুলিশে আমাকে ধরিয়া লইয়া যায়, সে দিন হইতে আমার

মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। তাহার পর মুমূর্ষু বেচুর নিকট বসিয়া, তাহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া আমার চক্ষু উন্মুক্ত হইয়াছিল। মনুষ্য-জীবন কিরূপ অনিত্য, তাহা আমি বুঝিয়াছিলাম। আমি ভাবিলাম যে, নিয়োগী মহাশয় যেরূপ লোক হউন না কেন, আমি তাঁহার বিচার করিবার কে? মানুষ দোষে গুণে হইয়া থাকে। নিয়োগী মহাশয়েরও অনেক গুণ থাকিতে পারে,—যে গুণের পরিচয় আমি প্রাপ্ত হই নাই। দোষের ভাগ ত্যাগ করিয়া, মানুষের গুণের ভাগ গ্রহণ করাই যে ভাল, সকলকে আমি এই উপদেশ প্রদান করি! কাহারও প্রতি বিদ্বেষ ভাব মনে স্থান দিও না। কাহাকেও ঘৃণা করিও না। কাহারও প্রতি হিংসা করিও না। অনেক সময়ে কু-চিন্তা উদয় হইতে পারে। অন্যের ভাল হইয়াছে শুনিয়া, মনে হিংসার উদয় হইলে, তৎক্ষণাৎ তাহা দূর করিতে চেষ্টা করিবে। মনে কু-চিন্তা উদয় হইলে, ক্রমাগত ঈশ্বরকে ডাকিতে থাকিবে যে,—'হে ঈশ্বর! আমার মন হইতে এরূপ চিন্তা দূর কর।'

এইরূপ ভাবিয়া আমি কাঁদিতে কাঁদিতে নিয়োগী মহাশয়কে তাঁহার পুত্রের মৃত্যু-সংবাদ প্রদান করিলাম। এরূপ ঘোর দুঃখ-সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াও তাঁহার অন্তঃকরণ আর্দ্র হইল। আমার প্রতি তাঁহার রাগ দূর হইল না! অন্ততঃ তাঁহার কোপ-দৃষ্টি দেখিয়া আমি তাহাই বুঝিলাম। যাহা হউক, তাঁহার পুত্রের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার নিমিত্ত লোক ডাকিয়া আনিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। সে অনুমতি তিনি আমাকে প্রদান করিলেন। গাড়ী করিয়া শীঘ্র আমি লোক ডাকিয়া আনিলাম। তাঁহার পুত্রের সৎকার আমরাই করিলাম। দুইদিন পরে নিয়োগী মহাশয় কলিকাতা হইতে প্রস্থান করিলেন। এই পর্য্যন্ত আর কোন সংবাদ আমি পাই নাই। পাইতে ইচ্ছাও বড় করি না।

পাল মহাশয়ের ও তাঁহার পুত্রের অনুসন্ধানে পুনরায় আমি প্রবৃত্ত হইলাম। তাঁহার সহিত যাহাদের আলাপ পরিচয় ছিল, একে একে সকলকে তাঁহার তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলাম। তাঁহার গ্রামে গিয়া একে একে গ্রামবাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম। আরও কত স্থানে গিয়া অনুসন্ধান করিলাম। কিন্তু কেহই তাঁহার সন্ধান আমাকে বলিয়া দিতে পারিল না। মিহির নিরপরাধ প্রমাণিত হইয়াছে, আর লুক্কায়িত থাকিবার আবশ্যক নাই, এই মর্ম্মে দুইখানি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিলাম। তাহাতেও কোন ফল হইল না। কিন্তু তাঁহাদের সহিত পুনরায় যে আমার দেখা হইবে, সে বিষয়ে হতাশ হইলাম না। কারণ, পাল মহাশয় সম্পত্তিশালী লোক। এক দিন না এক দিন তাঁহাকে দেশে আসিতেই হইবে। তাহা ব্যাতীত, কলিকাতার বাসা তিনি একেবারে পরিত্যাগ করিয়া যান নাই! কলিকাতার সেই তিনটি ঘরে তাঁহার জিনিস পত্র আছে। তাহাতে চাবি দিয়া গিয়াছেন। এক দিন না এক দিন কেহ না কেহ সে দ্রব্যাদি লইতে আসিবে। এই প্রত্যাশায় আমি দিনাতিপাত করিতে লাগিলাম।

পঞ্চদশ অধ্যায় — আগে কষ্ট—পরে ইষ্ট

এইরূপে আরও তিন মাস কাটিয়া গেল। ভাদ্র মাস পড়িল। সে বৎসর দারুণ বর্ষা হইয়াছিল। পথঘাট জলময় ও কাদায় কর্দমময় হইয়াছিল। একদিন অপরাহ্ণ চারিটার সময় আফিসে বসিয়া কাজ করিতেছি, এমন সময় এক জন উৎকলবাসী আমাকে একখানি চিঠি

দিল। সে পত্রে কেবল এই কয়টি কথা লেখা ছিল,—'অনুগ্রহ করিয়া অতি গোপনে এই লোকের সহিত শীঘ্র আসিবেন। আসিলে সকল কথা জানিতে পারিবেন।'

পাল মহাশয় ও মিহিরের জন্য সর্বদাই আমার মন উদ্বিগ্ন ছিল। চিঠিখানি পাইবামাত্র আমার মনে হইল যে, এইবার বোধ হয়,তাঁহাদের সন্ধান পাইলাম। কাল-বিলম্ব না করিয়া, আমি সেই লোকের সহিত চলিলাম। কলিকাতার যে অংশে অতি ঘন বসতি, উড়িয়া আমাকে সেই স্থানে লইয়া গেল। সঙ্কীর্ণ গলির ভিতর সঙ্কীর্ণতর গলি, তাহার ভিতর একখানি খোলার বাড়ীতে আমি প্রবেশ করিলাম। অতি কুৎসিত স্থান, দুর্গন্ধে নাড়ি উড়িয়া যায়। চারিদিক্ কাদায় ও ময়লায় পরিপূর্ণ। সেই বাটীতে অতি সামান্য ও ক্ষুদ্র একখানি ঘর উড়িয়া আমাকে দেখাইয়া দিল। ঘরের মেজে নিতান্ত আর্দ্র, যেন জল সপ-সপ করিতেছিল। আমি দেখিলাম যে, সেই ভিজা মেজেতে সামান্য একটি মাদুরের উপর গেরুয়া পরিচ্ছদ পরিহিত এক যুবক পড়িয়া আছে! 'কেও মিহির'—এই কথা বলিয়া আমি তাহার নিকট গিয়া বসিলাম।

মিহির আমার দিকে চাহিয়া দেখিল। চিনিতে পাবিলাম বটে; কিন্তু সে মিহির আর নাই; তাহার দেহ অস্থিচর্মসার হইয়া গিয়াছে; তাহার মুখ মলিন হইয়া গিয়াছে। তাহার গায়ে হাত দিয়া দেখিলাম যে, শরীর হইতে অগ্নির ন্যায় উত্তাপ বাহির হইতেছে। মাঝে মাঝে অতি কষ্টের সহিত সে কাসিতেছে। নিশ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া সাধন করিতেও যেন তাহার বড় ক্লেশ হইতেছে। আমি পুনরায় বলিলাম,—'মিহির!'

মিহির মৃদুস্বরে বলিল,—'চুপ চুপ! আমার নাম ধরিয়া ডাকিও না, কেহ শুনিতে পাইলে এখনি আমাকে ধরিয়া লইয়া যাইবে।'

আমি বলিলাম,—'তবে তুমি এখনও সে কথা জান না? মিহির! সে ভয় আর কিছুমাত্র নাই। তুমি যে নিরপরাধ, তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। বেণীকে নিয়োগী পুত্র খুন করিয়াছিল; পুলিশের কাছে ও আদালতে সাহেবের কাছে, সে তাহা স্বীকার করিয়াছে। তোমার আর কোন ভয় নাই।'

এই কথা শুনিয়া মিহির বলিল,—'আমাকে তুলিয়া বসাও। আমি উঠিতে পারি না।'

আমি মিহিরকে তুলিয়া বসাইলাম। আমার স্কন্ধে মাথা ও বক্ষঃস্থলে আপনার শরীর রাখিয়া, সে বসিয়া রহিল। তাহার পর, বেচুর আদ্যোপান্ত বিবরণ বার বার সে আমার মুখ হইতে শুনিল। সেই বিবরণ শ্রবণ করিয়া তাহার রোগ ও যাতনার যেন অনেকটা উপশম হইল, আর তাহার শরীরে যেন একটু বল হইল।

তাহার পর, আমি তাহাকে বলিলাম,—'মিহির! ভাই! তোমাকে আর ক্ষণকালের জন্য আমি এ স্থানে রাখিতে পারি না। এ স্থানে সহজ মানুষ মরিয়া যায়। তুমি ভয়ানক জ্বর ভোগ করিতেছ। বুকেও বোধ হয়, কিছু রোগ হইয়া থাকিবে। অতএব তোমাকে আমি আমার বাসায় লইয়া যাইব।

মিহির উত্তর করিল,—'কি করিয়া তাহা হইবে! আমার হাতে একটিও পয়সা নাই। এই

সন্ন্যাসীবেশে বহুদেশ ভ্রমণ করিয়া, আজ দশ দিন কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছি। কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াই, আমি শ্যামবাজারে গদাধর মোড়লের নিকট গমন করিয়াছিলাম। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। তাহার পরদিন হইতে এই বিষম জ্বর দ্বারা আমি আক্রান্ত হইয়াছি। সেই অবধি বিছানায় পড়িয়া আছি;—না ঔষধ, না পথ্য। গাড়ীতে যাইতে পারিব না, পালকি করিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু গাড়ী কি পালকি ভাড়া কোথায় পাইব যে, তোমার সহিত তোমার বাসায় যাইব? তবে তুমি যদি গদাধর মোড়লের নিকট একবার যাইতে পার, তাহা হইলে হয়।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'গদাধর মোড়ল কে?'

মিহির উত্তর করিল,—'তিনি বাবার বন্ধু, আমাদের স্বজাতি। কলিকাতায় তিনি ব্যবসা করেন। শ্যামবাজারে তাঁহার বাসা, তোমার সহায়তায় যে রাত্রে আমি পুলিশের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাই, সেই দিন বাবার নিকট যাহা কিছু নগদ টাকা ছিল, তাহা তিনি আমাকে প্রদান করিয়া বলিলেন যে, এ টাকা ফুরাইয়া গেলে তুমি গদাধর মোড়লের নিকট যাইবে, যখন যাহা আবশ্যক হইবে, গদাধর তোমাকে দিবে। আমাকে কদাচ তুমি পত্র লিখিবে না। কারণ, সেই পত্রের অনুসরণে পুলিশ তোমার সন্ধান পাইতে পারে।'একটু চুপ করিয়া মিহির পুনরায় বলিল,—'তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্বেও আমি গদাধর মোড়লকে পত্র লিখিতাম, পিতাকে লিখিতাম না। গদাধর মোড়ল পিতাকে আমার সংবাদ দিতেন। ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া যে দিন বাটী যাইতে ইচ্ছা হইত, সে সংবাদও গদাধর মোড়লের দ্বারা পিতাকে জানাইতাম। পিতা, মাতা ও রাধারাণী সকলে আমার জন্য বসিয়া থাকিতেন। আমি উপস্থিত হইলে, জানালার গরাদ তুলিয়া, ঘরে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত রাধারাণী পথ করিয়া দিত।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'সে, রাত্রি তুমি কিরূপে পলায়ন করিলে? আর তাহার পর এত দিন কোথায় ছিলে? তুমি যে নিরপরাধ, তাহা যখন প্রমাণ হইল, তখন আমি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়াছিলাম। সে সংবাদ-পত্র তোমার হাতে পড়ে নাই?'

মিহির উত্তর করিল,—'না সে বিজ্ঞাপন আমি দেখি নাই। মৃত্যুকালে বেচু আপনার দোষ স্বীকার করিয়া, আমাকে যে খুনের অভিযোগ হইতে অব্যাহতি দিয়াছে, সে কথা তোমার মুখ হইতে এইমাত্র শুনিলাম। সে রাত্রি পুলিশে তোমাকে লইয়া গেল। তাহার পর, বাসাড়েগণ যে যাহার ঘরে পুনরায় শয়ন করিল। আমি তোমার ঘর হইতে বাহির হইয়া, পুনরায় পিতা, মাতা ও ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তাহার পর বাটীর সদর দরজা দিয়া পলায়ন করিলাম, অশ্বত্থ গাছ দিয়া নহে। কয়দিন কলিকাতার এক খোলার ঘরে লুক্কায়িত রহিলাম। তাহার পর, কাপড় ছোপাইয়া, গেরুয়া বস্ত্র ধারণ করিয়া, সন্ন্যাসীর বেশে সে বাটী হইতে বাহির হইলাম। একদল সন্ন্যাসীর সহিত প্রথম জগন্নাথ যাইলাম। তাহার পর, নানা তীর্থস্থান ভ্রমণ করিয়া কলিকাতা প্রত্যাগমন করিলাম। পিতা যাহা কিছু টাকা দিয়াছিলেন, সে সমুদয় খরচ হইয়া গিয়াছে। টাকার জন্য গদাধর মোড়লের নিকট

গমন করিলাম। তাঁহার দেখা পাইলাম না। তাহার পর আজ নয় দিন পীড়িত হইয়া বিছানায় পড়িয়া আছি। সে রাত্রি পিতা আমাকে তোমার পরিচয় দিয়াছিলেন; তুমি কোন আফিসে কাজ কর, তাহাও তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন। তাই আজ তোমাকে সংবাদ দিতে পারিলাম। তোমার বাসায়, কি গদাধর মোড়লের বাসায় লোক পাঠাইতে আমি সাহস করিতাম না। সে যাহা হউক, আমার হাতে এখন একটিও পয়সা নাই। গাড়ী কি পালকি ভাড়া কোথায় পাইব যে, তোমার বাসায় যাইব?'

আমি বললাম,—'সে জন্য তোমার কোন ভাবনা নাই। গদাধর মোড়ল বোধ হয়, তোমার পিতার ঠিকানা জানেন?'

মিহির উত্তর করিল,—'বোধ হয় কেন! পিতার ঠিকানা তিনি নিশ্চয় জানেন।'

মিহিরকে আমি আমার বাসায় লইয়া যাইলাম। পরিষ্কৃত শুভ্র বসন পরাইয়া, তাহাকে পরিষ্কৃত বিছানায় শয়ন করাইলাম। তৎক্ষণাৎ ডাক্তার আনিয়া তাহাকে দেখাইলাম। ডাক্তার বলিলেন যে, 'মিহিরের পীড়া বড় কঠিন হইয়াছে। তাহার বক্ষঃস্থলের দুই দিকেই প্রদাহ হইয়াছে। যাহা হউক, তাহার ঔষধ ও পথ্যের আয়োজন করিয়া, ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে তাহার নিকট বসাইয়া, আমি সেই রাত্রিতেই মোড়লের অনুসন্ধানে গমন করিলাম। এ স্থানে বলিয়া রাখি যে যখন যেরূপ ঘটনা ঘটিতেছিল, ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে তাহা সমুদয় বিবরণ আমি প্রদান করিতেছিলাম। তাঁহার অনুগ্রহ আমি এ জীবনে ভুলিতে পারিব না।'

গদাধর মোড়লের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। পাল মহাশয়ের তিনি বন্ধু বটেন; কিন্তু মিহির যে নিরপরাধ প্রমাণিত হইয়াছে, সে সংবাদ এ পর্য্যন্ত তিনি শ্রবণ করেন নাই। আমার মুখে সেই সমুদয় বিবরণ শুনিয়া, তিনি অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। কিন্তু মিহিরের কঠিন পীড়া শুনিয়া তিনি দুঃখিত হইলেন। তাঁহার মুখে শুনিলাম যে, পাল মহাশয় কাশীতে আছেন। সেই ঠিকানায় তৎক্ষণাৎ আমি বিস্তারিত ভাবে তাকে খবর দিলাম। ডাক্তার খরচের নিমিত্ত অনেকগুলি টাকা সঙ্গে লইয়া, মোড়ল মহাশয় সেই রাত্রিতেই আমার সঙ্গে মিহিরকে দেখিতে আসিলেন। মিহিরকে দেখিয়া তিনিও পাল মহাশয়কে স্বতন্ত্রভাবে তারে খবর দিলেন।

এক দিন পরে পাল মহাশয় সপরিবারে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলা বাহুল্য যে, মিহির যে নিরপরাধ প্রমাণিত হইয়াছে, সে কথা তিনিও পূর্ব্বে শ্রবণ করেন নাই। আমার তারের সংবাদে সে সুসমাচার তিনি প্রথম প্রাপ্ত হইলেন। পুত্রর মুখ দেখিয়া তিনি আনন্দিত হইলেন, কিন্তু তাহার পীড়ার জন্য সকলকেই ঘোরতর উৎকণ্ঠিত হইতে হইল। মিহিরের পীড়া ক্রমে এমনি কঠিন হইয়া উঠিল যে, দিন কয়েক তাহার বাঁচিবার আশা একেবারেই ছিল না। পাল মহাশয়, তাঁহার গৃহিণী, রাধারাণী, ভট্টাচার্য্য মহাশয়, আর আমি—এই কয় জনে, আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া মিহিরের সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম। যাহা হউক, ভগবানের কৃপায় মিহির এ যাত্রা রক্ষা পাইল। পীড়ার যখন একটু উপশম হইল, তখন মিহির একদিন আমার হাতটি ধরিয়া কাঁদ-কাঁদ স্বরে বলিল,—'ভাই!

তুমি আমার ভাই।'

পাল মহাশয়, তাঁহার গৃহিণী ও রাধারাণী সকলেই মিহিরের বিছানার পার্শ্বে সেই সময় বসিয়াছিলেন। মিহিরের এই কথা শুনিয়া পাল মহাশয় বলিলেন,—'হাঁ মিহির! মদন তোমার ভাই। মদনকে প্রথম আমি বুদ্ধি-শুদ্ধিহীন পাগল বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু ইহার স্বভাব দেখিতেছি, সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। ইহার ধীর-মধুর বাক্যে আমি বড়ই প্রীত হইয়াছি। তাহার পর, মদন আমার যে উপকার করিয়াছে, জীবনে তাহা আমি কখনই ভুলিতে পারিব না। সে রাত্রি তোমার পলায়ন, তাহার পর খুনী অভিযোগ হইতে তোমাকে অব্যাহতি দান, অবশেষে এই সঙ্কট পীড়ায় তোমার জীবন রক্ষা,—এ সমুদয় মদনের সহায়তায় হইয়াছে। সে নিমিত্ত আমি বলিতেছি যে, তুমি আমার যেমন পুত্র, মদনও সেইরূপ আমার পুত্র। রাধারাণী মা! তুমি কি বল?'

রাধারাণী বুঝিতে পারিল। লজ্জায় সে ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল। কোন উত্তর করিল না। তাহার পর, সে স্থান হইতে উঠিয়া সে পলায়ন করিল।

সেই দিন আমি মিহিরকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—'মিহির! মুখস্ পরিয়া কলিকাতার জনাকীর্ণ পথ দিয়া তুমি কি করিয়া চলিতে? কেহ তোমাকে কিছু বলিত না?'

একটু হাসিয়া মিহির উত্তর করিল,—'তুমি পাগল! পথ চলিবার সময় আমি মুখস্ পরিতাম না। কেবল অশ্বত্থ গাছে উঠিবার সময় আমি মুখস্ পরিতাম। চোর মনে করিয়া কেহ আমার নিকট না আসে, লোকে ভূত মনে করে ভয়ে পলায়ন করে, সেই জন্য গাছে উঠিবার সময় আমি মুখস্ পরিতাম। দুই একবার ভূত মনে করিয়া লোকে পলায়ন করিয়াও ছিল। খুনী অভিযোগ হইতে মিহির সহজে নিষ্কৃতি পায় নাই। ভাল হইয়া হুগলীর কাছারিতে তাহাকে হাজির হইতে হইয়াছিল। সে স্থানে সামান্য একটু মোকদ্দমাও হইয়াছিল। এই বিচারের সময় আর একটি নূতন কথা বাহির হইয়া পড়িল। বেচুর সহিত আর দুইটি ছাত্র একঘরে শয়ন করিত। খুনের সময় তাহাদের এক জন জাগরিত ছিল। বেচুকে বেণীর ঘরে প্রবেশ করিতে ও কিছুক্ষণ পরে দ্রুতপদে ফিরিয়া আসিতে সে দেখিয়াছিল। এইরূপ আরও অনেক কথা সে অবগত ছিল। মিহিরের হইয়া সে সাক্ষ্য প্রদান করিল। যাহা হউক, অল্প দিনের মধ্যেই মিহির খালাস পাইল।

অধিক আর কিছুই বলিবার নাই। খালাস পাইলে, পাল মহাশয় তাহাকে লইয়া দেশে গমন করিলেন। মাঝে মাঝে তিনি ও মিহির কলিকাতায় আসিয়া, আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। আমিও মাঝে মাঝে তাঁহাদের গ্রামে গমন করিতাম। রাধারাণীর সহিত আমার যে বিবাহ হইবে, সে সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন কথা হয় নাই। কিন্তু কি আমি, কি ভট্টাচার্য্য মহাশয়, কি আর আর লোক, সকলেই বুঝিল যে, সে তো হবেই, তবে আর কথার আবশ্যক কি। আমার পিতা যে স্বহস্তে চাষ করিতেন, সে কথার কোনরূপ আর উল্লেখ হইল না। তবে এক দিন কথায় কথায় ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে পাল মহাশয় বলিলেন যে,—'লোকের মনে কি কুসংস্কার। যাহাদের পরিশ্রমে ভূমি হইতে মানুষের আহার আচ্ছাদন

উৎপাদিত হয়, তাহাদিগকে লোকে চাষা বলিয়া ঘৃণা করে! বড় মানুষের রাজভবন ও গাড়ী ঘোড়া হইতে সামান্য ভিখারীর একমুষ্টি অন্ন পর্য্যন্ত সমুদয় বস্তু কৃষকের পরিশ্রমেই উৎপন্ন হয়। ভারতের সমুদয় জাতির সম্বল—কৃষিকার্য্যের ফল। সুতরাং কৃষকেরা সাধারণের পূজ্য, তাহারা ঘৃণিত নহে। এ বিবেচনা যাহাদের নাই, তাহাদিগকে আমি আর কি বলিব!'

পাল মহাশয় পুনরায় বলিলেন,—'বিপদে পতিত হইয়া আমি আর একটি জ্ঞানলাভ করিয়াছি। ঈশ্বর সর্ব্বদাই আমাদের নিকট আছেন। জলে যেমন মৎস্য ডুবিয়া থাকে, ঐশ্বরিক শক্তির ভিতর সেইরূপ আমরা ডুবিয়া আছি। সেই অনন্ত জ্ঞানসাগরে আমরা যে ডুবিয়া আছি, তাহা যদি ভালরূপে আমরা বুঝিতে পারিতাম, তাহা হইলে মনুষ্য নানা জ্ঞান ও নানারূপ অলৌকিক শক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইত। কিন্তু তিনি যে সর্ব্বদাই আমাদের কাছে আছেন, তাহা আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। সেই জন্য সেই বিশ্বাত্মার সহিত নিজের আত্মা সংযোজিত করিয়া, মানুষ সেই অনন্ত জ্ঞান ও শক্তি সাগর হইতে নিজের সামান্য জ্ঞান ও শক্তি পরিরুষ্ট করিতে পারে না। তথাপি তিনি সর্ব্বদাই আমাদের মঙ্গল সাধন করিতেছেন। বিনা রোষে মিহিরকে যখন পথে পথে ফিরিতে হইয়াছিল, তখন ভগবানের অবিচারের উপর আমি কতই না দোষারোপ করিয়াছিলাম। কিন্তু মিহিরের উপর সেই মিথ্যা অভিযোগ যদি আরোপিত না হইত, তাহা হইলে তাহার এক মাস পরেই বেচুর সহিত আমার কন্যার বিবাহ হইয়া যাইত। কারণ, বিবাহের দিন স্থির পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছিল। সে বিবাহ হইলে আমার সর্ব্বনাশ হইত! যে চুরি করিতে পারে, যে খুন করিতে পারে, আমার কন্যা সেইরূপ লোকের হাতে পড়িত। তাহার পর, রোগগ্রস্ত লোকের হাতে পড়িয়া অল্প দিনের মধ্যেই তাহাকে বিধবা হইতে হইত। অতএব মিহিরকে দুই বৎসরের নিমিত্ত ক্লেশ দিয়া, দয়াময় ভগবান্ চিরজীবনের নিমিত্ত আমার কন্যাকে রক্ষা করিয়াছেন।'

পুনরায় যখন মাঘ মাস আসিল, পুনরায় যখন শ্রীপঞ্চমীর সময় আসিল, তখন পাল মহাশয় কলিকাতায় আসিয়া, ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বিবাহের দিন ধার্য্য করিতে বলিলেন। তাহার পর, সে শুভকার্য্য,—অন্য লোকের যে ভাবে সম্পন্ন হয়, আমারও সেইভাবে হইল। পূর্ব্বের ন্যায় যদি আমার প্রাণে রস থাকিত, তাহা হইতে কিরূপে বাসর-ঘর হইল, কিরূপে শালী-শালাজগণ আমার সহিত তামাসা করিল, সে সব পরিচয় বিস্তারিত ভাবে আমি আপনাদিগকে প্রদান করিতাম। কিন্তু নিয়োগী পুত্রের চিতাগ্নিতে সে রস আমার শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। রস নাই বটে, তবে মন আমার আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছে। কারণ, আমার রাধারাণী, রূপে গুণে লক্ষ্মী। সরস্বতী দেবীর বরে আমি একাধারে এই লক্ষ্মী সরস্বতী লাভ করিয়াছি। সে দিন দেবীকে পূজা করিতে গিয়াছিলাম, তাই ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে পাইয়াছিলাম। তাহার পর, তাঁহার দ্বারা পাল মহাশয়কে পাইলাম। অবশেষে রাধারাণীকে লাভ করিলাম। সে দিন দেবীকে যদি অঞ্জলি দিতে না যাইতাম, তাহা হইলে এ সব যোগাযোগ হইত না। সেই জন্য বলি যে, মা সরস্বতীর কৃপায় আমি রাধারাণীকে লাভ করিয়াছি। রাধারাণীকে লাভ করিয়া, আজ, হে পাঠক! আপনাদের দাসানুদাস এই মদন

ঘোষের বদন হাসিতে পূর্ণ হইয়াছে।

শেষ ভাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ – ডাকিনীর নাচ

গড়াগড়ি মহাশয় বলিলেন,—

মদন ঘোষের গল্পটি শেষ হইবার পূর্ব্বে মুণ্ডটির দিকে আমি চাহিয়াছিলাম। গল্প যত শেষ হইতে লাগিল, মুণ্ডটির নাসিকা ও চক্ষু ততই বিলীন হইতে লাগিল, আর ইহার বর্ণ ততই লোহিত হইতে লগিল। অবশেষে গল্পটি যেই সমাপ্ত হইল, আর মুণ্ডটি তৎক্ষণাৎ রক্তমুক্তায় পরিণত হইল।

এরূপ যে হইবে, পূর্ব্ব হইতেই তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম। সুতরাং শেষ মুণ্ডটিও যখন মুক্তা হইয়া গেল, তখন আমি বিস্মিত হইলাম না, মনে মনে দুঃখও করিলাম না। আম ভাবলাম যে, মা জগদম্বা যখন আমার প্রতি কৃপা করিলেন না, তখন নিশ্চয় আমার আয়ু শেষ হইয়াছে। ডাকিনীকে আমি কিছুতেই বিবাহ করিতে পারিব না, আজ এই স্থানেই স্বহস্তে আমি আমার প্রাণ বিসর্জ্জন করিব।

এইরূপ মনে করিয়া আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। তাহার পব যোড়হস্তে মাকে বলিলাম,—'মা! এ দীন হীন সন্তানকে তুমি দয়া করিলে না। তোমার মুণ্ডমালার মুণ্ডগণ ফাঁকি দিয়া আমার গল্প শুনিল। তাহারা আমার কোন উপকার করিল না। তোমার এ কলঙ্ক, মা, জগতে চিরকাল থাকিবে। তোমার শাণিত খড়্গ দ্বারা এই মুহূর্ত্তে আমি আমার মুণ্ড কাটিয়া তোমার পায়ে সমর্পণ করিব। তাহাতে যদি মা, তোমার সন্তোষ হয়, তো তাহাই হউক!'

মায়ের হাত হইতে আমি খড়্গটি লইলাম। হাত দিয়া দেখিলাম যে, খড়্গ আতি সুতীক্ষ্ণ ছিল। কিন্তু এক কোপে নিজের মুণ্ড দেহ হইতে কিরূপে বিচ্ছিন্ন করিতে পারা যায়, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। পূর্ব্বে কেহ কেহ এরূপ করিয়াছিল, পুস্তকে তাহা আমি পাঠ করিয়াছিলাম। কিন্তু কিরূপে তাহারা করিয়াছিল? আমি দেখিলাম যে, নিজে নিজের মুণ্ড এক কোপে কাটিয়া ফেলিতে পারা যায় না। দুই হাতে খড়্গ ধারণ করিয়া যত বলেই কোপ মারি না কেন, মুণ্ডটি সম্পূর্ণরূপে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে না। অবশেষে এই স্থির করিলাম যে, শয়ন করিয়া, দক্ষিণ হস্তে খড়্গ ধরিয়া বাম দিক্ হইতে নিজের গলদেশ কাটিতে আরম্ভ করি। যতক্ষণ হস্তে শক্তি থাকিবে, ততক্ষণ কাটিয়া যাইব, তাহার পর যাহা হয় তাহা হইবে। এইরূপ স্থির করিয়া আমি শয়ন করিলাম ও তাহার পর আমার গলদেশ কাটিতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু এক রতিও কাটিতে পারিলাম না। একবার বাম দিকে, একবার সম্মুখ দিকে, একবার দক্ষিণ দিকে, সকল দিকে খড়্গ রাখিয়া কাটিতে চেষ্টা করিলাম।

খড়্গ অতি তীক্ষ্ণ ছিল, কিন্তু দাগ পর্য্যন্তও আমার গলায় পড়িল না। সবলে কোপ

মারিয়া দেখিলাম, তাহাতেও কিছু হইল না।

বাহিরে ডাকিনীগণ খল খল হাসিয়া উঠিল; ভূমিকম্প বৃদ্ধের সহিত ডাকিনীগণ মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিল।

ভূমিকম্প মহাশয় আমাকে বলিলেন,—'বিধাতার ভবিতব্য কেহ লঙ্ঘন করিতে পারে না। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ এই যে, নারিকেলমুখী তোমার পত্নী আর তুমি তাহার পতি। মা জগদম্বারও এইরূপ ইচ্ছা, বেতালগণেরও এই ইচ্ছা অতএব আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। লাউমুখী! শাঁকমুখী! শামকমুখী! সকলে তোমরা বিবাহের আয়োজন কর। আমার হাতে শঙ্খ দাও, আমি নিজে শঙ্খ বাজাইব।''

মন্দিরটি ডাকিনীদিগের দ্বারা পরিপূর্ণ হইল। কেহ ফুলের মালা, কেহ বরণডালা কেহ শঙ্খ লইয়া মায়ের সম্মুখে সকলে দাঁড়াইল। স্তম্ভিত হইয়া আমিও সেই ভিড়ের ভিতর দাঁড়াইয়া রহিলাম।

শঙ্খ হাতে লইয়া ভূমিকম্প বলিলেন,—'এ বিবাহের আমি কন্যাকর্ত্তা এবং নিজে পুরোহিত হইব! কিন্তু কন্যা-সম্প্রদায়ের পূর্ব্বে মায়ের সম্মুখে এস, সকলে একবার প্রাণ ভরিয়া নৃত্য করি।''

এই বলিয়া শঙ্খ বাজাইতে বাজাইতে ভূমিকম্প মহাশয় নৃত্য আরম্ভ করিলেন। তাঁহার শঙ্খের শব্দে আকাশ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তাঁহার নৃত্যের বলে মেদিনী কম্পিত হইতে লাগিল। সেই সঙ্গে জগৎ পরিপূর্ণ হইল। নৃত্য প্রথম ধীরে ধীরে আরম্ভ হইল। কিন্তু ক্রমে তাহার বেগ প্রবল হইতে প্রবল তর হইতে লাগিল। বাষ্পীয় যন্ত্রের চক্রের ন্যায় ডাকিনীদিগের দেহ ক্রমে প্রবল বেগে ঘূর্ণিত হইতে লাগিল।

ডাকিনীদিগের উলুধ্বনিতে, ভূমিকম্প মহাশয়ের শঙ্খনিনাদে, নানারূপ বাদ্যযন্ত্রের ভীষণ কোলাহলে, আমার কর্ণে তালি লাগিয়া গেল। তাহার পর তাহাদের দারুণ ঘূর্ণায়মান নৃত্যে আমার মস্তক ঘুরিতে লাগিল। আমি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম সত্য, কিন্তু তাহাদের চক্রবৎ ঘূর্ণিত দেহ দর্শনে আমার মস্তক যেন প্রবল বেগে ঘূর্ণিত হইতে লাগল।

মস্তক ঘুরিয়া আমি ভূমিতে পতিত হই আর কি, এমন সময় কোথা হইতে দুইটি হস্ত আসিয়া আমাকে ধরিয়া ফেলিল। সেই হস্ত অবলম্বনে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া, কাহার হস্ত দেখিবার নিমিত্ত আমি চাহিয়া দেখিলাম। যাহা দেখিলাম, তাহাতে ঘোরতর বিস্মিত হইলাম। দেখিলাম, যে, মায়ের বাম হস্তস্থিত সেই নরমুণ্ড ও মুণ্ডমালার সমুদয় মুণ্ড মুক্তা রূপ পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় নরমুণ্ডের আকার ধারণ করিয়াছে; আর প্রতি মুণ্ডের গলদেশ হইতে দুইটি করিয়া হাত বাহির হইয়াছে। একটি মুণ্ডের দুইটি হস্ত আমাকে ধরিয়া আছে, ও অন্য মুণ্ডদিগের হস্তগুলি ডাকিনীদিগকে ধরিয়া আছে। আমাকে যে হস্তদ্বয় ধরিয়াছিল, তাহারা আমাকে স্থিরভাবে রাখিয়াছিল, কিন্তু অন্য মুণ্ডদিগের হস্তগুলি ডাকিনীদিগকে প্রবলবেগে ঘূর্ণিত করিতেছিল। পুতুল বাজির পুতুলগণ যেরূপ মনুষ্য কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়, মুণ্ডমালার হস্ত দ্বারা ডাকিনীগণও সেইরূপ পরিচালিত হইতেছিল। বোঁ

বোঁ, ভোঁ ভোঁ, তা থেই থেই, তা থেই থেই, হস্ত কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া ডাকিনীগণ কখন ঘুরিতেছিল, কখন নাচিতেছিল। ভূমিকম্পের নৃত্য ক্রমে অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। হস্ত কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া তিনি শঙ্খ বাজাইতে বাজাইতে আমাকে প্রদক্ষিণ করিয়া নাচিতে লাগিলেন। এত বেগে তিনি আমার চারি দিকে ঘুরিতে লাগিলেন যে, তিনি যেন সর্ব্বদাই এক স্থানে দাঁড়াইয়া আছেন, আমার এইরূপ বোধ হইল। দারুণ নৃত্যে, দারুণ কোলাহলে, আমার মস্তিষ্ক দধি-মন্থনের ন্যায় যেন মন্থিত হইতে লাগিল। আমার দারুণ শিরঃপীড়া উপস্থিত হইল। ঘোরবেদনায় আমার মস্তক যেন খসিয়া পড়িতে লাগিল।

এই সময় মুণ্ডমালার হস্ত দুইটি ভূমিকম্পের মস্তক ধরিয়া আমার দিকে কিছু অবনত করিল। শঙ্খের এক দিক্ ভূমিকম্পের মুখে রহিল, শঙ্খের পশ্চাৎ দিক্ আমার বক্ষঃস্থল ঈষৎ স্পর্শ করিল। এই সময় ভূমিকম্প-মহাশয় শঙ্খে সবলে ফুঁ দিলেন। এই সময় মুণ্ডমালার হস্ত দুইটি আমাকে ছাড়িয়া দিল। শঙ্খের পশ্চাৎ দিক্ হইতে প্রবল ঝটিকার ন্যায় বায়ু নির্গত হইয়া আমার বক্ষঃস্থলে লাগিল। সেই প্রবল বায়ুবেগে আমার শরীর মন্দিরের দ্বার পার হইয়া আকাশ-পথে চলিতে লাগিল! নিমেষের মধ্যে সমুহ সহস্র কোশ পথ অতিক্রম করিয়া শূন্যপথে আমার শরীর প্রবলবেগে ছুটিতে লাগিল। নদ-নদী, বন-উপবন, পাহাড়-পর্ব্বত, সাগর-মহাসাগরের উপর দিয়া আমার শরীর শূন্যপথে ছুটিতে লাগল। দুই চারি মুহূর্তের মধ্যে আমার শরীর সাতবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিল। সে দারুণ বেগে জ্ঞান-গোচর আর আমার কিছুমাত্র রহিল না। অবশেষে ঝুপ করিয়া আমি ভূমিতে পতিত হইলাম।

ভূমিতে পতিত হইবার পূর্ব্বে আমি চক্ষু মুদিত করিয়ছিলাম। ভূমিতে পতিত হইয়াও আমি চক্ষু মুদিত করিয়া রহিলাম। মনে করিলাম যে, আমি আর জীবিত নাই, আমার হস্ত পদ অস্থি মজ্জা সমুদয় চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

যাহা হউক, কিছুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে আমি চক্ষু চাহিয়া দেখিলাম। প্রথম আমি আমার মাথায় হাত দিয়া দেখিলাম। দেখিলাম যে, মস্তকটি চূর্ণ হইয়া ধূলার ন্যায় হইয়া যায় নাই! তাহার পর হাত দুইখানি দেখিলাম, দেখিলাম যে, হাত দুইখানিও যেমন তেমনি আছে, তবে কৃশ হইয়া গিয়াছে। তাহার পর পদদ্বয় নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলাম। তাহাও ভগ্ন বলিয়া বোধ হইল না। অবশেষে কোথায় কোন্ দেশে আমি নিক্ষিপ্ত হইয়াছি, তাহা স্থির করিবার নিমিত্ত এদিক্ ওদিক্ দৃষ্টি করিলাম। যাহা যাহা এখন আমার নয়নগোচর হইল, তাহা দর্শন করিয়া আমি ঘোরতর বিস্মিত হইলাম। আমি দেখিলাম যে, পাহাড়-পর্ব্বত অথবা সাগর-মহাসাগরের উপর আমার শরীর পতিত হয় নাই, ঘরের ভিতর, তক্তপোষে, বিছানার উপর আমার শরীর পতিত হইয়াছে। অন্ততঃ চক্ষু চাহিয়া আমি দেখিলাম যে, ঘরের ভিতর তক্তপোষের উপর আমি শয়ন করিয়া আছি, আর আমার পদতলে সেই তক্তপোষের উপর, এক জন স্ত্রীলোক বসিয়া আছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ – আমার কথাটি ফুরুলো

সেই স্ত্রীলোককে দেখিয়া আমার বড় ভয় হইল। আমি ভাবিলাম যে, সেই নারিকেল-মুখী বুঝি সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে। অতি ধীরে ধীরে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'কে ও! নারিকেলমুখী?'

স্ত্রীলোকটি কোন উত্তর করিলেন না। আমি আরও নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম স্ত্রীলোকটি মানুষের মত, ডাকিনীর মত নহে। তাহা দেখিয়া মন আমার অনেকটা আশ্বস্ত হইল। সে স্ত্রীলোক যেন আমার পরিচিতা, যেন কোথায় তাহাকে আমি দেখিয়াছি, এইরূপ আমার মনে হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি কে, তাহা আমি স্মরণ করিতে পারিলাম না।

স্ত্রীলোকটিকে স্মরণ করিবার নিমিত্ত মনে মনে চেষ্টা করিতেছি, এমন সময় সেই ঘরে আর এক জন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক প্রবেশ করিলেন। আমার বিছানায় যিনি বসিয়া ছিলেন, তাঁহাকে বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিলেন,—'শৈল! জামাতা এখন কেমন আছেন?'

এই প্রশ্ন শুনিবামাত্র আমার সকল কথা স্মরণ হইল। শৈল আমার স্ত্রীর নাম। যে স্ত্রীলোকটি বিছানায় আমার পদতলে বসিয়াছিলেন, তিনি আমার স্ত্রী। বৃদ্ধা আমার শাশুড়ী-ঠাকুরণী!

আমার স্ত্রী উত্তর করিলেন,—'ডাক্তার বলিযাছিলেন যে, নিদ্রা অবসানে হয় তো জ্ঞান হইবে। কিন্তু কৈ? জ্ঞান তো হয় নাই। এই মাত্র নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া বে-ছুট কথা বলিলেন।

শাশুড়ী-ঠাকুরাণী তাহার পর আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'সুবল! বাবা! এখন তুমি কেমন আছ?' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'আমি এ কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি?'

শাশুড়ী ঠাকুরাণী উত্তর করিলেন,—'বালাই! কোথায় পড়িবে কেন? বাড়ীতে আছ। আমার বাড়ীতে আছ। তোমার শ্বশুরবাড়ীতে আছ।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'ডাকিনী সব কোথায় গেল? তাহারা তো এখানে আসে নাই।' শাশুড়ী উত্তর করিলেন,—'ছি বাবা! ও সব কথা ছাড়িয়া দাও। ঔষধ দিয়া দুষ্টগণ তোমাকে অজ্ঞান করিয়াছিল! ডাকিনী এখানে কোথা হইতে আসিবে বাবা! ঐ দেখ, শৈল বসিয়া কাঁদিতেছে। ও সব বেছুট কথা ছাড়িয়া দাও।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'কত দিন আমি এ স্থানে আছি?'

শাশুড়ী ঠাকুরাণী উত্তর করিলেন,—'তোমার প্রতিবাসী বটকৃষ্ণকে তুমি পত্র লিখিতে বলিয়াছিলে। তাহার চিঠি পাইবামাত্র যজ্ঞেশ্বরকে সঙ্গে লইয়া আমি ও শৈল তোমার বাড়ীতে গমন করিলাম। গিয়া দেখিলাম যে, তোমার ভাই হতভাগা তোমার পায়ে বেড়ী দিয়া রাখিয়াছে। তোমার তখন জ্ঞান-গোচর কিছুই ছিল না। কিন্তু বামী গোয়ালিনীর মুখে ভিতরের কথা আমরা সব শুনিলাম। সত্য সত্য তুমি পাগল হও নাই। ওকুরের বন্ধু সেই পোড়ার-মুখো ডাক্তার কি তোমাকে খাইতে দিয়াছিল। সে ঔষধ খাইয়া তোমার ওরূপ

হইয়াছিল। তোমার ভাই কিছুতেই ছাড়িয়া দিবে না। আমরা নালিশ করিবার ভয় দেখাইলাম। তবে তো তোমাকে ছাড়িয়া দিল। সে স্থানে থাকিলে নিশ্চয় তোমাকে মারিয়া ফেলিত। মার পেটের ভাই যে এমন নিষ্ঠুর হয়, তা কখন শুনি নাই। কিন্তু সে যাহা হউক, এখন তুমি কেমন আছ, বাবা? আমাদের চিনতে পার? আজ তিন মাস তোমাকে আমরা এস্থানে আনিয়াছি। তাহার উপর আবার জ্বর-বিকার বাঁচিবার আশা আর ছিল না। এক চল্লিশ দিন যে কি করিয়া কাটিয়াছে, ভগবান্ তাহা জানেন। তিন মাস তুমি আমাদিগকে চিনিতে পার নাই। নারিকেল-মুখী, শাঁক-মুখী কত কি আমাদিগকে বলিতেছিলে।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তবে কি সত্য সত্য আমি ডাকিনীর হাতে পড়ি নাই?'

শাশুড়ী ঠাকুরাণী উত্তর করিলেন,—'বালাই! ডাকিনীর হাতে কেন পড়িবে? শৈল তোমাকে সকল কথা বলিবে। এখন শৈলের সহিত একটু কথাবার্ত্তা কর। আজ তিন মাস বাছা আমার আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছে।'

এই কথা বলিয়া শাশুড়ী ঘর হইতে প্রস্থান করিলেন। আমার স্ত্রীর সহিত কথোপকথনে আমি বুঝিলাম যে, সেই ডাক্তারের ঔষধ সেবন করিয়া সত্যসত্যই আমি জ্ঞান-হত হইয়া গিয়াছিলাম। আমি কলিকাতা গমন করি নাই, আমি গির্জ্জার উপরে পতিত হই নাই, সমুদ্রের ঝিনুকের ভিতরও আমি বাস করি নাই, ডাকিনীদিগের সহিতও আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। আমার গ্রামবাসীর পত্র পাইবামাত্র 'স্ত্রী ও শাশুড়ী ঠাকুরাণী তাঁহাদের প্রতিবাসী যজ্ঞেশ্বরকে সঙ্গে লইয়া তৎক্ষণাৎ আমার গ্রামে গমন করেন, ও সে স্থান হইতে তাঁহারা আমাকে শ্বশুরালয়ে আনয়ন করেন।

আমার শাশুড়ী, স্ত্রী ও আর সকলে বলিলেন বটে যে, সনাতন নস্কর, ভূমিকম্প মহাশয়, গির্জ্জা, সমুদ্র, সুন্দরবন, ডাকিনী ও কালীর মন্দির, এই সমুদয় সম্বন্ধে আমি যাহা কিছু দেখিয়াছিলাম, সে সমুদয় পীড়ারখেয়াল ব্যতীত আর কিছুই নহে, কিন্তু সকলের কথা এখন পর্য্যন্ত আমর সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় নাই। সে সমুদয় বিষয় আমি এখন প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, তাহা সম্পূর্ণ অলীক বলিয়া আমি ভাবনা করিতেও পারি না।

আমার স্ত্রী বলিলেন যে, শ্বশারালয়ে আগমনের পর আমি জ্বর-বিকার দ্বারা আক্রান্ত হই। এক-চল্লিশ দিন অজ্ঞান অবস্থায় থাকিয়া সেই দিন সবে মাত্র আমার জ্ঞান হইয়াছিল। ডাক্তার বলিয়াছিলেন যে, জ্বর, বিকার কাটিয়া গেলে আমার মস্তিষ্কের দোষ কাটিয়া যাইবে। প্রকৃত তাহাই হইল, সেই দিন হইতে আমার সম্পূর্ণ জ্ঞান হইল।

সে দিন আমার স্ত্রী আমাকে অধিক কথোপকথন করিতে দিলেন না। আমার ভ্রাতার বিষয় আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু আমার স্ত্রী সে দিন সে কথার কোন উত্তর দিলেন না। কিছু সুস্থ ও সবল হইলে, দুই চারি দিন পরে, পুনরায় আমি আমার ভ্রাতার কথ জিজ্ঞাসা করিলাম। আমার গৃহিণী তখনও পরিষ্কার করিয়া কোন উত্তর করিলেন ন 'আমি শুনিয়াছি যে, ওকুর কলিকাতায় আছে।' তখন তিনি কেবল এই কথা বলিলে

প্রায় এক মাস পরে, যখন আমি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইলাম, তখন এক দিন আমা আমাকে কলিকাতা যাইতে বলিলেন। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন

'আমরা শুনিয়াছি যে, ওক্রুরের বড় বিপদ হইয়াছে। উচ্চ ছাদের উপর বসিয়া সে এক দিন মদ খাইতেছিল। সেই সময় নিকট দিয়া একটি চিল উড়িয়া গেল। তাহা দেখিয়া চিলের মত উড়িতে তাহার সাধ হইল। চিলের মত উড়িতে গিয়া সে ছাদ হইতে পড়িয়া গিয়াছে। ডাক্তার তাহার পা দুইটি কাটিয়া দিয়াছে। এখন সে হাঁসপাতালে পড়িয়া আছে।'

এই কথা শুনিয়া আমি তৎক্ষণাৎ কলিকাতা গমন করিলাম। কলিকাতায় আসিয়া দেখিলাম যে, সত্যসত্যই অক্রুর হাঁসপাতালে পড়িয়া আছে, আর তাহার পদদ্বয় কৰ্ত্তিত হইয়াছে। শ্বশুরালয়ে আমি যখন জ্বরবিকারে অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া ছিলাম, কলিকাতায় সেই সময় এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। আমি আরও জানিতে পারিলাম যে, পৈতৃক সম্পত্তির নিজের অংশ অক্রুর বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে। সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাইয়াছিল, তাহা সে অপব্যয় করিয়াছে। তাহার হাতে এখন আর একটি পয়সাও নাই।

কলিকাতায় থাকিয়া আমি অক্রুরের ভালরূপে চিকিৎসা করাইতে লাগিলাম। যখন সে একটু সুস্থ ও সবল হইল, তখন তাহাকে দইটি কাঠের পা কিনিয়া দিলাম। তাহার পর তাহাকে আমার শ্বশুরালয়ে লইয়া আসিলাম। সম্পূর্ণরূপে সে আরোগ্য লাভ করিলে, তাহাকে সঙ্গে লইয়া আমি আমার স্বগ্রামে গমন করিলাম। সে স্থানে কিছুদিন থাকিয়া একটি বয়স্থা কন্যা স্থির করিয়া তাহার বিবাহকাৰ্য্য সমাধা করিলাম। পরিবার প্রতিপালনের নিমিত্ত, পৈতৃক সম্পত্তির আমার অংশের উপস্বত্ব তাহাকে আমি দিয়াছি। পাছে বিক্রয় করিয়া ফেলে, সে জন্য সম্পত্তি একেবারে তাহাকে আমি লিখিয়া দিই নাই। সে এখন গ্রামে দলের দলপতি হইয়াছে। কে কি খায়, কে কি করে, সর্বদা সে সেই সন্ধানে থাকে। লোককে একঘরে করিতে পারিলে, অথবা কাহারও কোনরূপ মন্দ করিতে পারিলে, সে পরম সন্তোষ লাভ করে। কিন্তু তাহার সংসারে সুখ নাই। তাহার অনেকগুলি পুত্র কন্যা হইয়াছিল, কিন্তু একটিও বাঁচিয়া নাই। তাহার পর, স্ত্রীর সহিত তাহার সর্ব্বদাই কলহ হয়। কলহ হইলে তাহার স্ত্রী সেই কাষ্ঠনির্ম্মিত পা দুইখানি লুকাইয়া রাখে, তখন চলিতে না পারিয়া অক্রুর নিতান্ত বিপন্ন হয়। দুই হাতের সহায়তায় স্ত্রীর নিকট গমন করিয়া তাহার হাতে-পায়ে পড়িতে থাকে। অনেক সাধ্য-সাধনার পর তাহার স্ত্রী কাঠের পা দুইটি বাহির করিয়া দেয়।

স্বগ্রামে থাকিয়া যখন আমি কনিষ্ঠের বিবাহের আয়োজন করিতেছিলাম, তখন গুরুদেব এক মকদ্দমায় পড়িয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে সে সময় আমার হাতে টাকা ছিল। সে বার আমি তাঁহার রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। এক্ষণে তাঁহার স্বর্গলাভ হইয়াছে। কোথায় কিরূপে তাঁহার স্বর্গলাভ হইল, সে কথা আর শুনিয়া কাজ নাই।

যে ডাক্তার আমাকে বলপূর্ব্বক ঔষধ দিয়া পাগল করিয়াছিল, ভ্রমক্রমে তাহার একমাত্র পুত্র ডাক্তারখানা হইতে কি ঔষধ খাইয়া মরিয়া গিয়াছে। সেই শোকে তাহার স্ত্রী বায়ুগ্রস্ত হইয়াছে। রাত্রি দিন তাঁহার চীৎকারে ও নানারূপ উপদ্রবে ডাক্তার বড়ই বিপন্ন হইয়াছে। আমি এক্ষণে আমার শ্বশুরালয়ে বাস করিতেছি। শ্বশুরের যে সম্পত্তি পাইয়াছি, তাহাতে

সুখে স্বচ্ছন্দে আমার সংসার চলিয়া যায়। ভালরূপ লেখা-পড়া জানি না, শাস্ত্র জানি না, জানি কেবল এই যে,—সত্য ও পরোপকার—ইহাই ধর্ম্ম, ইহাই কর্ম্ম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ – নোটে গাছটি মুড়ুলো

মহাদেব বাবুকে সম্বোধন করিয়া ঘনশ্যাম বলিলেন,—'আড্ডাধারী মহাশয়। সুবল গড়গড়ি মহাশয়ের কাহিনী আপনারা শ্রবণ করিলেন। আজ সেই গল্প শেষ হইল। এক্ষণে আপনারা ইহার ভাল মন্দ বিচার করুন।'

সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিলেন যে, বেতাল পঁচিশ সিংহাসন ও আরব্য উপন্যাসের পর এরূপ অদ্ভুত ঘটনা পৃথিবীতে আর কখন ঘটে নাই।

তাহার পর, সভ্যদিগের মধ্যে বাদানুবাদ উপস্থিত হইল। সনাতন নস্কর, ভূমিকম্প-মহাশয়, গির্জ্জা, সমুদ্র, ঝিনুক, সুন্দরবন, ব্যাঘ্র, ডাকিনী, কালীর মন্দির, এই সকল বিষয় সম্বন্ধে গড়গড়ি মহাশয় যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা সত্য, অথবা পাগলের ভ্রান্তি, এই কথা লইয়া ঘোর বাদানুবাদ উপস্থিত হইল।

হলধর বলিলেন,—'এ সমুদয় ঘটনা প্রকৃত ঘটে নাই। হয় পাগল অবস্থায় আর না হয় বিকার অবস্থায় গড়গড়ি মহাশয়ের মস্তিষ্কে এই সমুদয় অলীক দৃশ্য আবির্ভূত হইয়াছিল।'

ঘনশ্যাম বলিলেন,—'এ সমুদয় ঘটনা সত্য ঘটিয়াছিল। এমন অদ্ভুত ঘটনা কখন মি ্যা হইতে পারে না।'

হলধর উত্তর করিলেন,—'গড়গড়ি মহাশয় যদি শ্বশুরালয়ে শয্যাশায়ী হইয়া রহিলেন, তাহা হইলে কি করিয়া তিনি কলিকাতা গমন করিলেন?

দুই পক্ষের বাদানুবাদ শ্রবণ করিয়া অবশেষে মহাদেব বাবু ধীর-গম্ভীর স্বরে আপনার রায় প্রকাশ করিলেন।'

মহাদেব বাবু বলিলেন,—'গড়গড়ি মহাশয় যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য, তাঁহার জড় দেহ শ্বশুরালয়ে পড়িয়াছিল। নাক্ষত্রিক দেহ অবলম্বন করিয়া তিনি কলিকাতায় গমন করিয়াছিলেন।'

হলধর বলিলেন,—'সে কথা সম্ভব। তা হইতে পারে। সেই যারে বলে তাড়িত-দেহ। সেই তাড়িতদেহ গড়-গড়ি মহাশয় এই সকল কাণ্ড করিয়াছিলেন।'

অদ্ভুত ঘটনাসমূহ সমন্ধে আড্ডাধারী মহাশয় এইরূপ মত প্রকাশ করিলেন। তাহাতে সকলের মন হইতে সন্দেহ দূর হইল। প্রফুল্ল মনে সকলে স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন।

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত